এক পথ

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দর্জ্জীপাড়া ষ্ট্রীটের ১২ নম্বর বাড়ী হইতে ঐ যে ভদ্রলোকটিকে নিত্য দেখেন, বেলা নটা পনেরো মিনিটে বাহির হইয়া দ্রুত-পায়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিয়াছেন, হাতে মস্ত টিফিন-বাক্স—পাণ চিবাইতেছেন,—পাড়ার কাহারো সঙ্গে মেলামেশা নাই, কাহারো পানে ফিরিয়া চাহেন না, ঐ ভদ্রলোকটির নাম জানেন?

উঁহার নাম প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ১২ নম্বর বাড়ীটি তিন বৎসর ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। ডালহৌসি স্কোয়ারের কোন্ অফিসে কেরাণীগিরি করেন। তা হোক্—ও ভদ্রলোকটির মনের গতি আমাদের পাঁচজনের মত নয়।

সে কথা বুঝিতে হইলে বারো বৎসর পূর্ব্বেকার যবনিকা তুলিতে হয়। বারো বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকটির বয়স ছিল বাইশ বৎসর। তখন উনি কলেজে পড়িতেন—থাকিতেন বেনেটোলায় হষ্টেলে। কবিতা লিখিতেন—বেশভূষায় ছিল বিলক্ষণ লক্ষ্য। এখন যেমন মাথার সামনে টাক দেখিতেছেন, তখন টাক ছিল না; টাকের পরিবর্ত্তে বড় বড় চুলে সিঁথির বাহার ছিল খুব! কলেজের ছাত্র মহলে সৌখীন বলিয়া উঁহার বেশ একটু খ্যাতি ছিল।

কিন্তু এত খুঁটীনাটী কথা বলিতে গেলে প্রশান্তর জীবন-চরিত লিখিতে হয়। জীবন চরিত এ-যুগে কেহ পড়ে না, কাজেই চরিত-কথা লিখিয়া লাভ নাই।

শ্রাবণ মাসের কথা। সেদিন কলেজের ছুটী। সকাল হইতে বিছানায় পড়িয়া প্রশান্ত অনেক কথা ভাবিতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ দেখিয়া সে কবিতা লিখিতে বসিল; কিন্তু ভাষা আর ভাব এ দুর্য্যোগে কোথায় লেপ মুড়ি দিয়া লুকাইয়া রহিল, প্রশান্তর কলমের মুখে কিছুতে আসিয়া দেখা দিল না।

বিছানায় পড়িয়া প্রশান্ত বিশেষ করিয়া ভাবিতেছিল আরতির কথা।

কেশবের বোন্ আরতি। কেশব আর প্রশান্ত এক গ্রামের ছেলে। দুজনে এক ক্লাসে পড়িত। কেশব মারা গিয়াছে। তার বাপ ছিলেন এক ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের বাবু। মনিবের কৃপা অজস্রভাবে পাইবে ভাবিয়া বেচারী ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লেখায়; বিবাহ করে ব্রাহ্ম-সমাজের এক প্রচারকের কন্যাকে। কেশবের মা লেখা-পড়া জানিতেন—একটা মেয়ে-স্কুলে নীচেকার ক্লাসে তিনি পড়াইতেন। কেশব বাঁচিয়া থাকিতে কেশবের সঙ্গে প্রশান্ত তার গৃহে বহুবার আসিয়াছে এবং কেশবের অন্তিম শয্যায় তার শিয়রে বসিয়া মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়া দু'দিন বসিবার ভাগ্যও সে লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে এ গৃহের দ্বার আজো অবারিত আছে।

বিছানায় পড়িয়া আরতির কথা সে খুব বেশী করিয়া ভাবিতেছিল। আরতি ম্যাট্রিক পড়ে। তার ট্রানস্লেশনের খাতা টানিয়া প্রশান্ত দু'চারিটা ভুল শুধরাইয়া দেয়; আরতির অঙ্ক বুঝাইয়া দেয়; এবং...

চিন্তা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রশান্ত উঠিয়া জামা গায়ে দিয়া হষ্টেল ছাড়িয়া কেশবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

সিমলায় চার-তলা একটা বাড়ীর সব উপরতলায় দুটী ঘর লইয়া কেশবের মা বাস করেন; কন্যা আরতি থাকে সঙ্গে। প্রশান্ত আসিয়া চার তলায় সিঁড়ির দ্বারে করাঘাত করিল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। চার-তলায় এই দুটীমাত্র ঘর; অন্য ভাড়াটিয়া এ তলায় থাকে না।

দ্বারে করাঘাত করিতে আরতি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কহিল—প্রশান্ত-দা!

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশান্ত কহিল—হুঁ।

—কি খবর? কলেজে যাওনি?

—না। কলেজের ছুটী।

—ও! আজ ফতেয়া-দোয়াজ-দোহাম বটে!

প্রশান্ত কহিল—মা কোথায়?

আরতি কহিল—ব্রহ্মদাস বাবুর বাড়ী গেছেন; তাঁর মেয়ে গান শিখছে মায়ের কাছে। সন্ধ্যার সময় তাঁরা বাড়ী থাকবেন না—তাই মা এখন গেছে সেখানে মিউজিকে লেশন্‌স্‌ দিতে।

প্রশান্ত আরতির মুখের পানে চাহিল; কহিল,—সে অঙ্কগুলো কষেছ?

মুখ বাঁকাইয়া আরতি কহিল—একটা অঙ্ক ভারী শক্ত।

প্রশান্ত কহিল—চল, বুঝিয়ে দিই।

দুজনে আসিয়া ঘরে বসিল। আরতি ট্রানস্লেশন করিতেছিল। প্রশান্ত কহিল—আন তোমার এরিথমেটিক…

এরিথমেটিক আসিল; খাতা আসিল; পেন্সিল আসিল। বই দেখিয়া প্রশান্ত খাতায় আঁকের রেখা পাড়িল।

কিন্তু আঁকের লাইনে-লাইনে মেঘের জমাট অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাইয়া বহিতেছে—যেন সমুদ্রের ঢেউ! পাঁচ মিনিট…দশ মিনিট…বিশ মিনিট কাটিল। প্রশান্তর হাতের পেন্সিল হাতে রহিয়া গেল…

উচ্ছ্বসিত হাস্যে আরতি কহিল—কেমন মশায়…নিজেও পারছ না তো!

প্রশান্তর বুকের কূলে কূলে যে-অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ছিল, এ হাস্যের চপল আঘাতে সে অন্ধকার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অবিচল নেত্রে প্রশান্ত চাহিয়া রহিল আরতির পানে…

লজ্জায় আরতির দু' গালে রাঙা গোলাপ ফুটিল। তবু হাসি সে চাপিতে পারিল না; আঁচলের খুঁট টানিয়া ঠোঁটের উপর চাপা দিয়া মৃদু হাস্যে আরতি কহিল—কি দেখছ?

প্রশান্ত কহিল—তোমায়!

কথাটা আসিল যেন পাতালের কোন্ অতল রন্ধ্র ভেদ করিয়া। ভগ্ন স্বর। সে স্বর যেন পাতালের অন্ধকার বাষ্পের স্পর্শে আর্দ্র রহিয়া গিয়াছে!

আরতির মুখ হইতে বাহির হইল—ছোট একটু কথা। সে কহিল—আমাকে আজ নতুন দেখছ?

ঘাড় নাড়িয়া মৃদু কণ্ঠে প্রশান্ত কহিল—তাই…

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসের ঝড় বহিয়া গেল। প্রশান্তর চোখে নূতন-কি দেখিয়া আরতি মুখ নামাইল।

প্রশান্ত কহিল—কাল রাত্তির থেকে শুধু তোমাকেই দেখ্ছি আরতি। আমার মন তুমি এমন ছেয়ে বসে আছ যে, আমার এ মনে আজ আর কিছু নেই!

আরতি মুখ তুলিল না, তার চোখের দৃষ্টি এরিথমেটিকের খোলা পাতার উপর বিচরণ করিতে লাগিল। ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—If three labourers working seven hours a day…

রুল অব থ্রি।

নীরব দৃষ্টিতে আরতির পানে প্রশান্ত ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, পরে নিজের হাতে তার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল—আরতি…

চমকিয়া হাত ছাড়াইয়া আরতি সরিয়া বসিল।

প্রশান্ত কহিল—আমি তোমায় ভালবাসি আরতি। কাল থেকে অনেক ভেবেছি—ভেবে বুঝেছি, তোমা বিহনে আমার জীবন মরুভূমি! আমি মরে যাব আরতি। সত্যি বলছি, তোমায় না পেলে আমি বাঁচব না…

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে আরতির হাতখানা আবার নিজের হাতে তুলিয়া প্রশান্ত সে-হাত বুকের উপর রাখিল।

আরতি সবলে হাত ছাড়াইয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এ কি প্রশান্ত-দা!

প্রশান্তও উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আর কিছু নয়! আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, আরতি…বিয়ে…

আরতি নিমেষের জন্য কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে দুই চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া কহিল—আমি খুকী নই প্রশান্ত-দা—বয়স হয়েছে পনেরো বছর। আমায় একলা পেয়ে এ-সব কথা বলা তোমার উচিত হচ্ছে? তোমায় না আমি দাদা বলি?

প্রশান্তর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। অপ্রতিভ ভাবে সে কহিল—তুমি যা মনে ভাবছ, এ তা নয় আরতি। আমি তোমায় ভাল বাসি। খুব বেশী ভাল বাসি। তোমায় আমি অন্য ভাবে চাই—সে-কথা আমি বলছি না। আমি তোমায় বিয়ে করব আরতি। তোমার মায়ের কাছে সেই প্রার্থনা আজ জানাতে এসেছি।

আরতি কহিল—মায়ের কাছে যদি বলবে তো মা বল গে! আমার কাছে এ কথা কি বলে তুলছ?

আরতি একখানা চেয়ারে বসিল। তার নিশ্বাস বহিতে ছিল ফুলিয়া ফুঁসিয়া!

প্রশান্ত কহিল—তার আগে শুধু জানতে চাই, তুমি আমায় ভাল বাসো কি না! আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কি না!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আরতি কহিল আমি যদি বলি, আছে আপত্তি? আমি যদি বলি, আমি তোমাকে মোটে ভাল বাসি না?

প্রশান্তর মুখে শপাৎ করিয়া কে যেন চাবুক মারিল; তার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইল। সে কহিল—তাহলে মরণ ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না···

এই কথা বলিয়া সে চুপ করিল; আরতির পানে চাহিল—ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশের যেমন চেহারা হয়, নিথর. নিস্পন্দ ···আরতির মুখের ভাব ঠিক তেমনি।

তার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। তবে কি আরতির বুকেও মমতা···মায়া···

নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত কহিল—জীবন আমার শূন্য হয়ে যাবে। শূন্য জীবন নিয়ে কে বাঁচতে চায় আরতি? আলো নেই···জীবণ অন্ধকারে···?

একটি ঢোঁক গিলিয়া আরতি কহিল—তুমি আত্মহত্যা করবে?

অশ্রুর বাষ্পে দুলিয়া যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল। প্রশান্তর মুখে কথা ফুটিল না—ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সে শুধু মাথা নাড়িল; মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ঠোঁট উল্টাইয়া আরতি কহিল—অন্ততে আর কাজ নেই! ঢের হয়েছে! তুমি করবে আত্মহত্যা! হুঁঃ! সে সাধ্যি তোমার নেই!

যেখানটায় দারুণ ব্যথা, সেখানটায় কেহ বুট পরিয়া মাড়াইয়া ধরিলে ব্যথা যেমন টনটনিয়া উঠে, প্রশান্তর মনেও···

কোন মতে নিশ্বাস চাপিয়া মলিন হাস্তে সে কহিল—মনের সব আশা যখন চূর্ণ হয়, মানুষ তখন অসাধ্য সাধন করে।

বিদ্রূপের স্বরে আরতি কহিল—সে অসাধ্য সাধন করতে তুমি পার না!

—বেশ। তাহলে তোমার শেষ কথা···আমাকে তুমি বিয়ে করবে না? প্রশান্তর স্বর কম্পিত বাষ্পার্দ্র।

—না।···আরতির স্বর সহজ সুস্পষ্ট।

—আমাকে ভালবাস না?

আরতি কহিল—ভালবাসা এক রকমই নয়···

প্রশান্ত কহিল—আমাকে তোমার প্রাণের স্বজন বলে ভালবাস না?

আরতি বেশ সজোরে কহিল—তুমি যা বলচো, সে ভালবাসা নয়···

প্রশান্ত নীরব রহিল···বহুক্ষণ; তারপর কোনো মতে স্বর সংযত করিয়া কহিল—তা হলে এই আমাদের চির-বিদায়?

আরতি জবাব দিল না; উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।···দূরে কালো আকাশ আরো কালো করিয়া মাণিক-তলার কোন্ কারখানার চিম্‌নি আকাশে অনর্গল কালো ধোঁয়া ছড়াইতেছে!

প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত দ্বারের দিকে চলিল।

আরতি ফিরিয়া চাহিল, কহিল—আমার অঙ্কটা···?

প্রশান্ত হাসিল···মলিন হাসি। অঙ্ক! হায়রে, জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে যে যবনিকা টানিয়া দিতেছে···

প্রশান্ত চলিয়া গেল। হাসিয়া আরতি সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া ড্রয়ার টানিয়া অর্দ্ধ-পঠিত কোনান্ ডয়েলের হাউণ্ড অফ্ দি ব্যাস্কারভিল্‌স্ বই খুলিল···বাঙ্গালা অনুবাদ।

[২]

প্রশান্ত যখন পথে আসিল, তখন বৃষ্টি নামিয়াছে। সে বৃষ্টি সে গ্রাহ্য করিল না। ভিজিতে ভিজিতে সে হষ্টেলে ফিরিল। মাঠে ছিল মোহনবাগানের ম্যাচ—হষ্টেল-শুদ্ধ ছেলে মাঠে গিয়াছে।

প্রশান্ত নিজের ঘরে আসিল। ভিজা জামা-কাপড় গায়ে আছে, সে কথা মনে ছিল না। মাথায় আগুন জ্বলিতে ছিল। বুঝি, তারই আঁচে মনে পড়ে নাই।

খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ীর পর বাড়ী—তারপর বাড়ী—লোক একেবারে গিশ্‌গিশ্ করিতেছে! জীবনে এরা কি পাইয়াছে? কি এরা চায়? সকালে উঠিয়া সেই চায়ের পেয়ালা আর

খবরের কাগজ ; তারপর গল্প, হল্লা ; কেহ যায় কলেজে, কেহ অফিসে—সেখানে গাধার মত খাটে—বিকালে ছাড়া পায় ; ছাড়া পাইয়া বাড়ী ফিরে, ফিরিয়া আবার সেই বসা, দাঁড়ানো গল্প, হাসি, তাস পেটা, আহার, তারপর শয়ন ! দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিয়াছে, এই একই ধারায়। শুধু আহার আর আহার ! সারা দুনিয়াখানা যেন মানুষের জঠরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ! মন নাই ! সে মনে দয়া নাই, প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, মায়া নাই ! কবিরা এই যে যুগে যুগে গাহিয়া গিয়াছেন,

জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু··· .

সে সব মায়া ! মরীচিকা !···

The fountains mingle with the river

মানুষ সেদিকে কখনো চাহিয়া দেখিয়াছে ?

দিবস-রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।

থাক তো, দুনিয়ায় কাহার তাহাতে কি বহিয়া গেছে !

মাথার মধ্যে যেন জার্ম্মান যুদ্ধ চলিয়াছে ! ফটাফট্ শেল ফাটিতেছে···জেপ্‌লিন চলিয়াছে—সাবমেরিণের সমারোহ··· চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার !

ছেলেবেলা হইতে তার মন কি ছন্দে না গড়িয়া উঠিয়াছে ! এই গতানুগতিকের পথ ছাড়িয়া এমন অসাধারণ কিছু করিবে ···কালের বালুকাময় তীরে তার পদরেখা রহিবে অনন্ত কাল ধরিয়া···অক্ষয়, অমর হইয়া !···

অতীত জীবনের দিনগুলার পানে সে ফিরিয়া চাহিল।·· এখনো ছায়ায় মিলায় নাই ! কালের তুলি সে ছবি মুছিতে পারে নাই। সুযোগ খুঁজিয়া সে ফিরিতেছে চিরদিন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িল। গ্রামের নদীতে বান আসিয়াছিল, কৈবর্ত্তদের ন্যাপলা বানের জলে কি করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল—ডুব-জলের দিকে। সে ছিল তীরে। বান দেখিতে আসিয়াছিল। হৈ-হৈ রব শুনিয়া চকিতে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল···পায়ের জুতা, গায়ের জামা খুলিয়া সবে মাত্র মালকোঁচা আঁটিতেছে—আঁটা হইলেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ন্যাপলাকে উদ্ধার করিতে···

এমন সময়ে তিন-চারিটা মাঝি কোথা হইতে সাঁতরাইয়া আসিয়া ন্যাপলাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। প্রশান্তর আর জলে ঝাঁপ দেওয়া হইল না ! এত বড় সুযোগ···

তারপর সেবারে সেই ম্যাচ দেখিতে গিয়া পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে আর একটু হইলেই মারিয়া বসিয়াছিল ! ম্যাচের বহু পূর্ব্বে ফটক বন্ধ হইয়াছে—সে টিকিট কিনিবে, পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ঘোড়ায় চড়িয়া সকলকে তাড়া করিতেছে—সে দিকে কাহাকেও ঘেঁষিতে দিবে না···প্রশান্ত তবু যাইবেই ! সার্জ্জেণ্টের ঘোড়া আসিয়া তার গায়ে ঘেঁষ্ দিবামাত্র···সে ছিল রুখিয়া ! ঘোড়ার মুখ তার গায়ে ঠেকিলে হয়··· সার্জ্জেণ্টের কি খেয়াল হইল, ঘোড়া লইয়া সরিয়া গেল—তার অতখানি রাগ মিথ্যা নিরাশায় মিলাইয়া দিয়া !

থিয়েটারে গিয়া অভিনয় দেখিতেছে—যে-অভিনেতার অভিনয় তার ভাল লাগিয়াছে—ড্রপ পড়িবামাত্র প্রশান্ত শুনিল, দুজন দর্শক সেই অভিনেতার অভিনয় লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছে ! উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিতেছিল···ভাবিয়াছিল, আর একটু ভ্যাংচাইলে দুজনের মাথা এমন জোরে ঠুকিয়া দিবে···কিন্তু তাহা ঘটিল না। থিয়েটারওয়ালারা চট্‌পট্ ড্রপ তুলিয়া পরের অঙ্কের অভিনয় জুড়িয়া দিল।

এমনি করিয়া সকল দিকে বিরোধের সুর উঠিয়াছে··· চিরকাল। সকলে যেন বিদ্রোহ করিয়াছে ! তাহাকে বাধা ঠেলিয়া মহা-মানবের পৈঠায় কিছুতে তুলিয়া দিবে না !

আজ এই আরতি ! তার সঙ্গে এতদিনের অন্তরঙ্গতাতেও আরতি তাকে চিনিল না ! তার প্রার্থনা ভয়ঙ্কর নয়···সে ভালবাসে, আরতিকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিতে চায় !

মুখের উপর বলিয়া বসিল—না ! আরতি ভাবিয়াছে কি ? ম্যাট্রিক পড়িতেছে বলিয়া নিজেকে এমন দুর্ল্লভ কামনার ধন মনে করে সে ? বিবাহ করিবে তো শেষে ঐ ব্রাহ্ম-সমাজেরই কোনো বেতনভোগী দীন প্রচারককে ! তোমার বাপ ছিল ব্যারিষ্টারের বাবু ! প্রশান্ত কি তার চেয়েও হীন ?

অদ্ভুত জায়গা এই পৃথিবী ! এখানে কেহ কাহারো দাম বুঝে না। যত লোক মেকির কাঙাল ! হায় রে, এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া লাভ ?

প্রশান্ত বলিল, তার জীবন মরুভূমি হইয়া যাইবে ! সে আত্মহত্যা করিবে ! সে-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। জীবন-মরণের কথা এমন তুচ্ছ করে !

মত্ত আক্রোশে ঘরময় সে পায়চারি করিতে লাগিল। মাথার মধ্যে যেন নায়েগ্রা-প্রপাত টগবগ করিয়া ফুটিতে-ছিল—সে প্রপাতে দুনিয়া ভাসিয়া যায়, জলিয়া যায়, ধারায় এমন বেগ ! এমন দাহ !

সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া প্রশান্ত চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথমে লিখিল আরতিকে।

আরতি,

তোমায় ব্যথা দিব বলিয়া মরিতে বসি নাই। জানি, আমার মরণে তোমার কিছুই আসিয়া যাইবে না। তুমি নিত্যকার মত ট্রান্‌স্লেশন লিখিবে, অঙ্ক কষিবে, জিয়োমেট্রি মুখস্থ করিবে। তা নয়। মরিতে বসিয়া ভগবানের কাছে আন্তরিক নিবেদন জানাইতেছি,—তোমার মুখের হাসি অক্ষয় হোক্ ! তোমার সারা জীবনে এ হাসি যেন মলিন না হয়—ঝরিয়া না যায় !

তোমায় আমি ভালবাসি। জীবনের শেষ ধাপে দাঁড়াইয়া এখনো বলিতেছি, বিশ্বাস কর—তোমায় ভালবাসি—আমি ভালবাসি। আমার যে-হাত এ-কথা লিখিতেছে—সে-হাত এখনো চলিতেছে ! তবু না, আমি বাঁচিয়া নাই- মরিয়াছি। আমার প্রাণ এ-দেহ ত্যাগ করিয়াছে।

কখন ত্যাগ করিয়াছে, জান ? যে-ক্ষণে আমায় তুমি কঠিন বিদ্রূপে প্রত্যাখান করিয়াছ।

সারা জীবনের কথা মনে পড়িতেছে—এই বাইশ বৎসরের দীর্ঘ কাহিনী। ঘরে আমার বিধবা মা আছেন ; আমার দিদি আছেন ; ছোট বোন আছে। তারা কেহই আমায় বুঝিল না ! আমার বন্ধু আছে—পয়োমুখ বন্ধু—তারা নিজেদের লইয়া মত্ত—কোনোদিন আমাকে বুঝিল না ! তারপর ভাবিয়া-ছিলাম, তোমার বুকে দরদ আছে, মায়া আছে, ভালবাসা আছে। তোমায় কত রূপে কত বেশে স্বপ্ন দেখিতাম ! হায়রে, সে শুধ স্বপ্ন ! মিথ্যা মরীচিকা !

ভালবাসায় যদি বঞ্চিত হইলাম, কি লইয়া বাঁচিব ? জীবনটা কি ? কতকগুলা দিন আর রাত্রির আসা-যাওয়া—সেই সঙ্গে স্নান, আহার, হাসি, গল্প, পরচর্চ্চা আর নিজের স্বার্থ ! এ জীবন লইয়া আর যে বাঁচিতে চায়, বাঁচুক। আমি বাঁচিব না ; বাঁচিতে পারিব না।

তুমি ছিলে এ মরুভূমিতে শ্যামল ওয়েশিস ! আমার এ শুষ্ক মনে নির্ঝর ! আমার আঁধার-বুকে মণি-প্রদীপ ! এমনি স্বপ্নে আমি বিভোর ছিলাম ! আজ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে। প্রাণ যদি গেছে তো জীবনটাকে চূর্ণ করিয়া দিই।

তুমি যখন এ চিঠি পড়িবে, তখন আমি এ দুনিয়ার কেহ নহি—দুনিয়া-ছাড়া ! যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, অন্তিম ভিক্ষা—সে অপরাধ ক্ষমা করিয়ো।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ! তুমি চির-সুখী হও !

প্রশান্ত

লেখা শেষ করিয়া চিঠিখানা সে পড়িল। মহাদেবের ত্রিশূলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন সতীর দেহের মত তার চূর্ণ হৃদয়টাকে চিঠির কাগজে বিছাইয়া সে যেন মালা রচিয়াছে ! নিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানা খামে পুরিয়া বড় বড় অক্ষরে খামের উপরে সে আরতির নাম-ঠিকানা লিখিল।

তারপর আর একখানা কাগজ লইয়া মাকে চিঠি লিখিল।

শ্রীচরণেষু,

মা,

তোমার চরণে শত অপরাধে অপরাধী। কুপুত্রের সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার মত মা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা বাদী।

নানা কারণে জীবনে আমার রুচি নাই। পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইতেছি।

আমার বইগুলি টুনিকে দিয়ো ; রিষ্ট-ওয়াচটা দিয়ো দিদিকে। আমার শতকোটী প্রণাম লইয়ো মাগো জননী আমার।

চিরদুঃখী

প্রশান্ত

খামের উপর ঠিকানা লিখিল

পূজনীয়া

শ্রীশ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণ-কমলেষু

৺গগনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী

ইছাপুর

Via নবাবগঞ্জ (বারাকপুর)

E. B. Ry.

তারপর বন্ধুর দল।

ভাই অনাদি

যখন এ চিঠি পাইবে, তখন আর আমি ইহলোকে থাকিব না। জীবনে প্রেম যদি না পাইলাম, কীর্ত্তি না লাভ করিলাম তো সে জীবনে প্রয়োজন কি ? তাই আমি হাসি-মুখে আজ মরণকে বরণ করিতেছি।

তোমার

প্রশান্ত

আরো পাঁচজন বন্ধু ছিল; তাহাদিগকেও চিঠি লিখিল। তারপর হিসাব করিয়া তিন টাকা বারো আনা এক টুকরা কাগজে মুড়িয়া আর একখানা চিঠি লিখিল হষ্টেলের ম্যানেজারকে।

আপনার কাছে যে টাকা ধার লইয়া সাবান আর সেণ্ট কিনিয়া ছিলাম, সে টাকা শোধ দিলাম। ধন্যবাদ।

কিন্তু তাইতো, ষ্টাম্প নাই! পোষ্ট অফিস বন্ধ! উপায়? চিঠিগুলা ডাকে না দিয়া কি করিয়া মরিবে! হষ্টেলের বনমালীর কাছে মিলিল একখানি মাত্র দু-পয়সার টিকিট।

মায়ের খামে সে টিকিট আঁটিয়া সে-চিঠি নিজে গিয়া ডাক-বাক্সে দিয়া আসিল; তারপর ভাবিল, একটা দিন নিরুপায় হইয়া বাঁচিতেই হইবে! তারপর গভীর নিশীথে··· এই চোখের সামনে নামিয়া আসিবে মৃত্যুর নীল যবনিকা!

তার আগে যতখানি পারে, শেষবারের মত পৃথিবীকে দেখিয়া লইতে ক্ষতি কি!

[৩]

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত কলিকাতার পথে-পথে ঘুরিয়া শ্রান্ত চরণে প্রশান্ত আসিয়া হষ্টেলের দ্বারে করাঘাত করিল। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল; ঘুম-চোখে কহিল—আপনার ঘরে চাবি দেওয়া ছিল, তাই ঠাকুর খাবার রাখতে পারেনি। খাবার ঢাকা আছে ঘরের সামনে একটা কাঠের টুলের উপর।

প্রশান্ত হাসিল। খাবার! দুনিয়ার এই বিষাক্ত বাতাসের স্পর্শ ছাড়িয়া থাকিবার উপায় নাই, তাই! আহারে এখনো রুচি! হায়রে, সে টিকিট কিনিয়া বসিয়া আছে, শুধু সময়-এঞ্জিন মৃত্যু-ট্রেণটাকে টানিয়া আনিলেই সে-ট্রেণে চড়িয়া বসে!

তার ঘরখানা ছোট—সে-ঘরে সে একা থাকে। কাজেই কোনো উৎপাতের আশঙ্কা ছিল না। পিপাসায় গলা শুকাইয়া টাকরা জ্বলিতেছিল। এক গ্লাস জল পান করিয়া সে শুইয়া পড়িল। মনে ঘন ঘোর নৈরাশ্য! তার উপর দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া বেড়ানোর ক্লান্তি! পৃথিবীর যত ঘুম আসিয়া তার চোখে নিমেষে চাপিয়া বসিল।

ঘুম ভাঙ্গিল ভোরে—ক্ষুধার তাড়নায়। মানুষের নশ্বর দেহ···পঞ্চভূতে মিশিতে গিয়াও ক্ষুধার মায়া ছাড়িতে পারে না!

নিরুপায়! হাত-পাগুলা পর্য্যন্ত উদরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে! উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে!

গা-আলমারির মধ্যে ছিল বিস্কুটের টীন। মায়ের আদেশ ছিল, বাজারের খাবার খাবিনে বাবা—আমার পা ছুঁয়ে বলে যা···বিস্কুটের একটা টিন সর্ব্বদা কাছে রাখবি! তাই খাবি। প্রশান্ত মায়ের আদেশ বরাবর পালন করিতেছে।

চিঠিগুলা ডাকে দিতে হইবে; তার আগে মরা চলে না! হষ্টেলে থাকিবে না—এখানে এখনি হাসি-গল্পের স্রোত বহিবে। সে-সব তার ভাল লাগে না।

বিস্কুট খাইয়া গলায় জল ঢালিয়া প্রশান্ত পথে বাহির হইল।

দিনে মরা চলিবে না—বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে। মরিবে রাত্রে—গভীর রাত্রে।

কিন্তু কি করিয়া মরিবে? হাওড়ার পুল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে?···না!

মোটর···বাস···লরি···তাহার তলায় পড়িয়া?···না!

রেলের লাইনে গিয়া শুইয়া থাকিবে—প্রকাণ্ড সরীসৃপের মত ট্রেণ আসিয়া···? না!

বড় ব্যথা! বড় যাতনা! প্রাণ যদি না যায়, ভাঙ্গা-হাত-পা লইয়া থাকিতে হইবে!

বিষ?

কি করিয়া জোগাড় হয়?

আফিম!···সহজ উপায়! কিন্তু কতখানি আফিমে মৃত্যু হয়? কিনিতে গিয়া যদি বিপদে পড়ে?

খবরের কাগজে পড়িয়াছিল, কবে আফিম খাইয়া কে মরিতে গিয়াছিল, মরণ আসে নাই! বেচারীকে শেষে পুলিশ আসিয়া গ্রেফ্‌তার করে। কাছারীতে তার মোটা টাকা জরিমানা হয়!

রাগ ধরিল। ইচ্ছা করিয়া আমি মরিতে চাহি—তাহাতে বাধা দিয়া আমাকে বাঁচাইতে তোমাদের এত মাথা-ব্যথা কেন, বাপু!

প্রশান্ত শিহরিয়া উঠিল। জীবন মরু-ভূমি! মরণেও মানুষের অধিকার নাই! বা রে দুনিয়া!

গভীর রাত্রে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিল্কের চাদরের ফাঁস টানিয়া···সেই বেশ! নিরাপদ মৃত্যু! বিঘ্নের আশঙ্কা থাকিবে না!

দশটায় পোষ্ট অফিস খুলিবামাত্র এক-গাদা ডাক-টিকিট কিনিয়া খামগুলায় আঁটিয়া প্রশান্ত সেগুলা ডাক-বাক্সের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

তারপর সুরু হইল নিরুদ্দেশের পাড়ি!···

পা আর আজ চলিতে চায় না! পথে লোক-জনের ভিড়! প্রশান্ত তাদের সকলের পানে তাকাইতেছিল। এই সব লোক কি তুচ্ছ জিনিষের মোহে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে! কিসের আশায় জীবন-ভার বহিয়া বেড়ায়! সে যেন ইহাদের কেহ নয়! সে যেন কোন্ সুদূর বিদেশ হইতে আসিয়াছে, এ-সব লোকের সঙ্গে কোথাও তার এতটুক মিল নাই!

এমনি করিয়া পৃথিবী তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া তার কাছ হইতে দূরে, আরো দূরে সরিয়া যাইতেছিল···

সে-রাত্রে যখন সে হষ্টেলে ফিরিল, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। ভৃত্য সদরের দ্বার খুলিয়া দিল। প্রশান্ত আসিয়া দোতলায় নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। চারিদিক নিস্তব্ধ···

নীচেকার ড্রেন বহিয়া শুধু জলের স্রোত চলিয়াছে—তাহারি একঘেয়ে রব এ নিস্তব্ধতার বুকে বাজিতেছে···

শিল্কের চাদর বুকের উপর রাখিয়া প্রশান্ত বিছানায় শয়ন করিল। শয়ন করিয়া ফাঁস টানিয়া দিবে···? না, ঐ লোহার কড়িতে চাদরের এক প্রান্ত বাঁধিয়া গলায় অপর প্রান্ত···

কিন্তু টুলটা ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিবার সময় শব্দ হইবে যে! সে শব্দে যদি কাহারও ঘুম ভাঙ্গে? ঘুম ভাঙ্গিলে যদি কেহ আসিয়া···

তাহা হইলে মরা হইবে না তো! শুধু তাই নয়—কত হাসি-ব্যঙ্গ, কদর্য্য ইঙ্গিত—অসহ্য প্রশান্তর!

* * *

বেলা প্রায় আটটা। হষ্টেলে ঘরের সামনে প্রকাণ্ড ভিড়। বন্ধুরা অন্তিম বিদায়ের পত্র পাইয়া দারুণ কৌতূহলে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুস্থ মানুষ কলেজে যায়, ঘরে বসিয়া কবিতা লেখে—সে কবিতা পড়িয়া সকলকে শুনায়! হঠাৎ তার কি এমন দুঃখ···এমন করিয়া পত্র লিখিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়!

আরতি আসিয়াছে তার মায়ের সঙ্গে।

কাহারো মুখে কথা নাই! হষ্টেলের ম্যানেজার পুলিশ আনিয়া হাজির করিয়াছে। তার বিরক্তির অন্ত নাই। হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটিতেছে, তার মধ্যে খুন-জখমের ফ্যাসাদ লইয়া এখন থানা-ঘর করিতেই প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে!

পুলিশের হুকুমে ছুতার ডাকা হইল। করাত বাহির করিয়া স্ক্রু ড্রাইভারে প্যাঁচ টানিয়া কৌশলে সে ঘরের কপাট খুলিল।

দ্বার খোলা হইলে সর্ব্বাগ্রে ঘরে প্রবেশ করিল পুলিশ; তার পিছনে হুড়মুড় করিয়া প্রকাণ্ড ভিড়।

কাহারো মুখে কথা নাই। আতঙ্কে বিস্ময়ে সকলে স্তম্ভিত! ঐ যে, বিছানায় পড়িয়া আছে প্রশান্ত! তার বুকের উপর একখানা শিল্কের চাদর। চট্ করিয়া কে-একজন আসিয়া নাকের সামনে হাত বাড়াইয়া দিল, দিয়া বলিল,—বেঁচে আছে। নিশ্বাস পড়ছে এখনো।

পুলিশ তখন দুই চোখে সন্দেহের বোঝা বহিয়া ঘরের আশে-পাশে দৃষ্টি বুলাইতেছে। এ কথায় লাসের কাছে আসিয়া তার পানে চাহিল ··

হ্যাঁ, নিশ্বাস পড়িতেছে! আঃ!

সে কহিল—আম্বুলান্স। চট্ করে কেউ একটা টেলিফোন্ করে দিন। কাছে কারো বাড়ীতে টেলিফোন নেই?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন কহিল—আছে রায় বাহাদুরের বাড়ী।

ইনস্পেক্টর কহিল—যান, শীগগির যান।

লোকটা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

ঘরের মধ্যে নিমেষে কলরব জাগিল। সে কলরবে প্রশান্ত চোখ মেলিয়া চাহিল ; চাহিবামাত্র বিস্ময়ে দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া পড়িবে, সে চোখে এমন দৃষ্টি।

ঘরশুদ্ধ লোক ভয়ে কাঠ! দানো পাইল না কি?

প্রশান্ত উঠিয়া বসিল। এ কি! ঘরে ইন্‌স্‌পেক্টর!

প্রশান্ত কহিল—ব্যাপার কি? ঘরে এত ভিড়…না, স্বপ্ন দেখছি?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিল—আপনি আত্মহত্যা করেছেন না? সকলকে চিঠি লিখেছেন তাই বলে! তামাসা! বটে! আত্মহত্যার কথা রটিয়ে তামাসা! পুলিশের সঙ্গে চালাকি! হুঁ! মজা টের পাবেন'খন

প্রশান্ত কহিল,—ও! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এই তো শিল্কের চাদর। মরব ভেবেছিলুম—মরা হয়নি… ঘুমিয়ে পড়েছি…

ভিড়ের মধ্যে ছিল এক রসিক ব্যক্তি সে কহিল—একেই বলে রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!

ইন্‌স্‌পেক্টর ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। খুশী-মনে। খুব রক্ষা পাইয়াছেন! ভাগ্যে লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! মরিলে এই সকালে তাঁকেও মারিত! হাসপাতাল …মর্গ… করোনার্শ কোর্ট! বাপ্ রে, ছুটিতে ছুটিতে জান গিয়াছিল আর কি!

বন্ধুরা বলিল—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছে! ভাগ্যে আমরা চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছিলুম!

আরতি ছিল বাহিরে ; সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। আরতির মা কহিলেন—নে, বাড়ী চ। কি-রকম ছোটলোকের মত আমোদ। চ। তোকে বারণ করছি আরতি, খবর্দার, ওর কাছে আর লেখাপড়া করতে হবে না। মাগো! কি ছেলে, মা!

ঘণ্টা খানেক পরে একখানা সেকণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া হষ্টেলের দ্বারে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিলেন এক অশ্রুমুখী বিধবা ; সঙ্গে বারো-তেরো বৎসর বয়সের কুমারী মেয়ে।

মা বলিলেন—আমার প্রশান্ত…

ভৃত্যটা এতক্ষণ যেন হকচকিয়া গিয়াছিল! সে বলিল—ভাল আছেন। দোতলায় তাঁর ঘরে আছেন। এস মা। সিঁড়ি এদিকে।

বিধবা নিশ্বাস ফেলিলেন। স্বস্তির নিশ্বাস!

দ্বারের কাছে আসিয়া মা ডাকিলেন—ও বাবা প্রশান্ত…

প্রশান্ত চা পান করিতেছিল। পাশে ছিল অনাদি, শশাঙ্ক, বিভূতি, অশ্বিনী, ভরত। দ্বারের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত ডাকিল—মা…

সজল চোখে বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে মা কহিলেন—এমন চিঠি মানুষ লেখে, বাবা!

পেয়ালা রাখিয়া প্রশান্ত মায়ের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

প্রশান্ত গাঙ্গুলী সুস্থ দেহে সুস্থ মনে এখনো বাঁচিয়া আছে। উক্ত ঘটনার এক বৎসর পরে বি-এ ফেল করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছে। তার এক বৎসর পরে ভদ্রকালী-নিবাসী ৺হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবীর সহিত শুভহিবুক-যোগে প্রশান্তর বিবাহ হইয়াছে। পত্নী জগত্তারিণী এ দশ বৎসরে প্রশান্তকে তিনটি কন্যা ও তিনটি পুত্র উপহার দিয়াছেন।

দুনিয়ার উপর প্রশান্তর সে বিদ্বেষ আর নাই! তবে কাহারো সঙ্গে সে মেলামেশা করে না। তার কারণ, অফিস হইতে ফিরিয়া ছোট খুকীকে দেখিতে হয় ; তার উপর দুবেলা গৃহে যতটুকু থাকে, ছেলেমেয়েদের পড়ানো আছে, মানে লিখিয়া দেওয়া আছে, ট্রানশ্লেসন শুধরাইয়া দেওয়া আছে ; তার উপর আছেন শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী…

বেচারীর অবসর কোথায়?
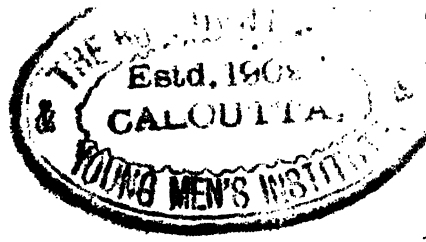
স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

সূচনা

ভারতবর্ষের যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে সর্ব্বপ্রধান বিচারাসনে ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে একদা উপবিষ্ট হইয়া ভারত-গৌরব স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র অপূর্ব্ব ন্যায়পরতা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং প্রগাঢ় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ে ভারতীয় ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মিত রমেশচন্দ্রের আবক্ষ মর্ম্মরময়ী প্রতিমূর্ত্তি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার-শাস্ত্রশাখার সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষরূপে (Dean of the Faculty of Law) যিনি এককালে ব্যবহারশাস্ত্রশিক্ষার প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, সেই রমেশচন্দ্রের ধাতু-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল অতীত হইয়া যাইবার পরেও যে তাঁহার বিস্মৃতিপ্রবণ দেশবাসী এই সকল স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের একখানিও উল্লেখ-যোগ্য জীবনচরিত এখনও প্রকাশিত হইল না, ইহা আমাদের কলঙ্কের কথা। বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল, স্যর প্রভাস-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, রমেশচন্দ্রের জীবনীর উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে এবং খ্যাতনামা লেখক তদীয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশিত হইল না।

স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা রমেশচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য মাত্র সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইব। পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ক্ষমতাবহির্ভূতও বটে। আশা করি, এই অসম্পূর্ণ চিত্র অদূরভবিষ্যতে নরেশচন্দ্র বা তাঁহার ন্যায় অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত রচনার ও প্রকাশের প্রয়োজ-নীয়তা স্মরণ করাইয়া দিবে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত (দমদমার নিকটবর্ত্তী) রাজার হাট বিষ্ণুপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন মিত্র-বংশীয় কায়স্থকুলে, সন ১২৪৬ সালের ৩০শে ফাল্গুন (ইংরাজী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ) দিবসে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

রমেশচন্দ্রের প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র নদীয়া জিলার কলেক্টরের অফিসে মহাফেজ ছিলেন। সেকালে এই পদের যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের গুণের জন্যও তিনি সামসময়িক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের পিতামহ রামধন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বাঁকুড়া জিলার

অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরে মুন্সেফী করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন।

সদর দেওয়ানী আদালত।

রমেশচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে বিষ্ণুপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচক্ষণ সেরেস্তাদাররূপে তিনি তদপেক্ষা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কর্ম্মনিপুণতা ও সততার জন্য তিনি প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী, পারসী ও আরবী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার থাকায়, তিনি তৎকালীন বিচারপতিগণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে রামচন্দ্র ইংরাজী Civil Guide নামক গ্রন্থের উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

রমেশচন্দ্রের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার পিতা রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। রামচন্দ্রের ছয় পুত্র হইয়াছিল, যথা, প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে প্রসন্নচন্দ্র কৈশোরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। উমেশচন্দ্র ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কিছুকাল চকদীঘির সারদাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

রমেশচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা কেশবচন্দ্র একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। নিপুণ মৃদঙ্গবাদকরূপে তিনি খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন।

চতুর্থ ভ্রাতা কাশীচন্দ্র শিয়ালদহের ছোট আদালতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পঞ্চম ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র হাইকোর্টের অন্যতম এটর্ণিরূপে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

মাতা কমলমণি

শৈশবে পিতৃহীন হইলেও বুদ্ধিমতী জননীর গুণে রমেশচন্দ্রের সুশিক্ষালাভের ও চরিত্রগঠনের কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। রমেশচন্দ্রের জননী কমলমণি বিষ্ণুপুরেরই প্রসিদ্ধ ঘোষবংশীয় মধুসূদন ঘোষের ভগিনী ছিলেন। তিনি "শিক্ষিতা" না হইলেও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মনিপুণা ছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মীয় ও কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে তাঁহার পরলোকগত স্বামীর পরিত্যক্ত বিষয়াদির সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন এবং পুত্রগণের সুশিক্ষার যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন এবং সৎকার্য্যে দান করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। একবার তিনি নিজব্যয়ে কাদিহাটি হইতে ভাঙ্গড় পর্য্যন্ত প্রায় পনেরো মাইল সুপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আর একবার তিনি নিজব্যয়ে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কাদিহাটি হইতে নিজ গ্রাম বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পরোপকার প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার মাতার হৃদয়ের ও মনের সদ্‌গুণনিচয় উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা

রমেশচন্দ্র প্রথমে ডেভিড হেয়ারের পাঠশালা এবং পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (এক্ষণে হেয়ার স্কুল) শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে যে, রমেশচন্দ্র বাল্যকালে অন্যান্য "ভাল ছেলে"র মত দিবা-রাত্রি পাঠাভ্যাস করিতেন না। তিনি অতি অল্পক্ষণ পাঠ করিতেন, কিন্তু ঐ অল্পক্ষণ প্রগাঢ় একাগ্রতাসহকারে পাঠ করিতেন, এমন কি তিনি যখন পাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, তখন পার্শ্বে সঙ্গীতপ্রিয় ভ্রাতৃগণের বাদ্যযন্ত্রনিঃসৃত প্রচণ্ড ধ্বনিও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিত না।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র তৎকালীন জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় কৃতিত্বসহকারে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৫্ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসমাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু সর্ব্বপ্রথম বি এ উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দশজন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে তিনজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, যথা, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিখ্যাত সন্দর্ভ-লেখক), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বনামধন্য কবি এবং হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকীল), এবং ভোলানাথ পাল (শিক্ষক)। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বি-এল পরীক্ষা দেন এবং তিনি, কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি আই ই প্রভৃতি আটজন সসম্মানে বি-এল উপাধি লাভ করেন। কালিকাদাস এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ব্যবহারাজীব

বি-এল উপাধিলাভের পর রমেশচন্দ্র সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সরল ও সাধু আচরণ, বিনয়নম্র ব্যবহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমশীলতায় মুগ্ধ হইয়া মক্কেলগণ শীঘ্রই তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী হইয়া পড়িল। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবগণ সানন্দে তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের জন্য সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট সংযুক্ত হইয়া হাইকোর্ট সংস্থাপিত হইলে রমেশচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হইলেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত আহূত হইলেন। তরুণ বয়সেই রমেশচন্দ্র এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন এড্‌ভোকেট জেনারেল মিষ্টার টমাস এইচ্‌ কাউই তাঁহাকে হে'র রিপোর্টের সম্পাদকীয় চক্রে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও রমেশচন্দ্রের কিছু অর্থাগম হইয়াছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ অকালে পরলোকগমন করিলে রমেশচন্দ্রের পরম হিতৈষী বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র তৎস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে রমেশচন্দ্র ও তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহারাজীবরূপে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের

দ্বারকানাথ মিত্র।

মৃত্যুতে এই প্রতিপত্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে তাঁহার স্মৃতিকথায় বলেন যে, যখন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, "তখন অন্নদাবাবু হাইকোর্টের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং জগদানন্দবাবু জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার। হেমবাবুর তখন খুব পসার। তিনি যেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তেমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তখনকার প্রধান উকীলদের মধ্যে শ্রীনাথ দাস, মহেশ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিনীমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।"

বাস্তবিক তখন রমেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র প্রচলিত কথায় "বাঘা ভালুকো" উকীল ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্যর গুরুদাসের নিকট শ্রুত একটি কৌতুকাবহ কাহিনী আমরা কবিবর হেমচন্দ্রের জীবনচরিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এস্থলে উহা পুনরুদ্ধৃত হইতে পারে :—

"কোন এক মোকদ্দমায় এক পক্ষে রমেশবাবু ও হেমবাবু ছিলেন, অপর পক্ষে উঁহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর দুই একজন উকীল ছিলেন। মোকদ্দমাটি দ্বারকানাথ মিত্র এবং আর একজন বিচারপতির সম্মুখে চলিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের মোক্তার অপর পক্ষের মোক্তারকে একদা বলিতেছিল, 'তুমি তো দুই

স্যর রিচার্ড গার্থ।

বাঘা ভালুকো উকীল দিয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি?' এই কথা শুনিয়া রহস্যপ্রিয় হেমবাবু (জজেরা তখন টিফিন করিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন) বলিয়া উঠিলেন, '(সেদিন কোন কারণে অনুপস্থিত রমেশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া) বাঘটা ত পালিয়েছে, আর (নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভল্লুকটা তো (ব্রিটিশ সিংহের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিরূপে উপবিষ্ট দ্বারকানাথ মিত্রকে উদ্দেশ করিয়া) সিংহের তাড়ায় অস্থির হ'য়েছে।'

হাইকোর্টের বিচারপতি

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি "অতুল্য ধারিক—বঙ্গের মিহির" চির-দিনের জন্য বঙ্গাকাশ হইতে অস্তমিত হন। রমেশচন্দ্র তাঁহার ন্যায় হিতৈষী বন্ধুর বিয়োগে নিরতিশয় কাতর হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিসভার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের স্থানে রমেশচন্দ্রই হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নির্ভীক স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার জন্য সহযোগিগণের এবং সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর মাত্র।

তিনি এক একটি জটিল মোকদ্দমায় রায় দিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত নথি পরীক্ষা করিতেন এবং তাঁহার রহস্যপ্রিয় বন্ধু হেমচন্দ্র ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) হাইকোর্টের অন্যতম সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে শুভাগমন করিলে "বাজীমাত" শীর্ষক যে প্রসিদ্ধ রহস্য কবিতা রচনা করেন, তাহার একস্থলে রমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর তৎপ্রতি কাল্পনিক অনুযোগের মধ্যে এই "নথির গোছা" পরীক্ষার এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—

> জজের গৃহিণী কন "জ্বালা জজিয়তি।
> নামে শুধু অনারেবল, পদ বিলায়তি॥
> ছোট লাটের আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি,
> লক্ষ গুণ বড়লোক বল দেখি একি?
> কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
> তোমার কোর্টের উকীল তোমাকে হারায়!
> ছিছি, ছিছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
> শুধু খালি মার্কামারা পেয়াদার "লিবরি"॥
> ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বিষ্ট তুমি একজন
> জরাসন্ধ রাজা কিংবা লঙ্কার রাবণ!
> ওমা ওমা পোড়া ভাগি, উকীলের ওঁচা!
> হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোছা॥
> বলে, ঠোন্‌কা মেরে জজ মহিলা বারাণ্ডায় যান।
> মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙাতে তাঁর মান॥

বিজ্ঞান-সভা

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই বাঙ্গালার তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্ত্তা স্যর রিচার্ড টেম্পলের পৌরোহিত্যে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রমেশচন্দ্র প্রথমাবধি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি উহার অন্যতম ন্যাসরক্ষক এবং পরে বহুদিন উহার সহকারী সভাপতিরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভার সপ্তম বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় বঙ্গেশ্বর স্যর রিভার্স টমসন সভার সভাপতি এবং মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁ সভার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

প্রধান বিচারপতি

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ ছুটীর আবেদন করেন। অন্যান্য বিচারপতিগণের মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং প্রধান বিচারপতির পদে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা স্বাভাবিক। কিন্তু একজন ভারতবাসী যে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবেন, ইহা সরকারী ও বেসরকারী য়ুরোপীয়গণের অসহ্য হইল। তাঁহারা মহা আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এমন কি ছুটীর আবেদন প্রত্যাহার করিবার জন্যও অনেক হিতৈষী স্যর রিচার্ড গার্থকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদারহৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড রিপন এ সকল আন্দোলনে কর্ণপাত না করিয়া রমেশচন্দ্রকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত মহারাজ্ঞীকে পরামর্শ দিলেন এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইল।

এই নিয়োগে ভারতবাসীমাত্রেই আনন্দিত এবং লর্ড রিপনের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। এই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের "জয়-মঙ্গল গীতে" উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল :—

কাছে এসো ভাই, করি আশীর্ব্বাদ, চিরসুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে উদিল চন্দ্রিকাজাল!
উজল আজি হে বাঙ্গালীর নাম, উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার-আসনে আজিহে প্রধান তুমি॥
কাছে এস ভাই করি আশীর্ব্বাদ বিপুল ভারত যুড়ে,
জয় জয় জয় ধ্বনি ছড়াইয়া তব কীর্ত্তি-ধ্বজা উড়ে॥
আজিরে এরবে কেবা ঘরে রবে আনন্দে বাজিছে ভেরী।
'রিপণের জয় রমেশের জয়' আনন্দে বাজিছে ভেরী॥
বৃটিশের বেশে ঋষিতুল্য নর এদেশে উদয় হবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার ভারতে উদয় হবে॥
আনন্দে বাজরে মৃদঙ্গ মুরলী আনন্দে বাজরে ভেরী
"রিপনের জয় রমেশের জয়" সঘনে নিনাদ করি॥
কৈ বরণ ডালা আনো আনো আনো ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপনের গলে পরে প্রিয়জনে সাজাব॥

সিটি কলেজ

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির সংযোগিতায় সিটি স্কুল স্থাপিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার অন্যতম শিক্ষক এবং শিবনাথ শাস্ত্রী উহার সম্পাদক হন। ইহা পরে কলেজে পরিণত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ-গৃহের ভিত্তিস্থাপন ও পুরস্কার-বিতরণকালে রমেশচন্দ্র পৌরোহিত্য করেন। দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে তিনি চিরদিনই যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তিনি এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী কলেজগুলিতে যেরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ উঠাইয়া দিয়া উহার পরিচালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ অন্যবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন।

সুরেন্দ্রনাথের বিচার

হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম বিচারপতি মিষ্টার নরিস্ কোনও মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারালয়ে শালগ্রাম শিলা আনয়ন করিতে আদেশ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক্ ওপিনিয়ন' নামক পত্রে এই আদেশ সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করত বলেন যে, তরুণবয়স্ক বিচারপতির এইরূপ পাগলামির প্রতি-

আনন্দমোহন বসু।

বিধান করা হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী" নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে তাঁহার সহকারী (পরে আলিপুরের পাব্লিক প্রসিকিউটর) আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ে একটি কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং জষ্টিস নরিস্কে জেফ্রিজ ও স্ক্রগস্ নামক দুষ্ট বিচারকগণের সহিত তুলনা করেন। ফলে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের নামে ও 'বেঙ্গলী'র মুদ্রাকর রামকুমার দে-র বিরুদ্ধে হাইকোর্টের অবমাননার জন্য অভিযোগ আনীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম অপ্রকাশ রাখেন এবং স্বয়ং সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মনোমোহন ঘোষ অসুস্থ থাকায় স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সর্ত্তে সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা গ্রহণ করেন যে, সুরেন্দ্রনাথ ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন। প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ, বিচারপতি মিত্র, কানিংহাম, ম্যাকডনেল এবং নরিস্ সম্মিলিত হইয়া এই মোকদ্দমার বিচার করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলিশম্যান পত্রে পাটনার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার টেলর সাহেব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের অবমাননাসূচক এক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে প্রধান বিচারপতি পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড ও একমাস কারাবাসের আদেশ দেন, কিন্তু আদেশ প্রদত্ত হইবার পরে টেলর সাহেব ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কারাদণ্ডের আদেশ রহিত হয়। রমেশচন্দ্র এই মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে কোনও দণ্ড প্রদান করা অনুচিত। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দুই মাস কারাবাসের আদেশ দেন। রমেশচন্দ্র নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র রায়ে নিজমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ অপরাধী বটে, কিন্তু তিনি নিজ মুখেই অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন. এ ক্ষেত্রে কোনও দণ্ড দিবার আবশ্যকতা নাই। অকৃত্রিম ভারতবন্ধু রবার্ট নাইটস সম্পাদিত 'ষ্টেট্‌সম্যান' এবং দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ও সাধারণ জনমত রমেশচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল এবং তাঁহার নির্ভীকতা ও পক্ষপাতহীনতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিল।

বাস্তবিক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া রমেশচন্দ্র কখনও নিজ বিবেকানুমোদিত ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ গিবন সাহেবের মোকদ্দমার সময় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাদিগের আন্দোলনে কর্ণপাত না করিয়া পক্ষপাতশূন্য বিচার করত তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার নরিস।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন

লর্ড রিপনের সময়ে ইলবার্ট বিল লইয়া দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন ব্যবস্থা-সচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্টের নামের সহিত এই আইনের পাণ্ডুলিপি জড়িত হইলেও উহার যথার্থ প্রবর্ত্তক বিহারীলাল গুপ্ত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংস্কার যখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল, তখন বিহারীলাল গুপ্ত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদানীন্তন ব্যবস্থানুসারে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু মফঃস্বলস্থ কোনও দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট যুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই, সুতরাং এতকাল কোন গোলযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যখন রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল দুইজন দেশীয় ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইলেন, তখন এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি স্পষ্ট ভাবে প্রতীত হইল। জিলার অধিবাসী যুরোপীয়গণ যদি জিলার শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন না হন, তাহা হইলে সেই জিলায় কিরূপে তাঁহার পক্ষে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে? অধিকন্তু দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ যুরোপীয় জয়েণ্ট

ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীর যে ক্ষমতা থাকিবে না, ইহাই বা কিরূপ সঙ্গত? বিহারীলাল বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর অ্যাশলি ইডেনের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন। ফলে উদারহৃদয় লর্ড রিপনের ইঙ্গিতানুসারে দেশীয় শাসন-কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত হইল। ইহাই ইল্‌বার্ট বিল।

বলা বাহুল্য এই বিল লইয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ মহা আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

হেমচন্দ্রের কবিতায় এই আন্দোলনের স্মৃতি অমর হইয়া আছে—

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন, কেস্‌য়িক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া নেভার—নেভার।
নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিভে পাবে সন্ধান, আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনও তা হবে না।"

স্যর হেনরি কটন তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে এরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিবার পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে লর্ড রিপন তাঁহার রাজস্ব-সচিব স্যর অকল্যাণ্ড কলভিনের মধ্যবর্ত্তিতায় য়ুরোপীয় সমাজের সহিত concordat নামক সন্ধি স্থাপন করিয়া ইলবার্ট বিলের বহুলাংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া আইন পাশ করেন। ইহাতে বিশেষ কিছু অধিকার দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ পান নাই। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় লর্ড রিপন প্রায়ই রমেশবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

প্রধান বিচারপতি-পদে দ্বিতীয়বার

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর কোমার পেথারাম দীর্ঘকালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিলে রমেশচন্দ্র তৎপদে অভিষিক্ত হন। লর্ড ডাফরিন লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ববারে রমেশচন্দ্র যেরূপ কৃতিত্বসহকারে প্রধান বিচারপতির দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এবারেও নিযুক্ত না করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস এচিসনের সভাপতিত্বে চৌদ্দজন সদস্য লইয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন নামক এক কমিশন নিযুক্ত হয়। রমেশচন্দ্র উহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিশনে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং স্বতন্ত্র মন্তব্যে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে উভয় দেশেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যর সৈয়দ আহম্মদের ন্যায় বিচক্ষণ মুসলমান নেতা পর্য্যন্ত কমিশনের রিপোর্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, রমেশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিবাদসূচক মন্তব্য লিখেন নাই:—

"It is worthy of note however that as a member of the Public Service Commission of 1887, he signed the report of the majority, and did not join Sir Romesh Chandra Mitter and Rai Bahadur Nulkar in their support of simultaneous examinations."
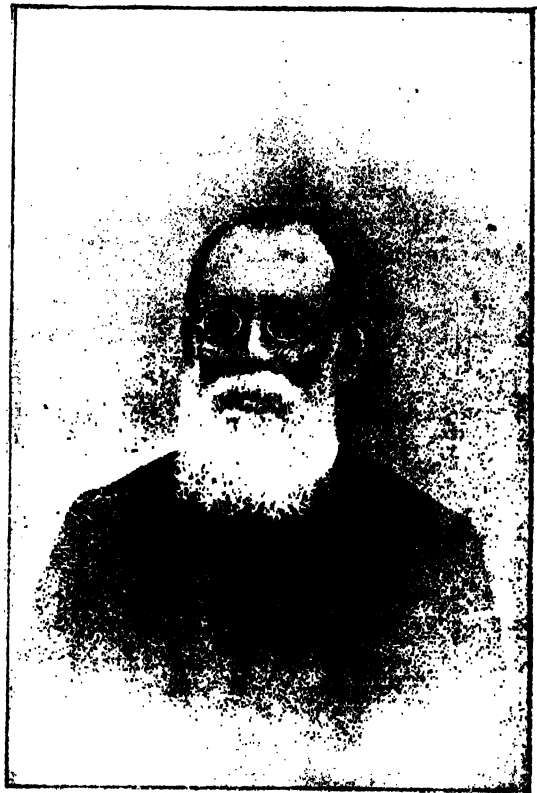
স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকরী কমিশনের সভ্যরূপে তিনি (স্যর সৈয়দ আহম্মদ) অধিকাংশ সভ্যের সহিত যোগদান করিয়া রিপোর্টে সহি করিয়াছিলেন, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র এবং রায় বাহাদুর নালকরের সহিত যোগদান করত ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই।

রমেশচন্দ্রের প্রস্তাব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে।

অবসর গ্রহণ ও উপাধি লাভ

বিচার বিভাগের গুরুতর পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মাত্র ১৬ বৎসর হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

জুরীর বিচার

এই সময়ে এদেশে জুরীর বিচার লইয়া এক গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস এলিয়টকে জুরীর বিচার এদেশে কিরূপ হইতেছে সে সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করেন, কারণ কোন কোন জুরীর বিচারে দোষী অব্যাহতি পাইয়া থাকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের বিচারপতিদেরও অভিমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্যর চার্লস বিচারপতি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কতকগুলি ব্যাপারে জুরীর বিচার বাঞ্ছনীয় নহে, জুরীদের অভিমতের সহিত বিচারপতির মতান্তর ঘটিলে তাহা হাইকোর্টে চূড়ান্ত আদেশের জন্য প্রেরণ করা উচিত কতকগুলি ব্যাপারে আপীলের অধিকার থাকা উচিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটামুটী ভাবে স্যর চার্লসের মতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে স্যর চার্লস ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। উহাতে দেশবাসীর অধিকার ক্ষুন্ন হইতেছে বলিয়া সাধারণে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং স্যর চার্লস বাধ্য হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। রমেশচন্দ্র এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং এই কমিশনের সুপারিশের ফলে স্যর চার্লসের পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশ প্রত্যাহৃত হয় এবং সাধারণের অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া জুরীর বিচারসংক্রান্ত নিয়মাদির সংস্কার সাধিত হয়।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

সহবাস-সম্মতি বিষয়ক বিধি

বিচারপতির আসন হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রমেশচন্দ্র লর্ড ল্যান্সডৌন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় সহবাস-সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ করিবার আয়োজন হইতেছিল।

হরিমতি নাম্নী এক দশম বর্ষীয়া বালিকার প্রতি তাহার যুবক স্বামী দাম্পত্য শয্যায় অত্যাচার করিবার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। এইরূপ অত্যাচার নিবারণের জন্য তৎকালীন ব্যবস্থাসচিব স্যর এনড্রু স্কোবল্ সহবাস সম্মতি-আইন বা Consent Act প্রণয়ন করেন। এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দু মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের দেশবাসী রাজদ্বারে পুলিশের হস্তে নানা লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় দেশবাসী অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মনোভাব প্রসিদ্ধ নাটাকার অমৃতলালের 'সম্মতি-সঙ্কট' নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সহৃদয় সমাজ-সংস্কারকও এরূপ আইন শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অনুচিত, বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার মূক দেশবাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন এবং অবশেষে আইন বিধিবদ্ধ হইবেই জানিয়া বিল পাশ হইবার দিন ব্যবস্থাপক সভায় অনুপস্থিত হন। তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, সুশিক্ষা-প্রভাবে দেশের এই সকল কুপ্রথা শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং সমাজ সংস্কার ব্যাপারে বিদেশীয় রাজপুরুষগণের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহার কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

দেশসেবা

রমেশচন্দ্র দেশের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে স্থাপিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বহুদিন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়াছিলেন এবং ১৮৭৭-৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উহার ব্যবস্থাবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Dean of the Faculty of Law) পদে বৃত হন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজে এক মহা গোলযোগ হয়। জনৈক বি-এল শ্রেণীর ছাত্র 'অনুপস্থিত' হইলেও হাজিরা কেতাবে 'উপস্থিত' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল এবং বি-এল পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া কলেজটিকে disaffiliate বা বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত করিবার চেষ্টা করেন। স্যর তারকনাথ পালিতের অনুরোধে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনস্মৃতিতে কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়াছেন :—

"Sir Romesh Chandra Mitter's help and co-operation were most valuable. I was then brought into close and in imate touch with him ; and the more I saw of him the reater was my admiration for the man. Strong, honest, with an uncommon fund of that rarest of all commodities, commonsense, I always felt that he was one of the finest types of our race. He was not only a great judge but a great man."

অর্থাৎ, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় মহা উপকার হইয়াছিল। আমি তাঁহার সহিত নিকট ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং যতই তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি দৃঢ়চিত্ত, সাধু এবং অনন্যসাধারণ ও অতি দুষ্প্রাপ্য সাধারণ বুদ্ধি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। আমাদের জাতির মধ্যে তিনি একজন সুন্দর আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। তিনি কেবল বিচারপতি হিসাবেই বড় ছিলেন না, মানুষ হিসাবেও তিনি একজন প্রকৃত বড় লোক ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণের পর মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনের পরিচালন সভার তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং উহার গৌরব বর্দ্ধনে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা পাইয়াছিলেন।

সিটি কলেজ, মূক-বধির বিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভায় সভাপতিরূপে উহার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

ভবানীপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ও তাঁহার উৎসাহ ও সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহারও কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভার তিনি সভাপতি ছিলেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ভবানীপুরে ভাগবৎ চতুষ্পাঠী নামক এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় দেন।

ভবানীপুরের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি ভবানীপুর সুরা-পান নিবারণী সভার সভাপতি ছিলেন। অসহায় ও অক্ষম নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য ভবানীপুরে তিনি একটি সাহায্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই উহার সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তিনি বিশেষ মনো-যোগী ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভবানীপুরে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাতাজী মহা-রাণী তপস্বিনী প্রতিষ্ঠিত মহাকালী বিদ্যা-লয়েরও তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুণ্যস্মৃতি আনি বেশান্তের বারাণসী হিন্দু বিদ্যালয়েরও তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা, য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল।

রবার্ট নাইট।

কায়স্থ সমাজে বিবাহের ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রমানাথ ঘোষের বাটীতে "কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিবাহ ব্যয়-সংস্কার সভা" স্থাপনপূর্ব্বক তিনি উক্ত সভায় সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান সদস্য এবং কিছুদিন উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন, কিন্তু উক্ত সভার বিশৃঙ্খলার জন্য উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিংহের সহযোগিতায় Property Association স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।
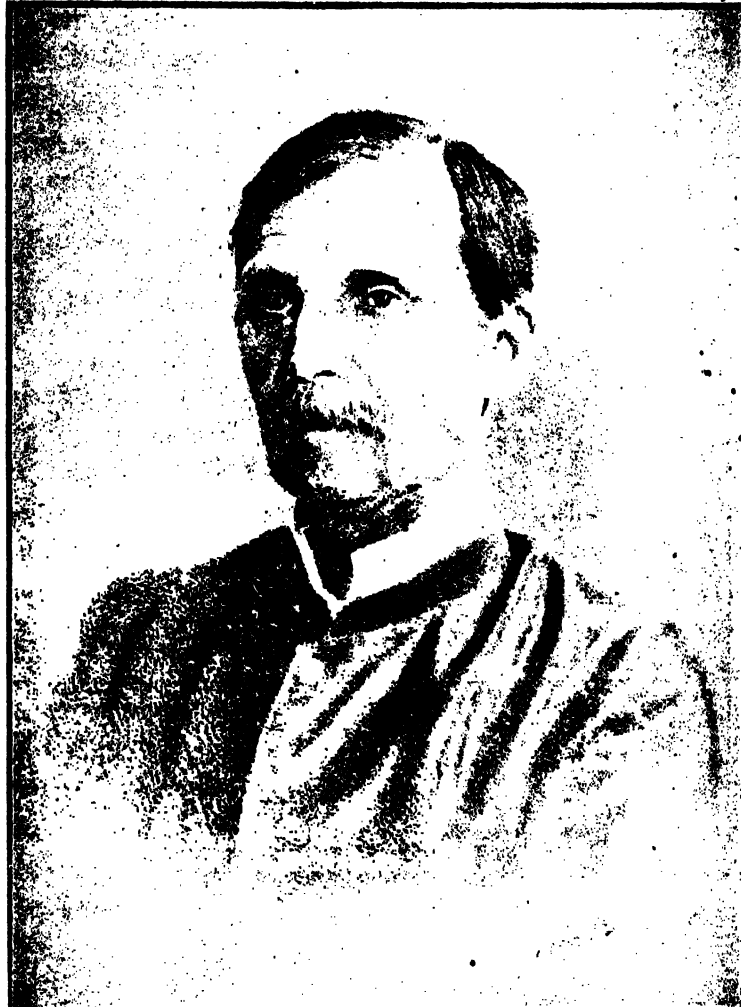
তিনি জমিদারী-পঞ্চায়তের একজন সদস্য ও সুযোগ্য নেতা ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহায়তায় অনেক জমিদারের গৃহবিবাদ মিটাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারত সভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন) ও জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতা ছিলেন। বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু অবসর

গ্রহণের পর উঁহার সহিত আন্তরিক ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তৃতীয়বার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। রমেশচন্দ্র সেবারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

The Indian National Congress was to be held in Calcutta in 1896, and we had many works before us. A Reception committee was formed with Sir Romesh Chunder Mitter as its Chairman. It was a great thing to have secured the services of the eminent judge, who had now retired. He needed no persuasion, no pressure to join the Congress ranks. His sympathies with us were open and undisguised, though, like the late Mr. Justice Ranade, he was not able while still on the judicial Bench to associate himself closely with

রমেশচন্দ্র দত্ত।

the congress movement or to influence its deliberations. As Chairman of the Reception committee, Sir Romesh Chunder Mitter made a notable speech. He asked me for some notes, which I gladly supplied him with ; but his speech was his own in every sense, having in every line the impress of his views and personality. One of the most notable declarations made by him (and coming from him it had value all its own) was that the educated community represented the brain and conscience of the country, and were the legitimate spokes-men of illiterate masses, the natural custodians of their interest. To hold otherwise, said Sir Romesh Chunder Mitter, would be to presuppose that a foreign administrator in the service of the Goverment knows more about the wants of the masses than their educated countrymen. And he went on to add that it was true in all ages that 'those who think must govern those that toil ; and could it be', he asked, 'that the natural order of things was reversed in this unfortunate country ?' This claim is now practically admitted ; and I need not waste words to justify it. But in those days it was still a matter of controversy, and the vigorous pleading of so eminent a man as Sir Romesh Chunder Mitter, who showed no partisan bias even in the advocacy of public interests, was necessary and useful. The trouble now, however, is of a different kind. The Indian public man, in the exuberance of his love for his own views, is apt to mistake his own opinion for that of the country, and his voice for the trumpet-organ of the masses. He too frequently talks of the country, all the while meaning himself and nobody else.

"১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল এবং আমাদের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার পড়িয়াছিল। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। যিনি সম্প্রতি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন - এরূপ বিচক্ষণ বিচারপতির সাহায্য লাভ করা বহু ভাগ্য। মহাসমিতিতে যোগদান করাইবার জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি প্রকাশ্যে এবং অসঙ্কোচে আমাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, যদিও বিচারপতি রানাডের ন্যায় বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি মহাসমিতিতে ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই বা উহার আলোচনাদি তাঁহার প্রতিভা দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। তিনি আমার নিকট কিছু কিছু তথ্য চাহিয়াছিলেন এবং আমি সানন্দে তাঁহাকে তাহা দিয়াছিলাম ; কিন্তু বক্তৃতাটি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব, উহার প্রত্যেক পংক্তিতে তাঁহার স্বাধীন অভিমত ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি উহাতে একটি স্মরণীয় বাণী বিঘোষিত করিয়াছিলেন (এবং তাঁহার উক্তি বলিয়া উহার একটি বিশেষ মূল্য আছে) যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের মস্তিষ্ক ও বিবেকবুদ্ধির প্রতিনিধি এবং অজ্ঞ জনসাধারণের প্রকৃত মুখপাত্র—তাহাদের অধিকারসমূহের স্বাভাবিক রক্ষক। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছিলেন যে একথা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝাইবে যে, গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা দেশের জনসাধারণের অভাবের কথা তাহাদের শিক্ষিত দেশবাসিগণ অপেক্ষা বেশী জানেন। তিনি আরও বলেন যে, এ সত্য সর্ব্ব যুগেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদিগকে যাহারা মানসিক পরিশ্রম করে তাহারাই শাসন করিবে, এই প্রাকৃতিক সত্য কি এই হতভাগ্য দেশেই অস্বীকৃত হইবে ? এই দাবী

এক্ষণে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার সমর্থনে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেকালে উহা একটি বিতর্কের বিষয় ছিল এবং স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রবল সমর্থন অত্যন্ত আবশ্যক ও ফলপ্রসূ হইয়াছিল, কারণ তিনি সাধারণের হিতকর প্রস্তাবের সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া কখনও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় নেতারা তাঁহাদের আত্মমতকে এত প্রিয় জ্ঞান করেন যে, নিজের অভিপ্রায়কে দেশের অভিপ্রায় এবং নিজের উক্তিকে জনসাধারণের ভেরীনিনাদ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা প্রায়ই যখন দেশের কথা বলেন তখন নিজেরই কথা বলেন, আর কাহারও নহে।"

দুঃখের বিষয় রমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে সহযোগিগণের সহিত কোনও বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। চৈতন্য-সম্পাদিত হইলে তিনি গৃহে চলিয়া আসেন। শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি স্বয়ং প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। স্যর রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার বক্তৃতাটি পাঠ করেন।

জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ

জন্মভূমির প্রতি রমেশচন্দ্রের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। অনেকেই কার্য্যব্যপদেশে রাজধানীতে অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়া পল্লীগ্রামের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্রের স্বাদেশিকতা সেরূপ ছিল না। তিনি প্রায়ই তাঁহার জন্মভূমি বিক্রমপুর গ্রামে যাইতেন এবং তাহার উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতেন। তিনি তথায় একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন এবং উইলে উহার জন্য ৬০,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অনেক দীনদুঃখীকে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন।

কবিবর হেমচন্দ্র বার্দ্ধক্যে অন্ধ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেন।

স্বর্গারোহণ

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই (২৯শে আষাঢ় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) রমেশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। বহুদিন হইতে বহুমূত্ররোগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কন্যারত্নকে হারাইয়া তিনি শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের ছিন্নতন্ত্রী বীণায় জাতীয় শোকের আর্ত্তনাদ শেষবার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল :—

এবে কোথা চলিলে ?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এতদিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি' কোথায় চলিলে ?
জগতের হিতব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন রাজ্যে উদয় হইলে,
কোথা ওহে মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ?
… … …
তোমারে পাইলে কাছে জুড়াত পরাণ,
কি মধুর মাদকতা
সৌরভের কি স্নিগ্ধতা,
সরস আনন্দ ভরা কি সুধা আঘ্রাণ !

স্যর তারকনাথ পালিত (যৌবনে)

শুনিলে তোমার কথা,
ভুলিতাম সব ব্যথা
শোক দুঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নির্ব্বাণ
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান ?

হা মিত্র ! মিত্রতা তব করিয়ে স্মরণ
বঙ্গভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন ;
কাঁদিলে জনমভূমি
দেখিতে পারনি তুমি
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,

রোদনের প্রতিকার
করিতে পার না আর?
হায় সখা সে ক্ষমতা গেল কি এখন?
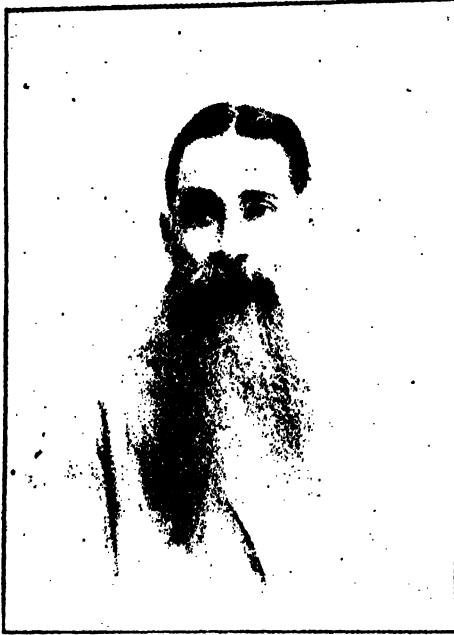
ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি।

ঢালি অশ্রু অবিরত
"সখা" বলে ডাকি কত,
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন প্রাণে সখা তুমি করিলে গমন?

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্লীন বলিয়াছিলেন,—"his reported judgments bore traces of the impartiality of the Judge, the erudition of the lawyer and the polish of the scholar," অর্থাৎ "তাঁহার মোকদ্দমার রায়গুলিতে বিচারকের পক্ষপাতহীনতা, ব্যবহারাজীবের জ্ঞান এবং পণ্ডিতের প্রগাঢ় বিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায়"—ইহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। সম্প্রতি হাইকোর্টে রমেশচন্দ্রের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারও রমেশচন্দ্রের বিচারগুলির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত প্রিভি কাউন্সিল অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। এবিষয়ে আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশ ধৃষ্টতা মাত্র।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির আসন হইতে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত স্যর রমেশের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন—"You have not had amongst you a stronger friend of the congress, a greater patriot and a more sincere and thoughtful son of India than Sir Romesh Chunder Mitter. অর্থাৎ "আপনাদের মধ্যে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় জাতীয় মহাসমিতির অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, গভীরতর স্বদেশানুরাগী, অধিকতর চিন্তাশীল ও আন্তরিক কল্যাণকামী ভারতসন্তান ছিল না।"

রমেশচন্দ্রের জীবনের যে সকল ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, মনস্বিতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ভাষার আড়ম্বরে সে সরল পবিত্র জীবন ফুটাইবার নহে।

রমেশচন্দ্রের পারিবারিক জীবন অতি মধুময় ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী লেডি জগত্তারিণী মিত্র অতি ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন এবং তাঁহার দেবতুল্য স্বামীর সর্ব্বকার্য্যে সহকারিণী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের প্রাগুল্লিখিতা কন্যা ব্যতীত চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যম পুত্রটি অতি অল্প বয়সেই পরলোকগত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথও ইহলোকে নাই। তাঁহার এক পুত্র রিপন কলেজের দর্শন-

বিহারীলাল গুপ্ত।

শাস্ত্র অধ্যাপক ডাক্তার সুশীলচন্দ্র মিত্র বঙ্গভাষার অকৃত্রিম অনুরাগী এবং "বিচিত্রা" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পরিচালক। সম্প্রতি পরলোকগত তৃতীয় পুত্র ৺স্যর বিনোদচন্দ্র ও কনিষ্ঠ ৺স্যর প্রভাসচন্দ্রের নাম বাঙ্গালার গৃহে গৃহে এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

চীনা-শ্রমণদের ভারতদর্শন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

হিউয়েন দূতের সঙ্গে কামরূপে গেলেন ; কুমার-রাজা মহাসমারোহে তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা করিলেন। এই ভাবে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইবার পর হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জাম হইতে ফিরিয়া সংবাদ পাইলেন যে, হিউয়েন কামরূপে আছেন। পূর্ব্বে কয়েকবার অনুরোধ করিলেও হিউয়েন শিলাদিত্যের কাছে আসেন নাই, অথচ এখন তিনি কামরূপে গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিয়া শিলাদিত্য কুমাররাজাকে আদেশ করিলেন যে, চীনদেশীয় শ্রমণকে যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে পাঠান হয়। কুমাররাজা শিলাদিত্যের দূতকে বলিলেন, "শিলাদিত্য আমার মাথা লইতে পারেন, কিন্তু হিউয়েনকে এখন পাইবেন না।" দূত ফিরিয়া শিলাদিত্যকে এ কথা জানাইলে শিলাদিত্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও পরিষদবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, কুমাররাজা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। শিলাদিত্য দ্বিতীয় দূতের মুখে কুমাররাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মাথাই পাঠাইবেন, আমার এই দূত যেন শীঘ্র তাহা আমার কাছে উপস্থিত করিতে পারে!" কুমার-রাজা ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া ২০,০০০ হস্তী ও ৩০,০০০ নৌ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া গঙ্গাপথে হিউয়েনকে লইয়া শিলাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শিলাদিত্য যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন, সেখানে পৌছিয়া গঙ্গার উত্তরকূলে আবাস স্থাপন করিয়া, হিউয়েনকে সেখানে রাখিয়া, মন্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া শিলাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কুমাররাজাকে দেখিয়া শিলাদিত্য হৃষ্ট হইলেন এবং হিউয়েনের প্রতি কুমাররাজের শ্রদ্ধাভক্তির কথা স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বক্রোধ বিস্মৃত হইয়া, শুধু চীনদেশীয় শ্রমণ কোথায় আছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হিউয়েন আবাসে আছেন শুনিয়া শিলাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কুমাররাজের সঙ্গে আসিলেন না কেন। কুমাররাজা বলিলেন, "মহারাজ ধার্ম্মিক লোককে সম্মান করেন ; নিজেও ধর্ম্মপ্রিয়, আপনিই আসিয়া তাঁহাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলুন না কেন?" হর্ষবর্দ্ধন ইহাতে তুষ্ট হইয়া কুমাররাজাকে তখনকার মত তাঁহাকে শিবিরে ফিরিতে অনুমতি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তিনি নিজেই পরদিন যাইবেন।

কুমার শিবিরে ফিরিয়া হিউয়েনকে বলিলেন, "রাজা যদিও কাল আসিবেন বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তিনি আজ রাত্রেই আসিবেন। তিনি যখন আসিবেন তখন আমাদের তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিয়া আপনি ভীত হইবেন না!" হিউয়েন বলিলেন, "হিউয়েন-থ্সিয়াং বুদ্ধের ধর্ম্ম অনুযায়ী আচরণ করিবেন।"

কুমাররাজার অনুমান সত্য হইল। হর্ষ সত্যই সেই রাত্রেই আসিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরে লোকমুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গঙ্গাবক্ষে কয়েক সহস্র প্রজ্জলিত মশাল দেখা যাইতেছে ও জয়ঢাকের বাজনা শুনা যাইতেছে। শিলাদিত্য আসিতেছেন বুঝিয়া কুমাররাজা তৎক্ষণাৎ লোকের হাতে মশাল দিয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে হর্ষকে অনেক দূর হইতে অগ্রগমন করিতে চলিলেন।

শিলাদিত্য যখন চলিতেন তখন কয়েকশত লোক স্বর্ণময় ঢাক লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিত এবং শিলাদিত্যের প্রতি পদক্ষেপে একবার করিয়া ঢাক বাজাইত। শুধু শিলাদিত্যেরই এই প্রথা ছিল, অন্য রাজাদের এরূপ করিবার অধিকার ছিল না।

আবাসে পৌছিয়া শিলাদিত্য হিউয়েনের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে ফুল ছড়াইয়া ভক্তিপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং বহু শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, তারপর বলিলেন, "আপনার শিষ্য পূর্ব্বে বহুবার আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, আপনি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই কেন?"

হিউয়েন বলিলেন "হিউয়েন-থ্সিয়াং বহু দূরদেশ হইতে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও 'যোগভূমিশাস্ত্র' শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন ; যখন আপনার আমন্ত্রণ আসিয়াছিল, তখনও আমার

শাস্ত্রাধ্যায়ন সমাপ্ত হয় নাই, তাই আমি তখন মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।"

তারপর সম্রাট হিউয়েনকে চীনদেশের রাজার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তরে হিউয়েন চীনরাজের সুখ্যাতি করিয়া অনেক কথা বলিলেন। পরদিন হিউয়েনকে লইয়া যাইবেন এই কথা জানাইয়া হর্ষ সে রাত্রে বিদায় লইলেন।

পরদিন শিলাদিত্যের দূতের সঙ্গে হিউয়েন ও কুমাররাজা সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইলে, শিলাদিত্য বিশ জন অনুচর পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আদর অভ্যর্থনার পর সম্রাট, হিউয়েন প্রণীত 'বিরুদ্ধমতখণ্ডক' গ্রন্থখানি চাহিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শিলাদিত্যের ভগিনী রাজার পশ্চাতে বসিয়া ছিলেন, তিনি অতি বুদ্ধিমতী ও সম্মতীয়-মতে ব্যুৎপন্না ছিলেন; তিনিও হিউয়েনের ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দলাভ করিলেন। তারপর শিলাদিত্য হিউয়েনের গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, হীনযানীদের অনেকে এখনও ভ্রান্তমতে বিশ্বাস করে এবং তিনি মহাযানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিবার জন্য কান্যকুব্জে একটি মহাপরিষদ আহ্বান করিয়া তাহাতে ভ্রান্তবিশ্বাসীদের নিকট নিঃসংশয়রূপে হিউয়েনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

সেই দিনই শিলাদিত্য সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে কান্যকুব্জে সমবেত হইয়া হিউয়েনের গ্রন্থ বিচার করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

শিলাদিত্যের সঙ্গে হিউয়েন কান্যকুব্জে গেলেন। হর্ষের আহ্বানে বহু রাজা, রাজমন্ত্রী, মহাযান ও হীনযানে সুপণ্ডিত তিন হাজার শ্রমণ, তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও নির্গ্রন্থ এবং এক হাজার নালন্দা-পণ্ডিত সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে হস্তী, রথ ও শিবিকায় আরোহণ করিয়া আরও বহু সহস্র লোক আসিয়াছিল। মহাপরিষদের জন্য দুইটি বিশাল মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং হর্ষ একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণ-ময় বুদ্ধমূর্ত্তিও বানাইয়াছিলেন। শিলাদিত্য ও কুমাররাজা ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত হইয়া এই মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রত্নমণ্ডিত হস্তীর পৃষ্ঠে মূর্ত্তিটি শিলাদিত্যের শিবির হইতে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। মূর্ত্তির পিছনে দুইটি সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে কয়েকজন লোক ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। তাহার পিছনে হিউয়েন, রাজন্যবর্গ প্রভৃতি হস্তীপৃষ্ঠে দুই সারি বাঁধিয়া চলিলেন। সভামণ্ডপে পৌছিয়া সকলে যথাক্রমে মূর্ত্তিকে পূজার্ঘ্যদান করিবার পর এক হাজার বৌদ্ধপণ্ডিত ও পাঁচশত ব্রাহ্মণ ও অন্যদলের আচার্য্য লইয়া পরিষৎ আরম্ভ হইল। হিউয়েন পরিষদাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া একটি মূল্যবান উচ্চ আসনে বসিয়া মহাযান-মত ব্যাখ্যা করিলেন ও ঘোষণা করিলেন যে, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিলে তিনি স্বীয় মস্তক দান করিবেন। পাঁচ দিন ধরিয়া এইরূপ সমারোহ চলিল এবং হিউয়েনের বিরুদ্ধে কেহ অগ্রসর হইলেন না। হীনযানীরা এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া হিউয়েনের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ সংবাদ শুনিয়া শিলাদিত্য ঘোষণা করিলেন যে, হিউয়েনের কেহ কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আঠার দিনের মধ্যে কোন বিরোধী পক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় (স্বয়ং সম্রাট হিউয়েনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল) পুনরায় মহাযান-মতের জয় ঘোষণা করিয়া পরিষদ ভঙ্গ হইল। শিলাদিত্য ও অন্য রাজারা হিউয়েনকে বহু স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্রাদি উপহার দিলেন, কিন্তু হিউয়েন সে সব কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তারপর শিলাদিত্যের আদেশে হিউয়েনকে হস্তীপৃষ্ঠে বসাইয়া মন্ত্রীরা তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। ইহাতেও হিউয়েন আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের প্রথা বলিয়া শিলাদিত্য তাঁহাকে রাজি করাইলেন। মহাযানীরা হিউয়েনকে "মহাযানদেব" এবং হীনযানীরা "মোক্ষ-দেব" উপাধি দিলেন।

হিউয়েন এইবার নালন্দা-ভিক্ষুদের কাছে বিদায় লইয়া দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিলে শিলাদিত্য তাঁহাকে প্রয়াগের "মহামোক্ষ পরিষৎ" পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে অনুনয় করায় হিউয়েন সানন্দে সম্মত হইলেন।

পরিষদের শেষ দিন আগুন লাগিয়া সমগ্র মণ্ডপ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং পরে ভিড়ের মধ্যে একজন লোক ছুরিকাহস্তে হর্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন এরূপ অতর্কিত আক্রমণে দুই পা হটিয়া গিয়া লোকটিকে ধরিয়া ফেলেন ও পরে তাহার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় যে, ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণেরা জলন্ত তীর মারিয়া মণ্ডপে আগুন লাগায় ও রাজাকে বধ করিতে তাহাকে

ব্যবৃত্ত করায়। ইহার ফলে পাঁচশত ব্রাহ্মণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়।

প্রয়াগের মহাদান যজ্ঞেও সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক ও অনাথ আতুরদের হর্ষবর্দ্ধন বহুধনরত্ন এবং রাজকোষের সমস্ত সঞ্চয় বিলাইয়া দিলেন। প্রায় দশ দিন ধরিয়া এই যজ্ঞ চলিল, শেষে হর্ষ তাঁহার ভগিনীর কাছ হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা পরিধান করিলেন।

"মহামোক্ষ পরিষদের" পর হিউয়েন বিদায় লইতে চাহিলে শিলাদিত্য তাঁহাকে আরও দশ দিন ধরিয়া রাখিলেন। পরে কুমাররাজা বলিলেন যে, তিনি যদি কামরূপ গিয়া বাস করেন, তবে তাঁহার জন্য কুমার একশত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। রাজারা তাঁহাকে এ দেশে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিয়া হিউয়েন বিদায়ের মিনতি জানাইলেন। শিলাদিত্য বলিলেন, তিনি যদি দক্ষিণ পথে (সমুদ্রপথে) ফিরিতে চাহেন, তবে তিনি সঙ্গে লোকজন দিয়া সব ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু কাউ-চাং-এর রাজার সঙ্গে পুনরায় দেখা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েন যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই যাইতে চাহিলেন।

রাজারা হিউয়েনকে পথের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অনেক স্বর্ণরৌপ্য দিতে চাহিলেন, কিন্তু হিউয়েন সব প্রত্যাখ্যান করিলেন, শুধু কুমাররাজের নিকট হইতে পথে বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি চামড়ার আঙরাখা গ্রহণ করিলেন।

এইবার হিউয়েন সত্যই বিদায় লইলেন। শিলাদিত্য বহু অনুচর পরিবৃত হইয়া ৩০।৪০ লি পথ তাঁহার সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। শেষ বিদায়ের সময় কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ ও প্রতিমাদি ঘোড়ার পিঠে লওয়া হইল; উত্তর ভারতের উধিত নামক একজন রাজা সেনা সঙ্গে দিয়া তাঁহার পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। ঘোড়ার গতি যথেষ্ট দ্রুত নহে বলিয়া শিলাদিত্য একটি বড় হস্তী ও পথের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও দশ হাজার রৌপ্য-মুদ্রা উধিতরাজার সেনার হাতে দিলেন। বিদায়ের তিন দিন পরে শিলাদিত্য কুমাররাজ ও দক্ষিণ ভারতের ধ্রুবভটরাজকে সঙ্গে লইয়া বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া আবার হিউয়েনকে ধরিয়া অনেক দূর তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং যাত্রার সুবিধার জন্য হিউয়েনের সঙ্গে রাজকর্ম্মচারী ও পথের সব রাজার নামে স্বমুদ্রাঙ্কিত পত্র দিয়া দিলেন।

হিউয়েন আবার ভারতের মধ্য দিয়া সীমান্তদেশ পার হইয়া গিরিপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে পৌছিলেন। পথে তিনি অনেক স্থানে কিছুদিন করিয়া থাকিয়া গিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু বাধাবিপত্তিও ভোগ করিয়াছিলেন। রাজারা এবং জনসাধারণও সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

চীনদেশে পদার্পণ করিয়া হিউয়েন চীনসম্রাটকে তাঁহার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন এবং সম্রাটের আদেশে তাঁহার অভ্যর্থনার সমুচিৎ ব্যবস্থা করা হইল। বিভিন্ন সঙ্ঘারামের ভিক্ষুরা একত্র হইয়া ধ্বজাপতাকা হস্তে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া 'হংফু' (পরমানন্দ) বিহারে লইয়া গেলেন। এখানে হিউয়েন কর্ত্তৃক ভারত হইতে আনীত সামগ্রীসমূহ রক্ষিত হইল; যথা—

(১) ১৫০ খণ্ড ধাতু (বুদ্ধের নখদন্ত অস্থি প্রভৃতি দেহাবশেষ)।

(২) একটি স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি, ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ স্ফটিক-বেদীর উপর স্থাপিত।

(৩) একটি চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তি, ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চ স্ফটিকবেদীর উপর স্থাপিত।

(৪) একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, ২ ফিট ৯ ইঞ্চি স্ফটিকবেদীর উপর স্থাপিত।

(৫) একটি রৌপ্যময় বুদ্ধমূর্ত্তি, ৪ ফুট উচ্চ স্ফটিকবেদীর উপর স্থাপিত।

(৬) একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চ স্ফটিকবেদীর উপর স্থাপিত।

(৭) একটি চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তি, ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ স্ফটিকবেদীর উপর স্থাপিত।

মূর্ত্তি ছাড়া হিউয়েন-আনীত ২২৪ খানি মহাযান সূত্র, ১৯২ খানি মহাযানশাস্ত্র, ১৫খানি স্থবিরাবাদের (হীনযান) গ্রন্থ, সমসংখ্যক সম্মতীয়বাদের গ্রন্থ, ২২ খানি মহীশাসকবাদের গ্রন্থ, ৬৭ খানি সর্ব্বাস্তিবাদের গ্রন্থ, ১৭ খানি কাশ্যপীয় মতের গ্রন্থ ৪২ খানি ধর্ম্মগুপ্ত মতের গ্রন্থ এবং ৩৬ গ্রন্থ শব্দবিদ্যাশাস্ত্রও সেখানে রক্ষিত হইল। এই গ্রন্থগুলি বহন করিতে কুড়িটি ঘোড়া লাগিয়াছিল।

প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর সম্রাটের সঙ্গে হিউয়েনের সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলাপ হইল। রাজকর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া হিউয়েন হংফু বিহারে বাস করিয়া শাস্ত্রানুবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজানুরোধে সে-এন বিহারে গিয়া বাস করিলেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কিছু জলযোগের পর তিনি চার ঘণ্টা ছাত্রদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন এবং বহু মান্যগণ্য লোক এই ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন। বাকি সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সংস্কৃত ভাষার বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করিতেন, বুদ্ধ প্রতিমার প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতেন এবং শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতিলিপি বানাইতেন। বিহারের ভিক্ষুদেরও তত্ত্বাবধান তাঁহাকে করিতে হইত। এ ছাড়া সম্রাটের অনুরোধে তাঁহাকে ভারত-ভ্রমণের বৃত্তান্তও লিখিতে হইয়াছিল।

৬৫৪ খৃষ্টাব্দে মধ্য ভারতের মহাবোধি-বিহার হইতে একদল পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া হিউয়েনকে তাঁহাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কিছুদিন নবনির্ম্মিত সি-মিং বিহারে বাস করিবার পর শরীরে বার্দ্ধক্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় অন্তিম সময় আসন্ন বুঝিয়া হিউয়েন সম্রাটের অনুমতি লইয়া "ইউ-ফা" (মণিপুষ্প) প্রাসাদে বাস করিয়া বহু পরিশ্রমে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে ১০২ খণ্ড ও ৬০০ অধ্যায়ে বিভক্ত "মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র"-এর অনুবাদ সম্পূর্ণ করিলেন। সব শুদ্ধ ১৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত ৭৪ খানি গ্রন্থ হিউয়েন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এ গুলির আবৃত্তি শ্রবণ শেষ করিয়া তিনি মুদ্রিত নয়নে স্থিরদেহে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তারপর মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহার জীবনদীপ ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে হিউয়েন ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

৬৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহার দেহাবশেষ ফান-চুয়ান উপত্যকার উত্তরে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উপর একটি স্তূপ রচনা করা হয়। [সমাপ্ত

প্রতীক্ষিত

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

তোমারই পথ চেয়ে হে মম প্রিয় সাথি!
কাটাই সারাদিন কাটে যে সারারাতি,
তুমি তো আসিবে না আমারে যেতে হবে।
যাত্রাতিথি মম জানি নে হবে কবে!

একেলা আসি হেথা বাজিছে বড় ব্যথা
জানিনে দিন তব কাটে কি সুখে মাতি!
দেখাতো দিতে পারো স্বপনভরে এসে,
তেমনি মধুমাখা স্নিগ্ধ হাসি হেসে।

সময় পাও না কি? ব্যস্ত এত কাজে?
আমার দিন হেথা কাটিতে চাহে না যে,
জানিনে কবে যাবো, তোমারে বুকে পাবো
জ্বলিবে প্রাণে পুনঃ স্নিগ্ধালোকভাতি।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

দ্বিপ্রহরে কীর্ত্তনের শেষে পিতা পুত্রে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, পানু কহিল, বাবা এ সাধু নয়, সন্ন্যাসী নয়, কিছু নয়, ও একটি জুয়াচোর ভণ্ড, ওর আড্ডা তুলে দাও।

সদ্য কীর্ত্তনের পরে সুরেন্দ্রনাথের মন তখনও ব্যথা-সজল ছিল, কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, কার কথা বলছিস?

—ওই স্বামীজি, ও ভণ্ড বাবা, ও সন্ন্যাসী নয়, সবাইকে হিপনটাইজ করে রাখছে খালি।

পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, চুপ কর পানু, এতটুকুন ছেলে, কি বোঝ তুমি? কত সব বিদ্বান বড় বড় চাকুরে ওঁকে মেনে চলেন, আর তুমি কি বলছ এসব?

পানু মাথা নত করিয়া কহিল, সবাইকেই ও ভুলিয়েছে বাবা, তুমি এখন বুঝতে পারছ না—

পিতার ক্রোধ সহনাতীত হইয়া উঠিল, কহিলেন, না, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, আর তুমি সব বুঝে নিয়েছ! যাও, যাও খেলা করগে যাও।

নির্ম্মলা কি কাজে এদিকে আসিয়াছিলেন, পিতা পুত্রের কথা শুনিতে পাইয়া একটু দাঁড়াইলেন, তাহার পর গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের ভাবে কহিলেন, শুধু ম্যাট্রিকটি পাশ করেছ বাবা, এরই মধ্যে এত? বাপের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সমানে তর্ক? এর পরে আর রক্ষে থাকবে না যে!

সুরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু পানু একটু জোরে জোরেই কহিল, একে তুমি তাড়াও বাবা, এ যে সত্যই কত খারাপ তুমি জান না! যদি এখানে থাকেই ও, আমি আজই কলকাতায় চলে যাব।

স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, এত উদ্ধত হওয়া উচিত নয় পানু, গুরুজনের সম্মান করতে শেখ, বিনয়ের বাড়ী মানুষ হয়ে, এ রকম উদ্ধত তুমি হলে কি করে আমি তাই ভাবছি।

নির্ম্মলা কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া, অতি মধুর ভাবে কহিলেন, 'ওগো, মানুষ করার কথা ব'লো না গো, কি মানুষই করেছেন তোমার বিনয়বাবুর স্ত্রী, তা দেখতেই পাচ্ছি, তখন ত বড় রাগ দেখিয়ে নিয়ে কলকাতায় রেখে এলে! বিনয়বাবুর স্ত্রী খুব ভাল করে মানুষ করবেন বলে, নিজের মেয়ের সঙ্গে এক রকম করেই যদি দেখতেন, তা হলে ও অত ভাল পাস করল আর তোমার ছেলেটি এ রকম করে, তলায় ঝুলছে কেন? কাল ও বাড়ীর মেজ বউ জিজ্ঞেস করছিল, বলতে আমি লজ্জায় মরে যাই।

পানুর চক্ষু দুটি সজল হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, আজ এই একটার ট্রেণেই আমি কলকাতায় যাব, বাবা, তুমি যদি ও দিকে থাক তখন, তাই, আগেই বলে রাখছি।

—যেতে হয়, পরে যেয়ো। আজই যাবার তাড়া কিসের! স্বামীজির সঙ্গেও তুমি কি রাগারাগি করেছ শুনলাম, আজ তাঁর কাছে তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে, আজ কীর্ত্তনের সময় আমার সঙ্গে তুমি যাবে সেখানে।

সে আমি পারব না, ওখানে আমি কিছুতেই যাব না—ও ভণ্ড, ও জুয়াচ্চোর,—খেতে না পেয়ে সন্ন্যাসী সেজেছে—

পিতা বসিয়া ছিলেন সহসা আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তারপর, দ্বারের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া, রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—

পানু নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, সুরেন্দ্রনাথ ভৃত্যের হাত হইতে পাখাটি টানিয়া লইয়া, প্রবল বেগে গায়ের উপর পাখা নাড়িতে নাড়িতে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর দণ্ডায়মান ভৃত্যের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, এক গেলাস জল দে রমেশ।

নির্ম্মলা কহিলেন, ওমা এখন জল কি গো, ভাত খাবে না?

সুরেন্দ্রনাথ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কহিলেন, জল আন্ রমেশ।

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষটি হইতে এক গেলাস সরবত লইয়া উষা আসিয়া পিতার কাছে দাঁড়াইল, মৃদু স্বরে কহিল, এখন

জল না বাবা, সরবত খাও,—পাখাটা আমার হাতে দাও বাবা।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, সুরেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে কহিলেন, তোরা সব খেয়েছিস মা?

—না বাবা, রান্নার একটু দেরী হয়ে গেছে আজ। ওদিকের ভোগের রান্না হয়ে গেছে, শম্ভু এসে খবর দিলে।

—খবর দিয়ে গেছে? আমি যাচ্ছি তা হলে।

সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া কহিলেন, ঊষা, রান্না হলে ওটাকে ডেকে নিয়ে খাওয়াস। আবার একটু অগ্রসর হইয়া আর একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, ঘড়িতে বারটা ত বেজে গেল দেখছি, ওটা যদি সত্যিই চলে যায়, তা হলে দেওয়ান মশায়কে গিয়ে খবর দিস্ বুঝলি?

ঊষা ঘাড় নাড়িল, সুরেন্দ্রনাথ নামিয়া গেলেন।

ইহার মিনিট কয়েক পরেই ছোট্ট একটা সুটকেস হাতে লইয়া পানু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, আশা ব্যতীত ঊষা ও আর সব কটি ভাই বোনই পানুর পশ্চাতে পশ্চাতে নামিয়া চলিল। ঊষা অনুনয় করিয়া কহিল, খেয়ে যাও দাদা, অনেক সময় আছে এখনো।

—না ভাই ক্ষিদে নেই।—পানুর চক্ষু দুটি লাল, ঊষা সেদিকে তাকাইয়া কহিল, কলেজের এখনো ঢের দেরী আছে দাদা, আজ নাই বা গেলে।

—না ভাই আজই যেতে হবে।

—তুমি রাগ করে যাচ্ছ দাদা, যেয়ো না ওরকম করে'।

পানু ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঘর অতিক্রম করিয়া বাগানের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, ঊষা চেঁচাইয়া কহিল, হেঁটে যেয়ো না দাদা, জ্যাঠামশাইকে খবর পাঠাই, তাঁর সঙ্গে গাড়ী করে যাও।

পানু দ্রুত পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

দেওয়ান মহাশয় যখন খবর পাইয়া এ বাড়ী আসিলেন, তখন পানু ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছিয়াছে।

ঊষা একটা টিফিন-কেরিয়ার সাজাইয়া আনিয়া দেওয়ানজির পাশে গাড়ীতে রাখিয়া কহিল, দাদা কিছু খেয়ে যায় নি জ্যাঠা মশায়, এটা দেবেন তাকে, আর টাকাকড়িও ত কিছু নেয়নি সে। দেওয়ান কহিলেন, সে সব আমি নিয়েছি মা, কিন্তু একটা বাজে, গাড়ী ধরতে পারলে হয়।

দেওয়ান মশাই গিয়া প্লাটফরমে দাঁড়াইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, টাকার কি করলি পানু?

পানু জানালায় মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, সে সব ভাববেন না জ্যাঠামশায়ই, সব ঠিক আছে।

পানু তাহার ফাউণ্টেন পেন বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় চলিল।

দেওয়ান মশাই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কলিকাতায় বিনয় বাবুকে একটি টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন।

[১১]

গাড়ী ছাড়িতেই সেই যে পানু মাথার নীচে একটি হাত রাখিয়া, অন্য হাতটিতে কপাল ঢাকিয়া বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ট্রেণখানি কতবার থামিল, চলিল, কত যাত্রী নামাইল এবং তুলিল, কিন্তু পানু একটিবার উঠিল না। অবশেষে কলিকাতায় পৌঁছিয়া গাড়ী যখন সেই রাত্রির মত তাহার শেষ বাঁশীটি বাজাইয়া সেইখানেই থামিয়া পড়িল, তখন পানু মাথা তুলিয়া একবার একটু বাহিরের ভিড়ের পানে তাকাইয়া আবার বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল, মনে মনে বলিল, ভিড় কমুক, তারপর আস্তে আস্তে একটা কুলীকে ডেকে রওনা হলেই হবে। বিনয় বাবুর বাড়ীতে সে উঠিবে না, সেখানে আর সে থাকিবে না, একথা গেজেটে পরীক্ষার ফল জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী ত একটা আছেই, তবে আর ভাবনা কি! পরীক্ষার খবর জানিয়া মীরার মা বাবার, তাহার উপর যে কি রকম একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছে, সে ভাবটা নিজের মনে কল্পনা করিয়াই দারুণ অভিমানে পানুর হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। এখন চোখ বুজিয়া প্রাণপণ বলের সহিত নিজের মনেই সে বার বার বলিতে লাগিল, যাব না আমি, কক্ষণো না, কক্ষণো গিয়ে আর তাঁদের সঙ্গে দেখাও করব না, আমার কেউ নেই তা ত' আমি জানি, আমার বাবাও আমার পর হয়ে গেছেন।—বদ্ধ চক্ষুদুটির কোণে কোণে জল সঞ্চিত হইয়া ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল, একটা দারুণ

অবসাদ ও ক্লান্তি আসিয়া সারাদিনের অনাহারী পানুকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

হঠাৎ একটি শব্দে সে চমকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইল। মীরাদের দারোয়ান বৃদ্ধ রামভজন গাড়ীর ভিতরে মুখ বাড়াইয়া সোৎসাহে কহিতেছে, মাজি এই ত এই গাড়ীতে পানুদাদাবাবু ঘুমিয়ে আছেন।

মা কহিলেন, গাড়ীতে উঠে ডেকে তোল, রামভজন। যা গরম পড়েছে, অসুখ করে নি ত, কে জানে বাপু। দেখ দেখ।

রামভজন তৎক্ষণে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে, পানু মুহূর্ত্ত মধ্যেই মুখটা ফিরাইয়া বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাবিয়া লইতেছিল, কানে ঢুকিল খিলখিল শব্দে মীরার মিষ্টি হাসি।

উঠেছেন না কি? ও রামভজন উঠেছেন নাকি বাবু?

এ যে জ্যাঠামশায়েরই কীর্ত্তি, পানু নিঃসন্দেহেই তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখন না উঠিয়া কোন উপায়ই যে আর নেই, তাহা বুঝিয়াই পানু ধীরে ধীরে উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, মা গভীর স্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর খারাপ হয় নি ত পানু? ঘুমুচ্ছিলি কেন?

মীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়া বিব্রত পানুর পানে তাকাইয়া তখন হাসিতেছিল, কহিল, নেমে আসতে পারলে পানুদা? আমরা যদি না আসতাম তা হলেই হয়েছিল আর কি! কাল সকালে জেগে দেখতে আবার বিনাভাড়াতেই একেবারে সেই ফুলপুরের ষ্টেশন!

মা কহিলেন, যাঃ, হাসছিস কি? তাছাড়া এই গাড়ী ত আজ রাত্তিরে আর যাবে না, সান্ট করে সাইডিঙে নিয়ে রেখে দেবে।

মীরা কহিল, তা হলে ত আরো মজা হত, রাত্তিরে গাড়ী পরিষ্কার করতে এসে কুলীরা ঘুমের চোখে আর অন্ধকারে বেশ ভাল একটি মোট মনে করে কে নেবে বলে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিত যে।

মা রাগের ভাব দেখাইয়া কহিলেন, থাম ত মীরা, ছেলেটা নামলো খালি গাড়ী থেকে এরই মধ্যে কি আরম্ভ করেছে দেখো না! ও রামভজন, কই বিছানা কই দাদাবাবুর? খালি স্যুটকেসটি নামালে যে,—

—বিছানা ত নেই মাজী, বলিয়া রামভজন আর একবার গাড়ীর ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

মা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কিরে পানু, বিছানা কৈ?

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া ঘাড়, মুখ, কপাল বার বার মুছিতে মুছিতে পানু কহিল, বিছানা ত নেই মা, ভুলে গেছি আনতে—

এইবার আর মীরার হাসি কিছুতেই বাধা মানিল না, মুখের ভিতর রুমাল গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল।

মা মুহূর্ত্তকাল অবাক হইয়া তাঁহার এই আপনভোলা ছেলেটির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তিনি ছাড়া যে একমুহূর্ত্তও এই ছেলেটির চলে না—তিনি কাছে নাই, তিনি গুছাইয়া দেন নাই, নিজেও সে তাই জিনিষপত্র তার গুছাইয়া আনিতে পারে নাই, ভাবিয়া প্রবল স্নেহ উথলিয়া উঠিয়া, বুকখানি তাঁহার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, কি করে শুয়েছিলি বাবা? লাগেনি পিঠে?

পানু হাসিয়া কহিল, কি জানি মা, তাও বুঝিনি বিশেষ।

রাস্তার উপর নিতান্ত অভদ্রতা হইতেছে মনে করিয়া মীরা প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পানু কহিল, থামলে কেন? হয়ে গেল?

—হ্যাঁ এখনকার মত অন্ততঃ,—বাড়ী গিয়ে তারপর আবার হবে।'

সহজ কথাবার্ত্তায় এবং হাস্যপরিহাসে পানুর মন কতকটা হাল্কা হইয়া উঠিয়াছিল, পরীক্ষা বা পাশের কথা যে ইঁহারা একবারও তুলিলেন না, পানু মনে মনে তাহাতে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল; কিন্তু বাড়ী গিয়া, আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া, মাথাটা যখন বেশ সুস্পষ্ট ভাবে ভাবিবার ক্ষমতা পাইল, দ্বিপ্রহরের কথা মনে করিয়া, মনটা তখনই আবার একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। পিতার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার যে সে কখনও করিতে পারে, ইহা একদিন তাহার ধারণারও অতীত ছিল, কিন্তু আজ সত্যই তাহা ঘটিয়া গেল। হয়ত ঘটনাটা এতটা বিশ্রী রূপ ধারণ করিত না, যদি বিমাতা আসিয়া সেখানে ঐ রূঢ় কথাগুলি না বলিতেন! যাক্, সে যা হইবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার এরূপ ভাবে, পিতার কাছে ভাল করিয়া অনুমতি না লইয়া

একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসাটা কি সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে? না হয় সে স্বামীজির কাছে না-ই যাইত,—হয়ত পিতা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইতেন, ক্রুদ্ধ হইতেন, তবুও হয়ত সে পরে তাহার মনোভাবটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেও পারিত, কিন্তু—কে এই স্বামীজি, যাহার জন্য পিতার সঙ্গে সে বিরোধের সৃষ্টি করিল! পানুর অনুতপ্ত মন নানা ভাবে নানা রকমে পিতার অজস্র স্নেহধারার কথা স্মরণ করিয়া, বেদনাতুর হইয়া রহিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, পানু শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে করিতে, সহসা তাহার আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। পুকুরের পাড় দিয়া বহির্ব্বাটি অতিক্রম করিয়া যখন সে দ্রুতপদে বাহিরের পথের দিকে আসিতেছিল, তখন বাগানের এক প্রান্তে একটা দেবদারু গাছের শীতল ছায়ায় একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিল, স্বামীজির যে সব শিষ্য তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইনিও তাঁহাদেরই একজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাঁহারা সকলেই, ইনিও তাই,—এম-এ পাশ করিবার পর যখন স্কলারসিপ পাইয়া বিলাত যাইবার আসন্ন সম্ভাবনাকে পদদলিত করিয়া ইনি স্বামীজির সঙ্গে চলিয়া আসেন, পিতামাতার তখন দুঃখের আর অন্ত ছিল না,—এ সব কথা জ্যাঠামশায়ের কাছে সে শুনিয়াছে। সকালের কীর্ত্তনের পর দ্বিপ্রহরে যখন ভোগের ব্যবস্থা চলিয়াছে, ইনি তখন নীরবে সরিয়া আসিয়া গাছতলার নির্জ্জন ছায়ায় তাঁহার ধ্যানে বসিয়াছেন। তীব্র আলোকদীপ্ত আকাশের নীচে, প্রকৃতি যেখানে তাহার উদার বক্ষটি বিস্তৃত করিয়া ধরিয়াছে, সেখানে এই তরুণ তাপসের এই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তিটি পানুর চোখে হঠাৎ কি রকম ভাল লাগিয়া গেল, চলিতে চলিতে বারকয়েক ইহাঁর পানে পানু তাকাইয়া তাকাইয়া গেল, ঈষৎ উন্নত মুখখানি, মুদিত চক্ষুদুটির নীচ দিয়া দুটি গাল বাহিয়া ক্ষীণ দুটি জলের রেখা,—কি সুন্দরই লাগিল পানুর চোখে!

পানু ভাবিতে লাগিল এই স্বামীজির এমন সব শিষ্য! কি করিয়া এ রকম হইল? পানুর ভুল হয় নাই ত? পানু অবিচার করে নাই ত? নিশ্চয়ই না, সে যে ভণ্ড লম্পট, পানু তাহা নিজের চোখে দেখিয়াছে। তবু তাহার যে কি একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে মানুষ বশ করিবার, তাহার আর তুলনা নাই, পানু তাহা স্বীকার করিল; ধর্ম্মগুরুর ভাণ করিয়া, নিজে সে পরমহংস সাজিয়া বসিয়াছে সত্য, কিন্তু এতগুলি মানুষ ত সত্য সত্যই ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, সত্য ধর্ম্মের জন্যই পাগল হইয়া উঠিয়াছে। চার পাঁচটি গ্রামের লোক যে কি করিয়া; ইহলোকের সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া, লাভ ক্ষতি ভুলিয়া সেই সত্য পরমব্রহ্মকে লাভ করিবার আশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে, শত্রু মিত্র ভুলিয়া গিয়া সকলে কি করিয়া এক হইয়া গিয়াছে, ইহা ত পানু নিজের চোখেই দেখিয়াছে—সে নিজে যাহাই হউক, এই যে লোকশিক্ষা সে দিতেছে, এই অনাচারে ভরা পৃথিবীর বুকে ইহারই মূল্য কি কম? জাতিকে ধর্ম্মের দিক দিয়াই হৌক বা যে কোন দিক দিয়াই হউক, এই যে শুদ্ধচিত্ত, একতাবদ্ধ করিয়া তোলা ইহাই বা কয়জনে পারে? এই দিক দিয়া জাতির সে পূজ্য এবং পানুরও সে নমস্য! পানুর মন হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। মনে মনে কহিল, থাকুন ওঁরা যতদিন ইচ্ছা আমার বাবার ঘরে, আমার বাবার আশ্রয়ে থাকিয়া যতদিন পারেন, নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম সাধন করিয়া লউন পাড়াগাঁয়ে ঝগড়াঝাটির চেয়ে এ শতগুণে ভাল।

শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ হাওয়া জানালাপথে ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে পানুকে ঘুম পাড়াইয়া দিল।

সকাল বেলা মাতা কন্যা একই সঙ্গে মুখ ধুইয়া আসিয়া দোতলার বারাণ্ডায় চায়ের টেবিলে বসিলেন। ছোকরা চাকরটি একতলা হইতে কেটলী করিয়া জল আনিয়া দিলে মীরা দাঁড়াইয়া চা করিতে লাগিল, মা পানুর ঘরের রুদ্ধ দ্বারের পানে তাকাইয়া কহিলেন, উনি ত মুখ ধুচ্ছেন, এখনই এসে পড়বেন, কিন্তু পানু ত এখনও ওঠে নি, ও উঠলে আবার চা তৈরি করে দিও মীরু।

মীরা ত্বরিত হস্তে রুটিতে মাখন মাখাইতে মাখাইতে হাসিয়া কহিল, দাঁড়াও মা, একটা মজা করছি।

—কি আবার মজা করবি?

দেখ না, কি করে ওর ঘুম ভাঙ্গাই।

বারাণ্ডার দিকে জানালাটার নীচেই পানুর শয্যা এবং সেইদিকে মাথা রাখিয়াই পানু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মীরা পিতার বৈঠকখানা হইতে কলিং-বেলটি আনিয়া মায়ের পানে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে সেই জানালাপথে হাত বাড়াইয়া পানুর কানের কাছে ধরিয়া প্রবল শক্তিতে বোতাম

টিপিতে লাগিল। মা হাসিয়া কহিলেন, থাক থাক হয়েছে, ও তারপর ভয় পেয়ে চমকে-টমকে উঠে একটা অসুখ-টসুক করবেখ'ন, চলে এস।

—না মা, অসুখ হবে কি, এত বেলা অবধি ঘুমুবে কেন। এ তার শাস্তি। দেখ না, এক্ষুণি উঠে পড়বে।

বিনয় বাবু রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে টেবিলের দিকেই আসিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, ও কি হচ্ছে পাগলী?

—কিছু না বাবা, পানুদা ঘুম থেকে উঠতে ভুলে গেছে, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।

বিনয়বাবু হাসি মুখে কহিলেন—তার মানে?

—পানুদা বড্ড সব ভুলে যাচ্ছে আজকাল, বাবা কাল বিছানা আনতে ভুলে গেছে দেশ থেকে, রাত্রে গাড়ী থেকে নামতেও ভুলে গেছল, আজ আবার -

মা কহিলেন, চুপ কর মীরু।

বিনয় বাবু কহিলেন, আহা বলুক বলুক, এই ত ওদের হেসে বেড়াবার সময়। তুমি কি পার এখন ঐ রকম বাজে জিনিষ নিয়ে হেসে সময় নষ্ট করে বেড়াতে?—আমরা কারণে অকারণে ও রকম যদি হাসতে পারতাম, তা হলে আর এ রকম বুড়ো হতাম না শীগগির। হাসিতে আয়ু কত বাড়িয়ে দেয়,—তা জান?

—তা হলে হাস তোমরা বসে বসে, আমি বাপু চা খেয়ে নিয়ে নীচে চলে যাই, বসে বসে খালি হাসলে পেট ত আর ভরবে না।

—আহা বোস বস, এক সঙ্গে চা না খেলে কি আর খেয়ে আরাম হয়?

পানু উঠিয়া দ্বার খুলিলে, মীরা হাসিতে হাসিতে সরিয়া আসিল।

মীরা পেয়ালায় পেয়ালায় চা ঢালিয়া সকলের সম্মুখে আগাইয়া দিলে, চা পান চলিল। মা চা পান করিতে করিতে পানুকে, তাহার গ্রাম এবং পিতা মাতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মীরা মাঝে মাঝে এ কথা সে কথায় যোগ দিতে লাগিল এবং বিনয়বাবু সদ্য আগত খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

তারপর হঠাৎ একবার কাগজখানা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া, পেয়ালায় অবশিষ্ট চা-টুকু শেষ করিয়া কহিলেন—হুঁ,—তারপর, পানু তোমার বাবা তোমার রেজাল্ট শুনে কি বললেন? নিশ্চয় দুঃখিত হলেন খুব! হবারই কথা, তা সে আর বলে কি হবে? তবে এইবারে কলেজে ঢুকে একটু ভাল করে পড়ায় মন দাও দিকি'নি। আই-এ টা খুব ভাল করে পাস করা চাই। বুঝলে ত? কলেজ-টলেজ গুলো খুলছে কবে?—হাঁরে মীরু, খোঁজ-টোজ নিয়েছিস ত?

টেবিলটিকে ঘিরিয়া যে একটি স্নেহোজ্জ্বল কোমল আলো এই গুঞ্জনরত মানুষগুলিকে পরস্পরের নিকটে মধুরতম করিয়া তুলিতেছিল, সহসা তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, পরস্পরকে মানিয়া লইতে স্নেহই যে সংসারে যথেষ্ট নয়, বিচার তার রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া অনুক্ষণই যে স্নেহের উপরে কড়া পাহারা দিয়া ঘুরিতেছে, পানুর চোখে তাহা পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

নীচে মক্কেল আসিয়াছে খবর পাইয়া বিনয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন, পত্নীর পানে তাকাইয়া কহিলেন, ওগো আমায় আজ একটু শীগগির ভাত দিতে বল ত, একটু আগে বেরুতে হবে।

আচ্ছা বাজার কি এল মীরু দেখ ত।

—না মা আসে নি এখনো, বাজার এলে মা আমায় খবর দিও, আমি মাছ কুটব আজ,—চল পানুদা, আমরা লাইব্রেরী থেকে কতগুলো বই বেছে নিই গে

দ্রুত হস্তে মীরা ঠাকুর চাকরদের চা খাবার ঠিক করিয়া দিয়া, চায়ের টিন চিনি সব পাশের মিটসেফটায় তুলিয়া রাখিল, তারপর বাজার আসিয়াছে কিনা আর একবার খোঁজ করিয়া, পাশের ঘরে ঢুকিয়া লাইব্রেরীর চাবী আনিয়া ডাকিল, চল পানুদা নীচে যাই। পানু নীরবে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল।—

[১২]

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে; পানু; মীরা উভয়েই কলেজে ভর্ত্তি হইল, একজন বেথুনে, আর একজন খৃষ্টান মিশনারীদের একটা কলেজে। নূতন বই নূতন খাতা নূতন বন্ধু-বান্ধব, উভয়েরই উৎসাহের আর সীমা রহিল না। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আসিয়া মীরা কহিল, পানুদা এস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, দুজনেই আমরা কেউ কারুর চেয়ে নীচে পড়ে থাকব না,

এমন করে এবার আমরা পড়ব, কেউ যেন কারুককেই না হারাতে পারি, তা হলে সমস্ত ইউনিভারসিটিতে অন্য কেউ আমাদের সঙ্গে পারবে না, আমরা দু জনেই হ'ব ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট।

পানু হাসিল।

আর মাস দুই মন্দ কাটিল না, প্রোফেসারের বক্তৃতা শোনা, নূতন খাতায় নোট লেখা বেশ লাগে, তারপর হইতেই পানুর একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। কবে কোন্‌টা পড়া হইবে, কবে কোন্‌টার নোট লেখা হইবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পানুর ভাল লাগে না। বাড়ীর লাইব্রেরী এবং কলেজের লাইব্রেরী ঘাঁটিয়া একমনে পানু কেবল বই-এর পর বই পড়িয়া শেষ করিয়া চলিল। পাঠ্য-তালিকার ঐ গণ্ডীবদ্ধ কয়েকখানা বহির ভিতর পানুর মন আর আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না, বহির পর বহি খুলিয়া কখনো বিজ্ঞান কখনো ইতিহাস লইয়া, তাহাদেরই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে করিতে মুগ্ধ পানু এমনই তন্ময় হইয়া থাকিত যে, কলেজের ক্লাস বা পড়ার বহিগুলি কোন দিক দিয়াই পানুর মনকে স্পর্শ করিতেও পারিল না।

মাঝে মাঝে মীরা আসিয়া কহিত, পানুদা কি হচ্ছে? জ্ঞানচর্চ্চা?

—হাঁ ভাই, তাই।

টেবিলের উপরে দুই তিনটি বহির পাতা খোলা, এবং কপিং পেন্সিলে তাহাতে অজস্র দাগ কাটা, মীরা একবার সেগুলিতে একটু চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিত, তা জ্ঞানচর্চ্চাটা একটু পরে করলে হবে না? আগে বিদ্যাচর্চ্চাটা করে নাও না।'

পানু হাসিয়া কহিল, বিদ্যাচর্চ্চা এবং জ্ঞানচর্চ্চায় তফাৎ আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই আছে, জ্ঞান আমাদের ঐ উড়ে বামুনটারও থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যা নেই—এবারও হাসিয়া পানু কহিল, তা যদি হয়, তবে দুটোরই চর্চ্চা করবার সময় কই,—বিদ্যায় আমি রস পাই না, আবার এই জ্ঞানচর্চ্চায় এত বেশি সেটা পাই, জ্ঞান-সমুদ্রের রস এত বেশি,— যতই অথই জলে ডুবছি ভাই, তার আর শেষ নেই,—

মীরা গম্ভীর হইয়া খানিকক্ষণ চুপ' করিয়া থাকিল। খানিকক্ষণ বইগুলি নাড়াচাড়া করিয়া কহিল, জীবনটা এত ছোট নয় পানুদা, যদি নষ্ট না কর, এ জীবনটায় বিদ্যা জ্ঞান দুটোই লাভ করা যেতে পারে,—যে যুগের যা;—এ যুগে বিদ্যা না থাকলে আদর নেই ভাই। তোমার কি পড়তে বেশি সময় লাগে? মোটেই না,—যদি পড় মন দিয়ে, ভাল পাস করতে পারবে আমি জানি,—আগে পাশ ক'টা করে নাও না, জ্ঞান চর্চ্চার তোমার তাতে কি বেশি সুবিধে হবে না?

পানু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া হাসিয়া কহিল, চাকুরীর কথা বলেছ?'

একটু থামিয়া পানু আবার বলিল, আজকালকার দিনে চাকুরী আর সম্মান পেতে হলে ল্যাজ থাকা দরকার, সেই ল্যাজটাই আমার নেই, তা নাই বা পেলাম চাকুরী, চাকুরী না হলে কি খাব বলছ? ভগবান যখন প্রাণটা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং ক্ষিধেও রেখেছেন পেটে, তখন এক বিঘৎ ধানের জমিও কোথাও রেখেছেন নিশ্চয়, খাবার ভাবনা কি মীরু,—আর সম্মান? চাষার যে সম্মান, সেই সম্মানেই যথেষ্ট হবে; তার বেশি দরকার কি?

মীরা আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইত। পানুও এদিক ওদিক হাত পা ছড়াইয়া দিয়া চোখ মুদিয়া চেয়ারে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিত। গাল দুটি কুঞ্চিত, বন্ধ চোখ দুটির পাতায় পাতায় গভীর চিন্তার রেখা! কতক্ষণ কাটিয়া গেলে সোজা হইয়া উঠিয়া টেবিলের একপ্রান্ত হইতে কলেজের বইগুলি টানিয়া আনিয়া খুলিয়া বসিত, পাশেই সেই নোটবুক, পাতায় পাতায় তার কত অতি প্রয়োজনীয় লাইনগুলি লাল পেন্সিলে দাগ করা, সেই ক্লাস, সেই পড়া—একঘেয়ে জীবন!—অসম্ভব,—কি বিশ্রীই লাগে এইগুলি, মনটিকে বিরক্ত করিয়া দেয়! পানু জোরে জোরে সব বন্ধ করিয়া টেবিলের এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। তার পর কি ভাবিয়া টেবিলটা হইতে তাহার পরম আদরের বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পা ছড়াইয়া দিয়া চেয়ারটিতে হেলান দিয়া বসিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিত। বাজাইতে বাজাইতে চোখ দুটি কখন আপনি আপনি বন্ধ হইয়া আসিত, প্রায় বিলুপ্তচেতন পানু সুরের পর সুর তুলিয়া রাস্তার লোককে তন্ময় করিয়া দিয়া আকাশ

বাতাস কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কতকক্ষণ ধরিয়া কেবল বাজাই-তেই থাকিত—কতক্ষণ পরে দ্বারে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিত—মীরা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, ওগো সুর-বিলাসী,—সুরের বন্যায় রাস্তার লোক যে সব ভেসে গেল। দয়া করে থামাও এবারে।

—কে, মীরু?

—হাঁ আমি! সময়ের পরওয়ানা নিয়ে এসেছি, দুঃখের সময় ঘনিয়ে এসেছে, ওঠ এবারে,—

পানু উঠিয়া, সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিত, অর্থাৎ কলেজের?

—হ্যাঁ মশাই, ন'টা বাজল, চান করে খেতে এস, শীগ্‌গির করে, আমাদের কলেজে রেখে এসে তারপর বাবাকে নিয়ে গাড়ী কোর্টে যাবে।

—তোমার হয়েছে?

—আমার ত পাঁচ মিনিট, এস শীগ্‌গীর,—

বিনুনীটি সামনে আনিয়া চুল খুলিতে খুলিতে মীরা বাথরুমে গিয়া ঢুকিল, পানু তোয়ালে ধুতি লইয়া নীচের বাথরুমে যাইতে যাইতে শুনিল, কলের জল পতনের উপর দিয়াও মীরার গানের সুর পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে,—

যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, দোতলার বৈঠকখানা ঘরের পিয়ানোর পাশে মীরা গাহিতে বসিয়াছে, এখন আর সকালের সেই বিদ্রোহের ভাব তাহার চোখে মুখে কোথাও নাই, চিরচঞ্চলা চিরকৌতুকময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী মীরা গাহিতেছে,

"কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ,
আমায় নিয়ে যাওরে নদী, সেই সে কন্যার দেশ—

পিয়ানোর পাশে দাঁড়াইয়া, পানু তাহার বাঁশীতে মীরার মিষ্টি গলার সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিয়াছে। বারাণ্ডার জ্যোৎস্না-লোকে প্রতিদিনকার মত বসিয়া আছেন, বিনয়বাবু এবং তাঁহার পত্নী। বিনয়বাবুর সেই হাসিখুসি সদানন্দ মূর্ত্তি এখন আর নাই। নানা দিক দিয়া উন্নতি ও পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেহারা এবং মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন একমাত্র পত্নী কন্যার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলা ছাড়া, অন্য সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে হাসিতে দেখা যায় না। হাইকোর্টের জজিয়তি প্রাপ্তি এবং আরো কতগুলি উপাধিলাভ করিয়া, সংসারটাকেই এখন তিনি অন্য চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহের দাস দাসী, গৃহদ্বারের অনাথ ভিক্ষুক, পথে ভ্রমণরত কলেজের তরুণ ছাত্র—প্রত্যেকের চোখে মুখেই নানারকম কু উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই তিনি দেখিতে পান, এবং এই জন্য প্রতিনিয়তই সতর্কভাবে থাকিতে থাকিতে, প্রকৃতি তাঁহার একান্ত রুক্ষ ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিক পাশের পর হইতে পানুর উপর হইতেও তাঁহার সেই সন্দেহ দৃষ্টি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সে কথা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিলেও, মীরার মা সকলই বুঝিতে পারেন; বুঝিয়াও তিনি চুপ করিয়াই থাকেন।

গান শুনিতে শুনিতে স্বামী স্ত্রীতে মৃদুস্বরে আলাপ হইতেছিল,—

—ওগো, তোমার পানুটির দিকে একটু লক্ষ্য রেখ।

—কেন?

—ও যে কিছু পড়াশুনো করছে, তা'ত আমার মনে হয় না।

—কি আর করব বল, সব ছেলেরই কি আর পড়া হয়, তা ছাড়া ও পড়ে ত।

—পড়ে কি, কি করে, কে জানে।

পত্নী নীরবেই বাগানের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয়বাবু কহিলেন, রাগ করলে নাকি?

—না, রাগ কিসের?

—তোমার মনে মনে একটা আশা ছিল, আমি জানতুম, ছিল কেন, হয়ত এখনো আছে, কিন্তু তা অসম্ভব, বুঝলে?

—কি আশা ছিল? কিসের আশা? কিছু না, কেন তুমি ও সব বলছ?

বিনয়বাবু হাসিলেন। একটু পরে কহিলেন, একটা 'এ্যাট হোম' (At home) দিতে চাই, কি বল?

—তা বেশ ত' কিন্তু হঠাৎ?

—হঠাৎ মানে, বছর খানেক ত দিই নি কিছু, ফ্রেণ্ডরা ধরেছে খুব, আমাদের মিঃ গ্র্যাণ্ট সেদিন বলছিল, তোমাদের বাঙ্গালী রসগোল্লা খাওয়াও, চেম্বারে বসে সেদিন বেয়ারা পাঠিয়ে দশ টাকার রসগোল্লা আনালুম।

—দশ টাকার রসগোল্লা? বল কি! খেলে নাকি সব তোমার ঐ গ্র্যাণ্ট?

—না, না পাগল নাকি! সাত আট জন ছিলুম আমরা, গোটা কয়েক করে তুলে নিলে সবাই, আর সব ত বেয়ারা দারোয়ানদেরই ভোগে গেল।

ঘরের ভিতর গান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মা মুক্তদ্বার পথে দেখিলেন, গান বন্ধ করিয়া উঠিবার মুহূর্ত্তে মীরা দ্রুত হস্তে একটা নাচের গৎ বাজাইতে বাজাইতে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, আর পান্নু ঠক্ ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর বাঁশীটি দিয়া তাল দিতেছে। মা দেখিতে লাগিলেন, দুইটিই সুন্দর, দুইটিই তুলনাহীন!

বাজনা শেষ করিয়া, দু'জনে কথা কহিতে কহিতে একই সঙ্গে বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিল। তারপর একবার এইদিকে একটু তাকাইয়া পান্নু সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল, আর মীরা আসিয়া পিতার চেয়ারের হাতলের উপর বসিল।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে মা ঝি-চাকরদের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন, উহাদের ডাল তরকারী এবং মাছ দেওয়া লইয়া, উড়ে ঠাকুরটি যে একটু গোলমাল করে, মা তাহা জানিতেন, এই সময়টায় মীরা সর্ব্বদাই মাতার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর হইতেই মা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন কোন দিন কন্যার উপরই এই সব কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দেন, মীরা আঁচলে ভাঁড়ারের চাবিটি বাঁধিয়া ছোটখাট একটি গৃহিণীর মতই চাকরদের প্রার্থনামত, কাহাকেও একটু দই, কাহাকেও একটু তেঁতুল চিনি, কাহাকেও বা আর কিছু দিয়া, ভাঁড়ার বন্ধ করিয়া, ছোট শিশুটির মত প্রায় নাচিতে নাচিতেই উপরে উঠিয়া যায়। তারপর কোন কোন দিন, পড়িতে যেদিন আর ভাল লাগে না, মীরা তাহার এসরাজটি লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসে। মীরার বাজনার সুরে অফিসরুমে পিতার কাজের গোলমাল হইয়া যায়, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া, কন্যার পাশের ইজি চেয়ারটীতে বসেন,—সিগারেটের আবেশময় মধুর ধূম, মীরার বাজনার করুণ রাগিণীর সহিত মিশিয়া কখন এক সময় তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। মীরার মা প্রায়ই এ সময়ে, ঘরে বসিয়া তাঁহার সারাদিনের অসমাপ্ত কতকগুলি কাজ সারিয়া রাখেন, আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্র লেখা, বাজারের হিসাব ইত্যাদি সারিয়া, বারাণ্ডায় যখন আসেন, বিনয়বাবু তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া আছেন আর মীরা,—মীরা তাহার সমস্ত চেতনা পুঞ্জীভূত করিয়া, নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে, নিজেরই সুরের জালে যে মায়াপুরী সৃজন করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া সাধনায় মগ্ন!

আজ মা রান্নাঘরের কাজ সমাপ্ত করিয়া, উপরে উঠিয়াই আগে পান্নুর ঘরে গেলেন, টেবিলের উপর পা দুটি তুলিয়া দিয়া, চেয়ারে উপবিষ্ট পান্নু অন্যমনস্কভাবে উর্দ্ধে চাহিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে খোলা একখানি বই, দুই তিনটি খাতা এবং একটি কপিং পেন্সিল। মা ডাকিলেন, পান্নু।

পান্নু চমকিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিতে বসিতে, কহিল, মা!

—হাঁ দেখতে এলাম, তোর জলটল ঠিক করে' দিয়ে গেছে কিনা, বিছান টিছানা পাতা হয়েছে, না তেমনিই রয়েছে। আজ বিকালে এসে দেখে যেতে পারি নি।

কথাটা মিথ্যা, প্রতিদিনকার মত আজও বিকালে আসিয়া মা চাকরদের কাজের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। পান্নু হাসিয়া কহিল, সব ঠিক আছে মা, তুমি শোও গে যাও।

মা গেলেন না, খাটে আসিয়া বসিয়া টেবিলটির পানে তাকাইয়া কহিলেন, হাঁারে পান্নু, টেবিলটাকে এত নোংরা করে রাখিস কেন, বল ত? সকালে গোপাল এসে সব পরিষ্কার করে' গুছিয়ে দিয়ে যায়, এরই মধ্যে এত নোংরা করে ফেলিস?

পান্নু উত্তর দিল না, টেবিলের উপর বই খাতা পেন্সিল, বাঁশী, রুমাল, জুতার বাক্স, অবাক জলপানের ঠোঙা প্রভৃতি মিলিয়া, এ উহার গায়ে পড়িয়া যে বিষম ভিড় জমাইয়া ফেলিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া শুধু হাসিতে লাগিল। উহাদের প্রত্যেকটিরই উপরে তাহার যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং কোনটিকেই যে সে কাছছাড়া করিতে পারে না, মা তাহা কি করিয়া বুঝিবেন?

মা কহিলেন, ওরকম ক'রে বসেছিলি কেন, ঘুম পেয়েছে!

—পেয়েছিল মা, এখন আর নেই।

—ওগুলো কি সব কলেজের বই?

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৫]

স্বর-যন্ত্র

স্বর-যন্ত্র (larynx) বায়ু নালীর ঠিক উপরে অবস্থিত। ইহার উচ্চ ও নিম্নদিক খোলা। নিম্নে ইহা বায়ু নালীর সহিত মিলিত এবং উচ্চে ইহা গুহা-নালীর (pharynx) সহিত মিলিত। ইহার উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং দেখিতে একটি ত্রিভুজাকৃতি বাক্সের মত। ইহার নিম্ন অংশ সরু ও সমগোলাকার, দীর্ঘ, ঘনপদার্থের মত। ইহা কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত। অস্থিগুলি ঝিল্লী-বন্ধনী দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ। বহু পেশীর সাহায্যে সমস্ত স্বর-যন্ত্রকে অথবা ইহার বিশেষ কোমলাস্থিকে নড়ান যায়।

স্বর-যন্ত্রে সর্ব্বসমেত নয়টি কোমলাস্থি আছে। সমস্তগুলি অস্থির বিষয়ে আমাদের বিশেষ করিয়া জানিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থিটির নাম থাইরয়েড্ এবং এই নামের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। ইহা সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। আমরা কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বা স্পর্শ করিলে থাইরয়েডের উদ্গত অংশ বেশ দেখিতে পাই। ইহাকে ডাক্তারি শাস্ত্রে 'পোপাম্ আডামি' বলে। স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের কণ্ঠে ইহা বেশী পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। স্বর-যন্ত্রের উপরাংশে যে ঢাকুনির মত কোমলাস্থিটি থাকে, তাহাকে এপিগ্লটিস্ বলে। এপিগ্লটিসের নীচে এরিটিনয়েড্ নামে এক-জোড়া কোমলাস্থি আছে। স্বর যন্ত্রের উপরের মুখ বন্ধ করিতে ও স্বর-তন্ত্রী-মুখকে সঙ্কুচিত করিতে ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে স্বর-যন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা তিনটি ভাগে বিভক্ত। স্তরে স্তরে দুইটি পর্দ্দা এই বিভাগ করে। উপরের পর্দ্দা দুইটিকে কৃত্রিম স্বর-তন্ত্রী বলে এবং নীচের পর্দ্দা দুইটি আসল স্বর-তন্ত্রী। উপরের পর্দ্দা দুইটি দ্বারা স্বর-প্রণয়ন হয় না, অথচ ইহাদিগকে দেখিতে স্বর-তন্ত্রীর মত, এই জন্য ইহাদিগকে কৃত্রিম স্বর-তন্ত্রী বলা হয়।

স্বর-যন্ত্রে যে সমস্ত পেশী আছে, তাহাদের সাহায্যে কোমলাস্থিগুলির অবস্থান-ভেদ হওয়ায়, স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ে টান পড়ে এবং উহাদের মধ্যস্থিত ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়। বহির্গামী বায়ু এই পথে বাহির হইবার সময় তন্ত্রীদ্বয়কে আঘাত করে এবং স্বরের উৎপাদন হয়। স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ে যত বেশী টান পড়ে, তত স্বরের গ্রাম উচ্চ হয়। স্বরের গ্রাম যত উচ্চ হয়, সমস্ত স্বর-যন্ত্রটি তত উপরের দিকে উঠে। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ক যখন খুব উচ্চ গ্রামে গান করেন, তখন তাঁহার 'পোপাম্ আডামি' উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে, খালি চোখেও ইহা বেশ দেখা যায়। কথা বলিবার সময় একটু নজর করিলেই অনুভব করা যায় যে, গ্রামের উচ্চতার সহিত স্বর-যন্ত্র উপরের দিকে উঠে। নিম্ন গ্রামে কথা বলিবার সময়, 'খাদে' গান গাহিবার সময়, ইহার ঠিক বিপরীত হয়।

কোন খাদ্যদ্রব্য গিলিবার সময় স্বর-যন্ত্র-মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা দরকার, নতুবা খাদ্যদ্রব্যের সামান্য কণামাত্রও বায়ু নালীতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে। 'বিষম খাওয়া' যাহাকে বলে, তাহা এই ভাবেই হয়।
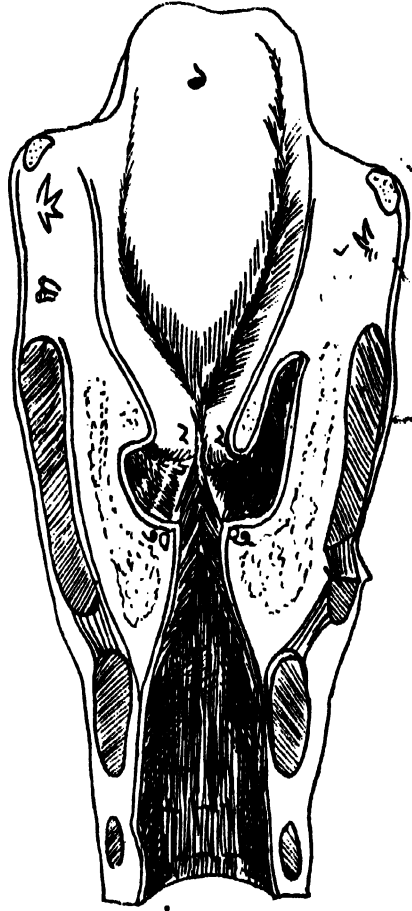
[কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ গুরুপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

(১) এপিগ্লটিশ ; (২) কৃত্রিম স্বর-তন্ত্রী ; (৩) স্বর-তন্ত্রী।

গিলিবার সময়, এরিটিনয়েড দুইটি পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগিয়া যায় এবং এপিগ্লটিসের উপর হেলিয়া পড়িয়া স্বর-যন্ত্রের মুখ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেয়।

মানুষ মাত্রেরই গলার স্বরের পার্থক্য আছে। একই রকম স্বর-যুক্ত মানুষ দুইটি পাওয়া যায় না ; কিছু তফাৎ থাকিবেই। ইহার কারণ, এক জনের স্বর-যন্ত্রের আকার অপরের স্বর-যন্ত্রের আকার হইতে ভিন্ন। কিন্তু

ইহা এত সূক্ষ্ম যে, মানুষের প্রস্তুত কোন মাপ-কাঠিতে তাহা ধরা পড়ে না। এইজন্য কেহ কথা বলিলে, তাহাকে না দেখিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, অমুক কথা বলিতেছে। প্রত্যেক লোকের কথার স্বরেই একটা বিশিষ্ট ভাব আছে, যাহাকে ইংরাজিতে 'টিম্বার' বলে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব 'টিম্বার' লইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই 'টিম্বার' বদ্‌লাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই।
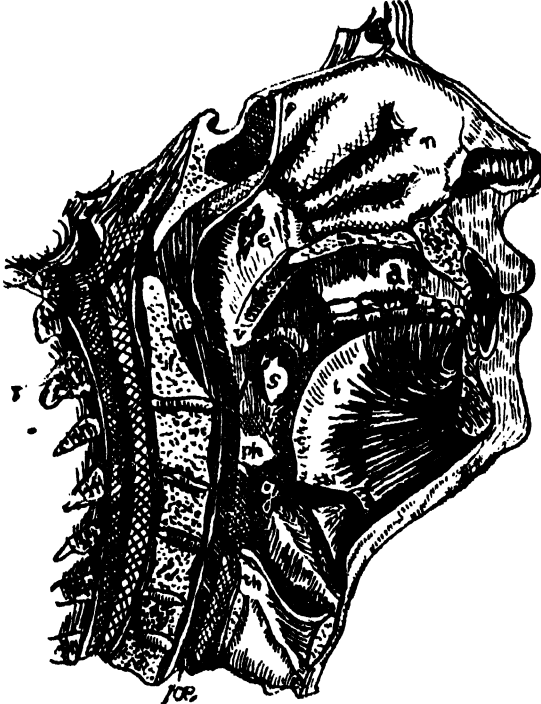
[কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ গুরুপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

n—নাসিকা পথ ; v—কোমল তালু ; s—টন্‌সিল ; t—জিহ্বা ; ph—গুহানালী ; g—এপিগ্লটিশ ; th—থাইরয়েড ; œ অন্ন-নালী।

মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষের স্বর-যন্ত্র সব দিক দিয়াই আকারে বড়, স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ও অপেক্ষাকৃত লম্বা ও পুরু। এই জন্য পুরুষের গলার স্বর মেয়েদের গলার স্বর অপেক্ষা নিম্ন-গ্রামস্থ ও গভীর।

কৈশোরের প্রারম্ভে শরীরের বৃদ্ধি অতি দ্রুত হইতে থাকে। এই সময়ে স্বর-যন্ত্রও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেক সময় এই বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে, গলার স্বর কর্কশ হইয়া পড়ে, যাহাকে আমরা 'বয়স-ধরা-গলা' বলি। যাহারা শুনিতে পায়, তাহারা নিজেরাই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে। কিন্তু বধির বালকের এই সুবিধা থাকে না। সে বুঝিতে পারে না যে, তাহার স্বর কর্কশ হইতেছে। এই সময়ে মূক-বধিরদিগের শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন হয় ; কারণ, একবার স্বর নষ্ট হইয়া গেলে, আর তাহা সংশোধন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মেয়েদের স্বর-যন্ত্রের বৃদ্ধি এত দ্রুত ও এত বেশী হয় না। এই জন্য তাহাদের মধ্যে বয়সের সহিত গলার স্বরের বিশেষ বিকৃতিও শুনিতে পাওয়া যায় না।

স্বর-যন্ত্র বাঁশী ও তারের যন্ত্রের সংমিশ্রণ। সমস্ত স্বর-যন্ত্রটি বাঁশী এবং স্বর-তন্ত্রীদ্বয় তারের যন্ত্রের তার। বাঁশী ও তারের যন্ত্রে শব্দের গ্রামের উচ্চাবচতা যে যে নিয়মের উপর নির্ভর করে, স্বর-যন্ত্র সেই সমস্ত নিয়মগুলি মানিয়া চলে। তন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনের অনুপাতে স্বরের গ্রাম নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত স্বর-যন্ত্রের অবস্থানের জন্য সমস্ত পথটির সঙ্কোচনের উপরও নির্ভর করে।

গুহানালী

স্বর-যন্ত্রের উপরে ও মুখ-গহ্বরের পিছনের স্থানকে গুহানালী বলে। সম্মুখদিকে ইহা আল্‌জিহ্বা ও জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ দ্বারা আংশিকভাবে বদ্ধ এবং পিছনের দিকে মেরুদণ্ডের অস্থিদ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ। ইহার আকারের কোন স্থিরতা নাই। কোমল তালু ও জিহ্বার গতির জন্য এবং ইহার নিজের দুই ধারের সঙ্কোচন করিবার শক্তির জন্য, ইহার গহ্বরকে ইচ্ছানুযায়ী ছোট বড় করা যাইতে পারে।

গুহানালীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়,—naso-pharynx, oro-pharynx ও laryngo-pharynx। নাসিকা-পথ গুহানালীর যে স্থানে আসিয়া পতিত হইয়াছে তাহাকে naso-pharynx বলে। মুখ-গহ্বরের ঠিক পিছনের স্থানকে oro-pharynx এবং স্বরযন্ত্র ও অন্ন-নালীর মধ্যস্থিত স্থানকে laryngo-pharynx বলে।

স্বর গুহানালীর গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাহির হয়। এইজন্য ইহার অবস্থান ও আকার স্বরের গ্রাম ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে শাসন করে। ইহার দেয়ালগুলিকে কথা বলিবার সময় অত্যন্ত শক্ত করিয়া রাখিলে, কথা শুনিতে অত্যন্ত কর্কশ হয়।

তালু

মুখ-গহ্বরের উপরের ছাদকে তালু বলে। সম্মুখ দিকে, অর্দ্ধেকের বেশী অংশ, ইহা শক্ত, হাড়-নির্ম্মিত। পিছনের অংশে কোন হাড় নাই। এই অংশকে কোমল-তালু বলে। আল্‌জিহ্বা ইহার শেষে লেজের মত ঝুলিয়া থাকে। যখন আমরা কোন আনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করি, তখন ইহা নীচের দিকে ঝুলিয়া নাসিকা-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং স্বর নাসিকা-পথে বাহির হইয়া যায়। যখন নাসিকা-পথ বন্ধ করা দরকার হয়, তখন ইহা উপরের দিকে উঠিয়া নাসিকা-পথকে ঢাক্‌নির মত ঢাকা দিয়া রাখে। সাধারণতঃ, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সময়, ইহা ঝুলিয়া পড়িয়া থাকে।

এইগুলি ছাড়া, কথা বলিতে, জিহ্বা, দাঁত ও ওষ্ঠদ্বয়েরও বিশেষ প্রয়োজন হয়।

কথা বলিবার সময় বায়ু যখন ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হয়, তখন উহা কি কি অবস্থার ভিতর দিয়া যায় তাহা দেখা যাউক। যদি স্বর-তন্ত্রী-মুখ উন্মুক্ত থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার শব্দের উৎপাদন হইতে পারে না। স্বরহীন

বায়ু গুহানালীর ভিতর দিয়া মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করে এবং এইখানে জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠদ্বারা উহার সহজ গতি রুদ্ধ হয়। ইহার ফলে যে যে শব্দ আমরা শুনিতে পাই, তাহাই হইল স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণের মূল উচ্চারণ। বায়ু বাহিরে আসিবার সময় যদি স্বর-যন্ত্রে স্বরের উৎপাদন করিয়া মুখ-গহ্বরে আসিয়া পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন যে যে উচ্চারণগুলি আমরা শুনিতে পাই, তাহা হইল স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের মূল উচ্চারণ। স্বর নাসিকা-পথে বাহির হইলে, আনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ শুনিতে পাই। 'ম্' উচ্চারণ করিবার সময় মুখ-গহ্বর ওষ্ঠদ্বারা, 'ন্' উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বাগ্র ও উপরের দন্তদ্বারা, 'ণ্' উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বাগ্র ও তালুদ্বারা, এবং 'ঙ্' উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ ও কোমল তালুর দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে স্বর বাহির হইবার সময় মুখ-গহ্বরে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় না। বিভিন্ন স্বরবর্ণের উচ্চারণ নির্ভর করে মুখ-গহ্বরের আকারের উপর। মুখ-গহ্বরের হ্রাস ও বৃদ্ধি উৎপন্ন করে জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থান। উদাহরণ স্বরূপ 'উ' ও 'ঈ'কে লওয়া যাউক। 'উ' উচ্চারণ করিবার সময়, জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ একটু বাঁকিয়া উপরে উঠে, জিহ্বাগ্র নীচু হইয়া থাকে, ওষ্ঠদ্বয় একটু গোল হয়। 'ঈ' উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার সম্মুখ অংশ সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ স্থানে থাকে। স্বর জিহ্বা ও তালুর মধ্যস্থ গহ্বর দিয়া বাহির হয়। মুখ-গহ্বরের এই পরিবর্ত্তন না হইলে কিছুতেই 'উ' বা 'ঈ'র উচ্চারণ হইবে না।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে, কি উপায়ে মূক-বধির শিশুকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উনপঞ্চাশী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ নহে যক্ষ-বধূর বিরহমথিত দীরঘশ্বাস
রামগিরিশিরে বধূর বেদনা মাখানো পরাণ ত্রাস !
অণু পরমাণু নীহারিকাদল কেঁদে ওঠে তারা সব,
ময়ূর ময়ূরী তবুও থামে না, তুলিতেছে কেকারব।
ওরা তো বুঝে না যে মেঘ জমেছে—নহে শ্রাবণের মেঘ,
মহাসিন্ধুর হৃদয়ে জাগায় উনপঞ্চাশী বেগ !

ওরাতো বুঝে না যে মেঘ জমেছে রুদ্র তাহাতে নাচে,
আগুন ঝলকে দধীচির দেওয়া বৃত্রবধের বাজে।
হর হর রব গগনে গরজে শুনিয়া শঙ্কা পাই,
আপনার হাতে রচিত কুঞ্জ হয়ে যাবে বুঝি ছাই।
বিপুল ঝঞ্ঝা এসেছে এবার মেঘের মমতা ঢাকি,
বিজলী চমকে কম্পিত ধরা, নীড়-হারা বনপাখী।

ধিকি ধিকি জ্বলে শ্মশানে শ্মশানে শত শত নর-চিতা,
পীড়িত ভুবন ভগ্নকণ্ঠে করুণ অশ্রুগীতা।
বিলাস-প্রাসাদ, পর্ণকুটীর কীর্ত্তি-সৌধ যত,
ধ্বান্ত তিমিরে কালের ত্রিশূলে নিমিষেই হবে হত।
তীর্থ-পথিক দূর হ'তে আসি মন্দির নাহি পায়,
তীর্থ-শিলার বিরাট সমাধি—তারি পানে বৃথা চায়।

অতীত-মধুর হারানো দিনের পড়ে আছে পদচিন্,
তাহারি উপরে শবাসনে আজি বহ্নি যে সমাসীন !
প্রভাতের নাহি জাগরণ-রেখা, নিরাশা আঁধারে নিশা,
লেলিহ-জিহ্ব বাসুকী-ফণায় মূর্ত্ত প্রলয়-তৃষা।
ধ্যান-প্রশান্ত মহাহিমগিরি ধরণীর আদিঋষি
শিহরিয়া কাঁপে আর্ত্তনাদের ব্যথা শুনে দশদিশি।

জ্ঞানের প্রতাপে ভুবন-বিজয়ী মানব শক্তিধর,
বিধাতার সাথে করি অভিযান কাঁপিতেছে থর থর।
বুঝে নাই সেতো এক লহমায় ছারেখারে যাবে সব
হিরণ-গর্ভ পরমপুরুষ করিলে শঙ্খরব !
মানব এনেছে সুখের স্বরগে দুখের অগ্নি-শিখা
মুছিতে চেয়েছে আপনার বলে নির্ম্মম বিধিলিখা।

দোষী তো মানব ?—ঈশ্বর-দ্রোহী কহে তাই মহাকা
নবশতাব্দী বক্ষে এবার রবে শুধু কঙ্কাল।
এই যে যুগের মহাবিপ্লব দেবতার নাম ভুলি,
ইহা কি কারণে অকারণ মরে নিরীহ পরাণগুলি।
বৈদিক যুগ হয়তো ফিরিয়া আসিবে প্রলয়পরে,
স্বস্তিবাচন করিবে স্রষ্টা মহামানবের তরে।

ক্ষমা

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১

শেষ অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ। মধ্যাহ্নের পর হইতেই রৌদ্রের তেজ দ্রুত হ্রাস পাইয়া তাপবিহীন আলোকমাত্র বিতরণ করিতেছে। বাতাসে শীতের স্পর্শ অনুভূত হয়। সুধাকর তাহার শয়নকক্ষে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। খাটের পার্শ্বে একখানা ছোট টি-টেবলের উপর কাচের গ্লাসে জল—তাহাতে বরফ দেওয়া হইয়াছিল, তাই গ্লাসের গাত্র বহিয়া সঞ্চিত বাষ্প জলধারায় নামিয়া আসিতেছে, একটা ছোট শিশিতে এ্যাসপিরিন ঔষধের চাকৃতী ও একখানা তোয়ালে। তাহার পর একখানা টুলের উপর একটা চিলিমচি ও নিম্নে একটা পিতলের জাগে জল। উপরে বৈদ্যুতিক পাখা মৃদু-বেগে ঘুরিতেছে। সুধাকর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিল—এক বার চাহিয়া দেখিল, ঘড়ীতে সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে।

ঘরে আর কেহ ছিল না। কেবল পৌত্রী কণা এক এক বার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেছিল। পাঁচ বৎসরের এই নাতিনীটি সুধাকরের একমাত্র পুত্র সুধীরের প্রথম সন্তান—তাহার বড় আদরের। রোগী দেখিয়া মধ্যাহ্নে গৃহে ফিরিয়াই সুধাকর ডাকে—"দাদু!" সেই যে কণা তাহাকে অধিকার করিয়া বসে, আর অপরাহ্নে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়ে না। যেদিনই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সেদিন কণার মনে যেন সুখ থাকে না। মধ্যে মধ্যে যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সে সুধাকরের শিরঃপীড়ার জন্য। এই শিরঃপীড়া সুধাকর তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে গৃহ ও লক্ষাধিক টাকার সঙ্গে পাইয়াছিল। অক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য সুধাকরের দেহে এই পীড়ার আক্রমণ সর্ব্বদাই অতর্কিত ও অপ্রকাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। যৌবনে ইহা তাহাকে "পাইয়া বসিয়াছিল"—এখন প্রৌঢ়াবস্থায়ও ত্যাগ করে নাই—যখন তখন আবির্ভূত হয়। আজ একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার ছিল কাযেই শরীর একটু অসুস্থ বোধ করিলেও সে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ব্যবসা অনেক সময় মানুষকে যত পরাধীন করে, তত আর কিছুতেই নহে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকিলে ডাক্তার রোগীর, উকীল মক্কেলের, সম্পাদক সংবাদপত্রের কায হাতে লইলে আর আপনার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিতে পারেন না। রোগীর বাড়ীতে যাইয়া সুধাকর দেখে, তাহার সঙ্গে যে বিশেষজ্ঞ "অস্ত্র করিবেন" কথা ছিল, তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আসিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহাকেই এক জন সহকারী লইয়া "অস্ত্র করিতে" হইয়াছে। সেই কাজের গুরু শ্রম তাহার অসুস্থতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং সে দারুণ মাথাধরা লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে—সে প্রবল বিবমিষা ভোগ করিয়াছে—কিছু আহার করে নাই। শেষে কয় বার চেষ্টার পরে এক বার বমি করিয়া ও গরম জলে "ফুটবাথ" লইয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া আছে; নাতিনীকে লইয়াও একটু আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। এখন সে ঘড়ী দেখিল—বেলা পাঁচটায় তাহাকে আর একটি রোগী দেখিতে যাইতে হইবে।

কণাকে দেখিয়া সুধাকর জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, তোমার দিদা কোথায়?"

কণা বলিল, "সামনে বারান্দায়; মেজ দিদার সঙ্গে কথা কইছেন।" মেজদিদা সুধাকরের পত্নী করুণাময়ীর মেজদিদি।

"ভাইটি কোথায়?"

"দিদার কাছে।"

বারান্দায় করুণাময়ীর মেজদিদি ঘরের মধ্যে নাতিনী-ঠাকুর্দ্দা-সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি ভগিনীকে বলিলেন, "তোর কথা জিজ্ঞাসা করছে—যা।"

করুণাময়ী বয়সের তুলনায় অধিক "প্রবীণা" হইয়াছিল। সে চওড়া লালপাড় কাপড়ই পরিত, জামা যদি কখনো ব্যবহার করিত তবে সে সাদা কাপড়ের, স্বামীকে দেখিবার ভার প্রায় ত্যাগ করিয়াছিল। সে বলিল, "কেন?"

"অসুখ করেছে। তুই যা। আমি বৌয়ের চুল বেঁধে দেব।"

"কেন বল, মেজদি! ইচ্ছাটা, আমি কাছে বসে থাকি। আমি কি এখনও ক'ণে বৌটি আছি? লজ্জা করে না?"

"তাই বলে' অসুখে সেবা করবি নি?"

"এ অসুখ ত চার কালই আছে—সেবায় ওঁর কি হ'বে, মেজদি?"

"তোকে ত আর কেউ ডাক্তারী করতে বলছে না—সেবা করবার কথা করবি নি?"

করুণাময়ী কি বলিল, সুধাকর শুনিতে পাইল না; কারণ, সেই সময় কণার ভাইটি একটা কি জিনিষ চাহিল—"দাও, না!" করুণাময়ী বলিল, "দিচ্ছি, দাদা, দিচ্ছি।"

আঙুলের ডগায় মাংসের মধ্যে যদি গোলাপ ফুলের কাঁটা বিঁধিয়া থাকে তবে সামান্য স্পর্শেও যেমন খচ্ করিয়া উঠে, করুণাময়ীর কথা সুধাকরের বুকের মধ্যে তেমনই যেন খচ্ করিয়া উঠিল—ব্যর্থ আশার কাঁটা তথায় প্রবিষ্ট হইয়াই ছিল। আজ পঞ্চাশ বৎসরের কূলে দাঁড়াইয়া তাহার যৌবনের কথা মনে পড়িল। তখন তাহার শিরঃপীড়ার আক্রমণ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইত—করুণাময়ী। তখন করুণাময়ীর ব্যবহারে মনে হইত—কেমন করিয়া সে স্বামীর দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিবে, সে কেবল তাহাই ভাবিতেছে, তাহারই উপায় সন্ধান করিতেছে। সে সময় এক এক দিন দারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর ঘুমাইয়া পড়িলে নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিয়াছে, করুণাময়ী তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। আর আজ? আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে করুণাময়ী তাহার রোগ-যন্ত্রণায় বিরক্তি অনুভব করিতেছে—বলিতেছে, "এ অসুখ ত চার কালই আছে"—ইহার জন্য আবার ব্যাকুলতা কেন—শুশ্রূষার প্রয়োজন কি? তাহার মনে পড়িল:—

> "যদুপতি, মথুরায় কি আছে তোমার:
> উত্তর কোশল কোথা, রঘুপতি, আর?"

কিন্তু—কিন্তু কেন এমন হয়? ভালবাসা—প্রেম যদি এক বার উৎপন্ন হয়, তবে কি তাহার বিলয় বা বিকৃতি সম্ভব? তাহার ত তাহা মনে হয় না। তবে? তবে যাহা দর্শনেরও স্বপ্নাতীত, তাহাও ত ঘটিয়া থাকে, বা ঘটিতে পারে। জীবনে যে মনোভাবের এমন পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে না, আপনি অনুভব করিতেও পারে না। কিন্তু করুণাময়ীতে সে সেই পরিবর্ত্তনই প্রত্যক্ষ করিতেছে; প্রত্যক্ষ করিতেছে, আর তাহার বুকের মধ্যে কেবল যাতনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে ব্যথিত করিতেছে। ত্রিশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্ত্তন হয়—জীবনের লক্ষ্য এত পরিবর্ত্তিত হয়—সুখদুঃখের আদর্শ এত ভিন্ন রূপ ধারণ করে! আজ সে সংসারে থাকিয়াও এত দূরে যাইয়া পড়িয়াছে! অথচ সে আপনার মনে কোনরূপ দূরত্ব অনুভব করিতে পারিতেছে না!

আজ করুণাময়ীর কাছে স্বামী আর কেহই নহে—আর সংসার—পুত্রপৌত্রাদিই চিন্তার ও মনোযোগের কেন্দ্র! ভাবিয়া সুধাকর আপনার মনে আপনি হাসিল সে কি শেষে তাহার "দাওদের" ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিবে? সে আবার ঘড়ীর দিকে চাহিল—চারটা বাজিয়া গিয়াছে। সে ডাকিল, "দাদু!"

কণা, বোধ হয়, দাদুর ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াই ছিল—সে আসিয়া সুধাকরের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল।

সুধাকর বলিল, "আজ আর গল্প হল না।"

কণা বলিল, "না, দাদু, তোমার যে অসুখ করেছে।"

সুধাকর আদর করিয়া তাহার কপোলে করতল স্পর্শ করিল; বলিল, "দাদু এক বার দীনকে ডাক ত'।"

কণা চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য দীননাথ আসিয়া দর্শন দিল। সুধাকর তাহাকে বলিল, "গাড়ী বার করতে বল।" ভৃত্য চলিয়া গেল।

সুধাকর উঠিয়া বসিল—তখনও মাথার যন্ত্রণা। শিশি হইতে দুইটা এ্যাস্পিরিনের চাকতী লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল ও পরে জল লইয়া গিলিয়া ফেলিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। চুলটা আঁচড়াইয়া পঞ্জাবী জামা পরিয়া—জুতা পায় দিয়া তুষের গায়ের কাপড়খানা লইয়া সে বাহির হইল। দীননাথ তাহার পশ্চাতে চলিল।

সুধাকর কণার কাছেই শুনিয়াছিল, করুণাময়ীর মেজদিদি আসিয়াছেন; তাহার পর সে ঘর হইতে তাঁহার কথাও শুনিয়াছিল—বাহির হইয়া তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া নমস্কার করিল। তিনি অভ্যাসবশে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ ত?"

কুশলপ্রশ্ন শুনিয়া সুধাকর একটু হাসিল—বলিল, "দেখতেই পাচ্ছেন।"

তিনি বলিলেন, "আজ মাথাটা খুব ধরেছে ?"

"এ অসুখ ত চার কালই আছে"—বলিয়া সুধাকর করুণাময়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি রাত্তিরেও কিছু খা'ব না।"

সুধাকর নামিয়া গেল।

করুণাময়ীর দিদি বলিলেন, "দিনে উপোস গেছে, রাত্তিরেও উপোস ?"

করুণাময়ী বলিল, "বেশী মাথা ধরলে, তাই ত করতে হয়।"

সুধাকরের মোটর গাড়ী চলিয়া গেল—তাহার শব্দ শুনা গেল।

[২]

সুধাকর বাহির হইয়া যাইবার প্রায় পনের মিনিট পরে সুধীর আফিস হইতে ফিরিয়া আসিল। সে এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক এটর্ণীর আফিসে অংশীদার হইয়াছে।

ছেলের সাড়া পাইয়াই করুণাময়ী বধূকে বলিলেন, "যাও, বৌমা, সুধীর এসেছে।" বধূ অরুণার উপর করুণাময়ীর আদেশ ছিল, সুধীর বাড়ীতে ফিরিলেই সে তাহার ঘরে যাইবে। অরুণা ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া ঘরে গেল। কণা মা'র সঙ্গে গেল।

চাকর তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিতেছিল, এমন সময় মা ও মেয়ে ঘরে ঢুকিলে সুধীর কণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি গল্প শুনলে, কণা ?"

কণা গম্ভীরভাবে বলিল, "আজ গল্প হয় নি।"

"কেন ?"

"দাদুর অসুখ।"

সুধীর ততক্ষণে কোটটা খুলিয়া ফেলিয়াছে, সার্ট খুলিতে খুলিতে অরুণার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার অসুখ করেছে ?"

অরুণা উত্তর দিল, "হাঁ। মাথার অসুখ।"

চিন্তিত ভাবে সুধীর বলিল, "শীত পড়ল, এখনও ঘন ঘন মাথার অসুখ হ'তে লাগল ?"

সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া কণাকে বলিল, "চল দাদুকে দেখে আসি।"

অরুণা বলিল, "বাবা বেরিয়ে গেছেন।"

"বেরিয়ে গেছেন !"—সুধীরের স্বর বিস্ময়বিজড়িত।

"—মাথা ধরা ছেড়ে গেছে ?"

"তা' ঠিক বলতে পারি না।"

"তুমি কাছে ছিলে না ?"

অপরাধী যে ভাবে দোষ স্বীকার করিয়া আপনার কাযের সমর্থনচেষ্টা করে, অরুণা সেই ভাবে বলিল, "না। বাবার ফিরতে দেরী হয়েছিল। খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে যা'ব, এমন সময় মেজ মাসীমা এসে পড়লেন- মা ডাকলেন—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অধীরভাবে সুধীর বলিল, "আমি তোমাকে এক শ' বার বলেছি, তুমি কা'রও কথা শুনবে না, বাবার অসুখ হ'লে তাঁ'র কাছে থাকবে।"

অরুণা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুধীর পিতার ঘরের দিকে চলিল। বারান্দায় করুণাময়ী তখনও তাহার মেজ দিদির সঙ্গে নানা কথায় ব্যস্ত ছিল। সুধীর তথায় যাইয়া একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "বাবার অসুখ—তবু তিনি বেরুলেন !"

পুত্রের কণ্ঠস্বরে করুণাময়ী তাহার ক্রোধ বুঝিতে পারিল, এই ক্রোধ সে পিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিল। সুধাকরও ক্রোধপ্রবণ ছিল, কিন্তু বিশেষ চেষ্টায় ক্রোধ সংযত করিয়াছিল। যুবক সুধীর তাহা করে নাই। করুণাময়ী বলিল, "জানিস ত কি মনিষ্যি—দু' দণ্ড কি চুপ করে থাকতে পারেন ?"

"তিনি ত চুপ করে থাকতে পারেন না ; কিন্তু কেউ কি তাঁ'কে চুপ করে থাকতে বলে ? কেউ কি তাঁ'কে বেরুতে বারণ করেছিল ?"

করুণাময়ী কিছু বলিতে পারিল না।

সুধীর তিরস্কারের ভাবে বলিল, "তাঁ'র অসুখ হ'লে, আমি বাড়ী না থাকলে, কেউ তাঁ'র একটু সেবাও করে না।"

করুণাময়ীর স্বামীর প্রতি ব্যবহার তাহার মেজ দিদির ভাল লাগে নাই, তবুও মাতাপুত্রের এই কথাকাটাকাটিকে তিনি ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্যই বলিলেন, "সেবা যে উনি চা'নও না।"

সুধীরের উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি মাসীমা'র মুখে স্থাপিত হইল। সে বলিল, "মাসীমা, সেই জন্যই তাঁ'র সেবা করা আরও বেশী দরকার। এই যে অসুখ নিয়েও টাকার জন্য বেরুলেন—এ ত আমাদেরই জন্য।"

"তোর কি টাকার অভাব আছে?"

"মাসীমা, সেই জন্যই আমার বেশী কষ্ট হয়—বেশী লজ্জা হয়। তাঁ'র বাবা তাঁ'কে যা' দিয়ে গেছেন, সে টাকা, আর তা'র উপর আরও টাকা আমার জন্য রেখেও বাবার তৃপ্তি হচ্ছে না। আগে বললে বলতেন, আমার কথা; এখন আবার আমার ছেলেমেয়ের জন্য ভাবেন। আমি ত দেখছি, মাথার অসুখ বয়সের সঙ্গে, না কমে' বাড়ছে। কোন দিন একটা বিপদ ঘটবে। আবার এখন মধ্যে মধ্যে বলেন, বংশে তিন পুরুষে চারটা আত্মহত্যা হয়েছে।" বলিয়াই সুধীর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুধাকরের নিয়ম ছিল, সে যেসব স্থানে যাইবে তাহা টেবলের উপর দিনপঞ্জীতে টুকিয়া রাখিত, পরে নোটবুকে তুলিত। সে বৈকালে কোথায় কোথায় যাইবে তাহা দেখিয়া সুধীর উপরে আসিল এবং একখানা মোটা চাদর লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

করুণাময়ী পুত্রবধূর উদ্দেশে বলিলেন, "বৌমা, সুধীরের খাবার দাও।"

সুধীর যাইতে যাইতে বলিল, "এখন খাবার সময় হ'বে না।"

"কেন?"

"আমি যাচ্ছি।"

"খেয়ে যা।"

"দেরী হয়ে গেলে বাবাকে ধরতে পারব না।"

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"তিনি শেষে যে রোগীর বাড়ী যা'বেন সেখানে।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তাঁ'কে মাঠের হাওয়ায় একটু ঘুরিয়ে আনব, নইলে এখনই ফিরে আসবেন।"—বলিতে বলিতে সুধীর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

করুণাময়ী বলিলেন, "দেখ দেখি—সারা দিন খেটে এসে মুখে হাতে জল না দিয়েই বেরুল! আর পারি নি বাপু।"

দিদি বলিলেন, "কিন্তু ওদের বাপছেলের ঐ যে সম্বন্ধ, ওটি বরাবর আমার বড় মিষ্টি লাগে। বাপ যেমন ছেলে-অন্ত প্রাণ, ছেলেও তেমনি বাপ-অন্ত প্রাণ। আজকালকার দিনে অমন ছেলে দেখা যায় না।"

"কিন্তু দেখ—না খেয়ে গেল।"

"দেখ্, করুণা, সুধীরকে যাই বলি, দোষ তোর, ছেলে যা' বলেছে, তাই ঠিক। তা'র উপর ঐ যে কি আত্মঘাতের কথা বললে, শুনে আমার গা শিউরে উঠছে।"

যেন তিনি সেই ভাবনাই ভাবিতেছিলেন, এমনই ভাবে করুণাময়ী বলিল, "আর ভাবতে পারিনি, মেজদি! ভেবেই বা কি হবে—অদৃষ্টের বাহিরে ত আর পথ নেই।"

"কিন্তু তাই বলে ত মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি তখন বললাম, 'তুই যা'। তা তুই গেলিনে—শুনলি ত, কেমন ইটটির বদলে পাটকেলটি মেরে গেল, যাবার সময় বলে গেল—অসুখ ত চার কালই আছে। ছেলে ত দেখছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছে। একি ভাল। অমন ছেলে—আহা, বেঁচে থাক; সোণার চাঁদ। তোর বড়দির ছেলের মত নয় যে, এক ব্যঞ্জন—তা-ও লবণে পোড়া।"

করুণাময়ী কতকটা অভিমানের সুরে বলিল, "আচ্ছা, আমার কি অপরাধ। এই বুড়ো বয়সে আমি কি বসে বৌটির মত স্বামীর কাছে বসে থাকব। ছেলে, বৌ, নাতী, নাতনী, সংসার—এসব দেখব না, ঠাকুর দেবতার নাম করব না!"

মেজদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তুই যে সেই কথা মনে করিয়ে দিলি, 'যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?' ছেলে, বৌ, সংসার, ঠাকুরসেবা এ সব সবাই করে। তাই বলে স্বামীর অসুখে সেবা করতে লজ্জা, এ ত নতুন কথা।"

"ও অসুখ, ও ত আর নতুন নয়; ওতে ব্যস্ত হয়েই বা কি ফল?"

মেজ দিদি তিরস্কারের ভাবে বলিলেন, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? অমন কথা মুখে আনতে আছে?" তিনি অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৌমা তোমার শাশুড়ীর মাথা খারাপ হয়েছে, তোমার শ্বশুরকে বলবে, আমি চিকিৎসা করতে বলে গেছি।"

এই সময় দ্বারে মোটরের "ভোঁ" শুনা গেল এবং তাহার পরেই মেজ দিদির মোটর-চালক নিম্ন হইতে বলিল, গাড়ী আসিয়াছে।

মেজ দিদি উঠিলেন; বলিলেন, "আজ আসি।"

করুণাময়ী বলিলেন, "এক্ষুনি যা'বে?"

"হাঁ। তোর জামাই বাবু আফিস থেকে এসেছেন, আর দেরী করতে পারব না। তুই এক দিন বৌমাকে আর ছেলেদের নিয়ে যাস।"

যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "আজ এসে কেবল মনটা ভার করে চললুম, সুধীর না খেয়ে গেল। করুণা, তুই আর অমন করিস নে।"

তিনি অরুণাকে বলিলেন, "আজ আসি, মা।"

অরুণা তাঁহাকে প্রণাম করিল। মা'র প্রণাম করা দেখিয়া কণাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি কণাকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

[৩]

সুধাকর জন্মিয়াছিল—কবির প্রকৃতি লইয়া; সে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল—চিকিৎসকের। যদি ইহা অদৃষ্টের উপহাস হয়, তবে যে অদৃষ্ট এই মর্ম্মান্তিক উপহাস করিয়াছিল, সে তাহার পিতার আকার ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার পিতা সুরনাথ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত পাটের ব্যবসায় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালায় পাটের ব্যবসা বহুলাংশে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর হাতে ছিল—বাঙ্গালার লোক কেবল পাটের চাষ করিয়া এবং পাটপচা জলে পাট কাচিয়া রোগ সঞ্চয় করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইত না, পরন্তু পাট রপ্তানী করিয়া লাভবান হইত;—"মার্কা" তখন বাঙ্গালীর ছিল এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তাহা মাড়োয়ারীকে ভাড়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। রথের দিন "যাত্রা" করিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তখন কয় মাসে পাটে মোটা টাকা লাভ করিতেন।

সুরনাথ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন—টাকা আনা পাই হিসাব করিতেন, আর মনে করিতেন—স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি যে সব কোমল মনোবৃত্তি সংসার রমণীয় ও জীবন বহনীয় করে, ব্যবসায়ীর পক্ষে সে সব অকারণ দৌর্ব্বল্য। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি সে সব মনোবৃত্তি জয় করিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যবহারে তিনি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিতেন। সেটা যে কত ভুল তাহা অদৃষ্ট যখন দারুণ আঘাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তখন সে আর তাঁহাকে সে ভুলের প্রতীকারের অবসর দেয় নাই।

তখন তাঁহার পুত্রত্রয়ের বিবাহ দিয়া তিনি প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ শশধরকে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে লইয়াছেন। ব্যবসায়ে তিনি তাহাকে একটা অংশ দিয়াছেন এবং তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অংশীদারের মত ব্যবহার করিতে হয়। তাহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইয়া পিতৃদত্ত অন্য গৃহে বাস করিতে হয় এবং পিতা তাহাকে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। মধ্যম—সুধাকর। সুধাকর যখন কলেজে পড়ে, তখন এক দিন একখানা বাঙ্গালা মাসিকপত্র ঘটনাক্রমে পথ হারাইয়া রবিবারে সুরনাথের হাতে পড়ে। সেখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তিনি দেখিতে পান, একটি অনতিদীর্ঘ কবিতার নিম্নে লেখকের নাম—শ্রীসুধাকর বসু। তখনই পিতার নিকট সুধাকরের ডাক পড়ে এবং পুত্র আসিলে পিতা কবিতাটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "একি তুমি লিখেছ?" পুত্র "হাঁ" বলিলে, পিতা জিজ্ঞাসা করেন, "কবিতা লিখবার কারণ কি?" পুত্র ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। ফুল ফুটে কেন, পাখী গাহে কেন, বাতাস প্রবাহিত হয় কেন, এ সব প্রশ্নের উত্তর হয় ত বিজ্ঞানের দিক হইতে দেওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ ভাবে দেওয়া যায় না। কাজেই পুত্র নিরুত্তর থাকাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। সুরনাথের পুত্ররা কেহই পিতার নিকট মুখ তুলিয়া অধিক কথা কহিত না—যত অল্প কথায় সম্ভব কায সারিয়া চলিয়া যাইত; তিনিও তাহাই ভালবাসিতেন। সুরনাথ তখন বলেন, "ও সব বাজে কাযে পড়ার ক্ষতি হয়।" পিতার সেই কথায় পুত্রকে কবিতা-রচনা ত্যাগ করিতে হয়; কারণ, পিতাকে লুকাইয়া তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কায করা সুধাকর তাহার লব্ধ শিক্ষার ফলে অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহার পর সুধাকর যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি পড়ব?" তখন সুরনাথ তাহার ভবিষ্যৎ কায স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কবিতা রচনা যে মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাহাকে নষ্ট করিতে হইলে কোন্ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগে

সাফল্য-সম্ভাবনা অধিক, তাহা তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন। মৃত মানবের অস্থিতে কখনো কবিতা-কুসুম বিকশিত হয় না—স্থির বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—সুধাকরকে ডাক্তার করিবেন। সুধাকরের জিজ্ঞাসায় তিনি উত্তর দিলেন, "ডাক্তারী।" সুধাকর ডাক্তারী পড়িতে গেল।

প্রতিভাবান যুবক—ডাক্তারী পাঠ তাহার নিকট যত অপ্রীতিকরই কেন হউক না, কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহাতে মনোনিবেশ করিল এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। যে দিন সে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তাহার পূর্ব্বেই তাহার জন্য রচিত গৃহ তাহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুরনাথ তাহাকে বলিলেন, "তুমি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে 'প্র্যাকটিসের' চেষ্টা কর।" তিনি তাহাতে সস্ত্রীক তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং সে যখন যায় তখন তাহার হাতে মোটা টাকার একখানি "চেক" দিয়া দিলেন। সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিবার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে, দূরস্থ হইলে তাহা আর সেরূপ পূর্ণ থাকে না; যত দিন যায় ব্যবধান তত বৰ্দ্ধিত হয়। সুতরাং শশধর ও সুধাকর দুই জনের ও তাহাদিগের সন্তানদিগের সহিত সুরনাথের ও তাঁহার পত্নীর—হিন্দু পরিবারে এরূপ সম্বন্ধে যে ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক—তাহা আর রহিল না। সুরনাথ তাহাতে বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার পত্নীর পক্ষে বিশেষ বেদনার কারণই হইল—তিনি কেবল উপায়ান্তরবিহীনা হইয়াই তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন।

পিতামাতার নিকট ছিল—কনিষ্ঠ পুত্র জলধর। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তাহার মনীষাই, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর ছিল। সে কখনো কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই—সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সুরনাথ অন্য পুত্র দুইজনকে স্বতন্ত্র ভাবে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলে তাহাদিগের মাতা ইহাকে ও ইহার স্ত্রীকে লইয়াই সেই শূন্য পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া সে সর্ব্বশেষ পরীক্ষা দিল। এই পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, সে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। সে যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিতে পারে ইহা সে কখন কল্পনাও করে নাই। কাযেই পরীক্ষার ফল তাহার কাছে অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাতের মত অনুভূত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল—পরদিন প্রভাতে শয্যায় তাহার শব পাওয়া গেল। সংবাদ পাইয়া সুধাকর ছুটিয়া আসিল—আসিয়া দেখিল, অতি উগ্র বিষসেবনফলে তাহার জীবন বহুক্ষণ পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে।

যে বৃদ্ধ চিকিৎসক সাধারণতঃ সুরনাথের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন এবং পরিবারের ইতিহাস জানিতেন, তিনি কথায় কথায় বলিয়া ফেলিতেন, "তাইত বংশে তিন পুরুষে তিনটা আত্মহত্যা!"

সুরনাথের পত্নী এই শোকে যেন কেমন হইয়া গেলেন—শোকের আতিশয্যে কাঁদিতেও পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন পুত্রশোক সহ্য করিতে হইল না—শোকের আঘাতে দুই মাসের মধ্যে তাঁহার সকল বেদনার অবসান হইল।

সুরনাথ তখন একা। জলধরের মৃত্যুর পর শশধর ও সুধাকর পুরাতন গৃহে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল—তিনি সম্মতি দেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন—যাহারা একবার পৃথক থাকিতে অভ্যস্ত হয়, তাহারা আর কখনো পূর্ব্ববৎ এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, শোকের অগ্নিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবেচনার বিষয় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

মা'র মৃত্যুর পর আর একটা ব্যাপার ঘটিল—জলধরের শ্বশুর আর তাঁহার কন্যাকে তাহার শ্বশুরালয়ে রাখিতে চাহিলেন না। তিনি যখন জিদ করিলেন, সুরনাথ তখন আর আপত্তি করিলেন না। গৃহ যেন শ্মশান হইয়া গেল।

শশধর তখন জিদ করিয়া সপরিবারে পিতার কাছে আসিল। কিন্তু সুরনাথের মনে তখন চিন্তার বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে. বৃদ্ধ চিকিৎসক সে চিন্তার ধারা প্রবাহিত করাইয়া গিয়াছিলেন—পরিবারে তিন পুরুষে তিনটা আত্মহত্যা হইল! ধর্ম্মকে সুরনাথ স্নেহ প্রেম ভালবাসারই মত অকারণ দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক—কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, কেবল কাহারও কায, অন্যের অধিকারসঙ্কোচক না হইলে, তাহাতে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই—এই মত হৃদয়ে পোষণ করায় তিনি কখনো অপরের ধর্ম্মাচরণে বাধা দেন নাই। কাযেই ধর্ম্ম হইতে কোনরূপে শান্তি ও সান্ত্বনালাভের উপায় তাঁহার ছিল না। তিনি কেবলই ভাবিতেন—একা থাকিতে

ভালবাসিতেন। পাটের মরশুম যখন শেষ হইয়া গেল, তখন তাঁহার অবসর আরও বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বাড়িল। যেমন নদী যে দিক দিয়াই কেন প্রবাহিত হউক না, সাগরে যাইয়া পড়ে—তেমনই তাঁহার চিন্তা একই দিকে যাইতে লাগিল; সে চিন্তা যেন তাঁহাকে "পাইয়া বসিল।" তিনি অনিদ্রাকাতর হইলেন—চিকিৎসক ঔষধ দিলেন। এক দিন তিনি সেই ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলেন—পরদিন তাঁহাকে শয্যায় মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল। লোক বলিতে লাগিল—তিনি পুত্রশোক সহ্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু বাড়ীর বৃদ্ধ চিকিৎসক শঙ্কিত হইলেন—ইহা বংশগত বিকৃত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রবৃত্তি প্রবল হইলে মানুষ আর তাহাকে বশে আনিতে পারে না।

ইদানীং সুধাকর সময় সময় বংশের এই অভিসম্পাতের কথা বলিত। তাহাতে সুধীর শঙ্কিত হইত। কারণ, সে জানিত, যে বংশে এরূপ অভিসম্পাত থাকে, সে বংশের কাহারও মনে তাহার কথার উদয়ও বিপদ-সম্ভাবনা সূচিত করে।

[৪]

সুধীর যে পিতার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ, সে যখন রোগীর গৃহে উপস্থিত হয়, তখন সুধাকর তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। শরীরের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে সুধাকরের পক্ষে প্রবল কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই সে দিন তাহাকে ঘরের বাহির করিতে পারিত না; তাই সে যথাসম্ভব শীঘ্র কায সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ব্যর্থমনোরথ সুধীর গৃহে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সুধাকর ফিরিয়া আসিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তখন অগ্রহায়ণের স্বল্পায়ু দিবাভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

সুধীর ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে অরুণা শ্বশুরের কাছে গিয়াছিল; আর কণা তাহার সঙ্গে "দাদুর" ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সুধীরই বলিয়া দিয়াছিল, মাথার অসুখ প্রবল হইলে সুধাকরের মস্তকে করস্পর্শও কষ্টকর হয়, সে সময় তাঁহার পদে হাত বুলাইলে তাহা একটু আরামপ্রদ বোধ হইতে পারে। অরুণা আসিয়া শ্বশুরের পায়ে হাত দিতেই সুধাকর মুদ্রিত চক্ষু মেলিল—জিজ্ঞাসা করিল, "কে,—মা?"

অরুণা উত্তর দিল, "হাঁ, বাবা।"

সুধাকর অরুণাকে কন্যার মতই দেখিত এবং তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিত। অরুণাও তাহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, সে কণাকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্টানুভব করে বলিয়া কখনো অধিক দিন পিত্রালয়ে থাকিত না—প্রায়ই সকালে যাইয়া বৈকালে ফিরিয়া আসিত। মা'র সঙ্গে কণাকে দেখিয়া সুধাকর বলিল, "দাদু তুমি এদিকে এস।"

কণা তাহার পার্শ্বে যাইতেছে এমন সময় সুধীর ঘরে প্রবেশ করিল।

সুধাকর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেড়াতে গিয়েছিলি?"

সুধীর বলিল, "না, বাবা; তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।"

"তোর বাবা কি হারিয়ে গিয়েছিল; আর তুই ভুবন ভ্রমিয়া শেষে বাড়ীতেই তা'কে পেলি?"

"না, বাবা, তোমার সঙ্গে আমার বড় ঝগড়া আছে।"

"আমি যদি ঝগড়া না করি?"

"আমি একাই করব। তুমি অসুখ হলেও বেরোবে—কেন?"

"এই ত এটর্নী হয়েছিস; এখন দেখবি, মক্কেলের কোন বড় মামলা হাতে থাকলে নিজের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করবার সুবিধা থাকবে না; তার সুবিধাটাই আগে দেখতে হ'বে।"

"তাই যদি হয়, তুমি 'প্র্যাকটিস' ছেড়ে দাও।"

সুধাকর হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া সুধীর বুঝিল, কথা কহিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সে বলিল, "আজ আর কোন কথায় কায নাই—তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর। কিন্তু আমি আর কোন কথা শুনব না; তোমাকে বিশ্রাম করতেই হবে।"

"মানুষ কি বিনা কাযে থাকতে পারে?"

"তোমার ঢের কায আছে। তুমি কণার সঙ্গে গল্প করবে।"

সুধাকর কণার ছোট হাতখানি হাতে লইয়া তাহাকে আদর করিতেছিল। সুধীর বলিল, "তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর।" সে আলোর আবরণটা ঘুরাইয়া দিল—ঘর স্বচ্ছান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল। সুধাকর চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার জন্য পুত্রের এই যে উৎকণ্ঠা ইহা যেন মরুভূমিতে স্নিগ্ধ বারিবর্ষণ।

সে নিজে কখনো তাহার পিতার স্নেহের বিকাশ দেখে নাই—সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে পিতার সহিত ব্যবহার করিয়াছে। বুঝি সেই জন্যই পিতার প্রতি ভালবাসা ও পুত্রের প্রতি স্নেহ উভয়ই সে পুত্রকে দিয়াছিল। আর করুণাময়ী স্বামীর নিকট হইতে যত দূরে যাইতেছিল সুধাকর যেন সে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য পুত্রকে তত নিবিড় স্নেহে নিকটে টানিয়া আনিতেছিল। তাহাদিগের পিতাপুত্রে সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনই সুমিষ্ট ছিল; এবং যত দিন যাইতেছিল, তাহা যেন ততই অধিক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

কয় ঘণ্টা ছটফট করিবার পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় সুধাকর ঘুমাইয়া পড়িল। তখন, আলোটি নিবাইয়া দিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

সাধারণতঃ সুনিদ্রার পর সুধাকরের শিরঃপীড়ার আক্রমণ শেষ হইত এবং নূতন আক্রমণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে ভাল থাকিত। আজ কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সুনিদ্রা-সম্ভোগ হইল না; রাত্রি একটা বাজিতে না বাজিতে দ্বারে একখানি মোটর গাড়ী থামিল এবং ব্যস্ত জিজ্ঞাসা শুনা গেল—"ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন?" সঙ্গে সঙ্গে সদর দ্বারের কড়া নাড়া চলিল। ভৃত্য উঠিয়া দ্বার খুলিল। সেই ডাকে ও শব্দে সুধীরের নিদ্রা-ভঙ্গ হইবামাত্র সে শয্যা ত্যাগ করিয়া নামিয়া গেল; উদ্দেশ্য-আগন্তুককে বলিবে, ডাক্তারবাবু অসুস্থ, আজ আর যেন তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। কিন্তু অনিষ্ট যাহা হইবার, তাহা ততক্ষণে হইয়া গিয়াছে; তখন শয্যাত্যাগ করিয়া সুধাকর বারান্দায় আসিয়াছে এবং আগন্তুককে রোগীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে দিন যে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, তাহারই অবস্থা-পরিবর্ত্তনে তাহার স্বজনরা শঙ্কিত হইয়া ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। সুধাকর বলিল, "আমি যাচ্ছি।"

সুধীর পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল; বলিল, "বাবা, আজ তোমার যাওয়া হ'বে না।"

সুধাকর স্নেহস্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "যেতে যে হবেই, বাবা।"

"আর কোন ডাক্তারকে টেলিফোন ক'রে দাও।"

"রোগী আমার—আমি দায়িত্ব নিয়ে 'অস্ত্র করেছি'—এখন ত না গিয়ে পারি না।"

"কিন্তু তুমি নিজে যে রোগী।"

"ডাক্তারকে তা' ভাবতে গেলে চলে না, বাবা।"

সুধাকর জামা পরিয়া গাত্রবস্ত্রখানা জড়াইয়া লইল এবং ষ্টেথস্কোপ ও যন্ত্রের ব্যাগটা লইল। সুধীর ব্যাগটি পিতার হস্ত হইতে লইয়া পিতার সঙ্গে চলিল এবং সুধাকর গাড়ীতে উঠিলে সেও উঠিতে উদ্যত হইল।

সুধাকর বলিল, "তুই কোথায় যা'বি?"

সুধীর বলিল, "তোমার সঙ্গে যাই।"

সুধাকর হাসিয়া বলিল, "পাগল ছেলে! একখানা গা'র কাপড়ও নিস নি; ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হ'বে। তুই যা'। আমি এখনই ফিরে আসছি।"

সুধীর চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ফিরিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

সুধাকর যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই হইল—সে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। রোগীর নিদ্রাভঙ্গে তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার স্বজনগণ শঙ্কিত হইয়াছিল; সুধাকর গিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সুধাকর আসিয়া ধীরে ধীরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে আপনার ঘরে গেল। ইহাই তাহার অভ্যাস—পাছে বাড়ীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই জন্য রাত্রিতে রোগী দেখিয়া আসিলে সে এইরূপে ঘরে আসিত। বিশেষ করুণাময়ীর ব্যবহারে সে বুঝিয়াছিল, সে বাহিরে গেলে সে কখনও তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিবে না।

সুধাকর যথাসম্ভব নিঃশব্দে আসিল বটে, কিন্তু সুধীর তাহা জানিতে পারিয়াছিল।

সুধাকর ঘরে আসিয়া আলোটি নিবাইয়া শয়ন করিতে না করিতে সুধীর আসিয়া তাহার চরণপ্রান্তে খাটের উপর বসিল। সুধাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"—তাহার মনে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা উদিত হইল। সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিতে পারে? করুণাময়ী তাহার জন্য জাগিয়া ছিল—ইহা কি সম্ভব?

সুধীর উত্তর দিল, "আমি, বাবা।"

এই তাহার পুত্র—তাহার একমাত্র সন্তান—যাহাকে সে কোন দিন তিরস্কার করে নাই, কেবল স্নেহ দিয়া "মানুষ" করিয়াছে—ইহার ভালবাসা তাহার অশান্ত জীবনের শান্তি। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সুধাকর বলিল, "আবার উঠে এলি কেন?"

"তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর"—বলিয়া সুধীর পিতার চরণ-তলে হস্ত বুলাইতে লাগিল। শারীরিক স্বস্তি অপেক্ষাও তাহাতে মানসিক স্বস্তি সুধাকর অধিক সম্ভোগ করিতে লাগিল—পুত্রকে বারণ করিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না।

এ বার অল্প সময়ের মধ্যেই সুধাকর ঘুমাইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

চিত্রে রুশবিদ্রোহের ইতিহাস—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডবলক্রাউন ষোল পেজী, ৮৮ পৃঃ। মূল্য ১৷৷০ প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত।

আকার হিসাবে মূল্য অধিক বিবেচিত হয়, কিন্তু বহুপরিমাণ চিত্র সন্নিবেশিত থাকায় ও আর্ট পেপারে মুদ্রিত হওয়ায় মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয় অধিক পড়িয়াছে বুঝিতেছি, তথাপি আমরা ইহার মূল্যহ্রাসের পক্ষপাতী, কারণ ইহার পাঠক কিশোর ও তরুণ ছাত্রদল। রাশিয়া সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলিই সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বীগণ কর্ত্তৃক লিখিত; ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিই যেন বাহাদুরী লইবার জন্য লেখা—পাঠককে রাশিয়ার সত্যকার রূপটুকু দেখাইবার প্রয়াসও নাই, শক্তিও নাই। নিত্য বাবুর লেখার মধ্যে ঐ প্রকার আত্মপ্রকাশের কোন প্রয়াস নাই। তিনি যেন ছাত্রের মন লইয়া রাশিয়াকে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজে তাহার যে রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই সহজ ভাষায় পাঠককে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী বেশ স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, তাহাতে বর্ণনার ঘনঘটা নাই, তরুণ সাহিত্যিকদের মত দুর্বোধ্য প্যাঁচ নাই, এই জন্যই বইখানি পড়িতে ইচ্ছা করে। প্রচুর চিত্রসন্নিবেশে বর্ণনার অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজন হইয়াছে, সংক্ষেপে সকল প্রকার বক্তব্য গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। পুস্তকখানি স্কুলের পারিতোষিক পুস্তক রূপে অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক লাইব্রেরীতে, বিশেষতঃ যেখানে সভ্যবৃন্দের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা অধিক সেখানে ইহা পরম সমাদরে রক্ষিত হওয়া উচিত।

—ঔ

সম-সাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ—প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ। দাম এক টাকা চার আনা।

প্রকাশকগণ সমসাময়িক কবি বলিয়া যাঁহাদের লেখা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চাঙ্গের কবি না হইলেও চলনসই কবিতা লিখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যে সমালোচক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মত বুদ্ধি যে তাঁহাদের, আছে লেখা পড়িয়া তাহা মোটেই মনে হইল না। বালখিল্য 'কবি' বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা' নির্লজ্জ ন্যাকামী এবং অমার্জ্জনীয় আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া এই অহং-দর্পে উদ্ধত কলাকার যোগী যে পরবিলম্বী কৃত্রিম জটাজালের বেণী দোলাইয়াছেন, তাহা সাহিত্যের বাজারে কোন কাজে লাগিবে না। দশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি কেমন সমঝদার ছিলেন, কেমন লিখনদার ছিলেন, কত অজস্র কবিতা লিখিয়াছিলেন—প্রবন্ধে এই সব নিজের কথাই ষোল কাহন গাহিয়াছেন।

বইখানার প্রায় প্রবন্ধই ঐ এক ছাঁচে ঢালা। হেমেন্দ্রকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় মুরুব্বিয়ানা করিতে গিয়া নিজের গান থিয়েটারে কেমন জমিয়াছে, তার সুরের কায়দাটা কি রকম ইত্যাদি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। এই আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্যে ভাল লাগিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের লেখা "সমালোচক রবীন্দ্রনাথ"। লেখক আপন বক্তব্য গুছাইয়া বলিয়াছেন এবং যাহা বলিয়াছেন তাহা সরস, সুন্দর, সুতরাং সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমোহিতমোহন বাগচীর "রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যে"র কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। শ্রীকালিদাস রায় "রবীন্দ্র-কাব্য-বিচারের ভূমিকা"য় খুব ভাল ভাল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর "ঘরে বাইরে"তে কোন নূতন কথা নাই। অনেকেই যাহা বলিয়াছেন—সেই থোড়, বড়ি, খাড়া, খাড়া, বড়ি, থোড়!

নবজীবন—বালকদের অভিনয়োপযোগী স্ত্রীচরিত্রহীন নাটক। শ্রীসরোজাক্ষ কাব্যতীর্থ বি-এ, বি-টি প্রণীত। মূল্য আট আনা। লম্বোদরপুর, শিউড়ী হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

লেখকের নাটক লেখার ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্যম, উদ্যম প্রশংসনীয়। এই উদ্দেশ্যমূলক নাটকে ছেলেদের শিক্ষার উপযোগী অনেক ভাল বিষয় আছে। নাটকের ঘটনা সংস্থান, চরিত্রচিত্রণ মোটের উপর ভালই। তবে ভাষাটা ঠিক নাটকের ভাষা হওয়া উচিত ছিল। গানগুলি মন্দ লাগিল না।

মধুচ্ছন্দা—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কবিতার বই। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা মাত্র।

আজকালকার কবিদের মধ্যে যে কয়জন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন অপূর্ব্ব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কবিতাগুলি ভাবপূর্ণ, ভাষা ভাবকে মূর্ত্তি দিয়াছে, ছন্দ ভাষাকে সাবলীল করিয়াছে। মধুচ্ছন্দার

সমস্ত কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নিখুঁত ছন্দ, সুন্দর ভাষা, চমৎকার ভাব এই বইখানিকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী আসন দান করিবে। বইখানির ছাপা বাঁধাই চমৎকার।

বালির বাঁধ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅজিত শ্রীমাণী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

সাংবাদিক ও সুলেখক বলিয়া প্রফুল্লবাবু নাম করিয়াছেন। উপন্যাস সাহিত্যেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বিমান ডাক্তার; ডাক্তারী করিতে গিয়া প্রভার সঙ্গে পরিচয়। প্রভা খুব বড় ঘরের বৌ। স্বামীর মৃত্যুর পর অবস্থাহীনতার জন্য হাসপাতালে নার্সের কাজ গ্রহণ করে। বিমান সেখানে চাকুরী করিত। ক্রমে প্রভা বিমানের প্রেমে পড়ে এবং বোধহয় কোন একরাত্রে বিমানকে বিপথগামী করে! বিমান পূর্ব্ব হইতে শীলাকে ভাল বাসিত। কিন্তু এখন কর্ত্তব্যবোধে প্রভাকে বিবাহ করিতে চায়। শেষে প্রভা সব জানিতে পারিয়া নিজে পলাইয়া শীলার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। শীলার অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। শীলা সে বরের হাত এড়াইবার জন্য বিমানের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করে।

মোটামুটি গল্পটী এইরূপ। পাত্র-পাত্রীরা আপন মুখে এই সব কথা বলিয়া গিয়াছে। বিমানের চরিত্র আমাদের ভাল লাগিল না। কি রকম কর্ত্তব্যবোধ এবং কি রকম ভালবাসা বুঝা গেল না। তার বাড়ীতে চুলো-জ্বলে-না-প্রায় গোছ অবস্থা। এদিকে কাশীতে মার খরচ চলে। তার হাঁসপাতালের চাকরীটাও হঠাৎ হইয়াছে। আমরা কোন কথা জানিতে বা শুনিতে পাইলাম না, দেখি বিমান প্রভার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। উপন্যাসে এতটা গরজ চলে কি? প্রভার চরিত্র মোটের উপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শীলার চরিত্রও মন্দ লাগিল না। অধ্যাপক, আধুনিক রুচিসম্পন্ন শীলার বাপ বিমানকে বিলেত পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, শীলা বাপের একমাত্র সন্তান, অবস্থাও ভাল তিনি মেয়েকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন, তবুও মেয়েটীকে সেকেলে পল্লী গৃহস্থ ঘরের বলিয়া মনে হইল।

যে ফুল না ফুটিতে—প্রমোদ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক কল্যাণ পাব্লিশিংএর সুবোধ মৈত্র। ১৮।২ অনরেট ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

এখানি বোধহয় উপন্যাস। কারণ লেখক প্রথমেই একটী গুরুতর দরকারী খবর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"এই উপন্যাস লেখা হয়েচে জানুয়ারী ১৯৩৫ সালে।" সুতরাং বইখানা যে উপন্যাস তা আর পড়িয়া জানিতে হইল না। লেখক কি জানাইতে চান যে 'বইখানা এক মাসেই তিনি লিখে ফেলেচেন'? না বইটা অতি-অধুনিক, এই খবরটুকু দিতে চান?

কলেজে পড়িতে গিয়া লিলির সঙ্গে কানুর প্রেম হয়। লিলি কানুকে ভাল করিয়া পাইবার জন্য কানুর দাদাকে বিয়ে করে। কানু একদিন দাদার খাট হইতে ঘুমন্ত লিলিকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় আসে। সেখানে আসিয়া লিলি বলে আমি তোমার দাদার স্ত্রী, আমি অন্তঃস্বত্তা, অতএব—! এদিকে রোজই চুমো দেওয়া ও খাওয়া আদি চলে!! শেষে একদিন ধরা পড়িল যে লিলি অন্তঃস্বত্তা নয়। এই জন্যই লেখক বোধ হয় গ্রন্থের নাম দিয়াছেন "যে ফুল না ফুটিতে"। নাম দিলে ভাল হইত—"যে বই না ছাপিতে"! লেখকের কতকগুলি প্রিয় শব্দ—শ্রেষ্ঠ, (যথা শ্রেষ্ঠ স্ত্রী, শ্রেষ্ঠ সুখ ইত্যাদি); রোমকূপ, যৎকিঞ্চিৎ—তিনি স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন। লেখা পড়িয়া মনে হয় লেখকের চন্দ্রাধিক্য হইয়াছে যা তা আবোল-তাবোল বকা যার লক্ষণ।

প্রসন্ন রাঘব নাটক—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১১৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

নাটকখানির প্রণেতা কবি জয়দেব কৌণ্ডিণ্য গোত্র সম্ভূত। কবির পিতার নাম মহাদেব। মাতার নাম সুমিত্রা। সীতা-স্বয়ম্বরে নাটকের আরম্ভ এবং রাবণ-বধের পর পুষ্পক হইতে অযোধ্যায় অবতরণে সমাপ্তি। নাটকখানি সপ্তমাঙ্কে বিভক্ত। ১ম অঙ্কে স্বয়ম্বরে ভারতের রাজগণের সঙ্গে দৈত্যাপতি বাণ ও রাক্ষস রাজ রাবণের আগমন। ২য় অঙ্কে চণ্ডীমন্দিরে রাম সীতার পরস্পর সন্দর্শন। ৩য় অঙ্কে রাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ। ৪র্থ অঙ্কে পরশুরাম পরাজয়। ৫ম অঙ্কে গঙ্গাকালিন্দী প্রভৃতির কথোপকথনে রাম বনবাস হইতে সীতাহরণ ও হনুমানের সাগর লঙ্ঘন বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অঙ্কে সীতা-বিরহ-কাতর রাম, লক্ষ্মণের বিদ্যাধরের ইন্দ্রজালে লঙ্কাদৃশ্য দর্শন ও সীতার সংবাদ লইয়া হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ৭ম অঙ্কে রাবণ-বধের পর অযোধ্যা আগমন। এই নাটকের ঘটনাগুলি অনেক সময় অন্যের কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটিতে দেখিলে দর্শকের চিত্ত যেমন ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল হওয়া সম্ভব কাহিনী শুনিয়া তাহার এক কণাও হইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এরূপ নাটকের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। "প্রসন্ন রাঘব" সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। সুতরাং ইহার অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বাড়িবে। এই অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ঘোষ মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও রসরক্ষার চেষ্টা প্রায় ফলবতী হইয়াছে। মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িয়া বেশ আনন্দই পাওয়া গেল। ছন্দ, ভাব, ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই মূলকে অনুসরণ করিয়াছে। তবে ভাষা আর একটু সরল করা উচিত ছিল।-এ একেবারে অনুস্বার বিসর্গ তুলিয়া দিয়া দুরূহ সংস্কৃত শব্দগুলি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর আমরা নাটক পাঠে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

পথের সন্ধানে—শ্রীশিবেশ্বর দাস গুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'জীবিকার্জ্জনের অজস্র কর্ত্তব্য পালনের মাঝে মাঝে যখনই অবসর পাইয়াছি, অন্তরের আহ্বানে খাতা ও কলম লইয়া বসিতে হইয়াছে।" লেখক বোধ হয় ফাউনটেন পেনে লেখেন তাই দোয়াতের উল্লেখ করেন নাই। অজস্র কর্ত্তব্য পালনের মাঝেও যে অবসর মেলে ইহা যথার্থই সৌভাগ্যের পরিচায়ক এবং খাতা কলম লইয়া বসিতে হয় বলিয়া ধন্যবাদের যোগ্য। লেখক যোগ্যতা নাই ভাবিয়া নিরস্ত ছিলেন কিন্তু শুধু বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী বর্গের উৎসাহে বহি ছাপাইয়া কাজটা ভাল করিয়াছেন কিনা এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন। বন্ধুরা স্বার্থবশে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ স্নেহবশে অনেক সময় অন্যায় করিয়া বসেন। আজকাল পথের সন্ধানে, পথের ধারে, পথহারা, পথের শেষে—পথ লইয়া এত বইও হইয়াছে বা হইতেছে! এ জন্য পথে ভীড় বাড়িতেছে এবং ব্যাপার ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইতেছে। লেখক বইখানিকে নাটক ও উপন্যাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলচ্চিত্রের উপযোগী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সাধু প্রয়াস সন্দেহ নাই। তবে সফল হয় নাই।

একাদশ শতব্দীতে বাঙ্গালার রাজনির্ব্বাচন মহারাজ দিব্য—শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

বাঙ্গালার গৌরবময় যুগের একটী ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা যখন স্বাধীন ছিল, বাঙ্গালী দেশ জয় করিত, প্রজাপ্রতিনিধিগণ রাজা নির্ব্বাচন করিতেন ইহা সেই দিনের কাহিনী। কৈবর্ত্তপতি দিব্য কেন পরাক্রান্ত পাল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন. বাঙ্গালী প্রজা এক বাক্যে কেন দিব্যকে গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল, পুস্তকে তাহারই বর্ণনা আছে। প্রত্যেক লেখাপড়াজানা বাঙ্গালী বালক বালিকা যুবক বৃদ্ধ যুবতী প্রৌঢ়ার পড়া উচিত। বইখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত।

—হরিচন্দন

A Recovery Plan for Bengal—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। প্রকাশক, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নানা দিক দিয়া, নানা কারণে দেশ আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন। দেশের বর্ত্তমান অন্নাভাব তাহার একটি। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এই দিকটা আজ মারাত্মক রকমে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কারণও হয়ত আছে কিন্তু মূল কারণ হইতেছে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি; অন্নাভাব মিটাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে চাকুরীতে তাহাদের একান্ত আত্মসমর্পণ। ইহাকে ব্যাধি—দারুণ ব্যাধি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এ ব্যাধির সত্বর প্রতিকার প্রয়োজন। এ ব্যাধির সৃষ্টি একদিনে হয় নাই, প্রতিকারও একদিনে সম্ভব নহে।

প্রতিকারার্থে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষিত যুবকদের মনোভাব পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তন নৈতিক উপদেশে আসিবে না। অর্থনৈতিক বিচারবুদ্ধির সত্যকার জাগরণ হইলে এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বাঙলা সরকারের শিল্পব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের এই বিরাট গ্রন্থ (আকারেই শুধু বিরাট নহে, গুণেও বিরাট!) "A Recovery Plan for Bengal"—সেই বিচারবুদ্ধির জাগরণে কেবল সহায়তা নয়, প্রেরণা দান করে। দেশের বর্ত্তমান সমস্যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই—সেই সমস্যা সমাধানের উপায়ও ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সমস্যা বিশ্লেষণে এবং উপায় নির্দ্ধারণে যে গভীর গবেষণার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার পরিমাপ আমার সাধ্যাতীত। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, গ্রন্থকার ইহাতে ব্যাধির প্রতিকার-পন্থার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অনতিবিলম্বে সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য হওয়া উচিত হইলে দেশ, দেশবাসী ও সরকার সকলেই উপকৃত হইতে পারিবেন।

পুরাকালে আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে যে সকল সংহিতা রচিত হইত এবং সেগুলি যেমন দেশবাসীর বিকৃত বুদ্ধিকে সংশোধিত করিত, এই বিরাট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়েও তদ্রূপ আচরণীয় পদ্ধতির উল্লেখ আছে।

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

Calcutta Municipal Gazette—সম্রাট-দম্পতীর রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ সচিত্র সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীঅমল হোম। মূল্য দুই টাকা। ছাপা বাঁধাই উৎকৃষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল আফিস, কলিকাতা।

সিলভার জুবিলী উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত যতগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকা ও পুস্তক আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, আলোচ্য পত্রিকাখানিকে নিঃসংশয়ে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকাশার্থে অবশ্য কলিকাতা কর্পোরেশন ব্যয়কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু অর্থ ব্যয় করিলেও সকল কাজ সার্থক হয় না। এ ক্ষেত্রে অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে বলিতেই হইবে। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত অসংখ্য চিত্র এবং বহু রঙিন ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া, একদিকে যেমন ইহা সাধারণ পাঠকের মনোহারী হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই রচনাসম্ভারে ইহা চিন্তাশীল পাঠকেরও আদরণীয় হইবে। All about their Majesties, Twenty five years a King, India in Transition ইত্যাদি রচনার মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য বহু আছে। The Story of Calcuttaও উল্লেখযোগ্য রচনা। পাঠ্য বিষয়ের মূল্য ও প্রকাশিত চিত্রাদির দুষ্প্রাপ্যতা হিসাবে এই বইয়ের জন্য দুই টাকা খরচ অনেকেই করিবেন বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধির্যস্য

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি!' মাতার এই ম্যাক্সিমের কাছে অজয়ের যুক্তি-তর্ক-কলহ সব ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই, বি-এ পাসের খবর বাহির হইবার দিন আষ্টেক পরেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বি-এ'র পরে বিয়ে হইলেও, পড়ায় তাহার বিঘ্ন ঘটিল না এবং যেদিন অজয়ের প্রথম পুত্র সুজয় ধরার মুখ দেখিল, সেইদিন দৈবক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অজয় এম্-এ পাশ করিল। যে বছর প্রথম শ্রেণীতে ল' পাস করিল, সে-বছর তাহার দ্বিতীয় সন্তান অথবা প্রথমা কন্যা জয়া জন্মগ্রহণ করিল। সে'ও দুই বছরের কথা—এবার সুজয় ও জয়ার ভাই হইবে, না বোন্ হইবে, এ সমস্যাও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে ইহা লইয়া দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন হইবে না, দুই দশ দিনের মধ্যেই সমস্যা ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

এখন সেই ম্যাক্সিমটির কথা। জীব দিবার মালিক যিনি, তিনি মুক্তহস্ত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, হেতুও নাই; কিন্তু আহার যিনি দিবেন, তিনি সত্য সত্যই আছেন অথবা নাই, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের গুরুতর কারণ ঘটিতেছে। মাতা এখনও জীবিতা, হাতে এখনও হরিনামের মালা, এবং মুখে এখনও সেই ম্যাক্সিম।

অজয় দুইটা টিউসনী করে, গোটা পঁয়তাল্লিশ টাকা আসে। বাড়ীভাড়া দিতে হয় বার টাকা; খাইতে পাঁচটি প্রাণী—আর একটি বাড়িল বলিয়া—; একটি ঝি আছে, একবেলা খায়, আর চার টাকা মাহিনা। পঁয়তাল্লিশ টাকায় পঁচিশ দিন চলে, পরের পাঁচ দিন যেন আর চলে না। তখন ছাত্রদের বাড়ীতে হাত পাতিতে হয়। এইরূপে দিন চলে।

এমন চলাকে তোমরা পাঁচজন কি চলা বলিতে প্রস্তুত আছ? তোমরা যাহাই বল না কেন, এমন চলাকে চলা বলে না। কেন চলে না শুনিবে? ছোট মেয়েটার ক'দিন হইতে ঘুসঘুসে জর হইতেছে, ডাক্তারখানায় দেখাইয়া আনা হইয়াছে, ডাক্তার ঔষধের যে সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহার দৈর্ঘ্যে সে ভীত না হইলেও মূল্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য তাহাকে সবিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। দুইদিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নাই এই কৈফিয়ৎ দিয়া কাটান হইয়াছে, কিন্তু আর ত কাটে না। মেয়েটার অসুখও বিশেষ জটিল হইয়া পড়িতেছে। সুজয় ছেলেটা দুষ্টুর হাড় গাছ হইতে পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, সে 'বার' 'প্যাড', তুলা প্রভৃতির দাম আজও বাকী, ডাক্তারবাবুটি কি ভাবিতেছেন কে জানে! গত মাসে মেজ শালীর কন্যার বিবাহ। শুধু হাতে যাওয়া যায় না, মনীষা পাশের বাড়ীর বধূর মারফতে একজোড়া দুল্ আনাইয়াছে, দাম চার টাকা। এ মাসে এ কয়টি টাকা দিতেই হইবে। নহিলে, মনীষা বলিতেছে, 'পাশের বাড়ীর বৌয়ের সামনে বার হওয়া যায় না।' আজকালকার স্কুল-কলেজে পড়া-শুনা যে কত হয়, তাহা কাহারও অজানা নাই; কিন্তু উপদ্রব যে কত রকমের তাহা সকলে জানেন কি? ছেলেটি কাব (cub) না কি হইয়াছে। কাব মানে বাঘের বাচ্ছা, মানুষের ছেলে বাঘের বাচ্ছা কিরূপে হয়, কে জানে! স্কুলের স্কাউট-মাষ্টারের হুকুম হইয়াছে, পোষাক কিনিতে হইবে। হুকুম করা সহজ, হুকুম তামিল করিতে পুত্রের পিতার যে প্রাণান্ত ঘটে, হুকুমদাতা সে খবর রাখেন কি? মনীষা মুখ বুজিয়া সব সহ্য করে সত্য; কিন্তু যে তাহাকে সর্ব্বংসহা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মনের কথা কে বুঝিতে পারে?

যখন বিবাহ করিয়াছিল, তখনকার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। পর পর এম্-এ, বি-এল্ পাস করিয়া যখন আত্মীয়-পর সকলের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিল, তখন তাহার মনশ্চক্ষুতে যে সুখ-নীড়ের একটি শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, শ্রীমণ্ডিত চিত্র ফুটিয়া থাকিত, যে-চিত্র দর্শন করিয়া এই যুবক-যুবতী ভাবে বিভোর হইয়া অনন্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত উড়িয়া বেড়াইত, সে চিত্রখানি গেল কোথায়? সেই নীলাকাশেই রামধনুর মত কখন্ যে উঠিল, আর কখন্ যে ডুবিল, চিহ্নমাত্রও রহিল না।

এমন কোন আপিস নাই, যেখানে না দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে। এমন কোন আত্মীয় বন্ধু নাই, যাঁহার কাছে না উমেদারী করা হইয়াছে। এমন কোন খবরের কাগজ নাই, শহরের এমন কোন বৃক্ষকাণ্ড বা গ্যাসপোষ্ট নাই, যাহার কর্ম্ম-খালির তালিকা অজয় না মুখস্ত করিয়াছে।

স্কুলের মাষ্টার, কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব-পণ্ডিত, কাহার বাড়ীর রাস্তা না দুরমুস্ করিয়াছে! কিন্তু ফল কি হইয়াছে? কি হইয়াছে, পাঠক, জানিতে চাও, না দেখিতে চাও? ঐ দেখ, ঐ যে টিপি-টিপি বৃষ্টিতে উনচল্লিশটি তালি ও শতছিদ্রযুক্ত ছাতা মাথায় অকালে বৃদ্ধ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ লোকটি অতি কষ্টে জুতা বাঁচাইয়া চব্ চব্ করিতে করিতে রাস্তা চলিতেছে, উহাকে দেখিয়া তুমি কি বিশ্বাস করিতে পার যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার স্বর্ণকমলের পাপড়ি খসাইয়া বার বার ঐ লোকটির কণ্ঠে বিজয়মাল্যসম পরাইয়া দিয়াছিলেন? আরও দেখ, ঐ যে অন্নাভাবে জীর্ণ, তৈলাভাবে শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে মলিন ছেলেমেয়ে কয়টি শুষ্কমুখে ঐ ভাঙ্গা রোয়াকে বসিয়া আছে, একদিন উহাদের পিতামাতা ইহাদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত চিন্তা, কত গবেষণা না করিয়াছে, আবার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি লাভ হওয়ায় তাহাদের মনের অবস্থাই বা কি, পাঠক তুমি তাহা কল্পনা করিতে পার না কি?

অজয় সকালে বিকালে টিউসনি করে; আর মধ্যাহ্ন কালটা কলিকাতার অগণিত আপিস আদালতের অসংখ্য দ্বার জানালা, সাহেব বাবু বেয়ারা চাপরাসী দরোয়ান গণিয়া বেড়ায়। প্রায় সব আপিসের প্রবেশ-পথে জলন্ত অক্ষরে লেখা 'নো ভেকেন্সি'। যে আপিসগুলি ভদ্রতা করিয়া অথবা ব্যয়-সঙ্কোচোদ্দেশ্যে নিরাশাব্যঞ্জক অক্ষর কয়টি লিখে নাই, ঐ কথা কয়টাই মুখে বলিতে তাহাদের বাধে না। অনেক-গুলি আপিসের, অনেকগুলি বাবু, অনেকগুলি দরোয়ান, অনেকগুলি চাপরাসী বেয়ারার সঙ্গে সে বেশ জমাইয়া লইয়াছে। কেহ তাহার দাদা, কেহ ভাই, কেহ বাপু বাছা হইয়া পড়িয়াছে। এই নবলব্ধ আত্মীয়-বন্ধুরা প্রায় এক-বাক্যে তাহাকে বলিয়াছে, কোন কাজ খালি হইবামাত্র তাহারা সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই খবর দিবে।

কথিত আছে, ঘনিষ্ঠতা ঘৃণা উৎপাদন করে। আমাদের অভিজ্ঞতা, ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তাস্থাপনে সহায়ক। যে সব আপিসে আনাগোনা করিয়া, অজয় আত্মীয়তা করিয়াছিল, তাহাদেরই ভিতর একজন একদিন খবর দিল, একটি কার্য্য খালি হইয়াছে। মেজ সাহেবের খাস্-বাবু (পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট) হঠাৎ গতায়ু হইয়াছেন, নূতন লোক লওয়া হইবে। আজই দরখাস্ত দিন।

দরখাস্ত দেওয়া হইল, "আত্মীয়বর্গ" তদ্বিরও করিলেন। কিন্তু ফলদায়ক হইল না। বহুগুণ নিকৃষ্ট এক মুসলমান যুবক কর্ম্ম পাইলেন। আরও একস্থানে অনুরূপ ঘটিল। সে-আপিসের সাহেবটি স্পষ্ট বলিলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাকে লইতে পারিলাম না। আপিসের ম্যানেজিং বোর্ডের ইচ্ছা পূরণ আমাকে করিতেই হইবে, আমার হাত বাঁধা।

গবর্ণমেণ্ট আপিস, রেল আপিস, কর্পোরেশন সর্ব্বত্রই ঐ কথা। 'উপরওয়ালার ইচ্ছা', 'হাত বাঁধা' 'অত্যন্ত দুঃখিত'। সর্ব্বত্রই ঐ নীতি! নীতিটি নিন্দনীয়, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। দেড়শতাধিক বর্ষকাল হিন্দুরাই ভারতের সর্ব্বত্র চাকুরী-বাকুরীতে প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিয়াছে, আজও যে কোন আপিসে কর্ম্মচারী-সংখ্যায় মুসলমানে-তরের সংখ্যা যে শতকরা আশী জন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং সমান-সমান না হউক, কিছু দিন যদি মুসলমানদিগের মধ্যে চাকুরী বণ্টিত হয়, তাহাকে অন্যায় বলিবে কে?

চাকুরীজীবি হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষের উদয় হইয়াছে সত্য; মুখে যাহাই কেন বলুন না, হিন্দুমুসলমান-মিলনাকুল হিন্দু রাজনীতিকরাও অন্তরে অন্তরে বিচলিত হইয়া পড়িয়া-ছেন সত্য; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপপ্রাপ্ত যুবক ও তাঁহাদের অভিভাবকবৃন্দ দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের ঘোরতর নিন্দা করিতেছেন, এ সবই সত্য; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে বসিলে সত্যই কি নিন্দা করা যায়? বহুকাললব্ধ সুখ-সুবিধায় ব্যাঘাত ঘটিলে নিরপেক্ষ বিচারশক্তির হ্রাস হইবেই; তাহা না হইলে, কেহই গবর্ণমেণ্টের এ নীতির নিন্দা করিতে পারিবে না। সে কথা যাক্। আমরা গল্প বলিতে বসিয়াছি, রাষ্ট্রনীতি আলোচনা আমাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা।

যে সময়ে নানা সংবাদপত্রে আপিস-আদালতে প্রবর্ত্তিত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হইয়া গেল, হিন্দু পত্র-পত্রিকামাত্রই যখন 'আর কোন আশা নাই' রবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হিন্দুকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলেই যেন মনস্কাম সিদ্ধ হয়, বলিয়া সর্ব্বত্র মনোবেদনা প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই সময়ে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

একটি ঘটনা, অজয়ের পত্নী মনীষা বিনাকষ্টে একটি কন্যা প্রসব করিল। কন্যার নাম হইল বিজয়া।

অপর ঘটনা, বিকালে যে ছেলেটিকে পড়াইয়া কুড়ি টাকা মাহিনা আসিত, সেই ছেলেটির পিতা রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকুরী হারাইয়া, টিউটর ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

আপিস আদালতের বন্ধুরাও ম্লান মুখে বলিয়া দিলেন, 'ও পৈতে-টৈতে ফেলে, দাড়ী রেখে নাম বদলে আসুন, তখন দেখা যাবে। দুঃখের সময় কি মানুষের মুখে হাসি আসে? আসে বৈ কি! নহিলে এমন মর্ম্মভেদী বাক্যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই হাসিলেন কি করিয়া?

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সে ঘটনার প্রথম পর্ব্বে দুইখানি পত্র রচিত হইল; দ্বিতীয় সর্গে অজয় নিরুদ্দেশ।

প্রথম পত্র এইরূপ :—

শ্রীচরণেষু, মা, আমি দেশত্যাগ করিলাম। আশা আছে এক বৎসরের মধ্যে ফিরিব; যদি এক বৎসর মধ্যে না ফিরি কিম্বা আমার সংবাদ না পাও, তাহা হইলে জানিও, আমি আর নাই।

হতভাগ্য অজয়।

দ্বিতীয় পত্রও ঐরূপ; কেবল সম্বোধনে প্রভেদ। বক্তব্য, হুবহু এক।

দুইখানি পত্র ডাকযোগে, একই সময়ে একই পিওনের হাতে একই বাড়ীতে আসিল। দুইজন প্রাপক পত্র পাঠ করিয়া একই কার্য্য করিলেন। সে রাত্রে এবং পরে আরও অনেক রাত্রে দুই জনেরই বিনিদ্র নয়ন অজস্র জলে ভরিয়া রহিল।

মনীষা হিসাব করিয়া বলিয়াছে, গৃহত্যাগের দিন অজয়ের হাতে তেরটি পয়সা মাত্র ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী কাপুরুষ জাতি।

তেরটি পয়সায় কত দূর ও কোন্ বিদেশে যাওয়া যাইতে পারে? এ সমস্যা যে শুধু আমাদের মনেই জাগিয়াছে, তাহা নহে; অজয়ের মাতা জায়ার কথা স্বতন্ত্র, চেনা-জানা সকলেই ইহা চিন্তা করিতেছেন। তবে আমাদের মনে হইতেছে, এই গবেষণা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখিতেছি, তের পয়সায় যত দূর যাওয়া যায়, অজয় তদপেক্ষা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। অজয় লক্ষ্ণৌ শহরে উপনীত হইয়াছে। শূন্য পকেটে, রেলগাড়ীতে চড়িয়া এতদূর আসা সম্ভব হইল কিরূপে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু বলিব না। বলিয়া, দেশের বেকার হতভাগাদের অসাধু হইতে প্রোৎসাহিত করিবার ইচ্ছা আমদের নাই।

অজয় লক্ষ্ণৌ-এ আসিয়া দুই দিন শহর দেখিয়া বেড়াইল; তৃতীয় ও চতুর্থ দিন আপিস সকল পরিদর্শন করিল; পঞ্চম দিবসে স্থানীয় জুম্মা মসজিদে নমাজ দৃশ্য অবলোকন করিল; ষষ্ঠ দিবসে এক মৌলভী সাহেবের সঙ্গে ভাব করিয়া, সপ্তম দিবসে তাঁহার সঙ্গে জমাইয়া লইয়া অষ্টাহ্নে তাঁহার সঙ্গে চা পান করিল। মৌলভী সাহেব লোকটি বড়ই দয়াদ্রহৃদয়। অজয়ের আহারের সংস্থান নাই, বাসের স্থান নাই শুনিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে বেদনা ফুটিয়া উঠিল। অজয়ের বাসের জন্য মসজিদসংলগ্ন এক মুসলমান-পরিবারের বহির্বাটীর একখানি ঘরের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করিয়া দিলেন এবং নিজ জোব্বার জেব হইতে একটি রৌপ্য মুদ্রা দান করিলেন। অজয় তদ্দারা ক্ষুন্নিবারণ করিল।

কয়দিন পরে, মাথা গুঁজিবার ঘর ও মাথায় দিবার বালিশ পাইয়া অজয় স্বর্গসুখ অনুভব করিল। গৃহে অভুক্তা মাতা, সন্তানসন্ততিসহ বিব্রতা পত্নী প্রভৃতির কথা চিন্তা করিতে তাহার অন্তর সিক্ত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় তখনকার মত সে বাঁচিয়া গেল।

যে পরিবারের বহির্বাটীতে অজয় স্থান পাইয়াছে, সেই পরিবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী, আশ্রিতবৎসল ও সুজন। অতি প্রত্যুষে পরিবারের প্রধানগণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন; প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শত সহস্র অনাথ আতুরকে ভিক্ষা দিতেন—অন্ন-ভিক্ষুককে অন্ন, রুটী-ভিখারীকে রুটী,

অর্থকামীকে অর্থ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন; আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিতেও যে তাঁহাদের কার্পণ্য ছিল না, অজয় স্বয়ং তাহার প্রমাণ।

কয়েক দিনের মধ্যেই পরিবারের যুবকগণের সহিত অজয়ের সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। আহারে ব্যবহারে তাহার ঔদার্য্যের অভাব নাই জানিয়া প্রথমে অন্তঃপুর হইতে চা, হালুয়া, পরে পোলাও কোর্ম্মা কাবাবও আসিতেছে। কোর আন্ শরীফের বয়েৎগুলির মোটামুটি অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া সে ধন্য হইতেছে। মনে হয়, যদি সময় ও সুযোগ মিলিত, নবী মহম্মদের ধর্ম্মজীবন অনুশীলন ও অনুসরণ করিতেও অজয় পশ্চাদ্‌পদ হইত না।

সেই দয়ালু মৌলভী সাহেবকে কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইয়া অজয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে তাহার দুর্গতির অবসান সম্ভব কি না তাহাই জানিতে চাহিল।

মৌলভী সাহেব তাহার পারিবারিক ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অজয় অকপটে সব বলিল, কেবল স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের অস্তিত্বের সংবাদ অপ্রয়োজনীয় বিধায় বলিল না।

মৌলভী সাহেব বলিলেন, তিনি চিন্তা করিয়া উত্তর দিবেন।

তিনি যতদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, অজয় ততদিন আশ্রয়দাতার সমাদর-অতিথি-সংকার স্বীকার করিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অজয় ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, আশ্রয়দাতার যুবা-বয়স্ক পুত্রগণ ঘোষণা করিয়াছেন, ফার্সীতে অজয় অনতিবিলম্বে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারিবে। অজয় মহোৎসাহে লেখাপড়া চর্চ্চা করিতেছে।

অভাগিনী জননী, হতভাগিনী পত্নী ও মন্দভাগ্য সন্তান-সন্ততির কথা ভাবিতে আগ্রহের বিন্দুমাত্র অভাব তাহার নাই, কিন্তু আজকাল অবসরের একান্তই অভাব। দিবাভাগে ধর্ম্মালোচনা ও সাহিত্যশিক্ষায় অতিবাহিত হয়, আর নাতিদীর্ঘ রাত্রিটুকু আততায়ী নিদ্রার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অবশেষে মৌলভী সাহেব সম্মত হইলেন। একদিন শাস্ত্রমতে অজয়ের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অজয়-কুমার হালদার আজিজুল হক্ হইয়া, পোলাও কালিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেহ মনসংযোগ করিলেন।

বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধাই বলা যায়, মাতা জীবিতা, তাঁহার হার্ট ফেল হইয়া অপঘাত মৃত্যু ঘটিতে পারে আশঙ্কায়, মৌলভী সাহেবকে ধরিয়া পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সংবাদটা সংবাদ-রাক্ষস রিপোর্টারদের নিকট হইতে সবিশেষ যত্নসহকারে গোপন রাখা হইল।

একটা কথা এখানে বলা দরকার হইয়া পড়িতেছে। হক্ যুবা পুরুষ, চেহারাটিও মন্দ নহে। যখন আসিয়াছিল, তখন তাহার বাহ্যাবয়বে যে দীনতা বিদ্যমান ছিল, এখন আর তাহা নাই, একমাস কাল মধ্যেই সে কান্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অন্য কথা উত্থাপিত হওয়ার সময় হইয়াছে।

মৌলভী সাহেব সে বিষয়ে উদাসীন নহেন। কোন মুসলমানকুমারী হকের মনোহরণ করিয়াছেন কি না, করিয়া থাকিলে সে কোথায় বসতি করে, কি বা নাম ধরে, এ সকল বৃত্তান্ত জানিবার অধিকার যে মৌলভী সাহেবের আছে, তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ হক্‌কে স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন্ নাই।

হক্ মৃদু হাসিয়াছে এবং নতমুখে কহিয়াছে, সময় মত সবই বলিবে।

এখন আশ্রয়দাতার পরিবারে কয়েকটি অনূঢ়া যুবতী ছিলেন। হক্ তাঁহাদিগকে দেখিয়াছে—মৌলভী সাহেবের ধ্রুব বিশ্বাস, হকের হৃদয়টি এই গৃহান্তরালেই হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে মুস্কিল! কেন মুস্কিল ও কি মুস্কিল, তাহা আমরা পরে বলিব

এইবার একটি চাকুরীবাকুরীর চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্রয়দাতা দেবতুল্য লোক;—আশ্রয় বা অন্নদানে তাঁহার কার্পণ্য নাই বটে; কিন্তু এই যুবা বয়স ও এমন কর্ম্মঠ দেহ লইয়া তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিতে হকের লজ্জার সীমা নাই।

আশ্রয়দাতার সঙ্গে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। অল্প চেষ্টায় এবং অত্যল্পকাল মধ্যে রেল-আপিসে মোটা মাহিনায় চাকরী জুটিয়া গেল। মিষ্টার আজিজুল হক্ রেল-আপিসে ট্রাফিক বিভাগের দুইশত টাকার সহকারী সুপারিনটেনডেনটের পদারূঢ় হইলেন।

আমিনাবাগে বাসা লওয়া হইল; আশ্রয়দাতার যুবক পুত্রগণ আসিয়া বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া দিলেন; বয়, বাবুর্চ্চি

নিযুক্ত হইল ; একখানা এক-হাত-ফেরত ছোটখাট মোটর গাড়ীরও সন্ধান করা হইতেছে। হকের হাতে পয়সা-কড়ি নাই বটে, আশ্রয়দাতার পুত্রগণ বিনাসর্ত্তে অগ্রিম দিয়া গাড়ী কিনিয়া দিবেন, নিজেরাই এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর ভূতপূর্ব্ব আশ্রয়দাতার গৃহেই হক্ সাহেবের মজলিশ বসে। রাত্রির পান-ভোজন-কার্য্যগুলি সেইখানেই সমাধা হয়। তিনিও মাঝে মাঝে ইহাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। ছুটী-ছাটার দিনে শহরের বাহিরে পিক্‌নিক্ পার্টি ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পার্টি পুরুষ-পার্টি, একতরফাই চলে। যেহেতু মুসলমানসমাজ এ বিষয়ে এখনও অত্যন্ত পিছনে পড়িয়া আছেন। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও পার্টি জমিতে বাধে না। এই ত আজই রাত্রে দৌলতাবাদে নদীর ধারে চড়ুইভাতি করিয়া, হক্ সাহেব বন্ধুদের গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে শিস্ দিতে দিতে যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন কি তাঁহাকে একটুও ক্লান্ত অবসন্ন দেখাইল ? আশ্রয়দাতার গৃহদ্বারে যখন তিনি বন্ধুদের নিকট বিদায় লইতেছেন, তখন রাস্তার আলো বারান্দার যে অংশটি আলোকিত করিয়াছিল, সেখানে একখানি সুন্দর মুখ উদ্যান-গোলাপের মত প্রস্ফুটিত ছিল, হক্ তাহা দেখিয়াছিলেন—মুখখানি দেখিবার মত, একবার দেখিলে আবার দেখিবার মত, দেখিয়া হৃদয়ে আঁকিয়া লইবার মত, আঁকিয়া ধ্যান করিবার মত—কিন্তু হক্ সাহেব কি সেই আননখানি হৃদয়-কাগজে আঁকিয়া আনিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন ? আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সারাদিনের পর শয্যা গ্রহণ করিবামাত্র তিনি হতচেতন।

মৌলভী সাহেব মধ্যে একদিন আসিয়া গোপন কথাটি জানিবার চেষ্টা করিলেন। হক্ হাসিল, বলিল, সময়মত বলিব।

মৌলভী সাহেবও হাসিলেন ; তিনিও পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, আগে বাঙ্গালীরা বিবাহ করিবার জন্য ছটফট্ করিত। মেয়েরা আট বছরে, ছেলেরা পনেরো ষোল বছর বয়সেই বিবাহ করিয়া বসিত। এখন মেয়েরা বিশ ত্রিশ ও ছেলেরা প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আরও এক অদ্ভুত কথা শুনিয়াছেন। শুনিয়াছেন যে বাঙালী ছেলেরা বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহে। তাই ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্গালী মেয়েরা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিতেছে না। আবার কেহ কেহ বলে, তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া, বি-এ এম-এ পাস করিয়া স্বাধীন থাকিতেই চাহিতেছে, পরাধীন হইতে আর চাহে না। আমরা কি বলি জানেন ? আমরা বলি, পর জুটিলে পরাধীন হইতে তাহাদের অমত নাই, পর না জুটিলে কাহার অধীন হইবে ? সুতরাং দোষ ছেলেদেরই।

হক্‌ও যে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না, মনের গোপন কথাটি তাঁহার মত অকৃত্রিম সুহৃদের কাছেও বলিতে পারিতেছে না, বাঙ্গালীত্বই তাহার কারণ। নারী সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতি যে কাপুরুষ তাহা ত সর্ব্বজনবিদিত সত্য। এই দেখ না, তুচ্ছ কথাটা প্রকাশ করিতে হক্ ছ'মাসেও পারিল না। হকের মনোরমা যে একজন আছে এবং এই লক্ষ্ণৌ শহরেই তাহার অবস্থিতি, মৌলভী সাহেব সে বিষয়ে নিঃসন্দিহান এবং তাঁহার এমত ভরসাও আছে যে, তিনি সন্ধান পাইলে খোদাতাল্লাহের কৃপায় চারিহাত এক করিতে পারিবেন, এ কথা তিনি একাধিকবার হক্‌কে জানাইয়া অভয় দিয়াছেন, তবুও ছোকরার সাহসে কুলাইতেছে না। এই বাঙ্গালীরাই আবার স্বদেশী করে, কংগ্রেস করে, স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করে ! সংসার করিতেই ভয়ে মরে, রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে ! হাসির কথা বটে।

আরও কিছুদিন সময় ইহাকে দেওয়া যাক্। মনের কথা বলে ভাল, না-বলে সম্বন্ধ করা যাইবে, ভাবিয়া মৌলভী সাহেব কিছুদিনের জন্য হক্‌কে অব্যাহতি দিলেন।

হঠাৎ একদিন খবর শুনা গেল, হক্ রেলের গাজিয়াবাদ জেলায় বদলি হইয়াছে। খবরটা হক্‌ই দিল। গাজিয়াবাদ জেলার স্বাস্থ্য ভাল নয়, জেলা-অফিসার লোকটিও সুবিধার নয়, বদলির বিরুদ্ধে হক্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাওড়ার হেড আপিস কোন কথা শুনিল না।

ভূতপূর্ব্ব আশ্রয়দাতা একবার শেষ চেষ্টা করিবেন বলিলেন, হক্ তাহাতে ভয় পাইয়া গেল, সবিনয় নিবেদন করিল, আমি একটু-আধটু চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতেই সাহেবটা আগুন হইয়া উঠিয়াছে ; আবার—ইত্যাদি।

যুক্তি অসার নয় ; আশ্রয়দাতা নিবৃত্ত হইলেন।

মৌলভী সাহেব নিভৃতে পাইয়া কহিলেন, এইবার…

হক্ হাসিল, বলিল, সময়মত বলিব।

আর কবে বলিবে?

শীঘ্রই ছুটি লইয়া ফিরিতেছি।

লক্ষ্ণৌ হইতে বিদায়ের দিনে ভূতপূর্ব্ব আশ্রয়দাতার অট্টালিকার বারান্দাটা কি শূন্য ছিল? হকের তৃষার্ত্ত দৃষ্টি কি বার বার বারি-ভিক্ষু চাতকের মত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতেছিল না? মৌলভী সাহেব দুশ্চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। এই পরিবার সমাজে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, তাঁহারা যে অজ্ঞাতকুলশীলকে কন্যাদান করিবেন এমত সম্ভাবনা নাই। হক্ বোধহয় অনুমানে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, বুকের ব্যথা তাই বুকেই চাপিয়া রাখিয়াছে! দূরে যাইতেছে, ভালই হইতেছে। ইত্যবসরে তিনি একটি সুন্দরী বয়স্কা পাত্রীর সন্ধান করিয়া রাখিবেন।

হক্ একমাস পরেই আসিতেছে। পাত্রী সন্ধান জন্য একমাস যথেষ্ট সময়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীব ও আহার।

হক্ সাহেব যে সময়ে গাজিয়াবাদে রেলওয়ে বাঙলোয় সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মাতা, বনিতা ও সন্তানসন্ততির সংবাদ লইবার আগ্রহ কি পাঠক পাঠিকার হইতেছে না? অনুমানে তাঁহাদের আগ্রহ বুঝিয়া আমরা ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী প্রাসাদকিরীটিনী সৌন্দর্য্যশালিনী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিতেছি, না আসিলেই ভাল করিতাম।

মা হরিনামের মালা ফিরান, বার ব্রত, উপবাস, গঙ্গাস্নান, এ সব ত আছেই ; বহুকাল বাঁচিয়া আছেন, মানুষটি কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন। নিজে একাদিক্রমে দশ পনেরো দিন অনাহারে থাকিলেও শুষ্কমুখে কোন বৈচিত্র্যই যেমন দেখা যায় না, অভয়ের ছেলেমেয়েগুলা না খাইয়া, রুক্ষ শুষ্কমুখে বাড়ীময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, তাহা দেখিয়াও তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। মাঝে মাঝে পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলেন, তুমি ভেব না বউ মা, এতগুলি জীবকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তাহাদের খাবারও তিনি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। একদিন সে খাবার আসিবেই আসিবে, তুমি দেখিও মা, আমার কথা মিথ্যা নয়।

কথাগুলিতে বধূ কতখানি সান্ত্বনা পান, তাহা বলা শক্ত। ক্ষুধার্ত্ত ছেলেমেয়েগুলা ঠাকুরমাতার কাছে যায় না, আসে তাহার কাছে, কাঁদে তাহার জানু ধরিয়া। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও বুভুক্ষু সন্তানরা ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে। শ্বশ্রূ ত এ দৃশ্য দেখেন নাই, যে দেখে, জ্বালা যে কত, তাহা সেই জানে, সেই বোঝে।

মনীষা পল্লীগ্রামের মেয়ে। পল্লীগ্রামে দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা নাই। সেই সব পরিবারের মেয়েদের জীবনযাত্রা মনীষা ছেলেবেলায় দেখিয়াছে। পাঁচ পুকুর হইতে কল্মী, শুষনী শাক তুলিয়া, পথ-মাঠ-ঘাট হইতে গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে দিয়া, বন হইতে বৈঁচি তুলিয়া, ফুল জড় করিয়া হাটে বাজারে পাঠাইয়া বা অন্য লোকের বাড়ীতে বেচিয়া কোনও মতে তাহাদের দিন কাটে। শহরে কোন সুবিধাই নাই।

বাড়ীভাড়া ছয় মাসের বাকী, বাড়ীওয়ালা বাবুটি বড় ভদ্রলোক, তাই দয়া করিয়া তাড়াইয়া দেন নাই। মুদীও নিতান্ত ছোট লোক নয়, কি মাসেই শাসায় বটে যে আর ধার দিতে পারিবে না, কিন্তু মাসকাবারে সামান্য সামান্য জিনিষ পাঠাইয়া দেওয়া বন্ধ করে নাই। জিনিষপত্তর যাহা দেয়, তাহাতে এতগুলি প্রাণীর দুই বেলার গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে না, সকলের একবেলারও পুরা হয় না। আর কিছু 'উঠ্‌না' বাড়াইতে বলায় মুদী নিজে শুধু গালি-গালাজটা করিতেই কসুর করিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলার পরণে কাপড়, ইজার ত দূরের কথা, ন্যাকড়াটুকুও ঘুচিয়াছে।

জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন, কথাটা শুনিতে বেশ, সত্য হইলে আরও বেশ হইত। কিন্তু, মনীষার অদৃষ্টে?

আর সেই লোকটি? ছয় মাস নিরুদ্দেশ! কোথায় গিয়াছে? আছে, না, সব জ্বালার বোঝা একা মনীষার ঘাড়ে চাপাইয়া সব এড়াইয়াছে কে জানে! বার বৎসর বিবাহ হইয়াছে, এগার বৎসর মনীষা শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছে, একটি বেলা মনীষাকে না দেখিলে যাহার দিন কাটা দায় হইত, সেই লোক ছ'মাস দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া, মনীষা

ছাড়া! সারা দিনের শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদের বোঝা ঠেলিয়া রাখিয়া যে লোক যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত, ছেলে-মেয়েগুলিকে বুকে বুকে মুখে মুখে রাখিত, ছেলেমেয়েদের কথা মনে করিয়াও কি একখানি একছত্র চিঠি সে লিখিতে পারে না? আজকালকার দিনেও, মাকে ভক্তি হয়ত মনে মনে সব ছেলেই করে, কিন্তু বুড়ীরা প্রকাশ দেখিতে ভালবাসে জানিয়া ভক্তি দেখাইতে অনেক ছেলেই লজ্জা পায়—মনীষার স্বামী সে দলের নহেন, তিনি কোন দিন মাতার চরণ বন্দনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাই; প্রতি রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে জননীর চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তবে তিনি শয্যা প্রবেশ করিয়াছেন। সেই মা বার্দ্ধক্যে, অনাহারে, মনঃপীড়ায় জীর্ণ, শীর্ণ, আতুর, কাতর, তবুও যে-লোক মাকে দেখিতে আসে না, একটা মঙ্গলামঙ্গলের খবর দেয় না, সে কি আর আছে? ভাবিতে ভাবিতে মনীষা কাঠ হইয়া যায়, হাতে পায়ে খিল ধরে। অবসন্ন ভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিন্ন কাঁথায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। কাঁথা ভিজিয়া যায়, বুক ভিজিয়া যায়, মনীষা ভগবানকে ডাকিতে চায়, পোড়া ভগবান বিরূপ, দুই চক্ষুতে বান পাঠাইয়া দেন। অগতির গতি, দীনের বন্ধু, অনাথশরণকে ডাকিতেও সে পারে না। হায়, তাহার মত হতভাগিনী কি কেহ আছে?

মনীষার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র প্রথম প্রথম কয়েক মাস পাঁচটি করিয়া টাকা বোনটির হাতে দিয়া যাইত, গত মাস হইতে তাহাও বন্ধ—দাদার মাহিনা হঠাৎ পঁচিশ টাকা কমিয়া গিয়াছে। ঐ পাঁচটি টাকা আসিত, দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। ঐ টাকা হইতেই ছোট খুকীটার হর্লিক্স, ছাগল দুধ হইত; গত মাসে ঐ টাকা হইতেই সামান্য কিছু বাঁচাইয়া নিজের জন্য একটা ওষুধও আনাইতে হইয়াছিল—বিকালের দিকে রোজই যেন একটু জ্বর হয়, সঙ্গে একটু একটু কাসিও আছে। ওষুধটা খাইয়া ভালই মনে হইতেছে। তা সে যাক্, নিজের জন্য মনীষা আদৌ ভাবে না, এদেহ থাকিলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! শুধু ভাবনা এই পাপ ক'টার জন্য!

ছোট খুকীটার যে কি হইবে ভাবিলে মায়ের প্রাণ শুকাইয়া উঠে। ডাক্তারখানা হইতে ধারে এক বোতল হর্লিক্স পাওয়া গিয়াছে, ছাগলের দুধ যে মাগী দিত, নগদ দাম পাওয়া যাইবে না জানিয়া এ পথই সে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার বুকে একদিন কত দুধই ত ছিল, অনাহারে, দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় বুকে কি আর কিছু আছে!

এমনই যখন অবস্থা, হঠাৎ দ্বিপ্রহরে পিওন আসিয়া হাঁকিল, মায়িজি-মনীষা-দেবী, মণি-অটার আছে।

মনীষা দেবী, মণি-অটার! মনীষা দেবীকে মণি-অটার কে করিবে? দাদা? আহা, তাহারই একগাদা টাকা মাহিনা কমিয়াছে, তাহার এক গাদা ছেলেমেয়ে, দুর্দ্দশার কি সীমা আছে? তবে?—তবে? ভগবান! হায়, ভগবানের নাম মুখে আনিতেই পোড়া পাপ চোখে জল আসে কেন?

কিন্তু, একি, "এ. হক্, লক্ষ্ণৌ" কে? হক্ কোন্ জাতি? সাহেব, না মুসলমান? যে জাতি হউক, যে-ই হউক, সে তাহাকে টাকা পাঠায় কেন? তিনি পাঠাইয়াছেন কি? কিন্তু সে লোক যেই হউক, তাঁহার নাম দিল না কেন?

এ টাকা লওয়া কি উচিত হইবে?

পোষ্ট-পিওন এতোক্ষণ খাড়া থাকিতে পারে না, বার বার মায়িজী সম্বোধনে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনীষা শ্বশ্রূর শরণ লইল। মাতা নিরুদ্বিগ্নে কহিলেন, একশ' টাকা, আমার অজুই পাঠিয়েছে। কিছু ভেব না মা, নাম লিখে টাকাটা নাও।

পিওন বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, মাতা আসিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়াও ত বাছা।—বধূকে বলিলেন, হাতের লেখাটা ভাল করে দেখ ত বৌমা!

পিওন ফরমখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, কলের টাইপ করা লেখা, হাতের লেখা নয়।

ঘরে আসিয়া শ্বশ্রূ বধূকে কহিলেন, দেখলে বৌমা, যিনি জীব দেন, তিনিই আহার দেন কি না।

—কিন্তু মা, কে পাঠালে, কি বৃত্তান্ত, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—অজু, অজু, আমার অজুই পাঠিয়েছে, অজু ছাড়া আবার কে পাঠাবে অত টাকা?

বধূ উচ্ছ্বসিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে বলিল, তিনি হলে কি একখানা চিঠিও লিখতেন না! কার যে টাকা, কি জন্যে যে কে পাঠালে—

—তোমার কোন বাবা পাঠায় নি বাছা, তা তুমি দেখে নিও ; পাঠাতে আমার বাবাই পাঠিয়েছে।

ছেলেটা নূতন জামা পরিয়া বাঁচিল, বড় মেয়েটা সিল্কের ফ্রক পরিয়া, আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট মেয়েটা সেদিন হইতে একটি বারও কাঁদে নাই। ভরা পেট থাকিলে কচি-কাচারা কাঁদে না ; লেখক অনুমান করেন, বুড়াবুড়ীরাও শান্ত থাকে।

পরের মাসেও 'মণি অটার' আসিল। পিওন ফর্মখানার লেখা পরীক্ষা করিয়া বলিল, টাইপে লেখা ফর্ম ; কুপনটি সাদা পড়িয়া রহিয়াছে। প্রেরক, সেই এ. হক্। প্রেরণ-স্থান লক্ষ্ণৌ নয়, এবার গাজিয়াবাদ।

সংসারে কোন অভাব নাই ; বাড়ীওয়ালা প্রসন্ন ; মুদী মিন্সে নিজে আসিয়া মাসকাবারী ফর্দ্দ লইয়া যায়, আধঘণ্টা না কাটিতে, বিশ্বস্ত মুটের মাথায় জিনিষ পাঠাইয়া দেয়। ছেলেরা স্কুলে যাইতেছে। মনীষা বড় ছেলেটিকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একটি মাষ্টার রাখিয়া দিয়াছে। বড় মেয়েটিকে সে নিজেই পড়ায়—সে এখনও দ্বিতীয় ভাগের উপরে উঠিতে পারে নাই কি না! বোধোদয়, চারুপাঠ, পদ্মমালা পর্য্যন্ত মনীষাই তাহাদের দেখিতে শুনিতে পারিবে। তারপরে অবশ্য সে আর পারিবে না, কারণ তাহার বিদ্যায় কুলাইবে না। তখন না-হয় সুজয়ের মাষ্টারকে আর দুইটি টাকা বেশী দিয়া ইহাকেও পড়াইতে বলিতে হইবে। সে এখন অনেক দিনের কথা! তত দিনও কি—? মনীষার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ভগবানের মনে যে কি আছে তিনিই জানেন! ভাবিতে ভাবিতেও মনীষার দুই নয়নে সহস্র ধারা বহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজসিক ম্যালেরিয়া।

তিন মাস আগে লক্ষ্ণৌ রেল-আপিসে যাঁহারা ছোট সুপারিনটেনডেণ্ট হক্ সাহেবকে দেখিয়াছেন, আজ তিনমাস পরে গাজিয়াবাদে সেই হক্ সাহেবকে দেখিলে তাঁহারাও চিনিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। হক্ সাহেব খানিকটা নূর রাখিয়াছেন ; সুন্দর মুখে নূরটি বেমানান্ হয় নাই, বরং বেশ মানাইয়াছে। কিন্তু ঐ নূর-টুকুর জন্যই যে তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইবে তাহা নহে তাঁহার চেহারারও অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তিনি একহারা ছিলেন, এক্ষণে আড়াইহারা হইয়াছেন। যে হারে মাংস মেদ মজ্জা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই হারে চলিলে তিনহারা, চারহারা অবশেষে অচল পদার্থ হইতেও বিলম্ব হইবে না। পূর্ব্বে তাঁহার বর্ণ ছিল পিত্তল-বর্ণ ; এক্ষণে স্বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। নূতন পালিশ-করা স্বর্ণে যেমন লালিমা দৃষ্ট হয়, এক একদিন প্রভাতে হক্ সাহেবের কপোল দু'টিতেও তদ্রূপ রক্তিমাভা দেখা যায়। হক্ সাহেব একনিষ্ঠ মুসলমান, ধর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা, তবুও, কেন জানি না, চক্ষুষ্মান বাঙ্গালী হিন্দু হক্ সাহেবের চেহারায় বাঙ্গালীর সহজাত লাবণ্যটুকু লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়বোধ করিয়া থাকেন।

জাতিতে তিনি যাহাই হউন, হক্ সাহেবের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী একেবারেই নাই। আপিসে তিনি সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের প্রিয়। এমন কি হিন্দু মহাসভার ভক্তরাও কোনদিন তাঁহার ব্যবহারে তুষ্ট ছাড়া রুষ্ট হন নাই। তিনি বলেন, ভারতবাসীর জাতি, ধর্ম্ম, সবই এক ; আমরা সকলেই ভারতবাসী, ভারত-জাতি, ভারত আমাদের ধর্ম্ম। কথাটা সাহেবদের কাণেও উঠিয়াছে। একদা এক সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হক্, তুমি কি কোনদিন রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়িয়াছ? হক্ বলিলেন, আমার রাজনীতি, আমার উদর। সাহেব সন্তুষ্ট।

এই ত গেল বাহিরের কথা। তাঁহার ঘরের কথা শুনিবেন? তিনি রেলের যে বাঙলোটিতে আছেন, তাহার আশে-পাশে অনেকগুলি বাসায় হিন্দুরা বাস করিয়া থাকেন, পাছে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগে, তাই একটি দিনের জন্য হক্ সাহেবের বাবুর্চ্চিখানায় নিষিদ্ধ মাংসাদি প্রবেশাধিকার পায় নাই। তাঁহার স্বজাতীয় বাবুর্চ্চিটা বাজারের পয়সা চুরী করার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলে, তিনি পাশের বাসার রামলাল বাবুর সুপারিশে একটি হিন্দু পাচক নিযুক্ত করিয়াছেন। আপিসের একটা অর্ডারলী তাঁহার বাঙলোয় থাকে (পদস্থ সকল কর্ম্মচারীই এই সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া থাকেন), এই লোকটি হিন্দু, বাসার সামান্য খুচরা-খাচরা কাজ সেই করে ; বাসন-কোসন ধুইবার জন্য একটি দাই আছে ; সুতরাং অন্য চাকর-বাকর রাখিবার প্রয়োজন হয় না। একটি মুসলমান 'বয়'

রাখিতে বাসনা আছে বটে; কিন্তু খরচবৃদ্ধির ভয়ে পারিতেছেন না। হক্ মৌলভী সাহেবকে লিখিয়াছেন, টাকা পয়সা জমাইবার চেষ্টা করিতেছি। সংসার পাতিতে বহু অর্থের প্রয়োজন।

হক্ সাহেবের গুণের কথাই বলিলাম; দোষ যে নাই এমন নহে। এইবার দুই একটি দোষের কথা বলিব। লোকটি বিশেষ সজ্জন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সামাজিকতার জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। চার মাসাধিক কাল গাজিয়াবাদে বদলি হইয়া আসিয়াছেন, কত লোকের সঙ্গে ভাব হইয়াছে, অন্তরঙ্গতা হইয়াছে, কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, লোকটি একটি দিনের তরেও কাহারও গৃহে আহার করে নাই। হিন্দুর বাড়ীতে না খায়, না খাক্, মুসলমান—সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের গৃহে খাইবে না কেন? হক্ বলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিত্তশূলের ব্যায়রাম হইয়াছিল, তিনি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। যে ভিষক্ মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, নিমন্ত্রণ খাইতে তাঁহার গুরুতর নিষেধ আছে।

এ কথার পর আর কে কি বলিবে?

হক্ সাহেবের আরও একটি দোষ আছে। শনিবারে আপিস করিয়াই তিনি দিল্লী ছুটেন, রবিবার দিল্লীবাস করিয়া সোমবারে সোজা আপিসে আসেন। অন্য ছুটী-ছাটার দিনেও এই ব্যবস্থা। রসবতী দিল্লী নগরীর কথা না জানে কে? লোকে নানা রকম কাণাঘুষা করে। লোকেরই বা দোষ কি! বিবাহাদি হয় নাই, বয়স কাঁচা, মোটা মাহিনা ইত্যাদি। দিল্লীতে তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন, এ সকল কথা কাহাকেও বলেন না। কাজেই কাণাঘুষা সম্বন্ধে লোকের ক্ষীণ ধারণাও ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে। ভাগ্যে মৌলভী সাহেব এখানে নাই, থাকিলে যে কি হইত, তাহা বলা যায় না।

যাহাই হউক, ভালয়-মন্দয়, দোষে গুণে লোকটি সকলের সঙ্গে পরম সদ্ভাবে দিন যাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ হক্ সাহেবকে বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ করিল! বেশ কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, হঠাৎ কোঁ কোঁ করিয়া জ্বর, আর্দ্দালীর কাঁধে ভর দিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বাঙলোয় চলিয়া গেলেন। আট দশ ঘণ্টা পরে জ্বর বিরাম হইল: দুই দিন ভাল গেল, তৃতীয় দিনে আবার জ্বর! কাঁপুনী দেখিয়া সাহেবদেরও ভয় হইয়া গেল। রেলের ডাক্তার বোতল বোতল ফিবার-মিক্শ্চার, ফাইল ফাইল কুইনিন্ প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হয় না। পিরিওডিক্যাল ফিবার দাঁড়াইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশ হইতে বোতল বোতল ডিঃ গুপ্ত, পাইরেক্স, বেঙ্গালা, বঁড়শে, তানপুরো, ফতনা সেখানকার যত পাচন ছিল, স্থানাটোজেন, কালজানা, পাইরেক্স, রচিটোন কিছুই বাদ পড়িল না; তবুও জ্বর যায় না।

বন্ধু বান্ধব বলিলেন, রাজধানী দিল্লীর রাজসিক ম্যালেরিয়া সহজে যাইবে না। আমাদের কথা না শুনিয়া দিল্লী-ঘর করার ফল ফলিবেই।

হক্ সাহেবের ব্রাহ্মণ-পাচক বলে, সাহেব বার্লির জল ছাড়া আর কিছুই খান্ না। আর খাইবেনই বা কিরূপে? পেটে জায়গা থাকিলে ত! এই একটি ঔষধের বোতল খোলা হইল, খানিক পরেই দেখা গেল, সব শেষ। এত ঔষধ খাইলে খাদ্যে কখনও রুচি থাকে? না, খাদ্যের স্থান থাকে? বড় লোক, সাহেব মানুষ, গরীবদের কথা ত কাণে তুলিবেন না! আমরা হইলে ঐ ডিঃ গুপ্ত খাইয়াই বসিয়া থাকিতাম। স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যালোয়ারী কোন্ ভাগাড়ে গিয়া খাবি খাইত! সাহেব আজ একটা এ-বোতল খালি করিতেছেন, কাল একটা সে-বোতল শেষ করিতেছেন, এমন ধারা অম্বল চাখিলে কখনও অসুখ সারে?

লোকটি ঠিকই বলিয়াছে—সত্যই অসুখ সারিল না। দেড় মাস হইয়া গেল, মাঝে মাঝে কম্পজ্বর আসিতেছেই। হক্‌কে বাহির হইতে দেখিয়া এত যে অসুখ, বুঝাই যায় না! দিব্য নাদুস-নুদুস চেহারাটি রহিয়াছে, কেবল মুখে সে লাবণ্য ও লালিমা নাই, চোখের নীচে ও উপরে কালী পড়িয়াছে। চ্যাপসা লোকগুলা চট করিয়া কাহিল হয় না বটে, তবে তাহাদের ভিতরটা যত শীঘ্র ফোঁপরা হয়, অন্য কাহারও তেমন হয় না। এই দেখ না, হক্ সাহেবকেই দেখ না! অমন ভুঁড়িওয়ালা চেহারাটি ত, আপিসের এই ক'টা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে দশ মিনিট লাগিয়া যায়; চেয়ারে বসিয়া আধঘণ্টার উপর লাগে, দম লইতে।

রেলের সাহেব ডাক্তার বলিলেন, হক্ আমার মনে হয়, স্থান-পরিবর্ত্তনে তোমার উপকার করিবে।

হক্ কহিলেন, আমারও তাই মনে হয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, আমি সেই পরামর্শই দিতেছি, তুমি দেরী করিও না। কোন দিকে যাইতে চাও?

হক্ বলিলেন, পূর্ব্বদেশের লোক, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের লোক পশ্চিম দেশে, এই দিকে আসে। আমরা পশ্চিমের লোক, পূর্ব্ব দিকে যাইলেই ভাল হইব। ডাক্তার সাহেব, আমি কলিকাতা যাইতে চাই।

—চমৎকার স্থান এই কলিকাতা। আমি তিন চার মাস সেখানে ছিলাম, খুব ভাল লাগিয়াছিল; আমার স্ত্রীরও স্থানটি বড় পছন্দ হইয়াছিল। তবে কলিকাতার একটা কি দোষ জান?

—কি?

—বাড়ীভাড়া বড় বেশী। তিন চার শ' টাকার কমে ছোট বাড়ীও পাওয়া যায় না। তবে বাঙ্গালী পাড়ায় শুনিয়াছি, খুব কম ভাড়ার বাড়ীও আছে, তাই না?

—হাঁা সাহেব।

—আমি গোপনে একটা খবর শুনিয়াছি, অনেক ইউরোপীয় কলিকাতায় সস্তা বাড়ীর লোভে বাঙ্গালীপাড়ায় বাসা লইয়াছেন। এ কথা কি সত্য?

হক বলিলেন, হাঁা সাহেব, আমি অনেক সাহেবকে বাঙ্গালীপাড়ায় বাস করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা বাঙালী-পাড়ায় গিয়া বাঙালী হইয়া যান, তাহাও দেখিয়াছি। তাঁহাদের জন্য কলিকাতায় কুচা-চিংড়ী ও পেঁয়াজকালির দাম অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা 'রসগুল্লা'র আদ্য-শ্রাদ্ধ করিয়া রসগোল্লারও দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন।

সাহেব বলিলেন,'রসগুল্লা' খাইতে অতীব সুস্বাদু! উত্তম হক্, আমি এখন চলিলাম, আজিই আপিসে গিয়া তোমার ছুটী, ও স্থান-পরিবর্ত্তনের সুপারিশ পাঠাইয়া দিব। তুমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। হাঁা, যাইবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিও। তোমাকে একটু কষ্ট দিব।

হক্ সবিস্ময়ে কহিলেন, কি কষ্ট সাহেব?

—আজকাল কোল্ড-ষ্টোরেজ-গাড়ী কলিকাতা-দিল্লী আনাগোনা করিতেছে জান ত?

—জানি বৈ কি।

সাহেব হাসিমুখে কহিলেন, তুমি রসগুল্লার কথাটা তুলিয়া ভাল কর নাই হক্। আমার স্ত্রী রসগুল্লার নামে পাগল। তোমার অসুস্থ শরীর, বলিতে আমার কুণ্ঠা হইতেছে, কিন্তু যদি কিছু ভাল রসগুল্লা পাঠাইতে পার—

হক্ সানন্দে বলিলেন, কোন অসুবিধা হইবে না সাহেব, রসগুল্লা বল, রসোমালাই বল, কলিকাতায় গিয়াই পাঠাইয়া দিব।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠিবে এই কামনা।— বলিয়া সাহেব রোগীর করমর্দ্দনান্তর কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ছুটী ও পাশ মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। ডাক্তার সাহেব এমন সুপারিশও করিয়াছেন যে, যুক্ত-প্রদেশের জল-হাওয়া এই লোকটির ধাতে সহিতেছে না, ইহাকে বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্টের কোথাও বসাইলেই ভাল হয়। বিভাগীয় উপর-ওয়ালাও ডাক্তার সাহেবের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

হকের মত সর্ব্বজনপ্রিয় লোককে বিদায় দিতে সকলেই দুঃখানুভব করিল। তাহাদের অধিকতর দুঃখ এই যে, সুস্থ হইয়াও হক্ আর এদেশে আসিবেন না। লোকটি বড়ই ভাল ছিলেন। যাক্, কি আর হইবে! ভগবান তাঁহাকে রোগমুক্ত করুন।

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাতে চার্জ্জ হাণ্ড ওভার করিয়া হক্ দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে দুই তিন দিন থাকিয়া, কলিকাতা যাইবেন এইরূপ স্থির আছে। ষ্টেশনে সেদিন রেল-আপিস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বলিলেও বেশী বলা হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নুর-বর্জ্জন।

পঞ্চম দিবসে দিল্লী-মেল বর্দ্ধমানে পৌছিলে হক্ সাহেব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া চা খাইলেন; দুই টাকার সীতাভোগ ও দুই টাকার মিহিদানা ক্রয় করিলেন। তদনন্তর, একখানি ষ্টেটসম্যান ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে বসিলেন।

কিন্তু আজ কি আর কাগজে মন দেওয়া যায়? প্রায় এক বৎসর—হাঁ, দশমাস উত্তীর্ণ হইয়া এগার মাস চলিতেছে, এক বৎসর পরে দেশে ফিরিতেছে। দেশে, বাড়ীতে মা, স্ত্রী,

পুত্র, কন্যা। বড় মেয়েটা বাবা বলিয়া চিনিবে ত? ছোট মেয়েটা পুট পুট করিয়া চাহিয়া থাকিবে। নূতন লোক দেখিয়া কোলে ত আসিবেই না, বরং কাঁদিতেই থাকিবে। সুজয় নিশ্চয় স্কুলে যায়। না, কেবল ধূলা-কাদা মাখিয়া মাখিয়া বেড়াইতেছে?

মনীষা কি খুব রোগা হইয়া গিয়াছে? এমনই ত তাহার দেহের কোথায়ও মাংস ছিল না, এই কয়মাসে ভাবিয়া ভাবিয়া সে হয়ত কাঠি হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার মুখে হাসি ও কান্না বোধ হয় একই সঙ্গে দেখা যাইবে।

মা? মাও কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন? হয়ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, হয়ত বিছানাতেই পড়িয়া থাকেন।

প্রথম কয়মাস হয়ত কলের জল খাইয়াই— নাঃ, সে কথা আর ভাবিতে পারি না।

ষ্টেট্‌সম্যান খুলিয়া চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র একটি সংবাদ নজরে পড়িল। সংবাদটি এই:—

"গত ২০শে জুন, দিল্লীর * * রেল-আপিসের কর্ম্মচারী মিঃ এ. হক্ দিল্লীর হিন্দু মহাসভার অধ্যক্ষ স্বামী অপরূপানন্দ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। দীক্ষা-সভায় বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু নরনারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই হক্ পরিবেশিত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়াছেন। হকের হিন্দুনাম অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য হইয়াছে।"

হক্ হাসিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন। এটাচি কেস্ হইতে ক্ষুর বাহির করিয়া নূরটি বর্জ্জন করিলেন। ক্ষৌরকার্য্যটিও গাড়ীতেই সারিয়া লইলেন।

অনেকদিন পরে মৌলভী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মাত্র সেলাম আলেকুম করিয়াই চলিয়া গেলেন।

হকের ব্যাপার লইয়া কিছুদিন সর্ব্বত্র আলোচনা চলিয়াছিল। সকল ব্যাপারে যেমন দুটি দল হয়, এ ব্যাপারেও তাহাই হইল। এক পক্ষ রাগিলেন, অপর পক্ষ হাসিলেন। তৃতীয় পক্ষ নীরব রহিলেন।

প্রতিষ্ঠা

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতো

মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।

-ঋগ্বেদ।

বাক্য মোর মনোমাঝে হোক্ প্রতিষ্ঠিত,
মন মোর বাক্য-সনে হউক্ মিলিত।
প্রকাশিত হও স্বামী, সম্মুখে আমার;
* * *
কহিব 'ঋতম্'-বাণী, ক'ব সত্য-সার।
* * *

—শ্রীঅনিলা দেবী

গায়ত্রী

ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

—ঋগ্বেদ।

দীপ্ত সবিতা—যিনি আমাদের
চালিত করেন মতি,
ধ্যান করি তাঁর দিব্য পরম
বরণীয় শুভ জ্যোতি।

-শ্রীঅনিলা দেবী

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস
(Medical Class in the Sanskrit College)

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জন টাইটলার (Dr. John Tytler) 'সংস্কৃত মেডিক্যাল ক্লাসে' শারীর-স্থান-বিদ্যা (Anatomy) সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। অনেক ভাষায় তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জন্ গ্রাণ্ট (Dr. John Grant) তাঁহার পদে নিযুক্ত হন।

ডাক্তার জন্ গ্রাণ্ট।

তিন বৎসর অনন্ত পরিশ্রম করিয়া মধুসূদন চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষতঃ শারীরস্থান-শাস্ত্রে (In the science of Anatomy) পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, মে-মাসের প্রথম-ভাগে ক্ষুদিরাম বিশারদ মহাশয় কোন কারণবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করেন। ডাক্তার উইলসন সাহেব, মধুসূদন গুপ্তকে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য জানিয়া তাঁহাকেই ক্ষুদিরামের পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে মধুসূদনের সমপাঠী বৈদ্য-ছাত্রগণ অভিমান-বশতঃ বিশেষ আপত্তি করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তৎকালে এ সম্বন্ধে 'সমাচার-চন্দ্রিকায়' যাহা লিখিত হইয়াছিল, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' জে-সি মার্সম্যান সাহেব (J. C. Marshman) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই উদ্ধৃত অংশ নিম্নে অবিকল প্রদত্ত হইল :—

"সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কর্ম্মে রহিত হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে বৈদ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ করেন নাই কেবল শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কর্ম্মে রহিত হইলে তৎপদে তাঁহার এক ছাত্র শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্ত নিযুক্ত হওয়াতে অন্য ছাত্রেরা সমাধ্যায়ির নিকট পাঠ স্বীকার না করাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়ের তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং ছাত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। উত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যেহেতুক একটী ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন ঐ ছাত্রের নিকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিদ্যা তবে কাযে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে হইবেক তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যদ্যপি ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে পারিবেন যদ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ত্রুটি সপ্রমাণ করিয়া কর্ম্মে রহিত করণানন্তর তত্তুল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের ছাত্রেরা সুখ্যাতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগ্য নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্তুল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে সুখ্যাতি পত্র না পান যদ্যপি মধুসূদন গুপ্তের সহিত

ইহারা বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়েরা জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্যছাত্রেরা ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজী বৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমী প্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুসূদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে ২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।"

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের 'সমাচার-দর্পণে' লিখিত আছে :—

"আমরা শুনিতেছি যে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই পাঠশালার সন্নিধানে একটা চিকিৎসালয় স্থাপন করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক তাহা কতক শিক্ষা বিষয়ে সরকারের দত্ত ধন হইতে সম্প্রতি লওয়া যাইবেক ইংরেজী ঔষধ কোম্পানীর ঔষধাগার হইতে দিবেন আর ২ ঔষধ ঐ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ ২ চাঁদা স্বরূপ দিতে পারিবেন যদি এবিষয় নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক আর পাঠশালার বৈদ্যছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোকে যাইয়া ঔষধ পথ্য দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা এক্ষণে বড় মান্য ও চিকিৎসা বিষয়ে প্রধান কল্প হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রাচুর্য্য হইবেক।"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, ২৭ মার্চ্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' সংস্কৃত-কলেজের বৈদ্য-ছাত্রগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

যদ্যপি সাহেব লোকের এতদ্দেশীয় লোককে উভয় ভাষায় (ইংরাজী ও সংস্কৃতে) পারগ করাইতে বাঞ্ছা হয় তবে হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত কালেজে যে সকল বৈদ্য ছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণ রূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক।"

মধুসূদনের নিয়োগ সম্বন্ধে তৎকালে বহু সংবাদ-পত্রে বহু বাদানুবাদ চলিয়াছিল। যাহা হউক, ডাক্তার উইল্‌সন তাঁহাকে ক্ষুদিরাম বিশারদের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। তিনিই পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে এনাটমী শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তৎকালে 'সংস্কৃত কলেজে মেডিকাল ক্লাশ'-এ শবচ্ছেদ হইত না। ছাগল ও ভেড়া চিরিয়াই ছাত্রগণকে এনাটমী (**Anatomy**) শিক্ষা দেওয়া হইত। একবার ডাক্তার উইলসন সাহেব 'মেডিকাল ক্লাসের' ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"মেডিক্যাল ক্লাসের ছাত্রগণ জাতীয় কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়াছে। তাহারা আহ্লাদ-সহকারে মৃত মানব-দেহের অস্থি পরীক্ষা করিতেছে। এমন কি, সময়ে সময়ে তাহারা জীব-জন্তুর মৃতদেহের কোমল অংশগুলিও ব্যবচ্ছেদ করিতে কাতর হয় না।"(১)

জে. সি. মার্সম্যান।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'সংস্কৃত কলেজে মেডিকাল-ক্লাসের' ছাত্র-গণের সুবিধার নিমিত্ত একটি হাসপাতাল খোলা হয়। ইহাতে ৩০ জন রোগীর থাকিবার নিমিত্ত ৩০টা বিছানা দেওয়া হইল। 'মেডিকাল ক্লাস' সম্বন্ধে নিম্নে কয়েক খানি পত্রের ভাবার্থ দেওয়া গেল (১) :—

(১) Sadler Commission's Report on Medical Education, 1919, and its reference to the "Minutes of evidence of the House of Commons on the affairs of the East India Company, 1832." P. 491.

(১) সংস্কৃত-কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্‌ এ, পি-এচ ডি মহাশয় মহাপণ্ডিত ও উদারস্বভাব পুরুষ। তিনি বহু যত্ন করিয়া সংস্কৃত-কলেজের প্রাচীন কাগজ-পত্র ও চিঠিগুলি রাখিয়া দিয়াছেন। পরম সম্মাননীয় সুপণ্ডিত স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

১। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, ২৫ মে তারিখে 'জেনারল-কমিটী অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন' (General Committee of Public Instruction')-এর সেক্রেটারী (Secretary) গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লেখেন। ইহার ভাবার্থ এই :—

'সংস্কৃত কলেজের মেডিকাল ক্লাসে' এখন ৩টি ছাত্র (১) সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য হইয়াছে। তাহারা পাশ্চাত্য প্রণালী

জেম্‌স্ সাদার্ল্যাণ্ড।

অনুসারে বিলক্ষণ এনাটমী (Anatomy) শিখিয়াছে। এই স্কুল হইতে কয়েকটী ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা এদেশীয় বাঙ্গালীদিগকে চিকিৎসা করিতেছে। এক-জন ছাত্র 'সিভিল সার্জ্জন' (Civil Surgeon) হইয়া হিজলীতে গিয়াছে। আর একজন ছাত্র 'সংস্কৃত কলেজের ক্ষুদ্র হাসপাতালে' রোগিগণকে ঔষধ দিবার ও তাহাদিগকে পরিচর্য্যা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার জে. গ্রাণ্ট (Dr J. Grant) সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই হাস-পাতাল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হাসপাতাল দ্বারা দেশীয় লোকদিগের নিরতিশয় উপকার হইতেছে।

২। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, ১২ জুন তারিখে ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসন (Dr. Horace Hayman Wilson) গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এন্-টি প্রিন্‌সেপকে (N. T. Prinsep কে) এই পত্র লিখিয়াছিলেন :—

প্রতীচ্য প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেছে। এখানে যে হাসপাতাল খোলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের যথেষ্ট উপকার হইতেছে।

৩। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, ১লা জানুয়ারি তারিখে 'মেডিক্যাল ক্লাসের' সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার জে গ্রাণ্ট (Dr. J. Grant) সাহেব, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী মেজর ট্রয়ার (Major Troyer) সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

(ক) এই ক্ষুদ্র হাসপাতালের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তাহা দেখিয়া আপনি সুখী হইবেন।

(খ) বাবু রামকমল সেন অতি মহাশয় লোক। 'মেডিক্যাল ক্লাসের' উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করিতেছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে একটী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। ইহাতে ৩০টী রোগী রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

(গ) আমাদের হাসপাতালের জন্য একজন ইউরোপীয় এপথিকারী (European Apothecary), ঔষধ ও যন্ত্র রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পত্র লেখা হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই।

(ঘ) নবকৃষ্ণ গুপ্ত সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র। তাঁহাকে এপথিকারী (Apothecary) নিযুক্ত করা হইয়াছে। আরও এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্র এক মাস করিয়া তাঁহার সহকারী থাকিবেন, এবং দুই জনে দিবানিশি হাসপাতালের কার্য্য করিবেন।

(ঙ) আপাততঃ ৯৩ জন রোগী হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতেছে, এবং ১৫৮ জন রোগী রোগ দেখাইয়া ঔষধ লইয়া যায়। যাহারা হাসপাতালে থাকে, তাহারা এই স্থানেই আহারাদি করে। যাহারা ঔষধ লইবার জন্য না

মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই পত্রগুলির সারাংশ গ্রহণ করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম।—লেখক

(১) এই ৩টী ছাত্রের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত ও নবকৃষ্ণ গুপ্ত নিশ্চিত আছেন। তৃতীয় জনের নাম কি, তাহা বহু পুরাতন কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাইলাম না।—লেখক

আসিতে পারে, সম্ভব হইলে এপথিকারী স্বয়ং গিয়া তাহা-দিগকে দেখিয়া আসেন।

৪। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ১লা জানুয়ারী তারিখে জে গ্র্যাণ্ট (J. Grant) সাহেব, মেজর ট্রয়ার (Major Troyer) সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার ভাবার্থ এই—

(ক) এ বৎসর ৮৬ জন রোগী হাসপাতালে আছে, এবং ১৭৯ জন রোগী বাহির হইতে আসিয়া ও রোগ দেখাইয়া ঔষধ লইয়া যায়।

(খ) মধুসূদন গুপ্ত ও নবকৃষ্ণ গুপ্ত 'মেডিক্যাল-ক্লাসের' জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও আমার বিশেষ রূপ সাহায্য করেন। মধুসূদন হাসপাতালের ভার লইয়া ব্যস্ত থাকেন। নবকৃষ্ণ এপথিকারী (Apothecary) হইয়াছেন।

(গ) বাবু রামকমল সেন 'মেডিক্যাল-ক্লাসের' জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

(ঘ) ডাক্তার জন টাইটলার (Dr. John Tytler) ও ডাক্তার মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলী (Dr. Mountford Joseph Bramley) ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আমি স্বয়ং ছাত্রগণকে পরীক্ষা করি নাই, পাছে আমার প্রিয় প্রশ্নগুলি তাহাদিগকে বলিয়া দিই।
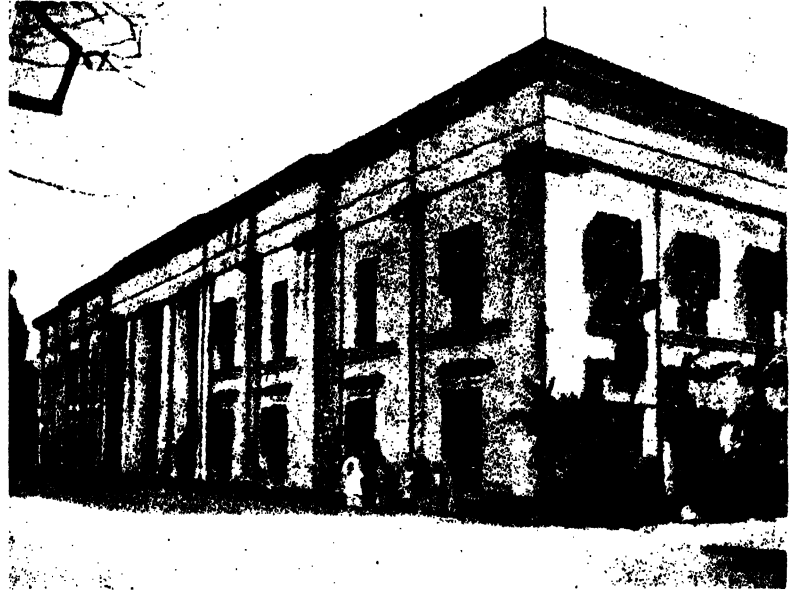
৫। ডাক্তার জন টাইট্‌লার (Dr. John Tytler), মেজর ট্রয়ারকে (Major Troyer) যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই:—

(ক) সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অনেক জ্ঞানগর্ভ তথ্য আছে। কোন কোন বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সহিত আমাদের শাস্ত্রের মিল না থাকিলেও আমি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ভাল বলিয়া মনে করি। ইউরোপীয় চিকিৎসক-গণ যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-গণ অপেক্ষা ভাল চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না। এ দেশীয় রোগিগণ, এ দেশীয় প্রথানুসারে এ দেশীয় চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলেই ভাল হয়। তাহাদের চিকিৎসা-প্রণালী অগ্রাহ্য করিয়া যে আমরা জোর করিয়া তাহাদিগকে আমাদের প্রণালীতে চিকিৎসা করিব, এরূপ কিছুমাত্র অধিকার আমাদের নাই।

(খ) যে সকল ছাত্র আমাদের 'মেডিক্যাল স্কুল' হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় আয়ুর্ব্বেদ-মতানুসারেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে তবে তাঁহারা বিলাতী প্রণালী অবলম্বন করেন। তাঁহাদের রোগিগণ আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসাই ভাল বাসেন।

কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ।

(গ) আমার এই অভিপ্রায় যে, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নহে। আরও আমার ইচ্ছা যে, ইংরাজী 'মেটিরিয়া মেডিকা' সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করা হউক।

৬। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ২ সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্কৃত-কলেজের ইংরাজী-অধ্যাপক উলাস্টন (Mr. Woollaston) সাহেব, সংস্কৃত কলেজের মেজর এ ট্রয়ার (Major A. Troyer) সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—

মধুসূদন গুপ্ত পূর্ব্বে 'মেডিক্যাল-ক্লাসের' ছাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইহার শিক্ষক হইয়াছেন। কলেজে যে সকল পণ্ডিত আছেন, ইনি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি 'হুপারস্ এনাটমিষ্টস্ ভেডিমেকাম্' (Hooper's Anatomists' Vade-mecum) নামক ইংরাজী গ্রন্থখানি সংস্কৃত-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং এই হেতু তিনি ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

৭। 'সংস্কৃত মেডিক্যাল-ক্লাসে' যে সকল পুস্তক পঠিত হইত, তাহাদের নাম এই :—

Hooper's Anatomists' Vade-mecum, Physicians' Vade-mecum, Surgeon's Vade-mecum, Thomson's Conspectus of the Pharmacopœia, Toyfe's Manual of Chemistry, Conquest's Outline of Midwifery, Tropical Diseases by Twining and Smith, Plague by Dr. Thomas, Book on Vaccination—J. C. C. Sutherland, G. O. P. I. and A. Troyer.

মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস। (১)

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' খোলা হইয়াছিল। ঠিক এই দিনেই 'মাদ্রাসা কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' খোলা হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্লাস হিন্দুগণের জন্য এবং পরোক্ত ক্লাস মুসলমান-গণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মাদ্রাসায় "মেডিক্যাল-ক্লাসে" আরবী ভাষায় লিখিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনে' (Native Medical Institution-এ) ইংরাজী চিকিৎসা-গ্রন্থের যে সকল উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সেখানে ছাত্রগণ পাঠ করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্প ছাত্রই ভর্ত্তি হইয়াছিল, এবং তাহারা বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। সংস্কৃত-কলেজ ও মাদ্রাসা কলেজের 'মেডিক্যাল-ক্লাস' ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২৮ জানুয়ারি তারিখে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তুলিয়া দিয়াছিলেন।

মাদ্রাসা-কলেজে নিম্ন-লিখিত আরবী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক সকল পঠিত হইত :—

Avessena, Aksurace, Shuruh, Sudeedee, Kanooncheh, Anees-ool-mosharra-heen (translation of Hooper's Anatomists' Vede-mecum) —General Committee of Public Instruction, 1833, Vol. XII.

ক্ষুদিরাম বিশারদ-কর্ত্তৃক "বৈদ্য-সমাজ"-গঠন

বৈদ্য-কুল-চূড়ামণি ক্ষুদিরাম বিশারদ মহাশয় 'সংস্কৃত-কলেজে' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমেই কোন অজ্ঞাত কারণ-বশতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করিলে মধুসূদন গুপ্ত ঐ পদ প্রাপ্ত হন। বিশারদ মহাশয় যোড়াসাঁকো-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বসুর বাটীতে একটী সভা-স্থাপন করেন। এই সভার নাম 'বৈদ্য-সমাজ।' ১২৩৮ বঙ্গাব্দে, ৫ শ্রাবণ, বুধবার দিবসে তিনি এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমবেত বৈদ্য কবিরাজদিগকে তিনি স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "আমরা এই 'বৈদ্য-সমাজ' হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল প্রস্তুত করিব, এবং বৈদ্য কবিরাজ ভিন্ন অন্য জাতীয় কবিরাজকে ইহা বিক্রয় করিব না। বিশেষতঃ, অন্য জাতীয় কবিরাজ যদি কোন রোগীর চিকিৎসা করে, তবে আমরা (বৈদ্য-কবিরাজ-গণ) সেই রোগীর চিকিৎসা করিব না।"

(১) মাদ্রাসা-কলেজের "মেডিক্যাল-ক্লাস" সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ১৫ জুলাই তারিখে বর্ত্তমান 'কলিকাতা মাদ্রাসা'-কলেজের ভিত্তি স্থাপন হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, আগষ্ট-মাস হইতে নিয়মিত-রূপে কলেজ বসিতে আরম্ভ হয়।—লেখক

১২৩৮ বঙ্গাব্দে, ১৭ শ্রাবণ (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ১ আগষ্ট সোমবার) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"বৈদ্য সমাজ। আমরা অবগত হইলাম যে, শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান হইয়া ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ পূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তজের দরুণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থরূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ১৩ আগষ্ট (১২৩৮ বঙ্গাব্দে, ২৯ শ্রাবণ) তারিখের 'সমাচার-দর্পণ' পাঠ করিলে 'বৈদ্য-সমাজ' সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ইহা হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"বৈদ্য সমাজ বিষয়। গত ১৭ শ্রাবণের [সমাচার] চন্দ্রিকায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন সমাচার প্রচার হইয়াছে ঐ সুসম্বাদ প্রভাকর পত্র হইতে অত্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে এক্ষণে তদ্বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম।

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক [খুদিরাম] বিশারদ কর্ত্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্ব নিমিত্ত এবং অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্ন জন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবার তদ্বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন। কিন্তু তাঁহার নানা বিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এ প্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজ দ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্য ভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে স্বজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদি দ্বারা লোক সকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না।

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করিবেন। চিকিৎসা বিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেন না আমারদিগের শাস্ত্রে এমন নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঔষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে আর সেই রোগে মুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা ঔষধ সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধর্ম্মহানি হয় ইত্যাদি অনেক দোষ দর্শান যাইতে পারে। যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছে যথা। ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এমত নহে যে পীড়া হইলে ব্রাণ্ডি কেলারট আদি মদ্য আনিয়া পান করিবেন ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় ঔষধার্থে নিষিদ্ধ দ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরাই ব্যবস্থাই দিবেন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত ব্যবসায়ি বৈদ্য ভিন্ন অন্যের ঔষধ কোনমতেই গ্রাহ্য নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য ধার্ম্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সুগন্ধা গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাঁহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৈদ্যতিলক উপাধি প্রদান করেন কিন্তু তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত ঔষধের ব্যবস্থা বিবেচনা করাইতেন।

যদি কেহ এমত কহেন আমাদিগের দেশে এক্ষণে সুপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পোঁতের বেদাই অনেক তাঁহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্য জাতীয় চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে সুতরাং লোকদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তার-দিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তার সাহেবদিগের মহামান কিন্তু দীন দুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা ঐ হাতুড়িয়ে বা পোঁতের বৈদ্য দ্বারাই হইতেছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তার সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাঁহাদিগের চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এজন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল ঐক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান মহাশয়দিগের প্রকাশ পত্রে অনুরোধ করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়েরা কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে ঐ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন।"

[ক্রমশঃ

[৮০]

যতদূর জানা যায় কবীন্দ্র বিরচিত পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাণ্ডবকথাই বাঙ্গালায় মহাভারতের প্রাচীনতম 'অনুবাদ'। অনুবাদার্থে গল্পাংশের 'অনুবাদ' বুঝিতে হইবে। উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে সমগ্র মহাভারতের কোন বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হয় নাই। দৈবাৎ দুই একটি পুঁথিতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার"[১] ইত্যাকার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর এবং তাঁহার উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"। কিন্তু কোন প্রামাণিক পুঁথিতেই "পরমেশ্বর" নাম পাওয়া যায় না। "কবীন্দ্র পরম যত্নে রচিল পয়ার" ইত্যাকার ভণিতাই লিপিকার প্রমাদে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে" পরিণত হইয়াছে এই অনুমান করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, পরমেশ্বর নামক কোন গায়ক স্বীয় নাম কাব্যমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন।[২]

কবীন্দ্র মহাভারতের সমগ্র কাহিনীরই অনুবাদ করিয়াছিলেন, স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত নহে। কবীন্দ্রের সমগ্র মহাভারত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবীন্দ্রের কাব্য সংক্ষিপ্ত, কাশীরাম প্রভৃতির কাব্যের মত সুবৃহৎ নহে। সংক্ষেপে রচনা করিবার ইতিহাস কবি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

[৮১]

কবি এবং কাব্যের বিষয় যাহা পাণ্ডববিজয় হইতে জানা যায় তাহা এই। গৌড়ের সুলতান আল্লাউদ্দীন হুসেন সাহের অন্যতম প্রধান সেনাপতি (লস্কর) পরাগল খান চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় যুদ্ধার্থে প্রেরিত হন। তথায় বিজয়ী হইয়া সুলতানের নিকট প্রচুর সম্মান ও খিলাত প্রাপ্ত হন এবং ঐ অঞ্চলেই রহিয়া যান। সভায় মহাভারতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে একদিন পরাগল খানের ইচ্ছা হইল, তিনি সংক্ষেপে 'মহাভারত পাঁচালী' শুনিবেন। পরাগলের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কবীন্দ্র 'মহাভারত পাঁচালী' রচনা করিলেন। ইহাই কাব্যরচনার ইতিহাস। হুসেন শাহ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। সুতরাং কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক ধরা যাইতে পারে।

কলিযুগে অবতার গুণের আধার। পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার ॥
সুলতান আলাপদীন[৩] প্রভু গৌড়েশ্বর। এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার ॥
রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া। শয়ানে পালঙ্ক দিল এক শত ঘোড়া ॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি। এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি ॥
লস্কর পরাগল[৪] অনন্ত কাহিনী। যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর। কেন মতে ধর্ম্ম রহিল বনের ভিতর ॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত বসতি। কেন মতে তারা সবে পাইল বসুমতী ॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া। দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া ॥
তাঁহার আদেশ মাল্য[৫] মস্তকে করিয়া। কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সংখ্যক পুঁথিতে (লিপিকাল ১৬১০ শক) আছে[৬]—

রাস্তি খান[৭] তনয় বহুল গুণনিধি। পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি ॥
সুলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাথ। ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ ॥
সোনার পালঙ্ক দিল এক শত ঘোড়া। সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া ॥
তাহান আদেশ তবে শিরেতে ধরিয়া। কবীন্দ্রে কহিল কথা পাঁচালী রচিয়া ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৬৯ সংখ্যক পুঁথিতে[৮] আছে—

শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি। দারিদ্র্যভঞ্জন যেই অনাথের গতি ॥
কুতুহল বহুল ভারত কথা শুনি। কেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
বনবাসে বঞ্চিবেক দ্বাদশ বৎসর। কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর ॥
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বসতি। কেমত পৌরুষে পাইলেক বসুমতী ॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষিপ্ত করিয়া। দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া ॥[৯]

১। এই ছত্র ছাড়া অন্যত্র 'পরমেশ্বর' নাম (?) পাওয়া যায় না। ২। কবীন্দ্র রচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ধুবড়ী, আসাম হইতে প্রকাশিত; ভূমিকা, পৃঃ ৸৹।

৩। আলাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্। ৪। 'পরগল খান'। ৫। 'মাল্য'। ৬। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত —শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬৬। ৭। রাস্তি খান পরাগলের পিতা ছিলেন। ৮। লিপিকাল ১৬৩২ শক। ৯। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড —দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১১০।

কেহ কেহ এমন কথা বলিয়া থাকেন যে কবীন্দ্র মহাভারত সম্পূর্ণ করিবার আগেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের মৃত্যু হয় এবং অবশিষ্টাংশ পরাগলের পুত্র ছুটিখানের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি নাই, বরঞ্চ বিপরীতে আছে। পাণ্ডববিজয়ের অধিকাংশ পর্ব্বেরই শেষে ভণিতাংশে পরাগল খানের উল্লেখ আছে। যেমন,

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
কবীন্দ্র কহিল আস্ত পর্ব্ব সমাপ্তি ॥১

লস্কর পরাগল খান মহা দাতা কর্ণ সম
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি জোড় হাতে
সভাপর্ব্ব কৈল বিরচিত ॥২

লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
বনপর্ব্ব কবীন্দ্র কহিল অবস্থান ॥৩

বিরাট পর্ব্বের কথা এহি (হৈতে) সমাধানে।
কবীন্দ্রে কহিল কথা পরাগল স্থানে ॥৪

লস্কর পরাগল মহিমা অপার।
কবীন্দ্রে কহিল কথা পয়ার ॥৫

ভীষ্ম পর্ব্বের কথা এহি সমাধান।
কবীন্দ্র কহিল কথা পরাগল স্থান ॥৬

বৈশম্পায়নে কহে (কথা) জন্মেজয় শুনে।
কবীন্দ্র কহিল তাক পরাগল স্থানে ॥৭

ইহলোকে সুখভোগ পরকালে স্বর্গলোক
ভারতের পুণ্য কথা শুনি।
শ্রীযুত নায়কচর লস্কর পরাগল
কবীন্দ্রেত পুছে পুনি পুনি ॥৮

ভারতের পুণ্যকথা অমৃত সমান।
শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খান ॥৯

লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার। কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। পাণ্ডব বিজয় শুনি মনে কুতূহলে ॥১০

[৮২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৬৯৭ সংখ্যক পুঁথিতে[১২] স্বর্গারোহণ পর্ব্বের পূর্ব্বে "ব্যাসাশ্রম পর্ব্ব" বলিয়া একটি নূতন পর্ব্ব সন্নিবিষ্ট আছে। নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাংশ দেখিলে ইহা কবীন্দ্রের রচনা বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশিত কবীন্দ্র-মহাভারতে এই অংশ নাই।

লস্কর ১২ পরাগল আপনে পুছন্ত। কোন বিধি করিলেন বিষ্ণুবংশ অন্ত ॥
কহন্ত কবীন্দ্রে কথা গুণের সাগর। যেন মতে শরীর এড়িল গদাধর ॥
যেন মতে মুনি দিলা বিষ্ণু বংশে শাপ। রভস সংগ্রাম যেন আছিল কলাপ ॥
যেন মতে সোমক বিষ্ণু বংশের নিধন। সংবাদ আছিল যেন নরনারায়ণ ॥
সংক্ষেপিয়া তাহাক কবীন্দ্রে কহে সার। ভাগবতে বিস্তারিয়া কহিছে ইহার ॥
তাহাক লিখিলে গ্রন্থ১৩ হয়ে গুরুতর। এহা লাগিয়া সেহ কথা এড়িল সকল ॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী। শুনন্ত ভকত জনে কর্ণঘট ভরি ॥
লস্কর১৪ পরাগল গুণের সাগর। যার কীর্ত্তি ঘোষন্ত পঞ্চম গৌড়েশ্বর ॥
তাহান আদেশ তবে শিরে আরোপিয়া। কবীন্দ্র রচিল সব পয়ার রচিয়া ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার। যাহাকে ভাবিলে লোক পাইব নিস্তার ॥১৫

পর্ব্বের মধ্যভাগেও কোন কোন স্থলে পরাগল খানের উল্লেখ আছে। যেমন,

শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খানে। যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পিতার কারণে।
কি কারণে দুর্য্যোধন ইচ্ছিল মরণে। কি কারণে কুমন্ত্রণা কৈল রাজাগণে ॥
কবীন্দ্রে কহিল শুন খান মহামতি। যজ্ঞ পূর্ণা দিল যবে ধর্ম্ম নরপতি ॥১৬
ইত্যাদি।

[৮৩]

কবীন্দ্র-মহাভারতের নাম পাণ্ডববিজয় বা বিজয় পাণ্ডব। প্রায় প্রত্যেক পুঁথিতেই পর্ব্বের পুষ্পিকায় আছে "ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে" অথবা "ইতি পাণ্ডববিজয়ে"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সংখ্যক পুঁথির ১২৫ ক পৃষ্ঠায় এই শ্লোক দুইটি আছে[১১]—

ভারতামৃতসিন্ধার্থং রসং বিজয়পাণ্ডবম্।
পায়ং পায়মতো নিত্যং মহাকীর্ত্তিপরান্বিতম্ ॥
শ্রীপরাগলখানস্য মহানুগ্রহগৌরবাৎ।
দেশ ভাষামেবাবাপ্য১৮ কৌতুকাদকরোৎ কবিঃ ॥

১। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ২২, পাদটীকা। ২। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ৩৮। ৩। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ৫৪, পাদটীকা। ৪। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ৭৮, পাদটীকা। ৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি, উদ্যোগ পর্ব্ব; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬২। ৬। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ১১২। ৭। কবীন্দ্র মহাভারত, দ্রোণ পর্ব্ব, পৃঃ ১৩৮। ৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি, কর্ণ পর্ব্ব। ৯। শল্য পর্ব্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা ১৭১। ১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৬৯ সংখ্যক পুঁথি, অশ্বমেধ পর্ব্ব পরীক্ষিৎ-জন্ম।

১১। পুঁথিটির লিপিকাল শক, সন এবং খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া আছে—শক ১৭২১, সন ১২০৬, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯৬ "মাহে আবরিল"। ১২। 'লস্কর'। ১৩। 'গ্রহন্ত'। ১৪। পত্রাঙ্ক ১৪ ক-খ। ১৫। কবীন্দ্র মহাভারত, সভাপর্ব্ব, পৃঃ ২১। ১৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬৩। ১৭। 'দেসভাসাবের্ব্যাবাচ্য'।

কবীন্দ্র মহাভারতের বিশিষ্ট পুষ্পিকা এই—

বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

অথবা—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার ॥

কোন কোন পুঁথিতে কচিৎ পরাগলের ভণিতা পাওয়া যায়; যথা—

লস্কর পরাগল ভুবন বিদিত।
করিলেক পাচালি লোকের হৈল হিত ॥

[প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১৭২] ॥

কবীন্দ্রের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাহারও কাহারও মতে কবির নাম ছিল শ্রীকর নন্দী, 'কবীন্দ্র' বা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' তাঁহার উপাধি মাত্র। কিন্তু শ্রীকর নন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী প্রস্তাবে আলোচনা করিব। কবীন্দ্র-মহাভারতের সম্পাদকের মতে কবীন্দ্র কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। নরনারায়ণ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবীন্দ্রের নাম ছিল বাণীনাথ, 'কবীন্দ্র' তাঁহার উপাধি। রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'কবীন্দ্রপাত্র' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১] কুচবিহার গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রবাদও আছে যে "গৌরীপুর রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ কবীন্দ্র পাত্র কর্ত্তৃক ঐ মহাভারতখানি লিখিত হইয়াছিল।"[২]

কবীন্দ্র মহাভারতের সম্পাদকের উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করিবার মত তেমন কিছু মালমসলা নাই। তবে কবি যে উত্তর বাঙ্গালার লোক তাহা ভাষাদৃষ্টে অবধারণ করা কঠিন নহে। কবীন্দ্র-মহাভারতের পুঁথি শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে নহে, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, কুচবিহার, রঙ্গপুর অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। উত্তর বঙ্গে কবীন্দ্র-মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের পাঠ এখনও হইয়া থাকে।[৩]

পরাগল খান 'দিনেকে' মহাভারতের পাঁচালী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে কবীন্দ্র কাব্যটি খুব সংক্ষিপ্ত করিয়া রচনা করেন। তথাপি কোন মুখ্য কাহিনী বাদ পড়ে নাই। ইহা কবির বাহাদুরীর নিদর্শন বটে। সংক্ষিপ্ত বলিয়া পাণ্ডববিজয় অত্যন্ত বর্ণনামূলক এবং তজ্জন্যই ইহাতে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ ছিল না। আর কবিও তাহার জন্য বিশেষ মাথা ঘামান নাই। রচনার নমুনা হিসাবে দুর্য্যোধনের পতনে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির মহাশয়। দেখি মহা শোকাকুল হৈল অতিশয় ॥
ভীমকে বিস্তর পাছে বোলে ধর্ম্মরাজ। এত বড় কুকর্ম্ম করিলা সভামাঝ ॥
জানিবা পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন। বিশেষ আমার হয়ে ভাই জ্ঞাতিজন ॥
কেনে তাক চরণে মারিলা কুলাধম। মারিলাহা কুরুপতি যুদ্ধ-অনিয়ম ॥
অন্যায় সমরে যদি না মারিলা হয়। তবে কি জিনিয় দুর্য্যোধনক নিশ্চয় ॥
মূৰ্চ্ছিত হৈলে তুমি না করে সমর। অন্যায় মারিলা তাক শুন রে বর্ব্বর ॥
সসাগরা পৃথিবীর নৃপ অধিপতি। কি কারণে সভাতে মারিলা তাকে লাথি ॥
এহি বুলি ধর্ম্ম কান্দে করিয়া বিলাপ। ধরণীত পড়িয়া রহিলা কেনে বাপ ॥
প্রচণ্ড অনল কেনে হৈল প্রভাহীন। যত রাজলক্ষণ তোমাতে আছে চিহ্ন ॥
জলধ মুকুট মণি কিরণ পরায়। এহেন শোভিত মণি ধরণী লোটায় ॥
সসাগরা পৃথিবীর হৈলা অধিকারী। ভূমিত পড়িয়া রৈলা সব পরিহরি ॥
তোমাতে পুঁজিলো গ্রাম কৃষ্ণক পাঠায়া। শকুনির বোলে গ্রাম না দিলা ছাড়িয়া ॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলা বোল। গুরুবাক্য না শুনিলা মৃত্যু দিল কোল ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী। কি বলিয়া প্রবোধিব শতেক রমণী ॥
পুত্রশোকে অন্ধরাজা হৈবেক বিকল। ভোকে ভাত না খাইব পিয়াসত জল ॥
কান্দে সব রাজাগণ যুধিষ্ঠির সনে। ভূমে গড়াগড়ি দেয় রাজা দুর্য্যোধনে ॥
ভ্রাতৃ পুত্র শোক মহা সহন না যায়। ভাই ভাই বুলি রাজা কান্দে উচ্চরায় ॥[৪]

[৮৪]

কবীন্দ্রের "বিজয়পাণ্ডব-কথা"ই অজ্ঞ লিপিকারদিগের হস্তে পড়িয়া "বিজয়পণ্ডিত কথা" হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি। এই তথাকথিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের কতক অংশ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কবীন্দ্র-মহাভারত এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত যে একই বস্তু তাহা গ্রন্থ দুইখানি মিলাইয়া দেখিলে সংশয়চ্ছেদ হইতে বিলম্ব হইবে না।

১। ভূমিকা, পৃঃ ৷/০। ২। ভূমিকা, পৃঃ /০। ৩। ভূমিকা, পৃঃ ৷৷/০।

৪। কবীন্দ্র মহাভারত, পৃঃ ১৭৩।

[৮৫]

পরাগল খানের পুত্র লস্কর ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক কবি মহাভারতের অন্ততঃ অশ্বমেধ পর্ব্বের 'অনুবাদ' করিয়াছিলেন। তখন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ গৌড়ের 'অধিরাজ'। কবি নিজের পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা এবং কাব্যরচনার ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন—

পৃথিবীর মধ্যে পুরী সেই এক ভাল। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাক্রি কোন কাল ॥
যাহার সমীপে রহে দেবী ভাগীরথী। বড়ই সুখদা পুরী মরণে মুকতি ॥
নসরত সাহা নামে তথি অধিরাজ। রাম সম প্রজা পালে করে রাজকাজ ॥
নৃপতির যত সব তনয় সুমতি। সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥
তার বর সেনাপতি শ্রীমত ছুটিখান। ত্রিপুরার১ গড়ে গজবাজী কৈল সন্নিধান২ ॥
অদ্ভুত নগর নিকটে ভাল পুরে। চন্দ্রশেখর নাম পর্ব্বত উপরে।
চরণা নগরি নাম পৈতৃক বসতি৩। পুরীর যতেক গুণ বর্ণিব ভারতী ॥
তাহার ঈশ্বর সেই ক্রমদীশ্বর নাম। ভবানী সহিতে নিবসে অবিরাম ॥
যতেক পুরীর গুণ সব আছে তায়। চারি বর্ণে বৈসে লোক শোক নাক্রি পায় ॥
মহানদী ভাগীরথী৪ বহে চারি ধারা। পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি আছে সর্ব্বজয়া ॥
দেবের প্রবন্ধ গড়ে প্রবেশিতে নারি। আছুক শত্রুর কাজ নাক্রি ডাকা চুরি ॥
মহাবল পরাগল৫ খানের তনয়। সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন। বিশাল নয়ন মত্ত গজেন্দ্র গমন ॥
পৃথিবীতে জন্মিল যেন ফুলধনু। প্রসন্ন বদন অতি সুললিত তনু ॥
চতুঃষষ্টি৬ কলার বসতি গুণনিধি। যারে অতি যত্ন করি নির্ম্মাইল বিধি ॥
নরসিংহ সমান যে বীর সমসর। ধনঞ্জয় সমান সে বীর ধনুর্দ্ধর ॥
কপটের লেশ নাই প্রসন্ন হৃদয়। রাম সম পিতৃভক্তি৭ খান মহাশয় ॥
বাপের বল্লভ পুত্র কুলের নন্দন। কলিকাল অবতরি বিপক্ষ তপন ॥
যাহার সহজ গুণ শুনিল নৃপতি। সম্বাদি বিষয় ছিল হরষিত মতি৮ ॥
নৃপতির আনন্দেতে বহুত সম্মান। ত্রিপুরার গড়ে গজ বাজী কৈল সন্নিধান৯ ॥
লস্কর১০ বিষয় তথা পাইয়া মহামতি। সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥
ত্রিপুরার রাজা১১ ভয়ে এড়ি গেল দেশ। পর্ব্বতকন্দরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।১২ অভয় করিয়া তারে কইল নিবারণ ॥
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি। তথাপি আতঙ্কে ত্রিপুরা নৃপতি ॥

১। 'তিরার'। ২। 'সম্বিধান'। ৩। 'সুমতি'। ৪। ইহা বোধ হয় লিপিকার প্রমাদ; অন্যত্র 'ফনি নাম নদিএ'। ৫। 'পরাক্রম'। ৬। 'চতুরস্থি'। ৭। 'পিতৃভক্তি'। ৮। 'সামদানে দণ্ডভেদে প্রাণের কুমতি'। ধৃত-পাঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি হইতে। ৯। 'সম্বিধান'। ১০। 'নস্কর'। ১১। 'ত্রিপুরা রাজার'। ১২। 'সন্ধান' অন্যত্র।

বহুকাল ভিউক লস্কর মহাশয়। মূর্খ১৩ পণ্ডিত বিদ্যা সভাকার হয় ॥
হেন সুললিত সভাখণ্ড মহামতি। একদিন বসিলেন বান্ধব সংহতি ॥
শুনিল ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনি পুরাণ সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা শুনি আনন্দ হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
ব্যাসমুনি ভারত শুনি চারুতর। তাহাত কহিল জৈমিনি মুনিবর ॥১৪
সংস্কৃত ভারত না বুঝেন সর্ব্বজন। মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ ॥
দেশভাষে এই কথা করিয়া প্রচার। সঞ্চরুক কীর্ত্তি মোর জগত ভিতর ॥
তাহার১৫ নিদেশমালা মাথে আরোপিয়া। শ্রীকর নন্দী বলে পাঁচালি রচিয়া ॥১৬

এই কথা যতগুলি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে উপরি উদ্ধৃত বিবরণটিই বিস্তৃততম। তথাপি ইহার মধ্যেও যে লিপিকার প্রমাদ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরের পুঁথির আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, উহার ভাষা পূর্ব্ব-বঙ্গীয় নহে। অন্যান্য পুঁথি এবং মুদ্রিত পুস্তকের১৭ উল্লেখ-যোগ্য পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

পৃথিবীর মধ্যেত প্রধান এক স্থান। উপদ্রব নাই কোন অতি পুণ্যবান্ ॥
নসরত সাহা নাম অতি মহারাজা। পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা ॥
নৃপতি হুসেন সাহা তনয় সুমতি।১৮ সাম দণ্ড ভেদে পালে সর্ব্ব বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান। ত্রিপুরা গড়েত গিয়া কৈল সন্নিধান ॥
চাটিগ্রাম নগরক উত্তর প্রধান। চন্দ্রশেখর নাম পর্ব্বতের স্থান।
চরো নাম নগর যে পৈতৃক বসতি। সে পুরীর যতেক গুণ কহিবাম১৯ কতি ॥
আপনি মহেশ তথা ক্রমদীশ্বর২০ নাম। উনকোটী শিবলিঙ্গ বৈসে অবিরাম ॥
চারি বর্ণে বৈসে প্রজা সেনাসন্নিপাত। নানা গুণবন্ত সব বৈসয়ে তথাত ॥
ফনি নাম নদীএ বেষ্টিত চারিধার। পূর্ব্বেতে যে মহাগিরি অধিক বিস্তার ॥
দৈবের নির্ম্মাণ সে যে প্রলংঘন পুরী। আছটক শত্রুর ভয় নাই ডাকাচুরি ॥
* * *
ঘোটক পসায় ক্ষিতি পাইল ছুটিখান। নৃপতি অগ্রেতে পাইল বহুল সম্মান ॥
লস্কর বিষয় পাই খান মহামতি। সামদণ্ডভেদে পালে সর্ব্ব বসুমতী ॥
ত্রিপুরার নরপতি ভয়ে ছাড়ে দেশ। পর্ব্বতকন্দরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্ধান। মহাবন মধ্যে পুরী করিল নির্ম্মাণ ॥২১

১৩। অথবা 'অর্থ'। ১৪। 'জাহার'। ১৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠান্তর দ্রষ্টব্য। ১৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা ২৬২১ (লিপিকাল সন ১১৬৯, শক ১৬৮৪, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬২), পত্রাঙ্ক ১-২। ১৭। ছুটি খানের অশ্বমেধ পর্ব্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮। 'নৃপতি হুসন সাহা যেঅ ক্ষিতিপতি' মুদ্রিত পুস্তক। ১৯। 'কহিবম'। ২০। 'ক্রমতিস'।

২১। অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
গজ বাজি বারি দিয়া করিল সম্মান। মহাবল মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি। তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥
আপনি নৃপতি সম্বর্পিয়া বিশেষে। সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজ সম্মান। যাবত পৃথিবী থাকে সম্ভতি তাহান ॥

পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খান মহামতি। একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥
শুনন্ত ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনির রচিত সংহিতা ॥
অশ্বমেধ কথা ১ শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
ব্যাসগীত ভারত শুনিল চারুতর। যার হেতু জৈমিনিএ রচিল সকল ॥
দেশী ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার। সঞ্চরৌ২ কীর্ত্তি মোর জগত সংসার ॥
তাহান আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া। শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালি
রচিয়া ॥৩

বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ের প্রথমখণ্ডে[৪] ১৫৮৫ শকের লেখা পুঁথি হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পাঠ্য নিম্নে দেওয়া গেল।

পৃথিবীর মুখ্য পবিত্র একস্থল। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল ॥
যেমন সর্ব্বংসহা তেমতি মহারাজা। রাম হেন বহু নিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসন সাহা যেমন ক্ষিতিপতি। সাম দান দণ্ড ভেদে পালএ বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান। ত্রিপুরার উপরে করিল সন্বিধান ॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে। ;;;...চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের উপরে ॥
চারলোল গিরি তার পৈতৃক বসতি। বিধিএ নির্ম্মাণ তাকে কি কহিব অতি ॥
চারি বর্ণে বসে লোক সেনাসন্নিহিত। নানাস্থানে প্রজা সব বসয়ে তথিত ॥
ফণী নাম নদীএ বেষ্টিত চারিধার। পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥

... ...

তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি। সংবাদ দিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
নৃপতির অগ্রেতে তার বহুল সম্মান। ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান ॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি। সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥

... ...

তাহান আদেশ মাল্য[৫] মস্তকে করিয়া। শ্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥

[৮৬]

এই শ্রীকর নন্দীকে (মতান্তরে শ্রীকরণ নন্দী) লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন, শ্রীকর নন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়া জুড়িয়া দিয়া কবীন্দ্র-বিরচিত তথাকথিত 'পরাগলী মহাভারত' সম্পূর্ণ করেন। অপরে বলেন, শ্রীকর নন্দী আর কবীন্দ্র একই ব্যক্তি। কবির নাম শ্রীকর নন্দী, এবং উপাধি কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর।[৬]

যাঁহারা শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্রের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের অনুমানের সপক্ষে যুক্তি হইতেছে এই যে, একই পুঁথিতে কবীন্দ্র এবং শ্রীকর নন্দীর ভূমিকা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, কুত্রাপি 'কবীন্দ্র শ্রীকর নন্দী' এই যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কবীন্দ্র যে উপাধি তাহা বলিবার কি হেতু আছে? 'কবীন্দ্র' 'গুণরাজখান'এর মত নামান্তর হইতে পারে। অপরঞ্চ, ছুটিখানের পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্বমেধ পর্ব্ব রচিত হইলে পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বর্গারোহণ পর্ব্ব কি করিয়া রচিত হইতে পারে?[৭] ইহার সপক্ষে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শ্রীকর নন্দী সর্ব্বশেষে অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন, তখন পরাগল জীবিত ছিলেন না।[৮] কিন্তু এই সকল যুক্ত্যাভাসের বিরুদ্ধে প্রবলতম যুক্তি হইতেছে, শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্র রচিত স্বতন্ত্র দুই অশ্বমেধ পর্ব্বের অস্তিত্ব। কবীন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব্ব অনেক বড়। কবীন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্বে আছে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ভীম অশ্ব আনিতে গমন করিলেন। শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব্বে দেখিতে পাই, ভীমের যাত্রা করিবার সময় ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে একটিকে অপরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ না বলিয়া স্বতন্ত্র রচনা বলিতেই হয়।

অনুমান হয়, শ্রীকর নন্দী পুরা মহাভারতই রচনা করিয়াছিলেন। এই মহাভারত কবীন্দ্রের মহাভারত অপেক্ষা অনেক বড়। কবীন্দ্র 'জৈমিনি ভারত' অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর শ্রীকর 'সঞ্জয় (বা বৈশম্পায়ন) ভারত' অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতই কালান্তরে ও লিপিকার-মাহাত্ম্যে 'সঞ্জয় মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে।

এই অনুমান যে ভিত্তিহীন নহে তাহা শ্রীকর নন্দীর বাক্যেই প্রমাণিত হইতেছে। একদিন ছুটিখান সভায় বসিয়া মহামুনি জৈমিনি রচিত (এবং কবীন্দ্র অনূদিত)

১। 'পুণ্য'। ২। 'সঞ্চরৌক' মুদ্রিত পুস্তক। ৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬। ৪। পৃঃ ৬২৮-৬৩০। ৫। 'মাল্য' হইবে। ৬। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬১, ১৬৮।

৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৬৯৭ সংখ্যক পুঁথির স্বর্গারোহণ কার্য্যের পুষ্পিকায় আছে—

পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর ॥
তাহান আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া। শ্রীকর নন্দিয়ে কহে পাঁচালি
রচিয়া ॥

৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা. চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬৭।

'সংহিতা' (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত) মহাভারত শুনিতেছিলেন। অশ্বমেধ পর্ব্ব শুনিয়া খান মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন ব্যাসরচিত মহাভারত, যাহা হইতে জৈমিনি সার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আরও সুন্দর। এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীকর নন্দীকে ব্যাস-মহাভারত দেশী ভাষায় রচনা করিতে আদেশ করিলেন, যাহাতে করিয়া (তাঁহার পিতার মত) তাঁহারও কীর্ত্তি জগতে সঞ্চারিত হয়।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খান মহামতি। একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥
শুনন্ত ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনির রচিত সংহিতা।
অশ্বমেধ কথা১ শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
ব্যাসগীত ভারত শুনিল চারুতর। যার হেতু জৈমিনিএ রচিল সকল ॥
দেশি ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার। সঞ্চরউ২ কীর্ত্তি মোর জগত সংসার ॥
তাহান আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া। শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥৩

[৮৭]

যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা নূতন সংবাদ নহে যে, তথাকথিত 'পরাগলী' মহাভারতের দুইটি রূপ প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়, একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত রূপটি 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে' এবং বিস্তৃতটি 'সঞ্জয়ের মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে। আমি বলিতে চাই প্রথমটি কবীন্দ্রের মহাভারত এবং দ্বিতীয়টি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। যেমন প্রাচীন কাব্যের পুঁথিতে হইয়া থাকে, তেমনি এই দুইটি মহাভারতের মধ্যেও অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া ভণিতাংশে পরস্পর অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই কবীন্দ্রের মহাভারতে শ্রীকর নন্দীর ভণিতা এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে কবীন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

[৮৮]

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রীকর নন্দীর মহাভারতই 'সঞ্জয়ের মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে। ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। তথাপি ক বী ন্দ্র ম হা ভা র ত যে 'সঞ্জয় মহাভারতের' মূলে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সঞ্জয় ভারতে অনেক নূতন আখ্যান আছে, এবং অনেক আখ্যানের বিস্তৃততর বিবরণ আছে।৪ তথাপি 'সঞ্জয় মহাভারতের' স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রাচীনসাহিত্যালোচনাকারিদিগের মধ্যে প্রবল মতভেদ বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভণিতার মধ্যে কেবল পৌরাণিক সঞ্জয়েরই অস্তিত্ব পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'সঞ্জয়' নামে বা ভণিতায় কোন বাঙ্গালী কবি ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় বসন্তবাবুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন।৫ সুধীরবাবুর যে পুঁথি লইয়া আলোচনা তাহার কতকগুলি ভণিতায় তিনি পৌরাণিক এবং অপৌরাণিক দুইজন সঞ্জয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতে তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়—

সঞ্জ এ গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয় ॥৬

অর্থাৎ (পৌরাণিক) সঞ্জয় কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তক (অপৌরাণিক) সঞ্জয় (ভাষায়) বর্ণনা করিতেছেন।

সঞ্জ এ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয় ॥৬

অর্থাৎ (পৌরাণিক) সঞ্জয় কর্ত্তৃক কথিত কাহিনী (অপৌরাণিক) সঞ্জয় (ভাষায়) ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, কবি এই সকল স্থলে যেন ইচ্ছা করিয়াই ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুধীরবাবুর পুঁথির একটি ভণিতা এইরূপ—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারত কথা কহে কুতূহলে ॥৭

অনুরূপ ভণিতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও একটি পুঁথিতে পাইয়াছেন।৮ কিন্তু এই স্থলে যে পৌরাণিক সঞ্জয় উল্লিখিত হইতেছেন না তাহা কে বলিল? শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক পুঁথিতে পাইয়াছেন—

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জয় রচিলা কৈল পাঁচালি প্রচার ॥৯

এখানে দেব-অংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমার পৌরাণিক সঞ্জয় ভিন্ন আর কে হইতে পারে? এখানে ভাষার দিকে দৃষ্টি

১। 'পুণ্য'। ২। 'সঞ্চরৌ'। ৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সংখ্যক পুঁথি (লিপিকাল ১৬১০-১১ শক); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৬২-১৬৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭২১ সংখ্যক পুঁথি।

৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, বসন্তবাবুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ৫। ঐ, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৩১-১৪৩। ৬। ঐ, পৃঃ ১৩৯। ৭। ঐ, পৃঃ ১৪২। ৮। ঐ, পৃঃ ১৪১। ৯। ঐ, পৃঃ ১৪২।

করিলে ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। 'সঞ্জয় রচিলা' এবং অনুল্লিখিত ব্যক্তি 'কৈল পাঁচালী প্রচার'।

যিনিই হন, একজন সংগ্রহকার (ও কবি) যে জোড়া-তাড়া দিয়া 'সঞ্জয় মহাভারত' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। এবং এই সংগ্রহকার যে পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও স্বীকর্ত্তব্য। এখন কথা হইতেছে ইনি কে? এই সমস্যার সমাধানে একটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় একটি মহাভারত পুঁথির ভণিতায়।[১] মহাভারতের পুঁথিতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। তন্মধ্যে সঞ্জয়ের কতকগুলি ভণিতা মূল্যবান্। ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিতেছি।

হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি। সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতী॥
ব্যাসদেব হোতে মহাভারত প্রচার। সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালি পয়ার॥

শ্লোক ভাঙ্গিয়া পোথা কুরিয়া পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
দীনহীন মূঢ় মতি হরি নারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ।
রচনা বিশেষত নানারসমএ।
হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥

এখানে দ্বিতীয় ভণিতাটিতে 'হরিনারায়ণ দেব' দ্ব্যর্থ-বোধক; কিন্তু অপর দুইটি ভণিতায় 'হরিনারায়ণ দেব' অসন্দিগ্ধভাবে কবির নাম বুঝাইতেছে। প্রথম ভণিতাটি হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কবি 'সঞ্জয়' এই উপনাম (অভিমান) আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'দেব' ব্রাহ্মণের উপাধি হয় না, সুতরাং 'হরিনারায়ণ দেব' কবির নাম হইলে, কবিবর ব্রাহ্মণকুমার হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে কবি বৈদ্যবংশীয় এবং বিক্রম-পুর বাসী ছিলেন, কিন্তু কোথা হইতে যে এই সংবাদ পাওয়া গেল তাহা তিনি বলেন নাই।

(ক্রমশঃ)

১। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত, ১৩২১, পৃঃ ১৭২।

পুরুষ ও স্ত্রী

পুরুষ এবং স্ত্রীর আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম, গুণ এবং কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়, একটি অপরটির পূরক; একটি যে কার্য্য আরম্ভ করেন, অপরটি তাহা শেষ করেন; সন্তান জননের আরম্ভ পুরুষ হইতে, শেষ স্ত্রী হইতে; সন্তান-পালনের আরম্ভ স্ত্রী হইতে, শেষ পুরুষ হইতে; উপার্জ্জনের আরম্ভ পুরুষ হইতে, শেষ স্ত্রী হইতে। মানুষের জীবন-ধারণের জন্য যত কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার প্রত্যেক কর্ম্ম কতকাংশ পুরুষোচিত গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত এবং কতকাংশ স্ত্রীজনোচিত গুণসম্ভূত শক্তির সহিত সমঞ্জসীভূত। দুই জনের কর্ম্মশক্তি লইয়া একটা পুরা মানুষের কর্ম্মশক্তি হয়। দুইজন সমধর্ম্ম অথবা সমগুণ অথবা সম কর্ম্মশক্তি বিশিষ্ট নহে। দুই জনকে সমান করিতে যাওয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মের অসমঞ্জসীভূত এবং তাহাতে জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত। কাজেই মানুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমেই স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য বিভক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। মনে রাখিতে হইবে, এই বিভাগ শুধু কর্ম্ম করার রকমে। লক্ষ্য এক কর্ত্তব্য—দুই জনের দুই পৃথক রকমের কর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণতা। কাজেই কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিবার সময় স্ত্রী-পুরুষের জন্য দুই রকম কর্ত্তব্য পাওয়া যায় না।
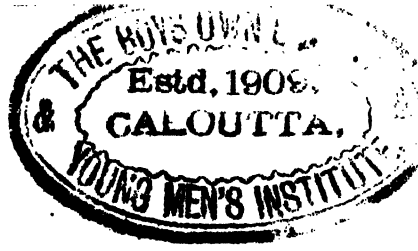
হামবুর্গ—কলি—লণ্ডন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

মার্চ্চের শেষাশেষি শীত কমিয়া বসন্তের আবির্ভাব হইল। বসন্তের প্রকাশটা এদেশে বসন্ত-সমাগম নয়, বসন্তের আগমন মাত্র। 'ট্রপিকাল' বাঙ্গালাদেশে যেমন সহসা অজস্রতার সঙ্গে আমের মুকুল, উগ্রগন্ধ ফুল, কোকিলের ঝঙ্কার ও ঝোড়ো দক্ষিণে হাওয়া লইয়া পাগলের মত বসন্তের আবির্ভাব হয়, এখানে তার বিপরীত। এই আচমকা প্রাচুর্য্যের অভাবে, লোক "ফ্র্যুলিং (Fruehling, বসন্তকাল) আসিয়াছে, ফ্র্যুলিং আসিয়াছে" বলিলেও আমাদের প্রথমটা বিশ্বাস হয় না, বরং মনে একটু অবজ্ঞার ভাব আসে এই ভাবিয়া যে, "ওঃ এই তোমাদের বসন্তকাল!" কিন্তু দুই এক দিন যাইতে যাইতে তফাৎটা বুঝা যায়। হঠাৎ একদিন বাগানে পাখীর ডাক শোনা যায়, হঠাৎ একদিন দেখা যায়, শীতশুষ্ক গাছগুলির ডালে ডালে অসংখ্য সবুজ 'ব্রণ' নির্গত হইয়াছে। তার পরদিন আর একটু, তার পরদিন আরও একটু, এইভাবে অতি ধীরে এই ব্রণগুলি বাড়িয়া পাতার আকার ধারণ করে, ক্রমে গাছে গাছে কুঁড়ি গজায়; কি বড় গাছ, কি ফুলগাছ, সবেতেই এইভাবে অতি ধীরে কিন্তু অতি সুস্পষ্টভাবে, যেন মাপা যায় এমন ভাবে, দিনের পর দিন চোখের সামনে ফুলপাতা ও মঞ্জরী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ নিঃশব্দ লঘু আবির্ভাবের একটা ভারি সুন্দর বৈচিত্র্য আছে। আচার্য্য বসু মহাশয়ের "ক্রেসকোগ্রাফ" যন্ত্রের "স্ক্রীনে" উদ্ভিদের বৃদ্ধি, মাদকপ্রয়োগে মত্ততা ও বিষপ্রয়োগে ছটফট করিয়া মৃত্যুর গতিরেখাগুলি বহু সহস্রগুণ বর্দ্ধিতভাবে প্রকাশিত হইয়া যেমন জড় প্রকৃতির অন্তরালে প্রাণশক্তির অদ্ভুত লীলাকে পরিস্ফুট করে, সেইরূপ বসন্তের আগমনে সুপ্তপ্রকৃতির নবজাগরণের যে লীলা ঘটিতে আমাদের দেশে তিন দিন লাগে, এখানে তাহা তিন সপ্তাহ ধরিয়া দেখায় প্রকৃতির প্রাণময়তা যেন বেশী সজীব হইয়া ধরা পড়ে। ঘোড়ার লাফ বা খেলোয়াড় স্পোর্টস্‌ম্যানদের যে কারিকুরি দেখিয়া চমক লাগে, তাহাই যখন আবার সিনেমাতে "স্লো" ছবির আকারে দেখা যায়, তখন অন্য রকমের একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, হাঁ ব্যাপারটা বেশ বুঝা গেল। সেইরূপ এদেশে বসন্তের এই "স্লো" ছবি দিনের পর দিন ধরিয়া দেখিয়া মনে হয় যে, প্রকৃতির চৈতন্যরহস্যের যেন আরও একটু বেশী খবর পাইলাম।

বসন্তের মধ্যেই অর্থাৎ গ্রীষ্মের আগেই, দিন কয়েক বেশ গরম পড়িল। ক্রমে পূরা গ্রীষ্ম আসিল, বড় বড় গাছের

হিণ্ডেনবুর্গ ও হিটলার।

ফুলের মৃদুগন্ধে বাতাস মিষ্ট হইয়া উঠিল, বাগান ও উদ্যানের নানাবিচিত্র বর্ণের, নানা আকারের ছোট বড় ফুলে রংএর উজ্জ্বল খেলাটা দেখিবার মত। এদেশের আবহাওয়া এত পরিবর্ত্তনশীল যে দুদিন আকাশ পরিষ্কার থাকিলেই ভয় হয়, কালই বৃষ্টি হইবে! তবে এবার আমাদের ভাগ্য ভাল,

বুড়াবুড়িরা বলিতেছেন, গত পঞ্চাশ বৎসরে নাকি এমন সুন্দর ও দীর্ঘ গ্রীষ্মবসন্ত এদেশে হয় নাই। রাত তিনটায় ভোর হইয়া বেশ আলো হইয়া যায় আর সন্ধ্যা সাড়ে নটা দশটা পর্য্যন্ত বাহিরের আলোতে বই পড়া যায়। গরম জামা কাপড় কেহ ছাড়ে না বটে, তবে জুলাই আগষ্টে এক একদিন শুধু গেঞ্জি গায়ে বা একেবারেই খালি গায়ে ঘরে বসিয়া কাটাইয়াছি। গরম পড়িলে এখানে লোকে মাংস খাওয়া কমাইয়া দেয়, নানারকমের স্যালাড, সরবত, আইসক্রীম

কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রাডের (Schrader)

প্রভৃতির ধূম পড়িয়া যায়, দই ঘোলও বেশ চলে। আমাদের দেশের অনেকে ঘোর গ্রীষ্মেও মাংস ডিম খাইয়া স্বাস্থ্য ও আরাম হারান, রোগেও ভোগেন, কিন্তু ভাবেন যে খুব সাহেব হইয়াছেন, কারণ সর্ব্বাবস্থায় মাংসাদি বরদাস্ত করিতে না পারিলে নেটিভত্ব প্রমাণ হইয়া যাইবে! আসল সাহেবরা কিন্তু দেখিতেছি গরমের সময় শরীর যাতে ঠাণ্ডা থাকে সযত্নে সেইরূপ খাদ্য খায়—তবু তো আমাদের গ্রীষ্মের চেয়ে এদের গ্রীষ্ম কত কম। এখানকার ডাঃ দাসগুপ্তের মতে নিয়মিত মাংসভোজনের তুল্য কুফলদায়ী নাকি মানব-শরীরের পক্ষে অল্পই আছে, তিনি বলেন বহু কঠিন রোগের মূল না হউক প্রধান কারণ, নিত্য আমিষ ভোজন; তিনি বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগীকে যে চিকিৎসা করিয়া সারাইতেছেন, তাহার প্রধান ব্যবস্থা খাদ্যাখাদ্যবিচার ও সর্ব্বপ্রকারের আমিষ এককালে ত্যাগ; কেমিষ্ট্রির প্রমাণের উপর তিনি ডাক্তারদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন, নিরামিষ ভোজনে রোগীর শরীরের কিরূপ পরিবর্ত্তন আনে ও রোগনাশে সহায়তা করে। ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন যে, আধুনিক কেমিষ্ট্রির জ্ঞান না থাকিলেও এবং কেমিষ্ট্রির ভাষায় বিচার ও ব্যবস্থাদি না দিয়া থাকিলেও আমাদের প্রাচীন কবিরাজরা তাঁহাদের empirical অভিজ্ঞতা হইতে রোগচিকিৎসা ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া কেমিক্যাল গবেষণা দ্বারা সুনিশ্চিত হইয়াছেন যে কবিরাজদের প্রত্যেক কথাটির প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ডাঃ দাসগুপ্ত শীঘ্রই তাঁহার গবেষণাগুলি প্রকাশ করিবেন; এ পর্য্যন্ত তাঁহার সব পরীক্ষাগুলিতেই তিনি সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন; তাঁহার পরীক্ষা ও প্রমাণগুলি বৈজ্ঞানিক মহলে প্রকাশিত হইলে আমাদের দেশের যে-গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ডাঃ দাসগুপ্ত আরও একটা কথা বলেন যে, এদেশের চেয়ে আমাদের রান্নার প্রক্রিয়া বেশী "সায়েন্টিফিক্", কারণ এরা সুপ ছাড়া অন্য সব জিনিষ যে জলে সিদ্ধ করে, খাইবার সময় সে জলটা ফেলিয়া দিয়া জিনিষটিকে টেবিলে হাজির করে এবং ইহাতে মাছ মাংস তরীতরকারির অনেকগুলি উপকারী দ্রব্যগুণ যাহা জলে সিদ্ধ করিবামাত্র বাহির হইয়া আসে, তাহা শরীরপোষণের কাজে লাগে না; আমাদের রান্নায় কিন্তু আমরা ঝোল রাখিবার সুবুদ্ধি করিয়া এই অপচয় নিবারণ করি।

দেশী মতে কাঁচা শশা মূলা প্রভৃতি খাওয়া ছাড়িয়া যাঁহারা বিলাতি মতে স্যালাড খাইয়া ভিটামিনের খাতির বজায় রাখেন তাঁহাদের জন্য জার্ম্মানিতে সুপ্রচলিত একটি স্যালাডের খবর দিতেছি। জিনিষটি খুবই সোজা ও খাইতে বড়ই সুস্বাদু—স্যালাডের (খুব পাতলা বাঁধাকপি জাতীয় সব্জি) ভিতরের দিকের কচিপাতা মিনিট দশ পনর একটা পূরা লেবুর রস ও সামান্য চিনি মিশ্রিত আধবাটি ঘোলে ভিজাইয়া পরে ঝোলমাখা সেই পাতা খাইয়া দেখিবেন, কেমন তৃপ্তি

হয়। এখানকার লোকের গ্রীষ্মবিলাস অনেক রকমের। চারিদিকে টবের ফুলে ঘেরা "ব্যাল্‌কনি"র উপর নানা বর্ণের চাঁদোয়া বা "সান্‌-শেড" ছাতা খাড়া করিয়া তাহার নীচে বসিয়া সকাল বিকাল চা কফি খাওয়া, সুসজ্জিত বাগানে বসিয়া বৈকালে চা খাওয়া খুবই আনন্দ ও শোভার জিনিষ, আমাদের মত গরমদেশে খোলামেলা জায়গা অনেক থাকা সত্বেও, এই সুন্দর অভ্যাসটি যে কেন চলে নাই বলিতে পারি না। সহরের মধ্যের কাফেগুলি ভিতর ছাড়িয়া ফুটপাথে চড়াও হইয়াছে, সহরের উপকণ্ঠে যেখানে একটু জল বা পাহাড় বা অন্য রকমের মনোরমত্ব আছে, তার কাছাকাছি কাফেগুলির বারান্দা ও বাগান লোকে গিশগিশ করিতেছে। তারপর আছে নৌকাবিহার, বনে বেড়াইতে যাওয়া, নদী ও সমুদ্রে স্নান, বা সহরের বাহিরে মাঠঘাটে ছুটির দিন কাটান। ছুটি পাইলেই লোকে একটু "এক্‌স্‌কারশান" করিয়া আসে। রৌদ্র-সেবনটা এই সব রকমের গ্রীষ্মবিলাসের কেন্দ্রস্থল। যতটা সম্ভব ত্যক্তবসন হইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া "সান-বাথ" খাইতে এদের মহানন্দ। রংটা একটু "সান্‌বার্ণ্ট" হওয়া বড়ই কামনার জিনিষ। আগে এই রৌদ্র-স্নান বা জলস্নান উপলক্ষে "নিউড-কাল্টের" খুব চর্চ্চা ছিল, এখন নাটসি-সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক সাগরতীরের ছোট সহরগুলির মিউ-নিসিপ্যালিটি ও পুলিশকে এই নগ্নতাবাদীদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতে হয়, যাতে বেশী বাড়াবাড়ি না হয়। হয় সবই, তবে রুচিবাগীশরা বেশী আপত্তি করিলে পুলিশেও একটু আপত্তি করে এবং কাগজে লেখালেখি প্রভৃতি কেলেঙ্কারি হইলে কর্ত্তৃপক্ষ "অফিসিয়ালি" প্রকাশ করেন যে "কিছুই হয় নাই, আমাদের পুলিশের কড়া দৃষ্টি আছে যে সুরুচি যেন লঙ্ঘিত না হয়!" কি নৌকাবিহারে, কি নদী বা সাগরতীরে, কি বনে বা মাঠে যেখানেই তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী একত্র হয়, সেখানেই প্রণয়ী-প্রণয়িনীর বন্ধু-বান্ধবীর আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গাঙ্গী ভাবের নিবিড়তার আধিক্য দেখা যায়। কন্দর্পক্রীড়ার বিবিধ বিধির প্রকাশ্য লীলা অবশ্য এ দেশে চোখ-সওয়া না করিয়া লইলে উপায় নাই।

গত মাস কয়েকের মধ্যে জার্ম্মানীতে অনেকগুলি উত্তেজনা-জনক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। প্রথম, রাষ্ট্রীয় ভাইস্‌-চান্সেলার ফোন্‌ পাপেনের (Von Papon) মারবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা। এ বক্তৃতায় ফোন্‌ পাপেন্‌ নাট্‌সিদলের কার্য্য প্রণালীর কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বেই ফোন্‌ পাপেন্‌ পাণ্ডুলিপি প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে দেখাইয়াছিলেন এবং হিণ্ডেনবুর্গ তাহা অনুমোদন করিয়া-ছিলেন। ফোন্‌ পাপেন হিণ্ডেনবুর্গের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।
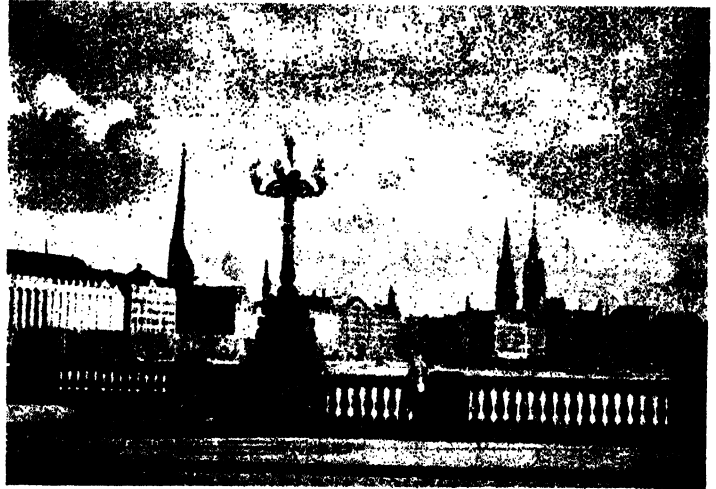
হামবুর্গ।

বক্তৃতার পর হিণ্ডেনবুর্গ টেলিগ্রামে ফোন্‌ পাপেনকে অভি-নন্দন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই নাট্‌সি-সরকার ঐ বক্তৃতা বাজেয়াপ্ত করিয়া জার্ম্মানির কোন কাগজে উহার প্রকাশ নিষেধ করিয়া দেন। ইংরেজি, ফরাসী ও সুইস্‌ কাগজে লোকে কিছু খবর পাইল। কাগজে প্রকাশ নিষিদ্ধ হইলেও কিন্তু টাইপ-করা পূর্ণ বক্তৃতাটি গুপ্তভাবে হাতে হাতে অনেক দূর চালান হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা গুপ্তভাবে নাট্‌সি-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের হত্যা। এ খবরও বিশদভাবে আমরা বিদেশী কাগজ হইতেই পাইলাম। বিদ্রোহ সম্বন্ধে হত্যাকাণ্ডের

পূর্ব্বে বা পরেও সাধারণ লোকের কোন খবরই ছিল না। অনেকের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে আসলে অনেক বেশী লোক নিহত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুরূপ দিক্‌পাল-পতন। এই বিপুলদেহ দীর্ঘজীবী বৃদ্ধ যোদ্ধৃবরের কর্ত্তব্যপরায়ণ চরিত্রবল টলটলায়মান জার্ম্মান-পোলিটিকাল-সমুদ্রে যেন একটা বিরাট অটল সেতু-বন্ধের মত ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি স্বদেশীয়দের আশাস্থল ও শত্রুপক্ষের ভীতিস্থল ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত বুড়া জেনারেল যখন প্রেসিডেণ্ট হইলেন তখন তিনি আপামরসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন; সকলেই জানিত বুড়ার সঙ্গে কোন চালাকি খাটিবে না, কর্ত্তব্য ছাড়া অন্য পথে কোন মতেই তাঁহাকে কেহ লইতে পারিবে না। অতি চরিত্রবান খাঁটি লোক সব দেশেই যেমন হয়, সেইরূপ, জেনারেল ওয়াশিংটন বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত হিণ্ডেনবুর্গের কথা ইহারই মধ্যে একটা কিম্বদন্তীতে দাঁড়াইয়াছে।

হিটলার যখন ভেনিসে গিয়া মুস্‌সোলিনির সঙ্গে দেখা করিলেন তখনও এখানে খুব হৈচৈ হইয়াছিল। "ডুচে"র সঙ্গে খাতির রাখিতে সবাই চায়। তবে হিট্‌লার বোধহয় এমন বিশেষ সুবিধা কিছু করিয়া আসিতে পারেন নাই। অষ্ট্রিয়ান নাট্‌সিদের হাতে ডাঃ ডলফুসের হত্যা আর একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই রাহাজানির খবর পাওয়ামাত্র ডুচে যদি বিদ্যুদ্‌বেগে ইটালিয়ান ফৌজকে অষ্ট্রিয়ান-সীমান্তে হাজির ও মোতায়েন করিয়া না রাখিতেন, তবে যে ব্যাপার কোন্ দিকে কতদূর গড়াইত তাহা বলা যায় না। শেষতঃ, প্রেসিডেণ্ট ও চান্সেলার পদ একত্রীভূত করিয়া হিটলারের রাষ্ট্রপতি-নিয়োগ। "ইল্ ডুচে"র মত হিটলারের উপাধি এখন হইয়াছে "ডের ফ্যুরার—der Fuehrer" অর্থাৎ "নেতা"। ভোটের দিন কতক আগে হিটলার হামবুর্গে আসিয়াছিলেন। বার্লিন হইতে উড়িয়া আসিয়া এখানকার এয়ারপোর্টে নামিলেন, সেখান হইতে মোটরে সহরের মধ্যে হোটেলে গেলেন। পথের দুইপাশে লোকারণ্য হইল; পুলিশ, S.S.* গার্ড, ও জেনারেল গোয়েরিংএর স্পেশাল গুপ্ত পুলিশ রাস্তা পাহারা দিল। প্রথমে কয়েকখানি পুলিশ ও S. Sদের মোটর গেল, তারপর দুখানি পুলিস-মোটর-বাইক ফুটপাথ ঘেঁষিয়া আগাইয়া আসিল, ঠিক পিছনেই একখানা মোটরে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াইয়া হিটলার ঈষৎ হাস্যে হাত তুলিয়া আছেন, তাঁহার পিছনেই আবার পুলিশের গাড়ী, তাহার পরে ডাঃ গোয়েবেল প্রভৃতি অন্য রাষ্ট্রনেতাদের গাড়ী। হিট্‌লারের চেহারা খুব সাধারণ লোকের মত; তাঁহার চোখে একটু "ফ্যানাটিকে"র উন্মত্ত ও স্বপ্নময় ভাব আছে, কিন্তু মুখে ও ঠোঁটে মুস্‌সোলিনির বজ্রদৃঢ়তা নাই, বরং একটু কোমলই। মহাত্মা গান্ধীর শীতল অন্তর্ভেদী ও স্যার আশু-তোষের তীক্ষ্ণ প্রাণদাহকারী দৃষ্টির মত হিট্‌লারের দৃষ্টিতেও একটা মোহিনী শক্তি আছে, তাঁহারও দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ থাকিলে নাকি লোকে নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও বেশভূষায় হিটলার অতি সরল ও সহজ মানুষ, তিনি নিরামিশভোজী ও এত কোমলচিত্ত যে, মাঠে বাগানে বেড়াইতে গেলে বন্ধুদের সাবধান করিয়া দেন, যেন গাছপালাকে কেহ নিরর্থক কষ্ট না দেয়। তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও প্রয়াস দেশেরও দশের জন্য, বস্তুতপক্ষে দেশের রাজা হইলেও এতটুকু নিজের স্বার্থচিন্তা ও এতটুকু আত্মাড়ম্বর তাঁহার নাই।

হামবুর্গ হইতে কীল (Kiel) একস্‌প্রেস ট্রেণে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কীল সুন্দর সহর, এখানকার ইউনিভার্সিটি ১৬৬৫ সালে স্থাপিত। বাল্টিক সাগরের কয়েকটি বালু পাহাড়ময় স্থলভূমির মধ্যে প্রসারিত হইয়া ফিয়র্ডের (fjord) আকার ধারণ করিয়াছে। তাহারই তীরে তীরে কীল সহর ও বন্দর। ইউনিভার্সিটির প্রাচীন বাড়ীটি একেবারে ফিয়র্ডের ধারে। ফিয়র্ডের ধারে দূরের পাহাড় ও বনগুলি সুন্দর বেড়াইবার জায়গা। এখানকার ভারততত্ত্বের অধ্যাপক প্রোফেসার অটো শ্রাডেরের (Otto Schrader) বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। প্রোফেসার শ্রাডের বৎসর দশেক মাদ্রাজের আডিয়ারস্থ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির লাইব্রেরিয়ানরূপে ভারতে ছিলেন ও যুদ্ধের সময় ভারতেই অন্তরীণ ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী জাতিতে সুইস্। ইঁহাদের দুইটি মেয়ে, দুজনেরই জন্ম ভারতে, নাম সীতা ও ললিতা। প্রোফেসার ও ফ্রাউ

* হিটলারের ব্রাউন-শার্টরা দুইদলে বিভক্ত—(১) S. A. অর্থাৎ ষ্টুর্ম্ আব্‌টাইলুং, Sturm Abteilung,—ইহারা সাধারণ "ষ্টরম ট্রুপার"; (২) S. S. অর্থাৎ Sturm schutz ষ্টুর্ম্ শুট্‌স্—ইহারা বাছাইকরা বিশেষ লোকে গঠিত ও কাল ইউনিফর্ম পরে।

প্রোফেসারের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে শুনিতে পাইলাম, যেন আর একটি ঘরে নারীকণ্ঠে থিয়েটারের রিহার্সালের মত শোনা যাইতেছে—ফ্রাউ প্রোফেসার হাসিয়া জানাইলেন যে তাঁহাদের বড় মেয়েটি সম্প্রতি এন্‌গেজ্‌ড্‌ হইয়াছেন, সেই উপলক্ষে উহারা কিছু আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতেছে। অতঃপর অনতিবিলম্বে মায়ের আহ্বানে ভাবী জামাতাকে সঙ্গে লইয়া দুড় দাড় করিয়া শ্রীমতী সীতা ও ললিতার ড্রয়িংরুমে আবির্ভাব ও অতিথির সঙ্গে আদর-আপ্যায়নাদি হইল। ছেলেবেলায় আডিয়ারে থাকিতে সীতা-ললিতা, শুনিলাম, অনর্গল তামিল বলিতে পারিতেন, এখন একটি কথাও মনে নাই। কিছুক্ষণ আলাপাদির পর প্রোফেসারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিয়র্ডের ধারে একটা পাহাড়ের মাথায় রেস্তরাঁতে বসিয়া প্রোফেসার অনেক গল্প করিলেন। ইনি বিখ্যাত অধ্যাপক ডয়সেনের (Dousson) ছাত্র ; ডয়সেন এই কীলেই দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ডয়সেনের নাম ভারতীয় দর্শন-ইতিহাস যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে সুপরিচিত। আমাদের উপনিষদ্‌গুলি লইয়া ডয়সেন যে ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশদ গবেষণা করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন পণ্ডিতই করেন নাই, যদিও উপনিষদ সম্বন্ধে তিনি যতটা দাবী করিয়াছিলেন তাহার সবটা বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। উপনিষদের উপর ডয়সেনের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। শ্রাডের গল্প করিলেন যে, ডয়সেন দুজন লোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনে করিতেন, প্রথম শঙ্করাচার্য্য ও দ্বিতীয় শোপেনহাউয়ার এবং বলিতেন যে, এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এত বড় দুইজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল দার্শনিকের দুজনেরই মনোজগতের প্রধান ভিত্তি ছিল উপনিষদ ! মৃত্যুশয্যায়ও উপনিষদ পাঠ ও চর্চ্চা ডয়সেনের প্রধান কাজ ছিল এবং অন্তিম মুহূর্ত্তে ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়।

শ্রাডের গল্প করিলেন যে, মাদ্রাজে থাকিতে দক্ষিণী, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "শ্রীধর" নাম দিয়াছিলেন। ভারতীয় নাম পাওয়া এখানকার ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিশেষ সম্মানের বিষয় মনে করেন। ডয়সেন "দেবসেন" নাম পাইয়াছিলেন। একবার হিন্দী অক্ষরে "শ্রীদেবসেনাচার্য্যায়-কীলে" ও ইংরাজীতে জার্ম্মানী লেখা ঠিকানাওয়ালা একখানি চিঠি জার্ম্মান ডাকবিভাগের হাতে আসে। ডাকবিভাগ উহার অর্থভেদ করিতে না পারিয়া বার্লিন ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে, লিপিটি যখন ডাকবিভাগের জানিত কোন ইউরোপীয় ভাষায় নয়, তখন উহার জাতি-নির্ণয়ে বার্লিনের অধ্যাপকদের সাহায্য প্রয়োজন। চিঠিখানি তখন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিদেশী বিভাগ ঘুরিয়া ভারতীয় বিভাগে উপস্থিত হয় এবং যথা সময়ে কীল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডয়সেনের হস্তগত হয়। এদেশের সামান্য একখানা চিঠি সম্বন্ধেও লোকের এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি। পণ্ডিত মাক্‌স্‌ম্যুলারের "মোক্ষমুলর" নামকরণ লইয়া ইংরেজ ও আমেরিকান ভারত-তাত্ত্বিকরা "Salvation Mueller" বলিয়া রহস্য করেন, কিন্তু ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠবস্তু মোক্ষসংপৃক্ত নাম পাওয়ায় সকলেই তাঁহাকে মনে মনে হিংসা করেন। শ্রাডের মন্তব্য করিলেন যে, বিদেশীকে দেশী নাম দেওয়া ভারতীয়দের বিশেষত্ব ; আমি বলিলাম, প্রাচীন গ্রীকরাও তো আমাদের চন্দ্রগুপ্তকে "সান্দ্রোকোত্তোস্‌", পুরুকে "পোরোস্‌" পাটলিপুত্রকে
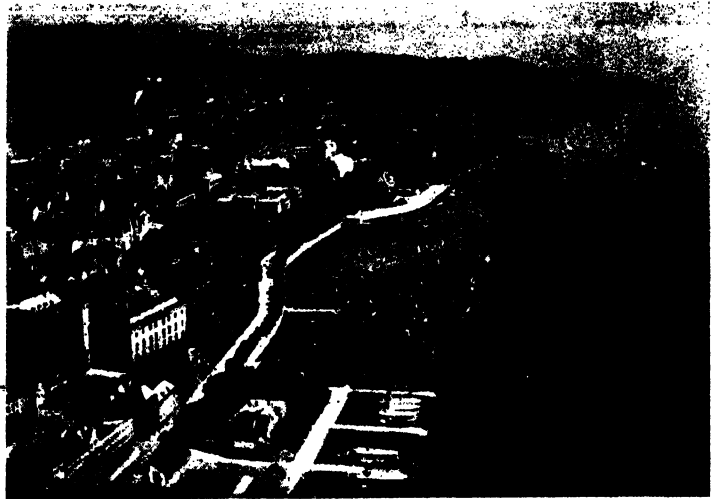
ফিয়র্ডের ধারে কীল সহর।

"পালিবোথ্রা" ও পঞ্জাবের নদী ও বিভিন্ন জাতিদের অদ্ভুত অদ্ভুত গ্রীকগন্ধী নাম দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতদের নিজ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ছাড়া সময়ে সময়ে এক একটা "ইনটেলেকচুয়াল" বাতিক থাকে। পাহাড়ের মাথায় বসিয়া কফি শেষ করিয়া সিগার টানিতে টানিতে শ্রাডের বলিলেন, তাঁহার অনেক দিন হইতে একটা সমস্যা আছে যে, ভারতে তামাকের প্রচলন হইল কবে হইতে ও কিরূপে প্রধান বিদেশী পণ্ডিতে ও অর্ব্বাচীনে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল কিন্তু সমস্যার সমীমাংসা কিছু হইল না, আমি শেষে বলিলাম যে, অক্‌সফোর্ডের গ্রীকভাষার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বালিয়ল কলেজের অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন জাওয়েটেরও এ বিষয়ে কৌতূহল ছিল; অক্‌স্‌ফোর্ডে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যে সব ইংরেজ যুবক সেকালে সিভিলিয়ান হইয়া ভারতে আসিতেন, জাওয়েট তাঁহাদের বলিয়া দিতেন যে, তাঁহারা যেন ভারতে তামাক প্রচলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে জানান; জাওয়েটের চিঠিপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে হয়ত এ বিষয়ে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা গবেষণা করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার কিছু খবর মিলিতে পারে!

প্রোফেসার শ্রাডের প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সাহিত্যের চর্চ্চা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। শৈব "পাঞ্চরাত্র" প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শ্রাডের উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিব্বতী ও ভারতীয় প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি এখন কিছু আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন; উপনিষৎ সম্বন্ধে একটা বড় লেখাতেও হাত দিয়াছেন এবং বলিলেন যে এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের উপনিষৎ সম্বন্ধে কয়েকটি পুরাতন লেখা তাঁহার কাজে লাগিয়াছে

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি ঘুরিয়া ডয়েট্‌সে আকাডেমির নিমন্ত্রণে হামবুর্গ ও জার্ম্মানীর অন্য কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফ্রাউ ফেরার প্রচেষ্টায় হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় বিভাগ ও অন্য দুইটি সমিতির তরফ হইতে অধ্যাপক সরকারকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। দুইটি বক্তৃতা তিনি হামবুর্গে দিয়াছিলেন। ফ্রাউ ফেরা তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আতিথ্য দান করিয়াছিলেন এবং বহু বিদ্বজ্জনকে ও মেয়রকে নিমন্ত্রণ করিয়া সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শুব্রিংও নিজের বাড়ীতে একটি চা-পার্টি দিয়া ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক প্রফেসারদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন।

রাসিয়ান সোভিয়েট জাহাজে হামবুর্গ হইতে লণ্ডন গেলাম। এখানে সরকারি ফিনান্স বিভাগ হইতে নিয়ম হইয়াছে যে পঞ্চাশ মার্কের (প্রায় পঞ্চাশ টাকা) বেশী কেহ সঙ্গে লইয়া জার্ম্মানীর বাহিরে যাইতে পারিবে না, লইতে হইলে ফিনান্স-বিভাগের বিশেষ অনুমতি লাগিবে। কিছু ইংলিশ পাউণ্ড এখান হইতে কিনিয়া সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি পাইয়াছিলাম, কিন্তু পাউণ্ড কিনিবার জন্য আমেরিকান এক্‌স্‌প্রেসের কাছে গেলে তাহারা বলিল যে, দিন সাতেকের কমে হইবে না, কারণ ফিনান্স-বিভাগের অনুমতিপত্রসহ কত পাউণ্ড দরকার জানাইয়া রাইশ-ব্যাঙ্কের কাছ হইতে পাউণ্ড আনাইতে হইবে। আমার জাহাজ পরদিন ছাড়িবে, কি করিব ভাবিয়া ইণ্ডিয়ান ট্রেড-কমিশনার মিঃ গুপ্তের কাছে গেলাম। মিঃ গুপ্ত "অফিসিয়ালি" টমাস কুকের কাছে টেলিফোন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কালই আমার জাহাজ ছাড়িবে, কুক শীঘ্র পাউণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারে কিনা। কুক জানাইল যে, তিনদিন হইল নিয়ম হইয়াছে যে, রাইশ্‌ব্যাঙ্কের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যাঙ্ক পাউণ্ড বা "ট্রাভেলার্স চেক" দিতে পারিবে না, অতএব সময় লাগিবে। গতিক খারাপ দেখিয়া মিঃ গুপ্ত বলিলেন, তিনি তাঁহার লণ্ডন ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখিয়া দিবেন, লণ্ডনে পৌছিয়া ভাঙ্গাইলেই চলিবে। ফিনান্স-অফিসে গিয়া পাউণ্ডের বদলে চেক ও পথের খরচের জন্য মার্ক সঙ্গে লইবার অনুমতি চাহিলাম; অফিসের লোক পরিবর্ত্তনের কারণ শুনিতে চাহিল ও রাইশব্যাঙ্কে চেষ্টা করিতে বলিল। আমি বলিলাম সময়ে কুলাইবে না, কালই আমার জাহাজ। অনুমতি লিখিয়া দিয়া অফিসের লোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ লাইনের জাহাজে যাইতেছি। বর্ত্তমান জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার অহিনকুল সম্বন্ধ। ইচ্ছা করিলেই মিথ্যা বলিতে পারিতাম, কিন্তু তখন আমার কাজ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, মজা দেখিবার জন্য খাঁটি সত্যই

বলিলাম। সোভিয়েট জাহাজের নাম শুনিবামাত্র ফিনান্স-অফিসের কেহ ফ্যাকাশে, কেহ বা হতভম্ব হইয়া গেল। শুধু গবর্ণমেন্ট অফিসে নয়, পরিচিত মহলে সকলেই সোভিয়েট জাহাজে যাইতেছি শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। ফিরিয়া আসিলে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করিলেন, এমন কি বিছানায় ছারপোকার কথাও বাদ পড়িল না। সকলেরই ধারণা—"বাবা! সোভিয়েট জাহাজ! না জানি সে কি বিভীষিকা!" আমি কিন্তু নিশ্চিন্তই ছিলাম, কারণ এখানকার একটি ইংরেজ বন্ধু দুইবার এই লাইনে যাতায়াত করিয়াছিলেন ও তাঁহার কাছে সব খবর শুনিয়া তবে প্যাসেজ বুক করিয়াছিলাম।

হামবুর্গ বন্দরের ঘাট হইতে মোটর-বোটে মিনিট কুড়ি গিয়া বন্দরের আর এক দিকে মাঝনদীতে জাহাজে উঠিলাম। জাহাজ লেনিনগ্রাড হইতে হামবুর্গ হইয়া লণ্ডনে যায়। লেনিনগ্রাডের অনেক প্যাসেঞ্জার জাহাজে ছিল। বৈকাল পাঁচটায় জাহাজ ছাড়িয়া ধীরগতিতে এলবে নদী বাহিয়া চলিল। রাত প্রায় বারটায় জাহাজ সমুদ্রে পড়িল। তারপর সারাদিন সারারাত নর্থ সীতে। শেষ রাত্রের দিকে টেম্‌স্ নদীতে প্রবেশ করিয়া বেলা নটার সময় জাহাজ একেবারে লণ্ডনের মাঝখানে, লণ্ডন ব্রিজের কাছে Hay's Wharf-এ আসিয়া দাঁড়াইল। এই লাইনের জাহাজগুলি মোটরে চলে, মাল ও প্যাসেঞ্জার দুই নেয় এবং আকারেও খুব বড় নয়। ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ডাইনিং হল একসঙ্গে, থার্ড ক্লাসের আলাদা। ক্যাবিন ও ডাইনিং হল ছাড়া অন্য সবই সাধারণ, অর্থাৎ লাউঞ্জ, স্মোকিং রুম ও যে কোনও ডেক সব ক্লাসের লোকই সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। সাজ-সজ্জা অবশ্য খুবই সাধারণ রকমের, কারণ এই লাইনের ভাড়া একটু সস্তা। রাশিয়ান খাওয়াও মন্দ নয়। ক্যাবিনে বা অন্যত্র কোন নোংরামি নাই, বরং পরিচ্ছন্নই। তবে থার্ড ক্লাসের ডাইনিং হল বড় সঙ্কীর্ণ ও টেবিলক্লথ একটু দেরীতে বদলান হয়। বিছানা বেশ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন, ছারপোকাও নাই, তবে রাশিয়ান নোংরামি প্রকাশ পাইয়াছে থার্ড ক্লাসের বাথরুমগুলিতে। মুখ ধুইবার বেসিনে জল সহজে বাহির হয় না, পায়খানা অতি সঙ্কীর্ণ, ঝক্‌ঝকে ভাব মোটেই নাই।

সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডনের পথে ফিরিবার সময় দুইবারই সমুদ্র ভাল পাইয়াছিলাম, কাজেই সময় অল্প হইলেও লোক-জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের অসুবিধা হয় নাই। লেনিন-গ্রাড দেখিয়া বা কিছুদিন রাশিয়াতে বাস করিয়া অনেক আমেরিকান ও ইংরেজ এই জাহাজে যাইতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার বাস্তবিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু মতভেদ শুনিলাম। আমেরিকানদের অধিকাংশই সোভিয়েট শাসনের নিন্দা করিলেন, দেশের কোনই উন্নতি বা উপকার হয় নাই, রাস্তা-ঘাটের হতশ্রী অবস্থা, দেশময় দারুণ দারিদ্র্য ও অভাব প্রভৃতির কথা বলিলেন। আবার ইংরেজদের অনেকের কাছে খুবই প্রশংসা শুনিলাম, সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য তরুণদের স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতির জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট কত আগ্রহ, কত চেষ্টা করিতেছেন, তারও অনেক সুখ্যাতি শুনিলাম। মোটামুটি এই বুঝা গেল যে, যাহারা খাঁটি সোশালিষ্ট বা কমিউনিষ্ট মতের প্রতি আকৃষ্ট, তাহারা রাশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থায় মোটেই হতাশ হয় নাই। উন্নতির একান্ত চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যে ফাঁকি নাই; বাধাও কিছু কিছু আছে এবং আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে সময়ও লাগে, কাজেই অভাবত্রুটি থাকিলেও তাহা এমন কিছু মারাত্মক

মুসোলিনি ও হিটলার।

নয়—যাহারা রাশিয়ার প্রতি বিরূপ নহেন তাঁহাদের মতটা এই রকম। বাথরুমে একটি তামাটে রঙ্গের ভদ্রলোকের সঙ্গে ওয়াশ-বেসিনের জল বাহির না হওয়া প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ হইল; ভাবিয়াছিলাম ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকান, কিন্তু যখন তিনি বলিলেন, বাড়ী ভারতে, তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিলাম যে তিনি বাঙ্গালী, নাম মিঃ ঘোষ। ইনি পুরা কমিউনিষ্ট-বাদী; পরে বুঝিলাম, এবং কথাপ্রসঙ্গে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনেক নিন্দা করিলেন।

বেলা ন'টা আন্দাজের সময় জাহাজ আসিয়া ঘাটে

দাঁড়াইল। ব্রেকফাষ্ট সারিয়া নামিবার সময় শুনিলাম কাষ্টম্‌সের লোক জাহাজেই জিনিষপত্র পরীক্ষা করিবে। অন্য জাহাজে আসিলে জাহাজ হইতে নামিয়া পরে কাষ্টম্‌সের পরীক্ষা হয়, কিন্তু রাসিয়ার প্রতি সবাই বিরূপ, তাই সোভিয়েট জাহাজে যাহাতে লোক না চড়ে, সেজন্য 'স্বাধীনতার জন্মভূমি' ইংলণ্ডেও কাষ্টম্‌সের লোক জাহাজের উপর আসিয়া যাত্রীদের একটু ভোগায়। সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এক জনের পর একজন করিয়া পরীক্ষা হইতেছে, আমার সামনে আটদশ জন লোক থাকা সত্বেও কাষ্টমস্‌ দারোগার দৃষ্টি আমার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাঁকিয়া জনতাকে বলিলেন, "ঐ ভদ্রলোকটিকে আগে আসিতে দিন"; আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এদিকে আসুন", এবং সহকারিকে বলিলেন, "উঁহাকে একবার উপরেও যাইতে হইবে।" আমি তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলাম, লাইন ছাড়িয়া সকলের আগে দারোগার সহকারীর সম্মুখীন হইলাম। সহযাত্রীরা স্বাধীন দেশের প্রজা, ব্যাপার না বুঝিয়া সামনের লোক ছাড়িয়া পিছনের লোককে আগে ডাকায় একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দারোগার সহকারী আমার হাতে একটি ছাপান কাগজ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখুন, এই তালিকার মধ্যে কি কি জিনিষ আপনার সঙ্গে আছে।" আমি লিষ্ট দেখিয়া জানাইলাম, উহার অধিকাংশই আমার সম্পত্তির বাহিরে, যাহা এক আধটা আছে, তাহা আমার নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ। আবার প্রশ্ন হইল "রাশিয়ায় আপনি যেসব জিনিষ কিনিয়াছেন তাহা লিষ্টের মধ্যে পড়ে কিনা দেখুন", আমি বলিলাম আমি রাশিয়ায় যাই-ই নাই এবং জার্ম্মানিতে কেনা অনেক জিনিষ আমার সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু সবই নিত্য প্রয়োজনীয়। অতি মৃদু স্বরে দারোগা আমার স্যুটকেস খুলিয়া দেখিতে চাহিলেন এবং অতি সাবধানতার সহিত দু' মিনিট জিনিষপত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পাসপোর্টের জন্য আপনাকে একবার উপরে যাইতে হইবে।" উপরে স্মোকিং-রুমে পুলিশ বসিয়া ছিলেন, এক ধারে ব্রিটিশ ও অন্য ধারে নন্‌-ব্রিটিশ পাসপোর্টের পরীক্ষা হয়। যথাস্থানে গিয়া নাম জানাইলে, পুলিশের লোক পাস্‌পোর্ট ফেরৎ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা আপনার লণ্ডনের ঠিকানা জানিতে পারি কি?" একটা ঠিকানা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। জাহাজ হইতে নামিবার সময় সঙ্গের একটি ইংরেজ বন্ধু বলিলেন, "তোমাকে ইণ্ডিয়ান কমিউনিষ্ট রেভলিউশনারি মনে করিয়াছিল বুঝি!" বন্ধু ঠিকই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলাম যে, ইংলণ্ডে যদিও আমরা দাসজাতীয় এবং সন্দেহ করিবার অধিকার পুলিশ ও কাষ্টম্‌সের আছে, তবু হাতে হাতে অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও ভদ্র বা শান্ত ব্যবহারের ত্রুটি হইল না। আর দেশে হইলে?

জাহাজ হইতে নামিয়া জার্ম্মাণ মার্কের বদলে ইংরেজি পাউণ্ড লইবার জন্য ব্যাঙ্কে গেলাম, সেখান হইতে আবার জাহাজে ফিরিয়া জিনিষপত্র লইয়া ইউস্‌টন ষ্টেশনে গিয়া ইংরেজ বন্ধুটিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গাওয়ার ষ্ট্রীটে ওয়াই-এম-সি-এ'র ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস্‌ হষ্টেল ও ইউনিয়ানে কিছুদিন ঘর লইয়া থাকিলাম; পরে অন্যত্র একটি ইটালিয়ান পরিবারে বাসা লইলাম। লণ্ডন সহর যে কত প্রকাণ্ড তা বেশ বুঝা গেল। ইংরেজরা যে বলেন, যে, যে-লোক আজন্ম লণ্ডনে বাস করিয়াছে, সেও লণ্ডনের সবটার ভাল পরিচয় জানে না, সে কথা মিথ্যা নয়। পুরাতন সহর অর্থাৎ "সিটি" দেখিতে অতি কদর্য্য, পুরান বাড়ীগুলি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাল হইয়া গিয়াছে। এদেশের লোক সাবেকিয়ানার বড় পক্ষপাতী, পুরাতনের গন্ধ ছাড়িতে চায় না। জার্ম্মানিতে যেমন যত নূতন আবিষ্কার, যত কিছু নূতন, তাহা চালাইবার চেষ্টা হয়, এখানে তা নয়, এরা যতদিন সম্ভব পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকে, বড় জোর একটু অদল-বদল জোড়াতালি দিয়া পুরাতনকেই চালাইবার চেষ্টা করে। গত দশ পনর বৎসরের মধ্যে বাহির হইয়াছে এমন বড় বাড়ীর তো কথাই নাই, বহু পুরাতন বাড়ীতেও জার্ম্মানিতে কয়লার বদলে সেণ্ট্রাল-হিটিং-এ ঘর গরম করা হয়, কিন্তু লণ্ডনের খুব অল্প বাড়ীতেই সেণ্ট্রাল-হিটিং আছে। লণ্ডনের রাস্তা ও ফুটপাথও তত চওড়া নয়, সে জন্য ট্রাফিক অতি ভয়াবহ মনে হয়। জার্ম্মানির রাস্তাঘাট যেমন ঝকঝকে পরিষ্কার সে তুলনায় লণ্ডনকে অনেক নোংরা মনে হয়, অনেক রাস্তা ও গলি প্রায় কলিকাতার মতই। লণ্ডনের একটি বিশেষত্ব, দোকানের বাহার, এত বড় বড় এবং এমন সুন্দর করিয়া সাজান দোকান জার্ম্মানিতে নাই। সহর যেমন বিপুল, সেরূপ সহরের মধ্যে পার্ক বাগান বা মাঠ জাতীয় খোলা জায়গাও বহু। লণ্ডনের টিউব-ট্রেনগুলির মত বেগবান আরামের গাড়ী বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই; গাড়ী থামিলেই অটোম্যাটিক দরজাগুলি নিজে নিজে খুলিয়া ও গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলেই বন্ধ হইয়া যায়; টিউবের তিন চার তলার সমান গভীর ষ্টেশনগুলিতে নামাওঠা করিতে কোন কষ্ট নাই, বৈদ্যুতিক "এস্কালাটার" সিঁড়িগুলি নিরন্তর ঘুরিতেছে, লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেই হইল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পয়লা আষাঢ়। কবে, কোন্ সে সুদূর অতীতে মহাকবির মানস-সন্তান বিরহবিধুর হৃদয়ে, কোন্ রামগিরি হইতে মেঘকে দূত করিয়া, মেঘের মুখে, তাহার সুদূরের প্রেয়সী-সকাশে বিরহের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, আজিকার আকাশ দেখিলে, মেঘের এক গতি, এক লক্ষ্য দেখিলে সেই কথাই শুধু মনে পড়ে। আজও কে-যেন মেঘের মুখে তাহার বিরহের বার্ত্তা পাঠাইয়াছে, মেঘেরা বিরহী-যক্ষের গভীর বেদনা অনুভব করিয়াই, অবিশ্রান্ত গতিতে বিরহিণীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ যেন তাহার একটি মুহূর্ত্ত অবসর নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কেবলই ছুটিতেছে।

সারাদিন, আকাশে মেঘের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি খেলাই চলিয়াছিল, অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘণ্টাখানেক মুষলধারায় বৃষ্টিপতনের পর, বৃষ্টি বন্ধ হইল বটে, উদ্দাম বায়ু অবিশ্রান্ত গতিতে বহিতে লাগিল। এলোমেলো বাতাস, কখনও পূর্ব্ব দিক হইতে, কখনও উত্তর, কখনও দক্ষিণ, কখনও বা পশ্চিম দিক হইতে সোঁ সোঁ শব্দে ছুটিয়া আসে। কখনও বাতাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম বারিকণাও ভাসিয়া আসে। জানালা বন্ধ না করিয়া বসা যায় না, আবার জানালা বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয় না; দুঃখ হয়। মনে হয় কি যেন দেখা হইবে না, কিসে যেন ফাঁকি পড়িয়া যাইতে হইবে।

ছায়া আজ সমস্ত দিন মেঘের খেলা দেখিয়াছে। শেলীর কবিতা তাহার ভাল লাগিত, কখনও শেলীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কবিতা পড়িয়াছে, কখনও মেঘদূত খুলিয়া বসিয়াছে। সমস্ত দিন এই ভাবেই কাটিয়াছে। বৃষ্টির সময়ও সে জানালা খুলিয়া বসিয়া ছিল, জানালার কাছের মেঝের কার্পেটটি ভিজিয়া গিয়াছে, টেবিলের বই খাতা গুলিও ভিজিয়া, স্যাঁতাইয়া উঠিয়াছে, ছায়া তাহা দেখিয়াছে, তবুও সার্সিটা বন্ধ করে নাই। আজ সে সারাদিনমান খোলা জানালাটার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে, মেঘকে যদি তাহার ভাষা বুঝাইতে পারিত, তবে তাহাকে কাছে ডাকিয়া, আদর করিয়া, তাহার দুঃখের কথা বলিত; বলিয়া, তাহাকে দূতরূপে বরণ করিত। তারপর দূতমুখে বার্ত্তা প্রেরণ করিত। কিন্তু কোথায়, কাহার কাছে পাঠাইত মেঘদূতকে? ছায়া নিজের মনে, নিজের এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পায় নাই।

অশোকের কাছে?

তাহার বিবাহের ব্যাপারটাও কি বিশ্রী! অশোকের সঙ্গে অনেক দিনের জানা-শোনা ছিল বটে; কিন্তু কোন দিন কি তাহারা পরস্পরকে হৃদয় দিয়া জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে? অশোকের মা ও তাহার মা মিলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, অশোক ক্বচিৎ কোন দিন তাহার মা'র সহিত এ বাড়ীতে আসিয়াছে, ড্রয়িং রুমে সকলের সঙ্গে বসিয়াছে, সকলের সঙ্গে যেমন কথাবার্ত্তা কহে, ছায়ার সঙ্গেও তেমনই দুই চারিটা কথাবার্ত্তা হইয়াছে। অশোক তখন সিনিয়র কেম্ব্রিজের শেষ পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, কালে ভদ্রে একদিন আসিত। সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ ঋজু দেহ, দীর্ঘ আয়ত কৃষ্ণতার দু'টি চক্ষু, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ, পাতলা টুক্‌টুকে দুটি ঠোঁট, রক্তিম কপোল, উন্নত নাসা, সর্ব্বাপেক্ষা কথা বলিবার একটি বিশেষ কায়দা—এই সব মিলিয়া মিশিয়া ছায়ার হৃদয়পাতে রেখাঙ্কন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশোকের পরীক্ষা যেদিন শেষ হইল, তাহার পরদিনই এনগেজমেণ্ট উৎসব। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে উপাসনা, অঙ্গুরীয় দান, গীতবাদ্য ও জলযোগাদি হইয়াছিল। উৎসবান্তে অশোক তাহাকে লইয়া সেই প্রথম বেড়াইতে গিয়াছিল। গাড়ীতে দুই তিনটার বেশী কথা হয় নাই, অশোক বাক্‌পটু নহে, একটু যেন বেশী লাজুক, ছায়া তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া একটু ক্ষুণ্ণ, একটু প্রসন্ন হইয়াছিল।

অশোকের মা ও ছায়ার মা'র মধ্যে কথাবার্ত্তা বহুকাল ধরিয়া চলিলেও, উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার কারণ ছিল; অশোকের পিতা দরিদ্র এবং

দরিদ্র থাকিতেই চাহিতেন। কিন্তু ধনী বংশের মেয়ে বলিয়া অশোকের মা'র প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ। তিনি ছেলেকে বাল্যকাল হইতে পিত্রালয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন এবং সেখান হইতেই ছায়ার মা'র সঙ্গে বৈবাহিকা-সম্বন্ধ পাতাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত, অশোকের পিতা 'এনগেজমেন্ট' কি পদার্থ তাহা অনবগত ছিলেন; বিবাহের দিনে পদার্থটির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিল বটে, কিন্তু তখন সব হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা না থাকায়, অশোকের সঙ্গে অবধি মেলামেশা ছায়ার হয় নাই এবং আধুনিক মতে হৃদয়ের আদান প্রদান নামক আধুনিক উদ্বাহের অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব্বানুষ্ঠানও সাধিত হয় নাই। আগেকার কালে কি হইত, এখনও অশিক্ষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে ও পরিবারে কি হয় না হয়, তাহার সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া নাসা কুঞ্চিত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল নাই। হৃদয় আদান প্রদানের কথাই এখনকার কালে বড় কথা হইয়াছে এবং সেই আদান প্রদানটা বিবাহের পরে নয়, আগে হওয়াই রীতি দাঁড়াইয়াছে।

বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিতেছিল, ছায়ার পিতাই চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল, অবিলম্বে রওনা হইবার জন্য। পাসপোর্টের তদ্বির, পরিচয়-পত্রাদি-সংগ্রহ, আত্মীয়দিগের গৃহে ভোজন, বন্ধুবান্ধব সহপাঠিদিগের পার্টি, ক্লাবে বিদায়-সভা ইত্যাদি শিষ্টাচারমূলক পাঠাদি সারিতে সারিতে দুই পক্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই সমস্ত শেষ হইতে না হইতে বিবাহ! বিবাহের পরই অশোক বিলাত যাত্রা করিল।

এই বিবাহ!

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয়ারা অশোককে ধরিয়া জোর করিয়া ছায়ার ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই হাসি! হাসি আর থামে না। কি বিশ্রী লাগিয়াছিল সেই হাসি! কতদিন, কতকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, কত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, ভালবাসার একটি কথা নাই, একটি স্নেহ-সম্ভাষণ নাই, একটু আদর নাই। সে কথা ছায়ার মনে আছে আজও।

ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অশোক বিলাতী কায়দায় ইংরাজীতে একটি চুম্বন মাগিয়াছিল। লজ্জায়, ক্ষোভে ছায়া সাড়া দেয় নাই; অশোক দ্বার খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ছায়ার আজও মনে আছে, সে সময়ে ছায়ার মন ভাবিতেছিল, ভিক্ষায় প্রয়োজন কি! জোর করিয়া লইতে কে তাহাকে মানা করিয়াছিল!

এই বিবাহ! এই মিলন! আর, এই বিচ্ছেদ!

আজ যদি মেঘেরা দৌত্য স্বীকার করিত, ছায়া তাহাদের কোথায় বা কাহার কাছে পাঠাইত? অশোকের কাছে নিশ্চয়ই নয়। তবে কাহার কাছে পাঠাইবে?

তাহার মত দুঃখী এ পৃথিবীতে কেহ আছে কি? যদি কেহ থাকে, ছায়া শুধু তাহারই কাছে তাহার ব্যথাভরা হৃদয়ের কাহিনী মেঘমুখে পাঠাইতে পারে। মেঘেরা সকল দেশে যায়, সব ঘর দেখিতে পায়, সকলের কাছেই যাইতে পারে, যেদেশে যেখানে যে ঘরে তাহার মত দুঃখী আছে, শুধু তাহারই কাছে ছায়া খবর পাঠাইতে চায়।

এই মেঘেরা কি বিলাতেও যায়? বিলাত মেঘের রাজ্য শুনা যায়, সেখানকার আকাশ সকল সময়ই মেঘে আচ্ছন্ন। এখানকার মেঘ বোধ হয় সে দেশে যাইতে পারে না। কিন্তু যদি যাইত, আর মেঘকে তাহার ভাষা যদি সে বুঝাইতে পারিত!

—ছায়া!

ছায়ার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সিক্ত মস্তক, সিক্ত বসন সুবিমলের প্রবেশ।

—মিঃ রায়! এই বৃষ্টিতে!

—বৃষ্টি বেশী পড়ছে না, হাওয়াটা শুধু—

—এই বাদলায় মানুষ বাড়ীর বার হয়?

বিমল হাসিয়া বলিল, নইলে যে তোমার পড়ার—কথাটা শেষ করিল না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। যে কথাটা সে মুখে বলিল না, যে কথাটা তাহার—শুধু তাহার কেন, গরীব মাত্রেরই মনে অহরহ ধ্বনিত হয়, সে কথাটা যে বুঝান যায় না। চাকরীর ভয় দৈবদুর্ব্বিপাকের চেয়ে কত ভীষণ, গরীব চাকুরীজীবী ছাড়া কে তাহা বুঝিতে পারে?

বিমল জামার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মাথাটা, হাত দু'টা, মুখটা মুছিয়া লইয়া, চেয়ারে বসিতে, ছায়া বলিল, চা দিতে বলি?

—বয়ের সঙ্গে আমার দেখাহয়েছে, চা আনছে। আলোটা জ্বেলে দিই।—বিমল উঠিয়া, সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল।

ছায়া দু'হাতে চোখ দু'টায় আড়াল করিয়া বলিল, আজ আলো ভাল লাগছে না।

বিমল বলিল, অঙ্ক ক'টা কষেছিলে?

—না।

—পার নি?

—দেখিই নি।

বিমল দুঃখিত ভাবে বলিল, চেষ্টা ক'রে দেখলে না কেন একবার?

ছায়া দৃঢ়স্বরে বলিল, কি হবে চেষ্টা করে!

একটু থামিয়া আবার বলিল, আজ পড়ব না।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিল, শুধু আজই নয়, কোনও দিনই আর পড়ব না।

বিমল নীরবে ছায়ার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছায়া আলোর দিকে হাত দু'টা আড়াল করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া বলিল, পড়তে আমার ভাল লাগে না, একটুও না, একটুও না।

কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, বিমলের মুখখানি আস্তে আস্তে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া আসিল।

ছায়া বলিল, আজ বাবা বাড়ী এলেই একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে। পড়ব না আমি, কিছুতেই না।

বয় চায়ের সরঞ্জামাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই, ছায়া উঠিয়া আসিয়া, চা প্রস্তুত করিয়া, চায়ের বাটী আগাইয়া দিতে গিয়া বিমলের শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ দেখিতে পাইল। ছায়া নিজে দুঃখী, অপর দুঃখীর ব্যথা সে বুঝিল। নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া শূন্য মনে চায়ের পেয়ালায় চামচটি নাড়িতে নাড়িতে নতমুখে বলিল, বাবাকে বলে কাজ নেই, যেমন চল্‌ছে চলুক।

বিমল বলিল, তার মানে?

ছায়া বলিল, মানে—আমি যদি বলি, পড়ব না, তা হলে ত আপনার কাজটি যাবে। তার চেয়ে, আপনার যতদিন অন্য কাজ না হয়, আমি বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টে যাব; আপনি বসে বসে দেখবেন।

—তোমাকে না পড়িয়েও আমি পড়ানর পারিশ্রমিক নিয়ে যাব?—কথাগুলা এত নীরস, এত কঠিন ও এত তীক্ষ্ণ করিয়া সে বলিল যে, ছায়া চমকিয়া উঠিল। বিমল পুনরায় বলিল, না ছায়া, এমন চাকরী আমি করি নে! আমি গরীব, কিন্তু জোচ্চোর নই।

দরিদ্রের অভিমানের সহিত ছায়ার সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল না; থাকিলে সে ঐ কথা উচ্চারণও করিত না। অশোক গরীব; কিন্তু অশোককে জানিবার, বুঝিবার, চিনিবার সুযোগ তাহার কবে মিলিয়াছে? এক্ষণে, বিমলের কথার ভাবে দরিদ্রের দৃপ্ত অভিমান যে কি, তাহা বুঝিয়া, অনুতাপ-আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করলেন মিঃ রায়?

বিমল কথা কহিল না।

চায়ের পেয়ালাটা খট করিয়া টেবিলের উপরে নামাইয়া রাখিয়া, ছায়া উঠিয়া আসিয়া বিমলের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, না জেনে যে কথা বলে ফেলেছি, তার জন্য আপনি আমায় মাপ করুন, মিষ্টার রায়।

তবু বিমল কথা বলে না দেখিয়া ছায়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল, আমায় ক্ষমা করুন, আপনার হাতে ধরে মিনতি করছি মিঃ রায়! আমার মনটা আজ ভাল ছিল না, অসাবধানে বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

বিমল ছায়ার হাত হইতে নিজের হাত দু'খানি টানিয়া লইয়া বলিল, তুমি বস ছায়া। আমি তোমার ওপর রাগ করি নি, সত্যি বলছি, রাগ করি নি।

ছায়া বসিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে নিজমনেই বলিতে লাগিল, আজ সমস্ত দিন মনটা আমার কি খারাপই যে হয়ে রয়েছে, তা আমিই জানি। তাই কি বলতে কি বলে ফেলেছি; নইলে আপনার মনে আমি কখনও কষ্ট দিতে পারি? একে আমার মন ভাল নেই, তার ওপর আপনি রাগ করলেন···

বিমল অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, আমারও মনটা ভাল নেই ছায়া, নইলে ঐ তুচ্ছ কথাটার জন্যে এত কড়া কথাই বা তোমায় বলব কেন? তুমি আমায় ক্ষমা কর ছায়া।

একটা যেন বুঝাপড়া হইয়া গেল। দু'জনেই পরিত্যক্ত পেয়ালা তুলিয়া চুমুক দিল।

চা খাইতে খাইতে বিমল বলিল, ছায়া তুমি মিঃ বোসের চিঠি পেয়েছ?

ছায়া বিলাতফেরতের মেয়ে, আধুনিক সমাজেরও বটে, তবুও একটু লজ্জারুণ হইয়া নতমুখে বলিল, না।

—কতদিন পাও নি?

—অনেক দিন। কেন বলুন তো?

—বলছি, তুমি চিঠি দাও?

—না; আগে আগে জবাব না পেয়েও ক'খানা লিখেছিলুম, তারপর ছেড়ে দিয়েছি। কেন, বলুন না?

—পরে বলছি। মিঃ বোসকে তোমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না?

—না।

—বিমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে হয় না?

ছায়া বলিল, না। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন এসব?

—আমি এক মস্ত সমস্যায় পড়ে গেছি ছায়া।

ছায়া সাগ্রহে কহিল, কি বলুন না মিঃ রায়?

বিমল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ছায়া কিন্তু আগ্রহ দমন করিতে পারিতেছিল না, কহিল, কৈ বললেন না?

—বলছি, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, বলুন না মিঃ রায়?

—বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি।

—তবে থাক্ বলতে হবে না, বলিয়া ছায়া জানালার দিকে ফিরিয়া বসিল। বাহিরে তখন ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বিমল বলিল, বলছি শোন।

ছায়া ঘুরিয়া বসিল।

—একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে; মেয়েটিও বাসত। মেয়েটি বড়লোকের মেয়ে, ছেলেটি খুব গরীব। কিন্তু তারা দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা পরস্পরকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। মেয়েটির মা চাইতেন, খুব বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়; মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিছুতেই না। মা পছন্দ করতেন না যে গরীব ছেলেটি তাঁর বাড়ীতে আসে; ছেলেটিও কাজ-কর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বাড়ীতে যাবে না, স্থির করেছিল। কিছুদিন থেকে ছেলেটি মেয়েটির বাড়ীতে যায় না বটে, তবে তাদের ভালবাসা ঠিক ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল—বিমল থামিল।

ছায়া বলিল, কি দেখা গেল?

বিমল বলিতে লাগিল, দেখা গেল, খুব বর্ষায় একদিন মেয়েটি অন্য একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মোটরের কাচটাচ বন্ধ করে গল্প করতে করতে বেড়াতে যাচ্ছে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই।

—তবে যে বললেন, সমস্যা।

—ঐ ত সমস্যা।

—ঐ বেড়াতে যাওয়া? তাতে দোষ কি?

—দোষ নেই?

—কি দোষ! কিন্তু মেয়েটি কে?—বলিয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে ছায়া বলিল, আমি বলব কে? ইন্দু? না, মিঃ রায়?

বিমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ছায়া হাসিয়া বলিল, বড়লোকটি বোধ হয় আমার সুবিখ্যাত প্রণয় মামা।

বিমল সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কেমন ক'রে জানলে?

ছায়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, গরীব লোকটি কে, তা বোধ হয় না বললেও চলবে। কিন্তু কখন দেখলেন তাদের? আজ আসবার সময়?

—হ্যাঁ।

বিকট শব্দে বাজ ডাকিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তে সারা পৃথিবী যেন আলোয় আলো হইয়া গেল। মিসেস্ ঘোষ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন; বাজটা কাছেই কোথাও পড়েছে মনে হচ্ছে, না?

এই অহেতুক প্রশ্নের জবাব কেহই দিল না।

মিসেস ঘোষ বলিলেন, উনি হয় ত এতক্ষণে কোর্ট থেকে বেরিয়েছেন। দেখি একবার ফোন করে। না বেরিয়ে থাকলেই ভাল।—তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিমল ভাবিতেছিল, এ সময়ে ইন্দু বাড়ীর বাহির হইল কেন?

ছায়া ভাবিতেছিল, প্রণয় মামা এদিকে আসে না কেন?

আকাশ আর একবার বিরাট গর্জ্জন করিয়া উঠিল; আবার ধরিত্রী আলোকোদ্ভাসিতা হইল।

বিমল বলিল, এ রকম বেড়ান দোষের নয়. তুমি বলছ?

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, নিশ্চয়ই নয় বন্ধুর সঙ্গে সবাই বেড়াতে যায়, কোন দোষ হয় না।

"না, তিনি আপিসেই ছিলেন।" বলিয়া মিসেস্ ঘোষ সেই ঘরে আসিয়া বসিলেন।

ছায়া বলিল, আজ আমরা গল্প করছি, মা।

—কি গল্প?

ছায়া বিমলের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ এই সব।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, আজ আর তুমি হেঁটে যেও না বাবা। ওঁর গাড়ী ফিরলে, সেই গাড়ীতে সকাল সকাল বাড়ী চলে যেও।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিমল ভুল দেখে নাই।

কিন্তু কিরূপে কি হইল সেটা জানা দরকার। আবু-দি'র কৃতিত্ব অসাধারণ; তিনি যাহা বলেন, তাহা করেন। ধার্য্য রবিবার দিবস অপরাহ্নে হঠাৎ প্রণয় সাহেবের গাড়ীখানা ইন্দুদের ফটকে ঢুকিয়া পড়িয়া ইন্দুকে ব্যস্ত করিয়া ফেলিল। ব্যস্ততার কারণ মা কণাকে লইয়া কিছুক্ষণ হইল ইন্দুর পিতৃবন্ধু ও পাশায় পিতৃজয়ী মহেন্দ্র বাবুর কন্তার পাকা দেখার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। ইন্দু সচরাচর কোথাও যায় না, যাইতে চায় না বলিয়া মা আজও তাহাকে ডাকেন নাই। না যাইতে হইলেই ইন্দু বাঁচে। কোথায় গেলেই, চারিদিক হইতে দরদীদের আক্রমণ হইতে থাকে, এবং নানাস্থানের ও নানারকমের পাত্র-পরিচয় প্রকাশ পাইতে থাকে, ইহা সহ্য করা অতীব কষ্টকর। তাহার অসাক্ষাতেও দরদের বন্যা বহিতে থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ত শুনিতে পায় না, এই সান্ত্বনা।

সারাদিন মেঘ করিয়াছিল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখন বৃষ্টি থামিয়াছে, হাওয়া চলিতেছে, ইন্দু কাশ্মীরী বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। নীচের ফুলবাগানে এখন আর ফুলের ছড়াছড়ি নাই। সীজন ফ্লাওয়ারের গাছগুলি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, স্থানটি খালি পড়িয়া আছে, পাতা-বাহার গাছের বেড়ার ধারে ধারে বেল যুঁই মল্লিকার ঝাড়-গুলিতে দুটি চারটি করিয়া ফুল দেখা যায়। ফুল থাক্ আর নাই থাক্—নববর্ষার প্রথম প্রবল বারিধারাস্নাত তরুলতা গুলির স্নিগ্ধরূপে নয়ন ভরিয়া যায়। কে যেন যত্ন করিয়া তেল মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দিয়াছে। ধরণী যেমন জলধারাকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, এই গাছপালাগুলিও যেন সদ্য সদ্য বাড়িয়া গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম বর্ষার সঙ্গে মানুষের মনের কেমন একটা সম্প্রীতি আছে; নববর্ষাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য মানুষ উন্মুখ হইয়া থাকে, ইন্দুও ছিল। কি ভাল লাগিতেছিল ঐ ভেজা ফাঁপা মাটী আর সদ্যবিধৌতগাত্র গাছ-পালাগুলি!

এমন সময়ে প্রণয় সাহেবের শুভাগমন। ইন্দুর মনে হইল, মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইলে এ বিপদে পড়িতে হইত না।

কিন্তু যা নাই, আদর আপ্যায়ন করিয়া বসাইতে হইল।

প্রণয় সাহেব বলিলেন, তুমি নাকি আমার ওপর বড্ড রেগেছ, ক'দিন আসি নি বলে?

ইন্দু প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল, পরে বলিল, আপনাকে কে বললে?

—বৌদি! আবার কে! ক'দিন আসতে পারি নি। মিসেস্ সরকারের মিউজিক ক্লাসের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসন সেরিমণির জন্যে একটা প্লেলেট (নাটিকা) লিখতে হচ্ছিল। কালই সেটা শেষ হয়েছে। তুমি রাগ করেছ ইন্দু?

ইন্দু বলিল, লেখা হয়ে গেল?

প্রণয় কহিলেন, হ্যাঁ, কাল লিখে, মেয়েদের মধ্যে ভূমিকা ডিষ্ট্রিবিউট্ (বণ্টন) করে দিয়ে এসেছি। "অদৃষ্টের পরিহাসে" শুধুই বালক চরিত্র ছিল ত, "কিশোরী"তে শুধু কিশোরী চরিত্র আছে। ২০এ জুলাই গ্লোবে প্লে হবে। তুমি যাবে ত ইন্দু?

ইন্দু বলিল, আপনাকে খাবার কিছু দিতে বলি? কি খাবেন?

—বাদলায় কি ভাল লাগে, বল দেখি?

-তা কি জানি?

—জান না ? বাদলায় ভাল লাগে, কবিতা লেখা, পাঁপর ভাজা, আর—

ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তাই বলে আসি।

প্রণয়কুমার কহিলেন, আর ভাল লাগে প্রিয়াসঙ্গ।

ইন্দুর কাণমাথা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। অতিথি নারায়ণ, অসম্মান করিতে নাই—এই নীতিবাক্য তাহার মনে আসিল না; মনে হইল, যে লোকটা ঐ মুখে ঐ কথা বলিয়াছে, সেই মুখে একটি চপেটাঘাত করিতে পারিলে তার যেন রাগ যাইত। ইন্দুর সকল অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

প্রণয়কুমার ইহাকে লজ্জা পরিকল্পনা করিয়া বর্দ্ধিতোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, বাঙলার কাব্যসাহিত্য বর্ষা-বন্দনায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে ; আর তার মূলে আছে, এই প্রিয়াসঙ্গ।

ভাবে বিভোর প্রণয়কুমার বর্ষণক্লান্ত ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিশোরী" নাটিকায় আমি সেই কথাই লিখেছি।

—আপনার খাবার দিতে বলি, বলিয়া আরক্তমুখে একরকম উর্দ্ধশ্বাসেই ইন্দু চলিয়া গেল। জনহীন অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে তাহার বক্ষের স্পন্দন প্রশমিত করিতে লাগিল। কেন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যায় নাই, কেন মরিতে বাড়ীতে ছিল, কোন্ কুক্ষণে এই লোকটা তাহাদের গৃহে আসিয়াছিল, কোন্ অশুভক্ষণে সে ইহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল, আর কেনই বা ভদ্রতার আভরণটা ফেলিয়া দিয়া অভদ্র হইয়া ইহাকে বিতাড়িত করিতে পারিতেছে না, এই সব কথাই ভাবিতেছিল। লোকটা হয়ত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছে, জুতার মস্ মস্ শব্দ শুনা যাইতেছে, হয়ত বা এই দিকেই আসিয়া পড়িবে, ইন্দু দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। ঠাকুরকে পাঁপর ভাজিতে ও চা করিতে বলিয়া, বাবার বৈঠকখানায় ঢুকিল। কক্ষ জনশূন্য ! বাবা একটিদিন যদি সকাল সকাল ফিরেন ! রোজই দেরী, রোজই রাত !

ইন্দু যে ভয় করিতেছিল, তাহাই ঘটিল। লোকটি বারান্দা হইতে ডাকিল, ইন্দু, ইন্দু !

ইন্দু দু'হাতে বুক চাপিয়া চক্ষু মুদিয়া সে ডাক শুনিতে লাগিল। ডাক ত নয়, যেখান দিয়া, যে পর্য্যন্ত শব্দ যাইতেছে, সব যেন পুড়াইয়া দিতেছে।

আবার আহ্বান, চমৎকার অতিথিসেবা করছ ইন্দু, চমৎকার।

ইন্দু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। কি জানি, লোকটার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, যদি এইখানেই আসিয়া হাত ধরিয়া বসে।

উপরে আসিতে, প্রণয় বলিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা ! তোমার ইয়ে-র সঙ্গে আলাপ হ'ল যে !

ঐ লোকটির মুখের পানে চাহিতেও প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইয়ে-টি কে জানিবার কৌতূহল দমন করিতে না পারায় চাহিতে হইল। প্রণয় বলিলেন, বুঝতে পারছ না, ঐ যে তোমার ইয়ে গো। কি নামটা ভাল, সুবিমলপ্রকাশ না কি, ভাল যে !

ইন্দুর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

প্রণয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার একটি গার্ল ফ্রেণ্ডকে সে পড়াত, আলিপুরের জজ মিঃ ঘোষের মেয়ে, সম্পর্কে আমার ভাগ্নী হয়। তাকে পড়াত, তা' সে আর পড়বে না, সেই জন্য তোমার কি বলে ইয়ে-র চাকরীটি গেছে।

সমস্ত দেহ, রক্ত মাংস অস্থি মেদ মজ্জা, সমগ্র লোমকূপ দিয়াও ইন্দু শুনিতেছিল।

—ছায়া তার মাষ্টার মশায়ের জন্য আমাকে অনেক বললে-টললে, যাতে কোথায়ও একটি চাকরী-বাকরী হয়…

—চাকরী-বাকরীর যে বাজার, হওয়া মুস্কিল…

—ছায়ার কাছে আরও অনেক কথা শুনলুম…

ইন্দুর মনে হইতেছিল, তাহার হয়ত সংজ্ঞা লোপ পাইবে, না-হয় তাহার সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হইবে।

—তুমি অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ইন্দু ! এখানে এসে বস না। বলিয়া যে সোফাটায় তিনি বসিয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বের খালি স্থানটুকু নির্দ্দেশ করিলেন।

ইন্দু কথা বলিল না, নড়িল না, বুঝি তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হইয়া আসিতেছিল।

প্রণয়কুমার আদর ও অভিমানমিশ্রিতস্বরে কহিলেন, আসবে না ত ? তাহলে আর বলব না।

ইন্দু অতিকষ্টে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আসছি, আপনি বলুন। বলিয়া সে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল। খাবার লইয়া ঠাকুর আসিয়া পড়িলে বেশ হয়।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর আসিয়া পড়িল। খাবার গুছাইয়া, প্রণয়ের সামনে ধরিয়া দিয়া, পাশের একাসন কৌচটায় বসিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

—তুমি নাকি তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্নের উত্তর সহজ এবং সরল, 'হাঁ' বলিতেও কিছু মাত্র দ্বিধা ছিল না; কিন্তু প্রশ্নকারীর ভাষা, প্রশ্ন করিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর এতই কদর্য্য বলিয়া মনে হইল যে, উত্তর দিতেও ঘৃণা হইল; ইন্দু কোন কথা বলিল না।

—তার একটা ভাল চাকরী হলেই তোমাদের বিয়ে হতে পারবে, এই রকম ঠিক আছে, না?

তবুও ইন্দুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

—একটা কাজ আছে, চেষ্টা করলে যে না-হয়, তা'ও নয়, তাই ভাবছি।—বলিয়া তিনি গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিলেন।

ইন্দুর মুখ দিয়া এতক্ষণে কথা বাহির হইল, চা যে জল হয়ে গেল।

—না, এখনও জলের পূর্ব্বাবস্থা—অর্থাৎ বাষ্পাবস্থা রয়েছে। ঐ দেখ, ধোঁয়া উঠ্ছে।

—খেয়ে নিন্ না।

—নিই। বেড়াতে যাবে? চল, বেড়াতে বেড়াতে পরামর্শ করব 'খন।

আবার সেই জঘন্য প্রস্তাব।

—যাবে? বর্ষার দিনে বেড়াতে বেশ লাগে।

ইন্দু বলিল, বৃষ্টি পড়ছে যে!

প্রণয় বলিলেন, বন্ধ গাড়ীর ভেতর বৃষ্টি ঢোকে না।

ইন্দু বলিল, বাড়ীতে যে কেউ নেই।

—না-ই বা থাক্‌ল! বাড়ী চুরী যাবার ভয় আছে কি?

ইন্দু হাসিল।

প্রণয় বলিলেন, ঘরে বসে গল্প করতে ভাল লাগে না। চল, বেরিয়ে পড়ি। সত্যি, পরামর্শ আছে।

যাওয়া উচিত, অথবা নয়, সে কথা আগেই ভাবা হইয়া গিয়াছিল। ইহার সঙ্গ ভাল লাগে না, সেই যা; নইলে শুধু বেড়াইতে যাওয়ায় আপত্তি কিসের!

—পাঁচ মিনিট, আমি আসছি, বলিয়া ইন্দু বাহির হইয়া গেল। খুব যে আগ্রহ ছিল, তাহা নহে; তবে অনাগ্রহও ছিল না। বেড়াইতেই যখন যাওয়া হইতেছে, একটু প্রসাধন করিতে হয়, ভাল কাপড়ও পরিতে হয়, কপালে একটা ফোঁটাও দিতে হয়! বেশবিন্যাস করিয়া সে যখন এ ঘরে ঢুকিল, মধুলোভে মত্ত অলি পুষ্পসন্নিধানে আসিয়া যেমন গুঞ্জন তোলে, প্রণয়ও তেমনই গুঞ্জন করিয়া উঠিল। কি বলিল না বলিল তাহা বুঝা গেল না বটে, তবে ইন্দুর সৌন্দর্য্যের উচ্চপ্রশংসাই যে তাহার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইল তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। ইন্দু যদি পারিত, সেই মুহূর্ত্তে সাজসজ্জা দূর করিতেও দ্বিধা করিত না।

পথে একটা লোক ছাতি মাথায় ভিজা জুতায় চব্ চব্ করিতে করিতে চলিয়াছে, বহু দূর হইতে ইন্দু তাহাকে দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ী যখন পথিককে অতিক্রম করিল, ইন্দু দুই উৎসুক নেত্রে তাহাকে দেখিয়া লইল। সে-ই বটে! ইন্দু যে তাহার ছায়ামাত্র দেখিলেও চিনিতে পারে। গাড়ী থামাইতে বলিতে ইচ্ছা হইল, পারিল না।

প্রণয় বলিতেছিলেন, কাজটা ভালই; দেড়শ টাকায় আরম্ভ, চার পাঁচশ' পর্য্যন্ত হবার আশা আছে। আমি কালই সব খোঁজ নিয়ে এসে সন্ধ্যার সময় তোমায় বলব, কেমন?

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

প্রণয় কহিলেন, আমার মনে হয়, আমি তোমার ইয়ে-কে বসিয়ে দিতে পারব।

ইন্দুর চোখে অজস্র কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল।

—কিন্তু আমার পুরস্কার?

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ইন্দু চক্ষু নত করিয়া লইল।

—বিয়ের পরে কি আর আমাদের মনে থাকবে?

—না, থাকবে না! বলিয়া ইন্দু হাসিল।

—দেখা যাবে, কেমন মনে থাকে!

—দেখবেন।

রাত্রি করিয়া প্রণয় যখন ইন্দুকে বাড়ীতে নামাইতে আসিলেন, মা তখনও ফিরেন নাই।

রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয় নি বোধ হয়, আমি যাই, বলিয়া কণ্ঠের স্বরে মিনতি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দু ভিতরে চলিয়া গেল।

দুই তিন দিন পরে প্রণয় বলিলেন, ইন্দু, এইবার তোমার ইয়ে-কে—

ইন্দু রাগিয়া বলিল, ইয়ে ইয়ে করেন কেন বলুন ত?

প্রণয় বলিলেন, কি বলব? লভার? ফিয়াঁসি?

—তা কেন!

—তবে?

আপনি ত তাঁর নাম জানেন।—হাসিয়া ইন্দু মুখ নীচু করিল। একটু পরে বলিল, কি বলছিলেন?

—কৈ?

—এই যে এইমাত্র কি বলছিলেন, তাঁকে—

—তাঁকে?—প্রণয় বঙ্কিম কটাক্ষে, কৃত্রিম অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিলেন, তাঁকে—কাকে?

—যান্, আমি জানি নে!

প্রণয় হাসিয়া বলিলেন, ওঃ, তাই! হ্যাঁ, তোমার ডার্লিংকে দু' একদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লে দাও।

ইন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক হয়েছে?

প্রণয় দুষ্টামি করিয়া বলিলেন, বিয়ের দিন?

ইন্দু বলিল, যান্।

—তাই যাই। কিন্তু তুমিও যাবে ত? চল, "কিশোরী"র ষ্টেজ রিহার্স্যালটা দেখে আসি, এম্পায়ারে।

ইন্দু না বলিতে পারিল না। রিহার্স্যালের লোভে নয়, কিন্তু যে কথাটা অর্দ্ধেক শোনা হইয়াছে, সেই কথাটার শেষ না শুনিলেই যে নয়।

এম্পায়ার হইতে ফিরিবার পথে, প্রণয় বলিলেন, কাল পর্শুর মধ্যেই দেখা করতে বলো।

ইন্দু কৃতজ্ঞস্বরে কহিল, বল্‌ব।

প্রণয়কুমার বলিলেন, কিন্তু আমাদের ভুলে যাবে না'ত গো ইন্দুমতী?

—বন্ধুকে কি কেউ ভোলে।—ইন্দু অবিচলিত-কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার সুদক্ষ চালক। চক্ষু তাঁহার যেদিকেই থাক্, মন যেখানেই নিবদ্ধ থাক্, গাড়ী ঠিকই চলে, কখনও এদিক ওদিক হয় না। এম্পায়ারের রিহার্সালে চল্লিশ পঞ্চাশটি তরুণী ছিল, কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্যেই নয়, ইন্দু যেন সকলের মধ্যেও আলাদা, একা। সে যেন একা এক শ'। সকলে তাহার পানে চায়; সে কাহারও পানে তাকায় না। সকলে তাহার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র, সে আনতমুখে একাকী বসিয়া থাকিতেই চায়।

গাড়ী ছুটিতেছে, ইন্দু কাঁচের বাহিরে মুখ রাখিয়া বসিয়া, তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রণয়কুমার ঐ কথাগুলিই ভাবিতেছিলেন। যত ভাবেন, ইন্দু তাঁহার নিকট ততই মনোরম, ততই কাম্য হইয়া পড়ে। একবার যেন ভাবাতিশয্যে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া বসিল, তাঁহারও ভাবাবেগ আহত হইল।

রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। প্রণয় ইন্দুকে নামাইয়া দিয়া, চলিয়া যাইতে ইন্দু যখন উপরে উঠিতেছিল, মালী তাহার হাতে একখানি শত-ভাঁজ কাগজ দিল। বলিল, বিমল দাদাবাবু দিয়া গিয়াছেন।

ইন্দু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া উপরে ছুটিল। মা ক্ষণাকে বুকের কাছে লইয়া শুইয়া গভীর নিদ্রামগ্ন। তবুও শয়নকক্ষে বসিয়া চিঠিখানা খুলিতে তাহার সাহস হইল না। বাথরুমে গিয়া চিঠি খুলিল।

"আজও দেখিলাম, প্রণয় বাবুর সঙ্গে গড়ের মাঠ হইতে বাহির হইয়া তুমি এম্পায়ারে গেলে। খবর লইয়া জানিলাম নাটকের রিহার্সাল হইতেছে; রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত হইবে। আমি দু'তিন দিন মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছি—ভাগ্যান্বেষণে।"

কি কঠিন নির্ম্মম পত্র! ইন্দু আর একবার পড়িল। তারপর মাথায় মগের পর মগ জল ঢালিয়া বিছানায় শুইয়া মুখের উপর বালিশ চাপা দিল। [ক্রমশঃ
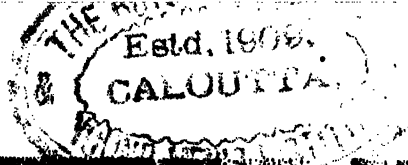
পলিনেসিয়ার পুরাণ

§ মাউই-এর কীর্ত্তি

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মাউই-এর মা টারাঙ্গার বাড়ীতে মস্ত বড় ভোজ। সকাল থেকে নাচ চলেছে, গান চলেছে, খাওয়া চলেছে। সন্ধ্যা-বেলা টারাঙ্গা খাইয়ে-দাইয়ে ছেলেদের শুতে পাঠাবেন, হঠাৎ ছেলেদের গুণতে গিয়ে তিনি ত' অবাক।

একবার গোণেন, দু'বার গোণেন, তিনবার গোণেন। হিসেব আর মেলে না।

টারাঙ্গার চার ছেলে, বড় ছেলের নাম মাউই-টাকা, মেজর নাম মাউই-রোটো, সেজ হল মাউই-পেয়ে, ছোটর নাম মাউই-ওয়াহো; তার ভিতর আর একটা এল কোথা থেকে?

তাইত! এক রত্তি একটা ছেলে কোথা থেকে এসে ভিড়েছে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে!

টারাঙ্গা রেগে উঠে বলেন, "কেরে তুই?"

ছোট্ট ছেলেটি বলে, "আমার নাম মাউই, আমিও তোমার ছেলে।"

"আমার ছেলে? কখখনো না। আমার ছেলে ত' চারটি। যাঃ তুই চলে যা।" বলে' টারাঙ্গা ছেলেদের নিয়ে ঘরে শোয়াতে যান।

ছোট মাউই তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে মুখটি কাঁচুমাচু করে বলে, "আমায় তুমি চিনতে পারছ না মা, আমিও তোমার ছেলে।"

টারাঙ্গা তার দিকে ফিরেও তাকান না।

ছোট্ট মাউই দৌড়ে এসে তাঁর হাত ধরে বলে, "সেই যে তোমার কোলে এত্তটুকুন আমি হয়েছিলাম, তোমার মনে নেই মা? সেই একদিন আমার চোখ গেল গহন ঘুমে বুজে, আমার কান্না গেল থেমে, আর তুমি কাঁদতে কাঁদতে আমায় শুইয়ে দিয়ে এলে সাগরের তীরে ঢেউএর ফেনার ভিতর। সেখানে সাগরের শ্যাওলা আমাকে জড়িয়ে ধরলে, আর সাগরের ঢেউ আমাকে দিতে লাগল দোলা।

"হরেক রকমের রঙ-বেরঙের মাছ এসে আমায় আদর করে গেল, আর দুধের মত সাদা যাদের ডানা সেই সিন্ধু-বাজেরা উড়ে উড়ে আমায় দিতে লাগল পাহারা।

"আমি তখন চোখ খুলে তাকালাম আর বললাম, 'আমার মা কোথায়?'

"মা কোথায় তারা কেউ বলতে পারে না। শ্যাওলারা বললে, 'আমরা ভেসে বেড়াই মায়ের কি জানি! আমাদের সঙ্গে ভেসে চল।'

"মাছেরা বললে—'আমরা ডিম ফুটে বেরুই, মায়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমাদের সঙ্গে সাঁতরাবে এস।"

"সাদা-ডানা সিন্ধু-বাজেরা বললে, 'আমাদের মা থাকে সাগর-পারে খাড়া পাহাড়ের চুড়োয়! আমাদের সঙ্গে তুমি ত উড়তে পারবে না।'

"আমি বললাম, 'আমার মা ত' পাহাড়ের চুড়ায় থাকে না, থাকে মাটির ঘরে। আমি তাকে খুঁজব।'

"সেই থেকে মা কতদিন ধরে কত জায়গা খুঁজে আজ তোমায় পেয়েছি। তুমি আমায় চিনতে পারছ না?"

"তাইত! তাইত!" টারাঙ্গা ছোট্ট মাউইকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "এইত আমার ছোট্ট মাউই, আমার হারানো মুক্তো, আমার মাউই-টিকি-টিকি! এতদিন পরে আমার কোল জুড়োতে এসেছে।"

মাউইকে তিনি চুমো খেলেন। মায়ের তখন চোখে জল, মুখে হাসি। আর সব ভাইদের তাই দেখে বুঝি হিংসে হল। না, হিংসে হবে কেন? মাউইএর মিষ্টি মুখখানা দেখলে অমনিই যে আদর করতে ইচ্ছে করে। তার উপর কি হিংসে হয়!

এমনি করে ছোট্ট মাউই ফিরে এল মায়ের কাছে।

টারাঙ্গা মায়ের পাঁচ ছেলে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল; পাঁচ ছেলেই মস্ত বীর, কিন্তু সবার সেরা হল মাউই। যেমন তার গায়ে জোর, তেমনি তার ধারালো বুদ্ধি। দেশের যা কিছু সে সব ফেললে শিখে। তার মত ডোঙ্গা বানাতে কেউ পারে না, বইতেও না। ঝিনুকের বঁড়শী দিয়ে গহন সমুদ্রের বড় বড় মাছ গেঁথে তুলতে তার জুড়ি মেলে না।

কিন্তু তার কিছুতে সুখ নেই।

একদিন মাছ-ধরা সেরে পাঁচ ভাই ডোঙ্গা বেয়ে ঘরে ফিরছে। সূর্য্য বসেছে পাটে। হঠাৎ মাউই বললে, "দিনগুলো ভাই বড্ড ছোট। মাছ ধরে আশ মেটে না।"

দাদারা বললে, "তার আর উপায় কি! দিন ত' আর টেনে বাড়াতে পারবি নে?"

"কেন পারব না?" মাউই তার ডোঙ্গায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বললে, "সূয্যি ঠাকুর বড় চালাক! ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালান। দাঁড়াও, তাকে জব্দ করছি!"

"সূয্যি ঠাকুরকে জব্দ করবি কি রে? অমন কথা মুখে আনাও পাপ।" দাদারা সব ছোট্ট মাউই-এর কথা শুনে একেবারে থ।

কিন্তু মাউই বিষম একগুঁয়ে, যা ধরেছে তা সে করবেই। বললে, "সূয্যি ঠাকুরের গলায় ফাঁস দিয়ে বেঁধে ফেলব।"

"কি দিয়ে ফাঁস দিবি! কলাগাছের আঁশে ত' আর হবে না!"

"কেন?" বনের দিকে চেয়ে মাউই বললে, "ওই শনগাছ দিয়ে!"

দাদারা হেসে উঠল। কিন্তু ছোট্ট মাউই-এর আবদার না শুনলে ত চলে না। ডোঙ্গা থেকে নেমে তারা শন গাছ গেল তুলতে।

কিন্তু তুলেই সবাই অবাক, শন গাছে এমন ফাঁসের দড়ি লুকিয়ে ছিল কে জানত। ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল মাউই-এর। তার পর শন থেকে মস্তবড় দড়ি তৈরী হল। সে দড়ি এত লম্বা যে মেপে শেষ করা যায় না। সেই দড়ি নিয়ে পাঁচ ভাই চলল সূয্যি ঠাকুরকে বাঁধতে পূব দিকের উদয়-পর্ব্বতে। কত নদী মাঠ, কত সমুদ্র পার হয়ে, কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, তারা যে গেল তার হিসেব নেই। রাতের বেলায় তারা হাঁটে আর দিনের বেলা থাকে লুকিয়ে। সূয্যিঠাকুর টের পেলে ত' আর রক্ষে নেই।

কত মাস কত বছর বাদে পাঁচ ভাই পৌঁছল গিয়ে উদয়-পর্ব্বতে। তখন রাত ভোর হয় হয়। সূয্যি ঠাকুর পাহাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দেবার উদ্যোগ করছেন। পাঁচ ভায়ে ফাঁস-দেওয়া দড়ি বাগিয়ে ধরে' রইল লুকিয়ে।

সূয্যি ঠাকুর যেই মাথাটি তুলেছেন, অমনি মাথায় ফাঁসটি লাগিয়ে, দে টান আর দে টান। সূয্যি ঠাকুর দম বন্ধ হয়ে যান আর কি!

"ওরে কে এমন সর্ব্বনাশ করলি রে, ছেড়ে দে ছেড়ে দে।"

কিন্তু ছেড়ে কি আর দেয়। ফাঁসের দড়ি হাতে করেই এসে প্রণাম করে মাউই বললে, "কিছু মনে ক'রোনা ঠাকুর। রোজ ফাঁকি দিয়ে পালাও। এমন করে না ধরলে আর ত আমাদের কথায় কান দেবে না। তাই একটু কষ্ট দিতে হল।"

সূয্যি ঠাকুর ছোট্ট ছোট্ট পাঁচটা মানুষ তাঁকে বেঁধেছে দেখেই ত' অবাক। বললেন, "কি তোদের চাই?"

"এখন থেকে দিন রাত আমাদের আলো দিতে হবে। রাতের বেলা সমুদ্দুরে ডুবে থাকা আর চলবে না।"

কিন্তু তা কেমন করে হয়! সূয্যি ঠাকুর অনেক ভয় দেখালেন, ধমকালেন, শেষকালে মিনতি করে বললেন, "বুড়ো মানুষ, আমায় একটু ঘুমোতেও দিবি নে বাপু!"

তাও ত' বটে, কিন্তু আলোও যে তাদের চাই!

সূয্যি ঠাকুর ভেবে চিন্তে বললেন, "তাহলে এক কাজ কর্! আমার মেয়ের কাছে গিয়ে ধন্না দে, সেই একটা ব্যবস্থা করে দেবে।"

সূয্যি ঠাকুরের কাছে তাঁর মেয়ের ঠিকানা জেনে নিয়ে আবার চল্‌ল মাউই। এবার সে একা। দাদারা কেউ তার সঙ্গে নেই।

সূয্যি ঠাকুরের মেয়ের দেশ—সে কি খুঁজে পাওয়া সহজ! কত কাল পাহাড়-পর্ব্বত বন-বাদাড় ঘুরে, শেষে মাউই পেলে তাঁর দেখা। পাহাড়ের ভিতর গহন গুহা, সেখানে তাঁর বাস। সূয্যি ঠাকুরের মেয়ে কিন্তু ভারী ভালো। মাউইকে কি আদরটাই না করলেন! মাউই তাঁর কাছে সাহস করে সব কথা বলতেই তিনি একটা নখ দিলেন খুলে। অমনি সেখান থেকে বেরিয়ে এল আগুন আর আলো; সমস্ত অন্ধকার গুহা আলোয় আলো হয়ে গেল। তিনি বললেন, এখন একে যে গাছে ঠেকাবে সেই গাছই হবে আগুনের বাহন।

মাউই-এর খুশী আর ধরে না। নখে করে আগুন নিয়ে সে চলল দেশে ফিরে। কিন্তু মাউই-এর স্বভাব বড় মন্দ। কিছুতে তার আশ মেটে না। পথে যেতে যেতে তার মনে হল একটা নখ খুলতে যখন এমন জিনিষ বেরিয়েছে, আর একটা নখ খুললে না জানি কি বেরুবে!

দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় চাপতেই মাউই একটা জঙ্গলের গাছে আগুনের নখ লুকিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে গেল সূয্যি ঠাকুরের মেয়ের কাছে।

আগুনের নখ সে হারিয়ে ফেলেছে। আর একটা নখ তাকে খুলে দিতে হবে।

সূয্যি ঠাকুরের মেয়ে এদিকে মনে মনে সব জানতে পেরেছেন আর খুব রেগে গিয়েছেন। 'তথাস্তু' বলে তিনি একটা নখ দিলেন খুলে, আর হু হু শব্দে বেরিয়ে এল জল। সে জলের তোড় কি সোজা! মাউই ত' ভেসে গেলই, সমস্ত মাঠ ঘাট জঙ্গল নিয়ে সমস্ত দেশই গেল ডুবে। মাউই-এর অনেক কান্নাকাটিতে সূয্যি ঠাকুরের মেয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হল। জলও কমে গেল। কিন্তু তখন গাছে লুকোন আগুনের নখ গেছে জলের স্রোতে হারিয়ে। সে নখ আর তিনি দিতে রাজী হলেন না।

কি আর করে! মাউই এবার সত্যি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলল। তাই দেখে শেষ কালে সূয্যিঠাকুরের মেয়ের বুঝি হল দয়া। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "কাঁদিসনে! যে গাছে নখ লুকিয়েছিলি সে গাছ খুঁজে বার কর্। এখন থেকে শুধু সেই হবে আগুনের বাহন।"

তাই হল। সেই একটি গাছই আগুনের বাহন। মাউই-এর দুষ্টুবুদ্ধির জন্যে আর সব গাছ জ্বলতে পারে, কিন্তু আগুন জ্বালাতে পারে না।

যাই হোক দেশে আগুন নিয়ে আসা ত' কম কাজ নয়। আর কেউ হ'লে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত সারা জীবন। কিন্তু মাউই ত' তেমন নয়। কিছুতে তার সুখ নেই, কিছুতে তার আশ মেটে না।

কিছুদিন বাদেই আবার তার মন উসখুস করতে লাগল। কিছু একটা না করলে আর চলে না।

দিন কয়েক বাদে একদিন সে আবার বেরিয়ে পড়ল। এবার সে যাবে মরণের দেবতার কাছে। পৃথিবীতে মৃত্যু আর থাকতে দেবে না।

এমন কথা কেউ কখনও শোনে নি। মা মানা করলে, ভায়েরা মানা করলে। কিন্তু মাউই নাছোড়বান্দা। তাকে যেতেই হবে!

সকলকে কাঁদিয়ে মাউই গেল একলা চলে দূর পাহাড়ের ওপারে মরণের দেবতার দেশে পৃথিবী থেকে মৃত্যু না ঘুচিয়ে আর সে ফিরবে না।

মাউই আজও সেখান থেকে ফেরে নি। কে জানে হয়ত সে সত্যিই একদিন সেখান থেকে ফিরে আসবে।

নির্ব্বংশ জীব-গোষ্ঠি

§ বিলুপ্তির দুর্ভেদ্য রহস্য

কলকাতা সহরের কোন পুরাতন বাসিন্দা যদি রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মত ৩৯ বা ৪০ বছর বাদে আজ আবার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলে কি রকম অবাক যে সে হবে, তা বুঝা শক্ত নয়। কলকাতার সে চেহারা আর নেই, শুধু তাই নয়, যান-বাহনও গেছে একেবারে বদলে। কোথায় গেল সে ঘোড়ায় টানা ট্রাম আর ছ্যাকড়া গাড়ি! তার জায়গায় বিদ্যুতের ট্রাম চলেছে মাথায় আঁকশী তুলে, মোটর আর বাস চলেছে রাস্তা দিয়ে হুস হুস করে। তখন যেখানে পৌছোতে দু'ঘণ্টা লেগে যেত, এখন সেখানে পোনেরো মিনিটে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। মোটরের আর বৈদ্যুতিক ট্রামের কাছে হার মেনে ঘোড়ার গাড়ি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে।

শুধু মানুষের সহরে নয়, প্রাণীজগতেও এমনি পুরানো অনেক শ্রেণীর জীব যেন ক্লান্ত হয়েই এক এক সময়ে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে। তাদের চেয়ে চালাক আর চটপটে প্রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তারা অনেক সময়ে হটে গেছে সত্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাদের বিলোপের এত সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর যখন বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, তখনকার বিরাট-কায় ডাইনোসর নামে সরীসৃপের কথা আজ এখানে তুলব না। লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করে' আমাদের আজকালকার হাতীদের তিন চার গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও

অধুনালুপ্ত আমেরিকার বাইসন।

কেমন করে' তারা লোপ পেয়ে গেল, তার আশ্চর্য্য কাহিনী আর একদিন বলব। আজ শুধু সেই সব প্রাণীর কথা আলোচনা করব, মাত্র গত হাজার বছরের মধ্যে যারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বা এখন পেতে বসেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে সেকালের কাব্যে, গল্পে, সিংহের কথার ছড়াছড়ি। পশুর মধ্যে সিংহ হল রাজা, সবচেয়ে প্রধান কোন লোককে, সব চেয়ে জোরালো কিছুকে বোঝাতে হলেই সিংহের উপমা দেওয়া হ'ত।

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেরই সেকালের এক রাজার নাম ছিল সিংহবাহু, যাঁর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন। বাঘের চেয়ে সিংহ এদেশে বেশী না হ'ক, কম ছিল না বলেই সিংহের কথা তখন যত শোনা যায়, বাঘের কথা তত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আজকাল সেই ভারতবর্ষে সিংহ নেই বললেই হয়। চিড়িয়া-খানায় যে সব সিংহ ধরে রাখা হয়েছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাদের সবগুলিই এসেছে আফ্রিকা থেকে। এদেশের সিংহকে অনেক কষ্টে গোয়ালিয়ারের কাছে রাজার খাস জঙ্গলে কয়েকটা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শিকার করা মানা। কিন্তু এত যত্ন পাহারা সত্ত্বেও তারা কতদিন আর টিঁকবে বলা শক্ত।

ভারতবর্ষের প্রধান হিংস্র জানোয়ার এখন হল বাঘ। বাঘ ও সিংহ, হিংস্র প্রাণী হিসাবে দুই-ই মানুষের শত্রু। মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি করবার সঙ্গে এই দুই হিংস্র প্রাণীকেই উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বাঘ এখনও টিঁকে থাকা সত্ত্বেও সিংহ যে কেন একে-বারে হটে গেল, সে রহস্যের ঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীতে যে সমস্ত জানোয়ার সম্প্রতি লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার জন্যে মানুষই অবশ্য প্রধানতঃ দায়ী। মানুষের হাতেই বা মানুষের প্রভাবের দরুণই অনেক প্রাণী নির্ব্বংশ হয়েছে।

উত্তর-মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে এক কালে নানা জাতের তিমি প্রচুর দেখা যেত। সমুদ্রের এই অতিকায় প্রাণীটিকে দেখলেই ভয় পাবার কথা। মোচার খোলার মত আগেকার জাহাজ বড় বড় তিমির একটা লেজের ঝাপটেই ডুবে যেতে পারত। তবু মানুষ ত' কিছুতে ভয় পাবার নয়! এই বিশাল তিমি শিকার করতেও সে পেছপা হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেনের লোকের তিমি-শিকার একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। তিমি একটা মারতে পারলে লাভ ত' কম নয়। একটা তিমিমাছের গায়ে যে প্রচুর চর্ব্বি থাকে তা বিক্রী করেই বড়লোক হয়ে যাওয়া যায়। তখনকার পালতোলা জাহাজের দিনে হার্পুন নামে হাতে ছোঁড়া এক রকম বল্লম দিয়ে তিমি-শিকার করা হ'ত। হার্পুনটার গোড়ায় দড়ি বাঁধা থাকত। হার্পুন তিমির গায়ে বিঁধে যাওয়া মাত্র তিমি যখন

সমুদ্রে ছুট দিত বা ডুব দিত অগাধ জলে, তখন হুইলের সুতোর মত সেই দড়ি ছেড়ে দেওয়া হত। তারপর আমরা যেমন

মরিশাসের অধুনালুপ্ত ডোডো পক্ষী।

করে মাছ খেলিয়ে তুলি, তেমনি করে সমুদ্রে হার্পুনে গাঁথা তিমি তারা খেলিয়ে হায়রাণ করে মেরে ফেলত। হাতে ছোঁড়া হার্পুন দিয়ে তিমিশিকারের বিপদ সেদিন কম ছিল না। তিমি একবার ঘুরে নৌকো উল্টে দিলেই হল!

যতদিন হাতে তিমি শিকার করতে হয়েছে ততদিন কিন্তু তিমির বংশ-লোপের সম্ভাবনা দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যখন বাষ্পের জাহাজে, কামান থেকে হার্পুন ছোঁড়ার ব্যবস্থা হল, তখন তিমিশিকার সহজ ও নিরাপদ হওয়াতেই তিমিদের সর্ব্বনাশ হ'ল সুরু। লোভের বশীভূত হয়ে অসংখ্য জাহাজ নির্ব্বিচারে তিমিশিকার করতে সুরু করলে। শেষ কালে এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, উত্তর দিকের সমুদ্রে তিমি আর দেখা যায় না বললেই হয়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জানোয়ার, যে অতিকায় নীল তিমি একদিন উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র তোলপাড় করে ফিরত, আজ তাদের একটিরও দেখা পাওয়া দুর্লভ। তিমি-শিকারী জাহাজ চেষ্টা করলেও উত্তর-সমুদ্রে আর মারবার কিছু খুঁজে পাবে না। এখন এই সব তিমি-শিকারী জাহাজ দক্ষিণ-মেরুর দিকে তিমির খোঁজে ফেরে, অবাধে সেখানেও তাদের তিমি হত্যা করতে দিলে পৃথিবীতে কিছুদিন বাদে আর তিমি থাকবে কিনা সন্দেহ।

তিমির মত, উত্তর-আমেরিকার 'বাইসন' নামে মহিষ জাতীয় প্রাণীর বিলোপের জন্য শ্বেতাঙ্গরাই একমাত্র দায়ী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের বিশাল প্রান্তরগুলি এককালে এই বাইসনের বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। এক এক

নিউ জীলাণ্ডের অস্ট্রিচ জাতীয় অধুনালুপ্ত মোয়া পক্ষী।

পালে লক্ষ লক্ষ বাইসন তখন এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চরে বেড়িয়েছে। আমেরিকার আদিম

অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনেক জাতির এই বাইসনই একমাত্র শিকার ও জীবিকার উপায় ছিল। তারা তল্পি-তল্পা তাঁবু নিয়ে এদের পিছনে পিছনেই দেশময় ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আহারের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী তারা কখনও হত্যা করত না। বহু প্রাচীনকাল থেকে শিকার করে এলেও, বাইসন তাদের হাতে তাই লোপ পায় নি। ১৮৭১ সালেও আরাকানসাসের একজন পর্যটক পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাবার সময় বাইসনের একটি বিরাট পালের সাক্ষাৎ পান। ২৫ মাইল ধরে শুধু বাইসন ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পান নি। তিনি লিখেছেন—"মাটি আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু কালো মহিষ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়,

মধ্য এশিয়ার লুপ্তপ্রায় টাকিন।

কালো জলের একটা দেশ-জোড়া বন্যা যেন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বয়ে চলেছে।" এ রকম বড় পাল সে সময় আরো অনেকে দেখেছে। একটি পালে খুব কম করে হিসেব করেও অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ বাইসন আছে বলে সে দিন জানা গিয়েছিল।

কিন্তু ১৮৭১ সালে একটি পালেই যেখানে চলিশ লক্ষ প্রাণী দেখা যেত, ১৮৯৭ সালে সেখানে একটি বন্য বাইসনও আর দেখা গেল না। ভোজবাজীতে সমগ্র আমেরিকা থেকে বাইসন যেন উবে গেল। আমেরিকার বাইসনের বিলোপ যে কত তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেখানকার একটি রেল কোম্পানীর চামড়ার চালানের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবে। ১৮৮২ সালে যে রেল কোম্পানী দিয়ে ২ লক্ষ চামড়া চালান দেওয়া হয়, ১৮৮৩-তে হয় ৪০ হাজার, ১৮৮৪তে হয় মাত্র ৩০০ আর ১৮৮৫তে একটিও চামড়া চালান যায় নি। এত অল্প সময়ে এমন আশ্চর্য্যভাবে আমেরিকা বাইসন-শূন্য হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ অবশ্য ইউরোপের লোকের চামড়ার লোভ। সেদিন আমেরিকায় যে যেখানে পেরেছে যতখুশী অবাধে বাইসন হত্যা করেছে এই চামড়ার লোভে। অতিরিক্ত ডিমের লোভে, যে হাঁস ডিম দেয় তাকেও যে মেরে ফেলা হচ্ছে এ হুঁস কারুর সেদিন হয় নি। হুঁস হল যেদিন আমেরিকার সীমাহীন প্রান্তরে বাইসনের রাশীকৃত সাদা হাড় ছাড়া অতীতের অগণন বাইসনযূথের অস্তিত্বের সাক্ষী আর কিছু রইল না। চামড়ার ব্যবসা শেষ হবার পর, জমির সার হিসাবে এই হাড়ের ব্যবসা করেও সেখানকার লোক অনেক-দিন চালিয়েছে। যাদের অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছিল, বাইসনযূথ মৃত্যুর পর অস্থি দিয়ে তাদের জমিই তারা উর্ব্বরা করে দিয়ে গেল।

আমেরিকার কোন কোন পশু-সংরক্ষণী-উদ্যানে এখন কয়েকটি মাত্র পোষা বাইসন দেখা যায়, তাদের স্বাধীন জ্ঞাতি খুঁজতে হলে, এখন যেতে হবে কানাডার ম্যাকেঞ্জি নদীর অঞ্চলে। সেখানে বাইসনের সগোত্র এক রকম মহিষ এখনও বন্য অবস্থায় বিচরণ করে।

তিমি ও বাইসনের বেলায় মানুষকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে দোষী বলা চলে, ডোডো পাখীর বেলা তেমন চলে না। ডোডো মরিশাস দ্বীপের একরকম বড় পাখী, দেখতে খানিকটা পাতিহাঁসের মত হলেও, তারা পায়রারই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। চেহারা যেমন কদাকার, তেমনি তারা বুদ্ধিহীন ও সব বিষয়ে আনাড়ি। না পারে তারা আকাশে উড়তে, না চটপট ডাঙ্গায় দৌড়োতে। মরিশাস দ্বীপে সভ্য মানুষের পদার্পণের ফলেই ডোডো পাখী লোপ পায়, কিন্তু মানুষ নিজ হাতে তাদের ঠিক উচ্ছেদ করেছে বলা চলে না, মানুষের আমদানি-করা ইঁদুর, শূয়ার ও বানরই মরিশাস দ্বীপ থেকে এই নিরীহ নির্ব্বোধ প্রাণীটিকে বিলুপ্ত করে দেয়। যে সমস্ত ইউরোপীয় নাবিক প্রথম মরিশাস দ্বীপে নামে, তারা ডোডো পাখীকে দয়া করেছিল ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। পাখীটির মাংস খাবার উপযুক্ত নয়, অন্য কোন জিনিষও তার দেহ থেকে পাওয়া যেত না, তবু প্রথমে পর্ত্তুগীজ ও পরে

ওলন্দাজ নাবিকেরা অহেতুক হিংসাবশে মাথায় মুগুর মেরে সে দ্বীপের অসংখ্য ডোডো পাখী সংহার করে। নির্ব্বোধের মত পাখীগুলি লগুড়ের ঘায়ে নিহত হ'ত বলেই তাদের নাম ওলন্দাজেরা দেয় ডোডো। ডোডো মানে ওলন্দাজ ভাষায় বেকুফ। পর্ত্তুগীজেরা মরিশাস দ্বীপ আবিষ্কার করে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে, ১৬৮১ সালে সেখানে একটি ডোডো পাখীও আর দেখা যায় না। দশ বছরও যারা মানুষের সভ্যতার আওতায় টি'কতে পারল না, তাদের ত' বোকা বলাই সঙ্গত!

ডোডো পাখীর অনেক পরে আর একটি পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে ইউ-রোপীয়দের তাদের বিলুপ্তিতে কোন হাত নেই। এ পাখীর নাম 'মোয়া'—তাদের বাস ছিল নিউজীলাণ্ডে। মোয়া আফ্রিকার উট পাখীরই সগোত্র, তবে আকারে অনেক বড়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বারো ফুট লম্বা অর্থাৎ লম্বা লম্বা দুটি মানুষের সমান 'মোয়া' বিরল ছিল না। নিউজীলাণ্ডের মাওরী জাতি শ' পাঁচেক বছর আগে তাদের প্রধান বাসস্থান থেকে উত্তরের একটি দ্বীপে পৌঁছে 'মোয়া' প্রথম আবিষ্কার করে। তার মাংস সুস্বাদু বলে' এবং নিউজীলাণ্ডে বড় প্রাণী আর কিছু না থাকাতে 'মোয়া' মাওরীদের প্রধান শিকার হয়ে ওঠে; এবং একশ বছরের মধ্যেই উত্তরের দ্বীপ থেকে একেবারে লোপ পায়। উত্তরের দ্বীপে আগে লোপ পেলেও নিউজীলাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত 'মোয়া' যে টি'কে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবু কোন ইউরোপীয়ের জীবন্ত 'মোয়া' পাখী চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। দক্ষিণের দ্বীপে 'মোয়া' পাখীর লোপ পাওয়াও ভারী বিস্ময়কর ব্যাপার। মাওরীরা সেখানে গিয়ে সমস্ত 'মোয়া' মেরে যে ফেলেনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত দুর্ভেদ্য দুর্গম জায়গায় প্রচুর পরিমাণে 'মোয়া'র কঙ্কাল পাওয়া গেছে, মাওরীরা সেখানে কোন কালে ঢুকতে পারে নি। তা সত্ত্বেও 'মোয়া' পাখী যে অকস্মাৎ কেমন করে সবংশে সেখানে লোপাট হয়ে গেল, সে রহস্যের কোন যথার্থ মীমাংসা বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি।
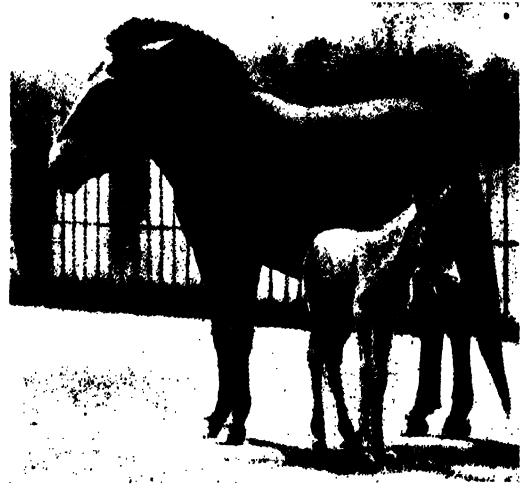
প্রায়লুপ্ত বন্য অশ্ব: মঙ্গোলিয়ায় এখনও দুই একটি দেখা যায়।

শুধু মোয়া নয়, পৃথিবীর অনেক প্রাণীই কেন যে লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার কোন সদুত্তর এখনো বৈজ্ঞানিকেরা দিতে পারেন না। আফ্রিকার গহন জঙ্গলের জিরাফের জ্ঞাতি 'ওকাপি', ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশের আধা-ভেড়া আধা-মহিষ 'টাকিন, ব্রেজিলের দীর্ঘপাদ লাল নেকড়ে, মঙ্গোলিয়ার বন্য ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু, সমশ্রেণীর 'বর্দ্ধিষ্ণু' প্রাণীদের চেয়ে বুদ্ধিতে বা বলে এমন কিছু খাটো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবু কেন যে তারা কালের বিবর্ত্তনের মিছিল থেকে পথের পাশে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে, তার রহস্য এখনও গভীর অন্ধকারে আবৃত।

দুঃখ কষ্টের মূল

নিজের কার্য্য ও নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত হইলে জগতের সকল মানুষ এবং সকল মানুষের কার্য্য বিশ্লেষণ করিতে পারা এবং সেগুলি আমাদের কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর হইতেছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন নহে। আমাদের দুঃখদৈন্যের মূলে আমাদেরই নিজ নিজ অসঙ্গত কার্য্য এবং কার্য্যগুলির মূল কারণ—ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত আমাদের সংসর্গজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকপাঠ দ্বারা অর্জ্জিত সংস্কার।

জীবনশিক্ষা

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

আমাদের বাড়ীতে একখানি ইংরাজী, একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ আসে। আমরা অর্থাৎ 'বাড়ীর-মধ্যে'রা বাঙ্গালা কাগজখানিকে অধিকার করিয়া বসি। দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ করিয়া বিছানায় শুইয়া খবরের কাগজখানি খুলি। প্রথমে বড় বড় অক্ষরে যে সব কথা বা সংবাদের চুম্বক থাকে, সেইগুলি পড়িয়া লই, পরে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাই। ইত্যবসরে যদি নিদ্রা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

আজকাল এমন দিন খুব কমই যায়, যেদিন কাগজ খুলিয়া নারীদের সম্পর্কিত কোন না কোন খবর না থাকে। বেশীর ভাগ খবরই লজ্জাজনক। খবরগুলি পড়িতে পড়িতে লজ্জায় আমাদের মাথা নুইয়া পড়ে। মনে হয় খবরগুলি না থাকিলেই বেশ হইত, আরও মনে হয় এইগুলা না ঘটিলে আরও বেশ হইত। কিন্তু বেশ হওয়া চুলায় যাউক্, ঘটনা যেন বেশী করিয়া ঘটিতেছে; খবরের কাগজে বেশী করিয়া ছাপা হইতেছে।

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমার মনে পড়িতেছে, আজ সেইটাই বলিব। * * *. নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, তিনি স্বামীর গৃহে যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার স্বামীর ব্যবহার ভাল নয়, স্বামী ও শাশুড়ী তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলেন।

এই রমণীকে আমি জানি। আমরা যখন ···লেনের বাসায় থাকিতাম, আমাদের পাশের বাড়ীর একতলাটি ভাড়া লইয়া ইঁহারা থাকিতেন। সংসারে ইনি, ইঁহার স্বামী ও শাশুড়ী। শাশুড়ী খুব বৃদ্ধা, দুইটি চক্ষুতেই দোষ হইয়াছে, দেখিতে পান না, তাই কাজকর্ম্ম করিতেও পারেন না। স্বামী এক সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, কত মাহিনা জানি না, তবে বেশী যে নয় ইহা জানি। বাবুটি ন'টার সময় নাকে মুখে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ভাত গুঁজিয়া বাহির হইয়া যাইতেন, আর আসিতেন রাত্রি সাড়ে আট-টা, ন'টায়। সকালে প্রায়ই আধপেটা খাইতেন, আবার রাত্রে প্রায়ই তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইত।

নিত্য দুপুরবেলা যে কোন ছুতা-নাতায় এই রমণীটি শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিতেন। শাশুড়ী কাঁদিয়া কাটিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেন, বধূও গোসাঘরে ঢুকিতেন। উনানে আগুন পড়িত না, কুলুঙ্গী হইতে হাঁড়ী নামিত না। ভদ্রলোকটি আফিস হইতে ফিরিয়া একবার মা'র, একবার স্ত্রীর চরণ ধরিয়া সাধা-সাধনা করিয়া বেড়াইতেন। পুত্রের কাতর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মা অধিকক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু বধূ উঠিতেন না। নিজেও খাইতেন না, সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত স্বামীকেও খাইতে দিতেন না। মাসের মধ্যে দশ পনের দিন এই রকম হইত।

আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহাদের সব কথা শুনিতে বা বুঝিতে আমরা পারিতাম না। তবে আফিসের ছুটি-ছাটার দিন মধ্যাহ্নে যখন খণ্ডপ্রলয় বাধিত, তখন অনেক কথাই কাণে আসিয়া পৌছিত এবং একটু একটু করিয়া সব বুঝিতে পারিতাম।

বুঝিতে পারিয়াছিলাম, বাবুটির এককালে থিয়েটারের সখ ছিল। এমেচার থিয়েটারে পার্ট করিয়া করিয়া শেষকালে তিনি পেশাদার থিয়েটারে ঢুকিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, তাঁহার মা দেশে থাকিতেন। বাবুটি তখন

মেসের বাসায় বাস করিতেন। বিবাহের পরে, তাঁহার স্ত্রী শুনিয়াছিলেন তখন তিনি রাত্রে বাসায় ফিরিতেন না; থিয়েটারের এক নটীর বাড়ীতেই থাকিতেন।

এই সব কথা সত্য অথবা নয়, তাহা জানি না; তবে যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বতঃই মনে হয় যে, এমন লোক বিবাহ না করিলেই পারিতেন। কিন্তু তা পারিলেন না। তাঁহার আফিসের ডেসপ্যাচার বাবুর অষ্টাদশ বর্ষীয়া ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। এখন পত্নীর বয়স পঁচিশ, বাবুটির বয়স কত হইবে? বোধ হয় চল্লিশ বা কাছাকাছি।

বাবুটি লম্বা একহারা, কালো, গৃহিণী মোটা ও বেঁটে এবং খানিকটা ফরসা।

বিবাহের পর কয়েকবৎসর তাঁহারা কোথায় ছিলেন কে জানে, এক বর্ষাকালে আমাদের পাশের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। পাড়ায় কোন নতুন লোক (স্ত্রীলোক) আসিলে তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে আমাদের দেরী হয় না। আমারও হয় নাই। মনে আছে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, তবু ছাদে উঠিয়া সেই বাড়ীটার দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছি, যদি দৈবাৎ নবাগতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চোখোচোখি হইলেই ডাকা। ডাকিয়া আলাপ জমাইতে মেয়েদের বেশী সময় লাগে না। দেখিতে তাঁহাকে অনেকবার পাইলাম, কিন্তু চোখোচোখি হইল না, ডাকিতে পারিলাম না। দিব্যি বেঁটে চওড়া মোটাসোটা আহ্লাদি-আহ্লাদি বৌটি, ছেলেপুলে হয় নাই বলিয়াই মনে হইল (সত্যই তাই), বেশ আঁটসাট গড়ন।

প্রথম দিনই তাঁহার কতকটা পরিচয় পাইলাম। বোধ হয় বাড়ী বদলাইবার সময় গাড়ীর ছাদ ভেদ করিয়া খানিকটা বৃষ্টির জল গাড়ীর ভিতরে পড়িয়া, তাঁহার বালিশ বিছানা ভিজাইয়া দিয়াছিল, তিনি মাঝে মাঝে উঠানে বাহির হইয়া আসিতেছেন আর উনুনমুখো দেবতার মুখে বারম্বার নুড়ো জ্বালিয়া দিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা ম্লানমুখে নীরব রহিয়াছেন, তাঁহার রাগ ইহাতে কেবলই বাড়িয়া যাইতেছে। রাগ বাড়িতে বাড়িতে যে বেহুঁস লোকের অসাবধানতার জন্য বালিশ বিছানা ভিজিয়াছে, তাহার উপরে আসিয়া পড়িতেছে।

সেদিন রবিবার, লোকটি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন দেবতা উনুনমুখো কিংবা এই লোকটি চুল্লীবদন, ভদ্রনারীটি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া উভয়ের মুখেই অনল সংযোগ করিতেছেন। লোকটি খুব ভালমানুষ, স্ত্রীকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কত মিষ্ট কথা বলিলেন, একদিন রৌদ্র হইবেই, সেইদিন রৌদ্রে দিলেই বালিশ বিছানার দোষ খণ্ডন হইবে, এই রকমের কত সান্ত্বনাই দিলেন, তবুও কোন কাজই হইল না।

দেখিতে লাগিলাম, রোজই দুপুরবেলা বাড়ীটায় একটা না একটা কাণ্ড ঘটিতেছে; তাহার জের রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। একটা রবিবারের কথা বলি। সকালে ছাদে কাপড় মেলিয়া দিতে আসিয়া দেখিলাম, একটা বুড়া গোছের স্ত্রীলোক সিঁড়ির নীচে বসিয়া রাঁধিতেছেন, বধূটি খুব যত্নের সঙ্গে তাহাকে সব যোগাড় দিতেছে। বাবুটির মা রোজ যে স্থানে তোলা উনুনে পিতলের সরা চাপান্, সেদিনও সেইখানে সরা চাপাইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় বাবু বাজার লইয়া আসিলেন। বাজারের থ'লেতে হাত পুরিয়া বধূ যা পাইলেন, সবই সিঁড়ির নীচে যিনি রাঁধিতেছিলেন, তাঁহার কাছে দিয়া আসিলেন। শাশুড়ী গোটা দুই আলু ও পটল চাহিয়াছিলেন, আর বায় কোথায়? বধূ নাক-চোখ-কাণ-মাথা ঘুরাইয়া বার বার এমন মুখ-ঝামটা দিলেন, মনের দুঃখে বুড়ী উনুনে ঘটিসুদ্ধ জল ঢালিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। ইহাতেও তাঁহার দুর্গতির শেষ হইল না। সিঁড়ির নীচে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধিতেছিলেন, তিনি বাবুকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি সেই যে ঘাড় গোঁজ করিয়া দাঁড়াইলেন, একটি বার মুখ তুলিলেন না বা মুখ খুলিলেন না। স্ত্রীলোকটি অনেকক্ষণ পরে থামিলেন, তখন আবার বধূ আরম্ভ করিলেন। বধূর কথায় বুঝিলাম, এই স্ত্রীলোকটি তাহার জননী। বধূর বক্তব্য এই যে, তাহার মা চিরদিন জামায়ের বাড়ীতে পাত পাতিতে আসে না, একদিন আসিয়াছে, জামাই ও তাহার মা'র পক্ষে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

জামাই এবারে মুখ খুলিল, বলিল, আস্তে আস্তে, অপরাধীর মত, মা'কে দু'টো আলু দিলেই ত' পারতে!

যেমন বলা আর দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠা, এই অগ্নিকাণ্ডের শেষ দৃশ্যও আমি দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। ভদ্রলোকটি অভুক্ত অবস্থাতেই ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাহির

হইয়া গেলেন ; মা ও মেয়ে গল্পগাছা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন আহার সমাধা করিয়া, তাঁহার জন্য ভাত বাড়িয়া, কলায়ের বাসন চাপা দিয়া সিঁড়ির নীচে রাখিয়া শুইতে গেলেন। ঘরে ছেলের মা এবং পথে ছেলে, দু'জনেরই সেদিন একাদশীর উপবাস গেল।

রাত্রে প্রলয়-কাণ্ড। বাবু অনেক রাত্রে ফিরিয়া ঘরে জামা-কাপড় ছাড়িতেছেন, তাঁহার গৃহিণী উঠান হইতে হুঙ্কার ছাড়িলেন, কোন্ মা-মাসীর বাড়ীতে এত রাত্তির করা হল, তাই শুনি ? নিশ্চয়ই মরতে 'থ্যাটারে'র মাগীদের দরজায় দরজায় ঘোরা হচ্ছিল। তা সেই থেনে সেই মা-মাসীদের কাছে থাকলেই ত হত, এত রাত্তিরে আবার হাড় জ্বালাতে মাস পোড়াতে এখানে আসতে কে মাথার দিব্বি দিয়েছিল, শুনি ?

ভদ্রলোকটি বাহিরে আসিয়া, স্ত্রীর সামনে দাঁড়াইয়া ধীর কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে কতদিন বলিছি না, আমি থিয়েটারে যাই নে।

—তবে কোন্ চুলোয় থাকা হয়েছিল শুনি ? গেলাই বা হল কোথায় ? কোন্ মাসী-পিসির বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল যে বাড়ীতে ভাত রুচল না ?

ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে কহিলেন, গেলা হয় নি সদু (পরে জানিয়াছি নামটি সৌদামিনী। সৌদামিনীই বটে !) রাস্তার কলের জল খেয়েই দিন কেটেছে। বাড়ীতে ঢুকলেই ত কাক চিল উড়ে পালাবে, তাই আসি নি।

সৌদামিনী নাকিস্বরে বলিতে লাগিলেন, তা আসবে কেন ? আমার মা'কে যে দু'টি চক্ষে দেখতে পার না, পাছে আমার মা'কে দেখতে হয়, আমার মা'র সঙ্গে ব'সে দু'দণ্ড কথা বলতে হয়, বাড়ী ঢুকতে আছে ? নাও, ঐখেনে কুঁড়ো পাত্তর রাখা আছে, গিলে আমাদের কেরতার্থ কর।

ভদ্রলোক বলিলেন, হাত পা ধুই, ধুয়ে খাচ্ছি।

সৌদামিনী চলিয়া গেলেন। দুপুর বেলা ঐ কলায়ের-থালা-ঢাকা ভাত ঠিক ঐ খানেই দেখিয়াছি, বিকালেও দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। সকালের সেই ভাতই যে সযত্নে স্বামী-দেবতার জন্য সৌদামিনী রাখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না, ভদ্রলোকটি খান্ কি-না অথবা খাইতে পারেন কি-না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ এবং কৌতূহল দুই-ই ছিল। অন্ধকারে আলিশায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বাবুটি হাত-মুখ ধুইয়া, গামছায় গা মুছিতে মুছিতে ভাতের থালার কাছে বসিতে গিয়া না বসিয়া মা'কে ডাকিতে ডাকিতে মা'য়ের ঘরের দিকে চলিলেন। খুব সম্ভব, এই সময় মনে পড়িল যে, জননীও অনাহারে আছেন। ফিরিতে অনেকখানি দেরী হইল। ফিরিয়া আসিয়া, ঢাকা খুলিয়া খাইতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাতগুলি নাড়াচাড়া করিয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন, পরে একবার এদিক, একবার ওদিক চাহিতে চাহিতে আবার ভাতগুলি ঢাকা দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোক যে রকম করুণ দৃষ্টিতে ভাতগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে উঠিলেন, তাহা দেখিলে কষ্ট হয়। সারাদিন অনাহার, খাইতে বসিয়া কতকগুলি চাল দেখিতে পাইলেন। আমার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। মাগো, নারীতে এমন কদন্নও মানুষের সামনে ধরিয়া দিতে পারে।

বাবুটি কলতলায় গিয়া হাতটি সবে ধুইতেছেন, সৌদামিনীর বিকাশ হইল। সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, খেলে না যে বড় ? কোন্ মাসী-পিসী সোহাগ করে গিলিয়ে দিয়েছে বুঝি ?

ভদ্রলোকটি একবার কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন ; পর মুহূর্ত্তে যেন আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া ঘাড় নীচু করিয়া অদৃশ্য হইলেন, বোধ করি ঘরের ভিতর গেলেন। তাঁহার সৌদামিনী তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন, মুখে খৈ ফুটিতেছিল।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে "আইন-আদালত" সংবাদ মধ্যে সৌদামিনীর নাম দেখিয়া ঘটনাটা এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। সৌদামিনী অভিযোগ করিয়াছেন,

তাঁহার স্বামী অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন।

তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করেন।

তাঁহার মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত তাঁহার স্বামীর ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য্য।

তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেন না।

তাঁহার স্বামীর অন্যান্য দোষও আছে।

তাঁহার স্বামী থিয়েটার করিতেন, এখনও করেন।

কাজেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, জজ সাহেব যেন এমন স্বামীর ঘর করার বিড়ম্বনা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়া কৃতার্থ করেন।

আমি যখন সৌদামিনীদের দেখিতাম, তখন বিপরীত ব্যবস্থা ছিল, তখন সৌদামিনীর অকথ্য অত্যাচার ও অসংখ্য দুর্ব্যবহার তাহার স্বামীটি সহ্য করিতেন। লোকটি অন্য অত্যাচার করা দূরে থাকুক, কখনও সৌদামিনীর একটি কথার একটি কড়া উত্তরও দিতেন না। সৌদামিনী তাঁহাকে ক্ষুধার অন্ন দেয় নাই, যদি বা দিয়াছে, অন্নব্যঞ্জনে গালি গালাজের লঙ্কা এমন উগ্র ফোড়ং দিয়াছে যে খাইবার আগেই তাঁহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিত।

সেই স্বামী সৌদামিনীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে শুনিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিরীহ, ভালমানুষ, অনুগত স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা মানি; কিন্তু পাঁকের চেয়ে নরম আর জুতার চেয়ে অধম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা থাকে কিনা, আমার তাহাতে সন্দেহ আছে। সৌদামিনীর স্বামীর মত স্বামী পাইয়া কোন রমণী যদি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করে, তাঁহার সহিত আমার আলাপ করিতে ইচ্ছা জাগে।

আদালতে সৌদামিনীর স্বামী স্ত্রীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী রাজী হয় নাই। সৌদামিনীর হইয়া তাহার মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী সাক্ষ্য দিয়াছিল, কিন্তু স্বামী-ভদ্রলোকটি একটি সাক্ষীও ডাকেন নাই। হাকিম সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনও দুর্ব্যবহার করেন নাই। সাক্ষী অনেক আছে, কিন্তু তিনি কাহাকেও ডাকিবেন না।

বিচারে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইল, সৌদামিনীকে প্রতি মাসে ২০ টাকা করিয়া মাসোহারা দিবার হুকুম হইয়াছে। সৌদামিনী তাঁহার জননীর সঙ্গেই বাস করিতে থাকিবেন।

এত বড় একটি গল্প বলিয়া পাঠিকাদিগের ধৈর্য্যের হানি ঘটাইয়াছি, সেই জন্য আমি দুঃখিত। গল্পটি না বলিলে যে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য, তাহা বলা হইত না।

সৌদামিনী নারীজন্ম লইয়াছিল, নারীজন্মের অভিশাপ হইতে আত্মরক্ষার উপায় তাহার ছিল না। তাহাকে পরের ঘর করিতেই হইবে; পরবশ্যতা ভিন্ন তাহার গতি নাই। তাহাকে তাহার মা কাপড় পরিতে শিখাইয়াছিল, টিপ পরিতে শিখাইয়াছিল, রান্নাবান্নাও শিখাইয়াছিল, হয়ত (জানি না) লেখাপড়াও শিখাইয়াছিল, কিন্তু যে একটি মাত্র কাজ শিখাইলে তাহার নারীজীবন ধন্য হইত, সেই শিক্ষাটিই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তাহাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই যে, কোন কারণেই স্ত্রীলোকের পক্ষে উগ্রস্বভাব হওয়া সকল অশান্তির মূল। স্ত্রীলোক মুখরা হইলে সংসারে কাকপক্ষী তিষ্ঠিতে চায় না, মানুষ ত অনেক বড়, অনেক উঁচু।

রমণীকে বসুমতীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আদর্শ পুস্তকে নারীর যে আদর্শ আমরা দেখিতে পাই, তাহার কথা যদি আমরা আজ গল্প-কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়াও দিই, আমাদের পিতামহী, মাতামহী, প্রপিতামহী, প্রমাতামহীর জীবনের গল্পও কি আমরা শুনি নাই? তাঁহারা যে বসুমতীর মত সর্ব্বংসহা ছিলেন, তাহার কত কথা আমরা প্রত্যেকেই শুনিয়াছি।

আমাদের কবিরা বঙ্গললনার মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করিয়াছেন। কমলের শোভাই কি শুধু তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে? কমলে মধুর অস্তিত্ব কি তাঁহারা জানিতেন না?

সৌদামিনীর কথা আলোচনা করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না, বরং ঘৃণা হয়। তবুও আজ আমাকে সেই কথা আলোচনা করিতে হইতেছে। সৌদামিনীর ভালমানুষ স্বামী বিবাহের আগে কি ছিলেন, না ছিলেন, তাহা সৌদামিনী জানে না। জানিবার কথাও নয়। লোকমুখে হয়ত ঐ থিয়েটারের কথা শুনিয়াছে। সেই কথাকে বেদবাক্য মানিয়া লইয়া স্বামীকে উঠিতে বসিতে খোঁটা ত দিয়াছেই, আবার কদন্নের সঙ্গে অশ্রদ্ধা, অনন্নও পরিবেশন করিয়াছে। এ ভদ্রলোক ঐ দু'টাই সহ্য করিতেন, হজমও করিতেন; অন্য কোন পুরুষ হইলে, প্রথমটা সহিলেও, আহারে অশ্রদ্ধা ও অনন্ন সহিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না।

আমরা আধুনিক কালে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু আধুনিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। আধুনিক সমাজে মেয়েদের রান্নাবান্না শিখান হয় না, যদি বা হয়, সৌখীন দু' একটা ডিশ তৈয়ারী করিতে শিখাইলে মস্ত কাজ করা হইল মনে করা হয়। এই সমাজে কোন মেয়ে

যদি দু'চারটা না-নুন-না-মসলা-না-সিদ্ধ তরকারী রাঁধিয়া একদিন দৈবাৎ বাড়ীর লোককে খাওয়ায়, তাহা হইলে বাড়ীতে ত' বটেই, চেনা-শুনা যত বাড়ী আছে, সব বাড়ীতে খবর (যেন বেতারে) চলিয়া যায় ও হৈ হৈ পড়িয়া যায় সবাই ধন্য ধন্য করিতে থাকে। আমরা যে সমাজে জন্মিয়াছি, সে সমাজে "কথামালা"র সঙ্গে সঙ্গে, রান্নাঘরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করিলে মা'রা মেয়েদের গতর ভাঙ্গিয়া দিতেন। আমাদের সমাজে গলা সাধিয়া গলা মিষ্ট করিয়া গান গাহিবার তাগাদা ছিল না, তবে কথা কহিবার সময় কণ্ঠস্বর যাহাতে কর্কশ না হয়, তার জন্য কড়া শাসনের ত্রুটী ছিল না।

আমার পিতামহী কিরূপ জবরদস্ত লোক ছিলেন তাহা আমি আগেকার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, পাঠিকাদের মনে আছে বোধ হয়। পিতামহী সেকালের লোক, আমাদেরও সেকালের শিক্ষা দিয়া "মাটী করিতে" বসিয়াছিলেন। "মাটী করিতে" কথাটি আমার নয়। কলিকাতা হইতে আমাদের অনেক আত্মীয় ও আত্মীয়া আসিতেন, তাঁহারা আমাদের দুই বোনের 'দশা' দেখিয়া মাকে চুপি চুপি বলিয়া যাইতেন, মেয়ে দু'টিকে 'মাটী' করছিস ভাই। মা শুধু শুনিয়াই যাইতেন, কথা বলিবার সাহস তাঁহার কোন দিনই হইত না।

পিতামহী শিখাইয়াছিলেন, জোরে কথা বলিবে না। ছেলেবেলায় 'সদা সত্য কথা বলিবে' এই নীতিবাক্য ভুলিতেও যেমন দেরী হইত না, ঠাকুরমার এই শিক্ষা বিস্মৃত হইতেও তেমনই দেরী হইত না। তাহার ফলে রোজ দু'চারবার উত্তম-মধ্যম হইত। উত্তম-মধ্যমের শিক্ষা বড় ভুল হয় না। শুধু আমার নয়, সে শিক্ষা ভুল কাহার বড় হয় না। আরও শিখিতে হইয়াছিল, কাহারও কথার পিঠে সমান তেজে কথা বলিবে না। যত জবাবই থাকুক, বলিতে হয়, পরে বলিবে, তখন কথাকাটাকাটি করিবে না।

বাল্যকালে এই উপদেশের মর্ম্ম যেমন বুঝিতাম না, পালন করিতেও তেমনই অবহেলা করিতাম। পিতামহী ছাড়িবার লোক ছিলেন না। পাখীকে যেমন করিয়া রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখায়, তিনি তেমনই করিয়া আমাদের ঐ উপদেশ অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

আজ বুঝিয়াছি, এত বড় অমূল্য উপদেশ নারীর পক্ষে আর নাই। কত অশান্তি, কত সংঘর্ষ, কত বিপর্যায়ের হাত এড়াইতে পারা যায়, তাহা বলিবার নয়।

সৌদামিনীকে সে শিক্ষা কেহ দেয় নাই। দিলে, স্বামীর ঘর হইতে পলায়ন করিয়া স্বামী থাকিতে, বিধবা মার ঘরে আশ্রয় লইয়া বাঁচিয়া মরিয়া থাকিতে তাহাকে হইত না।

আমার মনে হইতেছে, সৌদামিনী এত কাণ্ডের পর আজও নতুন করিয়া জীবন ও সংসার সুরু করিতে পারে। কিন্তু সে কি তাহার ক্ষুরধার রসনার অগ্রভাগ কাটিয়া আসিতে পারিবে? বলা নিষ্প্রয়োজন, ছুরী কাঁচি দিয়া কাটিতে হইবে না, মনে মনে কাটিয়া ফেলিলেই যথেষ্ট হইবে।

সৌদামিনী কি তাহা পারিবে না? পারিলে তাহার স্বামীর গৃহ আমরণ তাহাকে আদর আলিঙ্গন দান করিতে পারিবে।

সাহিত্যের ধর্ম্ম

বর্ণনা অথবা গানের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগ্রত না হইয়া বস্তুর উপভোগের ইচ্ছা জাগ্রত হইলে কবি ও গায়ক সমাজের সর্ব্বনাশ-সাধক হইয়া থাকেন। জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত না হইয়া উপভোগের ইচ্ছায় প্রলুব্ধ হইলে মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। যখন বর্ণনা অথবা গানের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগ্রত না হইয়া বস্তুর উপভোগের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন বর্ণনা বিকৃত হইয়াছে এবং বিকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞান জগৎ

ভারী হাইড্রোজেন ও ভারী জল

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, কোন পদার্থের পরমাণুগুলি সর্ব্বাংশে অনুরূপ। পজিটিভ (positive) তড়িতা-

অধ্যাপক হারল্ড সি. উরে।

বেশযুক্ত একটি ভারী কেন্দ্র (nucleus) ও তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন,—ইহাই ছিল তখনকার পরমাণুর প্রতিরূপ। তখন মানিয়া লওয়া হইত যে, একই পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর বিভিন্ন অংশের তড়িতাবেশ ও ভার নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু তেজোবিকিরণ (radio-activity) সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, একই মূল পদার্থে একই তড়িতাবেশ অথচ বিভিন্ন ভারসম্পন্ন পরমাণু পাওয়া সম্ভব। একই মূল পদার্থের এই প্রকার বিভিন্ন ভারসম্পন্ন পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ (isotope) বলা হয়।

তড়িতাবেশযুক্ত পরমাণু, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বাঁকিয়া যায় এবং এই বাঁকের পরিমাণ হইতে কোন পদার্থের আইসো-টোপের সংখ্যা ও ভার নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ভারী জল প্রস্তুত করিবার যন্ত্র

স্যর জে. জে. টমসন (Sir J. J. Thomson) ও অ্যাসটনের (Aston) পরীক্ষার ফলে বহু আইসোটোপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এই

উপায়ে শতকরা এক ভাগের কম আইসোটোপ থাকিলে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। অ্যাস্টন আইসোটোপ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

আধুনিক কালে আণবিক বর্ণচ্ছত্রের (molecular spectra) সাহায্যে আরও সূক্ষ্মভাবে আইসোটোপের সংখ্যা ও ভার নির্ণয় করা যায়। কোন একটি বিশেষ অণু হইতে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়, তাহার বর্ণ ঐ অণুটির ভারের উপর নির্ভর করে। বর্ণচ্ছত্রে বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে আইসোটোপের অস্তিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। এই উপায়ে হাজারকরা এক ভাগ আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার পরিমাণ করিতে গিয়া দেখা গেল যে, দুইটি বিভিন্ন উপায়ের ফল মিলিতেছে না। একটি উপায়ে স্বাভাবিক হাইড্রোজেন ও অপরটিতে সাধারণ হাল্‌কা হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, স্বাভাবিক হাইড্রোজেনে প্রতি ৯৫০০ ভাগে ২ ভাগ "ভারী" হাইড্রোজেন আছে। এই হাইড্রোজেনের পরমাণু-ভার ২। সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভার ১ ধরিয়া সকল দ্রব্যের পরমাণুর ভার পরিমাপ করা হয়। ইহা ছাড়া ৩ পরমাণু-ভার এরূপ হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড. সি. উরে (Prof. Harold C. Urey) ভারী হাইড্রোজেন আবিষ্কার করিয়া নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

কারখানায় নির্ম্মিত একটি বাড়ী। [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আমরা জানি যে, দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্‌সিজেন যুক্ত হইয়া এক অণু জল গঠিত হয়। হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপের উল্লেখ করা হইয়াছে; অক্‌সিজেনেরও তিনটি আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের পরমাণু-ভার যথাক্রমে ১৬, ১৭ ও ১৮। সাধারণ জল সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেনে গঠিত। সুতরাং অন্ততঃ আরও ৮ প্রকার জলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। সাধারণ জলে সম্ভবত সকল প্রকার জলই খুব সূক্ষ্ম পরিমাণে আছে। সাধারণত ভারী জল বলিতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভারী হাইড্রোজেন ও সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা অক্‌সিজেনের যৌগিক বুঝিয়া থাকি।

অত্যধিক শৈত্য ও চাপপ্রয়োগে হাইড্রোজেন, তথা যে কোন গ্যাস তরল বা কঠিন অবস্থায় আনা হয়। সাধারণ ও ভারী হাইড্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) বিভিন্ন হাওয়ায় তির্য্যকপাতনের দ্বারা দুই প্রকার হাইড্রোজেন পৃথক করা যাইতে পারে। কস্টিক পটাশযুক্ত তড়িৎ-বিশ্লেষণ কোষের (electrolytic cell) পরিবর্ত্তন করিয়া বিশুদ্ধ ভারী জল প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। এই জল প্রস্তুত করিতে প্রতি গ্যালনে (প্রায় ৫ সের) প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা খরচ পড়ে।

ভারী হাইড্রোজেন ও ভারী জলের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জলের ব্যবহার বহুল ও অপরিহার্য্য, সুতরাং ভারী জলের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে।

জীবনধারণ বিষয়ে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট মীমাংসা এখনও হয় নাই। বিশুদ্ধ ভারী জল জীবণধারণের উপযোগী নহে, কিন্তু শতকরা ৩০ ভাগ ভারী-জলযুক্ত জল ক্ষতিকর নহে। অধ্যাপক উরে মনে করেন যে, ক্রমশঃ ব্যবহার করিলে ভারী জল সহ্য করা সহজ হইয়া উঠিবে, কিন্তু উহার প্রভাবে জীবনী-ক্রিয়াসকল সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত স্বল্পগতি হইবে। ব্যাকটিরিয়া (bacteria) সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও কোনও ব্যাক্‌টিরিয়া ইহাতে বাঁচিতে সক্ষম হয়, কোনটি বা মরিয়া যায়। বীজ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে কোন কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং কোন কোনটির হয় না।

বহু লক্ষ জৈব যৌগিক দ্রব্যে (organic compound) হাইড্রোজেন বর্ত্তমান। ভারী হাইড্রোজেন দ্বারা এই সমস্ত যৌগিকের সামান্য ভাগ প্রস্তুত করিতে পারিলেও বহু নূতন ধর্ম্মযুক্ত দ্রব্য পাওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, ইহার ফলে বহু রঞ্জক দ্রব্য ও ঔষধ পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি আরও একটি ভারী জলের আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার জে. বি. এম. হার্বার্ট (J. B. M. Herbert) ও অধ্যাপক এম. পোলানিয়ি (Prof. M. Polanyi) ভারী অক্‌সিজেনযুক্ত (পরমাণু-ভার ১৮) জল সাধারণ জল

কারখানায় নির্ম্মিত অপর একটি বাড়ী।

হইতে নিষ্কাশন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের যন্ত্রে দৈনিক মাত্র ·০২ গ্রাম বা ১ গ্রেনের তৃতীয়াংশ ভারী জল প্রস্তুত হইতেছে।

বের্লিনের অধ্যাপক জি. হার্ৎস (G. Hertz) প্রথমে এই জল কয়েক ফোঁটা প্রস্তুত করেন ও অধ্যাপক পোলানিয়িকে তাহা উপহার দেন। অধ্যাপক পোলানিয়ি পূর্ব্বে বের্লিনে কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম ইন্‌ষ্টিট্যুটে (Kaiser Wilhelm Institute) অধ্যাপকতা করিতেন।

ইহার আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

কারখানায় নির্ম্মিত বাড়ী

সম্পূর্ণরূপে কারখানায় তৈয়ারী বাড়ী সংপ্রতি আমেরিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই বাজারেও দেখা যাইবে।

পাঁচটি কামরাওয়ালা একটি বাংলোর দাম প্রায় ১১,৫০০৲ টাকা; দুই তলা বাড়ীর দাম পড়িবে প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা। আবশ্যক মত ঘর জুড়িয়া বাড়ীগুলি বড় করিবার ব্যবস্থাও আছে। এখন পর্য্যন্ত পনেরটি বিভিন্ন ধরণের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে।

বাড়ীগুলি সিমেন্টের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইস্পাতের কাঠামোর উপর সিমেন্ট ও অ্যাসবেস্টসে নির্ম্মিত অংশ (panel) দ্বারা দেওয়ালগুলি তৈয়ারী। এই দেওয়ালগুলি আগুনে পুড়িবে না এবং শব্দ, তাপ বা শৈত্য ইহার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবে না। পোকা-মাকড়, ঝড়, ভূমিকম্প বা বজ্রপাতে ইহার কোন ক্ষতি হইবে না।

এই প্রকার কারখানায় তৈয়ারী বাড়ী মালিকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এক প্রকার বৃহদাকার মোটর-ট্রাক (truck) নির্ম্মিত হইতেছে। বাড়ীর বিভিন্ন অংশ ছাড়া ইহাতে দুইজন ড্রাই-

কারখানায় নির্ম্মিত বাড়ীর যন্ত্রসজ্জা—বামদিকে রান্নাঘর দক্ষিণে বাথরুম।
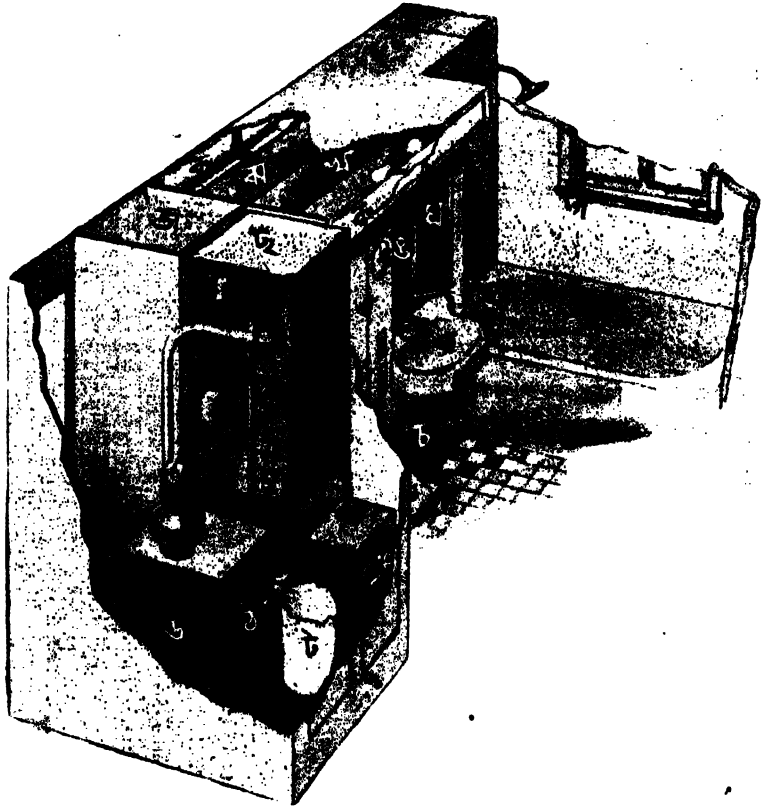
(ক, ক) আলোকিত কাচখণ্ডের সাহায্যে ছায়াহীন আলোকের ব্যবস্থা (খ) পাইপ লাগাইবার জায়গা (গ) জানালা খুলিবার বা বন্ধ করিবার হাতল (ঘ) ঔষধের আলমারী—দরজায় আয়না লাগানো (ঙ) দেওয়ালে লাগানো বৈদ্যুতিক ঘড়ি (চ) দেওয়ালে লাগানো বৈদ্যুতিক হীটার (heater) (ছ) এয়ার-কণ্ডিশনিং যন্ত্র (জ) রান্নাঘরের আলমারী (ঝ) ফেরাজ (ঞ) বরফ তৈয়ারী করিবার যন্ত্র (ট) গরম জলের ট্যাঙ্ক (ঠ) জল গরম করিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র (ড) চুল্লী (ত) হাত ধুইবার পাত্র, শিশুদের স্নানপাত্র হিসাবেও ব্যবহার করা চলে।

ভার, এক জন মিক্যানিক (mechanic) ও এক জন গৃহনির্ম্মাণ-পরিদর্শক থাকিবে। এই বাড়ীর সম্মুখভাগ দুই তলা এবং উপরে এই লোকগুলির শুইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

কারখানায় নির্ম্মিত বাড়ী বহন করিবার মোটর-ট্রাক।

স্থানীয় মজুর লইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই একটি বাড়ী খাড়া করা সম্ভব হইবে।

বাড়ীগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নানাপ্রকার যন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং যন্ত্রগুলি একটি বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। এই অংশটির এক দিকে রান্নাঘর ও অপর দিকে বাথ্‌রুম। রান্নাঘরে বিদ্যুৎ চালিত বরফের কল ও ডিশ ধুইবার কল, সিঙ্ক (sink), বৈদ্যুতিক ঘড়ি এবং গ্যাস বা বিদ্যুৎচালিত ষ্টোভ আছে। বাথ্‌রুমটিও আধুনিক ধরণে সজ্জিত।

এই গৃহে যে বাতাস চলাচল করিবে তাহা বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ ও উপযুক্তরূপে গরম বা ঠাণ্ডা করিবার অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে এয়ার-কণ্ডিশনিং (air conditioning) বলে, তাহার ব্যবস্থা আছে। মোটরগাড়ীর জানালার ন্যায় একটি হাতল ঘুরাইয়া জানালা খোলা বা বন্ধ করা যাইতে পারিবে; তবে হাওয়ার জন্য এয়ার-কণ্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। ধূম, ধূলা ও রান্নাঘরের গন্ধ হইতে বাড়ীগুলি একেবারে মুক্ত।

নূতনতম এয়ারশিপ বা উড়োজাহাজ

প্রায় চার বৎসর হইল, জার্ম্মানীতে একটি প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; অতি শীঘ্রই আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহার নাম এল. জেড, ১২৯ (L. Z. 129) সুবিখ্যাত গ্রাফ জেপেলিন (Graf Zeppelin) বা এল. জেড, ১২৭ L. Z. 127) অপেক্ষা এইটি বৃহত্তর। নিম্নে কয়েকটি মাপ তুলনা করিয়া দেখান হইল।
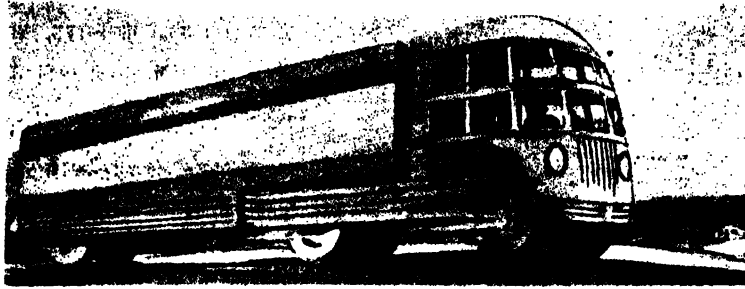
	গ্রাফ জেপেলিন	নূতন এয়ারশিপ
দৈর্ঘ্য	৭৭০ ফুট	৮১৫ ফুট
বৃহত্তম ব্যাস	১০০ ফুট	১৩৪ ফুট
গ্যাসের পরিমাণ	৩৭,০০,০০০ ঘনফুট	৬৭,০০,০
ইঞ্জিনের শক্তি (হর্স-পাওয়ার)	২৭৫০	৪৮০

নূতন এয়ারশিপটি ৪,১৮,০০ পাউণ্ড ভার তুলিতে পারিবে। সাধারণত ইহার বেগ হইবে ঘণ্টায় ৮০ মাইল, সুতরাং ইহা দুই দিনের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে পারিবে।

এয়ারশিপটি আকাশে উঠাইবার জন্য হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম (helium) গ্যাস দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে। হাইড্রোজেন অত্যন্ত সহজদাহ্য বলিয়া হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাসব্যাগ হিলিয়ামপূর্ণ আস্তরণ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। হিলিয়াম অদাহ্য হইলেও, ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক এবং ইহা হাইড্রোজেন অপেক্ষা ভারী, সুতরাং দুই প্রকার গ্যাস ব্যবহার করা সকল দিকেই সুবিধাজনক।
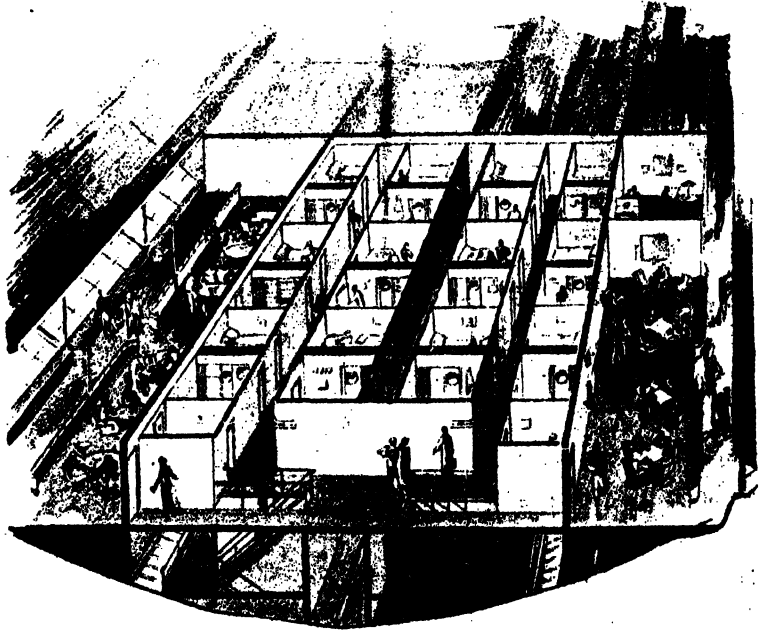
নূতন এয়ারশিপের অভ্যন্তর-ভাগ: দুই পাশে ডেক, মধ্যে যাত্রীদিগের বাসকক্ষ।

ইহাতে ১,৩০,০০০ পাউণ্ড জ্বালানী তৈল বহন করিবার স্থান আছে। তৈল ব্যবহার হইতে হইতে এয়ারশিপটি ক্রমশঃ হাল্কা হইয়া পড়িবে এবং

নির্ম্মাণকালে নূতন এয়ার-শিপের বহির্দৃশ্য।
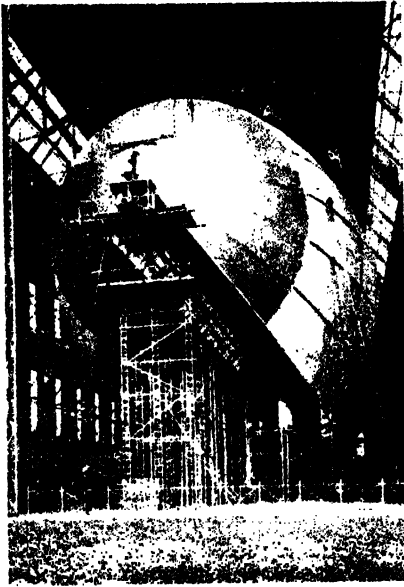
তখন ভারসাম্য ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজন মত হাইড্রোজেন ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত গ্যাস ১৬টি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ।

চারটি ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে উড়োজাহাজটি চলিবে। উড়োজাহাজে ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার এই প্রথম।

মাল ও ডাক ছাড়া ইহাতে ৫০ জন যাত্রী ও এয়ারশিপ চালাইবার জন্য ৩১ জন লোক বহন করা যাইবে।

যাত্রীদের বাসকক্ষ, জাহাজের অন্যান্য কক্ষাদি এবং আসবাবপত্র অতি সুন্দর অথচ বাহুল্যবর্জ্জিত ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাহাতে অহেতুক ভার না বৃদ্ধি হয়, সে জন্য সমস্ত আসবাবপত্র ধাতুনির্ম্মিত করা হইয়াছে। দুইটি বেড়াইবার ডেক, বসিবার ঘর, ভোজন কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই আধুনিক ভাবে সজ্জিত। যাত্রীদের বাসকক্ষে জানালা নাই, আগাগোড়া আধুনিক আলোকসজ্জা ও এয়ার-কণ্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ। বেড়াইবার ডেক হইতে দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য সমস্ত ডেকব্যাপী তির্য্যকভাবে স্থাপিত জানালা লাগান হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কোন উড়ো জাহাজে ধূমপান করিতে দেওয়া হইত না কিন্তু ইহাতে ধূমপান নিষিদ্ধ নহে এবং এই জন্য একটি বিশেষ ধূমপানকক্ষ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে আগুন লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এক কথায় যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

আলোকসঞ্চারী স্ত্রীলোক

কোন কোন জন্তু এবং উদ্ভিদের অন্ধকারে আলোক প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু মনুষ্যদেহ হইতেও যে আলোক নিঃসৃত হইতে পারে সম্প্রতি তাহারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আলোকসঞ্চারী লোকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা জীবিত দেহে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই আলোকসঞ্চারী স্ত্রীলোকটির নাম আনা মোনারো (Anna Monaro), ইতালির পিরানোতে ইঁহার বাস। ভিনিসের ডাক্তার প্রোটি (Dr. G. Protti) সম্প্রতি ইঁহার একটি বিবরণ দিয়াছেন।

দিবাভাগে বা অল্প ঘুমের সময় কখনও আলোক নির্গত হইতে দেখা যায় না। আলোক কখনও তিন চার সেকেণ্ডের বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আলোকের বর্ণ সবুজ হইতে লাল, বিভিন্ন বর্ণের হইতে দেখা গিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের নিকট হইতে আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। মোনারো নিজে এই আলোক সম্বন্ধে কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। আলোক নির্গমনের পর কোনরূপ গন্ধ, তাপ বা বর্ণের লেশমাত্র চিহ্ন থাকে না।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, মোনারোর শরীরে অল্প হাঁপানি ও রক্তের সামান্য চাপাধিক্য ছাড়া অন্য কোন রোগ নাই। পর্ব্ব উপলক্ষে উপবাস করিবার সময়ে আলোক-নিঃসরণ অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়। প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপবাস করিবার সময়ে এক রাত্রে ২৫ বার আলোক নির্গত হইতে দেখা গিয়াছিল। নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়াও ডাক্তার প্রোটি আলোকসঞ্চারের কারণ নির্ণয় করিতে
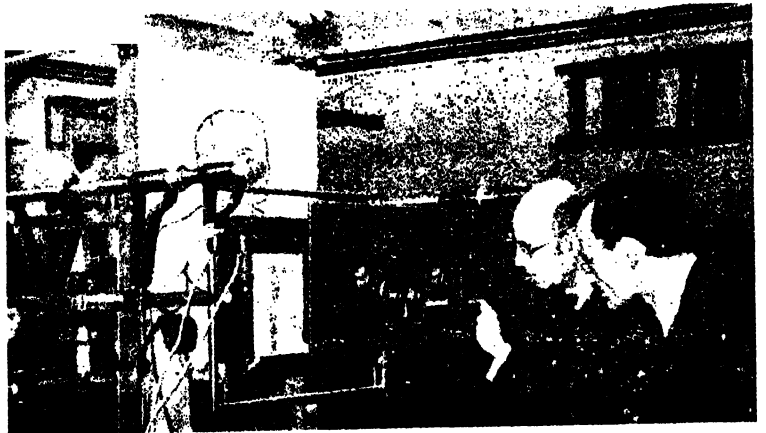
নূতন এক্স-রে যন্ত্র ও তাহা ব্যবহারের পদ্ধতি।

[পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পারেন নাই, তবে ইহার ভিতর যে কোনরূপ জুয়াচুরী নাই, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

নূতন এক্স্-রে যন্ত্র

রাশিয়ায় আবিষ্কৃত এই নূতন যন্ত্রে প্রতিরূপগুলি সমতল না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় উঁচুনীচু দেখাইবে। দুইটি স্বতঃস্ফূরক পরদার (fluorescent screen) উপর দুইটি আলাদা ছবি পড়ে এবং একটি বিশেষ চক্ষুনলীর (eye-piece) মধ্য দিয়া দেখিলে দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময়, কাশিবার সময়, কোন কিছু গিলিবার সময়, দৈহিক যন্ত্রের মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, ইহার সাহায্যে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাতে রোগনির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

বধিরদের জন্য সবাক ছবিঘর

কেবলমাত্র বধিরদের জন্য সম্প্রতি শিকগো শহরে একটি সবাক ছবিঘর খোলা হইয়াছে। ইহাতে একসঙ্গে ত্রিশ হাজার লোকের দেখিবার ও শুনিবার ব্যবস্থা আছে। বধিরদের শুনিবার জন্য প্রত্যেক দর্শকের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছবিঘরের শব্দযন্ত্রের সহিত যুক্ত আছে। এইটি মুখমণ্ডলের কোন হাড়ের সহিত স্পর্শ করাইলে যে কোন বধির দর্শক কথা ও সঙ্গীত স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে।

বধিরদের ছবিঘরের একটি দর্শক-যন্ত্রসাহায্যে সবাক ছবি উপভোগ করিতেছেন।

হিরাকস হইতে সালফ্যুরিক অ্যাসিড

অনেক কারখানায় প্রচুর পরিমাণে হিরাকস অপ্রয়োজনীয় উপকল (by-product) হিসাবে পাওয়া যায়। সম্প্রতি হিরাকস হইতে সাল-ফ্যুরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিবার একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি কারখানায় প্রতিদিন ১০০ টন করিয়া অ্যাসিড তৈয়ারী হইতেছে এবং আরও একটি কারখানা খুলিবার আয়োজন করা হইতেছে। প্রথমে হিরাকসকে শুখাইয়া লইয়া তাপযোগে ইহা হইতে সালফার ডাই-অক্সাইড (sulphur dioxide) প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সালফার ডাই-অক্সাইড পরে ভ্যানেডিয়াম ক্যাটালিস্‌টের (vanadium catalyst) সাহায্যে সাল্‌ফ্যুরিক অ্যাসিডে পরিণত হইতেছে।

কান্‌সার রোগে সর্পবিষ

বাল্‌টিমোরের ডাক্তার ডেভিড এল. মাথ্‌ট (Dr. David L. Macht) কান্‌সার রোগের অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য কেউটে সাপের বিষ ইনজেক্‌শন দিতেছেন। সর্পবিষের কান্‌সার আরোগ্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে ইহার প্রভাব এরূপ যে, তাহাতে যন্ত্রণার যথেষ্ট উপশম হয়।

তরল তামা

আট বৎসর চেষ্টার ফলে নিকল্‌স কপার কোম্পানী "তরল তামা" প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দ্রব্যটি কোন জিনিষের উপর লাগাইলে তাহাতে একটি বিশুদ্ধ তামার আস্তরণ পড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে কপারপ্লেটিংয়ের (Copperplating) ব্যবহার বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে। একটি তরল পদার্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম তামার চূর্ণ ব্যাপ্ত করিয়া এই তরল তামা প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু তরল পদার্থটি কি কি উপাদানে প্রস্তুত, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে বোধ হয় যে, এই তরল তামার প্রলেপ পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।

ট্রয়ের হেলেন কি আমাদের সীতা ?

—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর. এ. দারা বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাস-রচনায় তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি ৩০০০ হইতে ৪০০০ বৎসরের পুরাতন এমন সব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, বাল্মীকির রামায়ণই হোমারের 'ইলিয়াডে'র মূল প্রেরণা। তিনি বলেন, হেলেন 'ট্রয়' হইতে আসেন নাই, পরন্তু আসিয়াছিলেন 'লঙ্কা' হইতে এবং 'ট্রোজান যুদ্ধের' নায়ক ছিল অযোধ্যা ও লঙ্কার অধিবাসিগণ। হোমার, রাম, সীতা এবং রাবণের নূতন নাম করণ করেন মেনেলস, হেলেন ও প্যারিস।

প্রফেসর দারা আরও বলেন যে, গ্রীক, মিশরী ও মায়া-(মধ্য-আমেরিকান)-সভ্যতার আদি কেন্দ্র হইল ভারতীয় সভ্যতা—ভারতীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মগধ হইতে গ্রীকেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং মাছাদা ও মেসিদন নামের মূলও ঐ মগধ।

মগধে রাজগ্রেক নামে এক বংশ ছিলেন, পরে ইঁহারাই গ্রীক বলিয়া পরিচিত হন।

সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষাতেও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় এবং উভয়ই যে এক ভাষা হইতে উদ্ভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রীক সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় স্থাপত্যের একখানি চিত্র অধ্যাপক দারার নিকট আছে। উহা গর্গন মেডুসার চিত্র বলিয়া অনুমিত হয়।

বিচার-বিভ্রাট

কেহ কিছু অন্যায় করিলে তাহার বিচার হয় এবং বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহার সাজা হয়—মনুষ্য-সমাজের ইহাই চিরাচরিত নিয়ম—অনাদি কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি বলি কোন কোন দেশে জন্তু-জানোয়ারেরাও যদি অপরাধ করে, তবে তাহাদিগকেও অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচারের সব কিছু অনুষ্ঠান শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা হয়, তবে হয়ত আপনারা তাহা নিতান্তই আজগবি বলিয়া মনে করিবেন; অথচ সভ্য বলিয়া কথিত ইউরোপের অনেক প্রদেশে মধ্য-যুগে সত্যই জন্তু-জানোয়ারদের এবম্প্রকার বিচার-প্রহসন নিত্যই ঘটিত।

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী আইনবিদ্ বারথোলোমিউ চ্যাসেনি (Bartholomew Chassenee) ইন্দুরের উকিল রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। একবার কয়েকটি ইন্দুর কোন ক্ষেত্রের বার্লি নষ্ট করিয়া দেয়। বিশপের প্রতিনিধির নিকট তখনই নালিশ রুজু করা হইল এবং তিনি বিচারের জন্য একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া চ্যাসেনিকে ইন্দুরদের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিলেন।

শস্য নষ্ট করা ব্যাপারে ইন্দুরদের বড়ই দুর্নাম! তাই চ্যাসেনি বাধ্য হইয়া আইনের ফাঁকিগুলির সন্ধান করিতে লাগিলেন—যদি এই ভাবে বিলম্ব করিতে করিতে কোন প্রকারে অপরাধীদের আইনের কবল হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারেন। প্রথমতঃ, তিনি আপত্তি করিলেন, তাঁহার মক্কেলসমূহ এক স্থানে বাস করে না, সুতরাং একটি মাত্র সমন দ্বারা সকলকে হাজির করান সম্ভব নয়। অতঃপর স্থির হইল, প্রতি গ্রামের ধর্ম্ম-মন্দির হইতে আবার পৃথক করিয়া সমনগুলি জারি করিতে হইবে। এই আদেশ পালন করিতে যথেষ্ট সময় লাগিল এবং সেই সময়ান্তে বিচারের দিনে চ্যাসেনি পুনরায় আপত্তি তুলিলেন—তাঁহার মক্কেলগণ বিচারালয়ে

আসিতে প্রস্তুত হইয়াই আছেন, কিন্তু পথে বিপদাপদ অনেক, বিশেষতঃ মার্জ্জারেরা তাহাদের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, কাজেই ভয়ে তাহারা আসিতে পারিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত হইলে আইনতঃ তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনীয়।

একবার বিউনির (Beaune) অধিবাসিবৃন্দ অটনের (Autun) যাজক-বিচারালয়ে আসিয়া নালিশ করিল যে, পতঙ্গসমূহ তাহাদের শস্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে শস্যক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হউক। তখনকার কালে লোকে বিশ্বাস করিত যে, ধর্ম্মযাজকবৃন্দ যদি অনিষ্টকারী পতঙ্গসমূহের বিরুদ্ধে অভিসম্পাতসূচক আদেশ জারী করেন, তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। একবার নাকি রিসেনিউ (Roicheneau) দ্বীপে ভয়ানক সাপের দৌরাত্ম্য হয়, তাহার পর সেণ্ট পিরমিনিয়াম (St. Pirminium) নামক এক সাধু ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিবা মাত্র সেই সকল সাপ তৎক্ষণাৎ স্থলভূমি পরিত্যাগ করিয়া জলে যাইয়া আশ্রয় লয়। কখনও কখনও বা কোন দেশের অধিবাসিবৃন্দ পোপের নিকট হইতে অভিশাপ লিখাইয়া লইয়া আসিত—তাহারা বিশ্বাস করিত যে, সেই অভিশাপের ফলে তাহাদের অনিষ্টকারী জীবেরা বিনষ্ট হইবে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে লুসার্ণ-(Lucerne)-এর অধিবাসিবৃন্দ এইরূপ একটি দলিল পোপের নিকট হইতে ক্রয় করেন।

বিচারে সকল ক্ষেত্রেই যে অপরাধীদের সাজা হইত তাহা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীরা অব্যাহতিও পাইত। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জুলিয়েনের (St. Julien) মদ্যপ্রস্তুতকারকেরা ফসলনষ্টকারী পতঙ্গদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করে। পিয়েরী ফকন (Pierre Falcon) এবং ব্রড মরেন— এই দুইজন পতঙ্গদের পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। এই বিচারে পতঙ্গদেরই জয় হয়। বিচারক নির্দ্দেশ দেন—"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সকল জীবই সৃজন করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী পৃথিবীর শাকসব্জী-ফসলাদি যে শুধু মানুষের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, কীট-পতঙ্গেরাও ঐ সকল ফসল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। সুতরাং এই সকল কীট-পতঙ্গদের বিরুদ্ধে অভিযান করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। পরন্তু, আমাদের এখন উচিত, ভগবানের নিকট দয়া প্রার্থনা করা—যে পাপের জন্য তিনি আমাদের এমন শাস্তি দিতেছেন তাহা যেন তিনি ক্ষমা করেন।" অতঃপর কি ভাবে এই দয়া ভিক্ষা করিতে হইবে, কি ভাবে তাহারা সদ্‌জীবন যাপন করিয়া ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪২ বৎসর পরে আবার সেই প্রদেশে পতঙ্গের অত্যাচার আরম্ভ হয়। ১৫৮৭ সালের ১৩ই এপ্রিল বিশপের সমক্ষে ইহার বিচার আরম্ভ হইল। পতঙ্গ পক্ষের উকিল তাঁহার মক্কেল-পক্ষের অন্য সব কথা বলিয়া বলিলেন, "বাইবেলে আছে, ভগবান মানুষের পূর্ব্বে কীট-পতঙ্গকে সৃষ্টি করিয়া বলেন— তোমরা স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। খাদ্য না হইলে কীটপতঙ্গও বাঁচিতে পারে না; পৃথিবীর যাবৎ শস্যই তাহাদের খাদ্য এবং তাহা গ্রহণ করিয়া তাহারা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যই করিতেছে। তাহা ছাড়া, এই সকল বোধহীন জীবগণের বিরুদ্ধে সভ্য সমাজের আইন খাটান উচিত নয়, একমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুযায়ীই তাহাদের বিচার করা উচিত। মানুষের পাপের শাস্তি দিবার জন্যই হয়ত ভগবান এই সকল পতঙ্গকে পাঠাইয়া দেন, সুতরাং ইহাদের বিনাশ সাধন করার অর্থ হইতেছে, ভগবানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের উচিত—পরমেশ্বরের করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা।"

অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাদী পক্ষের উকিল ক্রমাগত সময় লইতে থাকেন এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া গ্রাম্য অধিবাসীদের লইয়া একটি নিষ্পত্তি-সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, গ্রামের প্রান্তে একটি পৃথক শস্যক্ষেত্র ঐ সকল পতঙ্গদের জন্য নির্দ্ধারিত করা হউক। যদি প্রতিবাদী পক্ষের উকিল স্বীকার করেন যে, তাঁহার মক্কেলরা মাত্র উক্ত শস্যক্ষেত্র হইতেই তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিবে, তবে গ্রামের লোকেরা রীতিমত দলিল করিয়া উক্ত শস্যক্ষেত্র পতঙ্গদের দান করিতে পারে। মকদ্দমার পরবর্ত্তী তারিখে বাদী পক্ষের উকিল ঐ প্রস্তাব কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং বলেন যে, এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে প্রতিবাদী পক্ষের কোন আপত্তিই থাকা উচিত নয়। প্রতিবাদী পক্ষের উকিল এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সময় চাহিলেন এবং পরে জানাইলেন যে, তাঁহার মক্কেলরা এই প্রস্তাবে সম্মত নয়। এই মামলার শেষ পরিণতি কি হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না,

কারণ, যে গ্রন্থে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল, তাহার শেষ কয়টি পৃষ্ঠা পোকায় কাটিয়া দিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, পতঙ্গদের নির্দ্দেশক্রমেই এই কুকার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

আর একবার সেণ্ট এটনির ধর্ম্মযাজকেরা শ্বেত-পিপীলিকাদের বিরুদ্ধে বিশপের নিকট নালিশ করেন। পিপীলিকাদের বিরুদ্ধে শমন বাহির হইল এবং বিচারকালে প্রতিবাদীর উকিল পিপীলিকাদের সপক্ষে চিরাচরিত সকল তর্কই যথারীতি উত্থাপন করিয়া সর্ব্বশেষে বলেন যে,—শ্বেত-পিপীলিকাগুলি যথেষ্ট অধ্যবসায়ী এবং সে হিসাবে তাহারা বাদীপক্ষের সন্ন্যাসীদের অপেক্ষা ঢের বেশী উন্নত। তাহা ছাড়া, যে সকল দ্রব্য তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই সকল দ্রব্যে তাহাদের মালিকানা অধিকার ধর্ম্মযাজকদের ঐ সকল সম্পত্তি দাবী করিবার বহুপূর্ব্ব হইতে সাব্যস্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যদি তাহাদের বিতাড়িত করা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে যেন তাহাদের জন্য পৃথক একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

বধ্য-ভূমিতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শূকরী। [প্রাচীন চিত্র]।

ধর্ম্মযাজকদের গ্রন্থে লেখা আছে যে, এই আদেশ যেমন পিপীলিকাদের জানান হইল, অমনি তাহারা দলে দলে যাইয়া নির্দ্ধারিত স্থানে আশ্রয় লইল। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, ভগবান তাহাদের বিচার অনুমোদন করিয়াছেন —ধর্ম্ম-যাজকদের ইহাই ছিল অনুমান।

বড় বড় অনিষ্টকারী জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিচার-প্রহসন চলিত। স্লাভোনিয়ার অন্তর্গত প্লেটারনিকায় (Pleternica) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক শূকর এক বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার কর্ণচ্ছেদ করে। বিচারে শূকরের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং তাহার মাংস কুকুরকে দিয়া খাওয়াইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ঐ শূকরের মালিককেও বালিকার বিবাহ-কালে যথেষ্ট যৌতুক দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারে অপরাধী জন্তুদের জীবন্ত দগ্ধ কিংবা প্রোথিত করিবার আদেশ দেওয়া হইত; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি-আদায়ের জন্য পীড়ন-যন্ত্রে রাখিয়া তাহাদের উৎপীড়ন করা হইত। অবশ্য বিচারকেরা জানিতেন যে, স্বীকারোক্তি যদি বা তাহারা সত্যই করে, তবে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, কিন্তু তথাপি বিচার-ফল প্রকাশের পূর্ব্বে বিচারের যত কিছু আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা আছে, সব ত' মানিয়া চলিতে হইবে! ঐ সকল মামলার আবার আপিলও চলিত। আপিলে কখনও কখনও দণ্ডিত আসামী বেকসুর খালাস পাইত, কখনও বা তাহাদের সাজা কমাইয়া দেওয়া হইত।

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একস্থানে (Fontenay-aux-Roses) একটি শিশুকে উদরসাৎ করার অপরাধে বিচারকেরা একটি শূকরকে জীবন্তে দগ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে **Falaise**-এর একটি

শূকরী কোন এক শিশুর মুখ ও হাত কামড়াইয়া দেয় এবং ফলে তাহার মৃত্যু হয়। বিচারক ঐ শূকরীর মাথা খণ্ড-বিখণ্ড ও পা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরে ফাঁসি দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। জীবজন্তু ও মানুষকে সে যুগে একই কয়েদ-খানায় রাখা হইত। মানুষ-কয়েদীর জন্য তাহারা মাথাপিছু যাহা খরচ করিত, জন্তুদের জন্য তদপেক্ষা কম খরচ করিত না, উপরন্তু তাহাদের বাঁধিবার জন্য দড়ির খরচ অতিরিক্ত লাগিত।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে দুই দল শূকরের এক দলের তিনটি শূকর এক শিশুকে হত্যা করে, ফলে বিচারে শুধু উক্ত তিনটি শূকরেরই প্রাণদণ্ড হইল না, উভয় দলের সকলেই কার্য্যতঃ এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দ্বিতীয় দল শূকরের মালিক ছিলেন একজন ধর্ম্মযাজক; তিনি এত সহজে এই লোকসান সহ্য করিতে সম্মত হইলেন না। পরে ডিউক অফ বারগাণ্ডি ফিলিপ বোল্ডের নিকট হইতে তিনি সঙ্গদোষে অপরাধী শূকরদের মার্জ্জনা-পত্র লইয়া আসেন।

আর একবার ১৫৭২ সালের ২০শে মে এক শিশুহত্যার অপরাধে **Moyen Montier**-এর এক শূকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ দেশে রীতি ছিল, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে উলঙ্গ অবস্থায় প্রধান শান্তি-রক্ষকের হাতে দণ্ডভোগার্থ দেওয়া হইত। কিন্তু শূকরকে রজ্জুবদ্ধ না করিয়া উপায় নাই, অথচ তাহা হইলে এই চিরাচরিত প্রথার ব্যত্যয় ঘটে এবং পরে হয়ত অন্য অপরাধীরাও এই সুবিধা দাবী করিবে, এই আশঙ্কায় কোর্টের নথি-পত্রে এরূপ পৃথক ব্যবস্থা কেন করা হইল, সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের পার্লিয়ামেণ্টের আদেশ অনুযায়ী একজন মানুষ ও একটি গরুকে এক সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয়। **Neiderrad**এ ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে একজন মানুষ ও একটি ঘোটকীর প্রাণদণ্ড হয় এবং উভয়কে এক সঙ্গে একই গর্ত্তে প্রোথিত করা হয়।

জীবজন্তুদের এই বিচারের কথা পড়িয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন, কিন্তু নির্জীব দ্রব্যসমূহের বিচারের কাহিনী কেহ কখনও কল্পনাও করিয়াছেন কি? বেশী দিনের কথা নয়, চীনের ১৫টি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সৈন্য-বিভাগের কোন এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত পরিবারের আবেদনক্রমে **Fouchow**-র রাজপ্রতিনিধি তখনই অপরাধীদের ফৌজদারী আদালতের বিচার-মণ্ডপে লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর আইনানুযায়ী তাহাদের বিচার হইল এবং বিচারে তাহাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিবার আদেশ হইল। সমবেত বহু সহস্র লোকের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ তামিল করা হয়।

দ্বিতীয় আইভানের পুত্র রাজকুমার ডিমিট্রিকে যখন ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তাঁহার নির্ব্বাসন-স্থান অগলিচে হত্যা করা হয়, তখন সহরের বিরাট ঘণ্টাটি বিদ্রোহের সঙ্কেত জ্ঞাপন করে। এই অপরাধে উক্ত ঘণ্টাটিকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই ঘণ্টার অপরাধ মকুব করিয়া তাহাকে আবার পুরাতন স্থানে ফিরাইয়া আনা হয়।

বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান

ব্যক্তির জ্ঞানের তারতম্যে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার তারতম্য এবং জাতির জ্ঞানের তারতম্যে জাতির প্রতিষ্ঠার তারতম্য হয়, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।......

......প্রকৃতিকে জানিবার ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞানের তারতম্য হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান যে কত অল্প তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিগত ইষ্টারের ছুটীতে রোম সহরে ইংলণ্ডের ইউনিটি হিষ্ট্রি স্কুল (Unity History School) নামক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে "ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং আমাদের বিশ্বাস, কেহই, হয়ত তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার বক্তৃতার যে যে অংশ বুঝা যায়, তাহাও ভ্রমাত্মক। তাঁহার বক্তৃতার সার এই :—

(১) প্রাচীন ভারতীয়গণ বাস্তব ঘটনা কতখানি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। (It is difficult to assert how much opportunity the ancient Indians had of observing and experimenting upon facts).

(২) প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের ধারণার মূল নীতি—

(ক) সহজাত জ্ঞান (intuition), অন্তর্দৃষ্টি (insight) এবং কল্পনা (imagination).

(খ) জড় পদার্থের সম্ভবপর গুণসম্বন্ধীয় মানসিক অবাস্তব ন্যায়ের বিচার (*Apriori* abstract logical reasonings regarding the possible nature of matter.)

(গ) সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা কারণ নির্ণয়ের জন্য বিবিধ ঘটনা বা কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (Observation and experiment upon facts and effects towards the determination of causes of things by the application of the Inductive method).

(৩) 'সায়ান্স' (Science) শব্দটী ইউরোপীয় এবং ইহার নিজস্ব একটী অর্থপ্রকাশক ইতিহাস আছে। (This word 'Science' is European and has a connotative history of its own.)

(৪) ভারতীয় শব্দ 'বিদ্যা' প্রধানতঃ প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (The Indian word *Vidya* is used to denote primarily the true knowledge).

(৫) পিণ্ডীভূত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা এবং সহজ বোধশক্তির সহায়তায় বাস্তবতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রকৃত জ্ঞান। (The true knowledge —a knowledge of the reality through concrete inner experience and intuition.)

(৬) যে সমস্ত পুস্তকে বিভিন্ন বিদ্যা কাল্পনিক অথবা ব্যবহারিক ভাবে বর্ণিত হইত, তাহাদিগকে 'শাস্ত্র' বলা হইত। (The treatises which described

either theoretically or practically the different *Vidyas* were called *Sastras*.)

(৭) সর্ব্বোচ্চ বাস্তবতার বিজ্ঞান বুঝাইতে 'ব্রহ্ম-বিদ্যা' শব্দটী ব্যবহৃত হইত। (The word *Brahma Vidya* used to denote the Science of the highest reality.)

ইহা ছাড়া বৈশেষিক দর্শন, জৈন দর্শন, সাংখ্য দর্শন এবং পাতঞ্জল দর্শনে তিনি একটী পরমাণুবাদ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ।

কাহারও কথা সমালোচনা করিয়া কাহাকেও হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করা আমাদের মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তদুদ্দেশ্যে আমরা ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতার আলোচনা করিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস, মানুষের বাস্তব* ও কাল্পনিক† দুঃখ সম্পূর্ণভাবে কি করিয়া দূর করিতে হয়, তাহার উপায় একমাত্র ভারতীয় দর্শনে ও বেদে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বর্ত্তমান দার্শনিকগণ যথাযথ বুঝিতে পারেন না এবং দর্শনের নামে অযথা কতকগুলা অর্থহীন এবং ভ্রমাত্মক কথা প্রচার করিয়া থাকেন। ডাঃ দাশগুপ্তও তাহাই করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান মানুষের সংসারযাত্রানির্ব্বাহে কিরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং তথাকথিত পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য যেরূপ সম্পূর্ণ এবং ভ্রমশূন্য, জগতের অন্য কোন জাতির কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞানের পুস্তক সেইরূপ সম্পূর্ণ ও ভ্রমশূন্য নহে। বর্ত্তমান জগতে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা দূর করিবার প্রধান উপায়, ভারতীয় দর্শনের ও বেদের জ্ঞান পুনরুদ্ধার করা। ঐ জ্ঞান বর্ত্তমানে বিকৃত ভাবে প্রচারিত। অনতিবিলম্বে ঐ বিকৃত প্রচার বন্ধ করিতে না পারিলে উহার পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। ভারতীয় দর্শনের এই বিকৃত প্রচারের জন্য দায়ী ভারতীয় পণ্ডিতগণ। ইঁহারা প্রায়শঃ প্রকৃত সংস্কৃত জানেন না এবং জানেন না বলিয়াই ভারতীয় দর্শনগুলি অধুনা যে অর্থে প্রচলিত, তাহা হইতে মানুষের কোন্ কর্ত্তব্য কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হওয়া উচিত, তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

অথচ ইঁহারা স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে প্রায়শঃ অন্ধ। এক হিসাবে ইঁহারা সাধারণ লোক হইতেও নিকৃষ্ট। ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান কি ছিল এবং ভারতীয় দর্শনে কি আছে তাহা যে তাঁহারা জানেন না, এ ধারণা সাধারণ লোকের আছে; কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী তথাকথিত পণ্ডিতগণ যে এই বিজ্ঞান ও দর্শন জানেন না, সে ধারণা হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতির নামে তাঁহারা যে সমস্ত কথা প্রচার করেন, তাহাদের যে কোন অর্থ হয় না, তাহা যে মানুষের কোন কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক নহে, তাহাও তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণ যদি কোন প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জানিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত কি?

বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা ভারতীয় দর্শন বলিয়া যাহা জানেন, তাহাই ভারতীয় দর্শন, এবং ভারতীয় দর্শনে মানুষের নিত্য ব্যবহারোপযোগী কোন প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নাই; যাহা আছে, তাহা মানুষের পরকালের কথা। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ভারতীয় দর্শন যে মানুষের নিত্য ব্যবহারোপযোগী কথায় পরিপূর্ণ এবং তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে যে, মানুষের 'বাস্তব' ও 'কাল্পনিক' সমস্ত দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর **আর্থিক স্বাধীনতা*** ও **রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার** কথা মনে জাগে।

মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উপাদানে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। আর্থিক স্বাধীনতা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। যাহাতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়,

* "বাস্তব দুঃখ"......বলিতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অভাবজনিত দুঃখ বুঝায়।

† "কাল্পনিক দুঃখ"......অভিমানবশতঃ অপরের তুলনায় নিজের কোন বস্তুর অভাব আছে, ইহা মনে করিলে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম কাল্পনিক দুঃখ।

* পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য নিজ দেশে উৎপন্ন করার সামর্থ্যের নাম 'আর্থিক স্বাধীনতা'। আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যই মানুষের সর্ব্বদা প্রার্থনীয় এবং মানুষ যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই তাহার অর্থ; কারণ, অর্থ শব্দ অর্থ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং অর্থ্ ধাতুর অর্থ প্রার্থনা করা

তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তাহা সত্য, কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আর্থিক স্বাধীনতা আনয়ন করিতে অসমর্থ, তাহা অর্থহীন।

মানুষ রাষ্ট্র-পরিচালনকার্য্যে স্বাধীন, অথচ যাহা তাহার নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সে পরমুখাপেক্ষী—এবংবিধ স্বাধীনতা অর্থহীন নয় কি?

জগতের ইতিহাস তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয়ত গ্রীক জাতির অভ্যুদয়ের আগে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রীক জাতির অভ্যুদয়-কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত জগতে যে যে জাতির ও দেশের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাঁহাদের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভিমানে অন্ধ, কিন্তু যাঁহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য পরের নিকট হাত পাতিতে হয়, অথবা অপরের উৎপন্ন বস্তু সঞ্চয় করিবার জন্য কৌশলের ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের সভ্যতার ও বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায় এবং তৎসম্বন্ধে অভিমানেরই বা যুক্তি কি, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে কাহারও পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় কি? আর্থিক স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আরাধ্য, অথচ জগতের অন্য কোন জাতি তাহা লাভ করিতে না পারিলেও চীন ও ভারতবর্ষ তাহা পারিয়াছিল, ইহা কি চীন ও ভারতবর্ষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনন্যসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় নয়?

ভারতের এই আর্থিক স্বাধীনতা সাধিত হইয়াছিল তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন দ্বারা এবং ঐ সংগঠনের মূলে ছিল জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভ্রান্তিহীনতা এবং তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন ভারতের ঋষি। ঋষিগণ যে তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। ঋষিদিগের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে যে আর কেহ কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কোন মৌলিক চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

যে সংগঠনের ফলে ভারতবর্ষ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, সেই সংগঠন অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের জমির সুজলতা ও সুফলতা এবং তাহার কৃষকের সন্তুষ্টি সেই সংগঠনের পরিচয়। আর জমির উর্ব্বরাশক্তির ক্রমিক অবনতি এবং কৃষকের অর্দ্ধাশন-ক্লেশ ও অসন্তুষ্টি উহার বিকৃতির পরিচয়।

এই সংগঠনের মূল জ্ঞান যে ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহে আছে, তাহা ঐ গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায়।

যে সমস্ত গ্রন্থে ভারতীয় ঋষির ঐ জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বিকৃত হইয়াছে এবং এখন আর মানুষ তাহা যথাযথ বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনও বিকৃত। অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার বৎসর হইতে ঐ গ্রন্থগুলির বিকৃতি এবং তাহা বুঝিবার অসামর্থ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

যে সমস্ত গ্রন্থে ভারতীয় ঋষির মৌলিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের নাম ভারতীয় দর্শন ও বেদ।

ভারতের দর্শন ছয়টী এবং বেদ চারিটী, ইহা আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। ছয়টী দর্শনের নাম - ন্যায় অথবা গৌতম সূত্র, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা অথবা বেদান্ত। চারিটী বেদের নাম—ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব্ব। 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চিন্তা করিলে যাহা বুঝায়, তদনুসারে পাণিনিকেও একটী 'দর্শন' বলিতে হয় এবং তাহা হইলে 'দর্শন' হয় সাতটী।

যাহাতে মানুষ তাহার 'অর্থ'-লাভ করিতে পারে তাহার উপায় ভারতীয় দর্শন ও বেদে আছে। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে কিরূপে হিতকারী 'অর্থ'-লাভ করা সম্ভব, তাহার একটা সাধারণ ধারণা থাকা আবশ্যক।

মানুষ সর্ব্বদা একটা না একটা কিছু পাইবার ইচ্ছা করিতেছে। অথচ জগতের যাবতীয় বস্তুই এবং তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবহার মানুষের হিতকারী নহে। কোন্ বস্তু অথবা তাহার কোন্ ব্যবহার মানুষের প্রকৃত হিতকারী তাহা যথাযথ না জানা থাকিলে, প্রকৃত অহিতকারী বস্তু হিতকারী বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে এবং তাহার ব্যবহার করিয়া মানুষ স্বীয় অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কাযেই কোন্ দ্রব্যের কি উপাদান, কি গুণ এবং তাহার কি কর্ম্মশক্তি অথবা ব্যবহার, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। 'জানা' ব্যাপারটি কি তাহা বুঝিতে কিংবা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোনও বস্তু যথাযথ জানা হইতেছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কাজেই কোন্ দ্রব্যের কি উপাদান, কি গুণ এবং কি কর্ম্মশক্তি তাহা বুঝিতে হইলে 'জ্ঞান' কি বস্তু, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা হয় তখন, যখন মানুষ ঐ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় কর্ম্মের ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মানুষ সর্ব্বদা তিল তিল করিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছে, অপরের সহায়তা অথবা দাস্য ব্যতীত স্বীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না; অথচ কেন যে তাহার অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি ও পরমুখাপেক্ষা, তাহার কারণও সঠিকভাবে নির্দ্দেশ অথবা ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কি করিলে তাহার অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি এবং পরমুখাপেক্ষা দূরীভূত হইতে পারে, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ যদি নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, তাহা হইলে তাহাকে কি বিভ্রান্ত বলা যায় না?

মানুষ কেন কোন্ কর্ম্ম করিতেছে এবং কি করিলে স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহা জানিতে হইলে 'মানুষ' বস্তুটি কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

কোন্ উপাদান, কোন্ গুণ সম্বলিত হইয়া মানুষের উদ্ভব হইয়াছে এবং কেন মানুষের কর্ম্মসামর্থ্য বিভিন্ন হয়, তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হইলে মানুষ বুঝিতে পারে যে, স্বীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, কোন কোন বস্তুর বাহির ও অন্তর আংশিকভাবে বুঝা সম্ভব হইলেও, কোন বস্তুই সম্যক্ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই কি করিয়া বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইলে, কি করিয়া বস্তুকে সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হয়।

কি করিয়া বস্তুকে সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইলে, যে উপায়ে বস্তু সম্যক্ভাবে উপলব্ধ হইতে পারে, তাহার প্রয়োগ করিয়া বস্তুকে উপলব্ধি করার আবশ্যকতা আছে।

বস্তুর বাহির, অন্তর, আদি এবং আদির আদিকে সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। তখন বিশ্বদুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পরস্পর কিরূপভাবে সংবদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং মানুষ তাহার অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে, অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে মানুষের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন :—

(১) জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞেয় বস্তু কি?
(২) বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্ম কি?
(৩) মানুষের উপাদান, গুণ এবং বুদ্ধি কি?
(৪) বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার উপায় কি?
(৫) বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি কি?
(৬) বস্তুর বাহির অন্তর ও আদিকে উপলব্ধি করিবার উপায় প্রয়োগ করিবার নিয়ম কি?
(৭) বস্তুর আদির আদি কোথায়? কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হয় কি করিয়া এবং যাবতীয় পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

সাধনা করিলেই উপরোক্ত সাতটী তত্ত্বজ্ঞান ও বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধি করিবার উপায় কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ সাধনা সম্ভব নহে। কাযেই যাঁহারা ঐ সাধনা করিতে সক্ষম, তাঁহাদের উপলব্ধি যাহাতে অন্যান্য সকলের বোধগম্য হয়, তদনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়।

মানুষের ভাষা দুই রকম—প্রাকৃত ও সংস্কৃত। যে ভাষায় মানুষ জন্মাবধি কথা কহে, তাহার নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। বস্তুর বাহ্যিক রূপ প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব বটে, কিন্তু বস্তুর অন্তর এবং আদি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিতে হইলে শব্দের আদি, অন্তর এবং বাহির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষার প্রয়োজন হয়। শব্দের মৌলিকতা ও মিশ্রণ সম্যক্রূপে পর্য্যবেক্ষিত হইলে, যে ভাষার উদ্ভব হয় তাহারই নাম 'সংস্কৃত'। সংস্কৃত ভাষায় এমন কোন শব্দের প্রয়োগ থাকিতে পারে না, যদ্বারা কোন পদার্থের

প্রতীতি হয় না। কাযেই মানুষের অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বকথিত তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া সংস্কৃত ভাষারও প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় দর্শনে ও বেদে উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান এবং বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধির পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সঙ্কেত আছে।

গৌতমসূত্র পড়িলে জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞেয় বস্তু কি তাহা জানা যায়। 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' প্রভৃতি ষোলটী বিষয় ঐ গ্রন্থের আলোচ্য, তাহা উহার প্রারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে। 'প্রমাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞান' এবং 'প্রমেয়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞেয়'।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, বর্ত্তমান জগৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞান কি করিয়া লাভ করিতে হয় এবং জ্ঞান লাভ হইয়াছে কিনা, তাহার পরীক্ষা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা ত' দূরের কথা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার পরিষ্কার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। বরং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করা মানুষের শক্তির বহির্ভূত। বর্ত্তমান ভারতের পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শিষ্য। যে জ্ঞান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নাই অথবা ভ্রমাত্মক, তাহা বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের না থাকা অথবা ভ্রমাত্মক হওয়া স্বাভাবিক। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান কতখানি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কতখানি জ্ঞান আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং ধারা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর 'হিপোক্রেটিস' (Hippocrates), অ্যারিষ্টটল্ (Aristotle), অ্যাকুইনাস্ (Acquinos), রোজার বেকন (Roger Bacon), ডেকার্টে (Descartes), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), লক (Locke), লিবনিজ (Leibnitz) ক্যাণ্ট (Kant) কোঁৎ (Comte), হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), আর্থার টমসন্ (Arthur Thomson), গেডিস্ (Geddes), ফ্লিণ্ট (Flint), পিয়ার্সন (Pearson) এবং হোয়াইটহেডের (Whitehead.) নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের আলোচনায় Absolute Science, Applied Science, Inductive Science, Liberal Science, Mental Science, Moral Science, Occult Science, Sanitary Science, The Seven Liberal Sciences, The Seven Terrestrial Sciences প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু Science অথবা 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান কি করিয়া লাভ করিতে হয়, তাঁহারা যাহাকে Science বলিয়াছেন, মানুষ তাহাকে অন্য কিছু না বলিয়া Science বলিবে কেন,—এবংবিধ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। ইংরাজী অভিধানানুসারে Science শব্দের অর্থ systematised knowledge, অথবা শৃঙ্খলিত জ্ঞান। Knowledge অথবা 'জ্ঞান' কি বস্তু, তাহার system অথবা 'শৃঙ্খলা' বলিতে কি বুঝায়, ঐ শৃঙ্খলায় যে শৃঙ্খল (chain) রচিত হয়, তাহার আদি অথবা প্রারম্ভ কোথায় এবং শেষই বা কোথায়, তাহা না বলিয়া কেবল মাত্র 'শৃঙ্খলিত জ্ঞান' অথবা systematised knowledge বলিলে কিছু পরিষ্কার বুঝা যায় কি ?

'জ্ঞান' কাহাকে বলে তাহার পরিষ্কার এবং সঙ্গত সংজ্ঞা ও তাহা লাভ করিতে হয় কি করিয়া, তাহার উপায় বর্ত্তমান কোন জাতির কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষি তাহা পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন।

গৌতমসূত্রানুসারে মানুষের ইন্দ্রিয় যাহা প্রার্থনা করে, তাহার সত্ত্বার উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জ্ঞান।*

* ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং… (১ম অঃ ; ১ম আঃ ; ৪র্থ সূত্র)

ইন্দ্রিয়ার্থ (ইন্দ্রিয়ের অর্থ অথবা ইন্দ্রিয় যাহা প্রার্থনা করে), তাহার সন্নিকর্ষ (সত্ত্বার নিকর্ষ) ; "নিকর্ষ" শব্দের মধ্যে "নি" এবং "কর্ষ" এই দুইটী শব্দ আছে। "নি" বলিতে নিশ্চিত রূপে বুঝায় ; আর "কর্ষ" বলিতে উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিকাশ নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য বুঝায়। "কর্ষ" শব্দের মধ্যে যে এতখানি অর্থ আছে, তাহা খুব সম্ভব বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্‌গণ স্বীকার করিবেন না। কিন্তু যদি কখনও কেহ মূল পাণিনির শব্দবিজ্ঞান যথাযথ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, এই শব্দের 'ক'এর অর্থ "উদ্ভব", 'র'এর অর্থ "বৃদ্ধি" এবং 'ষ'এর অর্থ বিকাশ এবং তিনি আমাদের বক্তব্যের সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবেন। উপরোক্ত 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ' হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার নাম "জ্ঞান"।

ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কোন না কোন বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। কাযেই মানুষের ইন্দ্রিয় যাহা প্রার্থনা করে, তাহার নাম বস্তু। বস্তুর সত্তার উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিকাশ নির্দ্ধারণ করা, আর তাহার আদি, অন্তর ও বাহির কেন তাদৃশ, তাহা স্থির করা একই কথা। কাযেই গৌতমসূত্রানুসারে কোন্ বস্তু কি উপাদানে নির্ম্মিত এবং কি পদ্ধতিতে তাহার নির্ম্মাণ হয়, তাহার কর্ম্মশক্তি কত রকমের এবং কোথা হইতে তাহার উদ্ভব হয়, তাহার গুণ কি কি এবং কেন তাহা ঐ সমস্ত গুণ-সম্বলিত ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য হইতে যাহা লাভ হয়, তাহার নাম 'জ্ঞান'। 'জ্ঞান' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও ঠিক এই অর্থই পাওয়া যায়। অন্যান্য দর্শনেও 'জ্ঞান' শব্দটী যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানেই এই অর্থই প্রযুজ্য হয়।

গৌতমসূত্রের মতে জ্ঞান লাভ করিবার উপায়, ইন্দ্রিয় যাহা প্রার্থনা করে, তাহার, অর্থাৎ বস্তুর বিশ্লেষণ করা। মানুষ সাধারণতঃ বস্তু দেখিলেই তাহার অবয়ব উপভোগ করিতে চাহে। উপভোগে প্রবৃত্ত হইলে কোন বস্তুর যথাযথ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। মানুষের ইন্দ্রিয় যে বস্তুর যাচ্ঞা করে, তাহার উপভোগে উদ্যত না হইয়া বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনেও জ্ঞানলাভ করিবার জন্য মূলতঃ বস্তুর বিশ্লেষণ করিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ভারতীয় বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ গৌতমদেবের উপরোক্ত সূত্রটী যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে অবশ্য 'জ্ঞানের' এবংবিধ পরিষ্কার এবং কার্য্যকরী সংজ্ঞা হয় না। তাহার দায়িত্ব ভারতের ঋষির নহে। যদি তজ্জন্য কাহারও কোন দায়িত্ব থাকে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষ্যকার পণ্ডিত এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গের। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের অভাববশতঃ বর্ত্তমানে দর্শনগুলি প্রায়শঃ বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। গৌতমসূত্র অত্যন্ত বিকৃত অর্থে চলিতেছে, তাহারই জন্য তথাকথিত বর্ত্তমান গৌতমসূত্রবিদ্‌গণ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পড়িয়াও 'জ্ঞান' কাহাকে বলে এবং তাহা লাভ করিতে হয় কি প্রকারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না।

জগতের সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান (দ্রব্যত্ব), গুণ এবং কর্ম্মশক্তিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে **বৈশেষিক** দর্শনে। তাহার প্রমাণ এই দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্র। যাহার জন্য প্রত্যেক বস্তুর তাদৃশ রূপ এবং কর্ম্মক্ষমতা অথবা তাদৃশ বিকাশ, তাহাকে বস্তুর 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; বস্তুর দ্রব্য অথবা উপাদান কি, তাহার গুণ এবং কর্ম্মশক্তি কি, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর সমতা কোথায়, প্রত্যেক বস্তুর বৈশিষ্ট্য কোথায়, কোন্ বস্তুর কোন্ উপাদান, অপর কোন্ উপাদানের সহিত মিলিত হইলে মিশ্রিত কি বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিলে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন 'ধর্ম্ম' কি, তাহা জানিতে পারা যায় এবং কোন্ বস্তু মানুষের হিতসাধক ও কোন্ বস্তু অহিতসাধক তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কণাদদেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে ঐ আলোচনা আছে বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে 'বৈশেষিক' দর্শন। 'বৈশেষিক' বলিতে বুঝায় তাহা, যাহা দ্বারা বস্তুর 'বিশেষ' অথবা প্রত্যেক বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি জানিতে পারা যায়। কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি কি তাহা জানিতে হয়। তাহার পর অপর বস্তুর সহিত তাহার সমতা কোথায় তাহা বুঝিতে হয়। বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানা আর তাহার বিজ্ঞান জানা একই কথা। বিজ্ঞান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, বিশেষের জ্ঞান অথবা 'বৈশিষ্ট্য' জানিবার প্রযত্নের ফলে যাহা উদ্ভূত হয়, তাহা। কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা করিতে হয়:—

(১) ঐ বস্তুর উপাদান কি, কি উপায়ে ঐ উপাদানের উদ্ভব, কি ভাবে ঐ উপাদানগুলির মিশ্রণ হয়, কেন ঐ উপাদানগুলির মিশ্রণে অন্য কোন বস্তুর উদ্ভব না হইয়া ঐ বস্তুর উদ্ভব হয়, কেন ঐ উপাদানগুলি অন্য কোন রূপের উৎপত্তি না করিয়া তাদৃশ রূপের উৎপত্তি করে, কেন ঐ উপাদানগুলি বস্তুর অন্য কোন কর্ম্মশক্তির উদ্ভব না করিয়া তাদৃশ কর্ম্মশক্তির উদ্ভব করে—বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে এবংবিধ যাবতীয় জ্ঞান।

(২) ঐ বস্তুর গুণ কি, কি উপায়ে ঐ গুণের উদ্ভব, কেন ঐ বস্তুর অন্য কোন গুণ না হইয়া তাদৃশ

গুণ হইল—বস্তুর গুণ সম্বন্ধে এবংবিধ যাবতীয় জ্ঞান।

(৩) ঐ বস্তুর কর্ম্মশক্তি কি, কি উপায়ে ঐ কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হয়, কেন ঐ বস্তুর অন্য কোন কর্ম্মশক্তি না হইয়া তাদৃশ কর্ম্মশক্তি হইল—বস্তুর কর্ম্ম সম্বন্ধে এবংবিধ যাবতীয় জ্ঞান।

বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্ম যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং কোন বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে যে, বস্তুর উপাদান, গুণ, কর্ম্ম এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হয়, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর আগে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই একই গ্রন্থে তাহার আলোচনা তাঁহারা করিয়াছেন।

কোন বস্তুকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে যে, তাহার উপাদান, গুণ এবং কর্ম্ম ও তাহার পরস্পরের সম্বন্ধের আমূল আলোচনা করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি বুঝিতে পারেন নাই। তাহার প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থগুলি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) পুস্তকগুলিতে বস্তুর উপাদান এবং গুণ সম্বন্ধে আংশিক ভাবে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বস্তুর কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics) পুস্তকগুলিতে বস্তুর গুণ এবং কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে আংশিক ভাবে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার উপাদান সম্বন্ধে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় না।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। কোন জ্ঞানের কথা আমূল জানিতে না পারিলে, যাহা জানা হয়, তাহা যথাযথ জানা হইয়াছে কিনা তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

'বিজ্ঞান' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার আলোচনা ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনে সম্পূর্ণভাবে আছে এবং ঐ আলোচনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পুস্তকগুলির মত আংশিক নহে কাজেই উহা নির্ভরযোগ্য।

ভারতবর্ষে যাবতীয় এঞ্জিন ও কল প্রস্তুত হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, ভারতবাসী বিজ্ঞান জানিত না। যদি কখনও বৈশেষিক দর্শন যথাযথ অর্থে আবার ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিবে যে, এঞ্জিন ও কল তৈয়ারী করিতে হইলে বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমান যুগের তুলনায় অনেক অধিক ঐ দর্শনে আছে। ঐ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানের তুলনায় প্রাচীন ভারতবাসীর জ্ঞান এত সম্পূর্ণ ছিল যে, এঞ্জিন ও কল তৈয়ারী করিবার সামর্থ্যও তাঁহাদের ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হয়ত তাঁহারা একদিন উহা তৈয়ারীও করিতেন এবং খুব সম্ভব মানুষের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু রক্ষা সম্বন্ধে উহা অহিতকারী, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল নির্ম্মাণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তথাকথিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের নূতন আবিষ্কারগুলি যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের ও পরমায়ুর কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা বর্ত্তমান জগৎ বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়াই তথাকথিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের অভিমান পোষণের সহায়তা করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান জগতের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকৃত হইবার খুব বেশী বিলম্ব নাই।

বৈশেষিক দর্শন যে এখন আর যথাযথ অর্থে প্রচারিত নহে, তাহার কারণ, বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্‌গণ প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, অথবা যে ভাষায় বৈশেষিক দর্শনের সূত্রগুলি লিখিত, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার কিরূপ বিকৃতি সাধিত হইয়া তথাকথিত বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমাদের "অর্থনীতির ছাত্র" তাঁহার "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধের বর্ত্তমান সংখ্যায় দেখাইয়াছেন। আমরা আমাদিগের পাঠকদিগকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমানে বৈশেষিক দর্শন যে অর্থে প্রচলিত, তাহা ভারতবর্ষের কলঙ্কের পরিচয়। সমস্ত গ্রন্থখানি এই অর্থে পড়িয়া কি জ্ঞান লাভ করিলাম, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যায়, তাহা হইতে কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই। সারা

গ্রন্থখানি এই অর্থানুসারে কতকগুলি অসংলগ্ন এবং অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত। এই অর্থে এই গ্রন্থ যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় এবং অজ্ঞানতাসাধক, বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্‌গণ তাহাও বুঝিতে পারেন না। ঐ গ্রন্থের ঐ অর্থ স্বীকার করিয়া লইলে পরোক্ষভাবে ঋষিগণকে জ্ঞানহীন উন্মাদ বলা হয়, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ঋষিগণ যে কখনও জ্ঞানহীন উন্মাদ হইতে পারেন না, তাঁহাদের জ্ঞানের কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকিলে যে, ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা সংঘটিত হইতে পারিত না এবং ভারতবাসী বহুদিন আগে অন্নাভাবে কালের করাল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইত, তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না।

বস্তুর পরিমাপ করিবার বিধিপ্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে 'অণু' ও 'মহৎ' সম্বন্ধে কয়েকটী সূত্র আছে। বৃহৎ বৃহৎ অবয়বসম্পন্ন বস্তু সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে, তাহা কত ক্ষুদ্রাংশে বিশ্লিষ্ট করিতে হয় এবং তাহা করিতে পারা যায়, ইহাই বুঝান এই সূত্রগুলির উদ্দেশ্য। অথচ এই সূত্রগুলিতে একটা অর্থহীন পরমাণুবাদ আরোপ করা হয়; ঐ পরমাণুবাদের সার্থকতা যে অতি সামান্য, তাহা পর্য্যন্ত তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈশেষিক দর্শন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে অমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ। এবংবিধ প্রয়োজনীয় দর্শনের যথাযথ ব্যাখ্যা অনতিবিলম্বে যাহাতে পুনরুদ্ধার করা যায়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, দর্শন যথাযথ ব্যাখ্যাত হইলে তথাকথিত বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্‌গণের সেই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিবার সম্ভাবনা থাকিবে। কাযেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ কি তাহা জানিতে হইবে।

মানুষ কোন্ উপাদানে গঠিত, কেন মানুষ বিভিন্ন গুণ এবং কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন হয়, তাহার জ্ঞানের প্রারম্ভ হয় **সাংখ্য দর্শনে** এবং সম্পূর্ণ হয় যোগ দর্শনে।

যাহা লইয়া মানুষের বিকাশ, তাহার কতকগুলি ব্যক্ত আর কতকগুলি অব্যক্ত। মানুষের শরীর ব্যক্ত আর তাহার শরীর কেন এইরূপ হয়—তাঁহার কারণ অব্যক্ত।

মানুষের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যক্ত, অথচ তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি স্বকীয় কার্য্য যাহাদের সহায়তায় সাধন করিয়া থাকে তৎসমুদয় অব্যক্ত। মানুষের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যক্ত, অথচ তাহাদের কার্য্য যাহাদের সহায়তায় সম্পন্ন হয়, সেগুলি প্রায়শঃ অব্যক্ত।

ইহা ছাড়া মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার বুদ্ধি। যাহা হইতে মানুষের বুদ্ধির উদ্ভব হয় তাহার নাম—'জ্ঞ'।

মানুষের 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' অংশের এবং 'জ্ঞ'-এর জ্ঞান লাভ হইলে মানুষ কোন্ উপাদানে গঠিত, কেন মানুষ বিভিন্ন গুণ এবং কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং তখন মানুষের পক্ষে নিজ সামর্থ্যের উন্নতি সাধন করিয়া দুঃখ দূর করা সম্ভব হয়।

কি করিয়া স্বীয় 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' অংশের এবং 'জ্ঞ'-এর জ্ঞান লাভ করিতে হয় এবং এই জ্ঞান দ্বারা কি উপায়ে নিজ দুঃখ দূর করিতে হয় তাহাই সাংখ্য দর্শনের আলোচ্য। ইহাই যে সাংখ্য দর্শনের আলোচ্য, তাহা তাহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাংশ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা তাহার 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' অংশের এবং 'জ্ঞ'-এর সম্পূর্ণ (অর্থাৎ আদি, অন্তর এবং বাহিরের) জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। কাজেই এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি উপায়ে মানুষের বুদ্ধির উন্নতি সাধন করা সম্ভব, তাহা জানিতে হয়।

'যোগ দর্শন' পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে কি উপায়ে মানুষের বুদ্ধির উন্নতি করা সম্ভব তাহা জানা যায়। যোগদর্শনের জ্ঞানলাভের পর বুদ্ধির উন্নতি সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের 'ব্যক্তাংশ' সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব বটে, কিন্তু 'অব্যক্তাংশ' এবং 'জ্ঞ'-এর পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। কাযেই সাংখ্য দর্শনে 'ব্যক্তাংশে'র সহিত 'অব্যক্তাংশে'র এবং 'জ্ঞ'-এর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই বুঝাইবার জন্য অব্যক্তাংশের এবং 'জ্ঞ'-এর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ব্যক্তাংশের আলোচনায় পরিপূর্ণ। ব্যক্তাংশ সংখ্যাভুক্ত করা যায় এবং প্রধানতঃ তাহার আলোচনার জন্যই কপিলদেব তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

বলিয়াই বোধ হয় ঐ গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন 'সাংখ্য'। যাহার দ্বারা সংখ্যাধীন বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়, ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সাংখ্য' বলিতে তাহাকে বুঝায়

সাংখ্য দর্শন পড়িলে মানুষের মাংস, অস্থি ও ইন্দ্রিয়াদি কি কি উপাদানে গঠিত, তাহাদের প্রকৃতি এবং বিকৃতি কি, তাহা জানিতে পারা যায়।

এই দর্শনও অত্যন্ত বিকৃতার্থে চলিতেছে। তাহারই জন্য তথাকথিত বর্ত্তমান সাংখ্যবিদ্ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পড়িয়াও নিজ মাংস, অস্থি ও ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করেন না। কেহ কেহ সাংখ্যের ভিতরও পরমাণুবাদ দেখিতে পাইয়া থাকেন। তাহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমরা আগেই বলিয়াছি, **যোগদর্শন** পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, কি উপায়ে মানুষের বুদ্ধির উন্নতি করা সম্ভব, তাহা জানা যায়। নিজ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুবিশেষের সহিত যুক্ত করিয়া ঐ বস্তুর বিশ্লেষণ না করিলে উহাকে বোধগম্য করা যায় না এবং বুদ্ধিরও উন্নতি সাধিত হয় না। কাযেই বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কি করিয়া বস্তুর সহিত তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা শিক্ষা করিতে হয়। যাহার সহায়তায় বস্তুর সহিত নিজ বুদ্ধি কি করিয়া সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা যায়—ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহার নাম যোগ। পতঞ্জলিদেব তাঁহার গ্রন্থে ঐ বিদ্যার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার নাম দিয়াছেন যোগ দর্শন।

কোন বস্তুর সহিত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইতে হইলে বুদ্ধির বিক্ষেপ দূরীভূত করিয়া একাগ্র হইবার চেষ্টা করিতে হয়। যোগ দর্শনও আরম্ভ হইয়াছে বুদ্ধির বিক্ষেপের কথা লইয়া।

বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সম্যক্‌ভাবে বুঝা কাহাকে বলে এবং তাহার উন্নতি সাধন করিবার উপায় কি তাহা জানিতে হয়, আর বুদ্ধির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একটি একটি করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করে এবং ক্রমশঃ স্বীয় সমস্ত অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যেক বস্তুর উপাদান এবং গুণ কি করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার জ্ঞান জন্মে।

সম্যক্ ভাবে বুঝা কাহাকে বলে তাহা লইয়া যোগদর্শনের প্রথম পাদ অথবা "সমাধি পাদ"। সমাধি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহা হইতে সম্যক্ রূপে বুঝা কাহাকে বলে তাহা জানা যায়। ঐ আলোচনা যোগদর্শনের প্রথম পাদে আছে বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে "সমাধি পাদ"।

যোগ দর্শনের দ্বিতীয় পাদের নাম "সাধনা পাদ"। বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কি করিতে হয়, তাহার বিবৃতি আছে বলিয়া এই পাদের ঐরূপ নাম হইয়াছে।

বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জ্ঞান এবং সামর্থ্যের অথবা 'বিভূতি'র উদ্ভব হয়, তৃতীয় পাদে তাহার বর্ণনা আছে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে "বিভূতি পাদ"।

বুদ্ধির উন্নতি সাধন সম্পূর্ণ হইলে গুণ হইতে পৃথক করিয়া 'কেবল' দ্রব্যকে উপলব্ধি করিবার যে সামর্থ্য জন্মে, তাহার বর্ণনা চতুর্থ পাদে আছে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে "কৈবল্য পাদ"।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের শরীরতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার উপায়, মৃত মানুষের অথবা জীবের শরীর ব্যবচ্ছেদ করা।

জীবন্ত মানুষের শরীরে বায়ুর যে চলাচল থাকে, শবের শরীরে তাহা থাকে না। ফলে শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানুষের প্রাণবায়ু তাহার আভ্যন্তরীণ কোন্ রাস্তা দিয়া কিরূপ ভাবে যাতায়াত করে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না এবং আভ্যন্তরীণ কোন্ সূক্ষ্ম অঙ্গ জীবিত অবস্থায় কোথায় থাকিয়া কিরূপ কার্য্য করে, তাহারও সঠিক নির্দ্ধারণ হয় না। কাযেই শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার জ্ঞান হইতে যে শরীর তত্ত্বের উদ্ভব হয়, তাহাতে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নহে।

বর্ত্তমান যুগে শরীরতত্ত্ব বলিয়া চিকিৎসকগণ যাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। তাহা যে অসম্পূর্ণ তাহার প্রমাণ, আমাদের ডাক্তারগণের মানুষের বুদ্ধি ও মন সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব। বুদ্ধি ও মন মানুষেরই অঙ্গ। বুদ্ধি ও মন কি বস্তু, মানুষের অভ্যন্তরে কোথায় তাহাদের স্থান, তাহাদের স্বকীয় ও মিলিত কার্য্যপদ্ধতি কি, তাহা না জানা থাকিলে, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় না কি? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বুদ্ধি ও মন কি বস্তু, তাহা জানা মনস্তত্ত্ববিদ্গণের কার্য্য, চিকিৎসকগণের নহে। ইহা সমীচীন কি? বুদ্ধি ও মনের সহিত মানুষের

শরীরের কতখানি সম্বন্ধ, তাহা বর্ত্তমান জগৎ পরিজ্ঞাত নহে বলিয়া, বর্ত্তমান জ্ঞানে শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারই জন্য মানসিক অসুস্থতাবশতঃ রোগীর কোন রোগের উদ্ভব হইলে বর্ত্তমান বৈদ্যগণ তাহার কোন চিকিৎসা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বেও বুদ্ধি ও মন কাহাকে বলে তাহা এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। উহাতে মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শঃ অর্থহীন কথার কথা। মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসাকল্পে তাহার ব্যবহার করা যায় না। মানুষের দশটী ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্বে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয় নিজ শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন্ উপাদান অথবা কার্য্যক্ষমতার জন্য বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার কোন কথা নাই। ফলে চক্ষুরাদির অসুস্থতার চিকিৎসা মাত্র অতি সাধারণ অবস্থা পর্য্যন্ত সাধিত হয়।

শরীরের আভ্যন্তরীণ যে পথে প্রাণবায়ুর চলাচল হইয়া থাকে বলিয়া বর্ত্তমান বৈদ্যগণের বিশ্বাস, তাহাও নিজ শরীরের ভিতর অনুভব করা যায় না এবং তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শরীরতত্ত্বজ্ঞানে বর্ত্তমান বৈদ্যগণের যদি কোন ভ্রমই না থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কোন কোন রোগ পারদর্শিতার সহিত নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও, সর্ব্ববিধ রোগ সেই পারদর্শিতার সহিত নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন কেন ?

শরীরতত্ত্ববিদ্যাতেও ভারতীয় ঋষিগণ অনন্যসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। শরীর, মন ও বুদ্ধি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক ঋষিদিগের জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে—সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে। জীবন্ত মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রাণবায়ুর চলাচল অনুভব করিবার উপায় কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া এবং প্রথমতঃ প্রাণবায়ুকে উপলব্ধি করিয়া মানুষের মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত কি বস্তু এবং তাহাদের স্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় ঋষির শরীরতত্ত্বের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ও সঠিক, তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এখনও বুঝিতে পারা যায়। অল্পবুদ্ধি মানুষকে কি করিয়া বুদ্ধিমান করিতে হয়, তাহার জ্ঞান একমাত্র ভারতীয় ঋষি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের অন্য কোন জাতি তাহা অদ্যাবধি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় ঋষির এই অনন্যসাধারণ জ্ঞান আজ সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য সাধারণের অপরিজ্ঞাত এবং অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যোগী মৃতপ্রায় ব্যক্তির জীবন দান করিতে পারেন, এবংবিধ প্রবাদ এখন আজগুবি গল্প বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু যদি আবার কখনও যোগ দর্শন যথাযথ অর্থে প্রচার করা সম্ভব হয় এবং প্রকৃত যোগীর উদ্ভব হয়, তখন মানুষ জানিতে পারিবে যে, ঐ প্রবাদ আজগুবি গল্প নহে, পরন্তু উহার মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত রহিয়াছে। মানুষ কি করিয়া নিজেকে যোগী করিয়া তুলিতে পারে, তাহারও ব্যবহারযোগ্য উপদেশ আছে।

গৌতমসূত্রের সহায়তায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি তাহা বুঝিতে পারিলে 'বৈশেষিক' দর্শনের সহায়তায় যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম কি এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে পারা যায়। যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহায়তায় মানুষের সম্পূর্ণ ও সঠিক শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। তখন মানুষ তাহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করিবার সামর্থ্য লাভ করে এবং কোন অঙ্গের অসুস্থতা ঘটিলে তাহার আরোগ্য সাধন করিতে পারে। তখন প্রত্যেক বস্তুর বাহির, অন্তর, এবং আদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু কোন বস্তুর 'আদির আদি' সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বস্তুর আদির আদিকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে বস্তু সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানলাভ হইল কিনা, তাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়।

আদির আদি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যাবতীয় বস্তুর সমতা কোথায় এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমস্ত বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, প্রথমতঃ—তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয়তঃ—যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমস্ত বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার বিবিধ প্রয়োগ করিতে হয়। বিবিধ প্রয়োগের ফলে যে বিবিধ জ্ঞান হয়, তাহাদের সামঞ্জস্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, কোন্ বস্তু এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে আর কিছু অজ্ঞাত

থাকে না এবং তখন আর মানুষের অস্বাস্থ্য এবং অভাব উপস্থিত হইতে পারে না।

কোন বস্তুর 'আদির আদি'কে সাধারণতঃ স্পর্শ করা যায় না এবং কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বুঝিতে না পারিলে তৎ-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। বস্তুর আভ্যন্তরীণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিতে পারিলে তাহার উপলব্ধি করা সম্ভব হয়

যাহা বস্তুর আভ্যন্তরীণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিবার সহায়তা করে, তাহার নাম **মন্ত্র**; ইহাই পাণিনি দেবের শব্দ-জ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ। ভারতীয় ঋষিগণ প্রত্যেক বস্তুর 'মন্ত্র' অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহাদের চারিটী বেদে লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুর আভ্যন্তরীণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বস্তুজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় ঋষির 'মন্ত্র' ও 'বস্তুজ্ঞান' 'কাল্পনিক', তাঁহারা মন্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইলে, যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, যোগ দর্শন সহায়তায় সেই বুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া সন্দেহ হয়।

কি উপায়ে বস্তুর আদির আদিকে উপলব্ধি করা যায়, তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত **পূর্ব্বমীমাংসা** দর্শনে লিপিবদ্ধ আছে। 'মন্ত্রের' দ্বারা বস্তুর আদির আদিকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহা হইতে যে বিবিধ জ্ঞান হয়, তাহার পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে উত্তরমীমাংসায়।

'মন্ত্র'-প্রয়োগে অভ্যাসের পূর্ব্বে বস্তুর আদির আদিকে উপলব্ধি করিবার উপায় সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল বলিয়া, যে গ্রন্থে ঐ বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে 'পূর্ব্বমীমাংসা'।

'মন্ত্র'-প্রয়োগ অভ্যাসের পর উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সামঞ্জস্য ও পরস্পরের গ্রন্থি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বলিয়া যে গ্রন্থে উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সামঞ্জস্য ও পরস্পরের গ্রন্থি নির্দ্ধারিত হইয়াছে—তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে **উত্তর-মীমাংসা**।

পূর্ব্বমীমাংসা, বেদ ও উত্তরমীমাংসার আলোচ্য বিষয় যে আমাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ, তাহা যাঁহারা ঐ তিন শ্রেণীর গ্রন্থের বিন্দুমাত্রও রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বেদ ও দুইটী মীমাংসা যে অর্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ গ্রন্থগুলির প্রকৃত রহস্য জগৎ বহু সহস্র বৎসর আগে বিস্মৃত হইয়াছে। যোগ দর্শনের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম-সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, বেদ ও মীমাংসার জ্ঞান কি, তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান জগতে কি করিয়া বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে পূর্ব্বমীমাংসা, বেদ ও উত্তরমীমাংসা এখন আর কেহ বুঝিতে পারেন না।

পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্তানুসারে বস্তুর আভ্যন্তরীণ আদির আদিকে বিকশিত এবং বিবর্দ্ধিত করিবার উপায় দুইটী, (১) বস্তুকে প্রকাশ করিবার জন্য **সাধারণ লোক** * যে শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে যে শব্দ থাকে, তাহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, এবং (২) বস্তুকে তেজসম্পন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেক উপাদানের প্রকটতা সাধন এবং তাহার পর প্রত্যেক উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা। প্রথমোক্ত উপায়টীর নাম **শব্দ-জ্ঞান** লাভ করা এবং দ্বিতীয় উপায়টীর নাম **ব্রহ্ম-জ্ঞান** লাভ করা। প্রকৃত শব্দ-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বহু সহস্র বৎসর আগে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দ-জ্ঞানে ও ব্রহ্ম-জ্ঞানে যে জীবের মুক্তি হয়, সেই সংস্কার এখনও বহু ভারতবাসীর মধ্যে আছে। প্রকৃত জ্ঞানের লোপ হইয়াছে, অথচ তাহার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সংস্কার এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী শব্দ-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আজগুবি গল্প করিয়া থাকে এবং তাহা বিশ্বাস করে। তাহারই জন্য ভারতের অল্পবুদ্ধি পণ্ডিত-গণ মনে করেন, ভারতবাসীর বস্তুজ্ঞান কল্পনাপ্রসূত এবং তাহার মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই। কিন্তু ভারতীয় ঋষির বস্তুজ্ঞান যে বিন্দুমাত্রও কাল্পনিক নহে এবং তাহা যে সর্ব্বতো-ভাবে বাস্তব, তাহার অটুট সাক্ষ্য ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ 'আর্থিক স্বাধীনতা'।

* সাধারণ লোক বলিতে বুঝিতে হইবে, যাঁহারা শিক্ষিত লোক বলিয়া অভিমানগ্রস্ত হন নাই।

শব্দ-জ্ঞান লাভ হয় বেদের 'মন্ত্র'-প্রয়োগে এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় পূর্ব্বমীমাংসার উপদিষ্ট বিধিবদ্ধ যজ্ঞ দ্বারা। মন্ত্র-প্রয়োগ ও যজ্ঞ, এই দুইয়ের ব্যবহার অভ্যাস করিবার পদ্ধতি বেদে আছে।

বেদ-প্রদর্শিত মন্ত্রের প্রয়োগাভ্যাস দ্বারা যে শব্দ-জ্ঞান লাভ হয়, তৎসাহায্যে ভাষার সৃষ্টি করিলে, কোন্ শব্দের প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য অথবা অর্থ কি, তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত ভাষা এবংবিধ শব্দ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাণিনিদেব ঐ শব্দ-জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন আর কেহ 'বেদ'-প্রদর্শিত মন্ত্রের প্রয়োগের অভ্যাস করেন না এবং কাহারও প্রকৃত শব্দ-জ্ঞান লাভ করিবার সামর্থ্য হয় না। ফলে পাণিনিদেবের ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি যে সমস্ত পরবর্ত্তী ব্যাকরণ বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা বোধগম্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা পাণিনিদেব-প্রদর্শিত শব্দ-জ্ঞানের উপর আদৌ প্রতিষ্ঠিত নহে। ফলে তৎসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা যে ভাষায় বেদ ও দর্শনাদি লিখিত, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা সম্ভব হয় না।

শব্দের বিবৃদ্ধি হইতে প্রকাশ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইতে শব্দ যে গতির আশ্রয় করে, সেই গতির বিকাশ সেই শব্দের 'রূপ'; ইহা 'রূপ' শব্দের শব্দগত অর্থ। বস্তুতঃ সামান্য মাত্র শব্দ-জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, 'অ', 'আ', 'ক' 'খ' প্রভৃতি যে রূপে লিখিত হয়, সেই রূপ আর তাহা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার যে গতি অবলম্বিত হয়, তাহার রূপ এক। 'অ', 'আ' প্রভৃতির লিখন-প্রণালী দেখিলে তাহার সম্পূর্ণ উচ্চারণ কি হইলে হয়, তাহা অনুমান করা যায়। কাযেই সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত বর্ণের ব্যবহার হয়, তাহার উচ্চারণ, অর্থ ও লিখন-প্রণালী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণের লিখন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করিবার কল্পনা সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক।

অনন্যসাধারণ ভারতীয় আর্থিক স্বাধীনতা যে ভারতীয় ঋষির অনন্যসাধারণ জ্ঞানের ফল, তাহা উপরে যাহা দেখান হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বেদের ও দর্শনের ঐ অনন্যসাধারণ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার বৎসর। ঐ জ্ঞানের বিকৃতির জন্য দায়ী ভট্ট, আচার্য্য ও মিশ্র নামক ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ। বর্ত্তমান সংস্কৃত-বিদ্ পণ্ডিতগণকে উহার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না।

ভারতীয় ঋষির অনন্যসাধারণ জ্ঞানের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, ভারতীয় দর্শন, বেদ ও পাণিনি ব্যাকরণের বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রথমতঃ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভারতীয় দর্শন, বেদ ও পাণিনির বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ যে ভ্রমাত্মক, তাহা উপলব্ধি করা সামান্য মাত্র বিবেচনা-শক্তি থাকিলে কঠিন হয় না।

নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী স্মরণ রাখিলেই ভারতীয় ঋষির গ্রন্থগুলি যে বিকৃতার্থে প্রচলিত, তাহা বুঝা যায়:—

(১) ভারতবর্ষের আর্থিক স্বাধীনতা যখন অনন্য-সাধারণ, তখন ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ অনন্যসাধারণ জ্ঞান ব্যতীত অনন্যসাধারণ সংগঠন সম্ভব হয় না।

(২) ভারতবর্ষের দর্শন ও বেদ যখন মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে, তখন উহার ভিতর মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা নিশ্চয়ই আছে। যে পুস্তকে মানুষের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা থাকে না, সেই পুস্তক যে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা নিজ নিজ জীবনকালে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের স্থায়িত্ব ও পরিণাম পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সংস্কৃত দর্শন ও বেদের যে সমস্ত টীকা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, তাহাতে মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। ঐ সমস্ত ভাষ্য মূল দর্শনের ও বেদের ভাষ্য বলিয়া প্রচলিত। উহাদের প্রচার দীর্ঘস্থায়ী হইলেও বিকৃত হইতে পারে, কারণ মূল দর্শনের ও বেদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ মানুষ তাহা বুঝিবার প্রকৃত সহায়ক কিছু না পাইলেও অর্থবোধক বলিয়া যাহা পায়, তাহারই ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ঐ ভাষ্যগুলি ঋষিদিগের মূল গ্রন্থের নামের সহিত জড়িত না

হইয়া স্বাধীন ভাবে প্রচলিত থাকিলে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যাইত।

(৩) প্রচলিত ভাষ্যের সাহায্যে মূল দর্শন অথবা বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিয়া যদি নিজেকে প্রশ্ন করা যায় যে, তদ্‌পাঠে মানুষের বাস্তব ও কাল্পনিক দুঃখ দূরীভূত করিবার সহায়ক কি শিক্ষালাভ করিলাম, তাহা হইলে কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে কি? যদি তাহা পাওয়া না যায়, তবে বুঝিতে হইবে, ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যানুসারে দর্শনসমূহ কতকগুলি অর্থহীন অসংলগ্ন কথার সমাবেশ, কিন্তু ভারতীয় মূল দর্শনে কেবল অর্থহীন অথবা অসংলগ্ন কথা থাকিতে পারে না। কাযেই প্রচলিত ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক।

আমাদের দুঃখ, বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্ দার্শনিকগণ বর্ত্তমান ব্যাখ্যার ভ্রমাত্মকতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং তাহারই জন্য সাধারণ কৃষক পর্য্যন্ত অর্থহীন কথা কহিতে যে কুণ্ঠা অনুভব করে, তাঁহারা অনর্গল সেই অর্থহীন কথা কহিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন না।

ডাঃ দাশগুপ্তের ইটালীর বক্তৃতা তাহার পরিচয়।

দাশগুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্যানুসারে "প্রাচীন ভারতীয়গণ বাস্তব ঘটনা কতখানি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত।" বাস্তব ঘটনা যে দর্শন-প্রণেতা প্রাচীন ভারতীয়গণ আমূল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার চূড়ান্ত সাক্ষ্য ভারতের অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা। ডাঃ দাশগুপ্ত যদি তাহা না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়ী ঋষিগণ নহেন, দায়িত্ব তাঁহার নিজের। বাস্তবিকই যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন যে, ভারতীয় দর্শন-প্রণেতাগণ বাস্তব ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা পর্য্যন্ত তিনি সঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি নিজেকে ভারতীয় দর্শনজ্ঞানসম্পন্ন মনে করেন কেন? এবং দর্শনের কথার অর্থহীন ঝঙ্কার দ্বারা দার্শনিকের অভিনয় করিয়া আরাধ্য ও পূজনীয় ঋষিদিগের অপমান সাধন করেন কেন? তিনি যে ভারতীয় ঋষিদিগের দর্শনে কিছুমাত্র প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার কথায় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় না কেন?

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের ধারণার মূল নীতি—

(ক) সহজাত জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা;

(খ) জড়পদার্থের সম্ভবপর গুণ সম্বন্ধীয় মানসিক অবাস্তব ন্যায়ের বিচার;

(গ) সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা কারণ নির্ণয়ের জন্য বিবিধ ঘটনা বা কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা।"

(খ) ও (গ) লিখিত কথা তিনি ভারতীয় কোন্ দর্শনের কোন্ সূত্র হইতে পাইয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে জানাইবেন কি? এই সমস্ত কথায় কি প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগ কি করিয়া করিতে হয় তাহা তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার (খ) ও (গ) লিখিত কথা অর্থহীন, কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না এবং তাহা আকারান্তরে স্থান পাইয়াছে তথাকথিত পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের দর্শনে। ভারতীয় দর্শনে ঐ জাতীয় কথা কোথায়ও পাওয়া যাইবে না।

ভারতীয় ঋষিদিগের নির্দ্দেশানুসারে জ্ঞানলাভ করিবার পদ্ধতি মূলতঃ চারিটী—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, এবং (৪) শব্দ। এতদতিরিক্ত যে সমস্ত উপায়ের কথা দর্শনের কথা বলিয়া প্রচারিত, তাহা ভাষ্যকারদিগের কথা। মূল সূত্রে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কোন কোন ঋষি উপমান ও শব্দকে পৃথক পদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ চারিটী পদ্ধতি যে বাস্তব ও প্রয়োগসাধ্য, তাহা 'প্রত্যক্ষ' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঋষিদিগের উপদেশানুসারে সহজাত জ্ঞান হইতে সাধারণতঃ 'কামের' এবং 'সঙ্কল্প ও বিকল্পের' অথবা 'কল্পনার' উদ্ভব হয়। 'কাম' এবং 'সঙ্কল্প' পরিত্যাগ না করিতে পারিলে কোন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না এবং তাহা কি করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায়—তাহার নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশ ভারতীয় দর্শনে বহু স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে।

সহজাত জ্ঞানের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া এবং কল্পনাবলম্বী না হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা—ভারতীয় ঋষিদিগের উপদেশ। অথচ ডাঃ দাশগুপ্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, 'সহজাত জ্ঞান, অন্তর্দ্দৃষ্টি এবং কল্পনা' প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের ধারণার মূল নীতি!

'অন্তর্দ্দৃষ্টি' বলিতে ডাক্তার দাশগুপ্ত কি বুঝেন এবং তাহার প্রয়োগ কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয় অন্তর্দ্দৃষ্টি একটী অর্থহীন শব্দ এবং অন্তর ও দৃষ্টির পৃথক পৃথক ভাবে যে অর্থ হয়, তদ্বারা অন্তর্দ্দৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝা সম্ভব, তাহার কোন প্রয়োগ কার্য্যতঃ হইতে পারে না।

'সহজাত জ্ঞান' এবং 'কল্পনা' হইতে যে জ্ঞান হইতে পারে, তাহা ভারতীয় ঋষি তাঁহাদের মূল সূত্রে কুত্রাপি বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বরং জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিপরীত নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

সহজাত জ্ঞান এবং কল্পনা হইতে প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে, ইহা ভ্রান্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকের কথা। ডাঃ দাশগুপ্ত "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইলেন কেন?

ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতানুসারে ইউরোপীয় 'Science' শব্দটীর নিজস্ব একটী অর্থ-প্রকাশক ইতিহাস আছে। 'Science' শব্দটীর পরিষ্কার অর্থ ইউরোপীয় কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহা তিনি দয়া করিয়া দেখাইয়া দিবেন কি? যদি তিনি তাহা না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতার এই অংশ ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতার এবং তৎপ্রতি অযথা ভক্তির পরিচায়ক বলিয়া লোকে যদি মনে করে, তবে কি নিতান্ত অন্যায় হইবে?

তাঁহার মতে 'বিদ্যা' ও 'প্রকৃত জ্ঞান' একার্থ-প্রকাশক। 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্ঞান' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তদনুসারে বস্তুকে বুঝিবার উদ্দেশ্যে যে প্রযত্ন, তাহার ফলে মানুষ যাহা লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম জ্ঞান। আর বিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি—বিদ্+য(ক্যপ)—ণ আপ্। তদনুসারে 'বিদ্যা' শব্দ বলিতে বুঝায়, 'যাহার দ্বারা বস্তুকে অর্থাৎ বস্তুর ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা যায়।' 'জ্ঞানের' ফলে 'বিদ্যা' লাভ হয়, আবার বিদ্যার সহায়তায় জ্ঞানলাভ হয়। 'জ্ঞান' 'বিদ্যা'র কারণ হইতে পারে, আবার 'বিদ্যা'ও 'জ্ঞানে'র কারণ হইতে পারে এবং সাধারণ লোক এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝিয়া জ্ঞান এবং বিদ্যাকে একার্থে প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক এবং সংস্কৃতভাষাবিদ্ যে কি করিয়া 'বিদ্যা' ও 'জ্ঞান' একার্থে ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডাঃ দাশগুপ্ত ছাড়া অন্যান্য তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যেও 'অবিদ্যা' ও 'অজ্ঞান' একার্থে ব্যবহারের পরিচয় আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যে পণ্ডিত 'অবিদ্যা' ও 'অজ্ঞান' একার্থ-বোধক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি যে মূল সূত্রের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যবহারোপযোগী কার্য্য-নির্দ্দেশক হয় নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ভারতীয় দর্শনে 'জ্ঞান' কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা এবং তাহা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধীয় কথা যে অতি পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

অথচ ডাঃ দাশগুপ্ত বলিতেছেন, "পিণ্ডীভূত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা এবং সহজ বোধশক্তির সহায়তায় বাস্তবতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রকৃত জ্ঞান"।

ডাঃ দাশগুপ্ত 'প্রকৃত জ্ঞানে'র এই সংজ্ঞা ভারতের কোন্ দর্শনে পাইয়াছেন? তাঁহার এই সংজ্ঞা অর্থহীন নহে কি? "পিণ্ডীভূত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা" বলিতে কি বুঝায়? তিনি যখন 'আভ্যন্তরীণ' অভিজ্ঞতার নাম করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই 'বাহ্যিক' অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা কিছু বস্তু আছে। অভিজ্ঞতা বুদ্ধির কার্য্য। তাহা আভ্যন্তরীণ না হইয়া বাহ্যিক হয় কিরূপে? 'জ্ঞানে'র সংজ্ঞা বলিতে গিয়া "......অভিজ্ঞতা...সহায়তায় বাস্তবতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান..." উহা বলা আর কিছু না বলা একই কথা নহে কি? 'জ্ঞান' কি তাহা না বুঝিতে পারিলে 'অভিজ্ঞতা' কি তাহা বুঝা সম্ভব কি?

ডাঃ দাশগুপ্তের কথানুসারে "যে সমস্ত পুস্তকে বিভিন্ন বিদ্যা কাল্পনিক অথবা ব্যবহারিক ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাদিগকে 'শাস্ত্র' বলা হইত।"

'বিদ্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা থাকিলে এবং ঐ অর্থের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা থাকিলে 'বিদ্যা' কখনও কাল্পনিক (theoretical) হইতে পারে তাহা মনে করা যায় কি? "কাল্পনিক ভাবে বিদ্যার বর্ণনা", এবংবিধ বাক্য ব্যবহারে

বালকোচিত চিন্তাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিপর্য্যয়' ও 'বিকল্প' মানুষের 'প্রবৃত্তিগত' হইতে পারে, কিন্তু 'জ্ঞান' অথবা 'বিদ্যা'গত হইতে পারে না—ইহা ডাঃ দাশগুপ্ত বুঝিতে পারিবেন কি? শব্দের এবংবিধ লঘু ব্যবহার দর্শনালোচনা-ক্ষেত্রে বালক-স্বভাবের পরিচায়ক নহে কি?

'শাস্ত্র' ও 'গ্রন্থ' শব্দ তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্গণ বহুদিন হইতেই লঘু ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কাযেই 'শাস্ত্র' শব্দের লঘু ব্যবহারের জন্ম আমরা ডাঃ দাসগুপ্তের স্কন্ধে দায়িত্ব চাপাইব না। 'গ্রন্থ' বলিতে বুঝায় তাহা, যাহা বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের গ্রন্থি (interlinking or correlating) বুঝিবার সহায়তা করে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে ভারতীয় দর্শনের পুস্তকগুলি ও 'মহাপুরাণ'গুলি 'গ্রন্থ'।

'শাস্ত্র' বলিতে বুঝায় তাহা, যাহা মানুষের চলা-ফেরার নির্দ্দেশ প্রদান করে। বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের গ্রন্থি অবগত হইতে পারিলে কিরূপ ভাবে মানুষের চলাফেরা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। কাযেই 'গ্রন্থের' উদ্ভব না হইলে 'শাস্ত্রে'র উদ্ভব হয় না। তদনুসারে একমাত্র 'সংহিতা'গুলিকে শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। যাহা বস্তুর বিকাশ অথবা উদ্ভব সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করে, তাহার নাম 'সংহিতা', ইহাই সংহিতা-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। বস্তুর বিকাশ অথবা উদ্ভব রক্ষা না করিয়া যে আচরণ-পদ্ধতি বস্তুর কার্য্যক্ষমতা অথবা অস্তিত্ব-বিনাশের সহায়তা করে, সেই আচরণ-পদ্ধতিকে সংহিতা-নির্দ্ধারিত বলিয়া প্রচার করা, প্রকৃত সংহিতা না বুঝিবার এবং তাহার অবমাননা করিবার পরিচয়—ইহা আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ বুঝিবেন কি?

ডাঃ দাশগুপ্তের 'ব্রহ্মবিদ্যার' জ্ঞান যে অগাধ, তাহা তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশ্য আমাদের সকলেরই 'ব্রহ্মবিদ্যা'র জ্ঞান যে অগাধ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মবিদ্যা বুঝা যে কত কঠিন এবং সাধনাসাপেক্ষ, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারা এবং অভিমান ত্যাগ করা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বুঝা হয় নাই, ইহা বুঝাই ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয়। আমাদের দুঃখ যে ডাঃ দাশগুপ্ত তাহা পর্য্যন্ত না বুঝিয়া ভারতীয় দার্শনিক নামে নিজেকে ভিন্ন দেশে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন এবং নানা রকমে অপরের নিকট ভারতীয় ঋষির এবং ভারতবর্ষের অপমান সাধন করিয়াছেন।

'সর্ব্বোচ্চ বাস্তবতা' শব্দটী দাশগুপ্ত মহাশয় ব্যবহার করিয়াছেন। 'বাস্তবতার' সর্ব্বোচ্চতা ও সর্ব্বনিম্নতা কি, তাহা ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় বুঝাইয়া দিবেন কি?

বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদ আরোপের দায়িত্ব ডাঃ দাশগুপ্তের নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের যে পরমাণুবাদ ডাঃ দাশগুপ্ত বিলাইয়া আসিয়াছেন, তাহা এই দুইটী দর্শনের কোন্ কোন্ সূত্র হইতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ভক্তিভাজন দাশগুপ্ত মহাশয় বুঝাইয়া দিবেন কি?

মোটের উপর ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতায় যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহা অনন্যসাধারণ। এতাবৎ আমরা ঋষিদিগের দর্শনের মূল সূত্রের ব্যাখ্যায় বিকৃতি দেখিয়াছি। ঐ বিকৃতি আমাদের নিজস্ব। উহা কাহারও নিকট ধার করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথায় আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্গণের বিকৃত দর্শনব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভ্রমাত্মক কথা ভারতীয় দর্শনের কথা বলিয়া প্রচার করিবার পরিচয় বোধ হয় এই প্রথম।

ভারতীয় দর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে চিন্তাশীলতার প্রয়োজন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দর্শনাধ্যাপকের সামান্য মাত্রায় পর্য্যন্ত নাই, ইহা দ্বারা কি লোকে তাহাই বুঝিবে না?

এবংবিধ দার্শনিকগণই যে ভারতের এবং ইউরোপের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, তাহা আমরা আগামী বারে দেখাইব। ইহা ছাড়া এই জাতীয় দার্শনিক ও দর্শন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি তাহারও আলোচনা করিব।

শিক্ষা

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যার প্রকাশ-কাল হইতে শিক্ষাবিষয়ে যেসব সংবাদ দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিলে, বাঙ্গালা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তাহার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষাবিষয়ক যে সমস্ত ঘটনা এই সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছে তাহা হইতে যে সব নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলি এই :—

(১) কি কি বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত দৃষ্টির এবং তৎসম্বন্ধে আমূল চিন্তাশক্তির অভাব।

(২) প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতিতে যে দোষ আছে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলেও কি করিয়া তাহা দূর করিতে পারা যায়, তন্নির্দ্ধারণে অক্ষমতা।

(৩) স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অথচ স্ত্রীশিক্ষা কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা।

(৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের 'বিদ্যা' কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব।

(৫) বাঙ্গালার তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্‌গণের 'পণ্ডিত' কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, অথচ নিজদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া আখ্যাত করা।

(৬) অতি সাধারণ বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী যে কাহাকে কাহাকেও 'বিদ্বান' বলিয়া আখ্যাত করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত।

মাদ্রাজ প্রদেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশগুলি পাওয়া যায় :—

(১) জনসাধারণের সহ-শিক্ষার প্রতি বিরক্তির উন্মেষ।

(২) আইন-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

(৩) শ্রমসাধ্য নিয়মমূলক শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা, অথচ তৎসম্বন্ধে আমূল চিন্তাশক্তির অভাব।

আর বোম্বাই প্রদেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ—

(১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা।

(২) বিবিধ গবেষণা বিস্তারের প্রযত্ন।

মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাস –

(১) ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সজাগতা এবং ঐ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ।

(২) মুসলমানদিগের শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাষ—

(১) কংগ্রেস-মহলে দেশসেবায় গোঁড়ামির অস্তিত্ব।

ইউরোপে শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আভাস—

(১) ইউরোপীয়দিগের কাহারও কাহারও মতে প্রদর্শনী ও সিনেমা শিক্ষাবিস্তারের উপায়।

(২) প্রস্তরফলক ও নরকঙ্কাল দ্বারা ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব বলিয়া ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস।

(৩) ইউরোপীয়গণের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাগবত তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা।

(৪) শরীরতত্ত্ব বিদ্যার চর্চ্চা এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ব জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞতা।

(৫) ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের অনুসন্ধিৎসা এবং তৎসম্বন্ধে ভারতীয় তথাকথিত পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা এবং তাঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকৃত প্রচার।

(৬) ইউরোপীয়গণের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

(৭) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অবিকৃত জিনিষকে বিকৃত করা এবং 'কুজ্ঞান'কে 'বিজ্ঞান' বলিয়া প্রচার করা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে। বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এই নূতন পদ্ধতি মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক ছাত্রকে ইতিহাস ও ভূগোল ভাল করিয়া পড়িতে হইবে, এই দুইটি বিষয়ই অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে; প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়েও তাহাকে পাশ করিতে হইবে।

এই নব পদ্ধতিতে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে। অবশ্য ইংরাজী ভাষাজ্ঞান হইতেও ছাত্রগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কি কি বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, গভর্ণমেণ্ট যে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন—ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ইতিহাসের পুস্তকগুলির পরিবর্ত্তনের নীতি স্থির না করিয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া, ঐ পুস্তকগুলিকে ছাত্রদিগের ইতিহাস-শিক্ষার পুস্তক বলিয়া ব্যবহার করা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের তৎসম্বন্ধে আমূল চিন্তাশক্তির অভাবের পরিচায়ক।

মানুষের জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি এবং কর্ম্মের সহিত তাহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় অবস্থা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বীয় দৈনন্দিন কার্য্য পরীক্ষা করিতে শিখিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। জাতীয় জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জাতীয় অবস্থার কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। যে ইতিহাস ঐ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়, সেই ইতিহাস মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, উন্নতিসাধক এবং অবশ্যপাঠ্য। মানুষের জ্ঞানের, কর্ম্মশক্তির এবং কর্ম্মের কোন্ অবস্থা হইতে তাহার সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন্ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সে ইতিহাস কখনও ভ্রান্তিহীন ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। একই ঘটনা যে বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানসম্পন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং যিনি কার্য্যকরণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তিনি সত্য বলিতে চেষ্টা করিলেও আসল ঘটনার ভিতর যে কি সত্য আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার বর্ণনায় প্রকৃত সত্যের যে প্রচার হয় না, তাহা আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

কার্য্য ও কারণের সামঞ্জস্য বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সেই ইতিহাস ইতিহাস-নামের কলঙ্ক হইয়া পড়ে; তাহা পড়িলে মানুষের কুজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এবং মানুষকে তাহা বিকৃত পথে চালিত করে। কাজেই ঐ জাতীয় ইতিহাস যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের হস্তে না পড়ে, তাহা সর্ব্বথা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে ইতিহাস বলিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই যে কার্য্যকারণ বিচার করিয়া লিখিত হয় নাই তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তকে চিন্তার খাদ্য আছে। ঐ পুস্তকগুলি ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণের দ্বারা লিখিত। যাঁহারা ঐ পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং ছাত্রভাবে কার্য্যকারণ বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের লেখায় পরিস্ফুট। যে সমস্ত ইতিহাস অধুনা ছাত্রদিগের মধ্যে পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহার মূল সাধারণতঃ ঐতিহাসিক "পণ্ডিত"গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ কার্য্যকারণ আমূলভাবে বিচার করেন না। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই বর্ত্তমান নিয়মানুগতার পদ্ধতি অনুসারে আমাদের মত জনসাধারণ মানিয়া লইতে বাধ্য।

বোধ হয় এই কারণে ভারতীয় ঐতিহাসিক "পণ্ডিত"গণ ইতিহাস বলিয়া যাহা আমাদিগের ছাত্রদিগের মধ্যে বিলাইতেছেন, তাহার ভিতর প্রায়শঃ কার্য্যকারণের কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং তাহা আমাদিগের যুবকবৃন্দের বিপথগমনের সহায়তা সাধন করিতেছে। যদি কখনও প্রকৃত ইতিহাস অনুমান করা সম্ভব হয়, তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে, ভারতবর্ষের ও ইউরোপের এবং বৈদিক ও মুসলমান সভ্যতার ইতিহাসে কত বিকৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত, তাঁহাদের ভিতর ছাত্রত্ব লুপ্ত হইয়া তথাকথিত পাণ্ডিত্যের বিকাশ হওয়ায় আমাদের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার জন্য ইউরোপীয়গণ দায়ী নহেন, কারণ বৈদিক জ্ঞান কতখানি ছিল এবং মুসলমানগণ তাহা কতদূর রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নহে। তাহা বুঝা সম্ভব ভারতীয়গণের, কিন্তু ভারতীয়গণের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত,

তাঁহারা প্রায়শঃ "পণ্ডিত" না হইয়া পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত হওয়ায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা কি, কি করিলে বাঙ্গালা ভাষা প্রয়োজন-সাধক হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ না করিয়া এবং বাঙ্গালা ভাষার তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া, উহাকে শিক্ষার বাহন করা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তাহীনতার অন্যতম পরিচয়।

ভাষার উদ্দেশ্য নিজ মনোভাব ব্যক্ত করা এবং পরের মনোভাব বুঝা। নিজ সাধারণ মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কোন ভাষা গঠনের প্রয়োজন হয় না, কারণ ভগবানই প্রত্যেক মানুষকে একটা প্রাকৃতিক ভাষা দিয়া থাকেন। যে সমস্ত অবস্থা বাস্তবিক পক্ষে ঘটিয়া থাকে, অথচ সাধারণ মানুষ তাহা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষাগঠনের প্রয়োজন হয়। ভাষা-বিজ্ঞানের সমঞ্জসীভূত ভাষা এবং তাহার জ্ঞান না থাকিলে পরের মনোভাব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝা কখনও সম্ভব হয় না। অবশ্য বিজ্ঞানের সমঞ্জসীভূত ভাষা বর্ত্তমান জগতে নাই, তজ্জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালা বলিয়া যে ভাষা চলিতেছে, তদ্দারা প্রায়শঃ গ্রন্থকারের মনোভাব সঠিক বুঝিতে পারা যায় না এবং বস্তুর সর্ব্ববিধ অবস্থাও প্রকাশ করা যায় না। এই ভাষাকে বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন হইতে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া—ঐ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ফলে, আমাদের বাঙ্গালীর শিক্ষা আরও বিকৃত হইয়া যাইবে, ইহা আশঙ্কা করিয়াই আমরা গভর্ণমেণ্টের উপর চিন্তাহীনতার দায়িত্ব আরোপ করিতেছি।

যে সমস্ত গ্রন্থকারের পুস্তক মানুষের অবোধ্য, অথবা যাঁহাদের রচিত চিত্র মানুষের চরিত্রগঠনের বিরোধী, তাঁহারা বিবিধ উপায়ে আত্ম-বিজ্ঞাপনের ফলে "কবি-সম্রাট" এবং "সাহিত্য-সম্রাট" বলিয়া আখ্যাত হইলেও প্রকৃত শিক্ষালয়ে যাহাতে তাঁহাদের রচনার কোন স্থান না হয়, তাহার চেষ্টা না করিলে গভর্ণমেণ্টের চিন্তাশক্তির অভাবই সূচিত হয় না কি? গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা মনোভাব বোধগম্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তদপেক্ষা বেশী চেষ্টা হইয়াছে ভাষা দ্বারা মনোভাব অবোধ্য করিবার এবং যাঁহারা তাহার সারথ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অধিক পরিমাণে আদর লাভ করিয়াছেন। জনসাধারণ তাহা পছন্দ করেন না, অথচ তাহা মুখ ফুটিয়া কি করিয়া বলিতে হয় তাহাও জানেন না। জনসাধারণ যে তাহা পছন্দ করেন না, তাহার পরিচয় ঐ বিকৃত গ্রন্থকারগণের বিক্রীত গ্রন্থের সংখ্যা। শিক্ষিত লোকের বর্ত্তমান সংজ্ঞানুসারেও বাঙ্গালায় অন্ততঃ পক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ শিক্ষিত লোক আছেন। একখানি পুস্তক দশ জন লোক পড়িবেন ধরিয়া লইলেও—যে পুস্তক জনসাধারণের আদৃত, তাহার সাড়ে তিন লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা বর্ত্তমানে "কবি-সম্রাট" অথবা তৎসদৃশ বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের কয়জনের কয়খানি গ্রন্থ সাড়ে তিন লক্ষ ত' দূরের কথা, সাড়ে তিন হাজার বিক্রীত হইয়াছে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, জনসাধারণ আর্থিক অভাব বশতঃ পুস্তক কিনিতে পারেন না। কিন্তু লোকের যে অর্থাভাব, তাহারও পরোক্ষ কারণ এই বিকৃত শিক্ষা এবং বিকৃত পুস্তক। বস্তুতঃ জনসাধারণ কি পছন্দ করেন, অথবা পছন্দ করেন না, তাহা গভর্ণমেণ্ট জানিবার সুযোগ পান না এবং তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ যথাযথ চিন্তা করেন না এবং তাহারই জন্য গভর্ণমেণ্ট লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিয়াও এতাবৎ ভারতবাসীর অপ্রিয়ই হইয়া আসিয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার

বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক ও মধ্য-শিক্ষাপদ্ধতিতে যে বহু দোষ-ত্রুটী আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার সেইগুলির প্রতি অবহিত হইয়াছেন। সরকার শিক্ষাপদ্ধতি ঢালিয়া সাজিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই সরকার এই নূতন পদ্ধতি প্রকাশ করিবেন।

আগামী শীত ঋতুতে, কলিকাতায় একটি "শিক্ষা-সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের এক সভাধিবেশনের ব্যবস্থাও হইতে পারে।

প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতির দোষ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে অনেকাংশ সচেতন, ইহা তাহার পরিচয়।

কিন্তু শিক্ষার 'বিষয়' কি হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ না করিয়া শিক্ষাসংস্কার করিলে শিক্ষাপদ্ধতি কখনও দোষশূন্য হইবে না এবং তাহা গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতার পরিচায়ক হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা

বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা যে শিক্ষাগ্রহণে যত্নবতী হইয়াছেন, স্কুল-কলেজের ছাত্রীসংখ্যার আধিক্য দেখিলে তাহা স্বতঃই মনে হয়।

১০ বৎসর আগে, বাঙ্গালাদেশের সমস্ত কলেজে আড়াই শতের অধিক ছাত্রী ছিলেন না। আজ ন্যূনপক্ষে এক সহস্র তরুণী উচ্চশিক্ষা লাভাশায় কলেজে পড়িতেছেন। বার তের বৎসর পূর্ব্বে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে হাজার মেয়ে ছিলেন ; ১৯৩৩ সালে তাঁহাদের সংখ্যা চার সহস্রে দাঁড়াইয়াছে।

ইহা তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরিচয় বটে। কিন্তু আমাদের দুহিতা ও ভগ্নিগণ বি-এ ও এম-এ উপাধি লাভ করিয়া সংসারের স্ত্রীজনোচিত কর্ত্তব্য কতটুকু সাধন করিয়াছেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন কি? দেশের পতন যখন পুরুষেরাই পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি হইয়া বিন্দুমাত্রও অবরোধ করিতে পারেন নাই, পরন্তু অজ্ঞাতভাবে তাহার সহায়তাই করিতেছেন, তখন স্ত্রীলোকদিগকে বি-এ, এম-এ পাশ করাইবার যৌক্তিকতা কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ করিয়াছেন, ভাইস-চ্যান্সেলারের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের নিকট হইতে ৩৮০,০০০ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে ; আপাততঃ আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, কিন্তু নানা দিক দিয়া আয়বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগমন পুরামাত্রাতেই চলিতে থাকে, ইহাই আমাদের কাম্য। আমাদের কাছে অনেক সংস্কার প্রস্তাব আসিয়াছে, সেগুলি বিবেচনাধীন, কাজে লাগাইতে গেলেই টাকার দরকার।

"এ কথা আমি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীর জোর সরকারও যে না বুঝিয়াছেন তাহা নহে ; এবং সেই জন্যই আগামী বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সন্তোষজনক একটা মীমাংসা হইবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

"বিদ্যা" কাহাকে বলে, তাহার ধারণা পর্য্যন্ত যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নাই, ইহা তাহারই পরিচয়। লোকে "বিদ্যা" শিক্ষা করে স্বীয় অভাব দূর করিবার জন্য। যে "বিদ্যা" শিক্ষা করিলে লোক স্বীয় অভাব দূর করিতে পারে না, সেই বিদ্যা অর্থহীন নহে কি? যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বদা নিজেরই এত অভাব এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক বহু টাকার দান পাইয়াও সতত অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয়, সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অভাব দূর করিবার "বিদ্যা" প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কি? বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এতাবৎ মানুষ স্বীয় অভাব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষাই পাইয়াছে, অভাব দূর করিবার কোন শিক্ষা পায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য যে গত ৩০ বৎসর হইতে বাঙ্গালার এবং পরোক্ষভাবে সারা ভারতের সর্ব্বনাশ-সাধক হইয়া আসিতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কবে বুঝিবেন? গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাহার চেষ্টা করিলেই প্রকৃত বিদ্যা বিতরণের সহায়তা করিবেন, তাহা আমাদের নবীন ভাইস-চ্যান্সেলার বুঝিতে পারিবেন কি?

ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল

ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে—

বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত দর্শন প্রভৃতির অত্যন্ত দুরবস্থা। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ও ছাত্রদেরও শোচনীয় অবস্থা। অন্যে পরে কা কথা, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাও এই আর্য্যঋষিবন্দিত সংস্কৃত ভাষাকে অচল ভাষা নামে অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন না। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত ভাষা বা দর্শনের কোনরূপ সংস্কার বা উন্নতি করা সম্ভব নহে, দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ও ছাত্রগণও এইরূপ অশ্রদ্ধেয় কথা প্রচার করিয়া চলিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রাদির অনুশীলনে প্রবৃত্ত পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীগণকে অর্থসাহায্য দিবার লোক ক্রমেই বিরল হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এমন অবস্থাও আসিতে পারে, যখন সংস্কৃত ভাষানুশীলনে প্রবৃত্ত হইবার লোকই পাওয়া যাইবে না।

সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাঁহারা এই দেবভাষা রক্ষার ও পুষ্টির কামনা করেন, তাঁহাদিগকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে এবং সংস্কৃত ভাষার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে অবহিত হইতে হইবে।

ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষার ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে লইয়া এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সংস্কৃতবিদ্ যদি নিজেকে "পণ্ডিত" বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি সংস্কৃতবিদ্ নহেন এবং "পণ্ডিত" শব্দের অর্থবোধ তাঁহার নাই। যিনি যাবতীয় বস্তুর 'স্পর্শ' কি, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যেক বস্তুর এবং তাহার অবস্থার সম্পূর্ণ ভ্রমবিহীন জ্ঞান লাভ করিতে এবং তাহা সাধারণকে বুঝাইবার মত ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার নাম পণ্ডিত—ইহা পাণিনিদেবের নির্দ্ধারণ অনুসারে "পণ্ডিত" পদটীর শব্দগত অর্থ। পাণিনি দেবের নির্দ্ধারণ অনুসারে "পণ্ডিত" পদটীর যে এই অর্থ হয়, তাহাও বর্ত্তমান পণ্ডিত-দিগকে বুঝান সম্ভব নহে। পাণ্ডিত্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয় ও মনের দমন সাধন করিতে হয়। বস্তুকে বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের উদ্ভব না হইলে ইন্দ্রিয়

ও মনের দমন সম্ভব নহে। ইন্দ্রিয় ও মনের দমন করিতে হইলে প্রথমতঃ বুদ্ধিমান হইতে হয়। ইহারই জন্য ব্যাসদেব তাঁহার গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে "পণ্ডিত" কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার আগে "বুদ্ধিমান" কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়াছেন।

ব্যাসদেবের নির্দ্দেশানুসারে বুদ্ধিমানের লক্ষণ—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥
(গীতা. ৪র্থ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)

পণ্ডিতের লক্ষণ—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ।

উপরোক্ত নির্দ্দেশানুসারে যে দেশে একটী পণ্ডিত থাকেন, সে দেশের জনসাধারণের কোনরূপ দুঃখ দৈন্য থাকিতে পারে না। এই ভারতবর্ষে ব্যাসদেব-নির্দ্ধারিত লক্ষণসম্পন্ন বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বজনা-কাঙ্ক্ষিত অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। এক সময়ে প্রকৃত পণ্ডিতের দ্বারা দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং সমগ্র জগৎ ভারতবর্ষের আদর্শ ও নির্দ্দেশ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। এই পণ্ডিতগণের কার্য্যক্ষমতার ফলে ভারতবর্ষের উন্নতি এত দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, তাহা বিনষ্ট হইতেও তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল লাগিয়াছে। প্রকৃত পণ্ডিত যদি গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে একজনও জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না; পরন্তু ভারতবর্ষের অবনতি বহুদিন আগে অবরুদ্ধ হইত।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে প্রকৃত লক্ষণসম্পন্ন কোন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন নাই। বরং পণ্ডিতাখ্যাত ব্যক্তিগণ গত তিন হাজার বৎসর হইতে ভারতীয় দর্শন বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে কতকগুলি কাল্পনিক কথার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে জগতের পূজনীয় ঋষিদিগের হত্যাসাধন করিয়াছেন। এখনও এই পণ্ডিতাখ্যাধারী লোকগুলি প্রায়শঃ ঋষিদিগের 'ঘাতক'তার কার্য্যেই লিপ্ত আছেন। সাধারণতঃ ইহাঁদের বুদ্ধি এত বিকৃত হইয়াছে যে, ইহাঁরা যে আমাদের প্রাণের দেবতাগণের হত্যাকারী, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট ইংরাজের হাতে। ইংরাজ ইহাঁদের অপরাধ কত গুরু তাহা বুঝিতে পারেন না। তাই লোকতঃ ইহাঁদের কোন শাস্তি হয় নাই। কিন্তু ভগবান ইহাঁদের শাস্তি ঠিকই দিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকার উপায়ান্তর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ইহাঁদের বংশ অনেক স্থলে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইহাঁরা নিরন্ন ভিক্ষুক হইয়া পড়িতেছিলেন।

ইহাঁদের লজ্জা নাই। তাই ভারতীয় ঋষির রচিত এত বড় ভারতবর্ষের এত বড় অনিষ্ট সাধন করিয়াও নিজদিগকে "পণ্ডিত" বলিতে কুণ্ঠিত হন না।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ "পণ্ডিত" বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝেন না বলিয়াই ইহাঁদিগকে "মহামহোপাধ্যায়", "পণ্ডিত" বলিয়া সম্মানিত করেন। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র তথাকথিত সংস্কৃত ভাষা—এবং বিকৃত স্মৃতির কয়েকটি নির্দ্দেশ টিয়াপাখীর মত উচ্চারণ করিতে পারিলেই "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিলাভ করা যায়। ঋষিদিগের নির্দ্দেশানুসারে 'জ্ঞান' লাভ করিতে না পারিলে "পণ্ডিত" হয় না এবং 'দর্শন' না পড়িলে জ্ঞান হয় না। 'ভাষা' দর্শন-শিক্ষার উপায় হইতে পারে, কিন্তু শুধু ভাষা শিখিলেই দর্শনের শিক্ষালাভ করা হয় না। যাঁহারা কোন দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে মহা-মহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা কি, যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের উপাধি-বিতরণের পরামর্শদাতা, তাঁহাদিগের "পণ্ডিত" শব্দের প্রকৃত অর্থের অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?

কি করিলে নিজের অথবা নিজ আত্মীয়-স্বজনের উন্নতি সাধন হইতে পারে, বর্ত্তমানে তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, এমন লোক বেশী আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

অন্যান্য প্রদেশ এবং ইয়োরোপে শিক্ষা সম্বন্ধে এই সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহারও বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের কথার সার্থকতা দেখান যায় স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা করিতে পারিলাম না।

মোটের উপর শিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বলিতে হয়, জনসাধারণ বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উপর বিরক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা শিক্ষার পরিবর্ত্তন চাহেন। আমাদের ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও শিক্ষাবিস্তার যাহাতে হয়, তাহার জন্য বরাবর

তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা বলেন যে, ইংরাজ আমাদিগকে অমানুষ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথার যৌক্তিকতা আমরা বুঝিতে পারি না। ইংরাজ তাঁহার নিজের দেশে যে শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ইংরাজ ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন, ততদিন আমাদের দেশে সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন না করিলে আমরা ইংরাজকে দায়ী করিবার যুক্তি বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, ইংরাজ তাঁহার নিজের দেশে যে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, সেই শিক্ষাই আমাদের দেশেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন ইংরাজকে দোষ দেওয়া যায় না।

বস্তুতঃ ইয়োরোপীয়গণ প্রকৃত শিক্ষা কি এবং তাহার পদ্ধতিই বা কি তাহা অদ্যাবধি পরিজ্ঞাত নহেন। তাহারই জন্য তাঁহাদের আজও পর্য্যন্ত আর্থিক পরাধীনতা এবং নিজেদের মধ্যে এত মারামারি, কাটাকাটি।

প্রকৃত শিক্ষা কি এবং তাহার পদ্ধতি কি, তাহা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ জানিতেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। দেশীয় লোকের তাহা বুঝা যত সহজ, বিদেশীয়ের পক্ষে তাহা বুঝা তত সহজ নহে। কাজেই আমাদিগের শিক্ষার বিকৃতির জন্য দায়ী আমরা নিজেরা।

প্রথমতঃ যাঁহারা সংস্কৃতবিদ্ 'পণ্ডিত' বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন, তাঁহাদের উপাধ্যায়গণ আমাদিগের শিক্ষার বিকৃতি সাধন করিয়াছেন। সেই বিকৃতির ফলে জনসাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজের জ্ঞানপিপাসার ফলে তাঁহাদের সংসর্গে আমরা পুনরায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কি, ইংরাজের সে জ্ঞান না থাকায় আমাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। শুধু আমাদের কেন, সারা জগতেই প্রকৃত শিক্ষা কি তাহার জ্ঞান নাই। তাহারই জন্য সারা জগতে হাহাকার উঠিয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষার উদ্ভব না হইলে এই হাহাকার কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। "প্রকৃত" শিক্ষা নাই বলিয়া বর্ত্তমান ইংরাজগণ বর্ত্তমান বিপদের গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না। ভ্রান্ত অর্থনীতির অনুরক্ত, ভ্রান্ত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্গণ 'ভিতরে ক্ষত রাখিয়া উপরে তাহা শুষ্ক হইয়াছে', ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু ক্ষত একেবারে বিদূরিত না হইলে ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ক্ষত একেবারে বিদূরিত করিতে হইলে প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহা আগে জানিতে হইবে এবং তাহার পর ইংলণ্ডে এবং এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

প্রকৃত শিক্ষা কি এবং কি ভাবে তাহা কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি এবং তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে বলিব।

দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

কলিকাতা কেওড়াতলায় যে স্থানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শেষকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, গত ১লা আষাঢ় সেই স্থানে তাঁহার চিতার উপর

দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির [শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

একটি স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> দেশবন্ধুর জীবনে আমরা যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, সেই সকল গুণ যদি আমরা আমাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইল।

রবীন্দ্রনাথও এই উপলক্ষ্যে একটি কবিতা রচনা করেন।

সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন—স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশবন্ধু যেন আমাদের মনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন।
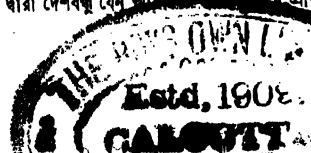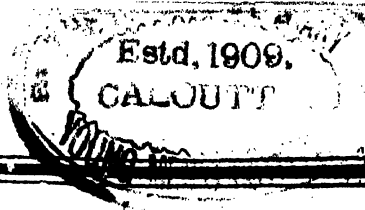
শিক্ষা

পঁচিশ বৎসরের উন্নতি

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রজত জুবিলি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বিলাতে, কেনসিংটনের বিজ্ঞান-গবেষণাগারে একটি প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের পঁচিশ বৎসর রাজত্বকাল মধ্যে বিজ্ঞানবিভাগে যে সমস্ত গবেষণা ও আবিষ্কারাদি হইয়াছে, তাহা দেখানই এই প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশন, যান-বাহন, বায়ুরথ, ডুবো জাহাজ ও জ্যোতিষ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়সমূহের বিশিষ্ট উন্নতিগুলি লোকসমক্ষে ধরাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কে?

ম্যাসাচুসেট্সের, য়ারমুথ বন্দরে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত একখানি প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত রেখাবলী পরীক্ষা করিয়া, ওয়াশিংটনের প্রোফেসর ওলাফ ষ্ট্রাওওল্ড বলিতেছেন, কলম্বাসের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নর্স জলদস্যুগণ আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছিল।

ভারতের ইতিহাস

পুণায় একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গভর্ণর প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান দলিল-পত্রাদি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি দুই ভাগে বিভক্ত।

ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডল-ভবনে প্রদর্শনীর যে বিভাগটি রক্ষিত, তথায় বহু দলিল, প্রাচীন চিত্র, মুদ্রা, অলঙ্কার, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও অতীত কালের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

তিলক-মন্দিরে অন্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানেও বহু করদ রাজ্যের সরকারী দলিল, চিঠিপত্র, প্রাচীন চিত্র ও মুদ্রাদি রক্ষিত। ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল রেকর্ড-বিভাগ ঊনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি গ্রন্থ ও সরকারী পত্রাদি প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু—মহাভারতের ১৮০ ফুট দীর্ঘ একখানি পাণ্ডুলিপিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

কুম্ভকোনাম (মাদ্রাজ) কাউন্সিলে এইরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়গুলি এক করিয়া দিয়া সহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হোক।

কাউন্সিলে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু সদস্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

রাও বাহাদুর মুত্তুকুমারা চেটিয়ার প্রতিবাদপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক শিক্ষাপ্রণালী ভারতবর্ষের ধাতসহ নহে। সহশিক্ষার ফলে নারীদের নারীজনোচিত গুণাবলী হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে।

কাউন্সিল একটি কমিটি গঠন করিয়া ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভারতের গৌরব-যুগ

অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা সহরে, গত ৬ই জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটির এক অধিবেশনে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে কৃষ্টিগত সম্পর্কের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিল; ভারতের পরিব্রাজকগণ সমগ্র এসিয়াখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের শিক্ষা ও কৃষ্টির বার্ত্তা বিতরণ করিয়াছিলেন; ভারতের বণিকগণ সমস্ত সভ্য জগতে বাণিজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা

সম্প্রতি পুণা নগরীতে নিখিল ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ডক্টর স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ তাঁহার অভিভাষণে ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনার উপকারিতার প্রতি সদস্যবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি একটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। স্যার সাফাৎ আমেদ তাঁহার অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—সত্যকার ঐতিহাসিক গবেষণায় লোককে প্রবুদ্ধ করিয়া বা বিস্তৃততর

ভাবে গবেষণা পরিচালনা করিয়া, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি আমাদের শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রতীক রূপে পরিচিত হইতে পারিয়াছেন?

আমেরিকা ও ভারত

আমেরিকান লিটারারি এসোসিয়েসনের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রোফেসর বিনয়কুমার সরকার আমেরিকাবাসীদের ভারতীয় মনোভাব ও আদর্শের সহিত সহানুভূতির লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে আমেরিকার বোষ্টনের উন্নতি-কামীরা কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির প্রচারিত আদর্শের প্রতি যেরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ভারতের গীতা ও উপনিষদের প্রতিও তাঁহাদের তদ্রূপ সহানুভূতি ছিল। পার্কার ও ইমার্সন প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রে বেদান্তের বাণী প্রচার করিতেন।

আইনশিক্ষা

মাদ্রাজে আইন শিক্ষার অবনতি হইয়াছে, মাদ্রাজ প্রদেশবাসীর এইরূপ ধারণা। তাই, সেখানে একটি বেসরকারী আইন কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

শিক্ষার স্বদেশী রূপ

মাদুরা (মাদ্রাজ) শিক্ষক সম্মিলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি শিক্ষকগণকে শিক্ষাকে স্বদেশী-রূপ দিতে উপদেশ দিয়াছেন। মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—

যাহাতে মাতৃভাষার সাহায্যে পঠন-পাঠনের কাজ হয়, তাহা করিতে হইবে।

সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ছাত্রগণকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। তিনি মনে করেন, দেশীয় মাষ্টারদের দ্বারা "গেঁয়ো ইংরাজী" না শিখাইয়া, সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ফল ভাল হইতে পারে।

ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করাই শিক্ষকদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সেদিকে যদি তাঁহাদের লক্ষ্য না থাকে, এবং দশটি ছেলেকে গ্রাজুয়েট করার চেয়েও যদি তাহাদিগকে আত্মঘাতী হইতে তাঁহারা সহায়তা করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা দেশের মঙ্গল করিবেন।

অর্থাৎ, (বোধ হয়) চরিত্রহীন গ্রাজুয়েট তৈরী করার কোনই সার্থকতা নাই।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের শ্রম ও কষ্টের লাঘব হইবে এবং ছাত্র শিক্ষণীয় বিষয়ে আনন্দের স্বাদ পাইবে।

তারপর, শিক্ষার স্বদেশী রূপের কথা। ভারতীয় ছাত্রগণকে দেশভক্ত করিতে হইবে; ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ যেন অতীতের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া গর্ব্বানুভব করে; দেশের সমস্ত কার্য্যে যেন তাহারা যোগ দিতে উদ্যোগী হয়; দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহাদের ভবিষ্যতকে মিশাইয়া দিতে হইবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

বোম্বায়ের বাধ্যতামূলক প্রথম শিক্ষা আইনটি (Compulsory Elementary Education Act) সর্ব্বপ্রথমে পল্লী অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত করা হইবে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর আর. পি. পরাঞ্জপে তাঁহার জন্মস্থান রত্নগিরির জেলাবোর্ডের হাতে ৭০০০ টাকা দান করিয়া বাধ্যতামূলক প্রথম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ডক্টর পরাঞ্জপে প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐ টাকা হইতে রত্নগিরি জেলার পল্লীতে শিক্ষার ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সঙ্কুলান হইবে; বাকী দুই ভাগের জন্য জেলা-বোর্ড বোম্বাই সরকারের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন। ডক্টর পরাঞ্জপে যখন বোম্বাই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে বোম্বাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছিল। সেই আইনের একটি ধারায় ইহা বিধিবদ্ধ আছে যে, কোন জেলা বোর্ড যদি প্রথম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করিতে পারেন, অবশিষ্টাংশ সরকার বহন করিবেন।

ডক্টর পরাঞ্জপে রত্নগিরি জেলার মরদি (তাঁহার জন্মস্থান) গ্রামে একটি স্কুল ও লাইব্রেরী-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আরও তিন হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার ভ্রাতা মিঃ কে. পি. পরাঞ্জপেও দুই হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মুসলমানদের শিক্ষা

মহম্মদের জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক মুসলমান জনসভায় তাঞ্জোরের (মাদ্রাজ) জেলা-জজ খাঁ বাহাদুর কুরেশি সাহেব বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

আমরা (মুসলমানেরা) শিক্ষাকে অবহেলা করিয়াছি বলিয়াই সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়াছি।

অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মুসলমান সমাজ যদি অ-নড় অবস্থায় থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের অবনতি ত হইবেই, হয়ত বা আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া একেবারেই অবজ্ঞাত হইতে হইবে। এই সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, মুসলমানগণকে শিক্ষার প্রতি অবহিত হইতে হইবে এবং সকল কার্য্যেই অগ্রসর হইতে হইবে—বিশেষ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দিতে হইবে। আর সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদিগকে প্রকৃত মুসলমান হইতে হইবে।

কুম্ভকোনাম মুসলেম সমিতির মিঃ মহম্মদ হুসেন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন:—

বক্তৃতামঞ্চে যত লম্বা লম্বা কথাই প্রচারিত হউক না কেন, হিন্দুদের নিকট মুসলমানেরা প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ মুসলমানদের শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার

অভাববশতঃই হিন্দুরা মুসলমানদের শ্রদ্ধা করে না, আর হিন্দুরা সেই জন্যই সরকারী চাকরী গুলিতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া বসিয়াছে।

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর

'খৃশ্চিয়ান সায়ান্স মণিটার' নামক পত্রে মিঃ হ্যারী ডি রুক লিখিয়াছেন—

সকল যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে যে অজ্ঞাত একটি শক্তি বা ব্যক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই।

আইনষ্টাইনের ভাষায় বলা যায়—Here is something you can call God. এই সেই, যাহাকে তুমি ঈশ্বর নামে অভিহিত করিতে পার।

শিল্প

শিল্প-সাহায্য সমিতি

যুক্তপ্রদেশের শিল্প-সাহায্য সমিতি, ঐ প্রদেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সমিতি তাঁহাদের নির্দ্ধারণ সরকারের নিকটে পেশ করিয়াছেন। এই সমিতিতে তিনজন ইউরোপীয় ও পাঁচজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন; স্যার সোরাবজী পুচকানওয়ালা সমিতির সভাপতি।

সমিতি যে নির্দ্ধারণ দিয়াছেন তাহা মূলতঃ এই—

(ক) শিল্পের সাহায্যের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি ব্যাঙ্ক (Industrial Credit Bank) খুলিতে হইবে।

(খ) ছোট-খাট শিল্পসমূহকে অর্থসাহায্য দিবার ও শিল্প-সামগ্রী বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে প্রচারকার্য্যের দ্বারা কুটীরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঘ) কানপুরে একটি ষ্টক এক্সচেঞ্জ আপিস খুলিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

পল্লী-শিল্প

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বোম্বাইয়ের মাতুঙ্গায় "পল্লীশিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বৃটিশ জাতির ৪ কোটী লোক তাহাদের শিল্পসম্ভার লইয়া দেশ-বিদেশের বাজার ঘুরিয়া, বেচিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের লোকসংখ্যা ৩৬ কোটী—ভারত যদি শিল্প প্রস্তুত করিতে সুরু করে, তাহা হইলে আমাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি নূতন পৃথিবী রচনা করিতে হইবে।

একদিন ভারতের গ্রামগুলি স্বাবলম্বী ছিল। তাহাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, গ্রামেই তাহা পাইত। আজ গ্রামের কি শোচনীয় দুরবস্থা হইয়াছে!

"ভারতের সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে ভারতবর্ষের গ্রামসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী পল্লী-শিল্প-উন্নয়ন-সমিতি গঠন করিয়াছেন।

"আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি যদি পল্লীবাসীদের জন্য কাজ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই বিফল বুঝিতে হইবে।

"গান্ধীজী পল্লী পল্লী করেন বলিয়া অনেকে বলেন যে, তিনি আমাদের উন্নতি না ঘটাইয়া অবনতির পথ খুলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সে কথা সত্য নহে। যে কোন নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

কৃষি

পল্লীবাসীর ঋণ

কোচিনের ইকনমিক ডিপ্রেসন কমিটি পাঁচলক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া পল্লীবাসীদের দুঃখ ও দুরবস্থার নিরশনকল্পে বিতরণ জন্য সরকারের নিকট নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছেন।

জমিদারী প্রথার বিলোপ

কটকে একটি কৃষক সম্মিলনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে, এই প্রদেশ হইতে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হোক।

গ্রামের উন্নতি

সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া না থাকিয়া গ্রামবাসীরা চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার গোলাবেড়িয়া ও আরও কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

স্থানীয় অধিবাসীরা ১১ মাইল দীর্ঘ একটি শুষ্ক খাল খনন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিসমূহে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই বৃহৎ ব্যাপারে অর্থ ব্যয় হয় নাই বলিলেও চলে। কারণ ঐ খালের জলে যে সকল জমির মালিক উপকৃত হইবেন, তাঁহারাই এই কার্য্য করিয়াছেন।

হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গোলাবেড়িয়া পরিদর্শন করিয়া গ্রামবাসীদের কর্ম্মক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

সরকার ও ভারতের কৃষির উন্নতি

হাউস অব লর্ডসে ইণ্ডিয়া বিল বিতর্কের সময় (২০ জুন) লর্ড লিংলিথগো যে বক্তৃতা দিয়াছেন, নানা কারণে তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

ভারতের কৃষকগণের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার অনেক কিছু করিতে পারিতেন। এ কথা কৃষি কমিশনের প্রত্যেক সদস্যই মনে করেন। যাঁহারা গত পনেরো বৎসরের রায়ৎ ও কৃষকদিগের

আন্দোলনের গভীরত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, ইণ্ডিয়া বিলে সেই রায়ৎ ও কৃষকদিগের কথা শুনাইবার যে সুযোগ রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

পল্লী-উন্নতিতে ব্যয়

পাঞ্জাব সরকার পাঞ্জাবের পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্ক তাঁহাদের খসড়া ভারত সরকারের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ খসড়া হইতে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ কিরূপ, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) যে সমস্ত স্থানে জলের অভাব আছে, তথায় জল সরবরাহ জন্য

—প্রায় ৩ লক্ষ টাকা

(খ) পল্লীসমূহে বেতারবার্ত্তা প্রেরণ বাবদ— " অর্দ্ধ " "

(গ) পল্লীবাসীর শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ সিনেমা বাবদ " অর্দ্ধ " "

(ঘ) ফলের চাষ ও উন্নতি বাবদ— " অর্দ্ধ " "

এতদ্ভিন্ন মেষপালন, পশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে ও বালক বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারকল্পে অর্থ ব্যয়িত হইবে।

পাটচাষ

বাঙ্গালা সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা সুফলপ্রদ হইয়াছে, এই বিশ্বাসে গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ আর এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিতেও পারেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

স্বর্ণরপ্তানী

ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ২,২৯,৭৩,৭১,২১৯ টাকার স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চালান হইয়াছে।

মামলা বৃদ্ধি

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার বলিতেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধিবশতঃ মামলা মোকর্দ্দমাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বেকার-সমস্যা

লণ্ডনের ন্যাসন্যাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্টানলী বল্ড্উইন বলিয়াছেন—

আমি এমন কথা কখনও বলি নাই, বলিতে পারিও না যে, আমি বেকার-সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিব। তবে আমাদের সরকারের চেষ্টার ফলে সাধারণের মনে আস্থা জন্মিয়াছে যে, অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৩৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে, সরকার পূর্ব্বের দুই বৎসরের তুলনায় ২৭,০০,০০০ পাউণ্ড অধিক টাকার মাল বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিয়াছেন।

রাষ্ট্র

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

নবনিযুক্ত ভারত-সচিব মার্ক্ইস অভ জেটল্যাণ্ড ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনার সময় বলিয়াছেন—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর নয়।

মার্ক্ইস অফ জেটল্যাণ্ড অবসরপ্রাপ্ত ভারতবর্ষীয় পুলিশের কর্ম্মচারিদিগের এক ভোজ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ভারতীয় পুলিশবাহিনীর মঙ্গলের জন্যই পুলিশ বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত করা হইতেছে।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস

লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন—ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিবার পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে।

ভারতবর্ষ সম্প্রতি অর্থনৈতিক অবসন্নতা (depression) হইতে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে। ভারত সরকারের অর্থসচিব মনে করেন যে, এই ভাবে উন্নতি হইতে থাকিলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভার বহন করিতে বেগ পাইতে হইবে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে করভারও কমিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের জন্য শাসনতন্ত্রের খসড়া রচিত হইতেছে।

বিবিধ

পরিণয়-পরিণতি

আমেরিকায় প্রতি তিন মিনিটে একটি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। আমেরিকার শতকরা ১৭টি পরিণয়ের পরিণতি হয় বিচ্ছেদে; শতকরা ৩৫টি বিবাহ অন্য নানা রকমে নাকচ হয়।

জার্ম্মাণ নারী

জার্ম্মেনীর নারীসমাজের নেত্রী শ্রীমতী জেরট্রুড সোল্‌ৎস ক্লুক বলিতেছেন—

জার্ম্মেনীর তরুণীদের গৃহকর্ত্রী ও জননী হইবার উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে।

হিন্দুত্ব-বিলোপ

বেজওয়াদায় (মাদ্রাজ) অন্ধ্র প্রাদেশিক সনাতন ধর্ম্ম সম্মেলন উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভারতী স্বামী বলিয়াছেন—সহ-শিক্ষা,

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ঋতুমতী কন্যার বিবাহের ফলে হিন্দুত্বের বিলোপ সম্ভাবনা প্রকট হইবার আশঙ্কা আছে।

সমাজতন্ত্রবাদ

নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদ সভার একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে—কংগ্রেসের কার্যতালিকায় বর্ত্তমানে এমন একটি বিষয়ও নাই, যাহা আমাদিগকে (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদ-বিশ্বাসীদের) আকৃষ্ট করিতে পারে।

সোনার পাথরবাটী

ডক্টর মেরী ষ্টোপসের নাম অনেকের জানা থাকিতে পারে। যৌন সমস্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমন অনেক যুবক যুবতী আছেন, যাঁহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও সংসার পাতিতে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে পারেন না। ডক্টর মেরী ষ্টোপসের মতে ঘর-ছাড়া বিবাহে কোন দোষ নাই। বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রী স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব জীবিকা লইয়া থাকিতে পারেন; এমন কি কলেজে লেখাপড়াও করিতে পারেন। যখন অবস্থা ভাল হইবে, ঘর বাঁধিতে পারিবেন, তখন ঘরসংসার পাতিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই।

শোক-সংবাদ

আমাদিগের বন্ধু কবি হেমেন্দ্রলাল রায় নিতান্ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হইত; তাঁহার কয়েকখানি বই পাঠকসমাজে আদর লাভ করিয়াছিল। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

যদি ঝড় আসে

—শ্রীহাসিরাশি দেবী

শরতের সাঁঝে সেদিন সহসা ঝড় এসেছিল ভাই
ধরণী ধূলায় ঢাকি
গভীর অন্ধকারে,—
সে ঝড়ে হারায়ে আশা-নীড়খানি নীরবে ফিরিছে তাই
আজিও পরাণপাখী
সুখের বন্ধদ্বারে।
সে দিনের ঝড়ে ডানা ভেঙ্গে গেল, বুকেতে বিঁধিল আসি
নিঠুর ব্যাধের শর
বেদনার বিষ-মাখি,—
তবুও চ'লেছি ধীরে মন্থরে মুখে নিয়ে মৃদু হাসি,
জীবন-বালুকাপর
শোণিতের রেখা আঁকি॥

নূতন প্রাতের প্রথম কাকলী যত ছিল জমা করা
হৃদয়ের বীণা-তারে
মৃদু আশাবরী সুর,
সে-তার ছিঁড়েছে, ভাঙ্গা বীণা কোথা পড়ে' আছে ধূলা ভরা,
জীবনের কোন ধারে
কোন বিসরণপুর।

যে শাখে কুন্দ মুকুলে ঝরেছে সে শাখে ফোটেনি আর,
হেরিতে আশার ছবি
উৎসবগান গাহি,
সেদিন যে আঁধি এসেছিল, আজও আঁধার কাটে না তার
আকাশে ওঠেনি রবি
অরুণ নয়নে চাহি॥

সে দিনের সাঁঝে ঘুমায়েছে সাথী ঝরা কোরকের সাথে
শ্বেত-করবীর বনে
আমারে জাগায়ে রাখি,
তাই আজও তারে জাগাইতে চাই প্রতিদিন সন্ধ্যাতে
ভাষাহারা দেহ মনে
নীরব রোদনে ডাকি।
চোখের সীমায় জল নাই, আছে বুকের অতল ক্ষত,
ঝরিছে রুধির ধারা,
সে ধারা লুকায়ে রাখি,
তোমারও জীবনে যদি ঝড় আসে সহসা আমারই মত
যদি হও দিশাহারা,
তবু পথ খুঁজো, চলি॥

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড [illegible]
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩৪২

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

পূর্ব্বানুবৃত্তি :
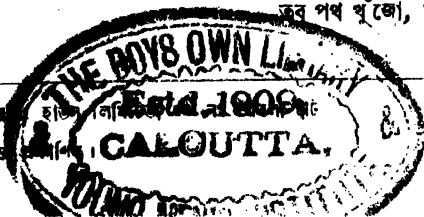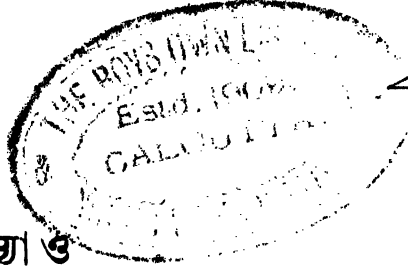
আমরা এই প্রবন্ধটী আরম্ভ করিয়াছি গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে। এই নয় মাসের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং প্রবন্ধটীর বিস্তৃতি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান জগতে যতগুলি দেশের অস্তিত্ব আছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কাযেই প্রাচীনতা ভারতবর্ষের একটী বৈশিষ্ট্য; আর্থিক স্বাধীনতা ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষকে একদিন জগতের অন্যান্য সমস্ত দেশ আপন আপন শিক্ষা ও সংগঠনের গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, ইহাও মনে করিবার কারণ আছে। অথচ সেই ভারতের অধিবাসী আজ স্বীয় শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য জগতের কৃপাপ্রার্থী এবং নিজ রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-কার্য্যে পরাশ্রয়ী। যে দেশের এতগুলি বৈশিষ্ট্য এবং যাহার পরিবর্ত্তন এত আমূল, তাহার সমস্যা নির্দ্ধারণ করিতে ও সমস্যা-পূরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে যে অনেক কথা বলিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ কোন বিষয়ে অনেক কথা বলা হইলে তাহার সমস্ত পাঠকদিগের সাধারণতঃ স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। কাযেই লেখকের কর্ত্তব্য পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

আমাদের প্রবন্ধে মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা করা হইবে বলিয়া ইহার প্রথমাংশেই প্রকাশ করা হইয়াছে—

১। যাবতীয় সমস্যা-পূরণের উপায় কি?

২। কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি?

৩। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি?

৪। ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা ও সামর্থ্য কিরূপ?

৫। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার পূরণ কোন প্রচলিত বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব কি না?

৬। যদি প্রচলিত বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার পূরণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কি উপায় দ্বারা তাহা হইতে পারে?

৭। যে মূল সূত্রানুসারে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার পূরণ সম্ভব তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি কি হইতে পারে?

উপরোক্ত সাতটী মূল বিষয়ের মধ্যে যাবতীয় সমস্যা পূরণের উপায় কি তাহা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

"কি উপায়ে কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতে পারে" তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমতঃ "জাতি" বলিতে কি বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ "দেশ" বলিতে কি বুঝায়, তৃতীয়তঃ জাতি-সংগঠনের প্রয়োজন ও উপায় কি, চতুর্থতঃ জাতীয় সমস্যা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্ভব হয় কেন, ইহা জানিতে* ও বুঝিতে† হয়।

আমাদের নির্ণয়ানুসারে "জাতি" বলিতে "দেশ"কে কেন্দ্র

* "জানা" বলিতে আমরা বুঝি "অপরের কথা কান দিয়া শুনিবার কার্য্য।"

† "বুঝা" বলিতে আমরা বুঝি "যাহা শুনা হইয়াছে তাহা স্বীয় কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধীয় যথাযথতা নিরূপণ করিবার কার্য্য।"

করিয়া তৎ তৎ দেশবাসিগণের সমষ্টি অথবা সম্মেলন, এবং "দেশ" বলিতে জমী, জীব ও জলহাওয়ার সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

কি করিলে জমীর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে ইহার আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কৃষকের কোন্ অবস্থা আকাঙ্ক্ষণীয় তাহা যথাযথ জানা না থাকিলে জমীর উৎকর্ষ বলিতে কি বুঝায় তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না এবং মানুষের উন্নতি ও অবনতির অবস্থা কি তাহা জানা না থাকিলে কৃষকের কোন্ অবস্থা আকাঙ্ক্ষণীয় তাহার নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় না। কাযেই জমীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য কি করিতে হইবে তাহার আলোচনা সমাপ্ত হইবার আগেই মানুষ সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গের উত্থাপন করা হইয়াছে। মানুষ সম্বন্ধীয় যে যে জ্ঞাতব্য কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে তাহার বর্ণনা শেষ হইলে পুনরায় জমীর উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহার বিচার করা হইবে।

মানুষ সম্বন্ধে আমরা এতাবৎ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছি—

১। মানুষ বলিতে কি বুঝায়;
২। মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ;
৩। মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

ইহার পর কোন্‌টা মানুষের "প্রয়োজন" আর কোন্‌টা তাহার "আকাঙ্ক্ষা", তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন তাহার কথা আরম্ভ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

১। মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ;
২। বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ;
৩। চালচলন অনুযায়ী মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায়;
৪। 'কার্য্য' ব্যাপারটী কি?
৫। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম কার্য্য করে কেন?
৬। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের বস্তু চাহে কেন?
৭। বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে তাহাতে তাহাদের পরিণাম কি হয়?
৮। অধ্যয়নের বিভিন্ন রকম ও তাহা হয় কেন?
৯। অধ্যাপনার বিভিন্ন রকম এবং তাহা হয় কেন?
১০। জ্ঞান কাহাকে বলে এবং ভারতবাসী যে এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল তাহার প্রমাণ কি?
১১। প্রকৃত ও বিকৃত সাহিত্য কাহাকে বলে এবং তাহা বিভিন্ন রকমের হয় কেন?

বর্ত্তমান সংখ্যায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের স্বরূপ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কথা।

আত্মার সংজ্ঞা

"আধ্যাত্মিক সাহিত্য" সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইলে "আত্মা" কাহাকে বলে তাহা আগে বুঝিতে হয়, কারণ বস্তুর আত্মাকে অধিকরণ করিয়া যে সাহিত্য অথবা আত্মা-সম্বন্ধীয় সাহিত্যের নাম "আধ্যাত্মিক সাহিত্য"।

"আত্মা" শব্দের প্রচলিত অর্থ "আমি"। "আত্মা" বলিতে যে "আমি" বুঝায় সে "আমি"-র বিস্তৃতি যে কতখানি সাধারণতঃ আমাদের তাহা অপরিজ্ঞাত।

পাণিনি দেবের শব্দ বুঝিবার পদ্ধতি অনুসারে জীবের আত্মা বলিতে বুঝায় সেই অবস্থান যাহাতে নির্গুণের প্রকাশ, গুণ এবং কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

"আত্মা" এই শব্দটীর মধ্যে আছে 'আ', 'ত্', 'ম্', 'আ'।

'আ' শব্দের অর্থ 'নির্গুণের প্রকাশ' 'ত্' শব্দের অর্থ "অহংকৃতি" অথবা গুণ, 'ম্' শব্দের অর্থ "স্পর্শ" অথবা কার্য্য, "আ" শব্দের অর্থ গুণ এবং কার্য্যের প্রকাশ, অথবা বিকাশ।

আমাদের ঋষিদিগের কথা অনুসারে চরাচর সমস্ত জীবের মূল কারণ একটী নির্গুণ দ্রব্য। ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি সমস্ত চর-জীবের এবং লতা-গুল্মাদি অচর-জীবের মূল উপাদান ঐ নির্গুণ বস্তু। ঐ নির্গুণ বস্তুর প্রকাশ হইলে তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। কাযেই পাণিনি দেবের সংজ্ঞানুসারে নির্গুণ বস্তুর প্রকাশ হইবার পর তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হইলে যে অবস্থানের উদ্ভব হয় তাহার নাম "আত্মা"।

নির্গুণ বস্তু বলিতে বুঝায় "ব্যোম"। ঋষিদের কথানুসারে ব্যোম অচল, অটল। যেখানে অথবা যে জীবের ভিতর ব্যোমের পরিমাণ বেশী, সেই স্থানে অথবা সেই জীবের আকর্ষণী অথবা বিকর্ষণী শক্তি থাকে না। আকর্ষণী অথবা

বিকর্ষণী শক্তি না থাকিলে জীব আকাশে উড়িতে এবং বায়ুমণ্ডলে অথবা জলের উপর বসিতে পারে। খেচর জীবের ভিতর ব্যোমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া তাহারা আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

যে স্থানে খুব বেশী পরিমাণ ব্যোম সঞ্চিত থাকেন, সেই স্থানের মধ্য দিয়া কোন স্থূলাবয়বসম্পন্ন জীব স্বাভ্যন্তরে অত্যধিক পরিমাণ ব্যোমের সংস্থান না করিতে পারিলে যাতায়াত করিতে পারে না। আকাশের যে অংশ নীল বর্ণ, সেই অংশে ব্যোম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঞ্চিত। প্রত্যেক দুইটী তারকার মধ্যে ব্যোমের সঞ্চয় আছে বলিয়া একটী তারকা আর একটী তারকার উপর পড়িতে পারে না।

ব্যোমের কোন গুণ নাই। তাঁহাকে মানুষ হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার রস গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার কোন গন্ধও নাই। তাঁহার ভিতর দিয়া মানুষ কেবল মাত্র শব্দ শুনিতে পারে।

মানুষের কর্ণমূলে (কর্ণরন্ধ্র নহে) ব্যোম আছেন বলিয়া মানুষ শব্দ শুনিতে পায় এবং কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়া এক শব্দ ছাড়া অন্য কোন বস্তু যাতায়াত করিতে পারে না। মানুষের অবয়বের যে যে অঙ্গে ব্যোম অধিক পরিমাণে আছেন, সেই সেই অঙ্গে অন্য কোন বস্তু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই সেই অঙ্গে কেবল মাত্র শব্দ শুনা যায়।

ব্যোম না হইলে চরাচর কোন জীবের উদ্ভব ও রক্ষা সম্ভব হয় না। এই জন্য ব্যোমকে বস্তুর "বীজাকার" বলা হইয়া থাকে।

এইখানে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুর তিনটী আকার আছে। তাহাদের নাম বীজাকার, সূত্রাকার অথবা সূক্ষ্মাকার এবং স্থূলাকার।

"ব্যোম" গতিশীল হইলে তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যোম গতিশীল হইলে সূক্ষ্মাকার বায়ুর উদ্ভব হয়। সূক্ষ্মাকার বায়ুর কোন রূপ নাই, কোন রস নাই, কোন গন্ধ নাই। তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা এবং জীবের শরীরে সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত থাকে বলিয়া জীব স্পর্শ করিতে পারে এবং সুখস্পর্শ চায়। মানুষের ত্বকের ও মাংসের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত থাকে বলিয়া ত্বকের ও মাংসের স্পর্শশক্তি রহিয়াছে। যে যে অঙ্গে সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত হয় না সেই সেই অঙ্গের স্পর্শশক্তি থাকে না। রক্তের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত হয় না বলিয়া রক্তের কোন স্পর্শশক্তি নাই।

সূক্ষ্মাকার বায়ুর উদ্ভব হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার ও স্থূলাকার জল, তেজ এবং ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীব বিবিধ গুণ ও কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে, নির্গুণের প্রকাশ হইলেই বায়ুর উদ্ভব হয় এবং বায়ুর উদ্ভব হইলেই সূক্ষ্মাকার ও স্থূলাকার জল, তেজ এবং ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীবের উদ্ভব হয় এবং জীব গুণ ও কার্য্যশক্তি অর্জ্জন করে। কাযেই আত্মা বলিতে বুঝায় চরাচর জীব এবং আত্মার জ্ঞান বলিতে বুঝিতে হইবে জীব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাহা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তুর উপাদান কি, গুণ কি—এবং কার্য্যসামর্থ্য কি তাহা জানিতে হইবে।

প্রচলিত বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষানুসারে আত্মার জ্ঞান বলিতে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক বস্তুর পদার্থ-বিজ্ঞান * (Physics) ও রসায়ন (Chemistry) জানা। অবশ্য বর্ত্তমান জগতে যে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন আছে তাহা ঐ দুইটী নামের কলঙ্ক। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় ঋষিদিগের বস্তুর আত্মা-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে অথবা ভারতবাসীর যে পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন (Chemistry) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে, তাহা যথাযথ অর্থে প্রকাশ হইলে বর্ত্তমান জগতের পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন যে ঐ দুইটী নামের কলঙ্ক তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা আত্মাকে "সচ্চিদানন্দময়" বলিয়া থাকেন তাঁহারা কি বলেন তাহা জানেন না বটে, কিন্তু যাহা বলেন তাহা ঠিকই বলেন। "সৎ" বলিতে বুঝায় "সত্তা" অথবা "উপাদান", "চিৎ" বলিতে বুঝায় "কার্য্যশক্তি" এবং "আনন্দ" বলিতে বুঝায় "গুণ"। উপাদান, কর্ম্মশক্তি এবং গুণবিশিষ্ট বস্তু বলিতে

* মনুষ্য, পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদি চরাচর সমস্ত জীবের শরীর-গঠন তত্ত্ব (Anatomy), শরীর-তত্ত্ব (Physiology), পরস্পরের সংশ্রবতত্ত্ব (এই বিষয়ক কোন বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের অপরিজ্ঞাত) পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নের অন্তর্গত।

চরাচর-জীবকেই বুঝায়। কাযেই তাঁহারাও পরোক্ষভাবে চরাচর-জীবকেই "আত্মা" বলিতেছেন।

"আত্মা"কে বুঝিতে হইলে "ঈশ্বর"কে জানিতে ও বুঝিতে হয়। ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারাও ঠিক বলিয়া থাকেন। আমাদের কথানুসারে কোন জীবের "আত্মা"কে বুঝিতে হইলে তাহার উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি কি কি তাহা বুঝিতে হইবে। সমস্ত উপাদানের উদ্ভব হইয়াছে কোথা হইতে, তাহা না বুঝিলে কোন জীবের উপাদানকে সম্যক্ ও অভ্রান্ত ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। জীবের সমস্ত উপাদানের উদ্ভব হইয়াছে "ব্যোম" হইতে। কাযেই কোন জীবের উপাদান সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে "ব্যোম"কে জানিতে ও বুঝিতে হইবে। এই "ব্যোম"কেই ভারতীয় ঋষিগণ "ঈশ্বর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। "ঈশ্বর" শব্দের মধ্যে আছে 'ঈ··· শ্···ব্···র।'

'ঈ' শব্দের অর্থ 'চিৎকলার দীর্ঘত্ব' অথবা গুণের বৃদ্ধি।

'শ্' শব্দের অর্থ 'সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন'।

'ব্' শব্দের অর্থ অম্বু।

'র' শব্দের অর্থ বহ্নি।

যাঁহার হইতে গুণের বৃদ্ধি, সত্ত্বগুণসম্পন্ন অম্বু এবং বহ্নির উদ্ভব হয় তাঁহার নাম 'ঈশ্বর'। ইহাই ঈশ্বর শব্দের শব্দগত অর্থ।

নির্গুণ "ব্যোম" হইতেই প্রথম স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উদ্ভব হয় এবং তাহার পর গুণের বৃদ্ধি হইলে সূক্ষ্মাকার (সূক্ষ্মাকার ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন একই অর্থ-প্রকাশক) অম্বুর এবং বহ্নির উদ্ভব হয় ইহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। কাজেই "ব্যোম"কে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে।

ব্যোম যে নির্গুণ এবং তাহা না হইলে যে চরাচর কোন জীবের সৃষ্টি এবং স্থিতি অথবা রক্ষা সাধিত হয় না এবং তাঁহার বিহনে যে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহাও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

একটী মানুষের দিকে চাহিয়া দেখুন এবং প্রথমতঃ চিন্তা করুন, মানুষ কি কি কার্য্য করে এবং তাহার কি কি গুণ। মানুষ অনেক কিছু কার্য্য করে এবং তাহার গুণও অনেক। কিন্তু তাহার সমস্ত কার্য্য ও গুণ সংক্ষেপ করিয়া বলিতে হয়—

(১) সে অবিরত তাহার নাসিকার সাহায্যে গন্ধ লইতেছে এবং সুগন্ধ পাইতে চাহে। তাহার নিজের দেহেও গন্ধ আছে এবং তাহার তারতম্য হয় নিজ ত্বক্ ও মাংসের তারতম্যানুসারে।

(২) সে অবিরত খাদ্যের ও ভাবের রস গ্রহণ করিতে চাহিতেছে এবং পছন্দ-বিরুদ্ধ হইলে "পৌ-রস" দেখাইয়া থাকে। তাহার নিজের অঙ্গেরও একটা রস আছে এবং তাহার তারতম্য হয় তাহার অঙ্গের উত্তাপের তারতম্যানুসারে।

(৩) সে অবিরত কিছু-না-কিছু জলীয় দ্রব্য পান করিতে চাহিতেছে এবং তাহার শরীরেও রক্তরূপ জলীয় দ্রব্য রহিয়াছে। তাহার অঙ্গে একটা রূপও আছে এবং সেই রূপের তারতম্য হয় রক্তের তারতম্যানুসারে।

(৪) সে অবিরত সুকোমল অথবা বায়ুর স্পর্শ চাহিতেছে। এবং তাহার অঙ্গেরও একটা স্পর্শ পাওয়া যায়। শীতল বায়ুতে থাকিলে তাহার স্পর্শ শীতল এবং উষ্ণ বায়ুতে থাকিলে তাহার স্পর্শও উষ্ণ হয়।

(৫) সে অবিরত কথা কহিতে অথবা শব্দ করিতে চাহে। নিদ্রার সময়েও তাহার শব্দের বিরতি নাই। কারণ তখনও নিশ্বাসের শব্দ শুনা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শব্দের বিরতিতে তাহার মৃত্যু। অথচ তাহার অঙ্গের কোথায়ও শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, "জিহ্বা"য় শব্দ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার দেহে যেরূপ গন্ধ, রূপ, রস এবং স্পর্শ পাওয়া যায়, সেইরূপ জিহ্বা না নড়াইলে জিহ্বার উপর কি "শব্দ" পাওয়া যায়? জিহ্বা হেলন করিলে সর্ব্বদা শব্দের উদ্ভব হয় না। অঙ্গের কোন কার্য্য না হইলেও যেরূপ মানুষের দেহে গন্ধ, রূপ, রস এবং স্পর্শ পাওয়া যায়, জিহ্বার কোন কার্য্য না হইলে সেইরূপ শব্দ পাওয়া যায় না এবং এই শব্দের তারতম্যই বা হয় কেন তাহা বুঝা যায় না। কাযেই "শব্দ" একটি কার্য্য মাত্র, তাহা গুণ নহে। যাঁহারা

"শব্দ"কে গুণ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদের ভারতীয় ঋষিগণের দর্শনের ভাষ্যকার-দিগের মধ্যে কেহ কেহ শব্দকে না বুঝিয়া গুণ বলিয়া মনে করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন দর্শনের কোন মূল সূত্রে শব্দকে গুণ বলা হয় নাই।*

মানুষের যত কিছু কার্য্য এবং গুণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপরোক্ত পাঁচটী কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায়। কাযেই বলিতে হইবে, মানুষের কার্য্য পাঁচটী, যথা, গন্ধ লওয়া, রস লওয়া, অম্বু গ্রহণ করা, স্পর্শ করা এবং শব্দ করা। তাহার গুণ চারিটী, যথা, গন্ধমানতা, রসমানতা, রূপবানতা এবং স্পর্শমানতা।

আরও দেখা যাইতেছে যে, মানুষের ত্বক্ ও মাংসের জন্য তাহার গন্ধমানতা এবং তাহার নিজের গন্ধমানতা আছে বলিয়াই সে সুগন্ধ চাহিয়া থাকে। ত্বক্ ও মাংসকে যদি ক্ষিতি নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, মানুষের ক্ষিতি নামক একটী উপাদান আছে এবং তাহার গুণ গন্ধমানতা এবং তাহার কার্য্য গন্ধ লওয়া

এইরূপে আরও দেখা যাইতে পারে যে—মানুষের বহ্নি অথবা তেজ নামক একটী উপাদান আছে, তাহার গুণ রস-মানতা এবং কার্য্য রস গ্রহণ করা। তাহার নিজের রসমানতা আছে বলিয়াই সে অন্য রস গ্রহণ করিতে চাহে।

অম্বু নামক আর একটী উপাদান আছে। তাহার গুণ রূপবানতা এবং কার্য্য অম্বু গ্রহণ করা। তাহার নিজের রূপ-বানতা আছে বলিয়াই সে অন্য রূপ গ্রহণ করিতে চাহে।

বায়ু তাহার অপর উপাদান। বায়ুর গুণ স্পর্শমানতা এবং কার্য্য স্পর্শ গ্রহণ করা। তাহার নিজের স্পর্শমানতা আছে বলিয়াই সে শীত-গ্রীষ্মাতুর হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করুন যে, স্পর্শাদি চারি শ্রেণীর গুণ বশতঃ যে চারি শ্রেণীর কার্য্য মানুষ করিয়া থাকে এবং ঐ চারি শ্রেণীর গুণ ও কার্য্য যে তাহার বায়ু প্রভৃতি উপাদানের জন্য তাহা জানা হইল বটে, কিন্তু মানুষের শব্দ-কার্য্য যে কি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা জানা হইল না।

নিছক বায়ু হইতে শব্দের উদ্ভব হইতে পারে না। যদি নিছক বায়ু হইতে শব্দের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে শত শত যোজনব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বের শব্দ সুস্পষ্ট শ্রবণ করা সম্ভব হইত, কিন্তু কার্য্যতঃ শত শত যোজনব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর ত দূরের কথা, তিন চারি মাইল প্রশস্ত নদীর এক পার হইতে অপর পারের শব্দ শুনা যায় বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট শুনা যায় না। কাযেই বায়ুকে শব্দের কারণ বলা যায় না, অথচ অস্পষ্ট ভাবে যখন বায়ুর মধ্যে শব্দের গতি পরিলক্ষিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, নিছক বায়ু শব্দের কারণ নহে বটে, কিন্তু বায়ুর মধ্যে শব্দের কারণ বিদ্য-মান আছে। 'অম্বু'ও শব্দের কারণ হইতে পারে না, 'অম্বু' যদি শব্দের কারণ হইত, তাহা হইলে জলের মধ্যে নিমজ্জিত হইলে শত শত যোজন ব্যবধানেও সুস্পষ্ট শব্দের আদান-প্রদান সম্ভব হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। অম্বুর মধ্যে সুস্পষ্ট শব্দের আদান-প্রদান সম্ভব না হইলেও অস্পষ্ট শব্দের গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, নিছক অম্বু শব্দের কারণ নহে বটে, কিন্তু অম্বুর মধ্যে শব্দের কারণ মিশ্রিত আছে।

এইরূপে নিছক বহ্নি অথবা নিছক ক্ষিতিও যে শব্দের কারণ নহে অথচ তাহাদের মধ্যে শব্দের কারণ যে মিশ্রিত আছে, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, শব্দের কারণ ক্ষিতি, বহ্নি, অম্বু, বায়ু ব্যতীত অপর কিছু এবং শব্দের যিনি কারণ তিনি নির্গুণ এবং বায়ু, অম্বু, বহ্নি ও ক্ষিতির সহিত সর্ব্বদা মিশ্রিত রহিয়াছেন।

চরাচর সমস্ত জীবের উপাদানেই বায়ু, অম্বু, বহ্নি এবং ক্ষিতি রহিয়াছে। কাযেই শব্দের কারণ যিনি, তিনি চরাচর সমস্ত জীবের মধ্যেই আছেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

সমস্ত জীব-মধ্যস্থিত এই নির্গুণের নাম "ব্যোম" এবং "ব্যোম"ই শব্দের কারণ।

"অম্বুযুক্ত" বায়ুর ঐক্য-বিজ্ঞান হইতে যাহার স্পর্শানুভূতি হয় তাঁহার নাম "ব্যোম"—ইহা ব্যোম শব্দের শব্দগত অর্থ।

ব্যোম না হইলে যে কোন জীবের রক্ষা সাধিত হয় না, তাহার প্রমাণ জীবের অন্তর্নিহিত "শব্দ"। আগেই বলিয়াছি, যে মুহূর্ত্তে শব্দের বিরতি সেই মুহূর্ত্তে জীবের মৃত্যু। "ব্যোম" যখন শব্দের কারণ, তখন ব্যোমের অভাব হইলে জীবের মৃত্যু হয় ইহা বলা যাইতে পারে।

* বৈশেষিক দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ৬ষ্ঠ সূত্র দেখুন।

যথেষ্ট পরিমাণে নিগুর্ণ ব্যোমযুক্ত হইলে জীব নীরোগ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা স্বীয় মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহার জন্য নিগুর্ণ ব্যোমের অপর নাম "শিব"।

স্বীয় শরীরাভ্যন্তরের এবং সন্নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলে নিগুর্ণ "ব্যোমে"র মাত্রার বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে জীবের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হইতে পারে। তাহারই জন্য ভারতীয় ঋষি-গণ তাঁহাদের সন্তানগণের নিত্য শিব-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং "নিগুর্ণ ব্যোম"ই যে "শিব", তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার জন্য "শিব"-পূজান্তে "ব্যোম", "বোম"-ধ্বনির ব্যবস্থা।

বৈষ্ণবদিগের কাছে ঈশ্বরের আর এক নাম "নীলমণি"। এই "ব্যোম"ই সেই "নীলমণি"। তাঁহারও রূপ "নীল"।

যে বিদ্যার সহায়তায় নিগুর্ণ "বোমে"র স্পর্শানুভূতি জন্মে, তাহার নাম "ব্রহ্মবিদ্যা"। শব্দগত অর্থানুসারে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "অম্বুজ তেজ" এবং "ব্যোমজ স্পর্শানুভূতি"। "ব্রহ্ম" শব্দের মধ্যে আছে "ব্", "র", "হ্," "ম"। "ব্" শব্দের অর্থ "অম্বু হইতে উৎপন্ন"। "র" শব্দের অর্থ "তেজ"। "হ্" শব্দের অর্থ "ব্যোম হইতে উৎপন্ন"। "ম" শব্দের অর্থ "স্পর্শানুভূতি"।

"উত্তর-মীমাংসা" অথবা "বেদান্ত" অধ্যয়ন করিতে পারিলে "ব্রহ্মবিদ্যা" শিক্ষা করিতে পারা যায় এবং অম্বুজ তেজ ও ব্যোমজ স্পর্শানুভূতি কি করিয়া লাভ করিতে হয় তাহা জানা যায়।

পাঠক, আমরা কি বলিলাম তাহা লক্ষ্য করিবেন। আমাদের কথানুসারে বেদান্ত-দর্শনে 'অম্বুজ তেজ' সম্বন্ধীয় কথা অর্থাৎ জল হইতে কি করিয়া সদ্য সদ্য তেজ উৎপন্ন করা যায় এবং তাহার বহুল প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারে তাহার বর্ণনা আছে।

আকাশপথে তেজ-চালিত যান ব্যবহার করিলে মেঘগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থানে অনাবৃষ্টি এবং কোন স্থানে অতি-বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

স্থল-পথে তেজচালিত যান ব্যবহার করিলে জমীর অম্বুর ঘর্ষণ বশতঃ জমীর মধ্যে অতিরিক্ত তেজের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে জমীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। অধিকন্তু হাওয়ায় তেজ-পদার্থের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য প্রভৃতি জীবের অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যু অনিবার্য্য।

তাই আমাদের ঋষিগণ অন্ততঃ পক্ষে দশ হাজার বৎসর আগে জল হইতে তেজ উৎপন্ন করিয়া কি উপায়ে জলপথে দ্রুতগতি-যানের চালনা করিতে হয় তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন ও বেদের সমস্ত কথা আমরা এখনও পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। তাহার সামান্য যে অংশ মাত্র আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণরূপে আমাদের পাঠক-দিগকে বলিতে ভরসা হয় না, কারণ বর্ত্তমান জগতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট যেরূপ অহরহ চলিতেছে, তাহাতে মানুষকে যে একে-বারে দুঃখহীন করা যাইতে পারে এবং তাহার উপায় যে ভারতীয় ঋষি বর্ত্তমান জগতের অপরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পূর্ণ কথায় বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি ?

আমরা "ব্যোম"কে "ঈশ্বর" বলিলাম বলিয়া আপনারা স্তম্ভিত হইতেছেন ? আমরা ঋষিদিগের কথা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায় আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। একটা প্রকাণ্ড কিছু ভুল না হইলে ঋষি-দিগের রচিত সোনার ভারতের এই অবস্থা হইত না, তাহা আপনারা স্পষ্ট বুঝিতেছেন কি ?

আমাদের সকলেরই ধারণা "ঈশ্বর" আমাদিগের স্রষ্টা, অথবা "বাবার বাবা"। অথচ আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কতক-গুলি কথাই মাত্র বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। সেই সমস্ত কথা হইতে তিনি কোথায় কিরূপে আছেন, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। যিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমাদের জীবন বিষময় হওয়া অস্বাভাবিক কি ? বর্ত্তমান জগতে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত অবিশ্বাসী লোকের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ কি তাঁহার অস্তিত্ব কোথায় তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব নহে ?

কাযেই আমাদিগের কথায় স্তম্ভিত না হইয়া আমরা কি বলিয়াছি এবং বলিতে চাহিতেছি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন।

বস্তুর যেরূপ বীজ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল এই তিনটী আকার

আছে, সংস্কৃত ভাষারও ঐরূপ তিনটী আকার আছে। সংস্কৃত ভাষার বীজাকারের উপর সূত্রাকার প্রতিষ্ঠিত এবং সূত্রাকারের উপর স্থূলাকার প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষার বীজাকার না বুঝিতে পারিলে সূত্রাকার বুঝা যায় না এবং সূত্রাকার বুঝিতে না পারিলে স্থূলাকার বুঝা যায় না। বেদ ভাষার বীজাকারের ও সূত্রাকারের সহায়তায় লিখিত, দর্শনগুলি সূত্রাকারের সহায়তায় লিখিত এবং পুরাণ ও সংহিতাগুলি স্থূলাকারের সহায়তায় লিখিত।

বর্ত্তমানে যে ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া প্রচলিত, তাহাদের প্রত্যেক খানিতে ভাষার বীজাকার ও সূত্রাকারের আলোচনা উপেক্ষিত হইয়াছে। ঐ আলোচনা আছে একমাত্র অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আর কেহ অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি যথাযথ বুঝিতে পারেন না। তাহা একটা কাল্পনিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

কাজেই আমাদের বেদ ও দর্শনের প্রকৃত অর্থ বর্ত্তমান জগতের অপরিজ্ঞাত।

যদি কখনও বেদ ও দর্শন যথাযথ অর্থে আবার প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাদিগের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা আত্মা (soul) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর প্লেটো, এরিষ্টটল, ডেকার্টে, লক্, লিবনিজ, স্পিনোজা এবং হিউমের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কথাগুলি প্রায়শঃ কথার কথা। তাঁহাদের কথাগুলি "টিয়াপাখী"র মত মুখস্থ করিয়া রাখা যায় বটে এবং পাণ্ডিত্যাভিমানও পোষণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কাহারও কথা হইতে 'আত্মা' যে কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না।

যাঁহারা "ব্যোমে"র প্রতিশব্দ ইংরাজী "ইথার" বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। "ব্যোম" নিগুণ আর "ইথার" সগুণ দ্রব্য। যাঁহারা "ব্যোমে"র কথা বলিয়াছেন, সেই ঋষিগণ নীলাকাশ পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডল তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন এবং কি করিয়া নীলাকাশ পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া অভ্রান্ত ভাবে দেখা সম্ভব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর যাঁহারা ইথারের কথা বলেন, তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত ২৮০০০ ফুট উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

আধ্যাত্মিক সাহিত্য

সংজ্ঞা

আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিতে বুঝিতে হইবে সেই সাহিত্য, যে সাহিত্য হইতে চরাচর সমস্ত বস্তুর উপাদান কি, গুণ কি এবং কার্য্যসামর্থ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যে সাহিত্য হইতে সমস্ত বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়, সেই সাহিত্য যে অতীব বিস্তৃত এবং অতীব মহান তাহা বলা বাহুল্য।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের জ্ঞান থাকিলে কি কি বস্তু মানুষের প্রকৃত অভীষ্ট এবং উহা লাভ করিতে হয় কি উপায়ে তাহা জানা যায়। আধ্যাত্মিক সাহিত্য নির্ভুল হইলে কোন্ মানুষের কোন্ কার্য্যের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় তাহা অভ্রান্তভাবে জানা যায় এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে সাংসারিক দুঃখকষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক সাহিত্য ভ্রমাত্মক হইলে তাহা হইতে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাহাতে মানুষ গরলকে অমৃত মনে করে। ভ্রমাত্মক আধ্যাত্মিক সাহিত্যানুসারে কার্য্য করিলে মানুষের পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে হয়।

জ্ঞানী, কুজ্ঞানী এবং অজ্ঞানী

সংজ্ঞা

নির্ভুল আধ্যাত্মিক সাহিত্য হইতে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং যে মানুষ নির্ভুল আধ্যাত্মিক সাহিত্য জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে "জ্ঞানী" বলা যাইতে পারে।

ভ্রমাত্মক আধ্যাত্মিক সাহিত্য হইতে বিকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং যিনি বিকৃত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাকে "কুজ্ঞানী" বলা যাইতে পারে।

যিনি নির্ভুল অথবা ভ্রমাত্মক কোন আধ্যাত্মিক সাহিত্যেরই ধার ধারেন না তাঁহাকে "অজ্ঞানী" বলা হয়। অজ্ঞানী লোক সাধারণতঃ তাহাদের প্রাণে যাহা চাহে তাহা করিয়া থাকে।

আমাদের সাধারণ ধারণা যে কোন সাহিত্যের ধার না ধারা অপেক্ষা ভ্রান্ত সাহিত্যের চর্চ্চা বরং ভাল। ইহা সত্য নহে।

অজ্ঞান বরং ভাল, কিন্তু কুজ্ঞান অতীব ভীষণ।

কি ভাল কি মন্দ তাহা না জানা থাকিলে, কি করিলে যাহা মানুষ চায় তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কি করিলে

মানুষের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু অটুট থাকিতে পারে, কি করিলে মানুষের অন্ন সংস্থান হইতে পারে, কি করিলে মানুষের আরাম অটুট থাকিতে পারে ইত্যাদি, যদি মানুষ বাস্তবতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধির সহায়তায় নির্দ্ধারণ করিয়া লয়, তাহাতে সময় সময় মানুষের ভুল হইলেও হইতে পারে এবং তাহাতে মানুষের ক্লেশোদয়ও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মানুষ প্রায়শঃ নির্ভুলভাবে কার্য্য করিয়া তাহার অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু কুজ্ঞানের আশ্রয় লইলে মানুষ গরলকে অমৃত মনে করে এবং অমৃতকে গরল মনে করে, অথচ মানুষ যে এতাদৃশ ভ্রান্তি-পূর্ণ কার্য্য করিতেছে তাহার বোধ পর্য্যন্ত লোপ পায়। ফলে কুজ্ঞানী লোক সর্ব্বদা তিল তিল করিয়া মরিতে থাকে এবং সে যে প্রতিনিয়ত নিজ কার্য্য দ্বারা স্বীয় ধ্বংস সাধন করিতেছে তাহার বোধ পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে।

প্রকৃত জ্ঞান সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে, অজ্ঞান মানুষের জীবন-যাত্রা ভাল-মন্দে মিশ্রিত করে, আর কুজ্ঞান মানুষকে সর্ব্বদা বিভ্রান্ত করিয়া মানুষের ধ্বংস সাধন করে এবং মানুষ তাহা বুঝিতেও পারে না। ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলে প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হয় যে, জগতে যখন সমস্ত মানুষ সর্ব্বদা তাহাদের অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তখন জ্ঞানের রাজত্ব চলিতেছে। সমস্ত মানুষ সর্ব্বদা যখন স্বকীয় অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন আর মানুষের কোন দ্বন্দ্ব কলহ থাকে না এবং তাহারা এত নির্ঝঞ্ঝাটে চলিতে থাকে যে, তাহারা যেন নাই এইরূপ মনে হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মানুষের জীবন-যাত্রা ভাল-মন্দে মিশ্রিত থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, মানুষ অজ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছে। তখন মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু মানুষের সে দ্বন্দ্ব-কলহ খুব প্রকট হয় না।

তৃতীয়তঃ স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মানুষের জীবন-যাত্রায় বিভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রতি কার্য্য স্বীয় ধ্বংসের সহায়ক হইয়া থাকে, অথচ সকল মানুষ কি চাহে তাহার বিচার পর্য্যন্ত কোন মানুষ করে না এবং সকল মানুষ যাহা চাহে তাহা পাইবার কোন চেষ্টা হয় না এবং সর্ব্বদা সকলে অভাবগ্রস্ত থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কুজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

জ্ঞান কুজ্ঞান এবং অজ্ঞানের বিধিবদ্ধ একটী ক্রম আছে। মানুষ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে সাংসারিক জীবনযাত্রায় সর্ব্বপ্রকারের প্রকৃত সুখ-শান্তি পাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়িয়া দেয় ও নিজের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকৃতি ঘটে। জ্ঞানের এই বিকৃতির নাম কুজ্ঞান।

কুজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হইলে মানুষ প্রতিনিয়ত স্বীয় সংসারযাত্রায় বিধ্বস্ত হইতে হইতে যাঁহারা কুজ্ঞানের উপদেষ্টা তাঁহাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তখন আর কাহারও কথা মান্য করিতে চাহে না এবং ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিবার ইচ্ছার উদ্ভব হয়। কাহারও কথা না শুনিয়া স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিবার ইচ্ছার নাম "অজ্ঞান"।

স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইলে জগতের বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং তখন আবার প্রকৃত জ্ঞানোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা জাগে। তখন যদি কুজ্ঞানের প্রভাব সম্পূর্ণ অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে।

কাযেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের পর কুজ্ঞান, কুজ্ঞানের পর অজ্ঞান, অজ্ঞানের পর আবার জ্ঞান মানুষের স্বভাবে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। ইহা ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞানের কথা।

মানুষের অবয়বের কোথায় কি আছে এবং কোন্ অঙ্গের কোন্ কার্য্যফলে ঐরূপ ভাবে জ্ঞানের পর কুজ্ঞান, কুজ্ঞানের পর অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের পর আবার জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং কি করিলে সর্ব্বদা প্রকৃত জ্ঞান বজায় রাখা যায়, তৎ-সম্বন্ধে আমাদের দেবতাস্বরূপ ঋষিগণ অনেক আলোচনাই করিয়াছেন। তাহা অতীব জটিল এবং তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। কাযেই এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা আমরা করিব না।

জগতের ইতিহাসে মানুষের জ্ঞান, কুজ্ঞান ও অজ্ঞানের পরিচয়

মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান, কুজ্ঞান ও অজ্ঞানের খেলা অহরহ চলিতেছে তাহা জগতের ইতিহাসের সহিত ইয়োরোপ এবং

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইতে পারে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে জগতের ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহার বহু অংশই কার্য্য-কারণ বিজ্ঞানের সমঞ্জসীভূত নহে এবং ভ্রমাত্মক কথায় পরিপূর্ণ। কাযেই কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য ইতিহাস ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়। এখানে আমরা আরও বলিতে বাধ্য যে, ইতিহাসের এই বিকৃতির জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের দায়িত্ব অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের দায়িত্ব অধিক।

যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা পরাধীন বলিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ অযথা আমাদের উপর কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা যে ইহার রহস্য সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমাংশে লিখিত ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস এবং শেষার্দ্ধের শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস পড়িলেই পরিস্ফুট হয়।

খৃষ্ট জন্মাইবার বার শত পূর্ব্বাব্দ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চারিটী:—

(১) খৃষ্টদেবের জন্ম হইতে খৃষ্টাব্দ নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়দিগের ধর্ম্ম লইয়া কলহ ও যুদ্ধ এবং বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টার পরিচয়-হীনতা।

(২) খৃষ্টাব্দ দশম শতাব্দী হইতে ধর্ম্মবিষয়ক যুদ্ধ-প্রবৃত্তির হ্রাস এবং তদবধি ইয়োরোপীয় প্রত্যেক জাতির ভারতবর্ষে আসিবার অভিলাষ এবং বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টা।

(৩) খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উন্মেষ এবং খৃষ্টাব্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার উন্নতির প্রযত্ন এবং ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে ঐক্য।

(৪) বর্ত্তমান ইয়োরোপের অন্নাভাব, বেকার, রাজ্য ও সমাজ-শাসনে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব এবং পাশবিক শক্তির উপর বিশ্বাস।

এই সময়ে ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা চৌদ্দটী:—

(১) বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব এবং তাহার সহিত হিন্দু পণ্ডিতগণের বিরোধ।

(২) মূল পাণিনি ব্যাকরণ ও বেদের আলোচনার বিরতি।

(৩) বৌদ্ধ-দর্শনের পর আর কোন মৌলিক দর্শন প্রণয়নের চেষ্টার বিরতি।

(৪) বিবিধ দর্শনের বিবিধ ভাষ্য এবং একই দর্শনের অর্থ লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতবিরোধ।

(৫) বিবিধ ব্যাকরণের উদ্ভব এবং বৈয়াকরণিকগণের মত-পার্থক্য।

(৬) বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রূপোপভোগ-লালসা-বৃদ্ধিকর কাব্যের অভাব এবং পরবর্ত্তী-কালে রূপোপভোগ-লালসা-বৃদ্ধিকর কাব্যের উদ্ভব।

(৭) সংহিতার অর্থ লইয়া মত-বিরোধ এবং নব্য-স্মৃতির উদ্ভব।

(৮) প্রাচীন দর্শনগুলির আলোচনায় শৈথিল্য এবং নব্য-ন্যায়ের উদ্ভব এবং প্রাদুর্ভাব।

(৯) রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও আর্থিক স্বাধীনতা।

(১০) রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সময়ে দেশের জনসাধারণের তৎ-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য।

(১১) ভারতবর্ষাধিকারের পর মুসলমানগণের ও ইংরেজ-গণের ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতির উন্নতি।

(১২) ইংরেজ রাজত্বে বেদ ও দর্শনাদির চর্চ্চার প্রযত্ন।

(১৩) অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তির ক্রমিক হ্রাস।

(১৪) দেশব্যাপী অস্বাস্থ্যের বৃদ্ধি এবং বর্ত্তমানে আর্থিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও দেশব্যাপী অসন্তুষ্টি এবং অভাব।

জগতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

(১) বৌদ্ধধর্ম্মোদ্ভবের আগে বৈদিক ধর্ম্মেতর অন্য কোন ধর্ম্মের অস্তিত্বের অভাব।

(২) বৌদ্ধধর্ম্মের পরে এক একটী করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্ভব।

(৩) বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মযাজকদিগের পুতুল-পূজা, অগ্নি-পূজা এবং সূর্য্য-পূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান।

(৪) এই কালের প্রারম্ভে ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের সংখ্যার প্রাচুর্য্য এবং বর্ত্তমানে তাহার হ্রাস।

(৫) বর্ত্তমান কালে জগদ্ব্যাপী অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, যুদ্ধ এবং কলহ-প্রবৃত্তি।

ইয়োরোপের, ভারতবর্ষের এবং জগতের ইতিহাসের উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পাঠ করিলে বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষে একদিন প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞান সারা জগৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম্মের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের এই জ্ঞান তথাকথিত পরলোক-সম্বন্ধীয় নহে। উহা মানুষ কি উপায়ে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া অন্নাদির সংস্থান করিতে পারে এবং শান্তি ও সন্তুষ্টির সহিত দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান। ভারতবর্ষে তাদৃশ প্রকৃত জ্ঞান ছিল বলিয়াই ভারতবাসীর কোনদিন অন্নের জন্য দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে হয় নাই এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে অন্নের ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য ও সন্তুষ্টি ছিল বলিয়াই কোন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ভারতবর্ষের এই আর্থিক প্রাচুর্য্যের জন্যই যখন যে জাতি ভারতের রাজত্ব পাইয়াছেন, সেই জাতি ঐশ্বর্য্যশালী এবং খ্যাতিমান্ হইতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত জ্ঞান পুরাকালে ইয়োরোপীয়গণ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য গ্রীকগণের পূর্ব্বে ইয়োরোপে কোন বিজ্ঞানমূলক সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইবার ফলে ইয়োরোপেও যাহাতে কোনরূপ অন্নকষ্ট না হয় এবং অন্নের জন্য স্বীপুত্র ছাড়িয়া অন্য দেশে না যাইতে হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল। তাহারই জন্য নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়গণ ধর্ম্ম লইয়া কলহ এবং যুদ্ধ করিবার অবসর পাইয়াছিল এবং তাহাতে কালক্ষেপণ সত্ত্বেও তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিপদসঙ্কুল রাস্তায় বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে হয় নাই এবং বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টাও করিতে হয় নাই। ভারতবাসীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধীয় সংস্কার তাৎকালিক ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই সংস্কার বশতঃ তাঁহারা প্রত্যেকে দশম শতাব্দীতে তাঁহাদের অন্নাভাব উপস্থিত হইলে পর, তাহার মোচনার্থ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ভারতবাসীর এই প্রকৃত জ্ঞান জগতের সমস্ত জাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য অগ্নি, জল এবং পুতুল-পূজা সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণ তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশেই অগ্নি-জলাদির পূজার প্রচলন দেখিয়াছেন।

ভারতবাসীর এই জ্ঞান ও তাহার বিতরণের ফলে জগতের সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত এবং বিরাজিত হইয়াছিল। তাহারই জন্য ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে কোন যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায় না এবং মনে হয়, এই সময়ে জগতে কোন লোকই যেন ছিল না।

কতদিন আগে এবং কবে যে ভারতবর্ষে উপরোক্ত প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যমান ছিল তাহা বর্ত্তমান ইতিহাসের সাহায্যে বলা যায় না। তবে ভারতবর্ষে যে একদিন মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রকৃত জ্ঞান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জগৎ যখন এই জ্ঞান কি তাহা যথাযথ জানিতে পারিবে তখন তাহার সাহায্যে ভারতবাসীর এতাদৃশ উন্নতির সময় কবে ছিল তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে।

ইহার পর এই জ্ঞানের বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং সর্ব্বত্র কুজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। এই কুজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই মানুষ স্বীয় জীবনযাত্রায় অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারই জন্য মানুষ আর স্বীয় প্রচলিত চাল চলনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই এবং বুদ্ধদেব যখন নূতন চালচলনের পদ্ধতি (ধর্ম্ম) প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন মানুষ তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ দূর করিবার কোন পথ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কাজেই সমস্ত মানুষ তাহা গ্রহণ করে নাই এবং খৃষ্টদেব যখন তাঁহার চালচলনের পদ্ধতি (ধর্ম্ম) প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আবার কোন কোন মানুষ তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে এবং এখনও খৃষ্টদেবের প্রদর্শিত পথে

মানুষের নৈতিক চরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব বটে এবং পরোক্ষভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাও সম্ভব হয় বটে, কিন্তু খৃষ্টদেবের প্রদর্শিত পথে জগতের শস্যোৎপাদনের অথবা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অন্নাদি সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয় না। কাযেই খৃষ্টদেবের প্রদর্শিত পথও সকল মানুষ গ্রহণ করে নাই। ইহারই জন্য আবার যখন নবী মহম্মদের প্রদর্শিত পথ মানুষ জানিতে পারিয়াছিল তাহাও অনেকে অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাতেও মানুষের দুঃখ দূর করিয়া প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার অনেক উপায় আছে বটে, কিন্তু শস্যোৎপাদন এবং প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অন্নাদি সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নাই। তাহারই ফলে ভগবান মহম্মদের প্রদর্শিত পথ সকল মানুষ মিলিত হইয়া গ্রহণ করে নাই এবং তাহা লইয়া মানুষের ভিতর নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ-কলহ চলিয়াছিল।

ভারতীয় ঋষির প্রকৃত জ্ঞানোদ্ভূত পথের সংগঠনের ফলে নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও জগতের সর্ব্বত্র অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই জ্ঞান বিকৃত হইয়া যাওয়ায় অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থাও বিকৃত হইয়াছিল এবং নবম শতাব্দীর পর সর্ব্বত্রই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য একটা আকুলতার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারই জন্য নবম শতাব্দীতে ধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ-কলহের প্রখরতা কমিয়া গিয়াছিল এবং মানুষ কি করিয়া অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইয়োরোপের জগৎ পরিভ্রমণের ইচ্ছা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যপ্রসারের চেষ্টা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য আকুলতার পরিচয়।

এই সময় ভারতবর্ষে অন্নের ঠিক অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতবাসীরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহার পরিচয় ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ। আচার্য্য ও ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণই তখন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব করিতেন।

ভারতীয় ঋষির প্রকৃত জ্ঞান যে তখন হইতেই বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ—তখন হইতেই ভারতীয় দর্শন ও বেদ যে অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে এই গ্রন্থগুলির মধ্যে আর জমীর উর্ব্বরতা-সাধনের উপায়, শস্যোৎপাদনের উপায় অথবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাৎকালিক আচার্য্য ও ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উহার মধ্যে কেবল অপ্রতীত পরকালের কথাই (Metaphysics) দেখিতে পাইয়াছেন এবং দর্শন ও বেদের বহু কথারই যে প্রকৃত কি অর্থ, অর্থাৎ তাহাতে কোন্ দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম বুঝায়, তাহা অদ্যাবধি নির্দ্ধারিত হয় নাই। মহাপুরাণের বক্তব্যও তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে আজগুবি গল্পে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে ভাষা-জ্ঞানের বিকৃতির পরিণাম তাহার পরিচয় বিভিন্ন ভাষ্যকারের বিভিন্ন অর্থ। প্রত্যেক ভাষ্যকারই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, অথচ দুইজন ভাষ্যকার একই গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে একই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে এবং কোন ব্যাখ্যাই অসংলগ্নতা, অপ্রাসঙ্গিকতা বিহীন নহে এবং কোন ব্যাখ্যাতেই গ্রন্থস্থ শব্দগুলিতে কোন্ দ্রব্য, অথবা কোন্ গুণ অথবা কোন্ কর্ম্ম বুঝায়, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। ভাষা-জ্ঞানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহার অন্যতম পরিচয় নূতন নূতন ব্যাকরণের উদ্ভব। যদি ভাষা-জ্ঞানেরই বিকৃতি না হইত, তাহা হইলে স্মরণাতীত কাল হইতে একমাত্র যে ব্যাকরণ ভাষা বুঝিবার সহায়তা করিয়া আসিতেছিল, সেই অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া সাজাইবার অথবা বিবিধ ব্যাকরণ প্রণয়নের কি প্রয়োজন হইতে পারে?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, স্মরণাতীত কালে প্রকৃত জ্ঞান জগতে ছিল এবং সেই জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল দেবোপম ভারতীয় ঋষির মস্তিষ্ক হইতে এবং তাহা যে সারা জগতের সমস্ত মানুষের দৈনন্দিন অন্নাদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পারিয়াছিল ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

জগতে 'কুজ্ঞানে'র উদ্ভব হইয়াছিল বুদ্ধদেবের জন্ম পরিগ্রহ করিবার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার পূর্ণ প্রভাব চলিয়াছিল খৃষ্টাব্দ নবম অথবা দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত।

নবম অথবা দশম শতাব্দীর পর হইতে জগতে 'অজ্ঞানে'র প্রভাব দেখা দিয়াছে এবং তাহা চলিয়াছে পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এই সময় ইয়োরোপীয়গণ আর তাৎকালিক কাহারও উপদেশে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই এবং নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া অন্নাদি

নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখনই যে ইয়োরোপে খাদ্যশস্যোৎপত্তির অল্পতা পরিলক্ষিত হয় তাহা মনে করিবার কারণ আছে। তখনও ইয়োরোপে আডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রভৃতি অর্থনৈতিকগণের আবির্ভাব হয় নাই, রুসোর শিক্ষানীতি প্রচারিত হয় নাই, খনি হইতে কয়লা ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু উত্থিত করিয়া তাহার বহুল প্রচারের উদ্যম তখনও এত অধিক পরিমাণে জাগ্রত হয় নাই, বাষ্প ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজ-পদার্থের ব্যবহার তখনও মানুষ এত অধিক পরিমাণে করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু এই সময়ে কোন তথাকথিত পণ্ডিতের কথা না শুনিয়া স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিবার ফলে ইয়োরোপ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাৎকালিক জগতের সমস্ত দেশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং দৈনন্দিন জীবনে আবার অপেক্ষাকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।

আমাদের সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত অথবা তথাকথিত পণ্ডিত-গণের কোন কথা না শুনিয়া স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে চলিলে মানুষ "অজ্ঞানী" হয় তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। এবং তদনুসারে ইয়োরোপীয়গণ দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত "অজ্ঞানী" ছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহাদের উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের অভাব বশতঃ এই উন্নতি কি করিয়া স্থায়ী করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই এবং মানুষের জীবিকার প্রকৃষ্ট উপায় কি এবং উহা সাধন করিবার বিধি কি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

এই সময়ে ভারতবর্ষেও অজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। ভারতবাসীও প্রাচীন দর্শন, পুরাণ ও সংহিতাদিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। চৈতন্যদেব প্রণীত দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা, নব্য-ন্যায়, নূতন নূতন উপ-পুরাণ, নব্য-স্মৃতি তাহার পরিচয়। ভারতবাসীর অন্নাভাব ইহার পূর্ব্বেও হয় নাই এবং এই সময়েও হয় নাই। মুসলমান রাজাদিগের প্রভাবে একটা নূতন ভাবের সজাগতার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রকৃত জ্ঞানের অভাববশতঃ জগতের কোথায়ও খাদ্য-শস্যোৎপত্তির অথবা জমীর উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা এই সময়ে হয় নাই। বরং সর্ব্বত্রই জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও খাদ্য-শস্যোৎপত্তির পরিমাণ কমিয়া আসিতে-ছিল।

ভারতীয় ঋষিদিগের কথিত 'জ্ঞান', 'কুজ্ঞান' এবং 'অজ্ঞানে'র বিধিবদ্ধ ক্রমানুসারে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'অজ্ঞান' অবস্থার পর সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবীতে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইবার কথা। প্রকৃত জ্ঞানের মূল ভিত্তি বাস্তবতার পর্য্যবেক্ষণ এবং তদনুসারে চালচলনের বিধি-প্রণয়ন। বাস্তবতা-পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছার উদ্ভব যে ষোড়শ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান বিজ্ঞান।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের বাস্তবতা-পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছা যে হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ভাবিয়াও থাকেন যে, তাঁহাদের বিজ্ঞান বাস্তবতা-প্রসূত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত বাস্তবতা দেখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তই হইয়াছে, এখনও যে তাঁহারা বস্তুর বাস্তব অবস্থা কি উপায়ে দেখিতে হয় তাহা জানিতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে তাঁহারা যাহা বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা আসলে বিকৃত বিজ্ঞান এবং ঐ বিকৃত বিজ্ঞানই বর্ত্তমান জগতের অভাব ও দৈন্যের কারণ, তাহা তাঁহারা অথবা বর্ত্তমান জনসাধারণ বুঝিতে পারেন না।

ভগবান আমাদিগকে বাস্তব জিনিষ দেখিবার জন্য পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। তাহাদের নাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্। চক্ষুর সহায়তায় আমরা বস্তুর রূপ দেখিয়া থাকি, কর্ণের সহায়তায় আমরা শব্দ অথবা কথা শুনিয়া থাকি, প্রচলিত ধারণানুসারে নাসিকার সহায়তায় আমরা গন্ধ লইয়া থাকি ও জিহ্বার সহায়তায় আমরা রস গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ত্বকের সহায়তায় আমরা স্পর্শানুভব করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর গুণ অথবা কর্ম্মশক্তি দেখিবার জন্য চক্ষুর ব্যবহার করিতে পারেন না, কারণ অতি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষুর যে তীব্র দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন সেই তীব্র দৃষ্টিশক্তি তাঁহার নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিলে প্রকৃত ক্ষুদ্র বস্তুকে যে বড় করিয়া লওয়া হয়, ক্ষুদ্র গুণ ও কর্ম্মশক্তিকে যে বৃহত্তর করিয়া লওয়া হয় এবং তাহাতে যে মূল বস্তুটীকে যথাযথ না দেখিয়া অন্য রকম করিয়া দেখা হয় এবং তাহার ফলে যে উপলব্ধি লাভ হয়, তাহা যে প্রকৃত মূল বস্তু সম্বন্ধীয়

উপলব্ধি হইল না এবং তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যে ভ্রমাত্মক হইয়া গেল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু দেখিয়া তাঁহারা যে সমস্ত উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও ঐ রূপে ভ্রমাত্মক হইয়া যায়।

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সাহায্যে কোন বস্তু দেখিতে চেষ্টা করিলে তদনুরূপ একটা কিছু দেখা হয় তাহা সত্য, কিন্তু ঠিক ঠিক সেই বস্তুটীকে যে দেখা হয় না তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপ একটা জিনিষ দেখিলে যে সর্ব্বতোভাবে আসল বস্তুটীকে দেখা হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি?

অনুরূপ বস্তু দেখিয়া 'আসল বস্তু' কি হইতে পারে, অথবা একটা বস্তু দেখিয়া তদনুরূপ বস্তু আর কি হইতে পারে তাহার একটা অনুমান করা সম্ভব বটে, কিন্তু আসল বস্তুকে সুনিপুণ চক্ষুর দ্বারা যথাযথ না দেখিতে পারিলে তৎসম্বন্ধীয় ভ্রমহীন জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে ইহা আমাদের ভারতীয় ঋষির কথা। ইহারই জন্য কি উপায়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ যন্ত্রবৎ তীব্র শক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহার চিন্তা তাঁহারা করিয়াছিলেন এবং এই উপায় তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। যদি আবার কখনও ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শন যথাযথ অর্থে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যে যাবতীয় যন্ত্র হইতেও তীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহা জগৎ জানিতে পারিবে।

মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে কি উপায়ে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিতে হয় এবং বায়ুমণ্ডলের আপাত অগম্য স্থানগুলিকে কি করিয়া গমনাগমনযোগ্য করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগতে সমস্ত বস্তুর "আত্মা"-সম্বন্ধে ভ্রমহীন সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত বস্তুর "আত্মা"-সম্বন্ধে ভ্রমহীন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সারা জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে, দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া কোন বস্তুকে যথাযথ দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই। কোন বস্তুকে যথাযথ দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই বলিয়াই বস্তুর প্রকৃত উপাদান কি, তাহার প্রকৃত গুণ কি এবং কর্ম্মশক্তিই বা কি তাহা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাহারই জন্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কোন্ বস্তুর মূল কারণ কি এবং তাহার পরিণতি কি তাহা বলিতে পারেন না। কোন্ বস্তুর কি কারণ এবং কি পরিণতি তাহা না জানা থাকিলে উহা মানুষের ব্যবহারযোগ্য অথবা অব্যবহারযোগ্য তাহা বলা সম্ভব নহে। ইহারই ফলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মানুষের ব্যবহারের ও আরামের জন্য যে সমস্ত বস্তু ও ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাই বাস্তবিক পক্ষে মানুষের ধ্বংস সাধন করিতেছে এবং তাহাই সারা জগতের বর্ত্তমান দুঃখদৈন্যের কারণ। পরন্তু যাহা প্রত্যেক মানুষ চাহিয়া থাকে তাহা যাহাতে মানুষ পাইতে পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক করিতে পারেন নাই এবং বিকৃত বিজ্ঞানের প্রচলনে মানুষের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য এত নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সকল মানুষ কি চাহিয়া থাকে, কোন্ কোন্ জিনিষ মানুষের পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের কোন মানুষ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য এই বিকৃতির জন্য কোন মানুষকে দোষী করা যায় না।

এক শত কি দুই শত বৎসরে কোন বস্তুর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকদের যদি কোন দায়িত্ব থাকে তাহা এই যে, তাঁহারা একটা নূতন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও অবলীলাক্রমে তাহা মানুষের ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনোহর বস্তু যে পরিশেষে বিষবৎ মনে হইতে পারে তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

কাযেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ইচ্ছার উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু মানুষ ভ্রান্ত পথে চলিতেছে বলিয়া প্রকৃত বিজ্ঞান এখনও বাহির হয় নাই। প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ইচ্ছার উদ্ভব যে হইতেছে, তাহার অন্যতম পরিচয় ইয়োরোপীয়দিগের জ্ঞানপিপাসা। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়গণ যে জ্ঞানপিপাসু তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। তাঁহাদেরই প্রযত্নের ফলে ভারতবাসীর লুপ্ত বেদ ও দর্শনের চর্চ্চা আবার আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য ভারতীয় বেদ ও দর্শন অসংলগ্ন এবং অসমঞ্জস অর্থে চলিতেছে। কে জানে যে অচিরে আবার এই বেদ ও দর্শন যথাযথ অর্থে প্রচারিত হইয়া মানুষের প্রকৃত বিজ্ঞান জানিবার এবং দৈনন্দিন জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার ব্যবস্থা হইবে না!

প্রচলিত অর্থনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ভ্রান্তিই যে বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহা আমরা আগামী বারে দেখাইব এবং আমাদের কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ

রাশিয়ার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুশ সরকারের প্রকাশিত গাইড-বই-এ দেখেছিলাম, মস্কোতে 'ভোক্স' (Voks) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে; রাজনৈতিক সম্পর্কশূন্য উপদেশের সঙ্গে সংস্কৃতিগত যোগসূত্র বজায় রাখবার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রদর্শককে বললাম, আমি ঐ প্রতিষ্ঠানে যেতে চাই, তার ঠিকানা ১৭ ত্রুবনিকাউস্কি পেরেনলোক, মস্কো ৬৯ (17 Trubnikovski Perenlok, Moscow 69)। এই প্রতিষ্ঠানটি আমার প্রদর্শক জানত না, কারণ রীতিমত খোঁজ করে বাড়ীটি সে আবিষ্কার করলে। বাড়ীটি অবশ্য নেহাৎ ছোট নয়—রাষ্ট্রের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শক সেখানে গিয়ে বললে, আমি একজন ভারতবাসী ও আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন—তিনি প্রাচ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি ইংরেজী খুব কম জানেন, কাজেই প্রদর্শকের মারফত এখানেও কথাবার্ত্তা চালাতে হল। তরুণী বান্ধবী খুব চমৎকার ইংরেজী ও ফরাসী বলতে পারত; এত সুন্দর ইংরেজী বলত যে তার উচ্চারণে বিদেশীর বিকৃত সুর ধরা পড়ত না।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'সোভিয়েট কালচার রিভিউ' নামে একটি ইংরেজী মাসিক ও "সোস্যালিষ্ট কনষ্ট্রাকশন ইন দি ইউ এস. এস. আর." (Socialist Construction in the U. S. S. R.) নামে একটি দ্বৈমাসিক পত্র—ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই গুলিতে রাশিয়ার অগ্রগমনের ও উন্নতির ইতিহাস আলোচিত হয়—বিদেশে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্যই এগুলি পরিচালিত। আমাকে এ গুলির কয়েক সংখ্যা তাঁরা উপহার দিলেন।

কথাবার্ত্তার মাঝে আমি বললাম, "আপনাদের কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আমি দেখেছি; সে সব বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করব না। রাশিয়ার রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামো আমার কাছে এখনও রহস্যাবৃত। গাইড-বইগুলিতে পড়েছি, রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে সোভিয়েটগুলিই সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু সোভিয়েটের কর্ণধারদের নামের মধ্যে আমি ত কোথাও ষ্টালিনের নাম খুঁজে পেলাম না; অথচ শুনি তিনি ডিক্টেটার।"

—"ষ্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী"—প্রদর্শক তর্জ্জমা করে ভদ্রলোকটির কথা বোঝাতে লাগল, "কিন্তু তার ইউনিয়ানের (রাষ্ট্রের) সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। সমস্ত রাশিয়া বিয়াল্লিশটি স্বয়ংশাসিত 'ইউনিটে' (unit) বিভক্ত। এর মধ্যে নয়টি ফেডারেল মেম্বার ষ্টেট (federal member state), পনরটি স্বয়ংশাসিত রিপাব্লিক (autonomous republics) এবং আঠারটি স্বয়ংশাসিত রিজিয়ন (region)। এই সব ইউনিটগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে স্বাধীন।"

—"আভ্যন্তরীণ শাসন মানে—কি কি বিষয়ে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "আভ্যন্তরীণ আইনকানুন, সাধারণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি। অর্থনীতি, রাজস্বের আয়-ব্যয় (financial) এবং শ্রমিক সম্বন্ধীয় সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে এদের চলতে হয়। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি (Central Executive Committee) সব সময়েই সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা।"

—"আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার বলতে কি সৈন্য, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সংস্রব ইত্যাদি বোঝায়?" জিজ্ঞাসা করলাম।

—"হ্যাঁ, এ সব ছাড়া দেশের যানবাহন, বৈদেশিক বাণিজ্য, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকানুন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, —এসবও কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির এলাকাধীন।"

—"তা হলে কেমন করে আপনারা বলেন যে অধীন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন? প্রকৃত পক্ষে আসল ব্যাপারেই তাদের হাত বাঁধা"—আমি বললাম।

বিস্মিত হয়ে প্রদর্শক জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

—"তা ভিন্ন কি? আমাদিগকে বৃটীশ সরকার ঠিক অতটুকু অধিকারই দিতে চেয়েছে—তারা সবই আমাদের হাতে দিতে চায়; খালি সৈন্য, বৈদেশিক বিভাগ, নৌবিভাগ, ও টাকাকড়ির ব্যাপারটুকু নিজেদের আয়ত্বে রাখতে চায়। শ্রমিকশাসিত দেশের ও বৃটীশ-শাসিত দেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়েই প্রভুত্বে সমান, পরাধীনদের কপালে একই

দুঃখ। কি জন্য লোকে তোমাদের মত গ্রহণ করে তোমাদের অধীনতা স্বীকার করবে?"

—"অধীন রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে"—প্রদর্শক বললেন।—"হয়ত কাগজ কলমে তা থাকতে পারে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। ইতিহাস তোমাদের এ উদারতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। আরমেনিয়া, জর্জ্জিয়া, আজার বৈজান প্রভৃতি প্রদেশকে তোমরা জোর করে নিজেদের অধীনে এনেছ"—আমি খুব জোর দিয়ে বললাম।

—"কিন্তু আপনি জানেন আমরা পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এসথোনিয়া, লিথুয়েনিয়া, ল্যাটভিয়া প্রদেশকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করি নাই! তারা আজও পৃথক রিপাব্লিক"—প্রদর্শক নিজের পক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করলেন।

আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম -"সেগুলো মোটেই রুশ সরকারের উদারতার জন্য নয়; অক্ষমতার জন্য। পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডকে নিজের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করতে রাশিয়া কসুর করে নাই, কিন্তু শক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত কুলায় নাই। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য রাশিয়াকে বাধ্য হয়ে নিজেদের সীমানা থেকে ঐসব দেশকে বাদ দিতে হয়েছে। নয় কি?"

হাস্যরসিক প্রদর্শক আত্মসমর্পণের অভিনয়ে হাতদুটি উপরে তুললেন—আমি হেসে ফেললাম। সহসা আমার সুবুদ্ধি ফিরে এল; মনে পড়ল আমি সাতসমুদ্র তেরনদী পারে রাশিয়ায় বসে কথা বলছি; তাদের দেশে বসেই তাদের সরকার সম্বন্ধে এমন তীব্র মন্তব্য করা অশোভন, বিপজ্জনক; বিরুদ্ধ মতামতের কণ্ঠরোধ করতে সকল দেশের সকল-পন্থী সরকার সমান ব্যগ্র; বিশেষ রুশ সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। আমি অন্য কথা পাড়লাম।

- "আচ্ছা, কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনপদ্ধতি কি?"—তিনি বোঝাতে লাগলেন, "কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি (Central Executive Committee) দুটি 'চেম্বারে' বিভক্ত। একটির নাম "সোভিয়েট অব ইউনিয়ানস" (Soviet of Unions), এটিতে বিভিন্ন ইউনিয়নে থেকে চার শ' জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। এই চেম্বারে প্রত্যেক ইউনিয়ান অর্থাৎ প্রদেশ নিজেদের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠায় আর 'সোভিয়েট অব ন্যাশানালিটিস্' (Soviet of Nationalities) নামে দ্বিতীয় 'চেম্বারটি'তে দেশের সমস্ত জাতি তাদের প্রতিনিধি পাঠায়। এই নির্ব্বাচন প্রথায় কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতিতে দেশের সমস্ত প্রদেশ লোক-সংখ্যার অনুপাতে ও সমস্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ জাতি সমানভাবে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে; এতে দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হয়। রাশিয়ায় ১৮৫টি জাতিগত ও ১৪৭টি ভাষাগত এবং কয়েকটি ধর্ম্মগত সম্প্রদায় আছে। পূর্ব্বে একমাত্র রুশীয় ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত; জারের আমলে বিভিন্ন প্রদেশ তাদের প্রাদেশিক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে পেত না। কিন্তু এখন প্রত্যেক জাতি এবং উপজাতি তাদের প্রাদেশিক ভাষা নিজ নিজ প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। পূর্ব্বে এক প্রদেশের অর্থে অন্য প্রদেশের ঘাটতি মিটানো হত, এখন তা বন্ধ হয়েছে; প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ আয় থেকে ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হয়, এক প্রদেশের অর্থে অন্য প্রদেশ আর্থিক স্বাচ্ছল্য ভোগ করে না।"

রাষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থা বুঝলাম, কিন্তু কমিউনিষ্ট দলের কথা কেবলই মনের মধ্যে ফিরতে লাগল; পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ষ্টালিন কে? কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি?"

—"কোন সম্পর্ক নাই—"

"তবে তাঁকে ডিক্টেটার বলা হয় কেন?"—জিজ্ঞাসা করলাম, মৃদু হেসে তরুণী প্রদর্শক বললে—"কারণ তিনি ডিক্টেটার।"

—"তা হলে এই সব সোভিয়েট ও বিভিন্ন চেম্বার প্রভৃতি খাড়া করে রেখে লাভ কি? যে লোকের সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো যোগ নাই, যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নয়, এমন কোন লোক যদি তোমাদের রাষ্ট্রনিয়ামক হন তা হ'লে একে জনসাধারণের শাসন কেমন ক'রে বলব? আচ্ছা, আইনতঃ রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ামক কে?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রদর্শক

বললে—"কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির সভাপতিই প্রকৃতপক্ষে দেশের নেতা, আর ষ্টালিন তাঁর দলের অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা।"

কথাটা প্রদর্শক 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ'র মত করে আমায় বলবার চেষ্টা করলে। সে বললে, "সেটা ঠিকই; কিন্তু কমিউনিষ্ট দল এখন রাশিয়ায় সর্ব্বশক্তিমান হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের সকল বিভাগ কমিউনিষ্টদের হাতে থাকায় কমিউনিষ্টদলের নেতাই প্রকৃত পক্ষে দেশকে পরিচালিত করেন এবং 'ডিক্টেটার' নামে পরিচিত। ক্রেমলিন দুর্গের ভিতর থেকে এই দলপতি দেশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ গেপেয়ু (G. P. V.) সৈন্য বিভাগ, নৌ ও বিমান বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, কৃষি শিল্পের উৎপন্ন পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভাগগুলা পরিচালিত করেন। দেশের প্রায় সমস্ত সরকারী পদেই কমিউনিষ্টরা নিযুক্ত, যদিও তাঁরা বলেন যোগ্যতা থাকলে যাঁরা কমিউনিষ্ট নন তারাও ঐ সব পদ পেতে পারেন। অল্প কিছু দিন আগে ষ্টালিন একটি বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন, নিজদিগকে কমিউনিষ্ট বলেন না অথচ মনে প্রাণে কমিউনিষ্ট এমন বহু লোক দেশে আছেন, কাজেই সরকারী পদে এমন লোকও নেওয়া হয়।"

আমার হোটেলমুখো তুষারাস্তীর্ণ পথগুলি দুজনে যখন একে একে হেঁটে পেরিয়ে চলেছিলাম তখন প্রদর্শককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—"তোমাদের বাজেটে দেখলাম ষ্টেট তিন শ' কোটি রুবল ধার নিয়েছে। এই ধার কে দিলে ও কি সুদে দিয়েছে?"

—"জনসাধারণই এই টাকা ষ্টেটকে ধার দিয়েছে এবং তারা সুদ পায়। তুমি হাসছ কেন? তুমি বুঝি ভাবছ রাষ্ট্র আবার একটা ধনী সম্প্রদায় গড়েছে? না তা নয়। ওদিকে খুব চড়া হারে আয়কর ও উত্তরাধিকার-কর (inheritance tax) দিতে হয়"—প্রদর্শক ওকালতি করলে।

—"যাই বল, তোমাদের রাষ্ট্র এমন কতকগুলি লোক তৈরী করছে, যারা বিনাশ্রমে তাদের সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু না কিছু আয় ভোগ করে। বাড়ীর আসবাব-পত্র, জামা-কাপড় ও তৈজসপত্রের মত এই সব ঋণপত্রগুলিও ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এইটাই ত তোমাদের পরাজয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। ধনোৎপাদনের ব্যক্তিগত পন্থা লোপ করাই সোস্যালিজমের মূল সূত্র, কিন্তু তোমরা তা পার নি।"

—"কিন্তু রাষ্ট্রের বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তার বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্র একজনের কাছ থেকে বেশী টাকা ধার নেয় না, কাজেই একজনের বেশী সুদ পাবার আশা নাই; তুমি ত জান এখন রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রতি তার মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন করেছে"—সে বললে।

আমি পরে অন্য একটি বই-এ দেখেছিলাম যে, রাশিয়ার চতুর্থ ঋণ গ্রহণের সময় ঋণদাতার সংখ্যা চার কোটী ও ঋণের পরিমাণ তিন শ' কোটী রুব্‌ল, কাজেই মনে হয় প্রদর্শকের কথা অতিরঞ্জিত নয়। অনেকের ধারণা রাষ্ট্র এই ভাবে ঋণ গ্রহণ করে জনসাধারণের সঞ্চয়টুকু আত্মসাৎ করে ও ধন একত্রীভূত হতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন্ বিভাগ ঋণ নেয়? কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি কি?"

—"না, কার্য্যকরী সমিতি শুধু শাসন ব্যাপার নিয়েই থাকে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'গ্যসব্যাঙ্ক' (gosbank) এই ঋণ গ্রহণ করে"—সে বললে।

—"এই ব্যাঙ্কেই বুঝি দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কিং কাজ চলে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

—"অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোকেও এখানে টাকা জমা রাখে কিনা জিজ্ঞাসা করছ?"—সে জিজ্ঞাসা করলে।

—"হ্যাঁ, শুধু সাধারণ লোক কেন? কলকারখানা, কেন্দ্রীভূত কৃষিক্ষেত্রগুলি এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির কথাও বলছি।" সে উত্তর দিলে—"সাধারণে ব্যক্তিগত হিসাব রাখে সমবায় ব্যাঙ্কে (co-operative bank) এবং সেভিংস ব্যাঙ্কে (সর্ব্বসমেত ষাট হাজার শাখা আছে) কিন্তু কলকারখানা, যানবাহন প্রতিষ্ঠান, বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গ্যসব্যাঙ্ক (gosbank) বা প্রোম ব্যাঙ্কের (promo bank) কাছ থেকে টাকা ধার করে ও তাদের কাছেই টাকা আমানত রাখে।"

—"প্রোমব্যাঙ্ক আবার কি?" জিজ্ঞাসা করলাম।

—"এই প্রতিষ্ঠান কোন নূতন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় দীর্ঘ মেয়াদে বিনা সুদে টাকা ধার দেয় আর গ্যসব্যাঙ্ক অল্প সময়ের মেয়াদে এই সব প্রতিষ্ঠানকে সাময়িক

ঋণ দেয় এবং শতকরা পাঁচ থেকে সাত রুবল সুদ আদায় করে"—সে বললে।

বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"গ্রোমব্যাঙ্ক তা হলে শুধু শুধুই টাকা খাটায় কেন? রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান টাকায় সুদ নেয় অপরটি নেয় না, এর কারণ কি?" —"শুধু শুধু ধার ঠিক দেয় না; যে সব প্রতিষ্ঠান এখান থেকে ধার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের লাভের শতকরা বাইশ ভাগ এই ব্যাঙ্ক নেয়; ইচ্ছা করলে এরা সব লাভই নিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের এই পতিষ্ঠানটি নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। গ্যাসব্যাঙ্ক এই সব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অথবা জরুরী প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ দেয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, সব রকমের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বনজাত সম্পদ, নোট প্রকাশ এবং ডাক বিভাগ পরিচালিত করে"—সে বুঝিয়ে বললে।

কারখানাগুলির লাভ-লোকসানের কথায় খট্‌কা লাগল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার ধারণা ছিল তোমাদের কারখানাগুলো শুধু তৈরীর খরচটুকু নিয়ে বিনা লাভে শ্রমিকদিগকে জিনিষপত্র দেয়; কিন্তু তুমি কারখানার লাভের কথা বলছ। কার পকেটে এই লাভ যায় ও কেন লাভ করা হয়?"

মৃদু হেসে তরুণী উত্তর দিলে—"তোমার ভুল ধারণা, বন্ধু। রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক কারখানা, মোটর ট্র্যাকটার কারখানা ও সমস্ত লঘু শিল্পগুলি এক একটি পৃথক 'ট্রাষ্টের' অধীনে পরিচালিত হয় এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তাদের লাভ-লোকসানের হিসাব দিতে হয়; সব প্রতিষ্ঠানই নিজেদের পড়তার উপর লাভ ধরে বিক্রী করে। কাঁচামাল-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিজের উৎপন্নের উপর লাভ ধরে, সেই দামে কারখানাকে কাঁচা মাল বেচবে ও কারখানা আবার তার উৎপন্নের উপর লাভ রেখে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বা সাধারণকে নিজেদের তৈরী জিনিষ বেচবে। ধনতন্ত্রী দেশের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে সম্পর্ক, এখানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও সেই সম্পর্ক।"

এই রহস্যপূর্ণ দেশের অদ্ভুত ব্যবস্থার ধাঁধাঁ তখনও পরিষ্কার হল না। বললাম—"আমরা ত শুনি যে তোমাদের সমস্ত জিনিষ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে কেমন করে চলে বুঝলাম না।" সে বোঝাতে লাগল—"সমস্ত ট্রাষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাসব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত ট্রাষ্টের কাঁচা বা তৈরী মালের দর গ্যাসব্যাঙ্ক নির্দ্ধারণ করে দেয়; এই দরে যদি কোনো ট্রাষ্টের আপত্তি থাকে, তাকে গ্যাসব্যাঙ্কের কাছে তা জানাতে হবে। ধর, কাপড়ের কলগুলির ট্রাষ্ট দেখলে যে গ্যাসব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত অঙ্কে তুলো-উৎপাদনকারী ট্রাষ্টকে দাম দিতে গেলে তাদের লাভ থাকে না; তখন তারা তুলোর ট্রাষ্টকে সে বিষয়ে না জানিয়ে গ্যাসব্যাঙ্ককে জানাবে। গ্যাসব্যাঙ্ক পঞ্চবার্ষিকী কার্য্য পরিকল্পনা (pyatiletka) তৈরী করে ও বিভিন্ন ট্রাষ্টের ডিরেক্টারের কাছে তাদের বিভাগের পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেয়; তারা আবার তাদের অধীনের ফ্যাক্‌টরীগুলিতে সেটি পাঠিয়ে দেয়, ফ্যাক্‌টরীর শ্রমিকেরা ঐ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে, প্রয়োজন মত সংশোধন করেও পুনরায় ওপরে পাঠিয়ে দেয়। ট্রাষ্টগুলি নিজেদের মতামত সহ পরিকল্পনাটি গ্যাসব্যাঙ্কে ফেরত দিলে গ্যাসব্যাঙ্ক চূড়ান্তভাবে তা ঘোষণা করে। এই হ'ল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা —বুঝলে?"

—"এত উৎপন্নের দিকটা বুঝলাম, কিন্তু যদি খরচের দিকটাও কেন্দ্র থেকে পরিচালিত না হয়, তা হলে অন্য দেশের মত প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন হয়ে, মন্দাবাজারের সৃষ্টি করবে"—বললাম। —"তা ঠিক; কিন্তু সে দিকটাও গ্যাসব্যাঙ্ক দেখে। দেশের উৎপাদিত কলকব্জা, খনিজ পদার্থ, ও কাঁচামাল রাষ্ট্র পরিচালিত কারখানাগুলিই ব্যবহার করে, কাজেই প্রয়োজনের অনুপাতে উৎপন্ন পরিচালিত করা বিশেষ কঠিন কিছু নয়।"

উত্তরটায় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না—তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন তোমরা ব্যক্তিগত ব্যবসাকে ছাড়পত্র দিয়েছ, কৃষকদিগকে এখন শুধু শস্যের কিয়দংশ খাজনা স্বরূপ দিতে হয়, উদ্বৃত্ত শস্য কৃষকেরা যে কোন দরে বাজারে বেচতে পায়—এর ফলে রাষ্ট্র-পরিকল্পিত উৎপন্নের পরিমাণ কম বেশী হতে পারে না কি?"

হেসে বান্ধবী উত্তর দিলে—"যদিও আইনতঃ কৃষকেরা বাজারে নিজেদের উৎপন্ন বেচতে পায়, কিন্তু বাজারে বেচলে তাদের এত চড়া হারে কর দিতে হয় যে, তারা ষ্টেটের কাছেই নিজেদের শস্য বিক্রী করতে পছন্দ করে। তারা ইচ্ছামত দরেও বেচতে পায় না, রাষ্ট্রের নির্দ্ধারিত মূল্যে বেচতে বাধ্য। তাছাড়া যারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে—এমন কি ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত, শ্রমিক-টিকিট পায় না, ফলে তাদের জীবিকা উপার্জ্জন সুকঠিন হয়। শস্য ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসার দ্বারা এমন কিছু উৎপন্ন হয় না যার দ্বারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পরিমাণের কম বেশী হতে পারে।"

কথা কইতে কইতে মস্‌কাভা নদীর সেতু পেরিয়ে আমার হোটেলের দরজায় এসে পড়েছিলাম। হোটেলের প্রকাণ্ড কাঁচের ঘোরানো দরজাটার মধ্যে দুজনে মাথা গলালাম।

পিঁপড়ের সমাজ

§ এদেশের নানাশ্রেণী

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

রাজপুরীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই শশব্যস্ত।

পুরীর মহলের পর মহল পার হয়ে চলেছেন ভয়কাল চেহারার একটি মহিলা। দেখে রাজরাণী বলেই মনে হয়। কিন্তু নিশ্চয় ভিন্ন কোন দেশের, ভিন্ন কোন জাতের। পুরীর লোকজন তাঁকে চেনে না। তবু দ্বারীরা সভয়ে তাঁকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। লোকজন শশব্যস্তে সড়ে দাঁড়াচ্ছে। এরা নিরীহ জাত। এই জবরদস্ত রাজরাণীকে আটকাবার সাহস এদের নেই।

এক এক করে সব মহল পার হয়ে বিদেশী রাজরাণী একেবারে গিয়ে উঠলেন রাজপুরীর সব চেয়ে গোপন, সবচেয়ে পবিত্র কক্ষে—এ পুরীর রাজ-মাতার খাস-মহলে।

সোজা সে ঘরে ঢুকেই বিদেশী রাণী, এই পুরীর রাজমাতার বুকে অস্ত্রাঘাত করে তাঁকে হত্যা করলেন। চারি ধারে অনুচরের দল, কিন্তু কেউ একটি হাতও তুললে না। ভয়ে বিস্ময়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

সেই দিন থেকে নূতন রাণীর রাজত্ব সুরু হল। সমস্ত পুরীর লোক তাঁর গোলাম। প্রতিবাদের ক্ষমতা তাদের নেই, সাহসও নয়। নূতন রাণীর সন্তান-সন্ততিরাও বড় হয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে লাগল। ক্রীত-দাসের মত পুরীর লোকজন তাদের জন্যে আহার সংগ্রহ করে, তাদের থাকবার বাড়ী তৈরী করে, এমন কি তাদের মুখে খাবারও তুলে দেয়। রাণীর ছেলে-মেয়েরা ষষ্ঠীর কৃপায় যখন অসংখ্য হয়ে উঠল, তখন তাদের জন্যে দরকার হল আরো নতুন ক্রীতদাসের। শাহাজাদীর সন্তানেরা ত আর নিজেদের হাতে কিছু করবেন না!

ক্রীতদাস-সংগ্রহের জন্য 'অ্যামাজন' পিঁপড়ের অপর জাতের পিঁপড়ের বিরুদ্ধে অভিযান।

পাশে আর এক নিরীহ জাতের রাজ্য। ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যে তার উপর চড়াও হ'ল এই বিদেশী রাণীর দলবল; নিষ্ঠুরভাবে তাদের ছত্রভঙ্গ করে লুটে নিয়ে এল তাদের সমস্ত শিশু-সন্তান। এরাই বড় হয়ে এ পুরীর ক্রীতদাসের অভাব পূরণ করবে···।

ইতিহাসের সত্য কাহিনীই বলছি, তবে মানুষের নয়—পিঁপড়ের। অ্যামাজন নামে এক ধরণের পিঁপড়েরা ঠিক এই ভাবেই আর এক ধরণের নিরীহ পিঁপড়েকে ক্রীতদাস করে তাদের উপর রাজত্ব করে। নিরীহ পিঁপড়েদের বাসায় অ্যামাজন 'খাণ্ডার' রাণীর প্রবেশ ও হত্যালীলা নিত্যই ঘটছে।

ভারতবর্ষে অবশ্য এই জাতের পিঁপড়ে নেই। নিজের জাতকে ক্রীতদাস করে রাখে এমন পিঁপড়ের সন্ধান এখনো এদেশে পাওয়া যায় নি

কিন্তু তা না গেলেও এখানে এমন অনেক অদ্ভুত জাতের পিঁপড়ে আছে, আমাদের ঘরের আনাচে-কানাচে, মাঠে-ঘাটে নিত্য দেখা সত্ত্বেও যাদের রহস্য আমরা জানি না।

উইপোকা ও মৌমাছির মত পিঁপড়েও কীটজগতের বিস্ময়। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সুশৃঙ্খলায় তারা মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে। উইপোকার তারা চিরন্তন শত্রু হলেও এবং সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর কীট থেকে উদ্ভূত হলেও উভয়ের সমাজের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। শুধু উইপোকা ও পিঁপড়ে নয়, কীটজগতে যারাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে শিখেছে, তাদের সকলেরই সমাজ অনেকটা এক রকম। এ সমাজে নারীরই প্রাধান্য। উইপোকা, মৌমাছি ও পিঁপড়ে,—তিন জাতীয় কীটই, রাজা নয় রাণীরই দাসত্ব করে। তাদের সমস্ত সমাজ রাণীকে কেন্দ্র করে গঠিত। তারা সেই রাণীরই সন্তান, তাদের মধ্যে কেউ সৈনিক কেউ বা শুধু দাস। তিন জাতের রাণীই অসংখ্য ডিম প্রসব করে, রাজ্যের লোকবল সরবরাহ করে। দাসদের কাজ সেই ডিমের যত্ন করা, সমস্ত সমাজের জন্য আস্তানা তৈরী করা, রাণী এবং সকলের জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। সৈনিকদের কাজ তাদের রাজ্য পাহারা দেওয়া, বিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং দরকার হলে অপরের রাজ্য আক্রমণ করা। কীটদের সমাজে পুরুষের স্থান অত্যন্ত নগণ্য। সংখ্যায় তারা বেশী থাকে না, তাদের কোন কাজও নেই। অকর্ম্মণ্য বিলাসী রূপে তারা পরগাছার মতই সমাজে বাস করে

মূলতঃ কীট-সমাজের গঠন একই রকম হলেও পরস্পরের মধ্যে বাইরের কয়েকটি পার্থক্য তাদের আছে। এক সমাজের ভিতরও অনেক রকম সভ্যতার স্তর দেখা যায়।

উই, পিঁপড়ে বা মৌমাছি হঠাৎ একদিনে নয়, বহু যুগের বিবর্ত্তনের ফলেই যে এ রকম সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের আদর্শ লাভ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষের চেয়ে তাদের সভ্যতা আরো অনেক প্রাচীন। বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার বহু যুগ আগেই পিঁপড়েরা তাদের বর্ত্তমান জীবন-প্রণালী আবিষ্কার করেছিল। শত কোটি বছর আগের পিঁপড়ের দেহও আশ্চর্য্য ভাবে বৈজ্ঞানিকেরা পেয়ে গেছেন। সে যুগের গাছের আটায় তখনকার কোনো কোনো পিঁপড়ের দেহ আটকে গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা সেই 'অ্যাম্বার' বা প্রাচীন গাছের আটা পেয়ে তার ভিতর তখনকার পিঁপড়ের দেহ পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেই সুদূর অতীতের পিঁপড়েরা তাদের বর্ত্তমান বংশধরদের থেকে খুব আলাদা ছিল না।

কালো-পিঁপড়ের মৃতা রাণীর শবযাত্রা।

মানুষের সমাজের সঙ্গে পিঁপড়ের সামাজিক জীবনের নানা স্তরের মিল আছে। মানুষের মতই প্রথম আরণ্য শিকারী থেকে যাযাবর বেদের জীবনযাত্রা-প্রণালী পার হয়ে কৃষিপ্রধান সমাজ ও তার পর আরো জটীল ও উন্নত সামাজিক প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর নানা দেশে, সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য ও অসভ্য, নানা জীবিত জাতির ভিতর মানুষের বিবর্ত্তনের এই নানা ধাপের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, পিঁপড়েদের ভিতরও পাওয়া যায় তেমনি। পিঁপড়েরা সবাই একই স্তরে উঠে আসে নি। তাদের ভিতর অনেক জাত এখনও আরণ্য শিকারীর স্তরে আছে। তারা একা একা বা দলবল মিলে শিকার করে ফেরে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন নেই বললেই হয়। এই জাতীয় পিঁপড়েই উইপোকার

প্রধান শত্রু। কোন রকমে উইঢিবির ভিতরে একবার প্রবেশ করতে পারলে তারা যে হত্যালীলা সুরু করে, তার কাছে জঙ্গিস্ খাঁর অত্যাচারও নগণ্য। যুগ-যুগান্তর ধরে উই-পোকাদের উপর এদের এই অত্যাচার চলে আসছে। উই-পোকাদের ঢিবি-নির্ম্মাণের অপূর্ব্ব বিদ্যা এদের আক্রমণের প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে বড় বড় গুদামে উই লাগতে সুরু হলে অনেক সময়ে খুঁজে-পেতে এই জাতীয় পিঁপড়ে আমদানী করা হয়।

কালো ডেয়ো-পিঁপড়ের বাসা।

আমাদের বাড়ী-ঘরে অত্যন্ত চট্‌পটে কালো রঙের খুব ছোট এক জাতীয় পিঁপড়েকে আমরা 'সুড়-সুড়ে-পিঁপড়ে' বলি। এরা এখনো যাযাবর বেদের স্তরে আছে। এদের স্থায়ী ঘর-বাড়ী কিছু নেই, দেয়ালের ফাটলে মেঝের বা ছাদের কোন গর্ত্তে যেখানে সেখানে এরা আস্তানা গাড়ে। খাবার কিছু পেলে যতখানি সম্ভব মুখে করে বাসায় নিয়ে যাওয়াই এদের রীতি। একজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে দল বেঁধে এরা খাদ্য বহন করে নিয়ে যায়। চিনি, গুড় প্রভৃতির মত রসাল জিনিষ হলে এরা যতখানি সম্ভব রস শুষে পেট ভর্ত্তি করে নেয়। আস্তানার প্রতি এদের কোন মায়া নেই। কোনোরকম অসুবিধা হলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে দলকে দল চলল আর এক বাসার খোঁজে।

যে সব লাল-পিঁপড়ে গাছের পাতা জুড়ে বাসা তৈরী করে এবং এদেশের ডেয়ো-পিঁপড়েরা—পশুপালনের স্তরে পৌঁছেছে। এই দুই জাতিই হিংস্র মাংসাশী। বনে এই সব ডেয়ো-পিঁপড়েরা বড় বড় গাছের তলাতেই বাসা করে। উইপোকা শিকার এরাও করে, কিন্তু আসল কাজ হ'ল গো-পালন। কালো ডেয়ো-পিঁপড়ের বাসা খুঁজলেই তাদের বড় বড় গোয়াল দেখা যাবে। পিঁপড়েদের গোরু হ'ল 'আফিড্‌স্' নামে ছোট্ট এক জাতীয় সবুজ কীট, কয়েকজাতীয় প্রজাপতির গুটি, নানাজাতের গুবরে পোকা ও নরম ছারপোকার মত বা তুলোর কণার মত কয়েকটি পোকামাত্র। এই পোকামাকড়গুলিকে মেরে খাবার জন্যে তারা পোষে না, সত্যই তাদের গোরুর মত দোহন করে তাদের রসপান করে। মাথার শুঁড় দিয়ে পিঁপড়েরা তাদের গোরুদের প্রথমে সুড়সুড়ি দেয়। এই সুড়সুড়ির ফলে পোকা-গুলির বিভিন্নস্থানের গ্রন্থি থেকে একরকম রস বার হয়। সেই রসই পিঁপড়েদের খাদ্য।

কয়েক জাতের পিঁপড়েদের গোয়াল তাদের বাসার বাইরে থাকে। কোন কোন জাত আবার বাসার ভিতরেই গোরুদের রাখবার ব্যবস্থা করে। গেছো-পিঁপড়েরা অনেক সময়ে তাদের গৃহপালিত পশুদের জন্যে বিশেষভাবে বাসস্থান তৈরী করে। প্রথমে একটি পাতাকে তারা নলের মত পাকিয়ে গোল করে, তার পর সামান্য একটু ছিদ্র রেখে নলের দুদিক বন্ধ করে দেয়। পোষা পোকামাকড়কে এই নলের মধ্যে রেখে দিয়ে এক সঙ্গে আহার ও আশ্রয় উভয় সমস্যাই তারা মিটিয়ে ফেলে। পোকামাকড়গুলি যেখানে বাস করে সেই গাছের পাতাতেই তাদের আহার পায়।

লাল গেছো পিঁপড়েদের পাতার বাসার ভিতর ধাড়ী ও বাচ্চা নানারকম পোকা দেখা যায়। তারা শুধু পোকা সংগ্রহই করে না, তাদের বংশবৃদ্ধি করতে দিয়ে নিজেদের পশুপাল বাড়িয়েও তোলে।

অবশ্য বাইরে পোকার সন্ধান পেলে তারা ছেড়ে দেয় না। 'বন্য' পোকার পাল দেখতে পেলেই লাল-পিঁপড়েরা পাতালতা দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। পাতা-টাতার অভাব হলে রেশমী এক রকম আবরণ নিজেদের লালা থেকে তৈরী

করে তারা সে পোকাদের ঢেকে দেয়। সময়ে সময়ে আস্ত পোকা ধরেও তারা গোয়ালে নিয়ে যায়।

লাল-পিঁপড়েরাই বেশীর ভাগ প্রজাপতির গুটি পালে খাবার জন্য। 'ক্রাইসোম্যাল্লস' নামে একজাতীয় নীল প্রজাপতির গুটির উপরই তাদের লোভ বেশী। অন্যান্য প্রজাপতির গুটি তারা দেখামাত্র মেরে ফেললেও এই জাতীয় গুটিকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের আশ্রয়ে।

আমাদের বাড়ী-ঘরে ছোট লাল যে পিঁপড়ে দেখা যায়, তারা ঠিক কৃষিকার্য্য না করলেও কাছাকাছি স্তরে এসেছে। চিনির কণা, মরা পোকামাকড় থেকে নানাপ্রকার বীজ পর্য্যন্ত তারা বাসায় নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখে। তাদের সামাজিক জীবনও অনেক উন্নত।

আসল কৃষিজীবী বলা যায় মেঠো-পিঁপড়েকে। বৈজ্ঞানিকেরা এদের নানা শ্রেণীকে দাঁত-ভাঙ্গা দুটি নাম দিয়ে ভাগ করেছেন। সে নাম আপাততঃ আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই। এরা মাঠেই থাকে। ঘাসের দানা সংগ্রহ করাই এদের প্রধান কাজ। মাঠের মাঝে এই পিঁপড়েদের বাসা চেনা কঠিন নয়। এদের গর্ত্তের চারিধারে ঘাসের বীজের তুষ স্তূপাকার করা থাকে। ঘাসের বীজ মাড়াই করে এরা তুষ বাইরে ফেলে আসে। এক একটি এই জাতীয় পিঁপড়ের বাসায় আধ সের পর্য্যন্ত ঘাসের চাল অনেক সময়ে মজুদ থাকতে দেখা যায়। এদের আর একটি বিশেষত্ব রাস্তা তৈয়ারী। পাগুলি ছোট বলে এব্‌ড়োখেবড়ো জায়গায় এদের চলতে বোধ হয় অসুবিধে হয়। সেই জন্যে গর্ত্তের চারিধারে বহুদূর পর্য্যন্ত এরা পরিষ্কার পথ তৈরী করে রাখে। সে রাস্তাগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি মসৃণ। কোন রকম জঞ্জাল বা গাছ-টাছ সেখানে দেখা যায় না।

মেঠো চাষী-পিঁপড়ের পরিষ্কার পথ দিয়ে শস্য বয়ে আনবার সময় ভারী চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। মাঝখান দিয়ে চলে শ্রমিকের দল মুখে ঘাসের বীজ নিয়ে। তাদের পাশে পাশে জবরদস্ত চেহারার সৈনিকেরা চলে পাহারা হিসাবে। সৈনিকেরা আকারে অনেক বড়, তাদের মাথার 'দাড়া'ও খুব মজবুত। সৈন্যদের কোন বোঝা বহন করতে দেখা যায় না। বোধ হয় তাদের মর্য্যাদায় বাধে। বাসার ভিতর কিন্তু তারাই তাদের তীক্ষ্ণ দাড়া দিয়ে বীজগুলি ভেঙ্গে তুষ বার করে দেয়।

উঁচু স্তরের পিঁপড়েদের ভিতরই সৈনিক ও শ্রমিকদের স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়। মানুষের সমাজের মত যে কেউ সেখানে সৈনিক হতে পারে না। ডিম থেকেই সৈনিক বা শ্রমিক হিসাবে তৈরী হয়ে তারা বেরোয়। কি উপায়ে পিঁপড়েরা একই ডিমকে সৈনিক বা শ্রমিক পিঁপড়েতে পরিণত করে, তার রহস্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারেন নি।

সৈনিকেরা বাসা পাহারা দেয়, শ্রমিকদের বাইরের
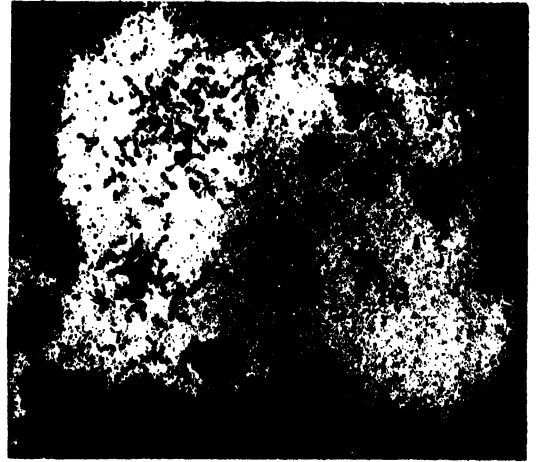
পিঁপড়ের শহর : ইহার রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া মনে হয় যে এই বুদ্ধি ও নিপুণতার সহিত মানুষের শারীরিক বল যদি পিঁপড়ের থাকিত, তবে জীবজগতে তাহাদের একছত্র রাজত্ব হইত।

কাজের সর্দ্দারী করে এবং দরকার হলে অন্য পোকামাকড় বা অন্য পিঁপড়ের বাসা আক্রমণ করে। কয়েক জাতের পিঁপড়ে-সৈনিকদের বাসার দরজা আগলাবার পদ্ধতি ভারী মজার। তাদের মাথাগুলি প্রকাণ্ড। সেই মাথা দিয়ে ঠেলে তারা বাসায় যাবার আসবার পথের সরু ফুটো ভিতর থেকে বন্ধ করে রাখে। ভিতর থেকে বেরুবার দরকার হলে পিঁপড়েরা দরোয়ানের পেটে শুঁড় দিয়ে টোকা মারে। দরোয়ান তখন মাথা সরিয়ে তাদের যাবার পথ করে দেয়। বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবার সময়ও এই রকম দারোয়ানের মাথায় টোকা দিতে হয়। এই টোকা যেমন তেমন করে দিলেই হয় না। প্রত্যেক জাতের ইসারা আলাদা। ভিন্ন জাতের কেউ এসে যেমন তেমন ভাবে টোকা দিলে দরজা খুলবে না।

বেদে-পিঁপড়ে ছাড়া আর সমস্ত জাতেরই বাসার উপর টান অত্যন্ত বেশী। মাটির নীচে তাদের নগর তারা পরম যত্নে তৈরী করে। সে নগর রক্ষাও করে প্রাণ দিয়ে। রাণীর পর রাণী বদল হয়ে এক একটি নগরকে ৫০।৫৫ বৎসর পর্যান্ত টিঁকে থাকতে দেখা যায়। বাসায় যখন পিঁপড়ের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়, জায়গায় আর আহারে যখন আর কুলোয় না, তখনই তারা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করতে বেরোয়। এইখানে পিঁপড়েদের সঙ্গে উইপোকাদের আর একটি মিল আছে। আমরা পাখাওয়ালা পিঁপড়ের ঝাঁক প্রায় দেখতে পাই। মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পালক ওঠে বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু প্রবাদটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই পিঁপড়েরা এমনি করে নিজেরা প্রাণ দেয়। উপনিবেশের জন্য অসংখ্য পিঁপড়ে কুমার ও কুমারীরা পাখায় ভর করে মৃত্যুপণ নিয়ে বার হয়। পথে সকলে মারা গেলেও একটি কুমারী যদি কোন রকমে নিরাপদ নূতন জায়গা খুঁজে পায় তাহলেই তাদের অভিযান সার্থক। সেই একটি কুমারীই রাণী হয়ে নূতন পিঁপড়ের রাজ্যের পত্তন করে। তাকেই কেন্দ্র করে আবার সমৃদ্ধ নগর গড়ে ওঠে। জাতির মুখ চেয়ে ব্যক্তি সেখানে তাই অনায়াসে নিজেকে বলি দেয়। অন্ধ হ'লেও, প্রচণ্ড ও সহজাত এই জাতি-প্রেমই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও অসহায় এই কীট-সমাজকে যুগ-যুগান্তের সমস্ত বিপদের ভিতর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমেরিকার আদিম জাতির পুরাণ

§ 'মানুষ কেন অমর হ'ল না'

পৃথিবীর ওপরে আকাশ, সে আকাশের ওপরে হ'ল 'ওলেল পান্তি'; 'ওলেল পান্তি'তে দেবতারা থাকেন, আর থাকেন দেবাদিদেব 'ওলেবিস্'।

ওলেবিসের একদিন হঠাৎ উপর থেকে পৃথিবীর উপর চোখ পড়ে গেল। সবুজ মাঠ, নীল নদী আর বরফ ঢাকা পাহাড় নিয়ে পৃথিবীকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে! ওলেবিসের মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গায় কেউ না থাকলে যেন মানায় না।

যেই মনে হওয়া সেই কাজ। ওলেবিস তক্ষুনি নানা রকম প্রাণী কল্পনায় তৈরী করে ফেললেন; মানুষ, বাইসন, শেয়াল, খরগোস, ভালুক, র‍্যাট্‌ল-সাপ—কত রকম যে প্রাণী তার লেখা-জোখা নেই।

সব প্রাণী কল্পনায় তৈরী করে ওলেবিস তাদের পৃথিবীতে দিলেন পাঠিয়ে। যাবার সময় বলে দিলেন—জল দিলাম ডাঙ্গা দিলাম, ভাগ করে নিও, ফল দিলাম মূল দিলাম, মিলে মিশে খেয়ো।

ওলেবিস সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ত নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে সেখানে কিন্তু দারুণ গণ্ডগোল বেধে গেছে। কোথায় মিলে মিশে থাকবে, না তারা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে মারামারি। ফলমূল খাবে, না তারা এ ওকে খাওয়া-খাওয়ি শুরু করেছে।

সব চেয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছে ধুমসো ভালুক আর শুঁটকে র‍্যাট্‌ল-সাপ। তাদের একজন উঠেছে পাহাড়ে আর একজন ঢুকেছে মাটির ভিতর, শুধু তাদের জ্বালায় সবাই অস্থির।

মানুষেরই দুর্দ্দশা সব চেয়ে বেশী। বাইসনের মত তার ক্ষুরও নেই শিঙও নেই, পুমার মত তার দাঁতও নেই নখও নেই। যে পারে সেই তাকে মারে। যেখানে যায় সেখানেই সে তাড়া খায়। তার দুঃখের আর অবধি নেই।

ওলেবিসের অনেক দিন বাদে আবার একদিন পৃথিবীর কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর দিকে চেয়ে ত তিনি অবাক। সবাই সেখানে আছে কিন্তু মানুষ কই!

অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে নজর করবার পর হাড্ডিসার আধমরা গোছের গোটা কয়েক জীব তাঁর চোখে পড়ল। আহা! একি হাল হয়েছে মানুষের!

ওলেবিসের সত্যি বড় দয়া হ'ল। তিনি ভাবতে বসলেন, ক্ষুর না নখ, দাঁত না শিঙ, কি দিয়ে মানুষকে বড় করা যায়? অনেক ভেবে ওলেবিস ঠিক করলেন, মানুষকে এ সব কিছুই দেওয়া হবে না; নখ যায় ভোঁতা হয়ে, দাঁত যায় ভেঙ্গে, শিঙ যায় উঠে, ক্ষুর যায় ক্ষয়ে। এসব নিয়ে মানুষের কি হবে!

মানুষকে তিনি দিলেন তার চেয়ে বেশী কিছু—মাথায় তার বুদ্ধি। মানুষ তারই জোরে পাথর দিয়ে বানালে কুড়ুল, কাঠ ঘসে জ্বাললে আগুন। নখ, দাঁত, ক্ষুর, শিঙ সব গেল তার কাছে হটে। এবার আর মানুষকে পায় কে! পৃথিবীময় তারই রাজত্ব।

কিন্তু তবু পৃথিবীর দিকে চেয়ে ওলেবিসের সুখ হয় না। পৃথিবী ত আর 'ওলেল পাস্তি' নয়। সেখানকার হাওয়ায় বয়স হলে সবাই বুড়ো হয়, সেখানে সবাই একদিন যায় মরে।

ওলেবিস ঠিক করলেন পৃথিবী থেকে মরণ দিতে হবে ঘুচিয়ে। 'ওলেল পাস্তির' দুই বড় কারিগর হ'ল 'হুস'রা দুই ভাই। তাদের দুজনের ডাক পড়ল ওলেবিসের দরবারে।

তাদের উপর হুকুম হল, পৃথিবী থেকে 'ওলেল পাস্তি' পর্য্যন্ত লম্বা সিঁড়ি বানাবার। সিঁড়ির মাঝে মাঝে থাকবে মিষ্টি জলের ফোয়ারা আর বিনা তুষের ফসল। মানুষ বুড়ো হলে সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই আবার নবযৌবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে পৃথিবীতে। মরতে আর কাউকে হবে না।

দুই ভাই 'হুস' হুকুম পেয়ে গেল পৃথিবীতে। সোজা কারিগর ত তারা নয়। দেখতে দেখতে তাদের কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু সে খানিকদূর পর্য্যন্ত। তারপর আর পাত্তা নেই। ওলেবিস রোজ থাকেন আশায় আশায়, 'হুস'-ভায়েরা সিঁড়ি গড়ে তুলল বলে। কিন্তু সিঁড়ি আর এগোয় না।

'হুস'-ভায়েরা একদিন তিতি বিরক্ত হয়ে এসে হাজির। সিঁড়ি গড়া তাদের দিয়ে আর হবে না।

কেন, ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কি! তারা রোজ যেটুকু গড়ে, সেদিৎ বলে এক বুড়ো রোজ এসে তা দেয় ভেঙ্গে।

এমন কথা কে কবে শুনেছে! তলব হল সেদিৎকে পৃথিবী থেকে ধরে নিয়ে আসবার।

ওলেবিস জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রোজ সিঁড়ি ভাঙ্গ কেন?"

সেদিৎ বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কি বললে জান? বললে, "নইলে যে পৃথিবীতে মরণ থাকবে না।"

ওলেবিস অবাক হয়ে বললেন, "তুমি অমর হতে চাও না!"

"না, চাই না। মরতে হয় বলেই ত বেঁচে সুখ।"

ওলেবিস বললে, "কি রকম?"

সেদিৎ বললে, "পৃথিবীতে সব প্রাণী মরে যায় বলেই এত মায়া এত ভালবাসা। চিরদিন থাকতে পাব না বলেই, নদীর জল আর মাঠের ফল, দিনের সূর্য্য আর রাতের চাঁদ এত ভালো লাগে!"

"সবাই যদি অমর হয় তা হলে কারুর উপর কারুর আর টান থাকবে না। বছরের পর বছর একই মুখ একই জিনিষ দেখে দেখে, বাড়ী-ঘর লোকজন সব পুরোনো একঘেয়ে হয়ে যাবে। মা ছেলের জন্য কাঁদবে না, ছেলে, বুড়ো বাপ-মায়ের জন্যে শিকারে বেরোবে না, বন্ধু বন্ধুর জন্যে ব্যাকুল হবে না। তেমন অমর হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?"

ওলেবিস খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "ঠিক বলেছ! বাঁচতে হলে মরাই দরকার।"

সেই থেকে 'ওলেল পাস্তি'র সিঁড়ি আর গড়া হয় নি। মানুষও আর অমর হতে পারে নি।

সাতদিন সাতরাত যদি সোজা উত্তরে যাও ত' 'ওলেল পাস্তির' সিঁড়ি এখনো দেখতে পাবে। সে সিঁড়ির পাহাড় মেঘের রাজ্য ছাড়িয়েও 'ওলেল পাস্তি' পর্য্যন্ত পৌছোয় নি।

সেদিৎ বুড়ো, মানুষের ভালো করেছে না মন্দ করেছে, কে জানে!

ঐতিহাসিকের দায়িত্ব

...জাতির জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জাতীয় অবস্থার কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। যে ইতিহাস ঐ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয় সেই ইতিহাস মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, উন্নতি সাধক এবং অবশ্য-পাঠ্য। মানুষের জ্ঞানের, কর্ম্মশক্তির এবং কর্ম্মের কোন্ অবস্থা হইতে তাহার সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন্ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সে ইতিহাস কখনও ভ্রান্তিহীন ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।...

সুন্দর

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সুন্দর মম অন্তরতম,
অশ্রুদহের কমল নব !
আজি ঘন-ঘোর শ্রাবণের ভোরে
জলে ভরিল কি নয়ন তব ?
আঁধার রাতের দুর্যোগে, মোর
অশ্রু ছাপায়ে উঠিল তটে,
রিক্তকুসুম কামিনীকুঞ্জে,
প্রাচীন বটের জটিল জটে।
কাঁদিছে আকাশ, কাঁদিছে বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ শিহরে দেহ ;
সলিলে আমার কলস ভরিতে
সুপরিচিতারা আসেনি কেহ।
মেঘের ভুষায়-মলিন উষায়
জাগেনি ভ্রমর, ডাকেনি পাখী ;—
তাই কি হে মোর অমল কমল,
সলিলে ভরিল তোমারও আঁখি ?

তব হাসিমুখ ধেয়ানে ধরিয়া
কাটিল আমার তিমির-রাতি,
অশ্রু-সেঁচা সুন্দর ওগো,
তুমি আজি মোর একক সাথী !
কত বরষার অশ্রু-থিতানো
পঙ্ক-শয়নে অতলে মম
ঘুমায়ে ছিলে কি যুগ-যুগ ধরি',
সিন্ধু-অঙ্কে লক্ষ্মীসম ?
জলভার ভেদি' আপন মৃণালে
জাগিলে যেদিন আমার বুকে —
ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
কালো গুণ্ঠন উষার মুখে !

সেদিন কাঁদিছে আকাশ বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ বক্ষ দোলে,
বধূরা ভুলিল ভরিতে কলস,
কাননের পাখী কাকলি ভোলে !

আমি জানিতাম—হে মোর কমল,
যতই গভীর হোক্ না ব্যথা,
আনন্দময় প্রকাশ তোমার,
জলে ভেজে না ও-চোখের পাতা।
তাই প্রাণপণ তোমারি স্বপন
অন্তরে ধরি' কাটানু রাতি,
তাই ভোরে ভোরে ও-মুখ দেখিনু,
ওগো অদিনের শরণ সাথী !
একি হেরিলাম ?—তোমারও নয়নে
উছলি' লেগেছে অশ্রু মম !
আমার সাধনা, আমার বেদনা
কাঁদা'ল কি তোমা হে প্রিয়তম ?
ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দরূপে ফুটিবেনা কি ?
সজল এ চোখে রাখিবে না তব
হাস্য-উজল মোহন আঁখি ?
মেঘল প্রভাতে আলোকের দল
গুটা'ল অরুণ মর্ম্মকোষে ;—
কত সাধনার সুন্দরে পেয়ে
কাঁদিয়া কাঁদানু কর্ম্মদোষে !
শ্রাবণ-প্রাতে এ অশ্রুদহে,
ফুটিল কমল নব নির্ম্মল,
তারও চোখে হায়, অশ্রু বহে !

মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের চরিতকার ৺যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিখিয়াছেন যে, যখন কবিবর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, তখন "দেশের অনেক কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভ্রুকুটী নিক্ষেপ করিতেছিলেন।" তিনি লিখিয়াছেন, "নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে গুপ্ত কবির শিষ্যদল, অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সেই সঙ্গে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ন্যায় ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য অমিত্রচ্ছন্দের বিকৃতি করিয়া কতজনে কত হাস্যোদ্দীপক কবিতা প্রচার করিয়াছিলেন।" কিন্তু মহাকবির এই নূতন অবদানের সমাদর করিবার মত কয়েকজন সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিও তখন ছিলেন। যিনি নিজব্যয়ে তিলোত্তমা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যোৎসাহী মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রতিভার বরপুত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-সম্পাদক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে মধুস্থদন-প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও বাগ্মী 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, যিনি মান্দ্রাজ হইতে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় প্রত্যাগত কবি-বন্ধুকে বহুদিন নিজ উদ্যানবাটিকায় অতিথিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনে পুলিশকোর্টে দ্বিভাষীরূপে নিযুক্ত করিয়া কবির দুঃসময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আন্তরিক বন্ধুপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় এক্ষণে অনেকেই অবগত নহেন। কিশোরীচাঁদ তাঁহার বন্ধু রাজা রাজেন্দ্রলালের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বিখ্যাত সেবক রাজনারায়ণ বসুকে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন এবং উহা তৎসম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত করেন। সেকালে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্র

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত।

সর্ব্বজনসমাদৃত ছিল এবং উহার য়ুরোপীয় গ্রাহক সংখ্যাও বিস্তর ছিল—কারণ ঐ পত্রখানি কেবল সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক ছিল না, উহা এদেশের ক্রীড়াবিষয়ক একমাত্র পত্র ছিল। মধুসূদনের চরিতকার লিখিয়াছেন, "রাজনারায়ণ বাবু ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে তিলোত্তমার যে সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।" হইবারই কথা, কারণ তৎকালে বাগ্মী,

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

সুপণ্ডিত ও সুলেখক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলিয়াছিলেন যে "তুমি যাহা কিছু বল কিম্বা যাহা কিছু লেখ তাহাতে দেশে এক মহা আন্দোলন উঠে এবং সে আন্দোলন সহজে থামে না।" কবি স্বয়ং রাজনারায়ণকে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

"Your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book (Tilottama) your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said 'O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right !'"

কিশোরীচাঁদ মধুসূদনের অভিনব কাব্যের সমালোচনা লিখাইবার জন্য অতি উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহার আর একখানি পত্রে রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন :—

"Talking of criticism, I am told the Editor of the Indian Field (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop."

মধুসূদনের জীবনচরিতে 'সোমপ্রকাশ' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত সমালোচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু অতীব দুষ্প্রাপ্য সাপ্তাহিক পত্র 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত সমালোচনাটি এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আমরা সম্প্রতি এই সমালোচনাটি পুরাতন সংবাদপত্রের স্তূপের মধ্য হইতে পুনরাবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং উহার অনুবাদ আজ কবির দ্বিষষ্টিতম মৃত্যুবাসরে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

২৯শে জুন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

বাঙ্গালা অমিত্রচ্ছন্দ

—৺রাজনারায়ণ বসু

ভূ-পর্য্যটকগণের নিকট আমরা অবগত হই যে, জাতির মধ্যে কোনও সুকবির প্রথম আবির্ভাব হইলে বা উৎকৃষ্ট অশ্ব-শাবকের জন্ম হইলে বেদুইন আরবেরা মহোৎসব করিয়া থাকে। সুকবি সম্বন্ধে এই রীতিটি উচ্চ সভ্যতা সোপানে সমারূঢ় জাতিসকলও অনুকরণ করিলে ভাল হয়, কারণ সম্মানই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত রীতি অনুসারে মৃত্যুর পরে (যখন সম্মান উপভোগ অসম্ভব তখন) না করিয়া জীবিতাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয়১। এই পত্রে অশ্বজাতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া

১। বোধ হয় এই সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়াই অনতিকালমধ্যে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' হইতে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মাইকেল মধুসূদনকে রজতনির্ম্মিত পানপত্র সহ একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।

থাকিলেও১ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা ঘোটকের কথা পরিহার করিলাম, কারণ মধ্যযুগের সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্রের দিন অতীত হইবার পর, অশ্বারোহী ও অশ্ব যে সমপদস্থ এবং একের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন উচিত অপরের প্রতিও তাহা কর্ত্তব্য ইহা প্রমাণ করিবার বিদ্যা মানবজাতি বিস্মৃত হইয়াছে। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে অ্যাপলোর বিশেষ আদেশে মস্কট হইতে একটি উচ্চ বংশীয় মহাতেজা এবং উক্তরূপে জাতকর্ম্মসম্মানিত আরবদেশীয় তুরঙ্গ আনীত হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বারা উহার পৃষ্ঠে এক জোড়া পক্ষ সংযোজিত হইয়া পেগ্যাসাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি পেগ্যাসাসের বীর আরোহীকে তাঁহার বাহনের সমজাতীয় জীবগণের অনধিক সম্মান দান করিলে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হয়।

পক্ষযুক্ত অশ্ব এবং রঙ্গ-রহস্যের কথা যাউক, যথার্থ সুকবি তাঁহার জীবিতাবস্থায় প্রকাশ্য ও সাধারণ উৎসব দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার যোগ্য, কারণ সকলেই কবি হইতে পারেন না। কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণের সমবায় ঘটিলেই তিনি কবি নামে বিশেষিত হইতে পারেন। একজন জীবিত ফরাসী গ্রন্থকার এই গুণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন —১ম স্মৃতি, ২য় কল্পনা, ৩য় সূক্ষ্ম অনুভূতি, ৪র্থ বিচারশক্তি, ৫ম বর্ণনাশক্তি, ৬ষ্ঠ সুরবোধ, ৭ম বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও সহানুভূতি, ৮ম ভগবদ্‌ভক্তি। যে আধারে এই সমস্ত বা উহার অধিকাংশ গুণগুলি অসাধারণ মাত্রায় সমাশ্রিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করিবে—সে যুগ যতই অ-কাল্পনিক ও স্বার্থপর হউক না কেন। যেমন বিলাসীদিগের প্রাসাদে এবং সভ্যতালোকদীপ্ত নগরীসমূহে পুষ্পবীথিকা ও শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষসমন্বিত আধারাদি হইতে এই সকল সুরুচিপূর্ণ দৃশ্যের প্রতি মানবের স্বাভাবিক অনুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা (utilitarian) প্রয়োজনসর্ব্বস্ব যুগেও প্রতিভার বাণীতে মানব হৃদয়ের কতকগুলি তন্ত্রী বাজিয়া উঠে এবং যথার্থ কাব্যের প্রতি মানবের স্বাভাবিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকির ভাষায়, "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে"—তাবৎ যথার্থ কাব্যের সমাদর থাকিবে, কারণ উহা স্বর্গীয়। উহা দেবজনভোগ্য সুধা এবং যিনিই উহা পান করেন তিনিই—

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

"ধরা নামে অভিহিত
ক্ষুদ্র কোলাহলপূর্ণ ধূম্রময় লোক"
হইতে বহু ঊর্দ্ধে উন্নীত হন।

যে গ্রন্থকারের কাব্য সমালোচনা উপলক্ষে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা,

১। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে একেল ঈষ্ট ছদ্মনামে জেম্‌স্ হিউম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে ঘোড়দৌড় ও অন্যান্য ক্রীড়াবিষয়ক প্রস্তাবাদি প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হইত। কিশোরীচাঁদ ক্রমে ক্রমে উহাকে রাজনীতিক ও সাহিত্য-প্রধান পত্রে পরিণত করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উহা বাবু কৃষ্ণদাস পালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।

তিনি যে একজন যথার্থ কবি, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।৩ 'শর্ম্মিষ্ঠা' নামক সুলিখিত নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক অত্যুৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করিয়া গ্রন্থকার নাট্যকাররূপে পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে সাধারণসমক্ষে সাফল্যমণ্ডিত মহাকবিরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বাঙ্গালী জাতির মহা আনন্দ হওয়া উচিত। তিনি মাতৃভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই একমাত্র কার্য্যই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুযোগ্য সমালোচকগণ বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অসম্ভব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। নূতন ছন্দে কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নাই, কারণ ভাষায় তাহার প্রচলন নাই। প্রত্যেক পংক্তিতে ১৪টি অক্ষর আছে এবং কার্য্যটি বিরাম-যতি অনুসারে পঠিতব্য। যথোচিতভাবে পাঠ করিলে উহার সুর বোধগম্য হয়। কেবল অভিনব ছন্দ নহে, তাঁহার কল্পনা ও ভাবসম্পদও গ্রন্থকারের প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় দেয়। যদিও তিনি য়ুরোপীয় ও সংস্কৃত কবিগণের নিকট হইতে, বিশেষতঃ প্রথমোক্তগণের নিকট হইতে, প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে এক অভিনব আকার দান করিয়াছেন। কাব্যমধ্যে তাঁহার নিজস্ব মৌলিক ভাবও বিরল নহে। আমাদের অভিমতের সত্যতা উক্ত কাব্যের নিম্নপ্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে. উহাতে আমরা কবির রচনা হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করিব ৪ :—

ধবলগিরির এক মহাগাম্ভীর্য্যপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গের নির্জ্জনতার চিত্র ভীষণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

"নিকুঞ্জ কানন,
তরুরাজি, লতাবলী মুকুল, কুসুম—
অগ্রাস্ত অচল ভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা,
পৃথ্বী সুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়। সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদক বিহঙ্গ, ভ্রমর মধুলোভা
কভু নাহি ভ্রমে তথা।
... ...
বন কমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা,
... ...
না যায় নিকটে তার।"

৩। তিলোত্তমা সম্ভব। বাঙ্গালা অমিত্রচ্ছন্দে রচিত মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস, ১৮৬০।

৪। রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলির ইংরাজী অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বর্ত্তমান অনুবাদে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের অতীব দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণ হইতে অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক অংশ পরিমার্জ্জিত পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

অন্ধকারময় গিরি-গহ্বর হইতে নিঃসৃত জলস্রোতের মহাকোলাহল, পর্ব্বতোত্থিত প্রচণ্ড বায়ুর প্রলয়ঙ্কর গম্ভীর নিঃশ্বাস, গিরিশৃঙ্গের ভীষণতা দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ ও উপসুন্দ কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র এই ভীষণ নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—

"যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখা পাশে
বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব।
... ...
যথা ঘোরতর বাত্যা, করিয়া অস্থির
গভীর পয়োধিনীর, ধরি মহাবলে
জলচর কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল।"

গিরিশৃঙ্গের ভীষণ নির্জ্জনতা ইন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের বেশ উপযোগী হইয়াছে। দেবেন্দ্রের স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও সুখের স্মৃতি শান্ত ও করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে—এবং বর্ণনার সঙ্গে গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব বাগ্‌বিন্যাস-কৌশল ও হিন্দুপুরাণাদির গভীর জ্ঞান প্রকটিত হইয়াছে। নিশাদেবী, নিদ্রাদেবী ও স্বপ্নদেবী সংক্রান্ত উপাখ্যানটি করুণরসে পরিপূর্ণ। শোকাকুল দেবরাজকে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্য দেবীগণের প্রচেষ্টার যে বর্ণনা আছে তাহা অতি সুন্দর। যিনি "পতিহীনা কপোতীর" ন্যায় "ভ্রান্তিদূতীসহ" জগতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এবং দেবরাজকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি আর কাহারও নাই বলিয়া যাঁহাকে উক্ত দেবীগণ ধবলগিরিশৃঙ্গে আহ্বান করিলেন সেই ইন্দ্রজায়ার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য, তাঁহার আগমনে ধবলশিখরে আচম্বিতে যে তরুলতা কুসুমাদি শোভিত নিকুঞ্জ পরিদৃশ্যমান হইল, তাহার অপূর্ব্ব শোভা এবং নাগবালিকাগণ ইন্দ্রাণীকে যে সম্বর্দ্ধনা করিল তাহার দৃশ্য—এ সমস্তই আরিয়স্টোর ন্যায় প্রচুর ও উজ্জ্বল কল্পনা সহকারে চিত্রিত হইয়াছে। ইন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রাণীর উক্তি সত্য সত্যই অতি করুণরস পরিপূর্ণ :—

"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্তু হে রমণ, হেরি ও বিধুবদন,
পাশরিনু আমি এবে পূর্ব্ব দুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? তার সুখভোগে ছাই
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে।
বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর,

নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি দেব!"

শেষোক্ত উপমাটি যদিও মুরের 'প্যারাডাইস এণ্ড পেরি' হইতে গৃহীত, যেখানে শোকাকুলা কুমারী তাহার মরণাহত প্রণয়ীকে বলিতেছে—

"When the stem dies the leaf that grew
Out of its heart must perish too"

তাহা হইলেও উহা সম্পূর্ণ নূতন পরিচ্ছদে আমাদিগকে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় সর্গে দেবদম্পতির ব্যোমযানে অম্বরপথে চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতি যাত্রার বর্ণনায় কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি তাঁহার হিন্দুপুরাণের গভীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপকরণ আহরণ করিয়া এই অংশের শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে ব্রহ্মলোকের দ্বারে উপনীত হইবার জন্য এই যাত্রা করিয়াছিলেন। এই স্থানে পরাজিত দেবসৈন্যদল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—

"—যথা যবে প্রলয় প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সকলে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
বজ্র পদপ্রহরণে তরঙ্গ নিচয়
বিমুখয়ে।"

মহাপ্রাণ ইন্দ্র তাঁহার সৈন্যগণকে দেখিয়া শোকাকুল হইলেন এবং এই বলিয়া বিলাপ করিলেন—

"তপন তাপেতে তাপি পশু পক্ষী যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে যায় তরুপাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ। হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"

ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে দেবগণ যে যুদ্ধ-সভায় সমবেত হইলেন তাহাতে প্রত্যেক দেবতা তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়ী বক্তৃতা করিলেন। নিজের অপেক্ষা তাঁহার প্রজাগণের দুঃখে অধিকতর অভিভূত সেই দেবরাজ ইন্দ্র, তমিস্রময় জগতে এবং ধ্বংসময়ী লীলায় যাঁহার নিয়ত আনন্দোৎসব সেই মহাতেজোময় ভীষণ যমরাজ, প্রকৃতিতে ধীর এবং যুদ্ধে ভীষণ রূপে অনুপম কার্ত্তিকেয়, রমণীগণের প্রতি সম্ভ্রমশীল বীরশ্রেষ্ঠ কুবের, ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র তাঁহার বক্তৃতায় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। মন্ত্রণা-সভায় স্থির হইল যে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার নিকট তাঁহাদের বিপদের শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হউক।

তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মলোকের সৌন্দর্য্য ও বৈভবের বর্ণনা কি উপভোগ্য!—

"—পঙ্কজ বন যেন
অযুত ফুটিয়া, মন্দ মলয়-অনিলে
দিল পরিমল-সুধা।"

কবির কল্পনা এই বর্ণনাতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে—

"বরবরে যথা
সুখে দান করে পিতা দুহিতা রতন।"

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

আমরা কবির বর্ণনার প্রশংসা তাঁহারই একটি উক্তি হইতে নির্ব্বাচিত করিলাম—যে উক্তি তিনি জগতের উপর কোনও একজন দেবতার বাণীর প্রভাব বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছেন।

দেবগণের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা দৈববাণী করিলেন যে, ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশের অন্য কোনও উপায় নাই এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনার্থ দেবতাগণ ভারতীয় 'ভলক্যান' বিশ্বকর্ম্মাকে সৌন্দর্য্যে নিরুপমা অপ্সরী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সর্গে ভক্তি ও আরাধনার যে রূপক আছে তাহা যথার্থ ই বানিয়ানের কল্পনাসদৃশ। ইহাতে

একটা আন্তরিকতার ভাব আছে যাহা হৃদয়কে স্পর্শ করে। যখন পবনদেব বিশ্বকর্ম্মার নিকট তিলোত্তমা সৃষ্টির প্রস্তাব লইয়া যান তখন যে পর্ব্বত দর্শন করিলেন তাহার বর্ণনা সত্য সত্যই অতি মহান্ গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ। এই বিশ্বকর্ম্মাকে পৌরাণিক আদর্শের পরিবর্ত্তে কবি গ্রীক আদর্শে গড়িয়াছেন এবং জগতের সীমান্তে তাঁহার বাসভবন করিয়াছেন। ইহাতে দান্তের 'ইনফার্ণো' এবং বাইবেলোক্ত নরকের কথা মনে উদিত হয়। যথা—

রাজনারায়ণ বসু।

"অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সাগর-কল্লোল জিনি দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দন ধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।"

বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের আদেশ পালন করিলেন এবং তিলোত্তমার সৃষ্টি করিলেন—দেবতারা ও জড়পদার্থসমূহ তাহাদের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণের দ্রব্য হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য দান করিল।

চতুর্থ সর্গ বিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবীর একটি সুন্দর স্তবের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছে :—

"সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে,—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে—
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল গো জননি!
সফল জনম মম তোমার প্রসাদে
দয়াময়ি! যথা কুন্তী নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু মানব আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা, শুনিনু ভারতী
তব বীণা ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে!
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিবা-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিক্তে রসনা তার তব সুধা-রসে!
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, আগুন রূপ ধরি
নিদাঘের, নাশে সে আশার ফল ফুল,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি।
ধিক্ সে যাচ্ঞা—ফলবতী নীচ কাছে!"

এই সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য্যের প্রগাঢ় উপাসক কোন ভাস্করের ন্যায় কবি তাঁহার নিজের সৃষ্ট তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিলোত্তমার অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং কাননের মধ্য দিয়া বিন্ধ্যগিরিশিখরস্থ যে সমতলভূমিতে দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় দেবগণকে পরাজিত করণান্তর বিজয়োৎসবে উন্মত্ত তথায় তিলোত্তমার জয়যাত্রার বর্ণনা অতি মনোরম।

"মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে ; সুমন্দ মলয়-সমীরণ,
ফুলকুল উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ পতি।"
... ...
"কত স্বর্ণ-লতা
মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে! কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি!
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলিদল কে পারে কহিতে?"

যথায় দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত তথায়,—

"প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
সরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী।"

দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় তাহাকে দেখিল। "উভয়ে ধরিলা রূপসীরে।"—উভয়েই তাহাকে অধিকার করিতে চাহিল। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিল। পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিল। দেবতারা সুযোগ পাইয়া দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিলেন। অতঃপর দেবতাদিগের বিজয়োৎসব হইল এবং তিলোত্তমা দেবকার্য্য সাধনের পুরস্কারস্বরূপ আনন্দময় ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যলোকে স্থান প্রাপ্ত হইল।

কাব্যে দোষ আছে—মানবের কোন্ সৃষ্টির মধ্যে তাহা নাই? বহুবার শ্রুত বাক্যালঙ্কার এবং অত্যধিক ব্যবহৃত উপমা পুনঃ পুনঃ নিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে রচনাপদ্ধতি অতিমাত্রায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আদিরসাত্মক ইঙ্গিতের প্রতি কিছু অসামান্য অনুরাগ অনেক স্থলে প্রকটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের একজন স্বদেশহিতৈষী সাময়িকপত্রসম্পাদক একস্থলে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—দেশের নবযুগের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকারের এ বিষয়ে অধিকতর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আখ্যানভাগ স্থূলতঃ হিন্দুভাবাপন্ন হইলেও কোন কোন স্থলে অ-হিন্দু এবং এক এক স্থলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজনোচিত হইয়াছে। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য কোন কোন স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বিশেষতঃ কাব্যের শেষ ভাগে,—যদি তিলোত্তমাকে রীতিমত মহাকাব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এই সকল দোষ উহার অসংখ্য গুণে ঢাকিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারের কল্পনার উচ্চতা, সূক্ষ্ম প্রকৃতিসন্দর্শনশক্তি, গভীর সৌন্দর্য্যবোধ এবং ভাষার অনন্যসাধারণ দীপ্তি কাব্যের প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদিগকে চমৎকৃত করে। ইহা যেন মনীষার বিলাস-ভবন বা উৎসব-ক্ষেত্র। ইহার নিকট "দারুচিনি বর্ণে রঞ্জিত স্বচ্ছ সরবত কোথায় লাগে!" প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত দেবতাগণ যেমন এই হিন্দু "প্যাণ্ডোরা"কে তিল তিল করিয়া রূপের উপাদান দিয়াছিলেন, (অবশ্য পিতামহীর ন্যায় মুখর বৃদ্ধ হেসিয়ডের প্যাণ্ডোরা হইতে আমাদের তিলোত্তমা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এপিমেথিয়ুস মোহিনী হইতে যেরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা হইতে তদ্রূপ না হইয়া বরং কল্যাণই সমুৎপন্ন হইয়াছিল), সেইরূপ যাহা কিছু পবিত্র, সহজ বা সুন্দর—আকাশ, জলধি, পর্ব্বত, ইন্দ্রধনু, মলয়ানিল, কমলিনী এবং যত মহামনীষী ব্যাস ও বাল্মীকি, হোমর ও ভর্জিল, হিব্রু সাধুগণ ও দান্তে, ট্যাসো ও মিল্টন, কালিদাস ও সেক্সপীয়র, তিলোত্তমা-কাব্য সৃষ্টির উপাদান যোগাইয়াছেন; কিন্তু যেমন বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গীয় শক্তি-বলে এই গুলিকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া, তাঁহার উপকরণগুলির যথোচিত সমাবেশ দ্বারা এক অলোকসামান্য ভুবনমনোমোহিনী মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কবিও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহার বিচিত্র সুন্দর ও মহান ভাবরাশি ও উপমাসমূহের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যথাযোগ্য উপকরণগুলি আহরণ করিয়া একটি সুন্দর, মৌলিক, সৌষ্ঠবসম্পন্ন অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন—যাহা যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহার-দেশবাসীকে আনন্দ দিবে।

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিবার আছে। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে বিদ্যাসুন্দরের একাধিক সহস্র অনুকরণ এবং অসংখ্য অনুবাদ গ্রন্থ নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম বাঙ্গালী জাতির মৌলিক প্রতিভা নাই, কিন্তু এই পুস্তক আনন্দজনকভাবে আমাদের ভ্রম সংশোধিত করিয়াছে। বাঙ্গালার উন্নতির এখনও আশা আছে।

শিক্ষা-পদ্ধতি

ফেনী সহরে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর এইচ কে. সেন মহাশয় অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে সমষ্টিগতভাবে জাতির শিক্ষায় অগ্রগতি ও শিক্ষার আদর্শ সিদ্ধি সম্ভব নহে। এই সামঞ্জস্যের অভাব আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম ত্রুটী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও গবেষণা বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্ব বহু ক্ষেত্রে উপরোক্ত সামঞ্জস্যের অভাবে আশানুরূপ পরিস্ফুট হইতে পারে না। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের অভাবে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের ন্যায় জনবহুল কৃষি ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দেশে আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। কার্য্যকারী শিক্ষার অভাবে এই বিপুল সম্ভাবনা অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে।......মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় নিজেদের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া একদিকে যেরূপ নিজেদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অপর দিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব বৃদ্ধিতে বাধা জন্মাইতেছেন। স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্র সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবে সকলেই ইহা মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির গুণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেও ছাত্রের জ্ঞান সাধারণ বিষয়েও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিক্ষণীয় বিষয়ের বাহুল্য বর্জ্জন না করা গেলে এবং জীবন-যাত্রার প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়মিত না করা হইলে দেশ বা জাতির অগ্রগতি ও শিক্ষার উন্নতি সম্ভব হইবে না।

পণরক্ষা

—শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

হেমন্ত কালের গভীর অন্ধকার রাত্রি। বৃদ্ধ মহাজন তাঁর পড়বার ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যান্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন আর পনর বছর আগেকার এক হেমন্তকালের একটি পার্টির কথা ভাবছিলেন। পার্টিতে অনেক গণ্যমান্য, বিদ্বান ও পদস্থ লোকের সমাগম হয়েছিল।

অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে প্রাণদণ্ডের কথা উঠেছিল। অতিথিদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত ও সংবাদপত্রসেবী ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন যে, শাস্তি হিসাবে ওটা অত্যন্ত পুরাতন, তাছাড়া যে কোন খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের পক্ষেই দণ্ডটা অনুপযুক্ত, নীতিশাস্ত্রের বিরোধীও বটে। কেউ কেউ বললেন যে, চরম দণ্ড হিসাবে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গৃহকর্ত্তা বললেন, "আমি কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যদিও প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস, ব্যক্তিগতভাবে এ দুটোর কোনটারই আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই, তবুও আমার বিশ্বাস যে প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাবাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীতিসম্মত ও মনুষ্যোচিত শাস্তি। ফাঁসি লোককে মুহূর্ত্তের মধ্যে মেরে ফেলে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাবাস তিলে তিলে একটু একটু করে হত্যা করে। এখন কোন্‌টিকে বেশী 'সহৃদয়' বলবে — যে নিমেষের মধ্যে তোমার সব শেষ করে দেয়, তাকে, না যে বছরের পর বছর ধরে পলে পলে তিল তিল করে তোমার প্রাণশক্তি শোষণ করে, তাকে?"

অতিথিদের মধ্যে একজন বললেন, "ও দুটোই নীতিশাস্ত্রের বিরোধী, কারণ রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই এবং যা সে কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না, সে জিনিষ নিয়ে নেবারও তার কোন অধিকার থাকতে পারে না।"

সেই দলের মধ্যে একজন তরুণ আইনব্যবসায়ী ছিল, বয়স তার বেশী নয়—বছর পঁচিশ। তার মত জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললে, "প্রাণদণ্ড আর যাবজ্জীবন কারাবাস দুটোই নীতিবিগর্হিত, কিন্তু আমাকে যদি ঐ দুটোর কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়, আমি নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টা বেছে নিই। একেবারে না বাঁচার চেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকাও ভাল।"

তারপর খুব জোর তর্ক আরম্ভ হল। মহাজনের বয়স তখন অনেক কম — সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন, রক্ত গরম, মেজাজটা তাঁর হঠাৎ গরম হয়ে উঠল।

টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করে আইনব্যবসায়ীর দিকে চেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না—তোমার বাজে কথা, একদম বাজে কথা। যাবজ্জীবন ত দূরের কথা, তার দরকার নেই। তুমি যদি পাঁচটি বছরও একটা অন্ধকার ঘরে একাকী বন্ধ থাকতে পার, আমি একলক্ষ টাকা বাজী হারব।" ব'লে তিনি গর্ব্বভরে সকলের মুখের দিকে বার বার চাইতে লাগলেন।

তরুণ আইনব্যবসায়ী বললে, "ঠিক?"

"ঠিক।"

"বেশ, তাই হবে। পাঁচ কেন, যাবজ্জীবন কারাবাসের যে নিয়ম,—চোদ্দ বছর, আমি সেই চোদ্দ বছরই বন্ধ থাকব।"

"চোদ্দ বছর! বহুৎ আচ্ছা—তাই হবে—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সব শুনছেন। আমি এক লক্ষ টাকা বাজী রাখলাম।" এই বলে মহাজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

এই হল সেই অদ্ভুত হাস্যজনক বাজীর সূত্রপাত। মহাজনের তখন কোটী কোটী টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত। লোকটিও অত্যন্ত খামখেয়ালী ও উগ্র প্রকৃতির। কোন কিছুতে ঝোঁক পড়লে বা জেদ চাপলে তিনি আর নিজেকে সংযত করতে পারতেন না। যাবার সময় তরুণ ব্যবহারাজীবকে ঠাট্টা করে বললেন, "ওহে ছোকরা, সময় থাকতে থাকতে মাথা ঠিক কর। এক লক্ষ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু তুমি তোমার জীবনের সব চেয়ে ভাল সময়টুকু ঐ তিন চার বছরে হারাবে। তিন চার বছর এই জন্য বলছি যে, আমি জানি, তুমি ওর চেয়ে বেশীদিন কখনই থাকতে পারবে না। তাছাড়া ভুলে যেওনা যে, নিরুপায় বন্দিত্বের চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত বন্দিত্ব ঢের বেশী ভয়ঙ্কর। তুমি যে ইচ্ছা করলেই বন্দিত্ব হতে মুক্তি

পেতে পারবে এই চিন্তাই অহর্নিশ তোমার বন্দিজীবন বিষময় করে তুলবে। তুমি ভেবে দেখ, তোমার জন্যে আমার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।"

তরুণ আইন-ব্যবসায়ী অচল, অটল।

কতকাল কেটে গেছে তার পর! ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে মহাজন আজ সেই পুরাতন কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, "হায়! হায়! কেন আমি এমন বাজী রাখতে গিয়েছিলাম? কি লাভ হল এতে? আইনব্যবসায়ীর জীবনের পনর বছর নষ্ট হল আর আমারও একটি লক্ষ টাকা গেল, কিন্তু তাতে প্রাণদণ্ড ভাল কি যাবজ্জীবন কারাবাস ভাল, সে বিষয়ে জগতের লোক কি কোন স্থির মত পোষণ করতে পেরেছে? কখনই না।

"সবশুদ্ধ মিলে এটি একটি অত্যন্ত বোকামীর কাজ হয়েছিল। পয়সাওয়ালা লোকেদের যেমন নানা অদ্ভুত খেয়াল থাকে, আমি সেই রকম খেয়ালের বশেই এটা করেছিলাম আর আইনব্যবসায়ী করেছিল, টাকার লোভে।"

ক্রমে ক্রমে সেই সন্ধ্যাবেলার সমস্ত কথাই তাঁর মনে পড়তে লাগল। ঠিক হয়েছিল যে, আইন-ব্যবসায়ী মহাজনের বাগানবাড়ীর এক অংশে সতর্ক প্রহরীদের প্রহরায় বন্দী থাকবে। আরও ঠিক করা হয়েছিল যে, বন্দী অবস্থায় সে তার ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে পারবে না, কোন লোকের দেখা সে পাবে না, এমন কি কোন মানুষের গলার শব্দও তাকে শুনতে দেওয়া হবে না। কোন চিঠি বা খবরের কাগজ পাবারও তার কোন অধিকার থাকবে না। কেবল একটা কোন বাজনা রাখবার, বই পড়বার ও চিঠি লিখবার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হবে এবং মদ বা তামাক খেতেও তার কোন বাধা থাকবে না। একটা ছোট জানালার মধ্য দিয়ে সে নীরবে বহির্জ্জগতের কাছে তার মনোভাব জানাতে পারবে। বই, বাজনা, মদ বা অন্য কোন জিনিষের দরকার হলে ঐ জানালাটার উপর একটা কাগজে লিখে রেখে দিলেই তাকে সেই জিনিষ দেওয়া হবে। এই ছিল সর্ত্ত।

সেই সর্ত্তের নির্দ্দেশানুসারে তরুণ আইনজীবীর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বন্দীভাবে থাকবার কথা ছিল। সেই চুক্তিতে আরও নির্দ্দেশ ছিল যে, বন্দী যদি এই সমস্ত সর্ত্ত এতটুকুও লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করে, এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাত্র দু'মিনিট আগেও যদি মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে, তা হলে মহাজন অব্যাহতি পেয়ে যাবেন, তাঁকে আর টাকা দিতে হবে না।

তার সেই জানালায় রেখে-দেওয়া কাগজের টুকরোগুলো থেকে যতদূর বোঝা যেত, তাতে মনে হত যে বন্দিত্বের প্রথম বছর আইন-ব্যবসায়ী নির্জ্জনতা ও নিঃশব্দতার জন্য খুব কষ্ট পেত। তখন তার ঘর থেকে দিনরাত পিয়ানোর 'শব্দ' আসত। সে কিন্তু মদ বা তামাক খেতে চাইত না। সে লিখে দিয়েছিল যে, মদ বাসনার উদ্রেক করে, আর বন্দীর পক্ষে বাসনার মত বড় শত্রু আর কিছু থাকতে পারে না, তাছাড়া ভাল মদ একা একা খাওয়াও এক কঠিন শাস্তি-বিশেষ। তামাকের বিষয় সে বলেছিল যে, সেই ক্ষুদ্র ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয় ব'লে সে তামাক খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করেছে।

বন্দিত্বের প্রথম বৎসরে আইন-ব্যবসায়ী হাল্‌কা ধরণের গল্প উপন্যাস পড়তে চাইত। অপরাধমূলক ও কল্পনাবহুল গল্প, মিলনাত্মক বা জটিল প্রণয়সমস্যামূলক বই—এই সবই ছিল তার পাঠ্য।

দ্বিতীয় বছরে বন্দীর ঘরে আর পিয়ানোর শব্দ শোনা যেত না। বন্দী তখন নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই চাইত। পঞ্চম বৎসরে আবার বাজনার শব্দ শোনা গেল। এই সময় বন্দী মদ চেয়েছিল। যারা তাকে এই সময় লক্ষ্য করেছিল, তারা বলে যে, এই সময়টা সে খালি হেসে, খেলে এবং অলস ভাবে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছিল। তখন সে ঘন ঘন হাই তুলত এবং নিজেই নিজের সঙ্গে খুব তর্ক করত। এই সময় সে কোন বই পড়ত না; কখন কখন রাত্রিবেলায় বসে বসে লিখত। সময় সময় সে অনেকক্ষণ ধরে লিখত এবং তার পর দিন সকালে উঠে লেখা কাগজগুলি ছিঁড়ে ফেলত। প্রহরীরা বলে, অনেকবার তার কান্নার শব্দও শুনতে পাওয়া যেত।

ষষ্ঠ বৎসরের দ্বিতীয় ভাগে সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাসমূহ, দর্শনশাস্ত্র এবং ইতিহাসপাঠে মনোনিবেশ করেছিল। সে এমন উৎসাহের সঙ্গে এসব পড়তে আরম্ভ করল যে, মহাজনকে তার প্রয়োজনীয় সব বই জোগাড় করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। চার বৎসরের মধ্যে তার

জন্য ছয় শতের চেয়েও বেশী বই আনা হয়েছিল। যে সময় সে এই রকম গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল, সেই সময় মহাজন তার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিল; তাতে লেখা, "কারারক্ষক মহাশয়! আমি এই চিঠিটা ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় লিখছি। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের এটা দেখিও। যদি তাঁরা একটাও ভুল বের করতে না পারেন, তা হলে বাগানে বন্দুকের আওয়াজ ক'রো। তা হলে আমি বুঝতে পারব যে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের প্রতিভার বিকাশ বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়েই হয় সত্য, কিন্তু তাঁদের সকলেরই চিন্তাপ্রণালী সেই একই চিরন্তন ভাবধারার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই সব মনীষিদের লেখা বুঝতে পেরে আমি যে কি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি তা যদি তুমি বুঝতে!"—বন্দীর ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়েছিল। মহাজনের আজ্ঞানুসারে বাগানে বন্দুকের আওয়াজ করা হয়েছিল।

আরও পরে। দশম বৎসরে আইন-ব্যবসায়ী তার টেবিলের সামনে স্থির হয়ে বসে কেবল মাত্র "নিউ টেষ্টামেণ্ট" পড়ত। মহাজনের ভারী আশ্চর্য্য বোধ হত যে, যে লোক চার বছরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই পড়ে শেষ করেছে, সে পুরো এক বছর ধরে কেবল মাত্র এমন একখানি বই পড়ত, যেটা খুবই সহজ এবং অত্যন্তই ক্ষুদ্র। "নিউ টেষ্টামেণ্টের" পর সে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করল।

শেষ দু'বছর বন্দী বিভিন্ন প্রকারের অনেক বই পড়ত। কোনো সময়ে সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কোনো সময় বা বায়রণ ও সেক্‌স্‌পীয়র পড়ত। অনেক সময় সে একই সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের বই, ডাক্তারী বই, উপন্যাস এবং দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বই চেয়ে পাঠাত। তার পড়ার ধরণ দেখে মনে হত, সে যেন এক ভগ্নতরী নাবিকের মত সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছে এবং হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাকেই চেপে ধরছে।

মহাজনের এখন এ সবই একে একে মনে পড়ল। তিনি ভাবতে লাগলেন, "কাল সকালে বন্দী মুক্তি পাবে এবং সেই সর্ত্ত অনুসারে আমার তাকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পথের কুকুর।"

পনর বছরে মহাজনের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাঁর সে কোটি কোটি টাকা নেই, বড় বড় ব্যবসায় নেই—আর সেই খামখেয়ালী গরম মেজাজও নেই। জুয়ায়, আমোদে প্রমোদে, বিলাস ব্যসনে সবই গিয়েছে। মাত্র বাজীর একটি লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে আছে।

"সেই অর্থহীন, অদ্ভুত, বাজে বাজীটার জন্যই…" মহাজন দু'হাতে মাথা চেপে ধরে নিজে নিজেই বলতে লাগলেন,—"আচ্ছা, ও লোকটাই বা এতদিনে মরে গেল না কেন? ওর ত এখন মোটে চল্লিশ বছর বয়স—ও আমার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত নিয়ে নেবে—তারপর বিয়ে করবে, জুয়া খেলবে, আরও কত কি করবে—নানাভাবে জীবন উপভোগ করবে, আর আমি? আমি ঈর্ষ্যাপরায়ণ ভিক্ষুকের মত চেয়ে থাকব। ও হয়ত রোজই আমাকে সেই একই কথা বলবে, "আমার জীবনের সর্ব্ববিধ সুখশান্তির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার দুঃসময়ে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে আমাকে অনুমতি দাও।"

"না—না—সে অসহ্য—তা আমি সহ্য করতে পারব না।—কিন্তু দেউলিয়া হয়ে অপমানের বোঝা বওয়া থেকে নিস্তার পাবার অন্য উপায়ই বা কি? হাঁ—আছে—একমাত্র উপায় আছে—সে হল ওর মৃত্যু।"

ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটা বাজল। বাড়ীতে সবাই ঘুমোচ্ছে—চারিদিক নিস্তব্ধ; বাইরে খালি বরফ পড়ার শব্দ ও বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে রণরঙ্গমত্ত গাছগুলোর আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কোন শব্দ না করে মহাজন—পনর বছর যে ঘরের দরজা খোলা হয়নি—সেই ঘরের চাবিটি পকেটে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লেন। তখনও বৃষ্টি পড়ছিল—বাগানে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। গভীর অন্ধকার। একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ, আর্দ্র বাতাস গাছগুলোকে অবিশ্রাম কাঁপাচ্ছিল। মহাজন অনেক চেষ্টা করেও বাগানের পথ, সাদা পাথরের মূর্ত্তিগুলো, বাগানের বেড়া বা ফুলগাছ কিছুই দেখতে পেলেন না। আন্দাজে হাতড়াতে হাতড়াতে বন্দীর ঘরের কাছে গিয়ে সে পাহারাওয়ালাকে দু'বার ডাকলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। সে নিশ্চয়ই এই বিশ্রী জলঝড়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রান্নাঘরে বা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে। মহাজন মনে মনে ভাবলেন, "যদি আমি যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই পাহারাওয়ালাটার উপরেই সর্ব্বপ্রথম দোষ পড়বে।"

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে তিনি বাগান-বাড়ীর সিঁড়ি ও দরজা খুলে প্রথমেই হলঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন—তারপর সে ঘরগুলোর সামনের সরু পথটাতে এসে দাঁড়ালেন এবং আস্তে আস্তে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন। সেখানে জনপ্রাণীও ছিল না—খালি একটা চাদর-না-দেওয়া বিছানা ও এককোণে একটা ষ্টোভ পড়ে ছিল। বন্দীর ঘরের দরজার "সীল"গুলো আস্তই ছিল।

হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। মহাজন উত্তেজনাপূর্ণ হৃদয়ে সেই ছোট জানালাটা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন।

বন্দীর ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছিল বন্দী একটা টেবিলের ধারে চুপ করে বসে। বাইরে থেকে কেবল মাত্র তার পিঠের দিকটা, মাথার পিছন দিক্‌কার চুলগুলো এবং হাতদুটো দেখা যাচ্ছিল। টেবিলে, চেয়ারদুটোয় ও কার্পেটটার উপরে অনেক খোলা বই ছড়ান।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল—কিন্তু বন্দী একবারও নড়ল না; পনর বছর বন্দিত্বের ফলে তার নিশ্চলভাবে বসে থাকবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। মহাজন আঙুল দিয়ে জানালার গায়ে টোকা মারলেন, কিন্তু লোকটি নির্ব্বাক, নির্ব্বিকার, নিশ্চল। মহাজন আস্তে আস্তে, সতর্কতার সঙ্গে দরজার "সীল" ভেঙ্গে খুব সন্তর্পণে তালাতে চাবি ঢুকিয়ে দিলেন। বহুদিনের পুরাণো মরচে-পড়া তালায় একটা বিশ্রী, কর্কশ শব্দ হল। মহাজন ভেবেছিলেন যে, এখুনি একটা বিস্ময়সূচক শব্দ ও পদধ্বনি শোনা যাবে, কিন্তু তিন মিনিট কেটে গেল, তবু ভিতর থেকে এতটুকুও শব্দ এল না। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন

টেবিলের সামনে একজন লোক বসে ছিল বটে, কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। ঠিক যেন একটা কঙ্কাল। তার চামড়া গেছে কুঁচকে, চুলগুলো হয়ে গেছে মেয়েদের মত লম্বা ও কোঁকড়ান, আর দাড়িও গেছে খুব বেশী রকম বেড়ে। তার মুখের রংটা হলদেটে ধরণের—অনেকটা মেটে মেটে দেখাচ্ছিল। গালদুটো বসে গিয়েছিল, পিঠটাও খুব সরু আর লম্বা দেখাচ্ছিল, যে হাতের উপর মাথা রেখে সে শুয়ে ছিল, তার সেই হাতটা এমন কাঠির মত সরু হয়ে গেছে যে, দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়। তার চুল এর মধ্যেই পাকতে সুরু করেছিল এবং তার সেই বিশীর্ণ মুখের দিকে তাকালে কেউ ভাবতে পারত না যে, তার বয়স মোটে চল্লিশ বছর। টেবিলের উপরে, তার নুয়ে-পড়া মাথার সামনে খানকয়েক কাগজ পড়ে ছিল; তাতে ছোট ছোট অক্ষরে কি সব লেখা ছিল। মহাজন ভাবলেন, "আহা! বেচারা নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে। আমি যদি এখন ওর এই অর্দ্ধমৃত দেহটা তুলে বিছানায় নিয়ে গিয়ে, লেপ চাপা দিয়ে চেপে শেষ করে ফেলি, তা হলে অতি সূক্ষ্ম তদন্তের ফলেও কারও সন্দেহ হবে না যে, এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু তার আগে একবার দেখা যাক্‌ কাগজগুলোতে ও কি লিখেছে।"

মহাজন কাগজগুলো তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, কাল রাত্রি বারোটার সময় আমার মুক্তি। কাল আমি আবার জনসমাজে মেশবার অধিকার অর্জ্জন করব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, এই ঘর ছেড়ে সূর্য্যের মুখ দেখবার আগে তোমাদের কিছু বলে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। আমার নিজের বিবেকের দিকে চেয়ে এবং সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমি বলছি যে, আমি এখন স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য এবং পৃথিবীতে যা কিছু জীবনের সুখশান্তি বলে মনে করা হয়, সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করি।

"পনর বছর ধরে আমি অশ্রান্ত সূক্ষ্মভাবে পার্থিব জীবনের বিষয় চিন্তা করেছি। অবশ্য আমি বাইরের পৃথিবী বা পৃথিবীর মানুষ কিছুই দেখতে পেতাম না, কিন্তু আমি বই পড়তাম ও বইয়ের মধ্য দিয়েই সব কিছু অনুভব করতাম। গভীর অভিনিবেশ দিয়ে পড়ার ফলে বইয়ের সঙ্গে আমি একেবারে একাত্ম হয়ে যেতাম এবং বই পড়েই আমি মদ্য পান করার আরাম পেতাম, মধুর স্বরলহরীপূর্ণ গান গাইতাম, হরিণ ও বরাহ শিকার করতাম এবং সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যময়ী নারীকে ভালবাসতাম; তোমাদের কবিদের প্রতিভা-সৃষ্ট অপরূপ সুন্দরী নারীরা নক্ষত্রবাসীদের মত রাত্রে আমার কাছে আসত এবং এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনীর উল্লেখ করত, যাতে আমার মন মধুর আবেশে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেত। তোমাদের বই পড়েই আমি "এলবুজ" ও "মণ্ট ব্লাঁ"র সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছি, সেখান থেকে আমি সমস্ত দিগন্ত উদ্ভাসিত করে ধীরে ধীরে প্রাতঃসূর্য্যের উদয় এবং আকাশে

মেঘের গায়ে, সমুদ্রের জলে ও পর্ব্বতমালার শিখরদেশে রক্তাভ সোনালী রংয়ের তুলি বুলিয়ে সন্ধ্যা-সূর্য্যের অস্তগমন, এ সবই দেখেছি। আমি আরও দেখেছি, কেমন করে আমার মাথার উপর দিয়েই মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সবুজ বনানী, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, কল্লোলিনী নদী, বিশাল, স্থির হ্রদ, প্রাসাদমালিনী নগরী—এ সবই আমি দেখেছি। আমি "সাইরেন"দের মোহিনী সঙ্গীতধ্বনি শুনেছি; "প্যানে'র বাঁশীর স্বর আমার কানে এসে পৌছেছে। যে সকল সুন্দর দেবদূতেরা আমাকে ঈশ্বরের কথা বলতে আসত, আমি তাদের স্বর্গীয় পাখার স্পর্শ পেয়েছি। তোমাদের বইয়ের সাহায্যেই আমি গভীর খাদে অবতরণ করেছি—সহর পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি, নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেছি এবং বড় বড় দেশ জয় করেছি।

"বই পড়ে আমি বহু জ্ঞান সঞ্চয় করেছি। মানুষের অক্লান্ত চিন্তার ফলে বহু শতাব্দী ধরে যে জ্ঞানভাণ্ডার জমে উঠেছে—সে সবই আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঠাসাঠাসি করে রয়েছে। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমি তোমাদের সবাইকার চেয়েই ঢের বেশী জ্ঞানী।

"এখন আমি গ্রন্থমাত্রকে ঘৃণা করি, সমস্ত পার্থিব সুখ-শান্তি ও জ্ঞানকে ঘৃণা করি। পৃথিবীর সব জিনিষই শূন্য, ক্ষণস্থায়ী, স্বপ্নের মত মিথ্যা এবং মরীচিকার মত ভ্রান্তিজাল-পূর্ণ; তুমি যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সবচেয়ে সৌন্দর্য্যশালী হও, তাহলেও সামান্য একটি ইঁদুরের মতই মৃত্যু পৃথিবী থেকে তোমার সব চিহ্ন লোপ করে দেবে। তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, তোমার ইতিহাস, তোমাদের কাছে যে সব প্রতিভাশালী লেখককে আজ অমর বলে মনে হচ্ছে, সে সবই ক্রমে ক্রমে জমে-যাওয়া বরফের স্তূপের মত অচল, অনড়, জড়পদার্থবিশেষ হয়ে যাবে এবং অবশেষে পৃথিবীর অংশবিশেষের সঙ্গে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

"তোমরা পাগলের মত ভুল পথে চলেছ, তোমরা মিথ্যাকে সত্য ভাব এবং কুৎসিতকে সুন্দর ভাব। হঠাৎ যদি আপেল ও কমলালেবুর গাছে ব্যাং ও টিকটিকি ফলতে আরম্ভ করে এবং গোলাপ ফুলে যদি হঠাৎ ঘোড়ার ঘামের গন্ধ পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম ভাবেই আমি তোমাদের দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—তোমরা, যারা স্বর্গকে ত্যাগ করে পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। আমি তোমাদের কোন কথা বুঝতে চাই না।

"আমি যে সত্যসত্যই তোমাদের জীবনযাপনের সর্ব্ব-প্রকার উপায়কে আন্তরিক ঘৃণা করি, তা বোঝানর জন্য—যে এক লক্ষ টাকা পেলে আমি এক সময় স্বর্গসুখ অনুভব করতে পারতাম এবং যা আমি এখন অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখি—সেই লক্ষ টাকার সর্ত্ত আমি ত্যাগ করছি। যাতে সে টাকাটা আমাকে না পেতে হয়, সে জন্য আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক দু' মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাব এবং তা হলেই সর্ত্ত ভঙ্গ করার দরুণ এ টাকাতে আমার আর কোনো অধিকার থাকবে না।"

পড়া শেষ করে কাগজটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মহাজন ধীরে ধীরে সেই আশ্চর্য্য লোকটির মস্তক চুম্বন করলেন, —তাঁর দু' চোখ বয়ে তখন ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছিল। তারপর সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জীবনে কখনও—এমন কি যখন তিনি জুয়া-খেলায় প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন—তখনও তিনি নিজের উপর এমন বিতৃষ্ণা অনুভব করেন নি। বাড়ী এসে তিনি চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু প্রবল মানসিক উত্তেজনা ও ক্রন্দনের ফলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমোতে পারলেন না।

পরদিন সকালে বন্দীর ঘরের প্রহরী দৌড়তে দৌড়তে এসে মহাজনকে বলল যে, তারা বন্দীকে জানালা বেয়ে বাগানে নেমে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীর বার হয়ে যেতে দেখেছে। মহাজন তখনই তাঁর চাকরবাকরদের নিয়ে বন্দীর ঘরে গেলেন এবং চারিদিকে বন্দীর পলায়ন-সংবাদ প্রচার করে দিলেন। অনভিপ্রেত জনরবের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি টেবিলের উপর থেকে সেই কাগজটি তুলে নিলেন ও তাঁর লোহার সিন্দুকে চাবি বন্ধ করে রেখে দিলেন। *

* শেকভ হইতে।

ইঙ্গিত

—শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ক্রেয়ন ড্রয়িং পেনসিল

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন ভূগোল পড়িতে আরম্ভ করিবার পর ম্যাপ আঁকিবার ধুম পড়িয়া যায়। কেবল outline আঁকিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। উহাতে রঙ দেওয়া চাই ; নচেৎ মানাইবে কেন ?

ম্যাপে রঙ দিবার জন্য তখন আমাদের কাছে এখনকার মত এত সরঞ্জাম থাকিত না। একটি পাতলা কাঠের বাক্সে কয়েকটি ছোট ছোট চৌকা রঙের 'কেক', সরু মোটা কয়েকটি তুলি, একটি চীনা মাটীর প্লেট (রঙ গুলিবার জন্য), আর কয়েকটি ডিশ (ছোট)।

এই কয়েকটি রঙের কেক ছাড়া সবুজ রঙের জন্য আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সন্ধান করিতাম—কোন বাড়ীতে সিম গাছ আছে কি না। হলদে রঙের জন্য অন্তঃপুরে রন্ধনশালায় অভিযান করিতে হইত। লাল রঙের কাজ লাল কালিতে সারিয়া লইতাম।

পঞ্চাশ বৎসর পরে এখন দেখি, বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে একটি করিয়া কার্ড-বোর্ডের বাক্স যোগাড় করিয়াছে। বাক্সের উপর লেবেল হিসাবে একটি সুদৃশ্য ছবি আছে। প্রত্যেক বাক্সের ভিতর বারোটি করিয়া মোটা পেনসিল। প্রত্যেক পেনসিল এক এক রঙের।

বাক্সটি 'নিরীক্ষণ' করিয়া দেখিলাম, উহা জাপানে তৈয়ারী। প্রত্যেক বাক্সের দাম ছয় পয়সা, কোথাও কোথাও চার পয়সায়ও পাওয়া যায়। কিছু কাল পূর্ব্বে এইরূপ বাক্স রাস্তার ধারে ফেরীওয়ালাদের কাছে দেখিয়াছিলাম। সেগুলা জার্ম্মাণ। তাহার দামও বেশী।

ছেলে মেয়েরা ম্যাপ আঁকিতেছে, ছবি আঁকিতেছে—জীবজন্তুর, মানুষের—এমন কি আমারও! আর পেনসিল ঘষিয়া মনের সাধে রঙ করিতেছে।

জীবজন্তুর ছবিগুলি এমন সুন্দর হইতেছে যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রে ত্রিবর্ণ ছবি রূপে মুদ্রিত করিলেও নেহাত খারাপ দেখায় না।

ম্যাপ ও চিত্রাঙ্কনের এইরূপ আধুনিক কত রকমের আয়োজনই না হইয়াছে ! সে সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিশু-পছন্দ জিনিস এই crayon pencil। এই পেনসিল প্রস্তুত করা কঠিন নয়—মারাত্মক রকমের বড় বড় কলকব্জার প্রয়োজন নাই—অজস্র মূলধনে প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন না করিলেও ক্ষতি নাই।

এই পেনসিল প্রস্তুত করিবার উপকরণও অতি সামান্য। (১) মোম, (২) চর্ব্বি, (৩) রঙ। মোমটা যত সাদা হইবে, রঙের বাহার ততই খুলিবে। কয়েকটি পাত্র চাই। একটি—মোম ও চর্ব্বি গলাইবার পাত্র। আর একটা জল গরম করিবার পাত্র, যাহার ভিতর মোম গলাইবার পাত্র বসাইয়া দিয়া গরম জলের তাপে মোম গলানো যায়। ইহাতে যদি সুবিধা না হয়, অর্থাৎ মোম ও চর্ব্বি গলিয়া না যায়, তবে উনুনের মৃদু আঁচে গলাইতে হইবে। বেশী তাপ দিলে জিনিসটি পুড়িয়া বা আঁকিয়া গিয়া বিবর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

রঙগুলি খুব মিহি চূর্ণ হওয়া চাই। ভাল রকম চূর্ণ না হইলে, কিম্বা খিঁচ থাকিলে পেনসিল ভাল হইবে না। মিশ্রণও উত্তমরূপ হওয়া চাই।

কালো রঙের পেনসিলের জন্য ভুষা দশ ভাগ, সাদা মোম চল্লিশ ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

সাদা—জিঙ্ক হোয়াইট চল্লিশ ভাগ, সাদা মোম কুড়ি ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

নীল—প্রুসিয়ান ব্লু পনেরো ভাগ, মোম পাঁচ ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

ফিরোজা—প্রুসিয়ান ব্লু দশ ভাগ, সাদা মোম কুড়ি ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

হলদে—ক্রোম ইয়েলো দশ ভাগ, মোম কুড়ি ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

চর্ব্বি ও মোম গরম করিয়া গলাইয়া রঙগুলি তাহার সঙ্গে মিশাইতে হইবে। মিশ্রণ যেন নিখুঁত হয়। মশিনার তৈল বা গর্জ্জন তৈলের সঙ্গে রংরাজরা যে ভাবে রং মিশায়, সেই ভাবে মিশানো চাই। রংরাজরা একটা পাথরের শিলের উপর কিছু তৈল ঢালিয়া তাহার উপর রঙ দিয়া একটা পাথরের নুড়ি দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিয়া তেলের সঙ্গে রঙ মিশায়, দেখিয়া থাকিবেন। ইহাও সেই ভাবে মিশাইতে হইবে।

বর্ষণ করিতে করিতে মোম ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া আসিবে। ক্রমে তিনটি জিনিস মিশিয়া তাল পাকাইয়া যাইবে। নরম থাকিতে থাকিতে ছাঁচে ঢালিয়া চাপ দিয়া পেনসিলের আকার দিতে হইবে। পেনসিলগুলি কড়ে আঙুলের ডগার মত মোটা হইলেই চলিবে। সুতরাং ঐ ফাঁদের ছাঁচ চাই। পেনশিলের কারখানায় গ্র্যাফাইটের কাদা সরু নলের ভিতর দিয়া চাপ দিয়া যেমন করিয়া পেনসিলের শিস তৈয়ার করা হয়, ইহাও তাহাই।

ক্রেয়ন ড্রয়িং পেনসিল তৈয়ার করিবার ইহাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি অনেক রকম আছে। মশলাও নানা রকম ব্যবহৃত হয়। তবে রঙ সকল পদ্ধতিতেই একই রকম। বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আরও একটা পদ্ধতি দিতেছি। ইহাতে উপকরণও ভিন্ন প্রকার।

চর্ব্বি নব্বুই ভাগ, সাদা রজন আড়াই ভাগ, রজনের সাবান এক ভাগ। বাকী রঙ দিয়া এক শত ভাগ পূরণ করিতে হইবে। প্রথম তিনটি জিনিষ অগ্নিতাপে গলাইয়া যাহা হইল তাহা base। উহার সহিত প্রুসিয়ান ব্লু, রেড আয়রণ অক্সাইড (ইমারতী লাল রঙ), মেটে সিন্দুর, চীনের সিন্দুর, ক্রোম ইয়েলো প্রভৃতি যে-কোন রঙ মিশাইলেই হইল। মিশ্রণ ও ছাঁচে ঢালা প্রথম পদ্ধতির ন্যায়।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির উপকরণগুলির মধ্যে চর্ব্বি ও রজন এবং রঙগুলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। কিন্তু রজনের সাবানটা কি? উহার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচয় নাই; কলিকাতার বাজারেও বোধ হয় উহা আপনারা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে উপায় কি? উপায় আছে—উহা আপনাদিগকে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। উহা তৈয়ার করাও শক্ত কাজ নয়। কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেছি। ২২৫ ভাগ রজন, ২২৫ ভাগ নারিকেল তৈল ও ২৮ ডিগ্রি শক্তির ৩৭১½ ভাগ সোডা লাই নিন। রজন অবশ্য চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। তার পর cold processএ উহাকে সাবানে পরিণত করুন।

রজন ও তৈল একটা পাত্রে নাড়িয়া চাড়িয়া মিশাইয়া উহাতে সোডা লাই ধীরে ধীরে ধারার আকারে ঢালিয়া একটা কাঠের হাতার দ্বারা মিশাইতে থাকুন। সমস্ত জিনিষটা মিশিয়া গেলে মধুর মত ঘন হইবে। হাতার দ্বারা নাড়াচাড়ি বেশী করিবার দরকার নাই। শুধু মিশাইবার জন্য যেটুকু দরকার তাহাই যথেষ্ট। বেশী নাড়াচাড়া করিলে একটা প্রতিক্রিয়া হইয়া জিনিষটা খারাপ হইয়া যাইবে।

ইহার পর ২৪ ডিগ্রি বি-শক্তির লবণ-জল তৈয়ার করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া লইলে সাবানটা পৃথক হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে। লবণ-জলটি তলায় পড়িয়া থাকিবে। সেটি ফেলিয়া দিয়া সাবানটি লইতে হইবে। কিছুক্ষণ বাদে উহা জমাট বাঁধিলে ছাঁচে ঢালিয়া কাটিয়া লউন।

রজনের সাবান বাজারে পাওয়া গেলে অবশ্য আপনাদের এত মেহনত করিতে হইবে না।

অবশেষে রঙের কথা। যে কয়টি রঙের নাম দেওয়া হইল, তা ছাড়া আরও অনেক রঙের পেনসিল হইতে পারে। মূল বর্ণের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। কিন্তু দুই বা তিনটি রঙের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের দ্বারা হাজার হাজার রকম রঙ তৈয়ার হইতে পারে। আপনাদের বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী-শক্তি কিছু কম নয়। আপনারা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া নিজেরাই অনেক রঙ তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবেন।

যে দুইটি পদ্ধতি দেওয়া হইল এবং উপকরণগুলির যে ভাগ দেওয়া হইল তাহাই চূড়ান্ত নহে। ক্রেয়ন ড্রয়িং পেনসিল কি পদ্ধতিতে তৈয়ার হয় তাহার একটা মোটামুটি আভাষ দিলাম। এইগুলি লইয়া ভাবিতে থাকুন। মূল তত্ত্বটি মনে রাখিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অনেক নূতন পদ্ধতির idea আপনাদের মনে আসিবে—আপনারা নিজেরাই নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারিবেন।

ভাগগুলির সম্বন্ধেও এই কথা। কাজ করিতে করিতে ভাগগুলির ইতর বিশেষ করিয়া, কিম্বা নূতন নূতন উপকরণ লইয়া experiment করিয়া তাহার ভাগ ঠিক করিয়া লইয়া আপনারা হয়ত বিদেশ হইতে আমদানী পেনসিলের অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্টতর পেনসিল তৈয়ার করিতে পারিবেন।

কাঠের খোলের ভিতর যে সব লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙের পেনসিল তৈয়ার হয়, তাহার শিসটি তৈয়ার করিবার পদ্ধতিও অনেকটা এই প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন মেকারের এই ধরণের পেনসিল সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া লিখিয়া ও অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, উহাদের পরস্পরের মধ্যে উপকরণের ও প্রস্তুত-প্রণালীর কত পার্থক্য রহিয়াছে। জাপানী বা জার্ম্মাণ ক্রেয়ন ড্রয়িং পেনসিল দুই চারি বাক্স সংগ্রহ করিয়া তাহাও পরীক্ষা করিতে থাকুন। একটু একটু টুকরা পোড়াইয়া, চূর্ণ করিয়া, রাসায়নিক প্রণালীতে analyse করিয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা করিতে পারেন। তাহাতে আপনাদের বুদ্ধি খেলাইবার, উদ্ভাবন করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তখন ভাল ভাল জিনিস তৈয়ার করা আপনাদের পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন হইবে না।

হামবুর্গ—কীল—লণ্ডন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

লণ্ডনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এখানকার সংগ্রহ খুব ভালই, কিন্তু সর্ব্বদাই ভ্যাটিকানের সঙ্গে তুলনাটা মনে আসে, কারণ ভ্যাটিক্যানের অনেক বিভাগ এখানকার চেয়ে বড়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রীডিংরুম খুব চমৎকার। না পাওয়া যায় এমন বই বা কাগজ নাই, বসিয়া লেখাপড়া করিবারও খুব সুব্যবস্থা আছে। ফ্লীট ষ্ট্রীটের বড় বড় খবরের কাগজের অফিসগুলি ঘুরিলাম। মিড্‌ল্ টেম্পল্, গ্রে'স্ ইন্ ও লিংকন্‌স্ ইন্‌গুলি ঘুরিয়া দেখিলাম। মধ্যযুগ-ধরণের পুরান বড় বড় বাড়ী, মাঝখানে প্রশস্ত পুরান ধরণের আঙিনা। এই ইন্‌গুলিতে আমাদের দেশের বড় ছোট কত ব্যারিষ্টার তৈয়ারী হইয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি কত বিখ্যাত লোক ছাত্রাবস্থায় এখানে ঘোরাঘুরি করিয়াছেন। হাইকোর্ট অফ জাষ্টিস্‌ও খুব প্রকাণ্ড বাড়ী। ওয়েষ্টমিনিষ্টার পাড়ায় গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের বাড়ীগুলি, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী প্রভৃতি নামজাদা জায়গাগুলি দেখিতে বড় আনন্দ লাগিল। অল্‌ড উইচে ভারতীয় হাই-কমিসনারের প্রকাণ্ড নূতন অফিস বেশ সুন্দর ভাবে সাজান। নীচের তলায় ছোট একটী ভারতীয় একজিবিশন রাখা হইয়াছে। হর্স্-গার্ড-এর পাহারা বদলির অনুষ্ঠানটি বিদেশীরা সকলেই ভীড় করিয়া দেখে। অ্যাড্‌মিরালটি-আর্চের তলা দিয়া সেণ্ট-জেমস্-পার্কের মধ্যে বেড়াইতেছিলাম, দেখিলাম ব্যাগপাইপ বাজাইয়া ব্যাংক-অফ-ইংলণ্ডের বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদধারী গার্ড হর্স্-গার্ডের দরজা দিয়া পার হইতেছে; হর্স্-গার্ডের সান্ত্রীরা প্রেজেন্টি-সেলামি দিল, ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডের পাহারাওয়ালাদের অফিসার খোলা তলোয়ার হাতে "আইজ লেফট, আইজ ফ্রণ্ট" হুকুম করিলেন; ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু কি সুনিপুণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইল! দেখিবার জন্য দুমিনিটের মধ্যে পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীটে লোকারণ্য জমিয়া গেল। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি রাজাদের অভিষেক, বিবাহ, ইংলণ্ডের বিখ্যাত লোকদের সমাধিস্থলরূপে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগের বড় বড় লোকদের নাম দেওয়ালে ও মেঝেয় পড়িতে পড়িতে ও পূর্ণমূর্ত্তি, অর্দ্ধমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডের গৌরব-ইতিহাস মনে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে।

আর্ট-গ্যালারী, মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক বাড়ীঘর লণ্ডনেও অনেক আছে, কিন্তু ইটালি ঘুরিয়া আসিয়া এসবের দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি দিবার অবকাশ হয় না। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ও ইংরেজি সাহিত্য, ইংরেজি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকায় এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, খবরের কাগজ ও সিনেমার কল্যাণে এবং শেষতঃ বিলাতফেরতদের সংসর্গ-মহিমায় লণ্ডন সহরের অনেক জিনিসের সঙ্গে দেশে থাকিতেই আমাদের কিছু কিছু পরিচয় হইয়া থাকে। "রহস্য-লহরী"তে প্লাবিতমস্তিষ্ক বয়সে বুদ্ধিতে নাবালক একটি ছোকরাকে লণ্ডনে হঠাৎ বেকার ষ্ট্রীট আবিষ্কার করিয়া মহা উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি। দূর হইতে লণ্ডনের যে সব জিনিষ আমাদের খুব বৃহৎ দেখিব আশা হয়, কাছে আসিয়া দেখা যায়, সেগুলি আসলে এমন কিছু বৃহৎ নয়—বিশেষতঃ লণ্ডনে আসিবার আগে যদি কণ্টিনেণ্ট ঘোরা থাকে, তবে লণ্ডনের সবই বেঁটে, ছোট ও সরু মনে হয়। পিকাডিলি, অক্সফোর্ড সার্কাস, চেয়ারিং ক্রস্ প্রভৃতি বলিতে বা শুনিতে যাহাদের জিভ দিয়া জল পড়ে, এখানে আসিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অবশ্য দেশে ফিরিয়া চা'ল দিবার সময় মুখ খোলে। "বিগ-বেন"এর নাম না শুনিয়াছে কে? মধ্যে বিগ-বেনের কিছুদিন অসুখ করিল, সারাইবার জন্য মিস্ত্রী মজুর লাগিল, রাজা-রাজড়ার অসুখের বুলেটিনের মত বিগ-বেনের উপর সপ্তাহখানেক ধরিয়া টাইমসের মত কাগজেও দৈনিক প্যারাগ্রাফ বাহির হইল, কিন্তু দেখিয়া মনে হইল, অমন উচ্চতা, আকার বা আওয়াজের ঘড়ি অন্য যে কোনও সহরেও অনেক আছে। নিজের জিনিষ সম্বন্ধে ইংরেজের খুব একটা গর্ব্ব আছে। ইংরেজের মত এমন আত্মসম্মান-জ্ঞান, এমন মর্য্যাদাবোধ ও 'ডিগনিটি' কোন জাতির নাই। নিজের সামান্য জিনিষের একটু গুণ থাকিলে ইংরেজ তাকে শুধু যে

খ্যাতির ও সম্মান করে তা নয়, তার সুখ্যাতির কথা দশজনকে প্রচার করিয়া জিনিষটির নিজেরই যেন আত্মসম্মান-জ্ঞান বাড়াইয়া দেয়। গুণবানের দ্বারাই গুণগ্রাহিতা সম্ভব হয় এবং গুণীলোকের কাছে আদৃত হইলে এদেশে লোকে আরও গুণবর্দ্ধনের প্রয়াস করে, তাই এদেশে সব জিনিষের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এত উঁচু। আমাদের দেশে উল্টা ভাব, অজ্ঞতা ও দুষ্টবুদ্ধি বশতঃ আমরা পারতপক্ষে নিজেদের ভাল জিনিষের প্রশংসা বা সম্মান করি না এবং যাহা বাস্তবিকই উঁচু বা ভাল বা সুন্দর, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য থেলো জিনিষকে খুব বাহবা দিয়া বড়াই বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।

এই বাহিরে খুব নাম-ডাক কিন্তু আসলে নাতিবৃহৎ ইংরেজের এরূপ আর একটি জিনিষ হইতেছে 'পার্লামেণ্ট'। হাউসেস্ অফ পার্লামেণ্টের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সযত্নে দেখিলাম। প্রথমে একটি ছোট্ট হল্, রাজার 'রোবিং রুম'। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাজা মহাশয় কি সত্যই এই হলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া 'রোব' করেন? প্রহরী একটু হাসিয়া হলের পাশে একটি ছোট কামরা দেখাইয়া বলিল, রাজা সেখানে 'রোব' করিয়া এই হল হইতে আসিয়া দাঁড়ান। প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট উদ্বোধনের সময় রাজারাণী 'রোব' করিয়া এই হল হইতে পরের ছোট হলটিতে আসেন, সেখানে রাজপুত্র ও রাজবংশীয়েরা অপেক্ষা করেন। এখান হইতে প্রোসেশন করিয়া রাজারাণী একটা করিডরের মধ্য দিয়া যে ঘরটিতে আসেন, সেটি হইতেছে হাউস অফ লর্ডস্—রামমোহন লাইব্রেরীর আকারের একটি হল, এক পাশে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর রাজারাণী ও প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের সিংহাসন, সামনে মেঝের উপর লর্ড-চান্সেলারের আসন, দু'পাশে লাল চামড়া মোড়া লম্বা লম্বা বেঞ্চি, উপরে গ্যালারী। পার্লামেণ্টের উদ্বোধনের সময় রাজা এখানে আসন গ্রহণ করিয়া কমনারদের ডাকিয়া পাঠান। রাজসিংহাসনের সামনাসামনি হলের অপর প্রান্তে একটি রেলিং আছে, "স্পীকার"-পুরঃসর কমনাররা এই রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া রাজার "সিংহাসন হইতে বক্তৃতা" (speech from the throne) শুনেন, এই রেলিংএর বেশী অগ্রসর হইবার অধিকার কমনারদের নাই। প্রিভি-কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে অবশ্য প্রধান মন্ত্রী কমনার হইলেও রাজসিংহাসনের পাদপ্রান্তে বসিতে পারেন। হাউস অফ লর্ডসের পরে লবি ও করিডর, আশে পাশে লর্ড চান্সেলারের প্রভৃতির বসিবার ঘর, এই লবির সীমানার মধ্যে পীয়ার বা তাঁহাদের পুত্রেরা ছাড়া অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। আভিজাত্য-যুগের এই সব নিয়মের এখন কোন অর্থ বা প্রয়োজন নাই, সমস্ত ইংরেজ জাত এই সব সাবেকি আদব-কায়দা লইয়া এখন কত ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সময় প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করে না। হাউস অফ লর্ডসের মন্ত্রীদের বেঞ্চগুলি দেখিয়া স্বর্গতঃ লর্ড সিংহের কথা মনে হইল, তিনি বক্তৃতা দিয়া এই মহামান্য সুপ্রাচীন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানেও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হাউস অফ লর্ডসের লবি পার হইয়া হাউস অফ কমনস্, ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের মস্তিষ্ক। সেই রামমোহন লাইব্রেরীর মত ছোট্ট হল, এক পাশে "স্পীকারে"র আসন, তাঁহার সামনে কেরাণীদের বসিবার জায়গা, টেবিলের উপর স্পীকারের শাসনদণ্ড, স্পীকার আসন ছাড়িয়া উঠিলেই কিম্বা হাউস যখন "কমিটি অফ দি হোল হাউস, Committee of the whole House" হইয়া যায় তখন এই দণ্ড টেবিল হইতে নামাইয়া নীচে বেঞ্চের উপর রাখা হয়। হলের অপর প্রান্তে "সার্জ্জেণ্ট অ্যাট আর্মস"এর আসন, দু'পাশে কাল চামড়া মোড়া সারি সারি বেঞ্চ, উপরে গ্যালারী। স্পীকারের ডান পাশের দু' তিন সারি বেঞ্চ মন্ত্রী ও ক্যাবিনেট মেম্বারদের জন্য, ইহার প্রথমটিতে কোন্ বিশিষ্ট জায়গায় প্রধান মন্ত্রী বসেন, তাহা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম। হাউস অফ কমনস্ মানেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় জীবনের যত কিছু ভাল, যাহা কিছু বড়, তাহার স্মৃতি ও কীর্ত্তিস্তম্ভ। দেখিয়া বইয়ে পড়া কত কথা মনে পড়িল—কত ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক এই হাউস অফ কমনসের হাওয়ায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, অপূর্ব্ব বাগবৈদগ্ধ্যে এখানে যে যশঃ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে স্বদেশের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। দেওয়ালের মাথায় রঙীন কাচের সার্সি দেখিয়া মনে পড়িল, একদিন হাউসের আলোচনা সারারাত ধরিয়া চলিতেছিল, ভোরে সূর্য্যের আলো ঐ সার্সিপথে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দ্বারা অনুভাবিত হইয়া উইলিয়াম পিট্ যে বাগ্মিতার পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছিল;

এইখানে গ্লাড্‌ষ্টোন তাঁহার বাগ্‌-ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, সাধারণতঃ যেখানে প্রায় ৫০০ মেম্বরের মধ্যে ৫০এর বেশী উপস্থিত থাকেন না, সেখানে গ্লাড্‌ষ্টোন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন শুনিলেই লবি, লাইব্রেরী, ডাইনিং-রুম হইতে মেম্বাররা দৌড়িয়া আসিয়া হাউস কানায় কানায় ভরাইয়া তুলিতেন। হাউস অফ কমন্‌সের মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস আবার সমস্তটা আবৃত্তি করিতে হয়। ছোট্ট ঘরটি বটে, কিন্তু ব্রিটিশের চরিত্রপট ; ইংরেজের চরিত্র আছে, বুদ্ধি আছে, কাজ কি করিয়া করিতে হয় জানে ; সাজসজ্জা নাই, আড়ম্বর নাই, কোন জাঁকজমক নাই, নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে "স্পীকার" নিয়োগ করিয়া কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে না গিয়া একমাত্র "প্রিসিডেণ্ট"-পরিচালিত হইয়া, বহু দলাদলি তর্ক-বিতর্ক বিবাদ-বিতণ্ডা সত্ত্বেও এ জাতি ঐ একই ছোট ঘরটি হইতে সেকালে যেমন ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে, একালেও তেমন বৃহৎ এম্পায়ারে, সমান দক্ষতায় "হিজ ম্যাজেষ্টিজ গবর্ণমেণ্ট" চালাইতেছে। এক একটা জাতের মধ্যে এক একটা গুণের উৎকর্ষ দেখা যায়, আমাদের দেশের কালচারে যেমন সামাজিক ভাবের পরিপুষ্টি হইয়াছিল, ইউরোপে তেমনি উন্নতির ধারা পলিটিক্সের পথ লইয়াছে। ইউরোপের সব জাতি স্বীকার করে—পোলিটিক্যাল সুবুদ্ধি, পোলিটিক্যাল অভিজ্ঞতা, কর্ম্মকুশলতা ও পটুত্ব ইংরেজের যেমন, এমন কাহারও নাই। "পার্লামেণ্ট-মাতা"কে দেখিয়া ও তাহার বাহ্যমূর্ত্তির পিছনে ব্রিটিশ-চরিত্রের পরিচয় লাভ করিয়া এ ধারণা স্পষ্ট হইল যে, 'মেরুদণ্ডবান' ব্রিটিশের বক্তৃতা ও বিতণ্ডা ও মেরুদণ্ডহীন আমাদের গলাবাজি ও বিবাদে অনেক তফাৎ।

হাউস অফ কমন্‌সের আশেপাশে লবি, করিডর, লাইব্রেরী, বিশিষ্ট মেম্বারদের বসিবার ঘর প্রভৃতি আছে। সারা হাউসেস অফ পার্লামেণ্টের ঘরে করিডার প্রভৃতিতে দেওয়ালে অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি আঁকা বা ঝুলান আছে, দেওয়ালে মেঝেতে অনেক তাম্র ও প্রস্তর-ফলকও বসান আছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচারের সময় তিনি কোথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোনের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবার আগে কোথায় রাখা হইয়াছিল, রাজা ও পার্লামেণ্টের বিরোধের যুগে পার্লামেণ্টকে ক্ষমতাদানে অনিচ্ছুক অমুক রাজা কোন্ স্থানটিতে বিরোধী পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলেন প্রভৃতি স্থানের লিপি পড়িয়া অতীতের ঘটনাবলী স্পষ্ট হইয়া উঠে।

লণ্ডনে ইংরেজের 'জনবুলি-ভাব' মোটেই চোখে পড়িল না। কন্টিনেণ্টের সাহেবদের মত এখানকার সাহেবরাও সাধারণ মানুষের মত, গাড়ীতে পথে-ঘাটে অল্পস্বল্প কথা বা খোঁজ-খবরে সকলেই সাহায্য করিল। ভদ্রতাতেও তাহারা ন্যূন নহে। তবে কন্টিনেণ্টের চেয়ে এখানকার লোক একটু কম কথা বলে, একটু বেশী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে, একটু বেশী আত্মসম্মানী ও আত্মচেতন ও অন্যের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এমন কি আলাপও কম করে। এম্পায়ারের কল্যাণে অবশ্য এদেশে বর্ণবিদ্বেষটা কন্টিনেণ্টের চেয়ে বেশী। বর্ণবান অপরিচিতের সঙ্গে এখানকার লোকের সাধারণ ব্যবহার কন্টিনেণ্টের তুলনায় কিরূপ দেখিবার জন্য অপ্রয়োজনেও লণ্ডনের লোককে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করিতাম, সর্ব্বত্র সৌজন্যই পাইয়াছি। বিশেষতঃ সাধারণ লোকে বা দোকানদার প্রভৃতি যখন "সার" বলিয়া কথা বলে ও ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে যেমন করিত তেমনি ব্যবহার করে, তখন দাস জাতীয় আমাদের বেশ ভালই লাগে। দৈবক্রমে আমার এমন হইয়াছিল যে, যেসব লোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাদের কয়েকজন বলিল, তাহারা ভারতে কিছু দিন ছিল, দু' পাঁচটা হিন্দি বাংলা প্রভৃতিও বলিল। ইহাদের মধ্যে ভদ্রশ্রেণীর একজন লোক ভারতীয় পলিটিক্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। যেখানে স্বার্থে আঘাত না লাগে বা প্রতিযোগিতার কথা না ওঠে, সেখানে ভদ্রভাবে চলিলে সাধারণতঃ ভদ্রব্যবহারই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অনেকে এদেশে আসিয়া অন্য একটা কারণে একটু মুস্কিল বাধাইয়া বসেন ; দেশে থাকিতে সাহেবদের ভয় করিয়া দূর হইতে সেলাম করিয়া এখানে আসিয়া যখন দেখেন ভয় করিবার কিছু নাই, অনেকে "সার"ও বলে, তখন হঠাৎ তাঁহাদের মাথাটা কি রকম গোলমাল হইয়া যায়, ভাবেন আমরাও এক একজন বড় বড় সাহেব, খুব ওস্তাদি চালিয়াতি করিতে আরম্ভ করেন, ইংরেজি ভব্যতার নিয়মকানুন ভুলিয়া গিয়া সাহেবরা ভারতে ভারতবাসীর সঙ্গে যেমন আমীরি ব্যবহার করে, এখানে সুবিধা পাইয়া সাহেবদের উপরই ফিরিয়া সেই চাল ঝাড়িবার চেষ্টা করেন, নয়ত বা

সাহেবীয়ানা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চীৎকার করিয়া কথা বলা, কাহাকেও গ্রাহ্য না করা, নিজের চেয়ে নিম্নপদ বা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হাঁকিয়া ধমকাইয়া কথা বলা, যেখানে সেখানে সব বিষয়ে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার প্রভৃতি ঘোর অ-বৃটিশ নিরঙ্কুশ বেপরোয়া দেশী চা'ল আরম্ভ করেন—ফলে যে এখানকার লোকে তাঁহাদের 'বারবেরিয়ান' সাব্যস্ত করিয়া বর্জ্জন বা বহিষ্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীটের ওয়াই-এম-সি-এ হষ্টেলটিতে অনেক ভারতীয় ছাত্র থাকেন। আগে এখানে আরও লোক থাকিত, কিন্তু অনেক কারণে এখন লোক কমিয়া গিয়াছে, যথা দলাদলি, কর্তৃপক্ষ প্রবর্ত্তিত নিয়ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি; বিনা অনুমতিতে ঘরে বান্ধবীদের ইচ্ছামত দিবারাত্র লইয়া আসা নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকের স্বভাবতই একটু অসুবিধা হয়। শুনিলাম, আগে ছাত্রেরা রাস্তা হইতে যে সে মেয়ে ধরিয়া হষ্টেলের রেস্তরাঁতে আনিয়া খাওয়াইতেন, লাউঞ্জতে, ঘরে আড্ডা দিতেন; সাধারণতঃ রাত বারটার মধ্যে হষ্টেলে ফিরিবার নিয়ম, তবে যে কেহ আগে অনুমতি লইয়া রাখিলে নাইট-পোর্টারকে জাগাইয়া যত রাত্রে ইচ্ছা ফিরিতে পারেন, কিন্তু অনুমতি কেন লইব অনেকের এই অভিমান হইল; এদেশে নিয়ম—আসা-যাওয়া চলা-ফেরা সব নিঃশব্দে করিতে হইবে, বিশেষতঃ রাত্রে, যাহাতে অন্য লোকের অসুবিধা, বিরক্তি বা ঘুমের ব্যাঘাত না হয়! হষ্টেলের একজন প্রাক্তন পরিচালকের কাছে শুনিয়াছি যে, অনেক ছাত্র সবান্ধবদলে স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণে অনেক রাত্রে ফিরিয়া হল্লা করিতে করিতে সিঁড়ি ওঠা, ঘরে ঢোকা প্রভৃতি করিতেন, পরিচালক আপত্তি করায় তাঁহারা অপমানিত বোধ করিলেন। এই সব বিষয়ে নিয়মাদি হওয়ায় অনেকে বাহিরে থাকা পছন্দ করেন। এই হষ্টেলের ঠিক সামনেই লণ্ডন ইউনিভার্সিটির একটি রেস্তরাঁ আছে, সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। কারণ শুনিলাম, ইহারা 'ম্যানার্স' জানে না, বিশেষতঃ নিজের বা পাশের টেবিলের মেয়েদের সঙ্গে চট্ করিয়া অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে। ইণ্টারন্যাশানাল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট লণ্ডনের খুব বড় একটি অরগ্যানিজেশন, এখানে সব দেশের ছাত্রদের জন্য ক্লাব, রেস্তরাঁ প্রভৃতি আছে। সব দেশের ছাত্রছাত্রী যাহাতে অবাধে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও ইণ্টেলেকচুয়াল সংযোগে আসিতে পারে, সে চেষ্টা এখানে করা হয়, কিন্তু গোপন খবর শুনিলাম যে, কর্তৃপক্ষ মেয়ে-মেম্বারদের প্রথম হইতেই ভারতীয়দের সঙ্গে সাবধানে মিশিবার উপদেশ দিয়া দেন। "করনার-হাউস" নামে লণ্ডনের অনেক পাড়ায় একটা জিনিষ আছে, বিশিষ্ট মোড়ে মোড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চার পাঁচতলা বাড়ী, প্রতি তলায় ব্যাণ্ড বাজিতেছে ও খাওয়া-দাওয়া হইতেছে, দামও সস্তা। এখানে বহু সহস্র স্ত্রীপুরুষ বৈকাল সন্ধ্যা কাটায় এবং নেত্র-বক্ত্র-বিকারাদি প্রচলিত সঙ্কেত-ইঙ্গিতে বন্ধুবান্ধবীও সংগ্রহ করে। একটি ভারতীয় ছেলে একটি টেবিলে বসিয়া ছিলেন, পাশের টেবিলের একটি যুবতী কৃষ্ণবর্ণ লোক দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, ছেলেটি ভাবিলেন বাস্, তবে আর কি? খপ্ করিয়া নিজের টেবিল ছাড়িয়া যুবতীর টেবিলে গিয়া প্রণয়-সম্ভাষণ জানাইলেন, যুবতী উঠিয়া গিয়া ম্যানেজারের কাছে নালিশ করিলেন, ম্যানেজার আসিয়া এক হাজার লোকভরতি কাফের মাঝখান দিয়া ঘাড়ে হাত দিয়া ভারতীয়কে সিঁড়ির পথ দেখাইলেন। মা বোন ছাড়া অনাত্মীয়া অন্য স্ত্রীলোক দর্শনে অনভ্যস্ত আমাদের দেশের মাসি-পিসির অঞ্চলের নিধিরা এদেশে আসিয়া নারীসঙ্গ লাভ করিয়া টাল সামলাইতে পারেন না, অধিকাংশেরই ভাগ্যে কিন্তু দেখিলাম, পয়সাখোর বা হোটেলের চাকরাণী বা দোকানের কর্ম্মচারিণীর বেশী জোটে না, বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া গেলে অবশ্য সকলেই লর্ড-ঘেঁষা ফ্যামিলির মেয়ে হইয়া যায়! কন্টিনেণ্টের ভারতীয় ছাত্রেরা চেষ্টা করিলে এদেশের ভদ্র-পরিবারে মিশিতে পান্, কিন্তু ইংলণ্ডের ছাত্র বেচারাদের বড় দুরবস্থা। যাঁহারা অক্স্ফোর্ড, কেম্ব্রিজে পড়েন বা লণ্ডনে ব্যারিষ্টারির ডিনার খান, তাঁহারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও এবং নিজেদের স্বতন্ত্র টেবিলে বসিলেও, তবু অন্ততঃ দশজন ভদ্র ইংরেজের রকম-সকম দেখিয়া অনেকটা শিখিতে পারেন, কিন্তু লণ্ডন এডিনবরা প্রভৃতি স্থানের ছাত্রেরা দুপাঁচ বৎসর থাকিয়াও ইংরেজ ভদ্রলোক বা ভদ্র-পরিবারের ছায়াও মাড়াইতে পান্ না। রাস্তাঘাটের লোকজন, সস্তা হোটেলের ঝি চাকর, দরিদ্র ল্যাণ্ডলেডিদের দেখিয়া ইঁহাদের বিলাতি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এদেশে কি বাড়ী কি হোটেল সর্ব্বত্র 'বাথরুম' ঠাকুরঘরের

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৬]

কথা-শিক্ষা

বাগ্-যন্ত্রের অবস্থান ও গতির উপর শব্দের উচ্চারণ নির্ভর করে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যখন কথা বলি, তখন এই দিকে মোটেই লক্ষ্য করি না। আমরা কাণের সাহায্যে বুঝি, আমাদের উচ্চারণ শুদ্ধ হইতেছে কিনা। শিশুগণও যখন কথা বলিতে শেখে, তখন কাণের সাহায্য বেশী গ্রহণ করে। কোন শব্দ শুনিলে, তাহারা সেই শব্দের অনুরূপ শব্দ বাহির করিবার চেষ্টা করে, উহার উচ্চারণ করিতে বাগ্-যন্ত্রের প্রচেষ্টাকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে না। কথা শুনিবার সময় সে বক্তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার প্রায় সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ নিবদ্ধ থাকে শব্দের উপর।

বধির শিশুর পক্ষে এইরূপে কথা বলিতে শিক্ষা করা অসম্ভব। তাহাকে কথা বলাইতে হইলে, তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করাইতে হইবে বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য বাগ্-যন্ত্রের বিভিন্ন প্রচেষ্টার উপর। শুধু ইহাই যথেষ্ট হইবে না। কারণ, কোন কোন বর্ণের মূল উচ্চারণ সম-শ্রুত না হইয়া সম-দৃষ্ট হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্ ও ব্ লওয়া যাউক। উভয়ের উচ্চারণ ঠোঁটের উপর একই দেখায়, কিন্তু কাণে ভিন্ন শুনায়। কেবল চোখে দেখাইয়া বধির শিশুকে ইহাদের উচ্চারণ-পার্থক্য শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাকে স্পর্শ দ্বারা দেখাইতে হইবে, প্ স্বরহীন, অর্থাৎ ইহার উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও স্বরযন্ত্রে শব্দের কম্পন নাই, এবং ব্ উচ্চারণে [illegible]দ্বয় সঙ্কুচিত ও স্বরযন্ত্রে শব্দের কম্পন আছে।

আমাদের বর্ণমালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম দুইটি বর্ণ স্বরহীন, শেষ তিনটি বর্ণ স্বরযুক্ত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বরহীন বায়ু অথবা স্বরযুক্ত বায়ু নিষ্কাশিত হয়। পঞ্চম বর্ণ অনুনাসিক, অর্থাৎ ইহার উচ্চারণে মুখ-গহ্বর-পথ বন্ধ থাকে এবং স্বর নাসিকাপথে বাহির হয়।

প্রত্যেক বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণ কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, এক্ষণে তাহা বলিব। সুবিধার জন্য 'প'-বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক'-বর্গের দিকে যাইব। শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে সম্মুখে লইয়া বসেন। পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর একটি আয়না, কয়েকটি লম্বা ও সরু করিয়া কাটা পাতলা কাগজ, একটি মোমবাতি ও দেশলাই ও একটি জিহ্বার 'ম্যানিপুলেটার' থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ম্যানিপুলেটার ব্যবহার করা হয় না।

ব্যঞ্জন বর্ণ

প-বর্গ – পরস্পর আবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় বহির্গামী বায়ু বা স্বরকে মুখ-গহ্বরে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বায়ু বা স্বর ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় যে শব্দ হয়, তাহা 'প'-বর্গে মূল উচ্চারণ।

আয়নার সাহায্যে বধির-শিশু এই বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠ-দ্বয়ের অবস্থান ও গতি অনুকরণ করিয়া, ইহাদের উচ্চারণ শিখিতে পারে। ওষ্ঠদ্বয়ের ঠিক সম্মুখে একটি সরু, পাতলা কাগজ, বা পালক বা মোম-বাতি রাখিয়া দেখানো হয়, বায়ু কত জোরে ও কোন্ পথে বাহির হইতেছে।

ব্ স্বর-যুক্ত, বুকে, চিবুকে স্পর্শ করাইয়া স্বরের কম্পন অনুভব করানো হয়। কখনও গলদেশ স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না; কারণ ইহাতে শিশুর পূর্ণ দৃষ্টি গলদেশের উপর নিবদ্ধ হইতে পারে, এবং স্বর-যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য অন্যান্য বিকৃত স্বরের উৎপাদন হইবার ভয় থাকে।

ম্ অনুনাসিক,—ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগের মুক্তি হয় না, এবং স্বর নাসিকাপথে বাহির হয়। ওষ্ঠদ্বয়ের উপর স্বরের কম্পন অনুভব করা যায়। নাসিকা স্পর্শ করিলে, স্বর নাসিকাপথে বাহির হইতেছে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, শিশুকে নাসিকা স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। ম্ উচ্চারণ করিবার সময়, অনেক স্থলে শিশু জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগকে উপরে তুলিয়া কোমল তালুর সহিত সংযুক্ত করিয়া ঙ্ উচ্চারণ করে। এই দিকে শিক্ষকের বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

ফ্ ও ভ্ উচ্চারণ করিবার সময় প্ ও ব্ অপেক্ষা যে অধিক স্বরহীন ও স্বরযুক্ত বায়ু বাহির হয়, তাহা ওষ্ঠের সম্মুখে কাগজ বা মোম্-বাতি ও হস্ত ধরিলে অনুভব করা যায়। মূলগত উচ্চারণে প্ ও ব্-এর সহিত ফ্ ও ভ্-এর কোন পার্থক্য নাই। স্বরবর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া ফ্ ও ভ্ উচ্চারণ করিবার সময় পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ত-বর্গ—জিহ্বার অগ্রভাগকে প্রসারিত করিয়া উপরের দন্তসারির ঠিক পিছনে বা ঠিক নিম্নে সংযুক্ত করা হয়, এবং স্বরহীন বায়ু বা স্বরযুক্ত বায়ু সেই সংযোগ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় যে শব্দের উৎপাদন করে, তাহা এই বর্গের বর্ণগুলির মূল উচ্চারণ। ন্ উচ্চারণে সংযোগের মুক্তি হয় না, এবং স্বর নাসিকাপথে বাহির হয়।

শিক্ষা দিবার প্রণালী প-বর্গের মত।

ট-বর্গ—জিহ্বার অগ্রভাগকে বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঊর্দ্ধমাড়ীর সহিত সংযুক্ত করা হয়। স্বরহীন বায়ু বা স্বরযুক্ত বায়ু এই সংযোগ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে যে শব্দের উৎপাদন করে, তাহা এই বর্গের বর্ণগুলির মূল উচ্চারণ। ণ্ উচ্চারণে সংযোগের মুক্তি হয় না, এবং স্বর নাসিকাপথে বাহির হয়।

শিক্ষা দিবার প্রণালী প-বর্গের মত। কোন শিশু ট্ বলিতে জিহ্বার অগ্রভাগের প্রচেষ্টাকে সহজে অনুকরণ করিতে না পারিলে, তাহাকে উপরের ওষ্ঠের সহিত জিহ্বার অগ্রভাগের সংযোগ ও মুক্তি করিতে বলা হয়। ইহা অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, সে সহজেই ইহা করিতে পারে। একবার অভ্যস্ত হইলে, জিহ্বাগ্রভাগকে পিছনে ঠেলিয়া উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

ক-বর্গ—জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ ও কোমল-তালুর সম্পূর্ণ সংস্পর্শ হওয়ায়, উহাদিগের পিছনে বদ্ধ বায়ু বা স্বর ঐ সংস্পর্শ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে যে শব্দ উৎপন্ন করে, তাহা এই বর্গের বর্ণগুলির মূল উচ্চারণ। ঙ্‌ উচ্চারণে এই সংস্পর্শের মুক্তি হয় না, এবং স্বর নাসিকাপথে বাহির হয়।

প্‌, ত্‌, ট্-এর উচ্চারণের সহিত তুলনা করাইয়া ক্-এর উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়ে এই বর্গের উচ্চারণ-শিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণ প-বর্গের শিক্ষা-প্রণালীর মত। যদি কোন শিশু ঠিকভাবে ক্ উচ্চারণ করিতে না পারে, তাহা হইলে জিহ্বার অগ্রভাগকে নিম্ন দন্তসারির পিছনে জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তাহাকে ট্ বলিতে বলা হয়। এই ভাবে ট্ বলিবার চেষ্টা করিলে, জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ স্বভাবতঃই উপরে উঠে এবং ক্ উচ্চারিত হয়। কয়েকবার চেষ্টা করিলেই শিশু জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগের অবস্থান ও গতি বুঝিতে পারে, এবং নিজেই ক্-এর উচ্চারণ করিতে পারে।

হ্—মুখ-গহ্বর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে, জিহ্বা মুখ-গহ্বরে নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকে, এবং বায়ু অপ্রতিহতভাবে বাহির হয়।

আয়নার সাহায্যে অনুকরণ করাইয়া এই বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। বায়ুর গতি কাগজ বা মোম-বাতির সাহায্যে দেখানো যায়। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন শিশু তাহার বুক ভিতরের দিকে টানিয়া না নামায়; কারণ, ইহা করিলে, ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে এবং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বায়ু বাহির হওয়ায়, বাক্যের পরবর্তী উচ্চারণগুলির জন্য আর বায়ু ফুসফুসে থাকে না। অনেক সময় শিশু জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ উপরে তুলিয়া বায়ু নিষ্কাশিত করায়, বায়ু নাসিকাপথে বাহির হয়। এই অবস্থায় শিশুর মুখের সম্মুখে একটি আয়না অথবা একটি শ্লেট ধরিলে, তাহাকে দেখানো যাইতে পারে যে, বায়ু নাসিকাপথে বাহির হইতেছে।

ল্—জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের মাড়ীর সহিত সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু উভয় পার্শ্ব দিয়া স্বর বাহির হইবার পথ থাকে। এই উভয়-পথে স্বর বাহির হইবার পথ থাকে। এই উভয়-পথে স্বর বাহির হয়।

শিশুকে এক নিশ্বাসে 'লা-লা লা লা' এই পদাংশটি বলিতে বলা হয়। শিশু শিক্ষকের মুখ দেখিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে জিহ্বার গতি অনুকরণ করে। একবার অভ্যস্ত হইলে, 'লা-লা-লা-লাল্' বলিতে শেষের মূল উচ্চারণটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। গালে স্বরের কম্পন অনুভব করা যায়। জিহ্বার অগ্রভাগকে অত্যধিক সরু করিলে, উচ্চারণটি বিকৃত হয়। এই জন্য জিহ্বার অগ্রভাগ যাহাতে অত্যধিক সরু না করে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

র্—জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের মাড়ীর সন্নিকটস্থ করা হয়, কিন্তু মাড়ী স্পর্শ করে না। স্বর জিহ্বাগ্রের ও মাড়ীর মধ্যস্থিত পথে বাহির হইবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগকে আঘাত করে। ইহার ফলে জিহ্বার অগ্রভাগ
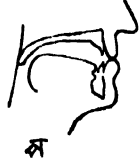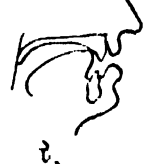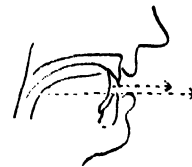
কাঁপিয়া উঠে এবং বারংবার মাড়ী স্পর্শ করায় কম্পনবিশিষ্ট (trilled) শব্দের উৎপাদন হয়।

শিশুকে জিহ্বাগ্রের অবস্থান ও কম্পনগতি দেখাইয়া এবং চিবুকে স্বরের কম্পন স্পর্শ করাইয়া এই বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। সে জিহ্বাগ্রের কম্পন অনুকরণ করিতে না পারিলে, জিহ্বাগ্রকে সম্মুখে আনিয়া, ইংরাজি '(th)' উচ্চারণ শিক্ষা দিতে পারা যায়। ইহা ভাল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, শিশু শীঘ্রই জিহ্বাগ্রের কম্পন দিতে পারে। একবার অভ্যস্ত হইলে, জিহ্বাগ্র ঠেলিয়া পিছনে উপযুক্ত স্থানে লইয়া গেলেই র্ উচ্চারণ করিতে পারে।

ড়্—র্ অপেক্ষা জিহ্বার অগ্রভাগ অনেক পশ্চাতে থাকে, মধ্যস্থিত পথ অনেক বেশী উন্মুক্ত। নীচে নামিবার সময়, জিহ্বাগ্র উপরের মাড়ী স্পর্শ করিয়া নামে। ইহার উচ্চারণ কম্পনবিশিষ্ট নহে, ঢাকের শব্দের ন্যায় গুরু গম্ভীর (rolled)।

অনুকরণ দ্বারা জিহ্বাগ্রকে পিছনে টানিয়া লইলেই এই উচ্চারণ দিতে পারা যায়।

স্—জিহ্বার উপাগ্রভাগ ঊর্দ্ধে উঠে, কিন্তু তালুর সহিত সম্পূর্ণ সংস্পর্শ হয় না। উভয় দন্তসারিকে পরস্পর খুব নিকটস্থ করা হয়, এবং জিহ্বার অগ্রভাগকে নিম্ন দন্তসারির ঠিক পিছনে রাখা হয়। জিহ্বার উপাগ্রভাগের দুই পার্শ্ব উপরের পার্শ্বস্থিত দন্তসারির সহিত লাগিয়া থাকে, কাযেই জিহ্বার উপরিস্থ মধ্যপথে বায়ু বাহির হয়। এই পথে বায়ু বাহির হইবার সময়

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান তরুণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত।
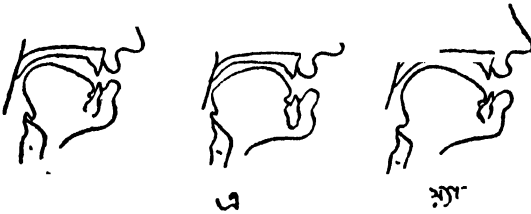
দন্তসারি ঘর্ষণ করিয়া বাহির হয়, এবং তাহাতে যে শব্দ হয়, তাহাই স্-এর মূল উচ্চারণ।

প্রথমে, আয়নার সাহায্যে অনুকরণ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। জিহ্বার অবস্থান, বায়ু-নির্গম-পথ, দন্তসারির অবস্থান শিশুকে লক্ষ্য করিতে বলা হয়। পাত্‌লা কাগজ বা পালকের দ্বারা বায়ু-নির্গমের বেগ ও দিক দেখান হয়। ঈ উচ্চারণ পূর্ব্বে শেখানো থাকিলে, উহা হইতে স্-এর উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। দন্তসারিকে অপেক্ষাকৃত সন্নিকটস্থ করাইয়া, স্বরহীন ঈ দিবার চেষ্টা করিলে স্ এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। ইংরাজি 'th' হইতেও স্-এর উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 'th' বলিতে বলিতে, জিহ্বাগ্রভাগকে ধীরে ভিতরে, নিম্ন দন্তসারির পিছনে ঠেলিয়া দিলে, স্-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়।

ষ্, শ্—উভয়ের উচ্চারণই বাংলা ভাষায় একস্থানে হয়। জিহ্বার অগ্রভাগকে সঙ্কুচিত করিয়া উপাগ্রভাগের সহিত প্রায় এক করিয়া ফেলা হয়, এবং মূর্দ্ধাস্থলে বাঁকাইয়া তুলা হয়। জিহ্বার উপর দিয়া বায়ু-নির্গমের মধ্য-পথ স্ অপেক্ষা বেশী উন্মুক্ত থাকে। ঐ পথে দন্তসারির ভিতর দিয়া বায়ু বাহির হইবার সময় ঘর্ষণজনিত যে শব্দ হয়, তাহা শ্ এর মূল উচ্চারণ।

অনুকরণ-সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ অপেক্ষা শ্-এর মধ্যপথ বেশী উন্মুক্ত, সেই দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। র্ হইতে শ্-এর উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। র্ স্থান হইতে জিহ্বাগ্রকে আরও একটু পিছনে স্থাপন করাইয়া, সম্মুখ দন্তসারিদ্বয়কে পরস্পর নিকটস্থ করাইয়া, স্বরহীন র্ দিবার চেষ্টা করিলে শ্-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়।

চ-বর্গ—এই বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণ-শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই জন্য সাধারণতঃ অন্যান্য বর্ণের উচ্চারণ-শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর এই বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

জিহ্বার অগ্রভাগের ভিতরের অংশ উপর-মাড়ীর সহিত সংযুক্ত হয় এবং স্বরহীন বায়ু বা স্বরযুক্ত বায়ু জিহ্বার সংযোগ-স্থলে মধ্যস্থল ভেদ করিয়া বাহির হয়। জিহ্বার অগ্রভাগের সম্মুখ অংশকে নিম্ন দন্তসারির পিছনে রাখা হয়।

অনুকরণ করাইয়া ইহাদের উচ্চারণ-শিক্ষা দেওয়া হয়। জিহ্বার প্রথম বদ্ধ অবস্থা ও পরে মধ্যপথে উন্মুক্ত অবস্থার প্রতি শিশুর লক্ষ্য আনয়ন করাইতে হয়। স্বরযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণ করাইবার সময় স্পর্শদ্বারা অনুভব করানো হয়।

স্বরবর্ণ

আ—এই স্বরবর্ণের উচ্চারণ-শিক্ষা সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয়। যতদিন না মূক-বধির শিশু এই উচ্চারণটি সুন্দরভাবে করিতে পারে, ততদিন অন্য কোন স্বরবর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহার উচ্চারণে জিহ্বা মুখ-গহ্বরে স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। যাহাতে জিহ্বা অতি সামান্যভাবেও কম্পিত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; কারণ জিহ্বার অতি সামান্য কম্পনেও স্বরের বিকৃতি হয়। এক গ্রাস ভাত মুখে দিবার সময় মুখ-গহ্বর যতটা উন্মুক্ত করা হয়, আ উচ্চারণ করিবার সময়ও মুখ-গহ্বর ততটুকু উন্মুক্ত করা হয়। অত্যধিক উন্মুক্ত করিলে, দেখিতে কুৎসিত হয়, স্বর বিকৃত হয় এবং পদের পরবর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণের সহিত সহজ সংযোগের ব্যাঘাত হয়।

অ—জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ আ অপেক্ষা একটু উপরে থাকে, ওষ্ঠদ্বয়কে গোলাকৃতি করা হয়। ইহার উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আ উচ্চারণের সহিত তুলনা করাইয়া এই উচ্চারণটি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

ও—অ অপেক্ষা ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান কম, জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগও অপেক্ষাকৃত উপরে।

উ—ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা কম, একটি পেন্‌সিল্‌ প্রবেশ করাইবার মত উপযুক্ত পথ মাত্র থাকে। জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে রাখা হয়। শিশু জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগের অবস্থান ধরিতে না পারিলে, তাহাকে কু পদটি বলাইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে সে ক্‌-এর সহিত তুলনা করিয়া, উ বলিতে জিহ্বার অবস্থান ঠিক করিয়া লইতে পারে।

ইংরাজিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের পার্থক্য বিশেষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু চল্‌তি বাংলায় এই পার্থক্য রাখা হয় না। এইজন্য উ ও ঊ, ঈ ও ই,—এই উচ্চারণগুলি একই ভাবে, অর্থাৎ হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব না দেখাইয়া, শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঈ—জিহ্বার অগ্রভাগ সর্ব্বোচ্চ স্থানে থাকে, এবং স্বর জিহ্বা ও তালুর মধ্যবর্ত্তী উন্মুক্ত পথের ভিতর দিয়া বাহির হয়।

মূক-বধির শিশু অনুকরণ করিয়া জিহ্বার অবস্থান ধরিতে না পারিলে, প্রথমে ইংরাজি vocalised 'th' দেওয়া যাইতে পারে। পরে—জিহ্বাকে ধরে পিছনে ঠেলিয়া লইলে, ঈ বলিতে সক্ষম হইবে। ইংরাজি z হইতে, অর্থাৎ স্বরযুক্ত স্‌ হইতেও ঈ পাওয়া যাইতে পারে।

এ—ঈ অপেক্ষা এ বলিতে স্বর বাহির হইবার পথ বেশী উন্মুক্ত থাকে। ঈর সহিত তুলনা করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

য়্যা (এ)—জিহ্বাগ্রভাগের সর্ব্বাপেক্ষ উন্মুক্ত পথে স্বর বাহির হয়।

বর্ণমালার ঐ ও ঔ মাত্র এই দুইটি যুক্তস্বর (dipthong) আছে, কিন্তু চল্‌তি বাংলা কথায় প্রায় ২৫।২৬টি যুক্তস্বর উচ্চারিত হয়) মূল স্বরবর্ণের উচ্চারণগুলি শিক্ষা দিবার পর যুক্তস্বরগুলি লইয়া অনুশীলন করিতে হয়। শিশু মূল স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ ভাল করিয়া করিতে পারিলে, যুক্তস্বরের উচ্চারণ সহজেই করিতে পারিবে। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে স্বরের গতি (glide) সহজ ও সরল হয়।

ঋণী

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সবার কাছে পেয়েছি যত দান
আপন ভাবি করিনু প্রতারণা ;
আজিকে মোর ভেঙ্গেছে অভিমান
স্বীকার করি সাধিয়া জনা জনা
আমার কিছু নাহি গো কিছু নাহি
জীবনে শুধু হয়েছি দানগ্রাহী।

ভবের হাটে করিতে আনাগোনা
পেয়েছি বহু রতন হীরা মোতি ;
মেলিতে আঁখি আকাশভরা সোনা
পড়েছে চোখে উদয়-নব-জ্যোতি।
তিমির-রাতি নীহার-ছায়া-পথে
দিয়াছে খচি' নীলায় মরকতে।

মানুষ, তুমি দিয়াছ মুখে ভাষা
দিয়াছ হাসি, দিয়াছ আঁখিজল :
সবার বড়, দিয়াছ ভালবাসা—
তাহারি ভারে হৃদয় টলমল।
আঘাত যদি দিয়েছ বুকে, তবু,
সে দান জানি বিফল নহে কভু।

যাহারা শুধু নয়ন দুটি তুলে
ফিরায়ে গ্রীবা চকিতে গেল চলি,
হাসিয়া মৃদু অধর কূলে কূলে—
রাতুল পায়ে হৃদয়খানি দলি'
বাজালো যারা নূপুর রিণি ঝিণি
তাদেরো কাছে রহিনু আমি ঋণী।

ঋণের বোঝা বাড়িছে দিনে দিনে
সবার কাছে খাতক আমি একা
জীবন ডুবে পরের ঋণে ঋণে
ললাটলিপি আমার ভালে লেখা।
গ্রহণ করি যখনি যাহা পাই
ফিরায়ে দিব ক্ষমতা হেন নাই।

জগতে ছিল যতেক মধুলিহ
আমার বুকে বাঁধিল তারা ঘর
মধুতে যবে উঠিল ভরি গৃহ
উড়িয়া গেল সকল মধুকর।
কহিতে কথা বাধিয়া গেল মুখে
মধুর বোঝা রহিল চাপি বুকে।

আজিকে কহি সবার কাছে আমি
শুন গো যত আমার মহাজন
শুধিতে ঋণ চেয়েছি দিবাযামী
ফিরায়ে দিতে করেছি প্রাণপণ।
হৃদয় চিরে দিয়াছি লোহু ঢালি'—
দেনার খাতা রহিল তবু খালি।

জুড়িয়া পাণি কহি গো তোমা সবে
আশিস্‌ কর ভবের নরনারী
সবার দেনা শুধিয়া দিয়া তবে
রিক্ত করে যাইতে যেন পারি।
যে-দান দিয়া করিলে চিরঋণী
বাসিয়া ভাল লই গো যেন জিনি।

মীরা

-শ্রীসুরুচিবালা

সকাল বেলা খবরের কাগজখানি হাতে তুলিয়াই পানু বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল, তিন চারটী গ্রামের লোকের সাক্ষাৎ ভগবান, তাহার পিতার গুরু শ্রীমৎ স্বামীজিকে পুলিশ বন্দী করিয়া থানায় চালান দিয়াছে, কি সর্ব্বনাশ, কি ভীষণ কথা! —পানু কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বহুক্ষণ পরে কাগজখানি তুলিয়া ঘটনাটি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল, পাঁচ বৎসর আগে কোথায় কোন্ গুরুতর অপরাধ করিয়া পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া এতকাল ধরিয়া তিনি পলাতক ছিলেন,—এখন কি করিয়া পুলিস তাঁহার সন্ধান পাইয়া, স্বামীজিগিরির উচ্চচূড়া পদাঘাতে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। পুলিসের ডায়েরিতে ইহার বহু অপরাধের বিবরণ লিখিত আছে, মোকদ্দমার দিন সে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।

ইহার পর কাগজে আরও যাহা লিখিত আছে তাহা পড়িয়া পানু একটু বেদনা বোধ করিল। এই সন্ন্যাসীপ্রবরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার সময়, প্রায় দুই তিন হাজার ভক্তের ভীড় হইয়াছিল, জনতা পুলিসের কাজে বাধা দিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে পুলিসকে দারুণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, গ্রামের জমিদার পুলিসকে বা জনসাধারণ কাহাকেও কোন সাহায্য করেন নাই, পুলিস-ওয়ারেণ্ট দেখিবামাত্রই তিনি তাঁহার বজরায় চড়িয়া মহাল পরিদর্শনে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

পানু বসিয়া বসিয়া পিতার কথাই ভাবিতে লাগিল, তাঁহার এই পলায়ন যে কেন পানু তাহা বুঝিয়াছিল, কি যে দারুণ লজ্জার বেদনা অন্তরে অন্তরে বহন করিয়া তিনি সকলের সম্মুখ হইতে আত্মগোপন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন, পানু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

ইহার দিন পাঁচ ছয় পরেই সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় বাবুর যত পরিবর্ত্তনই হোক্, তাঁহার এই ধনী পুরাতন মক্কেলকে তিনি সসম্মানেই অভ্যর্থনা করিয়া লইতে পূর্ব্বভাবের কোন ব্যতিক্রম করিলেন না।

পিতার অন্তরের বেদনার ছাপ মুখেও তাঁহার স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, পানু তাহা নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া নিজেও অন্তরে অন্তরে সেই বেদনারই খোঁচা অনুভব করিতে লাগিল। স্বামীজির কথা পিতা-পুত্রে কিছুই হইল না. পানু আসিয়া প্রণাম করিয়া কাছে দাঁড়াইলে, তাহার মাথায় তাঁহার স্নেহভরা হাতখানি মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া রাখিয়া, অতি কোমল হাসি হাসিয়া কহিলেন, অনেকদিন ত বাড়ী যাও নি খোকন কবে যাবে?

—পরীক্ষার আর মাস দুয়েক দেরী আছে বাবা, তার পর যাব।—

—বেশ।

এইরূপ বিনা আড়ম্বরে পিতা-পুত্রে মিলন হইয়া গেল।

মাস দুই কাটিয়া গেল, যেমনি মহা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা লইয়া পরীক্ষার দিনগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়, এবারেও তেমনিভাবে আসিল এবং চলিয়া গেল।

গ্রামের বাড়ীতে বসিয়াই পানু খবর পাইল, মীরা এ বৎসরও ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হইয়াছে, আর পানু? পানু হইয়াছে—ফেল!

[১৩]

গেজেটখানি বার দুই তিন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এপিঠ-ওপিঠ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, পানু মিনিট কয়েক চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; হাত দুটি ঘামে ভিজিয়া উঠিয়া কাগজখানি ভিজিয়া গেল; পানুর শরীর মাথা সহসা যেন কি রকম করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতার শয়ন-কক্ষের টেবিলটিতে গেজেটখানি রাখিয়া পানু তাহার নিজের শয্যাটিতে শুইয়া পড়িল।

পড়িতে তাহার যত অনিচ্ছাই থাক, পরীক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে মুখে সে যত যুক্তিতর্কই তুলুক, ভগবান জানেন ফেল হইবার ইচ্ছা তাহার একটুও ছিল না এবং শেষের দুই তিন মাস সত্যই সে প্রাণপণে খাটিয়াছে, তবু সে ফেল হইয়া

গল্প! সে ফেল, আর মীরা পাস, মীরা শুধু পাস নয়, ফাষ্ট হইয়া কত উচ্চ সম্মান লইয়া উপরে উঠিয়া গেল!

আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করিয়া পান্নু নিজেকে যেন জগৎসংসারের কাছ হইতে লুকাইয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। এতক্ষণ হাত পা কপাল তাহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, এখন কেমন একটা তীব্র কম্পন আসিয়া, তাহার সমুদয় দেহখানিকে অবশ করিয়া দিল।

সারাদিন কাটিয়া গেল, পান্নু উঠিল না, বিকালবেলা ঊষা জোর করিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়াইয়া গেল, খাবারের প্লেট চাকর যেমন আনিয়াছিল তেমনই ফিরাইয়া লইয়া গেল, দাদার মুখ দেখিয়া ঊষা আর জোর করিতে সাহস পাইল না, রাত্রিতেও পান্নু উঠিল না। কিন্তু সমস্ত রাত্রি তন্দ্রা এবং আধ-জাগরণের মাঝখানে বার বার দারুণ একটা বেদনা কেবলই তাহার বুকে কাঁটার মত হইয়া ফুটিতে লাগিল—মীরা পাস,—সে ফেল—মীরা পাস, মীরা ফাষ্ট।

দীর্ঘ রাত্রি এমনি করিয়া ব্যথার গুরুভার বহিয়া প্রভাত হইল। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া প্রথম সূর্য্যরশ্মি তাহার চোখে মুখে পড়িয়া যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল, তখন সর্ব্বাগ্রে তাহার এই কথাই মনে জাগিল, মীরা পাস—মীরা পাস হইয়া গেল

উঠিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পান্নু আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র পান্নুর চোখে মুখে পড়ায় কষ্ট বোধ হইতেছিল, তথাপি দারুণ একটি অবসাদ ও আলস্যে পান্নু শয্যাত্যাগ করিতে পারিতেছিল না, শুইয়া শুইয়াই শুনিতে পাইল, মা কহিতেছেন, কিরে রমেশ চা এনেছিস? তোর বাবুর মুখ ধোওয়া হয়েছে কি? চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না ত? আর দেখ ত দাদাবাবু কি এখনও ওঠে নি নাকি ঘুম থেকে? কাল সারাদিন খেলে না কিছু, এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে?

রমেশ জানালাপথে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, ঘুমুচ্ছেন মা এখনো দাদাবাবু।

পিতার জুতার শব্দ শোনা গেল একতলা হইতে দোতলায় উঠিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন কে ঘুমুচ্ছে? পান্নু?

মা কহিলেন, হাঁা গো তোমার পান্নু, অত যে ঘুমোয় দিন রাত, সে ফেল হবে না ত কে হবে!

মার কণ্ঠস্বরে এইবারে একটু তিক্ততা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পান্নু ভাবিল—আরো কতবার সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে, তাহার সহিত ব্যবহারে বা কণ্ঠস্বরে বিমাতার স্নেহ বা বিরক্তি কোনটাই অন্য কখনো না ফুটিলেও পিতার সম্মুখে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই কি করিয়া হঠাৎ কণ্ঠস্বর তাঁহার এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মিনিট তিন চার পরে দ্বার ঠেলিয়া রমেশ আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—পিতার আহ্বান আসিয়াছে—চা খাইতে বসিয়া পান্নুকে তিনি ডাকিতেছেন। পান্নু উঠিল। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া আরশীর কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, মুখ-চোখের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। এইভাবে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই, চুল আঁচড়াইয়া, খালি গায়ের উপর একখানি চাদর জড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে পিতার শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল— অতিথি অভ্যাগত না থাকিলে সকালে বিকালে পিতা এই ঘরেরই দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া চা খান।

ছোট একটি টিপয়ের উপর চায়ের পেয়ালা ও প্লেটে গরম লুচি মোহনভোগ রহিয়াছে। পাশেই আর একটি টেবিলে খবরের কাগজ ও খান দুই বই। চা-পান শেষ করিয়া পিতা একটি আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়েন ও চিঠিপত্র লেখেন, বারান্দার নীচেই ফুলের বাগানে রজনীগন্ধার লাইন, বর্ষার জল পাইয়া একটি দুটি করিয়া শীষ-গুলি ফুলের গোছায় ভরিয়া উঠিতেছে; বাগানটির ওপাশে আয়নাদীঘির স্বচ্ছ শীতল জলে প্রভাতের রোদ চিকমিক করিতেছে। পিতা এখনও চায়ের পেয়ালায় হাত দেন নাই, গরম চায়ের ধোঁয়া উঠিতেছে। সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পিতা গতকল্যকার ডাকে যে খবরের কাগজখানি আসিয়াছে তাহাই হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। ওপাশের একটি ঘর হইতে ছোট ভাই বোনদের জলখাবারের সঙ্গে সঙ্গে হাসি-গল্পের কোলাহল শোনা যাইতেছে। পান্নু চারিদিক দেখিল, মাকে কোথাও দেখিতে পাইল না; স্নানের ঘর হইতে জোরে জল-পতনের শব্দে মা স্নান করিতেছেন এবং হয়ত শীঘ্র তাঁহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই, ভাবিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হইল।

উষা নিজের চায়ের পেয়ালাটি হাতে লইয়া এঘরে ওঘরে পিতা ও ভাইবোনদের খাবার তত্ত্বাবধান করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, দাদা ব'স, তোমার চা আনছে রমেশ।

পিতা খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া এবং কাগজখানি পাশের টেবিলটায় নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, খোকন এসেছিস, ব'স। উষা, তোর দাদার চা কই রে?

—আসছে বাবা, তুমি খাও।

পানু একটা চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজখানি সম্মুখে টানিয়া লইল, নিজের বেদনাময় পরাজয়ের ভাবটা কোন কিছুর আড়ালে লুকাইয়া কোনমতে নিজেকে সহজ করিয়া লইতে পারিলেই যেন সে বাঁচে।

—তারপর খোকন, কি করবার ইচ্ছা এখন, কি করতে চাস?

পানু চুপ করিয়া রহিল।

—কলেজ খুললে আবার কলেজে গিয়েই ভর্ত্তি হয়ে যা, কেমন?

নীরব পানুর মুখ খবরের কাগজের উপর আরও একটু নত হইল—পিতা একবার একটু চাহিয়া দেখিলেন।

—দাদা তোমার চা এসেছে, খাও।

—অতগুলো লুচি খেতে পারব না উষা, নিয়ে যাও।

—পারবে দাদা, ওইত মাত্র কখানা, খেয়ে নাও।

প্রবীণা গৃহিণীর মত মুখের ভাব ও ভঙ্গী করিয়া উষা মায়ের বাক্স খুলিয়া বাজারের পয়সা বাহির করিতে বসিল।

—কলেজ কবে খুলছে জানিস?

পানু ঘাড় নাড়িয়া জানে না বলিল। পিতা কহিলেন, বিনয়ের চিঠিও এসেছে কালকে, তোমার যাবার দিন ঠিক হল কি না জিজ্ঞেস করেছে।

এইবারে পানু মুখ তুলিয়া কহিল, এবারে আর আমি ওঁদের বাড়ী থাকব না বাবা।

বিস্মিত হইয়া পিতা কহিলেন, মানে?—কোথায় থাকবে?

—আমাদের নিজেদের বাড়ীই ত রয়েছে, নয় ত হষ্টেলে।

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া পিতা একটু ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, না না সে কি হয়? সে কি ভাল দেখাবে? নিজেদের বাড়ী কিংবা হষ্টেল—না না, সে ভাল দেখাবে না, এতকাল ওঁরা তোমায় মানুষ করলেন, তুমি যখন ছোট ছিলে—কিছু বুঝতে না কিছু জানতে না, সেই তখন থেকে এখন কি করে তোমায় অন্য কোথাও রাখার কথা ওঁদের বলব?

পানু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চা-পান শেষ করিয়া পিতা ইজি-চেয়ারটায় বসিয়া আবার কাগজ হাতে তুলিয়া লইলেন। পানু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অন্যমনে কেবল লুচি-মোহনভোগ খাটিতে লাগিল। কথা বলিবার শক্তি তাহার তখন বিশেষ ছিল না। সে ফেল হইয়াছে, পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই, পিতা তথাপি সে সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না, বরং এমন ভাবেই কথা কহিলেন, যেন সে পরীক্ষা পাসের পর কলেজের নতুন ক্লাসে গিয়া ভর্ত্তি হইতেছে। পরাজয়ের এমন স্নেহময় ক্ষমা কোন্ পুত্র এমন করিয়া পিতার কাছে পায়!

পানুর দুঃখ এবারে সত্যকারের মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিল, প্লেটখানি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। পিতা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার কেমন মনে হইল, ক্ষুদ্র একটি শিশুর মতই তাঁহার এই সন্তানটিও যেন নিতান্তই অবোধ এবং অসহায়। বিস্মৃতপ্রায় কোন একটা ক্ষতের মুখ হইতে সহসা যেন এক ঝলক্ রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বুকখানি তাঁহার ভিজাইয়া দিয়া গেল। খবরের কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, অফিস-ঘরে গিয়া তিনি তাঁহার কাজে বসিলেন।

[১৪]

একটা তীব্র বেদনাময় অনুভূতি কখন যে দারুণ একটা অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, পানু নিজেও তাহা জানিতে পারিল না। ভাগ্য তাহাকে চিরদিন কেবল বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে, যখনই যে কোন দিকেই তাহার জীবনের গতি প্রবাহিত হইতে চাহিয়াছে, তখনই ফিরিয়াছে তীব্রভাবে প্রতিহত হইয়া।

কিন্তু এমনই ভাবে মাথা নত করিয়া শুধু আমরণ কেবল ভাগ্যকেই ত মানিয়া লওয়া চলে না। সংসারের আর সকলের ভাবে কপালে করাঘাত করিয়াই শুধু নীরবে ভাগ্যের বি-

…য়, পানু তাহা করিবে না,—বিমাতা পিতাকে বলিয়া-ওর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, তুমি তার জন্য ভেবে …ও কেন ?—পিতাও অবশেষে তাহাই মনে করিয়া … হইয়াছেন, কিন্তু পানু তাহা মানিবে না,—কে এই …ভাগ্য কি ? দেখা যাক্, কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কি …রিতে পারে তাহার ? পানু এবারে নিজের জীবনের …নিজেই গ্রহণ করিল।

প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়া ট্রেণ আসিয়া শিয়ালদহে …মিল। বাবার টেলিগ্রাফ পাইয়া, বাড়ীর সরকার অধরবাবু …বং চাকর-বাকরেরাও যে দুই একজন তাহাকে অভ্যর্থনা …রিয়া লইতে ষ্টেশনে হাজির হইবেই, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু পানুর কি মনে হইল কে জানে, একটা কুলীর মাথায় জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া দ্রুত সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে ভিড়ের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া যে রাস্তায় আসিয়া সে উপস্থিত …ল, সেটা তাহার নিজের বাড়ীর রাস্তা নয়। নিজেদের …ড়ীতে যাইবার যে সহজ রাস্তাটি সম্মুখে পড়িয়াছিল, পানু …া করিয়াই সেটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, চলিতে …তে যেখানে আসিয়া পানুর গতি সহসা রুদ্ধ হইয়া পড়িল, …ানে সম্মুখেই আলোয় ঝলমল যে সুন্দর, চিরপরিচিত বড় …ীখানি পানুর চোখে পড়িল, তাহাতে চোখদুটি তাহার …ছল করিয়া উঠিল।

পরিচিত—পরিচিত বটে—কিন্তু এত যে আকাঙ্ক্ষিত, …ত যে প্রিয় ছিল,—আগে কে তাহা জানিত! দেশে …ইবার পর এবং ফল বাহির হইবার পরও মীরা দুই তিনখানা …ঠি পানুদা'কে লিখিয়াছিল, পানু ইচ্ছা করিয়াই তাহার উত্তর … নাই—কে জানে কেন, মীরার কথা মনে পড়িতেই দারুণ …টা অভিমানে চোখে তাহার জ্বালা ধরিত। এ যে কিসের …ভিমান, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না।

তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া ছোক্‌রা কুলীটা কহিল, …ান বাড়ী বাবুজি ? এই জজ সাহেবের বাড়ী ?

…বিস্মিত পানু ফিরিয়া কহিল, কি করে জানলি রে তুই … সাহেবের বাড়ী, তুই গেছলি কখনো ?

ছোক্‌রা হাসিয়া কহিল, এই বাড়ী এ পাড়ায় কে না চেনে বাবুজি ? বড় ভারী সাহেব জজ সাহেব।

পানু উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে আবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরা এই ছোট কুলী ছেলেটা সমস্ত রাস্তাই শিশ দিতে দিতে এবং তাহারই সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া পা ফেলিতে ফেলিতে যেন কতকটা নাচের ভঙ্গীতেই পানুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, এইবারে বাবুজির জন্য তাহার একটু দয়া হইল, বাবুজি যে কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে, এবং অত্যন্ত গরীব, সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ ছিল না, বাবুজি হয়ত ছোটখাট কোন মেস-টেসের সন্ধান করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ভাবিয়া কহিল, বাবুজি এই গলিতে আপিসের বাবুদের একটা মেস আছে।

পানু অন্যমনস্ক ছিল, উত্তর দিল না।

ছোকরা ভাবিল, কেরাণীদের মত অত ভাড়াও বোধ হয় বাবুটি দিতে পারিবে না, বলিল, আর একটু এগিয়ে গিয়ে মিস্ত্রীদের একটা মেস আছে বাবু, সেটা খুব সস্তা, সেটায় যাবে ?

পানু এবারে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, হুঁ।

কিন্তু সেই সস্তার খোলার ঘরখানি দেখিবার পরও বাবুজি যখন তবুও কেবল চলিতেই লাগিল, তখন সে বেচারা একটু সন্দেহের সঙ্গে বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। হঠাৎ এক সময় হি হি করিয়া উচ্চ হাসিতে পানু তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতেই সে কহিল, বাবুজি এই রাস্তা থেকে যে একটু আগেই বের হয়ে গেলাম, আবার এই রাস্তাতেই ঢুকছ কেন ?

অপ্রস্তুত হইয়া পানু কহিল, তাইত রে, ভুল হয়ে গেছে, চল্ ঐ গলিটা দিয়ে চল্।

বাবুজি পাগল কি না সে বিষয়ে ছোকরাটার একটু সন্দেহ হইয়াছিল, হাসি থামাইয়া কহিল, বাবুজি ঐ রিক্সটা ডেকে দিই, তুমি বাড়ী চলে যাও, আমায় পয়সা দিতে হবে না, আমি চাই না পয়সা।

—আরে না, চল্ চল্, আর দেরী নেই, এই ত এসে পড়েছি।

অমলার মুখের হাসি বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ ও ক্ষণিক নয়, তাহা একাদশীর জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, স্নিগ্ধ এবং চিরন্তন। সেই হাসি একটুও ম্লান হইল না। কঠিন, নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে যেন তাহার এখনও পরিচয় হয় নাই—এমনই ভাবে সুদর্শী অমলা উত্তর দিল, তোমায় জড়িয়ে ধ'রে ভেসে যাই।

জীবনের সমস্যার সমাধান করা যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করার চেয়ে ঢের সোজা, সে বিষয়ে অনুপমের মনে আজ সন্দেহমাত্র রহিল না।

হাতের মুষ্টি একটু শিথিল হইয়া আবার দৃঢ়তর হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দুই জনে স্নান করিল এবং তারপর খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত হইল। জাহাজে উঠিলেই অমলার মাথা ঘোরে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। কিন্তু এবার সমুদ্র নিতান্তই শান্ত থাকায় জাহাজ মোটেই দুলিতেছে না, তাই অমলা বেশ ভাল আছে।

খাবার যখন হাজির হইল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাত, মাছ আর মুরগীর মাংস। নিষিদ্ধ মাংসে কাহারও আপত্তি ছিল না। অনুপম কলিকাতার কলেজের ছেলে, আর অমলা কিছুদিন মেমসাহেবদের কন্‌ভেণ্ট স্কুলে পড়িয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার সহিত শাস্ত্রবিগর্হিত অনাচারের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

খাইতে খাইতে অমলা বলিল, এত জিনিষ আমি খেতে পারব না। তুমি কিছু নেবে?

অনুপম উত্তর দিল, দাও।

অমলা ভাতের একটা অংশ এবং মাছের একটা টুকরা আলাদা করিয়া অনুপমের প্লেটে উঠাইয়া দিল।

অনুপমের সারা মুখে চাপা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু নিতান্ত গম্ভীরভাবেই সে বলিল, বেশ লোক তো তুমি! ভাত আর মাছ দেবার বেলায় একেবারে মুক্তহস্ত, অথচ মাংসটা সবই নিজের জন্য। সে সব হবে না। আমায় ভাগ দিতে হয় তো সব জিনিষ সমানভাবে দিতে হবে।

স্নিগ্ধ কৌতুকের চাঞ্চল্যে আপনার সারা দেহ মুখরিত করিয়া অমলা কহিল, তুমি যে কত বড় লোভী তা' আমার জানতে বাকী নেই। কিন্তু আজ আমারই জিৎ। তোমাকে আজ আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না। ভাত আর মাছ নিয়েই তোমায় আজ খুসী থাকতে হ'বে, আর মাংস তুমি পাবে না।

অনুপম এতক্ষণে রাগিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ারটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, বেশ, তাই হবে। মাংস আমি চাই না। তারপর পোটহোল্‌টার দিকে মুখ ফিরাইয়া আবার কহিল, কিন্তু আজ যে মুরগীর মাংস খাওয়া হচ্ছে তা' যখন দাদামশায় জানতে পারবেন তখন কে কাকে প্রশ্রয় দেয় তা দেখা যাবে।

অমলা মুখ না তুলিয়া এবং তাহার দিকে না ফিরিয়াই বলিল, আচ্ছা। দাদামশায় যে শাস্তি দেন তা না হয় আমি একাই নেব। কিন্তু আমায় ঘরে যেতে না দিলে তুমি কি করবে বল তো?

অনুপম বক্রদৃষ্টিতে একবার অমলার মুখের দিকে চাহিয়া এবং পরমুহূর্ত্তেই তাড়াতাড়ি আপনার চোখ অন্যদিকে ফিরাইয়া কহিল, বেশ হবে। আমার ঘরটাকে অমন দুষ্টু মেয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলে দাদামশায়কে আমি তামাক সেজে খাওয়াব।

—সত্যি? বলিয়া অমলা একবার হাসিল।

সেই হাসির উত্তরে নিজের মুখখানি যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া অনুপম কহিল, সত্যি।

সংগ্রাম আর কতদূর অগ্রসর হইত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ খানসামার আগমনে সন্ধি স্থাপিত হইল। অনুপম মাংসের ভাগ পাইল কিনা জানি না, কিন্তু আরো বেশী মধুর অনেক কিছু যে পাইল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিকালের দিকে রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। জাহাজ সমুদ্রের সীমারেখায় পৌঁছিয়াছে এবং দূরে তমালতালবনরাজিনীলা বেলাভূমি দেখা যাইতেছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার শেষ হইবে, তাই যাত্রীরা জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত।

অনুপম ও অমলা ডেকের উপর পায়চারি করিতেছিল। ফার্ষ্ট-ক্লাস ডেক, জনসমাগম বিরল। নীচের ডেকে সহস্র নরনারী একটুখানি বসিবার জায়গা পাইবার আশায় প্রাণপণে ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোলাহল, অফুরন্ত গালিবর্ষণের বিরাম নাই।

একটু দূরে জাহাজের ডাক্তারকে দেখিতে পাইয়া অনুপম ডাকিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন। আমাদের তো যাবার সময় হ'ল।

ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী, বয়স পঁয়ত্রিশ বা পঁয়তাল্লিশ এমনই একটা কিছু হইবে। বহুদিন জাহাজে চাকুরি করিয়া পঠিত বিদ্যা সম্যক্‌ভাবেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ঝড়ের বেগ যে তাঁহার উপর দিয়া বেশ ভালভাবেই বহিতেছে, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্নের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে।

ডাক্তার বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, আর তো বেশী দেরী নেই। আপনাদের কোন অসুবিধা হয় নি তো? বলিয়াই তিনি অমলার দিকে একবার জিজ্ঞাসুভাবে চাহিলেন।

অমলা সলজ্জভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। ছুটা বেশ কেটেছে। জাহাজের দোলানি না থাকলে সমুদ্রের উপর আমার বেশ ভালই লাগে।

অনুপম ডাক্তারবাবুর দিকে একটু ঘেঁষিয়া বলিল, ওর আর খারাপ লাগবে কেন বলুন? যখন যা' হুকুম হচ্ছে তাই আসছে, ভোজনাদিও বেশ চলছে। কিন্তু এ সব বোঝা নিয়ে যাদের চলতে হয় তাদের কি অবস্থা তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

অমলার কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, এটা নিতান্তই অন্যায় কথা হচ্ছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই ওরকম থাকেন বটে, কিন্তু আজকাল অনেকেই তো বেশ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করেন।

অনুপম হাসিয়া কহিল, আপনি দেখছি নারী-প্রগতির মস্ত বড় সমঝদার। হয়তো বহুদিন যাবৎ বিলাতী মানুষের সংস্রবে থেকে আপনি দেশের কথা ভুলে গেছেন।

ডাক্তারবাবুর মুখে যেন হঠাৎ একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল। উদাসভাবে বহুদূরবর্ত্তী তীরভূমির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, দেশের কথা ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ মনে করেন? দেশ আমাকে চায় না, কিন্তু তবু আমি তো তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনে।

অনুপম কহিল, মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—আপনাদের মত বয়সে এ সব কথা আমিও ঠিক বুঝতে পারতুম না, কিন্তু এখন সবই জলের মত সোজা হয়ে গেছে। বলিয়াই ডাক্তারবাবু একটু হাসিলেন এবং তারপর আবার কহিলেন, আমি যাদের চাই, তারা চায় টাকা, তারা আমায় চায় না। অথচ আমি দেশ বলতে বুঝি তাদের, যারা আমার নিজের জন, মাটির দেশকে ভালবাসবার মত উদার দৃষ্টি আমার নেই। তাই বলছিলুম, যে দেশ যদিও আমায় চায় না, তবু তাকে আমি ভুলতে পারি নে।

অনুপম কহিল, মাটির দেশকে সত্যভাবে গ্রহণ করা যে কত কঠিন, তা আমি একটু বুঝেছি ডাক্তারবাবু। আমরা যার ধ্যান করি, সে হচ্ছে শুধু একটা মানচিত্র, তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার মত শক্তি ও সাধনা কয়জনের আছে? কিন্তু সে কথা যাক। আমার ঠিক মনে হচ্ছে যে, আপনার জীবনে খুব বড় একটা দুঃখ রয়েছে, যার চাপ আপনি দৃঢ়ভাবে সহ্য করে যাচ্ছেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে—

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, আমার মনে করবার কিছু নেই। বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে আমার মত কত শত হতভাগ্য পড়ে রয়েছে, কে তাদের খোঁজ করে, কে তাদের ব্যথার প্রাপ্য মর্য্যাদা দেয়? আমরা বন্যার স্রোতে ভেসে-যাওয়া কাঁটার মত, আমাদের না আছে বর্ত্তমানের ঐশ্বর্য্য, না আছে ভবিষ্যতের গৌরব।

একটুখানি থামিয়া ডাক্তারবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, আপনি আজ যে প্রশ্ন করলেন এ পর্য্যন্ত আমাকে সে প্রশ্ন আর কেউ করেনি। অথচ বহুদিন যাবৎ আমি এই সহানুভূতিটুকু পাবার জন্য অপেক্ষা করে আছি। তাই আপনাকে সত্যিকার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। . যখন আমার বয়স আপনার মত ছিল, তখন আপনার মতই সংসারকে আমি আনন্দময় মনে করতুম। সেদিন আমার কোন অভাব ছিল না। আমার স্বাস্থ্য ছিল, বিদ্যা ছিল, অর্থ ছিল, আর এমন এক জন ছিল যাকে আমি ভালবাসতুম। আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে মধুর করে রাখত। তার স্পর্শে আমার সকল কাজ, আমার সকল স্বপ্ন বিচিত্র হয়ে উঠত।...তারপর সব মুছে গেল। বাবা চলে যাবার পরে দেখা গেল যে, তাঁর হিসাবের খাতায় জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক অনেক বেশী। কিন্তু আমি ভয় পেলুম না। তাকে বললুম, এস, আমরা

প্রেম দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করব। সে সাড়া দিল। অভাবের মধ্য দিয়ে কেটে গেল কয়েকটা বছর। একটি শিশুর হাস্যে আমাদের ঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু থামিলেন। জনশূন্য ডেকের নিস্তব্ধতা যেন কালবৈশাখীর ঘোর ছায়ার মত তিনজনের চারিপাশে ঘিরিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তারবাবু আবার বলিতে সুরু করিলেন, তারপর এল মৃত্যু। দারিদ্র্যের যাতনা সহ্য করবার শক্তি সে হারাল, তার মনের মৃত্যু হ'ল। যখন মন মরে যায় আর দেহটা বেঁচে থাকে, তখন স্বয়ং বিধাতাও বোধহয় সে ব্যাধির প্রতিকার করতে পারেন না। যাক। তাকে টাকা দেবার জন্য আমায় বিদেশে আসতে হ'ল। আমি আজ ঘুরে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে—অষ্ট্রেলিয়া, জাভা, চীন, জাপান। সে রয়েছে দেশে, তার সংসার নিয়ে। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। সময় সময় তার চিঠি আসে—অমুকের সুদটা দেওয়া হয়নি, ইত্যাদি। একদিন যে কাহিনীর শেষ ছিল না আজ তার পরিচয় দেব কি করে?... প্রেমের সত্যিকার উপসংহার—তার ভূমিকায়।

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হইল। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত কেহই আর কোন কথা বলিল না। শুধু অনুপম একবার আকাশের দিকে চাহিয়া অমলার দিকে মুখ ফিরাইল।

ততক্ষণে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিয়াছে এবং চারিদিকে হাঁক ডাক সুরু হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজী এবং উড়িয়া কুলির দল নিজেদের মালপত্র কাঁধে লইয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের দুর্ব্বোধ্য কোলাহলে এক তুমুল ঐক্যতানবাদনের সৃষ্টি হইয়াছে।

হঠাৎ দূরে কাপ্তেনকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, এখন তবে আসি। আমার কাজের সময় হ'ল, আপনাদেরও যাবার সময় হ'ল। আবার কোনদিন হয়তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু আমার মত যারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়, তাদের পক্ষে পরিচয়ের বন্ধন দৃঢ় করা বড় কঠিন। নমস্কার। বলিয়াই অমলার দিকে চাহিয়া মাথাটি একটু নীচু করিয়া ডাক্তারবাবু একবার হাসিলেন।

অনুপম বলিল, নমস্কার।

ডাক্তারবাবু যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, অমলা নিচু... হাস্যচকিত মুখখানি দোলাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে।

* * *

আমাদের কাব্যের দ্বিতীয় সর্গকে কুমারসম্ভব আখ্যা দিলে হয়তো অন্যায় হইবে না।

অনুপম বাড়ীর চিঠিতে জানিল যে, অমলার শরীর বড় খারাপ। কিন্তু সে নিজে ত সেকথার কখনও উল্লেখ করে নাই।

অবশেষে সকল সন্দেহের অবসান হইল।

অনুপমের সারা দেহ মন যেন কি এক অননুভূতপূর্ব চকিত বিস্ময়ের ছায়ায় ঘিরিয়া ফেলিল। ইহাও কি সম্ভব? তাহার নিজের মত, অমলার মত, এমন ক্ষুদ্র ও অসহায় দুইটি মানুষ কি সত্যই নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারে?

অনুপম ভাবিল, সব মিথ্যা, মায়াজাল মাত্র। সে... শিশুর মত সরল, ফুলের মত দুর্ব্বল অমলা—সে কি কখনও নিজের ক্ষুদ্র, শুভ্র দেহটিকে মথিত করিয়া এত বড় বিরাট রহস্যের সমাধান করিতে পারিবে?

কিন্তু একথাও ত সত্য যে, তাহার ও অমলার বিবাহিত জীবনের দুইটি বৎসর এবং তাহার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই নবজন্মের স্বপ্নই তো তাহাদিগকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন পৃথিবী, ইহার দুর্দ্দম কর্ম্মশক্তি, ইহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, ইহার অসীম প্রসার, ইহার ব্যাকুল বাসনা—অমলার মত নারী এবং অনুপমের মত পুরুষই তো সব সৃষ্টি করিয়াছে!

কিন্তু অমলা কি ভাবিতেছে? দেহের যাতনা এবং মনের ব্যাকুলতা মিলিয়া কি তাহাকে পিষিয়া ফেলিতেছে না? আহা বেচারী অমলা! কতদিন ত সে বলিয়াছে যে, সে এত তাড়াতাড়ি ছেলে চায় না। এই অনাহূত অতিথির আগমনের জন্য ত সে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু অমলা কি সত্যই এই নূতন গৌরব যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না? মৌখিক আপত্তির অন্তরালে তাহার অন্তরে সুপ্ত মাতৃত্বের যে সঙ্গীতধ্বনি অনুপম নিশিদিন শুনিতে পাইত, তাহা কি সত্য নয়? একদিন অমলা বলিয়াছিল যে, প্রথম মেয়ে হইলে সে সুখী হইবে। অনুপম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন বল তো? সলজ্জভাবে অমলা তাহার

কানে কানে বলিয়াছিল, মেয়েদের সুন্দর কাপড় ও গয়না দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভাল লাগে, ছেলেদের পোষাকটা বড় বিশ্রী। অনুপম হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আমিও মেয়ে চাই, কিন্তু অন্য কারণে। অমলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন? অনুপম বলিয়াছিল, এইজন্য যে ছেলেরা মেয়েদের মত ভাল-বাসতে জানে না।

সেই রাত্রিটির কথা অনুপমের মনে হইল। সেদিন কি তিথি ছিল তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু একথা ঠিক যে সেদিন খুব অন্ধকার ছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অমলাকে সে নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

সেদিন রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অনুপম দেখিল, ঋষি টলষ্টয় আসিয়া তাহাকে বলিতেছে—Levin, জাগো। অসহায়া [illegible]y-র পাশে এখন তোমার স্থান। অনুপম জাগিল, [illegible] দেখিল যে রাত্রিটি তেমনই নিবিড় অন্ধকারে ঘেরা, [illegible]া সেখানে নাই।

ঋষি টলষ্টয়ের উপদেশ অনুপম অবহেলা করিতে পারিল না। বিদেশ ছাড়িয়া সে অমলার কাছে ছুটিয়া গেল।

অমলার তাহাকে প্রয়োজন ছিল। অমলা কোনদিন কোন বিষয়ের জন্যই মুখে নালিশ জানায় না, কিন্তু কোথায় তাহার ব্যথা এবং কি-তাহার প্রয়োজন তাহা অনুপমের মত সূক্ষ্মভাবে কে বুঝিবে? একটুখানি ম্লান হাসি এবং কম্পিত ওষ্ঠের একটুখানি সুমিষ্ট স্পর্শে অমলা জানাইয়া দিল যে, এই হৃষ্ট আনন্দের উত্তেজনার মধ্যে তাহার প্রিয়তমের সঙ্গই সে কান্তভাবে কামনা করিতেছিল।

অমলার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, গায়ের কালো রঙ আরও বেশী কালো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হরিণ-চোখের সেই মুগ্ধ দৃষ্টি এবং শিশুর মত সরল মুখের সেই সহজ হাসি ঠিক আগের মতই আছে।

অমলা সারাদিন এবং সারারাত কি ভাবে কে জানে! সারাটি দিন সে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু অবসন্ন পদক্ষেপে এবং গভীর নিঃশ্বাসে তাহার ক্লান্তি ধরা পড়ে। রাত্রিতে তাহার ঘুম আসে না। শরীরে ব্যথা, চোখে জ্বালা, মনে ভয় ও আশার মিলিত স্পন্দন। সহস্রবার অমলা পাশ ফিরিয়া শোয়, আর মাঝে মাঝে যেন কিসের আঘাতে তাহার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল দেহটি কাঁপিয়া উঠে।

অনুপমও ঘুমাইতে পারে না। বলে, এস দু'জনে গল্প করি। তুমি যে একা জেগে থাকবে তা হবে না। অমলা আপত্তি জানাইয়া বলে, বাঃ রে! আমি ত ক'মাস ধরেই এমনি জেগে থাকি। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, কোন কষ্ট হয় না। তুমি জেগে থাকলে তোমার অসুখ করবে। তুমি ঘুমোও। অনুপম কথা শোনে না, গল্প সুরু করে। অমলা উত্তর দেয় না। কতক্ষণ পরে কখন্ ঘুমের ঘোরে তাহার চোখ মুদিয়া আসে অনুপম তাহা জানে না।

শরৎকালের অনাহুত বৃষ্টির মত মাঝে মাঝে এক পশলা ঝগড়া হইয়া যায়। বিষয়টা যে কত তুচ্ছ তাহা দুই জনেই হয় ত ভুলিয়া যায়। তাহাদের মনে হয়, যেন পৃথিবীর ইতিহাসে কোন মহাযুদ্ধের কারণ ইহার চেয়ে বেশী গুরুতর ছিল না।

একদিন ভোরের দিকে এমনই একটা ঝগড়া হইয়া গেল। অমলা যখন শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখ অন্ধকার। অনুপম চোখ টিপিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। বহুদিন আগে অনু-পমের রূঢ়তার প্রত্যুত্তরে অমলা চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছিল। মাসখানেক পরে যখন সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন অমলা লিখিয়াছিল, "চিঠি লিখতে ইচ্ছে হ'লেও অভিমান এসে বাধা দিত।" সেই কথাটি আজ অনুপমের মনে হইল।

সেদিন বাড়ীতে উৎসব, কিন্তু যাহাকে ঘিরিয়া আনন্দের কোলাহল, তাহার ম্লান মুখখানির স্বাভাবিক দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অমলার নিজেকে একেবারেই বেমানান মনে হইতেছিল। সহস্রবার এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সকলের কৌতুক-দৃষ্টির অন্তরালে যে নির্জ্জন ও নীরব কোণটি সে খুঁজিতেছিল তাহা আর পাওয়া গেল না। বৃদ্ধারা বলাবলি করিতেছিলেন, মেয়ে বড় লাজুক। সমবয়সীরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত ঠাট্টার ভঙ্গীতে বারবার তাহার দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু লজ্জা ও পুলকের সাথে অভিমানের যে মৃদু-মধুর স্পন্দন অমলাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল, তাহার সন্ধান কেহই পাইল না।

চাহিলেন না, বুঝিলেন, বিকার, মনে মনে একশত আট দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, ষাট্ ষাট্!

জ্বরে-জ্বরে খিট্‌খিটেস্বভাব ছেলে, দাঁতমুখ বিকৃত করিয়া বলিল, দেখ না ঐ দোরের গোড়ায় কে!

এবারে মা ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিতে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। মনে হইল বুঝি বা স্বর্গের কোন দেবী তাঁহার পুত্রের উপর করুণাবশতঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার আধি-ব্যাধি হরণ করিবার জন্ত। চেতনে অচেতন হইয়া বৃদ্ধা নির্ব্বাক রহিলেন।

বৃদ্ধা বিধবা। ছায়া জানিত তাহার শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন, আর একটি বালক দেবর আছে। এই বিধবা কে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তবু ভিতরে ঢুকিবার এবং কথা বলিবার জন্ত তাহার পা দুখানি নড়িল, ঠোঁট দুখানি কাঁপিল। ইহা বৃদ্ধা দেখিলেন।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, তুমি কে বাছা?

ছায়া সহসা কথা কহিতে পারিল না। বৃদ্ধার বিধবা বেশ দেখিয়া একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ বাছা? কাদের বাড়ী এসেছ?

ছায়ার মন কাঁপিল, দেহ কাঁপিল, ঠোঁট কাঁপিল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, আমি কলকাতা থেকে আসছি, আমার নাম ছায়া।

—তুমি জজসাহেবের মেয়ে?—কথা কয়টি বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শতছিন্ন মলিন বসনের প্রান্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদি[illegible] সন্দেহই থাকি[illegible] দেখতে [illegible] এখানে এলে বাছা?

ছায়া বুঝিল, শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে, বিধবা তাহার শাশুড়ী। যে শ্বশুরের স্নেহসম্ভোগের সৌভাগ্য হয় নাই, যাঁহাকে কোনদিন চোখেও দেখে নাই, তাঁহার বিয়োগ-ব্যথায় তাহার অন্তরও কাঁদিয়া উঠিল। নারীর বৈধব্যে নারীমাত্রেরই অন্তর বুঝি কাঁদে। ছায়া ভিতরে ঢুকিয়া শাশুড়ীর পাশে বসিয়া পড়িল। নিঃশব্দে শ্বশ্রূর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

করুণ ক্রন্দনের ইতিহাস অতীব করুণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশের বিচ্ছেদ-বেদনা বৃদ্ধ পিতা বহুদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। [illegible] নরেশের (অশোকের আসল নাম নরেশ; মাতুলালয়ে সে সৌখীন অশোক নাম গ্রহণ করিয়াছিল) বিবাহ ও বিলাত গমনের চার মাসের মধ্যেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অনাথা বিধবা ও অবোধ একটি বালককে[illegible] ফেলিয়া রাখিয়া পুত্রবিরহাতুর বৃদ্ধ অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত তৃ[illegible] লইয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজও রাত্রে বৃ[illegible] দেখিতে পান—এই বাড়ী, এই ঘর, ঐ সজিনাগাছের ত[illegible] ঐ গোয়াল-ঘর, ঐ কঞ্চির বেড়া, সকল স্থানে ব্যাকুল পিপাসার আকুল আঁখিতারা নরেশের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আ[illegible] বৃদ্ধের আতুর, আর্ত্ত কণ্ঠস্বর রাত্রের নিঃশব্দ বায়ুবক্ষে আরে[illegible]রই করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধা তাহা নিজের কানেও শুনিতে পা[illegible] অর্থাভাবে পরেশের চিকিৎসা হয় না; পথ্যাভাবে [illegible]পর শরীর বাখারী হইয়া পড়িয়াছে; তাহার পরণে একখা[illegible] নাই, গায়ের একটি জামা নাই। নরেশ যদি তাঁ[illegible] দিয়া এমন করিয়া না ভাসাইত, তাঁহাদের কিসের দুঃখ থাকি[illegible]

বিধবা মাতা কতদিন কতরাত্রি কাঁদিয়াছেন, [illegible] জলে নদী বহিয়া গিয়াছে, পাষাণ গলিয়া গিয়াছে, বনের কুকুর-শেয়াল তাঁহার দুঃখে আর্ত্তনাদ করিয়াছে, গাছের পাখীর চোখেও জল ঝরিয়াছে; কিন্তু অভাগিনীর নয়নমণির প্রা[illegible] এমনই কঠিন ধাতুতে প্রস্তুত, সে-ই শুধু আসে নাই, সে[illegible] কেবল কাঁদে নাই। ডাইনীতে তাহাকে ধরিয়াছে, [illegible] খাইয়াছে। সে প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না তা[illegible] জানে না।

ছায়া [illegible]দিতেছিল। [illegible] মনে হইতে[illegible] দোষ তাহারই। পুত্রমুখদর্শনবঞ্চিত বৃদ্ধ শ্বশুরের [illegible] অপরাধ তাহার; ঐ যে অবোধ দুর্ব্বল শিশু [illegible] পথ্যাভাবে শীর্ণ, সে অপরাধও তাহার; শাশুড়ী [illegible] সহস্রগ্রন্থিযুক্ত বসন পরিধান করিয়া কোন মতে [illegible] করিতেছেন, সে অপরাধও তাহার, তাহার, তাহা[illegible] সে যত অপরাধী মনে করে, তাহার চক্ষু দিয়া ততই অশ্রুর উৎস বাহিরিয়া আসে।

যত বড় শোক, যত বড় দুঃখ হউক, মানুষ যত[illegible], এক সময়ে তাহাকে থামিতেই হইবে। ক্রন্দনের[illegible]

নস্তে নামিতে নরম পর্দ্দায় আসিয়া এক সময় স্তব্ধ হইয়া সে ; ক্রন্দনের শব্দ বন্ধ হয়, তখন শুধু নিঃশ্বাস কাঁদে।

ছায়ার শাশুড়ী বলিলেন, তোমার বাবা-মা এসেছেন কি বাছা?

ছায়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, না মা।

—তবে তুমি কার সঙ্গে এলে?

—আমি একাই এসেছি মা; আমার এক দাদা আমাকে ধতে এসেছেন।

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় ছায়ার মুখের পানে পিত করিয়া কহিলেন, রাখতে এসেছেন? সে কি বাছা! জজসাহেবের মেয়ে, আমার এই ভাঙ্গা ঘরে হা-ভাতে রে থাকবে, কি বল?

ছায়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, আমি থাকতেই এসেছি মা। সে বৃদ্ধার দুই চরণের মাঝে মুখ রক্ষা করিল।

—সে কি করে হবে বাছা? সে কি হয়?

—কেন হবে না মা? পরেশ যদি থাকতে পারে, আমিই রব না কেন?

—পরেশ। সে আর ক'দিন! তারও গণাদিন ফুরিয়ে সছে। তিনি মুখে এই কথাগুলি বলিলেন বটে; কিন্তু মনে বারম্বার জিভ কাটিলেন, বারম্বার পরেশের শতায়ু মনা করিলেন।

ছেলেটি এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে ছায়ার এক হাত তাহার চর্ম্মহীন কৃশহস্তে ধারণ করিয়া বলিল, তুমি ার বৌ-দিদি?

ছায়ার বুকের মধ্যে চিরশান্ত, চিরসুপ্ত স্নেহসমুদ্র তোল- [illegible] উঠল। পরেশকে দুই হাতে বুকে [illegible] নিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল, হাঁ ভাই, আমি ৌদিদি। তুমি আমার ঠাকুরপো!

কতকটা নির্ভরতা, কতকটা সঙ্কোচের সহিত ভ্রাতৃ- তখানি অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা বৌদিদি, তুমি আর কলকাতায় যাবে না ত? এখানেই ক? ও কি তুমি চুপ করে রইলে যে বড়! চুপ করে াকছে না, বল, থাকবে?

শান্ত কণ্ঠে কহিল, হাঁ ভাই, থাকব।

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পেটের ছেলের বৌ, আমার হারাধন নরেশের বৌ, কত আদরের ধন, কিন্তু তোমার ত এখানে থাকা হবে না বাছা।

—কেন হবে না মা?

—তিনি থাকলে যা ভাল বুঝতেন, করতেন, তিনি নাই, আমি ত এই আবীরে-বিধবা।

ছায়ার মনে একটা সন্দেহের কাল মেঘ উঁকি মারিতেছিল, বলিল, হ্যা মা, ঠাকুর কি বলে গেছেন—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা, তিনি কিছুই বলেন নি। আর বলবেনই বা কেন? তুমি বড়লোক জজসাহেবের মেয়ে, তুমি যে কোনদিন আমার এই কুঁড়ে-ঘরে পা রাখতে আসবে, এ কি কোনদিন কেউ ভাবতেও পারে বাছা!

ছায়া সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমি আপনার কাছে থেকে আপনার সেবা করব না কেন মা?

বিধবা নিরুত্তর। নীরবে নতমুখে বসিয়া পরেশের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটি একটি মিনিট এক একটি ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতেছিল।

ছায়া ডাকিল, মা!

বিধবা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন মাত্র, কথা কহিলেন না।

ছায়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া আবার ডাকিল, মা!

ছায়ার মনে আরও একটি সন্দেহ জাগিয়াছিল, বলিল, আমার বাবা-মা ব্রাহ্ম-সমাজের, তারই জন্যে—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা।

ছায়া এবার প্রাণপণ বলে শাশুড়ীর পা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তবে কেন আমি আপনার সেবা করতে পাব না মা? —বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

এইবার বৃদ্ধা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, মা, মা, রাজলক্ষ্মী আমার [illegible] কাছে থাকবি, কি খাবি মা? কোত্থেকে তোকে দুবেলা দু'মুঠো খেতে দেব মা? ঐ একরত্তি ছেলে মাসের মধ্যে পনেরো দিন একবেলা আধ পেটা খেয়ে কোন গতিকে বেঁচে আছে; অর্দ্ধেকদিন এক আঁজলা মুড়িও বাছার পেটে যায় না। দুঃখীর ছেলের প্রাণ সহজে বার হয় না, তাই আজও বেঁচে আছে, নইলে কবে আমায় ফাঁকী দিয়ে পালাত। তুমি এত কষ্ট করতে পারবে কেন মা?

—আমি পারব মা।

—না বাছা না। সে আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। বাপ-মার নিধি, তাঁদের কাছে থাকগে মা। না খেতে দিয়ে পরের বাছাকে আমি মারতে পারব না।

ছায়ার চোখে জল ঝরিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, মা মরতে হয়, তিনজনে এক সঙ্গে মরব ; আপনার কাছ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। মা, আমি অনেক শিল্পকাজ জানি, কলকাতার অনেক প্রদর্শনীতে আমার শিল্পকাজ অনেক টাকায় বিক্রী হয়েছে, তার কিছু টাকা আমার কাছে আছে, তাই দিয়ে আমাদের কিছুদিন ত চলুক ; তার পর তিনি এলে—

বিধবা দুইটি ব্যাকুল, বিস্ফারিত নয়ন তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

ছায়া বলিল, তিনি এলে আমাদের আর ভাবনা কি ?

—নরু! সে কি আর আসবে? তেমন বরাত আমার নয় বাছা!

—হ্যাঁ মা, তিনি আসবেন। আমাকে আসবার খরচের টাকার জন্যে লিখেছেন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

মরণোন্মুখ রোগীও যেমন মকরধ্বজ প্রয়োগে চনমন করিয়া উঠে, এই কথাগুলিতে বৃদ্ধাও সেইরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ দুই বা পসারিত করিয়া পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টানিয়া অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ মা, সত্যি করে বল, নরু কি আমার আবার আসবে ? আসবে ?

—হ্যাঁ মা, আসবেন।

বৃদ্ধা চিন্তিত মুখে কহিলেন, তবে যে শুনি সে মেম বিয়ে করেছে। মেমেরা নাকি কামরূপ-কামাখ্যার যোগিনী, কাউকে ছাড়ে না।

ছায়ার নিজের মনে যে সন্দেহই থাক, ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করিতে সে পারে না ; বলিল, না মা মেম বিয়ের কথা মিথ্যে। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন—

—কবে আসবে লিখেছে ?

—তিন সপ্তাহের মধ্যে।

—তিন সপ্তাহ—ক'দিন বৌমা ?

—একুশ দিন মা।

—একুশ দিনের মধ্যে আমার হারানিধি আমার ঘরে আসবে বৌমা ?

—হ্যাঁ মা।

—তুমি রাজরাণী হও মা, শতপুত্রের জননী হও। নরু আসুক, তার হাতে তোমাদের দুজনকে সঁপে দিয়ে আমি যেন মা গঙ্গায় যাই।

পরেশ বলিল, হ্যাঁ বৌদি, দাদা নাকি গরু খায় ?

পাড়াগাঁয়ের সহজবিশ্বাসী ও সংস্কারাচ্ছন্ন ছেলেটির মনের ভাব বুঝিয়া লইতে ছায়ার বিলম্ব হইল না ; বলিল, না ভাই, হিন্দুর ছেলে কি গরু খায় ?

—দেখলে ত মা! গরু যে ভগবতী, দাদা কখন তা খান! এইবার যে বলবে তোর দাদা গরু খায়, দাঁই ক'রে তার মাথায় চাটি না দিই ত আমি কি বলিছি!

কি ভাবে ও কিরূপ বেগে চাটি দিতে হইবে তাহারই রিহার্স্যাল দিতে গিয়া দুর্বল পরেশ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, ছায়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া শোওয়াইয়া দিল। পরেশও সামলাইয়া লইয়া দুই দুর্বল ক্ষীণ হস্তে যত বল ছিল, তাহা দিয়া বৌদিদিকে জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বাহিরে ইতাবসরে পল্লীবাসী ও বাসিনীদের ভিড় জমিয়া উঠিতেছিল। পরেশের মা তাহা বুঝিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

পরেশ যত জোরে পারে চাপিতে চাপিতে কহিল, আর আমি তোমাকে ছাড়ব না বৌদি!

ছায়াও তাহার উত্তপ্ত আননের উপর মুখ রাখিয়া স্নেহের সাগর ঢালিয়া দিয়া কহিল, আমিই বুঝি তো ছাড়ব ভেবেছ!

[illegible] কণ্ঠস্বরটি [illegible]

পরেশ একটু পরে বলিল, বৌদিদি, কল আমার জন্যে ভাল ভাল খাবার এনেছ তুমি ?

ছায়া মনে মনে জিভ কাটিয়া বলিল, তুমি [illegible]কে ভালবাস জেনে আমার দাদাকে দিয়ে আজই আ[illegible] এত ভাই। বল-না ভাই, তুমি কি কি ভালবাস ?

—আমি সব ভালবাসি বৌদিদি!—একটু থামি[illegible] বলিল, মা'র যে পয়সা নেই, আমরা যে বড় গরীব[illegible]ছিল। কিচ্ছু খেতে পাইনে বৌদিদি!

ছায়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এইবারে পাবে ভাই।

ছায়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাবিল, এই চির-অভু[illegible]

শিশুকে রক্ষা করিতে পারিলে তাহার নারী-জীবন হইবে।

রেশ বলিল, বৌদিদি, এখানেও কামিনী বোষ্টমীর নে বড় বড় রসগোল্লা, গজা, পান্তুয়া পাওয়া যায়। গাঁয়ের কেনে, খায়, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। তোমার পয়সা থাকে ত দাও না, আমি ছুটে গিয়ে চারটে বড় ল্লা আনি। তুমি দু'টো, আমি দু'টো।

–কিন্তু তোমার যে জ্বর হয়েছে ভাই।

–ধের! ও জ্বর আবার জ্বর! ও ত রোজ হয়, রোজ যায়। আমি চান করি, ঘরে যে দিন ভাত থাকে খাই, ভাত না থাকে, মা কলমীশাক সেদ্ধ করে দেয়, তাই তোমার কাছে ভাঙ্গান পয়সা আছে বৌদিদি?

–পয়সা নয় ভাই, টাকা আছে।

দাও না, ভাঙ্গিয়ে রসগোল্লা আনি। বল ত চারখানা আনতে পারি।

া হাসিয়া বলিল, আর পান্তুয়া বুঝি ভাল নয় ? তা'ও চারটে আনবে না ?

হাসিয়া বলিল, হুঁ, তা'ও!—বলিয়া ছায়ার হাত টা একরূপ ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

র মুখখানির আদল আসে অশোকের মুখের মত। মত উন্নত নাসিকা, তাহারই মত দীর্ঘায়ত নয়ন, মত সুগৌর বর্ণ! আর চলাটি—হুবহু অশোকের ী মানুষের মনের গতি। ঐ রুগ্ন, পাণ্ডুর ছেলেটির া থাকিতে থাকিতে যে-ভাবনা, যাহার ভাবনা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসে নাই, তাহাই কাম্য এবং ঐ ছেলেটিকে তুষ্ট করিয়া সেই বহু সহস্র ৩ী লোকটিকে তুষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া নারী গ্রী হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

তাহার পিতামাতার সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন সয়াছে শুনিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মনস্তাপের রহিল না। বাপ-মা যে কি পদার্থ, যে ছেলে-মেয়ে বুঝিয়া তাঁহাদিগের মনবেদনার কারণ হয়, ইহকালে ই, পরকালেও তাহারা সুখী হইতে পারে না। ছায়ার মত সুশীলা মেয়ে যে কিরূপে বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়া তাঁহাদের অমতে এক বস্ত্রে শাঁখা হাতে চলিয়া আসিল, তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না।

ছায়া বলিল, নইলে যে তাঁরা আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন না মা।

—নরু বাড়ী আসছে; সে এলে তোমাকে তাঁরা না পাঠিয়ে পারতেন না। কটা দিন বৈ ত নয়, চুপ ক'রে বাপ-মার মুখ চেয়ে থাকতে হয় বাছা।

তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবার একটি গুরুতর কারণ ছিল। মা যে তলে তলে একটা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এমন কি তাহার পিতার অজ্ঞাতে কোন উকীল কি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, দৈবক্রমে ছায়া তাহা জানিতে পারে। জানিয়াই মনটি তাহার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। অশোকের উপর তাহার যে খুব মন পড়িয়াছিল, তাহা নয়; বিবাহান্তে বর-বধূর মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে যে প্রণয়ের বন্ধন সূচিত হয়, ইহাদের তাহাও হয় নাই; পরে অশোকের আচরণে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না, মনে মনে ছায়া যেন তাহাকে ঘৃণা করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, সব সত্য; তবু এক নারীর দুইবার দুইটি পুরুষের সঙ্গে বিবাহের কল্পনামাত্রে নারীর মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশোকের প্রতি মাতার নির্মম ব্যবহার কঠোর ও ক্রূর রূপ ধারণ করিতেছিল। মা তাহার বিলাতের খরচ বন্ধ করিয়াছেন ছায়া তাহা জানিত, কিন্তু ইহার গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা সেই দিনের পূর্ব্বে সে অনুমানও করিতে পারে নাই, যেদিন অশোকের চিঠিখানি তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। সেইদিন মনে হইল, এ জগতে একমাত্র সেই যেন অশোকের আশ্রয়স্থল আর অশোকের জন্যই যেন তাহার এই দেহ, এই জীবন, এই ধনরত্ন, এই মণিমাণিক্য, এই রত্নালঙ্কার! অশোক সেই সুদূর প্রবাস হইতে তাহারই মুখ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে; আর কাহারও ভরসা সে করে নাই, আর কাহারও কাছে যাচ্ঞা করে নাই—শুধু—কেবলমাত্র তাহারই কাছে যাচ্ঞা করিয়াছে, তাহারই সামনে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু দেব-দেবীর চিন্তায় অনভ্যস্ত ছায়ার মনে কবেকার দেখা একখানি পটের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেব-দেবীর নাম তাহার মনে নাই, তবে চিত্র

ানি এইরূপ। রত্নরাজিপরিহিতা পত্নী স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, বাঘাম্বর-পরিহিত ভিক্ষুকপতি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে সম্মুখে দণ্ডায়মান। অশোক যেন সেই বাঘছাল-পরিহিত ভিক্ষুক স্বামী, সেই সুদূর দেশ হইতে দুইখানি হাত বাড়াইয়া ছায়ার কাছে বলিতেছে, ভিক্ষাং দেহি!

সুখের দিনে আর সকলকে মনে পড়িলেও ছায়াকে অশোকের মনে পড়ে নাই, আজ দুঃখের দিনে আর কাহাকেও তাহার মনে পড়ে নাই, একমাত্র ছায়াকেই মনে পড়িয়াছে। সুখের সময়ে তাহার অনেক বন্ধু ছিল, দুঃসময়ের একতম সুহৃদ ছায়া! এই চিন্তাটুকু ছায়াকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। আর কেহ নয় একমাত্র সেই পারে তাহাকে সাহায্য করিতে, অশোক একমাত্র তাহারই ভরসা করে, এই চিন্তা ছায়ার সকল চিন্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন মনে পড়িল, সেই বিবাহ-রজনীর কথা। সে রাত্রির কথা সে একরকম ভুলিতেই বসিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া মন হইতে বিদূরিত করিয়াছিল, এখন নূতন করিয়া সেই দৃশ্য, তাহার সাজসজ্জা, তাহার গৌরব, তাহার সৌরভ, তাহার মাধুর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য লইয়া তাহার মানসপটে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। বিচিত্র সাজে সজ্জিত কক্ষ, ফুলে পাতায় আলোকমালায় অপরূপ সাজিয়াছে। মধ্যস্থলে রত্ন-বেদিকা, বেদীর দুই পার্শ্বে দুইখানি বিচিত্র কোমল সুখাসন—বেদিকায় আচার্য্য, দুই পার্শ্বে তাহারা দুইজন। সম্মুখে, নিকটে, দূরে যতদূর দেখা যায়, বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত আত্মীয়স্বজনগণ। একপার্শ্বে বাদ্যীগণ মৃদু বাদ্য বাদন করিতেছেন। ছায়ার আত্মীয়-দুহিতারা আচার্য্যের নির্দ্দেশে মধ্যে মধ্যে সুললিত সঙ্গীত করিতেছে, তাহারই মাঝে মাঝে তাহাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান হইয়াছিল।

ছায়া বলিয়াছিল—

বরেণ্যস্তং বৃণে ত্বাদ্য বৃণে চিত্তং বৃণে মনঃ।
বৃণে সৌমনসং হার্দম্‌ আত্মানং আত্মনা বৃণে॥

তুমি বরণীয়, তোমাকে আজ বরণ করি, তোমার চিত্ত, তোমার মনকে বরণ করি। তোমার প্রীতি, তোমার হৃদয়কে বরণ করি; আমার আত্মার দ্বারা তোমার আত্মাকে বরণ করি।

অশোক বলিয়াছিল—

বৃণে ত্বামপি সংসদি

তোমাকেও আমি সর্ব্বসমক্ষে বরণ করিতেছি।

তাহারা উভয়ে একসঙ্গে বলিয়াছিল—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করিতেছি।

আচার্য্য বলিয়াছিলেন—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

শ্বশুরের নিকট, শাশুড়ীর নিকট, ননন্দা ও দেবরগণের নিকট তুমি সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শোভমানা হও।

সমবেত নরনারী মধুর কণ্ঠে মধু উচ্চারণ করি বলিয়াছিলেন—

ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি॥

ছায়ার মনে হইয়াছিল, আলোকমালা যেন সহসা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল; পুষ্পরাজি যেন অধিকতর মিষ্ট সুরভি বিতরণ করিয়াছিল; তাহাদের কল্যাণকামীদের কণ্ঠে স্বস্তিবচন যেন উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কতদিনের কথা সে! ছায়া সে কথা সব ভুলিতে বসিয়াছিল। সে ধূপের গন্ধ, সে রক্তরাগরঞ্জিত আলোকদ্যুতি, সে পুষ্প-সৌরভ সবই তাহার মনে আবছায়া হইয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ অশোকের এই সকরুণ বাঞ্ছা তাহার মনে সেই রাত্রিকে মধুময়, প্রীতিময়, আলোকময়, সুখময়, আবেগময়, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় করিয়া তুলিল। এ যেন দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ সৌন্দর্য্যের তীব্র আকর্ষণ, ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলা যায় না, ইহার পর হইতে অশোককে মন হইতে দূরে রাখিবার সাধ্য তাহার রহিল না। অশোকের সুন্দর মুখখানি বুকের ভিতরে আসিয়া বাসা বাঁধিল। অশোকের হাসিটি চোখে, তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বরটি দুটি কাণে লাগিয়া রহিল।

রামনগরে আসিয়া অশোককে যেন সে আরও নিকটে পাইল। অশোকের মাকে মা বলিয়া, তাহার ছোট ভাইটিকে ভাই বলিয়া তাহার যেন আশ মিটে না। এত সেবা এত যত্ন করিতে সে জানিল কিরূপে, ইহা ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইল।

বিমল তাহাদের সংসারটি গুছাইয়া দিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র সংসারে প্রয়োজনও ক্ষুদ্র, গুছাইয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। দুই দিনেই সংসারের শ্রী ফিরিয়া গেল। যে

পাঁচ মাস দুগ্ধ বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বাঁটেও দুধ আসিল।

পল্লীগ্রামে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদা নগদ পয়সায় জীবনধারণ করিতে হয় না। অতিবড় দরিদ্রও পুকুরে কলমী, শুশুনি শাক পায়, ঘরের বেড়ায় লাউ, ঝিঙা, উচ্ছে জন্মে। কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল জুটিলে চর্ব্বচুষ্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সহরের মেয়ে, ধনীর দুলালী ছায়া শাশুড়ীর সঙ্গে পাঁচ বাড়ী বেড়াইতে গিয়া সবই লক্ষ্য করিল। যাহাদের সঙ্গে তাহার নবীন বন্ধুত্ব হইল, তাহাদের নিকট হইতে শাকসব্জীর বীজ বা চারা চাহিয়া লইয়া উঠানের জমিটুকুর সদ্ব্যবহার করিল। কয়দিনেই ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

আশ্চর্য্য নারীর মন, আর ততোধিক আশ্চর্য্য তাহাদের দৈহিক শক্তি। এই দরিদ্র পল্লীগ্রামে, দরিদ্রের গৃহাধিষ্ঠাত্রী ছায়াকে আজ না দেখিলে, তুমি পাঠক মহাশয়, কল্পনা করিতেও পারিবে না, কেন নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া পূজা করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তুমি ছায়াকে ঘোষ সাহেবের ড্রয়িং-রুমে সোফা-সেটিতে বসিয়া বয়-বেহারা-বাহিত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দেখিয়াছ; আয়া তাহার চরণসরোজে গিল্ট-এজেড জুতার বগলোস্ আঁটিয়া দিতেছে, ইহাও তুমি দেখিয়াছ; প্রণয় মামার সঙ্গে মোটরে বায়ুসেবনার্থ বিলাস ভ্রমণ করিতেও দেখিয়াছ। আর আজ দেখ, গোয়াল-ঘরে ছায়া, রন্ধনশালায় ছায়া, সে যে কোনদিন কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঝাড়ুহস্তে উঠান ঝাঁটাইতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন নয় কি? প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গে যাঁহাকে সে কোনদিন ডাকে নাই, কি বলিয়া ডাকিতে হয় তাহাও জানে না, তিনি কে তাহাও অজ্ঞাত, তাঁহাকেই ডাকিয়া বলে, আমাকে তুমি শক্তি দিও, তোমার কাছে আর কিছু চাহিব না। তুমি আমাকে শক্তি দিও, কোন কাজে আমি যেন অশক্ত না হই।

শাশুড়ীর মুখে দিবসারম্ভে নিত্যই সেই এক কথা।

—হাঁা বৌমা, আর ক'দিন বাকী রইল মা?

—দু সপ্তাহ, মা।

—দু সপ্তাহ ক'দিন বাছা?

—পনের দিন মা।

দুইদিন পরে ছায়া বলিল, তেরদিন বাকী মা।

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কতদিন আগে ত তুমি বললে তেরদিন বাকী, আজও বলছ তেরদিন। কি রকম কথা বাছা তোমার?

এ কথার কি উত্তর ছায়া দিবে? যে প্রশ্ন করিতেছে সে যে মণি-হারা ফণী, পুত্র-বিরহবিধুরা জননী! তাহার কাছে এক দণ্ড যে একবৎসর তুল্য! কোন্ কৈফিয়ৎ তাহাকে সন্তোষ দিতে পারে?

একদিন হৈ হৈ করিতে করিতে দুইখানা মোটর বোঝাই জিনিষপত্র আসিয়া পড়িল। পিতার বয় সঙ্গে আসিয়াছে। প্রায় এক বৎসর একটি বৃহৎ সংসার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চলিতে পারে এমন সমস্ত জিনিষ পিতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বয়কে কাছে বসাইয়া ছায়া পিতামাতার সংবাদ লইতে বসিল। শুনিল, কাল রাত্রে তাঁহারা বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

—হঠাৎ বিদেশ কেন রঘু? শরীর ভাল আছে ত?

—হুজুরের শরীর খারাপ ছিল দিদিমণি।

—মা।

—মেম সাহেব ভাল আছেন।

একটা প্রশ্ন কণ্ঠ ভেদিয়া জিহ্বার উপরে তাণ্ডব করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করাও সহজ ছিল না। রঘু নিজেই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া কহিল, হুজুর কাল আদালতে গিয়ে আমাকে টাকা আর ফর্দ্দ দিয়ে দিলেন, বললেন, তিনি বিদেশ থেকে আপনাকে চিঠি লিখবেন।

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, মা এ সবের কিছুই জানেন না; বাবা তাঁহাকে জানাইতে ভরসাও পান নাই। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, ছায়া বলিল, দাঁড়া রঘু, তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

কিন্তু একবার নির্জ্জন ঘরে এই সমস্ত জিনিষপত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার জিনিষপত্রের মধ্যে পিতার স্নেহতপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ গ্রহণ করিতে ছায়ার বুক যেন ফাটিয়া মরিতেছিল। পিতা চিরদিন চাপা-স্বভাবের লোক, কখনও কোন বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ, ছায়া দেখিতেছিল, সকল জিনিষে স্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাস—নদীর প্লাবনোচ্ছ্বাসসম মিশিয়া রহিয়াছে।

পাষাণী

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বাবুর নেতৃত্বাধীনে খননের কার্য্য (excavation) চলিতেছে। এইখানেই নাকি বৌদ্ধযুগের শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। চারিদিকে লোকজন কাজ করিতেছে। পাথরের অনেক মূর্ত্তি উঠিয়াছে। রাখালদাস বাবু সেই মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিতেছেন।

পাশাপাশি তিনটি মূর্ত্তি। একটি পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তি, একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, আর একটি বীভৎস-দর্শন কুৎসিত পুরুষের মূর্ত্তি। এই তিনটি মূর্ত্তির দিকেই একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখালদাস বাবু বসিয়া আছেন। এত এত মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু এই তিনটি মূর্ত্তি কেমন যেন একটুখানি অদ্ভুত রকমের। ধ্যানী বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্ত্তিটি যেমন হয় তেমনি; তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু পরমাসুন্দরী ঐ নারীমূর্ত্তিটির নীচে প্রথমে একবার লেখা হইয়াছিল 'স্বর্গের দেবী', তাহার পর সে লেখাটি বাটালি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া খানিকটা অস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নীচে পুনরায় লেখা হইয়াছে 'নরকের দানবী'। বীভৎস পুরুষের মূর্ত্তিটির নীচেও প্রথমে একবার লেখা হইয়াছিল 'নরকের দানব', তাহার পর সেটিকে কাটিয়া আবার লেখা হইয়াছে 'স্বর্গের দেবতা'।

মূর্ত্তির নীচে এইরকমভাবে দুই দুইবার নামকরণ করিবার হেতুটা তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অনেক ভাবিলেন, অনেকবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ইহার মানেটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মূর্ত্তি দুইটি তিনি একটুখানি দূরে সরাইয়া রাখিলেন।

জনবিরল প্রান্তরের উপর পাশাপাশি তিনটি তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাহারই ভিতর একটি ইজি-চেয়ারে রাখালদাস বাবু শুইয়া আছেন। চোখ বুঁজিয়া বোধ করি ঐ মূর্ত্তি দুইটির কথাই ভাবিতেছিলেন। চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শোনা যাইতেছে। দূরে একবার একদল শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। কোথায় কোন্ দূরের গ্রামে মাঝে মাঝে কতকগুলা কুকুর ডাকিতেছে।

রাখালদাস বাবু বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন:

তথাগত বুদ্ধের স্তবগানে মুখরিত নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধবিহার। বুদ্ধদেবের মর্ম্মরমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ধূপদানি হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে। মেয়েরা নূপুর পায়ে নাচিয়া নাচিয়া আরতি করিতেছে। চারিদিকে পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত বুদ্ধমন্দির।

মন্দিরের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক আচার্য্য শীলভদ্র বসিয়া বসিয়া তন্ময়চিত্তে স্তবপাঠ করিতেছিলেন। চীন পরিব্রাজক হাইউন্ সাং নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

পূজারতি শেষ হইল। হাইউন্ সাং জোড়হস্তে বলিলেন, 'আমার একটি নিবেদন আছে আচার্য্য দেব!'

'বলুন!'

'এবার গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে মহামোক্ষ পরিষদের যে প্রদর্শনী হবে, আমার ইচ্ছা সেই প্রদর্শনীর তোরণ-দ্বার সাজাবার ভার আমাদের শিল্পবিভাগের প্রিয় ছাত্র শঙ্করকে দেওয়া হোক্!'

শীলভদ্র বলিলেন, 'শঙ্করের তৈরি মূর্ত্তি আপনার খুব ভাল লাগে, না? তা বেশ, তাই হবে।'

হাইউন্ সাং বলিলেন, 'তোরণের মাঝখানে থাকবে ভগবান তথাগতের মূর্ত্তি, বামপার্শ্বে থাকবে পরমাসুন্দরী একটি নারী-মূর্ত্তি—স্বর্গের দেবী, আর তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে থাকবে বীভৎস কুৎসিত একটি পুরুষের মূর্ত্তি—নরকের দানব! এই আমি পরিকল্পনা করেছি। প্রদর্শনী হতে এখনও দু' বৎসর দেরি আছে। এই দু'বৎসরের মধ্যে মূর্ত্তি তিনটি তাকে তৈরি করতে হবে। আপনি ডেকে তাকে একবার বলে দিন।'

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ। শত শত ছাত্র পাথরের উপর বাটালি ঠুকিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে।

আচার্য্য শীলভদ্র তাইউন সাংকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।

কুৎসিত পুরুষ মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আদর্শ করিবার মত পরমাসুন্দরী নারী সে পায় কোথায়? বিহারে যত ভিক্ষুণী আছে, শঙ্কর তাহাদের প্রত্যেককেই আর একবার ভাল করিয়া দেখিল। কিন্তু কাহাকেও তাহার নিখুঁৎ সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না।

শঙ্কর আচার্য্যদেবকে জানাইল, আদর্শ একটি নারীমূর্ত্তির সন্ধান করিবার জন্ম তাহাকে কিছুদিনের জন্ম দেশভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হোক্।

শীলভদ্র অনুমতি দিলেন।

পশ্চিমের কয়েকটি শহর পর্য্যটন করিয়া শঙ্কর আসিল বাঙ্গালার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে।

কর্ণসুবর্ণ শহরে প্রবেশ করিতেই সন্ধ্যা নামিল। আকাশে ইহারই মধ্যে চাঁদ উঠিয়াছে। বোধ করি পূর্ণিমার রাত্রি। শঙ্কর এক বৃদ্ধার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাত্রে আহারাদির পর শঙ্কর শয়ন করিয়াছে। সহসা মধ্যরাত্রে নূপুরের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানালার পথে চাহিয়া দেখে দূরে একটি গাছের তলায়, মনে হইল একটি মেয়ে যেন নাচিতেছে। এত রাত্রে ওখানে ও এ রকমভাবে নাচে কেন দেখিবার জন্ম শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল এবং নিঃশব্দে তাহার কাছে গিয়া আর একটি গাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, এতদিন ধরিয়া সে যাহা চাহিতেছে তাহাই—পরমাসুন্দরী এক নারী! উন্মুক্ত জ্যোৎস্নালোকে নীল নির্ম্মল আকাশের তলায় মেয়েটি এক দেব-মূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্যসহকারে আরতি করিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট শঙ্কর ধীরপদবিক্ষেপে আরও একটুখানি অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিল, মূর্ত্তি আর কাহারও নয়, ধীর প্রশান্ত অমিতাভ মূর্ত্তি, আর তদ্‌গতপ্রাণা কুমারী তাঁহারই অর্চ্চনায় রত।

নৃত্যপরা কুমারী শঙ্করকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। তাহার পর দেখিতে পাইবা মাত্র সে তাহার নৃত্য বন্ধ করিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল, 'আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

কুমারী বলিল, 'এমন চোরের মত এখানে আসা আপনার উচিত হয় নাই।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, 'লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। আপনি কে বলুন! কোথায় থাকেন?'

কুমারী বলিল, 'যে-গৃহে আপনি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সেই আমার গৃহ। যিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি আমার মা। বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্কদেব বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী, তাই আমি প্রত্যহ রাত্রে এখানে আসি ভগবান বুদ্ধের অর্চ্চনা করতে।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম?'

'উৎপলা'।

চিন্তিত মনে শঙ্কর গৃহে ফিরিল। এতদিন পরে সে তাহার মানসীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

উৎপলার বৃদ্ধা মাতাকে শঙ্কর তাহার পরের দিন জানাইল যে, উৎপলাকে সে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইতে চায়। সেখানে যদি সে ভগবান্ বুদ্ধের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া শিক্ষা লাভ করে ত তাহার জন্ম বৃদ্ধাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। ভবিষ্যতে সে তাহার নিজের ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংসারধর্ম্মে বীতরাগ বৃদ্ধা তথাগতের চরণসেবায় কন্যাকে অর্পণ করিবার এ সুযোগ উপেক্ষা করিল না। তৎক্ষণাৎ সে তাহার সম্মতি জানাইল।

উৎপলাকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর নালন্দায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

উৎপলা সুন্দরী, উৎপলা বিদুষী, উৎপলা সদ্যপ্রস্ফুটিত অম্লান পুষ্পের মত মনোহারিণী!

শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া এই উৎপলাকে আদর্শ করিয়া একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি সে নির্ম্মাণ করিবে।

দুই বৎসর পরে মহামোক্ষ পরিষদের মেলা। সেই মেলার প্রদর্শনীতে সেই মূর্ত্তি তাহাকে উপহার দিতে হইবে। আচার্য্যের আদেশ।

শঙ্কর সেদিন উৎপলাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রার্থনা তাহাকে জানাইতেই উৎপলা নতমুখে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার সেই সুবঙ্কিম গ্রীবা হেলাইয়া তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঈষৎ হাসিয়া শঙ্কর তাহার মুখের পানে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখে উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী উৎপলাও তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

এইবার চাই নরকের সেই পিশাচের মূর্ত্তি।

তাহার জন্য শঙ্করকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তক্ষশীলাগত হূণ সর্দ্দার রাজার বিচারালয়ের হস্তারক তোরমাণকে তাহার জন্য নির্ব্বাচিত করা হইল। তোরমাণ জাতিতে হূণ, বিকটদর্শন, খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণকায়, বীভৎস।

শঙ্কর তাহার কাজ আরম্ভ করিল।

আদর্শ দুইটিকে সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে করিতে শঙ্করের একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টি যেমন উৎপলার দিকে স্থিরনিবদ্ধ হইয়া থাকিত, তোরমাণও তেমনি উৎপলার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিয়া কি যে দেখিত, সেই জানে!

হঠাৎ একদিন সেই কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস লোকটা তাহার মনের গোপন বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

মর্ম্মর মূর্ত্তি দুইটি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

গৃহে শঙ্কর ছিল না। তোরমাণ তাহার লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া উৎপলার দিকে আগাইয়া গেল। বলিল, 'উৎপলা, তোমাকে আমি চাই। তক্ষশীলার বাইরে এখনও আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তুমি চল আমার সঙ্গে।'

উৎপলা ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বলিল, 'আমি ভগবান তথাগতের শ্রীচরণের সেবিকা। তুমি—তুমি—তোরমাণ, এ প্রস্তাব করছ তুমি কার কাছে?'

তোরমাণ বলিল, 'ভগবান তথাগতের পূজা অর্চ্চনা আমার গৃহে থেকেও সম্ভব উৎপলা। তবে আমি অপ্রিয়দর্শন, কুৎসিত, কদাকার, তোমার অযোগ্য—এই যা।'

শঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিল।

তোরমাণকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া শঙ্কর তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

ব্যথিত দৃষ্টিতে তোরমাণ চাহিয়া রহিল উৎপলার দিকে।

এইবার উৎপলাকেও তাহার পারিশ্রমিক দিয়া এ-বিভাগ হইতে তাহাকে বিদায় করিতে হয়। কিন্তু···

শঙ্কর কম্পিত হস্তে তাহার শুভ্র সুকোমল একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তোমাকে আমি আর কি দেব উৎপলা?'

উৎপলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'দেবে না? আমাকে তোমার কি কিছুই দেবার নেই?'

'কি আছে উৎপলা তুমি বল!'

'তাও কি আমায় বলে দিতে হবে?'

শঙ্কর বলিল, 'তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নেই উৎপলা, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।'

উৎপলার আয়ত চক্ষু দুইটি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'দেবে? বল—অঙ্গীকার করলে?'

'হাঁ, অঙ্গীকার করছি। তুমি বল।'

উৎপলা বলিল, 'আমি তোমাকে চাই।'

এই বলিয়া সে একটু খানি থামিল। থামিয়া আবার বলিল, 'আমি চাই তোমার ভালবাসা, তোমার প্রেম, তোমাকে নিয়ে আমি সংসারধর্ম···'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া শঙ্কর বলিয়া উঠিল, 'আজ তবে তোমাকে আমি আমার মনের কথা অসঙ্কোচে জানাই উৎপলা, তুমি শোন। এ কামনা যে একদিন আমারও মনে জাগেনি তা নয়। আমিও ঠিক তোমারই মত ভেবেছিলাম। কিন্তু অতি কষ্টে সে কামনাকে আমি জয় করবার চেষ্টা করেছি। আমিও মানুষ, তোমার ঐ অনবদ্য রূপলাবণ্য আমাকেও মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তোমার মার কাছে আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম—নালন্দার বৌদ্ধবিহারে তোমাকে আমি ভিক্ষুণী করে' ভগবান তথাগতের চরণের দাসী করে দেব, তাছাড়া আর কিছু নয়।'

উৎপলা বলিল, 'বেশ ত', সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করলে কি ভগবান বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লাভ করা যায় না? আমাদের হৃদয়ের এই কামনার কি কোনও মূল্যই নেই?'

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। অষ্টশীল ব্রতে দীক্ষা লাভ করেছি আমরা। আমরা ব্রহ্মচারী। চিত্তের সংযম আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। দৈহিক মিলনের এ কামনা অতি তুচ্ছ উৎপলা। এর ঊর্দ্ধে অবস্থান করতে না পারলে হৃদয়ে কোন দিন তুমি সত্যিকার আনন্দের আস্বাদ পাবে না।'

উৎপলা বলিল, 'সে আনন্দ আমার তোমাতেই সম্ভব শঙ্কর। তোমাকে পেলে আমি ভগবানকেও পাব—এই আমার বিশ্বাস।'

শঙ্কর বড় দুঃখে একটু খানি হাসিল। বলিল, 'শিক্ষা তোমার এখনও সম্পূর্ণ হয় নি উৎপলা। শীঘ্রই তুমি—'

উৎপলা বোধ হয় রাগ করিল। বলিল, 'বুঝেছি। তুমি যাও। তুমি যাও আমার চোখের সুমুখ থেকে সরে যাও। আমার এ সর্ব্বনাশ করবার কোনও প্রয়োজন তোমার ছিল না নিষ্ঠুর!'

'তাই যাব, তোমার চোখের সুমুখ থেকে আমি সরে' যাব উৎপলা!' শঙ্কর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। 'নইলে তোমারও কল্যাণ নেই, আমারও নেই।'

শঙ্কর তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিল।

সুযোগ একদিন মিলিয়াও গেল।

বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্কদেব প্রবল পরাক্রমে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব আক্রমণ করিলেন।

আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করা। যে বৃক্ষতলে বসিয়া তথাগত বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শশাঙ্কদেব সেই বোধিদ্রুম বিনষ্ট করিতে চাহিলেন। এই সংবাদ যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহারে এই বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, এই ধর্ম্মযুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক নরনারীর যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অহিংসা-ব্রতধারী যে সব বৌদ্ধ যুদ্ধে প্রাণ-নাশের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণপণে শুধু শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবেন। অস্ত্রহীনের প্রতি অস্ত্রচালনা যুদ্ধের রীতি নহে। তাহা সত্ত্বেও শশাঙ্কদেবের সৈন্যেরা যদি ধর্ম্মযুদ্ধের রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া নিরস্ত্র বৌদ্ধদের হত্যা করে ত' সে পাপ তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করিবে।

শঙ্কর এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল না।

যুদ্ধে যোগদান করিবার পূর্ব্বে উৎপলাকে গোপনে সে একখানি পত্র লিখিয়া গেল।

লিখিল:

উৎপলা, প্রাণের উৎপলা, তোমারই কল্যাণের জন্য আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম আমি জানি, বৌদ্ধবিহারের সুপবিত্র শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াও চিত্ত তোমার চঞ্চল। সে চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ—আমি। সেই আমি আজ চলিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমি তোমার অন্তরের বাসনাকে জয় করিবার চেষ্টা করিও। যুদ্ধে যদি আমি মরি ত' দুঃখ নাই; কিন্তু দেখিও, মরিবার সময় আমি যেন ভাবিতে পারি তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, দেবতার পদপ্রান্তে উৎসর্গীকৃতা একটি পুষ্পের মতই পবিত্র। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি চলিলাম। ইতি।

তোমারই—শঙ্কর।

প্রিয়তমের স্বহস্ত-লিখিত গোপন এই লিপির প্রত্যেকটি অক্ষর তীক্ষ্ণধার শরের মত উৎপলার বুকে গিয়া বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই।

সেদিন নালন্দা বিহারের সঙ্ঘ-স্থবির আচার্য্য বীরদেব বিহারের প্রধানা শিষ্যা সুপ্রিয়া, সোমা ও উৎপলাকে উপসম্পদা প্রদানের আয়োজন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে এক বৃহতী সভা আহ্বান করা হইল। সভামধ্যে সকলেই উপস্থিত। ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত সভামণ্ডপের মঞ্চ-বেদিকার এক পার্শ্বে উপবিষ্টা সুপ্রিয়াকে আহ্বান করিয়া আচার্য্যদেব বলিলেন, 'তোমাকে আজ আমি উপসম্পদা দান করব না, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে তুমি অনুমতি প্রার্থনা কর।'

সুপ্রিয়া করজোড়ে তাহার বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিল।

সকলেই সমস্বরে অনুমতি দিলেন।

সুপ্রিয়া ও সোমা উভয়েই এইরূপে সমবেত জনগণের অনুমতি লইয়া আচার্য্যদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু গোল বাধিল উৎপলার বেলায়।

অনুমতি লইতে গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে উৎপলা ঠিক তাহার বিপরীত কথাই বলিয়া ফেলিল। বলিল, 'পূজনীয় সমবেত ভিক্ষুগণ, আমি সম্প্রতি উপসম্পদা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই, উপসম্পদার যোগ্যাও আমি নই। আমার চিত্ত অতীব চঞ্চল, সুতরাং আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন।'

উৎপলার তেজোদ্দীপ্ত এই নির্ভীক স্পষ্টভাষণে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। আচার্য্যদেব বলিলেন, 'তুমি জান উৎপলা, নিজ মুখে নিজের অসংযমের কথা স্বীকার করবার

পর বৌদ্ধবিহারে কোনও শিক্ষার্থী বা ভিক্ষুণীর থাকা চলে না! উৎপলা, তুমি আমার প্রিয় শিষ্যা, তুমি অসঙ্কোচে বল—কেন তোমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে!'

উৎপলা বলিল, 'আচার্যদেব, আমি একজনকে ভালবেসেছি। আমার দেহ মন প্রাণ তাহাতেই সমর্পিত হয়েছে।'

আচার্যদেব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'কে সে?'

উৎপলা বলিল, 'তার নাম আমি প্রকাশ করতে পারব না আচার্যদেব, সে প্রশ্ন আমায় করবেন না।'

'বিহারের বিধি তুমি লঙ্ঘন ক'র না উৎপলা, তার নাম প্রকাশ কর।'

'আমায় ক্ষমা করুন গুরুদেব।'

'তা হ'লে বলবে না?'

'না।'

'আমার আদেশ।'

উৎপলা মাথা নাড়িয়া হেঁট মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নাম সে কিছুতেই বলিল না।

আচার্যদেব বলিলেন 'আমাদের এ বৌদ্ধবিহার তোমার মত অসংযতচিত্ত যুবতীর জন্য নয় উৎপলা, অষ্টশীল তোমার আচরণীয় নয়, প্রব্রজ্যা তোমার পক্ষে ব্যর্থ স্বপ্ন। তুমি আজই আমার এ পবিত্র প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ কর।'

গবাক্ষপথে দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উৎপলা ভাবিতেছিল, কোথায় যাইবে সে? তাহার এই রূপ, এই যৌবন,—কোথায় তাহার স্থান?

এমন সময় সেই ভীষণকায় তোরমাণ তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'উৎপলা, তুমি এস আমার সঙ্গে। আজ তুমি বিহার থেকে বিতাড়িতা, শঙ্করও তোমাকে ত্যাগ করেছে, চল তুমি আমার আশ্রয়ে। তোমাকে আমি সুখে রাখব, দেবী বলে' নিত্য পূজা করব।'

উৎপলা বলিল, 'শঙ্কর আমাকে পরিত্যাগ করেনি তোরমাণ।'

তোরমাণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল, 'লাঞ্ছিতা নারী, আরও অপমান আরও লাঞ্ছনা যদি সহ্য করতে না চাও ত' চল আমার সঙ্গে। আমি তোমার শঙ্করকে খুঁজে এনে দেব! আমাকে বিশ্বাস কর।'

'তোমাকে বিশ্বাস আমি করব কেমন করে তোরমাণ?'

তোরমাণ বলিল, 'আমাকে বিশ্বাস না কর, আমার ভালবাসাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছি সেইদিন থেকে তোমার সুখ-শান্তিই হয়েছে আমার একমাত্র কাম্য। আমি তোমাকে সুখে রাখব উৎপলা।'

উৎপলা অনেক ভাবিল। কতই-বা আর ভাবিবে? পথে তাহাকে পা যখন বাড়াইতেই হইবে, তখন আর ভাবিয়া লাভ নাই। উৎপলা বলিল, 'চল তোরমাণ, তবে তোমার সঙ্গেই যাই।'

তোরমাণ কিন্তু উৎপলাকে তাহার গৃহে লইয়া শঙ্করের নামও আর মুখে আনে না!

উৎপলা বলে, 'কোথায় তোরমাণ, তুমি না বলেছিলে—শঙ্করকে খুঁজে আনবে!'

তোরমাণ বলে, 'কি হবে তার খোঁজ করে উৎপলা? যে তোমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে, তুমিই বা তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না কেন?'

'এ-সব কথা শোনবার জন্যে ত' আমি এখানে আসিনি তোরমাণ!'

'আমিও এ-সব কথা শোনাবার জন্যে তোমাকে এখানে আনিনি। আমি এনেছি তোমাকে নিজের করে পাবার জন্যে। কিন্তু–কিন্তু আমি কুৎসিত বলে তা কি সত্যিই অসম্ভব উৎপলা?'

উৎপলা বলে, 'অসম্ভব।'

এই কথা শুনিয়া তোরমাণের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। বলিল, চোখে কোনদিন কোনও কারণেই জল আসেনি উৎপলা, জল তুমিই এই প্রথম আনলে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় না আস, তোমার উপর বলপ্রয়োগ আমি কোনদিনই করব না—এ তুমি নিশ্চয় জেন।'

এই লোকটার জন্য উৎপলার দুঃখ হয়। ভাবে, হায় রে হতভাগ্য হূণ!

তোরমাণ বলিল, 'তোমার জন্য আমি নীরবে অপেক্ষা করব দেবী, এ-জন্মে না পাই, পরজন্মে তুমি আমারই হবে।'

তোরমাণ একদিন যুদ্ধক্ষেত্র-প্রত্যাগত দুইজন সৈনিককে উৎপলার কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল, 'শঙ্করের সংবাদ এনেছি উৎপলা।'

সৈনিকেরা ভগবান তথাগতের নামে শপথ করিয়া বলিল, 'শঙ্কর আর এখানে আসবে না।'

কারণ তাহারা সেখানে দেখিয়া আসিয়াছে, শঙ্করের সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী রমণী দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়। শঙ্কর বোধ হয় তাহাকেই বিবাহ করিবে।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করিল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে সুন্দরী রমণী সে কোথায় পেলে?'

সৈনিক বলিল, 'সেবাব্রতধারিণী শুশ্রূষাকারিণী এক নারী।'

আহত সৈনিকদের আরোগ্যশালায় তাহাদের দু'জনকে তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে।

হইতেও পারে বা!

কিন্তু আসলে তাহা নয়। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী আরও অনেক ভিক্ষুণী সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে আহতদের সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য গিয়াছিল। শঙ্কর আহত হইয়া যখন আরোগ্যশালায় বাস করিতেছিল, এই রাজ্যশ্রীই তখন তাহাকে সেবা করিয়া শুশ্রূষা করিয়া গান শুনাইয়া বীণা বাজাইয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছে।

সৈনিকেরা তাহাই দেখিয়া আসিয়াছে।

যাহাই দেখুক, উৎপলা কিন্তু সহসা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিল।

তোরমাণের গৃহে বাস করিতে উৎপলার আর ভাল লাগে না। শঙ্কর যখন সামান্য একজন শুশ্রূষাকারিণীকে লইয়া তাহাকে ভুলিয়াছে, তখন সে আর তাহার কথা চিন্তা করিবে না। আবার সে বৌদ্ধবিহারে ফিরিয়া যাইবে। শুদ্ধ সংযত হইয়া শঙ্করের কথা ভুলিয়া গিয়া সে উপসম্পদা গ্রহণ করিবে।

কিন্তু এখান হইতে সে যায় কেমন করিয়া!

উৎপলা দেখে, সেনাপতি যশোধর্ম্মদেবের পুত্র কুমারদেব প্রত্যহ অশ্বপৃষ্ঠে বৈকালিক নগরভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহই দেখে, সে তোরমাণের এই বাড়ীর পাশ দিয়া পার হইয়া যায়। উৎপলা ভাবে, সে তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু পারে না।

তোরমাণের অনেকগুলি সংবাদবাহী পারাবত ছিল। তাহারই একটি সংগ্রহ করিয়া উৎপলা একদিন একখানি পত্র লিখিয়া সেই পারাবতের পায়ে বাঁধিয়া উন্মুক্ত জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া রহিল কুমারদেবের আগমন-প্রতীক্ষায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, কুমারদেব আসিতেছে। উৎপলা তৎক্ষণাৎ সেই পারাবতটিকে তাহার উদ্দেশ্যে উড়াইয়া দিল।

পত্র পড়িয়া কুমারদেব ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখে, অট্টালিকার অলিন্দে এক পরমাসুন্দরী যুবতী উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল নয়নে তাহারই দিকে তাকাইয়া।

পরদিন রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া কুমারদেব আসিল উৎপলাকে উদ্ধার করিতে। উৎপলা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। অতিকষ্টে পিছনের দরজা খুলিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া উৎপলা আসিয়া দাঁড়াইল কুমারদেবের কাছে। কুমারদেব তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কুমারদেবকে উৎপলা লিখিয়াছিল,—সে বৌদ্ধবিহারে গিয়া ভিক্ষুণী হইতে চায়। তাহাকে পলায়নের সহায়তা করিলে—বীর সে—ধর্ম্মকার্য্যে সহায়ক হউক!

কিন্তু কুমারদেব তাহাকে লইয়া গেল একেবারে তাহার বিলাস-ভবনে।

বিলাসের প্রচুর উপকরণ উৎপলার চোখের সুমুখে! শত প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল।

শঙ্করের প্রতি দুর্জ্জয় অভিমানে উৎপলা তখন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে।

অস্পষ্টকণ্ঠে সে বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকে,—'সুন্দরী সেবাপরায়ণা শুশ্রূষাকারিণী! না?'

বলিয়াই ঠিক উন্মাদিনীর মত সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

কুমারদেব তাহাকে সহজে ছাড়ে না। ছাড়িবার পাত্রই সে নয়। উৎপলাকে বিলাসের স্রোতে ডুবাইয়া ফেলিতে তাহার বেশি সময় লাগে না।

তাহার পর প্রতিদিন তাহারা অশ্বশকটে বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভ্রমণে বাহির হয়। আহতা উৎপলা যেন সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতার প্রতি চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইতে চায়।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়াছে। বিষণ্ণ মুহ্যমান শঙ্কর!

শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়াছে আবার তাহার সেই পরিত্যক্ত শিল্প-গৃহে। গৃহে এখনও তাহার সেই স্বহস্তখোদিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি দুইটি বিরাজ করিতেছে। একটি উৎপলার, আর একটি তোরমাণের। উৎপলার মর্ম্মরমূর্ত্তির নীচে লেখা—'স্বর্গের দেবী'; আর তোরমাণের মূর্ত্তির নীচে—'নরকের দানব।'

গৃহে প্রবেশ করিয়া শঙ্কর একদৃষ্টে উৎপলার সেই মূর্ত্তিটির দিকে তাকাইয়া থাকে, আর চোখ দুইটি তাহার জলে ভরিয়া আসে। এখান হইতে কোথায় সে চলিয়া গেল কে জানে!

এ গৃহে বেশিক্ষণ সে থাকিতে পারে না। তাই সে অধিকাংশ সময় নালন্দার প্রসিদ্ধ 'রত্নোদধি' পুস্তকাগারে গিয়া নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

একদিন হঠাৎ একটা কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া সে পথে আসিয়া দেখে, কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে, আর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে এক অশ্বশকট। শকটারোহী প্রিয়দর্শন এক যুবক ও সুন্দরী এক যুবতী সেই নিরীহ সন্ন্যাসীদের উপর ঢিল ছুঁড়িতেছে। সন্ন্যাসীরা ছুটিয়া চলিয়াছে সেই ঢিলের ভয়ে।

শশাঙ্কদেব ও হর্ষবৰ্দ্ধনের গত যুদ্ধের পর বৌদ্ধদের হিন্দু-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে এই ব্যাপার।

শকটারোহীদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত শঙ্কর ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিয়দ্দূর গিয়া সে চিনিতে পারিল শকটারোহী প্রিয়দর্শন যুবা আর কেহই নয়, সেনাপতির পুত্র কুমারদেব, আর কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া যে-নারী তাহার পার্শ্বে বসিয়া ··· কে ও?

শঙ্কর থমকিয়া দাঁড়াইল। সে—উৎপলা!

মনের দুঃখে শঙ্কর বিহারে ফিরিল।

কিন্তু সেই দিনই রাত্রে ভীষণ একটা অঘটন ঘটিল।

মার খাইয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কোনও একজন প্রতিশোধ লইবার জন্য নালন্দার 'রত্নোদধি' পুস্তকাগারে দিল আগুন ধরাইয়া।

'রত্নোদধি' ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মহামূল্য গ্রন্থাবলী পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। চারিদিকে হৈ হৈ চীৎকার! গোলমাল ছুটাছুটির আর অন্ত নাই। শঙ্কর ভাবিল, কি হইবে তাহার এই তুচ্ছ জীবনে! জীবন দিয়াও যদি সে 'রত্নোদধি'র কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারে ত' তাহারই চেষ্টায় অবিলম্বে সেই প্রজ্জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডের মধ্যে সে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

'রত্নোদধি' বাঁচিল না, তবে শঙ্কর বাঁচিল। বাঁচিল বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ তখন তাহার পুড়িয়া গিয়াছে। রাজ্যশ্রী এবং অন্যান্য ভিক্ষুণীরা তাহার সেবা করিতে লাগিল। মাসাবধিকাল তাহাকে আর শয্যা ত্যাগ করিতে হইল না।

সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া শঙ্কর যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখা গেল, চক্ষু দুইটি তখন তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পথ দিয়া চলিয়াছে অন্ধ শঙ্কর। বৌদ্ধ ভিক্ষু শঙ্কর! হাতে ভিক্ষার পাত্র। বলিতেছে—

'ভবতি ভিক্ষাং দেহি!'

এমন সময় সেই পথ দিয়া পার হইতেছিল কুমারদেবের সেই অশ্বযান। শঙ্কর ভাবিল, কোনও ধনী পার হইতেছে। পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি!'

শকটে প্রত্যহ যেমন থাকে, সেদিনও তেমনি ছিল কুমার-দেব ও উৎপলা।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া উৎপলা চমকিয়া উঠিল। কুমারদেবকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া সে ছুটিল সেই অন্ধ ভিক্ষুকের কাছে। নিতান্ত কাতরকণ্ঠে ডাকিল, 'শঙ্কর!'

শঙ্কর বলিল, 'কে? উৎপলা?'

উৎপলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল, 'আমায় তুমি ক্ষমা কর শঙ্কর! আমি তোমারই।'

কুমারদেব ডাকিল, 'উৎপলা!'

উৎপলা তখন কাঁদিতেছে। তাহার ডাকে সে সাড়া দিল না। কুমারদেব আবার বলিল, 'উৎপলা, তুমি কি আসবে না উৎপলা?'

উৎপলা চুপ করিয়া রহিল। কুমারদেব রাগিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া একাকী গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

আবার সেই শিল্প-গৃহ। এবার আর শঙ্কর একা নয়, উৎপলাও আসিয়াছে। শঙ্কর ভিক্ষু, উৎপলা ভিক্ষুণী।

প্রথমেই উৎপলা তাহার মর্ম্মরমূর্ত্তির নীচের সেই লেখা—'স্বর্গের দেবী' কাটিয়া কাটিয়া অস্পষ্ট করিয়া সেই জায়গায় খোদাই করিয়াছে—'নরকের দানবী।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, 'কি করছ উৎপলা? ও মূর্তি তুমি নষ্ট ক'র না; ও আমার বড় সাধের মূর্তি।'

উৎপলা হাসিয়া জবাব দেয়, 'ও মূর্তি তুমি নিজেই গড়েছ আবার নিজেই নষ্ট করেছ শঙ্কর! এর জন্যে দায়ী তুমি নিজে।'

এই বলিয়া দু'জনেই হাসিতে থাকে।

কূপ হইতে উৎপলা একদিন জল আনিতেছিল, সহসা তোরমাণ তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'অন্ধ শঙ্করকে নিয়ে তুমি সুখে আছ উৎপলা?'

উৎপলা বলিল, 'সে সংবাদে তোমার কি প্রয়োজন তোরমাণ?'

তোরমাণ বলিল, 'তুমি তা বুঝবে না উৎপলা। ছায়ার মতন আমি তোমার অনুসরণ করি—এখনও, চিরদিন করব, যতদিন বাঁচব। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না দেবী, জোর করে কোনদিন আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করব না। আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা কর।'

উৎপলা বলিল, 'তুমি যাও তোরমাণ, এমন করে' আর কোনদিন এস না আমার কাছে।'

তোরমাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইবার একদিন আসিল কুমারদেব। অন্ধ শঙ্কর তাহার উৎপলাকে ছিনাইয়া লইয়াছে, আজ সে তাহাকে হত্যা করিয়া উৎপলাকে পুনরায় নিজের কাছে লইয়া আসিবে।

কুমারদেবকে দেখিয়াই উৎপলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কুমারদেব তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল, আর একহাতে ধারালো ছোরা তুলিয়া শঙ্করকে মারিতে গেল।

চারিদিকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। সহসা পশ্চাতের অন্ধকার হইতে কে যেন একটা লোক চোরের মত আগাইয়া আসিয়া কুমারদেবকে আক্রমণ করিল। তাহার পর অস্পষ্ট অন্ধকারে কি যে ঘটিল কিছুই ভাল বুঝা গেল না। খানিকক্ষণ ঝাপটা-ঝাপটি চলিল, কুমারদেব বার-কতক চীৎকার করিল, তাহার পর সব শেষ! উৎপলা তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিল। দেখা গেল, শঙ্করের পদপ্রান্তে কুমারদেব পড়িয়া আছে, বুকের উপর আমূলবিদ্ধ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, রক্তে তাহার পরিচ্ছদ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

উৎপলা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'ল উৎপলা?'

উৎপলা তাহাকে সব কথা বলিতে বসিল। কুমারদেবের রক্তাক্ত মৃতদেহ তাহার পদতলে পড়িয়া রহিল।

* * *

রাজসভায় পরদিন বিচার।

অপরাধী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পী ছাত্র অন্ধ শঙ্কর।

অভিযোগ তাহারই বিরুদ্ধে। সেনাপতি-পুত্র কুমারদেবের মৃতদেহ তাহার গৃহে পাওয়া গিয়াছে।

বহুলোক সাক্ষ্য বলে, উৎপলাকে লইয়া কুমারদেবের সঙ্গে শঙ্করের বিরোধ বহুদিনের। সুযোগ-সুবিধা অভাবে এতদিন কেহ কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

অধ্যাপক শীলভদ্র, আচার্য্য বীরদেব অনেক চেষ্টা করিয়াও শঙ্করের পক্ষে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

শঙ্করের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য্য।

উৎপলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল। বিচার-গৃহ লোকে লোকারণ্য!

এমন সময় লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া বিচারকের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তোরমাণ! হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কুমারদেবকে হত্যা করেছি আমি।'

'তুমি! তোরমাণ, তুমি?'

'হাঁ আমি। শঙ্কর নিরপরাধ।'

'তুমি হত্যা করেছ তার প্রমাণ?'

তোরমাণ বলিল, 'যে ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখুন সে ছুরি আমার। হূণ-সর্দ্দার তোরমাণের নাম তাতে লেখা আছে।'

দেখা গেল সত্যই তাই।

তোরমাণের হইল প্রাণদণ্ডের আদেশ।

প্রহরী তাহার হাতে ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বলিল, 'চল'।

ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সহাস্য মুখে সে তাকাইয়া রহিল উৎপলার দিকে। উৎপলার দুই চোখে তখন অশ্রুর ধারা।

গৃহে ফিরিয়া তোরমাণের মর্ম্মরমূর্ত্তিটির দিকে উৎপলা একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হাতুড়ি ও বাটালি লইয়া সে সেইদিকে আগাইয়া গেল। মূর্ত্তির নীচে লেখা ছিল—'নরকের দানব।' লেখাটি কাটিয়া উৎপলা লিখিল—'স্বর্গের দেবতা।'

তাহার পর সব শেষ!

সকরুণ এই জীবন-নাট্যের উপর বহু শতাব্দীর যবনিকা পাত হইয়া গেছে। মূর্ত্তি দুইটি মাটির নীচে কোথায় যে হারাইয়া গিয়াছিল কেহ তাহার সংবাদ রাখিত না।

চাকর আসিয়া বলিল, 'আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।'

রাখাল দাস বাবু উঠিয়া বসিলেন।

যায় তাহার নাম "স্মৃতি"। ভারতীয় ঋষিদিগের কথানুসারে মানুষের গুণ ও কার্য্যক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, তাহার প্রত্যেকটীর আধিক্য এবং অল্পতা নিন্দনীয়। মানুষ এমন কোন কার্য্য করে না অথবা এমন কোন গুণসম্পন্ন হয় না, যাহা তাহার প্রয়োজনীয় নহে। অথচ ঐ গুণ ও কার্য্যক্ষমতার প্রত্যেকটীর আধিক্য ও অল্পতা মানুষের দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব করিয়া থাকে, কাযেই যাহাতে ঐ আধিক্য ও অল্পতা সংঘটিত না হইয়া যথাযথতার উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি তাঁহাদের ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে, মানুষ একবার চুরি করিলে অথবা মিথ্যা কথা কহিলে অথবা অন্য কোন নিন্দনীয় কার্য্য করিলে, আর যাহাতে তাহার ঐ জাতীয় নিন্দনীয় কার্য্যের প্রবৃত্তির উদ্ভব না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা। তাঁহাদের ব্যবস্থা যে সুফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বর্ত্তমান আইন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব না, কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ঐ আইন-বিজ্ঞান অনুসারে রাজ্যের শাসন পরিচালিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা জনসমাজের পক্ষে অপকারী এবং গর্হিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বর্ত্তমান কালে একজন চোর বারংবার চুরি করিয়া বহুবার জেলে প্রেরিত হয় এবং গ্রীকদিগের সময় হইতে কোন রাজ্য ৬০০ বৎসরের অধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে পারে নাই— ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে বর্ত্তমান আইন-বিজ্ঞানেরও বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিবার মত যে বহু বিষয় আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সংখ্যায় "বিজ্ঞানের সংজ্ঞা", "বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়", "বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য", "বিজ্ঞানের স্বরূপ", "অর্থ ও ধন-বিজ্ঞান" এবং "আইন বিজ্ঞান" সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের যথাযথ কোন সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হয় নাই, কোন বস্তুর বাস্তবতা কি করিয়া যথাযথ ভাবে দেখিতে হয়, তাহার উপায় স্থির করা হয় নাই, কি উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের কোন প্রকৃত অর্থ-বিজ্ঞান নাই এবং আইন-বিজ্ঞানেরও বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যে যে আবিষ্কার মানুষের ব্যবহারে প্রচলিত হইয়াছে, সেইগুলি আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মনোরম হইলেও তাহার প্রত্যেকটী যে আমাদের অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু সংঘটিত করিতেছে, তাহাও আমরা গত সংখ্যার "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক"-শীর্ষক প্রবন্ধের ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮ এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া "বর্ত্তমান তথা-কথিত বিজ্ঞানই মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান সমস্ত দুঃখের কারণ" এই জাতীয় উপসংহারে যদি আমরা এখন উপনীত হই, তাহা হইলে কি আমাদিগের পাঠকগণ আমাদিগকে "পাগল" মনে করিয়া উড়াইয়া দিবেন?

যদি আর একবার বলি যে, বর্ত্তমানে কোন প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক নাই, আছে কেবল কতকগুলি বিভ্রান্তিকর অভিনয়, তাহা হইলে কি আমাদের চিন্তাশীল পাঠকদিগের কাছে আমরা উপহাসাস্পদ হইব?

এই সংখ্যায় এই প্রবন্ধের লেখকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, তিনি একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দোকানদার এবং তাঁহাকে মিস্ত্রীর অথবা কুলির সর্দ্দারও বলা যাইতে পারে। কিন্তু একজন মূর্খের লেখনীর সহায়তায় দেবোপম ঋষিগণের কথা বাহির হইতেছে বলিয়া আপনারা ঐ ঋষিগণের কথার উপর তাচ্ছীল্য দেখাইবেন না—ইহাই আমার অনুরোধ।

বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহা সত্য হইলেও, কতকগুলি প্রয়োগ (practices) যে আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কোন প্রয়োগের (practices) মূলে কোন বিজ্ঞান না থাকিলে এবং মানুষের ব্যবহারে তাহাদের প্রচলন হইলে, সেইগুলি হইতে মানুষের জীবনযাত্রায় জটিলতার উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে হইতেছেও তাহাই। প্রকৃত বিজ্ঞানের জ্ঞানহীন প্রয়োগকে আমরা প্রচলিত ভাষায় "কারিকরী" (crafts-manship) বলিয়া থাকি এবং যাহারা কারিকরী (crafts-manship) করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যসমাজে কারিকর (craftsmen) বলা হয়। তদনুসারে বর্ত্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে ঐ প্রয়োগগুলি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা নিজদিগকে

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করিলেও শব্দ-শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগকে "পণ্ডিত" বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মনুষ্য-সমাজ তাঁহাদিগকে অহিতকারী "কারিকর" বলিতে বাধ্য।

জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে সমস্ত ডি. এস. সি. এম. এস. সি. পি. এইচ. ডি. প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা মোটা বেতনে পরীক্ষাগারেই জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে 'কারিকর' (craftsman) পর্য্যন্ত বলা যায় না। এই মানুষগুলি প্রায়শঃই অর্থহীন পরিভাষার (terminology) সৃষ্টি করিয়া জনসমাজকে বিভ্রান্ত করিতেছেন এবং আমাদের 'উজ্জ্বল' যুবক ও যুবতীদিগের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অন্ধকারাবৃত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাঁদের চাল-চলন ও চরিত্র প্রায়শঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইঁহাদিগকে মনুষ্য হিসাবেও অস্বাভাবিক একটা কিছু বলিতে হয়। ইঁহাদিগকে কি নামে অভিহিত করিব, আমি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইঁহাদের নামকরণের ভার আমাদের পাঠকদিগের উপর থাকিল।

বৈজ্ঞানিক পাঠকদিগকে মনে রাখিতে হইবে, আমি কাহারও উপর কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করিয়া কিছুই লিখিতেছি না। মনুষ্যজাতির আসন্ন সঙ্কটকালে তাহার কারণ যাহা মনে হইয়াছে এবং এই সঙ্কট যাঁহারা ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের স্বরূপ সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করিবার জন্য যাহা বলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই বলিয়া যাইতেছি।

ডি. এস. সি প্রভৃতি উপাধিধারী পাঠকগণ, আপনারা উত্তেজিত না হইয়া একবার ভাবিয়া দেখুন যে, আপনারা প্রায়শঃ মনুষ্যসমাজের অথবা আপনাদের নিজেদের কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন? আপনাদের মধ্যে যদি কাহারও বিশ্ব-বিদ্যালয়প্রভৃতির দেওয়া চাকুরিটী ছাড়িয়া দিয়া লোকহিতকর কার্য্যের দ্বারা স্বাধীনভাবে আপনাদের পরিবারবর্গের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য আপনাদের মধ্যে কয়জনের আছে? যে বিদ্যার দ্বারা স্বাবলম্বনে নিজ পরিবারবর্গের জীবিকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য লাভ করা যায় না, সেই বিদ্যার অভিমান করিবার অথবা তাহাকে "বিদ্যা" বলিয়া অভিহিত করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? আপনাদের বিভ্রান্তির (mistake) জন্য আপনারা দায়ী নহেন তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের জনসমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল-রত্নগুলিকে বিভ্রান্ত করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কি? আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ, তাঁহাদের কি একবার সক্রেটিসের মত উচ্চৈঃস্বরে বলা উচিত নয় যে, "ভাই ও ভগ্নীরা, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নহে, তোমরা তাহাও বুঝিতে পার নাই। আর তোমরা কেহ এই বিদ্যা লাভ করিতে আসিও না।" মনুষ্যসমাজের আসন্ন বিপদের মাত্রা কি আপনাদের মধ্যে একজনও চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া তারস্বরে উপরোক্ত কথা কয়টী বলিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন না?

প্রকৃত বিজ্ঞানের বিদ্যা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধীয় আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানে যাহা বিজ্ঞান বলিয়া চলিতেছে, তাহা বিনাশকর হইলেও এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা অজ্ঞান হইলেও একদিনেই তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে ও একদিনের মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করাও সঙ্গত নহে। আবার একদিনের মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া একেবারেই তাহার পরিবর্ত্তন না করিবার চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন 'বিরেচক' (drastic) চেষ্টা না করিয়া আস্তে আস্তে অতর্কিতভাবে যাহাতে পরিবর্ত্তন হয় তাহার চেষ্টা হওয়া সঙ্গত। বিজ্ঞানের বিদ্যার্থী যুবকদিগকে বিজ্ঞানের কোন বর্ত্তমান গ্রন্থ না পড়াইয়া—"বিজ্ঞান কাহাকে বলে," "বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি," "বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি" ইত্যাদি যাহাতে তাঁহারা জানিতে পারেন এবং উপরোক্ত উপায়গুলি যাহাতে তাঁহারা কার্য্যতঃ অভ্যাস করেন ও ক্রমশঃ যাহাতে প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান তথাকথিত উচ্চ উপাধিধারী বৈজ্ঞানিকগণের ভ্রান্তির জন্য তাঁহারা নিজেরা দায়ী নহেন। কাযেই যাহাতে তাঁহারা জনসমাজে কোনরূপ তাচ্ছীল্যের সহিত ব্যবহৃত না হন, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্ত্তমান উচ্চ-উপাধিধারী বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা দাম্ভিক অথবা স্বীয় বিদ্যার অভিমানী, ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে অসংযত, তাঁহারা

যাহাতে জনসমাজে অথবা গভর্ণমেণ্টের চোখে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র না হন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ অনুপযুক্ত (unworthy) লোক সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইলে উপযুক্ত (worthy) লোকের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয় না। নিজদিগকে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রবৃত্তির নাম "দম্ভ," ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

"ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়"—এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কি তাহা জানিবার জন্য অনেকে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া আমার কাণে আসিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমার যাহা যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

১। জগতের সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরতা অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য এখন আর কোথায়ও কৃষি করিয়া কৃষক লাভবান হন না এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন।

২। লাভজনক কৃষিকার্য্য করা অসম্ভব হইয়াছে এবং তাহার জন্য কৃষকগণ শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র বেকারের উদ্ভব হইয়াছে এবং উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোক আপন আপন জীবনযাত্রায় অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৩। কৃষিকার্য্য হইতে মানুষের খাদ্য—ধান্য, গমাদির এবং বস্ত্রের উপাদান—তুলার উৎপত্তি হয়। কৃষিকার্য্য না হইলে মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিবার আশঙ্কা হয় এবং সমাজে শিল্প ও বাণিজ্য-পরিচালনার অসুবিধা ঘটে। কাযেই কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইলে মানুষের জীবন ধারণ করাও অসম্ভব হইতে পারে।

৪। বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরতা যে দ্রুত গতিতে কমিয়া যাইতেছে, তাহা অনতিবিলম্বে রুদ্ধ করিতে না পারিলে আগামী ৮।১০ বৎসরের ভিতর মানুষের জীবন ধারণ করা আরও কষ্টকর হইয়া পড়িবে এবং সর্ব্বত্র মানুষের অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু আরও বাড়িয়া যাইবে।

৫। সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরতা হ্রাস পাইবার এবং মানুষের অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ, বর্ত্তমান সভ্যতা ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান।

৬। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতির ব্যবহার লইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে। ভারতীয় ঋষির কথানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য 'মৃত্তিকা'র 'তেজ' ও 'রসে'র বৃদ্ধি ও রক্ষা সাধিত করে এবং লৌহ তাহার 'উৎপাদনের ইচ্ছা'র উদ্ভব করে। ভারতীয় ঋষির কথা যে সত্য, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণ মৃত্তিকার সহিত অতি সামান্য মাত্রায় একটু একটু স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দুই বৎসর রক্ষা করিলে এবং ঐ মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি রক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতীয় ঋষির কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে খনিজ পদার্থের উত্তোলন করিলে জমীর উর্ব্বরতা হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য এবং বর্ত্তমান সভ্যতাকে তাহার জন্য দায়ী করা যায়।

৭। মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য শীতল বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়—ইহাও ভারতীয় ঋষির কথা। শীতল বায়ুতে যে মানুষের শরীর ভাল থাকে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আরম্ভ হইয়াছে প্রধানতঃ বাষ্প, বিদ্যুৎ, রেডিয়ম প্রভৃতি "তেজ" পদার্থের ব্যবহার লইয়া এবং তাহাতে যে বায়ুর উষ্ণতা সাধিত হয়, তাহাও অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মানুষের অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু যে ক্রমশঃই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাও আমরা আমাদের নিজ নিজ পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনের স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর বয়স লক্ষ্য করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কাযেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে মানুষের অস্বাস্থ্যের এবং অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করা যাইতে পারে।

৮। শিল্পজ ও কৃত্রিম সার (manure) দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা যায় এবং তাহার দ্বারা যে সমস্ত শস্য ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সুন্দর হয়—ইহা সত্য। কিন্তু জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃত্রিম সার ব্যবহার করিতে হইলে কৃষিকার্য্যে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা সঙ্কুলান করিয়া কৃষক লাভবান হইতে পারেন না এবং উহা হইতে যে সমস্ত শস্য ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকর ত নহেই, পরন্তু অস্বাস্থ্যকর। এই কথা যে সত্য তাহা কৃত্রিম সার হইতে উৎপন্ন ফল ব্যবহার করিলে গরীবের কি অবস্থা হয় উহা একটু সজাগ হইয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। "বিশ্বা-

মিত্রের সৃষ্টি" বলিয়া কোন কোন তরকারী, ফল ও শস্য মানুষের অব্যবহার্য্য, এই জাতীয় একটা প্রবাদ যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহার মূলে "কৃত্রিম সার"—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

৯। বর্ত্তমান জল-সিঞ্চন-(irrigation)-প্রণালী জমীর উর্ব্বরতা স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি করিবার উপযোগী নহে। তাহাতে কয়েক বৎসর জমীর 'রস' একটু বৃদ্ধি করে এবং প্রারম্ভে ফসলও কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় তাহা সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। ঐ প্রণালী অনুসারে জল একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে কয়েক বৎসর পরে একটা বাষ্পের উদ্গম হইতে থাকে। তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ক্রমশঃ মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং ঐ স্থান-সমূহের শস্যও মানুষের অস্বাস্থ্যকর হয়। আমাদের কথা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে, তাহা কোন গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া যে যে স্থানে দশ বৎসরের অধিক কাল বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বিচারশীল বুদ্ধি লইয়া অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়।

১০। জমী কর্ষণ করিবার জন্য বাষ্পচালিত লাঙ্গল (tractor) ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাতে জমী অত্যধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাহার উর্ব্বরতা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা ঘটে। জমীর কর্ষণে বাষ্পচালিত লাঙ্গল ব্যবহৃত হইলে সমাজে "বেকার" লোকের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য।

১১। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং কৃষিকার্য্যকে লাভবান্ করিবার জন্য যে যে উপদেশ আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে দূরদর্শিতার অভাব আছে এবং তাহারই ফলে আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে "বেকারে"র সংখ্যা এবং হাহাকারের মাত্রা আমাদের ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

১২। জমীর উর্ব্বরতা এবং মানুষ প্রভৃতি সমস্ত চর ও অচর জীবের স্বাস্থ্যের উন্নতি কি করিয়া সাধিত করিতে হয় এবং তাহার রক্ষার উপায়ই বা কি, তাহা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ সম্যক্‌ভাবে জানিতেন এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বেদ, দর্শন ও পুরাণাদি গ্রন্থে। যে ভাষায় এই গ্রন্থগুলি লিখিত তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা এবং তাহা জগতের মানুষ বহুদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

১৩। আমাদের ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এখন যাহাকে সংস্কৃত ভাষা বলেন, তাহা ভারতীয় ঋষির উপরোক্ত সংস্কৃত ভাষা নহে। তাহারই জন্য এখন আর কোন ভারতীয় পণ্ডিত বেদ ও দর্শনের মূলমন্ত্র এবং সূত্র পড়িয়া তাহা যথাযথ বুঝিতে পারেন না এবং ভাষ্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হন। যে যে "ভাষ্য" বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহাদের প্রণেতৃগণকে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ দেবতাবোধে বহুদিন হইতে পূজা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই ভারতীয় ঋষির উপরোক্ত সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণভাবে জানিতেন না—ইহাও মনে করিবার কারণ আছে। তাহারই জন্য বাস্তব-দর্শন (observation) এবং বেদ (knowledge) বাস্তবতা-শূন্য কাল্পনিক মেটাফিজিক্‌স্ (metaphysics) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৪। জমীর উর্ব্বরতার স্থায়ীভাবে উন্নতি বিধান করিয়া মনুষ্যজাতিকে আশঙ্কিত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, প্রথমতঃ যে ভাষায় ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শনাদি লিখিত তাহার পুনরুদ্ধার করা, দ্বিতীয়তঃ বেদ ও দর্শনাদি গ্রন্থগুলিকে যথাযথ অর্থে প্রচারিত করা, তৃতীয়তঃ ভারতীয় ঋষিগণ যে যে উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা। এই তিনটী উপায় কার্য্যকরী করা বহু সময়-সাপেক্ষ।

অথচ জগতের সর্ব্বত্র প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে খারাপ হইয়া আসিতেছে এবং ৮৷১০ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের জীবনধারণ করা অসম্ভব হইবার আশঙ্কা আছে। কাযেই কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করিবার একমাত্র উপায়—ভারতীয় ঋষির বিদ্যার পুনরুদ্ধার করা যুক্তি-যুক্ত হইলেও, আগত সার্ব্বজনীন বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইলে, অস্থায়ীভাবে কতকগুলি উপায় এখনই অবলম্বন করিতে হইবে।

১৫। অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে তাহার সংখ্যা বহু এবং তাহার সমস্ত সর্ব্ব-সাধারণের ভিতর প্রকাশিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এমন বহু উপায়

আছে, যাহা একমাত্র রাজপুরুষদিগের প্রণিধানযোগ্য এবং জগতের বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে জটিলতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেক মানুষের অহিত সাধন করিতে পারে।

১৬। আগত সার্ব্বজনীন বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইলে, অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটী :—

(১) আকস্মিক বিপদে ক্ষিপ্ত হইয়া কোন মানুষ যাহাতে কোন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু, "বেকার" এবং জগদ্ব্যাপী হাহাকারের কারণ, ইহা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য হইলেও যাহাতে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া একদিনের মধ্যেই তাহার ধ্বংস সাধন করিতে না চাহে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা।

(৩) জগতের সর্ব্বত্র যাহাতে নদীগুলির উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত পঙ্কোদ্ধার হয় অর্থাৎ নদীর গভীরতা যাহাতে বাড়িয়া যায়, তাহার যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা করা।

১৭। ১৪, ১৫ ও ১৬ দফায় যে সমস্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী উপায়ের কথা লিখিত হইল, তাহা ভারতবর্ষে কার্য্যকরী করিতে হইলে অসহযোগ অথবা স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বুদ্ধিমান লোকগণকে সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৮। "স্বাধীনতা"-র কোন আন্দোলন না চালাইয়া "জমীর উর্ব্বরতাবৃদ্ধি" ও "কৃষকের অন্নসংস্থান" ভারতীয় কংগ্রেসের মূলমন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বাধীনতার অথবা অসহযোগের কোন আন্দোলন চালাইলে ইংরাজদিগের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং তাহাতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। দেশের জনসাধারণ মিলিত না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হইলে, দেশের কোনরূপ স্বাধীনতা কার্য্যতঃ লাভ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। অন্যদিকে ইংরাজদিগের সহিত মিলনের আন্তরিক ইচ্ছা ন্যায় রাখিয়া জমীর উর্ব্বরতাবৃদ্ধির অথবা কৃষকের অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিলে, সমস্ত জনসাধারণের মিলন সংঘটিত হইয়া একটি প্রকৃত জাতি গড়িয়া উঠিবার আশা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

১৯। মানুষের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিবার জন্য ঋষিদিগের বিবিধ বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে বর্ত্তমানে যাহা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নহে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে।

অথচ যাঁহারা প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার (?) সহায়তায় নিজ নিজ জীবিকার অর্জ্জন করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীশিক্ষিত সংস্কৃতাধ্যাপকগণের জীবনযাত্রায় কোনরূপ অসুবিধা যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২০। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার সংস্কার করিতে হইবে। দ্রুতগতিতে তাহা হওয়া সম্ভব নহে, কারণ বর্ত্তমান জগৎ প্রকৃত শিক্ষা কি তাহার সংজ্ঞা অথবা উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত নহে। যাহাতে দেশের প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মাতৃভাষা এবং আদালতের ব্যবহার্য্য ভাষা শৃঙ্খলিত ভাবে বুঝিতে ও প্রকাশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করাই শিক্ষা-বিভাগের এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাহা যাহা শেখান হয়, তাহা আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

২১। সংস্কৃতাধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহারা বিন্দুমাত্রও দাম্ভিক অথবা ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে অসংযত অথবা চাটুকারিতা-প্রিয়, তাঁহারা যাহাতে গভর্ণমেণ্টের অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে কোনরূপ সম্মান অথবা শ্রদ্ধা না পান, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা দাম্ভিক অথবা অসংযত ভাবে ইন্দ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকেন অথবা চাটুকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া অনুপযুক্ত লোকের পৃষ্ঠপোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপর জনসাধারণের কোনরূপ শ্রদ্ধা থাকিলে ঋষিদিগের বিদ্যার

সংস্কারকল্পে উপযুক্ত (worthy) লোকের উদ্ভব হইতে পারে না।

২২। অন্যান্য বিষয়ের স্কুল ও কলেজের অধ্যাপকগণের দাম্ভিকতা, ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের অসংযততা, চাটুকারপ্রিয়তা আংশিকভাবে মার্জ্জনীয় হইলেও তাহা যে ছাত্রের প্রকৃত শিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী, ইহা তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার জন্য ঐ শ্রেণীর অপরাধের গুরুত্বানুসারে যাহাতে ক্রমাবদ্ধ শাস্তি সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

২৩। দাম্ভিক, ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে অসংযত এবং চাটুকারিতাপ্রিয় লোক অশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কার্য্যক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যাহাতে কোন বিদ্যামন্দিরের কোনরূপ পরিচালনার ভার না পান, তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা। [ক্রমশঃ

সন্ধ্যাবিধবা

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

পূরবে নিবেছে আলো,
পশ্চিমে নিবিছে আলো,
মেঘে-মেঘে ফুটিছে না তারা।
বাদুড় ছেড়েছে বাসা,
কাকেরা পেয়েছে বাসা,
হ'য়েছে দিনের কাজ সারা।
মলিনা বিধবা সন্ধ্যা
জ্বালিল না শুভ-সন্ধ্যা,
শূন্যপানে চাহে একাকিনী।
নিঃশব্দ গগন ভ'রে,
নিস্পন্দ নয়ন ভ'রে,
নেমে আসে কালো নিশীথিনী।
কোথাও উঠেছে চাঁদ ?
আজ উঠিবে না চাঁদ ;
ঘরে ঘরে কাঁপে দীপশিখা।
প্রান্তরের পরপারে,—
অন্তরের মরুপারে ?—
মিলা'ল আলেয়া-মরীচিকা।

কুটীরে বাজিল শঙ্খ,
মিছে পিছু-ডাকে শঙ্খ,—
সে চলে অসীম শূন্য বেয়ে।
করে নি সে সন্ধ্যাসাজ ?
বিধবার সন্ধ্যাসাজ !
নিদ্রাময় রাত্রি আসে ছেয়ে।
প্রাতে উঠেছিল রবি ;
সায়াহ্নে ডুবিল রবি ?
কাল সে উদিবে পুনরায়।
আজ উঠে নাই চাঁদ ?
আবার উঠিবে চাঁদ।—
এ সবে তার কি আসে যায় ?
অত্যাসন্ন অন্ধকারে,
ভাদ্র-অমা-অন্ধকারে,
এ সন্ধ্যা ডুবিছে যারে চেয়ে,
অনন্ত দেশে ও কালে,
সন্ধান কি কোন কালে
পাবে তার বিধবা ও মেয়ে ?
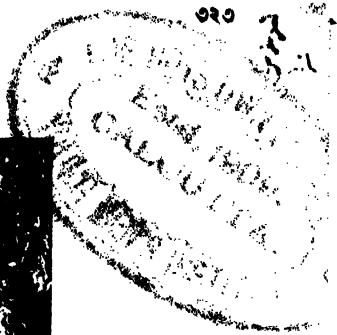
নৈনীতাল।

উত্তর-ভারত ভ্রমণে যে শিক্ষালাভ হয়, বিদ্যায়তনে তাহার সামান্য অংশও হয় না। ভ্রমণের সহায়তায় আমরা দেশের যে ইতিহাসের পরিচয় পাই, স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস-পুস্তকে তাহার সন্ধান মিলিবে না। —রমেশচন্দ্র দত্ত

দুর্গা-স্তোত্রম্

(যুধিষ্ঠির-কৃতম্)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

[১]

নমস্তে পরমেশানি ব্রহ্মরূপ সনাতনী।
সুরাসুরজগদ্বন্দ্যা কামরূপনিবাসিনী॥
তুমিই পরমেশ্বরী এই ত্রিভুবনে,
তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, বলে সর্ব্বজনে।
কিবা ভূত, ভবিষ্যৎ, কিবা বর্ত্তমান,
সকল কালেই মা গো! তুমি বিদ্যমান।
কিবা দেব, কিবা দৈত্য, কিবা জীবগণ,
সবাই বন্দনা করে তোমারি চরণ।
কামরূপে নিত্য মা গো! তোমার বিহার,
নমস্কার নমস্কার চরণে তোমার।

[২]

মাতঃ প্রভাবং জানন্তি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
প্রসীদ জগতামাদ্যে কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-আদি শ্রেষ্ঠ দেবগণে
তোমার অসীম শক্তি বুঝিয়াছে মনে।
সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই ত্রিসংসার,
কেবল তুমিই মা গো! করিতে বিহার।
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন রহ অনিবার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৩]

ত্বং বীজং সর্ব্বভূতানাং ত্বং বুদ্ধিশ্চেতসা ধৃতিঃ।
ত্বং প্রবোধশ্চ নিদ্রা চ কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
সমস্ত জীবের মা গো! তুমিই কারণ,
তুমি বুদ্ধি, তুমি ধৈর্য্য, তুমিই চেতন।
নিদ্রা আর জাগরণ স্বরূপ তোমার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৪]

ত্বামারাধ্য মহেশোঽপি কৃতকৃত্যঞ্চ মন্যতে।
আত্মানং পরমাত্মা চ কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
স্বয়ং পরম ব্রহ্ম দেব দিগম্বর,
কেবল তোমারি ধ্যান করি নিরন্তর।
কৃতার্থ হইনু, ইহা করেন বিচার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৫]

দুর্বৃত্তবৃত্রসংহন্ত্রি পাপপুণ্যফলপ্রদে।
লোকানাং পাপসংহন্ত্রি কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে
অতি দুষ্ট বৃত্রাসুরে ক'রেছ নিধন,
পাপ-পুণ্য-ফল তুমি কর বিতরণ।
মানবের পাপ-রাশি করহ সংহার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৬]

ত্বমেকা সর্ব্বভূতানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
করালবদনে কালি কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
এ সংসারে রহে মা গো! যত প্রাণি-চয়,
সবারি করহ তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
করাল-বদনা কালী তুমি অনিবার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৭]

প্রপন্নার্ত্তিহরে মাতঃ সুপ্রসন্নমুখাম্বুজে।
প্রসীদ পরমে পূর্ণে কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
বিপন্ন হইয়া মা গো! পড়ে যেই জন,
তুমিই বিপদ তার করহ খণ্ডন।
পরম প্রসন্ন তব বদন-কমল,
তুমিই পরমা পূর্ণা শক্তি অবিরল।
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন থাক অনিবার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৮]

ত্বামাশ্রয়ন্তি যে ভক্ত্যা যান্তি তে পরমং পদম্।
জগতাং ত্রিজগদ্ধাত্রি কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে।
ভক্তিভরে লয় যারা তোমার আশ্রয়,
তাহারা পরম পদ পায় সুনিশ্চয়।
তুমিই ধরিয়া আছ এই ত্রিসংসার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

[৯]

শুদ্ধজ্ঞানময়ী পূর্ণা প্রকৃতেঃ সৃষ্টিকারিণী।
ত্বমেব মাতর্বিশ্বেশী কামেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
তুমিই বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ী ত্রিভুবনে,
তুমিই মা পূর্ণা শক্তি,—বলে সর্ব্বজনে।
প্রকৃতি নামেতে নিত্য নির্দ্দেশ যাহার,
তুমি তার সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া প্রচার।
বিশ্বেশ্বরী নামে খ্যাত তুমি অনিবার,
ও মা কামেশ্বরি! তব পদে নমস্কার।

বাগিন্দ্রিয়ের এবং 'শব্দ' তাহার প্রথম কর্ম্ম। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই রক্ত, মাংস এবং অস্থির ক্রিয়া আরম্ভ হয় না এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ত, মাংস এবং অস্থি বজায় থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের বিকাশ অটুট থাকে না; মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বেই তাহাদের বিকাশ বিনষ্ট হইয়া যায়। শিশুর ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির উদ্ভব হয় তাহার 'শব্দ'-স্ফুরণের পর এবং তাহাদের বিলোপ হয় মৃত্যুর অনেক আগে। মৃত্যুর অনেক আগেই ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়ের স্ফুরণ অর্থাৎ কথা বন্ধ হইয়া যায় বটে, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াশীলতার প্রকাশক 'শব্দ' অনুভব করা যায়। যে মুহূর্ত্তে মানুষের শব্দ বন্ধ হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যু হয়। মানুষের অভ্যন্তরে শব্দের বিকাশে—তাহার জীবনীশক্তির প্রারম্ভ এবং এই শব্দের বিলোপে—তাহার বিনাশ। কাজেই 'শব্দ'কেই মানুষের একমাত্র 'নিত্যসঙ্গী' বলা হইতে পারে।

মানুষের অভ্যন্তরে শব্দের ক্রিয়া প্রকট হইলে মানুষ ক্রমশঃ শব্দের বাহির, অন্তর, আদি এবং তাহার আদির আদিকে বুঝিতে সমর্থ হয়। ইহারই নাম 'শব্দ-বিজ্ঞান' অথবা শব্দের 'স্বরূপ-জ্ঞান'। কোন মানুষেরই শব্দের পূর্ণ 'স্বরূপ-জ্ঞান' বিশেষ সাধনা ব্যতীত লাভ হয় না।

মানুষের অভ্যন্তরে শব্দের ক্রিয়া প্রকট হইলে মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম তাহার প্রত্যেক বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করে, সেই দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্য ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইল কেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তখন প্রথমতঃ, মানুষ তাহার আভ্যন্তরীণ কোন্ অঙ্গের কোন্ অবস্থার সহিত তাহার প্রকাশিত কোন্ শব্দ কিরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তাহার অনুসন্ধান পায়। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিভিন্ন মনোভাবের এবং বিভিন্ন শব্দের উদ্ভব হইতেছে তাহার উপলব্ধি হয়। তৃতীয়তঃ, কেন আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার অনুভূতি জন্মে। চতুর্থতঃ, যাহার জন্য আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গ বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার উদ্ভব হয় কোথায়, তাহার জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মে। এই চারিটী অবস্থার প্রত্যেকটীতে মানুষের বিভিন্ন ক্ষমতার উদ্ভব হয় এবং যিনি একে একে চারিটী অবস্থাতেই উপনীত হইতে পারেন, তিনি অপরিসীম শক্তিশালী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার অজ্ঞাত কিছু থাকে না।

প্রথম অবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম শব্দের 'বাহির' জানা; দ্বিতীয় অবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম শব্দের 'অন্তর', তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম শব্দের 'আদি' এবং চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম শব্দের 'আদির আদিকে' জানা। যাঁহারা শব্দের 'বাহির' পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত, তাঁহাদের অভ্যন্তরে শব্দের কোন ক্রিয়া প্রকট হয় নাই বুঝিতে হইবে। শব্দের 'বাহির' পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানুষ যে যে বস্তুর অথবা যে যে অবস্থার সংস্রবে আসে, তাহার 'বাহির' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে পারে এবং ঐ 'বাহির' বস্তুর অন্তরের সহিত কিরূপে কোথায় সংশ্লিষ্ট তাহাও বুঝিতে পারে। শব্দের 'বাহির' জানিয়া যিনি কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার বক্তৃতা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয় এবং তাহার বর্ণনা হইতে ঐ বস্তু ও তাহার অবস্থার বাহির ও অন্তর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সুস্পষ্ট ভাবে শ্রোতার মনে অঙ্কিত হয়। আভ্যন্তরীণ কোন্ অঙ্গের কোন্ অবস্থার সহিত মানুষের কোন্ শব্দ কিরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহা অনুভব করিয়া কোন বস্তুর অথবা অবস্থার বর্ণনা আরম্ভ করিলে ঐ বর্ণনায় শব্দ আপনা হইতেই এই রূপ ভাবে বিন্যস্ত হয় যে, শুনিবা মাত্র শ্রোতা সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার মন বর্ণিত বস্তুর ও অবস্থার কারণ ও পরিণতি জানিবার জন্য ঔৎসুক্য অনুভব করে।

যিনি তাঁহার আভ্যন্তরীণ কোন্ অঙ্গের কোন্ অবস্থার সহিত তাঁহার কোন শব্দ কিরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহা অনুভব করিয়া কথঞ্চিৎ শব্দ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নাম 'কবি'। প্রকৃত কবির নিজ যোগ্যতায়, লেখায় এবং শব্দ ও বর্ণবিন্যাসে বৈশিষ্ট্য থাকে।

তাঁহার নিজ যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য দুইটি, যথা:—

(১) প্রকাশিত প্রত্যেক শব্দের সহিত স্বীয় অন্তরঙ্গের সম্বন্ধের কায়িক অনুভূতি;

(২) যে শব্দ যে অর্থে প্রকাশিত হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ কেন প্রকাশিত হইবে তাহার আংশিক জ্ঞান।

তাঁহার লেখা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। প্রকৃত কবি যে বস্তু অথবা অবস্থা বর্ণনা করেন, পাঠকের মনে ঐ বস্তুর অথবা

সংস্কৃতজ্ঞগণ যাহা দর্শন এবং বেদ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা অপভ্রংশ এবং অবোধ্য কতকগুলি কথার ঝুড়িমাত্রে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শঃ ব্যবহার করা যায় না এবং ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলেও সাংসারিক জীবনে বিপন্ন হইতে হয়। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার এই অজ্ঞতার জন্যই নানা মুনি নানা মতের বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন এবং আধুনিক সংস্কৃতগ্রন্থগুলি 'দুষ্ট' ও 'অপ' শব্দের ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দের প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া শব্দ-বিজ্ঞান ও বাক্য-বিজ্ঞান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে না পারিলে কোন্‌টী 'দুষ্ট' এবং কোন্‌টী 'অপ' শব্দ তাহা সঠিক বুঝা যায় না। 'দুষ্ট'-শব্দের উদ্ভব হয় বহু কারণে। 'শব্দ' কি হইলে দুষ্ট হয় তাহা মোটামুটি বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হয় যে, মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞানে সামঞ্জস্য আছে। যে মানুষ যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার জ্ঞান অথবা বস্তু সম্বন্ধে ধারণা বা প্রতীতি বা প্রত্যয় তদনুরূপ হইয়া থাকে। মানুষের গুণের তারতম্যানুসারে তাহার কর্ম্মের তারতম্য হইয়া থাকে। কাযেই মানুষের গুণ (qualification), কর্ম্ম (activities) এবং জ্ঞান (knowledge) ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

মানুষ তাহার কোন্ কার্য্যে কোন্ অবস্থায় উপনীত হয় অথবা কোন্ কার্য্য পরে কোন্ কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার 'প্রত্যয়' অথবা 'জ্ঞান' সংস্কৃত 'কৃদন্ত' প্রত্যয়গুলি হইতে লাভ করা যায়। প্রত্যেক কৃদন্ত প্রত্যয়ের পৃথক পৃথক অর্থ আছে। যে কার্য্যে যে প্রত্যয় অথবা জ্ঞান হওয়া সম্ভব অথবা স্বাভাবিক, সেই কার্য্যে অথবা 'ধাতু'তে সেই প্রত্যয় যোগ না করিয়া অন্য কোন প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ সঙ্কলন করিলে শব্দ 'দুষ্ট' হইয়া যায়। এইরূপে যে বস্তুর যে গুণ হইতে পারে না, সেই বস্তুতে সেই গুণপ্রকাশক কোন 'তদ্ধিত' প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ সঙ্কলন করিলেও শব্দ 'দুষ্ট' হইয়া যায়।

আমরা আগেই বলিয়াছি, 'সাহিত্য' শব্দটী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা আধুনিক শব্দ এবং ইহাকে 'দুষ্ট'-শব্দ বলিবার কারণ আছে।

'সাহিত্য' শব্দটী দুষ্টই হউক আর অদুষ্টই হউক, ভাষায় যখন ইহার প্রচলন আছে, তখন ইহার যথাযথ একটা সংজ্ঞা হওয়া বিধেয়।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা ইহার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এবং পাশ্চাত্য ভাষায় যাঁহারা ইহার প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা কি অর্থে ইহার ব্যবহার হইবে, তাহা যখন মিলিত হইয়া সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্থির করেন নাই, তখন ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ শব্দের কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে 'সাহিত্য' বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের নিকট হইতে প্রকাশ পায় তখন, যখন মানুষ তাহার 'নিত্যসঙ্গী'র ক্রিয়ায় প্রভাবান্বিত হয়। অথবা মানুষের যাহা 'নিত্যসঙ্গী' তাহার ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে প্রকট (predominant) হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় মানুষ যাহা প্রকাশ করে, তাহার নাম 'সাহিত্য'*।

'নিত্যসঙ্গী' বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্তু, যাহা মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া মানুষকে পশু অথবা অন্য কিছু না বলিয়া 'মানুষ' বলা হয়, তাহাদের ভিতর মানুষের 'শব্দই' একমাত্র বস্তু যাহা তাহার 'নিত্যসঙ্গী'। 'শব্দ' ছাড়া মানুষের আত্মাকেও আপাতদৃষ্টিতে তাহার 'নিত্য সঙ্গী' বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'আত্মা' কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না এবং মানুষ বলিতে মূলতঃ তাহার 'আত্মা'কেই বুঝায়। মানুষ আর মানুষের আত্মা একই অর্থ প্রকাশক। এই জন্যই মানুষের আত্মাকে তাহার 'নিত্য-সঙ্গী' না বলিয়া তাহার 'শব্দকে' নিত্যসঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত।

আর যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া মানুষকে মানুষ বলা হয়, তাহার মধ্যে দশটী ইন্দ্রিয়, রক্ত, মাংস এবং অস্থিসম্বলিত মানুষের অবয়ব, তাহার ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে কোনটীই তাহার 'শব্দের' মত 'নিত্যসঙ্গী' নহে। সদ্যোজাত শিশুর চেহারায় চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার সমস্তগুলি সদ্য সদ্য একসঙ্গে বিকশিত হয় না। শিশুর দশটী ইন্দ্রিয়ের ভিতর প্রথম স্ফুরণ হয় তাহার

* সাহিত্য = সহিত + ষ্য ; সহিত = সহ + ই + ক্ত।

অগত্যা ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গেই চলিল, তাহার ভয়ের কারণ বুঝিয়া এইবারে পান্নু মনে মনে একটু হাসিয়া দুই একটা কথা আরম্ভ করিল, তোর নাম কি রে?

—ভজুয়া, বাবুজি।

—ভজুয়া, চাকরী করবি?

—না বাবুজি, আমরা চাকরি করি না, চাকরি করলে বড্ড কথা শুনতে হয়, আমার বাপ দাদা কেউ চাকরি করে নি, এই কাজে আমরা বেশ আছি বাবু, ইচ্ছে হ'ল কাজ করলাম, ইচ্ছে না হ'ল না করলাম।

পান্নু অত্যন্ত খুশী হইয়া ছেলেটার পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

সম্মুখেই বাড়ীর গেটে দাঁড়াইয়া অধরবাবু চাকর-ঠাকুরদের লইয়া পান্নুর না আসায় এখন কি করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা-সভা জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, দ্বরোয়ান বলিতেছিল, আমি বলি কি সরকার মশাই, একবার জজ সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ করে আসি গে—

এমন সময়ে পান্নু আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বারপ্রান্তের সভা ভাঙ্গিয়া গেল। পান্নু পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া ভজুয়ার হাতে দিতে যাইতেই দ্বরোয়ান এবং অধরবাবু চীৎকার করিয়া আসিলেন। ভজুয়া প্রসারিত হাতখানি সভয়ে সরাইয়া লইল। পান্নু বিরক্ত হইয়া অধরবাবুর পানে তাকাইয়া কহিল, সরুন, ট্যাক্সিতে এলে আমার দু'টাকার চেয়েও বেশি লাগত, তা জানেন? ওরে ভজুয়া নে, নে, ভয় কি? মাঝে মাঝে এই দিকে আসিস্, বুঝলি?

ভজুয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া বাড়ীখানির পানে দুই একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল, মনে মনে বোধ হয় কহিল, বাবুজিটি ত গরীব নয়, এযে রাজা মহারাজা! মাথাটায় একটু গড়বড় আছে···'হোগা।'

[১৫]

বাড়ী পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ একটা অবসাদ আসিয়া পান্নুর দেহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং কোন কিছু মুখে না দিয়াই দ্বিতলে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষটিতে গিয়া শুইয়া পড়িল; তাহার পর—ঠিক ঘুমে নয়, কেমন একটা তন্দ্রার ঘোরে অথবা জাগ্রত স্বপ্নের আবেশে, সারাটি রাত তাহার কাটিয়া গেল।

মা—মীরার মা—তাহার মা—তাঁহার কথা সে মনে করিতেই পারে না, কি কষ্টে যে সে তাঁহার আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া আসিতে পারিয়াছে, তাহা সেই জানে, মায়ের কাছে তাহার এই অমানুষিক ব্যবহার কোন দিন কি ক্ষমাই হইবে? কে জানে!

ছেলেবেলায় মীরার প্রতি অত্যাচার পান্নালাল কোন দিন কিছু কম করে নাই। মীরাও লক্ষ্মী শান্ত মেয়েটির মত তাহা কেবল সহ্য করিয়াই চলে নাই, অত্যাচারের প্রতি অত্যাচার যথেষ্ট পরিমাণেই ফিরাইয়া দিত। কিন্তু পান্নুর যে অত্যাচারে কদাচারই থাকিত বেশি, আর মীরার ব্যবহারে থাকিত কেবল দুষ্টামী এবং রহস্য।

ইদানীং বড় হইয়া পান্নালাল আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত ও সংযত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু মীরার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন কোন দিন আসে নাই। তথাপি তাহার ব্যবহারে এমন একটা গভীর প্রাণের পরিচয় ফুটিয়া উঠিত যে, পান্নু তাহার পরিবর্ত্তন কখনো চাহিতও না। পরিবর্ত্তন চাহিত না সত্য, কিন্তু, কে জানে কেমন একটা কিসের যে তীব্র অভিমান কবে কোন্ দিন তাহার মনের অজ্ঞাতেই, তাহার মনের বুকে বীজ বপন করিয়াছিল, যাহা, তাহার স্নেহ ভালবাসা এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল বাড়িয়াই চলিতেছিল। মীরার কথা পান্নুর মনে হইত যেমন সকলের চেয়ে বেশী, তেমনই ঐ প্রিয় স্মৃতিটুকু অহর্নিশ অন্তরে তাহার খোঁচাও দিত সকল কিছুর চেয়েই বেশী।—

দুঃস্বপ্নের শেষে পান্নু জাগিয়া যখন বিছানায় উঠিয়া বসিল, প্রকৃতির ললাটে তখন রক্ত-চন্দন মাখিয়া দিয়া কোন্ এক অশরীরী শক্তি এক শুভ নবজীবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। মুগ্ধ পান্নু সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া রহিল।

কালরাত্রির অবসানে নূতন গৃহে নূতন অনুভূতিতে, এই যে নূতন দিন তাহার জন্ম লইতেছে, বিছানায় বসিয়া বসিয়াই, পান্নু একাগ্র চিত্তে আজ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। এই যে সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর আকাশ, প্রকৃতির এই সুন্দর সজ্জা, উদ্দাম মেঘের নির্লজ্জ অত্যাচারে এখনই হয়ত সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু কই, ধ্বংস ত হইয়া যায় না, নষ্ট হয়, ক্ষণিকের জন্য বিলীন হইয়া যায়, আবার আসিয়া দেখা দেয় এমনই হাসি মুখে, আশায় আনন্দে, এমনই উজ্জ্বল

রূপে। মানুষের জীবনও ধ্বংস হইবার নয়, দুঃখের নিশা কাটে, সুখের প্রভাতে আবার ফুল ফোটে। পাখী গান গায়, আশার আলোয় দিন উজ্জ্বলতম হয়। সকল মানুষেরই হয়, পানুরও হইবে।—হইবে সত্য, কিন্তু বামনের চাঁদ ধরার মত তাহার কল্পনার তুলি আশার যে রঙ্গীন ছবি আঁকিয়াছিল—সে আশা? সে স্বপ্ন? পানুর বুকের ভিতরটা আবার একটু অশান্ত হইয়া উঠিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া ও পাশের ছোট বারান্দাটায় গিয়া পানু হাত দুটি দৃঢ়ভাবে বুকে বদ্ধ করিয়া চঞ্চল পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কখন এক সময় শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, পূর্ব্ব দিগন্তের সেই রক্ত-চন্দনের প্রলেপটুকু মুছিয়া গিয়া, বিশ্বব্যাপী এক অনাবৃত আলোকের মাঝখানে অম্লান অখণ্ড একটি সিন্দুরবিন্দু প্রকৃতির কপালে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে একই অবস্থাতে কোথাও কিছু স্থির হইয়া থাকে না, বিশ্বপ্রকৃতির চন্দ্র সূর্য্য তারা হইতে, জীব জন্তু উদ্ভিদ বা মানুষ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সকল কিছুরই পরিবর্ত্তন চলিয়াছে—কাহারও ধীরে, কাহারও বা দ্রুত।

বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া পানু ভাবিতে লাগিল, মানুষ হইতেই হইবে—নিশ্চয় হইব। বিদ্যার যে সম্মান, আভিজাত্যের যে গৌরব, তাহা আমরা চাইই, একবার ফেল হইয়াছি, তাহাতে কি, আর একবার পরীক্ষা দিয়া পাস করিব। ব্যর্থ হইতে কেন দিব জীবনটাকে? মানুষের মত করিয়া মানুষ হইব,—ভাগ্যদেবী সত্যই যদি কেহ থাকে, তবে তাহার হাতের খেলার পুতুল হইব না, নিজের পৌরুষ দিয়া তাহাকে আমি জয় করিয়া আসিব।

নীচে রান্নাঘরের দিক হইতে চাকরদের কর্ম্ম-ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া যাইতেছে,—নূতন মনিবটির অদ্ভুত মেজাজে কাল যে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়—আজ তাহাদিগকে একটু আশ্বস্ত করিয়া দিতে হইবে।

[১৬]

বেলা বাড়িবার সঙ্গে স্নান, চা-পান ইত্যাদি যথারীতি হইয়া গেলে, পানুর কাছে দিনটি বেশ সহজ ও সরল বোধ হইতে লাগিল। বাড়ীখানির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বাগানের একটি কোণায় প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে পান্নালাল তাহার বসিবার জায়গা ঠিক করিল। একটি টেবিল এবং গোটা দুই চেয়ার আনাইয়া এবং বহির ট্রাঙ্ক খুলিয়া, রাশীকৃত পাঠ্য পুস্তক টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল। তাহার পর ঘাসের উপর একটি মাদুর বিছাইয়া, লম্বা হইয়া সেখানে শুইয়া পড়িল।

কর্ম্মচারী অধরবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাজার থেকে মাছ তরকারী সবই ত এনেছে, কিন্তু পানু, কি খেতে তুমি ভালবাস, এরা ত জানে না, তুমি একবার বলে দাও, আমি ঠাকুরকে ডেকে দিই, কেমন?

অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় তুলিয়া পানু কহিল—কি যে বলেন, কি দিয়ে কি রাঁধতে হবে, আর কি খেতে ভাল হবে, আমাকেই যদি বলে দিতে হবে, তবে ঠাকুর চাকরগুলো রয়েছে কি করতে?

—না বাবা, সবার রুচি ত সমান নয়, তোমার কি ভাল লাগবে না লাগবে ওরা জানে না ত! তেমন পাকা লোক ওরা নয় কিনা, তবু বলে দিলে, একরকম করে—

পাশ ফিরিতে ফিরিতে পানু কহিল, যেমন করে পারে ওরা দিক তাই সিদ্ধ করে, গিলতে পারলেই হ'ল।

অধর বাবু চলিয়া গেলেন, পানুর মন আবার বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাস দুয়েক আগেও খাওয়া লইয়া কত আলোচনা চর্চ্চা, কত হাস্য পরিহাস হইত তাহা মনে পড়িল। মাতৃহীন অভাগার পরের মায়ের স্নেহের কথা মনে পড়িয়া চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

যা হোক, পানুর মনের বোঝার পরিমাণ মাপিয়া, তাহার নূতন সংসারের গতি কিছু অচল হইয়া রহিল না। দিন এবং রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারী এবং ভৃত্য পরিবেষ্টিত নাতি-বৃহৎ সংসারটি তাহার চলিতে লাগিল।

পানু কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং সংসারের ও পৃথিবীর সকল কিছুকেই যেন অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে জোর করিয়া শক্তি এবং উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া, অত্যন্ত জাঁক-জমকে পড়ার আয়োজন করিতে লাগিল। ঝক্‌ঝকে নূতন বইএ নূতন খাতায় টেবিলখানি তাহার ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। সকালে বিকালে দ্বরোয়ানের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি, বংশীয়া ও বুদ্ধু, সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়া বাবুজির টেবিলের উপর ফুল-দানীটি সাজাইয়া দেয়, পানু গাছের নীচে আরাম-কেদারায় বসিয়া চা খায়, এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলী লইয়া মত্ত হইয়া থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে বাগানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া মনে মনে বলে, বাঃ, বেশ আছি!

এইরূপে চারিদিকের অসীম শূন্যের মাঝে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করিয়া, পানু সে সকলের প্রভাব দ্বারা নিজেকে পূর্ণতা প্রদান করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ

ও বিদেশী মুসলমানগণ মিলিত হইয়া পরিচালনা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভারতবাসী ও বিদেশী ইংরাজগণ মিলিত হইয়া তাহা পরিচালনা করিতেছেন। কাযেই বলিতে হয় ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনায় ভারতবাসীর দায়িত্ব চিরদিনই ছিল এবং এখনও আছে। এক সময়ে ছিলেন শুধু ভারতবাসী আর তাহার পর তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন বিদেশীর সহিত।

যখনই মনে মনে ভাবি যে, মা আমাদের, আমরাই তাঁহার গর্ভজাত, তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করিবার দায়িত্ব আমাদের, অথচ অন্য মায়ের সন্তানকে লইয়া আমাদের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে, তখনই প্রশ্নের উদয় হয় যে, কেন এমনটী হইল?

তাহার একমাত্র উত্তর—আমরা প্রথমে অনুপযুক্ত হইয়াছি এবং আমরা আপনাদের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারি নাই। তাই অন্য মায়ের সন্তান আসিয়া আমাদের মায়ের সেবা ও পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়াছে। মা আমাদের, তাঁহার সেবা—আমাদের কার্য্য, আমরা হতভাগ্য—তাই কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছিলাম, অপরে আসিয়া আমাদের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের মায়ের সেবা কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানে না তাহা সত্য এবং তাহার ফলে আমাদের মায়ের যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা হইতেছে না তাহাও সত্য। কিন্তু আমরা হতভাগ্য হইয়াছিলাম বলিয়াই ত তাহারা আসিতে পারিয়াছে। তাহাদের ব্যবস্থায় আমাদের মার যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা হইতেছে না তাহা সত্য, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধিমত তাহারা চেষ্টা ত করিতেছে! কাযেই আমি তাহাদের দোষ খুঁজিয়া পাই না।

আমার মনে হয়, আমাদের কর্ত্তব্যবিমুখতাবশতঃ প্রথমেই উপরোক্ত তেরটী কারণের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার পর আমাদের ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার প্রধান কার্য্যভার বিদেশীয়গণের হস্তে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দায়িত্ব আমাদের, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এখনও ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার প্রধান কার্য্যভার বিদেশীয়গণের হাতেই রহিয়াছে। অর্থ বণ্টন বিভাগ (finance) ও সৈনিক বিভাগ (military) যখন ইংরাজগণের হস্তেই রহিয়াছে, তখন প্রধান কার্য্যভার যে আমরা পাই নাই তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে কি পদ্ধতিতে কার্য্য করিলে আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের উপরোক্ত তেরটী কারণ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

আগামী বারে এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার চেষ্টা করিব।

ব্যথিতের পূজা

—শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বন্যায় প্লাবিত বঙ্গ; দৈন্য, হাহাকার,
রোগ, শোক, সব আসি ঘিরিয়াছে দেশ;—
কেমনে হইবে দেবি! অর্চ্চনা তোমার
হেথা,—যেথা নাহি কোন আনন্দের লেশ?
রিক্তহস্ত মোরা দেবি! কাঙ্গালের প্রায়;
আছে শুধু তপ্তশ্বাস, উষ্ণ অশ্রুজল;

এ দিয়ে কেমনে বল পূজি মা তোমায়?—
ব্যথিতের পূজা মা গো, হবে কি সফল?
তাই হোক,—বন্যাজলে পূজাবেদী তব
হউক স্থাপিত দেবি!—উষ্ণ অশ্রুজলে
করুক সৃজন আজি অর্ঘ্য অভিনব;—
তপ্তশ্বাসে হ'ক দগ্ধ চরণযুগল।

দেখি তাহে লহ কি না ব্যথিতের পূজা!
নাশ কি না দুঃখ দৈন্য, ওগো দশভূজা!

ফোর্থ ক্লাস ফুল

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

আজকাল সহর কলিকাতার সিনেমা, টকি-হাউস সমূহে চিত্রাভিনয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টাকাল পূর্ব্বে একখানি নোটিস-বোর্ডে দেখা যায়,—থার্ড ক্লাস ফুল, ফোর্থ ক্লাস ফুল, ইত্যাদি। চিত্রাভিনয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ঐসব শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, নোটিস-বোর্ড তাহাই জানাইয়া দেয়। একথাটা জানিবার ও বুঝিবার আরও বেশী সুযোগ হয় চিত্রাভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিনেমা, টকি-হাউস সমূহের সম্মুখের ফুটপাথে ও রাজপথে রথ-দোলের ভিড় দেখিয়া। সে সময়ে মানুষকে পথ-পারাপারে প্রাণ হাতে লইয়া চলিতে হয়, এমনি সেই যানবাহনের হুড়াহুড়ি!

এসব এখন জানা কথা। ইহা ত এখন সহরের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যাঁহারা সিনেমা-টকির ছায়া মাড়ান না, অথবা রোগীর অপথ্য-ভক্ষণের ন্যায় মাঝে মাঝে লুকাইয়া অপরের অজ্ঞাতে সিনেমা দেখিয়া আসেন, তাঁহাদিগকে আক্ষেপ করিতে শুনা যায় যে, "এই সিনেমা-টকিতে দেশের সর্ব্বনাশ হইল। মানুষের পেটে ভাত জুটে না, কিন্তু সিনেমা দেখা চাই। বাড়ীর ঘটি-বাটী বেচিয়া, বাপের পকেট হাতড়াইয়া, মায়ের ক্যাশবাক্স ভাঙ্গিয়া, স্কুল-কলেজের পড়ার বই বেচিয়া, এমন কি স্কুলিং বা কলেজ-ফির কিছু গাফ করিয়া সিনেমা দেখা চাইই, না হইলে পেটের ভাত হজম হয় না, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না! বাপ পল্লীগ্রামে ছেঁড়া পেণ্টালুন মোজা পরিয়া, কাছারীর গাছতলায় মক্কেল ধরিয়া, টাকাটা সিকিটা উপায় করিয়া সহরে ছেলের মেস-হোটেলের খরচা পাঠাইতেছেন, ছেলে সেই খরচা হইতে পান সিগারেট ও চা-চপের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার খরচটাও তুলিয়া লইতেছে। সর্ব্বনাশ কি আর গাছে ফলে!"

আক্ষেপ করিবার কথা বটে। কিন্তু উপায় কি? সিনেমা-টকি যখন আসিয়াছে, তখন তাহাকে কেবল আক্ষেপ করিয়া তাড়ান যাইবে না। ওপারের কে এক মহিলা সম্মার্জ্জনী দিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাও তাই। এ দেশে যাহা আসে তাহা শিকড় গাড়িয়া বসে, এমন ত অনেক দেখা গিয়াছে। কেবল এদেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অবস্থা সমান। বহুদিন পূর্ব্বে কবি গোল্ডস্মিথ ইংলণ্ডে কল-কারখানার আমদানীতে গ্রামের ধ্বংস ও সহরের উন্নতি দেখিয়া "সুইট অবার্ণ" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া জগৎবিখ্যাত কবিতা 'ডেজার্টেড্ ভিলেজে' আক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই 'Trade's unfeeling train' এখন ইংলণ্ডের ঘাট-মাঠ-বাট ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইংরেজ এখন মস্ত বড় ব্যবসাদার জাতি। যন্ত্রযুগের শুভ পদার্পণে য়ুরোপ ও মার্কিণ মুল্লুকে ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ-বিরোধ অবিরাম গতিতে (chronic) চলিয়াছে এবং তাহার ফলে অসংখ্য 'ism'-এর আমদানী হইয়া সমাজে অশান্তি ও অসন্তোষ এবং রাষ্ট্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে, একথা য়ুরোপ ও মার্কিণের লোকও যে জানে না বুঝে না তাহা নহে। কিন্তু জানিয়া বুঝিয়াও ফল কি? এই স্রোতের গতি রোধ করিতে কেহ পারিতেছে না।

সিনেমা-টকির সম্বন্ধেও সেই একই কথার পুনরুক্তি করিতে হয়। যাহা আসিতেছে তাহার গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কাল তাহার ধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতেছে। অবতারবাদে বিশ্বাসী হিন্দু আমরা, আমরা কেবল এইটুকু আশ্বাস ইহাতে লাভ করিতে পারি যে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন সর্ব্বনিয়ন্তাই এজন্য অবতীর্ণ হইবেন।

কোন কোন মনীষীকে একথাও বলিতে শুনা যায় যে, যখন এই নেশা রোধ করা অসম্ভব, তখন যাহাতে আমাদের দেশে ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় মস্তিষ্কে, ভারতীয় শ্রমে এবং ভারতীয় মালমশলায় যতদূর সম্ভব বিদেশের আমদানী এই ব্যবসায়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হঠাইতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যেমন ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানের কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের তাঁতের কাপড়ের ব্যবসায় ধ্বংস হইয়া গেলে পর আমাদের দেশেও কলের আমদানী করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়কে জাগাইয়া তুলিতে হইয়াছে এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদের আদর্শে আমাদের বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তেমনই যে হেতু সিনেমা-টকি বিদেশী, অতএব উহা বর্জ্জনীয় বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া এই ব্যবসায়টিকে আমাদের দেশে বরণ করিয়া তুলিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ ঐ ব্যবসায়ে এদেশের বহু বেকারের অন্নসংস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অনেক টাকা বিদেশে না গিয়া ঘরেই থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

অর্থনীতির দিক দিয়া সিনেমা-টকির আমদানীর সমর্থন করা যায় কি না জানি না; কিন্তু সমাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে ইহার পরম অনিষ্টকারিতার প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রতি সহরে পর পর এমন কয়েকটি মামলা এবং ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে হিন্দুসমাজ লজ্জায় ঘৃণায় আতঙ্কে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিতেছে, "এ কি সর্ব্বনাশ হইল! সিনেমা-টকির প্রভাব যে এমন শোচনীয় হইবে, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল?" একটি ঘটনা বালিগঞ্জ

ঢাকুরিয়া লেকে হিন্দু তরুণ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর আত্মহত্যার করুণ কাহিনী সম্পর্কিত, অপরটি ঊষারাণীর মামলা সম্পর্কিত। অবশ্য এই দুইটি ঘটনার মূলে যে সিনেমা-টকির প্রভাবই একমাত্র প্রভাব তাহা বলা যায় না, অপর পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যে ইহার মূলে অত্যধিক মাত্রায় বিরাজমান তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ঊষারাণীর মামলার সম্পর্কে কোন স্থানীয় সংবাদপত্র বলিয়াছেন,—"এ ইন্দ্রজাল বিলাতী সিনেমার! এ ইন্দ্রজাল বিলাসের মোটরে চড়িয়া জাল ড্রাইভের! এ ইন্দ্রজাল গরীবের ঘোড়ারোগের! এ ইন্দ্রজাল হালের আমদানী নির্লজ্জ যৌন সাহিত্যের!"

সত্যই তাই। সত্যই এ সব সিনেমার ইন্দ্রজালের ফল, মোটর-বিলাসীর জাল ড্রাইভ বা রাইডের ফল, নির্লজ্জ যৌন সাহিত্যের ফল। এ সব হালের আমদানী শিক্ষাদীক্ষা, আবহাওয়া আমাদের সমাজে কি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহারই চাক্ষুষ প্রমাণ। এ কথা বলি না যে, ইতিপূর্ব্বে সমাজে বিবাহিতা তরুণী পরপুরুষের সহিত কুলত্যাগ করে নাই, অথবা প্রণয়ীর সহিত একযোগে আত্মহত্যা করে নাই। এ কথাও বলি না যে, অনূঢ়া যুবতী এদেশে পূর্ব্বে কখনও ব্যভিচার করে নাই। কিন্তু অনূঢ়া যুবতী পরপুরুষের সহিত কুলত্যাগ করিয়া অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্য আদালতে সে এখন যে সব কথা বলিতেছে, তাহা কখনও বলে নাই, বিবাহিতা যুবতী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বামীকে তাহার গৃহীত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলে নাই বা স্বামী ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে তাহার সহিত বিবাহবিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়া আদালতের শরণাপন্ন হয় নাই। এ সব ব্যতিক্রম কিসের ফল?

এই সিনেমা-টকি যে দেশের সৃষ্টি সে দেশেই উহার কি রূপ দুষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে এবং তাহার ফলে সমাজ কি ভাবে উৎসন্ন হইতেছে, তাহার একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ আধুনিক সভ্যতা ও প্রগতির শীর্ষস্থানীয়। সে দেশে সিনেমা-টকির যত উন্নতি হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি নহে। সেখানকার হলিউডের এক একটি ফিল্ম-ষ্টারের মাসিক বেতন ও বাবুয়ানার কথা শুনিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। মেট্রো-গোলডুইন-মেয়ার পিকচার্স কোম্পানী তাঁহাদের চিত্র-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে বেতন দেন, জগতে কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী অথবা রাজপুরুষও সে বেতন পান কি না সন্দেহ। এহেন মার্কিণ দেশেরই শিকাগো, ওহিও, নিউইয়র্ক, ইয়েন এবং পেন্সিলভ্যানিয়া ষ্টেট কলেজের বোর্ড কিছুদিন পূর্ব্বে একটি **Motion Picture Research Council** গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ফিল্মজগৎ হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা। রিসার্চ্চ কাউন্সিল তদন্ত করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন;—"ছোকরা-জেলে যে সব হতভাগ্য পথিভ্রষ্ট বালক ও কিশোর দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছে, দুর্ব্বৃত্ততার প্রেরণা তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পাইয়াছে ফিল্ম হইতে। যে সব বালিকা ও কিশোরী কুমারী পথিভ্রষ্টা ও দুর্ভাগিনী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বিপথগামিনী হইয়াছে উচ্ছৃঙ্খল দুর্নীতিমূলক ফিল্ম হইতে। তাহারা ফিল্ম হইতে প্রাণে প্রেরণা পাইয়াছে নির্লজ্জ অভিসার-মত্ততার, অবাধ মিলনের, সমাজ-শৃঙ্খলাহীন দুর্ব্বৃত্ত বাসনার। **Miss Jane Adams** মার্কিণ দেশের একজন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও লেখক। তিনি তাঁহার *The Spirit of Youth and the City Streets* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Cheap Theatres and Motion Picture Halls are places where the thrill-hunters get inspiration for their various activities...The immoral stage helps to increase the number of thieves, burglars and murderers...Wild parties, joy-rides, roadhouse toots, park and beach frolics, street frivolities, sensuous hilarities, promiscuous associations are other modes of the follies of the flappers and their boy friends. And there is the booze in connection with most of the activities of the pleasure seekers."

ইহার ভাবার্থ—"ফ্ল্যাপাররা (খাটো পোষাক-পরিহিতা খাটো চুল-ছাঁটা সিগারেট-ফোঁকা মার্কিনী তরুণী বিলাসিনীরা) তাহাদের 'বালক-বন্ধু'দের সঙ্গে যেভাবে উৎসন্ন যাইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। সস্তার থিয়েটার আর সিনেমা-ঘর হইতে এই সব চমক-অন্বেষীরা অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং সেই অনুপ্রেরণা হইতে তাহাদের নানা দিকের কর্ম্মশক্তির বিকাশ করে।...এই সব দুর্নীতিমূলক আমোদ-প্রমোদের স্থান চোর, সিঁধেল ও নরহত্যাকারীর সংখ্যা পুষ্ট করে।...বেলেল্লা উদ্দাম দল বাঁধিয়া তরুণ-তরুণীর অভিযান, মোটরে সখের ভ্রমণ, পথিপার্শ্বস্থ দুষ্টামীর আড্ডায় অবাধ গুপ্ত মিলন, পার্কে ও সমুদ্র তটে নর্ত্তন-কুর্দ্দন, কামোদ্দীপক আমোদ-স্ফূর্ত্তির হর্‌রা, তরুণ-তরুণীর অবাধ মিলামিশা, এ সব হইল উহাদের দুর্ব্বুদ্ধিসঞ্জাত দুষ্টামীর ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী। আর এ সব দুষ্টামীর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাসের পর গেলাস মদ্যপান।"

মার্কিণের সমাজ-সংস্কারকদিগের রচনায় এ কথাটাও পাওয়া যায়,—

—"It is the street and the working places as also the places of amusement that corrupt the city girls." অর্থাৎ, "সহরের তরুণ-তরুণীরা খারাপ হয় রাস্তায় বাহির হইয়া, কারখানা বা দোকানে কায করিতে গিয়া, অথবা আমোদ-আহ্লাদের স্থানে স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়া।"

মার্কিণ মুলুকের কোন কোন স্থানের সামাজিক অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, সে দেশেরই লেখক লিখিয়াছেন,—

"The whole amorphus field of clandestine vice will defeat any census." অর্থাৎ, "নিরবয়ব বা মূর্ত্তিহীন গুপ্ত পাপলীলার ক্ষেত্র ও নায়কনায়িকার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আদমসুমারীর বিবরণীরও অসাধ্য।"

প্রতীচ্যের সমাজে এ পাপ প্রবেশ করিতেছে বলিয়া বহু শীর্ষস্থানীয় সমাজপতি ও মনীষী লেখক চিন্তান্বিত হইয়াছেন। যাহারা 'হায় রে সেকাল' বলিয়া আক্ষেপ করে, তাহাদের বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু সত্যই কি সেকালের ও একালের সামাজিক অবস্থা ও সমাজ-শাসনের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই? মার্কিণ মুলুকের প্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ জজ Ben Lindsay তাঁহার *Revolt of Modern Youth* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"They (the youth of today) have turned to girls of their own class, a thing they have seldom done in the past". "আধুনিক কালের তরুণরা তাহাদের সমশ্রেণীর গৃহস্থ তরুণীদের প্রতি যৌনলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য মন দেয়, কিন্তু অতীতকালে তাহারা এরূপ করিত না বলিলেই হয়।"

কি ভয়ানক কথা!

তখন, অর্থাৎ অতীতে কামলালসাপরায়ণ তরুণদের লোলুপ দৃষ্টি থাকিত বাহিরে, ঘরের শাসন ছিল তখন খুবই কঠিন। Sinclair Lewis এর মত জগদ্বিখ্যাত লেখক তাঁহার *Babbit* গ্রন্থে বাহিরের রূপজীবিনীদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"It is a protection to our daughters and to decent women to have a district where tough nuts can raise Cain, keep them away from our home"

একথা প্রতীচ্যের মনীষীরাও স্বীকার করিতেছেন যে, অতীতে ঘরের শাসনের কড়াকড়ির ফলে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মিলামিশার বহু অন্তরায় ছিল। অবশ্য তাহার মধ্য হইতেও যে কাহারও বিগড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত না, এমন কথা কেহ বলে না, তবে সে দৃষ্টান্ত বিরল। এখনকার কালে এই শাসন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং তরুণ-তরুণী অবাধ মিলামিশার সুযোগ পাইতেছে। তাহার উপর সিনেমা-টকি, সেক্স-ফিল্ম, সস্তার থিয়েটার, ডান্স-হল, মিউজিক হল, জয়-রাইড, মিশ্র সমুদ্র-স্নান, পিকনিক এক্সকার্শান, এমেচার পারফরম্যান্স প্রভৃতি অসংখ্য ও অবাধ মিলামিশার সুযোগ জুটিতেছে। আর সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে co-education, sex hygeine-এর কামোদ্দীপক ও গুপ্ত কামলীলার সহায়ক বিচিত্র বিজ্ঞাপন, আর pornographic literature ও pictures. এ সকলের বিস্তৃত বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে, উহাতে প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এই হেতু ইহার মধ্য হইতে এখানে অবাধ মিলামিশার ফল কিরূপ হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইবার জন্য co-education ও promiscuous mixing-জনিত corruption in school, and outside schools সম্বন্ধে মার্কিণ লেখকরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

জজ Ben Lindsay-এর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার *Revolt of Modern Youth* গ্রন্থে স্কুল-কলেজের সহশিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের sex psychology জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"During the years 1920 and 1921 the Juvenile Court of Denver dealt with 769 delinquent girls ranging in age from 14 to 17 years. These girls were those who got 'found out'. The ratio was 1 to 5. So there were 38, 420 delinquent girls ranging in age from 14 to 17 years in the city of Denver during the years 1920 and 21." অর্থাৎ, "১৯২০ ও ২১ সালে ডেনভার সহরের তরুণ অপরাধীদের বিচারালয়ে ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের ৭ শত ৬৯ টি কিশোরী ও যুবতীর চরিত্রহীনতাজনিত নষ্টামীর বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল। যাহারা ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা এইরূপ। প্রত্যেক ৫টি ছাত্রীর মধ্যে ১টি চরিত্রহীনা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছিল। সোজা কথায় এ দুই বৎসরে ডেনভার সহরের স্কুল কলেজে ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের দুষ্ট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ৩৮ হাজার ৪ শত ২০টি! আর ৭ শত ৬৯ টি কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যে ৬ শত ৪টি স্কুলের ছাত্রী!"

তবুও এই সংখ্যার মধ্যে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের ছাত্রীদের ধরা হয় নাই। জজ Lindsayই বলিতেছেন,—

"Where there is doubtless a large percentage of such delinquents." অর্থাৎ, "এই বয়সের ছাত্রীদের মধ্যে পাপাচরণের পরিমাণ নিশ্চিতই অধিক।"

মাত্র পঞ্চদশবর্ষীয়া একটি স্কুলের ছাত্রী ধরা পড়িয়া ডেনভারের বিচারালয়ে প্রকাশ্যে বলিয়াছিল,

"Promiscuity in sex matters might be wrong, but there was something to be said for the trial marriage or experimental laisons, considering that most of the marriages she knew seemed to be ending in divorce." অর্থাৎ, "যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা মন্দ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও পরীক্ষা-বিবাহের পক্ষে অথবা পরীক্ষামূলক অবৈধ যৌন সুখসম্ভোগের পক্ষেও কিছু বলিবার আছে। কারণ, আমি যতগুলি বিবাহিত দম্পতির কথা জানি, তাহাদের প্রায় সবগুলিরই বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।"

পনেরো বছরের মেয়ে, বিশেষতঃ প্রতীচ্যের মেয়ের মুখে একথা কি চমৎকার শিক্ষা-দীক্ষা, আবেষ্টনী. প্রাত্যহিক পরিস্থিতি ও শাসনেরই পরিচয় দিতেছে!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ মুলুকের Carolina. Magazine নামক মাসিক-পত্রের একটি প্রবন্ধে এই রচনাটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল,

"The result of a questionnaire answered by the students revealed some startling facts. The average man had affairs with six girls, 87. 7 of the girls were necked and about 60 p. c. girls necked at also proved that the same girl went round to several men and was necked by a number of them."

এই ব্যাপারের উপর মন্তব্য করিয়া উক্ত সাময়িক পত্র লিখিয়াছেন,

"The school-girl and the school boy at co-educational institutions, thrown together in an atmosphere of vice, drug and cocktail, indulge in the dissipations that have become now recognised as part of school life."

এ বীভৎস চিত্রের তর্জ্জমা আর নাই দিলাম।

আধুনিক পিতামাতা কক্ষান্তরে বিলাসশয্যায় রাত্রিবাস করিতে যেমন লজ্জানুভব করেন না, তেমনই এখনকার পিতামাতা কন্যা কেমন সাহিত্য পাঠ করিতেছে, কোথায় কাহার সহিত সিনেমা-টকি অথবা 'জয় রাইড' করিতে বাহির হইতেছে, তাহার খোঁজ না রাখিয়া আপনারা সাজিয়া গুজিয়া যাইতেছেন ...রে কোথাও আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতে। উপযুক্ত ..., পিতার অনুমত্যানুসারে, তরুণী ভগিনীকে বাহির ...রতেছেন তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের টি-পার্টিতে অথবা ক্লাবে 'টি' প্রবেশন করিতে। আবার তাহার উপর তাঁহাদের আপত্তিও কন্যাভগিনীর সহশিক্ষায়!

এই সহশিক্ষার বিষময় ফলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ...খানে আরও কিছু বলিব। **Dr. Arabella Keneally** ...ং নারী হইয়াও তাঁহার *Feminism and Self-...stinct* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Self instinct is not identical in men and women. Man being less complex in his psychology, that ...hich in him is but a biological lapse, is in woman a ...ce. Man disperses, woman absorbs."

বিজ্ঞান পুরুষ ও নারীর এই অসজ্ঞা বাবধানের ব্যবস্থা ...রিলেও পুরুষ ও নারীকে একসঙ্গে পড়াইতেই হইবে, নতুবা ...তির পক্ষে বাধা পড়িবে। যাহারা একথা বলেন, তাঁহারা ...গতি অর্থে কি বুঝেন জানি না। **William Macdoug...** ...র তাঁহার *Character and Mind of Man* গ্রন্থে ...লিয়াছেন,—

"...False assumption that a lapse on the husband's ...rt is as grave an offence as on yours (wives'). It is ...t so and no change of law or custom or tradition ...n abolish this difference, which is deeply rooted in ...ological fact. A lapse on the part of the woman is ...re serious in its cousequence."

যৌবনের উদ্দাম স্বাভাবিক বৃত্তির প্রভাব ভীষণ, একথা ...কলেই স্বীকার করেন। চাণক্যের মত মহাজ্ঞানী ...হা না হইলে 'ঘৃতকুম্ভা সমা নারী', ইত্যাদি কথা লিখিয়া ...তেন না। এজন্য কৈশোর ও যৌবনে পুরুষ ও নারীকে ...ম্ভব পৃথক রাখাই সমীচীন। কেন না যৌবনের প্রভাবে ...নের যেখানে পদে পদে সম্ভাবনা এবং পদস্খলন নারীর ... যখন ভীষণ সামাজিক শাস্তি স্বরূপ, তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আগুনে হাত দিয়া হাত পুড়াইতে যাওয়া কেন? মনীষী লেখক H. G. Wells লিখিয়াছেন,—

"Overcrowded working class people's homes daily witness the mother's prostitution or constant danger of incestuous attacks from drunken father or brother."

ইহার বাংলা তর্জ্জমা করা অসম্ভব। মানুষ যখন পশু-প্রকৃতি, তখন আর্য্যঋষিরা পুরুষ ও নারীকে পৃথক রাখিতে বলিয়া কি বড় মন্দ কথা বলিয়াছেন? ধরা যাউক বাল্য-বিবাহের কথা। আর্য্য ঋষিরা গৌরীদানের কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের এখন কেহ কেহ বিদ্রূপ করেন। অথচ মার্কিণ মুল্লুকের জজ Ben Lindsay তাঁহার *Revolt of Modern Youth* গ্রন্থে দেশের কদাচার ব্যভিচারের আধিক্য দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

"Early marriages should be made possible by removing the possibility of children."

অবশ্য তিনি ইহাতে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন (contraception, sterilisation, etc.)। কিন্তু এদেশে কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন ছিল না। পূর্ব্বে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত না হইলে বর বধূর একত্র শয়নের নিয়ম ছিল না। Ellen Kay তাঁহার *Love and Marriage* গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"A real sexual morality is almost impossible without early marriage. Simply to refer the young to abstinence as the true solution of the problem is a crime against the young and against the race, a crime which makes the primitive force of nature, the fire of life, into a destructive element."

পুরুষ ও নারীর যৌনলালসাজনিত পাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যবস্থাও প্রতীচ্যের মনীষীরা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যখন বাল্যবিবাহের পাপই এদেশ হইতে আমরা আইন করিয়া উঠাইয়া দিয়াছি এবং অষ্টাবিংশতি হইতে পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয়া তরুণীদের বিবাহ দেওয়া ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন যাহাতে তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া ভাল ঘরে-বরে বিবাহ দিতে পারি এবং সমাজে শান্তি ও সন্তোষ আনিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে কি?

দৃষ্টান্তস্বরূপ সহশিক্ষার কথাই ধরা যাউক। যদি সহশিক্ষা আমদানী না করিলে আমাদের পেটের ভাত হজম না হয়,

এ ত গেল স্কুল-কলেজের ভিতরের চিত্র। উহার বাহিরের চিত্রও চমৎকার। কতক আভাস তাহার পূর্ব্বে দিয়াছি। কোন মার্কিণ সমাজ-সংস্কারক লেখিকা লিখিয়াছেন,

"Every holiday girl wants to enjoy herself. When she is lucky, she has her own boy friend; if she is on her own, then Heaven help her!"

সমুদ্রে মিশ্র-স্নান, চড়ুইভাতি ইত্যাদির কথায় লেখিকা বলিতেছেন, "Sea air is one of the greatest known sex stimulants" নৈশসমিতি, নৃত্যসমিতি, নাচঘর, গানঘর, সস্তার সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতির অবাধ মিলামিশার ব্যাপারে নিউইয়র্কের কোন সমাজ-সংস্কারক-সমিতির রিপোর্টের মত এই যে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ের জন্ম এমন পাপ (commercialised vice) আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রত্যেক সপ্তাহে ৩৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার তরুণ তরুণী কেবল নাচঘরেই স্ফূর্তি করিতে যায়। সম্প্রতি Motion Picture Research Council তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সব সহরে সিনেমা-হাউসের সংখ্যা অধিক, সেই সব সহরেই ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং পাপাচারণও সমধিক

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের এদেশে এখনও এই 'সভ্যতা ও প্রগতির তরঙ্গ' তেমন করিয়া সমাজ-জীবনের খাতে প্রবাহিত হয় নাই, উহা এখন কেবল সমাজ-জীবনের উপকূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে মাত্র। কিন্তু যেটুকু তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, তাহাতেই সমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই যে তটের তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত বেলা অতিক্রম করিয়া সমাজ-জীবন প্লাবিত করিবে, সে আশঙ্কাও আছে। সুতরাং আমাদের দোষ বা ত্রুটি কোথায় তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে এবং কিরূপে সেই দোষ-ত্রুটির যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া সমাজ-জীবনকে যথাসম্ভব কলঙ্কমুক্ত করা যায়, তাহার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

দেখিতেছি, এক শ্রেণীর লেখক গুরুমহাশয়দের মত বেত হস্তে কেবল তরুণ-তরুণীদের শাসন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। কেহ কেহ মহাবিজ্ঞ সমাজপতির মত তর্জ্জনী হেলাইয়া তরুণ-তরুণীকে উপদেশ দিতেছেন,—"সংসারে যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করাটাই কি সবচেয়ে বড় কাজ? প্রণয়ী প্রণয়িনী সাজিয়া জ্যোৎস্নালোকে বিচরণ এবং চুম্বন আলিঙ্গন—তাহা হইলেই জীবনে চরম প্রাপ্তি ঘটিয়া গেল।" পুনশ্চ—"যে সব পুরুষ তোমাদের ভোগ্য বলিয়া জানে, ভোগ্য বলিয়া চিহ্নিত করে—তাহাদের বিষবচন কাণে শুনিয়ো না।" কিন্তু এই শ্রেণীর গুরুমহাশয়রা ভুলিয়া যান যে, যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই অযাচিত উপদেশসুধা বণ্টন করা হইতেছে, তাহারা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব বা গীতাধ্যায় অথবা শংকরের মোহমুদ্গর পাঠ করে না বা তাহাদের পাঠ করান হয় না, অথবা তাহারা কণ্ঠি-তিলক ধারণ করিয়া ও নাক টিপিয়া জপে বসিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যযোগ অভ্যাস করে না, তা সকল দেশের সকল সময়ের তরুণ-তরুণীরই মত যৌবন দ্বারা প্রভাবিত। দৈহিক ক্ষুধা রিপুতাড়িত মানুষের স্বভাব। মানুষের এমন একটা বয়স আছে, যখন তাহার যৌনবৃত্তি চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিতদের চেষ্টা করা উচিত, কিরূপে এই স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে অভ্যাস ও সংযম দ্বারা ক্রমশঃ সম্ভবমত নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাওয়া যায়। শত উপদেশে ও বিদ্রূপকশাঘাতে যাহা সম্ভব না হয়, তাহা বাস্তবজগতে দৈনন্দিন জীবনের বাঁধাবাঁধি নিয়মের দ্বারা অন্ততঃ কতক পরিমাণে সম্ভব পারে।

পরিণতবয়স্ক সমাজপতি মুখে তরুণ-তরুণীদের শাসন করিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন সংযমী হইতে, অথচ তাঁহাদের অনেকে বাস্তবক্ষেত্রে কি করিতেছেন? যে দেশে ১৪ বৎসরে কন্যার এবং ১৬ বৎসরে পুত্রের যৌনবোধ সজাগ হয়, সে দেশে যে কারণেই হউক, তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইতেছে কন্যাপক্ষে ১৮ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত, আর পুত্রপক্ষে ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত। অথচ সেই অবিবাহিত পুত্র-কন্যাকে গৃহে বা স্কুলে সংযম, নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। পিতা অষ্টাদশী অবিবাহিতা কন্যাকে বিলাসসজ্জায় সাজাইয়া পাঠাইয়া দেন স্কুল-কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে, বাড়ীতে মাষ্টার রাখেন গীতবাদ্য শিখাইতে, আর অবাধে বাহিতে ও মিশিতে দেন যত্র তত্র। বালিকা কন্যাকে একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাসে কম্বলশয্যায়

সমতুল্য উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় না বলিয়া যাঁহারা উচ্চপদস্থ তাঁহাদের মধ্যেও হিংসা, দ্বেষ ও অসন্তুষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত অধিবাসিবৃন্দের স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল-মৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতার কারণ দশটী :—

(১) প্রকৃত শরীরযন্ত্রগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব।

(২) প্রকৃত শরীরযন্ত্রবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব।

(৩) প্রকৃত পদার্থ-বিদ্যার (Physics) অভাব

(৪) প্রকৃত রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) অভাব—

(৫) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৬) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officer & sub ordinate officer) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৮) জুয়াখেলার বিদ্যমানতা।

(৯) যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব সেই শিক্ষার অভাব।

(১০) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ও সাদৃশ্যের (parity) অভাব।

স্বাস্থ্য ও পরমায়ু অটুট রাখিতে হইলে কোন্ জল ও বায়ু শরীরের পক্ষে উপকারী, কোন্ খাদ্য ও বাসস্থান পুষ্টিকর তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। শরীরের পক্ষে কোন্‌টী ভাল অথবা কোন্‌টী মন্দ তাহা জানিতে হইলে একদিকে জানিতে হয় শরীরের গঠন ও বিধান কিরূপ, আবার অন্যদিকে জানিতে হয় কোন্ বস্তুগুলি শরীরের গঠন ও বিধানের পোষণোপযোগী ও মানুষ যাহাতে তাহা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। কাযেই শরীরগঠন-বিদ্যা, শরীরবিধান-বিদ্যা, প্রকৃত পদার্থবিদ্যা এবং প্রকৃত রসায়ন-শাস্ত্র জানিবার প্রয়োজন হয় ও দেশের জল এবং বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

বর্ত্তমান জগতে যাহা শরীরগঠন-বিদ্যা, শরীরবিধান-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত, তাহা যে ভ্রমাত্মক এবং বিকৃত বিজ্ঞানের ফলে দেশের জলবায়ু যে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে তাহা ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে দেখান হইয়াছে।

শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, বুদ্ধির প্রকৃত তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্য রক্ষিত না হইলে এবং জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌গণ সমান উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সংঘটিত না হইলে যে, জনসাধারণের মধ্যে সন্তুষ্টি ও স্বাবলম্বন রক্ষিত হওয়া অসম্ভব, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। দেশে জুয়াখেলা বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যক্ষমতা অর্জ্জন না করিয়া উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় এবং তাহাতে দ্বেষ, হিংসার উদ্ভব হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ; কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, মানুষ যখন ঐ নিয়ম যথাযথভাবে জানিতে এবং তদনুসারে চলিতে পারে, তখন জমীর উর্ব্বরাশক্তি ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং জমীর উর্ব্বরাশক্তি যত বেশী বৃদ্ধি পায়, তত বেশী লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা হয়, কারণ জমী হইতে মানুষের খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসস্থানের উপকরণ উৎপন্ন হয়। কাযেই লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক্ না কেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে এবং কৃষির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় না। এক সময়ে যে, লোকসংখ্যা বর্ত্তমান কালের তুলনায় অনেক বেশী ছিল তাহা স্থির করা খুব কষ্টসাধ্য নহে।

বর্ত্তমান কালে মোট লোকসংখ্যা কিয়ৎ-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু লোক-গণনার তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক বৎসরই মৃত্যুর হারও বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ এখন সারা ভারতবর্ষে চল্লিশ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক যুবকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং পরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যা খুব কম। মোট লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ জন্মের হার পূর্ব্বাপেক্ষা

বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে না যে, প্রকৃতিদেবী বর্ত্তমান সময়ে মানুষের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন আর মানুষ কোন না কোন ভ্রম বশতঃ নিজদিগকে হত্যা করিতেছে? উপরোক্ত সত্য না বুঝিয়া জন্ম-নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে কি প্রকৃতির বিরোধিতা করা হয় না, প্রকৃতির অনুগ না হইয়া বিরোধী হইলে দুঃখদুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী নহে কি?

কাযেই বলিতে হইবে যে, মানুষের দুর্দ্দশার কারণ—লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নহে। পরন্তু জন্মনিরোধ-চেষ্টাই দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ শস্য হয়, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় কৃষকের পক্ষে কৃষি করিয়া লাভবান্ হওয়া অসাধ্য হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু এখনও মোট যে পরিমাণ শস্য হয়, তাহা ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রয়োজন-নির্ব্বাহের পক্ষে কম নহে। এবং পঞ্চাশ বৎসর আগেও প্রতিবিঘা জমির উর্ব্বরাশক্তি বর্ত্তমান কালের তুলনায় দ্বিগুণের অধিক ছিল। কাযেই এখন যে পরিমাণ জমির চাষ করা হয়, তখন ঐ পরিমাণ জমির চাষ করিলে মোট শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারিত এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান কালের দ্বিগুণিত লোকসংখ্যার প্রয়োজন সাধিত হইতে পারিত। এদিক দিয়া দেখিলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শঙ্কিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাস্তব জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলে জন-বলের যে প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জন্ম-নিরোধ করিবার চেষ্টা করা কি অন্য পক্ষে সেই জন-বলের হ্রাস সাধন করা নহে? তাহা কি কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

যে জন-বল মানুষের এত প্রয়োজনীয়, তাহা যখন দুঃখের তাড়নায় হ্রাস করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে, তখন এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান দুঃখ অতীব ভীষণ!

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার উপায়

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে নিম্নলিখিত কারণ কয়টী হইতে :—

(১) জমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস।

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity)।

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতি পালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের মজুরীর সাদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and sub-ordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব।

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব।

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন-বিদ্যার (Anatomy) অভাব।

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান-বিদ্যার (Physiology) অভাব।

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থ-বিদ্যার (Physics) অভাব।

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব।

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব।

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ ভাবে ভারতবাসিগণের দ্বারা পরিচালিত হইলে দুঃখদুর্দ্দশার উপরোক্ত তেরটী কারণ দূরীভূত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট দুই শত বৎসর আগে ভারতবাসী

রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজীবলোচন রায় রামমোহন রায়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও এক জন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৮০০ সনে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন তিনি বিদেশে যান, তখন রামমোহন রাজীবলোচনের হাতেই তাঁহার নিজের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। রাজীবলোচন এক সময়ে রামমোহনের কোন-কোন সম্পত্তির বেনামদারও হইয়াছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতার জন্য রাজীবলোচনের বংশধরদের নিকট রামমোহন-সংক্রান্ত অনেক দলিলপত্র এখনও রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজীবলোচনের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়ের সৌজন্যে আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে এই সকল কাগজপত্র হইতে রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে অনেক সময়ে সংবাদগুলি এত সূক্ষ্ম বৈষয়িক ব্যাপার সংক্রান্ত যে একমাত্র জীবনীকার ভিন্ন অন্য কাহারও উহাতে আগ্রহ হইবার কথা নয়। সেই জন্য বর্ত্তমানে রামমোহনের স্বাক্ষরিত একটি মাত্র দলিল উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

এই দলিলটির তারিখ ১৮৩০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর। উহা হইতে দেখা যায় যে, রামমোহন তাঁহার বন্ধুর নিকট একটি ডিক্রি বিক্রয় করিতেছেন। এই ডিক্রি বিক্রয় খুব সাধারণ ব্যাপার নয় বলিয়া হয়ত একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রামমোহন ১৮১৭ সনে "জেলা হুগলীর জাহানাবাদ পরগণার সাবন সিংহপুর সাকিনের শ্রীহয়দর বখশ চৌধুরিকে, তাহার তালুক হুগলী জেলার জাহানাবাদ পরগণার লাট গোপালনগর বন্ধক রাখিয়া ছয় হাজার টাকা কর্জ্জ" দেন। টাকা ঐ জমীদার আদায় না করাতে রামমোহন ১৮২০ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সুপ্রীম-কোর্টে নালিশ করিয়া সুদে-আসলে সাত হাজার দুই শত চার টাকার ডিক্রি পান। কিন্তু কোন কারণে এই ডিক্রি জারি না করাতে ১৮৩০ সনে উহা আরও দশ বৎসরের সুদ লইয়া মোট চৌদ্দ হাজার দুই শত আট টাকায় দাঁড়ায়। এই সময়ে রামমোহন বিলাত-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার টাকার প্রয়োজন অথচ বিলাত চলিয়া গেলে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন কি-না অনিশ্চিত। সুতরাং বন্ধু রাজীবলোচনের নিকট হইতে আট হাজার ছয় শত টাকা লইয়া ডিক্রিটি বিক্রয় করেন। তাঁহার সর্ত্ত রাজীবলোচনের কথা থাকে যে, সম্পূর্ণ টাকা আদায় হইলে রাজীবলোচনই উহা পাইবেন, রামমোহন আট হাজার ছয় শত টাকার বেশী আর কিছু দাবী করিতে পারিবেন না ; পক্ষান্তরে রাজীবলোচন যদি টাকা আদায় না-করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি রামমোহনকে যে টাকা দিয়াছেন তাহা ফিরিয়া চাহিতে পারিবেন না। সমস্ত ব্যাপারটা মুদ্রিত দলিলটি পড়িলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। উহার অবিকল প্রতিলিপি এত পরিষ্কার যে ছাপার অক্ষরে প্রতিলিপি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম

এই দলিলের আসল বিষয় ভিন্ন আরও দু-একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমেই দেখিতে পাই যে, দলিল-পত্রের শীর্ষে যে-জায়গায় হিন্দু দেব-দেবীর নাম থাকে সে স্থলে রামমোহনের স্বহস্তে লেখা "সৎ" এই কথাটি রহিয়াছে। রামমোহন ব্রহ্মোপাসক বলিয়া একবার আদালতে হিন্দুর সাধারণ শপথের অতিরিক্ত বেদান্ত-গ্রন্থ হাতে লইয়াও শপথ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা ছিল। এই দলিলে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত "সৎ" এই কথাটি হইতে দেখা যায় যে, হিন্দু দেব-দেবীর স্থলে ব্রহ্ম-সূচক কোন শব্দ ব্যবহার করা তাঁহার রীতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন ১৮১৭ সনে, রংপুর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর টাকা কর্জ্জ দিতেছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। অনেকের ধারণা আছে, পরজীবনে রামমোহন কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচার লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। উহা ঠিক নহে। বর্ত্তমান দলিলটি হইতে দেখা যায়, তেজারতি ব্যবসা তাঁহার জীবিকার একটি অঙ্গ ছিল। ইহা ছাড়া সম্প্রতি আমি ১৮২৭ সনের ২৭এ এপ্রিল তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে রামমোহনের উল্লেখ পাইয়াছি। উহাতে তিনি নিজেকে "বেনিয়ান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* সুতরাং তখনও যে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহনের এই দলিলে "সাকিন্ কলিকাতা" ইহাও বোধ করি পরিশেষে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার একজন গণ্যমান্য অধিবাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের প্রথম যৌবন হইতেই ছিল। সেই জন্য তিনি নিজেকে গ্রাম্য জমীদার বলিয়া পরিচয় না দিয়া কলিকাতাবাসী বলিবারই পক্ষপাতী ছিলেন।

---

* List of Persons qualified and liable to serve on Juries in the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, prepared by the Clerk of the Crown, and published by order of the said Court.

Name of Jurors.	Their style or Calling.	Their Residence.	Their Native Country.	Their Religion.	Their qualification to serve on Juries.	Their exemption from serving on Common Juries.
Rammohun Roy,	Banian,	Manicktullah	East Indies	Hindoo		Possessing Property worth of 2 Lacs of Rs.

—THE GOVERNMENT GAZETTE, Extraordinary. Calcutta *Friday, April 27, 1827.*

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(১) মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপনের কারণ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এ দেশীয় লোকদিগকে ইউরোপীয়-প্রণালী-মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার কথা উঠে। গত মাসের 'বঙ্গশ্রীতে' লিখিত হইয়াছে যে, 'মেডিক্যাল-কলেজে'র সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক স্থাপিত ৩টী 'মেডিক্যাল-স্কুল' ছিল। প্রথমতঃ, 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন' (Native Medical Institution)। সিপাই-পল্টনের হাসপাতালে, ঔষধ প্রস্তুত করিবার, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ও যৎসামান্য ডাক্তারী করিবার নিমিত্ত কম্পাউণ্ডার (Compounder) ও ড্রেসার (Dresser) থাকিত। তাহারাই এই স্কুলে শিক্ষা পাইত। তাহারা সকলেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসী হাবিলদারদিগের পুত্র অথবা আত্মীয়। এই স্কুলে অতি সামান্যই ডাক্তারী-শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দী-ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পড়ান হইত। ছাত্রগণ ছাগল, ভেড়া ও কুকুর কাটিয়া শারীর-স্থান-বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষা করিত। ডাক্তার উইলিয়ম জেমিসন্ (Dr. William Jameson), ডাক্তার জন বৃটন (Dr. John Breton) ও ডাক্তার জন টাইট্‌লার (Dr. John Tytler) ক্রমান্বয়ে এই স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (Teacher and Superintendent) ছিলেন। ইহাতে মোটামুটী ডাক্তারী-বিদ্যার অধ্যাপনা হইত, এবং ফলও তত ভাল হইত না। ছাত্রগণ ইংরাজী জানিত না ; এই হেতু, শিক্ষক মহাশয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, 'মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' (Medical Class in the Madrasa College)। এস্থানে কেবল মুসলমান-ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিত। আরবী ভাষায় যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থ আছে, উর্দ্দু-ভাষায় তাহাদিগের অনুবাদ করিয়া তাহাই পড়ান হইত। ছাত্রগণের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। তাহারাও ইংরাজী জানিত না। তৃতীয়তঃ, 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' (Madical Class in the Sanskrit College)। টাকশালের প্রধান কর্ম্মচারী রস-সাহেব (Mr. Ross) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণ ইংরাজী বুঝিত না। বহু-কর্ম্ম-ভার-নিপীড়িত ডাক্তার টাইট্‌লার (Dr. Tytler) ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। ডাক্তার গ্রাণ্ট্ (Dr. Grant) এনাটমী ও ফিজিয়লজি (Anatomy and Physiology) পড়াইতেন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয়-মতে রোগ-নির্ণয় ও অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত। কলেজের সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল ছিল। সেখানে ৩০টী রোগী থাকিত। বৈদ্য ছাত্রগণ সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও স্মৃতি-শাস্ত্র পড়িত। পুনশ্চ তাহারা হাসপাতালে গিয়া রোগ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে শিখিত। এখানেও তাহাদের নিষ্কৃতি ছিল না। চরক, সুশ্রুত, নিদান, ভাব-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থও তাহাদিগকে পড়িতে হইত। এইরূপ মিশ্রিত শিক্ষায় নানাবিধ অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে লাগিল।

কোন কোন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, এইরূপ সঙ্কর-শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; এক-প্রকার শিক্ষা দেওয়াই হউক। ডাক্তার টাইট্‌লার (১) সঙ্কর-শিক্ষার ঘোর পক্ষ-

১। চোরবাগান নিবাসী স্বর্গত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। তৎকালে তিনি সদর-ষ্ট্রীটের ৭নং বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা 'মনোমোহিনী হুইলার' ও আমি তাঁহার নিকটে প্রাচীন কলিকাতার গল্প শুনিতাম। আমি তাঁহাকে 'বাঁড়ুয্যে মহাশয়' বলিয়া ডাকিতাম। তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইতেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "জন টাইটলার সাহেবের অশেষ গুণ ছিল। দোষের মধ্যে তাঁহার একটু মাথায় ছিট্ Eccentricity ছিল। 'সোডা' (Soda) শব্দ তাঁহার কাণে উঠিলেই তিনি উন্মত্ত হইয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করিতেন। এই হেতু. আমি তাঁহাকে 'প্রোফেসর সোডা' (Professor Soda) বলিয়া ডাকিতাম।"

বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, 'টাইট্‌লার সাহেব, সাহিত্য ও

পাতী ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বলিলেন, "এদেশীয় লোকদিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-মতেই চিকিৎসা করা উচিত। তবে অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হইলে ইউরোপীয় মত গ্রহণ করাই বিধেয়।" পাদরীপ্রবর এলেক্জণ্ডার ডাফ সাহেব (The Rev. Alexander Duff) কহিলেন, "আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুই নাই। ইহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। সুতরাং ইংরাজী-ভাষায় ইউরোপীয় মতে শিক্ষাদান করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। দুইটী দল গঠিত হইল। এক দলের অগ্রণী হইলেন ডাক্তার টাইট্লার, অন্য দলের অগ্রণী হইলেন পাদরী-প্রবর ডাফ। ডাক্তার টাইট্লারের দলস্থ লোকদিগের নাম 'ওরিয়েন্টালিষ্টস্' (Orientalists) অর্থাৎ প্রাচ্য মতাবলম্বী। পাদরী-প্রবর ডাফ্-সাহেবের দলস্থ লোকদিগের নাম 'এ্যাংলিসিষ্টস্' (Anglicists) অর্থাৎ প্রতীচ্য-মতাবলম্বী। দুই দলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। মেডিক্যাল-বোর্ড (Medical Board) দুই দলের বিভিন্ন মত 'সাধারণ-শিক্ষা-সমিতিকে' (The General Committee of Public Instruction কে) জানাইলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর-মাসে তিনি একটী কমিটী গঠন করিলেন। সার্জ্জন জন গ্রাণ্ট্ (Surgeon John Grant, Apothecary General to the Honourable Company), জে-সি-সি সাদার্
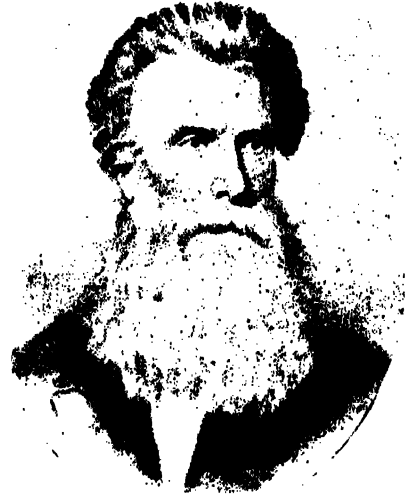
ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডাফ।

ল্যাণ্ড্ (J. C. C. Sutherland, Secretary to the Education Committee), সি ই-ট্রিভিলিয়ান্ (C. E. Trevelyan, Deputy Secretary, Political Department) (১), এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন স্পেন্স্ (Assistant Surgeon Spens, Body Guard), এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন মাউণ্টফোর্ড জোসেফ্ ব্রাম্লী (Assistant Surgeon Mountford Joseph Bramley, Marine Surgeon) এবং বাবু রামকমল সেন, এই ৬ জন লইয়া একটা কমিটী

অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। পারসী ও আরবী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষাও তিনি অল্প অল্প জানিতেন। তিনি একটু 'কেন্দ্র' (Eccentric) থাকায় একদিন তাঁহার শিশুপুত্রের ছাগলের গাড়ী চড়িয়া কেল্লার মাঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহেবেরা দেখিয়াই অবাক্। যেদিন তাঁহার ছাত্রেরা অঙ্ক-শিক্ষায় (Mathematicsএ) ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিত, সেদিন একজন ছাত্র একটা সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিত। কেহ বা বলিয়া উঠিত, 'নলিনীদলগতজলবৎ তরলম্'। তখন তিনি বাঙ্গালায় বলিতেন, 'কি বলিলে আবার বল। ইহার অর্থও বুঝাইয়া দাও।' এইরূপ করিতে করিতে সময় কাটিয়া যাইত এবং অঙ্ক-শাস্ত্র পড়া হইত না। একদিন তাঁহার ছাত্রগণ পাঠ্য পুস্তকে 'crawl' শব্দ পাইয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল, আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। অগত্যা তিনি মাটীতে 'crawl' করিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) দেখাইয়া দিলেন। তিনি উত্তম-রূপ চিকিৎসা-বিদ্যা জানিতেন। তিনি 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্ষ্টিটিউসনে' ছাগল ও ভেড়া চিরিয়া 'এনাটমী' শিখাইতেন এবং মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপনের বিপক্ষে ছিলেন। এবিষয়ে ডাফ্ সাহেব (Alexander Duff) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। টাকশালের কর্ত্তা রস-সাহেব (Mr. Ross) রসায়ন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে উপরে বক্তৃতা করিতেন। টাইট্লার সাহেব ইহা ভালরূপ জানিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই সোডার গুণ ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার ছাত্র রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'Soda and his pupils' এই নাম দিয়া সংবাদ-পত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১। স্যার সি ই ট্রিভিলিয়ান (Sir Charles Edward Trevelyan) ইনি মেকলের ভগিনী-পতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জর্জ্জ ওটো ট্রিভিলিয়ান (George Otto Trevelyan) পরিশেষে মান্দ্রাজের গভর্ণর হইয়াছিলেন।

গঠিত হইল। সেন মহাশয়ই এই কমিটীতে একমাত্র বাঙ্গালী মেম্বর ছিলেন। উপরি-উক্ত গ্র্যাণ্ট-সাহেব এই সভার সভাপতি হইলেন। রামকমল সেন মহাশয় তৎকালে সাধারণ-জন হিতকর কার্য্যের অগ্রণী থাকিতেন। তিনি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী ছিলেন। কলিকাতায় সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য কিরূপ এবং কিরূপ-ভাবে বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার চিকিৎসা-প্রণালী চলিতেছে, তাহা জানাইবার জন্য রামকমল বাবু ও জ্যাক্‌সন সাহেবের উপরি ভার অর্পিত হইল। এই দুই জন যে রিপোর্ট দিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

১। দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় একটী হাসপাতাল খোলা উচিত।

২। ভবানীপুরে একটী 'জেনারল হাসপাতাল' (General Hospital) আছে। কিন্তু সেখানে কেবল সাহেবদিগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। দরিদ্র বাঙ্গালীগণ সেখানে যাইতে পারে না। কলিকাতায় এখন একটি 'নেটিভ হাসপাতাল' (Native Hospital) ও দুইটী 'ডিস্‌পেন্‌সারী' (Dispensary) আছে। কিন্তু সাধারণ লোক সেখানে গিয়া বিশেষ উপকার পায় না।

৩। কলিকাতায় এখন স্বাস্থ্যকর জলের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। অত্রত্য সাধারণ অধিবাসিগণ জলের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। এস্থানে এখন ৪টী বড় বড় পুষ্করিণী আছে—লালদীঘি, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুষ্করিণী, পটোলডাঙ্গার গোলদীঘি ও হেদুয়া পুষ্করিণী। প্রথম পুষ্করিণীর জল লইবার জন্য লোকেরা প্রাতঃকালে ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সেখানে যাতায়াত করে। গঙ্গার সহিত ইহার যোগ না থাকিলে এপ্রিল ও মে মাসে ইহার জল শুকাইয়া যাইত। দ্বিতীয় পুষ্করিণীর জল তত ভাল নহে। তৃতীয় পুষ্করিণী তত গভীর নহে। এই হেতু, ইহাতে অতি অল্পই জল থাকে। এই জল গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ নানা নর্দ্দামার জল এখানে আসিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। চতুর্থ পুষ্করিণীর জল কেহই ব্যবহার করিতে চায় না। কেন যে লোকেরা ব্যবহার করিতে চায় না, তাহা আমরা জানি না। গঙ্গার জল, বৎসরের অধিকাংশ সময়েই, অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর থাকে।

৪। কলিকাতার দরিদ্র লোকগণ খানা খুঁড়িয়া ও তাহার মাটী লইয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া থাকে। এই সকল খানা তাহারা বুজাইয়া না দেওয়ায় তাহাতে বৃষ্টির জল ও নানা আবর্জ্জনা পড়িয়া বায়ুরাশি দূষিত করিয়া ফেলে। এই হেতুই লোকের সাংঘাতিক জ্বর হয়।

৫। সহরে পাইখানার অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার মলরাশি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

৬। কলিকাতার উপকণ্ঠে অনেক বড় বড় লোকের বাগান আছে। এই সকল বাগান হইতে জল বাহির হইবার উপায় নাই। অধিকন্তু তাহার উপর অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে। এই হেতু, বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং লোকের ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। জ্বরের প্রভাবে কি ধনী, কি দরিদ্র, অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৭। অনেক লোক চাকরী পাইবার চেষ্টায় মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসে। তাহারা পুরাতন অস্বাস্থ্যকর বাটীর এক একটী ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে। প্রত্যেক ঘরের ভাড়া ৵০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত। তাহারা শীতকালে ঘরের ভিতরে মাটীর উপরে শুইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তাহারা অনাবৃত স্থানে বা রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকে। সুতরাং তাহারা যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

৮। যখন উক্ত লোকদিগের জ্বর বা ওলাউঠা হয়, তখন তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এক পয়সা দামের পাচন কিনিবারও অবস্থা তাহাদের নাই। কেহ একটী পয়সা দান করিলেও পাচন প্রস্তুত করিবার স্থান ও উপায় তাহারা দেখিতে পায় না।

৯। যদি কোন মফস্বলের লোক কলিকাতায় কোন গৃহস্থ লোকের বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করে, এবং সেখানে থাকিয়া রোগাক্রান্ত ও মৃতপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহার গৃহস্বামী তাহাকে গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া দেয়, এবং তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন লোককে সেখানে রাখিয়া আসে। এই লোকেরা রোগীকে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাজলে চোবাইতে থাকে, এবং পরিশেষে তাহার মৃত্যু হয়। ইহাকেই লোকে "ঘাট-খুন" (Ghat murder) বলিয়া থাকে।

১০। তাই আমরা বলি যে, উক্ত প্রকার লোক বিনা চিকিৎসায় কলিকাতায় থাকিয়া মারা যায়। এখন কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে একটী অন্ততঃ ক্ষুদ্র হাসপাতাল খোলা উচিত। ইহা করিলে বহু নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় লোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসে ৬ জন মেম্বর লইয়া একটী কমিটী গঠন করেন। পূর্ণ এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২০ অক্টোবর তারিখে উক্ত কমিটীর মেম্বর-গণ, টাইটলার-প্রমুখ প্রাচ্য-দলের এবং ডাফ-সাহেব-প্রমুখ প্রতীচ্য-দলের মতের তন্ন-তন্ন বিচার করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকটে উক্ত কমিটীর সবিস্তার মন্তব্য পাঠাইয়া দিলেন। এই মন্তব্যের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় বিবেচ্য ছিল। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ও আরব-দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ-মতে চিকিৎসা-কার্য্য চলিবে কি না? দ্বিতীয়তঃ এ দেশীয় ভাষায় অথবা ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে? কমিটীর অধিকাংশ মেম্বর লিখিলেন, "ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ, এই ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্র লিখিত আছে। সুতরাং এই ভাষায় শিক্ষাদান করিলে ছাত্রগণের প্রভূত মঙ্গল হইবে। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা তত বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বিশেষতঃ, মৃত-মানব-দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ছাত্রগণকে 'এনাটমী' শিক্ষা দেওয়া উচিত। নচেৎ তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।"

উক্ত কমিটী তাৎকালিক ৩টী 'মেডিক্যাল স্কুলের' Medical schoolএর) যে ১০টী দোষ ও ত্রুটি দেখাইলেন, তাহা এই :—

১। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র-গণকে ভর্তি করা হয়, তাহার শৃঙ্খলার অভাব।

২। শিক্ষাদান করিতে হইলে যে সকল বস্তু বা উপায়ের প্রয়োজন, তাহার অভাব।

৩। মানব-দেহের কোথায় কি আছে, শিক্ষাদানের সময়ে কার্য্যতঃ তাহা না দেখাইয়া দেওয়া।

৪। ছাত্র-গণকে ভর্তি করিবার সময় বিশৃঙ্খলা।

৫। শিক্ষাদানের সময়ে যাহাতে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা যায়, তাহার অভাব।

৬। কলেজে পাঠ করিবার সময়ের অল্পতা।

৭। যে সকল বস্তু বা উপায় অবলম্বন করিলে ছাত্রগণ বাটীতে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহার অভাব।

৮। শিক্ষক-কর্ত্তৃক শিক্ষাদানের সময় ছাত্রগণের অনুপস্থিতি ও অমনোযোগিতা।

৯। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা-প্রাপ্তির ও কর্ত্তৃত্ব-প্রদর্শনের অভাব।

১০। শেষ-পরীক্ষা-গ্রহণের সময় বিশৃঙ্খলতা।

উক্ত কমিটী, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে যাহা লিখিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

"আপনি যেরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, সেইরূপে দেশীয় লোকের উপকার করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের অনুরোধ এই যে, 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন', 'সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' এবং 'মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' (Native Medical Institution, Medical Class in the Sanskrit College and Medical Class in the Madrasa College) এখনই তুলিয়া দেওয়া হউক। ইহাদের পরিবর্ত্তে এমন একটী 'মেডিক্যাল কলেজ' করুন, যাহাতে ইউরোপীয়-প্রণালী-অনুসারে ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এক সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ কেবল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করুক, এবং অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ বাঙ্গালা অথবা হিন্দী এবং কিঞ্চিৎ অঙ্ক-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করুক।"

(২) মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপন

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১) কমিটীর কথা বিশেষ-রূপ

১। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় অতি বুদ্ধিমান্, স্থিরচিত্ত ও উদার-চেতাঃ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু হোরেস হেম্যান্ উইলসন্ ইহার বিপরীত কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি (Boden Professor of Sanskrit at the Oxford University) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২০শে আগষ্ট তারিখে রামকমল সেন মহাশয়কে এই কথা লিখিয়াছিলেন—"Lord William Bentinck is an ignorant man. He has a vigorous mind and quiet observation, but he never reads, and therefore often judges wrongly."—Peary Chand Mittra's *Life of Dewan Ramcomul Sen.*

বিচার করিয়া স্থির করিলেন, বর্ত্তমান ৩টী 'মেডিক্যাল স্কুল' তুলিয়া দিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে একটী নূতন 'মেডিক্যাল কলেজ' স্থাপন করা হউক। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে তিনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

"গভর্ণমেণ্ট জেনারল অর্ডার, নং ২৮, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৩৫" (Government General Order, No 28, 28th January, 1835)

১। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস', 'মাদ্রাসায় মেডিক্যাল ক্লাস' ও 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন' (Medical Class in the Sanskrit College, Medical Class in the Madrasa College, and the Native Medical Institution) উঠিয়া যাইবে।

২। 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের' যে সকল ছাত্র শেষ (তৃতীয় বার্ষিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে 'নেটিভ ডাক্তার' (Native Doctors) করা যাইবে। অন্যান্য ছাত্রগণ এক্ষণে যে বৃত্তি পাইতেছে, তাহা পাইয়া তাহাদিগকে দেশীয় সৈনিক দলের সাহায্যে গমন করিতে হইবে, এবং 'মেডিক্যাল কমিটী' (Medical Committee) কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাদিগকেও 'নেটিভ ডাক্তার' বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

৩। একটী নূতন 'মেডিক্যাল-কলেজ' (Medical College) স্থাপিত হইবে। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং চিকিৎসা-বিদ্যা-সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় পঠিত হইবে।

৪। 'জেনারল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন' (General Committee of Public Instruction) এই কলেজের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিবেন।

৫। উক্ত কমিটী এই কয়েক-জন ডাক্তারের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিবেন,—'সার্জ্জন অফ দি জেনারেল হস্পিটাল' (Surgeon of the General Hospital), 'সার্জ্জন অফ দি নেটিভ হস্পিট্যাল' (Surgeon of the Native Hospital), 'গ্যারিসন্ সার্জ্জন অফ ফোর্ট উইলিয়ম' (Garrison Surgeon of the Fort William), 'সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অফ দি আই ইন্‌ফারমারী' (Superintendent of the Eye Infirmary) এবং 'এপথিকারী অফ দি অনারেবল কোম্পানী' (Apothecary of the Honourable Company)

৬। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা হইবে।

৭। কতকগুলি দেশীয় ছাত্রকেই ভর্ত্তি করা হইবে। তাহাদের বয়স্ ১৪ বৎসর অপেক্ষা অল্প ও ২০ বৎসর অপেক্ষা অধিক হইবে না। যাহারা সর্ব্ব-প্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের নাম 'ফাউন্‌ডেসন্ পিউপিলস্' (Foundation pupils) হইবে।

৮। যে সকল ছাত্র সর্ব্ব-প্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের বংশ-মর্য্যাদা ও চরিত্র যেন ভাল হয়। তাহারা যেন ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অথবা ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে। তাহাদের বয়স্ যেন ১৪ বৎসর অপেক্ষা অল্প ও ২০ বৎসর অপেক্ষা অধিক না হয়। ছাত্রগণ জাতি-নির্ব্বিশেষে ভর্ত্তি হইতে পারিবে।

৯। কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) ও 'এডুকেশন কমিটী' (Education Committee) ছাত্রগণের বংশ-মর্য্যাদা, চরিত্র, বয়স্ ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন।

১০। যে সকল ছাত্র সর্ব্বপ্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের সংখ্যা ৫০এর অধিক হইবে না।

১১। যে সকল ছাত্র সর্ব্বপ্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহারা ৭৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবে। নিম্ন-লিখিত নিয়মানুসারে এই ৭৲ টাকা অপেক্ষা আরও কিছু বৃদ্ধি হইতে পারে।

১২। যে সকল ছাত্র সর্ব্ব-প্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইবে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ ৭৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ৯৲ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ১২৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবে।

১৩। কলেজের 'সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট' (Superintendent) ও 'এডুকেশন-কমিটী' (Education Committee) উক্ত শ্রেণী-বিভাগ করিবেন। ছাত্রগণের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারেই শ্রেণী-বিভাগ করা হইবে,—তাহাদের পঠন-কালের

উপরি নির্ভর করিবে না। কোন ছাত্রই প্রথম দুই বৎসর ৭৲ টাকা মাসিক বৃত্তির অধিক পাইবে না। কিন্তু পরিশেষে যদি কোন ছাত্র স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইতে পারে, তবে সে ৭৲ টাকার অধিক মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

১৪। ছাত্রগণ কলেজে ৪ বৎসরের অল্পকাল ও ৬ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবে না।

১৫। ইউরোপে যে প্রণালীতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, ঠিক সেইরূপ প্রণালীতেই এই কলেজে শিক্ষাদান করা হইবে।

১৬। ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক শেষ করিলেই তাহারা একখানি 'সার্টিফিকেট' পাইবে। কলেজের 'সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট' (Superintendent) ইহাতে স্বাক্ষর করিবেন। এই 'সার্টিফিকেট' দেখাইলেই তাহারা 'শেষ পরীক্ষা' (Final Examination) দিতে পারিবে।

১৭। 'এডুকেশন-কমিটী' (Education Committee) ও উপরি-লিখিত মেডিকাল অফিসার-গণ (Medical officers) ছাত্রগণের 'শেষ-পরীক্ষা' গ্রহণ করিবেন। যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রত্যেকে একখানি 'প্রশংসা-পত্র' পাইবে। তখন তাহারা ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্র-চিকিৎসা করিবার অধিকার পাইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনতায় চাকরী করিতে সমর্থ হইবে।

১৮। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যে প্রশংসা-পত্র পাইবে, তাহাতে এই সকল লোকের স্বাক্ষর থাকিবে,—'এডুকেশন কমিটীর প্রেসিডেণ্ট' (President of the Education Committee), 'এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারী' (Secretary of the Education Committee) এবং এই কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট' (Superintendent of the College)

১৯। যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাকরী লইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এক জন করিয়া 'নেটিভ ডাক্তার' পাইবেন। দুইটী পরীক্ষার মধ্যবর্ত্তী কালে যদি কোন চাকরী খালি হয়, তাহা হইলে যে ছাত্র গত পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ হইয়াছে, তাহাকেই সেই চাকরী দেওয়া হইবে। তবে যে ছাত্র কৃতবিদ্য, তাহারই আবেদন আদরণীয়।

২০। যে সকল 'নেটিভ ডাক্তার' পাশ হইয়া প্রশংসা-পত্র পাইয়াছে, তাহাদের মাসিক বেতন প্রথমতঃ ৩০৲ টাকা হইবে। ৭ বৎসর চাকরী করিবার পরে তাহাদের মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা, এবং ১৪ বৎসর পরে মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা হইবে। ২০ বৎসর চাকরী করিবার পরে তাহারা পেনশন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিবে।

২১। 'মেডিক্যাল-কলেজের' জন্য একখানি উপযুক্ত বাড়ী, একটী লাইব্রেরী, এনাটমী ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-সামগ্রী,—এই সকল বস্তু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 'এডুকেশন কমিটীর' (Education Committees) উপর ভার অর্পিত হইবে।

২২। 'মেডিক্যাল-কলেজের' পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত একজন 'ইউরোপীয় সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (European Superintendent) থাকিবেন। তিনি সমস্ত-দিন কলেজের কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবেন এবং বাহিরে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

২৩। উক্ত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রেজিমেণ্টে থাকিলে যে বেতন ও ভাতা পাইতেন, তাহা তিনি পাইবেন, এবং তাহা ব্যতীত তিনি ১২০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

২৪। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন ইউরোপীয় সাহায্যকারী (European assistant) থাকিবেন। রেজিমেণ্টে থাকিলে ইনি যে বেতন ও ভাতা পাইতেন, তাহা তিনি পাইবেন, এবং তাহা ব্যতীত ইনি ৬০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

২৫। উক্ত ইউরোপীয় সাহায্যকারী (European assistant) সমস্ত দিন কলেজের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি বাহিরে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

২৬। উক্ত ইউরোপীয় সাহায্যকারী, কলেজের কোন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তবে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অনুমতি করিলেই তিনি তাহা করিতে পারিবেন। ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে তিনি সাহায্য করিবেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য।

২৭। কলেজের সমস্ত কার্য্য-পরিচালন, ছাত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা-দান-পদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং করিবেন। তবে তিনি 'এডুকেশন-কমিটীর' অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

২৮। কলেজের কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, তদ্বিষয়ে ৬ মাস অন্তর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, 'এড়ুকেশন কমিটীতে' রিপোর্ট পাঠাইবেন। 'এড়ুকেশন কমিটী' এই রিপোর্ট 'ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের' নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।

২৯। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কি কার্য্য এবং তাঁহার সহকারীর বা কি কার্য্য, তাহা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টই স্থির করিয়া লইবেন। তবে এ বিষয়ে তাঁহাকে 'এড়ুকেশন-কমিটীর' পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

লর্ড মেকলে।
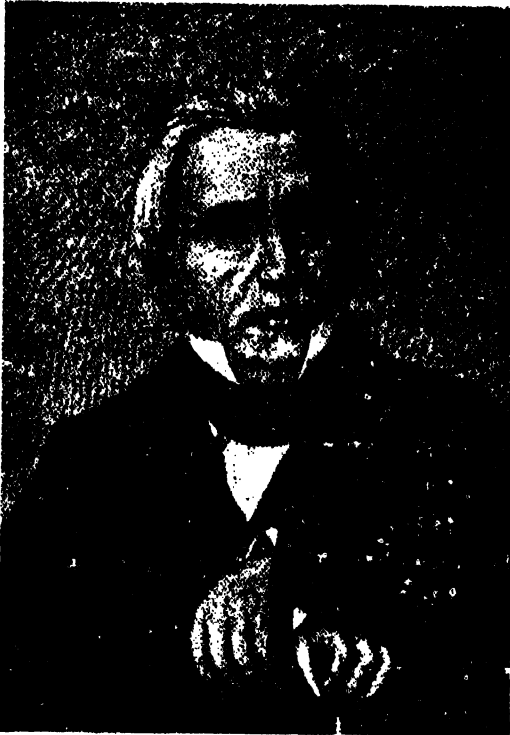
৩০। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার সহকারী উভয়ে মিলিয়া ছাত্রগণকে এনাটমী, সার্জ্জারী, ঔষধ-প্রয়োগ ও ঔষধ প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবেন; এবং তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষিত করিবেন যে, তাহারা যেন সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে।

৩১। ছাত্রগণ এই সকল হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়া সেখানে সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিবে,—'জেনারল হাসপাতাল' (General Hospital), 'অনারেবল কোম্পানীর ডিস্‌পেনসারী' (Honourable Company's Dispensary), 'দরিদ্র-গণের ডিস্‌পেন্‌সারী' (Dispensary for the poor) এবং 'চক্ষুরোগের হাসপাতাল' (The Eye Infirmary)

৩২। কলেজে ব্যবহার করিবার জন্য মাসে মাসে যাহা কিছু কাগজ, কলম, কালী প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহার খরচ গভর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইবে। তবে 'এড়ুকেশন-কমিটী' দেখিয়া দিবেন, এই খরচ ঠিক কিনা।

৩৩। 'এড়ুকেশন-কমিটী,' কলেজের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৩৪। যে কয়েক জন এদেশীয় ছাত্র সর্ব্ব-প্রথমে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদেরও অপেক্ষা আরও ছাত্র লওয়া যাইবে। ছাত্র-গণের বয়স্ ১৪ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। তাহাদের জাতি-বিচার করা হইবে না। তবে তাহাদের বংশ-মর্য্যাদা ও সচ্চরিত্রতা থাকা চাই। তাহারা যেন ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অথবা ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে। সেরূপ ছাত্রকেই কলেজে ভর্ত্তি করা যাইবে।

৩৫। কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, কলেজের খরচ সম্বন্ধে একখানি বিল করিবেন এবং 'এড়ুকেশন কমিটীর' সেক্রেটারী ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। এতদ্ভিন্ন 'মেডিক্যাল-কলেজের' ও 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের' বাড়ী-ভাড়ার জন্য আর একখানি বিল করিবেন। 'এড়ুকেশন-কমিটীর' সেক্রেটারী ইহাতেও স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) সর্ব্ব-প্রথমে কোন্ বাড়ীতে 'মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়াছিল ?

বর্ত্তমান হিন্দু-স্কুলের উত্তর-দিকে যে স্থানে এখন 'এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্' (Albert Institute) আছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে 'এলবার্ট-কলেজ' ছিল। রামকমল সেন মহাশয়ই এই বাটীর অধিকারী ছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ২১শে জুন দিবসে 'স্কুল ফর্ নেটিভ ডক্টার্স' (School for Native Doctors) বসিয়াছিল। এই বাড়ীতেই সেন মহাশয় 'সংস্কৃত কলেজের' অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন। এই বাড়ীতেই সর্ব্ব-প্রথমে 'মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়াছিল। এই

বাটীতেই সুপ্রসিদ্ধ 'ক্যাপ্টেন ডি-এল রিচার্ডসন' (Captain D. L. Richardson) সাহেব বাস করিয়া 'হিন্দু কলেজে'র ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন। (১) এই বাড়ীতেই থাকিয়া 'কার-সাহেব' (Mr. Kerr) হিন্দু কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। সেন মহাশয়ের এই বাড়ীখানিকে পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১লা জুন সোমবার (১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ দিবসে 'মেডিকাল-কলেজ' (Medical College) স্থাপিত হয়। তখন 'মেডিক্যাল-কলেজের' বাটী নির্ম্মিত হয় নাই। এই হেতু, রামকমল সেন মহাশয়ের উক্ত বাটীতেই 'মেডিকাল-কলেজ' বসিতে লাগিল। মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্র্যামলী (Mountford Joseph Bramley) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) নিযুক্ত হইয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে এবং এই বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। ৬০৲ টাকা মাসিক ভাড়া স্থির হইল। তখন 'লর্ড মেকলে' (Lord Macaulay) 'জেনারল কমিটী অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের' (General Committee of Public Instruction-এর) সভাপতি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রামকমল সেনের বাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে আমি সম্মত হইতে পারি না। যখন তাঁহার বাটীতে ডাক্তার ব্রামলী সাহেবের সংকুলন হইবে না, তখন আমরা কি জন্য রামকমল সেনকে মাসে মাসে ৬০৲ টাকা করিয়া ভাড়া দিব? যাহাতে ব্রামলী সাহেবের সুবিধা হয়, তাহা করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হই। তবে আমরা গভর্ণমেণ্ট হইতে এই টাকা দিতে পারিব না। তাঁহাকেই স্বয়ং এই টাকা দিতে হইবে।" (২) যাহা হউক, এই বাড়ীতেই সর্ব্বপ্রথমে 'মেডিকাল কলেজ' বসিয়াছিল। (৩)

স্যর রবার্ট চেম্বার্স

১। এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার প্রয়োজন। কলিকাতা হইতে কাশীপুর-বরাহনগর যাইতে হইলে কাশীপুরের রাস্তায় বাম-পার্শ্বে একখানি অতি পুরাতন ও বিখ্যাত বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম 'কেলস্যাল হাউস' (Kelsall House)। ইহাতে একখানি 'আট-কোণা বাড়ী' (Octagon House) ছিল। এখনও ইহার অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান। বাগবাজারে 'পেরিন্-সাহেবের বাগানে' এইরূপ আর একখানি 'আট-কোণা বাড়ী' ছিল। সিরাজ-উদ্দৌলার চর রাজারামের ভ্রাতা নারায়ণ দাস এই দুইখানি বাড়ীকে কেল্লা মনে করিয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে লাগাইয়া দেন। ইহাতেই সিরাজের আজ্ঞানুসারে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, ১৬ই জুন, বুধবার দিবসে মীরজাফর আসিয়া বাগবাজারে যুদ্ধ করেন। কেলস্যাল সাহেবের পরে 'স্যার রবার্ট চেম্বার্স' (Sir Robert Chambers) এই বাড়ীতে বাস করেন। স্যার রবার্ট, এই বাড়ী হইতে কলিকাতায় সুপ্রিম-কোর্টে গিয়া মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির বিচার করিতেন। 'স্যার রবার্ট পিল' (Sir Robert Peel) তৎপরে এই বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার পরে 'ক্যাপ্টেন্ ডি-এল রিচার্ডসন' (Captain D. L. Richardson) এই বাড়ীতে মাসিক ১০০৲ টাকা ভাড়া দিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখান হইতে হিন্দু-কলেজে পড়াইতে যাইতে তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব হইত। এই হেতু, রামকমল সেন মহাশয় তাঁহাকে বিনা ভাড়ায় উক্ত 'এলবার্ট কলেজের' (Albert College-এর) বাড়ীর উপরে বাস করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত 'কেলস্যাল হাউস' (Kelsall House) এখন শেঠ-বাবুদের অধিকারে আছে। ইহার নাম 'শেঠের বাগান-বাড়ী'।

২। Lord Macaulay writes, "Principal's House. I cannot agree to the proposition about Ramcomul Sen's house—I do not see why we should pay 60 Rupees a month, when we can have accomodation for nothing. I should be most happy to afford any convenience to Dr. Bramley, but I cannot consent to do it out of our funds." [Book E. Page 109] 19th April, 1835.

৩। "The Institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young Assistant surgeons, to whom a third was subsequently, and after much difficulty added were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students"—H. H. Goodeve's Lectures in the Medical College, 1848

(৪) কোন্ সালে, কোন্ মাসে ও কোন্ তারিখে 'মেডিক্যাল কলেজ' খোলা হইয়াছিল ?

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার এচ্. এচ্. গুডিভ সাহেব (Dr. H. H. Goodeve) মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যাল-কলেজ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "মেডিক্যাল কলেজের নিমিত্ত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।" (১) এই তারিখেই যে 'মেডিক্যাল কলেজ' খোলা হইয়াছিল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। যে সকল ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করা চাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১লা মে, শুক্রবার ছাত্র-নির্ব্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষা-গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলেজ খোলা হইয়াছিল, একথা হইতেই পারে না। কলেজ খোলা সহজ ব্যাপার নহে। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা চাই; বিশেষতঃ শিক্ষাদানের নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োজন। এখন কয়েকটী অসুবিধা আসিয়া দেখা দিল। প্রথমতঃ, কয়েকটী ছাত্র ভর্ত্তি হইবার জন্য আসিল। কিন্তু সাহস করিয়া তাহারা ভর্ত্তি হইতে পারিল না। তৎকালের হিন্দু-সমাজ দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল পাছে পাড়ার লোক বা আত্মীয় স্বজন ছাত্রের মাতা-পিতাকে "একঘরে" করিয়া তাহাদিগের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে, পাছে তাহাদের বাড়ীতে বৈবাহিক আদান-প্রদান রহিত হয়, ইহা লইয়াই বিষম সমস্যা হইল। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাদানের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নাই। তৃতীয়তঃ, লাইব্রেরী নাই, মিউসিয়াম নাই, হাসপাতাল নাই। চতুর্থতঃ, যে শব-চ্ছেদ-বিদ্যা না শিখিলে ডাক্তারী বিদ্যা আয়ত্ত করা নিতান্ত অসম্ভব, তাহাও তৎকালের হিন্দু-সমাজে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও ছাত্রগণ সমাজের ভয়ে শব-চ্ছেদ করিবার চিন্তায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই সকল কারণেই ছাত্রসংখ্যা অতি অল্পই হইল। এইরূপ গোলযোগে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। অতঃপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১ জুন (১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার) তারিখে মেডিক্যাল কলেজ সর্ব্বপ্রথম খোলা হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ৩০ মার্চ্চ তারিখে 'লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক' (Lord William Bentinck) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহার সাধের 'মেডিক্যাল-কলেজ' তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যখন 'মেডিক্যাল-কলেজ' খোলা হয়, তখন 'স্যার চারল্‌স্ মেটকাফ' (Sir Charles Metcalfe) এ দেশের গভর্ণর জেনারল।

(১) "Our labours began on the 20th February, 1835"—H. H. Goodeve's Lectures, 1848, quoted by J. E. D Bethune, 1849

বাদলে

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

সকল বুকের কান্না আজি ছড়িয়ে গেছে বাদল-বায়
থেকে থেকে ব্যাকুল দিঠি দিকে দিকে চম্‌কে চায়।
অতীত দিনের ব্যাকুলতা
অফুরানো স্মৃতির ব্যথা—
ঝড়ের হাওয়ার হাহারবে কর্‌ছে আজও হায়রে হায়।
অঝোর ঝরে ঝর্‌ছে বারি
অশ্রু ঝরে সঙ্গে তারই,
গুম্‌রে মরা প্রাণের ব্যথা সকলখানে ছড়িয়ে যায়।
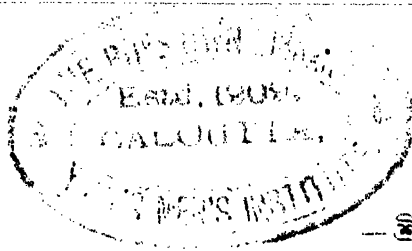
বাস্তব

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

সন্ধ্যার দিকে আকাশ কালো হ'য়ে উঠেছে মেঘের পরে মেঘ জমে জমে। মণিকা কেবল সেই আকাশের পানেই চাইছে। বুকের নীচে বুঝি আর একটা দীর্ঘশ্বাসও জমা নেই; রাশি রাশি দুর্ভাবনার মাঝে পড়ে তার জন্যে এতটুক জায়গাও বুঝি খালি ছিল না।···

দুটি ভাত পর্যন্ত মুখে না দিয়েই স্বামী সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছেন সহরের দিকে, ফেরা উচিত ছিল তো অনেক আগেই, তবু কে জানে কেন এখনও ফিরলেন না!

ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে এখনো তারা চেঁচামেচি করছে। মণিকা আর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে না পেরে বাইরে দাওয়ার উপর এসে বসেছে। কে জানে, এখনি হয়তো ঝড় উঠবে, ঝড়ের মুখে তাঁর ডাক হয়তো তার কাণে এসে পৌছুবে না—বাইরে থাকলে তবু শোনা যাবে।

বড় মেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে একেবারে মায়ের পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, দেখ না মা, কি করছে তোমার ঐ আদুরে ছেলেটি! খালি মারছে আমাদের।

মা বিরক্তির ঝাঁজ দিয়ে বলে উঠল, মারছে তো আমি কি করব!

ভিতর থেকে ছেলে অমনি চেঁচিয়ে বললে, না গো মা, মিছে কথা! দিদি আমায় আগে মেরেছে!···

—হ্যাঁঃ, মেরেছে! ভারী মিথ্যুক্ তুই!

কথা কাটাকাটি মণিকার একেবারেই ভাল লাগছিল না। সে চেঁচিয়ে উঠে বললে, মিথ্যুক্ ও, না তুই! নিশ্চয় তুই আগে মেরেছিস্···বলেই ঠাস্ করে মেয়ের পিঠে এক চাপড় বসিয়ে দিয়ে বললে, এত বড় ধাড়ি মেয়ে হ'লো, তা কি ছাই ভাই বোনেদের ভুলিয়ে নিয়ে খেলবে একটু!

অকারণে মার খেয়ে মেয়ের মুখ কালী হ'য়ে উঠল এবং পরমুহূর্ত্তেই টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা তার চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ল।

মা নিজের ভুল বুঝতে পেরে মেয়ের হাত ধরে একটু টান দিতেই মেয়ে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে।

— আহা, কতই যেন মেরেছি···শোন না বলি···

মণিকা জোর করে মেয়েকে কোলের উপর টেনে নিলে। ···বড় আদরের প্রথম সন্তান···কবি স্বামীর আদরের নামকরণ তাই—ঝরণা!

মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাদের দশ বৎসরের দাম্পত্য-জীবনের একটা নিষ্প্রভায়মান ছবি মণিকার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বৃষ্টি নামল: সঙ্গে সঙ্গে মণিকারও বুক ফেটে কান্না এল।

কোলের ভিতর থেকে মেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ও মা, বাবা ঐ দরজা ঠেললেন। শাগগীর খুলে দাও, ভিজে একেবারে নেয়ে গেছেন।

দরজা খুলেই মণিকা হেসে ফেললে।

—ধন্যি মেয়ে বাবা! আমি সেই কখন থেকে হা পিত্যেশ হয়ে বসে আছি, আমি একদম শুনতে পেলুম না, আর ও কিনা ঠিক ধরেছে!

স্ত্রীর হাসির উত্তর স্বামীর মুখে এতটুকু ফুটে উঠল না। সুতরাং মণিকার হাসিটুকুও বিদ্যুতের মত তখনি নিবে গেল। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁগো, খোঁজ কিছু পেলে নাকি?

সমীর বললে, পেলুম। ছ মাস আগে নীলাম হয়েছে। ইতিমধ্যেই দখল নেবার জন্যে দরখাস্তও পড়েছে।

মণিকা স্তব্ধ হয়ে গেল। খানিক পরে আস্তে আস্তে বললে, তা হ'লে উপায়?

সমীর বললে, উপায় আর কি বল?···ওখান থেকে ফিরে জমীদারদের সেজবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি অসম্ভব রকম দয়াও দেখিয়েছেন।

মণিকা উৎসুক হ'য়ে বললে, কি বললেন?

-বললেন, নীলাম হ'য়ে-যাক্ আর যাই হোক, টাকাটা দিতে পারলেই তিনি সব মিটিয়ে দেবেন।

—টাকা? কত টাকা হবে?

—আন্দাজ দু'শো।

······মসীবর্ণ আকাশের বুকের নীচে কোথাও এতটুকু একটি তারাও দেখা যাচ্ছিল না। তারই ব্যর্থ আশায় মণিকা আকাশের পানে চেয়ে বসে রইল।

জীবনকে সমীর সত্যি করেই উপলব্ধি করতে চেয়েছিল—পয়সার দিক দিয়ে নয়, দস্তুরমত কবিত্বের দিক দিয়ে। নিজের অন্তরের অনুভূতিগুলিকে সে চেয়েছিল জীবন্ত করে তুলতে—পয়সার পিছু পিছু মায়া-মরুর উত্তপ্ত বুকে ছুটে বেড়িয়ে তাদের শুকিয়ে মারতে সে রাজী হয়নি

তাই, সহরের লেখাপড়া সাঙ্গ করে সে বসল এসে তার গ্রামখানিতে। বন্ধুরা ঠাট্টা করলে। সে বললে, গ্রামকে অবহেলা করে সহরের ইঁটকাঠ নিয়ে পড়ে থাকা আমার সইবে না। সহুরে জীবনের বারমাস এই কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা-ঝাপট তার জন্যে নয়। সে চায়, কালবৈশাখীর সামনে থাকবে বসন্তের হিন্দোল, আর পিছনে থাকবে বর্ষার শ্যামলিমা!

বন্ধুরা বলত, বদ্ধ পাগল! রবি বাবুই ওর মাথাটা খেয়েছেন!···

নববধূ মণিকাও প্রথমটা আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সে ক্ষীণ আপত্তি ভেসে গিয়েছিল তার স্বামীর অকাট্য যুক্তির স্রোতে। স্বামী বলেছিল, পয়সাকেই বড় করে ধরলে গোটা জীবনটাকেই এড়িয়ে চলা হয় যে মণি! সে আত্মপ্রবঞ্চনা আমার জন্যে নয়।···

তাই, অতীতের সেই এক সুখ-স্বপ্ন ঘেরা প্রত্যূষে যেদিন সে তার অন্তর-বাহিরের কবিত্ব আর প্রাণময়ী কাব্যপ্রতিমা ঐ মণিকাকে নিয়ে তার পল্লী-মায়ের চরণপ্রান্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেদিন পল্লী-লক্ষ্মী খুসী হ'য়ে উঠলেও ভাগ্যলক্ষ্মী তার দারিদ্র্যের সেই স্পর্দ্ধাটুকুকে কোনো দিক দিয়েই হয়তো মার্জ্জনা করেন নি।···

মণিকা গরীবের ঘরের মেয়ে। সৌন্দর্য্যের তার অভাব ছিল না। কিন্তু সমীরের চোখে তার ঐ দারিদ্র্য আর সহায়-সম্বলহীন অবস্থাটুকুই যেন তার সৌন্দর্য্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই যেখানে হয়ত ইচ্ছা করলে ধনীর ঘরের মেয়েও তার পক্ষে দুর্লভ হত না, সেখানে সে মাল্য দিলে ঐ নিঃস্ব মেয়েটিরই গলায়।

পৈতৃক বিঘা দশেক জমীর সঙ্গে ঐ ভিটাটুকু, আর তার সঙ্গে যোগাড় করে নিলে পাশের গ্রামের ইস্কুলে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার মাষ্টারী। সমীর একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এর বেশী চাইবারই বা তার কী আছে?···চমৎকার চলে যাবে তার জীবনের তরীখানি! পালে সুবাতাসের এতটুকুও অভাব হবে না।

রঙীন প্রত্যূষের সেই বিচিত্র আলোকছটা আজ দুপুরের প্রচণ্ড ঝাঁজে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তার কল্পনাটুকুও যেন আর মনে আসে না। যে দারিদ্র্যকে সে তার বিচিত্র অনুভূতির আংরাখা পরিয়ে মনের মাঝে খাড়া করে রেখেছিল, সে রঙীন আংরাখা তার খসে পড়ে গেছে; তার নীচে থেকে বেরিয়ে এসেছে এক কদাকার দানবমূর্ত্তি, তার চোখে মুখে হিংস্রতা ফুটে বেরুচ্ছে। একে একে চারটি ছেলেমেয়ে তার সে কবিকুঞ্জে কাকলী তুলেছে; মণিকার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছে, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে শেষে দুই পক্ষে মাঝামাঝি রকমের একটা রফা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে।

সবই তবু এক রকম সহ্য হ'য়ে যাচ্ছে এবং যাবেও, কিন্তু, বুঝি বা ঐ এক বোড়ের কিস্তিতে মাৎ করলে—স্বর্গগত পিতার স্নেহের দান ঐ তমসুকের দেনাটুকু!···দুশো টাকা! কোথা থেকে পাবে এই দুশো টাকা! না-দিতে পারলেও যে আর দিন-পনেরোর মধ্যেই আদালতের পারোয়ানা আনবে এবং তার অনিবার্য্য পরিণামটুকু যে ঠিক কি, তা যে সে দেখতে পাচ্ছে তার নিদ্রাহীন মর্ম্মস্থলের সহস্র চক্ষু মেলে!

সুতরাং, যেমন করেই হাক্ দিতে হবে ঐ দুশো টাকা! কিন্তু এই অতি সুস্পষ্ট সঙ্কল্পটুকুকে সাফল্যের কোঠায় পৌঁছে তোলা যায় কেমন করে? ঘরে যে তার মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে অসহযোগ চলেছে! গত বছরের অনাবৃষ্টিতে যে কয়েক মণ ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাতে দেবতার ভোগই কুলোয় নি।··· হঠাৎ আজ সর্ব্বপ্রথম সমীরের মনে হয়ে গেল, মানুষের জীবনে একেই তো দ্বন্দ্বের সীমা-পরিসীমা নেই, তার উপর আবার মানুষ নিজে সখ করে' রেখেছে—দেবতার সঙ্গে এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব! জীবন্ত প্রাণীগুলো যেখানে শুকিয়ে না-খেতে-পেয়ে

মরতে বসেছে, সেখানে সেই অনাহারে বিশুষ্কতার মাঝেই তাকে ঘুমন্ত দেবতার আহার জুগিয়ে যেতে হবে!···চমৎকার ব্যবস্থা পূর্ব্বপুরুষদের!··

—বাবা!

—কিরে?

উত্তরে কোন-কিছু না-বলে' ঝরণা তার দুটি সরু সরু হাত বাপের গলার দুপাশে জড়িয়ে দিয়ে একেবারে তার কোলের উপর শুয়ে পড়ে' বললে, যা স্বপ্ন দেখিছি বাবা!

সমীর একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললে, কি স্বপ্ন রে?

ঝরণার দুটি চোখের তারা একবার নেচে উঠল। বাপের মুখের উপর চোখ রেখে বললে, কাল রাত্তিরে ঠাকুরকে আমি খু-ব ডেকেছি বাবা! তাই ঠাকুর বলেছেন, আমাকে এ্যাত্তো টাকা দেবেন।

সমীর হেসে ফেলে বললে, যা, যা, আর জ্বালাসনে তুই···

ঝরণা কিন্তু দমে যাবার মেয়ে নয়। বল্লে, হাঁ, সত্যি বলছি, এ্যা ত্তো টাকা!···দেখো তুমি···

—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যা। যখন 'এ্যা-ত্তো' টাকা পাবি, তখন আঁচল ভরে' আমার সামনে ঢেলে দিস্।

মেয়ে উৎসবের সুরে বলে' উঠল, দেবই তো! স-ব তোমাকে দোব। শুধ্ধু আমার জন্যে···সেই যে বড় একটা ডলি-পুতুল এনে দেবে বলেছিলে—সেইটি আমাকে তুমি এনে দিও বাবা, সবাই মিলে খেলব!

··সমীরের অন্তরের ভিতর দাউ-দাউ করে জ্বলে' যায়। বাইরে তবু কি এ মধুর প্রলেপ!

মনে হয়, মেয়ের ঐ কথাগুলিতেই জুড়িয়ে গেল তার সব জ্বালা, সমাধান হ'ল তার সব-কিছু সমস্যা!

তারপর দিন দশেক কেটে গিয়েছে। সমীর ইতিমধ্যে কম-সে-কম দশবার জমীদারবাবুদের কাছে ছুটোছুটি করেছে; নায়েব, গোমস্তা, বড়বাবু, সেজবাবু—কাউকেই বাদ দেন নি। কিন্তু সব কথারই ঐই চরম সংক্ষিপ্তসার—টাকা চাই। টাকা না-দিলে ছাড়তে হবে জমী-জায়গা, ছাড়তে হবে পৈতৃক ভিটেটুকু!

হতাশ হ'য়ে সে স্ত্রীকে বলে, কিছুরই দরকার নেই মণি! ছেড়ে যাই চল এই গ্রামের মায়া।

মণিকা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে, কোথায় যাবে? আর, বাপের ভিটে ছেড়ে যাওয়াই কি চাট্টিখানি কথা গা? কত-কালের ভিটে, কতকালের কুলদেবতা···

সমীর হেসে উঠে বলে, দেবতারা বহু—বহুদিন ঘুমিয়ে পড়েছেন মণি! সে ঘুম যদিই বা কোনোদিন ভাঙে, তা কাঙ্গালের কান্নাতে ভাঙবে না, বড়লোকের হুঙ্কারে ভাঙবে। ···ও সব আশা ছাড়—

মণিকা জিভ কেটে বলে, ছিঃ! তোমার মুখ দিন-দিন ভারী আলগা হ'য়ে পড়ছে!···

সাঁঝের আকাশে দেবতাদের প্রদীপ জ্বলেছিল। মণিকা তার মাটীর প্রদীপটি নিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে চলে' গেল। সেখানে গলবস্ত্রে প্রণাম করে' শুধু এইটুকু নিবেদনই আজ দেবতার চরণতলে জানাতে পারলে, দেখো ঠাকুর! যেন দেশ-ছাড়া ভিটে-ছাড়া ক'রো না। যেন···

কাণে এল স্বামীর গলা—বলি হাঁগো, মেয়েটার দেখা পাচ্ছি না যে! কোথায় গেল ঝরণা?

মায়ের প্রাণটা হঠাৎ যেন অকারণে চকিত হয়ে উঠল। ···সত্যই তো! সে তো আজ ফেরেনি এখনো!··দুষ্ট মেয়ে কোথায় যে খেলতে যায়—

আবার একবার দেবতার উদ্দেশে মণিকা প্রণাম করলে। কিন্তু ঘরছাড়া মেয়ের কথাকে ছাপিয়ে মনটিকে তার দেবতার চরণ পর্য্যন্ত পৌছে দিতে পারলে না।···

···প্রচুর রোদ থাকতে থাকতেই খেলতে বেরিয়েছে, এখনো ঘরে ফেরবার নামটি নেই। প্রথমে খানিকটা বিরক্তি, তার পর ক্রোধ ক্রমেই সেই ক্রোধ পলে পলে একটা রীতিমত দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে তুললে।

সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা থেমে গিয়ে চারিদিকে শুধু ঝিঁঝিঁর একতারাটি বেজে চলেছে। গ্রামের বুকে যেন রাত দুপুরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। ঝরণা এখনো বাড়ী ফেরেনি। বাপ মা দুজনে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাওয়ার উপর মুখোমুখি বসে। তাদের চারিপাশে অন্ধ ছেলেগুলো কলের পুতুলের মত নিরর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন ঐ নির্মেঘ আকাশের এক নির্ম্মম বজ্রছটায় বাড়ীর সব প্রাণীগুলি এক সঙ্গে হতবাক্ হয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে অন্তরের ব্যথাটুকু জানাতে চাচ্ছে—কিন্তু পারছে না।···

প্রলয়ারম্ভের সে-স্তব্ধতা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। আধঘণ্টা যেতে না যেতেই একটা বিপুল ঝঞ্ঝায় বাড়ীখানা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠল।

একটির পর একটি করে অনেকগুলি গ্রামবাসী সমীরের বাড়ী এল এই খবর বহন করে যে, ঠিক সন্ধ্যার মুখে বড় সড়কের ধারে ঝরণা অন্য কয়েকটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, সেই সময় হঠাৎ কোথাকার একখানা হাওয়া গাড়ীতে সে চাপা পড়েছে।···গাড়ীর বাবুটি তাকে তুলে নিয়ে সরকারী ডাক্তারখানায় গেছে।···এখনো তারা সব সেখানেই।

সারা গ্রাম জুড়ে একটা হট্টগোল উঠে পড়ল। দলে দলে লোক ছুটল সরকারী ডাক্তারখানার দিকে।

কোন্ এক দুরন্ত দস্যুর শোণিত-সিক্ত চাবুকের একটি আঘাতে যেন ঘুমন্ত পল্লীখানি হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে জেগে উঠেছে!

দিন পাঁচেক পরের কথা।

বড় ঘরের দাওয়ার সঙ্গে তার অস্থিসার দেহখানা মিশিয়ে দিয়ে মণিকা পড়ে আছে; হঠাৎ দেখে বেঁচে আছে কি না তাই সন্দেহ হয়। নিশ্বাস টানবার মত শক্তিটুকুও যেন এক দিনে তার নিঃশেষ হয়ে গেছে; শুধু সেই অবস্থাতেই পড়ে পড়ে একটা অতি অস্ফুট গোঙরানো কান্নার শব্দে সে তার বেঁচে থাকার প্রমাণ দিচ্ছে।··

সমীর সদরে গেছে দারোগার কাছে। ঝরণার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে যে!··যে ধনীর সন্তান চুরচুরে নেশার ঝোঁকে গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গরীবের এ সর্ব্বনাশ করলে, পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা চালাবে; তার শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সমীরের আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে সমীর বাড়ী ফিরে এল। মণিকা তখনো সেই দাওয়ার উপরই পড়ে। কোলের ছেলেটা তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে সেই অস্থিসার দেহখানারই স্বত্বটুকু নিংড়ে নিয়ে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে; অপর ছেলেমেয়ে দুটো একটা বড় বাটীতে কতকগুলো মুড়ি নিয়ে গোগ্রাসে গিলছে।

বাড়ীতে ঢুকেই সমীর বেশ সন্তর্পণে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, ওগো ওঠ-ওঠ! আজ আমাদের ভারী সুদিন!

—সুদিন?

··নিশ্চয়! ঝরণার ঠাকুরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি গো·· এক আঁচল ভর্ত্তি টাকা সে আমায় দিয়ে গেছে।

—টাকা?···

—হ্যাঁগো, টাকা। এক আধটা নয়, একেবারে পাঁচ পাঁচশো।·জমিদার বাড়ী দুশো টাকা দিয়ে বাকী এখনো থাকে তিনশো। চট করে ফন্দ করে ফেল কি কি করতে চাও এই তিনশো টাকায়!

মণিকার দেহের হাড়গুলো পর্য্যন্ত যেন বিদ্রোহের শিখায় ঋজু হয়ে উঠে বসল।

—টাকা?···তুমি তবে টাকা নিয়ে সেই রাক্ষুসেদের সঙ্গে মামলা মিটিয়ে এলে?···আমার সোণার ঝরণার কাছে বড় হল তোমার টাকা?···তুমি না তার বাপ?

বুক-ফাটা কান্নায় মণিকার মাথাটা মাটীর উপর আছড়ে পড়ল। আর তারই তালে তাল মিলিয়ে সমীর হা-হা করে হেসে উঠল। সে যেন মরুভূমির উপর দিয়ে উত্তর-বায়ুর উন্মাদ উচ্ছাস! সেই উচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গেই সে বললে, আমি বুঝেছি—বুঝেছি মণি! এত বড় সোজা কথাটা আজ এতদিন পরে আমি বুঝতে পেরেছি। যে যায় সে আর সত্যি-করে ফেরে না। শুধু সব-চেয়ে আসল—সব চেয়ে সত্যিকার বস্তু আমার এই কাপড়ে বাঁধা!···ওঠো—ওঠো-লক্ষীটি! সন্ধ্যে হয়ে গেল। ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভেঙেছে, তাঁকে অন্ধকারে রেখ না।·· কালই তাঁর ষোল আনার ভোগ দিও, যেন—আর আমার মায়ের জন্যে বড় একটা ডলি-পুতুল···

ঘোষালদের ঠাকুরবাড়ী থেকে পেটাঘড়ি আর কাঁসরের শব্দ তখন সমীরের কথাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে বহু বহু উর্দ্ধের শূন্যতাকেও রোমাঞ্চিত করে তুলছিল।

সিমলা শৈলে
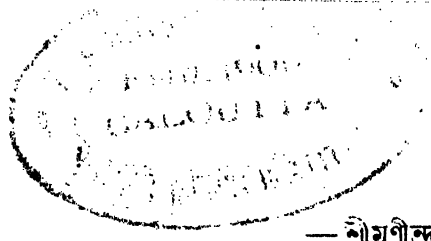
—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

২০শে মে, সোমবার রাতে কালকা-এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে রওনা হ'য়ে বুধবার ভোর বেলায় কালকা ষ্টেশনে পৌঁছুলাম। হাওড়া ষ্টেশন থেকে এক টানা কালকা, কোথাও গাড়ী বদলাবার দরকার হয় নি। কালকায় হাওড়ার গাড়ী ছেড়ে উঠ্‌তে হ'ল ছোট গাড়ীতে।

কাল্কা-সিমলা রেলের সর্ব্বোচ্চ খিলানকরা সাঁকো (viaduct)।

সিমলার কাছাকাছি এক ষ্টেশন, তারাদেবী। বড় এক বাঁধান খাতা নিয়ে গাড়ীর ভিতরে জনৈক কর্ম্মচারী এলেন—"আপকা নাম, বাপকা নাম—" ইত্যাদি ইত্যাদি পরিচয় দিতে হ'ল।

গোটা বারর সময় সিমলায় পৌঁছুলাম। আমার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠেছি। বাসায় পৌঁছে বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া গেল: প্রশস্ত বারান্দা থেকে পর্ব্বতশ্রেণী বেশ দেখা যায়। এখানকার বাড়ীগুলি একটার উপর আর একটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে গ্যালারীর মত করে যেন সাজান। ঘরগুলির চাল টিনের, দেওয়াল, হয় মাটীর এবং ইর্জ্জির, অর্থাৎ ভিতরে কাঠ ও পাথরের কুচি থাকে।

সিমলা কালীবাড়ী

বিকাল বেলা কালীবাড়ী বেড়াতে গেলাম। পাহাড়ের উপরে চারতলা প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সকলের নীচের তলায় বঙ্গীয় সম্মিলনীর স্থান, দ্বিতীয় তলায় অতিথিশালা, তৃতীয় তলায় হ'ল থিয়েটারের ষ্টেজ, চতুর্থ তলায় গ্যালারী।

কালীমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট-মন্দির পৃথক। এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালীর গৌরব বললে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর তো নিজের ঘরেই স্থান সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, বাইরে বাঙ্গালাদেশ থেকে অনেক দূরে সিমলা পাহাড়ে যে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান মস্তক উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে, তা কম আনন্দের কথা নহে।

গুরখা যুদ্ধের পর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে কলকাতা থেকে সার্ভে পার্টি যায়, এই পার্টিতে বা দলে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন। বর্ত্তমানে যেখানে কালীমন্দির, পূর্ব্বে সেখানে পাহাড়ের গুহায় চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি ছিল। শোনা যায়, এক বাঙ্গালী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী দেবীর পূজক ছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর সার্ভে-পার্টির বাঙ্গালীরা চণ্ডীদেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে কালীমূর্ত্তির ডানদিকে চণ্ডীদেবী, বাঁয়ে শ্যামলা দেবীর মূর্ত্তি। শ্যামলাদেবী নাকি ছিলেন পূর্ব্বে

কালীবাড়ীর মন্দির: সিমলা।

মন্দির : জ্যাকো পাহাড়।

জ্যাকো পাহাড়ের উপরে। প্রবাদ এই যে, এক মিলিটারী সাহেব ওখানে এক বাংলো তৈয়ার করেন এবং শ্যামলাদেবীর মূর্ত্তি খাদে নিক্ষেপ করেন। সাহেব রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, ঘোড়-সওয়ার সিপাহীরা তাঁকে কাটতে উদ্যত। সাহেব স্বপ্নের কথা এক হিন্দু চাকরকে জানালে, সে বলে, সাহেব দেবীমূর্ত্তি ফেলে দিয়ে অন্যায় করেছেন, তাই দেবী কুপিতা হয়েছেন। শ্যামলাদেবীকে নিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করলে কোপের উপশম হবে। সাহেব তাই চণ্ডীদেবীর পাশে শ্যামলাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবী-স্থাপনার সকল ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। কালীমূর্ত্তি পাথরের—জয়পুর থেকে পরে বাঙ্গালীরা এনে স্থাপন করেছেন। এই শ্যামলা শব্দ থেকেই নাকি সিমলার উৎপত্তি। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে কাঠের বাড়ীর পরিবর্ত্তে ইঁটের বাড়ী এবং পুরোহিতের জন্য কুটীর নির্ম্মিত হয়; অতিথিশালাও এই সময়ে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। লেফটেনাণ্ট এচ্. এচ্. রাজা স্যার যোগেন্দ্র সেন বাহাদুর কে-সি-এস-আই, মণ্ডি রাজ্যের রাজাসাহেব বাহাদুর ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) মন্দির এবং নতুন অট্টালিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তাঁর বক্তৃতায় নিজেকে বিশেষ করে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দেন, বলেন যে, হাজার বৎসর পূর্ব্বে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালাদেশ থেকে এ দেশে এসেছিলেন।

কালীবাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে!

দয়াল বাবা। [লেখক অঙ্কিত

যে কোন হিন্দু আগন্তুক কালীবাড়ী এসে আশ্রয় পান। কোন অতিথিকে স্থানাভাব বলে ফেরান হয় না। অতিথিশালা যদি ভরতি হয়ে যায়, তখন থিয়েটার-হলে নতুন আগন্তুকদের জায়গা করে দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম সিমলার হিন্দু ভ্রমণকারীদের যে কত সুবিধা, বলে শেষ করা যায় না। সকল অতিথিই খুব আদর-যত্ন পেয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বাঙ্গালী তার প্রতিদান যা দিয়ে যান, তাতে লজ্জার কারণ থেকে যায়। যাওয়ার সময় হয়ত, কেউ সামান্য দেয় অর্থ না দিয়ে পালিয়ে যান, রাস্তায় ব্যবহারের জন্ম অতিথিশালা থেকে গ্লাসটা বাটিটা সংগ্রহ করে নিতেও অনেকের বাধে না। বিছানা বাঁধবার জন্ম, দড়ির দরকার হলে, কালীবাড়ীর স্কাই-লাইট-টানা দড়িটা কেটে নেওয়া হয়—ইত্যাদি ছোট-খাট উপদ্রব সময়-সময় সহ্য করতে হয়। অবশ্য এ সবের সংখ্যা খুব কম।

কালীবাড়ীর কালীপূজা ও অতিথিশালার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন সিমলার চাকুরে বাঙ্গালীরা মাসিক চাঁদা দিয়ে। অবশ্য বাইরের অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর বড় বড় দানও যথেষ্ট আছে। বাঙ্গালা দেশ থেকে এ প্রতিষ্ঠান আরো দান আশা করতে পারে।

সকল জাতির স্ত্রীপুরুষদের দেখেছি, কালীমন্দিরে পূজা দিতে। এমন কি অনেক দিন দেখেছি, বোরখাপরা মুসলমান স্ত্রীলোকও এসেছেন। পার্শীরাও শুনেছি মানত করে থাকেন। পাহাড়ী ও পাঞ্জাবীরা অধিক সংখ্যায় এসে থাকেন, শিখও মাঝে মাঝে দেখেছি। এ স্থান সিমলার সকল জাতির মিলনকেন্দ্র বললে ভুল হয় না।

রোজ আরতি হয়, সন্ধ্যাগগন প্রতিধ্বনিত করে কাঁসর, ঘণ্টা, টিকারার শব্দ উত্থিত হয়। নাটমন্দিরে জনসমাগম, বাইরে চারদিকে দূরের পাহাড়ে শান্তি ও মৌনতা বিরাজমান, কেলুবনে কেবল বাতাস বইছে শন্ শন্। বাইরে মৌন প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয়—

"তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্ব-মন্দিরে
এলো আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্ত্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।"

এখানকার অনেক কিছু সকলের ভাল লাগলেও একটা বিষয় অনেক হিন্দু নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন না, সেটা পশুবলি। কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষ, মন্দিরের পক্ষ থেকে মাত্র তিনটা পশু বলি দেন, পূর্ব্বে অনেক বেশী ছিল। অনেকের আপত্তিতে একেবারে বলি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। মুস্কিল হয় পাহাড়ীদের নিয়ে। পূজার সময় বলির জন্ম এরা অনেক পশু নিয়ে আসে; পশুবলি ছাড়া

কাংড়াই।　　　　[লেখক অঙ্কিত

কালীমাইজির কি করে পূজা হতে পারে, এটা তারা বুঝতে চায় না। শুনেছি দুর্গা-পূজার সময় কালীমন্দিরের ভৃত্য শের সিং পশুরক্তে লাল হয়ে ওঠে। সে গাড়োয়ালী রাজপুত।

কোনো কোনো গুজরাটী শুনেছি, এখানে এসে পশুবলির প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়েছে।

দয়াল বাবা

কালীবাড়ীতে আশী বৎসরের অধিক বৃদ্ধ এক সাধু বাস করে থাকেন। বৃদ্ধ হলেও তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ দেহ; সিমলার

রাস্তায় তাঁকে সোজা হয়ে হাঁটতে দেখা যায়। সিমলার সকলে তাঁকে দয়াল বাবা বলে ডাকে; তাঁর গার্হস্থ্য নাম শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বহু পূর্ব্বে সিমলাতেই সরকারী কর্ম্ম করতেন; কর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। এখানে বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী সকলেই তাঁকে ভক্তি করে। সাধু হয়ে ভারতের সকল প্রদেশের তীর্থস্থানে, নেপালে, হিমালয়ের কৈলাসধাম প্রভৃতি তীর্থ ঘুরেছেন। তিনি নাকি কোনো কারণে একবার একমাস উপবাস করেন, সিমলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং এমন কি পাঞ্জাবের মন্ত্রী স্যার ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাঙ মহোদয়ও তাঁকে এ সঙ্কল্প থেকে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নি।

সিমলা : ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।

হরিসভা ও কীর্ত্তন

কালীবাড়ীতে নাট-মন্দিরে প্রতি রবিবার হরিসভার কীর্ত্তন হয়। অনেক বাঙ্গালী কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে সমবেত হন। সুদূর সিমলাতে বাঙ্গালীদের এই বৈশিষ্ট্য দেখে খুবই আনন্দ হ'ল। হরিসভার কর্ণধার "দুর্গাদা" সিমলার বাঙ্গালীদের সকলেরই দাদা এবং শ্রদ্ধেয়; তিনি বিনয়ী অমায়িক ব্যক্তি। আমার কথা শুনে দুর্গাদা খুব খুসি হলেন। এখানকার কীর্ত্তনীয়া হলেন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়, তাঁর দোহার আছে। কালীবাড়ীতে এবং অন্য এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর কীর্ত্তন শুনেছি। কীর্ত্তনে তাঁর দক্ষতা আছে। হরিসভার বাৎসরিক নাম-কীর্ত্তনের দিন উপস্থিত ছিলাম। প্রবেশ-পথে সকলকেই কপালে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। কীর্ত্তনের পরে পুরুষ মেয়ে সকলের কালীবাড়ী-হলে বিরাট ভোজ; নিরামিষ ব্যবস্থা, পোলাও, ছ্যাঁচড়া এবং দই, মিষ্টি। বাঙ্গালীদের এ সামাজিক মিলন খুবই আনন্দের ব্যাপার; বাঙ্গালার বাইরে সহস্র মাইল দূরে এবং আট সহস্র ফুট উচ্চে যে আছি, তা যেন ভুলে যেতে হয়, মনে হয় নিজের দেশে নিজের লোকদের মধ্যেই যেন বাস করছি। এখানে বড় বড় চাকুরেরা হ্যাট কোট পরে' আপিসে যান; বাড়ীতে ধুতি চাদর পরে' খোল করতাল বাজিয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান গেয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

বঙ্গীয় সম্মিলনী

বঙ্গীয় সম্মিলনীতে বাঙ্গালীরা বেড়াতে আসেন, একটি লাইব্রেরী ও ইনডোর-গেমের বন্দোবস্ত আছে। সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল, সাহিত্যশাখা, শিল্পশাখা, নাট্যশাখা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কর্ণধারদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, সকলেই আমাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সিমলাবাসীদের হৃদ্যতা ও আতিথেয়তা আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে, সে কথা আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করছি।

বঙ্গীয় সম্মিলনীর বাৎসরিক সভা হ'ল একদিন। সভাপতি হয়েছিলেন, বড়লাটের আইন-সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কে-টি; এই সভায় এক বাঙ্গালী যুবক শারীরিক কসরৎ দেখান। নাম শ্রীসুনীল সেন, বাড়ী ঢাকা জেলা। এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সুনীল সেন পরে আর এক দিন কালীবাড়ী-হলে শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন; সেদিন টিকিট বিক্রয় করে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বার্ষিক সভার পর বাঙ্গালীদের প্রীতিভোজ হয়। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে চিংড়ী মাছ আনা হয়েছিল। সিমলাতে গিয়ে সের পড়েছিল ১।।৴০ আনা করে। বাঙালী-দের খাওয়ার সখ আছে বটে!

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের এক বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, ষ্টেজের যবনিকার রং লাল ; বড় কটকটে রং, চোখে এর তীক্ষ্ণতা লাগে। বলেছিলাম, যবনিকার রং হওয়া উচিত ঘন নীল, যা চোখে দেবে আরাম এবং বিরতি, যেমন দেয় নীল আকাশ বা নীল সমুদ্র।

আমাকে বঙ্গীয় সম্মিলনীর অনুরোধে, এক বিশেষ সভায় কালীবাড়ীর হলে, 'ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এল্‌-এ মহোদয়। লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলীর অ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর দেবপতি দত্ত মহোদয় আমাকে সভায় পরিচিত করে দেন।

বাঙ্গালীদের বিদ্যালয়

এখানকার বাঙ্গালীদের স্থাপিত প্রাচীন বিদ্যালয় হারকোর্ট বাটলার ইস্কুল সুপরিচালনা এবং ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্য পাঞ্জাবের ইস্কুলের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বছর কয়েক হ'ল, পাঞ্জাবীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য এই ইস্কুল বাঙ্গালীদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। বাঙ্গালীরা নতুন করে আর একটি ইস্কুল খুলেছে নাম, বেঙ্গলি বয়েজ স্কুল। বাঙ্গালী ছেলেরা এখন এখানেই পড়ে।

সিমলা-শৈল : বিপণি।　　　　লেখক অঙ্কিত

হিমালয় ব্রহ্ম-মন্দির

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠান আছে, নাম হিমালয় ব্রহ্ম-মন্দির —ছোট্ট একটি হল ও আচার্য্যের থাকবার বাড়ী। এখানে উপাসনা, বক্তৃতাদি হয়ে থাকে। এক রবিবারে গিয়েছিলাম, এণ্ড্রুজ সাহেব বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হাঙ্গারির বৌদ্ধশাস্ত্রের পণ্ডিত ডাঃ ফাবরি কিছু বলেন, তিনি কিছুকাল বিশ্বভারতীতে ছিলেন। আরো কেউ কেউ কিছু বলেছিলেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে।

সভার পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী মহিলা গান গেয়েছিলেন "ত্বমীশ্বরাণাং—"

শ্রীযুত সত্যানন্দজি

সিমলা থেকে ৫০ মাইল দূরে কোটগড়ে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল, উদ্দেশ্য ছিল কোটগড়ের কাছে থানেধার গ্রামের শ্রীযুত সত্যানন্দজির সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু যখন রাস্তা-ঘাটের খরচ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের খবর পাওয়া গেল, তখন যাওয়া-আসা মিলিয়ে ১০০ মাইল হাঁটার সময় ছিল না।

প্রায় বছর তের পূর্ব্বে, তাঁর নাম শুনেছিলাম, তখন তাঁর

নাম ছিল মিঃ এস্-ই-ষ্টোকস্; তিনি ছিলেন আমেরিকান। ইনি আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের বহুমূল্য কৃষ্ণার্জ্জুনের (গীতার) চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, এবং একজন পার্ব্বত্য মহিলার পাণিগ্রহণ করে হিন্দু নাম নিয়েছেন সত্যানন্দ। তিনি এবং তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে, ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এবং পাহাড়ী। সিমলা অঞ্চলে ফল-ব্যবসায়ী রূপে শ্রীযুত সত্যানন্দজির খুব নাম। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে কোটগড়ে তাঁর ফলের চাষ। সিমলার বাজারে তাঁর বাগান থেকে আপেল প্রভৃতি ফল আসে এবং কলকাতা, বোম্বে সহরেও চালান যায়। তিনি পাহাড়ীদের শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করেছেন; কোটগড়ে একটি এম্-ই ইস্কুলের পরিচালনা করে থাকেন।

একদিন সিমলার বাজারে ভ্রমণ করতে করতে কোটগড়ের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হ'ল; সত্যানন্দজির সঙ্গে তাঁর খুব পরিচয় আছে। তাঁর দোকানে এক পাহাড়ী যুবক বসে ছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন যে, সে সত্যানন্দজির বাড়ীর ভৃত্য। আমি তাকে নন্দলাল বাবুর কৃষ্ণার্জ্জুনের চিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে হাঁ, সে চিত্র সে দেখেছে, সত্যানন্দজির বাড়ীতে টাঙ্গান আছে।

সিমলার চিত্রশিল্পী

এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সিমলা ফাইন আর্টস সোসাইটির ত্রিষষ্টিতম শিল্প-প্রদর্শনী হবে। সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বে এই প্রদর্শনী প্রতি বৎসর হচ্ছে। ক'লকাতার প্রদর্শনীতে সিমলার ক্যাপ্টেন ফস্‌বেরীর আঁকা জল-রংয়ের ছবি দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এসে শুনলাম তিনি মারী পাহাড়ে চলে গেছেন।

চিত্রকরদের মধ্যে স্যার প্রেস্টন্ কলভিন্, মেজর হেলক্, মিসেস গেল্, মিসেস্ বার্নেটের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল, তাঁদের আঁকা ছবি দেখলাম। মিসেস্ বার্নেট ছাড়া সকলেই জল-রংয়ের ছবি এঁকে থাকেন। মেজর হেলক্ সিমলা ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারী।

মিসেস্ গেল্ বৃদ্ধা, চুলে পাক ধরেছে, তাঁর স্বামী লেফটেনান্ট কর্ণেল গেল্, সিভিল সার্জ্জন। তাঁর বাড়ীতে ঢুকতেই মিসেস্ গেল্ বললেন, "We belong to the same guild" অর্থাৎ আমরা একই গোষ্ঠীভুক্ত; আপনার কথা পূর্ব্বেই মেজর হেলকের মুখে শুনেছি। তিনি তার আঁকা সব ছবি দেখালেন, সিমলা, হরিদ্বার ও কাশ্মীরের ছবি। মিসেস্ গেলের রং ফলাবার ক্ষমতা আছে।

ব্যারিস্‌টার রফি সাহেব পাঞ্জাবী মুসলমান, লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীর সেক্রেটারী। শুনেছিলাম তিনি ছবি এঁকে থাকেন; অ্যাসেম্বলীর গৃহে, তাঁর আপিসে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "আগে এক সময় ছবি আঁকতাম বটে, কিন্তু এখন আমাদের আইন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে, আর ছবির চর্চ্চা করার সময় হয় না; আঠার বছর হ'ল, ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি।"

মিসেস বার্নেটের কয়েকটি ছবি আমার ভাল লেগেছিল, মেজর বার্নেট এঁর স্বামী। এঁর ছবি এখানকার চিত্রকরদের কাজ থেকে একেবারে পৃথক। তাঁর প্যাস্‌টেলে আঁকা এক পাহাড়ী বালিকার প্রতিকৃতি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার শিক্ষা বোধ হয় প্যারিতে?" উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ আমি প্যারি এবং রোমে শিক্ষা পেয়েছি।"

আমার নিজের আঁকা ছবি কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম; তাঁর ভাল লেগেছিল মেঘদূতের কয়েকটি চিত্র। মিসেস্ বার্নেটকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি আধুনিক ভারতীয় চিত্র দেখেছেন?" উত্তর দিলেন, "হাঁ দেখেছি বৈ কি? হোমে (ইংলণ্ডে) এক প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি দেখে খুব ভাল লেগেছে।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অবনীন্দ্রনাথ বিদেশীর কাছে সম্মান পেলেও, দেশের লোকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন না। ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক বইয়ে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।* বোম্বেতে এক বই বেরিয়েছে "ফ্রম হেলেনিজম্ এণ্ড হ্যাভেলিজম্ টু ভাইটাল আর্ট" (From Hellenism and Havellism to Vital Art)। হ্যাভেলিজম্ মানে কি, না হ্যাভেলিয়ানা, অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রের বিদ্রূপজনক উক্তি। এতে লাভ আছে কি কিছু?

* এই প্রসঙ্গে জুবিলি সংখ্যার 'পূর্ব্বাশা'য় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের এক প্রবন্ধ পড়তে অনুরোধ করি—লেখক।

এই ধরণের চিত্র-সমালোচনায় প্রকাশ পায় কেবল বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা। অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত চিত্রকলা আজ
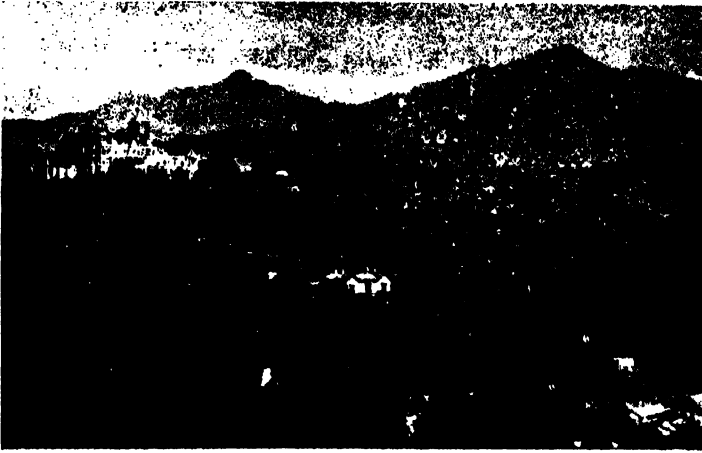
সিমলা : বড়লাটের বাড়ী, পিছনে তুষার-শৈল।

সারা ভারত গ্রহণ করেছে। অবনীন্দ্রনাথ কেবল নূতন শিল্পী-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি, শিল্পসম্বন্ধীয় চিন্তা-ধারাই বদলে দিয়েছেন।

ভ্রমণ

সিমলার প্রধান রাস্তা মাল রোড; বড় বড় দোকান-পসার এর দুই দিকে। মাল রোড প্রশস্ত, রাত্রে আলোকে সমুজ্জ্বল। ম্যাল রোডের নীচে মিড্‌ল্ বাজার, তার নীচে ছোট বাজার ও চোর বাজার। বলা বাহুল্য, এ সব দেশীয় দোকান ও পল্লী অপরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ দোকানদারই পাহাড়ী কাংড়াই, পাঞ্জাবীও আছে। এ সব দোকানের স্থাপত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কাঠের ছোট ছোট কুঠরী, কাঠের স্তম্ভ ও দরজাতে কারুকার্য্য আছে। পাহাড়ী বা কাংড়া স্কুলের চিত্রে যেসব ঘরবাড়ীর ছবি দেখা যায়, এগুলি তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নীচের বড় রাস্তা থেকে উপরের বড় রাস্তায় যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে সিঁড়ি গেছে ঘুরে ঘুরে। বিরাট পাগড়ীওয়ালা কাংড়াই ও বিচিত্র বেশে পাহাড়ী ও পাঞ্জাবীদের আনাগোনা। ভারী বোঝা পিঠে করে পাহাড়ী কুলী চলেছে। এসবের ভিতর যেন একটু ছবি-ছবি ভাব আছে, একটু বেশ ক্লাসিক্যাল আমেজ পাওয়া যায়। রাত্রে যখন লোক চলাচল কমে এসেছে, দোকান-পসার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নির্জ্জন পণ্যবীথি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে :—

> "জনশূন্য পণ্যবীথি ঊর্দ্ধে যায় দেখা
> অন্ধকার হর্ম্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা।"

মাল রোড গিয়ে শেষ হয়েছে রিজে। কতকটা খোলা জায়গা, সকলে এখানে বিকালে বেড়াতে আসে। সপ্তাহে দুদিন হাইল্যাণ্ডারদের ব্যাণ্ড বাজে। পাশে ক্রাইস্ট্ চার্চ্চ, দর্শনীয়; ভিতরে সুন্দর রঙীন কাঁচে বাইবেলের ছবি (stained glass) আছে।

রিজের উপরে গোটা তিনেক বেঞ্চ আছে, বসে সন্ধ্যাশ্রী উপভোগ করা যায়। সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে তেমন আকর্ষণীয় কিছু নেই—চারদিকে বৈচিত্র্যহীন পাহাড়। কিন্তু রিজের উপর থেকে সন্ধ্যা-অবতরণের যে দৃশ্য দেখা যায়, তা ক্ষতিপূরণ করবে। সু-উচ্চ ঢেউয়ের মত পাহাড়ের শ্রেণী চলেছে। রং ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। সূর্য্যাস্তের সময় থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত রং

তিব্বত-হিন্দুস্থান রোড।

ও আলো ছায়ার যে খেলা হয়, তা পরম রমণীয়। বিরাট এক নাট্যমঞ্চে কি এক অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। মন বলে ওঠে—

"ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত করো শির। দিবা হলো সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।"

সহস্রশীর্ষ মরীচিমালী আলোকবন্যায় ডুবে যায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আলোর আলোড়ন এসে লাগে। দূরের পাহাড়গুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে থাকে। সামনের পাহাড় গাঢ় নীলাভ হয় এবং ভিতরের সকল রেখা ঘুচে গিয়ে, আকাশের গায়ে কেবল কালো মূর্ত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্ধকারে সব মিশে যায়, আকাশের গায়ে দেখা যায় পাহাড়ের বাইরের রেখা। রাত্রির নিবিড়তার জন্য মনটা যখন উন্মুখ হয়ে আছে, রঙ্গমঞ্চে সহসা যবনিকা পড়ে যায়,—পাহাড়ের গায়ে গায়ে কুটীরে অসংখ্য বিজলী বাতি দপ করে জ্বলে ওঠে—পূরবীর ম্লান সুর অসমাপ্ত থেকে যায়।

রিজের বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা গেছে লং-উড পাহাড়ে। সেখান থেকে দূরে দেখা যায়, বরফে ঢাকা হিমালয়ের শিখর। রিজের ডানদিক দিয়ে রাস্তা গেছে জ্যাকো পাহাড়ে। সিমলার জ্যাকো পাহাড়ই হচ্ছে সব চেয়ে উঁচু। উপরে একটি মন্দির আছে। অসংখ্য বানর সেখানে—হনুমান নয়, বাঙ্গালা দেশের মর্কট। উৎপাত করে না বিশেষ কিছু। মন্দির থেকে তাদের আহার্য্য দেবার বন্দোবস্ত আছে। জ্যাকো থেকে সূর্য্যোদয় দর্শনীয় দৃশ্য।

সিমলার পশ্চিমে প্রস্পেক্ট হিল্, পাহাড়ের উপরে কামনা দেবীর মন্দির; এখানে এসে দেবীর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে নাকি সফল হয়, সেজন্য পর্ব্বতের নাম "কামনা পর্ব্বত" বা প্রস্পেক্ট হিল (Prospect Hill)। এই পর্ব্বত থেকে সূর্য্যাস্ত খুব রমণীয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায়, পর্ব্বতশ্রেণীর ওপারে বহু দূরে শতদ্রু নদীর ক্ষীণ রজত-রেখা।

রিজ থেকে দুই মাইল দূরে সঞ্জৌলি পল্লী। রাস্তাটা খুবই মনোরম এবং সমতল, পাইন, কেলু ও রোডোডেনড্রন্ গাছ রয়েছে রাস্তার ধারে। এপথে সিমলা থেকে ছয় মাইল দূরে মোসব্রাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড় লাটসাহেবের কান্ট্রি-হাউস মোসব্রাতে।

সঞ্জৌলি থেকে আরম্ভ হয়েছে "তিব্বত হিন্দুস্থান রোড।" এখান থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য নতুনতর, প্রকৃতির যেন রুদ্র মূর্ত্তি, পাহাড় বৃক্ষলতাহীন, কেমন একটা কঠোর, নিঃস্ব মূর্ত্তি। একটু যেন তিব্বত-তিব্বত ভাব। ২০০ মাইল গেলে তিব্বতের সীমানায় পৌছান যায়।

ভারতবাসীর মিলন

আমাদের কংগ্রেসের বয়স হইয়াছে উনপঞ্চাশ বৎসর। আমরা আমাদের গভর্ণমেণ্ট অথবা জগতের সামনে ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নানারূপ দাবীর কথা উপস্থিত করিয়াছি; কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশীয় ভাষায় সমস্ত ভারতবাসীর জাতিবাচক কোন একটি শব্দের বহুল প্রচলন হয় নাই। ইংলণ্ডে ইংরাজ জাতি, জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ জাতি, ফ্রান্সে ফরাসী জাতি প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের যেরূপ প্রচলন আছে, ভারতবর্ষে ভারতবাসী জাতি—এইরূপ কোন শব্দের প্রচলন তাদৃশ হয় নাই।

জাতীয়তার প্রধান উপকরণ 'মিলন'। 'ভারতবাসী জাতি' শব্দ সার্থক করিতে হইলে সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর পরস্পরের মিলনের চেষ্টা অপরিহার্য্য—এই বাস্তব সত্য আমাদের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে প্রথমেই বিচার করিবার প্রয়োজন হয়, আমাদের 'মিলন' হয় না কেন, অথবা আমরা নিজেদের মধ্যে নানা রকমে ঝগড়া করি কেন।

……সমস্ত লোককে মিলিত করিয়া একটা জাতি গঠনের চিন্তায় ও কর্ম্মে যে এমন কিছু থাকার প্রয়োজন, যাহাতে কেহ কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত না হন এবং প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত অনুভব করেন। সংক্ষেপে তাহা এই :—

(১) প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা;
(২) ঝগড়ার প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া এবং মিলনপন্থা আবিষ্কার;
(৩) প্রত্যেক শিক্ষালয়ে এতদনুরূপ ব্যবস্থা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[৮৯]

দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যের মধ্যে চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল গুলিই প্রাচীনতর। ষোড়শ শতকে লেখা অন্ততঃ তিনখানি চণ্ডীমঙ্গলের এখনও প্রচলন আছে। ষোড়শ শতকের পূর্ব্বের লেখা কোন চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল কাব্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও ম ন সা ম ঙ্গ ল কাব্যের মত উহাও যে পঞ্চদশ শতকে এবং তাহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল তাহা শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য ভা গ ব তে বৃন্দাবন-দাসের উক্তি হইতে জানা যায়—

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥১
প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত। করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ॥
গায়েন সব ভাল মুক্তি দেখিবারে চাও। সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও ॥২

রাত্রিকালে গীত হইত বলিয়া চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল কাব্য জা গ র ণ নামেও কথিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গীয় পুঁথিতে চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল স্থলে জা গ র ণ নামই বেশী পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকে লিখিত যে কয়খানি চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহার রচয়িতা হইতেছেন, যথাক্রমে মাণিক-দত্ত, মাধবাচার্য্য এবং মুকুন্দরাম-চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ। ইহার মধ্যে মাধবাচার্য্যের কাব্যে রচনার তারিখ দেওয়া আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে রচনার তারিখ দেওয়া না থাকিলেও তাহা স্থূলভাবে অবধারণ করা যায়। কিন্তু মাণিক-দত্তের কাব্য-রচনার কাল জানিবার কোনই উপায় নাই। সম্পূর্ণ পুঁথিও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং মাণিক-দত্তের কাল নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণরূপে আনুমানিক। কাব্যটি ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

[৯০]

মাণিক-দত্তের কোন পুঁথির সন্ধান এখন বড় পাওয়া যায় না, অন্ততঃ আমি পাই নাই। একদা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়দ্বয় মাণিক-দত্তের পুঁথি লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে বাহির হইয়াছিল।[৩] হরিদাস বাবু মাণিক-দত্তের দুইখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানির লিপিকাল ১১৮১ সাল। স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এবং হরিদাস বাবুর প্রবন্ধই বর্ত্তমান কালে মাণিক-দত্ত লইয়া আলোচনা করিবার একমাত্র উপাদান। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত ব ঙ্গ সা হি ত্য প রি চ য়ে মাণিক-দত্তের চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথা হইতে যে ঐ অংশটুকু পাইলেন তাহা জানান নাই। ঐ অংশটি যথাযথভাবে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে, সুতরাং দীনেশ বাবু যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশে কিছু কিছু পাঠভ্রম ও একটু-আধটু ছাড় আছে, তাহার সংশোধন ও পূরণ হরিদাস বাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। দীনেশ বাবু বোধ হয় হরিদাস বাবুর প্রবন্ধ দেখেন নাই, দেখিলে অন্ততঃ ছাড় অংশটি পূরণ করিয়া দিতেন।

দীনেশ বাবুর মতে মাণিক-দত্ত "সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক"[৪]। আবার হরিদাস বাবু বলেন, মাণিক-দত্ত মুকুন্দরাম-চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী।[৫] এদিকে দেখি, কবিকঙ্কণের কাব্যে মাণিক দত্তের উল্লেখ রহিয়াছে—

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস। আদিকবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস ॥
মাণিকদত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয় ॥৬

হলপ না করিয়াও বলা চলে যে, এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত নহে। মাণিক-দত্তের কাব্যের এক পুঁথিতে আছে—

১। আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়; অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।
২। মধ্য খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৩। মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী, শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, একাদশ ভাগ; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীর গীতে বৌদ্ধভাব, শ্রীহরিদাস পালিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ। ৪। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬০০। ৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ২৫০। ৬। বঙ্গবাসী প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬।

মাণিকদত্ত রচিঞা মাণিকদত্ত কৈল। রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল॥১

হরিদাস বাবু বলেন, রাঘব ও রঘু নামে মাণিক-দত্তের দুই দোহার ছিল। তিনি আরও অনুমান করেন যে, রঘু হয় ত মাণিক-দত্তের কাব্যে স্বীয় রচনা কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। উপরে উদ্ধৃত পয়ার শ্লোকটি নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ। মুকুন্দরামের কাব্যের ভণিতাংশে মধ্যে মধ্যে কবির ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথের নাম আছে; অনভিজ্ঞ গায়ক অথবা লিপিকার হয় ত ইহাকে কবির নাম বলিয়া ভ্রম করিয়া এই কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। সত্য বটে মুকুন্দরামের কাব্যের বন্দনা অংশে মাণিক-দত্তের উল্লেখের পরেই আছে—

বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ। প্রণাম করিয়া পিতা মাতার চরণ॥

এখানে স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে—অবশ্য এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত না হইলে—যে, 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরামের সঙ্গীত-বিদ্যার গুরু ছিলেন। আর মাণিক-দত্তের কাব্য হইতে মুকুন্দরাম বিষয়-বস্তু ("গীতপথ") পাইয়াছিলেন। অতএব মাণিক দত্ত যে মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিতান্ত অসঙ্গত অনুমান নহে। মাণিক-দত্তের কাব্যের প্রথম অংশে ধর্ম্মমঙ্গল অনুযায়ী সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মপূজার প্রভাব কতকটা পরিমাণে কাব্যটির প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। বিপদাসের মনসামঙ্গলেও এইরূপ ধর্ম্মপূজার প্রভাব দেখিতে পাই।

[৯১]

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং হরিদাস বাবু যে পুঁথি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা মালদহ অঞ্চলেরই। পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলে মাণিক-দত্তের কাব্য প্রায়ই গীত হইত। কবিও স্থানীয় লোক ছিলেন। তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী নদী, গ্রামাদি ও দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন।[২] ভাষার মধ্যে স্থানীয় বিশেষত্ব বিদ্যমান।[৩] কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার বাসস্থান ছিল "ফুলুয়া নগর" (আধুনিক ফুলবাড়ী, হরিদাস বাবুর মতে)। কবি অন্ধ এবং খঞ্জ ছিলেন, পরে দেবীর দয়াতে তাঁহার দৈহিক বিকৃতি দূর হয় এবং কবিত্ব ও সঙ্গীত-শক্তি লাভ হয়। কবি দেবী-উপাসক বলিয়া কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। দেবী তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। অতঃপর রাজা মাণিক-দত্তের অনুরাগী ও দেবীর প্রতি ভক্তিমান হইলেন।[৪] এই গতানুগতিক বর্ণনা অবশ্য আমরা আনুপূর্ব্বিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

[৯২]

নিম্নে উদ্ধৃত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অংশটি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এবং হরিদাস বাবুর ধৃত পাঠ[৫] মিলাইয়া নির্দ্ধারিত হইল।

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে। হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি গোলোক ধেয়াইল। গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি যুহিতে[৬] ধেয়াইল। যুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা। পৃথিবী সৃজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
ইন্দ্ৰ[৭] জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল। মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল॥
হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল। জলের আসন গোসাঞি জলেত বৈসল॥
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন। ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাঞি পাইল ঠেসন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাঞি পাইল ঠেসন। চৌদ্দ যুগ বহিয়া গেল ততক্ষণ॥
ধর্ম্ম ঠেসন হইতে উলুক জন্মিল। জোড় হস্ত করি উলুক সম্মুখে দাঁড়াইল॥
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলুক কত যুগ যায়॥
যত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাঙ আমি মগ্নধিয়ানে॥
মগ্ন ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। চৌদ্দযুগের কথা শুন আমার গোচর॥
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি শুন নৈরাকার। ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর॥
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল। তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আদ্য মূল॥
নানা পত্র বায়ু গেল এতিন ভুবন। পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন॥
দ্বাদশ বৎসর মৃত্তিকায় লাগি পাইল। হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা। শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা॥
পুনরপি আসিঞা পদ্মেত কৈল ভর। মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নৈরাকার॥
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম্ম অধিপতি। কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ[৮] বসুমতী॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজমূর্ত্তি[৯] হইল। গজের উপরি বসুমতীকে স্থাপিল॥

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ২৪৯। ২। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, একাদশ ভাগ, পৃঃ ৩৪; সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৪৯। ৩। ঐ, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ২৪৯।

৪। ঐ, ঐ, পৃঃ ২৪৮। ৫। ঐ, একাদশ ভাগ, পৃঃ ৩৬ ৩৭, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ২৫০-২৫২। ৬। <যুহিতি? ৭। —ইন্দু? বিষ?
৮। 'নির্ম্মল'? <নির্ম্মাইল? ৯। 'গজযুক্ত'।

গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজ সহিতে পৃথিবী যায় রসাতল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই কূর্ম্মরূপ হৈল। কূর্ম্মের উপরে পৃথিবী রাখিল॥
কূর্ম্ম সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজকূর্ম্মে পৃথিবী যায় রসাতল॥
টানিঞা ছিড়িল গলার কনক পৈতা। এক গোটা নাগ হইল সহস্রেক মাথা
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন॥১
যাও যাও বাসুকি হউক চিরাই। আমি যাকে জন্ম দিব তাকে দিহ ঠাই॥২
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্ব্বজয়া। যে ঘাটে অবতার করিবে মহামায়া॥
দেবীর চরণে মাণিকদত্তে গায়। নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায়॥

নিম্নে উদ্ধৃত হেঁয়ালী অংশটি কৌতুকাবহ। ভাষা অবশ্য কতকটা আধুনিকতাপ্রাপ্ত।

আমারে বোল ডান রে বুড়িরে বোল ডান। কার খাইনু ভাতারপুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী। দ্বারে বোসে থাইনু মুঞি চৌদ্দঘর পড়সি॥
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বারবার। দ্বারে বোসে খাইনু মুঞি বুড়া পোদ্দার॥
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল। দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার। আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার॥৩

মাণিক-দত্তের চ ণ্ডী ম ঙ্গ লে র পরিচয় এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই স্বল্প পরিচয় হইতেই বোধ হইতেছে যে কাব্যটি যথেষ্ট বিশেষত্বশালী। এই লুপ্তপ্রায় কাব্যের পুঁথি অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হওয়া এখনই প্রয়োজন। বিলম্বে একেবারেই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

[৯৩]

মাধবাচার্য্যের চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল কাব্য "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা" অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দে বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয়ও দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই: আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার তটবাসী দ্বিজবর পরাশর কবির পিতা ছিলেন।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড়মধ্যে সপ্তগাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদীতটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ (অঙ্গ) দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥

দীনেশ বাবুর মতে কবি ময়মনসিংহ জেলায় বাস উঠাইয়া লইয়া যান। ইহাঁর পিতামহের নাম ছিল ধরণীধর বিশারদ এবং ইহাঁর পুত্রের নাম ছিল জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। কোথা হইতে যে এই সংবাদটুকু পাওয়া গেল তাহা দীনেশ বাবু বলেন নাই। সুতরাং এই উক্তির উপর মোটেই আস্থা স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল-কার মাধবাচার্য্যকে অনেকে শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল-কার মাধবাচার্য্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল-কার মাধবাচার্য্য দুইজন ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন শ্রীচৈতন্যের পারিষদ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথা উঠিতেই পারে না। অপর মাধবের পিতার নামও ছিল পরাশর, এবং ইনিও সম্ভবতঃ ত্রিবেণীতে অথবা ত্রিবেণীর কাছাকাছি কোন স্থানে বাস করিতেন।[৪] ইহা হইতে অনুমান হইতে পারে যে, চ ণ্ডী ম ঙ্গ ল-রচয়িতা মাধবই একখানি শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। তবে যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, চ ণ্ডী-ম ঙ্গ ল রচনা করিবার পরে মাধব-আচার্য্য বৈষ্ণবমতাবলম্বী হয়েন এবং শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল রচনা করেন।

[৯৪]

উপাখ্যানভাগে মাধবের চ ণ্ডী ম ঙ্গ লের সহিত মুকুন্দ-রামের চ ণ্ডী ম ঙ্গ লে র সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। মাধবের কাব্যের পরিচয় হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত ভাঁড়ুদত্তের প্রবঞ্চনা ও অপমান-কাহিনীর অংশ হইতে ইহা পরিলক্ষিত হইবে।

১। তুলনীয় বিষ্ণুপালের ম ন সা ম ঙ্গ লে—
কান্ধের ছিড়িঞা ফেলে কনক পইতা। এক গোটী নাগের হইল সহস্র গোটা মাথা॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তার সমর্পিলা প্রভুর ই তিন ভুবন॥

২। তুলনীয় ঐ—
আস্ত আস্ত বসুমতি হইঅ চিরাই। আমি যাকে জন্ম দিব তুমি দিহ ঠাঞি॥

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একাদশ ভাগ, পৃঃ ৬৮।

৪। বঙ্গশ্রী, ১৩৪২ সাল, বৈশাখ, পৃঃ ৪৪৭, ৪৫০।

ইহা হইতে আরও দেখা যাইবে যে, ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রবর্ণনায় মুকুন্দরামের মত সংযম মাধবাচার্য্য দেখাইতে পারেন নাই।

কর্ণাট রাগ।

নগরে প্রজার ঘর হৈল সারি সারি। নেতের পতাকা উড়ে বাড়িরং১ উপরি॥
নগরে বসতি করে যত প্রজালোকে। দুর্গার প্রসাদে কারু নাহি রোগশোকে॥
রাজবিগ্রহ২ নাহি তাতে নাহি দস্যুভীত। দুর্গার প্রসাদে লোক থাকে হরষিত॥
রাজদ্বারে বাদ্য যত বাজে সন্ধ্যাকালে। আসিয়া পশ্চিমা আন (?) মাধয়ে চাওয়ালে॥
দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি। কনক কলসি ভরি প্রজা খাএ পাণি॥
নগরে বসিল প্রজা হইয়া হরষিত। ঘরে ভাত নাহি ভাঁড়ু৩ দৈবের লিখিত॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥
কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাম। বেলান্তে নিশ্চিন্ত হৈয়া দিবানেতে যাম॥
জেন মাত্র ভাঁড়ু-দত্তে কৈলে হেন বাণী। ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী॥
জেন মত কহ লোকে বলিবেক বাউল। কালি৪ কৈলা উপবাস আজি কোথা চাউল॥
স্ত্রীর বচনে ভাঁড়ু ভাবে মনে মনে। আজুকার অন্ন আম্মা মিলিব কেমনে॥
ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া। চাওআলের মাথাএ বোঝা দিলেক তুলিয়া॥
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্য মাত্র সার। ত্বরাএ পাইল গিয়া নগর বাজার॥
দনাই নামে চালুয়া পসার দিয়া আছে। ধীরে ধীরে ভাঁড়ু-দত্ত গেল তার কাছে॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে দনাই৫ চাউল দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া জাইমু তোরে।
দনাক্রি বোলে ভাঁড়ু-দত্ত চাউল নাহি এথা। বারে বারে চাউল খাও কহি মিথ্যা কথা॥
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া আগে মজুত দেহ কড়ি। রাজু (?) দিয়া পাঠাইব চাউল লইব বাড়ি॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে দনাই কহিএ তোমারে। ধনের গর্ব্বে মন্দ কথা বোলসি আহ্মারে॥
ঘরের ভিতরে ধন রাখ গোফা গোফা। গিরির মাথা চুল নাক্রি নাবার মাথাএ সে খোপা॥৬
ভাল মোর অধিকার আছএ নগরে৭। কালুকা পাইমু তোরে হস্তের উপরে॥
ভাঁড়ুর বচনে দনা৮ কাঁপে থর থর। আস্তে বাস্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর॥
পরিহাস করিলাম৯ করি দড়াদড়ি। চাউল নিয়া খাও তুহ্মি কড়ি দিহ বাড়ি॥

এতেক শুনিয়া ভাঁড়ু বান্দিল চাপিয়া। সের অষ্টাদশ চাউল লইল মাপিয়া॥
চাউল লইয়া চইল তবে ভাঁড়ুর গমন। পুড়ার১০ পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে পুড়া কহি নিজ কাজ। বাছিয়া বাছিয়া মোরে দেহত আনাজ॥
নিত্য নিত্য জোগাও আনাজ দেও মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া জাইমু তোরে॥
সাত পাঁচ বুলি তারে বোলে ভাই ভাই। শাক খাইব (?) নমুনা লইল তার ঠাঁক্রি॥
আনাজ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। নোনের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
মুলুকি১১ মুলুক বলি গেল তার কাছে। কালুকার মজুত নোন তোহ্মা স্থানে আছে॥
বিশাস (?) বোলাইয়া বীরবরের গোচর। যতেক মজুত কড়ি বোলএ সত্বর১২॥
যতেক মলুকিগণে ভোলাইয়া তোলে। বাছাই (?) মুলুকি সবে তথায় নোন তোলে॥
বাছাই (?) মলুকি তথা নোন তোলে তখনে। নোনের আড়াঙ্গ করিছে স্থানে স্থানে॥
তে কারণে তোহ্মার নোন কেহ নাহি কিনি। তোহ্মার ভাগ্যে সেই স্থানে আইলাম আপনি॥
অশেষ বিশেষ আহ্মি কহিলাম পুনি। প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত কৈল বীরমণি॥
মুলুকি বোলে ভাঁড়ু-দত্ত কৈলা উপকার। কিছু নোন লইয়া যাও আপনে খাইবার॥
লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। তৈলের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
কি তৈল কি তৈল বুলি হাত জাবড়াএ। আপনার গোফে দিল ছাওআলের মাথাএ॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে তেলি তৈল দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া জাইমু তোরে॥
ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিগে চাহ। এক পাবা তৈল দিমু বাড়ি লৈয়া যাহ॥
তৈল লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। পানের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে বারুই কহি তোর ঠাঁই। গুরুকীর্ত্তন কালু কাজে পান কিছু চাহি১৩॥
বারুই বোলে ভাঁড়ু-দত্ত আইলা এথাএ। এক বিড়া পান নেহ কড়ির নাহি দাএ॥
পান লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। গুআর পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে পসারি গুআ দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া জাইমু তোরে॥
পসারি বোলে ভাঁড়ু-দত্ত গুআ নাহি এথা। বারে বারে খাও গুআ কহি মিথ্যা কথা॥
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া আগে মজুত দেহ১৪ কড়ি। রাজু (?) দিয়া পাঠাইব গুআ পাইবা বাড়ি॥
ভাঁড়ু বোলে তোর বাক্য লাগিল তরাস। গুআর কড়ি হোতে ফাঙ্গা (?) পাইমু১৫ একমাস॥

১। 'বিরের'। ২। 'বির্গ্র'। ৩। 'ভার'। পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথি বলিয়া সর্ব্বত্রই ড় স্থানে র প্রয়োগ এবং চন্দ্রবিন্দুর লোপ হইয়াছে। ৪। 'কালু' পাঠান্তর। ৫। 'ধনা' পাঠান্তর। ৬। 'গিরির মাথে চুল নাক্রি বাইবনের মাথাএ সে খোপা' পাঠান্তর। ৭। 'ভালহি নরপতি মোর আছে এ নগরে' পাঠান্তর। ৮। 'ধনা'। ৯। 'কৈলাম ভাই' পাঠান্তর।

১০। 'পুরার'। ১১। 'মনকি' বা 'মলকি' পাঠান্তর। ১২। 'জগেক মলকি সব বোলাইছে সর্ব্বর' পাঠান্তর। ১৩। 'পচিস বিরা পান চাহী' পাঠান্তর। ১৪। 'মজুতে আন' পাঠান্তর। ১৫। 'ফাঙ্গাতে পার হৈল' পাঠান্তর।

সেই খানে বসি আছে গোবিন্দ-পালিত। কি কৈলা কি কৈলা ভাঁড়ু বাক্য বিচলিত॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে প্রজা বার্ত্তা নাহি পাও। সুখে অন্ন জল খাও সুখে নিদ্রা যাও॥
মহাবীর স্থানে লেখিছে দণ্ডধর। একত্রে পাঠাইয়া দেহ গুজরাটের কর॥
পত্র পড়ি চাহি বোলে ব্যাধনন্দন। বোলে কোন মতে হৈব গুজরাটের ধন॥
হেনকালে বসিছিলাম বীরের এক ধারে। ধণ্ডেক ফাঙ্গার (?) ভার দিবেক আন্ধারে॥
যত কথা কহে বীর আন্ধা করি বড়া। গাদু কম্বলা দিল পাদের পাছোড়া॥
কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাব ঘরে ঘরে২। তুলিয়া দিবেক টান গাছের উপরে॥
থর থর কাঁপ দেখি কোপ গেল হর (?)। পুত্র থাকিতে যেন বাপ আটখোর॥৩
ভাঁড়ুর বচনে প্রজা কাঁপে থরথর। আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া ভাঁড়ুর ধরে কর॥
পরিহাস করিলাম করি৪ দড়াদড়ি। গুআ নিয়া যাও তুন্ধি নাহি দিও কড়ি॥
গুআ লইয়া হইল যে ভাঁড়ুর গমন। কাপড়ুয়া৫ হাটে গিয়া দিল দরশন॥
মধ্য নগরে ভাঁড়ু প্রজারে করে বল। চিঁড়া মিঠা লৈল ভাঁড়ু সন্দেশ বহুতর॥
বেসাতি করএ ভাঁড়ু কারেও৬ না দেয়৭ কড়ি। পসার দিয়া বসি আছে খোসের মাও বুড়ি॥
তের বুড়ির দধি ভাঁড়ু হস্তে করি লইল। সেই দধি লই ভাঁড়ু মন্তরে চলিল॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে শুন খোষের মাও বুড়ি। দধিখান লইয়া যাই কড়ি লইও বাড়ি॥
পরিচারক নাহি দোহাইতে গাই। গুখিয়া (?) দ্রব্য নহে তোর ধারে দিয়া যাই॥
কথার চেঁছড় তুন্ধি দধি খাইতে চাহ। আপনার মাথা খাও দধি এড়ি যাহ॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে বুড়ি কি বুলিব তোরে। ধনের গরবে এত বোলসি আন্ধারে॥
তোর পুত্র শ্যাম-ঘোষ তেকারণে সহি। অন্য জন হইলে এহার কথা কহি॥
চোরা গাই লৈয়া৮ বুড়ি তোহ্মার বসত। এহার বাদী হইআছে গ্রামের রায়ত॥
ভাঁড়ুর বচনে বৃদ্ধা অন্তরে কাঁপিল। করেত ধরিয়া তাকে কহিতে লাগিল॥
পরিহাস কৈল বাপু৯ কহি১০ দড়াদড়ি। খাও নিয়া দধি তুন্ধি কালি১১ দিহ কড়ি॥

দধিখান লইয়া হৈল ভাঁড়ুর গমন। মৎস্যের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে। পসার হোতে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে১২॥
মৎস্য ধরিয়া ডোমনিএ১৩ পাড়ে টানাটানি। কড়ি না দিয়া মৎস্য লইয়া যাও কোন॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে ডোম বলিএ তোহ্মারে। এত কাল মৎস্য বেচ কর দেহ কারে॥
ডোমনীএ বোলে ভাঁড়ু তুমি হও কে১৪। করের লাগি ধরিবেক জোআতি হএ যে॥
এই মুখে তুন্ধি আন্ধার মৎস্য খাইবা। মোর সঙ্গে এখনে বীরের স্থানে যাইবা॥
গালাগালি বাজিল বহুল হুড়াহুড়ি। কোমরে থাকিয়া তার পড়ে১৫ ভাঙ্গা কড়ি॥
ভাঙ্গা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বড় লাজ পাএ। মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলাএ॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু-লোভে। দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

সেই দিন ভাঁড়ু-দত্ত বাকিলা মন্দিরে। প্রভাতে উঠিয়া যায় দেয়ান করিবারে॥
সেই দিন মহাবীর মিলিল সভাত। মধ্যস্থানে বৈসে ভাঁড়ু আচ্ছাদি সবাত১৬॥
সেই দিগে কালকেতু পাতিছিল১৭ মন। তখনে না বোলে কিছু সভার১৮ কারণ॥
পুষ্প চন্দন দিল প্রজাগণের তরে১৯। দেয়ান ভাঙ্গিয়া প্রজা গেল নিজ ঘরে॥
আগে চন্দন পাইলেক মণ্ডল দুচন। তাহা দেখি ভাঁড়ু-দত্তের পুড়ি উঠে মন॥
অন্তরে পোড়এ ইহা সহিতে না পারে। স্ফুটভাষী২০ হইয়া কহে সভার ভিতরে॥
ঠাকুর যে অল্পজাতি কি বুলিমু তোরে। তুন্ধি কি জানিবা বীর আন্ধার ব্যবহারে॥
দত্তকুল অল্প জাতি তোহ্মার গেআন। ভাঁড়ু-দত্ত থাকিতে চন্দন পাএ আন॥
যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে। মাংসের পসরা লইয়া ফুলরা যায়২১ হাটে॥
এখনে২২ পরের ধন পাইয়া২৩ ঠাকুরাল। হেন জান সেই ধন তোহ্মার হৈস২৪ কাল॥
আন্ধারে দেখিয়া তুন্ধি কর২৪ অল্প জ্ঞান। এই পুরী মজাইতে চলিনু দেআন॥
মহাবীরে বোলে মোর ধারে আছে কে। নিরজাস করিয়া কিছু ভাঁড়ুর তরে দে২৫॥

১। 'কর্ম্মল'। ২। 'সভার তরে' পাঠান্তর। ৩। কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটি নাই। ৪। 'কৈল', 'কহি'। ৫। 'কাপরুআ', 'কাপরয়া'। ৬। 'কারুকে' পাঠান্তর। ৭। 'নদে'। ৮। 'কিনিআ' পাঠান্তর। ৯। 'করিলাম' পাঠান্তর। ১০। 'কৈল' পাঠান্তর। ১১। 'কাইল'।

১২। 'পসারের মৎস্য ধরি ভাঁড়ু-দত্তে তোলে' পাঠান্তর। ১৩। 'ডোম' পাঠান্তর। ১৪। 'তুই তার কে' পাঠান্তর। ১৫। 'কছ হোতে ভাঁড়ুদত্তের পরে' পাঠান্তর। ১৬। 'সভাত', 'সভাকে'। ১৭। 'দিআছিল' পাঠান্তর। ১৮। 'প্রজার' পাঠান্তর। ১৯। 'সিরে' পাঠান্তর। ২০। 'স্ফুটবাদি'। ২১। 'জাইত' পাঠান্তর। ২২। 'অখনে'। ২৩। 'হইছে' পাঠান্তর। ২৪। 'আমারে কুরূপ দেখি মনে' পাঠান্তর। ২৫। 'নিঃস্বাস করিয়া ভারুর গালে চোয়ার দে' পাঠান্তর।

ভাঁড়ু-দত্ত ধরে পাইক করি ধরাধরি[১]। চোয়াড় চাপড় মারে উপাড়ে গোঁপ দাড়ি[২]॥
কিলের কারণে ভাঁড়ু ফাটি যায় বুক। ভূমিতে পড়িয়া দেখে মণ্ডলের মুখ॥
মণ্ডলে বোলএ বাপু করি নিবেদন। লাঘব হইল ভাঁড়ু রাখহ জীবন॥
মণ্ডলের বাক্যে ভাঁড়ু এড়ান পাইল। ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা বাড়িতে চলিল॥
বাড়ির নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। ত্বরায় আনিয়া দেহ এক হাঁড়ি[৩] পানি॥
প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা বাহাসে করি আনি দিল নীর॥
ভাঁড়ু-দত্ত দেখিয়া যে রমণী ফাঁফাএ। দেয়ানেতে গেলা তুহ্মি ধুলা কেনে গায়ে॥
ভাঁড়ু-দত্তে বোলে প্রিয়া শুনরে করুণা। মহাবীরের সঙ্গে আজি[৪] খেলাইছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীরে হারিল দশ পাটি। রসের রসিক হৈয়া কৈলা ধুলাধুলি॥
ধুলাধুলি করিয়া যে বড় পাইনু রস[৫]। মহাবীরের গায়ে দিছি এমন দ্বাদশ (?)॥
কি বোলিতে পারি প্রিয়া বীরের মহত্ব। তাহার[৬] পিরীতে বশ্য হৈল ভাঁড়ু-দত্ত॥
মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত। বাড়ির গোবার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেআনেরে যায় ভাঁড়ু মনে নাহি হেলা। চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচকলা॥
বীরের থাসি লৈয়া ভাঁড়ু দেআনেত যায়। তারকপুর সিঙ্গারপুর ত্বরায় এড়ায়[৭]॥
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট। উপনীত হৈল গিয়া যথা রাজপাট॥
ভেট সজ্জ থুইয়া ভাঁড়ু যায় এক ভাগে। দণ্ড প্রণাম কৈলা ভূপতির আগে॥
সারদার চরণ[৮]-সরোজ-মধু-লোভে। দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে॥[৯]

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্তিরস ও অদ্ভুত রসের একঘেয়েমির মধ্যে ভাঁড়ুদত্তের এই চরিত্রবর্ণনা আতিশয্য দোষযুক্ত হইলেও মোটের উপর ভালই লাগে। [ক্রমশঃ

১। 'ভারু লইআ বিরের পাইকে করে ধরাধরি' পাঠান্তর। ২। 'চাপর মারি উখারিল দাঁরি' পাঠান্তর। ৩। 'হারি। ৪। 'আছ', 'আহ্মি'। ৫। 'ধুরাধুরি করিয়া পাইছি বর রস' পাঠান্তর। ৬। 'তাহান' পাঠান্তর। ৭। 'আপনার পুরি এরি চণ্ডির হাট পাএ' পাঠান্তর। ৮। 'চরণে'। ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩১৮ ও ৬১১৭ সংখ্যক পুঁথি অবলম্বনে।

কুটীরের গান

—শ্রীমাধুরী ভট্টাচার্য্য

পথে যেতে তুমি মোরে ডেকে যাও দয়িত আমার,
তোমার যাত্রার পথে সঙ্গিনীরে নিতে চাও সাথে;
সাড়া দিতে পারি কই?—বেদনায় কাঁদি নিরালাতে—
পুঞ্জীভূত অক্ষমতা দুঃখ শুধু দেয় বার বার।

আমার অঙ্গনে প্রিয় জমিয়াছে সহস্র জঞ্জাল,
তোমার চলার পথে পায়ে পায়ে পারি না চলিতে,
কুটীরের কল্প-কেলি পারি না যে দুপায়ে দলিতে
তারা মোর তনুমনে রচিয়াছে মায়া-ইন্দ্রজাল।

তুমি চল হে পথিক আমি থাকি শুধু প্রতীক্ষায়,
চলিবার পথে ক্লান্ত অবসন্ন আসিবে যখন
মোর স্নিগ্ধ সেবা-যত্নে ভরে যেন উঠে দেহ মন—
আমার প্রসন্ন নীড়ে পথক্লান্তি যেন চলে যায়।

মোরে তুমি দিয়ো বন্ধু চিরমুক্ত পথের সন্ধান,
তোমারে শুনাব আমি প্রেমমগ্ন কুটীরের গান।

আকাশপথে

উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রেড্‌রিক সিম্‌পিক উড়ো-জাহাজে ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে বুয়েনস্ এরিস্ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন কারিব সাগরের পথ দিয়ে। পথে কারিব সাগরের মনোরম দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করেন, তারপর ওরিনাকো ও আমাজন্ নদীর ব-দ্বীপ, তার পর ব্রেজিলের শ্যামল উপকূল।

তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

'হাভানা বন্দর পার হয়েছি মিনিট চল্লিশ হবে, এমন সময় দূরে সমুদ্রবক্ষে ঘন কালো ঝোড়ো মেঘের নীচে একটা প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দেখা গেল। আমরা তার চারিধারে চক্রাকারে উড়লাম, এবং উড়োজাহাজ থেকে জলস্তম্ভের ফটো নিলাম। ঠিক একটা কৃষ্ণসর্পের মত সেটা প্রথমে মেঘের কোল থেকে নাম্‌ল —ক্রমে সেটা মোটা হ'তে হ'তে ৬০০ ফুট দীর্ঘ চিম্‌নীর আকার ধারণ করলে। যেখানে তার সঙ্গে সমুদ্রের জলের মিলন ঘটল, জলস্তম্ভের শুঁড়টা সমুদ্রের সেই অংশটা যেন মন্থন করছে। তার পর জলস্তম্ভটা একটু বেঁকে গেল এবং এদিক-ওদিক দুলতে লাগল, যেন কোনো অতিকায় অশ্ব তার পুচ্ছ আন্দোলন করছে— এই পুচ্ছটা ক্রমে ক্রমে বেঁকে আকাশের দিকে উঠে যেতে যেতে ঘন বৃষ্টির ধারার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমাদের ভাগ্য ছিল ভাল। জলস্তম্ভের এ-ধরণের ফটো নেওয়া বড় একটা ঘটে না।

আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শুধু দৃশ্যাবলীর ফটো নেওয়া নয়, পথে যে সকল স্থান পড়বে, তাদের লোকজন, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা ছিল আমাদের প্রধান কার্য্য। আর মনে ভাবুন, আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি। কিউবা, হেইটি,
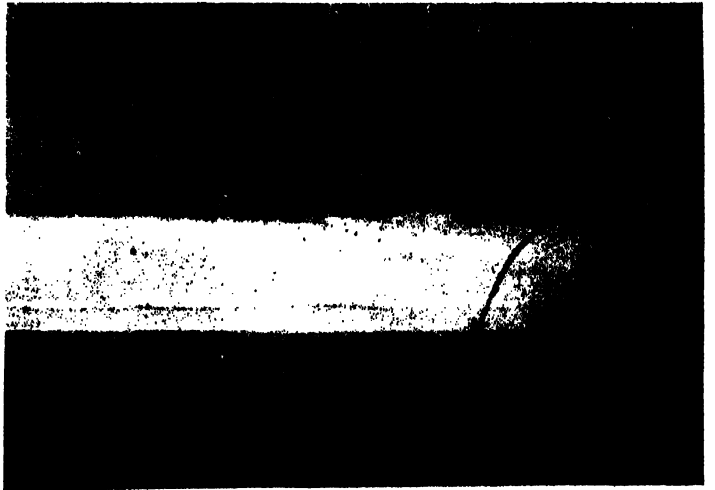
জলস্তম্ভ : প্রায় সাত মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। উড়ো-জাহাজ হইতে ফটো তোলা

পোর্টো রিকো, ভার্জ্জিন দ্বীপপুঞ্জ—তারপর আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে চিলি এবং পেরু—কত ধরণের মানুষ, কত ধরণের ভাষা, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, স্থাপত্যরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য!

মে মাসের চমৎকার সকাল বেলাটিতে ওয়াশিংটন থেকে আমরা আকাশে উড়লাম—নিউইয়র্ক ও বুয়েনস্ এরিস সহরদ্বয়ের মধ্যে যে যাত্রী ও ডাকবাহী উড়ো-জাহাজের সারি যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম উড়ো-জাহাজে আমরা

যাচ্ছিলাম। আমাদের জাহাজের নাম "আরজেন্টিনা"—নিউ-ইয়র্ক, রিয়ো, বুয়েনস এরিস, সংক্ষেপে "নিরব:" লাইনের; প্যান আমেরিকান্ এয়ারওয়েজ কোম্পানী এর পর এই জাহাজ খানাকে কিনে নিয়েছিল।

সান্টিয়াগো ডি কিউবা বন্দর: পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই বন্দরের মুখে স্পেন আর আমেরিকার যুদ্ধ মারাত্মক হইয়া উঠে।

নীচে চেয়ে দেখি পটোমাক নদীতীরের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছি—মাউন্ট ভার্ণন্, হ্যাম্পটন রোড্স্-এ নঙ্গর-করা আমাদের রণতরীর সারি, নরফোক্ সব ছাড়িয়ে আমরা সমুদ্রের উপর অনেকটা চলে গেলুম—পশ্চিমে বিখ্যাত 'বিষণ্ণ জলা (dismal swamp)'র নীল কৃষ্ণ, অস্পষ্ট সীমারেখা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

মিয়ামির দক্ষিণে ফ্লোরিডার নিম্ন উপকূলভূমি দেখা দিল। কর্দ্দমময় জনহীন ও ম্যানগ্রোভ গাছের জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল ও লোনাজলের খাড়ি। সমুদ্রে নানা ধরণের সিন্ধু-শকুন উড়ছে, শুশুকের দল জলের উপর ভেসে উঠে খেলা করছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রবালের বাঁধের উপর সন্তরণশীল মৎস্যের ঝাঁক চোখে পড়ছে।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কি-ওয়েষ্ট্ সহর। আমরা এর উপরে অনেকক্ষণ চক্রাকারে ঘুরে এই সহর ও চারি পাশের দৃশ্যাবলীর ফটো নিলাম। তার পরে যেমন আবার আমরা সমুদ্রে পড়েছি—একেবারে উষ্ণমণ্ডলের ঝড় ও জলস্তম্ভ আমাদের সামনে! এই জলস্তম্ভের কথা প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি। বিশ বছর পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে মনে আছে একবার চীন-সমুদ্রে এক জলস্তম্ভের সান্নিধ্য এড়াবার জন্যে আমাদের ষ্টীমার অনেকদূর দিয়ে ঘুরে গিয়েছিল, আর আজ উড়ো-জাহাজ থেকে আমরা তাকে গ্রাহ্যও করলাম না—উপরন্তু তার ফটো নিলাম।

হাভানা বন্দরে যখন পৌছেছি তখন ভয়ানক বৃষ্টি নেমেছে। সমুদ্রের ধারে উত্তেজিত জনতা গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও ঝড় ও জলস্তম্ভের বিষয় আলোচনা করছিল, কারণ জলস্তম্ভটা বন্দর থেকে বেশ দেখা গিয়েছিল। কিউবার রাজধানীতে সর্ব্বত্র বেশ একটা সজীবতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বেশীক্ষণ সেখানে বিলম্ব করবার উপায় ছিল না। আমরা তখনই উড়লাম এবং এই ফলশস্যপূর্ণ শ্যামল দ্বীপটি আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে খাড়া দক্ষিণমুখে রওনা হ'লাম।

তার পরে কতকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান পথে পড়ল সিয়েন্‌ফিউয়েগো নামক ছোট একটি সহরে আমাদের উড়ো-জাহাজে গ্যাস ভরে নেওয়া হ'ল। তার পরে আমরা সান্টিয়াগো বন্দরে ঢুকলাম। ত্রিশ বছর আগে লেফ্‌টেনাণ্ট হবসন মেরিমাক্ জাহাজ এই বন্দরের মুখে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, কারভেরার রণতরীদলকে বন্দরের মধ্যে আটকাবার জন্যে!
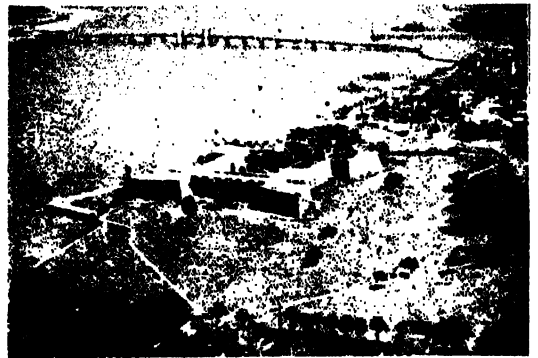
ফ্লোরিডা: সেন্ট আগষ্টিনের প্রাচীন দুর্গ ফোর্ট মেরিয়ন। চারি পার্শ্বের সংরক্ষণী-ব্যবস্থা—খাল, সচল সেতু, বন্দুক রাখিবার স্থান ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বন্দর থেকে একটু দূরে সানজুয়ান পাহাড় স্পেনীয় আমে-

রিকান্ যুদ্ধের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঐ পাহাড়ের শান্ত শ্যামল সানুদেশে সেই বিখ্যাত 'শান্তিবৃক্ষ'টি এখনও

সানজুয়ানের সানুদেশে শান্তিবৃক্ষ : নীচের প্রস্তরফলকগুলি স্পেনের সহিত যুদ্ধে পতিত আমেরিকার বীরদের স্মৃতি-চিহ্ন।

বর্ত্তমান, যার তলায় জেনারেল শ্যাফ্‌টার স্পেনীয় সেনাপতির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সান্টিয়াগোর হোটেলে আমরা রাত্রি কাটালাম। আমেরিকান্ ভাইস্-কনসাল্ ও একজন তামাকের ব্যবসায়ী ছাড়া আর কোনো নিজের দেশের লোকের দেখা পেলাম না। এ সব অঞ্চলের সহরগুলি আমেরিকার ছাঁচে তৈয়ারী। বাড়ীঘরের স্থাপত্য রীতি, লোকজনের বেশভূষা, হোটেলের ব্যবস্থা, সিনেমা ইত্যাদি—যুক্তরাজ্যের যে কোন সহরের মত।

তবে যুক্তরাজ্যের লোক এসে এখানে কিউবার সাধারণ লোকের সঙ্গে চাকুরীতে বা কুলীগিরির প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। কিউবার লোক যত কম মাইনে নিয়ে খাটবে, কোনো আমেরিকান্ তত কমে খরচ চালাতে পারবে না।

আমেরিকা ও প্রাচীন সান্টিয়াগো বন্দর অতীত স্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। কতকগুলি বন্ধন বেশ প্রাচীন, যেমন এই সহরের মেয়র হার্ণেণ্ডো কর্টেজ জাহাজ ভাসিয়ে একদিন এখান থেকে রওনা হয়েছিলেন মেক্সিকো-বিজয়ের জন্যে। চারটি শতাব্দীর বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, মহামারী, ভূমিকম্প, জলদস্যুর উপদ্রব ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সহর স্পেনের প্রধান ঘাটি ছিল।

এই ঘাটি স্পেনের শেষ ঘাটিও বটে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই বন্দরেরই অনতিদূরে সানজুয়ান পাহাড়ের সানুদেশে একটা বড় সিবা (ceiba) গাছের তলে শ্যাফ্‌টার, রুজভেল্ট ও উড্ মিলিত হয়ে পশ্চিম মহাদেশে স্পেনীয় আধিপত্যের শেষ দিন ঘোষণা করেন।

সানজুয়ান পাহাড় এখন একটা পার্ক। সকালে বিকালে সহরের অনেক লোক সেখানে বেড়ায়। সানজুয়ানের যুদ্ধে যে সকল আমেরিকান, স্পেনীয় ও কিউবা দ্বীপের যোদ্ধা মারা পড়েছিল, তাদের উদ্দেশে এই পাহাড়ের গায়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়েছে।

কিউবা দ্বীপ আজ স্বাধীন। অনেক স্কুল কলেজ এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজ শিক্ষার প্রতি এদের খুব ঝোঁক। চিনি ও তামাকের ব্যবসায়ে কিউবা বিত্তশালী। এখানে যে চুরুট তৈরী হয়, তার পৃথিবী জুড়ে নাম।

বেলা পড়ে এসেছে। সহরবাসীরা দলে দলে চলেছে সিনেমাতে। একটা সিনেমা 'টম কাকার কুটীর' (Uncle Tom's Cabin)-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কাছেই ফুটপাথের উপর একটা জীর্ণবস্ত্র পরা ছোক্‌রা—সে আমার জুতো পালিশ করতে ছুটে এল। আমি বললাম—রাখ জুতো, পালিশ করবার দরকার নেই।

সান্টিয়াগো ডি কিউবা উপসাগরের উপরিবর্ত্তী মরো দুর্গ আমেরিকার ইতিহাসে অমর।

সে বললে, আমায় দয়া করে পঞ্চাশ সেণ্টই দেবেন। আমি ঐ নতুন ফিল্মটা না দেখলে আজ মরে যাব। সবাই যাচ্ছে। মুখের উপর ছোকরাকে 'না' বলতে বাধল।

তার পর আরও কত দ্বীপ, নদী সহর আমাদের বেগবান উড়ো-জাহাজের তলায় উড়ে গেল। বড় বড় পর্ব্বত যেন ধীরে ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একবার আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখি, নীচে হেইটি দ্বীপ ও তার রাজধানী পোর্টো-আ-প্রিন্স, আমাদের জাহাজ তার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে।

সারবন্দী সবুজ গাছপালার মধ্যে হেইটি দ্বীপের সাদা সাদা বাড়ীগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে! কত ইতিহাস জড়ানো রয়েছে হেইটি দ্বীপের সঙ্গে! লাক্লার্ক (Leclerk), যে নেপোলিয়নের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিল,···নিগ্রো রাজা ক্রিষ্টোফ্, ······হেইটিতে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবার সময়ের সেই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড!

যখন এদেশে স্পেনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিশ লক্ষ ইণ্ডিয়ান বাস করত এখানে! তাদের বংশধর একজনও এখন বেঁচে নেই। বর্ত্তমানে হেইটির শ্যামল উপত্যকাগুলিতে ও পাহাড়ের ধারের গ্রামে যে সব লোক বাস করে, তারা আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসগণের বংশধর।

হেইটির লোক যে ফরাসীভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, তা কোন ফরাসী বুঝতে পারবে না। এ এখানকারই ভাষা, বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার নিগ্রোদের মুখে মুখে ফরাসী ভাষা পরিবর্ত্তিত হয়ে তার এখন এই রূপ দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার প্রভাব এখানেও বড় কম নয়। আমেরিকান মিশনরীরা এখানে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছে, এদের উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য শিখিয়েছে।

হেইটি দ্বীপের উপকূল: এখনও প্রাচীন ব্যবস্থার বহু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

সহর ছেড়ে কিছুদূর যাও, মনে হবে আফ্রিকার অপরিচিত অরণ্য-জীবনের মধ্যে এসে পড়েছ। ছাতার মত গোল চালাঘর, তার নীচে বসে নিগ্রো মেয়েরা কাফিফল গুঁড়ো করছে, রাখালেরা গরুর পাল চরাচ্ছে পাহাড়ের নীচে। ক্যামেরা দেখলেই তারা ঘরের মধ্যে ছুটে পালাবে, নয় তো হেসেই খুন হবে।

হেইটিতে ফলের বাগান যথেষ্ট। বড় বড় উপত্যকাগুলি আম, পেঁপে, কমলালেবু, রুটীফল, নারিকেল প্রভৃতি ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। বাজারে এসব ফল খুব সস্তা। এক ধরণের অদ্ভুত গাছ দেখলাম, তার ডালে যেন বড় বড় সবুজ ফুটবল ঝুলছে। এই ফলের ভিতরটা নাকি ফাঁপা, শাঁস নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলিকে জলপাত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে।

হেইটির অরণ্য অঞ্চলে বন্য কাফি হয়। আবার কতক চাষও করা হয়। কাফি এখানকার প্রধান ফসল। কাফি চূর্ণের উপর তপ্ত ইক্ষুরস ঢেলে সবটা ঘুঁটে কাদার মত করে ফেলে। এই জিনিস এদেশের একটা প্রিয় খাদ্য।

গাছতলায় ছোট একটা গ্রাম্য বাজার। দোকানে মাটীর পাইপ, ক্রুশ, সাবান, কাসাভার রুটী, আদা ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। জিনিসপত্র খুব সস্তা। দুজনে খেয়ে শেষ করা যায় না—এমন একটা রুটীফলের দাম মাত্র এক সেণ্ট। খাদ্যদ্রব্য এত সস্তা বলে' হেইটি দ্বীপের মজুরেরা দৈনিক ২৫ সেণ্ট মজুরীতে খাটতে পারে।

রবিবারের সকাল বেলা আমরা পোর্টো প্রিন্স ছেড়ে আকাশে উড়লাম। আমাদের নীচে শস্যশ্যামল উপত্যকা, দূরে এন্‌রিকিলো হ্রদ, হ্রদের উত্তরে দশ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতমালা। হ্রদের কর্দ্দমময় তীরে কুমীরের দল রোদ পোহাচ্ছে, উড়ো-জাহাজের শব্দ শুনে জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

হ্রদের পূর্ব্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকালয় দেখা গেল না। কেবল মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে, পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে বন্য অশ্বের দল বিচরণ করছে। তার পরেই আবার সমুদ্র, কতক-

গুলো ছোট ছোট খড়ের ঘর সমুদ্রতীরে। লোকে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরী করছে।

সমুদ্রের একটা ছোট খাড়ি পার হয়ে সাণ্টা ডোমিঙ্গো সহর। আমেরিকান ক্রুজার 'মেম্ফিস' এখানে ঝড়ে প্রবালের বাঁধে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল, এখনও তার ভগ্নাবশেষ আছে। এই সহরের গির্জ্জায় কলম্বসের অস্থি রক্ষিত আছে।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সাণ্টা ডোমিঙ্গো সহর শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সার ফ্রান্সিস ড্রেকের হাতে অধিবাসীরা অত্যন্ত নির্য্যাতিত হয়। ড্রেক সহরের অধিবাসীদের কাছে যে টাকা চেয়েছিলেন, তা দেওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। তখন ড্রেক সহরের বড় বড় বাড়ী ভাঙতে হুকুম দিলেন। পুরোনো আমলের অধিকাংশ ভাল বাড়ী এই ভাবে নষ্ট হয়। অতি কষ্টে সহরের লোকে তাঁকে ত্রিশ হাজার ডলার চাঁদা তুলে দিয়েছিল।

এখানকার বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য চিনি। সহরের চারিধারে আখের ক্ষেত। উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আখ মাড়াই করা ও রস জ্বাল দেওয়া হয়।

সাণ্টা ডোমিঙ্গো ও হেইটির মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। সাণ্টা ডোমিঙ্গোর লোকে যে ভাষা ব্যবহার করে তা স্প্যানিশ বটে, কিন্তু আসল স্প্যানিশ থেকে এত স্বতন্ত্র যে, ইউরোপ থেকে নবাগত কোনো স্পেনীয় ভদ্রলোক এখানকার ভাষা আদৌ বুঝতে পারেবেন না। কিন্তু হেইটির ভাষা ফরাসী—যদিও ফ্রান্সের ফরাসী ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য বড় কম।

সমুদ্রের দিক থেকে বড় ঝড় উঠল। আমরা বাত্যাবিক্ষুব্ধ মোনা-প্যাসেজের উপর দিয়ে উড়ে পোর্টো-রিকো পৌছুলাম। পোর্টো-রিকো প্রাচীন বন্দর, এর দেওয়ালে কত শতাব্দীর শৈবাল পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, এর রাজপথের পাথর কত জলদস্যু, বিদ্রোহী ও শত্রুসৈন্যের ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, এর বড় ক্যাথিড্রালের সংলগ্ন সমাধি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের কথা আমাদের মনে এল, কলম্বসের কথা মনে এল যিনি প্রথমে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, প্রথম এই অঞ্চল শাসন করেন।

পোর্টো-রিকোর অদূরে সান্-জেরিনিমো দুর্গ। বহু অর্থ ব্যয়ে এ দুর্গ তৈরী হয়েছিল। এর পুরু পাথরের দেওয়ালের গায়ে এখনও সার ফ্রান্সিস্ ড্রেকের কামানের গোলার দাগ আছে।
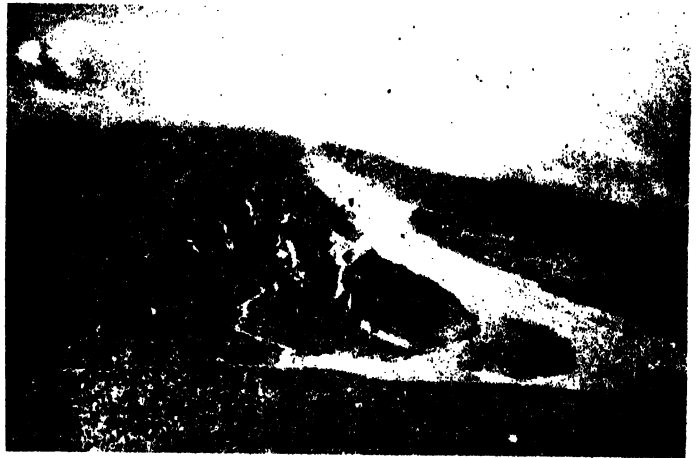
কিন্তু কলম্বসের আমলের পোর্টো রিকো এখন নবীন যুগের সভ্যতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়েছে। এখানেও আমেরিকান সিনেমা, মুষ্টিযুদ্ধের স্থান, খবরের কাগজের ক্যামেরাওয়ালাদের ভিড়, রিপোর্টারদের ভিড়—যুক্তরাজ্যের যে কোনো সহরের সব উৎপাতই আছে। দুঃখ হয় এই যে, জাতিটা এক ছাঁচে ঢালাই করা হচ্ছে, এর প্রাচীনত্ব আর রইল না।

মণ্ট পিলির অগ্ন্যুৎপাত পর্ব্বতশীর্ষ হইতে বিগলমান লাভা স্রোতের দৃশ্য।

কৃষি এখানকার লোকের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। সাধারণতঃ আনারস, আম ও তামাকের চাষই বেশী। এদেশে ধান হয় না, কিন্তু চাউলই এখানকার প্রধান খাদ্য। মাংস অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। বিদেশ থেকে আমদানী শুষ্ক কড্ মাছ বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। চাউলও বিদেশ থেকে আসে। এজন্য খাদ্য এখানে সস্তা নয়, অথচ মজুরীর হার সস্তা। পোর্টো-রিকোর প্রধান সমস্যাই এখন দাঁড়িয়েছে এই।

প্রাতঃকালের মেঘরাশি ভেদ করে আমাদের জাহাজ

উড়ল। পাশাপাশি তিনটি দ্বীপ, সেণ্ট টমাস, সেণ্ট জন্, সেণ্ট ক্রোয়া—ভার্জ্জিন দ্বীপপুঞ্জের তিনটি শস্যশ্যামল স্থান। সেণ্ট ক্রোয়া বিখ্যাত স্থান, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন্ এখানে বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন এবং বন্দরের জেটিতে প্রথম যৌবনে কেরাণীগিরি করতেন।

সারাদিনই মেঘ ও ঝড়, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। মার্টিনিক দ্বীপের কাছাকাছি যেতে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘপুঞ্জের মধ্যে সান্ধ্য সূর্য্য দেখা দিলে এবং রামধনু আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল।
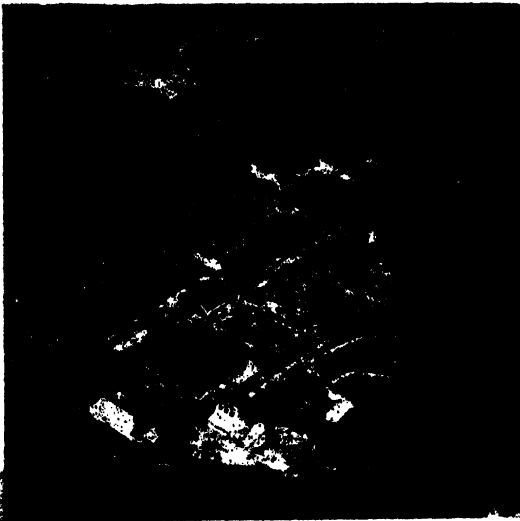
ট্রিনিডাডের প্রসিদ্ধ পিচ্-হ্রদ : তিন বিঘা জমির অধিক স্থান বিস্তৃত এই এই হ্রদ ট্রিনিডাডের সরকারের বিশেষ লাভের ব্যবসায়।

দূরে মণ্ট্ পিলি আগ্নেয়গিরির চূড়া দৃষ্টিগোচর হ'ল। যেন এক হিংস্র দৈত্য চক্রবালরেখায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মণ্ট্ পিলির শীতল ও জমাট লাভাস্রোতের নীচে সেণ্ট্ পিয়ের সহর চাপা পড়ে আছে।

১৯০২ সলে মণ্ট্ পিলির অগ্ন্যুৎপাতে এই সহরটি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয় এবং ত্রিশ হাজার লোক মারা পড়ে, একথা অবশ্য পুরাতন ইতিহাস।* কিন্তু মণ্ট পিলির শিখরদেশস্থ অগ্নিকটাহের ভীম ভৈরব মূর্ত্তি সেই পুরাতন দুর্দ্দৈবের কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। পাইলট হকিন্সের পরিচালনায় উড়ো-জাহাজ মণ্ট পিলির শিখরের উপরে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল এবং সেই সময় আমরা তার ফটো নিলাম।

পরদিন আমরা সেণ্ট্ লুসিয়া সহরে গভর্ণরের বাড়ীতে যখন চা পান করছি, তখন বহুদূর পশ্চিমে মণ্ট্ পিলির শিখর অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি মণ্ট্ পিলির আগ্নেয় গহ্বর আবার জেগেছে, রাত্রে প্রায়ই ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। ট্রিনিডাডের পথে রওনা হবার সময় মণ্ট্ পিলির এই ঈষৎ অস্পষ্ট ও সম্ভবতঃ ধূমায়মান শিখর রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি ও পম্পেয়াই-এর ধ্বংসের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে।

ট্রিনিডাড বন্দরে পৃথিবীর সকল জাতি এসে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। হিন্দু, চীনাম্যান, আমেরিকান্, ইংরেজ, নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান ট্রিনিডাডের রাজপথে এরা প্রতিদিনের পথিক। সহরের বাইরে কোকো আর কাফির বড় বড় ক্ষেত। বড় বড় তাল জাতীয় গাছ, বাতাসে তাদের পাতা খড়্ খড়্ শব্দ করছে। তার নীচে চীনা মেয়েরা হকি খেলছে, সাইকেলে চেপে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, কোথাও হিন্দু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কোথাও খৃষ্টানের গীর্জ্জা, মুসলমানদের মস্জিদ। পথের পাশে ছোট বড় বাংলা, নানা ধরণের পুষ্পিত লতা ছাদের উপর উঠেছে, দোদুল্যমান কাঠের গায়ে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড্।

এক সময়ে দাস-ব্যবসায় এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় আইনের দ্বারা ঐ কুপ্রথা রহিত করা হয়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'ল। বর্ত্তমানে ট্রিনিডাডের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ এই ভারতবর্ষীয় হিন্দু কুলীদিগের বংশধর।

ট্রিনিডাডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিখ্যাত পিচ্ হ্রদ। এখানকার পিচ অফুরন্ত। যত তোলা যায়, নীচে থেকে সেই পরিমাণ জমাট পিচ ঠেলে উঠে শূন্য স্থান পূরণ করে দেয়। ৪০ বছর ধরে এই হ্রদ পৃথিবীর সকল বড় সহরের রাস্তা পিচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছে—কিন্তু দেখতে ৪০ বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। এর অস্তিত্ব সেকালেও অজানা ছিল না, কারণ স্যর ওয়ালটার র‍্যালে এই হ্রদের পিচ দিয়ে তাঁর জাহাজের চেরা ও ভাঙা জায়গা গুলো মেরামত করেছিলেন।

---

* এই অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (চৈত্র, ১৩৩৯) ব ঙ্গ শ্রী তে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক 'বিচিত্র জগৎ' শীর্ষে লিখিত হইয়াছিল :—বঃ সঃ।
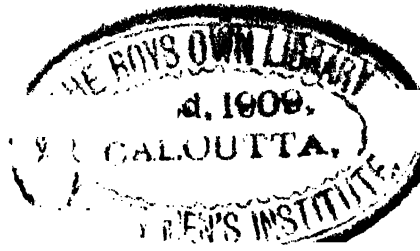
ক্ষমা

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[৫

আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া সুধীর দেখিল, অরুণা তখনও ঘুমায় নাই—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ঘুমিয়েছেন ?"

সুধীর বলিল, "হাঁ।"

"এখন আবার কেউ ঘুম না ভাঙ্গালে হয়!"

"আমি টেলিফোনের 'রিসিভার' নামিয়ে রেখে এসেছি, আর চাকরদের বলে এসেছি, তারা একজন একজন করে' জেগে থাকে—কেউ যদি আসে, তাকে বসিয়ে রেখে আমাকে খবর দেবে।"

"বেশ করেছ। এখন তুমি ঘুমোও।"

সুধীর আলোটা নিবাইয়া দিল; শুইয়া পড়িল। তাহার পর একটা কথা তাহার মনে পড়িল—কণা প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার দাদুর কাছে যায়, আজ যদি তত প্রত্যূষে সুধাকরের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তবে কাল যাইয়া তাহাকে না জাগাইলে ভাল হয়। সে স্ত্রীকে বলিল, "তুমি গিয়ে মাকে বলে এস, কণা যেন ভোরে গিয়ে বাবাকে না জাগায়।"

অরুণা বলিল, "বাবা যত রাত্তিরেই কেন ঘুমুন না, ভোর পাঁচটায় উঠবেনই, আর উঠে কণাকে ডাকবেন; কণা ত তার আগে উঠে না।"

সুধীর বলিল, "মার কি ঘুম! অত গোলেও তিনি উঠেন নি!"

একটা কথা বলিতে যাইয়া অরুণা আপনাকে সংযত করিল। মার যে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না—তিনি উঠেন নাই, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সে তাহা বলিল না। শ্বশুরের সম্বন্ধে শাশুড়ীর ব্যবহার তাহার কাছে কেমন রহস্যজনক বলিয়া মনে হইত। সুধাকরের স্নেহশীল হৃদয়ে পুত্রের প্রতি, পুত্রবধূর প্রতি, কণার প্রতি ও খোকার প্রতি স্নেহ যেন অফুরন্ত ছিল—করুণাময়ীর প্রতি তাহার ভালবাসাও অরুণা তাহার ব্যবহারে, বিচারবুদ্ধির পরিচয়ে বুঝিতে পারিত। করুণাময়ী যাহা ভালবাসিত না, তেমন কোন কাজ সুধাকর করিত না এবং করুণাময়ীর তুষ্টির জন্য তাহার আগ্রহ তাহার ভাবে সপ্রকাশ হইত। কিন্তু করুণাময়ী যেন স্বামীর সম্বন্ধে আপনার সব কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে মনে করিত—সে যেন এখন অনেকটা দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। নবীন যৌবনের প্রেমের ব্যাকুলতা লইয়া করুণাময়ীর এই স্বামীর আসঙ্গলিপ্সার অভাব বিচার করিয়া অরুণা বিস্মিতা হইত। বিশেষ সুধাকরের যে অসুখে সে সুধীরকে অতিমাত্র ব্যস্ত হইতে দেখিত, তাহা যে করুণাময়ীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না, ইহাতে সে কিছুতেই করুণাময়ীর অসাধারণ ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে পারিত না, পরন্তু মনে করিত—সে ভাবটা অস্বাভাবিক। মার ব্যবহার যে সুধীরেরও ভাল লাগিত না, তাহা সে বুঝিতে পারিত। তথাপি সে আজ তাহার সন্দেহ কথায় প্রকাশ করিল না—কি জানি, মার সম্বন্ধে সেরূপ কথা হয়ত পুত্রের কাছে প্রীতিপ্রদ হইবে না।

সুধীর বলিল, "কণা বাবার ভরত মুনির মৃগশিশু।"

অরুণা বলিল, "সে কথা বলবার উপায় নাই—বাবার মৃগশিশু একটি নয়।"

সুধীর স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "তা বটে—আগে ছিলাম, আমি একা; তার পরে হলে তুমিও। কিন্তু আমার উপর তাতে বাবার ভালবাসা এতটুকু কমল না, আমি এতে একটা ঈর্ষ্যা অনুভব করতে পারি। তারপরে এখন আবার কণা, খোকা।"

এ কথার যাথার্থ্য অরুণা অন্তরে অনুভব করিল। তাহাকে এত স্নেহ বুঝি তাহার পিতাও দিতে পারেন নাই—এমন স্নেহস্নিগ্ধ মধুর স্বরে "মা" সম্বোধন বুঝি সে তাহার বাবার নিকটেও পায় নাই! সে কখনো অসুস্থ হইলেও যে পিত্রালয়ে যাইয়া থাকিতে চাহে না, সে শ্বশুরের জন্য; তিনি যে বলেন, "যাইবে—তা যাও, কিন্তু এই বুড়াকে কেবল ভাবাইবে আর ছুটাছুটি করাইবে"—সে উক্তির আন্তরিকতায় অরুণা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারে না। যিনি স্নেহ দিয়াই সুখী, তাহাকে ভালবাসা দিয়া যেন কিছুতেই মনে হয় না—যথেষ্ট দেওয়া

হইল। তাই শাশুড়ীর ব্যবহারে আরও বিস্মিতা হইত। অথচ শাশুড়ী যে ভালবাসিতে পারেন না—এমন সে মনে করিতে পারে না। সত্য বটে, তিনি তাহার প্রতি ব্যবহারে আবাহনের বা বিসর্জ্জনের কোন ভাবই দেখাইতেন না, কেবল সংসারে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি তাহাকে প্রসন্ন ভাবেই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র-পৌত্রীর প্রতি তাঁহার স্নেহ যেন শত ধারায় আত্মপ্রকাশ করিত—তাহাদিগকে লইয়া তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাদিগের সব কাযের ভার তিনি লইয়াছিলেন।

স্বামীকে ভালবাসিয়া ও স্বামীর ভালবাসা পাইয়া মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও মানুষের আদর্শের বৈষম্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অরুণা মনে করিতে পারিত না—যেমন অনেক পুরুষ মনে করে, বিবাহের পর কয় বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর দুই তিনটি পুত্রকন্যা হইল, স্ত্রী সংসারের ভার লইলেন, তখন তাহার কার্য্যক্ষেত্র সংসার, মনোযোগের পাত্র পুত্রকন্যা—তখন আর যৌবনের উদ্বেগ, ভালবাসা স্ত্রীতে শোভা পায় না—তেমনই কতকগুলি স্ত্রীলোক মনে করে, স্বামীকে পুত্রকন্যা দিয়া, স্বামীর সংসারের ভার লইয়া তাহারা তাহাদিগের স্ত্রী-জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিল—স্বামীর প্রতি ভালবাসা তখন সাংসারিক কর্ত্তব্যে পর্য্যবসিত হয়—প্রেম যৌবনেই শোভা পায়। বাস্তবিক অনেক নারীর যেমন ধারণা, স্বামীকে যত ভালবাসা, যত যত্ন, যত সেবাই কেন দেওয়া যাউক না, কিছুতেই মনে হয় না, যথেষ্ট দেওয়া হইল, তেমনই কোন কোন পুরুষের মনে হয়, স্ত্রীকে তাহারা যত ভালবাসাই কেন প্রদান করুক না—ভালবাসিয়া কখনও তৃপ্তি হয় না—মনে হয়, আরও ভালবাসা তাহার কর্ত্তব্য। সেই যেন—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

আবার কোন কোন নারীতে ইহার বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহারা মনে করে—স্বামীর ভালবাসা যাহা পায়, তাহাই যথেষ্ট এবং স্বামীকে তাহারা যে ভালবাসা দেয় তাহাও যথেষ্ট। এই ভাব-বৈষম্য ও আদর্শের বিভিন্নতা অনেক স্থানে অসুখের কারণ হইয়া উঠে। আপনার ভাব ও আপনার আদর্শ যেমনই কেন হউক না, তাহা ত্যাগ করিয়া, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর ও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ভাব ও আদর্শ আপনার করিয়া লইতে পারিলেই সে অসুখের কারণ দূর হইতে পারে, নহিলে নহে।

অরুণা ইহা বুঝিত না—যৌবনের ভালবাসার প্রবাহে সে কোনরূপ বাধা অনুভব করে নাই। যে প্রেমের কিরণে সংসার সুখের সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পায়, যে আপনার সর্ব্বাঙ্গে জীবন ও সমগ্র হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, সে মানব-চরিত্রের এই বৈষম্য বুঝিবে কেমন করিয়া? এ রহস্যের কারণ সন্ধান সে কেমন করিয়া পাইবে? তাই অরুণা শাশুড়ীর ব্যবহারে বিস্মিতা হইত। সে যে সে-কথার আলোচনা স্বামীর সহিতও করিতে পারিত না—করিত না, তাহাতেই তাহার বিস্ময় প্রবাহপথহীন জলস্রোতের মত মনের মধ্যেই সঞ্চিত হইত। সে দেখিত, শ্বশুর স্নেহ-ভালবাসার কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার ব্যবহার, স্ত্রীর সামান্য অসুবিধায় বা অসুবিধার কল্পনায় তাঁহার বিচলিত ভাব সে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিত। কিন্তু সেই বিচলিত ভাব যখন তাহার শাশুড়ীর কাছে "বাড়াবাড়ি" বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাতে যখন শাশুড়ীর ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিত, তিনি যখন স্বামীর আগ্রহ, অবজ্ঞা ও স্বামীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতেন, তখন অরুণা ভাবিত—একি? অথচ শাশুড়ীর অন্য কোন ব্যবহারে সে নিন্দার কোন অবসর পাইত না। তাহার পরিচালনে সংসারের কায ঘড়ীর কলের মত চলিত: সামাজিক ব্যবহারে লোক-লৌকিকতায় তিনি যে ভাবে কায করিতেন, তাহাতে কেহ কোনরূপ ত্রুটির সন্ধান পাইত না; তাহার সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য পালন করিতেন; পৌত্র-পৌত্রীর পালন-ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাদিগের কাহারও সামান্য অসুস্থতায় তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেন; গৃহের শুচিতা তিনি কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না; হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই জন্য অরুণার সময় সময় তাঁহাকে যেন কেমন রহস্যময় বলিয়া মনে হইত।

এক এক সময় অরুণার মনে হইত, পিতার সম্বন্ধে মা'র এইরূপ ব্যবহার সুধীরের মনে বেদনা সঞ্চার করে। কিন্তু সে সন্দেহ তাহার মনে—জলের উপর পবনচালিত মেঘের প্রতিবিম্বের মত পতিত হইয়াই আবার সরিয়া যাইত; কেন

না, মা'র সম্বন্ধে সুধীর কোনরূপ বিরক্তির বিকাশ হইতে দিত না। মাতৃভক্তি ইহার কারণ না ও হইতে পারে। কারণ সে জানিত, তাহার মনে সেরূপ ভাবের সঞ্চার বুঝিতে পারিলে, তাহাতে তাহার পিতার মনেই বিশেষ বেদনা অনুভূত হইবে। মা'র প্রতি তাহার পিতার প্রগাঢ় অনুরাগের এত পরিচয় সে পাইয়াছে যে, সে পিতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসার জন্যও মনে মনেও মা'র প্রতি বিরক্তির উদ্ভব হইতে দিতে চাহিত না। তাহার প্রতি মা'র স্নেহে সে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিত না; আর সেই জন্যই বুঝি, পিতার প্রতি মাতার ব্যবহার তাহার নিকট অধিক বিস্ময়ের কারণ বলিয়া মনে হইত। পিতাকে মাতার উপেক্ষাজনিত বেদনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার ব্যর্থ ব্যাকুলতা পদে পদে তাহাকেই ব্যথিত করিত, আর সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি তাহার ভালবাসা পীড়িত সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহের মত বিবর্দ্ধিত হইত।

[৬]

অরুণা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। বারবার বাধাপ্রাপ্ত সুধাকরের তরল নিদ্রা ঘড়ীতে পাঁচটা বাজিলেই ভাঙ্গিয়া গেল। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ তাহার বাল্যকালাবধি অভ্যাস। সুরনাথ স্বয়ং প্রত্যুষে উঠিতেন। স্বৈরশাসনশীল গৃহকর্ত্তার স্বভাব—তিনি চাহেন, তিনি যাহা ভালবাসেন, সকলকে তাহাই করিতে হয়; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, গৃহে তাহাই নিয়ম; সেইজন্য গৃহে গৃহিণী হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকেই প্রত্যুষে উঠিতে হইত। বাল্যে অর্জ্জিত সেই অভ্যাস সুরনাথ কখনো ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার সেই অভ্যাস বাল্যপাঠে পঠিত সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিত—"স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও কম প্রবল নহে।" তবে পিতায় ও পুত্রে এই প্রভেদ ছিল যে, সুধাকর স্বয়ং প্রত্যুষে উঠিলেও বাড়ীর আর সকলকে তখনই উঠিতে বাধ্য করিত না। কিন্তু কণার প্রত্যুষে উঠা অভ্যাস ছিল। তাই সুধাকর উঠিয়াই কণাকে ডাকিত, আর কণা তাহার আহ্বান শুনিলেই দিদার নিকট হইতে ছুটিয়া তাহার কাছে যাইত। কাযেই করুণাময়ীকেও উঠিতে হইত। আজও সুধাকরের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে ডাকিল—"দাদু!" কণা উঠিয়া বসিল—করুণাময়ী তাহার গাত্রে একখানি গা'র কাপড় জড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—"জুতা পায় দিও।" সে তাড়াতাড়ি চটিজুতার মধ্যে পা কোন রূপে পুরিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল—যাইয়া দাদুর বুকের উপর শুইয়া পড়িল। সুধাকর তাহাকে আদর করিয়া বলিল; "কাল আর তোমার গল্প শুনা হ'ল না!"

খুব গম্ভীরভাবে কণা উত্তর দিল, "তোমার যে অসুখ করল!" তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দাদু, অসুখ সেরে যায় না কেন?"

সুধাকর বিব্রত হইল—অসুখ কেন সারে না, তাহা কণাকে কিরূপে বুঝাইবে? সে বলিল, "সব অসুখ কি সারে?"

"সারে না? তবে অসুখ হ'লে তোমাকে ডেকে নিয়ে যায় কেন?"

সুধাকর মনে মনে হাসিল; তাহার মনে হইল, বলে—সেটা কুসংস্কার, আর তাহার কোষ্ঠীতে ধনলাভ ও তাহাদের কোষ্ঠীতে ধনক্ষয় যোগ আছে বলিয়া। সে বলিল, "কতকগুলা অসুখ সেরে যায় বলে'।"

"কাল তোমার অসুখ হ'ল, তবু তুমি বেরুলে কেন?"

"আমায় যে রোগী দেখতে যেতে হয়েছিল।"

"তবে বাবা রাগ করলেন কেন?"

"বাবা বুঝি রাগ করলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার উপর রাগ করলেন?"

"না দাদু—দিদার উপর; রাগ করে' না খেয়ে চলে গেলেন।"

সুধাকরের বুকের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইল—যেন নদীতে বান আসিল—নদী ভরিয়া উঠিল। সংসারের একি রহস্য? তাহার একদিকে যেমন শুষ্ক মরুভূমি, আর এক দিকে তেমনই স্নিগ্ধ শ্যামশোভা—এক দিকে তপ্ত বালু, আর একদিকে নির্ঝরাগত স্বচ্ছ বারি! একদিকে করুণাময়ীর উপেক্ষা, আর এক দিকে সুধীরের ভালবাসা; একদিকে করুণাময়ীর ভালবাসার প্রতিদান-বিমুখতার বেদনা, আর একদিকে সুধীরের এই ব্যবহারের স্নিগ্ধ শান্তি! এই স্নিগ্ধ শান্তি যে দুষ্প্রাপ্য, তাহা সে জানিত—বুঝিত; কিন্তু সেই শান্তির মধ্যে যখন মরুভূমির তপ্ত শ্বাস আসিত, তখন তাহা যেন আরও অধিক কষ্টকর মনে হইত।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সুধাকর কণাকেও ভুলিয়া গিয়াছিল। কণা কিন্তু নিজেকে ভুলিতে দিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, তুমি বুঝি ঘুমোচ্ছ?"

"না, দাদু"—বলিয়া সুধাকর তাহার কোমল হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল; বলিল, "আজ গল্প শুনতে হ'বে ত?"

"আজ না হয় তুমি একটু ঘুমিও।"

"আর তুমি কি করবে?"

"আমি?—"

কণা কি করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই করুণাময়ী ডাকিল—"কণু!"

কণা সুধাকরকে বলিল, "দিদা ডাকছেন—আমি যাই।"

কণা চলিয়া গেল। করুণাময়ী তাহাকে মুখ ধোয়াইয়া কাপড় পরাইয়া দিয়া আপনি কাযে যাইত।

সুধাকরও শয্যাত্যাগ করিল; শয্যাত্যাগ করিবার সময় মস্তকে যন্ত্রণা অনুভব করিল; বুঝিল—এবার সহজে অব্যাহতি নাই। এই শিরঃপীড়ার আক্রমণ যেমন দামোদরের বন্যার মত অতর্কিতভাবে আসিত, তেমনই সেই বন্যারই মত আপনার চিহ্ন রাখিয়া যাইত। বন্যার জল সরিয়া যাইবার পরও যেমন বিধ্বস্ত গৃহে ও বিনষ্ট শস্যক্ষেত্রে তাহার আগমন ও গমন বুঝিতে পারা যায়, পীড়ার স্বল্পকালস্থায়ী বেগ অপসৃত হইলে তেমনই দৈহিক দৌর্ব্বল্য তাহার আক্রমণ-চিহ্ন রাখিয়া যায়; কেবল তাহা কখনো অধিক হয়, কখনো অল্প। গত রাত্রিতে যে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল এবং তখন ও তাহার পূর্ব্বেতে তাহাকে অসুস্থ অবস্থায় কায করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই এবার এমন হইয়াছে।

সুধাকর উঠিল—উঠিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল। আজ কণার কথা শুনিয়া একটা নূতন চিন্তা তাহার মনে প্রবেশ করিয়াছিল—সে কিরূপে সুধীরকে তাহার জন্য অনুভূত বেদনা হইতে রক্ষা করিবে? এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার জন্য সুধীর তাহার মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। আজ কণার কথায় সে তাহা বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াই মনে করিয়াছিল, এই ভাব বর্দ্ধিত হইলে সুধীরের জীবন তিক্ত হইবে। জীবন তিক্ত হইলে কি হয়, তাহা সে আপনার অভিজ্ঞতায় অনুভব করিতেছিল। এক এক সময় এক একটি কথার প্রভাব কত দূরগামী হয়! কে বলিতে পারে, অসাবধানে উক্ত কোন্ কথা বুদ্ধদেবকে ব্যাধিজরামৃত্যু-তাড়িত মানবের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুক্তির সন্ধানে সর্ব্বত্যাগী করিয়াছিল!

সুধাকরের কেবলই মনে হইতে লাগিল—সুধীর কেন তাহাকে এত ভালবাসিয়াছে? সেই চিন্তা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিল।

সুধাকর স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, সুধীর সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মাথাধরা ছেড়ে গেছে?"

তাহাকে তুষ্ট করিবার আগ্রহে সুধাকরের মনে হইল, সে বলে, "হাঁ।" কিন্তু এই পুত্রের কাছে সে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। সে বলিল, "কমে গেছে।"

সুধীর বলিল, "আজ তুমি আর বেরিও না।"

"তা' কি হয় বাবা?"

"কেন হ'বে না? তোমার শরীর ভাল নয়; তবু তোমাকে বেরুতেই হ'বে?"

সুধাকর বলিল, "আচ্ছা, আমি যত সকাল-সকাল পারি, ফিরে আসব। তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন?"

"তোমার চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, অসুখ এখনও রয়েছে। মুখের চেহারাটা এমন হয়েছে—যেন কত দিনের রোগীর।"

"মুখ ধুয়েছিস?"

"হাঁ।"

"তবে নীচে চল্—চা খা'বি।"—বলিয়া সুধাকর ডাকিল, "দাদু!"

কণার কোমল কণ্ঠে উত্তর আসিল, "যাই দাদু।"

সুধাকর নিম্নতলে আপনার বসিবার ঘরে গমন করিল। ভৃত্য চা'র সরঞ্জাম লইয়া আসিল। কণা আসিল, সুধীরও আসিল।

চা পান করিতে করিতে সুধীর বার বার পিতাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—তাহার মুখে-চোখে সে অসুখের লক্ষণ দেখিতে লাগিল। তাহার সেই লক্ষ্য করাটা সুধাকরের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

সেদিন আফিসে যাইবার সময় সুধীর অরুণাকে বলিয়া গেল, "বাবার অসুখ সারে নি। তুমি দেখো, আজ দুপুর বেলা যেন একটু ঘুমোন—নইলে আবার বাড়বে।"

[৭]

সুধাকরের অসুখ যে সারে নাই, তাহা অরুণা তাহার আহারেই বুঝিল। সুধাকর নামমাত্র-যেন নিয়মরক্ষার জন্য আহারে বসিল, খাবার লইয়া নাড়াচাড়া করিল, মাছ ছাড়াইয়া ডিম কণাকে দিয়া মাছ সরাইয়া রাখিল, ইত্যাদি।

অরুণা বলিল, "বাবা, কাল রাত্তিরে কিছু খান নি, আজও কিছু খেলেন না!"

সুধাকর বলিল, "খেতে পারছি না, মা! ক্ষুধা নেই।"

"মাথাধরা কি বেড়েছে?"

সুধাকর জিজ্ঞাসার সরল উত্তর না দিয়া বলিল, "যেমন হয়—সকালের পর একটু বাড়ে।"

অরুণা বলিল, "আজ আর আপনি কণাকে গল্প বলবেন না। ওকে আপনার ঘরে যেতে দেব না—কেবল বকায়। আপনি আজ ঘুমোবেন।"

দাদু কি বলেন, শুনিবার আগ্রহে কণা সুধাকরের মুখের দিকে চাহিল। সুধাকর যখন বলিল, "না মা, ও ত' আমাকে মোটে বকায় না, আমিই বকি"—তখন সে মা'র দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে যেন বিজয়গর্ব; ভাবটা—দেখিলে ত? দাদু কি বলিলে শুনিলে ত?

অরুণা বলিল, "আজ আর গল্প বলে কায নাই।"

সুধাকর বলিল, "মা, আর কতদিনই বা আমি গল্প বলব?"

সুধাকরের কথার স্বরে একটা যেন কেমন অস্বাভাবিক আর্দ্রতার ভাব।

সুধাকর বুঝিল অরুণার এই আগ্রহ সুধীরের প্রতিফলিত আগ্রহ। সুধীর তাহার জ্ঞানোদয় হইতেই পিতাকে মধ্যে মধ্যে এই রোগভোগ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে মনে করে নাই, এ রোগ যখন "চারিকাল" আছে তখন ইহার জন্য কাহারও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই—ব্যস্ত হইলে ব্যস্ততা কেবল অপব্যয়িত হইবে। সে মনে করে নাই, যাহাদিগের বয়স অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য সেবা-শুশ্রূষা অকারণ বাহুল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নামমাত্র আহার শেষ করিয়া সুধাকর আপনার ঘরে গেল। কয় মিনিট কাটিয়া যাইতে কণা আসিল না দেখিয়া সে বুঝিল, অরুণা তাহাকে আসিতে দেয় নাই। এই মেয়েটির সংলগ্ন অসংলগ্ন নানা কথা তাহার নিকট এত মিষ্ট বোধ হয় যে, তাহা না শুনিলে মনে হয়, দিনটা বৃথা গেল। প্রভাতে উঠিয়া যে বিহগের কাকলী শুনিতে পায় না, সে দুর্ভাগা! সে ডাকিল—"দাদু!"

উত্তর আসিল, "যাই দাদু।"—সুধাকর শুনিতে পাইল, কণা বলিতেছে, "মা, শুনতে পাচ্ছ না, দাদু ডাকছেন?" বাধভাঙ্গা জল যেমন ছুটিয়া আসে, কণা তেমনই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল।

সুধাকর একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিল—এক পার্শ্বে কণার জন্য চেয়ার ছিল। কণা আসিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদু, একটা কথা আছে।"

কণা এমন গম্ভীরভাবে এই কথা বলিল যে, সুধাকরের হাসি আসিল। সে গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, "কি কথা?"

"তুমি আজ ঘুমোও।"

"কেন?"

"বাবা যাবার সময় বলে গেছেন, নইলে অসুখ বাড়বে।"

"তোমাকে বলে গেছেন?"

"না—আমাকে না।"

"তবে কাকে?"

"কেন, মাকে। জানলে, দাদু, বাবা তোমার কথা মা'কে বলেন। দিদাকে বলেন না কেন, দাদু?"

ছেলেরা সময়-সময় যে সব প্রশ্ন করে, সে সকলের উত্তর দিতে বিব্রত হইতে হয়। উত্তর দিতে সুধাকরকে একটু ভাবিতে হইল। তাহার পর সে বলিল, "বাবা ছেলেমানুষ—তাই ভয় পান। দিদা জানেন, বুড়ারা মরে না।"

"মরে না?"

"তারা মরলে দুঃখ হয় না।"

এই সময় অরুণা শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল। সে কণাকে বলিল, "এই না বলে এলি, বাবাকে বকাবি না?"

কণা বুঝিল, সে তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই। সে বলিল, "আমি দাদুকে ঘুমোতে বলেছি।"

সুধাকর বলিল, "আমি সাক্ষী দিচ্ছি, ও তাই বলেছে।"

অরুণা হাসিয়া বলিল, "ও বচনে পণ্ডিত, কিন্তু আচরণে ভূত।"

সুধাকর কণাকে আদর করিয়া বলিল, "শুনলে, দাদু, মা বকছেন।"

অরুণা বলিল, "আপনি আজ ঘুমোন বাবা।"

"ঘুম যে আসে না মা! আমার বাবার কড়া শাসন ছিল, ছেলেরা দিনে ঘুমোতে পাবে না; সেই থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, আপনি একটু শুন; আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিই; আর কণা চুপ করে থাকুক—দেখবেন, ঘুম আসবে।"

"ভাইটি কোথায়?"

"মার কাছে" —বলিয়া অরুণা আবার বলিল, "আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

অগত্যা সুধাকর উঠিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করিল—একখানা গায়ের কাপড় টানিয়া লইয়া গায় দিল। অরুণা তাহার পার কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল; আর কণা তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় পাকাচুলের সন্ধান করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। তখনও সুধাকরের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সে অরুণাকে বলিল, "মা, খবরের কাগজখানা দাও ত।"

এই সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অরুণা গিয়া টেলিফোন ধরিল—কে কি বলিতেছিল বুঝিতে পারিল না। তখন সুধাকর গিয়া শুনিল—এক মাড়োয়ারী রোগীর বাড়ী হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, রোগী মাত্র দশখানি রুটি খাইয়াছে, আরও খাইতে চাহিতেছে, দিবে কিনা। "আউর মাৎ দেও" বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া আসিয়া সুধাকর হাসিতে হাসিতে ব্যাপারটা অরুণাকে বলিল; তাহার পর আর ফিরিয়া শয্যায় গেল না—আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল।

বিশ্রামলাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না—বিশ্রামলাভের জন্য সে ব্যস্তও ছিল না। সে কেবল ভাবিবার অবসর সন্ধান করিতেছিল। সে স্থির করিয়াছিল, মনের শক্তিতে সে দেহের রোগযন্ত্রণা প্রকাশ হইতে দিবে না—সুধীরকেও তাহা জানিতে দিবে না।

অরুণা বলিল, "বাবা, মোটেই ঘুমোলেন না!"

সুধাকর হাসিয়া বলিল, "কেমন করে ঘুমোই বল? মাত্র দশখানি রুটি রোগীর পেটে পড়েছে। কেমন রুটি তা'ত জান না—যেন সুদর্শন চক্র।"

কণা বলিল, "বাবা এলে আমি বলে দেব, তুমি ঘুমোও নি।"

কৃত্রিম ভীতিভাব দেখাইয়া সুধাকর বলিল, "এই বুঝি তুমি দাদুকে ভালবাস?"

"কেন?"

"বাবা যদি মারেন!"

"বাবা কি কখনো মারেন?"

"না"—বলিয়া সুধাকর অরুণাকে বলিল, "আমি যত বুড়ো হচ্ছি সুধীর তত আমার বাবার মত আমার অভিভাবক হয়ে উঠেছে। প্রভেদ এই যে, আমার বাবার শাসন ছিল কর্ত্তার কঠোরতায় পূর্ণ, আর ও বাবার শাসন—স্নেহের শাসন।"

শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় সুধাকরের কণ্ঠস্বর এমনই গাঢ় হইয়া আসিল যে, তাহা অরুণা লক্ষ্য করিল। সুধাকর আপনিও তাহা বুঝিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল—এত দিন যাহা মনে করে নাই, এখন তাহা মনে করিবার সময় হইয়াছে; সে বৃদ্ধ হইয়াছে, আর তাহার মনের উপর এমন অধিকার নাই যে, সে হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিতে পারে। এই অনুভূতি তাহাকে বিচলিত করিল। মনের উপর কর্ত্তৃত্ব যখন ক্ষুণ্ণ হয়, তখন মানুষ আর সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। সে পিতার স্নেহ কোন দিন অনুভব করে নাই, কিন্তু এক দিনের জন্যও পিতার ব্যবহারে বিরক্তি এমন কি বিস্ময়ও প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। বিবাহের কয় বৎসর পর হইতেই করুণাময়ীর ব্যবহার তাহার তৃষ্ণা তৃপ্ত করিতে বিরত হইয়াছে; কিন্তু সে স্ত্রীর প্রতি তাহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সে কেবল মনের উপর কর্ত্তৃত্ব হেতু। আজ সে সেই কর্ত্তৃত্ব হারাইতেছে। যে পিতার স্নেহ পায় নাই ও মাতার স্নেহ অনুভব করিবার সুযোগ লাভ করে নাই, পত্নীর ব্যবহার যাহার হৃদয় প্রীতিতে পূর্ণ করে নাই—যাহা লোক স্বাভাবিক প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করে, যে তাহা পায় নাই, আজ পুত্রের, পুত্রবধূর ও পৌত্রীর ভালবাসা তাহাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে! যে নদীতে কোন দিনই জলের প্রাচুর্য্য ছিল না, সহসা তাহাতে বন্যার বারি প্রবেশ করিয়াছে।

অরুণা বলিল, "বাবা, আর শোবেন না ?"

বাড়ীর দিকে চাহিয়া সুধাকর বলিল, "না মা, আর সময় নাই—তিনটা বাজে।"

অরুণা আর কি বলিবে ? কণা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিল না ; সে বলিল, "তোমাকে জব্দ করতে পারে—দিদা।"

সুধাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"ভাইটির মত তোমাকে চাপা দিয়ে—চাপড়ে ঘুম পাড়ালে, তবে ঠিক হয়। চোখ না বুজলে 'খেঁতো করব' বলে ভয় দেখাতে হয়, 'কালো মিনিকে' ডাকতে হয়।"

অরুণার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল—মাতৃভাবের স্নিগ্ধতায় দেবীভাবপূর্ণ সেই মুখে সে হাসি বসন্তের প্রভাতে অরুণরাগের মত মধুর—বাঙ্গালার শিল্পী প্রতিমা গঠিত করিলে প্রতিমার মুখে এই মধুর হাসিটি দিতে জানে। সে যেমন তাহার চারি দিকের পত্রপুষ্পাদি হইতে তাহার রচনার আদর্শ আহরণ করে, তেমনই বুঝি বাঙ্গালার মার মুখ হইতে সেই হাসিটির আদর্শ গ্রহণ করে।

সুধাকর হাসিয়া উঠিল, তাহার চিন্তামেঘান্ধকার মনেও আনন্দের আলোক বিকাশ হইল। সে বলিল, "দাদু চল—আজ তোমাকে একটা কালো মিনি পুতুল কিনে দেব।"

কণার চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি দেখা গেল। যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই শিশুর মুখে এই আনন্দদীপ্তি স্নেহশীলের কাছে অমূল্য পুরস্কার।

ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। খবরের কাগজখানা লইয়া সুধাকর নিম্নতলে বসিবার ঘরে চলিয়া গেল—যাইবার সময় কণাকে বলিয়া গেল, "দাদু, চারটার সময় বেরুতে হবে।"

[৮]

মনের বল যত প্রবলই কেন হউক না, দেহের উপর তাহার প্রভাবের একটা সীমা আছে। সাধারণ মানুষ কখনোই সে সীমা অতিক্রম করিতে পারে না ; বন্যার জলের বেগ যেমনই কেন হউক না, সে হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিলেও পর্ব্বতকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না। স্বয়ং চিকিৎসক সুধাকর যে তাহা বুঝিত না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবুও সে যে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অসাধ্যসাধন করিবে, তাহা রহস্য নহে—সে ইচ্ছা করিয়াই ভুল আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, কিছুতেই সুধীরকে তাহার জন্য চিন্তিত হইতে দিবে না। তাহার এই অসাধ্যসাধন-চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল কি, তাহাও সে বুঝিত। কিন্তু সে যতই ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, সে সংসারে ভারমাত্র হইয়া আছে—সংসারে তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই ; আর তাহার উপর তাহাকে লইয়া সুধীরের যেন স্বস্তি নাই। তবে সে কি করিবে ? সে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা সে যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিল না—বুঝিলেও আপনাকে নিবারণ করিবার ক্ষমতা সে দিন দিন হারাইতেছিল। শিলাখণ্ড যখন একবার পর্ব্বতের অঙ্গ হইতে গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন সে কি আপনার গতি রোধ করিতে পারে ? ডাক্তারীতে তাহার পশার ভালই ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে একটি হাসপাতালে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ছিল—পশার বাড়িবার পর ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার এক বন্ধু সেই কায করিতেছিলেন ; তিনি অসুস্থ হইয়া বাহাকে বেড়াইতে যাইবেন শুনিয়া সুধাকর যাচিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার কায লইল—কায বাড়াইল। শুনিয়া সুধীর আপত্তি করিলে সে বলিল, "বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজনে সাহায্য না করিলে কি চলে ?"

কাযের মাত্রা যেমন বাড়িয়া গেল, চিন্তাও তেমনই বাড়িয়া চলিল। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—বর্ত্তিকার দু' দিক দগ্ধ করা—অর্থাৎ অতি দ্রুত নিঃশেষ করা ; তাহার তাহাই হইতে লাগিল। অতিশ্রম ও অতিচিন্তা উভয়ের ফল দেহের উপর ফলিতে লাগিল, দেহ দিন দিন শক্তি হারাইতে লাগিল। ঝিমঝিমা যেন লাগিয়াই রহিল, দেহে স্বস্তির অভাবও অনুভূত হইতে লাগিল।

শিরঃপীড়া ছাড়িয়া দিলে সুধাকরের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই ছিল—তাহাকে কখনো রোগভোগ করিতে হয় নাই বলিলেও বলা যায়। কাযেই তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুর্ভাবনার সম্ভাবনার কথা করুণাময়ীর মনে উদিত হয় নাই। শিরঃপীড়া—"ও চার যুগই আছে"—মনে করিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল। বিশেষ কিছু দিন হইতে সে স্বামীর কার্য্যভার একরূপ ত্যাগই করিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখাও আর ছিল না। সেই জন্য অরুণা যদি কখনো তাহাকে বলিত, "বাবার

শরীরটা মোটেই সারছে না; বোধ হয় কোন অসুখ রয়েছে” —তবে করুণাময়ী বলিত, “আপনি ত ডাক্তার; অসুখ বুঝলে তার চিকিৎসা অবশ্যই করতেন।” এই কথা বলিয়া সে যে কেবল অরুণাকেই নিরুত্তর করিতে চাহিত, তাহাই নহে; পরন্তু আপনাকেও উদ্বেগশূন্য করিত।

কিন্তু অরুণা সে কথা সুধীরকে বলিলে সুধীর বড় শঙ্কিত হইত। সে পিতার দেহে অত্যন্ত অতর্কিতভাবে জরার আবির্ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইতেছিল। সে কথা সে পিতাকে বলিলে সুধাকর হাসিয়া বলিত, “তুই এখনও জিজ্ঞাসা করবি কেমন আছি? বাঁচাটা কি কম দিন হল? তুই কি মনে করিস, তোর বাবা জীবনের মৌরসীপাট্টা নিয়ে জগতে এসেছে?”

সে কথায় কিন্তু সুধীর স্থির থাকিতে পারিত না। সে মার সঙ্গে বাবার কথার আলোচনা একরূপ ত্যাগই করিয়াছিল। সে মার উপর অভিমানে। তবুও সে দুই একবার মার কাছে পিতার স্বাস্থ্যহানির কথা পাড়িবার চেষ্টা করিত; কিন্তু করুণাময়ীর নিরুদ্বেগ ভাব লক্ষ্য করিয়া আর অগ্রসর হইল না। তাহার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার বিষধর-ডিম্ব উদ্বেগের তাপে কাটিয়া গেল—সে বিষধর শাবকের দংশনবিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তাহার মনে চিন্তার ছায়া স্থায়ী হইল—বয়সের পক্ষে তাহা এতই অস্বাভাবিক যে, সুধাকর সহজেই তাহা লক্ষ্য করিল।

সুধাকরের ভাবনা আরও বাড়িল। করুণাময়ীর প্রতি তাহার ভালবাসা অভিমানে আচ্ছাদিত হইলেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাই সে কোনদিন করুণাময়ীকে দোষী মনে করিয়া আপনি শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে বরং আপনাকেই দোষী মনে করিতে চাহিত; মনে করিতে চেষ্টা করিত, তাহার ভালবাসার কোথাও এমন অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি আছে যে, তাহা করুণাময়ীকে তাহার জন্য আপনার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করাইতে পারে নাই। সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে পারিলে যেন চাঞ্চল্য হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিত।

শরীরের উপর অত্যাচার শরীর দীর্ঘকাল সহ্য করে না; কলে যদি তৈল না পড়ে, কল যদি পরিষ্কার রাখা হয়, তবে তাহা যেমন একদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে, যত্নের অভাব হইলে শরীরও তেমনই ভাঙ্গিয়া পড়ে কল যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে—সময় সময় বিগড়াইয়া যায়, দেহেরও তেমনই হয়। সুধাকরের তাহাই হইল। এক দিন কলেজে অধ্যাপনার কায সারিয়া গৃহে ফিরিবার সময় দেহ প্রথম বিপদ-সূচনা জ্ঞাপন করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল—সে পড়িয়া যাইতেছিল, সৌভাগ্যক্রমে কয়জন ছাত্র তাহার সঙ্গেই নামিয়া আসিতেছিল—তাহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং লইয়া গিয়া টেবলের উপর শয়ন করাইয়া দিল। সে সময় সেদিকে আর যে কয়জন ডাক্তার ছিলেন, সংবাদ পাইয়া, তাঁহারা তথায় আসিলেন এবং তাহার নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়া একটু উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুধাকর সামলাইয়া উঠিল—সে কতকটা দেহের পুনরাগত শক্তিতে, কতকটা মনের বলে। একজন ডাক্তার তাহার সঙ্গে তাহার বাড়ী পর্যন্ত যাইতে চাহিলে সে হাসিয়া বলিল, “আমাকে বুঝি বড় রকম রোগী করতে চাও?”

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হঠাৎ এমন হ'ল কেন?”

সুধাকর উত্তর দিল, “ঠিক বলতে পারি না।”

“বোধ হয়, ভাল ঘুম হয় নি।”

“তাই হ'তে পারে”—বলিয়া সুধাকর গিয়া মোটরে উঠিল।

সুধাকর চলিয়া গেলে ডাক্তাররা আপনাদিগের মধ্যে তাহার কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন, “নাড়ীর অবস্থা দেখে আমার ত ভয় হয়েছিল।”

আর একজন বলিলেন, “কেন অমন হ'ল বল ত?”

তৃতীয় ডাক্তার বলিলেন, “ভিতরে কোন রোগ হয়েছে —ডায়েবিটিস কি এলবুমেনিয়া একটা কিছু হয়েছে।”

প্রথম ডাক্তার বলিলেন, “সম্ভব বটে। দেখছ না অমন চেহারা ছিল, অল্প দিনের মধ্যেই যেন বুড়া হয়ে গেছে।”

“বুড়া সবাইকেই হতে হ'বে—তুমিও বাদ যাবে না।”

“আর তুমি?”

ততক্ষণে সুধাকরের মোটর কলেজের গেট ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, আর সেই গাড়ীতে বসিয়া সুধাকর ভাবিতেছে—ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এখন যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তত

দিন সে ভারমাত্র হইয়া থাকিবে—অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। দেহ যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, শরীর আর স্ববশ থাকে না, তখন জীবন দুর্ব্বহ ভারমাত্র; সেই ভার কে বহন করিতে চাহে? যে লোক কখনো কাহারো উপর নির্ভর করে নাই, তাহার পক্ষে জীবনে জীবিত থাকা অনন্ত দুঃখের কারণ। সে এত দিন যে অবস্থা সুধীরের নিকট গোপন করিয়া আসিয়াছে, শয্যা লইলে আর ত তাহা গোপন থাকিবে না!

ভাবিতে ভাবিতে সুধাকর গৃহে ফিরিল এবং গৃহে ফিরিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল। সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থার কল্পনা যেন অতি-রঞ্জিতভাবে তাহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। আতঙ্ক তাহাকে আক্রমণ করিল এবং পাইয়া বসিল। সে কিছুতেই সেই আতঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না।

তবে তাহার উপায় কি?

তাহার মনের মধ্য হইতে এই প্রশ্নের উত্তর আসিল। তাহার মৌলিক দৌর্ব্বল্য—তাহাকে অভিশাপ বলিতে হয়, বল—সে উত্তর দিল। সেই উত্তরে সুধাকর চমকিয়া উঠিল। সে দৌর্ব্বল্য যে তাহার অন্তরে ছিল, তাহা সে কখনো এই দীর্ঘকাল অনুভব করিতে—অনুমান করিতেও পারে নাই। কিন্তু যখন সুযোগ পাইয়া সেই দৌর্ব্বল্য প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সেই সুধাকরের চিন্তার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল; যেন সেই প্রভু, সুধাকর তাহার ভৃত্য—সেই সেনাপতি, সুধাকর তাহার আজ্ঞাবহ সৈনিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন গাছ বাড়িতে বিলম্ব হয়, কিন্তু আগাছা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে; যেমন স্বাস্থ্য তিলে তিলে সঞ্চিত হয়, কিন্তু রোগ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়, যেমন অর্থ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়, কিন্তু ঋণ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়—তেমনই সুধাকরের দুর্ব্বল দেহে যেমন মনেও তেমনই দৃঢ়তা যখন ক্ষুণ্ণ হইল, তখন তাহার মৌলিক দৌর্ব্বল্য দেখিতে দেখিতে প্রবল হইয়া উঠিল, বিচার-বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মহামায়া

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

দেখ মোর নাম কাঁপিছে হাওয়ায় কলঙ্কিনী,
মোর সেই নাম দিকে দিকে ভাসে কলঙ্কিনী,
    আমার মূরতি ছায়া হ'য়ে যায়—
    রেণু রেণু হ'য়ে ধূলিতে মিলায়;
তবু মনে মনে রচি ভাবনায় তপস্বিনী,
ওগো সুন্দরী, চিরনিশাচরী তোমারে চিনি।

কবে ডেকেছিলে কুমার কিশোরে সুকুন্তলা,
তা'র ধ্যানে ছিলে বিজুরীর রেখা সুকুন্তলা!
    খুলি' বাতায়ন দেখিত সে চেয়ে
    রূপে রূপে আছ মহাকাশ ছেয়ে
অসীমায়তনা ধরণীর গেহে চিরোজ্জ্বলা,
চির-মায়াবিনী ভুবনমোহিনী নীলোৎপলা!

দেখ মোর তনু বিষ-জর্জ্জর তিলোত্তমা,
দেখ মোর দেহ বিষনীল হ'ল তিলোত্তমা,
    মন্থন শেষ, সাগর ঘুমায়—
    ভালে শশীলেখা গঙ্গা জটায়,
তিমিরে তোমার মূরতি হারায়, হে নিরুপমা,—
একা ব'সে জাগি শ্মশান-বাসর তিলোত্তমা!

দেখ মোর নাম ভাসিছে বাতাসে হে কল্যাণী,
আমার মূরতি চুমিছে আকাশ হে কল্যাণী,
    কত রজনীর ছায়ালোক হ'তে,
    খুঁজেছিলে যা'রে ব্যথার মরতে,
অশ্রুনির্ঝর ঝরা'লে যে পথে সে পথে রাণী,
আজ আসিয়াছি সমুখে তোমার হে কল্যাণী।

দেখ চেয়ে দূর পূর্ব্ব-অচল অরুণালোকা,
হাতে তুলে লও শঙ্খ তোমার চূর্ণালকা,
    দেখ, আসে রথ সে বিজয়ী বীর,
    মুকুটে তাহার প্রভাত-শিশির
রশ্মি-ফলকে ছিঁড়িছে তিমির অরুণালোকা—
হাতে তুলে লও শঙ্খ তোমার পূর্ণালকা!

আমার মূরতি রেণু রেণু হ'ল হে মহামায়া,
আমার মূরতি মিশে কালস্রোতে হে মহামায়া—
    দেহ হ'ল মোর স্পন্দনহীন,
    তপ্ত রুধির কঠিন তুহিন
নিবে আসে শশী—ভাগীরথী ক্ষীণ শীর্ণকায়া—
ফেলো গো চরণ বক্ষে আমার হে মহামায়া!

আমাদের ব্যাঘ্রহত্যা

দ্বিতীয় পর্ব্ব *

-শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জব্বলপুর হইতে ফিরিবার তাড়া পড়িয়া গেল। বাঘের ও চিতাবাঘের চামড়া "মাউন্ট" করিতে দিয়া তৎপরদিন রওনা হইব। সকালেই নবাবুর খেয়াল হইল পুরাতন রাস্তায় গিয়া কাজ নাই, যদি বিলাসপুর হইয়া কোনও পথ থাকে তবে আইবুড় পথ বদলাইয়া যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। ম্যাপ আসিল, মোটর-গাইডও একখানি সংগ্রহ হইল, কিন্তু সঠিক পথ বাহির হইল না। তবে এটা বুঝা গেল, যদি বিলাসপুর ও সম্বলপুর হইয়া বাহির হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের ডিন্ডোরী হইয়া যাইতেই হইবে। বেলা ১টার সময় যাত্রা করা গেল, সঙ্গে অধিকন্তু "পরম আত্মীয়" এবং তাঁহার এক বন্ধু। স্থির হইল তাঁহাদের অমর-কণ্টক দেখাইয়া পেণ্ড্রা রোডে ট্রেনে চাপাইয়া দিয়া আমরা সেখান হইতে যতদূর সম্ভব সোজা কলিকাতার পথ ধরিব। কিন্তু ভাবা উচিত ছিল, এত সহজে অমর-কণ্টকরূপ মহাপীঠ দর্শনের পুণ্যসঞ্চয় ও সেই সঙ্গে বাড়ীর পথেও বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাওয়া যেন "tempting fate with a vengeance"—"বামুনের গরু"র মত হইয়া পড়ে। রাস্তায় মহানদী পার হইলাম, যদিও আয়তন ক্ষুদ্র তথাপি দেখিলেই বুঝা যায়, বর্ষায় এই নদীর প্রসার অতি বিশাল হওয়াই সম্ভবপর। ডাক্তার মোটর-গাইড লইয়া বসিয়া আছেন। তাহাতে নাকি রাস্তার প্রতি মাইলের অবস্থা অতি বিশদ ও সঠিকভাবে বর্ণিত আছে। ডাক্তার পিছন হইতে হাঁকিলেন, "সাবধান, সামনের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ;" গাড়ীর গতি সংযত করিলাম, মাইলের পর মাইল পিছনে পড়িয়া রহিল, কিন্তু রাস্তা খারাপ নহে। বলিলাম, "ডাক্তার খারাপ রাস্তা কোথায়?" ডাক্তার গাইডখানি উচ্চ করিয়া ধরিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "কিন্তু গাইডে লিখিয়াছে, এইবার ২৭ মাইলের পর খুব ভাল রাস্তা, জোরে চলুন।" যেমন গাড়ীর গতি বাড়াইয়াছি, এক "শট বেণ্ড" পড়িল, পার হইয়াই গাড়ী যেন হল-কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, আরোহীদের মাথা ও "হুডের সংঘর্ষ" বড় আরামদায়ক হইল না, গতি সংযত করিলাম এবং ক্রমশঃ গাড়ী একেবারে থামাইতে হইল। সকলেই ডাক্তারকে মারিতে উদ্যত। মোটর-গাইড ও তস্য লেখকের আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ একসঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গাইড হাতে লইয়া প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখি ১৯০৫ সালের সংস্করণ, ৩০ বৎসরে মন্দ ভাল হইয়াছে এবং ভাল মন্দ হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। অতএব ডাক্তারের হাতে এরূপ অস্ত্র না থাকাই ভাল বিবেচনা করিয়া গাইডখানিকে কুশন্ করিয়া চাপিয়া বসিলাম। হুডে মাথা ঠুকিয়া অনেকেই ডাক্তারের উপর ক্ষাপ্পা হইয়াছিলেন। একটা হাসির গল্প বলিয়া সকলের মেজাজটা একটু নরম হইলে পুনরায় অতি সন্তর্পণে রওনা হওয়া গেল। গল্পটি বহুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত পাঞ্চ-(Punch)-এর একটি নক্সা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। জগৎবিদিত হেনরী ফোর্ড একজন পরোপকারী লোক, তিনি একটি পুস্তিকা ছাপান, তাহার নাম "How to ameliorate the distress of mankind (মানুষের দুঃখ নিবারণের উপায়)।" পাঞ্চ একখানি ব্যঙ্গচিত্র ও টীকা-টিপ্পনীতে তাহার সমালোচনা এইরূপে করে:—একখানি মোটরগাড়ী চলিতেছে, সামনে খুব বড় করিয়া লেখা "ফোর্ড", আরোহীদের মাথা গিয়া হুডে ধাক্কা খাইতেছে এবং সকলে "stars" (সরষে ফুল) দেখিতেছেন; উপরে লেখা হেনরী ফোর্ডের বর্ত্তমান সমস্যা—মানুষের দুঃখ নিবারণের উপায় Henry Ford's latest effusion "How to ameliorate the distress of mankind", নীচে লেখা স্প্রাংগুলা আর একটু আরামদায়ক করিয়া, তুমি হেনরী ফোর্ড, মানুষের দুঃখ দূর করিতে পার, "By making your springs a bit more comfortable, Henry".

সাহপুরা হইতে ডিন্ডোরী পর্য্যন্ত রাস্তা, পাহাড় ডিঙ্গাইয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া, নানা নদ-নদী অতিক্রম করিয়া

* প্রথম পর্ব্ব জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গশ্রী"তে বাহির হইয়াছিল।

চলিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রকৃতির নানারূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি বড়ই তৃপ্তিকর লাগিতেছিল। কোথাও একটু একঘেয়ে ভাব নাই, সদাই মনে হইতেছিল আগের "ব্যাক" ঘুরিয়াই স্বভাবের আবার এক নূতন রূপ দেখিব এবং অধিকাংশ সময়েই হতাশ হইতে হয় নাই। কে যেন গাহিয়া উঠিল, "নদ, নদী, গিরি, বন, উপবন মহিমা তোমার প্রচারে গো"! মনের ভাবও সকলের তখন সেই সুরে বাঁধা, কাজেই গান বড় মিষ্ট লাগিল। একটি নদী, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, পার হইতেছি, একজন পান্থ পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। প্রশ্ন হইল, "নদীকা নাম কেয়া"? উত্তরে বলিল "কানাহি"। প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "বলাই কোথায়?" লোকটা রহস্য বুঝিল কি-না বলা যায় না, কিছু বলিল না। মাইল দুই গিয়া আর এক নদী, নাম জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল, নদীর নাম "বলাই"। স্থানীয় এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হইল, "কানাই কেত্তা দূর?" এবারের লোকটি রহস্য বুঝিল, বলিল, "কানাই বলাই পাশাপাশি চলিয়াছে।" সত্যই তাই, "কানাই বলাইকে" এক ক্রোশের মধ্যেই রাখিয়াছে।

একটি পাহাড়ের উপর হইতে "ডিন্ডোরী" দেখা গেল। সহরের কোলে প্রায় সহরকে বেষ্টন করিয়া নর্ম্মদা প্রবাহিত। পাহাড় হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তা নামিয়াছে এবং পাহাড়ের নীচেই আইরিশ-ব্রিজ-(Irish Bridge)-এর উপর দিয়া নদী পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। নদীর স্রোত বড় প্রবল, তবে জল খুব বেশী নাই। এখানে নর্ম্মদার বক্ষ প্রস্তরসমাকীর্ণ, নদীর প্রবাহে স্বল্পজল উপলখণ্ডে আহত হইয়া এমন একটা মধুর ধ্বনি জাগিতেছিল, একটু শুনিলেই আপনি চোখ বুজিয়া আসিতে চায়; নদীর এই ঘুম-পাড়ানী গান যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি আর জীবনে ভুলিবেন না।

ডিন্ডোরী পৌঁছিবার পূর্ব্বে নজর পড়িল, গাড়ীর "ডাইনামো" (dynamo) কার্য্য করিতেছে না। তদারক করিয়া দেখা গেল ডাইনামো-বেল্ট (dynamo belt) ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দড়ি বাঁধিয়া ডাইনামো চালাইবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলাম। আশা ছিল, ডিন্ডোরী পৌঁছিয়া নিশ্চয় বেল্ট পাইব। বেলা ৪।॰ টার সময় ডিন্ডোরী (জব্বলপুর হইতে ৯০ মাইল) পৌঁছিলাম।
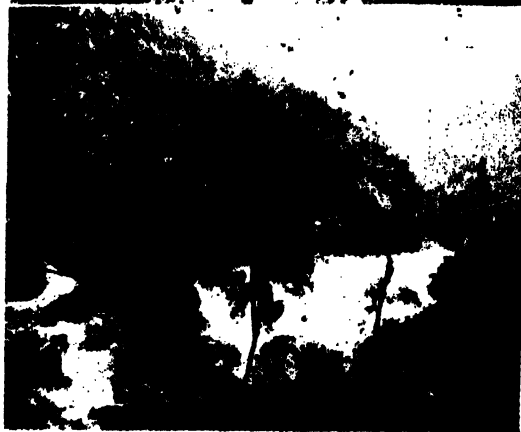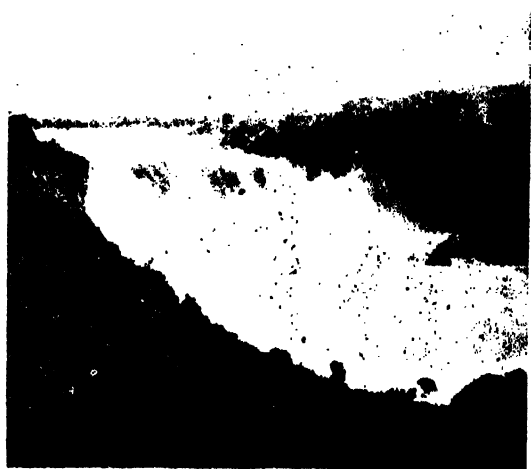
উপরে :—অমর-কণ্টক সান্নিধ্যে : উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা।
মধ্যে :—অমর-কণ্টক : শোণভদ্র।
নীচে :—অমর-কণ্টকের পথ : নদীকে বেষ্টন করিয়া ছবির ডানদিকে পথ পাহাড়ে উঠিয়াছে।

এখন রাস্তার খবর লওয়া হইল। নানা মুনির নানা মত। কেহ বলে, অমর-কণ্টক মোটর যাইবে না। কেহ বলিল, যাইতে পারে। কেহ গম্ভীরভাবে বুদ্ধিমানের মত বলিল, যাইতেও পারে, না যাইতেও পারে। কথায় বুঝা গেল, মোটর লইয়া অমর-কণ্টক কেহ যায় নাই, অতি কষ্টে গো-শকটে যাওয়া যায়, "পয়দলে" যাইবার বাধা নাই, অধিকন্তু বিশেষ সুবিধা, দূরত্ব ডিন্ডোরী হইতে মাত্র ৩৭ মাইল। বড় চেষ্টায় এক বাস্ চালকের নিকট একটি পুরাতন belt সংগ্রহ হইল, তবে তার অবস্থা যেরূপ তাহাতে বিশেষ ভরসা হইল না; উপস্থিত ডাইনামো কার্য্য করিতেছে, পরে কি হইবে বলা যায় না। "পরম আত্মীয়" ও তাঁহার বন্ধু বাস্-এ বসিলেন, তাঁহারা জব্বলপুর ফিরিবেন, আমাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য, কারণ আমাদের গতিবিধি সময়-অসময়জ্ঞান বড়ই অনিশ্চিত; তাঁহাদের সোমবার আপিস করিতেই হইবে। চাকুরের ভাগ্যে যাহা হয়; সদাই চাকরীর মায়ায় অবসন্ন, কি হয়, কি হয়! ছুটি না লইয়া অনুপস্থিত হইলে নাকি চাকুরী যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি পথ সম্বন্ধে "ওয়াকিফ-হাল্"। ২২ মাইল পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা, ২৭ মাইল পর্য্যন্ত তাঁহার জানা আছে, মোটর কষ্টে যাইবে, পরের খবর তিনি আর জানেন না। যাওয়াই স্থির হইল এবং নবাবু বলিলেন, যে সব দুর্গম এবং অকথ্য পথ বিশ্বস্ত মোটর আমাদিগকে অনায়াসে বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার অপেক্ষা মন্দ পথ আর হইতে পারে না অতএব "পরম আত্মীয়" ও তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে লওয়া হউক। আজ সবে শনিবার, সোমবারের প্রাতে নিশ্চয় তাঁরা জব্বলপুর ফিরিবেন। তাহাই হইল, তখন বুঝা যায় নাই, "the pitcher went to the well once too often", আমাদের প্রতিও প্রযোজ্য হইতে পারে। সকলে অমর-কণ্টকের রাস্তা ধরিলাম। ২২ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ ভালই, সেখানে একটি ছোট ডাকবাঙলো পাওয়া গেল। রাস্তার উপর এক কাষ্ঠফলক, তাহাতে বড় বড় করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে "Road not motorable ahead", সামনে মোটর চলার পথ নাই। সে কথা কে শোনে? সোজা চলিলাম। যে বেল্টটি ডিন্ডোরীতে সংগ্রহ হইয়াছিল এই সময়ে তাহাও দেহ রক্ষা করিল। এখন ভরসার মধ্যে এই যে, ব্যাটারিতে চার্জ্জ আছে। বেল্ট পুনরায় কতদূর গিয়া পাওয়া যাইবে এবং ব্যাটারি ততদূর গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি না এবং না পারিলে যে কি অবস্থা হইবে, অমর-কণ্টক দর্শনের আশায় তখন এতই বিভোর যে, সে সব চিন্তা মনে স্থান পাইল না, সামনের অগম্য বন্ধুর পথ ধরিয়া যত সম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশ পথ বিপথে পরিণত হইল। উভয় পার্শ্বে ঘাসের সমুদ্র, যতদূর দৃষ্টি যায়, চতুর্দ্দিকে উঁচু ঘাস, মাঝে অতি সরু পথ, স্থানে স্থানে ঘাস আসিয়া সেটুকুও ঢাকিয়া দিয়াছে। বামে বা ডাহিনে একটু সরিয়া গিয়া যে রাস্তার rutsকে (লিক্—গরুর গাড়ীর চাকার খাদ) ফাঁকি দিব, তাহারও উপায় নাই। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর রাস্তার অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইল। যেখানেই রাস্তা নামিয়াছে, ঐ সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পাশে জলের প্রবাহে কাটিয়া গিয়া গভীর গর্ত্ত হইয়াছে, 'চরণ' যদি এক ইঞ্চি এদিক বা ওদিকে যায় তবে আর রক্ষা নাই, গাড়ীশুদ্ধ অন্ততঃ ২০ফুট নীচে পড়িতে হইবে। তবুও আমরা নাছোড়বান্দা, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অমর-কণ্টকেশ্বরী আমাদের যে কি জোর আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না; এখন সে সব দুঃসাহসের কথা মনে হইলে হৃদয়ের স্পন্দন দুই চারিবার থামিয়া যায়।

একদল তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হইল। সংবাদ-সংগ্রহের জন্য গাড়ী থামাইলাম। তাহারা ঝাঁসি হইতে পদব্রজে অমর-কণ্টক দর্শনে আসিয়াছিল এখন 'সাগর' (সি-পি) যাইতেছে। পথের সংবাদ জানিতে চাহিলাম; একটু আশ্চর্য্য হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "বাবুজি দর্শনকো যাতেঁহে?" উত্তরে যখন জানিল সেইরূপই বাসনা, তখন সে বলিয়া ফেলিল, "দেবীমাইকে দর্শনমে দিল ভরপুর হো গয়া, রাস্তাকা খিয়াল তো নেহি কিয়া!" ৩৫ মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তার অন্তর বাহির দেবীদর্শনের আনন্দে এতই তন্ময় যে, ভাল রাস্তায় আসিল কি পথ বন্ধুর তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও হয় নাই। ধন্য ভক্তি, ধন্য বিশ্বাস। এইরূপ তন্ময়তা আছে বলিয়াই প্রস্তর, মৃন্ময় বা দারুমূর্ত্তিতে দেবী অধিষ্ঠান করেন;

শিক্ষাগর্ব্বে গর্ব্বিত আমরা কত নীচে কত পিছনে পড়িয়া আছি।

নর্ম্মদা পার হইলাম। স্রোত অত্যন্ত প্রবল ; পুল বা তদ্রূপ কিছুর বালাই নাই। নদীগর্ভ প্রস্তরময় হওয়ায় পার হইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। এইবার পথে মাঝে মাঝে জল এবং কর্দ্দম আরম্ভ হইল। এক এক স্থানে এত খাড়াই যে, গাড়ীর রেডিয়েটর আকাশের সহিত সমান্তরাল হইয়া পড়িতেছে, তবু চলিয়াছি। এঞ্জিন গরম হইয়া পড়িতেছে, পাখা অচল, এঞ্জিন ঠাণ্ডা হইতেছে না। আলো জ্বালাইতে হইল। ব্যাটারির চার্জ্জের উপর আরও দোহন আরম্ভ হইল, নতুবা উপায় নাই।

একটি ছোট গ্রাম পাইলাম। বহু অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল কবীর-চবুৎরা সেখান হইতে ১২ মাইল, সেখানে ডাকবাঙলো আছে ; কবীর-চবুৎরা হইতে অমর কণ্টক অতি নিকটে, গো-শকট গিয়া থাকে, মোটর পেণ্ড্রা হইতে কষ্টে আসে, এদিক দিয়া প্রায়ই মোটর যাইতে দেখা যায় না। আশ্রয় পাইতে হইলে কবীর-চবুৎরা যাইতে হইবে। আগে রাস্তা পাহাড়ের নীচে অত্যন্ত কর্দ্দমময় এবং অমর কণ্টক পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা বড়ই দুর্গম এবং অত্যন্ত ব্যাঘ্রভীতি-সঙ্কুল। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলাম ; সকলেই দমিয়া পড়িতেছিল, কেবল ডাক্তারের আগ্রহ সমভাব এবং তিনিই নানারূপ উৎসাহ দিয়া অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। এই প্রথম সি-পিতে শালের বন দেখিলাম। কি গভীর জঙ্গল, দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া অতি অল্প পরিসর ; নামে মাত্র পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। গাড়ীর আলোও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, যেহেতু অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নাই, কবীর-চবুৎরা না পৌঁছিলে আশ্রয় মিলিবে না। একটি ছোট নদী পার হইলাম, তাহার পরই দুস্তর পঙ্ক গাড়ী গ্রাসিল। প্রায় আধঘণ্টা ধস্তাধস্তি করবার পর গাড়ী উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু এঞ্জিন দারুণ গরম হইয়াছে, ব্যাটারিও নিস্তেজ, গাড়ী আর টানিতে চাহে না। উপরন্তু খাড়া চড়াই উঠিতে হইতেছে। বামে পাহাড় সোজা উঠিয়াছে এবং ডাহিনে গভীর খাদ, রাস্তা ঠিক গাড়ীর মতই প্রশস্ত এবং কালে রাস্তাটি যে সব বস্তু দিয়া আচ্ছাদিত ছিল, বহুকাল মেরামত না হওয়ায় জলের প্রবাহে সব ধুইয়া গিয়া

উপরে :— অমর-কণ্টকের পথে : "মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে"।

মধ্যে : নদী-পার।

নীচে : নর্ম্মদার উপরে শেষ (বা প্রথম) সেতু।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার উপর দিয়াই কোনও ক্রমে গাড়ী অগ্রসর হইতেছে। আলোর অবস্থা ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছিল, তবুও চলিয়াছি ; লোককে

"ভূতে পায়", আমাদের অমর-কণ্টকে পাইয়াছিল। এমন সময় সামনে পড়িল এক কাঠ বোঝাই গো-শকট, একেবারে রাস্তা জুড়িয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে দণ্ডায়মান। গাড়োয়ান গাড়ী বোঝাই করিয়া জঙ্গল হইতে কাঠ লইয়া যাইতেছিল, সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়া গরু খুলিয়া লইয়া বাঘের ভয়ে গ্রামে পলাইয়াছে, গাড়ী যে রাস্তা বন্ধ করিয়া রহিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সেখানে পুলিশ নাই এবং রাস্তা আটকের জন্য চালান যাইতে হয় না, পদব্রজে মানুষ এবং গো-শকট ছাড়া অন্য যান-বাহন চলে না; আমরা কিন্তু সেই গভীর রাত্রে এই ফাঁপরে আটক পড়িয়া রহিলাম। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া গো-শকটখানিকে যতটুকু সম্ভব পাশ কাটাইয়া রাখিয়া মোটর কোনও রূপে বাহির করিবার চেষ্টা করায় এক পাথরে চাকা আটকাইয়া তারক-ব্রহ্ম নামোচ্চারণ করতঃ এঞ্জিন দেহ রক্ষা করিল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আর সাড়া দিল না। ব্যাটারিতে যে চার্জ্জ আছে তাহাতে গাড়ী চালু করিতে পারিল না; এতক্ষণে বুঝিলাম, হায়! বিশ্বস্ত গাড়ী কৃষ্ণকে জবাব দিল। বহু চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেল, জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ডাক্তার ইত্যাদি সকলে টর্চ্চ ও বন্দুক আদি লইয়া আশ্রয়ের আশায় "পয়দল" অগ্রসর হইলেন, আমি ও নবাবু গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। আমাদের আন্দাজমত কবীর-চবুৎরা সেখান হইতে দেড় মাইলের মধ্যে। চুপ করিয়া গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর হইতে বাঘের ডাক কানে আসিতেছিল এবং আশেপাশে বানরের চীৎকারও শুনিতেছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে দূরে ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, আওয়াজ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসিতেছে। বড় আশা হইল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের মূর্ত্তিমানেরা ফিরিয়া আসিলেন, আমাদের ডাক্তার দ্বিতীয় রবিন্সন ক্রুসো হইয়া বাঘ তাড়াইবার জন্য একটি টিনের মগ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন। শুনিলাম তাঁহারা অনবরত চলিয়া অন্ততঃ তিন মাইল পথ গিয়াছেন কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গল ছাড়া কোনরূপ আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কবীর-চবুৎরা বা তাহার অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। পথে বিরাটকায় একটি প্রস্তর দেখিয়া ব্যাঘ্র-ভ্রমে সকলে অত্যন্ত ভয় পান এবং ডাক্তারের চীৎকার এবং লাফালাফির বহর দেখিয়া সকলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিরুপায় ছয়টি প্রাণী আমরা গাড়ীর মধ্যে নিশা-যাপনের ব্যবস্থা করিলাম।

সামনে আমি ও নবাবু এবং পিছনে আর চারিজন। নবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, "একটা বড় জানোয়ার সামনে পার হইয়া গেল।" আস্তে বলিলেন, ডাক্তারের ভয় পাওয়ার ভয়ে কিন্তু ডাক্তার আমাদিগকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া ঘোর রবে নাসিকাগর্জ্জনে ব্যাপৃত। গভীর বন, আলোঅন্ধকারের খেলা, হঠাৎ আমারও মনে হইল কি যেন একটা জানোয়ার চুপিসাড়ে গাড়ীর আশেপাশে ঘুরিতেছে; নেহাৎ ঘাড়ে আসিয়া না পড়িলে সেইরূপ অবস্থায় বন্দুক চালান নিরাপদ নহে, কারণ লক্ষ্যের উপর আলোকাভাব। চুপচাপ বসিয়া সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া গতি নাই। অবশ্য কালী, দুর্গা, তারা, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি রক্ষাকর্ত্রী ও কর্ত্তাদের নাম করিতে বাধা নাই, সকল সময়েই তাহা করা যাইতে পারে। তাহাই করা যাইতেছিল, এমন সময়ে হাঁউ-মাউ করিয়া পিছনে ডাক্তার চেঁচাইয়া উঠিল, তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "বাঘের স্বপ্ন দেখেছি।" স্বপ্ন নহে, কঠোর সত্য, বাঘ দশ হাত তফাতে বসিয়া পুচ্ছ আন্দোলন করিতেছে। "কেউ গুলি চালিও না" কঠোর স্বরে আদেশ দিয়া বন্দুক চাপিয়া বসিয়া থাকা গেল, নেহাৎ গাড়ীতে লাফাইয়া না পড়িলে অস্ত্র-ব্যবহার মূর্খতার পরিচায়ক হইবে। বাঘ নড়ে না, গাড়ীর ক্ষীণ আলো জ্বালিলাম; বাঘ সোহাগে গলিয়া রাস্তায় গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু অভ্যাস যাইবে কোথায়? মাঝে মাঝে শুষ্কনীদ্বারা ওষ্ঠ লেহন সমানেই করিতেছে। পরামর্শ করিয়া মোটরের হর্ণ, ডাক্তারের "টিনের মগ-বাদ্য", সমবেত চীৎকার ইত্যাদি উচ্চ এবং বিকট শব্দ আরম্ভ হইতেই সন্ত্রস্ত ব্যাঘ্র "হাঁক্" করিয়া ডাক ছাড়িয়া প্রাণের দায়ে লাফ দিয়া পলাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর চারিদিক হইতে আরও দুই চারিটি বাঘ চীৎকার করিতে করিতে দৌড় দিল। যেন গালি দিয়া বাঘের দল বলিয়া গেল, তোমাদের সহিত দল বাঁধিয়া পরিচয় করিতে আসিলাম, এমনই অভদ্রভাবে আমাদের তাড়াইলে! আমরা কিন্তু তাহাদের তিরোধানে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ব্যাঘ্রের ডাক দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল, বুঝিলাম নামরূপ মিথ্যা করি নাই, এ যাত্রা ফাঁড়া কাটিল।

রাত্রি কি ভাবে কাটিল তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না; যাঁহার অনুভূতি আছে, বুঝিয়া লইবেন। পরে শুনিলাম পেণ্ড্রা হইতে আসিবার কালে মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে "সরগুজা"

অমর-কণ্টকের পথে: ভারবাহী বলদ।

এইরূপে বাঘে ঘেরিয়া-ফেলা মোটর হইতে তুইটি বাঘ বধ করেন এবং এই "বে-আইনী" কার্য্যের জন্য বন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাইয়াছেন এবং এখনও "আসর সরগরম" রাখিয়াছেন: আমরা বাঘ মারিলে আর রক্ষা থাকিত না। সিপির ব্যাঘ্র-প্রাচুর্য্যের নমুনা এতক্ষণে পাওয়া গেল।

অতি প্রত্যূষে সকলে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়া গেল। আগের দিন অনাহার, রাত্রে আহার এবং নিদ্রা উভয়ই নাই, তার উপর দারুণ পরিশ্রমে ও মানসিক উত্তেজনায় সকলেরই অবস্থা শোচনীয়। তুইজনে সোজা রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন সাহায্যের অনুসন্ধানে। হাতল ঘুরাইয়া গাড়ী চালু করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সকলে আরও হয়রাণ হইয়া পড়িলাম, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে এক "বাবাজি"র আবির্ভাব। তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন, লোক-জন বা সাহায্য নিকটে মিলিবে না। সর্ব্বনিকটস্থ গ্রাম অন্ততঃ ছয় মাইল দূরে। কবীর-চবুৎরা ১½ মাইল, সেখানে ডাকবাঙলো ও তাহার খানসামা ছাড়া আর কিছুই নাই। "বেগারে"র চিরদিনই আমরা বিরোধী, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে নাচার। প্রথম 'বাবাজি'কেই আটক করা গেল, আমরা উদ্ধার না হইলে যে আসিবে কাহারও উদ্ধার নাই। তার পর আসিল পলাতক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান তাহার বলদ জোড়া লইয়া। চালক মায় বলদদ্বয় 'ক্যাপচারড'। তাহারই মুখে খবর মিলিল, গরুর পাল লইয়া বহু লোক জঙ্গলে চরাইতে আসিয়াছিল, বাঘের উপদ্রবে "ডেরা" তুলিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" করিতেছে। পাহাড় অতিক্রম করিয়া, দলকে দল গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলাম। তাহারা "আরজু" করিতে লাগিল যে, যথেষ্ট লোক না থাকিলে গরুর পালে বাঘ পড়িবে; কর্ণপাত করিবার মত অবস্থা আমাদের নাই। দিনে যদি বাঘ গরু ধরে, তবে লোক থাকিলে গাভী-লমে যে তাহাদেরই ধরিবে না তাহারই বা ঠিক কি? এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সব "পাকড়াও" করা গেল। ফিরিয়া দেখি আরও তিন চারিটি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জোগাড় হইয়াছে। প্রথম কাজ হইল সকলে মিলিয়া কাঠ-সুদ্ধ গরুর গাড়ী রাস্তা হইতে পাহাড়ের গায়ে নামাইয়া দিয়া এক সঙ্গে আটকাইয়া রাখা এবং তারপর পাথরের গভীর আলিঙ্গন হইতে গাড়ীকে উদ্ধার করিয়া বিপথ হইতে পথে আনা। এক্ষেত্রে horse power অপেক্ষা man power অধিক কার্য্যকরী হইল। কোনও গতিকে গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া ঢালুর দিকে গাড়ী ঠেলা আরম্ভ হইল। ডাইনামোতে দড়ী বাঁধিয়া সেই দড়ী জল দিয়া ভিজাইয়া ডাইনামো ঘোরান গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টা ঠেলাঠেলি ও নানা বুদ্ধি ধার ও খরচ করিয়া গাড়ী চালু হইল ও পুনরায় ঘুরাইয়া কবীর চবুৎরার দিকে দৌড়—অবশ্য বেগার ধরিলেও বেগারিদের যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণের পর। সত্যই ১½

অমর-কণ্টকের পথে: মহানদীর দৃশ্য।

মাইল পরেই ডাক বাঙলো পাইলাম; দিনে বলিয়া পাওয়া গেল, রাত্রে চেষ্টা করিলে 'নিশি'তে ধরিত। রাস্তা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর বাঙলো, কিন্তু কোনও নিশানা

নাই, যাহা হইতে এ হেন দুর্গম স্থানে বাঙলো আছে বুঝা যায়। রাত্রের দশ বাঙলো ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এমনই আমাদের সুযাত্রা। অগ্রদূতেরা চাপাটি ও তরকারির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে পানাহার করিয়া সুস্থ হইলাম; তখনই পুণ্যসঞ্চয়-বাসনা জাগ্রত হইল। অমর-কণ্টক দেখিতে হইবে। সেখান হইতে আরও উপরে উঠিয়া দুই মাইল দূরে মন্দির। ন-বাবু বলিলেন, অমর-কণ্টক আসিতে যে পরিমাণ কষ্টভোগ হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণপাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—এখান হইতে ফিরিবার আশা যখন আর নাই, তখন আর এক পর্য্যায় আহারাদির পর পুণ্যসঞ্চয়ে কোনও বাধা দেখা যায় না; তাড়াতাড়ি কি? আর এক পর্ব্ব ভোজনের ব্যবস্থাই হইল।

ডাকবাঙলো কবীর-ক্ষেত্রের উপর; একটি বেদী বাঁধান হইয়াছে এবং উঠিবার সিঁড়ি আছে। রামানুজের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য কবীর পাগল, কিন্তু উপায় নাই, অস্পৃশ্য দীক্ষা পাইবার অধিকারী নহে। ভক্তি যদি থাকে তবে তাহাকে নিরাশ করে কে? রামানুজের যাতায়াতের পথে ভক্ত কবীর পড়িয়া থাকেন, কারণ কবীর তাঁহাকেই মনে মনে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন। একদিন প্রাতে গুরুর পদ কবীরকে স্পর্শ করিল; শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসী "রাম, রাম" বলিয়া যবন-স্পর্শে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; গুরুমুখ হইতে নির্গত সেই রাম-নাম হইল কবীরের জপমন্ত্র, সেই স্থানে বসিয়া সাধক নিজের মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইলেন। ধন্য যবন কবীর, তোমার সাধনার ক্ষেত্র আজ ভারতে বিদিত আর আমাদের মত বেপরোয়া materialistsদিগেরও স্থান-মাহাত্ম্যে সম্ভ্রমে মাথা আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল।

অমর কণ্টকে অতি প্রাচীন নানা দেবদেবীর মন্দির আছে। মন্দিরসান্নিধ্যে এক উষ্ণ প্রস্রবন হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি। আন্দাজ দেড় মাইল দূরে সেই পাহাড় হইতে শোণভদ্রের (ডিহিরির শোণ নদ) উৎপত্তি; চমৎকার জলপ্রপাতে নদী পাহাড় হইতে নীচে নামিয়াছে। অতি সন্নিকটে গোদাবরীরও উৎপত্তিস্থল।

বেলা ১॥০টার সময় সাত্ত্বিকতার মধ্য হইতে হঠাৎ বাস্তবে আসিলাম, যখন স্মরণ হইল কাল ৭টার পূর্ব্বে দুইজনকে জব্বলপুর পৌছাইতেই হইবে। তাঁহারা এ যাত্রায় আমাদের মত "বেওয়ারিশ" নহেন। রেলের খবর পাওয়া যায় না, এমন সময় একদল যাত্রী পেণ্ড্রা রোড হইতে আসিলেন। তাঁহাদের কাছে সঠিক জানা গেল, পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ট্রেনে জব্বলপুর পৌছান যাইবে না, এবং পেণ্ড্রা হইতে বিলাসপুর যাইবার মোটর উপযোগী রাস্তা নাই। প্রাতে জব্বলপুর পৌছিতেই হইবে; গাড়ী ফিরাইয়া তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলাম; আবার সেই পথ। কিন্তু গাড়ী এবার মানরক্ষা করিল। সন্ধ্যায় ডিণ্ডোরী পৌছিলাম, মাঝে এক স্থানে man power আমাদের উদ্ধার করে, গাড়ীর horse power উত্তরোত্তর কর্দ্দমে চাকা পুঁতিয়া দিতেছিল। বাস্ বাস্ করিয়া সকলে ছুটিলাম। বাস্ নাই। এখানে বাস্ ইচ্ছামত চলে, সন্ধ্যাদির বড় ধার ধারে না। আরোহী পূর্ণ হওয়ায় সব বাস্ তিনটার সময় জব্বলপুর চলিয়া গিয়াছে। পরদিন ছাড়া উপায় নাই। সকলে অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিলেন যেন বলিতে চান, ইহার পর Cruelty to Animals-এর আইন ভঙ্গ হইবে, তবুও যদি একবার চেষ্টা করেন। তাহাই হইল। কিরূপে পেট্রোল সংগ্রহ হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলা যায় যে, সদ্য তীর্থ-প্রত্যাগত বলিয়াই বোধ হয় দেবী করুণা করিলেন। পেট্রোল অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলিল ও পুনরায় রওনা হইলাম। গভীর রাত্রি, অতি ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ মাত্র ভরসা, গাড়ীর আলো নাই, পথ দুর্গম, ক্ষীণ ব্যাটারির চার্জ্জে কোনওরূপে এঞ্জিন চালাইতেছে। তবু চলিলাম এবং সব বাধা অতিক্রম করিয়া ৬টার সময় প্রাতে জব্বলপুরে পৌছান গেল। সব দিক বজায় হইল। দেবীর মাহাত্ম্য নয় কি?

জব্বলপুর হইতে অমর-কণ্টক মোটরে যাওয়া একেবারেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কারণ বিপদ পদে পদে ঘটিতে পারে। তবে এই রাস্তায় স্বভাবের নগ্ন মূর্ত্তির সহিত যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, তাহা বোধ হয় জীবন বিপন্ন না করিলে মেলে না। যদি কেহ এই পথে যাইতে ইচ্ছা করেন খুব মোটা টাকার জীবন-বীমা করিয়া বাহির হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কোম্পানী যদি চাঁদার হার বাড়াইয়া দেন কষ্টের কারণ নাই, অন্য কোনও hazardous enterprise অপেক্ষা এই যাত্রা কম বিপজ্জনক নহে।
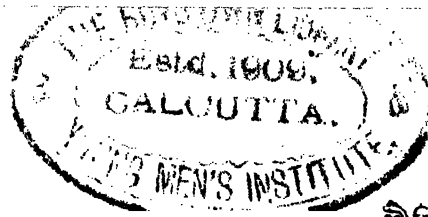
প্লাবন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া, ইন্দু উঠিয়া বসিল। বেড-সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া, চিঠিখানা আর একবার পাঠ করিল। প্রথমটা তাহার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। লাগিবারই কথা। প্রণয়ের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে বলিয়া বিমল তাহার উপর রাগ করিয়াছে, ইহা মনে করিতেও তাহার ঘৃণা ও লজ্জা হয়। মেয়েরা কি এতই লঘুচিত্ত যে পুরুষের ছোঁয়াচও সয় না! নারীদের এত লঘুচিত্ত ভাবিবার কি কারণ তাহার আছে? বিমলের উপর ইন্দুর রাগ হইল।

রাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, তাহার হাসি পাইল। পুরুষ কত সহজে ভুল বুঝিতে পারে! তাহার উপর রাগ করিয়া বাবু বিদেশ চলিয়া যাইতেছেন! ওঃ কি রাগ গো! রাগই পুরুষের লক্ষণ! ইন্দুর খুব হাসি পাইতেছিল। ছেলেবেলা হইতেই বিমলের রাগটা কিছু বেশী। এত অল্পে এত বেশী রাগ সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেবেলায় মার্বেল খেলার সময় টিপে একটু ভুল হইলে, বাবুর অমনি রাগ হইত; বিমল যখন তাহাদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, ইন্দুকেই ধরতা দিতে হইত; ধরতায় ভুল হইবার কথা নয়, ভুল হইতও না; কিন্তু যদি ঘুড়ি না উড়িত বা কোন কারণে লাট্ খাইয়া পড়িত, বাবুর রাগের শেষ থাকিত না। বিমল যখন ইন্দুকে পড়াইত, মাঝে মাঝে দুষ্টামী করিয়া ইন্দু অঙ্কের খাতা হারাইত, ট্রান্সলেসনের বই হারাইত, ছুরীর অভাবে পেন্সিল কাটা না হওয়ায় টাস্ক্ অসমাপ্ত রাখিত—তাহাতে বিমল এত রাগিত যে, কখনও কখনও পুরা দুই বা তিনদিন পর্য্যন্ত ইন্দুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিত না। ইন্দুর আজও মনে আছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষা দিবে না বলায়, বিমল আট-দিন ইন্দুদের বাড়ীতে পা দেয় নাই। সেই আটদিনে ইন্দু ষোলদিনের পড়া, অঙ্ক করিয়া রাখিয়া, লোক পাঠাইয়া বিমলকে ডাকিয়া আনাইয়া, চমকাইয়া দিয়াছিল। রাগ করিতে বিমল চিরকাল সিদ্ধপুরুষ।

বলিয়াছি ইন্দুর রাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই—বরং তৎপরিবর্ত্তে যে ভাবটি তাহার মনে জাগিল, তাহার কল্পনাতেও সে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। ইন্দু ভাবিতেছিল, কাঞ্চনের সন্ধানে বিদেশে যাইতে চাহিতেছে, যাক্ না, সে ত ভালই। কলিকাতায় যখন কাজ হইল না, তখন বিদেশে চেষ্টা করাই ত ভাল। সেই করাই ত উচিত। সেদিন ইন্দু একখানা অতি সহজ ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল, তাহাতে এইরূপ একটি ঘটনা ছিল:

একটি বড়লোকের ছেলে এক গরীবের মেয়েকে ভালবাসিত। তাহারা বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে ছেলের বাপ এই গোপন ভালবাসার কথা জানিতে পারিয়া ছেলের অজ্ঞাতে, এক ধনীর কন্যার সহিত বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন জানিয়া ছেলেটি মেয়েটির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আফ্রিকায় চলিয়া গেল। সেখানে, সোনার খনিতে কাজ করিয়া কয়েকবছরের মধ্যে অনেক টাকা রোজগার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিল, বিবাহ করিয়া, ঘর-সংসার পাতিয়া সুখী হইল।

গল্পটি কি সুন্দর! বিদেশে, খনির কাজে ছেলেটি যখন দ্রুত উন্নতি করিতেছে, খনির মালিকের একটি যুবতী মেয়ে কত রকমে কত ভাবে ছেলেটির মনোহরণের কত চেষ্টাই না করিয়াছিল; ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই টলিল না। একদিন নৈশ-নাচের আসরভঙ্গে তরুণীটি যখন বাহুসংবদ্ধাবস্থায় ছেলেটিকে প্রেম নিবেদন করিল, তখন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া ছেলেটি তাহার প্রিয়তমার ছবিখানি বুকে করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

আর সেই মেয়েটির বাবা ও মা নানান্ জায়গার নানা লোকের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করাইয়া দিতে লাগিল—যদি কাহারও সঙ্গে প্রেম হইয়া, মেয়েটি কাহাকেও বিবাহ করে। মেয়েটি সকলের সঙ্গে মিশিল, ভাবও হইল, অনেকের প্রেম-ভিক্ষাও শুনিল; কিন্তু অচল অটল গিরিশৃঙ্গের মত মেয়েটি দূর-দিগন্তের সুদূর আফ্রিকার পানে চাহিয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিল, কত ছোট কত বড় হইল, কত বড় বুড়ো

হইল, পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যৌবন চলিয়া গেল, অঙ্গে বুঝি জরার আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া আসিল! এমন সময়ে অসময়ে বসন্ত বিকাশ হইল। লতায় লতায় পাতায় পাতায় রঙের মেলা লাগিয়া গেল; পুষ্পতরু ফুলে ভরিয়া উঠিল; শাখে শাখে অলির গুঞ্জন উঠিল; শীতের কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইল; বিহগের কণ্ঠে কলগীত ধ্বনিত হইল। বসন্তে বাঞ্ছিত অতিথি আসিয়া প্রেম-সম্ভাষণ করিল।

গল্পের উপসংহারটি আরও মিষ্ট। ছেলের বাপ খুব বড় লোক—ঐ একমাত্র ছেলে, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোন্ দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে, কোন খবর নাই। বাপ যখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শয্যা হইতে উঠিতেও বড় পারেন না, এমন সময় একদিন সংবাদপত্রে শুভ-বিবাহ-সংবাদ-স্তম্ভে পুত্রের বিবাহের খবর দেখিলেন। দেখিয়া বুড়া কি করিলেন?—তাঁর সমস্ত বিষয়-আসয়ের দানপত্রের সঙ্গে পিতৃ-হৃদয়ের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ এক মস্ত লেফাফার মধ্যে পুরিয়া বিবাহ-বাসরে পাঠাইয়া দিলেন। গীর্জ্জায় ধর্ম্মযাজক পাত্র-পাত্রী উভয়ের শিরে মঙ্গলময় ধাতার করুণার বাণী বৃষ্টি করিতেছেন, সেই সময়ে মর্ত্ত্যের দেবতার আশীর্ব্বাদও তাহাদের হস্তগত হইল। বিবাহশেষে বর-কন্যা যখন গীর্জ্জা হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে আসিতেছিল, তখন বরের আঁখিকোণে অশ্রুবিন্দু সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই স্নিগ্ধ, পবিত্র, ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু উপহার দিয়াই গল্প-লেখক গল্প শেষ করিয়াছেন।

আজ এই নিদ্রাহীন নির্জ্জন নিশীথে গল্পটার আদ্যোপান্ত ইন্দুর মনের উপর দিয়া খেলা করিয়া গেল। ইন্দুর মনে হইতেছিল, বিমল আফ্রিকা-যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। বিদায় দিতে ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে সত্য, ইন্দু প্রাণপণে অশ্রু গোপন করিয়া, হাসি মুখে বিদায় দিবার চেষ্টা করিতেছে। বলিতে চাহিতেছে, যাও, যতদূরে ইচ্ছা যত দিনের জন্য হয়, তুমি যাও; তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া এস। আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকিব। খবর দিতে ইচ্ছা হয় দিও, খবর লইতে ইচ্ছা হয়, লইও। আমি চিরদিন তোমার! চিরদিন এই জায়গায়, এই ভাবে তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিব। কথাগুলা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালীর মেয়ের লজ্জা আসিয়া দু'হাতে গলা চাপিয়া ধরিতেছে, তবুও ইন্দু যেন সজল চোখ দিয়া, তাহার বিকম্পিত সকল অঙ্গ দিয়া ঐ কথাগুলা তাহার বিদায়কামী প্রিয়তমকে বলিয়া দিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে আবেশে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। সেই আবেশের রেশ-টুকুকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্য, আলোটি নিবাইয়া দিয়া, অন্ধকারে সে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িল। অন্ধকার আর অন্ধকার রহিল না। অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন বনবীথিকা অরুণালোকে সহসা যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইন্দুর মনও আলোকজ্যোতিসমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সে যেন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি দিয়া বিমলকে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু একটা কথা কাঁটার মত থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতেছিল। গড়ের মাঠে প্রণয়ের সঙ্গে গাড়ীতে দেখার সহিত বিমলের বিদেশযাত্রার কথাটা তাহার প্রাণে কাঁটার মত ফুটিয়াছিল। কেন সে প্রণয়ের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহা জানিলে বিমলের যে তাহার উপর বিরক্তির কোনই কারণ থাকিবে না, বরং তাহার আনন্দই হইবে—মনে মনে ইহা নিশ্চিত জানিলেও এ কথাটা তাহার মনকে কেবলই অপ্রসন্ন করিয়া তুলিতেছিল যে, মানুষ এত অল্পে ভুল বুঝে কেন?

বিমলের সঙ্গে তাহাকে দেখা করিতেই হইবে; তাহার বিদেশযাত্রাও অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু কি বলিয়া বন্ধ করিবে, ইহাই এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রণয়কে দিয়া চাকরীর চেষ্টা হইতেছে এ কথা সে এখন কিছুতেই বলিবে না। কাজটি হইলে প্রণয়ের গাড়ী চড়িয়া প্রণয়কে সঙ্গে লইয়া তাহাকে সংবাদ দিতে যাইবে, ইহাই আছে ইন্দুর কল্পনা। কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এখনই দেখা না করিলেই নয়। আজই এই মুহূর্ত্তে গিয়া বলিয়া আসিতে পারিলেই যেন স্বস্তিলাভ হয় যে, ওগো আরও কয়েকটা দিন এখানেই থাক। বিমল হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, কেন? ইন্দু কি উত্তর দিবে? কাজের চেষ্টা হইতেছে ইহা বলা হইবে না। সে কথা বলিতে গেলেই প্রণয়ের কথা, তাহার গাড়ীতে বেড়ানর কথা, এই রকম অনেক কথা উঠিয়া পড়িতে পারে। তাহা বলা হইবে না। তবে কি বলা হইবে? অকস্মাৎ ইন্দুর মুখখানি হাস্যে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল। কেনর জবাব ঠিক হইয়া গিয়াছে। বলিলেই হইবে, আমার ইচ্ছা, তুমি আরও কয়েকদিন অপেক্ষা কর। বিমল যে রকম একগুঁয়ে লোক, হয় ত নানান্ ওজর আপত্তি তুলিবে, তখন আর একটি কথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেই হইবে। সেই কথাটি মনে হইবামাত্র ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গে যেন হাসির লহরী-লীলা উত্থিত হইল। কিন্তু সে কথাটি কি? যত ভাবে, ততই হাসি আসে। শেষে হাসি আর চাপিতে পারিল না, নিজের মনে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিমল যখন কেবলই ওজর আপত্তি করিতে থাকিবে, তখন একটু হাসিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া, একটু কটাক্ষ করিয়া ইন্দু বলিবে, আমার হুকুম, তুমি এখনই যাইতে পারিবে না। কেমন, আর তোমার বলিবার কিছু আছে?

বিমল নিশ্চয়ই বলিবে, না আর কিছুই বলিবার নাই।

বলিবার আর কি-বা থাকিতে পারে?

বাকী রাতটা ভালই কাটিল। সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া একটা যেন অতিসূক্ষ্ম পুলকের প্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছিল। একটির পর একটি করিয়া সুখতরুটিতে কত সুখপুষ্প যে ফুটিল, নিশীথের শান্ত নীলনভে কত সুখতারা যে উঠিল, তাহার সংখ্যা নাই। চিন্তার গতি যে কত দ্রুত, কত সুদূর-প্রসারী তাহা বলা যায় না। ভাবিতে ভাবিতে বিমলের মা, সেই ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সংসারের একটি মধুরতম চিত্র ইন্দুর চিন্তাকাশে ফুটিয়া উঠিয়া আবেশে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আকাশে তখনও ভোরের দেখা নাই, নীড়নিদ্রিত পক্ষী-কূজন শুনিয়াই ইন্দু আলো জ্বালিয়া ঘড়ী দেখিল, ভোর হইতে বেশী দেরী নাই। ইন্দু শয্যা ত্যাগ করিল। স্নান-কামরায় ঢুকিয়া হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে ক্ষণাকে তুলিল। ক্ষণাকে বাহিরে আনিয়া বলিল, বেড়াতে যাবি? ভাত খাবি?—না, হাত ধোব কোথা?

—যাব দিদি, যাব।

—তবে চট্ করে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নে, শব্দ করিস নে। আস্তে আস্তে নীচে আয়, আমি ততক্ষণ গাড়ী বার করাই।

ক্ষণা বাথরুমে, ইন্দু নীচে চলিয়া গেল। ইন্দুর কেবলই ভয় হইতেছিল, মা না উঠিয়া পড়েন। মা উঠিয়া পড়িলে বাহির হওয়া মুস্কিল মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না, কিন্তু সত্য কথা বলাও মুস্কিল। মা উঠিলেন না, ক্ষণা আসিয়া পড়িল।

গাড়ী ফটক পার হইলে, ক্ষণা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে দিদি? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল?

—চল্ না, দেখতেই ত পাবি।

ড্রাইভারকে ইন্দু পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী একেবারে বিমলের গৃহদ্বারে আসিয়া থামিল। সবে মাত্র ভোর হইয়াছে। মিউনিসিপালিটির ধাঙ্গড়রা রাস্তা ঝাড়ু দিতেছে; কচিৎ কোন গৃহদ্বারে ঠিকা-ঝি দাঁড়াইয়া খটাখট শব্দে কড়া নাড়িয়া, বাড়ীর লোকের নিদ্রা ভাঙ্গাইতেছে; দুই এক জন প্রাতর্ভ্রমণবিলাসী বৃদ্ধ লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া ধীরমন্থর গমনে বেড়াইতে চলিয়াছেন; সহরের সর্ব্বাঙ্গে সুপ্তি যেন তখনও জড়ান রহিয়াছে।

ড্রাইভার নামিয়া গিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল।

ইন্দু সাগ্রহে দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই সময়কার মনের কথাও কি আমার পাঠিকারাণীদের বুঝাইতে হইবে? তাঁহাদের বোধ বা অনুমানশক্তির উপর আমার এতখানি হীন ধারণা নাই, তাই আমি নিরস্ত হইলাম।

শরতের নীলাকাশ, কত রৌদ্র, কত মেঘ, কত বর্ণের কত লীলা! আজি সুপ্রভাত, এক মুহূর্ত্ত পরে ইন্দু এই কথাটিই বলিবে, হয়ত এই কথাটিই শুনিবে। সত্যই—সত্যই আজি সুপ্রভাত! ইন্দুরা যেদিন পুরাতন বাসা ছাড়িয়া নিজেদের প্রাসাদোপম গৃহে উঠিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রথম প্রভাতে প্রিয়মুখদর্শন-সুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত। যখন পাশাপাশি বাড়ী ছিল, তখন প্রত্যেকটি প্রভাত সুপ্রভাত হইয়াই তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিত, প্রত্যেকটি রজনীও তাহাদের নিকট শুভরাত্রি বিজ্ঞাপিত করিত। সে সুখস্বপ্নের অবসান হইয়াছিল।

ইন্দু পাশের সেই বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল, ইন্দু শুনিয়াছিল, সে বাড়ীটায় মাড়োয়ারীরা বাস করে; দেখিয়া তাহাই মনে হয় বটে। বারান্দায় চট, ছেঁড়া থলের পর্দ্দা, ঝুড়ি—কত কি টাঙ্গানো।

দ্বার খুলিয়া গেল—বিমল নয়, তাহার জননী। ইন্দু তাড়াতাড়ি নামিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম

করিল; বিমলের মা তাহাকে বুকে চাপিয়া ক্ষণাকে ডাকিয়া বলিলেন, আয়, আয় ক্ষণু মা আয়।

ফ্রক-পরা ক্ষণা কাহাকেও প্রণাম করিতে বড় চায় না, দাম্ভিকতা নয়, লজ্জা। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তাহার বড় কুণ্ঠা। আসল কথা, কুণ্ঠাটা প্রণাম করিতে হয় না, প্রণামের পর, বয়স্ক লোকেরা যে চিবুক ধরিয়া আদর ও আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতেই তাহার যত লজ্জা। কোন গতিকে মাথাটা না-চৌকাঠে না-পায়ে ঠেকাইয়া সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলের মা প্রণামের অপেক্ষা না করিয়াই ক্ষণাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। দুই বাহুতে দুই বোন্‌কে চাপিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে বিমলের মা বলিলেন—হতভাগা ছেলে এক পোর রাত থাকতে বেরিয়ে গেছে, জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। আটটার আগেই জজ সাহেব বেরিয়ে যান কি-না, তাই রাত থাকতেই বাছাকে বের হতে হয়েছে। সে যে অনেকদূর, চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে যেতে হয়, বিমল বলে কি-না! জজ সাহেব সুন্দরবনে না কোথায় পাঠাবেন তাকে। তাই গেছে।

ইন্দু নতমুখে বলিল, সুন্দরবনে কেন মা?

'মা'! মাতৃসম্বোধনে কত মোহ, কত মধু, কত সন্তোষ! বৃদ্ধার হৃদয় ভরিয়া গেল, স্নেহসরসী কানায় কনোয় ছাপাইয়া উঠিল। ইন্দুর উপর স্নেহ চিরদিন ছিল, তাহার মুখে মাতৃসম্বোধনে স্নেহ যেন আরও উচ্ছ্বসিত হইল, পরম পরিতুষ্টচিত্তে তাহাকে আরও জোরে বুকের উপরে চাপিয়া বলিলেন, হ্যাঁ মা, জজ সাহেবের এক সাহেব বন্ধু অনেক জমি নিয়ে সেখানে চাষের কাজ করছেন, জজ সাহেব বিমুকে সেইখানে পাঠাচ্ছেন। কে জানে মা সে কতদূর দেশ, কেমন জায়গা!

বৃদ্ধা একটু থামিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কলকাতায় ত বাছার কাজকর্ম্ম হল না, তোমার বাবাও কিছু করলেন না, যে মেয়েটিকে পড়াচ্ছিল, সেও আর পড়বে না। একটা ত কিছু করতে হবে মা, সমর্থ ছেলে, বসে থাকতে ত পারে না, আর বসে থাকলে দুটো পেট চলেই বা কোত্থেকে? তাই যাচ্ছে বিদেশে।

ইন্দুকে নতাননে নীরব থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধা পুনশ্চ বলিলেন, ঠাকুরপো চেষ্টা করলে কি কিছু করতে পারতেন না মা? কি জানি, বাছা, আমি ওসব বুঝি নে। সেদিন তোমরা চলে যাওয়ার পর বিমু বাড়ী এল, আমি বললুম, তোর কাকা বাবু তোকে ডেকেছেন, একবার দেখা করিস বাছা। তখন বললে যাব, তার পর কি যে হ'ল, কতবার বললাম, কথা কানেই তোলে না। কাল যখন সুন্দরবনের কথা বললে, আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে খবর দিয়ে আসতে বললুম, বললে, কি দরকার মা! অনেক রাত ক'রে কাল ফিরল; আমি ভাবলুম, গেছল বুঝি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে; জিজ্ঞেস করলুম, বললে, গেছলুম। কিন্তু দেখা করি নি!

ইন্দু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বার বার তাহার মুখের পানে চাহিয়া, অবশেষে বলিলেন, একটু মোহনভোগ ক'রে দোব ইন্দু, খাবে?

—না মা, বাড়ীতে বলে আসি নি, ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি, ফিরে গিয়ে বাড়ীতেই খাব।

বৃদ্ধা আর কোন কথাই বলিলেন না। ইন্দু তাঁহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেই, তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন সত্য; কিন্তু যে স্নেহের উত্তাপের সহিত তিনি ইন্দুকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়াছিলেন, সে উত্তাপটুকু যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। স্নেহের উত্তাপের অভাবটুকু স্নেহকামী মাত্রেই বুঝিতে পারে।

ক্ষণা প্রণাম করিবার দায় এড়াইবার জন্য আগে-ভাগেই গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। ইন্দু গাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জজ সাহেবের বাড়ীর ঠিকানাটা আপনি জানেন মা?

—আমি ত জানি নে বাছা, তবে জজ সাহেব পরশু যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিটা আছে, দেখবে এস ত মা, তাতে যদি ঠিকানা লেখা থাকে।—বলিয়া ইন্দুকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন।

ছোট, অন্ধকার ঘর, দু'পাশে দু'খানা তক্তপোষ পাতা। বুঝিতে বিলম্ব হয় না, একখানিতে মাতা, অন্যখানিতে পুত্র বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিমলের শয্যার একপাশে এক গাদা বই, খাতা, পেন্সিল, দোয়াত, কলম, চিঠি, খবরের কাগজ রক্ষিত। ইন্দু সেই বিছানায় বসিতে, বিমলের মা বলিলেন, ঐ বড় খামটা দেখ ত বাছা, ঠিকানা আছে কিনা।

—দেখছি। ক্ষণা বুঝি গাড়ীতেই বসে রইল।

—আমি ডাকছি তাকে, তুমি দেখ।—বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দু ইহাই চাহিতেছিল। এই ঘরখানিকে নিভৃতে, একান্তে সে যেন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতে চায়। ঘরখানির সর্ব্বত্র দারিদ্র্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দণ্ডায়মান।

ইন্দু ঘরখানিকে, আসবাবপত্রগুলিকে একবার যেন হৃদয় মেলিয়া দেখিয়া লইল। তারপর একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট পত্রখানি খুলিয়া তাহাতে যে ঠিকানা ছিল, সেই ঠিকানাটা মনে টুকিয়া তুলিয়া বাহির হইবার আগে আর একবার ঘরখানি, শয্যাটি দেখিয়া বাহিরে গেল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিকানা পেলে ইন্দু?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, পেয়েছি মা।

একটু ইতস্তত করিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি সেখানে যাবে মা?

ইন্দু লজ্জাকাতর মুখে কহিল, হাঁ মা একবার দেখা ক'রে যাব।—বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া দ্রুতপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। একটু আগে স্নেহের উত্তাপটুকুর অভাব বুঝিতে ইন্দুর বিলম্ব হয় নাই। এবার বিদায়কালে সেই উত্তাপ সুদে-আসলে দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেও ইন্দুর দেরী হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুবিমল জজ সাহেবের বাড়ীর বাহিরে আসিতেছিল, ইন্দুদের গাড়ী থামিল। ইন্দু মুখ বাড়াইয়া বসিয়াছিল, দেখিয়া বিমল আস্তে আস্তে গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তোমরা এখানে?

ইন্দু হাসিয়া কহিল, ছায়ার সঙ্গে আলাপ করতে!

—ছায়া কি এত সকালে উঠেছেন? শুনেছি, তিনি অনেক বেলায় ওঠেন। খবর দেওয়া আছে নাকি?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, না।

বিমল বলিল, যাও ভিতরে, ছায়ার মা আছেন।

—তুমি কোথায় যাবে?

—দেখি,—বলিয়া বিমল অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল, গাড়ীতে ওঠ না। তারপর দেখো অখন।

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল, তুমি ছায়ার সঙ্গে দেখা করবে না?

—না করলেও ক্ষতি হবে না।

—এলে দেখা করতে, অথচ—

—আচ্ছা, সে ভাবনায় তোমার দরকার কি! তুমি ওঠ ত বলিয়া সে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল।

—কিন্তু—

ইন্দু বলিল, কিন্তু-মিন্তু-টিন্তু সব শুনব 'খন। উঠে এস।

—সেটা কি ঠিক হবে?

—কিছু অঠিক হবে না।

—কিন্তু—

—আঃ।

বিমল ক্ষণার পানে চাহিয়া বলিল, ক্ষণা কি বলে?

ক্ষণা হাসিয়া বলিল, খনার বচন হচ্ছে—

আগে চড় গাড়ী
পরে চল বাড়ী ···

—বা রে ক্ষণা!—বলিয়া বিমল গাড়ীতে উঠিবে, ছায়া ফটকের সামনে আসিয়া ডাকিল, মিষ্টার রায়!

বিমল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—গাড়ীতে কে?

ইন্দু নামিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, দেখুন ত, চিনতে পারেন কিনা!

—নমস্কার। আপনি ইন্দু। আসুন, আসুন।

—আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আর একদিন তখন—

—তখনকার কথা তখন, আজ আসুন ত। কারু বাড়ীতে এসে না বসে গেলে কি হয় জানেন?

—না, কি হয়?

ছায়া ইন্দুর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল, বিয়ে হয় না।

লজ্জায় ইন্দু রাঙা হইয়া উঠিল।

ছায়া বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিল, দেখছেন মিঃ রায়, তবুও উনি নামছেন না!

বিমল বলিল, আমি যাই।

—ও কথা আপনার উপরও খাটে জানবেন।—ইন্দুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, এস না ভাই।

ইন্দু বলিল, বাড়ীতে বলে আসিনি, দেরী হলে বাড়ীর লোকে ভাববেন, ভাই—

—কিছু ভাববেন না, আমি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। বকুনি খেতে হয় আমি খাব। আমার খুব অভ্যাস আছে।—বলিয়া ছায়া হাসিল। বিমলের উদ্দেশে কহিল, ক'দিন ধরে, বুঝলেন মিঃ রায়, মা'র বকুনি ছাড়া আর কিছু খেতে হয় নি।

বিমল বলিল, পড়া ছেড়েছেন বলে?

—না, অন্য কারণও আছে। চলুন না, সব বলছি। এস ভাই।

ইন্দু আর আপত্তি করিতে পারিল না, ক্ষণাও নামিল।

পড়ার ঘরে তাহাদের বসাইয়া, বয়কে খাবার ও চা আনিতে বলিয়া ছায়া বলিল, তোমাদের বাড়ীতে ফোন আছে ভাই? আছে? কত নম্বর বল ত? আমি একটা ফোন করে দিই।

ইন্দু, সেই সঙ্গে বিমল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, ফোন করবার দরকার নেই; একটু পরেই ত যাব।

ছায়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া কহিল, একটু পরেই যাবে কেন ভাই? তুমিও স্কুল-কলেজে পড় না, আমিও না, তাড়া কিসের? এক কাজ কর, তোমাদের গাড়ী ছেড়ে দাও, আমাদের গাড়ীতে আমি তোমাদের রেখে আসব।

গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়াও সমীচীন বলিয়া ইন্দুর মনে হইল না। মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিয়া ড্রাইভারের নিকট হইতে যা তা কতকগুলো কথা বাহির করিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারেন।

ইন্দু বলিল, আজ সকাল সকাল যাই, এর পরে একদিন এসে আপনার কাছে অনেকক্ষণ থাকব।

—আমি কারও আপনি, আপনার হতে চাই নে।

—বেশ, তোমার কাছে, হল ত?

চা ও খাবার আসিল। খাওয়ার পরে বিমল বলিল, আমি যাই।

ছায়া বলিল, এবার বুঝি আপনাকে খোসামোদ করতে হবে।

বিমল হাসিয়া বলিল, না, না, তা করতে হবে না। মিষ্টার ঘোষ একখানা চিঠি দিয়েছেন, এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাই।

—কখন্ দেখা করতে হবে?

—দুপুর বেলা।

—দুপুরের এখনও পাঁচ ঘণ্টা দেরী আছে। পাঁচ ঘণ্টায় গয়ায় পৌঁছান যায়—ছায়া হাসিয়া, ইন্দুর পানে চাহিয়া বলিল, প্রণয় মামার "কিশোরী"র রিহার্স্যাল দেখছ, কেমন?

ইন্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। এ কথা বিমলই ছায়াকে বলিয়াছে ভাবিয়া আরক্ত মুখে একবার বিমলের পানে একটি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, রিহার্স্যাল দেখে কিছু বুঝা যায় না।

—মাতুল মহাশয় কাল রাত্রে দয়া ক'রে আমাদের এখানে এসেছিলেন।

তবে বিমল বলে নাই! ইন্দুর মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসিল।

—তোমরা একটু ব'স ভাই, আমার মা সকালেই কোথায় বেরুচ্ছেন, একটু দেখা ক'রে দু'টো বকুনি খেয়ে আসি। তোমার বোনটি ভাই বড় লক্ষ্মী। সেই যে ঘাড় গুঁজে বসেছে, মাথাটি তোলবার নাম নেই। তোমার নাম কি গা লক্ষ্মী মেয়ে?

ক্ষণার মাথা বুকের সঙ্গে মিশিয়া গেল। জবাব দিল না, ইন্দু বলিল, ওর নাম ক্ষণপ্রভা, আমরা বলি, ক্ষণা।

—এস, ক্ষণা লক্ষ্মী, তোমাকে আমার সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে আনি।—বলিয়া সে একরকম টানিতে টানিতেই ক্ষণাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দুর মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ দুর্ব্বোধ্য নয়। ছায়া যে তাহাদের দুই জনকে নিভৃত বাক্যালাপের সুযোগ দিতেই ক্ষণাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা বুঝিয়াই এই হাসিটুকু। বিমলেরও হাসিবার কথা; কিন্তু মুখখানা ভার করিয়া সে বসিয়া রহিল; কোনরূপ ভাবান্তরই দেখা গেল না।

যত বড় ভালবাসার লোকই হোক, ঐ রকম অবস্থায় কথা আরম্ভ করা কি যায়! বিমল এমন নিঃসম্পর্ক, এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিয়া আছে যে, কথা আরম্ভ করিতে সত্যই ইন্দুর কুণ্ঠা বোধ হইতেছিল। কিন্তু এই অত্যল্প অমূল্য সময়টুকু হেলায় হারাইতেও পারা যায় না। তাহা যায় না বলিয়াই ত আরও দুঃখ, আরও কষ্ট।

ইন্দু দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিল, তারপর বলিল, তুমি সুন্দরবনে যাবে?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

—কাজের চেষ্টায়?

—হ্যাঁ।

—কবে যাবে?

—বোধ হয় কালই।

—আর কয়েক দিন পরে গেলে হয় না?

—কেন?

স্বর-লিপি

(সুর ও স্বর-লিপি অধ্যাপক শ্রীনরোত্তমদাস ঘোষ)

কথা—শ্রীঅনুরূপা দেবী

আজি বারিঝরা বাদলে
কত কথা পড়ে মনে গুরু মেঘ মাদলে ॥

বিজলী চমকি চায়
হাহা রবে ডাকে বায়
বিরহী ডাহুক বধূ কাঁদে আজি উভরায়

দিশি দিশি ঘন ঘোর
আঁধার এ গৃহ মোর
শূন্য পরাণ মনে প্রবোধিব কি বলে ॥

সুরট-মল্লার—তেতালা

গা সা রগা মপা I মা গরা সান্ সা I রা - া া া I
বা ০ রি০ ০০ I ঝ রা০ বা০ দ I লে ০ ০ ০ I

রগা মপা পমা গরা I
আ০ ০০ জি০ ০০ I

সা রা মা রা I মপা পনা নর্সা র্সা I সপা পধণর্সা
ক ত ক থা I প০ ড়ে০ ম০ নে I গু০ রু০০০

ণা ধপা I পমা গরা গা রা II
মে ঘ০ I মা০ া০ দ লে II

I সা সা রগা পমা I গা রা রা া I
I বি জ লী০ ০চ I ম কি চা য় I

গরা গা মধা পা I মা গা রগা সা I
হা০ হা র০ বে I ডা কে বা০ য় I

সা রা মরা রমা I পা পা ধা পধণা I ণধপা পপা রগা ধপা I
বি র হী০ ০ডা I হু ক ব ধূ০০ I উ০০ কাঁদে আ০ ০জি I

মা গা রা া I
উ ভ রা য় I

া মপা না না I র্সা র্সা র্সা র্সা I পা র্সা র্সা র্সা I
া দিশি দি শি I ঘ ন ঘো র I আঁ ধা র এ I

নর্সা নর্সা র্রা র্মর্গা I র্রা র্গর্রা না নর্সা I র্সা র্সা র্সা র্সা I
গৃ০ হ০ মো ০০ I র্ দিশি দি শি০ I ঘ ন ঘো র I

পা র্সা র্সা র্সা I নর্সা নর্সা র্রা র্রা I
আঁ ধা র এ I গৃ০ হ০ মো র I

না া না নর্সা I র্সা র্সা র্সনা র্সা I
শূ ০ ন্য প০ I রা ণ ম০ নে I

নর্সা নর্রা র্সা ণধপা I ধা মগরা গা রা II
প্র০ বো ধি ব০০ I কি ০০০ ব লে II

গণ্ডী টানা কি উচিত নয় ?

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

আজ সেই ভোররাতে বৃষ্টি নামিয়াছে, থামিবার নাম নাই। মাঝে মাঝে খুব জোরে আসিতেছে আবার কখনও কখনও বৃষ্টির বেগ কমিতেছে, একটি বারও থামে নাই। এইমাত্র ভিজা কাপড়ের ডাঁই লইয়া এঘর ওঘর বেড়াইয়া কতকগুলাকে সিঁড়ির দড়িতে, কতকগুলাকে রান্নাঘরের দড়িতে, বাকীগুলাকে শুইবার ঘরে ছবির পেরেকে আলনার হুকে টাঙ্গাইয়া ঝুলাইয়া দিয়া আসিলাম। একে ত আকাশ মুখ পুড়াইয়া রহিয়াছেন, ঘর-দুয়ারে আলো বাতাস নাই বলিলেও হয়, তার উপর ভিজা কাপড়ের রাশ ঝুলিতেছে —ঘর হইয়াছে স্যাঁৎসেতে, মনও তদ্রূপ।

একগাদা ভিজা চুল লইয়া সারা হইতেছি। দিদি বার বার করিয়া মানা করিয়াছিলেন স্নান করিতে, তাঁহার কথা শুনি নাই, এখন বুঝিতেছি গুরুজনের কথা না শোনার কি ফল! এমনিতেই আমার এ চুলের গাঁজা শুকাইতে চায় না, তার উপরে এই দারুণ বর্ষা, ভিজা চুল বাঁধিয়া রাখিলে শরীর খারাপ হয়, মহামুস্কিল।

খবরের কাগজ লইয়া বিছানায় আসিতেছি, দিদি প্রাতর্বাক্যে আমার মরণ কামনা করিলেন, বলিলেন, ভিজে চুলে ঘুমিয়ে মর, মজা দেখবে'খন।

মরিলে যে মজা দেখিবার সুযোগ আর হয় না এ কথা দিদিকে বুঝাইবার সাধ ছিল না তা নয়, তবে সাহস ছিল না সত্য। তাই বলিলাম, না দিদি ঘুমুব না। আপনি দেখবেন।

দিদি বিড়-বিড় করিলেন। বিড়-বিড়ের যাহা মর্ম্ম তাহা আমি জানি। তাহা এই, সে আমার দেখা আছে অনেক অনেক।

সত্যি মনে করি ঘুমাইব না, খুব চেষ্টাও ত করি, শেষ পর্য্যন্ত কেমন যে ঘুমাইয়া পড়ি, কিছুতেই পারি না।

কিন্তু আজ ঘুম হইল না। খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নীচের লিখিত সংবাদটি পাওয়া গেল :—

বিগত শনিবার রাত্রিতে ঢাকুরিয়া লেকে এক মর্ম্মান্তিক শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। যতদূর জানা যায় ঘটনার আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

শ্রীমতী অমুক এবং শ্রীমান অমুক বাহির মির্জ্জাপুর রোডে বাস করিত। তাহাদের বাড়ী কাছাকাছি। শ্রীমতীর বয়স ১৮ বৎসর এবং শ্রীমানের ২০ বৎসর। দুই পরিবারের মধ্যে বেশ আন্তরিকতা ছিল। পরস্পরের বাড়ীতে যাওয়া-আসার ফলে উহাদের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, মাস দুই পূর্ব্বে বিহারে এক ডাক্তারের সঙ্গে শ্রীমতীর বিবাহ হইয়া গেল।

দিন কয়েক পূর্ব্বে যুবতী স্বামীগৃহ হইতে কলিকাতায় পিত্রালয়ে আসে, এখানে আসিয়া আবার প্রণয়ীর সঙ্গে তাহার দেখা হয়।

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় প্রণয়ী তাহার এক বন্ধুর মোটরে করিয়া প্রণয়িনীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধুর শোফেয়ারই গাড়ী চালাইতেছিল। তাহারা গঙ্গাতীরে ষ্ট্রাণ্ড রোডে একবার এদিকে একবার ওদিকে গাড়ী চালাইতে থাকে। এইরূপে রাত্রি প্রায় ১১টা হয় এবং তাহারা শোফেয়ারকে ঢাকুরিয়া লেকের দিকে গাড়ী চালাইতে বলে।

লেকে গিয়া যুবকটি তাহার কোট গাড়ীতে রাখে এবং যুবতীকে লইয়া ভ্রমণ করিবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করে। তাহারা শোফেয়ারকে বলে লেকের ধারে একটু বেড়াইয়া খানিক পরেই ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের ফিরিয়া আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া ড্রাইভার খোঁজ করিতে যায় এবং জলের ধারে এক জোড়া জুতা দেখিতে পায়। তাহা দেখিয়া তাহার মনে আশঙ্কা হয় এবং সে সাহায্যের জন্য লোক ডাকাডাকি করে। সন্নিহিত মসজিদের একটি লোক তাহাকে বলে যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে একটি যুবক ও একটি যুবতীকে জলের ধারে দেখিয়াছে এবং তাহার পর জলে ঝপ করিয়া কিছু পড়িবার মত শব্দও শুনিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বালিগঞ্জের পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস আসিয়া যুবকটির কোটের পকেটে একটি চিঠি পায়। চিঠিখানা নাকি যুবতীর হাতে লেখা। পত্রে লিখিত ছিল যে, তাহারা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতে চলিয়াছে।

ডুবুরীর সাহায্যে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তাহাদের মৃতদেহ জল হইতে তোলা হয়। যথারীতি সুরতহালের পর তাহাদের শব তাহাদের পিতামাতার নিকট দেওয়া হয়।

প্রথমবার পড়িয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। আর একবার পড়িলাম। তার পর কাগজখানা লইয়া দিদির ঘরে গেলাম। দিদি ঘরে ছিলেন না। তাঁহার ছেলেদের জামা-কাপড়গুলা সহজে ও শীঘ্র শুকায় কিরূপে তাহারই নানাবিধ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। সিঁড়ির কোনে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া (ঘরে জ্বালেন নাই, কেরোসিনের ধোঁয়ায় ঘর কালো হইবে,

—দিদির এইরূপ মত) ছোট ছোট জামা কাপড়গুলাকে রুটী-সেঁকা করিতেছেন।

কাগজের সেই জায়গাটা খুলিয়া বলিলাম, পড়ুন। দিদি বলিলেন, ঘরে চল্ আমি আসছি।

দুই চারিটি কথায় দিদির একটু পরিচয় আমি যদি এখন দিই তাহা কি বেমানান হইবে? আমি বরাবর দেখিয়াছি, দিদি লোকটি বেজায় নিয়ম-দুরস্ত, যেখানকার যা এবং যখনকার যা তাহা হইতে একটুও এদিক-ওদিক বা নড়-চড় হইবার যোটি নাই। দিদি রান্নাঘরে রান্না করিতেছেন, এমন সময় ডাকের চিঠি আসিল কিন্তু যত দরকারী চিঠি হউক না কেন, খবরের জন্য যত আকুলতাই থাকুক না কেন, দিদি উপরে গিয়া বিশ্রামের সময় ছাড়া চিঠি খুলিবেন না বা পড়িবেন না। আমরা হইলে কি করি? তখনই সর্ব্বাগ্রে চিঠি খুলিয়া পড়িয়া তবে অন্য কাজ। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। দিদি হয় ত দ্বিতলে কোন কাজে ব্যস্ত আছেন জানিয়া চা এর সময় চা তৈরী করিয়া চা-এর পেয়ালা উপরে আমরা পাঠাইয়া দিলাম: তাহা হইবার যো নাই। চা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল, বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি চা-এর ঘরে আসিতেছেন। সব ব্যাপারেই দিদির এইরকম বাঁধা-ধরা নিয়ম ব্যবস্থা।

দিদি জামা-কাপড় সেঁকা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া বলিলেন, দে দেখি কি খবর আছে।

খবরটা পড়িয়া কাগজখানাকে আমার পানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, মরণদশা আর কি!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কার মরণদশা দিদি?

দিদি রাগতভাবে বলিলেন, তোর আবার কার?

—আমি কি দোস করলাম যে আমার মরণদশা হতে যাবে?

দিদি সেঁকা জামা কাপড়গুলাকে আলনায় গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন, মেয়েটা কি পাশটাশ?

আমি কাগজখানা আর একবার দেখিয়া লইয়া বলিলাম, কৈ, তা ত কিছু লেখে নি দিদি।

— নিশ্চয় পাশকরা মেয়ে। কলেজে না পড়লে কি অত চং হয়! মরবি ত একলা আপিম খেয়ে কি গলায় দড়ী দিয়ে মরলেই পারতিস্; একটা ভাল-মানুষের ছেলেকে সুদ্ধ মারলি কেন বাপু! ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার!

আমি অবাক হইয়া রহিলাম।

দিদি বলিতে লাগিলেন, ঐ ছুঁড়ীই মরবার পরামর্শ দিয়েছে ছোঁড়াকে, নিশ্চয় নিশ্চয়।

—তা আপনি কি করে বলছেন?

- দেখছিস্ নে, ছোট বোনের নামে শেষ পত্র পর্য্যন্ত লিখে তৈরী হয়ে গেছে। ছেলেটার যদি মরবার ইচ্ছা বা মন থাকত, তা' হ'লে সেও অমনই শেষ চিঠি লিখে বেরুত। তা সে বেরোয় নি। ইনি তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলেছেন, সে তাই করেছে. ইনি সারা রাস্তা তাকে ফুসলেছেন, চল মরি, চল মরি। ছোকরা হয় শেষ পর্য্যন্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে—

– দিদির এ ভারী 'এক-চোখো' কথা; তাই বলিলাম।

দিদি বলিলেন, মেয়েমানুষ মরতে বললে পুরুষ মানুষ না মরে পারে না। ঐ ছুঁড়ীই ছেলেটাকে ভুজুং দিয়ে মেরেছে।

—সে ত নিজেও মরেছে, দিদি।

তা মরেছে, তার মরাই উচিত; সে মরেছে, বেশ করেছে। বিয়ের পরে যে মেয়েমানুষের স্বামীতে মন ওঠে না, তার মরাই ভাল।

ইহার পর দিদি অনর্গল বকিয়া চলিলেন।

আমি তাঁহার বক্তৃতার সার কথাগুলি বলিব।

আজকাল Free mixing-এর যুগ। কংগ্রেস ইহার গোড়া-পত্তন করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, আইন-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে, কংগ্রেস একজিবিশনে ছেলেরা মেয়েরা পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করেছে, বেড়িয়েছে, খেয়েছে, ঘুরেছে, সিনেমা দেখেছে, থিয়েটারে গেছে। একসঙ্গে ভলেণ্টিয়ারী করেছে। তারপর রাস্তা ঘাটে মেয়েরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব সময়ে না হলেও ছেলেদের সাথে আলাপ-পরিচয় মেলামিশিও হয়েছে। এর পর এল Co-education, সহ-শিক্ষা। যে কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সে কলেজে ছাত্র ধরে না! শুধু মেয়েদের কলেজে পড়তে আজকাল-কার মেয়েদের মন ওঠে না।

খোঁজ করলে জানা যাবে আজকাল মেয়েদের ভাই বা দাদাদের বন্ধু-বান্ধবদের আনাগোনা সব বাড়ীতেই বেড়ে গেছে। আগে যে মেয়েদের দাদাদের বন্ধুরা আসত না, তা নয়, আসত; তবে এখনকার মত দাদাদের সঙ্গে ভদ্রগৃহস্থের অন্তঃপুরে দাদার বন্ধুদের এমন অবাধ-গতি বা স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার ছিল না। তখনকার দিনে, দাদার বন্ধুবান্ধবেরা বাইরের ঘরে দাদাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেই বিদায় নিত; এখন দাদার সম্পর্কে মা, কাকী, জেঠাইমা বলে ভিতরে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে সদাই সচেষ্ট।

এই রকম হ'তে হতে কোন মেয়ের দাদার কোন বন্ধুর উপর মন পড়াটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। এক সঙ্গে লেকে বেড়ান চলতে লাগল, সিনেমা দেখা চলল; হ'তে হ'তে ভাব খুব জমে গেল। এখন ধর, মেয়েটি হয়ত বৈদ্য জাতি আর দাদার সেই বন্ধুটি ব্রাহ্মণ।

মেয়ের বিয়ের বয়স হ'ল এবং তা চলেও গেল, সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। হচ্ছে ত হচ্ছেই। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর—দেখতে দেখতে পাত্র পছন্দ হ'ল, দেনা পাওনা মিটল, বিয়ের কথা পাকা। মেয়েটি মুখ শুকিয়ে বেড়ায়, দাদার বন্ধুও তাই। তারপর একদিন সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়ল।

তারপর? ফুলশয্যার রাত্রের ফুলবাসর, রঙীন আলো, নবীন আনন্দ, অসঙ্কোচ প্রেম-যাচ্ঞা, মেয়েটির জীবনে এ সবই আনকোরা নূতন। বেশীর ভাগ মেয়েই দাদার সেই বন্ধুকে ধীরে ধীরে ভুলতে আরম্ভ করে। তখনই ভুলতে পারে বা ভুলে যায় এমন কথা আমি বলছি নে; আমি বলছি-আস্তে আস্তে পুরানো ছবি তার মন থেকে মুছতে সুরু করে। দু' চারটে পোড়ার-মুখী অন্য রকমেরও থাকে।

আর ছেলেটি ? বেশীর ভাগে ছেলে স্বর্গীয় প্রভাত বাবুর "ষোড়শী" বইয়ের "প্রণয় পরিণাম" গল্পের নায়ক মাণিকলাল হয়ে যায়। হয় কুসুমলতার বিয়েতে পেট ভরে লুচিমণ্ডা খেয়ে গাছে গাছে আম জাম পেয়ারা পেড়ে পেড়ে বেড়ায় ; না হয় আধুনিক মতে কাবলী ধুতি পরে রুক্ষ চুল, ফ্যাকাসে মুখে সিনেমায় সিনেমায় ঘুরে দিন কাটায়। দু' চারটি ছেলে যে অন্য রকমেরও না থাকে, তা অবশ্য নয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে লেকের নাটকের নায়ক নায়িকার মত দুষ্প্রবৃত্তি বেশীর ভাগ মেয়ে বা ছেলের হয় না ; কিন্তু ঐ যে দু' একটা হয়, সমাজের আবহাওয়া দূষিত করতে আর সমাজকে নাড়া দিতে ঐ দু' একটাই যথেষ্ট। তরুণ-তরুণীর প্রেমের ব্যাপারে হতাশা আসা খুবই স্বাভাবিক ; নানা কারণেই তা সম্ভব হতে পারে ; কিন্তু হতাশ হলেই যে অমনই গাঁটছড়া বেঁধে মরতে হবে, এই যদি চলন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বাঙ্গালা দেশের লেক পুকুর নদ ও নদীর জল শীঘ্রই পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠবে।

ঘটনা একটিই ঘটেছে সত্যি ; কিন্তু এই ধরণের সাময়িক বাতুলতা প্লেগ, বসন্ত, ফ্লু ও কলেরার মত সংক্রামিত হয়ে উঠতে বেশীক্ষণ লাগে না। একদিন একটি স্নেহলতা তার দায়গ্রস্ত পিতামাতাকে দায়মুক্ত করবার জন্য কেরোসিন কাপড়ে ভিজিয়ে পুড়ে মরেছিল ; স্নেহলতার বাপ অব্যাহতি পেয়েছিলেন হয়ত, তারপর কেরোসিনে পুড়ে মরা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি একটি ক'রে বোধ হয় হাজারটি স্নেহলতা অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে। হাজার কিশোরীমেধ যজ্ঞের ফলে পৃথিবীর কি কোন উপকার হয়েছে ? পুত্রের পিতারা পণ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছিল ? বিনা পণে ক'টা বাঙ্গালীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে ? বিয়েই যদি হবে, তা' হলে মেয়েরা কলেজে গিয়ে পুরুষের পড়া পড়ে পাশ করবার জন্যে খেটে খেটে স্বাস্থ্য, লাবণ্য, মাধুর্য্য, জলাঞ্জলি দিচ্ছে কেন ? বিয়ে হচ্ছে না বলেই ত।

আমি বুঝেছি আমার এ কথাটা কোন লেখাপড়া জানা মেয়েরই ভাল লাগবে না। আমাকে মূর্খ, সেকেলে বুড়ী বলে তাঁরা উপহাস করবেন। তবু আমি বলবই যে এইটেই হল আসল সত্য কথা। লেখাপড়া - (মেয়েদের) সপক্ষে যত যুক্তিই দেখান না কেন, সে সবই মনকে আঁখি ঠারা ! আমি এমন একটি বাপ মা দেখিনি, যিনি মেয়ে লেখাপড়া করছে, এখন বিয়ে দেব না বলে বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন বা পিছিয়ে দিয়েছেন। ছেলের বাপ মা সে কথা বলেন, তাঁদের তা বলা সাজে, খাটেও। মেয়েদের পক্ষে তা খাটে না, খাটে নি, কখনও খাটবে না। মেয়েদের বর জুটছে না বিয়ে হচ্ছে না, হয় ত হবেও না, তাই বাপ মার অবর্ত্তমানে অবিবাহিতা থেকেও যাতে করে তারা দু' পয়সা অর্জ্জন করে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পারে, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। যে শিক্ষা এখন মেয়েরা পাচ্ছে, সে শিক্ষা তাদের মাষ্টারনীই করতে পারে ; আর কিছু পারে কি ? কত মাষ্টারনীরই বা আর দরকার ! আর কত মাষ্টারনীই বা চাকরী পাবে, কে জানে।

মেয়েরা লেখা পড়া শিখছে, পুরুষদের সঙ্গে এক কলেজে পড়ছে, এক ট্রাম বাসে চলাফেরা করছে, সিনেমায় যাচ্ছে—এক কথায় মেলামেশার কোন বিশেষ বাধা আছে বলে মনে হচ্ছে না। এদিক দিয়ে সমাজ খুব আধুনিক, খুবই সাহেবঘেঁসা হয়েছে।

শুধু ঐ দিকেই সমাজ আধুনিক হয়েছে ; আর সকল দিকেই যেমন আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ো সে ছিল, আজও তাই আছে।

সাহেবদের দেখাদেখি Co-education,—সহ-শিক্ষা ও মেলামেশা বাঙ্গালীর সমাজে চলছে বটে, কিন্তু এই সহ-শিক্ষা ও অবাধ মেলামেশার ফলে কোন নব্য-নব্যার প্রেম হ'লে, বিবাহ করতে চাইলে তারা যদি এক জাতের বা এক সমাজের না হয়, তাহলে তাদের বিয়ে দেবার মত দুঃসাহস সমাজের হচ্ছে কোথায় ? বিয়ের সময় জাত, কুল, পরিচয় (পর্য্যায়) ইত্যাদির বেড়া কিছুটাও শিথিল হয়েছে কি ? হয় ত একটু হয়েছে, অতি-আধুনিক অর্থাৎ বিলাত-ফেরত হিন্দু সমাজে (তাও খুব সামান্য !) আর ব্রাহ্ম সমাজে। কিন্তু অন্যান্য সমাজে কড়াকড়ি ঠিক আছে।

এই যে মেয়েটি লেকের জলে তার প্রণয়ীকে নিয়ে ডুবল সে তার প্রণয়ীকে খুব ভালবাসত তাতে সন্দেহ নেই। তার বয়স হয়েছে, ছেলেটিরও বয়স হয়েছে, তাদের দুজনের বিয়ে হলে অন্যায়টা কি হত ? তা না হয়ে বাপ মা পাটনা না কোথা থেকে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে এনে ঐ ধাড়ী মেয়ের স্বামী করে দিলেন। অবাধ মেলামেশা চালিয়ে মেয়েকে অন্য একজনের সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখেও বাপ-মার চৈতন্য যদি না-ই হয়ে থাকে, তার প্রায়শ্চিত্ত লেকের জলেই হ'ল।

আমি বলছি হয় অবাধে মেলামেশা বন্ধ কর, মেয়েদের আবার সেই ঋতুমতী হবার আগেই বিয়ে দিয়ে শ্বশুরঘরে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর আর তা যদি না পার, তা যদি না মনঃপূত হয়, সাহেবী সমাজই করতে চাও, তা হলে ঐ জাত-টাত, কুল-পর্য্যায় তুলে দিয়ে মেয়েদের অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব জীবন-সহচর নির্ব্বাচনের স্বাধীনতাও তাদের দিয়ে দাও। হয় এদিক না হয় ওদিক ! দু'-নৌকোয় পা রাখলে পা পেছলায়, ডুবতেও হয়।

আমি দিদির কথাগুলা যতদূর পারিলাম গুছাইয়া তুলিয়া দিলাম। ইহার পরে আমার বলিবার আর কিবা থাকিতে পারে ? ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের ও কষ্টের, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেটির মেয়েটির পিতামাতা হয় ত আছেন। তাঁহাদের কথা চিন্তা করিলে শোকে অভিভূত হইতে হয়। আমি তাঁহাদের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি ; ভগবান তাঁহাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। তাঁহাদের সন্তান ত গিয়াছেই, তাহাদের ত আর ফিরিয়া পাইবেন না, আবার তাহাদের মৃত্যুপ্রসঙ্গে কত রকমের কথাই তাঁহাদিগকে শুনিতে হইয়াছে, ইহাও অল্প মনস্তাপের বিষয় নয়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক

"**বিজ্ঞান** সভ্যতার বিঘ্নকর কিনা" তাহা লইয়া কলিকাতা রোটারী-ক্লাবে গত ১৬ই জুলাই তারিখে এক বিতর্ক-সভা হইয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সায়েন্স-কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ঐ প্রসঙ্গে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

"বিজ্ঞান সভ্যতার আদর্শের বিনাশ সাধন করিয়া যুদ্ধ, বেকার-সমস্যা, উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য এবং বাণিজ্য-বিভ্রাটের উদ্ভব করিতেছে, এই যে একটা ধূয়া উঠিয়াছে, ঐ ধূয়া ভিত্তিহীন", ইহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য। পরন্তু তাঁহার মতে বিজ্ঞানই সাধারণ মানুষের কৃষ্টি ও শিক্ষার ক্রমোন্নতি বিধান করিতেছে।

তাঁহার বক্তৃতার অন্যান্য অংশের উল্লেখযোগ্য কথা—

(১) প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—দুনিয়ার সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা দেখা যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী প্রকৃতির মূল নিয়মগুলির আবিষ্কার করা।

(২) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিতে যাঁহাকে বুঝা যাইতে পারে, তিনি তাঁহার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। তিনি সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

(৩) "সভ্যতা" বলিতে যদি দৈনন্দিন জীবনের রমণীয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি ব্যতীত মানুষের জ্ঞানের সীমানার উন্নতি, বৃহত্তর জীবনের উপভোগের সুযোগবৃদ্ধি, সাধারণের ভিতর শিক্ষার বিস্তার বুঝায়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এবং ধনিকের সমবায় যে সভ্যতার খর্ব্ব না করিয়া ইহার উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

(৪) এক শত বৎসর পূর্ব্বে জগতের যে স্বাভাবিক বিভব ছিল এখনও ঠিক ঠিক তাহা ত' আছেই, বরং একটু বাড়িয়াছে।

(৫) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রগতি এবং ইহার প্রয়োগ নূতন নূতন বিভব সুলভ করিয়া দিয়াছে এবং কায়িক শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

(৬) এখন আর কাহারও দরিদ্র হইবার কারণ নাই। প্রত্যেকেরই খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আবাস-গৃহ থাকা উচিত। এখন আর কাহারও কঠোর পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। চারিদিকে শিক্ষা ও জীবন উপভোগ করিবার জন্য প্রচুর অবসর পাইবার সুযোগ বিস্তার লাভ করিতেছে।

(৭) যদি বিজ্ঞানকে নিন্দা করিবার কিছু থাকে, তাহা এই মাত্র যে, ইহা আমাদিগকে জ্ঞান (knowledge), শক্তি এবং বিভব দিয়াছে, কিন্তু বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবার বিজ্ঞতা (wisdom) দেয় নাই।

ঐ বক্তৃতার সমর্থন করিয়াছেন মিঃ জে. ভ্যান ম্যানন। অবশ্য, ইনি কোন্ জাতীয় এবং স্ব-পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অন্যতম বেতনভুক্ "পণ্ডিত" কি না, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই।

আমরা এই বক্তৃতার মন্তব্য সমর্থন করি না। প্রকৃত "বিজ্ঞান" বলিতে কি বুঝায়, তাহা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান "বৈজ্ঞানিক"-গণের মধ্যে যথাযথ অনেকেরই জানা নাই। প্রকৃত "বিজ্ঞান" বাস্তবিকই মানুষকে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তি প্রদান করে। বর্ত্তমানে যাহা যাহা "বিজ্ঞান" বলিয়া চলিতেছে, তাহার মধ্যে কোনটাই প্রকৃত "বিজ্ঞান" নহে। তাহার প্রত্যেকটীকে "কুজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। এই "কুজ্ঞান"-গুলি মানুষের প্রকৃত সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং মানুষের বুদ্ধির পর্য্যন্ত হ্রাস সাধন করিতেছে। এই "কুজ্ঞান"-গুলির ফলে মানুষ গরলকে অমৃত এবং অমৃতকে গরল মনে করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হইয়াছে।

ডাঃ মিত্রের বক্তৃতা আদ্যোপান্ত অসমঞ্জস এবং তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না। আমরা প্রথমে ডাঃ মিত্রের বক্তৃতায় কি আছে তাহা দেখাইয়া, তাহার পর আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত করিব।

ডাঃ মিত্রের বক্তৃতার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অংশানুসারে দেখা যাইতেছে যে, "প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিতে বুঝিতে হইবে তাঁহাকে, যিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন।" অতএব তাঁহার কথানুসারে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কখনও তাঁহার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, যিনি বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তাঁহার পক্ষে বাস্তব প্রয়োগের ফলাফল জানা সম্ভব নহে, কারণ কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের কি ফলাফল, তাহা জানিতে হইলে, তাহার বাস্তব প্রয়োগের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

কাযেই এই দাঁড়ায় যে, ডাঃ মিত্রের কথানুসারে, যিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাস্তব প্রয়োগের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন। অথচ ডাঃ মিত্রের সম্পূর্ণ বক্তৃতা হইতে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের প্রয়োগ হইতে মানুষের সভ্যতার ও কৃষ্টির যে এতখানি উন্নতি হইয়াছে, তাহার দিকে তিনি নিজেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি নিজে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন? এবং ইহাও কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন, তাহা নিজেই স্বীকার করিতেছেন? তিনি যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকই না হন, তাহা হইলে সায়েন্স্-কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপকের কেদারাখানি জুড়িয়া বসিয়া আছেন কেন?

ডাঃ মিত্র জানিয়া রাখুন, কোন বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের ফলাফলের দিকে কাৰ্য্যতঃ লক্ষ্য না রাখিয়া পারেন না। যে আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগ কোন রূপ কুফল উৎপাদন করে, তাহাকে মানুষ শব্দ-প্রয়োগের বিধি অনুসারে কুজ্ঞানোদ্ভূত বলিতে বাধ্য। এবম্বিধ আবিষ্কারকে বিজ্ঞানোদ্ভূত বলিলে, "বিজ্ঞান" নামটীর কলঙ্ক করা হয় এবং যে বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের কুফলের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত এবং "কুজ্ঞান"-কে "বিজ্ঞান" বলেন, তিনি কাপুরুষ এবং আত্ম-প্রতারক।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে কিছু কিছু কুফলোৎপাদন করিয়াছে, তাহা বক্তা স্বয়ং নিজ বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ মিত্র যে উহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিবেন? যদি অস্বীকার না করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান "বিজ্ঞান" যে ডাঃ মিত্রের মতানুসারেও "কুজ্ঞান"-মিশ্রিত, তাহা বলা যায় না কি?

বক্তৃতার প্রথম উল্লেখযোগ্য অংশানুসারে, "দুনিয়ার সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা দেখা যায়, তাহার ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী প্রকৃতির মূল নিয়মগুলির আবিষ্কার করাই প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।"

প্রকৃত "বিজ্ঞান" অথবা "সায়েন্স্" এই শব্দ দুইটীর ব্যুৎপত্তি-গত (etymological) অথবা শব্দগত অর্থ চিন্তা করিলে, ঐ শব্দ দুইটীতে যাহা বুঝায়, তদনুসারে কেবল বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে সমান (common) কি কি আছে, তাহা জানিতে পারিলেই বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে, বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে যাহা যাহা সমান (common) আছে, তাহা ছাড়া আরও কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়, ইহা আমরা 'বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত,' তাহা আলোচনা করিবার সময় দেখাইব।

ডাঃ মিত্র যাহা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে-ছেন, তাহার পোষকতা করিবার লোকের সংখ্যাই প্লেটোর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অধিক, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকগণ যদি "বিজ্ঞান" অথবা "সায়েন্স্" শব্দের শব্দগত অর্থানুসারে, উহার সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত এবং

তাহার প্রয়োজনীয়তা কি তাহা সম্যক্‌ভাবে স্থির করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, কেবল মাত্র 'বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে সমান (common) কি আছে তাহা জানা অথবা তাহার ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য,' ইহা বলিলে বিজ্ঞানকে সঙ্কুচিত করা হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, তাহা প্লেটো হইতে টমসন পর্য্যন্ত অদ্যাবধি কেহই সম্যক্ ভাবে স্থির করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে ইহাঁরা যাহা বলেন, তাহাতে যে, প্রত্যেক মানুষের আরাধ্য যে বিজ্ঞান, তাহাকে সঙ্কুচিত করা হয় এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের উপাসকদিগের মনোবেদনা সাধন করা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতানুসরণ করিয়া যাহা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তাহা অর্জ্জন করিতে হইলেও, দুনিয়ার সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে কি কি **দেখা যায়,** তাহা যথাযথ নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হয়। কাযেই, তাঁহাদের মতানুসরণ করিলেও বলিতে হইবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু **যথাযথ দেখিতে পারিলে** প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্ভব হইতে পারে, নতুবা তাহার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুকে যথাযথ না দেখিতে পারিলে অথবা যথাযথ দেখিতে না জানিলে, তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহা বালকের জ্ঞান এবং তাহা বিকৃত। কাযেই বস্তুকে **যথাযথ না দেখিয়া** যে-জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাকে "কুজ্ঞান" না বলিয়া "বিজ্ঞান" বলিলে "শব্দ-শাস্ত্র" সম্বন্ধে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্ধার করা হয় না এবং তাহা "কুজ্ঞান"ই থাকিয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুকে **যথাযথ দেখিয়া** বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন কি না। গ্যালিলিও, নিউটন এবং লাপ্লাস পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুকে দেখিবার জন্ত প্রধানতঃ তাঁহাদের নিজ নিজ চক্ষু ব্যবহার করিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ষ্টোক্‌স্, বুন্‌সেন এবং কার্‌কফের প্রস্তুত জ্যোতিষ্কালোকের বিভিন্ন বর্ণ-পরীক্ষার যন্ত্র (Spectroscope) আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বৈজ্ঞানিকগণ বস্তু দেখিবার জন্ত কেবল মাত্র স্বীয় চক্ষু ব্যবহারের পরিবর্ত্তে মুখ্যতঃ যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এখন আর কেহ কোন বস্তু দেখিবার জন্ত অণুবীক্ষণ (Microscope) এবং দূরবীক্ষণ (Telescope) যন্ত্র ব্যতীত কেবল মাত্র স্বীয় চক্ষুর ব্যবহার করেন না।

অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু দেখিলে তাহাকে যথাযথ দেখা হয় কি? ঐ জাতীয় যন্ত্রের সহায়তায় কোন বস্তুকে দেখিতে চেষ্টা করিলে, তাহার বাহ্যিক আয়তন এবং পরমাণুর আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া (magnify) হয় না কি? একটী বস্তুকে অথবা তাহার পরমাণুকে বর্দ্ধিত করিয়া দেখা আর তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখা, একই কথা নয় কি? হইতে পারে, বস্তুকে অথবা পরমাণুকে বর্দ্ধিত করিয়া দেখিলেও তদনুরূপ অথবা তৎসদৃশ একটা কিছু দেখা হয়, কিন্তু তাহাতে কি সেই বস্তুটীকে যথাযথ দেখা হয়?

কাযেই দেখা যাইতেছে, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুকে অথবা পরমাণুকে দেখিলে, সেই বস্তুটীকে অথবা তাহার পরমাণুগুলিকে যথাযথ দেখা হয় না এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুকে যথাযথ দেখিয়া বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন না।

অতএব যুক্তি অনুসরণ করিয়া ডাঃ মিত্রের কথা চিন্তা করিলে এবং শব্দ-শাস্ত্রের প্রতি কোন সম্ভ্রম রাখিয়া ঐ কথা প্রকাশ করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে কুজ্ঞান বলিতে বাধ্য।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে প্রকৃত বিজ্ঞান নহে পরন্তু কুজ্ঞান, তাহা তাহার স্বরূপ ও পরিণতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি সেই বিজ্ঞান, যাহার বীজ ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন, গ্যালিলিও, স্যার আইজাক নিউটন এবং লাপ্লাস রোপণ করিয়াছিলেন এবং যাহার পুষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে সাধন করিয়াছেন—মাইকেল ফ্যারাডে, ডারুইন, ষ্টোক্‌স্, বুন্‌সেন, কার্‌কফ, মেণ্ডেল, জোল, লর্ড কেল্‌ভিন, হেল্‌ম্‌হোৎস, গিবস্, ক্লসিয়াস এবং জে. জে. টমসন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পরিণতি

(১) লৌহ, কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং তাহার বহুল ব্যবহার।

(২) জাহাজাদি সমুদ্র-যানের নির্ম্মাণ ও তাহার প্রচলন।

(৩) রেল, মোটর প্রভৃতি স্থল-যানের নির্ম্মাণ এবং তাহার প্রচলন।

(৪) এরোপ্লেন প্রভৃতি আকাশ-যানের নির্ম্মাণ ও তাহার প্রচলন।

(৫) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি শব্দযন্ত্রের নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যবহার।

(৬) কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া জীবিকার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ।

(৭) শিল্পের জন্য বিবিধ যন্ত্রের নির্ম্মাণ এবং যন্ত্র-শিল্পের বহুল প্রচলন।

(৮) আবাস-গৃহ-নির্ম্মাণে লৌহের ব্যবহার ও তাহার বহুল প্রচলন।

(৯) পানীয়-জল-বিতরণে লৌহনির্ম্মিত নলের ব্যবহার ও তাহার বহুল প্রচলন।

(১০) খাদ্য ও পানীয়রূপে মাংসের ও মদ্যের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন।

(১১) পরিচ্ছদে জামা, জুতা প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্থাপন।

(১২) বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখার বহুল প্রচলন।

(১৩) যাতায়াতের জন্য নদী ও খাল-পথের প্রতি উপেক্ষা করিয়া স্থল-পথের প্রসারণ।

(১৪) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য সিনেমা, গ্রামোফোন এবং রেডিও প্রচলন।

(১৫) বর্ত্তমান অর্থনীতির উৎপত্তি ও প্রচলন।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা চিন্তা করিতে বসিলে, প্রথমেই ইহার অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

ইহাতে বস্তুর স্থূলরূপ (solid), জলরূপ (liquid) এবং বাষ্পরূপ (gas) সম্বন্ধে কথা আছে, কিন্তু এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা বস্তু কেন স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে, কেন তাহার জলরূপ এবং বাষ্পরূপ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু ঐ তিনটী কেন হয়, তাহা আলোচনা করিবার জন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। অথচ আত্ম-প্রতারণা করিয়া কতকগুলি পরিভাষার (terminology) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পদার্থ-বিদ্যায় ও রসায়নে বায়ু, জল এবং তেজ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। অথচ কোন্ স্থানের কি বস্তু হইতে এবং কি বিধিতে তাহাদের উদ্ভব হইতেছে এবং কোন্ নিয়মানুসারে তাহাদের দুষ্টি ও বিশুদ্ধি বিচার করিতে হইবে এবং কেন ঐ নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোনও কথা নাই। বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্রে ঝুড়ি ঝুড়ি সঙ্কেত (formulæ) এবং পরিভাষা আছে সত্য, কিন্তু মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ু, জল ও তেজকে কি উপায়ে বিশুদ্ধ ভাবে ব্যবহার করিয়া জীবকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করা যায়, তাহার কোন সুস্পষ্ট সন্ধান নাই।

রসায়ন শাস্ত্রে "বিবিধ ধাতু" সম্বন্ধেও অনেক সঙ্কেত (formulæ) ও পরিভাষা আছে এবং সেই গুলি পড়িলে এক ধাতুকে অন্য ধাতুর রূপ কি রূপে দেওয়া যাইতে পারে অথবা প্রকৃত বস্তুকে কি করিয়া বিকৃত করা যায়, তাহা শিক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু ধাতুগুলির মূল উপাদান কি, কি হইলে তাহারা জীবের উপকারী ও অপকারী হয় এবং কেন তাহারা তাদৃশ উপকারী ও অপকারী হইয়া থাকে, তাহার কোন সন্ধান নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞানে শব্দ, উত্তাপ, বায়ু, আলোক, চুম্বক এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে বটে, কিন্তু কোনটীরই মূল কারণ কি এবং কোন্ অবস্থায় তাহারা জীবের উপকারী অথবা অপকারী, এবং কেন তাদৃশ উপকারী অথবা অপকারী, তাহার কোন আলোচনা নাই।

এইরূপে যে কোন বিষয়ক বিজ্ঞানের পুস্তক ধরা যাউক না কেন, তাহাতে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় অসংখ্য বস্তুর ও বিধানের আলোচনা দেখা যাইবে বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানেই তদালোচিত বস্তু অথবা বিধানের মূল উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কি উপায়ে তাহাদের তাদৃশ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ অবস্থা জীবের উপকারী অথবা অপকারী এবং কেন তাহাদিগকে উপকারী অথবা অপকারী বলিতে হইবে, তাহার কোন পরিষ্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উপরে যাহা দেখান হইল, তাহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যে যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে এবং কোন বিষয়েই বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে কোথা হইতে এবং তাহার পরিণতি কোথায় এবং ঐ বস্তু জীবের হিতকারী অথবা অহিতকারী এবং কেন তাহা তাদৃশ হিতকারী অথবা অহিতকারী, তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই।

কোন পদার্থের কোন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কোন কথাও বর্ত্তমান বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞানে পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আলোচনা দুইটী—একটী, ওজন-কার্য্যের প্রকৃতি এবং অপরটী, বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি।

ওজন-কার্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনাটী প্রাচীন গ্রীক গণের সময়কার এবং তাহা প্রায়শঃ অপরিবর্ত্তিত ভাবে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ওজন-কার্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনাটীকে আপাত-দৃষ্টিতে বস্তুর কর্ম্মশক্তি বিশেষ সম্বন্ধীয় আলোচনা বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ, বস্তুর উপাদানের এবং অবস্থার (অথবা গুণের) তারতম্যানুসারে তাহার কর্ম্মশক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একই দ্রব্য শীতল অবস্থায় যে আয়তনের এবং যত ওজনের হইয়া থাকে, উষ্ণাবস্থায় ঠিক ঠিক সেই আয়তনের ও তত ওজনের হয় না।

কাযেই, বস্তুর উপাদান এবং অবস্থার (অথবা গুণের) সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন না করিতে পারিলে তাহার কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধীয় কোন ভ্রমহীন আলোচনা করা সম্ভব নহে।

বস্তুর ওজন সম্বন্ধে আর্কিমিডিসের সূত্র (Principles of Archimedes) নামে যে বিখ্যাত তথ্যটী বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যে বস্তুর কোন্ প্রকৃতি (উপাদান-প্রকৃতি, অথবা গুণ-প্রকৃতি অথবা কর্ম্ম-প্রকৃতি) সম্বন্ধীয় আলোচনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে, উহাকেও কোন বস্তুর কোন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তথ্য বলা যায় না এবং একটা সংজ্ঞা মাত্র বলিতে হয়।

বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্যার আইজাক নিউটন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই তথ্যটী হইতে বর্ত্তমান গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গণিতের উদ্ভব হইয়াছে।

ইহা বাস্তবিক পক্ষে বস্তুর কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধীয় একটী আলোচনা। বস্তুর উপাদান এবং গুণ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন না করিলে, তাহার গমনাগমন-শক্তি অথবা কর্ম্মশক্তি কি হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না। বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একই বস্তুর শীতলাবস্থায় গমনাগমনের যে কর্ম্মশক্তি থাকে, উষ্ণাবস্থায় সেই কর্ম্মশক্তি থাকে না, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুর তাপের অল্লাধিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তাহাও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতে পারেন। বস্তুর তাপের যে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা নিজ নিজ শরীরের তাপের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা যে, বহিঃস্থিত কারণের জন্য বস্তুর তাপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাহারই জন্য তাঁহারা নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম সূত্রটী মানিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর উপাদানেই এমন কারণ আছে, যাহার জন্য অবিরত বস্তুর তাপের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা জানা থাকিলে, "চাপোদ্ভূত শক্তির দ্বারা পরিচালিত না হইলে প্রত্যেক বস্তু হয় কর্ম্ম-বিরত থাকে নতুবা একটী সহজ সূত্রে (straight line) নিয়মিত গতিসম্পন্ন হয়,"* এই তথ্য গ্রহণ করা যায় না। তাপজাত শক্তিকে চাপোদ্ভূত শক্তি (impressed force) বলা যায় না।

প্রত্যেক বস্তুর উপাদানের অণুতে যে তাপের কারণ আছে, তাহা জে. জে. টমসন তাঁহার "আয়ন" (Ion) সম্বন্ধীয় বিখ্যাত তথ্যে পরোক্ষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বীয় দুই পংক্তি দন্ত একত্রিত করিয়া রাখিলে স্বীয় শরীরাভ্যন্তরে উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং দন্তের দুইটী পংক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঠোঁট দুইটীকে একত্রিত করিয়া রাখিলে তাপের হ্রাস হয়, ইহা সহজেই পরীক্ষাসাধ্য। দুইটী

* A body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it is compelled by external impressed forces to change that state. (Newton's 1st Law of Motion.)

ঠোঁটের (lips) মিলনে শরীরের তাপের হ্রাস হয় এবং দন্তের মিলনে শরীরের তাপের বৃদ্ধি হয়, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে না যে, মানুষের স্বীয় উপাদানেই তেজ ও জলের কারণ আছে ?

বাস্তবিক পক্ষে, জগতের **চরাচর-জীবের** স্বীয় উপাদানেই তেজ ও জলের অথবা উষ্ণতার ও শীতলতার কারণ আছে এবং বস্তুর কার্য্যশক্তি ও গতিশক্তি চাপোদ্ভূত শক্তি ব্যতীত উপাদানের তেজ ও জলের শক্তির দ্বারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কাযেই, নিউটনের তথ্য অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও কার্য্যক্ষেত্রে নিউটনের আবিষ্কৃত তথ্য পুরাপুরি স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছেন না। অবশ্য, তাঁহারা যে পরোক্ষভাবে নিউটনের তথ্য সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ-যোগ্য বলিয়া মনে করেন না, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না এবং বুঝিতেও পারেন না।

গৃহ ও 'পুল'-নির্ম্মাণকালে অথবা কোন যন্ত্র-নির্ম্মাণকালে অঙ্কশাস্ত্রানুসারে বিভিন্ন অংশের যে বিভিন্ন আয়তনের প্রয়োজন হয় বলিয়া হিসাবে প্রতীয়মান হয়, সেই সেই অংশে সেই সেই আয়তন ব্যবহার না করিয়া তাহার চারি গুণ অথবা পাঁচ গুণ অথবা ছয় গুণ পর্য্যন্ত আয়তন কার্য্যতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কি অঙ্কশাস্ত্রের উপর অথবা তৎ ভিত্তিস্থানীয় নিউটনের তথ্যের সম্পূর্ণতার উপর পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসের পরিচয় নহে ?

খেচর-জীব কেন ইচ্ছামত উড়িতে এবং জলে ও স্থলে বিচরণ করিতে পারে, জলে কেন কোন কোন চর-জীব ও অচর-বস্তু ভাসিতে থাকে, আবার কোন কোন চর-জীব ও অচর-বস্তু নিমজ্জিত হইয়া যায়, মৎস্যাদি জলচর জীব কেন ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে এবং স্থলে উঠাইলে কেন কিছুক্ষণ স্বীয় অঙ্গ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্থলচর জীব কেন ইচ্ছানুযায়ী গতিসম্পন্ন হয় এবং কোন কোন স্থলচর জীব কেন জলের উপর ভাসিতে পারে এবং কোন কোন জীব কেন পারে না, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে বসিলে, নিউটনের তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং ভ্রমাত্মকতা উপলব্ধি করা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন, নিউটনের গতি-বিজ্ঞান কেবলমাত্র ইচ্ছাহীন (without volition) বস্তুর পক্ষে প্রযুক্ত। তাঁহারা জানেন না যে, অর্থানুসারে ইচ্ছা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নাই, এমন কোন বস্তু প্রকৃতিতে নাই। মানুষ ইচ্ছাহীন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতি কোন ইচ্ছাহীন বস্তু সৃষ্টি করেন না। কাযেই, যদি বলা হয় যে, নিউটনের "গতি-বিজ্ঞান" ইচ্ছাযুক্ত বস্তুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে, তাহা হইলে উহাকে প্রাকৃতিক কোন বস্তু সম্বন্ধীয় বলা যায় না এবং উহা আর বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

বর্ত্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্র, গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অঙ্কশাস্ত্র এবং অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অঙ্কভাগ প্রধানতঃ নিউটনের গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাযেই, নিউটনের গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্য অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে বর্ত্তমান যাবতীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সুপ্রশস্ত সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইলে এবং ভারতীয় ঋষিদিগের বিজ্ঞান যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, আমাদের কথার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমরা ভারতীয় ঋষিদিগের বিজ্ঞান আংশিক ভাবে অধ্যয়ন করিয়া বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই বলিতেছি। অবশ্য, সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার জন্য আমরা যে পদ্ধতির ব্যবহার করিতেছি, তাহা প্রচলিত পদ্ধতি হইতে পৃথক্। স্যার আইজাক নিউটনকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন কথা লিখি নাই।

লিয়োনার্দো দা-ভিঞ্চির কার্য্যকালের আগে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জগতের যে অবস্থা হইয়াছিল এবং তাহার যে পরিবর্ত্তন দাভিঞ্চি, কোপার-নিকাস্, ফ্রান্সিস্ বেকন, গ্যালিলিও, নিউটন ও লাপ্লাস্ সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে, তাঁহাদিগকে ভক্তি-ভরে নমস্কার না করিয়া পারা যায় না। সংস্কৃত ভাষানুসারে ইহাঁরা প্রত্যেকে "জিজ্ঞাসু" ছিলেন, ইহাঁদের ভাষা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং কাহারও যে পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতা ছিল না, তাহা তাঁহাদের প্রচারিত কথাগুলি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্যার আইজাক

নিউটনের প্রচারিত তথ্যের বিরোধী কথা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমরা তাঁহার মৃত-আত্মার(?) নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমরা জানি, তাঁহার অনুচরবৃন্দ উত্তেজিত হইলেও তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ফ্রান্সিস বেকন, গ্যালিলিও ও আইজাক নিউটন ছিলেন প্রকৃত মহাত্মা। তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল তাৎকালিক দুঃস্থ ইয়োরোপের এবং তৎসঙ্গে জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এবং তাঁহাদের আবির্ভাব সার্থকও হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁহাদের কার্য্যের ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ক্লাইভের মত দেশ-প্রেমিকের এবং নেলসন ও ওয়েলিংটনের মত বীর-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড জগতের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতীয় পাঠক, ক্লাইভকে "দেশ-প্রেমিক" নামে অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইতেছি বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন? একবার ভাবিয়া দেখুন, ক্লাইভ কত বড় দেশ-প্রেমিক ছিলেন। যে চতুরতার সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের রাজত্ব তাঁহার স্বজাতির জন্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন,সেই চতুরতার দ্বারাই ঐ রাজত্ব দেশীয় কোন নৃপতিকে বিক্রয় করিয়া তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত অসীম সম্পদ অর্জ্জন করিতে পারিতেন না কি? যে সামান্য বেতনে তিনি চাকুরী করিতেন, তাহাতে নিজের সম্পদ অর্জ্জন না করিয়া স্বীয় দেশের ও জাতির জন্য ভারতার্জ্জন করিয়া যতখানি লোভ সম্বরণ করিবার ও দেশ-প্রেমের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা জগতের লিখিত ইতিহাসে আর কয়জন দিতে পারিয়াছেন?

আমাদের ভারতবাসীরও ক্লাইভের কাছে এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের রাজ্য-চালক ইংরাজের কাছে কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

আজ যে ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শন হইতে আমরা বিবিধ সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি, তাহা ইংরাজের জ্ঞান-পিপাসার ফল। আমাদের সমস্ত বেদ ও দর্শন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইংরাজের চেষ্টার ফলে এখন প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত পুস্তকই পাওয়া যায়। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং তাহার উদ্ধার এখনও হয় নাই এবং তাহার জন্যই ভারতীয় ঋষির এই পুস্তকগুলি যথাযথ অর্থে প্রচলিত নহে, তাহা সত্য। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা উদ্ধার করা প্রাকৃতিক কারণবশতঃ ইংরাজের পক্ষে সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য এবং তাহার উদ্ধার হয় নাই বলিয়া যদি কাহারও কোন দায়িত্ব থাকে, তবে তাহা ভারতবাসী "ঋষি"র সন্তান ব্রাহ্মণগণের। এমন কি, "মনি"-র সন্তান ব্রাহ্মণগণকেও তাহার জন্য দায়ী করা যায় না।

হইতে পারে, ইংরাজ শিশু-জাতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে জাতীয় জীবনের যে বয়সের প্রয়োজন, ইংরাজের এখনও তাহা হয় নাই,এমন কি ইহাও মানিয়া লওয়া যায় যে, বর্ত্তমানে ইংরাজ তাহার ভারতীয় শাসন-কার্য্যে ভুল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ আমাদের কোন উপকার করেন নাই, কেবল ভারত শোষণ করিয়াছেন এবং আমাদের দুর্গতির কারণ কেবলমাত্র তাঁহাদের সংস্রব, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন করা যায় না।

শিক্ষা ও শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ নিজের দেশে যখন যে বিধির প্রচলন করিয়াছেন, ভারতবর্ষেও প্রায়শঃ সেই বিধিরই প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ, ভারতের সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ভারতবাসীর অনুরোধ ও উপরোধ। খেলোয়াড়ের জাতি,—লোককে সাধারণতঃ অবিশ্বাস করিতে জানেন না; কাহাকে বিশ্বাস করিতে হয় ও কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারেন না এবং তাহার ফলে যাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়াছেন, তাহাদিগের প্রীতি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া পরোক্ষভাবে দেশের জন-সাধারণের অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। যে বিধিতে স্বীয় দেশের শিক্ষা ও শাসন পরিচালনা করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, এ দেশে তদ্বিরুদ্ধে কিছু করিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহাদিগকে আমাদিগের দুর্গতির জন্য দায়ী করা যাইত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে ইংরাজ জাতি যে তাহা করে নাই, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। পরন্তু, আমরা আমাদের শিক্ষা ও অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন করিবার জন্য যখন যাহা চাহিয়াছি, প্রায়শঃ তাহার পূরণ করিয়া আমাদিগকে ইংরাজ সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল পূরণ করেন নাই আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের বাঞ্ছা। এই বাঞ্ছা কি "তুমি দূর হও", —এবম্বিধ অনুজ্ঞার তুল্য নহে? এই অপ্রাকৃত বাঞ্ছা কি কেহ রক্ষা করিতে পারে? এই অপ্রাকৃত বাঞ্ছা কি ভদ্রোচিত?

ইংরাজ-শাসনকালে ভারতবাসীর দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু ইংরাজের নিজের দেশের দারিদ্র্য কি ততোধিক বাড়িয়া যায় নাই? কাজেই, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য ইংরাজের স্বভাব অথবা সততাকে সন্দেহ করা যায় না।

অতএব ইংরাজের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের সহিত বিরোধ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। যাঁহারা মনে করেন, স্বায়ত্ত-শাসন হইলেই দেশের অন্নাভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাঁহারা ভ্রান্ত। স্বায়ত্ত-শাসন হইলেই যদি অন্নাভাব দূর করা যাইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অন্নাভাব কেন? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ যে ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অধিকতর অন্নাভাবগ্রস্ত এবং দুর্দ্দশাপন্ন, তাহা কি কেহ অবিশ্বাস করিবেন?

আমাদের পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছেন যে, আমরা গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ-লাভের আশায় এতখানি ইংরাজ-স্তুতি করিতেছি। আমরা যে কাহারও কোন অনুগ্রহ পাইবার আশায় কিছু করিতেছি না, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। দেশ সম্বন্ধীয় আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই জন-সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভারতের, তথা বর্ত্তমান জগতের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার জন্য ইংরাজ জাতির উপর কোন দায়িত্বের আরোপ করা যায় না। পরন্তু ইংরাজ জাতির পরোক্ষ বিচক্ষণতার জন্যই বর্ত্তমান জগৎ এক একটী আসন্ন মহাযুদ্ধ হইতে এবং চরম দুর্দ্দশার অবস্থা হইতে রক্ষা পাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ বিচক্ষণতার সহিত না চলিলে, আমেরিকার, জাপানের ও জার্ম্মানীর রণবাদ্য আবার বাজিয়া উঠিত এবং জগৎ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

জগতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য যুক্তিযুক্ত ভাবে যদি কাহারও কোন দায়িত্ব থাকে, তাহা মূলতঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের, ভারতের শিক্ষা-বিভাগীয় দেশীয় পরিচালকগণের ও ঋষির সন্তান ভারতবাসী দাম্ভিক ব্রাহ্মণগণের।

জগতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পরিমাণ যে কতখানি এবং তাহা কত ভীষণ, তাহা সাধারণতঃ যে আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহাও মনে করিবার কারণ আছে। একমাত্র ইংরাজ পরোক্ষভাবে সারা জগতের এই দুর্দ্দৈব যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার কার্য্য করিতেছেন। ইংরাজের গত পনের বৎসরের কার্য্যই যে জগৎকে তাহার চরম দুর্দ্দৈব হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করিতেছে, তাহা খুব সম্ভব ইংরাজ নিজেও জানেন না। কিন্তু জগতের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আবার মনুষ্যজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা প্রাকৃতিক কারণবশতঃ ইংরাজের অথবা জগতের কোন জাতির সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা সম্ভব হইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দ্বারা। আমাদের এই কথা আপাতদৃষ্টিতে অভিমানপ্রসূত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জগৎ যখন দেশের "প্রকৃতি" কাহাকে বলে এবং তাহার তারতম্য হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধিযোগ্য হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে, বলশেভিক রুসিয়া, অথবা মুসোলিনীর ইটালী, অথবা হিটলারের জার্ম্মানী, অথবা বর্ত্তমান আমেরিকা জগতের দারিদ্র্য মোচন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত।

জগতের এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলে ইংরাজের সহযোগে ভারতবাসীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার প্রধান উপায়, ইংরাজের সহিত অসহযোগের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রাপ্য কৃতজ্ঞতাটুকু তাহাকে দেওয়া। ইংরাজেরও ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

আমাদের মনে হয়, ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সজাগ। যদি সজাগ না হইয়া ইংরাজ কর্ত্তব্যভ্রষ্টই হন, তাহা হইলেও কি ভারতবাসীর স্বীয় কর্ত্তব্যের অবহেলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? আমরা কোন ভারতবাসীর নিকট হইতে কি কার্য্যতঃ ইহার যথোপযুক্ত উত্তর পাইব না?

মনে রাখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা জগতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ, তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের অনুচর রূপে দল (Society) বাঁধিয়া বিবিধ বিশেষজ্ঞ নামে বর্ত্তমান আছেন।

গ্যালিলিও, নিউটন ও লাপ্লাস্ ছিলেন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র। তাঁহারা নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করিয়া আত্ম-

প্রতারণা করেন নাই, যথাসাধ্য সত্যের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারা যাহা সত্য মনে করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে এখনও অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক রহিয়াছে এবং তাহার উপর যে "বিজ্ঞান" নামক বিবিধ "কুজ্ঞান" প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিতেছে, তজ্জন্য দায়ী তাঁহাদের পরবর্ত্তী উনবিংশ শতাব্দীর পাণ্ডিত্যাভিমান-মুগ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণ

ইহাঁদের কথা প্রায়শঃ অস্পষ্ট এবং ভ্রমাত্মক এবং ইহাঁরা আত্ম-প্রতারক। কতকগুলি পরিভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ তাঁহারা কি বলেন, তাহা নিজেরাই প্রায়শঃ বুঝিতে পারেন না।

জে. জে. টমসন এই দলের ব্যতিরেক। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে টমসনের "আয়ন" সম্বন্ধীয় বিখ্যাত তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রমহীন না হইলেও চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। টমসন বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অণুতে কেবলমাত্র "তেজে"-র বিকাশই দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ আরও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, বস্তুর প্রত্যেক অণুতে "তেজে"র সহিত মিশ্রিত আরও কয়েকটী পদার্থ আছে।

বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান জগৎকে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিভ্রান্ত করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ম্যালথসের ও জেভন্সের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান বিভ্রান্তির জন্য আইনষ্টাইন ও মিঙ্কোওয়াশকির দায়িত্বও যথেষ্ট।

১৯০৫ সালে আলোকের গতিবিধি সম্বন্ধীয় ও ১৯১৫ সালে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যে গণিত-তত্ত্ব আইনষ্টাইন জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যে অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে প্রতিভার সদ্ব্যবহার অপেক্ষা অসদ্ব্যবহারের পরিচয়ই অধিক

"আলোক" একটী "গুণ"-পদার্থ। উহা তেজের "গুণ"। যেখানেই "তেজ" থাকে, সেইখানেই "আলোকের" উৎপত্তি হয় এবং তেজের প্রাখর্য্যের তারতম্যানুসারে ও সন্নিকটস্থ স্থানের প্রকৃতি অনুসারে আলোকের বিস্তৃতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ইহা যে সত্য, আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। কোন্ "তেজ-ভাণ্ডার" হইতে আলোকের উৎপত্তি হইতেছে এবং সেই তেজ-ভাণ্ডারের সন্নিকটস্থ স্থান কি প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহা না জানা থাকিলে, তৎসম্ভূত আলোকের বিস্তৃতির প্রকৃতি কি হইতে পারে, তাহার বিচার করা সম্ভব হয় না। গ্রহগুলির উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী বায়ুমণ্ডল কোন্ কোন্ প্রকৃতিসম্পন্ন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান যে খুবই অল্প, তাহা খুব সম্ভব অভিমানহীন যে কোন বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন। আইনষ্টাইন তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চেষ্টা না করিয়া "গুণ-পদার্থে"র কর্ম্মশক্তি বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ঠিক "ভাল ছেলে"-র কর্ম্মবিধি কি হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করিতে বসিয়া "ছেলে"-র উপাদানের ও সংসর্গের দিকে লক্ষ্য না করিয়া "ভাল-ত্বে"র গতিবিধি পর্য্যালোচনা করার মত। ছেলের "ভাল ত্ব" ছেলে ছাড়া থাকিতে পারে না এবং তাহার তারতম্য হয় ছেলের উপাদান ও সংসর্গবশতঃ। কাযেই, ছেলেকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বিশেষণ পদার্থের আলোচনা করিতে বসিলে, যে সমস্ত কথা অথবা অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, তাহা বড় ত্বের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু অর্থযুক্ত হইতে পারে না এবং কাহারও পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। আইনষ্টাইনের আলোকের গতিবিধি সম্বন্ধীয় কথাগুলি ও তৎসম্বন্ধীয় অঙ্কশাস্ত্র হইয়াছে ঠিক তদ্রূপ। ইহা সম্পূর্ণভাবে কাহারও বোধগম্য কখনও হইতে পারিবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ আইনষ্টাইনের সমস্ত কথা মিলাইয়া চিন্তা করিলে তাহাকে অর্থহীন ও অসঙ্গত বলিতে হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আইনষ্টাইন নিজেই তিনি কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারেন না। আমরা সময়ান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কথাগুলিতেও যে ভ্রম আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে কতখানি ভ্রম আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে যতটুকু চিন্তার প্রয়োজন, আমরা তাহার অবসর এখনও পাই নাই। কাযেই এই সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ মতামত আমরা এখন প্রকাশ করিব না। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় মূল তথ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিলে, তাহা হইতে কোন ভ্রমহীন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কি ?

মোটের উপর, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে অসম্পূর্ণতা ও যথেষ্ট ভ্রম আছে, তাহা উপরে যাহা দেখান হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়। আমরা এক্ষণে ইহার পরিণতি মানুষের হিতকর অথবা অহিতকর হইয়াছে তাহার বিচার করিব।

বিজ্ঞানের পরিণতি মানুষের হিতকর অথবা অহিতকর হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে হইলে, মানুষের কি হিতকর অথবা কি অহিতকর, তাহা আগে স্থির করিতে হইবে। মানুষের কি হিতকর অথবা অহিতকর, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে তাহার বিচার না করিয়া সমস্ত মানুষ যাহা চায় এবং যে উপায়ে মানুষ তাহা পাইতে পারে, তাহাই মানুষের হিতকারী বলিয়া ধরিয়া লইব।

মনে রাখিতে হইবে, মানুষেরই ভিতর বুদ্ধদেব, খৃষ্টদেব, এবং নবী মহম্মদের মত মহাপুরুষ ; গ্যালিলিও, নিউটন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত পণ্ডিত ; ক্লাইভের মত দেশ-প্রেমিক ; নেপোলিয়ান, নেলসন, ওয়েলিংটনের মত বীর-পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার সাধারণ ধর্ম্ম যাজক, ছাত্র, দেশ-সেবক, সৈনিক, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, মাতাল, লম্পট, সচ্চরিত্রের ও কুচরিত্রের লোকও মানুষের ভিতরই জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু আছে। সমস্ত মানুষ কি চাহিয়া থাকেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষ যাহা যাহা চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে সমান (common) পদার্থ কি কি আছে, তাহা বাহির করিয়া লইতে হয়।

প্রত্যেক মানুষ যাহা যাহা চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে সমান (common) পদার্থ কি কি, তাহা স্থির করা আজকালকার দিনে একটী বৃহৎ ব্যাপার। বর্ত্তমান জগতে রাশি রাশি বিজ্ঞান-পুস্তকের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সত্য এবং সেইগুলিতে রাশি রাশি কথাও আছে তাহাও সত্য, কিন্তু সকল মানুষ যে যে পদার্থ চাহেন, তাঁহাদের নাম, অথবা যে যে উপায়ে মানুষ ঐ সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থগুলি পাইতে পারে, তাহাদের বর্ণনা কোন পুস্তকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাজেই, সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থ কি কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মানুষের নিজের বুকে হাত দিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা এই বৃহৎ ব্যাপারের ভিতর না যাইয়া ধরিয়া লইব যে, সমস্ত মানুষ বাঁচিবার জন্য কোন না কোনরূপ খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিধেয়, সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, শান্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু চাহিয়া থাকেন। এবং কোন মানুষ মৃত্যু, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি এবং অন্নবস্ত্রের অভাব চাহেন না।

কোন মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অথবা স্বীয় স্বাস্থ্য হারাইতে চাহেন না, তখন মনুষ্য-সমাজে এমন কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত নহে, যাহাতে মানুষের স্বাস্থ্য ভগ্ন অথবা মৃত্যু সম্ভব হইতে পারে, ইহা বোধ হয় আমাদের সমস্ত পাঠকই স্বীকার করিয়া লইবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, মানুষ কেন মরে অথবা স্বাস্থ্য হারায়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানুষের দিকে চাহিয়া দেখিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠে এবং হঠাৎ অবসন্ন হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হয়।

শরীরে উত্তাপের অথবা তেজের বৃদ্ধি হইলে, আমরা বলিয়া থাকি, "জ্বর" হইয়াছে। আর জলের ভাগ বেশী হইলে আমরা বলি শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাজেই বলিতে হইবে, মানুষের শরীরে তেজের অথবা জলের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা হয়।

আমাদের ভারতীয় ঋষিগণের শরীর-তত্ত্বানুসারে মানুষের শরীরের উপাদান পাঁচটী, যথা, ব্যোম, বায়ু, অম্বু, বহ্নি এবং ক্ষিতি। মানুষের শরীরের 'ক্ষিতি' বলিতে বুঝায় মানুষের ত্বক্, মাংস এবং অস্থি; 'বহ্নি' বলিতে বুঝায় তেজ অথবা উত্তাপ ; 'অম্বু' বলিতে বুঝায় রক্ত। তাঁহাদের মতে চরাচর প্রত্যেক জীবের শরীরের উপাদান এই পাঁচটী। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতি, বহ্নি এবং অম্বু, এই তিনটী উপাদানের যে কোন উপাদান বৃদ্ধি অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেই জীব অসুস্থ হয়।

জীবের জীবনের প্রধান উপকরণ "ব্যোম"। ক্ষিতি, বহ্নি এবং অম্বু এই তিনটী উপাদানের যে কোনটী বর্দ্ধিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, জীবের মধ্যস্থিত বায়ু দুষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার "ব্যোমে"র পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্যোমের পরিমাণ অত্যধিক কমিয়া গেলে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্ষিতি, বহ্নি এবং অম্বু এই তিনটী উপাদানের মধ্যে ক্ষিতির বৃদ্ধিতে ও হ্রাসে জীব অসুস্থ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুমুখে

তিত হয় না। বহ্নি এবং অম্বুর অত্যধিক বৃদ্ধিতে ও হ্রাসে চরাচর সমস্ত জীবের কঠিন পীড়া এবং মৃত্যু অনিবার্য্য। কাযেই, জীবের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু অটুট রাখিতে হইলে, যাহাতে তাহার শরীরের বহ্নি এবং অম্বু অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়।

"অম্বু" ও "বহ্নি"-র মধ্যে, মানুষের শরীরের যেরূপ গঠন, তাহাতে তাহার "বহ্নি" অহরহঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার দুই পংক্তি দন্ত অবিরত ঘর্ষিত হইতেছে। ইহা ছাড়া তাহার হস্ত ও পদ-সঞ্চালনে দুইখানি হস্তের চারিটী সংযোগ-স্থলে এবং দুইখানি পায়ের চারিটী সংযোগ-স্থলে অহরহঃ দুই দুইখানি অস্থির ঘর্ষণ চলিতেছে। দুইটী কঠিন বস্তুর ঘর্ষণে যে, তাপের অথবা বহ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও পরিজ্ঞাত। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের শরীরে যে পরিমাণ "অম্বু"-র উৎপত্তি হয়, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে "বহ্নি"র উৎপত্তি অহরহঃ হইয়া থাকে।

সূর্য্যের তাপও বহ্নি-বৃদ্ধির অপর একটী কারণ।

এত অধিক পরিমাণে বহ্নির উৎপত্তি হয় বলিয়াই মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খাদ্যরূপে মানুষ "অম্বু" গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যে খাদ্যে জলীয়াংশ কম অথবা অত্যন্ত বেশী, সে খাদ্য কদাচিৎ মানুষের উপকারী হইয়া থাকে। ইহারই জন্য বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ লালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত বিভিন্ন খাদ্য খাইয়া থাকে বটে, কিন্তু কেহই চাউল অথবা গমের প্রস্তুত খাদ্য না খাইয়া পারে না।

কাযেই, মানুষের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু অটুট রাখিতে হইলে, প্রথমতঃ, মানুষ যাহাতে নিঃশ্বাসের সহিত "তেজ" অথবা "বহ্নি"-পদার্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, পরন্তু "অম্বু" গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান এবং গমের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়। জমীর উৎপত্তির পরিমাণ অটুট রাখিতে হইলে, জমীতে যাহাতে "বহ্নি" অথবা "অম্বু"-র পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ফলে মানুষের সভ্যতার উন্নতির নামে যে যে নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হিতকারী অথবা অহিতকারী।—

(১) লৌহ, কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ জমীর প্রয়োজনীয় বহ্নি অথবা তেজ রক্ষা করিয়া থাকে। তাহা জমী হইতে উত্তোলন করিলে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি কমিয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। কাযাতঃও জগতের সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে জমীর ফসলের পরিমাণ প্রতি বিঘায় ৭ মণের উপর ছিল, এক্ষণে তাহার পরিমাণ হইয়াছে কিঞ্চি-দূর্দ্ধ ৩॥০ মণ।

(২) যাতায়াতের জন্য সমুদ্র যান ব্যবহার করিলে সমুদ্রের তরঙ্গবশতঃ আরোহীর মস্তিষ্কের এবং ইন্দ্রিয়াদির ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। মস্তিষ্ক "বুদ্ধি"-র আবাস-স্থল এবং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু। উহা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া অটুট থাকিতে পারে না। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিলে মানুষের বুদ্ধি ও চক্ষুরাদির প্রয়োজনীয় শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। একটী বালকের মস্তিষ্কে মাসাবধি কাল প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য ধাক্কা প্রদান করিলে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে।

(৩) রেল, মোটর প্রভৃতি স্থল-যানের ব্যবহারে বায়ুমণ্ডল অত্যধিক "বহ্নি" অথবা "তেজ"-সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং নিকটবর্ত্তী জমীর পরমাণুগুলি ঘর্ষণ-প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত "তেজে"-র ভাণ্ডার হইয়া পড়ে। তাহার ফলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইবার এবং শস্যের অস্বাস্থ্যের উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা হয়।

(৪) এরোপ্লেন প্রভৃতি আকাশ-যান ব্যবহার করিলে বায়ুমণ্ডল বিকৃত "বহ্নি"-র আবাসস্থল হয় এবং মেঘগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল বিকৃত "বহ্নি"-যুক্ত হইলে, মানুষ তাহার নিশ্বাসের সহিত তেজ ও বিকৃত বায়ু গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে। মেঘগুলি ছিন্নভিন্ন

হইলে কোথায়ও অতি-বৃষ্টি এবং কোথায়ও বা অনাবৃষ্টি দেখা যায় এবং সর্ব্বত্র খাদ্য-শস্যের অপ্রাচুর্য্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(৫) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং বেতার প্রভৃতি শব্দ-যন্ত্রের ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে আরম্ভ হইলে, বায়ুমণ্ডল অত্যধিক বহ্নি-সংযুক্ত হয় এবং তাহাতেও মানুষের স্বাস্থ্য, জমীর উর্ব্বরাশক্তি এবং খাদ্য-শস্যের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা হয়। অধিকন্তু মানুষের কর্ণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মানুষের বুদ্ধির হ্রাসের আশঙ্কা ঘটে।

(৬) কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া জীবিকার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মানুষ সর্ব্বদা তাহার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের পত্রিকায় বহুবার আলোচনা করিয়াছি। জীবিকার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য গৃহীত হইলে, বিভিন্ন মানুষের ভিতর দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা এবং পরশ্রী-কাতরতা অনিবার্য্য। শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা জগতের এক-ষষ্ঠাংশাধিক লোকের অন্নসংস্থান কিছুতেই হইতে পারে না।

(৭) শিল্পের জন্য যে স্থানে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সে স্থানের বায়ু অত্যধিক তেজ-সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যন্ত্র-চালনার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁহারা অত্যধিক বহ্নি-সংযুক্ত বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং অসুস্থ হইয়া পড়েন ও তাঁহাদের অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ঘটে।

(৮) আবাস-গৃহ-নির্ম্মাণে লৌহের ব্যবহার হইলে মানুষ তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে লৌহসংযুক্ত বায়ু গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। লৌহে যে উপাদানের আধিক্য, তাহা মানুষের শরীরেও বিদ্যমান আছে। ঐ উপাদান হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, মানুষের পক্ষে লৌহ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় এবং ইহারই জন্য মানুষ ঔষধের সঙ্গে সময় সময় লৌহ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে লৌহ ব্যবহৃত হইলে মানুষের অস্বাস্থ্য অনিবার্য্য।

(৯) পানীয় জল বিতরণে লৌহনির্ম্মিত নলের ব্যবহার হইলে, মানুষ তাহার পানীয় জলের সহিত সামান্য সামান্য মাত্রায় লৌহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার অস্বাস্থ্য অনিবার্য্য।

(১০) মাংস ও মদ্য খাদ্য ও পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইলে মানুষের "বহ্নি"-উপাদান অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের অস্বাস্থ্য অনিবার্য্য।

(১১) পরিচ্ছদে জামা-জুতা প্রভৃতি অহরহ ব্যবহৃত হইলে, মানুষের "বহ্নি"-উপাদানের বৃদ্ধি হইয়া অসুস্থতার কারণ উপস্থিত হয়।

(১২) বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখার বহুল প্রচলনে বায়ুমণ্ডলে "তেজ"-পদার্থ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যধিক "বহ্নি" গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার অস্বাস্থ্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(১৩) পূর্ব্বে যাহা দেখান হইয়াছে, তদনুসারে যাতায়াতের জন্য সমুদ্র-যান, স্থল-যান এবং আকাশ-যান মানুষের পক্ষে যে অপকারী, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অথচ সারা পৃথিবী যাহাতে মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য ভারতীয় ঋষিগণ নদী ও খাল-পথে দ্রুতগামী জল-যানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে বায়ুমণ্ডল অত্যধিক বহ্নিযুক্ত হইতে পারিত না এবং সমুদ্র-পথের ন্যায় মানুষের বুদ্ধির সূক্ষ্ম উপাদান হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা ঘটিত না।

এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত সারা পৃথিবী দেশমধ্যস্থ জল-পথে পরিভ্রমণ করিবার উপযোগী জল-পরিপূর্ণ নদী যে তখন বিদ্যমান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। ভারতের ঋষিগণ যে জল হইতে সদ্য সদ্য "তেজ" প্রস্তুত করিয়া কি উপায়ে জল-যান-চালনে ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানিতেন, তাহাও মনে করিবার কারণ আছে। আমরা বর্ত্তমান ভূগোলে যে সমস্ত সংবাদ পাইয়া থাকি, তদপেক্ষা অনেক বেশী সংবাদ যে

তাঁহাদের জানা ছিল, তাহা "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" যথাযথ অর্থে প্রচারিত হইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে।

জগতের নদীগুলি যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইলে, মানুষ দ্রুতগামী জল-যানে বায়ুমণ্ডলের "বহ্নি"-বৃদ্ধি এবং জমীর উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস না করিয়া সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু, সারা জগতের সমস্ত নদী সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ রাখিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, জমীর উর্ব্বরাশক্তি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায় এবং বর্ষার সময়ে জল-প্লাবনের আশঙ্কা কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে নদী ও খাল-পথের প্রতি উপেক্ষা করিয়া স্থল-পথ প্রসারণের চেষ্টাবশতঃ সারা জগতের নদীগুলির জলাধার কমিয়া যাইতেছে। তাহাতে জমীগুলি এখন আর সারা বৎসর জল পায় না এবং তাহারই ফলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অধিকন্তু নদীর পরিসর ও গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় বর্ষার সময়ে প্লাবন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

(১৪) সিনেমা দেখিবার প্রলোভনের ফলে মানুষ নিশ্বাসের সহিত অতিরিক্ত "তেজ" গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং পরোক্ষভাবে তাহার অস্বাস্থ্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। গ্রামোফোন ও রেডিও ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাভাবিক শব্দ-চর্চ্চার সামর্থ্য কমিয়া যায়। স্বাভাবিক শব্দ-চর্চ্চা যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের "অর্থনীতির ছাত্র" গত সংখ্যায় তাঁহার "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে "প্রকৃত ও বিকৃত সাহিত্য কি," এই আলোচনায় দেখাইয়াছেন।

(১৫) বর্ত্তমান অর্থনীতির মূলনীতি চারিটী :—

(ক) শিল্প-বাণিজ্য যত প্রসারিত হইতে পারে, কৃষি তত প্রসার লাভ করিতে পারে না। কাযেই জীবিকার জন্য শিল্প-বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহা যে কতদূর ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ, তাহা অন্ততঃপক্ষে ভারতবাসীর বুঝা উচিত।

(খ) চাহিদার বৃদ্ধি কর। সহজ ভাষায় বলিতে হয় "মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়াও"। ইহা অস্বাভাবিক নহে কি ?

(গ) "দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি কর," অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ যাহাতে সুলভ না হয়, তাহার চেষ্টা কর। ইহাও কি অস্বাভাবিক নহে ?

(ঘ) পণ্যদ্রব্য প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা কর। আত্মপ্রচার যে আত্মহত্যার অন্য নাম, তাহা কি কেহ যুক্তিযুক্ত ভাবে অস্বীকার করিতে পারেন ?

কাযেই দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে, তাহার কোনটীরই সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই এবং তদনুসারে প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পরিভাষা (terminology) এবং সংজ্ঞা (definition) মাত্র। যে যে সূত্রগুলিকে প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ধরা যায়, সেগুলি প্রায়শঃ অসম্পূর্ণ এবং মূলতঃ ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পরিণতিতে সভ্যতার প্রসারের নামে যাহা যাহা উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটী মানুষের অস্বাস্থ্যকর এবং অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এই সমস্ত দেখিয়া যদি বলা হয় যে, বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত "বিজ্ঞান" নাই এবং যাহা বিজ্ঞানের নামে চলিতেছে তাহা "কুজ্ঞান", তাহা হইলে কি অসঙ্গত হইবে ?

ডাঃ মিত্র তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াও বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে "কুজ্ঞান" বলেন না কেন এবং অযথা তাহার কতকগুলি মহিমা প্রচার করিয়া মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হন কেন ? ডাঃ মিত্রের মন্তব্যগুলির বিচার করিলে কি যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা যায় না, বর্ত্তমান "কুজ্ঞান" মানুষকে নির্ব্বোধ করিয়া দেয় ?

ডাঃ মিত্রের বক্তৃতার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য অংশে তিনি বলিয়াছেন যে, "বর্ত্তমান জগতে মানুষের সভ্যতার উন্নতি হইতেছে।" অবশ্য তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যাই যে বেশী, তাহা আমরা স্বীকার করি। ইহাও বর্ত্তমান জগতের মানুষের চিন্তাশীলতার অভাবের পরিচয়। "সভ্যতা" শব্দটীর অর্থ সম্যক্ ভাবে চিন্তা করা থাকিলে, বর্ত্তমান জগতে যে

ক্রমশঃই সভ্যতার খর্ব্ব হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে স্বীকার করিতে হয়।

"সভ্যতা" শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক। সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটীর প্রচলন একেবারেই দেখা যায় না। এই শব্দটী ইংরাজী ভাষা হইতে গৃহীত। ইংরাজীতে সভ্যতার প্রতিশব্দ সিভিলিজেশন (civilisation) এবং ইহার বিপরীত শব্দ মিলিটারীজম্ (militarism), অর্থাৎ দ্বন্দ্ব অথবা যুদ্ধ-প্রিয়তা।

শব্দার্থানুসারে "সভ্যতা" বলিতে কি বুঝায়, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং যুদ্ধ-প্রিয়তার অভাবে মানুষের যে অবস্থা হয়, তাহার নাম "সভ্যতা"। বর্ত্তমান জগতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং যুদ্ধ-প্রিয়তা কি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে না? ১৯১৪ সালের মত একটা মহাযুদ্ধ জগতের ইতিহাসে আর কখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া বর্ত্তমান জাতিগুলির মধ্যে যে দ্বেষ-হিংসা চলিতেছে, তাহাও কি ইতিহাসের আর কোনও সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

এই সমস্ত দেখিয়াও যদি বাস্তবতার প্রতি অন্ধ হইয়া কেহ বলেন, "সভ্যতার" উন্নতি হইতেছে এবং তাঁহাকে যদি চিন্তাশীলতা-বিহীন নির্ব্বোধ বলা হয়, তাহা হইলে কি অযৌক্তিক হইবে?

ডাঃ মিত্রের বক্তৃতার চতুর্থ অংশানুসারে, "একশত বৎসর পূর্ব্বেও জগতের যে স্বাভাবিক বিভব ছিল, এখনও ঠিক ঠিক তাহা ত' আছেই, বরং একটু বাড়িয়াছে।"

"স্বাভাবিক বিভব" বলিতে ডাঃ মিত্র কি বুঝেন, আমরা তাহা জানি না। তবে আমরা স্বাভাবিক বিভব বলিতে বুঝি, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটী বস্তু :—

(১) জমির উর্ব্বরাশক্তি,

(২) উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ,

(৩) দেশের জলহাওয়ার স্বাস্থ্য।

ইহার তিনটী গত তিন হাজার বৎসর হইতে কমিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। অবশ্য, বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত অধ্যয়নশীল না হইলে, তিন হাজার বৎসরের প্রাকৃতিক অবস্থা ও তাহার পরিবর্ত্তন অনুধাবন করা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান জগতের লোকের বুদ্ধি যেরূপ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তদ্দ্বারা পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার অবস্থা বুঝিবার উপযোগী কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে বিভিন্ন দেশের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণীর ও স্বাস্থ্য-বিবরণীর প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, জগতের প্রত্যেক দেশে প্রতি বিঘা জমীর উৎপাদিকা-শক্তি যে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ক্রমশঃ অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে এবং মানুষের অকাল-মৃত্যু প্রায় সকল দেশে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান জগতে কিঞ্চিদধিক দুই শত দুই কোটী লোক আছে। কার্য্যক্ষমতা-রক্ষার উপযোগী স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে, মানুষের অন্ততঃ পক্ষে প্রতিদিন গড়ে এক পাউণ্ড চাউল অথবা গমজাত দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে "খাদ্যতত্ত্ব" সম্যক্ ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই; কাজেই, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চশমার দ্বারা মানুষের যে প্রতিদিন এক পাউণ্ড চাউল অথবা গমজাত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না দেখা ও বুঝা সম্ভব হইতে পারে। সারা জগতের সমস্ত লোকের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৩৩ কোটী টন গম এবং চাউলের প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২০॥০ কোটী টন। প্রতি বৎসর মানুষের ১২॥০ কোটী টন গম ও চাউলের অভাব পড়িতেছে এবং প্রত্যেক মানুষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে অর্দ্ধাহারী থাকিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও জগতের এই অবস্থা ছিল না। এই অবস্থার জন্যই জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধি কি জিনিষ, বর্ত্তমান "বৈদ্য"গণ তাহা না জানায়, মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহারই জন্য জগতের হাহাকারের কারণ নির্ণীত হইতেছে না। এ সম্বন্ধীয় বক্তব্য অতি বিস্তৃত। তাহা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে।

মোটের উপর, জমীর উৎপাদিকা-শক্তি যে অতি দ্রুত গতিতে কমিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক দেশের জলবায়ু যে ক্রমশঃই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের কৃষি-বিবরণী ও স্বাস্থ্য-বিবরণী যাহা পাওয়া যায়,

তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ডাঃ মিত্র যে ঐ বিবরণীগুলি পর্য্যালোচনা না করিয়া ভ্রমপূর্ণ উক্তির প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা তাঁহার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় এবং অমার্জ্জনীয়।

ডাঃ মিত্রের পঞ্চম উল্লেখযোগ্য অংশানুসারে, "বর্ত্তমান বিজ্ঞান কায়িক শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।" যন্ত্রচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে নজর দিলে এই উক্তি আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু যে সমস্ত মানুষ জীবিকার জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যন্ত্র-চালনার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য ও পরমায়ু যেরূপ দ্রুত গতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিলে ঐ উক্তি অঙ্কশাস্ত্রানুসারে প্রতিপন্ন করা যায় না। কাজেই, ঐ জাতীয় উক্তি একদেশদর্শিতার ফল। একজন মানুষ প্রত্যহ এক জোড়া হিসাবে কাপড় উৎপন্ন করিয়া যদি পঁচিশ বৎসর কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিতে পারে এবং কার্য্য করে, আর অপর একজন প্রতিদিন পাঁচ জোড়া হিসাবে কাপড় উৎপন্ন করিয়া যদি চারি বৎসরের মধ্যে কার্য্য-ক্ষমতা হারাইয়া বসে এবং প্রতিনিয়ত তাহার চিকিৎসার ব্যয় সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে না যে, স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া প্রত্যহ এক জোড়া কাপড় উৎপাদন করিতে পারিলেও কায়িক শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী?

ডাঃ মিত্রের বক্তৃতার ষষ্ঠ অংশ অদ্ভুত। "...কাহারও দরিদ্র হইবার কারণ নাই, প্রত্যেকেরই খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আবাস-গৃহ থাকা উচিত...," ইত্যাদি কথা বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে ঐ কথাগুলি বলিতে পারিতেন না। দারিদ্র্য ও বিবিধ অভাবের যদি কোন কারণ না-ই থাকে, তাহা হইলে বাস্তব জগতে দারিদ্র্য ও বিবিধ অভাব ঘটিতেছে কেন? আমাদের ধারণা ছিল যে, "বাস্তবতা" কি করিয়া নিরীক্ষণ করিতে হয়, তাহা যদিও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু ডাঃ মিত্রকে "বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক" আখ্যায় আখ্যাত করিতে হইলে, ঐ ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কারণ,ডাঃ মিত্রের যে বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত নাই, তাহা তাঁহার বক্তৃতা হইতে পরিস্ফুট। তিনি কি বৈজ্ঞানিক, না কল্পনাশ্রয়ী "তথাকথিত দার্শনিক"?

তিনি জানিয়া রাখুন, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদিগের মূঢ়তায় জগতের জমীর উৎপাদিকা-শক্তি এতই কমিয়া গিয়াছে যে, এখন আর সারা জগতের লোকের খাদ্য ও পরিচ্ছদের উপযোগী প্রচুর গম, ধান, তুলা, রেশম এবং পশমের উৎপত্তি হইতেছে না। ফলে, জমীর উৎপাদিকা-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে না পারিলে কিছুতেই সমস্ত লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে না। "অর্থনীতিজ্ঞ" নামে তাঁহারই মত কয়েকটি "টীয়া-পাখী" আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা উপরোক্ত কথা না বুঝিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহারা শিল্প ও বাণিজ্য কি, তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যের পরামর্শদাতা।

ডাঃ মিত্র যদি তাঁহার চাকরীটী ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, মানুষের অন্ন-বস্ত্রের অভাব আছে কি না। তাহা তিনি ভরসা করেন কি?

তাঁহার বক্তৃতার সপ্তম অংশ অর্থহীন। "বিজ্ঞান জ্ঞান (knowledge)........দিয়াছে, কিন্তু......বিজ্ঞতা (wisdom) দেয় নাই।" "জ্ঞান"-লাভ হইলে বিজ্ঞতা লাভ না হইয়া পারে কিরূপে? এই উক্তিটী "বৈজ্ঞানিকে"-র মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয়! বৈজ্ঞানিক হইলে কি সাধারণ জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হয়?

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, ডাঃ মিত্রের বক্তৃতাটী আদ্যোপান্ত অসমঞ্জস, চিন্তাশীলতা-শূন্য, এমন কি দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক। ইহার সমর্থন করিয়াছেন একটী ইউরোপীয়। আমরা ইয়োরোপীয়গণের সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাঁহারা সাধারণতঃ দায়িত্বজ্ঞান-হীন হন না এবং বিশেষ চিন্তা না করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন না। তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেই তাহা বুঝিতে পারেন। আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতীয় "টীয়া-পাখী"গুলির সংস্রবে আসিয়া "পক্কত্ব"-লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন?

"প্রকৃত বিজ্ঞান" কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাওয়ায় আমরা তাহা পারিলাম না প্রবন্ধান্তরে এই আলোচনা আমরা করিব।

জগতের বর্ত্তমান বিপদ অতি ভয়ঙ্কর। অবশ্য, তাহার পরিবর্ত্তন একদিনেই সাধিত হইতে পারে না, এই "টীয়া-পাখী"-গুলিকে খাঁচায় পুরিয়া ইঁহাদের দেওয়া সংস্কার পরিত্যাগ না করিতে পারিলে যে, কি উপায়ে জগৎ অর্দ্ধাশন ও অর্দ্ধ-বসনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

আমাদের শিক্ষা-বিভাগের পরিচালকগণ ও গভর্ণমেণ্ট এই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি ?

স্যার জন এণ্ডারসন ও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

গত একমাসের ভিতর বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন আহ্বান-বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালীকে বিভিন্ন রকমের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও মুখ্যতঃ এক। তাঁহার কথায় যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বাঙ্গালীকে পল্লী-অভিমুখী করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। অবশ্য, কি করিয়া বাঙ্গালীর পক্ষে পল্লীগ্রামে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার কোন ব্যবহারোপযোগী উপদেশ আমরা তাঁহার কোন বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাই নাই। তথাপি তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র, কারণ বহুদিন আমরা এইরূপ ভাবে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইবার কথা কাহারও নিকট হইতে শুনি নাই।

স্যার জনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের মনে হয়, বহুদিন তাঁহার মত একজন কার্য্যক্ষম লোক বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। শুধু বাঙ্গালায় কেন, ভারত-শাসনেও তাঁহার মত চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ বহু দিন দেখা যায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষে যে কাল মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা তাঁহারও দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। ইহা ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তিনি এমন সময়ে যথাযথ উদ্দেশ্যযুক্ত প্রয়োগযোগ্য উপদেশ ব্যতীত শুধু ফাঁকা কথা বলিয়া সময়-ক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজ্য-পরিচালনার নীতি-প্রসূত এবং ঐ নীতির সমঞ্জসীভূত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু দেশের অবস্থা যথাযথ বিচার না করিয়া শাসন-নীতি গঠিত হইলে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা থাকে না কি ?

আমাদের মনে হয়, সারা ভারতবর্ষের ২৭ কোটী কৃষক বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে। প্রকাশ্যতঃ, এখনও তাহারা বিদ্রোহ করে নাই তাহা সত্য, কিন্তু বিদ্রোহের সমস্ত পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষকেরা সর্ব্বত্রই তাহাদের জমীদার ও মহাজন-দিগকে বলিতে বাধ্য হইতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা জমীদারের খাজানা ও মহাজনের প্রাপ্য দিতে পারিতেছে না। ইহাকেই আমরা বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করি। তাহাদের এই কথা প্রবঞ্চনামূলক নহে। তাহারা কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কায়িক পরি-শ্রমের সীমা আছে। তাহারা যতই পরিশ্রম করুক না কেন, এক একজন কৃষক সারাদিনে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমীর বেশী চাষ করিতে পারে না; অথচ, তাহাদের প্রত্যেকের সংসারযাত্রানির্ব্বাহে এমন কয়েকটী বস্তু আছে, যাহা না হইলে চলে না। কোনরূপ আরামের বস্তু তাহারা ব্যবহার না করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন এক বেলার (দুই বেলার নয়) অন্ন, রাজ্যের শৃঙ্খলার জন্য জমীদারের খাজানা ও মহাজনের সুদ, লজ্জা-নিবারণের জন্য একটুকরা ধুতি ও শাড়ী এবং রৌদ্র-বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে কোন রকমের একটা আচ্ছাদন। তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সারা বছরে সর্ব্বোর্দ্ধ (maximum) যে কয় বিঘা জমী চাষ করা তাহাদের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সম্ভব, সেই কয় বিঘা জমী হইতে যদি তাহাদের সারা পরিবারের এক বেলার অন্ন, জমীদারের খাজানা, মহাজনের সুদ, লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র এবং গৃহের আচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহোপযোগী শস্য উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, জমীর বাৎসরিক উৎপন্ন ফসল অন্ততঃ পক্ষে একটা সর্ব্বনিম্ন (minimum) পরিমাণের না হইলে, কৃষকের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জমীর উর্ব্বরাশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে। তখন কৃষক বাধ্য হইয়া প্রথমতঃ, তাহার আরামের বস্তুগুলি পরিত্যাগ করে। উৎপন্ন শস্যের হার আরও কমিয়া গেলে, দ্বিতীয়তঃ, কৃষক স্বীয় গৃহাচ্ছাদনের প্রতি উপেক্ষাশীল হইতে বাধ্য হয়; তাহার পর ক্রমশঃ তাহার জমীদার ও মহাজনদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার অসামর্থ্যের উদ্ভব হয় এবং পরিশেষে একান্ত প্রয়োজনীয় (বিলাসিতার নহে) অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় এবং প্রকাশ্যতঃ বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। উৎপন্ন শস্যের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার ফলে, কৃষক যখন জমীদার-মহাজনদিগের প্রাপ্য দিতে অসমর্থ হয় এবং ব্যাপক ভাবে কাতরতার সহিত তাহাদের অসামর্থ্যের কথা জমীদার ও মহাজনদিগকে বলিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, বিদ্রোহের পূর্ব্বলক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য, সময় সময় কোন কোন কৃষক প্রকৃত অসামর্থ্যের উদ্ভব না হইলেও অসামর্থ্যের অভিনয় করিয়া থাকে। এতাদৃশ অভিনয় স্থানে স্থানে কোন কোন কৃষক করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা খুব ব্যাপক হয় না। যখন প্রায় সর্ব্বত্রই সমস্ত কৃষক অসামর্থ্যের কথা প্রকাশ করে, তখন যে তাহা প্রায়শঃ সত্য, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হয়।

আমরা কার্য্যব্যপদেশে শিল্পজ দ্রব্যের বিক্রয়োপযোগী বাজারের অবস্থা ব্যক্তিগত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া এবং গভর্ণমেন্টের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণীর পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয়, বাঙ্গালার, তথা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র, জমীর উর্ব্বরাশক্তি এবং প্রতি বিঘার উৎপন্ন শস্যের হার বহু দিন হইতে (এমন কি ইংরাজ রাজত্বেরও পূর্ব্ব হইতে) কমিয়া আসিতেছে, এবং গত বিশ বৎসর হইতে এই হ্রাসের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হারের হ্রাস আরম্ভ হইলেও এবং বরাবর ঐ হ্রাসের মাত্রা বাড়িতে থাকিলেও, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও প্রতি বিঘায় যে ফসল হইত, তদ্দ্বারা কৃষক ক্লেশের সহিত কোন রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং সামান্য সামান্য আরাম-উপভোগের বস্তুও ক্রয় করিতে পারিত; কিন্তু গত বিশ বৎসর হইতে প্রায় সমস্ত কৃষকই তাহা পারিতেছে না। ইহারই ফলে, গত বিশ বৎসর হইতে ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রেতর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় খুব কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার বৈদেশিক আমদানীও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদেশিক আমদানী যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহার মূল্যের মোট পরিমাণ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না, কারণ দ্রব্যের মূল্যের হার (rate) বর্দ্ধিত হইলে, ব্যবহৃত দ্রব্যের পরিমাণ কম হইলেও তাহার মোট মূল্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে।

গত দশ বৎসর হইতে বস্ত্রের কাটতিও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। তাহারও কারণ, জমীর উর্ব্বরাশক্তির ও প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হারের হ্রাস এবং তজ্জনিত কৃষকের দুরবস্থা।

এখন যে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র, প্রায় সমস্ত কৃষক তাহাদিগের জমীদার ও মহাজনদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য দিবার অসামর্থ্যের কথা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহারও কারণ জমীর উর্ব্বরাশক্তির ও প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হারের হ্রাস এবং তজ্জনিত কৃষকের দুরবস্থা।

এখনও বৎসরাবধি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (maximum) যে কয় বিঘা জমী চাষ করা তাহাদের সামর্থ্যাধীন এবং তাহা হইতে তাহারা যে কয় মণ ফসল পাইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোন আরামের বস্তুর অথবা গৃহাচ্ছাদনের অথবা জমীদার ও মহাজনের প্রাপ্য-পরিশোধের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না বটে, কিন্তু কোন রূপে অতি ক্লেশের সহিত প্রায়শঃ অর্দ্ধাশন ও অর্দ্ধ-বসনোপযোগী অন্নবস্ত্রের সঙ্কুলান তাহাদের হইতেছে। তাই এখনও তাহারা প্রাকাশ্যতঃ বিদ্রোহ করে নাই। কেবল মাত্র ভদ্রভাবে তাহাদের জমীদার ও মহাজনদিগকে তাহাদের অসামর্থ্যের

কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু গত বিশ বৎসর হইতে জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, উৎপন্ন শস্যের অস্বাস্থ্য এবং বর্ষার সময়ে বন্যার বিস্তৃতি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার গতি অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে, প্রতি বৎসরই সারা ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষকের অর্দ্ধাশন ও অর্দ্ধবসনোপযোগী অন্নবস্ত্রেরও অভাব বাড়িতে থাকিবে এবং আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া দশ বৎসরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ জ্বলিয়া উঠিবে—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

ভারতীয় পাঠক, দেশের অবস্থা একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন। একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পরিবেন যে, আমাদের ভীতি অমূলক নহে। অতি দ্রুত-গতিতে ভারত যে জ্বলন্ত বিদ্রোহের সম্মুখে আগুয়ান হইতেছে, তাহা ২৭ কোটী বুভুক্ষু কৃষকের বিদ্রোহ। মনে রাখিবেন, তাহারা নির্দ্দোষ এবং নিরীহ ও সংখ্যায় ২৭ কোটী এবং ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইয়া সারা সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছে। কোন কামান-বন্দুক অথবা কূটনীতি এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিবে না। ২৭ কোটী কৃষক অন্নাভাবে বিদ্রোহ করিলে ভারতের বাকী আট কোটী লোক যে অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অন্নাভাব পূরণ করিতে পারিবেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জগতে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থান হইতে ভারতের ৩৫ কোটী লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইলে তাহার পূরণ হইতে পারে। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া জগতের সর্ব্বত্রই অন্নাভাব। কেবলমাত্র ভারতবর্ষই এতদিন পর্য্যন্ত অন্নের সংস্থান সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের জমীর উর্ব্বরাশক্তির জন্যই এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসার জন্যই সারা জগৎ এতদিন পর্যান্ত কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছিল। গত দশ বৎসর হইতে ভারতের জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং সারা জগৎও বিপন্ন হইয়াছে। আমরা জানি, ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে অনেকে এবং তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত ভারতীয় "টীয়া-পাখী"-গুলি আমাদিগের উপরোক্ত কথার সমর্থন করিবেন না। তাঁহারা সমৃদ্ধির একটা কাল্পনিক সংজ্ঞানুসারে মনে করেন যে, ইয়োরোপ খুব সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছে এবং ইয়োরোপীয়গণের সমৃদ্ধি তাঁহাদের বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত। কিন্তু তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না যে, জমীর প্রসবিণী শক্তি অটুট না রাখিতে পারিলে এবং তাহার ক্রমোন্নতি সাধন না করিতে পারিলে এবং শস্যোৎপাদন না হইলে শিল্প অথবা বাণিজ্যের বিস্তার হওয়া সম্ভব নহে।

এখন ঐ দ্বন্দ্ব-কলহের ভিতর প্রবিষ্ট হইলে চলিবে না। দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন। সমস্ত কৃষক ভদ্র-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া বসিয়াছে। তাহারই জন্য তাহারা অতি মিষ্ট কথায় তাহাদের জমীদার ও মহাজনের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে অসামর্থ্যের কথা জানাইতেছে এবং উকীল, ডাক্তার ও ব্যবসাদার প্রভৃতি দেশের সকলের অনটন আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে অতি শীঘ্রই তাহারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে। তাহারা একবার বিদ্রোহ করিয়া বসিলে তাহা দমন করা অসাধ্য হইবে, কারণ, ভারতবর্ষের পুরাপুরি ৩৫ কোটী লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইলে, অপর কোন দেশ হইতে তাহার পূরণ করা সম্ভব নহে।

এই বিদ্রোহের আশঙ্কা দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়, জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা। আমাদের গভর্ণমেণ্ট যে একেবারে তাহা করিতেছেন না তাহা বলা যায় না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত উপায় এতাবৎ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সার্থক হয় নাই এবং অদূরভবিষ্যতে যে উপায় অবলম্বন করিবেন বলিয়া রাজপুরুষদিগের কার্য্য হইতে মনে করা যায়, তাহাও সার্থক হইবে না। ইহার কারণ জমীর উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি কি উপায়ে সাধন করিতে হয়, তাহার কোন তথ্য বর্ত্ত-মান জলসিঞ্চন-(irrigation)-বিজ্ঞানে নাই। এবং বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার যে সামর্থ্য থাকিলে বিজ্ঞানের এই অভাব পূরণ করা সম্ভব, সেই সামর্থ্য বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-বিভাগীয় বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কাহারও আছে, তাহাও মনে করিবার কারণ নাই। যাঁহারা মনে করেন, আমেরিকা অথবা রুসিয়া প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত।

কেবলমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ এই উপায় জানিতেন এবং তাঁহারা এই উপায় জানিতেন বলিয়াই ভারতবর্ষ এখনও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালিনী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, সংস্কৃত ভাষা এখন বিকৃত এবং ভারতীয়-ঋষিদের বেদ ও দর্শন এখন বিকৃতার্থে প্রচলিত। বর্ত্তমান

অবস্থায় ভারতীয় ঋষির এই উপায় কার্য্যকরী করিতে হইলে সারাদেশের ও গভর্ণমেণ্টের মিলিত হইতে হইবে।

যাঁহারা বলেন অথবা ভাবেন যে, বিদেশীয় শোষক গভর্ণমেণ্টকে দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে, আমাদের অন্নাভাব দূর করিবার কোন উপায় নাই—তাঁহাদের কথা ঠিক অথবা বেঠিক, তাহার বিচার আমরা আপাততঃ করিব না। তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বর্ত্তমানে তাঁহাদের ও ইংরাজদিগের যে অবস্থা, তাহাতে আগামী চারি পাঁচ বৎসরের ভিতরে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবার যে কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা বাস্তব সত্য; অথচ চারি পাঁচ বৎসরের ভিতর দেশব্যাপী অন্নাভাব এবং কৃষকের বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে।

যদি তাঁহাদিগকে বুঝান যায় যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে অনতিবিলম্বে আমাদের অন্নাভাব দূর করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলেও কি তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইতে বিরত থাকিবেন?

আমরা আরও বলিয়া রাখি যে, এই স্যার জন এণ্ডারসন লোকটী এদেশে থাকিতে একটা চেষ্টার আরম্ভ হওয়া উচিত। কারণ, আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে জগতের সর্ব্বত্রই মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও জগতে যে সংখ্যক দূরদর্শী লোক পাওয়া যাইত, এখন আর কুত্রাপি তাহা পাওয়া যায় না। তদনুসারে ইংলণ্ডে দূরদর্শী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। স্যার জনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের যাহা মনে হইয়াছে, তাহাতে বলিতে হয় যে, স্যার জনের মত কার্য্যক্ষম লোক এখন আর ইংলণ্ডেও খুব বেশী নাই, এবং হয়ত তিনি এদেশ হইতে চলিয়া গেলে তাহার ন্যায় লোক ভারতবর্ষ কিছুদিন পাইবে না। অবশ্য স্যার জন যে ভুলভ্রান্তির অতীত আমরা তাহা মনে করি না।

দেশের সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া দেশের লোকের পক্ষে এই কার্য্যতৎপরতাটুকু অবলম্বন করা কি একান্ত অসম্ভব?

ভারতের অন্নাভাব এবং ২৭ কোটী লোকের বিদ্রোহের আশঙ্কার দিকে আমরা স্যার জন এণ্ডারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমানে তিনি যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, মুখ্যতঃ তাহা তিনটী—

(১) মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক ভ্রম-সংশোধন;

(২) স্বাধীনতার আন্দোলন নামে বাঙ্গালী যে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে তাহার পূর্ণ উচ্ছেদ;

(৩) সন্ত্রাসবাদ যাহাতে আর পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, তাহার আয়োজন।

দেশের শান্তি বজায় রাখিতে হইলে যে ঐ তিনটী কার্য্যের প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তদপেক্ষাও বেশী প্রয়োজনীয় কার্য্য কৃষকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা। এই কার্য্যে তিনি একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু ইহার গুরুত্ব যে তিনি যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপ হইতে এখনও বুঝা যায় নাই। প্রজার অন্ন-সংস্থানের জন্য যে যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কোনটী কার্য্যকরী হইবে কি না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ করা যায়।

কৃষকের অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়, জমীর উর্ব্বরতার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা এবং যে পদ্ধতিতে ঐ চেষ্টা সফল হইতে পারে, তাহার সন্ধান তিনি তাঁহার বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে পাইবেন না, কারণ, তাঁহাদের বিজ্ঞানে ঐ পদ্ধতির বিবরণ নাই।

আমাদের মনে হয়, এদেশের কোন কোন অজ্ঞাতনামা অতি-সাধারণ লোকের কাছে এখনও এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

স্যার জনকে মনে রাখিতে হইবে যে, সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে কাহারও নিকট হইতে কোন তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ, সাধারণ মানুষের কাছে সম্রাটের প্রতিনিধি সর্ব্বজ্ঞ এবং কেবল মাত্র অভিবাদন পাইবার উপযোগী।

তাঁহার নিজ দেশ ও নিজ জনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া একজন প্রাকৃত জনরূপে তিনি অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও বড়লাট মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ পদ্ধতির সন্ধান করিতে সচেষ্ট হইবেন, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না কি?

বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের নূতন পরিকল্পনা

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা-বিভাগ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিকে গতানুগতিকতার স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একটী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখনও তৎ সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই। কাযেই বর্ত্তমান সংখ্যায় তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষার সংস্কার বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে অতীব দুরূহ। কারণ, শিক্ষার মূলনীতি কি হওয়া উচিত, তাহা জগতের বর্ত্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই।

হার্বাট স্পেন্সার, থর্ণডাইক, ব্র্যাগ্‌লী, রুসো, কোঁৎ, জুলে সাইমন, লেসিং প্রভৃতি মনীষিগণ শিক্ষার মূলনীতি কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংস্কারকগণও তাঁহাদের কাহারও কথা অবিকল গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডের শিক্ষার মূলনীতি পৃথক্ ভাবে স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি ঈপ্সিত ফল প্রসব করে নাই।

ইংলণ্ডের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীতে তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবস্থার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি এবং উনবিংশতি শতাব্দীর অব্যবস্থার ফলে বিংশ শতাব্দীর অবনতি বলা যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কোন উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা যে ছিল না, তাহা শিক্ষার ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে ১৮৩২ সাল হইতে এবং তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

কাযেই বলিতে হইবে যে, তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার ফলে ইংলণ্ডের উন্নতি আদৌ হয় নাই, বরং তাহার ফলে তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষা কি, তাহা ইংরাজদিগের জানা নাই।

আমাদের মনে হয়, শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের খুব ধীরতা অবলম্বন করা উচিত।

সংবাদ

শিক্ষা

গত মাসে প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক সংবাদসমূহের মধ্যে ভারত-সরকারের প্রচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য :—

[১] সিমলার ৯ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ভারত-সরকার কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শ-সভার (Central Advisory Board of Education) পুনরুজ্জীবন-সংকল্প।

[২] বাঙ্গালা-সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক সংবাদ :—

(ক) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে বাঙ্গালার লাটসাহেবের বক্তৃতা ;

(খ) ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের ১৯৩৩-৩৪ সনের বিবরণী-প্রকাশ ;

(গ) শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা-প্রকাশ ও তদ্‌বিষয়ে জনসাধারণের মতামত আমন্ত্রণ। এই পরিকল্পনানুযায়ী বুঝা যায়, বাঙ্গালা-সরকার বর্ত্তমানে শিক্ষাকে পল্লী-উপযোগী এবং সহর-বিমুখ করিতে সচেষ্ট। তদুদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক-শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার-কল্পনা ; কিন্তু কল্পনানুযায়ী কার্য্যের অর্থাভাবের উল্লেখ।

(ঘ) অদূরভবিষ্যতে কলিকাতায় শিক্ষা-সংস্কারোদ্দেশ্য-মূলক একটি প্রদর্শনী ও শিক্ষা-সপ্তাহের ব্যবস্থার জন্য শিক্ষামন্ত্রী কর্ত্তৃক একটি সভার আহ্বান এবং সেই সভায় এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন।

[৩] বাঙ্গালা-সরকারের এই শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন সমালোচনায় প্রকাশ :—

(ক) দেশীয় পত্রিকাগুলির দেশের শিক্ষা-সমস্যা বিষয়ে চিন্তার অভাব এবং সরকারের শুভেচ্ছা বিষয়ে

সন্দেহ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, সরকারের এই পরিকল্পনা কেবল ইংরেজী শিক্ষার বিবিধ সুফল হইতে সাধারণ পল্লীবাসীকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতে উদ্ভূত—কাহারও কাহারও এমন সন্দেহ।

(খ) বিদেশীয়-পরিচালিত পত্রিকার সুস্পষ্ট মত—শিক্ষা-বিষয়ে দেশবাসীর স্বকীয় কর্ত্তব্য সর্ব্বোপরি এবং সরকারী চেষ্টা অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক।

[৪] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ :—

(ক) ভাইস্-চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক আশুতোষ কলেজের নূতন অট্টালিকার উদ্বোধন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসার প্রকাশ;

(খ) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জনৈক ইতালীয় অধ্যাপক কর্ত্তৃক ইতালীর ইতিহাস ও কৃষ্টি বিষয়ে বক্তৃতা।

[৫] বোম্বাই প্রদেশের সংবাদ :—

(ক) কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত নারীমানের বক্তৃতায় প্রকাশ, পাঁচ কিংবা দশ বৎসরের মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব করিতে মাত্র ১০০ জন যুবক কর্ম্মী আবশ্যক।

(খ) চিত্র-বিদ্যায়তনে ছাত্র-বৃদ্ধি।

[৬] মাদ্রাজ প্রদেশের সংবাদ :—

(ক) কাউন্সিলে প্রাদেশিক অর্থবিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠান (Provincial Economic Council) যে শিক্ষা-কার্য্যেও ব্রতী হইবে ইহার উল্লেখ;

(খ) মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের দেশের সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতায় দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ।

[৭] বিহার-উড়িষ্যার সংবাদে প্রকাশ :—

(ক) স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার;

(খ) শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার কর্ত্তৃক নূতন বিভাগে কর্ম্মচারী-নিয়োগ;

(গ) ইউরোপীয়-পরিচালিত শিক্ষায়তনে ভারতীয় ছাত্রবৃদ্ধি।

[৮] পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ :—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (technology) নূতন পাঠ্য-ব্যবস্থা।

[৯] নাগপুরের সংবাদ :—

(ক) কাউন্সিলে বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার বিতর্ক এবং ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন কর্ত্তৃক ভারত সরকার সঙ্কল্পিত কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সভার উল্লেখ।

[১০] অন্ধ্রের সংবাদ :—

(ক) বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিশেষ উপাধি দান বিষয়ে জল্পনা;

(খ) ওয়াল্টেয়ারে ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক:—ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যকরী না হওয়ায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লোপ সাধন আবশ্যক।

[১১] মুসলমান জগতের সংবাদ :—

(ক) আফগানিস্থানে মক্তবগুলিকে আধুনিক শিক্ষার বাহন করিবার আন্দোলন;

(খ) লণ্ডনে মাননীয় আগা খাঁ কর্ত্তৃক প্রাচ্য কৃষ্টি বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনের উল্লেখ;

(গ) মুরাদাবাদে বালিকাদিগের বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন;

(ঘ) মাদ্রাজের মুসলিম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর প্রবেশাধিকার দানের প্রশংসা করিয়া ডিরেক্টরের বক্তৃতা;

(ঙ) বাঙ্গালা কাউন্সিলে মুসলমান-শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে নিয়োজিত কর্ম্মচারীর অনুপযুক্ততা বিধায় ঐ পদের লোপ প্রার্থনা করিয়া জনৈক মুসলমান সদস্যের বক্তৃতা;

(চ) ইরাণের নূতন জাতীয় জাগরণের সমর্থন করিয়া কলিকাতার জনৈক মুসলমান অধ্যাপকের বক্তৃতা।

[১২] শিক্ষা-জগতের বিবিধ সংবাদ :—

(ক) দেরাদুনের নবপ্রতিষ্ঠিত পাব্লিক স্কুলের নব-নিযুক্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফুট কর্ত্তৃক এই স্কুলের উদ্দেশ্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানের মিলন-সংগঠন, ইহা জ্ঞাপন;

(খ) ত্রিপুরার অভিভাবকদের অনুরোধে বিদ্যালয়ে আংশিক সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তনা;

(গ) বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ব্রাউন কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শিক্ষার উপরিতন কর্ম্মপরিচালনার ব্যয়-বাহুল্যের উল্লেখ;

(ঘ) বাঙ্গালোর সায়ান্স ইন্‌ষ্টিট্যুটের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য;

(ঙ) ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের দুর্দ্দশা;

(চ) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিক্ষিতদের মধ্যে খৃষ্টানদের সংখ্যাধিক্য।

(ছ) প্রচলিত বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদের কাহারও অন্ধ ভক্তি এবং কাহারও কাহারও সন্দেহ;

(জ) সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে পাশ্চাত্যের অনুসরণমূলক আচরণ ;

(ঝ) পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ঔৎসুক্য ;

এবং (ঞ) সিংহলের কোনও কলেজের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক 'জিজ্ঞাসু-বাদ' (spirit of enquiry) যে সকল কুজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করে— এই মত প্রকাশ।

কৃষি

কৃষি-বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ :—

[১] বাঙ্গালা

(ক) জমিদারগণের এবং হুগলী, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, কালনা, রাণাঘাট ইত্যাদি স্থানের লোকের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ সত্ত্বেও ভূমি-উন্নতি বিধায়ক বিল আইন রূপে গৃহীত ;

(খ) বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের ১৯৩৩-৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ ; সাতটী বিশেষ বিষয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগরের ফলোৎপাদন গবেষণা, আখচাষ ; ফরিদপুরে ভদ্র-যুবকদিগের কৃষি-শিক্ষা ; এবং ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-গবেষণারও উল্লেখ ;

(গ) ভারত-সরকার কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সরকারকে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি-বিধানার্থে ১৬ লক্ষ মুদ্রা দান ;

(ঘ) ইম্পিরীয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সরকারকে শস্য বিষয়ে গবেষণার জন্য ৫০০০৲ টাকা ঋণদান ;

(ঙ) মৈমনসিং সহরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বক্তৃতায়—বাঙ্গালা দেশে সু-পরিকল্পিত শস্যোৎপাদন-নীতির সাহায্যে আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকার ও মধ্যবিত্তগণের মধ্যে বেকার-সমস্যা দূর করা যাইতে পারে—এই মত প্রকাশ ;

(চ) বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-সূচনা ;

(ছ) সরকার কর্ত্তৃক বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে ১,০১,৫০০ টাকার কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা এবং বর্দ্ধমানে কৃষকদিগের জন্য বিশেষ (test relief work) পরীক্ষামূলক সহায় ব্যবস্থা ;

(জ) শ্রীহট্ট অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের মতভেদ ;

(ঝ) প্রজা-সমিতি কর্ত্তৃক ভোটাধিকার আলোচনা ;

(ঞ) আগামী বৎসরের জন্য পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

[২] মাদ্রাজ

(ক) সরকার কর্ত্তৃক দশ-বার্ষিক কৃষি-উন্নতি-পরিকল্পনা গঠন ; চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা, কৃষককে কমসুদে ঋণদান, চলাচলের রাস্তা বাড়ানো এবং জমিদারদিগকে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতিকার্য্যে সাহায্য বিষয়ে প্রেরণাদান ইত্যাদি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ;

(খ) ভারত-সরকারের দান হইতে ৫৷৷০ লক্ষ টাকা কূপখনন ও পল্লী অঞ্চলে যাতায়াত-সুবিধার্থ ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ;

(গ) অব্যবহৃত খাড়ি ইত্যাদিকে নৌ-চালনার উপযোগী করণ ;

(ঘ) অনন্তপুর ও বেলারী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর আশা-প্রদান ; শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ কর্ত্তৃক ঐ অঞ্চলের সাহায্য ব্যবস্থা বন্ধ হইলে ৪৮০০০ লোকের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা প্রকাশ ;

(ঙ) কইম্বাটুরে চাউল-গবেষণায় সুফল ;

(চ) ইলোর অঞ্চলে পল্লী-সমবায়-সমিতির দায়িত্বহীন পরিচালনা ;

(ছ) সমবায়-সমিতির জয়েন্ট-রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক তুলা-চাষীদের সহায়-পরিকল্পনা ;

[৩] কৃষি-বিষয়ক অপরাপর সংবাদ

(ক) কৃষকগণের অবস্থার উন্নতির জন্য ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের অনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—জনৈক পত্র-লেখক কর্ত্তৃক পত্রিকায় এই মত প্রকাশ ;

(খ) 'টাইমস্'-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের পল্লী-অঞ্চলের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রশংসা ;

(গ) যুক্ত-প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি ;

(ঘ) ১৫ই হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত ইম্পিরীয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের পরামর্শ-বৈঠকের অধিবেশনে গো-পালন, পশুরক্ষা, ভূমি উন্নতি ইত্যাদি নানা বিভাগের পরিচালনা-কমিটি নির্দ্ধারণ ;

(ঙ) লক্ষ্ণৌ-এ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যারম্ভ ;

(চ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সরকারের পল্লী-উন্নয়নোদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি ;

(ছ) বিহারে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যারম্ভ ;

(জ) সিন্ধু-সরকারের কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক ২০ জন জমিদার-সন্তানকে কৃষিবিষয়ে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ;

(ঝ) মীরাট ও কানপুরে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যসূচক সভা ;

(ঞ) বরোদা সরকার কর্তৃক আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানানুযায়ী কৃষির উৎকর্ষ-চেষ্টা, এবং

(ট) ডেনমার্কে ৪০০০ হাজার কৃষক কর্তৃক শাসন সংক্রান্ত সকল পদ হইতে—বিশেষ করিয়া কৃষি-সংক্রান্ত পদগুলি হইতে, রাজনীতিকদের বিতাড়নের দাবী, নচেৎ শস্যোৎপাদন-রোধের নীতি-প্রদর্শন।

শিল্প

শিল্পবিষয়ক প্রকাশিত সংবাদসমূহ :—

[১] গত ১৯৩৩-৩৪ সনের অল-ইণ্ডিয়া-ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্ট হইতে, বাঙ্গালা ও আসামের ঐ দুই বৎসরের শিল্পসম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ;

[২] শর্করা-শিল্প :

(ক) ভারতবর্ষের শর্করা-শিল্পের ইংলণ্ডের বাজারের সম্ভাবনা—১৯৩৫ সনের শর্করা বার্ষিকীতে এই মত প্রকাশ;

(খ) কেন্দ্রীয় শর্করা-গবেষণাগারের প্রয়োজন-বোধ;

(গ) বিসবেনের আন্তর্জাতিক সমিতিতে ভারত সরকার কর্তৃক শর্করা-বিশেষজ্ঞ প্রেরণ;

(ঘ) কলিকাতা রোটারী-ক্লাবে জনৈক বক্তা কর্তৃক ভারতের শর্করা-শিল্পের অযথা বৃদ্ধির উল্লেখ।

[৩] টারিফ-বোর্ড :—

(ক) কাচ-ব্যবসা বিষয়ে এই বোর্ডের নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ;

(খ) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার কর্তৃক এই বোর্ডে বাঙ্গালী সদস্যের মনোনয়নের অনুরোধ;

(গ) টারিফ-বোর্ড কর্তৃক কলিকাতায় কাগজ-শিল্প বিষয়ে তদন্ত।

[৪] জাপানের ভারতীয় শিল্প ব্যাপারে অনাচার;

[৫] চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীদের অনাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

[৬] ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য :—

(ক) সরকার কর্তৃক ইংলণ্ডে শিল্প-মন্দার প্রতীকার অনুসন্ধানার্থে নিযুক্ত কমিশনারের বিবরণী-প্রকাশ;

(খ) প্রিন্স অব ওয়েল্‌স কর্তৃক কোনও সভায় (6th International Congress of Scientific Management) ইংলণ্ডের শিল্প-কারুদের পূর্ব্বাপেক্ষা নৈপুণ্যবৃদ্ধির উল্লেখ;

(গ) ১৯৩৭ সন হইতে বৃটিশ শিল্পের স্থায়ী মেলার জন্য ১২ একর পরিমিত স্থানের বন্দোবস্ত;

(ঘ) ল্যাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় তুলা চালাইবার পক্ষে ঐ তুলার বর্ত্তমানে যে সামান্য ত্রুটি তাহা দূর হইলেই উহা এখানে চলিতে পারে—জনৈক ইংরেজ (Mr. Short) কর্তৃক এই মত প্রকাশ।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ :—

[১] ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি মিঃ রান্সিম্যান ও রাজস্ব-সচিব মিঃ চেম্বারলেন, দুই জনেই ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে, এই মত প্রকাশ;

[২] মিশর ও বৃটেনের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারের চেষ্টা;

[৩] প্যারী সহরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মণ্ডলীর (International Chamber of Commerce) কোন সভায় শ্রীযুক্ত ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ কর্তৃক ভারতীয় জাহাজ-ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুর্গতির হেতু প্রদর্শন;

[৪] ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ব্যবসায়-বৃদ্ধির চেষ্টা;

[৫] মহীশূর চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক ভারত-সরকারের বাণিজ্য-সদস্যকে বিদেশে ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিনিধির (Indian Trade Commisioners) সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ।

রাজ্য-শাসন

রাজ্যশাসন সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদ সমূহ :—

[১] ভারতবর্ষ :

(ক) পার্লামেণ্ট কর্তৃক নূতন ভারত শাসন বিল আইন রূপে গৃহীত ও সম্রাটের সমর্থন;

(খ) আগামী মে মাস হইতে লর্ড লিংলিথগোর বড়লাট পদে নিয়োগ;

(গ) কাশ্মীরের গিলগিট প্রদেশের শাসন-ভার ভারত সরকার কর্তৃক গ্রহণ;

(ঘ) লাহোর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ; বড়লাট কর্তৃক এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির উত্তর-প্রদানকালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ।

[২] বাঙ্গালা :

(ক) ভূমি-উন্নতি বিধায়ক বিল আইন রূপে গৃহীত;

(খ) বাঙ্গালার অন্তরীণদের বিষয়ে বিক্ষুব্ধ জনমত;

(গ) হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট ও হাঁসপাতাল ইত্যাদির রিপোর্টে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের ক্রমিক অবনতির সংবাদ;

(ঘ) বাঙ্গালায় ডাকাতির সংখ্যাবৃদ্ধি;

(ঙ) বেকার-সমস্যা বিষয়ে বড়লাটের সহানুভূতি;

(চ) বাঙ্গালা সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রেরিত মেদিনীপুর পল্লী-অঞ্চলে সচল প্রদর্শনীর কার্য্য বিবরণী প্রকাশ।

[৩] বিবিধ সংবাদ :

(ক) বিহার ও উড়িষ্যার সরকার কর্ত্তৃক বেকার-সমস্যার প্রতিকার চেষ্টা ;

(খ) মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আসাম প্রদেশের উন্মাদ-আশ্রমের (Mental Hospital) রিপোর্টে ঐ সকল প্রদেশে উন্মাদ রোগের বৃদ্ধির সংবাদ ;

ব্যক্তিগত

ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদ সমূহ :—

[১] বাঙ্গালার কতিপয় মহাত্মার মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত :

(ক) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ;

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ;

(গ) কৃষ্ণদাস পাল ;

(ঘ) অন্ধ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারী সাহা ;

(ঙ) জে. এম. সেনগুপ্ত।

[২] জননায়ক-বিষয়ক :

(ক) মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিশোধ দেওয়া উচিত, একটী প্রবন্ধে তাহার নির্দ্দেশ ;

(খ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজন-নির্দ্দেশ ;

(গ) কলিকাতার মেয়র ফজলুল হক কর্ত্তৃক কোন জন-সভায় ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা যে বস্তুতঃ অর্থ-নৈতিক, এই মতপ্রকাশ এবং গত কয় বৎসরে বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় ৫ কোটি হইতে ১১কোটিতে বৃদ্ধির অযৌক্তিকতার উল্লেখ।

[৩] শোক সংবাদ :

(ক) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী মনোরমা দেবী ;

(খ) পুরুলিয়ার জননেতা নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত ;

(গ) সুগায়ক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

(ঘ) সাংবাদিক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু ;

(ঙ) স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

বিবিধ

বিবিধ বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ :—

[১] বিদেশ :

(ক) আবিসিনিয়া ও ইটালীর সমরায়োজন ;

(খ) ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক ব্যয়-সঙ্কোচ প্রস্তাব ;

(গ) লীড্‌স সহরে ১৪ লক্ষ ৫০ সহস্র পাউণ্ড ব্যয়ে ৩০ হাজার শ্রমিক পরিবারের আবাস-নির্ম্মাণ পরি-কল্পনা ;

(ঘ) লণ্ডনে একটি মণ্ডলীর কার্য্যবিধিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদনের সহিত শ্রম-মূল্যের অসামঞ্জস্য নিবারণ চেষ্টার সমধিক প্রয়োজনবোধের প্রকাশ ;

[২] কংগ্রেস :

(ক) ওয়ার্দ্ধা কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস-কর্ম্মী কর্ত্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রশ্নের বর্ত্তমানে মীমাংসা নিষ্প্রয়োজন প্রস্তাব গ্রহণ ;

(খ) ডাঃ আন্‌সারি ও ডাঃ রায়ের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে, জনসাধারণের মত গ্রাহ্য করিবার জন্য দেশের সকল প্রধান পদ কংগ্রেস কর্ত্তৃক অধিকারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ;

(গ) কংগ্রেসের বিশিষ্ট কয়েকটি নায়ক কর্ত্তৃক 'ডিমোক্রাটিক স্বরাজ পার্টি'র (Democratic Sawraj Party) গঠন ;

(ঘ) সোস্যালিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিবে কিনা তৎসম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ;

[৩] ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয়—

(ক) বাঙ্গালার লাট কর্ত্তৃক স্যালভেশন-আর্মির একটি পতিতা-আশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষে সমাজে বেশ্যাবৃত্তির কুপ্রভাব বিষয়ে বক্তৃতা ;

(খ) বাঙ্গালার লাট কর্ত্তৃক ঢাকার সারস্বত সম্মেলনে বর্ত্তমানে হিন্দুদের ধর্ম্ম-শৈথিল্য সংবাদ শ্রবণে উদ্বেগ প্রকাশ।
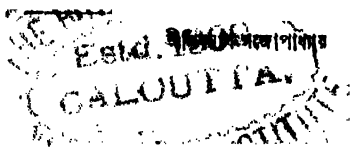
শ্রীকিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শারদশ্রী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শিল্পী - শ্রীপ্রশান্তকুমার মজুমদার

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
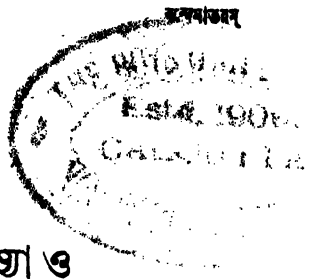
—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

"আধ্যাত্মিক সাহিত্য" কাহাকে বলে তাহার আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি। ঐ আলোচনা-প্রসঙ্গে "আত্মা" বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তদনুসারে কোন জীবের "আত্মা" বলিতে বুঝায়, পুরাপুরি সেই জীবটীকে এবং তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে জীবটীর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। কোন জীবের উপাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার সমস্ত উপাদানের "আদির আদি"কে বুঝিতে হয়। সমস্ত উপাদানের "আদির আদি"র নাম নিগুর্ণ "ব্যোম" অথবা "ব্রহ্ম" অথবা "ঈশ্বর"। মনে রাখিতে হইবে, নিগুর্ণ "ব্যোম" আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশে—বায়ু, জল, তেজ এবং অস্থি ও মাংস রূপে মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং তাঁহার প্রকাশ হয়—শিরা এবং ধমনীস্থ শব্দে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অস্তিত্ব এবং কার্য্য বজায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি। যে মুহূর্ত্তে আমাদের শরীরাভ্যন্তরে তাঁহার কার্য্যের বিরতি হয়, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কাজেই আমাদের শরীর রক্ষা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব উপকরণ "ব্যোম" অথবা "ঈশ্বর"। বাস্তব জিনিসেরই "দর্শন" observations) সম্ভব হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার সামর্থ্য মানুষ বজায় রাখিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান অটুট থাকে। বাস্তবতার পরিবর্ত্তে যখন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তখন "বিকল্পের"* উদ্ভব হয় এবং "কুজ্ঞান" প্রকৃত জ্ঞানের নামে চলিতে থাকে। তাহার ফলে মানুষের অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। নানা রকম দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিতে করিতে মানুষ অবশেষে অজ্ঞানের আশ্রয় লয় এবং অজ্ঞান হইতে আবার জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও মনুষ্য-সমাজে, জ্ঞানের পর কুজ্ঞান, কুজ্ঞানের পর অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের পর জ্ঞানের কার্য্য প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে। ভারতীয় ঋষির এই কথার যাথার্থ্য গত তিন হাজার বৎসরের ইয়োরোপের, ভারতের এবং জগতের ইতিহাস দ্বারা যে প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। জ্ঞান, কুজ্ঞান এবং অজ্ঞানের বিধিবদ্ধ ক্রমানুসারে বর্ত্তমান জগতে জ্ঞানের উদ্ভব হইবার কথা। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা যে হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রমাণ—বর্ত্তমান সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক দুঃখ-দারিদ্র্য। প্রকৃত জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলে কি এইরূপ সর্ব্বত্র "হাহাকার" উঠিতে পারিত? যে জ্ঞানে মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিতে না পারে, সে জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? এই জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে কি কুজ্ঞান নহে? যাঁহারা এই শ্রেণীর "কুজ্ঞান"কে "জ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদিগকে কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে আত্মপ্রতারক বলা যায় না?

অনেকে মনে করেন, "ব্যোম"কে "ঈশ্বর" বলা ভারতীয় ঋষির দর্শনবিরুদ্ধ কথা। ইহা তাঁহাদের ভ্রমাত্মক ধারণা।

* 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' (পাতঞ্জল দর্শন—১ম পাদ ৯ম সূত্র)। "বিকল্প" বলিতে বুঝায় কতকগুলি শব্দের সমষ্টি এবং ঐ শব্দসমষ্টি হইতে মনে হইবে যেন জ্ঞান হইতেছে অথচ প্রকৃত পক্ষে কোন্ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে তাহার কোন ধারণা থাকিবে না এবং ঐ শব্দসমষ্টি দ্বারা কোন বাস্তব উপাদান, গুণ অথবা কর্ম্মক্ষমতা বুঝা যাইবে না। এক কথায় অর্থহীন পরিভাষার (terminology) নাম "বিকল্প"।

"দর্শন"সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ও জ্ঞান যে "দর্শনে"র ভাষ্য-প্রসূত এবং তাঁহারা যে চিন্তা করিয়া ভারতীয় ঋষির দর্শনের মূল সূত্র পড়েন না এবং ভাষার অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা পড়িতে পারেন না, ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হন। "দর্শন" চক্ষুর অবস্থা-বিশেষের একটী কার্য্য এবং তাহার বিষয়—বস্তুর বাস্তব উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতা।

যে বস্তু চক্ষুর উপলব্ধিযোগ্য নহে, দেবোপম ঋষিগণ তাহা তাঁহাদের "দর্শনে"র আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইলে "দর্শন" শব্দ যে অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে ঋষিদিগকে যে অপমান করা হয়, ইহা বুঝা কি খুবই কঠিন? বিবিধ ভাষ্যকারগণ ভারতীয় ঋষির "ঈশ্বর"কে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কি অস্বীকার করা যায়? "ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা এবং তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন", ইহা বুঝিতে পারিলে, তাঁহার বাস্তবতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের ন্যায় বাস্তব আর কিছু জগতে নাই। অথচ ভাষ্যকার-গণ তাঁহাকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া ভাষ্যকারগণ যাহা বলিয়া-ছেন, তাহাই ঠিক, ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে অবাস্তব করিয়া তুলিলে তাঁহার অপমান করা হয় না কি? *

আমাদের মনে হয়, ভাষ্যকারদিগের কথা শুনিয়া উপরোক্ত ভাবে আমরা ঈশ্বরের এবং দেবোপম ঋষিগণের অপমান করিতেছি বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী দুর্দ্দশা।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, আপনারা আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়া এখনও কি সতর্ক হইবেন না? মোহাচ্ছন্ন হইয়া আপনারা কাহার সন্তান তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনারা আপনাদের গোত্র এবং প্রবর বুঝিবার চেষ্টা করুন। দেখিতে পাইবেন, আপনারা সকলেই খাঁটি ঋষির অথবা খাঁটি মুনির সন্তান। আপনারা আপনাদের পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ভারতীয় ঋষির খাঁটি জ্ঞান ও বিজ্ঞান আবার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। আপনাদের প্রকৃত পাণ্ডিত্য চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও প্রায়শঃ দৈহিক অসামর্থ্যের (physical inability) উদ্ভব হয় নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অখাদ্য অথবা কুখাদ্য খাইয়াছেন এবং মদ্যপান করিয়াছেন, তাঁহাদের জিহ্বা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucus membrane) বিকৃত হওয়ায় দৈহিক অসামর্থ্যের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের ঋষিগণের প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান উদ্ধার করা আপনাদের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। আপনারা আর একবার ভাল করিয়া কিছুদিন ধরিয়া অ-কারের উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে **আ-কার** ও **আ-গম** কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং তখন আবার **প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা** * আপনাদের হৃদয়ে বাজিয়া উঠিবে। তখন মনুষ্যজাতির বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার লক্ষণ যে দুইটী মীমাংসায় আছে—সেই "পূর্ব্ব" ও "উত্তর"-মীমাংসা আপনাদের পক্ষে যথাযথ বুঝা সম্ভব হইবে। তাহার পর মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে যে "বিচেষ্টা"র প্রয়োজন, তাহার বিবৃতি যে "অথর্ব্ববেদে" আছে, সেই অথর্ব্ববেদ যথাযথ ভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে পারিবেন এবং মনুষ্যজাতির পক্ষে বর্ত্তমান আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে।

আপনারা এখন যাহাকে পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা ও অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন, তাহা আমাদের ভারতীয় ঋষির মীমাংসা অথবা বেদ নহে। তাহা ভাষ্যকারগণের মীমাংসা ও বেদ। আমাদের ঋষির মীমাংসা ও বেদ যুগে যুগে সমস্ত দেশের সমস্ত মনুষ্যজাতির মিলন সম্ভব করিয়া দিয়াছে, কারণ ঐ গ্রন্থ-গুলির প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর ভাষ্যকারগণের কথাগুলি প্রায়শঃ ভ্রান্তিপরিপূর্ণ। ভাষ্যকারগণের কথায় ভ্রান্তি আছে বলিয়াই দুইটী ভাষ্য সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে এবং যাঁহারা তাহা পড়েন, তাঁহাদের দুইজনের পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে এক মত অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। ভাষ্যকারগণ আমাদের ভারতীয় ঋষির বেদ, মীমাংসা, দর্শন, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি

* বাস্তবিক পক্ষে কেহ ঈশ্বরকে অপমান করিতে পারে না, তবে আমরা ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করি বলিয়া ঐরূপ লেখা হইয়াছে।

* এখন যাহা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া প্রচলিত, তাহা যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নহে এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে বহুদিন হইতে বিকৃত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমার এই প্রবন্ধের বিগত প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় এবং 'অবতার' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'পাণ্ডিত্যের সংজ্ঞা'শীর্ষক আলোচনায় (এই সংখ্যার শেষভাগে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থগুলিকে যে "বিকল্পিত" করিয়া দিয়াছেন, তাহা একবার আপনারা চক্ষু মেলিয়া দেখুন। ভাষ্যকারগণের মধ্যে "শঙ্কর", শবর, প্রশস্তপাদ, অনিরুদ্ধ, "বাৎস্যায়ন", বোপদেব, "কাত্যায়ন", ভট্টোজি দীক্ষিতপ্রভৃতি মনীষিগণ আছেন তাহা সত্য, কিন্তু আপনারাই ত বলিয়া থাকেন, মুনিদিগেরও মতিভ্রম হইতে পারে—পরন্তু ঋষির মতিভ্রম হইতে পারে, এই জাতীয় কোন প্রবাদ আপনাদের মধ্যে নাই।

একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, বড়ই সঙ্কটের সময় আসিয়াছে। ঋষিদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞান অনতিবিলম্বে উদ্ধার করিতে না পারিলে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক মানুষকে অতি ভীষণ ভাবে বিপন্ন হইতে হইবে। আপনারা আপনাদের বর্ত্তমান দম্ভ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার চেষ্টা একবার করিবেন না কি?

কোন গভীর তথ্যে প্রবেশ করিতে হইলে মস্তিষ্কে ও দেহে শীতলতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু দম্ভ তেজের উদ্ভব করে এবং সমস্ত শরীর ও মস্তিষ্ক গরম করিয়া দেয়—ইহা আপনারা বুঝিবেন না কি এবং ইহা বুঝিয়া দম্ভ পরিত্যাগ করিবার একটু চেষ্টা করিবেন না কি?

প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে পাণিনির বিভিন্ন সূত্রগুলি যে যে অর্থে প্রচলিত, তাহা প্রায়শঃ অসঙ্গত। ঐ সূত্রগুলির এক একটী শব্দ যাদৃশ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে,তাহা কেন যে তাদৃশ হইবে, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। এক সময় ছিল, যখন আচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ কি এবং কেন তাহার সেই অর্থ হইবে তাহা জানিতেন এবং বিদ্যার্থিগণকে তাহা শিখাইতে পারিতেন। প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ কি এবং কেন তাহার সেই অর্থ হইবে, তাহা জানা থাকিলে বর্ত্তমানে সূত্রগুলি যে বিকৃত অর্থে প্রচলিত, তাহা চেষ্টা করিলেই বোধগম্য করিতে পারা যায়।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ এবং সংযত, তাঁহারা "বিবৃত" উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া "অ"-কার উচ্চারণ করিতে শরীরের কোন্ কোন্ স্থান ব্যবহৃত হয় এবং "অ"-কার হইতে "আ"-কারের উচ্চারণের কিরূপে উদ্ভব হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা করুন। "অ"-কার হইতে "আ"-কারের উচ্চারণের কিরূপে উদ্ভব হয়, তাহা জানিবার নাম, **"আ"-পদ-উদ্ধার** অথবা **"আ"-গম**। "আ-পদ-উদ্ধার" করিতে পারিলে অথবা "আ-গম" হইলে সংস্কৃত ভাষার কোন্ অক্ষরের কি অর্থ এবং তাহার লিখন-প্রণালী কি হইবে, তাহা জানা যায়। কোন্ অক্ষরের কি অর্থ, তাহা যথাযথ ভাবে জানা হইবার পর, সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে স্বতঃই তাহার পদের অর্থ বোধগম্য হয়। সারস্বত-ব্যাকরণ প্রথম-শিক্ষার্থীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ। উহা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রথম-শিক্ষার্থিগণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কলাপ, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, শব্দেন্দুশেখর, লঘুকৌমুদী, সিদ্ধান্তকৌমুদীপ্রভৃতি অপর সমস্ত ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের উদ্ভব হইয়াছে পাণিনির বিকৃতি হইতে। ঐ সমস্ত ব্যাকরণের কোনটী পড়িয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা যায় না এবং তৎসম্ভূত জ্ঞান হইতে ভাষ্যের বিনা সহায়তায় কোন দর্শনের মূল সূত্র, বেদের মূল মন্ত্র অথবা কোন তন্ত্রের বীজমন্ত্র বুঝিতে পারা যায় না। আপনারা যে কোন দর্শনের মূল সূত্র, বেদের মূল মন্ত্র অথবা কোন তন্ত্রের বীজমন্ত্র, কোন ভাষ্যের বিনা সহায়তায় বুঝিতে পারেন না, তাহা কি অস্বীকার করিবেন? কোন ভাষ্যের বিনা সহায়তায় যখন দর্শনের কোন মূল সূত্রাদি আপনারা বুঝিতে পারেন না, তখন আপনারা সংস্কৃত ভাষা জানেন, ইহা মনে করেন কেন?

সারস্বত-ব্যাকরণ এখন যে অর্থে প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নহে। "আ-গম" অথবা "আ-পদ-উদ্ধার" পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, কোন বৃত্তি অথবা ভাষ্যের বিনা সহায়তায় উহার যথাযথ অর্থ বুঝিতে পারা যায়। তখন প্রত্যেক অব্যয়, উপসর্গ, ধাতু এবং প্রত্যয়ের কি অর্থ হয় ও কেন সেই অর্থ হয় তাহা জানা যায় এবং পদের ও বাক্যের অর্থ কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। "আ-গম" অথবা "আ-পদ-উদ্ধার" পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, যে যে গ্রন্থ জগতের অথবা চর ও অচর জীবের "ব্যক্তাংশ" (physical part) সম্বন্ধে লিখিত, তাহার অর্থ নির্ভুলভাবে কোন

ভাষ্যের বিনা সহায়তায় বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থ কোন "অব্যক্তাংশ" (unseen and abstract ideas) সম্বন্ধে লিখিত, তাহার অর্থোদ্ধার অথবা মর্ম্মোদ্ধার করা যায় না। কোন বস্তুর অব্যক্তাংশের অর্থোদ্ধার ও মর্ম্মোদ্ধার করিতে না পারিলে ব্যক্তাংশের মর্ম্মোদ্ধার যথাযথ হইয়াছে কিনা, তাহার পরীক্ষা হয় না। কাযেই পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কেবল সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, যে সমস্ত গ্রন্থ ভাষার স্থূলাংশের সহায়তায় লিখিত, তাহার অর্থোদ্ধার করা যায় বটে, কিন্তু মর্ম্মোদ্ধার যথাযথ হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের বেদ (আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ সমেত), উপনিষদ, দর্শন, ভৃগুসূত্রপ্রভৃতি জ্যোতিষের গ্রন্থ মূলতঃ বস্তুর অব্যক্তাংশের আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং ঐ গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষার সূত্রাকারের সহায়তায় লিখিত। মহাপুরাণ, উপপুরাণ, স্মৃতি এবং বৃহৎসংহিতাপ্রভৃতি জ্যোতিষের গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ বস্তুর ব্যক্তাংশসম্বন্ধীয় আলোচনা বটে, কিন্তু এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেক খানির মধ্যে আলোচ্য ব্যক্তাংশ কি করিয়া তাহার অব্যক্তাংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় বহু তথ্যের সন্ধান আছে। কাযেই "আ-গমে"র সাহায্যে কেবল সারস্বত ব্যাকরণ পড়িলে—সংস্কৃত ভাষা যতটুকু জানা যায়, তদ্দ্বারা মহাপুরাণ, উপপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ আংশিক ভাবে বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায় না এবং বেদ, দর্শন ও জ্যোতিষের সূত্র-গ্রন্থগুলির মর্ম্মোদ্ধার একেবারেই করা যায় না।

এই সূত্র-গ্রন্থগুলির মর্ম্মোদ্ধার করিতে হইলে পাণিনি অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যে সমস্ত "অব্যক্ত"-ভাব (unseen and abstract ideas) আছে, তাহা তাহার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের ও কি কি উপাদানের কোন্ কোন্ রকম কার্য্য হইতে উদ্ভূত হয় এবং ঐ "অব্যক্ত"-ভাবগুলি (unseen and abstract ideas) ভাষায় কিরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে হয়, তাহার আলোচনা আছে পাণিনি-ব্যাকরণে। কাযেই "আ-গম", সারস্বত-ব্যাকরণ ও পাণিনি-ব্যাকরণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় এবং তখন বেদ, দর্শন ও জ্যোতিষপ্রভৃতির সূত্র-গ্রন্থগুলি কোন ভাষ্যের বিনা সহায়তায় পড়িতে পারা যায় এবং প্রচলিত ভাষ্য যথাযথ লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বেদ, দর্শনপ্রভৃতি সূত্র-গ্রন্থগুলির প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিলে পুরাণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষের সংহিতা-গ্রন্থগুলির যথাযথ মর্ম্মোদ্ধার করা অতি সহজ হয়।

আপনাদের মধ্যে কেহ উপরোক্তভাবে সংস্কৃত ভাষা পুরাপুরি ভাবে জানিতে পারিয়াছেন কি? ভাষার জ্ঞান যদি পুরাপুরি ভাবে অর্জ্জন করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা কেন মনে করেন যে, পুরাণ ও ব্যবস্থা-শাস্ত্রাদি যে মর্ম্মে চলিতেছে ও বিবিধ ভাষ্যকারগণ বিবিধ গ্রন্থের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ? তাহার পর যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ব্যাবহারিক জীবনে আমরা পশুর অধম হইয়াছি, এমন কি দেবতাসদৃশ ঋষির ভারতে অন্নাভাব পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে, তখন আপনারা কেন মনে করেন যে, প্রচলিত ভাষ্যকারগণ আমাদের দেবতাসদৃশ ঋষিগণের জ্ঞান অটুট রাখিতে পারিয়াছেন এবং আপনাদেরও ঐ জ্ঞান অটুট আছে? জ্ঞানের বিকৃতি না হইলে আমাদের এতাদৃশ দুরবস্থা হইতে পারিত কি?

মানুষের যে সমস্ত "অব্যক্ত"-ভাব (unseen and abstract ideas) আছে, তাহা শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের ও কি কি উপাদানের কোন্ কোন্ কার্য্য হইতে উদ্ভূত হয় এবং ঐ "অব্যক্ত"-ভাবগুলি (unseen and abstract ideas) ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করিতে হয়, তাহার আলোচনা পাণিনি-ব্যাকরণে আছে এবং "আ"-গম ও সারস্বত-ব্যাকরণ পড়া হইলে পাণিনি-ব্যাকরণ পড়া সম্ভব হয়, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু পাণিনি-ব্যাকরণে যখন মানুষের শরীরের অঙ্গের ও তাহার উপাদানের কার্য্যের আলোচনা আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কেবল "আ-গম" ও সারস্বত-ব্যাকরণের জ্ঞান থাকিলেই পাণিনি-ব্যাকরণ পড়া সম্ভব হয় না। পাণিনি-ব্যাকরণ পড়িতে হইলে মানুষের অঙ্গের ও তাহার উপাদানের ও তাহার কার্য্যবিধানের কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হয়।

আমার মনে হয়, এমন এক সময় ছিল, যখন পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যাপকগণ মানুষের শরীর-গঠন-তত্ত্ব (Anatomy) ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব (Physiology) পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং বিদ্যার্থিগণের তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ না পড়া

থাকিলেও পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্রের মর্ম্ম পরিষ্কার করিতে হইলে শরীর-গঠন-তত্ত্বের ও শরীর-বিধান-তত্ত্বের যে যে অংশ বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এখন আর পাণিনির ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক পাওয়া যায় না। কাযেই বর্ত্তমান সময়ে পাণিনি-ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে "আ-গম" ও সারস্বত-ব্যাকরণ পড়া হইবার পর শরীর-গঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব বিদ্যার্থিগণের নিজেদেরই পড়িয়া লইতে হইবে।

যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে পাণিনি বুঝিবার উপযোগী শরীর-গঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাদের নাম—

(১) শিবসংহিতা
(২) প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্।
(৩) স্পন্দসন্দোহঃ
(৪) স্পন্দকারিকা
(৫) ষড়্‌বিংশতত্ত্ব সন্দোহঃ
(৬) মহানয়প্রকাশঃ
(৭) মহার্থমঞ্জরী
(৮) শ্রী-বিজ্ঞান-ভৈরব
(৯) শ্রী-নেত্র-তন্ত্রম্
(১০) শ্রী-স্বচ্ছন্দতন্ত্রম্
(১১) শ্রী-তন্ত্রালোক।

ঐ গ্রন্থগুলি কাহার দ্বারা লিখিত, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি। তবে উহার প্রত্যেকখানি যে বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন, তাহা উহার ভাষা হইতেই বুঝা যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়িলে উপরোক্ত মূল গ্রন্থগুলির যথাযথ মর্ম্মোদ্ধার করিবার সহায়তা হয়—

(১) চক্রপাণিনাথের* ভাবোপহার
(২) অভিনবগুপ্তের* তন্ত্রালোক
(৩) অভিনবগুপ্তের বোধপঞ্চদশিকা
(৪) অভিনবগুপ্তের মালিনীবার্ত্তিকম্
(৫) অভিনবগুপ্তের পরাত্রিংশতিকা
(৬) অভিনবগুপ্তের ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা
(৭) উপলদেবের শিবদৃষ্টি
(৮) প্রাকৃতলক্ষণ
(৯) বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ।

মনে রাখিতে হইবে, "আ-গম" না হইলে এবং সারস্বত-ব্যাকরণ যথাযথ ভাবে পড়া না থাকিলে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলি পড়া যায় না এবং ঐ গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিলে পাণিনির বিবিধ সূত্র সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিবার জন্য শরীর-গঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্বের যে যে অংশ জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা জানা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরীর-গঠন তত্ত্ব ও শরীর-বিধান তত্ত্বের জ্ঞান দর্শন ও বেদ না পড়িলে লাভ করা সম্ভব হয় না।

আমার মনে হয়, আপনাদিগের মধ্যে এখনও বহু অভিমান-হীন সত্যানুসন্ধিৎসু লোক আছেন এবং তাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে চেষ্টা করিলে পাণিনি-ব্যাকরণ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিবেন ও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার যে কতখানি বিকৃতি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"ব্যোম"ই যে "ঈশ্বর", তাহা অভিনবগুপ্তের "ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা"র সাহায্যে "প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্" অধ্যয়ন করিলে অনুমান করা যায়। তাহার পর প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিয়া বেদান্তদর্শনের সূত্র পর্য্যন্ত ভাষ্যের বিনা সহায়তায় নিজে নিজে পড়িতে পারিলে এই কথার সার্থকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হয়। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য নামক অথবা তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিবার জন্য রচিত যতগুলি গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি, তাহা প্রায়শঃ বেদান্তদর্শনের বিকৃতি সাধন করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। ব্যাসদেবের কথানুসারে "ব্রহ্ম"কে উপলব্ধি করিবার উপায় তিনটী—

প্রথমতঃ, নিজের শরীরাভ্যন্তরে;
দ্বিতীয়তঃ, নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে;
তৃতীয়তঃ, "ব্রহ্মলোকে" অথবা "ভর্গলোকে" (এই "ভর্গ-লোকই" গায়ত্রীর "ভর্গদেব")।

নিজের শরীরাভ্যন্তরে "ব্রহ্মে"র (আমার কথানুসারে "ব্যোমে"র) উপলব্ধি হইলে, ইচ্ছামত শরীরের আভ্যন্তরীণ বায়ু হইতে তেজের ও জলের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। শরীরের ভিতর ইচ্ছামত তেজের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য হইলে

* এই গ্রন্থগুলি পড়িয়া যাহা মনে হয় তাহাতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করেন নাই—ঐ নামগুলি তাঁহাদের প্রকৃত ভক্তি-প্রজ্ঞা-সম্বলিত উপাধিমাত্র।

ব্যাসদেবের কথানুসারে শরীরের লঘুতা (intermolecular space-এর বৃদ্ধি) সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং তখন মানুষ যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ অনায়াসে জলের উপর বসিতে ও ভাসিতে পারে। বায়ু হইতে কি করিয়া তেজের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা না জানা থাকিলেও দৈহিক কৌশলের দ্বারা জলের উপর ভাসা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য এবং তাহাতে মানুষের কষ্ট হয়।

বেদান্তদর্শনের কথানুসারে কার্য্য করিলে যে, নিজের শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু হইতে তেজের সৃষ্টি করা যায় এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদন করিয়া জলের উপর ভাসা ও তাহার উপর বসা সম্ভব হয়, ইহা অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

শরীরের ভিতর বায়ু হইতে কি করিয়া জলের সৃষ্টি করিতে হয়; তাহা জানা থাকিলে, ইচ্ছানুসারে নিজ শরীরের ও মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদন করা সম্ভব হয়। বেদান্তদর্শনের এই সমস্ত কথা যে অতীব বাস্তব, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় কথানুসারে কার্য্য করিলে, নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে যথেচ্ছা তেজের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এবং শত্রুর প্রাণ বিনাশ না করিয়া, তাহার আক্রমণ হইতে নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই দ্বিতীয় কথানুসারে কার্য্য করিলে, নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডল হইতে কি করিয়া জলের উৎপত্তি করিতে হয় এবং জল হইতে কি করিয়া তেজের উৎপত্তি করিতে হয়, তাহা জানা যায়।

বেদান্তদর্শনের তৃতীয় কথানুসারে কার্য্য করিলে, মানুষের পক্ষে কি করিয়া নীলাকাশ পর্য্যন্ত যাওয়া এবং এক গ্রহ (planet) হইতে অন্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা জানিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় কথা এবং তৃতীয় কথা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই এবং আমাদের মনে হইয়াছে, ঐ কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধি-সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ত্তমান কালে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ কোন তথ্য যথাযথ না জানিয়া তেজের বহুল প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডল (atmosphere) হইতে এই অবিশুদ্ধির জন্যই বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথার প্রত্যক্ষ করা বর্ত্তমানে অসম্ভব হইয়াছে ত' বটেই, পরন্তু মানুষ অজীর্ণ, বহুমূত্র, বেরীবেরী ও রক্তের চাপপ্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতে আরম্ভ করিয়া জীবিত অবস্থায় অদ্ধমৃত রহিয়াছে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঋষিদিগের সমসাময়িক জগতের বায়ুমণ্ডলের ও জলমণ্ডলের বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের অথবা জনসাধারণের কতকগুলি কার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল এবং তখন বায়ুমণ্ডল ও জলমণ্ডল পরিষ্কৃত রাখা হইত বলিয়া সাধারণ মানুষের নীরোগ পরমায়ু (healthy longevity) দেড়শত বৎসরের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াছিল—ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কজ্ঞানের জন্য বায়ুমণ্ডল ও জলমণ্ডলের পরিষ্কৃতি সাধন করিবার চেষ্টা করা ত দূরের কথা, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা যে প্রতিনিয়ত তাহার অবিশুদ্ধি (impurity) সাধিত হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত রোধ করিবার আমাদের কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে নাই।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিলে বেদান্তদর্শনের মূল সূত্র পড়িতে কোন ভাষ্যের সহায়তার প্রয়োজন হয় না এবং তখন বেদান্তদর্শনের বাস্তবতার কথা অথবা দর্শনের (observations) সার্থকতার (meaningfulness) কথা বুঝিতে পারা যায়।

আপনাদের মধ্যে কেহ কি বেদান্ত দর্শনের মূল সূত্র ভাষ্যের বিনা সহায়তায় পড়িতে ও বুঝিতে পারেন? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আপনারা আপনাদিগকে "বৈদান্তিক" মনে করেন কেন? আপনারা যখন "শঙ্করে"র ভাষ্য অথবা "রামানুজে"র ভাষ্য পড়িয়া বেদান্তদর্শন বুঝিয়া থাকেন, তখন আপনারা আপনাদিগকে "বৈদান্তিক" মনে না করিয়া "শাঙ্করিক" ও "রামানুজিক" মনে করিবেন না কেন? আপনারা হয় ত বলিবেন যে, শঙ্কর ও রামানুজপ্রভৃতি ভগবৎসদৃশ মানুষগণ বেদান্তদর্শন যথাযথ ভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধি আছে। আমি তাহার উত্তরে বলিব, আপনারা যখন ভাষ্যের বিনা সহায়তায় মূল সূত্র বুঝিতে পারেন না, তখন শঙ্কর ও রামানুজ যথাযথ ভাবে বেদান্তদর্শন বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা আপনারা বুঝিতে যে অসমর্থ, ইহা আপনারা স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমি যাহা দেখিতেছি, তদনুসারে বর্ত্তমানে "শাঙ্করভাষ্য" বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহাতে এবং "রামানুজভাষ্যে" বেদান্ত-

দর্শনের প্রকৃত মর্ম্মের উদ্ধার হয় নাই, কারণ তাহাতে বস্তুর বাস্তবতা নষ্ট হইয়া "বিকল্পে"র উদ্ভব হইয়াছে। পরন্তু ঋষির "দর্শন" শব্দও অর্থহীন হইয়াছে, কারণ বাস্তব বস্তু ব্যতীত কোন কাল্পনিক বস্তু "দর্শন" করা সম্ভব হয় না।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান কালে যে-ভাষ্য বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, তাহা প্রকৃত শাঙ্কর-ভাষ্য নহে। প্রকৃত শাঙ্কর-ভাষ্য যে একটা কিছু ছিল এবং তাহা হইতে যে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যাইত, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। এখনও "ব্রহ্মসূত্রে"র একটী বৃত্তি পাওয়া যায় এবং তাহা আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে, ঐ বৃত্তিটীর ও ভারতীর্থ মুনির প্রণীত "বৈয়াসিকন্যায়মালা"র সহায়তায় বেদান্তদর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। "ব্রহ্মসূত্রে"র ঐ বৃত্তিটী শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎ শিষ্য প্রণীত বলিয়া প্রচারিত এবং তাহাতে মূল দর্শনের বাস্তবতার কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু তাহা স্থানে স্থানে বর্ত্তমানে যাহা শাঙ্কর-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, তদ্বিরুদ্ধ। কাযেই বর্ত্তমানে শাঙ্কর-ভাষ্য বলিয়া যাহা প্রচারিত, তাহা প্রকৃত শাঙ্কর-ভাষ্য নহে এবং প্রকৃত শাঙ্কর-ভাষ্যের সহায়তায় বেদান্তদর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যাইত—ইহা স্বীকার করিতে হয়।

বর্ত্তমানে যাহা শাঙ্কর-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, তাহা খুব সম্ভব কোন তথাকথিত সাধারণ পণ্ডিতের লেখা এবং তাহা "বিকল্প" ও "বিপর্য্যয়ে"র উদ্ভাবক ও ঘৃণার্হ।

আমি অশিক্ষিত, নগণ্য, এবং ব্রাহ্মণবংশের "কালাপাহাড়" বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিতে আপনাদের প্রবৃত্তি হয়, আপনারা তাহা করুন। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার প্রার্থনা, আপনারা এখনও আমার উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া তাহার ভিতর কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করুন এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের বাস্তবতা যাহাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন, অনতিবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করুন। নতুবা যে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক বিপদরূপী কালমেঘের উদয় হইয়াছে, তাহা মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। আপনাদের মধ্যে কাহারও কি প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য বিগলিত হইবে না? এই সঙ্কট-সময়ে ঋষির সন্তানগণের মধ্যে কাহারও প্রাণ মুহূর্ত্তের জন্যও কাঁপিয়া উঠিবে না, আমি ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না বলিয়াই পাগলের মত চিরপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের (?) বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাকে শাস্তি দিতে হয় পরে দিবেন। আপাততঃ আমি আপনাদের সহায়তা চাই এবং তাহারই ভিক্ষা আমি আপনাদিগের নিকট করিতেছি।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী-শিক্ষিত এবং যাঁহারা ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ব্যাকরণ পড়িয়া বেদের মর্ম্মোদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, অথবা ভট্ট মোক্ষমূলার এবং ডাঃ থিবো প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও অভিধান দেখিয়া ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শনাদির মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ইয়োরোপীয়গণের পক্ষে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। যদি কেহ পারে, তাহা কেবল আপনারা এবং সেই দিন হইতেই তাহার আরম্ভ হইবে, যেদিন আপনাদের "দম্ভ" বিনষ্ট হইয়া আপনাদের কায়, মন ও বাক্যে বিনয়ের উদ্ভব হইবে। মনে রাখিবেন "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"। যদিও ইয়োরোপীয়গণ প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিতে অসমর্থ এবং তাঁহাদের কৃতকার্য্যে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই বেশী সাধিত হইয়াছে, তথাপি আপনাদিগকে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে, কারণ তাঁহারা জ্ঞানপিপাসু এবং লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও লুপ্ত পুস্তকগুলি পুনঃ পাইবার সহায়তা করিয়াছেন।

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য-প্রভৃতিকে অভ্রান্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা কেহ কি শঙ্কর-প্রভৃতির ভাষ্য পড়িয়া এবং তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন? যদি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদিগের ভাষ্য না পড়িয়া থাকেন এবং বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল পরের মুখের কথা শুনিয়া একটা অভিমত পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত কি?

আমরা আমাদের সাধ্যমত দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল

তাহা সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান "বিজ্ঞান" ও "বৈজ্ঞানিক" তাহাতে বাধা প্রদান করিতেছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় কতকগুলি "বিকল্পিত" পরিভাষার (terminology) সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদনুসারে একটা অঙ্কশাস্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ঐ পারিভাষিক শব্দগুলির প্রায় কোনটার অর্থ হয় না এবং তাহার প্রায় প্রত্যেকটা "বিকল্প"। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও প্রায়শঃ অর্থহীন এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মানুষ তাহার কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে পারে না।

গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অঙ্কশাস্ত্র (Statics, Dynamics, Applied Mechanics) বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি। তাহার মূল ভিত্তি নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় বিধি (Newton's Laws of Motion); উহা যে ভ্রমাত্মক তাহা আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক"শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এই অঙ্কশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করা যায় না, তাহা সিভিল (Civil), মেকানিক্যাল (Machanical), ইলেক্‌ট্রিক্যাল (Electrical) প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের যে কোন ইঞ্জিনিয়ার একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি ঐ অঙ্কশাস্ত্র সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যই হইত, তাহা হইলে একটা কাল্পনিক "ফ্যাক্‌টর অফ সেফ্‌টী"র (Factor of Safety) প্রয়োজন হইত কি?

এবংবিধ অবিশ্বাসযোগ্য অঙ্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান জ্যোতিষবিদ্যার সৃষ্টি হইতেছে। তাহাও বিশ্বাস করা যায় কি? হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে, বর্ত্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্যই না হইত, তাহা হইলে গ্রহণাদির কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে কি করিয়া? যে সারণীকে (table or almanac) অবলম্বন করিয়া গ্রহণাদির কাল নিরূপিত হয়, সেই সারণী বর্ত্তমান কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিতে সক্ষম কি? আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ঐ সারণী প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন গণনা-প্রণালী খুঁজিয়া পাই নাই এবং আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ঐ সারণী কবে কাহার দ্বারা কোন্ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে কেহ অদ্যাবধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যা'ং-ইতি (Geometry), বীজ-গণিত (Algebra), লীলাবতী (Arithmetic and Mensuration), ক্ষণিক-ঈক্ষণ (Conics Section), ত্রিকোণং-ইতি (Trigonometry) অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি মানুষের কোন্ কোন্ প্রয়োজনের জন্য কোন্ শ্রেণীর চিন্তা হইতে কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাবধি জানিতে পারেন নাই। পরন্তু ঐ গ্রন্থগুলির বহু অংশের প্রয়োজনীয়তা না জানা থাকায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে উহার যথেষ্ট বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে ঐ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রসায়ন-(Chemistry)-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া এবং খাদ্যাদি কি করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা প্রায়শঃ জানেন না। তাঁহারা যাহাকে খাদ্যাদির বিশুদ্ধতা বলেন, তাহা প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক, নতুবা বর্ত্তমান জগতে প্রায় প্রত্যেক মানুষ বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে একটা না একটা অসুস্থতা ভোগ করিত না।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তদনুসারে বলিতে হয়, বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্র বর্ত্তমান বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা 'বিপর্য্যস্ত'* এবং তাহার দ্বারা মানুষের অথবা কোন জীবের কোনরূপ ইষ্ট সাধন করা ত দূরের কথা, পরোক্ষ ভাবে তাহা সর্ব্বদা আমাদের অমঙ্গল সাধন করিতেছে। মানুষের জ্ঞান সাধারণতঃ জটিল বিষয়গুলিকে সরল করিয়া দেয়, কিন্তু বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্র সরল বিষয়গুলিকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। তাহার প্রমাণ রসায়ন-শাস্ত্রের বিবিধ "এলিমেণ্টে"র (element) ও সঙ্কেতের (formulæ) সৃষ্টি। যে রসায়ন-শাস্ত্র পড়িয়া আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বিবিধ সম্মানযোগ্য উপাধি লাভ করেন, তাহা আমরা যতদূর জানি, মানুষের কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না। পরন্তু উহা ব্যবহার করিতে গেলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিপন্ন হইতে হয়। আমাদের এই কথা খুব সম্ভব সাবান, রং প্রভৃতির কারখানার চিন্তাশীল স্বত্বাধিকারিগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন। প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিলে মানুষ কেবল সারগর্ভ

* বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। (পাতঞ্জল ১ম অঃ ৮ম সূঃ)

কথা কহিয়া থাকে এবং তাহার পরিভাষা অল্প হয়। আর মানুষের প্রকৃত জ্ঞান কমিয়া যত বিকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় ততই তাহার পরিভাষা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে +—ভারতীয় পণ্ডিতের এই বাক্যের সজীব উদাহরণ বর্ত্তমান রসায়ন-শাস্ত্র।

বর্ত্তমান শরীর-গঠন-বিদ্যা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিদ্যার (Physiology) উদ্ভব হইয়াছে শব-ব্যবচ্ছেদ হইতে। মৃত মানুষের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে শরীর-গঠন বিদ্যার (Anatomy) উদ্ভব হয়, তাহা মৃত মানুষের শরীর-গঠন-বিদ্যা (Anatomy)। মৃত ও জীবিত মানুষের শরীরের গঠনে যে বহু পার্থক্য হয়, তাহা আমরা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি। মৃত মানুষের শরীর পরীক্ষা করিয়া জীবিত মানুষের শরীরের বিধানযন্ত্র কি হইতে পারে, ইহা অনুমান করিতে বসিলে ভ্রম হওয়া খুব স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও তাহাই। যদি কখনও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার হয় এবং আবার ভারতীয় ঋষির শরীর-গঠন-বিদ্যা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিদ্যা (Physiology) মানুষ জানিতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমান শরীর-গঠন-বিদ্যা ও শরীর বিধান-বিদ্যা যে কত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝা যাইবে। শরীরের চক্ষুরাদি কোন সূক্ষ্মভাগ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বর্ত্তমান বৈদ্যগণ যে তাহার আরোগ্য বিধান করিতে পারেন না, ইহা কি অসত্য? বেরীবেরী, রক্তের চাপ (Blood-pressure) প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ (terminology) রোগের নাম বলিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, অথচ তাহা যে শরীরযন্ত্রের কোন্ স্থানের কীদৃশ ব্যাধি, তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই, ইহা কি সহজেই অনুমান করা যায় না? যদি প্রকৃত শরীর-গঠন-বিদ্যা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিদ্যা (Physiology) বর্ত্তমান বৈদ্যগণের সম্পূর্ণ জানা থাকিত, তাহা হইলে কি ঐরূপ অর্থহীন পরিভাষার সৃষ্টি হইতে পারিত?

এইরূপ ভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যে কোন শাখার প্রতি লক্ষ্য করা যায়,তাহাতে আত্ম-প্রতারণার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি পরিভাষার সৃষ্টি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রায়শঃ কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বিকৃত বিজ্ঞান ও বিকৃত বৈজ্ঞানিকতাই জগতের সর্ব্বত্র শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে জনসাধারণের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়া থাকে।

বর্ত্তমান জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্ম্মক্ষম, বাস্তবতা-নিরাকাঙ্ক্ষেচ্ছু এবং লোক-রঞ্জনপ্রয়াসী। কিন্তু বিকৃত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার ফলে জমীর উৎপাদিকা-শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, কৃষকের পক্ষে লাভজনক কৃষিকার্য্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মানুষ প্রতিনিয়ত অসুস্থতা ও অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক কথায় এখন জনসাধারণ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই অসন্তুষ্টি অনুভব করিতে বাধ্য হন, অথচ সমস্ত কষ্টের কারণ যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকরূপী বিশেষজ্ঞগণ, তাঁহাদের অনুসন্ধান পান না। কারণ বিশেষজ্ঞগণ (experts) সর্ব্বদাই সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহাদের কার্য্য করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সম্মুখে থাকেন সাধারণতঃ শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং তাঁহাদের শাসনের উপর অথবা সাধারণের অসন্তুষ্টির দায়িত্ব আরোপিত হয়। ইহারই ফলে জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রতিনিয়ত গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণের পরিবর্ত্তন এবং নূতন নূতন কার্য্য-পদ্ধতির (scheme) উদ্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্রও লাঘব হইতেছে না।

প্রচলিত অর্থনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ভ্রান্তিই যে বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, ইহা দেখান আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার কার্য্য-তালিকা।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভ্রান্তিই যে এই জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহার কিয়দংশ "বঙ্গশ্রী"র ভাদ্র সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। আরও বিস্তৃত ভাবে উহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, "বিজ্ঞান" কাহাকে বলে, অথবা প্রকৃত বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি, তাহা প্রথমতঃ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বিজ্ঞান এই পদটীর মধ্যে আছে "ব্", "ই", "জ্", "ঞ্", "আ" এবং "ন" এই ছয়টী শব্দ।

+ কুমাংসোহপশব্দাঃ, অল্পীয়াংসঃ শব্দা ইতি। (পাণিনি—মহাভাষ্য)

ইহার মধ্যে "ব" শব্দের অর্থ "ত্বক"।

"ই" শব্দের অর্থ "গুণের বৃদ্ধি"।

"জ" শব্দের অর্থ "শ্রোত্র"।

"ঞ" শব্দের অর্থ "শব্দ"।

"আ" শব্দের অর্থ "বৃদ্ধি"।

"ন" শব্দের অর্থ "কর্ম্মক্ষমতার লোপ"।

কাযেই শব্দগত অর্থানুসারে, যাহার সহায়তায় কোন জীবের ত্বকের গুণের বৃদ্ধি হয় কত রকমের এবং কেন, অর্থাৎ বাহ্যিক গুণ কত রকমের হয় এবং কেন হয়, শ্রোত্র-মিলিত শব্দের বৃদ্ধি কি পদ্ধতিতে হইয়া থাকে এবং কেন হয় অর্থাৎ উপাদানের পরিবর্ত্তন হয় কেন ও তাহার পদ্ধতি কি এবং কর্ম্মক্ষমতার লোপ হয় কেন ইহা জানা যায়—তাহার নাম "বিজ্ঞান"।

"বিজ্ঞান" শব্দের উপরোক্ত শব্দগত অর্থটী সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়, যাহার সহায়তায় চর এবং অচর সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায়, তাহার নাম "বিজ্ঞান"।

ব্যুৎপত্তিগত (etymological) অর্থানুসারে, যাহার সহায়তায় চর এবং অচর বস্তুর প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানা যায়, তাহার নাম "বিজ্ঞান"। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য —তাহার উপাদান (ingredients), গুণ (qualities), এবং কর্ম্মক্ষমতা (mechanical activities)। জগতে যতকিছু চর এবং অচর বস্তু আছে, তাহাদের কতকগুলি উপাদান (ingredients), গুণ (qualities) এবং কর্ম্মক্ষমতা (mechanical activities) সমান (common)। আবার প্রত্যেক বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতার স্বকীয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (special features) আছে। প্রত্যেক বস্তুর আপন আপন বৈশিষ্ট্য সংঘটিত হয়, সমস্ত চর এবং অচর বস্তুর মধ্যে যে যে উপাদান (ingredients) সমান (common), তাহাদের বিভিন্ন রকমের মিশ্রণে। কাযেই চর এবং অচর সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে—প্রথমতঃ, তাহাদের কোন্ কোন্ উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতা সমান (common) ; দ্বিতীয়তঃ, এই সমান উপাদানগুলির মিশ্রণের নিয়ম কি কি ; তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে কি কি উপাদান, গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার উদ্ভব হয় এবং চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বস্তুর আপন আপন উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা জানিতে হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে সংক্ষেপতঃ "বিজ্ঞান" বলিতে বুঝায় সেই শাস্ত্র—যাহার সহায়তায় প্রত্যেক বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ জানা যায়।

উপরোক্ত শব্দগত অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মিলাইয়া "বিজ্ঞান" শব্দের সংজ্ঞা কি তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—"যাহার সহায়তায়—প্রথমতঃ, জগতের চর এবং অচর সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয় কেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কেন, তাহা জানা ও বুঝা যায়, তাহার নাম বিজ্ঞান"।

বৈজ্ঞানিক পাঠক, এখন একবার দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখুন, "বিজ্ঞান" এই পদটীর মধ্যে তাহার কত পরিষ্কার এবং বিস্তৃত সংজ্ঞা ভারতীয় ঋষি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এই সংজ্ঞা সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য বিভিন্ন গ্রন্থেও লিখিত রহিয়াছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সংঘটিত হয় কিরূপে এবং কেন, তাহাও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য ন্যূনপক্ষে গত ছয় হাজার বৎসর হইতে এই সমস্ত গ্রন্থ "বিকল্পিত" অর্থে প্রচারিত হইতেছে।

অন্যদিকে চাহিয়া দেখুন, প্রাচীন গ্রীক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, যে সমস্ত পুস্তক বিজ্ঞান-শাস্ত্রান্তর্গত বলিয়া প্রচারিত এবং যাহা অধ্যয়ন করিয়া বৈজ্ঞানিকতার অভিমান আমরা পোষণ করিয়া থাকি, তাহার একখানিতেও বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশসম্বন্ধীয় আমূল তথ্য ত দূরের কথা, "বিজ্ঞান" বলিতে কি বুঝায়, তাহার যথাযথ অর্থ পর্য্যন্ত পরিষ্কৃতভাবে অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। হিপোক্রেটিস (Hippocrates), অ্যারিষ্টটল (Aristotle), অ্যাকুইনস (Acquinos), রোজার বেকন (Roger Bacon), ডেকার্টে (Descartes), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), লক (Locke), লায়বনিৎস্ (Leibnitz), কাণ্ট (Kant), কোঁৎ (Comte), হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), আর্থর টম্সন (Arthur Thomson), গেডিস (Geddes), ফ্লিণ্ট (Flint), পিয়ারসন (Pearson) এবং হোয়াইটহেড (Whitehead) প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ

তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কেহ এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন কি? তাঁহাদের বিভিন্ন পুস্তকগুলি আমাদের সাধ্যমত তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কোন যথাযথ স্থির সিদ্ধান্তের উল্লেখ বাহির করিতে পারি নাই। আপনারা কেহ পারিয়াছেন কি?

আমাদের ইংরাজী অভিধানেও "Sceince" শব্দের কোন অর্থ পরিষ্কারভাবে লিখিত হয় নাই। অভিধানানুসারে Sceince শব্দের অর্থ systematised knowledge, অথবা শৃঙ্খলিত জ্ঞান। Knowledge অথবা "জ্ঞান" কি বস্তু, তাহার system অথবা শৃঙ্খলা বলিতে কি বুঝায় এবং এই শৃঙ্খলায় যে শৃঙ্খল (chain) রচিত হয়, তাহার আদি অথবা প্রারম্ভ কোথায় এবং শেষই বা কোথায়, তাহা না বলিয়া কেবল "শৃঙ্খলিত জ্ঞান" অথবা sytematised knowledge বলিলে কিছু পরিষ্কার বুঝা যায় কি?

যাঁহাদের কোন পুস্তকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগকে "বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক" বলিয়া অভিহিত করিলে অথবা তাঁহাদের পুস্তক পড়িয়া নিজদিগকে "বৈজ্ঞানিক" বলিয়া অভিমান পোষণ করিলে, "বৈজ্ঞানিক" শব্দের এবং শব্দ-শাস্ত্রের অপমান করা হয় না কি?

সাধারণ পাঠকগণ, "বিজ্ঞান কাহাকে বলে" অথবা "বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি"—এই প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আপনারা দেখিয়া রাখুন যে, আমাদের বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার (engineer), ডাক্তার (doctor), ফিজিসিষ্ট (physicist), কেমিষ্ট (chemist), ইকনমিষ্ট (economist) প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ "বিজ্ঞান কাহাকে বলে" তাহা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহাদের অনেকেই যে নিজদিগকে আমাদিগের মত জনসাধারণের তুলনায় উচ্চস্তরের মানুষ বলিয়া মনে করেন, তাহা তাঁহাদের প্রতি চাল-চলনে সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠে।

বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়

ভারতীয় ঋষিগণের নিয়মানুসারে বস্তুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়, প্রথমতঃ দুইটী। এক—যিনি বস্তুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহার স্বকীয় গঠন (self-construction & organisation) এবং দুই,—যে বস্তুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহার বিধিবদ্ধ ব্যবহার (treatment or dealing of the object)।

বিজ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য অর্জ্জন করিবার যে যন্ত্র মানুষ স্বভাবতঃ লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম "বুদ্ধি"। বুদ্ধি (intellect) কি বস্তু, মানুষের অবয়বের কোথায় তাহার সঞ্চয়-স্থান (storage), কি বিধিতে এবং কোন্ কোন্ নালীর (passage) মধ্য দিয়া তাহা সঞ্চারিত (distributed) হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মক্ষমতা (activities) সাধন করিয়া থাকে, কেন তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি (increase and decrease) সাধিত হয়—ইত্যাদি জানা থাকিলে মানুষ ইচ্ছামত স্বীয় বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং তখন মানুষের চক্ষুরাদি ধীন্দ্রিয় (instruments of understanding) ও বাগাদি কর্ম্মযোনি (instruments of work) মনুষ্যোচিত সামর্থ্য লাভ করে। চক্ষুরাদি ধীন্দ্রিয়গুলি ও বাগাদি কর্ম্মযোনিগুলির কতখানি সামর্থ্য (efficiency) হইলে যে, তাহাকে মনুষ্যোচিত (befitting a real man) বলা যায়, তাহা বর্ত্তমান কালে কোন উদাহরণ দ্বারা বুঝান সম্ভব নহে, কারণ ঐ সামর্থ্যের যে লক্ষণ ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা আজকালকার কোন মানুষের ভিতর দেখিতে পাই না। আজকালকার মানুষের ভিতর ঐ সামর্থ্য দেখা যায় না বলিয়া ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণগুলিকে "বিকল্পিত" (terminology) বলা যায় না, কারণ তাঁহাদের উপদিষ্ট পন্থানুসারে চলা-ফেরা করা অসাধ্য নহে এবং তদনুসারে চলা-ফেরা করিলে যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধিত হয়, তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

চক্ষুরাদি ধীন্দ্রিয়ের ও বাগাদি কর্ম্মযোনির মনুষ্যোচিত সামর্থ্য সাধিত হইলে দূরবীক্ষণপ্রভৃতি যন্ত্রের সহায়তা না লইয়া অত্যন্ত দূরে অবস্থিত বস্তুর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার সম্ভব হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় যথাযথ বিজ্ঞান নির্ভুলভাবে লাভ করা যায়।

যে বস্তুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে তাহার ব্যবহারের (treatment or dealing) বিধি অতি বিস্তৃত। সম্পূর্ণ গৌতম-সূত্রকে ঐ ব্যবহারের (treatment)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (summary or abstract) বলা যাইতে পারে। গৌতম-সূত্রকে অল্প কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কোন বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার ব্যবহার (treatment) করিবার বিধি (method) প্রধানতঃ তিনটী—

প্রথমতঃ—তাহার "জাতি" (genus ; species) নিদ্ধারণ করা।

দ্বিতীয়তঃ—তাহার বাস্তব "অবয়ব" (real anatomy) পর্য্যবেক্ষণ করা।

তৃতীয়তঃ—তাহার কোন্ কোন্ অংশ লক্ষ্য করিতে হইবে (প্রয়োজন) অথবা তাহার ভিতর অদৃষ্ট (unseen) কি কি থাকিতে পারে, তাহা স্থির করা।

স্বীয় চক্ষুরাদি ধীন্দ্রিয়গুলিকে এবং বাগাদি কর্ম্মযোনিগুলিকে যথাবিহিত (necessary) সামর্থ্যযুক্ত (efficient) করিয়া উপরোক্ত বিধিবদ্ধ উপায়ে কোন বস্তুর ব্যবহার (treatment) আরম্ভ করিলে যে, তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাযেই বলিতে হইবে, ভারতীয় ঋষিগণ প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিবার বাস্তব উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের অন্য কোন গ্রন্থ না পড়িয়া কেবল বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক গৌতম-সূত্র পড়িলে এবং তাহার অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলেই তাঁহারা যে প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা সম্ভব হয়। অবশ্য আজ ভাষার বিকৃতির ফলে তাঁহাদের সমস্ত কথাই "বিকল্পিত" (terminology) অর্থে প্রচারিত এবং তাঁহাদের প্রত্যেক গ্রন্থ একটা কাল্পনিক "মেটা-ফিজিক্‌সে"র (metaphysics) অংশীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া যদি একবার প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলি যে, আজ আমাদের প্রাণের দেবতা ঋষিগণের সৃষ্টি তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের দন্তের কচকচিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা হইলে কি আমাদের ব্রাহ্মণ-পাঠকগণের মধ্যে একজনেরও প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্য স্বীয় দম্ভ বিনাশ করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইবে না?

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায় অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণপ্রভৃতি যন্ত্র। যন্ত্রের সহায়তায় যে কোন বস্তু যথাযথভাবে দেখা সম্ভব হয় না এবং তদ্দ্বারা যে কোন প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্ভব হইতে পারে না, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে ও "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

ভারতীয় ঋষিগণের কথানুসারে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, মানুষের 'অর্থ'-সিদ্ধি করা। অর্থ বলিতে বুঝায় সেই বস্তু, যাহা মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য চাহিয়া থাকে। "অর্থ-সিদ্ধি" বলিতে বুঝায় সেই ব্যবস্থা এবং জ্ঞান, যাহার সহায়তায় মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা চাহিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটী পাইতে পারে।

মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা চাহিয়া থাকে, উহা যাহাতে সে পাইতে পারে, তাহা শিখান অথবা তাহার ব্যবস্থা করা কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইলে, সেই বিজ্ঞান যে প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। কাযেই ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানকে মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বলা যাইতে পারে।

মানুষ কি কি চাহিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার উপকারী ও কোন্‌টী অপকারী, ইহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

তাহার প্রত্যেকটী উল্লেখযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে।

আমি আপনাদিগকে "বঙ্গশ্রী"র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রবন্ধের ১২৯ পৃঃ হইতে ১৩৮ পৃঃ পর্য্যন্ত পড়িলে ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং ঐ ঐ বিষয় যে মানুষের অর্থসিদ্ধির সহায়ক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের অর্থসিদ্ধি কি করিয়া হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ—প্রথমতঃ মানুষ কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতি কাহাকে বলে, তৃতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতি কত রকমের হয়, চতুর্থতঃ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কত রকমের বিভিন্ন অভিলাসযুক্ত হয়, পঞ্চমতঃ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কত রকমের বিভিন্ন কার্য্যক্ষমতাযুক্ত

হয়, ষষ্ঠতঃ বিভিন্ন কার্য্যক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ কি করিয়া নিজ নিজ ইষ্টসাধন করিতে পারে, সপ্তমতঃ আদর্শ মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং কি উপায়ে ঐ আদর্শের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, ইত্যাদি কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রত্যেক গ্রন্থকে তাঁহাদের অর্থনীতির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। যদি কেহ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে ভারতীয় ঋষির "অর্থনীতি" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বহুস্থলে প্রশংসনীয় হইলেও বিবিধ প্রকারের ভ্রমে পরিপূর্ণ এবং তাহা ভারতীয় ঋষির মূল অর্থশাস্ত্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য দুইটী; যথা— (১) বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে সমান (common) কি তাহা বাহির করা এবং (২) সত্যের জন্য সত্যের আবিষ্কার করা। তাঁহাদের কথাগুলি শুনিতে একরূপ মন্দ লাগে না, কিন্তু তাঁহারা কি বলেন, তাহা তাঁহাদের কোন পুস্তক হইতে অথবা কাহারও বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না।

বিভিন্ন বস্তুর 'প্রকৃতি'র মধ্যে সমান কি, তাহার আবিষ্কার করা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কোন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থে 'প্রকৃতি' কাহাকে বলে অথবা 'প্রকৃতি' কত রকমের হয়, তাহার কোন তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'প্রকৃতি' কাহাকে বলে, অথবা 'প্রকৃতি' কত রকমের হয়, তাহা না জানা থাকিলে বিভিন্ন বস্তুর 'প্রকৃতি'র মধ্যে সমান কি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব কি?

যে বস্তুর সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে, সেই বস্তুটী কাহার নাম অথবা তাহার সংজ্ঞা কি, তাহা না জানা থাকিলে, তাহার সম্বন্ধীয় কোন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কি? যাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে, সেই জিনিষটী কাহার নাম অথবা উহার সংজ্ঞা কি, তাহা না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করা কি কর্ণধারবিহীন নৌকা-চালনার সদৃশ নহে? কর্ণধার-বিহীন নৌকা পরিচালনা করা আর উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য করা কি এক কথা নহে? কর্ণধার ব্যতীত নৌকা পরিচালনা করিলে কখনও গন্তব্য স্থানে পৌঁছান সম্ভব হয় কি এবং তাহাতে কেবল "ঘুরপাক" খাইতে হয় না কি?

"সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করা"—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় উক্তি, অথচ সত্য কাহাকে বলে, তাহার কোন সংজ্ঞা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "সত্য" কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃত তথ্য যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিবে যে, "সত্যের জন্য তথ্য" এইরূপ বাক্য হইতে পারে বটে, কিন্তু "সত্যের জন্য সত্য" এইরূপ কোন অর্থসম্পন্ন বাক্য হয় না। ঐ জাতীয় বাক্য আত্ম-প্রতারণার নামান্তর মাত্র।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা দেখা গেল তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য করিতেছেন। উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যের কোন পদ্ধতি (method) থাকিতে পারে না এবং পদ্ধতিবিহীন (un-methodial) কার্য্য কখনও মানুষের অর্থসিদ্ধির সহায়ক হয় না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের কার্য্য খুব শৃঙ্খলিত পদ্ধতিযুক্ত মনে করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। নিউটন অথবা আইনষ্টাইন প্রভৃতির প্রচারিত কোন তথ্য সম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্তিশূন্য নহে। আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির সহায়তা গ্রহণ না করিলে মানুষের পক্ষে শৃঙ্খলিত জীবন নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের এই ধারণা সত্য নহে। পরন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান মনুষ্যজাতিকে ক্রমশঃ অকালমৃত্যু, অস্বাস্থ্য এবং অন্ন-বস্ত্রহীনতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। "বঙ্গশ্রী"র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক"শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

বিজ্ঞানের স্বরূপ

কোন্ বিজ্ঞান প্রকৃত অথবা বিকৃত তাহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞানের "স্বরূপ" দেখা। যে বিজ্ঞানের ফলে মানুষের সর্ব্ব রকমের অর্থসিদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে **প্রকৃত বিজ্ঞান** বলিতে হইবে, আর যাহার ফলে মানুষ

বিভ্রান্ত হইয়া নানা রকমের দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে বিকৃত বিজ্ঞান অথবা কুজ্ঞান বলিতে হইবে।

ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানের ফলে এক সময়ে সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষের অর্থসিদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমাদের গত সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের "জগতের ইতিহাসে মানুষের জ্ঞান, কুজ্ঞান ও অজ্ঞানের পরিচয়"শীর্ষক অংশ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কাযেই ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ দেখা গিয়াছে এবং তাহার পরে সারা জগতের সর্ব্বত্র বেকার, অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু এবং অন্নকষ্ট দেখা যাইতেছে। কাযেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ফলে মানুষের ভিতর নানারকম দুঃখ-যন্ত্রণার উদ্ভব হইয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে এবং তদনুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে আমরা "কুজ্ঞান" বলিতে বাধ্য।

অর্থ ও ধন-বিজ্ঞান

সংস্কৃত ভাষার শব্দগত অর্থানুসারে—যাহার সহায়তায় মানুষের "আদির আদি"কে উপলব্ধি করিবার, এবং যে যে বস্তুর দ্বারা মানুষের পরমায়ু (longevity) অটুট থাকিতে পারে তাহা উৎপন্ন করিবার, এবং যে যে ব্যবস্থায় মানুষ নীরোগ থাকিতে পারে সেই সমস্ত ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পারা যায় তাহার জ্ঞান লাভ করিবার উপায় জানা যায়, তাহার নাম "অর্থ-শাস্ত্র"। ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষার শব্দগত অর্থানুসারে—যাহার দ্বারা মানুষের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধিত হয় এবং মানুষ কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে কর্ম্ম-বিরতি অথবা বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারে, তাহার নাম "ধন"। ঐ ভাষার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থানুসারে যাহা জমী হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারও নাম "ধন"।

আমাদের ঋষিদিগের কথানুসারে মানুষের অর্থ লাভ করিবার মুখ্য উপায় তিনটী :—

(১) জমীর উর্ব্বরতা রক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা ;

(২) বায়ুমণ্ডলের ও জলমণ্ডলের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা ;

(৩) মানুষ যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সম্পূর্ণ ও অভ্রান্তভাবে তৎসম্বন্ধে উন্নতি-কামী (desirous of improvement) হয়, তাহার ব্যবস্থা।

ভারতীয় ঋষিগণের "অর্থ-শাস্ত্রে" যে ঐ তিনটী ব্যবস্থার অনুসন্ধান আছে, তাহা ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা এবং ঋষি-গণের গ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঋষিগণ "লক্ষ্মী"কে ধনের দেবী বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের "লক্ষ্মী"র আহ্বানের মন্ত্র "ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী * *" ইত্যাদি। এই আহ্বান-মন্ত্রটীর অর্থ অতি বিস্তৃত, কারণ ইহার প্রারম্ভেই "ওঁ" শব্দটী আছে এবং "ওঁ" শব্দটীর দ্বারা যে যে বস্তু, গুণ ও কার্য্য বুঝায়, তাহা সংস্কৃত ভাষার বীজ-আকারের সহায়তায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বীজ-আকারের সহায়তা লইলে ছোট ছোট এক একটী মিশ্রিত শব্দের দ্বারা বহু বস্তু, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতা প্রকাশ করা যায় এবং ঐ বস্তু, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতাগুলি প্রায়শঃ সাধারণ বুদ্ধির (common sense) অগোচর এবং তাহাতে বস্তুর "অব্যক্তাংশের" (unseen and abstract ideas) প্রকাশ হইয়া থাকে। এই "ওঁ" শব্দটীর যথাযথ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

ঐ মন্ত্রের শেষাংশ—"...লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী..."ইহার অর্থ...হে লক্ষ্মি, ধান্যই তোমার রূপ এবং তুমিই জীবের জীবন দান করিয়া থাক।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ঋষিদিগের কথানুসারে "ধান্য"কে প্রধান "ধন" বলিয়া বুঝিতে হয়।

বস্তুতঃ পক্ষে ভারতীয় ঋষির অর্থ-শাস্ত্রের প্রথম লক্ষ্য, মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয় লক্ষ্য, মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয় লক্ষ্য, মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা।

উপরোক্ত তিনটী লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া ছয় হাজার বৎসর আগে মানুষের ইতিহাস বিভিন্ন রকমের হইয়াছিল এবং এই তিনটী লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই গত ছয় হাজার বৎসর হইতে ভারতবাসীর তথাকথিত "ভদ্র সম্প্রদায়" প্রকৃত মনুষ্য নামের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়

কিছুদিন আগেও প্রায় সমগ্র জগতের অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করিতে পারিয়া আসিতেছিলেন এবং ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে অনন্যসাধারণ আর্থিক-স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হইত।

ঋষিদিগের সমসাময়িক যুগেতে জমীর উর্ব্বরতা বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশগুণ ছিল এবং মানুষের সংখ্যা অন্ততঃ পক্ষে পঁচিশ গুণ ছিল, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

বর্ত্তমান অর্থনীতি-শাস্ত্রের সংজ্ঞা কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে "বঙ্গশ্রী"তে যে আয়তনের পৃষ্ঠা রহিয়াছে, তাহার অন্ততঃপক্ষে একশত পাতা পড়িতে হইবে। অথচ তাহা হইতে অর্থ-শাস্ত্র বলিতে যে কি বুঝায় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহার কোন প্রণালীবদ্ধ (methodical), প্রয়োগযোগ্য (capable of application in the practical field) ধারণা লাভ করা যায় না। অবশ্য আমরা মার্শাল, পেগু, জশিয়া ষ্টাম্প প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তক সাধ্যমত মনোনিবেশ সহকারে পড়িয়াও বর্ত্তমান অর্থনীতির কি সংজ্ঞা এবং তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারি নাই এবং অর্থনৈতিকগণের দ্বারা জগতের বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী হাহাকারের কোন প্রতীকার হইতেছে না, ইহা দেখিতেছি বলিয়াই উপরোক্ত উপসংহারে উপনীত হইয়াছি। আমরা বাস্তব জগতে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, ক্রমশঃই মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং আমাদের পার্লিয়ামেণ্টের অর্থসচিব মিঃ নেভিল চেম্বার্লেন যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহা বাস্তব অবস্থার বিরুদ্ধ। স্যার জশিয়া ষ্টাম্প যে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত কোন গ্রন্থে ইংলণ্ডকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমি কখনও ইংলণ্ডে যাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইংলণ্ডকে আমার নিজের দেশের একটী অংশ বলিয়া মনে করি। কারণ ইংলণ্ড বিপন্ন হইলে ভারতবর্ষও বিপন্ন হয়, ইহা আমার বিশ্বাস। ইংলণ্ড যে বিপদের দিকে ক্রমশঃ আগুয়ান হইতেছে, তাহার গুরুত্ব বুঝিবার মত মস্তিষ্কসম্পন্ন একটী লোকও বর্ত্তমান ইংলণ্ডে আছেন, ইহা মনে করিবার যৌক্তিকতা কাহারও কার্য্য হইতে খুঁজিয়া পাই না। আমাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী বলডউইন যে লোক হিসাবে খুব ভাল তাহা তাঁহার বিবিধ কার্য্য হইতে বুঝা যায় বটে, কিন্তু তাহার কোন কার্য্যে সময়োপযোগী চিন্তাশীলতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমশঃ এইরূপ অবনত হইতে পারিত কি? পার্লিয়ামেণ্টের মন্ত্রী সভায় যে কয়জন লোকের কার্য্যতৎপরতার (activity) পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্যার স্যামুয়েল হোরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহারও কোন কার্য্যে কোন দূরদর্শিতার (far-sighted-ness) পরিচয় পাওয়া যায় কি? দূরদর্শিতা অথবা দেশপ্রাণতা (patriotism) থাকিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় ভারতবর্ষের দেশ-প্রেমিক নামে প্রসিদ্ধ (known as patriots) কয়েকটী অভিনেতাকে (players) লইয়া ভারত-শাসনের পুনর্গঠন (re-organisation of Indian administration) নামক একটী প্রহসন (farce) তিনি এতদিন ধরিয়া চালাইতে পারিতেন কি? অবশ্য তাঁহার মতানুসারে, একটা প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তিনি যে মনে করেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়, কিন্তু ঐ কার্য্যদ্বারা ভারতবর্ষীয় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের ব্যবসার অবনতি রোধ (arrest of the fall), কৃষকগণের কৃষির অবনতির রোধ সংঘটিত না হইলে অথবা তাহার আশা করিতে না পারিলে, আমরা উহাকে যুক্তি অনুসারে প্রহসন (farce) বলিতে পারি না কি?

এইরূপে ইংলণ্ডের, ইয়োরোপের এবং আমেরিকার যে কোন মন্ত্রী-সভার দিকে লক্ষ্য করা যাক না কেন, প্রায় সর্ব্বত্রই মন্ত্রীগণের দূরদর্শিতার অভাব এবং মস্তিষ্কহীনতার পরিচয় প্রস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মানুষ হিসাবে অলস এবং মন্দ বলা যায় না।

সর্ব্বত্র রাজ্য-পরিচালকগণের মধ্যে এই যে দূরদর্শিতার অভাব হইয়াছে, তাহার কারণ—বর্ত্তমান অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বিকৃত জ্ঞান।

বর্ত্তমান অর্থনীতি অনুসারে "ধন" বলিতে বুঝায় সোনা, রূপা ও তামা প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা ও কাগজ-নির্ম্মিত নোট।

বর্ত্তমান অর্থনীতি অনুসারে দেশের "ধন" (wealth) বাড়াইবার উপায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার করা।

বর্ত্তমান অর্থনীতির "ধন" (wealth) ও ধনবৃদ্ধি করিবার উপায় (means of increasing wealth) এই দুইটাই বিকৃত। এই দুইটা বিকৃত ও অস্বাভাবিক বস্তুকে ধনবিজ্ঞান-রূপে বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাদিগকে ফলবান করিতে চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান জগতের রাজ্য-পরিচালক মন্ত্রীগণ বাধ্য হইয়া অতি-মানুষের (superman) মত বিনিদ্র রজনী (sleepless night) যাপন করিয়াও নিজ নিজ রাজ্যের অর্থাভাবের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

জগতে জমীর উর্ব্বরতার ও বস্ত্রের ন্যূনতাবশতঃ যদি খাদ্যের উপযোগী শস্যের এবং বস্ত্র প্রস্তুত করিবার মত তূলা, রেশম ও পশমের প্রকৃত অভাব হয়, তাহা হইলে রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কাগজের মুদ্রা থাকিলেও কি অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রাগুলিকে প্রকৃত ধন (real wealth) বলা যায় কি?

মানুষ ধন উপার্জ্জন করে জীবন ধারণ করিবার জন্য। যুদ্ধে মানুষের জীবন নষ্ট করে। কাজেই মানুষের জীবন ধারণ করিবার জন্য এমন কোন উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত নহে, যাহার ফলে যুদ্ধের উদ্ভব হইতে পারে।

জাতীয় ধনবৃদ্ধির জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে না কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর জগতের ইতিহাসে যে কয়টী যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীরই কারণ কি মুখ্যভাবে(directly) অথবা গৌণভাবে(in-(directly) বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা (trade rivalry) নহে?

কাযেই বর্ত্তমান অর্থনীতির মূল কথা যে "ধন ও ধন-উপার্জ্জনের বিধি", তাহাই ভ্রমাত্মক।

এই ভ্রমাত্মক কথাগুলি বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলে অর্থনৈতিকগণের মস্তিষ্ক এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা এখন আর কোন জিনিষেরই বাস্তবতা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে চাহেন না।

অর্থনৈতিকগণের ধারণা যে, বর্ত্তমানে কৃষিদ্রব্য প্রয়োজনাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে এবং অধিকতর পরিমাণের কৃষিদ্রব্য বিক্রয় করিবার উপযুক্ত বাজার কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অল্প কথায় আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে হইলে, আমরা মাত্র প্রশ্ন করিব যে, কোন দেশে কোন-রূপ খাদ্যশস্য সমুদ্র অথবা নদীগর্ভে প্রক্ষেপ (throw) করিবার অথবা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিবার কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? এক বৎসরের খাদ্য-শস্য অথবা বস্ত্র প্রস্তুত করিবার তূলা পরবর্ত্তী বৎসরে বহন করিয়া লইবার (carry over) কোন পরিচয় কোথায়ও পাওয়া যায় কি? যদি উদ্বৃত্ত শস্যগুলি নদীগর্ভে প্রক্ষেপ করিবার অথবা দহন করিয়া নষ্ট করিবার অথবা এক বৎসরের উৎপন্ন শস্য পর বৎসরে বহন করিবার বাস্তব দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, জমী হইতে যে যে খাদ্য ও ব্যবহার্য্য শস্যের উৎপত্তি প্রতি বৎসর হইতেছে, তাহার সমস্তই মানুষ ব্যবহার করিতে পারিতেছে? এবং ইহার পর যদি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই জনসাধারণের ভিতর অন্ন ও বস্ত্রের অভাব আছে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে না যে, জমীর উৎপন্ন খাদ্য ও ব্যবহার্য্য শস্যের পরিমাণ কম হইতেছে? ধন-বিতরণে (distribution of wealth) বিশৃঙ্খলা (irregularity) থাকিলে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি কম হইলেও কি তাহার ক্রয় বিক্রয়ের অসুবিধা হইতে পারে না? কোন Statistics-এ যদি ইহার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, ঐ Statistics প্রণয়নে বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের ব্যবহার হয় নাই?

বর্ত্তমান অর্থনীতি আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে, ইহা যে কোনও বিজ্ঞানই নয়, পরন্তু ইহা এত বিকৃত যে, অতি-মানুষগুলির মস্তিষ্কের ক্লান্তি পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা সাধিত হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

আইন-বিজ্ঞান (Jurisprudence)

সংস্কৃত ভাষায় আইন-বিজ্ঞানের নাম "স্মৃতি"। ঐ ভাষার শব্দগত অর্থানুসারে যে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ তামসিক অথবা রাজসিক হইলে, সে যে রাজসিক ও তামসিক হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় এবং তাহাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করা

সত্যমপ্রিয়ম্

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আজ কোন মিথ্যা নয়। স্বরঞ্জিত কল্পনার বাণী!
দীন শিল্পে দাও ছুটি আজি তার বড় ক্লান্তি মানি'।
সত্যের কিরণস্পর্শে প্রভাতের কুহেলির মত
সর্ব্ব অপরাধগ্লানি আজি তার হোক্ অপগত।

ভয়ে আর পরাজয়ে এ জীবন ধূলিবিলুণ্ঠিত
আজও পঞ্চাশিকাপারে, পলে পলে করিয়া কুণ্ঠিত
মনের মনুষ্যধর্ম্মে। কোনমতে কেটে চলে দিন—
অবিচারে অত্যাচারে অভাবে ও অভিযোগে হীন;
—তবু এই জীবনেরে প্রাণপণে বেসেছিনু ভালো,
মমতার মুগ্ধনেত্রে কালোর কিনারে হেরি' আলো।

প্রেয়সী শ্রেয়সী নহে—রূপে গুণে অবরুদ্ধ সীমা;
মহত্বের মহাকাশে দিক্‌বদ্ধ মনের মহিমা।
অন্তরের মধুস্রবা স্বল্পতোয়া—নহে সে পাথার,
প্রীতির পীযূষধারে ভরিয়া তুলে না চারিধার।
আপন প্রাণের গণ্ডী ত্যাগের কৃচ্ছ্রতা আর ক্লেশে
বাঁধিয়া রেখেছে শুধু হেসে কেঁদে সেধে ভালোবেসে
নিতান্ত নিজের জনে। কোন খেদ নাহি তায় মনে।

বন্ধুরা দেয় না ধরা হৃদয়ের নিবিড় বন্ধনে
জীবনের দুঃখদিনে;—আপনার ভারে অবনত—
কে চাহে কাহার পানে কর্ম্মস্রোতে নিয়ত বিব্রত!
মিষ্টভাষে মিষ্টহাসে দুদণ্ডের অভিনয়শেষে
নিজপথে চলি' যায় হেথা হ'তে আপনার দেশে।

সখা ভাবি' যার কাছে জীবনের মন্ত্র নিনু যাচি',
ভেবেছিনু ইষ্টপথে কাটাইব যার কাছাকাছি
এবারের কর্ম্মপথে;—চেয়ে দেখি প্রয়োজনকালে,
আপনারে জড়াইয়া আত্মঘাতী তুচ্ছতার জালে,
নিজেই ভুলিয়া তার চিরকাম্য রসের সন্ধান,
মানসের রাজহংস পল্বলে করিছে পঙ্কস্নান।
হায় অদৃষ্টের লেখা! চৈতন্যের প্রেমমন্ত্র আজি
নেড়ানেড়ী-গোপীসঙ্গে দেহতত্ত্বে উঠে বুঝি বাজি!

কোথা সে দেশাত্মবোধ কমলার সেবার সম্পদ!
কোথায় পৌরুষধর্ম্ম সাধনার রক্তকোকনদ—
প্রাণান্ত ত্যাগের অর্ঘ্য মমত্বের মকরন্দে মাখা?
অপমিত নাকি স্বর্গ? দিগন্তে দেখি যে শুধু আঁকা
রক্তাম্বরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষরক্ত লয়ে
খেলিছে মৃত্যুর হোলি সর্ব্বনাশা স্বার্থের কলহে!

অন্ধকার নেমে আসে মন্দ পদে আবরি' আকাশ;
পূতিগন্ধ বহে বায়; চারিদিকে উঠে নাভিশ্বাস—
আর্ত্তের অন্তিম চেষ্টা। আরও কিছু দেখিবার আগে,
হে বিধাতা! যেন তব মরণের হিমস্পর্শ লাগে
এ শীর্ণ জীবনদীপে। কোন সাধ নাহি আর মনে,
কেটে দাও এ বন্ধন হে রুদ্র, তোমার পরশনে।

তবু এই জীবনেরে প্রাণপণে বেসেছিনু ভালো,
ফিরে বলি আরবার:—মুগ্ধনেত্রে হেরেছিনু আলো।
কালের জীবনপটে। ভূর্ভুবস্ব তৎসবিতুর্জ্ঞানে
বরেণ্য সে ভর্গদেবে ডেকেছিনু ধী-এর সন্ধানে।
মিথ্যা হ'ল সে গায়ত্রী—শূদ্রের নাহিক অধিকার—
গোষ্পদে মিলিবে কোথা অসীমের শক্তি-পারাবার।
হায় রে এ ক্ষুদ্র চিত্ত! হায় তুচ্ছ জীবনের গতি!
হায় অন্ধ ভবিষ্যৎ! হায় 'বলহীন'-এর নিয়তি!

প্রাচীন ভারতে রঙ্গসজ্জা
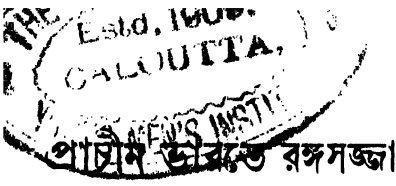
—শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

অভিনয় মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ—(১) আঙ্গিক, (২) বাচিক (৩) আহার্য্য ও (৪) সাত্বিক[১]। আঙ্গিক অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গশ্রী"তে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আহার্য্যাভিনয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

'আহার্য্য' শব্দটির অর্থ আহরণীয়—আহরণের যোগ্য। যাহা স্বাভাবিক নহে—কৃত্রিম—নানাস্থান হইতে বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিতে হয়—সেই বেশভূষাবিধানের নামই আহার্য্যাভিনয়।

অনুকরণযোগ্য নায়ক-নায়িকাদির অনুকরণে অনুকারক নটনটী কর্ত্তৃক রত্নহার, কেয়ূর, কিরীট প্রভৃতি ভূষণ ও নানাবিধ বেশাদির ধারণ এই আহার্য্যাভিনয়ের অন্তর্গত। অস্ত্রশস্ত্র, রথ-পতাকা, অশ্ব-হস্তী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নাট্যোপকরণকেই আহার্য্যাভিনয়ের মধ্যে ফেলা চলে। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন —আহার্য্যাভিনয় বলিতে বুঝায় নেপথ্যবিধান (নেপথ্য=বেশভূষা)। আর এই নেপথ্যবিধানের উপরই নাট্যের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। অতএব, নাট্যের শুভাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

নেপথ্য চতুর্ব্বিধ—(১) পুস্ত, (২) অলঙ্কার, (৩) অঙ্গরচনা ও (৪) সঞ্জীব।

নাট্যাভিনয়ে শৈল, যান, বিমান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, ধ্বজ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাদিগের নাম দেওয়া হয় "পুস্ত"। এই পুস্ত আবার ত্রিবিধ—(১) সন্ধিম, (২) ব্যাজিম ও (৩) চেষ্টিম। রূপ ও প্রমাণভেদে ত্রিবিধ পুস্তের অনন্ত ভেদ। কিলিঞ্চ[২], বস্ত্র, চর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা যে সকল নাট্যোপযোগী কৃত্রিম পদার্থ নির্ম্মিত হয়, সেই সকলের নাম সন্ধিম। আর যন্ত্রের দ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হয়, তাহাই ব্যাজিম। পক্ষান্তরে চেষ্টা অর্থাৎ শরীরব্যাপার দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহার নাম চেষ্টিম[৩]।

অলঙ্কার বলিতে বুঝায়, অঙ্গ ও উপাঙ্গে মাল্য আভরণ ও বস্ত্রাদির সংযোগ। ইহাদের মধ্যে মাল্য পঞ্চবিধ—(১) চেষ্টিত, (২) বিতত, (৩) সঙ্ঘাত্য, (৪) গ্রন্থিম ও (৫) প্রলম্বিত। চেষ্টিত বলিতে বুঝায় চঞ্চল, অতএব সূক্ষ্ম হাল্‌কা। বিতত—বিশেষ বিস্তৃত—খুব চওড়া। সঙ্ঘাত্য—নানাবিধ পুষ্পাদিযোগে গ্রথিত। গ্রন্থিম—গ্রন্থিযুক্ত। প্রলম্বিত বা প্রালম্বক—বহু দীর্ঘ—লম্বমান। চেষ্টিত 'একহারা' মালা, ও বিতত 'গোড়ে' মালা বলিয়া বোধ হয়। সঙ্ঘাত্য—বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প বা রত্নাদির দ্বারা গ্রথিত।

দেহের আভরণ চতুর্ব্বিধ—(১) আবেধ্য, (২) বন্ধনীয়, (৩) প্রক্ষেপ্য ও (৪) আরোপক। আবেধ্য—কুণ্ডলাদি কর্ণভূষণ। বন্ধনীয়—শ্রোণিসূত্র, অঙ্গদ, মুক্তাজাল প্রভৃতি। প্রক্ষেপ্য —নূপুর, বস্ত্রাভরণ ইত্যাদি। আরোপ্য—স্বর্ণসূত্র, নানাবিধ হার ইত্যাদি।

দেশভেদে, জাতিভেদে ও স্ত্রী-পুরুষভেদে ভূষণের ভেদ নাট্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের উপযোগী ভূষণের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল[৪]।

শিরোভূষণ—চূড়ামণি ও মুকুট। কর্ণাভরণ—কুণ্ডল, মোচক ও কীল। কণ্ঠভূষণ—মুক্তাবলী, হর্ষক, সৎসূত্র (স্বর্ণসূত্র?) প্রভৃতি। অঙ্গুলীবিভূষণ—কটক, অঙ্গুলিমুদ্রা। হস্তভূষণ—হস্তবী ও বলয়। মণিবন্ধভূষণ—রুচিক ও উচ্চিতিক। কূর্পরের (কনুইএর) উপরে কেয়ূর ও অঙ্গদ ধারণীয়। বক্ষোভূষণ—ত্রিরস (ত্রিসর?), হার। বিলম্বিত

১। "প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ পৃঃ ৫৫৩। ২। কিলিঞ্চ, কিলিঞ্জ, কিলিঞ্জক—(ক) মাদুর, দরমা, চ্যাটাই, (খ) তৃণাদি নির্ম্মিত পরদা, চিক বা দরমার বেড়া, (গ) তৃণাদি নির্ম্মিত রজ্জু, (ঘ) সূক্ষ্মদারু বা কাঠের পাতলা তক্তা।

৩। এই অংশটির অর্থ খুব পরিষ্কার নহে; এরূপ অর্থও সম্ভব—যাহা চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত- চঞ্চল, তাহাই চেষ্টিম।

৪। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সকল আভরণের অধিকাংশই সম্প্রদায় বিচ্ছেদের ফলে আমাদিগের অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে সুধী ব্যক্তিগণ যদি গবেষণা করেন, তবে অনেক লুপ্তপ্রায় তথ্যের পুনরুদ্ধার ঘটিতে পারে।

মৌক্তিক হার পুষ্পমাল্য, রত্নমালা প্রভৃতি সর্ব্বদেহের ভূষণ। কটিভূষণ—তরল ও সূত্রক। ইহাই হইল পুরুষের ব্যবহার্য্য আভরণের তালিকা। দেবতা, নৃপতি ও নারীসাধারণের ধারণযোগ্য ভূষণের তালিকা আরও দীর্ঘ। শিরোভূষণ—শিখাপাশ, শিখাজাল, পিণ্ডপাত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষক, বিচিত্র, শীর্ষজালক, কুণ্ডল, শিখিপাত্র, রোচক, বেণীকঞ্জ (কঞ্জ=পদ্ম)। ললাটের তিলকে নানাবিধ শিল্পকার্য্য থাকিবে। ভ্রূকক্ষার উপর কুসুমানুকারী গুচ্ছ নিবেশ করিতে হইবে। কর্ণভূষণ—কর্ণিকা, কর্ণবলয় (কাণবালা), পত্রকর্ণিকা, আবেষ্টিত, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎকীলক, নানারূপ চিত্রবিচিত্র রত্নপাত্র, কর্ণপূর ইত্যাদি। গণ্ডভূষণ—তিলক ও পত্ররেখা (অলকা-তিলকা)। বক্ষোভূষণ—ত্রিবেণী ও বিচিত্র শিল্পযুক্ত হার। নেত্রের অঞ্জন ও অধররঞ্জন ছিল একান্ত প্রয়োজন। সম্মুখের অন্ততঃ চারিটি দন্তকেও রঞ্জিত করিতে হইত; বিগত যুগের দাঁতে মিশি দেওয়া বোধ হয় ইহারই অপভ্রংশ। ইহার নাম ছিল দশনরাগ বা দন্তরাগ (কা ম সূ ত্র দ্রষ্টব্য)। উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ বা বর্ণান্তর দ্বারা দন্তরাগ নিষ্পাদিত হইত। মনোহারিণী সুন্দরীগণের দন্ত মুক্তার মত সিতশোভন বর্ণে অথবা পদ্মপলাশের মত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করার প্রথা ছিল। নবোদ্গত পল্লবের মত আরক্তিম অধরপল্লবের মধ্য হইতে শ্বেত-প্রস্তরের মত দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভা বিশেষ শোভা বিস্তার করিত। ইহার উপর নারীগণের সবিভ্রম দৃষ্টিপাত এক অপূর্ব্ব বিলাসের সৃষ্টি করিত।[৫] কণ্ঠভূষণ—মুক্তাবলী, ব্যালপঙ্‌ক্তি, মঞ্জরী, রত্নমালিকা, রত্নাবলী, ও সূত্র (হেমসূত্র)। ইহা ছাড়া দ্বিরস, ত্রিরস, চতুরসক শৃঙ্খলিকাও কণ্ঠভূষারূপে ব্যবহৃত হইত। স্তনভূষণ—মণিজালবন্ধন। বাহুমূলভূষণ—অঙ্গদ ও বলয়। হস্তভূষণ—বর্জ্জুর, স্বেচ্ছিতীক। অঙ্গুলীভূষণ—কণ্টক, কলশাখা, হস্তপত্র, সুপূরক ও মুদ্রাঙ্গুলীয়ক (অর্থাৎ অঙ্গুলিমুদ্রা)। শ্রোণীভূষণ—মুক্তাজালযুক্ত কাঞ্চী, কুলক, মেখলা, রশনা ও কলাপ। কাঞ্চী একযষ্টি অর্থাৎ একহারা। মেখলা—অষ্টযষ্টি অর্থাৎ আটনরী। রশনা—ষোড়শযষ্টি। আর কলাপ—পঞ্চবিংশতি যষ্টি। দেবতা, নৃপতি ও নারীগণের মুক্তাহার সাধারণতঃ বত্রিশ, চৌষট্টি অথবা একশ' আট নরী হইত। গুল্‌ফভূষণ—নূপুর, কিঙ্কিণী, রত্নজালক ও সজ্যোষকটক। জঙ্ঘাভূষণ—পাদপত্র। পাদাঙ্গুলিভূষণ—অঙ্গুলীয়ক। পাদাঙ্গুষ্ঠভূষণ—তিলক। ইহাই পাদাভরণের সম্পূর্ণ তালিকা। ইহা ছাড়া পাদতলে ও পদপল্লবপ্রান্তে নানা আকারের (ভক্তি) অলক্তকরাগ রচনা করা হইত। অশোকের নবপল্লবরাজির মত ঈষৎ অরুণবর্ণ অথবা লাক্ষার স্বাভাবিক রঙ হইত এই অলক্তকের। এইরূপে নারীর কেশ হইতে পাদনখ পর্য্যন্ত ভাব, রস ও অবস্থানুযায়ী অলঙ্কার নিবেশ করা হইত।[৬] কিন্তু এই প্রসঙ্গে মহর্ষি একটি বিশেষ মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন। নিজের ইচ্ছামত স্বর্ণ, মুক্তা বা মণি দ্বারা নাট্যের ভূষণ নির্ম্মাণ করা অনুচিত। শুধু তাহাই নহে, নাট্যপ্রয়োগে ভূষণের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন; কারণ বহু ভূষণ ধারণে নটনটীর শারীরিক খেদ উৎপন্ন হয়, আর সে জন্য তাঁহারা আঙ্গিক অভিনয়বিমুখ হইয়া পড়েন। কখন কখন অতিরিক্ত গুরু আভরণভারে অবসন্নদেহ নটনটীর শরীর হইতে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে ও পরিণামে কাহাকেও কাহাকেও মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। অতএব, সুবর্ণের গুরুভার আভরণ নাট্যে ব্যবহার্য্য নহে। অল্পরত্নখচিত ও জতুপূর্ণ (ফাঁপা, ভিতরে গালা দেওয়া) অলঙ্কার ধারণে ক্লান্তি জন্মে না বলিয়া ঐরূপ আভরণ নাট্যপ্রয়োগের উপযোগী।

ইহার পর বিদ্যাধরী, যক্ষী, অপ্সরাঃ, নাগকন্যা, ঋষিকুমারী, দেব-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-অসুর প্রভৃতি জাতীয়া নারীগণের ও বিভিন্নদেশীয়া মানুষীগণের বিভিন্নপ্রকার ভূমিকা ও অবস্থানুযায়ী বিচিত্র বেশভূষার বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্যাধরীদিগের বেশ হইবে শুদ্ধ শুভ্রবর্ণ। অলঙ্কারে মুক্তার বাহুল্য থাকিবে। শিরোভূষণস্বরূপে শিখাপুট ও শিখণ্ড ব্যবহার করিতে হইবে। যক্ষবধূ ও অপ্সরোগণের ভূষণ রত্ন-

৫। বিলাস—শোভা, স্থিরসঞ্চারিণী দৃষ্টি, বিচিত্রা গতি ও স্মিতপূর্ব্ব বচন; ইষ্টসন্দর্শনে স্থিতি, গতি, উপবেশন, হস্ত, ভ্রূ, নেত্র, মুখ প্রভৃতির বিশেষ ভাব। দয়িতের আগমন প্রভৃতি কারণে হর্ষ, অনুরাগ ও ত্বরাবশতঃ অস্থানে ভূষণাদির বিন্যাস ও বাগঙ্গাহার্য্যসত্ত্বাভিনয়ের ব্যত্যাস বিভ্রম। বিভ্রম—মনোহারিণী শোভা।

৬। গুল্‌ফ—পায়ের গাঁট। জঙ্ঘা—জানু (হাঁটু) হইতে গুল্‌ফ অবধি পাদাংশ। ভক্তি নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র করা—ornamental decoration, lines of painting.

খচিত হওয়া প্রয়োজন। যক্ষীগণের শিরোভূষণ হইবে কেবল শিখা। ভূমিকা ও অবস্থাভেদে দেবকন্যাগণের বিভিন্নপ্রকার বেশভূষা স্বেচ্ছাবশতঃ সম্পাদিত হইবে। নাগকন্যাগণের ভূষণ হইবে দেবকন্যাদিগেরই মত; তবে উহাতে মুক্তামণি-খচিত লতাপাতার বাহুল্য থাকিবে। মুনিকন্যাগণ হইবেন একবেণীধারিণী। তাঁহাদিগের শরীরে অতিরিক্ত ভূষণনিবেশ বাঞ্ছনীয় নহে। সিদ্ধ যুবতীগণের অলঙ্কার মুক্তামরকতখচিত হওয়া উচিত। ইঁহাদিগের পরিচ্ছদ হইবে পীতবর্ণ। গন্ধর্ব্বী-গণের ভূষণে পদ্মরাগমণির বাহুল্য থাকিবে। কৌসুম্ভবসনা ও বীণাহস্তারূপে তাঁহারা রঙ্গে অবতীর্ণ হইবেন। রাক্ষসী-গণের ভূষণে ইন্দ্রনীল থাকিবে। উহাদিগের দংষ্ট্রা হইবে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ও বস্ত্র হইবে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। দেববালা-গণের বেশভূষা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইলেও বৈদূর্য্য ও মুক্তা-খচিত আভরণের বাহুল্য থাকা প্রয়োজন। শুকপিচ্ছনিভ হরিদ্বর্ণ বস্ত্র হইবে তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ। দিব্য নরনারীগণের ভূষণ হইবে পদ্মরাগ ও বৈদূর্য্যখচিত। দিব্য বানর-নারী-গণের পরিচ্ছদ হইবে নীলবর্ণ। আর শৃঙ্গারীদিগের বেশ হইবে দিব্যাঙ্গনাগণের মত। কিন্তু অবস্থান্তরে শুদ্ধ বেশই গ্রহণীয়।

নানাদেশোৎপন্না মানুষীগণের বেশভূষা নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হইবে। অবন্তিযুবতিগণের[৭] মস্তকে অলকযুক্ত কুন্তল থাকিবে। গৌড়ীগণের অলকের বাহুল্য; আর তৎ-সঙ্গে শিখাপাশ[৮] ও বেণী থাকে। আভীরযুবতিগণের বেণী দুইটি; মস্তকটি বেষ্টিত[৯]; বস্ত্র প্রায় নীলবর্ণ। পূর্ব্ব ও উত্তর দেশীয় রমণীগণের শিখণ্ডক[১০] ধারণ করা উচিত ও কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিতে হইবে। দক্ষিণদেশের নারীগণের পক্ষে উল্লেখ্য, কুম্ভীপদ ও বর্ত্তুললাটিকা ধারণীয়।[১১] গণিকাগণ ইচ্ছাবিচ্ছিত্তিমণ্ডন[১২] ধারণ করিবে। এইরূপে জাতি, দেশ, ও অবস্থাভেদে বেশভূষার ভেদ কর্ত্তব্য। অন্যথা অদেশজ বেশ শোভা জন্মাইতে পারে না। কটিদেশের মেখলা বক্ষোদেশে বন্ধন করিলে হাস্যোদ্রেকই করে।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারীর অথবা ব্যসনাভিহতা রমণীর[১৩] পক্ষে মলিন বেশ ও মস্তকে একবেণী ধারণ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে[১৪] নারীর বেশ হইবে শুদ্ধ; অলঙ্কারগুলি মার্জ্জিত (অর্থাৎ পালিশ করা) হইবে না, বা অধিক অলঙ্কারও থাকিবে না। ইহাই হইল দেশাবস্থাভেদে নারীর বেশ-বিধি।

পুরুষের বেশ ও অঙ্গরচনার পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। শ্বেত ও নীল বর্ণের সংমিশ্রণে পাণ্ডুবর্ণের উৎপত্তি হয়। এইরূপে শ্বেত ও রক্তের মিশ্রণে পদ্মবর্ণ (গোলাপী), পীত-নীলসংযোগে হরিৎ (সবুজ), নীল-রক্ত সমাযোগে কষায় ও রক্তপীতের একীকরণে গৌরবর্ণ জন্মিয়া থাকে। এইগুলি "সংযোগজ" বর্ণ—কেবল দুইটি মাত্র মূল বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। আর তিন চারিটি বর্ণ একত্রে মিশাইয়া একটি বর্ণের সৃষ্টি করিলে উহা "উপবর্ণ" নামে খ্যাত হয়। এই বর্ণ সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াও নাট্যশাস্ত্রে সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। যে বর্ণটি খুব প্রবল, তাহার একভাগ ও দুর্ব্বল বর্ণের দুই ভাগ একত্রে মিশাইয়া মিশ্রবর্ণ উৎপাদন করার উপদেশ ভরত দিয়াছেন। কিন্তু সকল বর্ণের মধ্যে নীলবর্ণ অত্যন্ত বলবান্। অতএব, নীলের সহিত কিছু মিশাইতে হইলে নীলের একভাগ ও অন্য বর্ণের চারিভাগ লইতে হইবে। অন্যথায় নীলের আধিক্য ঘটায় বর্ণবিকৃতি দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা।

দেব, যক্ষ ও অপ্সরোগণের বর্ণ হইবে গৌর। রুদ্রগণ, দ্রুহিণ (ব্রহ্মা) ও স্কন্দ হইবেন তপ্তকাঞ্চনপ্রভ। সোম

৭। অবন্তী, অবন্তি—মালবের পশ্চিম—রাজধানী উজ্জয়িনী।

৮। শিখা-পাশ - মাথার উপর চুড়া ও চুড়াবিলম্বিত কেশদাম।

৯। বেষ্টিত - বেণী দ্বারা, অথবা মাল্যাদি অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা—তাহার উল্লেখ নাই।

১০। শিখণ্ড, শিখণ্ডক, শিখণ্ডিক —পুরুষের পক্ষে জুল্পি, নারীর পক্ষে কর্ণপ্রান্তলম্বী কেশগুচ্ছদ্বয়।

১১। উল্লেখ্য, কুম্ভীপদক ও বর্ত্তুললাটিকা—শব্দ কয়টির অর্থ বুঝা যায় না। ললাটিকা অর্থে চন্দনাদি কৃত ললাটস্থ তিলক—টীকা বা ফোঁটা বা টিপ।

১২। ইচ্ছাবিচ্ছিত্তিমণ্ডন - স্বেচ্ছায় অঙ্গরাগ শোভা। বিচ্ছিত্তি—অঙ্গরাগ; রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বেশভূষায় শৈথিল্য।

১৩। প্রোষিতভর্ত্তৃকা—যে নায়িকার স্বামী প্রবাসগত। ব্যসনাভিহতা—বিপদাপন্ন, অর্থাৎ বৈধব্য প্রভৃতি অশুভ দ্বারা আক্রান্ত।

১৪। বিপ্রলম্ভ -শৃঙ্গার দ্বিবিধ (১) সম্ভোগ ও (২) বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগশৃঙ্গার—নায়ক-নায়িকার মিলনে রতিরসাস্বাদন। ইহার বিপরীত বিপ্রলম্ভ—অভিলাষ-বিরহ-ঈর্ষা-প্রবাস-শাপ-হেতুক বিচ্ছেদ; যুবক-যুবতীর পরস্পর বিরহে অথবা মিলনাবস্থাতেও অভিপ্রেত আলিঙ্গনাদির অভাবে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার উৎপন্ন হয়।

(চন্দ্র), বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, তারকাগণ, সমুদ্র, হিমাচল, গঙ্গা প্রভৃতিকে শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইবে। অঙ্গারক (মঙ্গলগ্রহ) রক্তবর্ণ, বুধগ্রহ ও হুতাশন পীতবর্ণ। নর-নারায়ণ উভয়েই শ্যামবর্ণ। বাসুকি, দৈত্যগণ, দানববৃন্দ, রাক্ষসসমূহ, গুহ্যকগণ, নগ (অর্থাৎ পর্ব্বত বা বৃক্ষ), আকাশ, পিশাচসমূহ, ও যম—শ্যামবর্ণ। যক্ষগণ গৌরবর্ণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উঁহাদিগকে বিচিত্র বর্ণও করা চলে। গন্ধর্ব্ব, ভূত, পন্নগ (সর্প), বিদ্যাধর, পিতৃগণ, বানর প্রভৃতিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ সপ্তদ্বীপের অধিবাসী নরগণকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ করা উচিত। কেবল জম্বুদ্বীপের নানা বর্ষে যে সকল নানাবর্ণ নরগণ বাস করেন, (একমাত্র উত্তরকুরুর অধিবাসীদিগকে বাদ দিয়া) তাঁহাদিগকে ঈষৎ স্বর্ণাভ করা প্রয়োজন। ভদ্রের অধিবাসী শ্বেতবর্ণ, কেতুমালবাসীও তদ্রূপ, অবশিষ্ট বর্ষবাসিগণ গৌর।[১৫] ভূতগণকে নানাবর্ণ, বামনাকৃতি, বরাহ, মেষ, মহিষ বা মৃগবদনরূপে প্রদর্শন করান উচিত।

ভারতবর্ষের বর্ণবিভাগের বৈশিষ্ট্য অনেক। রাজগণ শ্যাম বা গৌরবর্ণের হইতে পারেন। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহাদিগকে পদ্মবর্ণে রঞ্জিত করাও চলে। সুখভোগে অভ্যস্ত মানবকে গৌরবর্ণ করিতে হইবে। ইহাই বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি। দেশ, জাতি, কাল ও বয়স অনুসারে বর্ণের বিশেষ বিশেষ ভেদ করণীয়। কিরাত, বর্ব্বর, অন্ধ্র, দ্রমিল, কাশী ও কোসলের অধিবাসী,—পুলিন্দ ও দাক্ষিণাত্যগণ প্রায় অসিত (কৃষ্ণ) বর্ণ। শক, যবন, পহ্লব, বাহ্লীক হইবে গৌরবর্ণ। উত্তরদেশের অধিবাসিমাত্রকেই গৌর করা যায়। পাঞ্চাল, শূরসেন, ওড্র, মাগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গগণ শ্যামবর্ণ।[১৬] উহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঈষৎ রক্তাভ, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ঈষৎ শ্যামাভ হওয়া প্রয়োজন। মুখ, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকলই সমভাবে রঞ্জিত করিতে হইবে।

ইহার পর শ্মশ্রু কর্ম্মবিধি। শ্মশ্রু চতুর্ব্বিধ—শুক্ল, শ্যাম, বিচিত্র ও রোমশ। আকুমার ব্রহ্মচারী, বা তপস্বীর শুভ্র শ্বেত শ্মশ্রু। অমাত্য ও পুরোধারও তদ্রূপ। মধ্যাবস্থায় উপনীত, দীক্ষিত, দিব্যপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নৃপতির বা রাজকুমারের অনুজীবী, শৃঙ্গারী, ও যৌবনমদোন্মত্তদিগের শ্মশ্রু হইবে বিচিত্র (শ্বেতশ্যামমিশ্রিত)। যাহাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় নাই, দুঃখিত, হতভাগ্য, বাসনগ্রস্তদিগের শ্যাম শ্মশ্রু বিহিত। ঋষি, তাপস, সিদ্ধ বিদ্যাধরগণের রোমশ শ্মশ্রুধারণ কর্ত্তব্য।

অতঃপর বেশবিধি। জীবিকা অনুসারেই বেশের ভেদ অনন্ত। তবে মোটামুটি বেশ ত্রিবিধ বলা চলে—শুদ্ধ, বিচিত্র ও মলিন। ঐরূপ আচ্ছাদনও ত্রিপ্রকার—শুদ্ধ, রক্ত ও বিচিত্র। দেবতাপূজায় বা দেবতাবিগ্রহের সম্মুখে গমনকালে মাঙ্গলিক নিয়ম বা উৎসব উপলক্ষে, শুভতিথি নক্ষত্রযোগে, বিবাহকার্য্যে, স্ত্রীপুরুষের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে শুদ্ধ বেশ ধারণীয়। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ও কর্কশ-স্বভাব নৃপগণের বেশ হইবে বিচিত্র। কঞ্চুকী[১৭], অমাত্য, শ্রেষ্ঠী, পুরোধাঃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, শাস্ত্রবিৎ, বণিক্, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে সৌম্যভাবাপন্ন নরগণের ভূমিকা-ভিনয়ে শুদ্ধ বেশ ধারণ করা প্রয়োজন। উন্মত্ত, প্রমত্ত,

১৫। জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ বা বিভাগ—কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক (রমণক), ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিন্নর ও ভারতবর্ষ।

১৬। কিরাত—ব্যাধবৃত্তি, বনচর বা পর্ব্বতচারী, অসভ্য জাতি। বর্ব্বর—অনার্য্য (barbarous), অন্ধ্র—বর্ত্তমান তেলিঙ্গানা। দ্রমিল—দ্রাবিড়(?)। কাশী—বর্ত্তমান Benares। কোসল বা মহাকোসল—নর্ম্মদা ও মহানদীর মধ্যস্থ ভূভাগ—বিদর্ভ (Berar)। পুলিন্দ—অনার্য্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। শক—Scythians। যবন—Ionians, Bactrian Greeks। পহ্লব—Parthians। বাহ্লীক, বাহীক বা আরট্ট, আরট্টিক এই অনার্য্যতুল্য নিন্দিতচরিত্র জাতির নিবাস ছিল পাঞ্জাবের সিয়ালকোট ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগে। পঞ্চাল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ (Gangetic Doab), বৃন্দাবন, ফরাকাবাদ প্রভৃতি স্থান। শূরসেন মথুরা। ওড্র—উড়িষ্যার কিয়দংশ মেদিনীপুরের পশ্চিমভাগ (পূর্ব্বভাগ সুহ্ম) মানভূম, পূর্ব্ব সিংহভূম, বাঁকুড়া। উৎকল—বালেশ্বর হইতে সোহার ডাঙ্গা। অঙ্গ—ভাগীরথীর ডান তীর—ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান। বঙ্গ বা সমতট—দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ। উত্তরবঙ্গ—গৌড়, বর্ত্তমান মালদহ। সুহ্ম—বঙ্গের পশ্চিমাংশ, রাঢ়, কপিশা বা কাঁসাইয়ের দক্ষিণতীরস্থ ভূভাগ—তমলুক। কলিঙ্গ—ওড্রের দক্ষিণ, কাঁসাইয়ের দক্ষিণ—Northern Sircars—পূর্ব্বঘাটের কিয়দংশ। মগধ দক্ষিণ বিহার।

১৭। কঞ্চুকী—অন্তঃপুরচর, গুণবান্, সর্ব্বকার্য্যকুশল, বৃদ্ধ বিপ্র। রাজান্তঃপুরের সকল দাসদাসীর অধ্যক্ষ Chamberlain. "কঞ্চুক" (লম্বা হাতাওয়ালা জামা) পরিধান করিতেন বলিয়া "কঞ্চুকী" উঁহার নাম।

পথিক, প্রবাসী, ব্যসনাভিহত[১৮] ব্যক্তিগণের বেশ মলিন। মুনি, নির্গ্রন্থ, শাক্য[১৯], ত্রিদণ্ডী, শ্রোত্রিয় প্রভৃতির যথাযথ রূপানুযায়ী অলঙ্কার ও বেশ হইবে। পরিব্রাজক ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের পক্ষে কাষায়বসন বিহিত। পাশুপতগণের বেশ হইবে বিচিত্র। অন্যান্য কুলজ গৃহস্থগণের যথোচিত বেশ ধারণীয়। অন্তঃপুররক্ষার নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের কঞ্চুক ও বস্ত্র কষায়রঞ্জিত হইবে। তাপসগণের চীর, বল্কল ও চর্ম্ম পরিধেয়।

স্ত্রীগণেরও বেশ অবস্থানুরূপ হওয়া প্রয়োজন। বীরগণের যুদ্ধসজ্জা ধারণীয়; যুদ্ধবেশের মধ্যে বিচিত্র শস্ত্র, কবচ, নানাবিধ অঙ্গত্রাণ (অঙ্গুলিত্র, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি), ধনুঃ প্রভৃতি প্রধান। নৃপগণের সর্ব্বদাই বিচিত্রবেশ কর্ত্তব্য; কেবল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় শুক্লবেশ পরিধেয়। বয়স, জাতি গুণ অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকৃতির নর-নারীগণের বেশের ইতরবিশেষ কর্ত্তব্য—ইহা বলাই বাহুল্য।

এইবার শিরোভূষণরচনার নিয়ম। দেবতা ও মানবগণের দেশ, জাতি, বয়স ও পাণ্ডিত্য অনুসারে মুকুট কিরীট প্রভৃতি ধারণ করা উচিত। রাজার পক্ষে সমগ্র মস্তকব্যাপী রাজমুকুট বা কিরীট ধারণীয়। মধ্যমপ্রকৃতির পাত্রের মস্তকোপরি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুকুট শোভা পাইবে। আর কনিষ্ঠপ্রকৃতির পাত্র শীর্ষদেশে চূড়ার আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র মুকুট ধারণ করিবে। বিদ্যাধর, সিদ্ধ,[২০] চারণ প্রভৃতি কেশপাশ মুকুটাকারে বাঁধিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা উদাত্তপ্রকৃতির, তাঁহাদিগের চূড়া মস্তকের একপার্শ্বে বাঁধিতে হইবে[২১]। দিব্য রাজগণের পক্ষে বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অথবা যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের অভিনয়েও কেশচ্ছেদন করা মহর্ষির অভিপ্রেত নহে। অতিদীর্ঘ কেশকেও মুকুটাদির আবরণে আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। অমাত্য, কঞ্চুকী, শ্রেষ্ঠী, পুরোধাঃ প্রভৃতির মস্তকে পট্টবন্ধ ধারণ কর্ত্তব্য। সেনাপতি ও যুবরাজের মস্তকে অর্দ্ধমুকুট দেওয়া উচিত। অনেক সময় প্রয়োগের বশবর্ত্তী হইয়া মস্তকসজ্জা করিতে হয়। তদনুসারে (কাকপক্ষ ধারণ কৈশোরে প্রশস্ত হইলেও) বালকের পক্ষেও শিখণ্ডধারণ মহর্ষি নিষেধ করিয়াছেন[২২]। ঋষিগণের শিরোদেশে জটামুকুট লম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

রাক্ষস, দানব ও দৈত্যগণের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতৃবর্গের মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু পিককেশনির্ম্মিত হইবে; শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পিশাচ, উন্মত্ত, ভূত, সাধক, তপস্বী ও অনুত্তীর্ণপ্রতিজ্ঞদিগের মস্তকের কেশ লম্বমান থাকিবে। শাক্য, শ্রোত্রিয়, পরিব্রাট্ (পরিব্রাজক), নিগ্রন্থ ও যজ্ঞদীক্ষিতগণের মস্তক মুণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের অনুকরণে কোন কোন শ্রেণীর লিঙ্গী মস্তক মুণ্ডন করে, আবার কেহ বা কুঞ্চিত কেশপাশ ও কেহ বা লম্বমান কেশ ধারণ করে। বধূগণ, রাজোপজীবিগণ ও শৃঙ্গারিগণের কেশদাম কুঞ্চিত হইবে। চেটগুলির মস্তক হয় মুণ্ডিত, অথবা তিনটি চূড়াবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিদূষকের মস্তকের মধ্যস্থলে থাকিবে টাক ও উভয় পার্শ্বে কাকপদ[২২]। এইরূপে প্রয়োগ ও রসসৃষ্টির অনুকূলভাবে যথাযথ বিচিত্র বসন, ভূষণ ও মাল্য দ্বারা অঙ্গরচনা কর্ত্তব্য।

অঙ্গরচনার পর "সঞ্জীব"। প্রাণিগণের রঙ্গপীঠে প্রবেশপদ্ধতির নামই সঞ্জীব। প্রাণী ত্রিবিধ—চতুষ্পদ, দ্বিপদ ও পদহীন। ইহাদিগের মধ্যে সর্প পদহীন, মানব ও পক্ষী—দ্বিপদ, আর সকল প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য পশু—চতুষ্পদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখন এই সকল নানাবিধ প্রাণীর

১৮। ব্যসন—নাশ, বিপদ, কুকার্য্য—(১) কামজ দশবিধ—মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রীসঙ্গ, মদ, তৌর্য্যত্রিক (নৃত্যগীতবাদ্য) ও বৃথাভ্রমণ; (২) ক্রোধজ অষ্টবিধ—পিশুনতা (অজ্ঞাতদোষাবিষ্করণ), সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থদূষণ, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য।

১৯। মুনি—মৌনব্রতধারী বা মননশীল তপস্বী, যিনি আত্মতত্ত্ববিচারপরায়ণ। নির্গ্রন্থক বা নির্গ্রন্থিক—দিগম্বর জৈনভিক্ষু। শাক্য—বৌদ্ধ ভিক্ষু। ত্রিদণ্ডী—তিন দণ্ডধারী সন্ন্যাসী। শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

২০। সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি দেবযোনি বিশেষ। চারণ—বৈতালিক, বন্দী, কীর্ত্তিগাথা-গায়ক।

২১। মূলে—মস্তকিনঃ, মৌলিনঃ, শীর্ষমৌলিনঃ, পার্শ্বমৌলিনঃ প্রভৃতি পদ আছে। ইহাদিগের সবগুলির অর্থ বুঝা যায় না। রাজগণ—'মস্তকিনঃ', অর্থাৎ সমস্ত মস্তকব্যাপী কিরীটধারী। 'মৌলিনঃ'—মধ্যমপ্রকৃতি,—ইঁহাদিগের মস্তকের উপরিভাগে মুকুটাদি ভূষণ। শীর্ষমৌলিনঃ—কনিষ্ঠ প্রকৃতি,—ইঁহাদের মস্তকের কেন্দ্রস্থলে চূড়া ও মুকুটাদি। পার্শ্বমৌলিনঃ—উদাত্তপ্রকৃতি,—মস্তকের একপাশে চূড়া, মুকুট প্রভৃতি।

২২। সেকালে বালক ও কিশোরগণ কাকপক্ষ, শিখণ্ড বা লম্বা জুলপি ধারণ করিত। প্রয়োজন অনুসারে কখন কখন বালকগণের পক্ষেও স্বাভাবিক শিখণ্ড ধারণ নিষিদ্ধ হইয়া উঠে—ইহাই এস্থলে বক্তব্য।

পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ, অবরোধ ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চে দেখাইতে হইলে নানা প্রহরণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, ধ্বজ প্রভৃতির প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অস্ত্রসমূহের মধ্যে ভিণ্ডি বা ভিন্দি হইবে দ্বাদশতাল পরিমিত; কুন্ত দশতালপ্রমাণ; শতঘ্নী, শূল, তোমর ও শক্তি অষ্টতাল; ধনুও অষ্টতাল ও উহার বিস্তৃতি দুই হস্ত; শর, গদা ও বজ্র হইবে চতুস্তাল; অসি চল্লিশ অঙ্গুলি; চক্র দ্বাদশ অঙ্গুলি ও প্রাস ছয় অঙ্গুলি[২৩]। পট্টিস প্রাসেরই মত; দণ্ড বিশ অঙ্গুলি; চর্ম্ম হইবে ষোড়শ অঙ্গুলি বিস্তৃত, দুই হস্ত দীর্ঘ; খেটক হইবে ত্রিশ অঙ্গুলি। ইহাই হইল অস্ত্রনির্ম্মাণবিধি[২৪]।

অতঃপর জর্জ্জর[২৫], বিদূষকের কুটিল দণ্ডকাষ্ঠ, প্রতিসীরা[২৬], ছত্র, চামর, ধ্বজ, ভৃঙ্গার প্রভৃতি নাট্যোপকরণ-গুলির বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বেতবর্ণাভ পবিত্র ভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষপ্ররোহ বা বংশদণ্ড পুষ্যানক্ষত্রে বা মাহেন্দ্রক্ষণে সংগ্রহ করিতে হইবে। উহা উচ্চতায় হইবে একশত আট অঙ্গুলি। উহাতে থাকিবে পাঁচটি পাব ও চারিটি গাঁট। পাবগুলি সরু ও লম্বা হওয়া উচিত; কোনটি খুব ছোট হওয়া উচিত নয়। গাঁটগুলির কোনটি খুব সরু বা খুব মোটা হইবে না। জর্জ্জর দণ্ডটিতে ডালপালা থাকিবে না অথবা উহা ঘুণধরা হইলেও চলিবে না। ঘৃত ও মধু দ্বারা উহার মার্জ্জন করিতে হইবে। পরে মাল্য-গন্ধ ধূপ-দীপ দিয়া উহাকে জর্জ্জররূপে রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করিতে হইবে।

বিল্ব, কপিত্থ বা বংশ দণ্ডকাষ্ঠের উপযুক্ত। ইহা ত্রিভাগে বক্র অর্থাৎ ত্রিভঙ্গ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া কাষ্ঠটি ঘুণধরা, বা অন্যরূপ পোকা-খাওয়া, অথবা রোগগ্রস্ত বৃক্ষের কাণ্ড হইতে সংগৃহীত হইলে চলিবে না। এরূপ কাষ্ঠ বিশেষ অমঙ্গলকর ও ক্ষতিজনক।

রঙ্গশীর্ষের জন্য যে পটী নির্ম্মিত হইবে, তাহা বিস্তৃতিতে হইবে বত্রিশ অঙ্গুলি। নেপথ্য হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার দুইটি দ্বারের মুখে এই দুইটি পর্দ্দা দেওয়া থাকিবে—ইহাদিগের দ্বারা সমগ্র রঙ্গশীর্ষ আবরণ করার প্রথা ছিল না। বিল্বকল্ক[২৭] ভাবনা দিয়া দ্রব করিতে হইবে। পরে উহার সহিত ভস্ম বা তুষ মিশাইয়া প্রতিশীর্ষ রচনা করা উচিত। চীর বস্ত্রে ঘন করিয়া বিল্বকল্ক মাখাইয়া খণ্ডগুলি যুক্ত করিলেই পটী নির্ম্মিত হইবে। এই পটী খুব মোটা, অথবা খুব পাতলা, অথবা খুব মৃদু হইতে পারিবে না। রৌদ্রে শুকাইবার পর পটী দেখিতে ঈষৎ মলিন হইবে।

ইহার পর পটীচ্ছেদ্যবিধান। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা পটীকে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ করা উচিত। তাহার পর ললাটের আকারে উহাকে কোণাকুণি কাটিতে হইবে; এই ছেদ্যটির পরিমাণ নিজ হস্তমাপের ছয় অঙ্গুলি। ইহার পর কটস্থলে[২৮] তিন অঙ্গুলি ছেদ্য। অতঃপর কর্ণবিবর—তিন অঙ্গুলি। তাহার পর দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত বাবটু। ইহাই সংক্ষিপ্ত পটীচ্ছেদ্য বিধান।

২৩। তাল—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা বিস্তৃত করিলে যতটা লম্বা হয় তাহাই তাল। ভিণ্ডি, ভিন্দি, ভিন্দিপাল—কোন মতে ইহা পাথর ছুঁড়িবার গুলতি, মতান্তরে নালিকাস্ত্র। নালিকাস্ত্র বলিলে দুইরকম অর্থ পাওয়া যায়—(১) বন্দুক বা কামান অথবা যাহা নলের মধ্য দিয়া ছোড়া যায়। (২) বাণ, বর্শা বা বল্লম (A short arrow thrown by the hand)। শুক্রনীতিতে বলা আছে—কুন্ত দশহস্ত,—উহার অগ্রভাগ ফালের (লাঙ্গলের) মত ও মূলদেশ শঙ্কুর (বর্শা, পেরেক, বাণের তীক্ষ্ণাগ্র কীলক বা গোঁজের) মত। ইহাও একপ্রকারের বল্লম একমুখ ফালযুক্ত ও অপরমুখ তীক্ষ্ণ (A bearded dart)। শতঘ্নী—কোন মতে বন্দুক বা কামান, মতান্তরে হাউই বা shell, অন্য মতে লৌহকণ্টক বসান মহতী শিলাখণ্ড—এই মতে ইহার পরিমাণ চতুস্তাল। তোমর—গণ্ডাস, শর্ব্বলা (শাবল), iron crow. শক্তি—কার্ত্তিকেয়ের প্রিয় অস্ত্রবিশেষ। বজ্র—ক্ষীণমধ্য সুতীব্র অস্ত্রবিশেষ। প্রাস, প্রাশ—অমরকোষমতে ইহাই কুন্ত। শুক্রনীতিমতে ইহা চতুর্হস্ত পরিমিত ও ক্ষুরের মত অগ্রভাগযুক্ত—বর্শার ন্যায় অস্ত্র।

২৪। পট্টিশ, পট্টিস—কাহারও মতে কুঠারবিশেষ, কাহারও মতে তীক্ষ্ণাগ্র ভল্ল। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র যখন প্রাস ও পট্টিসকে ছয় অঙ্গুলি প্রমাণ বলিতেছেন, তখন মনে হয়, ইহা অন্য কোন প্রকার অস্ত্র হইবে।

২৫। ইন্দ্রধ্বজ, শক্রধ্বজ বা জর্জ্জর—ইহার বিস্তৃত বিবরণ "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা" শীর্ষক মদীয় প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৪০; বৈশাখ, ১৩৪১)। জর্জ্জরের পাঁচটি পর্ব্ব বা পাব। উহার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান ও উহা শ্বেতবর্ণ; তাহার নিম্নে রুদ্রপর্ব্ব—নীলবর্ণ; তাহার অধোদেশে বিষ্ণুপর্ব্ব—পীতবর্ণ; তন্নিম্নে স্কন্দপর্ব্ব রক্তবর্ণ; আর সর্ব্বনিম্ন পর্ব্বে শেষ-বাসুকি-তক্ষক—এই তিন মহানাগের স্থিতি—উহা বিচিত্রবর্ণ। জর্জ্জরের শিরোভাগে পতাকা—অভিনীয়মান নাটকের রসানুযায়ী বর্ণে রঞ্জিত।

২৬। প্রতিসীরা, যবনিকা বা জবনিকা, তিরস্করিণী, পটী, অপটী ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দ; ইহা পর্দ্দাবিশেষ—রঙ্গমঞ্চকে রঙ্গশীর্ষক ও নেপথ্য হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিত। ইহা বর্ত্তমান যুগের Drop নহে।

২৭। বিল্বকল্ক—বেলের আটা অথবা শাঁস।

২৮। কট—কপালপার্শ্ব, অথবা কটীদেশ, নিতম্ব। পটীচ্ছেদ্যবিধান অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। বাবটু প্রভৃতি শব্দের অর্থই বুঝা যায় না।

ইহার পর নাট্যোপযোগী নানা রত্নশোভিত বিভিন্ন আকারের মুকুট নির্ম্মাণের কথা বলা হইয়াছে। এই মুকুটের উপকরণ নানাবিধ হইতে পারে। কিন্তু লৌহময় মুকুট হওয়া উচিত নহে; কারণ উহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া নটনটীর খেদ উৎপাদন করে। পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য বেশভূষারূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, নাট্যে অনেক সময় ঠিক সেই দ্রব্যগুলির ব্যবহার চলে না; তদনুকরণে অনুরূপ কৃত্রিম বেশভূষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রাসাদ, গৃহ, যান, বাহন প্রভৃতির যথাযথ ভাবে রঙ্গে প্রদর্শন সম্ভব নহে। এই প্রকার পদার্থগুলির নাট্যোপকরণ বাধ্য হইয়াই কৃত্রিম করিতে হয়। মহর্ষি বলিয়াছেন, লোকের ব্যবহার্য্য উপকরণ দ্বিবিধ—লোকধর্ম্মী ও নাট্যধর্ম্মী। লোকধর্ম্মী স্বাভাবিক ও নাট্যধর্ম্মী কৃত্রিম—বিকারজাত। এইজন্য মহর্ষি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, যেন নাট্যধর্ম্মী উপকরণ লৌহনির্ম্মিত বা প্রস্তরময় না হয়। জতু (গালা), হাল্‌কা কাঠ, চর্ম্ম, বস্ত্র, বেণুদল (বাঁশের চাঁচাড়ি বা চাটাই) প্রভৃতি দিয়া হাল্‌কা নাট্যোপকরণ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। যদি লঘু নাট্যোপকরণ নির্ম্মাণের উপযোগী বস্ত্র না পাওয়া যায়, তবে তালবৃক্ষজাত মৃদুসূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারাই কার্য্য চলিতে পারে[২৯]। অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইবে তৃণ ও বেণুদল হইতে; উহাদের উপর গালার আবরণ দিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আকার করা যাইতে পারে। হস্ত, পদ, মস্তক ও ত্বকের উপর আবরণ দিবার জিনিষগুলি তৃণজাত বা কীলজ (কাঠির তৈয়ারী) ভাণ্ডের দ্বারা নির্ম্মাণ করা উচিত। আবশ্যকস্থলে মৃন্ময় দ্রব্যও ব্যবহৃত হইতে পারে। ভাণ্ড, বস্ত্র, মধূচ্ছিষ্ট, লাক্ষা, অভ্রপত্র প্রভৃতি দ্বারা পর্ব্বত, চর্ম্ম, বর্ম্ম, ধ্বজ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য[৩০]। ফল, ফুল প্রভৃতি গালার দ্বারা তৈয়ারী করিলে শোভন হয়। তাম্রবর্ণ দেখাইতে হইলে ভাণ্ড, বস্ত্র ও মোম ব্যবহার্য্য। নীলবর্ণ প্রদর্শনে নীলীরঞ্জিত অভ্রপত্র উপযোগী। মুকুটাদিও অভ্রপত্রে নির্ম্মিত হইলে উজ্জ্বল রত্নখচিত বলিয়া মনে হয়। মহর্ষির মতে সুবর্ণরত্নাদি নির্ম্মিত মুকুট অপেক্ষা অভ্রপত্রমণ্ডিত তাম্রপত্রের মুকুট রঙ্গমঞ্চে অধিক উপযোগী। কারণ, নরলোকের নটনটীগণ সাধারণতঃ অল্পশক্তি। গুরুভার নাট্যোপকরণ বহন করিতে হইলে তাহাদের পক্ষে আঙ্গিক অভিনয় যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বিশেষতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বেদ, খেদ ও মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। অতএব, আসল রত্নালঙ্কারাদির পরিবর্ত্তে অভ্রমণ্ডিত কৃত্রিম ভূষণ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন যে, রঙ্গমঞ্চোপরি সত্যকার অস্ত্র দ্বারা ছেদন বা আঘাতের অভিনয় করা কর্ত্তব্য নহে। বাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করাও অনুচিত। যদি একান্তই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে অস্ত্রক্ষেপের প্রক্রিয়া বিশেষ যত্নসহকারে এমন ভাবে শিক্ষা করা উচিত—যাহাতে রঙ্গস্থ কাহারও কোনরূপ আঘাত না লাগে; অথচ দর্শকের চক্ষুতে যেন ধাঁধাঁ লাগে যে, সত্যই অস্ত্রনিক্ষেপ করা হইতেছে। ইহারই নাম "শিক্ষামায়া" বা "পীঠমায়া" (stage illusion)।

মহর্ষির আহার্য্যাভিনয়ের বিবরণ এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বহু স্থলেই এই বিবরণ অতি অস্পষ্ট। তাহার কারণ—প্রথমতঃ, ভারতের সর্ব্বত্রই নাট্যশাস্ত্রের সম্প্রদায় অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে[৩১]। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থমধ্যে এত দুর্ব্বোধ্য পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে যে, প্রচলিত সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে তাহাদিগের অর্থ করা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, পাঠের গোলমাল ও ছাপার ভুল এ বিষয়ে বিশেষভাবে দায়ী। লিপিকারের অজ্ঞতা বা অনবধানতার ফলে অনেক সময় অনেক সরল বিষয়ও অতি জটিল ও অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্থতঃ, নাট্যশাস্ত্রের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার যে একমাত্র পথ—আচার্য্য অভিনবগুপ্তের টীকা অ ভি ন ব ভা র তী—তাহার সমগ্র অংশ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় অনেক স্থলেই কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। অতএব, প্রবন্ধমধ্যে ভ্রমপ্রমাদ থাকা খুবই সম্ভব। ভবিষ্যতে অ ভি ন ব ভা র তী প্রকাশিত হইবার পর সুধীগণ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইলে অনেক লুপ্তপ্রায় তথ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

২৯। "কীলজ" ও তালীয়জ" শব্দ মূলে আছে। অনুমান হয়, তালগাছের চোঁচ অথবা অনুরূপ কাঠি খুব সরু করিয়া কাটিয়া তাহার দ্বারা কাপড়ের মত জিনিষ বোনা হইত। অথবা তালীয়জ বস্ত্র বলিতে তালপাতার চাটাই, ও কীলজ বস্ত্র বলিতে কাঠির মাদুর।

৩০। ভাণ্ড চাঁচাড়ি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র বলিয়া মনে হয়। ভাণ্ডনির্ম্মাণ বলিতে basket-weaving প্রভৃতি কর্ম্ম বুঝান সম্ভব। মধূচ্ছিষ্ট—মোম। লাক্ষা গালা।

৩১। দক্ষিণভারতে নাট্যশাস্ত্রের সম্প্রদায় আজিও বিদ্যমান আছে বলিয়া তথাকার অধিবাসিগণ গর্ব্ব করিয়া থাকেন। আঙ্গিকাভিনয়ের কোন কোন অংশ (মুদ্রা প্রভৃতি প্রদর্শন) সম্প্রদায়ক্রমে খণ্ডিতভাবে তথায় প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় (বিশেষ করিয়া, আহার্য্যাভিনয়ের সম্প্রদায়) তাঁহাদের মধ্যেও প্রচলিত নাই।

অপরিচিতা

-শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাব্যের দিকে কোন দিনই আমার ঝোঁক নাই। কাব্য-কথাও বলিতে বসি নাই।

এম-এ পাশ করিয়া খেয়াল হইল, জীবনে কি-বা শিখিলাম! পাশাপাশি এই যে অগণিত নর-নারী—তাদের সঙ্গে কি-বা পরিচয়!

খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইলাম। তীর্থে নয়, দেশ দেখিতে; মানুষ দেখিতে।

যৌবনের প্রদীপ্ত রাগ! প্রাণ খুঁজিয়া প্রাণের ব্যাকুল বাসনা! কথাগুলা পড়িয়াছিলাম। পড়িয়াছি অনেক কথা! মনে তার কোনোটা থিতাইয়া বসিল না।

কিন্তু না, এ যেন গুরু-গম্ভীর দর্শনের আলোচনা ফাঁদিতেছি। দর্শন-শাস্ত্র যদি কেহ পড়িতে চায় তো আমার কাহিনী পড়িবে কেন? মোটা মোটা অনেক বই আছে—জ্ঞানের জাহাজ।

সেদিনের কথা বলি। দার্জ্জিলিংয়ে আছি। যে হোটেলে থাকি, ছুটীর দিনে সে হোটেল সৌখীন নর-নারীতে ঠাসিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী আছে, গুজরাটী আছে, মাদ্রাজী আছে—এই ভারতবর্ষের ছোট-খাট একটি 'এপিটোম'!

আমি ঘুরিয়া বেড়াই। কাহারো সঙ্গে মেলামেশা নাই। আমোদের নেশায় সারাক্ষণ এরা যেন প্রমত্ত হইয়া আছে—এ প্রমত্ততায় আমার তেমন রুচি নাই। হোটেলে চুপচাপ থাকি—স্নান করি, খাই-দাই, ঘুমাই; বাকী সময়টা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াই। চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, রঙীন জগতের বিচিত্র ছবি, বায়স্কোপের বিচিত্র সিনের টুকরার মত।

জলাপাহাড়ের ওদিকে একটা পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। পাহাড়ের গায়ে পায়ে-চলা পথ। বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। এক জায়গায় দেখি, মেয়েদের পায়ের এক জোড়া নাগরা জুতা পড়িয়া আছে; তার কাছে নানা রঙের একরাশ পাহাড়ী ফুল। বুঝিলাম, যাঁর জুতা, তিনিই ফুলগুলি জড়ো করিয়া রাখিয়াছেন। খানিক আগে বৃষ্টি হইয়াছে; পাহাড়ের গায়ে ছোট পায়ের রেখা চোখে পড়িল।

দেহে-মনে কেমন একটু পুলকের সঞ্চার হইল। পায়ের রেখা একজোড়া। যিনি আসিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে সাথী কেহ নাই। একা। কে ইনি?

অলস মনের কৌতূহল! পাহাড়টা ঘুরিয়া চাহিয়া দেখিলাম—কাহারো দেখা মিলিল না।—না মাথার কালো কেশ, না শাড়ীর আঁচল! ঘুরিতে ঘুরিতে সেইখানে আসিয়া বসিলাম। নাগরা জোড়া তেমনি পড়িয়া আছে। পাশে সেই ফুলের রাশি।

কত বার সাধ হইল, ফুলগুলা হাতে তুলিয়া লই···নাগরা জুতা জোড়া দেখিয়া যদি কোনো পরিচয়···

হাসি পাইল। কেন এ বাসনা? পাগলামি।

বসিয়া রহিলাম। চারিদিক স্তব্ধ···শুধু দু' একটা পাখীর ডাক সে স্তব্ধতার বুকে ভাসিয়া উঠে। কাছে কোথায় পাহাড়ের গা বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার অবিরাম একঘেয়ে রব। উঠিলাম। কাছাকাছি খানিকটা ঘুরিলাম। একটা ঝোপ। ঝোপের পাশে ছোট একখানি খাতা পড়িয়া আছে। চারিদিকে চাহিলাম; তারপর চোরের মত খাতাখানি তুলিয়া তার পাতা খুলিয়া দেখি, দু' চারিটা পাতায় হস্তাক্ষর। খাতায় কাহারো নাম নাই। কোনো পাতায় লেখা—"কারো পকেটে আছে অজস্র টাকা; কেহ বা অভাবের জালায় হা-হা করিতেছে! মানুষের পরিচয় ধনে? না, মনে?"

কোনো পাতায় লেখা—"মনটাকে সকল বাধা-বন্ধের ঊর্দ্ধে তুলা কি এমনি অসম্ভব?"

—"রৌদ্রে আকাশ ভরা। একটু পরে মেঘ করিয়া কি বৃষ্টি! মাগো! মানুষের জীবনেও তাই দেখি! এই সুখ! একটু পরেই দুঃখ! কিসের আশায় মানুষ সংসার রচিতে বসে!"

"কোথায় এমন মানুষ···সত্যই আছে? যে ঠিক জলের

বুকে পদ্মের মত—গায়ে জল না মাখিয়া, কাদা না মাখিয়া ঢল-ঢল মনে ফুটিয়া আছে সংসারের বুকে! আশেপাশে গুঞ্জন তুলিয়া অহর্নিশ যারা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাদের দেখিয়া লজ্জা হয়, ঘৃণা ধরে! তারা যা চায়, সে অভাব কোন্ নারী না মিটাইতে পারে! এমন মানুষকে সাথী করিয়া জীবন-পথে চলিতে আমার কোনো সাধ নাই! লোকে বলিবে, পাগল! লোকে বলিবে, এ সাধ সৃষ্টিছাড়া! কিন্তু এ-বয়সে যেটুকু দেখিলাম—মনে আতঙ্ক ধরিয়াছে—বিরাগ জাগিয়াছে।”

তারপর খাতার শেষ পাতায়--“এই যে ফুলগুলিকে আজ জড়ো করিয়াছি…”

লেখা এইখানে শেষ। খাতার বাকী পাতাগুলা সাদা।

পড়িয়া দেহে রোমাঞ্চ হইল। আশ্চর্য্য এ মেয়ের মন! কত বয়স? জুতা জোড়ার পানে নজর পড়িল। লেখার ভঙ্গী! সামনে এই জড়ো-করা ফুল! বয়স যাই হোক, মন এখনো পাকে নাই। পাকিলে বিজন পাহাড়ে আসিয়া এমন কাব্য-কথা খাতার পাতায় লিখিয়া রাখিত না।

কিন্তু গেল কোথায়? পাহাড়টার উপরে নীচে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইলাম। সূর্য্য একরাশ মেঘের আড়ালে সরিয়া পড়িল…আমিও পাহাড় বহিয়া ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরিলাম।

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। মন সেই পাহাড়কে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরদিন সকালে চায়ের লোভ ত্যাগ করিয়া আবার সেই পাহাড়ে গিয়া চড়িলাম। সেখানে…না, সে নাগরা জুতা নাই, সে ফুল নাই, সে খাতা নাই!

পাহাড়ের বুকে বসিয়া রহিলাম। আজ আসিবে না? তখন…

কিন্তু কি তখন? চোখে দেখা! লাভ? হয়তো বিরক্ত হইবেন! মূঢ়তা! তবু এ মূঢ়তা ত্যাগ করিতে পারিলাম না।…

বেলা বাড়িল। নির্ম্মেঘ আকাশ। রৌদ্রে বেশ তেজ। রৌদ্র-হসিত দিগন্তের পানে চাহিয়া দেখিলাম। ভুটিয়াপল্লী-গুলায় জীবনের চাঞ্চল্য! দূরে ঐ আঁকাবাঁকা পথ-রেখায় কালো ধূমের লেখা! ট্রেন চলিয়াছে! নীচে কোন্ গির্জ্জা-ঘরে ঘণ্টা বাজিতেছে…ওদিকটা যেন ভিন্ন জগৎ!

সহসা দেখি, পাহাড়ের নীচে তরুশ্রেণীর মধ্যে এক কিশোরীর মূর্ত্তি! পরণে লাল রঙের শাড়ী কিশোরী ফুল তুলিতেছে।

পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম…পথের সন্ধান না রাখিয়া কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া…পা গেল পিছলাইয়া। হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম। গড়াইয়া একটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া গতির সে বেগ থামিল।

নড়িবার শক্তি নাই। দু' চারিজন ভুটিয়া নিকটে ছিল। তারা আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল। পরে একটু পায়ে বল পাইলাম। গায়ে ধূলা-কাদা সমেত কোনমতে হোটেলে ফিরিলাম।

পথে এক মাদ্রাজীর সঙ্গে দেখা। মাদ্রাজী বলিল,—পড়ে গিয়েছিলেন?

কহিলাম,—কে বললে?

মাদ্রাজী কহিল—আমি হোটেল থেকে বেরিয়েছি, পথে একটি বাঙালী মেয়ে আমায় বললেন—একজন বাঙালী ভদ্র-লোক পাহাড় থেকে পড়ে গেছেন। আপনিই…?

কহিলাম,—লাগে নি।

দাঁড়াইলাম না। মনটা হায়-হায় করিতে লাগিল। তিনি দেখিয়াছেন! তবু একবার কাছে আসিলেন না? পা ভাঙ্গিল কি না? কেন পড়িলাম? সে খোঁজ ..

এই হোটেলেই তবে বাস করেন! মাদ্রাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। মাদ্রাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, তিনি কে!

মাদ্রাজী বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া প্রশ্ন-ভাল দেখাইবে না

হোটেলে আছি। মনে দারুণ দাহ। একই গৃহে বাস। তিনি আমায় দেখিতেছেন। আমি কিন্তু…

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। দুপুর বেলা শয্যা ছাড়িয়া নড়িবার শক্তি নাই। হোটেলের ডাক্তার কি কতকগুলা লোসন দিলেন…

সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়া আছি। হোটেলের বেয়ারা

আসিয়া আমার ঘরে ঢুকিল ; তার হাতে এক রাশ ফুল। পাহাড়ী ফুল। কহিলাম,—কার ফুল ?

বেয়ারা বলিল,—আপনার।

কহিলাম,—কে দিলে ?

সে কহিল,—একটি মেয়েলোক। এতে কাগজ আছে।

ফুলগুলা হাতে লইলাম। ফুলের সঙ্গে ছোট এক টুকরা কাগজ পিনে-আঁটা। কাগজে লেখা আছে—"পার্ব্বতী-সংবাদ !"

পার্ব্বতী ? ঠিক ! পাহাড়ে কাল এই ফুলই দেখিয়াছিলাম। তবে···

মনের সে অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিয়া জানাইতে পারিব না। কখনো কবিতার চর্চ্চা করি নাই। শুধু মনে হইতে লাগিল—আমি যেন নাগপাশে বাঁধা রহিয়াছি ! এ বাঁধন যদি কাটিতে পারিতাম ! লোকালয়ের বাহিরে সেই বিজন গিরির বুকে···হোক রাত্রি···দুঃখ থাকিত না !

আরো দু' দিন বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। দু' দিনই সন্ধ্যায় ফুল পাইলাম। তেমনি টিকিট-আঁটা। টিকিটে সুন্দর অক্ষরে,—"পার্ব্বতীর উপহার !"

বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিলাম,—এ ফুল কে দেয়, সন্ধান নিতে পারিস ? বখশিস দেব।

সে কহিল—সে মেয়েলোক দেয় নি। এ ফুল আজ আমার হাতে দিয়েছে উর্ম্মী দাই।

—তাকে জিজ্ঞাসা কর্—তাকে এ ফুল কে দিয়েছে ?

বখশিসের লোভে বেয়ারা ছুটিল। ফিরিল। সন্ধান মিলিল না। রহস্য !

পায়ের ব্যথা সারিলে সকালে আসিলাম সেই পাহাড়ের ধারে।···ঐ লাল শাড়ী ! এক-মনে ফুল তুলিতেছেন।

নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইলাম। কহিলাম,—ধন্যবাদ !

কিশোরী বাঙালী। রূপসী। আমার পানে ফিরিয়া চাহিলেন। দুই চোখে বিস্ময় ! আমি হাসিলাম। হাসিয়া কহিলাম—কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার ! কি বলেন ?

তাঁর দুই চোখে বিরক্তি ! তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন, আমি কহিলাম—একটা কথা !

তিনি দাঁড়াইলেন—সসঙ্কোচে।

আমি কহিলাম—আজ পরিচয় পেয়েছি। আপনার লেখার যে-পরিচয় আগে পেয়েছিলুম···কিন্তু তার আগে ধন্যবাদ দি···আপনার পুষ্প-উপহারের জন্য।

কিশোরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। আমার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

তবু ছাড়িলাম না। কহিলাম,—আমার কাছে নিজেকে গোপন রাখতে পারলেন না তো ! আমি অনেক সন্ধান করেছি। লুকিয়ে থাকতে পারলেন কৈ !

কিশোরী নির্ব্বাক···নিষ্কম্প ! যেন সেই কুমার-সম্ভবের পার্ব্বতী আজ ঐ গিরি-শিখর হইতে নামিয়া আমার সামনে আসিয়াছেন—তেমনি ভঙ্গী !

আমি তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম···নিজেকে ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া।

সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর। সাহেবী পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক ডাকিলেন,—মীনা···

আমাকে দেখিয়া তাঁর কণ্ঠ নীরব হইল। আমার পানে চাহিলেন। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি। কহিলেন,—এর মানে ?

মানে তিনিই বুঝাইয়া দিলেন। অর্থাৎ মীনা আসিয়াছে দার্জ্জিলিঙে তার মা-বাপের সঙ্গে। ব্যারিষ্টার মিষ্টার রায়ের কন্যা। আর এই ভদ্রলোকটী করেষ্টে চাকরি করেন মিষ্টার দাশ গুপ্ত। দুজনে প্রণয় হইয়াছে।···এ সংবাদ আর কেহ জানে না···দুজনে স্থির করিয়াছে, মিষ্টার রায়ের কাছে একদিন গিয়া দাশগুপ্ত তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিবেন। আমাকে মিনতি জানাইলেন, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। কহিলাম,—তথাস্তু !

কিন্তু সেই নাগরা ? সেই খাতা ?

শুনিলাম, মীনা দেবী কস্মিনকালে নাগরা পায়ে দেন না—নাগরা পায়ে দিলে তাঁর পায়ে ফোস্কা পড়ে। তিনি পায়ে দেন হাই-হীল্ শু ! খাতার কথা তিনি জানেন না।

ভুল করিয়াছি !···

অধৈর্য্য বাড়িল।

মীনা দেবী চলিয়া গেলেন। একা পাহাড়ে বসিয়া রহিলাম। নিজের মনের তত্ত্ব লইলাম। আমার এ চাঞ্চল্য—এ কৌতূহল কেন ? এ কি প্রেম ? ভালবাসা ? কখনো যাকে

দেখি নাই—যার নাম জানি না—শুধু তাঁর পায়ের একজোড়া নাগরা আর হাতের লেখা দেখিয়া…

গল্পে-উপন্যাসেও যে এমন হয় না!

আরো একদিন কাটিয়া গেল। মনকে বুঝাই; তবু তার অধীরতা কাটিতে চায় না।

ডাকে চিঠি পাইলাম। লোকাল্ পোষ্ট-মার্ক। মেয়েলি হাতে খামের উপর নাম ঠিকানা লেখা! বিস্ময়ে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খুলিলাম। পড়িলাম,—

ওগো অপরিচিত

দেখিতেছি তোমার অধীরতার সীমা নাই! আমায় খুঁজিতেছ! কিন্তু কি করিয়া আমার দেখা পাইবে? তোমার অধীরতা দেখিয়া এক একবার মনে হইতেছে, দেখা দিই। কিন্তু সে দেখায় নৈরাশ্যের বেদনা বাড়িবে। যা ভাবিতেছ, আমি তা নই। তুমি ভাবিতেছ, রূপসী, কিশোরী? কিন্তু…

সে কথায় কাজ নাই। এমনি অপরিচয়ের রহস্যের অন্তরালে যদি থাকি, তাহাতে কি ক্ষতি!

তুমি আমায় জান না কাজেই মনের কথা অকপটে তোমাকে লিখিয়া জানাইতে পারি। তোমাকে জানিবার সুযোগ আমার প্রচুর। তোমাকে আমি নিত্য দেখি। দেখিতে ভাল লাগে। হয়তো আমার পরিচয় তুমি কোনদিন পাইবে না। চিঠি লিখিতে চাও? লিখিয়ো। চিঠি যাহাতে পাই, সে ব্যবস্থা করিব।

গোপন করিব না। তোমার উপর কি স্নেহ, কি মমতাই যে জাগিয়াছে! ভালও বাসিয়াছি। কিন্তু এ ভালবাসার তৃপ্তি সম্ভব নয়। তুমি আমার বন্ধু। চিরদিন বন্ধু থাকিয়ো। কেমন? আমায় খুঁজিতে চাও, খুঁজিয়ো। জীবনে মানুষ কত কি খুঁজিয়া বেড়ায়—কেহ অর্থ, কেহ বা পরমার্থ! মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? তুমি যদি আমায় না পাও, আমি তোমায় না পাই—কি করিব? হয়তো পাওয়ার উপায় নাই! ইতি—

অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পাইব না! স্পষ্ট লিখিয়াছে। কিন্তু চিঠি লিখিতে চাই। কাহাকে লিখিব? কোথায় লিখিব?

সন্ধান ছাড়িতে পারিলাম না। সেই পাহাড়ে গিয়া বসিয়া থাকি। কোনোদিন আর সে নাগরা জোড়ার দেখা মিলিল না। খাতা নয়, সে ফুলও নয়!

কিন্তু পাইবার আশা কেন নাই? রূপসী নন! কিশোরী নন! তবে…?

তিনি যেমন হোন্—ভাল বাসিয়াছেন! আমার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন! হয়তো কোন ক্ষণে… সতর্ক রহিলাম। আমার ব্যবহারে কোন ত্রুটি না থাকে…

দুদিন পরে ডাকে আবার চিঠি পাইলাম। তাঁর চিঠি। তিনি লিখিয়াছেন,—

তুমি ভাবিতেছ, আমি তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছি! না বন্ধু, সহজ বেশেই তুমি থাকিয়ো। সেই বেশে পুরুষকে মানায়। জোর করিয়া 'পিউরিটান' সাজিয়ো না। দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ হইতে নিজেকে যে বঞ্চিত করিতে চায়, সে কি মানুষ! না, না, তুমি অমন দুনিয়ার সংস্রব ছাড়িয়া, লোকালয় ছাড়িয়া নির্জ্জনে একান্তে বসিয়া দিন কাটাইয়ো না। লোকের মেলায়, সহস্র লোকের মধ্যেই আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়, সার্থক হয়। সে কথা ভুলিয়ো না।

তোমার জীবন-নাট্যের যে অভিনয় চলিয়াছে, সে নাট্যের আমি মুগ্ধ দর্শক। তোমার চিঠি পাইবার জন্য আমার মন আকুল। কি তোমার মনের কথা—কি ভাষায় তুমি সে কথা জানাইতে চাও—মন কি চায়—অন্ততঃ দুটী ছত্র চিঠি লিখিয়া জানাইয়ো। চিঠি হোটেলের বেয়ারা রমজুর কাছে রাখিয়ো। আমার লোক গিয়া সে চিঠি লইয়া আসিবে।

সে লোকটি কে—দেখিতে চাও? তার সঙ্গে দুটা কথা কহিবে? সম্ভব হইবে না। ইতি—

চিঠি লিখিলাম। ছোট চিঠি। শেলি-কীট্স্ আসিয়া বুকে বসিলেন। লিখিলাম—

দেবি

তোমায় আমি পূজা করি। তোমাকে পাইবার আশা রাখি না। সে আশা দুরাশা!

মনে হয়, আমার মনে তুমি বিরাজ করিতেছ যেন যুগ-যুগ ধরিয়া! তোমার তৃপ্তি আমার জীবনের একমাত্র কামনা হোক্! তোমার মনে যদি আমার জন্য আসন পাতিয়া থাক, সে আসনে বসিবার যোগ্যতা যেন লাভ করি—ইহাই হোক্ আমার সাধনা। দেখা দিবে না, বলিয়াছ। তোমার দেখার আশা আমার দুরাশা; অথচ আমায় তুমি দেখিতেছ—অহরহ! তাই হোক্। আমার বিধাতা হইয়া তুমি বিরাজ কর—নিশিদিন। তার বেশী কামনা আমি করিব না।

চিঠিখানা রমজুর হাতে দিলাম। কে আসিয়া সে চিঠি লইয়া কাহাকে দিবে জানিবার লোভ দারুণ; সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিব না বুঝিয়া নির্জ্জন পাহাড়ে চলিয়া গেলাম!

জবাব মিলিল এক সপ্তাহ পরে। এ কয়টা দিন প্রাণের মধ্যে যেন অধীরতার নায়েগ্রা ছুটিয়াছিল।

চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন—

এখানে বসিয়া কি লাভ! জীবনে অনেক কাজ করিবার আছে। নয়ের জন্ত তোমায় দাস্ত করিতে হইবে না, জানি। দেশের কথা াবিয়ো। অভাগা দেশ—শত দিকে শত অভাব, সহস্র অনুযোগ! সে ভাব ঘুচাইতে কিছু করিবে না? দেশ উদ্ধার করিতে ছোটো—সে থা বলি না। ওদিকে ভারী ভিড়। ও ভিড়ে প্রবেশ করিলে মনে ার পদার্থ থাকিবে না। হিংসা, রেষারেষি, দলাদলির ব্যূহে পড়িয়া ারা যাইবে। সমাজ আছে। সে সমাজে হাজার ফুটা! সে ফুটা মেরামত করিতে পার না?

আমি চলিয়া যাইতেছি। কোথায়—বলিব না। তবে দেখা হইবে। ীবনের দীর্ঘ পথ। সে পথে তুমি চলিবে, আমিও চলিব। পাশাপাশি াড়াইব না, এমন কথা বলিতে পারি না। কোন কাজে হয়তো পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি আসিয়া দুজনে মিলিব। তুমি আমায় চিনিবে না; আমি চিনিব।

তারপর হয়তো একদিন অপরিচয়ের আড়াল ভাঙ্গিয়া দুজনে সামনা সামনি াড়াইব। যদি বুঝি, হয়তো সেদিন আমায় চিনিবে। চিঠি লিখিয়া রমজুর হাতে দিয়ো। আমি পাইব।

তোমার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। তোমার চিঠি সেদিন কে আনে, দখিবার জানিবার কোনো প্রয়াস পাও নাই—এ কি সহজ কাজ! ইতি—

এ চিঠির জবাবে লিখিলাম—

তোমার যে মূর্ত্তি মনে-মনে আঁকিয়াছি—বলিব? তুমি যেন অশরীরী ক্তি! তুমি যেন প্রেরণা! তোমার এ প্রীতির স্পর্শে আমি ধন্ত, কৃতার্থ হইয়াছি। মানুষ ভগবানকে দেখিতে পায় না—পূজা করে। আমিও আমার ভগবানকে চোখে দেখিতেছি না—অন্তরে অনুভব করিতেছি। তোমায় আমি পূজা করি। চিরদিন করিব।

নারীকে পুরুষ চায় ভালবাসিতে—নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া তার সঙ্গে বাস করিতে। তুমি সে নারী নও—বুঝিয়াছি।

জবাব মিলিল,—ছোট্ট জবাব।

ছ'মাস অন্ততঃ কোন চিঠি লিখিব না। কেন—জিজ্ঞাসা করিয়ো না। পারি, সে কারণ পরে বলিব। ইতি—

দার্জ্জিলিংয়ের আকাশ মেঘে কালো হইয়া গেল। বাতাস নাই। পাহাড় যেন বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। প্রাণ যায়! দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া পলাইলাম।

দু'চারি জায়গায় ঘুরিয়া মনে হইল—দেবীর আদেশ, ঔদাস্তে জীবন বহিব না! কাজ আছে। তাই হোক! বেদনায় বুক যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবু দেশ আছে—সমাজ আছে…!

* * *

সাধিয়া গায়ে পড়িয়া একটা কাজে নামিলাম। বরিশালের ওদিকে একদল ভলান্টিয়ার গিয়া কচুরিপানার উচ্ছেদ করিতেছিল—তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। সে কাজ করিতে করিতে ম্যালেরিয়ার মশা মারিতে কামান দাগিলাম; পচা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল কাটানো—একেবারে যেন দশ-প্রহরণধারী হইয়া উঠিলাম। দেবীর উপর অভিমান জাগিয়াছিল। এ কাজ করিতে প্রচুর লোক ছিল! তবু…

পুকুরের পাক উঠিল। দু'চারিটা জেলায় ম্যালেরিয়ার জড় মরিল। কচুরিপানার ডাঁই গেল দেশ ছাড়িয়া। মন দিলাম কন্যাদায় ঘুচাইতে, মামলা-মকদ্দমার হাঙ্গামা মুছিতে!

আঘাত বাজিল। ম্যালেরিয়ার এনোফিলিস মশাকে কায়দা করা যায়; কিন্তু মানুষের মনে লোভের হিংসার যে বিরাট ব্যাসিলি জমিয়া আছে, মানুষ তাদের ছাড়িতে চাহে না, মারিতে চাহে না। বুকের রক্ত দিয়া সে ব্যাসিলি-গুলাকে লালন করিতে, শক্তিমান করিয়া তুলিতে তাদের সাধনার বিরাম নাই।

নিরাশ হইলাম।

প্রায় ছ'মাস কাটিয়া গেল। নোয়াখালির ওদিকে বন কাটানো হইতেছিল। ক্যাম্পে বসিয়া মজুরদের হিসাব কষিতেছি। ডাকে চিঠি আসিল। পরিচিত অক্ষরে অপরিচিতার চিঠি। হিসাব ফেলিয়া চিঠি পড়িলাম। দেবী লিখিয়াছেন,—

তোমার জয় হইয়াছে! যদি আমায় ভুলিয়া থাক, ভাল। এ ছয় মাস তুমি তপস্থায় মগ্ন আছ, নারীর ভ্রূ-বিলাসের স্বপ্নে জীবনকে ব্যর্থ কর নাই, সেজন্ত আমার শ্রদ্ধার সীমা নাই!

এ ছ'মাসে তোমায় দেখিয়াছি,—কি অসাধারণ তোমার নিষ্ঠা, আর শক্তি—তাও দেখিয়াছি। সকলের সঙ্গে সরল ব্যবহার—নারীকে সম্মান—এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। তুমি মানুষের মত মানুষ!

এ ছয় মাসের মধ্যে কতবার তোমায়-আমায় দেখা হইয়াছে। তিনগাঁয়ের মেলায় কলিকাতা হইতে বহু নর-নারী সেখানে গিয়াছিল; আমিও ছিলাম সে দলে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল মিস্ দত্ত। তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিতে তাঁর কি সাধ! —তুমি সে মোহে এতটুকু বিচলিত হও নাই, তাও জানি! তারপর বেলটুলির বন্যায় অন্ন-বস্ত্র-বিতরণের দিন—সেদিনও তোমার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তোমাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা হইয়াছিল। নারীর সংসর্গে পুরুষ এমন অবিচল থাকে, পূর্ব্বে দেখি নাই। আর একটু হইলেই নিজেকে

ধরা দিয়াছিলাম ! ভাগ্যে তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু হইতে তোমার ডাক আসিল—তুমি চলিয়া গেলে। আমি মুক্তি পাইলাম।

তোমার কাছ হইতে চিঠি আমি প্রত্যাশা করি না। চিঠি লিখিয়া লাভ নাই। জীবনে এমনি অপরিচিতাই থাকিব। উপায় নাই। তবু চিঠি যদি লিখিতে চাও, নিষেধ করিব না। চিঠি লিখিয়া সে চিঠি C/o পোষ্ট মাষ্টার, ভবানীপুর—এই ঠিকানায় পাঠাইতে পার। সে চিঠি আনাইবার ব্যবস্থা আমি করিব। ইতি—

চিঠি পড়িয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বুক আমার নিশ্বাসে ভরিয়া গেল। ভুলিয়া গিয়াছি ? হায় রে, চাঁদ কখনো সূর্য্যকে ভোলে—যে-সূর্য্য তার বুকখানাকে আলোয় আলো করিয়া তুলে ? ফুল তার গন্ধ ভুলিয়া যাইবে ? যে-গন্ধে তার বুক ভরিয়া থাকে ?

দেখা হইয়াছিল—তিনগাঁয়ে। দেখা হইয়াছিল বেল-টুলিতে ! ম্যাজিষ্ট্রেটের ডাক আসে ! ডাকের কথা মনে পড়িল। কিন্তু তার পূর্ব্বে কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম ? কোন্ নারী ?

মনে পড়িল না।

ভাবিলাম, আমাকে লইয়া খেলা খেলিতেছে ! কেন এ খেলা ? যে-খেলার অর্থ নাই !

চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। লিখিলাম,—

আমায় যদি পরখ করিলেন, তবে কেন এ অপরিচয় ? আপনার কত রকমের মূর্ত্তি আজো বসিয়া মনে মনে রচনা করিতেছি !

কেন যে পরিচয় চাই, বুঝি না। এই তো চিঠির মারফৎ পরিচয় চলিয়াছে। তবু মনের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি। আমি চাই নারী—যে নারীকে ভালবাসিব—যে-নারী আমায় ভালবাসিবে !

এ লুকোচুরি খেলায় মধ্যে যেটুকু আভাস পাই, মন তাহাতে আশায় আনন্দে রাঙিয়া ওঠে ! একটি মিনতি, একবার অপরিচয়ের আড়াল ভাঙ্গিয়া পাশে আমার দাঁড়াইতে দিন ! নহিলে নিজের পরিচয় কি করিয়া পাইব ? আমার মনে এই যে আকুলতা—এ আকুলতার অর্থ আজ বুঝিতেছি না। বুঝিবার সুযোগ কখনো মিলিবে না ?

চিঠি লিখিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। দু'দিন, চার দিন, দশ দিন কাটিয়া গেল ; একমাস, দু'মাস, এক বৎসর কাটিয়া গেল। জবাব আসিল না।

মনে অসহ্য অধীরতা। এই অসীম অনন্ত আকাশ-তলেই আছে—সে আছে ! আমাকে সে দেখিতেছে—আমাকে সে জানে। আর আমি···

এ অধীরতা বুকে বহিয়া কাজ করা যায় ?

অথচ অকাজ লইয়া ঔদাস্য বহন করিতে ভয় হয়। সে রাগ করিবে ; ব্যথা পাইবে। ভূতের মত এ আতঙ্ক সারা মনে ছাইয়া রহিল।

ছুটিলাম আসামে ; বন্যায় পাঁচ-সাতখানা গ্রাম ধ্বসিয়া গিয়াছে। ছুটিলাম কটকে ; মহানদীর জল ফাঁপিয়া ফুলিয়া বহু গ্রাম ভাসাইয়া দিয়াছে। তারপর বেহারে—ভূমিকম্পের প্রলয়-দোলে যেখানে শ্মশানের বিভীষিকা অট্টহাসি জুড়িয়া দিয়াছে।

মরণের তাণ্ডব লীলা ! সে দৃশ্যের অন্তরালে দুনিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। ভালবাসা, স্নেহ, মায়া সে দৃশ্যে শিহরিয়া ঝরিয়া পড়ে বুকের বাঁধন কাটিয়া। শুধু মনে হয়, জগতে সব মিথ্যা, মরীচিকা···সত্য শুধু এই কঠিন নির্ম্মম মৃত্যু !

মজঃফরপুরে তাঁবু পড়িয়াছে। আর্ত্ত অসহায় যারা দুনিয়ার বুকে পড়িয়া আছে—রিক্ত সর্ব্বহারা ভূতের মত দেহগুলা শুধু নড়িয়া বেড়ায়—মন নাই, অনুভূতি নাই—তাদের লইয়া কোন মতে দিন কাটিতেছে। হঠাৎ নিতাই আসিয়া খবর দিল, দু'নম্বর তাঁবুতে একবার আসিতে হইবে।

নিতাই আমার সঙ্গে কাজ করে।

আসিলাম। দেখি, শয্যায় পড়িয়া আছে এক নারী। মুখে-মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শীর্ণ একখানি হাত মোটা চাদরের আবরণ ঠেলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

নিতাই কহিল—ইনি আপনাকে ডাকছেন।

কাছে গেলাম।

কহিলাম—আমায় ডাকছেন ?

চোখ দুটিতে ব্যাণ্ডেজের বাঁধন ছিল।

রোগী কহিলেন—আপনি সুরেশ বাবু ?

কহিলাম—হ্যাঁ।

তিনি কহিলেন—আমায় আপনি দেখতে চেয়েছিলেন—পরিচয় চেয়েছিলেন। তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

বিস্ময় বোধ করিলাম। দেখা ! পরিচয় ! এত বড় পৃথিবী—সে পৃথিবীতে নর-নারীর প্রকাণ্ড ভিড়। এ

ভিড়ের মধ্যে শুধু এক জনের মাত্র পরিচয় চাহিয়া কাঙাল··· যুগ-যুগান্ত···জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া···

ইনি···?

নারী কহিলেন—মোহ! তবু এ মোহ আমায় আচ্ছন্ন রেখেছে চিরদিন। পরিচয় দেবার উপায় আমার ছিল না। আমি···আমার মা ছিলেন উন্মাদ। আমার দিদিমা ছিলেন উন্মাদ। আমার সম্বন্ধে ডাক্তাররা বলেছিলেন, এ রোগ এড়িয়ে থাকা হয়তো সম্ভব হবে না! বিবাহ করিনি। বাবা বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় বিপত্তির কথা শুনে আর-কাকেও বিপন্ন করতে পারিনি। দার্জ্জিলিঙে যখন আমার সন্ধান কর, ভেবেছিলে, আমি কিশোরী—আমি রূপসী! কিন্তু আমি তা নই। তোমার সে সন্ধানের অধীরতায় বুঝেছিলুম, আমায় তুমি যা ভেবেছ, যা ভেবে ভালবেসেছ—আমার সত্য পরিচয় পেলে তোমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে—হয়তো ঘৃণায় তুমি মন ফিরিয়ে নেবে। তাই পাছে তোমার সে-বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, এইজন্য দেখা দিইনি, ধরা দিইনি। জীবনে যেদিন বসন্ত জেগেছিল, সেদিন অনেকে এসে প্রলুব্ধ গুঞ্জন শুনিয়েছে। তারা আমার বংশের ইতিহাস জানত। তবু তাদের গুঞ্জন থামেনি। তাদের এ গুঞ্জনের অর্থ ছিল। আমি জানতুম। আমার বাবার ছিল অগাধ ঐশ্বর্য্য—আর আমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। সেদিন তাদের পানে ফিরে তাকাইনি অবজ্ঞায়, ঘৃণায়। ভগবান শাস্তি দিলেন। বসন্ত চলে গেল—জীবনের কুঞ্জখানিকে জীর্ণ করে। নিঃসঙ্গতায় অস্বস্তি বোধ করতুম। পাশে কাকেও পাবার উপায় নেই—অথচ মন তা শুনতে চাইল না! পাগল হাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি দিকে দিকে—পুরুষের উপর মনকে বিরূপতায় ভরিয়ে, বিরাগে ভরিয়ে!

তারপর দার্জ্জিলিংয়ের সেই পাহাড়। জুতো রেখে, লেখা রেখে ঝর্ণা দেখতে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে দূর থেকে দেখি,—তুমি আমার লেখা পড়ছ। ভাল লাগল। মনে হল, দুনিয়ার বুক থেকে সব মুছে গেছে—জেগে আছে শুধু এই ছোট পাহাড়! আর সে পাহাড়ের বুকে তুমি আর আমি! কিন্তু আমি কিশোরী নই, রূপসী নই—নারীকে পুরুষ যে-বেশে, যে-রূপে চায়—আমার সে-বেশ সে-রূপ অনেকদিন অঙ্গ থেকে ঝরে গেছে। তবু মনের তারুণ্য ঘোচেনি। তাই দেখা দিতে পারিনি—দেখা দিইনি—ভয়ে! ভুল করে মীনার সঙ্গে তুমি পরিচয় করতে গিয়েছিলে, তাও জানি।

দেখা করবার জন্য, আলাপ করবার জন্য মন অধীর হ'ত। লোভ প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু মনকে শাসিয়েছি—না! যদি আঘাত দিই?······

অনেক কথা। ক'বৎসরে যত কথা বুকে সঞ্চিত ছিল, অপরিচিতা সে-কথার এতটুকু গোপন রাখিলেন না।

নিজে তাঁর পরিচর্য্যার ভার লইলাম। তিনি কহিলেন—আমার জন্য আর-সকলকে ত্যাগ কর না।

কহিলাম—ত্যাগ করিনি। সকলের কাজ ভাগ করা আছে। আপনার পরিচর্য্যা যিনি করতেন, তাঁর সঙ্গে এ কাজের বদল করেছি মাত্র।

দুটি ঠোঁটে মৃদু হাসির কিরণ—সে যেন শ্রাবণের নিশীথ মেঘে বিজলীর রেখা!

পথ্য আনিয়া দিই। রাত্রে তাঁর শয্যার পাশে বসিয়া থাকি। দারুণ গুমট···পাখার বাতাস করি। ঘুম ভাঙ্গিলে বলেন—জেগে আছ! অনেক রাত্রি হয়েছে। ঘুমোও গে!

আমি জবাব দিই,—আর্ত্তের সেবা ঘুমের চেয়ে বড়।

তিনি বলেন,—এক জনের উপর সারাক্ষণ এমন করে মনোযোগ দেওয়া কি ঠিক?

আমি বলি,—অন্য জনের কাছে লোক আছে।

তিনি বলেন,—না, না। এত পরিচর্য্যার প্রয়োজন নেই। তুমি যাও, ঘুমোও গে। যদি অসুখে পড়, সেবার কাজে শক্তি কমবে!

অজস্র মিনতি! অনিচ্ছায় হাতের পাখা ফেলিয়া দিই। তাঁহারি শয্যার তলে ঘরের এক প্রান্তে পড়িয়া থাকি। চোখে ঘুম আসে না—আসিতে চায় না! চাহিয়া থাকি রোগ-শয্যা-শায়িনীর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখের পানে! দেখা যায় শুধু ঠোঁট দুটি! সর্ব্বাঙ্গে আবরণ!

ক'দিন কাটিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া নিত্য দেখেন। মুখের মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়। সে সময় ঘরে আমার থাকিবার উপায় নাই। নিষেধ আছে। বলিয়া দিয়াছেন, সে সময় সঙ্গে থাকিলে আমি রাগ করিব।

কি পাথর বুকে বহিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই। বুক একেবারে ব্যথায় টনটন করিতে থাকে!

সেদিন ডাক্তার বলিয়া গেলেন,—কাল ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিব। ঘা সারিয়াছে।

বৈকালের দিকে আমায় বলিলেন,—একটা কথা আছে।

কহিলাম,—বলুন…

কহিলেন,—কাল থেকে আমার সঙ্গে দেখা করবে না। মানুষের মন—সে মনের সঙ্গে জোর চলে না। কথা রেখ।

আশার উচ্ছ্বাসে বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। এ-কথায় সে বুক পাতালে নামিয়া গেল।

কহিলাম,—তাই হবে।

কহিলেন,—বড় আনন্দ পাই। এত-বড় কাজে নিজেকে স'পে দিয়েছ—চিরদিন এমনি মনে-মনে পরিচয় থাকুক! চোখের দেখায় অনেক মলা-মাটী ভেসে ওঠে। কাজ কি এ পরিচয়কে মলিন করে!

কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অশ্রুর বাষ্পে কণ্ঠ ভরিয়া ছিল।

তিনি কহিলেন,—একদিন আমার কথা বলব। আজ নয়; কাল নয়। অনেক দিন পরে।

সন্ধ্যার দিকে খবর আসিল, মতিহারীর দিকে মহামারী দেখা দিয়াছে। দুজন ভলাণ্টিয়ার মারা গিয়াছে। সেখানে রীতিমত বিভীষিকা!

রাত্রেই মতিহারি ছুটিলাম। থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার দিকে ফিরিলাম। ফিরিয়া তাঁর ক্যাম্পে ঢুকিয়া দেখি, তিনি নাই।

কোথায় গেলেন?

সন্ধান লইয়া জানিলাম. সকালে ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়, দুপুর বেলায় চলিয়া গিয়াছেন—ট্রেণে। কোথায়—কাহাকেও বলিয়া যান নাই। একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন। খামে মোড়া চিঠি। খামে আমার নাম

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। একটিমাত্র লাইন,—খরচের জন্য একশো টাকা রাখিয়া গেলাম।

একখানা একশো টাকার নোট খামের মধ্যে ছিল।

এমনি করিয়া চলিয়া গেলেন! নামটুকু…?

অভিমানের ব্যথায় বুক ভরিয়া উঠিল। অনেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—উনি কে?

কেহ নাম জানে না। বলিল, রিলিফের কাজে সঙ্গে সঙ্গে আছেন। একটা গৃহের মধ্য হইতে কাহার সম্পত্তি উদ্ধার করিতে গিয়া ফাটা ছাদ মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাহাতে খুব আঘাত পান। এবং ক্যাম্পে আনা হয়…

এই পর্য্যন্ত!

তাই দেখা! এমনি অপরিচয়ের অন্তরালেই তুমি থাক! আমায় তুমি দেখ! যে ভার দিয়াছ, সে ভার বহিবার যোগ্যতা আমার কতখানি!

মাসের পর মাস কাটিয়া চলিয়াছে। কাজের শিকলে নিজেকে বাঁধিয়া বসিয়া আছি।

কার জন্য, কিসের জন্য এমন করিয়া…

সেই দুটি ঠোঁট শুধু চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে! সে-ঠোঁটে হাসির মৃদু দীপ্তি! আঁধার-মেঘে বিজলীর রেখা!

অবসাদ টুটে। কাজ করি। কোথায় আমার অলক্ষ্যে চাহিয়া আছে সে দুটি চোখ! কোথায়, কে জানে!

অনেকে বলে, পাগল! আমারো মনে হয়, বুঝি তাই!

—শ্রীঅনিলা দেবী

স্তোত্রমালা

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। ইত্যাদি-

ওই উঠছে জ'লে পূর্ব্ব দিকে
চক্ষু জগতের!
দেবের সে যে প্রিয়, ওরে
জীবন মানবের!

যেন শত শরৎ হেরি চোখে,
বাঁচি শরৎ শত,
শত শরৎ শুনি কানে,
কহি শরৎ তত।

শত শরৎ অদীন বেশে
রহি বিদ্যমান,
শত শরৎ পরেও যেন
ভুঞ্জি ধরাখান!

কবিরঞ্জন

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালীর প্রসিদ্ধি একটা বহু দিনের পুরানো কথা। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত শ্রীধরের "ন্যায়-কন্দলীর" নাম খুব বিখ্যাত। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক উদায়নাচার্য্য প্রভৃতির নাম কে-না জানেন? তথাপি কেন জানি না, বাঙ্গালীকে ন্যায়ের শেষ-শিক্ষা লাভের বা শেষ-পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মিথিলায় যাইতে হইত। বাঙ্গালী বিদ্যার্থী মিথিলায় যাইত, বেশ শিক্ষিত ছাত্রই যাইত এবং সেখান হইতে যোগ্য-সম্মান লইয়াই ফিরিত। কিন্তু মনে যেন কেমন একটা অতৃপ্তি, একটা অস্বস্তি! হাজার হৌক বিদেশ তো, বিদ্যা—কিন্তু বিদেশীর কাছে ভিক্ষা করিয়া শিক্ষা তো!

যাই হৌক ছাত্র যায়।

খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ শতাব্দী; মিথিলায় বিদ্যাপতির তখন খুব নাম। একে পণ্ডিত, তায় কবি,—মিথিলার রাজার সভা-কবি। তাঁর রচিত পদাবলীর খ্যাতি মিথিলার ছোট বড় নরনারী সকলেরই মুখে। বিদ্যাপতির পদের অন্ততঃ দুই একটী "চরণ" না জানা খুবই লজ্জার কথা। এই বাতাস বাঙ্গালী ছাত্রদের গায়েও লাগিল, বিদ্যাপতির পদ তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল। টোলের ছাত্র, সংস্কৃত কাব্য-নাটকের রসে রসিক ছাত্র—নৈয়ায়িক হইলে কি হয়! কতকটা দেশাচারে, হুজুগের খাতিরে, কতকটা সত্যকার সৌন্দর্য্যে তাহারা কবি বিদ্যাপতির পদ মুখস্থ করিতে বাধ্য হইল। দেশে যখন ফিরিল, ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির দুই দশটা পদও লইয়া আসিল। এমনই করিয়াই বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালায় প্রচারের সূত্রপাত হয়।

বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় যাইত, মিথিলার কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, অন্ততঃ তার শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার বাঙ্গালীর মনে নিশ্চয়ই ছিল। অন্যথায় সেকালে এমন রাজশাসন তো ছিল না যে, শিক্ষা তুলারূপ হইলেও মিথিলা ঘুরিয়া না আসিলে তোমার দ্বিজত্ব ঘটিবে না, তোমার চাকরী মিলিবে না। তথাপি তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেদিনও বাঙ্গালী পরাধীন ছিল, কিন্তু বোধ হয় এমন করিয়া আপনাকে বিকাইয়া দেয় নাই। তাই জাতির মর্য্যাদাবোধ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে সাকার ও সাবয়ব হইয়া উঠিল। ইনিই স্বনামধন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম। মিথিলার পণ্ডিতেরা ইঁহার নিকট হইতে সমস্ত পুঁথি-পাতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাই ইনি সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্মৃতির তুলোটে লিখিয়া লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়াছিলেন। ইঁহারই ক্ষণজন্মা ছাত্র কাণা শিরোমণি রঘুনাথ বিচারে পক্ষধর মিশ্রকে হারাইয়া দিয়া ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ছাত্র আর মিথিলায় যায় নাই। নব্য-ন্যায় বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের সৃষ্টি।

বাঙ্গালী ছাত্রের মিথিলায় যাওয়া বন্ধ হইল, নূতন পদের আমদানীর সুযোগ আর রহিল না। কিন্তু পদ যাহা আসিয়াছিল, তাহাতেই বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিলেন। বাঙ্গালার বিদ্যামোদী, বাঙ্গালী রসিক সামাজিক—চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় একটা যুগান্তর—বাঙ্গালার একটা রূপান্তর ঘটিল। রঘুনন্দনের স্মৃতি, রঘুনাথের ন্যায়, আগমবাগীশের তন্ত্র এবং সর্ব্বোপরি মহাপ্রভুর প্রেম কিছু কম-বেশী অগ্র-পশ্চাৎ বাঙ্গালার পুরানো রূপের উপর একটা নূতন গড়ন দিল। সকলের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন,—সমাজের আগাগোড়া নাড়া দিলেন, মানুষের পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ তাঁহার সাধনের অঙ্গ হইল, তাঁহার আস্বাদন-গৌরবে এই কবিদের পদের আর একটা দিক খুলিয়া গেল। লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল তাহাদের গলার মালা—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে গাঁথা মালা স্বরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। রসে-ভাবে, রূপে, রঙে, গন্ধে-মধুতে জমাট বাঁধিয়া অপরূপ গোরারূপে মূর্ত্তি ধরিয়াছে—কাঞ্চনে পীযূষে মথিত রূপ! বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালার হাটে ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াইয়া পড়িল, সে পদ বাঙ্গালীর নিজস্ব হইয়া গেল।

বসন্ত নূতন জীবন, একটা আগাছা হইতে বনস্পতির মাথায় পর্যান্ত তার আগমনীর রঙ ধরাইয়া দেয়। নূতন পাতায়, নূতন ফুলে তরুলতা সোহাগে যেন ফাটিয়া পড়ে। কত দেশ হইতে কত অজানা পাখী আসে, পরিচিত অপরিচিত কত রকমের সুরে কত মধুর গান গায়। উৎসবের সে কি সমারোহ! বাঙ্গালী একদিন এই উৎসবে মাতিয়াছিল, বাঙ্গালায় বসন্ত আসিয়াছিল। মহাপ্রভু আসিলেন;—হেম-গৌর তনু ধূলিধূসরিত, নয়নে করুণার ধারা, অমৃত-কণ্ঠে উচ্চ হরিকীর্ত্তন! বাঙ্গালী সে রূপ দেখিল, দেখিয়া ধন্য হইল। চির-অনর্পিত করুণার বন্যায় স্নান করিয়া জুড়াইল। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গগনে পবনে ধ্বনি তুলিল—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর, চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর!" কবিরঞ্জন, রায়শেখর, বাসু ঘোষ, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য্য, মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। এই সমস্ত পুণ্যস্মৃতি ভগবৎপ্রেমিক পিক-পাপিয়ার মধুর কণ্ঠ আজিও বাঙ্গালায় প্রতিধ্বনি জাগায়। আমরা কবিরঞ্জনের কথা বলিব।

গৌরলীলা এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ লিখিয়া কবিরঞ্জন খুব নাম করিয়াছিলেন। এক সময় এমন হইল—তাঁহার পদ বাঙ্গালীর মুখে মুখে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, লোকে তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইল, মজিল—তাঁহাব নাম দিল "ছোট বিদ্যাপতি"। বিদ্যাপতির পরিচয় তখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া গিয়াছে বিদ্যাপতি কোন্ দেশের লোক, কোথায় তাহার ঘরবাড়ী। অমনি গল্প তৈয়ারী হইয়া গেল—"বিদ্যাপতির বাড়ী ছিল যশোরে, তিনি ছিলেন যশোরের রাজার সভাকবি, রাজার রাণী লছিমার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল। লছিমাকে না দেখিলে তিনি কবিতা লিখিতে পারিতেন না। একদিন রাজার সন্দেহ হয়,—রাজ-বাড়ীতে চোর আসে, তিনি পাহারার বন্দোবস্ত না করিয়া বিদ্যাপতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাপতি পাঁচীলের পাশে শূল পুঁতিয়া রাখিতে পরামর্শ দেন; এবং নিজে জানিয়া-শুনিয়া রাত্রিকালে পাঁচীল টপকাইতে গিয়া সেই শূলে পড়িয়া প্রাণ হারান"। আমার মুখের কথা নয়, এ গল্পের মস্ত মস্ত কয়েকটী কবিতা আছে, এবং সে কবিতা অন্ততঃ দুশো বছরের পুরানো পুঁথির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

কালে লোকে ভুলিয়া গেল, কোন্ পদ কার লেখা। "ছোট বিদ্যাপতি" ও "বড় বিদ্যাপতি"-র পদের গোলযোগ ঘটিয়া গেল। সাধারণে মনে করিল, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিরই একটা উপাধি। পরে যখন বাঙ্গালায় পদাবলী-সাহিত্য আলোচনার ঢেউ উঠিল, যাঁহারা সস্তায় নাম কিনিতে চাহিলেন, তাঁহারা অত শত খোঁজ করিলেন না, বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জনে তালগোল পাকাইয়া একটা নূতন-কিছু-করার সাধ মিটাইলেন। এই অপকর্ম্মের প্রধান ভাগী হইয়াছেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়।

প্রায় বছর বিশেক আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত "বিদ্যাপতি"-সম্পাদনের ভার লইয়া তিনিই ছাপার অক্ষ বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জনকে জোড় বাঁধিয়া দেন। তাহার পর হইতেই আমরাও, যাহারা ছাপার অক্ষরকে আপ্ত-বচন বলি, সকলেই বলিলাম,'আমেন!' কিন্তু পূর্ব্বেকার সংগ্রহে কোথাও এরূপ নাই। সাধারণে যাই মনে করুক, পণ্ডিত যাঁহারা, পদের সংগ্রাহক যাঁহারা—তাঁহারা পরিচয় জানুন আর নাই জানুন, পদের গোলমাল কখনই করেন নাই। বিদ্যাপতির পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং কবিরঞ্জনের পদ কবিরঞ্জনের ভণিতায় সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য দু'একটী পদের উল্টা-পাল্টা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ছাপা বইএর উল্লেখ করিতে পারি। বইখানির নাম প দ ক ল্প ল তি কা। ছোট বই, কিন্তু অনেক উৎকৃষ্ট পদ সংগ্রাহকের রসজ্ঞতার পরিচয় দেয়। এই বইএ কবিরঞ্জন-ভণিতার পদ পাওয়া যায়। বইখানার মুখপাত এইরূপ—

"পদকল্পলতিকা। ফলতঃ প্রাচিন পদকর্ত্তা মহাশয়গণ রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক পদ সম্প্রতি শ্রীযুত গৌরমোহন দাস দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল॥ শকাব্দা ১৭৭১"।

এই সংকলন কিছু কম শতখানেক বৎসর পূর্ব্বের কথা। প দ ক ল্প ত রু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থেও কবিরঞ্জনের পদ কবিরঞ্জনের ভণিতাতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কি "চম্পতি" ইত্যাদি কেবল পরের উপাধি কাড়িয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, ভূপতি সিংহ প্রভৃতি নামগুলিও তিনি বিদ্যাপতির গজমুণ্ডস্বরূপ জুড়িয়া দিয়াছেন।

রামগোপাল দাস—সংক্ষেপে গোপাল দাস নামে শ্রীখণ্ডে এক কবি ছিলেন। শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলার একটী সমৃদ্ধ পল্লী, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের পাট। গোপালদাসের রসকল্পবল্লী নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের চারিখানা প্রতিলিপি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রচয়িতা লিখিয়াছেন—

বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে।
আরম্ভ হইল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে॥

গ্রন্থখানি ঐ শাকেরই কার্ত্তিক মাসে সম্পূর্ণ হয়। অঙ্গ-শব্দে বেদের ছয়, আয়ুর্ব্বেদের আট ও ভক্তির নবাঙ্গ তিনটাই লওয়া চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অর্থে ছয় ধরিয়া ১৫৬৫ শকাব্দা, খ্রীষ্টাব্দ ১৬৪৩ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হয়, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, এই জ্ঞাত-রচনাকাল পুঁথিখানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, এবং এই পুঁথির সাহায্যে পদাবলী সাহিত্যের গহনে কিঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত হইতে পারে। আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। নায়িকা-ভেদের পুঁথি, আদি-রসের অবস্থাভেদে নায়িকার ছবি ফুটাইতে গিয়া গোপালদাস মহাজনদের পদ তুলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। আগে পদকর্ত্তার নাম তুলিয়া পরে সম্পূর্ণ পদ বা পদাংশ তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অনেক পদের রচয়িতার খোঁজ পান নাই, ভণিতা ঠাহর করিতে পারেন নাই। সেই সব পদের পূর্ব্বে "মহাজনস্য", "কস্যচিৎ" এইরূপ লেখা আছে। ইনি শ্রীখণ্ডের নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

শ্রীকবিরঞ্জন, দামোদর মহাকবি।
যশোরাজখান আদি সবে রাজসেবি॥

কবি দামোদর সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ। যশোরাজখান অন্যতম পদকর্ত্তা, ইহার একটী পদে "শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সেহ এহ রসজান। পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশোরাজখান॥"—ভণিতাংশে এইরূপ উল্লেখ আছে। এই হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দুইজন কবি এবং কবিরঞ্জন ইঁহারা রাজসেবী অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্র ছিলেন।

গোপালদাসের লিখিত শাখা-নির্ণয় নামে আর এক-খানি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি শ্রীখণ্ড হইতে ছাপানো হইয়াছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। এই পুঁথিতে এমন অনেক কথা আছে, যাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা হইলে পদাবলী সাহিত্যের অনেক নূতন খবর, অজানা খবর পাওয়া যাইতে পারে। শাখা-নির্ণয়ে নরহরি সরকার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র রঘুনন্দনের শাখার কথা আছে। রঘুনন্দনের শাখায় রামগোপাল লিখিতেছেন—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসি।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়॥
পদং যথা—
'শ্যাম গৌরবর্ণ একু দেহ' ইত্যাদি
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্ বিলাসঃ।
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভর্সিত পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলানিধানং॥"
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

এ প্রশংসা অতিশয়োক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কবিরঞ্জন সেকালের একজন খুব বড় কবি না হইলে গোপাল দাস কখনই মুক্তকণ্ঠে এমন উচ্চ প্রশংসা করিতেন না। উদ্ধৃত কবিতা হইতে মনে হয়, কবির নাম ছিল রঞ্জন। তিনি কবি-রঞ্জন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন, তাই স্বরচিত পদেও কবিরঞ্জন ভণিতাই দিতেন। ইনি বাঙ্গালায় কিছু কবিতা ও পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত শ্লোক বা কোন কাব্য-নাটকাদিও রচনা করিয়া থাকিবেন। হয়তো ইনি লোকের মনরক্ষার জন্য কিম্বা গুণমুগ্ধ (একালের মত সেকালেও ছিলেন বৈ কি) বন্ধুগণের অনুরোধে স্বরচিত পদে বিদ্যাপতি ভণিতাও ব্যবহার করিতেন। ইহার অধিক কবির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গোপালদাস "শ্যামগৌরবরণ" যে পদাংশটী তুলিয়াছেন, আমরা সেই পদটী পুরা তুলিয়া দিলাম।

শ্যাম গৌরবরণ একু দেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥

সৌরভে আগর মুরতি রসসার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানায় নিগুঢ় বিহার॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান।
নারী পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন॥
ত্রিপুরাচরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥

প দ ক ল্প ত রু গ্রন্থের কোন কোন পুঁথিতে এই পদটী কবিশেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতেই ইহা কবিরঞ্জনের নামেই আছে। গোপালদাস বিশেষ করিয়া এই পদটী কবিরঞ্জনের নামেই চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন।

র স ক ল্প ব ল্লী গ্রন্থে কবিরঞ্জনের নামে যে কয়টী পদ ও পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির প্রথম চরণ দেখাইতেছি।

(১) নব দর্শনে নবীন নারী,
(২) গুরুয়া গরজে ঘন গগনে না গণে মন,
(৩) দৃঢ় বিশোয়াসে পন্থ নেহারি,
(৪) কি কহব মাধব পীরিতি তোহারি
(৫) চরণনখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ
(১১) উদসল কুন্তল ভারা

প দ ক ল্প ত রু তে কবিরঞ্জন ভণিতার সাতটী পদ আছে।

(১) আর কবে হবে মোর শুভখণদিন (২১২ সং)
(২) কি কহব রে সখি আজুক বিচার (২৫৬)
(৩) কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ (৬৮০)
(৪) পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর (৯৬৪)
(৫) উদসল কুন্তল ভারা (১০৭৮)
(৬) কি কব রাইয়ের গুণের কথা (১১০৪)
(৭) আর সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব (১৭৬০)

র স ক ল্প ব ল্লী-ধৃত 'উদসল কুন্তল ভারা" পদটী কবিরঞ্জনের ভণিতায় এবং 'চরণনখ রমণীরঞ্জন ছান্দ' (৪৫২) পদটী বিদ্যাপতি-ভণিতায় প দ ক ল্প ত রু তে স্থান পাইয়াছে। 'চরণ নখ' পদটী গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বর স্বপ্রণীত র স ম ঞ্জ রী গ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাতেই উদ্ধার করিয়াছেন। র স ম ঞ্জ রী গ্রন্থে এই তিনটী পদ পাইতেছি—

(১) দৃঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
(২) পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি
(৩) চরণনখ রমণীরঞ্জন ছান্দ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-সম্পাদিত অপ্রকাশিত-প দ র ত্না ব লী গ্রন্থে—

(১) সখিহে তোহে কহুঁ আজুক ভাগি
(২) এ ধনি এক নিবেদন তোয়
(৩) হার উর মরকত মুকুরক জোতি

এই তিনটী পদ আছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর গী ত চ ন্দ্রো দ য় গ্রন্থেও কবিরঞ্জনের ভণিতায় কয়েকটী পদ পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪ নং পুঁথিতে একটী পদে বিদ্যাপতি ও হুসেন শাহের নাম পাওয়া যাইতেছে।

আজু গোধূলি দেখেলি বালা
যব মন্দির বাহির ভেলা
নব জলধর বিজুরি রেহা দন্দ বাড়াইয়া গেলা।
সে যে অলপ বয়েস বালা
যেন গিথুন পহুপ মালা
থোর দরশনে আঁশ না পুরল বঢ়ল মদন জ্বালা।
গোর কলেবর লোনা
জনু কাজরে উজর সোনা
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খানি দুলহলোচন কোনা।
সাহাহুসেন জানে
জাকে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীবি রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।

পদটীর পাঠ বিকৃত। কিন্তু এই পদে হুসেন শাহ এবং বিদ্যাপতি ভণিতা সন্দেহজনক। আর একটী সন্দেহজনক পদ এইরূপ—

শিরিশ কুসুম জিনি তনু অতি মাকা খিনী।
উচ কুচ ভিরি ফল লাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি।
নলুয়া বয়নি দশ দশন বোলয়ে হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশি॥
কাজরে উজর শর ধয়ল নয়ন বর।
ভ্রমরা ভুলল যৈছে বিমল কমল পর॥
কবিরঞ্জনে ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুলে কমলা বাণী॥

র স ক ল্প ব ল্লী-ধৃত একটী পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩নং পুঁথিতে পাইয়াছি। র স ক ল্প ব ল্লী-তে মাত্র ইহার দুইটী কলি ধরা হইয়াছে। সম্পূর্ণ পদটী এইরূপ—

গগনে গরজে ঘন তাহে না গণে মন
কুলিশে না করু মুখ বঙ্কা।
তিমিরক অঞ্জন জলধারে ধোয়ে জনু
তে উপজায়ত শঙ্কা॥
মাধব ধনী আনলু কত ভাঁতি।
প্রেম হেম পরি- খাকু কসোটীয়
ভাদর কুহু-তিথি-রাতি॥
ভাগে ভুজগ শির করে অভিনয় করি
ঝাপল ফণী মণি দাপে।
জনি সজল ঘন সো দেই চুম্বন
তৈঁ তুয়া মিলল সমীপে॥
নারি রতন ধনি নাগর ব্রজমণি
রসগুণে পহিরল হারে।
গোবিন্দ চরণে মন কহে কবিরঞ্জন
সফল ভেল অভিসারে॥

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিতে পারি যে, কবিরঞ্জন নামে শ্রীচৈতন্য দেবের সম-সময়ে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং তাঁহার কবিতা ও পদাবলী বাঙ্গালায় বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। আমার সন্দেহ হয়, তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতা বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুতে অনেক ভাল বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতির ভণিতায় সংগৃহীত আছে। "মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব" পদের কথা সকলেই জানেন। আর একটী পদ—

শুনলো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরাণে বাধালি একাজ করিলি কি।

এ সমস্ত পদ যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচনা করেন নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই পদগুলি কবিরঞ্জনের রচনা বলিয়া মনে হয়। তরুণীরমণের ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি বাঙ্গালা পদ কোন কোন পুঁথিতে বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনার জন্য আমি বাঙ্গালার পদাবলী রসিক সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অপ্রকাশ

—শ্রীরাধারাণী দেবী

আমার নিভৃত চিত্তে যে-ভাবনা করে সঞ্চরণ
অজস্র ঐশ্বর্য্যভারে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিয়া এ' মন;
সে-মহার্ঘ্য ভাবনার বিচ্ছিন্ন মাণিক্য কণাগুলি
ইচ্ছা হয় চয়নিয়া স্বর্ণসূত্রে মালা রচি' তুলি!
গোধূলির দীপ্তি তারা, ক্ষণতরে পশ্চিমের পটে
বিচ্ছুরিয়া বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত হয় অস্ততটে।

যে-নির্ব্বাক আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত চিত্ত মোর সদা
স্তব্ধ অনুভূতিলোকে যে-নিবিড় আনন্দ সর্ব্বদা
ভাষার অতীত তীর্থে সঙ্গোপনে আজো গেল রয়ে,
হে সুন্দর! তব স্পর্শে বাজুক তা' মুখরিত হয়ে!
সেচন করহ বারি অমৃত-ভৃঙ্গার হতে তুমি,
আমার কল্পনা-বীজ অঙ্কুরিয়া উঠুক কুসুমি'।

ওগো মোর অপ্রকাশ! প্রকাশিত হও জ্যোতিঃ সহ
ওঠো ওঠো হে প্রত্যূষ! মৌনরাত্রি হয়েছে দুর্ব্বহ।
তমসার গর্ভ হ'তে জাগো সূর্য্য কোটীরশ্মিপাতে,
আমার কানন ব্যগ্র আলোকের তীব্র প্রত্যাশাতে,
অগণ্য কোরক মম অন্ধ আঁখি উন্মীলন তরে
নিশীথ প্রহর ব্যাপি' নীরবে তোমারে ধ্যান করে।

নিখিলের বক্ষে কাঁদে যে অজ্ঞাত কামনা অধীর,
উপেক্ষিত রয়ে গেল যে পূজার চন্দন উশীর!
উজ্জ্বল হাসির তলে যে অশ্রু ফল্গুর সম বহে,
জীবনের দৃশ্যমধ্যে যে মরণ অদৃশ্যই রহে!
আমি যেন তারই লাগি দিতে পারি মোর শ্রেষ্ঠদান
অন্তরের আন্তরিক অনুরাগে অভিষিক্ত গান।

বিস্তারিত হোক মধ্যে আকাশের অন্তহীন নীল,
উদাত্ত সঙ্গীতছন্দে পূর্ণ হোক্ আমার নিখিল!
বন্ধনের বেদনায় বিধুনিছে পক্ষ থাকি থাকি
সংকীর্ণ পিঞ্জরমাঝে শৃঙ্খলিত নিরুপায় পাখী!
তবু তার লক্ষ্য যেন চলে দূর দিক্‌চক্রবালে,
মেঘঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে, অরণ্যের শ্যামস্নিগ্ধভালে।

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেন নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ-পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বৰ্দ্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হ'ত, সে সব স্থানে দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ যদু হাজরাকে 'নল-দময়ন্তী'-পালাতে 'নলে'-র পার্ট করতে দেখেন নি? তা হলে জীবনের ভাল জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভাল জিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্যজীবনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটী নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়ীতে কি একটা কাজ উপলক্ষে, নববধূটীকে নৌকা করে তাঁর বাড়ীতে আমাকেই রেখে আসতে হ'বে ঠিক হ'ল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে। বধূটী গ্রামসম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারাপথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ী, পৌছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুস্কিলে। মস্ত বড় বাড়ী; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কটুম্বের দল এসেছে। তার মধ্যে দুটী সহর অঞ্চলের চালাক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ করে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটী ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং ফর্সা, ছিপছিপে, সিল্কের রাঙা পাঞ্জাবী গায়ে—নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে। সে আমাকে বললে—কি পড়?

আমি বললাম—মাইনর সেকেন ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বল ত হাঁচি মাইনাস কাসি কত?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্।

বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি, 'মাইনাস' কথার মানে তখন জানিনে—তা ছাড়া এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন? আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা করলে—'হবগবলিণ' মানে কি?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে, কিন্তু সে সুশীল ও সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ও জেলের গল্প, বড় জোর গুটি-পোকা ও রেশমের কথা। সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই। লজ্জায় লাল হয়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোকসমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত করতেই বোধ হয় যতীনকে ওদের বাড়ীতে হাজির করেছিলেন। সে দুহাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করে আমার সামনে দেখিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পয়সা হয়, তবে পাচটা কলার দাম কত?

আমি বিষণ্ণমুখে ভাবছি, ওর দুহাতের মধ্যে কতগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিল খিল করে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে অর্জ্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন করলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশীও বটে, সহর অঞ্চলে ইংরাজি স্কুলে পড়ে বটে দরকার কি ওর সঙ্গে মিশে! তাছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি!

কিন্তু সে যতই আমায় জ্বালাতন করুক, জীবনে সে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সেজন্যে আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ। সে যদু হাজরার অভিনয় আমাকে দেখিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বললে—এই, কি তোমার নাম, রাজগঞ্জের বাজারে বারোয়ারী হবে, শুনতে যাবে?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু যাত্রা শুনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ এর সাহচর্য্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রণার দিকটা একেবারে মনেই পড়ল না।

তথাপি সারাপথ যতীন ও তার দলের তারই বয়সী জনকয়েক ছোকরা অশ্লীল কথাবার্ত্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত করে তুললে। আমি যে বাড়ীর আবহাওয়ায় মানুষ, সে বাড়ীর সবাই ধর্ম্মভীরু বৈষ্ণব-প্রকৃতির মানুষ—আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশাই সকলেই। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ও রকম টপ্পা ও খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক-মনের নীতিবোধ ক্রমাগত বাধা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জনসমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারীর খুব আসর, অনেক ঝাড়-লণ্ঠন টাঙ্গিয়েছে—বাঁশের জাফরীর গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর মধ্যে বোধ হয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু একবার বাবার সঙ্গে এর আগে না যে এসেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিং-এর ভিতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউই দিলে না—আমিও সাহস করে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না—বাইরে বাজে লোকদের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারীর মুরুব্বি-পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের এক জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্য বেঞ্চি আনিয়ে পাতিয়ে দেয়;—আবার যেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোনমতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাষাভূষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর থেকে পর্য্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথাও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে না—ষ্টেশন মাষ্টার বাবু, মাল বাবু, কেরাণীবাবু ও পোষ্টমাষ্টার বাবুদের যত্ন করে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। 'নল-দময়ন্তীর'-র পালা। একটু পরেই যদু হাজরা 'নল' সেজে আসরে ঢুকতেই—তখন হাত-তালির রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হয়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম—দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয় নি, ত্রিশও হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখমুখের ভাব, কি হাত পা নাড়ার ঢং! আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটী দেখিনি। ভীড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুই নি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোল্‌তায় হুল ফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললুম—যাত্রা থেমে গেলে তত রাত্রে একা অজানা স্থানে এই শীতে কোথায় যাব—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চদেবতা পঞ্চনলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় এসে বসেছেন, আসল 'নল'-রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বলছেন—

এ কি হেরি চৌদিকে আমার
মম সম রূপ নল চতুষ্টয়—
মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে
সভামাঝে।
বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল
ইষ্টদেব,
পুরাও বাসনা মোর, মায়াজাল ফেল ছিন্ন করি।

এমন সময়ে বরমাল্যহস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করিতেই নল বলে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসীমুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভপাশে:

অপর চারজন নলও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসীমুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে:

প্রকৃত নলের তখন কি বিমূঢ় দৃষ্টি!

তারপরে বনে বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায়-সম্পত্তিহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র! কতকাল তো হয়ে গেল, যত্ন হাজরার সে অপূর্ব্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারা রাত্রির মধ্যে, পাছে আশপাশের লোকে কান্না দেখতে পায় বলে কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গিতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম! যাত্রা শেষরাত্রে ভাঙ্গল। আমি সে রাত্রে আসরেই একটা বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে গেলুম।

তারপর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি—স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। যত্ন হাজরার কথা প্রায় এর ওর মুখে শুনি। যেখানেই যাত্রাদলের কথা ওঠে, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, যাত্রাদলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যত্ন হাজরা।

আমি কিন্তু বহুদিন যত্ন বিশ্বাসকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরে সহরের স্কুল-বোর্ডিং-এ গেলুম। মন গেল লেখাপড়ার দিকে, ধরাবাঁধা রুটীনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বদ্ধ হয়ে পড়ল। এ্যালজেব্রার আঁক, জ্যামিতির এক্‌স্ট্রা, ইংরাজি ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং-ক্লাব, খবরের কাগজ—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মত যে, যেখানে যাত্রার নাম শুনব—সেখানেই দৌড়ে যাব—তা কে জানে চার ক্রোশ, কে জানে ছ'ক্রোশ—এ মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। তাছাড়া ইচ্ছে হলেও হয়তো স্কুলের ছুটী থাকে না, স্কুলের ছুটী থাকলেও বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়তে চান না—নানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলুম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে সহরে পড়তুম, সেখানে উকীল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার-ক্লাব ছিল, তাঁরা একবার থিয়েটার করলেন, পালাটা ঠিক মনে নেই—বোধ হয় 'প্রতাপাদিত্য'। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ করলে—ভাবলুম, যাত্রা এর চেয়ে ঢের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন চমৎকার বাঁধুনী তো যাত্রার পালাতে নেই? তারপর অনেকবার উকীলদের ক্লাবে থিয়েটার দেখলুম—ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে সুরু করেছে; বাজারে যাত্রা হ'ল বারোয়ারীর সময়ে, ক'লকাতার ভাল দল, কিন্তু তাতে আগেকার মত আনন্দ পেলুম না।

তারপর ক'লকাতায় এলুম, তখন নতুন মতের অভিনয় সবে ক'লকাতায় সুরু হয়েছে। বড় বড় বঙ্গ-বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাঁদের নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম—বিলিতি ফিল্মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেক দিন ধরে দেখলুম—মাসুম ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকীল-মোক্তারদের ক্লাবের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় বলে ভেবে এসেছি—এখন তাঁর কথা ভাবলে আমার হাসি পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকুরী করি। ক'লকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরোনো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্ম সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা না থাকলে সে ছবি দেখতে যাই নে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি একদিন—এখন তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটীতে বাড়ী গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারী। শুনলুম, ক'লকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে—দেড়শ টাকা একরাত্রির জন্য নিয়েছে, এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসে নি। ভাল বিলিতি ফিল্মই দেখিনে, থিয়েটার দেখাই ছেড়ে দিয়েছি ভাল লাগে না বলে—এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—এ কথা বলাই বাহুল্য। যাত্রার আবার কি দেখব! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট করে এই সময়ের মধ্যে লোকের ভিড়ে বসে যাত্রা দেখতে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনুরোধ করে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। নিতান্ত না যাওয়াটা ভাল দেখাবে না হয় তো—বিশেষ, দেশে যখন তত বেশী যাতায়াত নেই।

সন্ধ্যার সময়ে যাত্রা বসল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ীর গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এসব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকীর কাজ করা সাজ-পোষাকও আর নেই—ক'লকাতার থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোষাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার ব'লবার ধরণ, মুখ গুলি ও হাত পা নাড়ার কায়দা, ক'লকাতার ষ্টেজের কোন কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মত। দেখলুম, আসরের শ্রোতার দলের মধ্যে যারা তরুণবয়স্ক (এবং তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কারণ, দুই মাইলের মধ্যে আমাদের দেশে দুটো হাই-স্কুল—তা ছাড়া ক'লকাতা-ফেরৎ কলেজের ছেলেও অনেক আছে), তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বললে—ওঃ কি চমৎকার নকলই করেছে ক'লকাতার ষ্টেজের অমুককে—বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে।

এমন সময় আসরে ঢুকলে একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোক। কিসের পার্টে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়েস ষাটের উপর হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভাল। কেউ তার বেলা একটা হাততালিও দিলে না, যদিও সে দর্শকদের খুসি করবার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত পা নাড়লে। আমার সাথে একদল স্কুলের ছেলেরা বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন একটা পিপে। এ্যাক্‌টিং করছে দেখ না ঠিক যেন সং!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললে—ও এককালে খুব নামজাদা এ্যাক্টর ছিল হে, তখন তোমরা জন্মাও নি। ওর নাম যদু হাজরা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম, তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম। বাল্য-দিনের একটা রাত্রির ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনে শীতের রাত্রি, সেই সহুরে ফেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ, সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালালে—তারপর বাড়ী থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারীর আসরে আমার সেই একা বসে রাত কাটান। সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ, বিস্মিত, উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—সেই যদু হাজরা এই?

এক সময়ে তার যে ধরণের মুখভঙ্গি দেখে ও কথাবার্ত্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত, আজও যদু হাজরা সেই সব তো করে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুসি নয় কেন? খুসি তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, বসে বসে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদু হাজরার ভাবসাব হাস্যকর ঠেকছে! কেন এমন হয়?

বাল্য-দিনের সেই যাত্রার আসরে একে আমি দেখেছিলুম, এর সে অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠা পত্নী নিয়ে—রাজা একদিন দুজনকে নির্জ্জনে প্রেমালাপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! কি ভেবে বললেন—মধুচ্ছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী, এই বয়সে তোমায় বিবাহ করে ভুল করেছি। তোমায় আমি এখনও ভালবাসি, প্রাণে মারব না—তোমরা দুজনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত ধরাধরি করে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনও তোমাদের মুখ না দেখি। ওরা ধরা পড়ে দুজনে ভয়ে ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রাজার সামনে এ কাজ কেমন করে করবে? হাত-ধরাধরি করে কেমন করে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—যাও, নইলে দুজনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবে যাও।

শেষে তারা তাই করতে বাধ্য হ'ল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছু দূর চলে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উন্মাদের মত মুক্ত তলোয়ার হাতে 'হা—হা হা'-রবে একটা চীৎকার করে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আসরের বাইরে চলে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তার হতাশ 'হা—হা'-রবের মধ্যে এমন একটা ট্রাজিক সুর ছিল, আসরশুদ্ধ দর্শককে তা বিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটী এমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত বয়সেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে একটা টুলের উপর বসে তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হয়েছে। বৃদ্ধ আগ্রহের স্বরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভাল লেগেছে? বললুম—চমৎকার। এমন অনেক দিন দেখিনি।

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুব খুসি হ'ল, মনে হ'ল প্রশংসা জিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেক দিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদের বেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজরার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বললে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভাল লেগেছে। আর কি মশায় সেদিন আছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথামুণ্ড তা বুঝিনে। বৌ-মাষ্টারের দলে ভৃগু সরকার ছিল, রাবণের পার্টে অমন এ্যাক্টো আর কেউ কখনও করবে না। আমি সেই ভৃগু সরকারের সাকরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধরে বলে গেলেন যদু, তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমার জীবনে আর ভাবনা থাকবে না।

আমি বললুম—এ বয়সে আপনি আর চাকুরী কেন করেন?

—না করে কি করি বলুন? বড়ছেলেটা উপযুক্ত হয়েছিল, আজ বছর দুই হ'ল কলেরা হয়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই উপর, নাতনীটার বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি, হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্য্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার জন্য অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলে থাকতাম। এখন পাই পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ বলে ওই যে ছোকরা কাল রামের পার্ট করলে—সে পায় আশী টাকা। ওরা নাকি আর্ট জানে! আপনিই বলুন তো, কাল ওর পার্ট ভাল লাগল আপনার, না আমার পার্ট ভাল লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশী অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরী বজায় রাখাই কঠিন হয়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশ বছর আগে তরুণ যদু হাজরাকে বৌ-মাষ্টারের দলের ভৃগু সরকার যে ভাবে হাত পা নাড়বার মুখভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজরা আজও যদি তা আসরে দেখাতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া তার যে আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন করে? কালের পরিবর্ত্তন তো হয়েছেই, তা ছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে, এ বয়সে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাঁচ ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি, একটা বেনেতী মশলার দোকানে যদু হাজরা দেখি বসে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরণে অর্দ্ধমলিন থান, পিঠের দিকটা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওকে খুসি করবার জন্যে বললুম—আপনি চিনতে পারুন আর নাই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আগুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা এখন বুঝি ক'লকাতায় আছেন?

বৃদ্ধের চোখে জল এল প্রশংসা শুনে, বললে, আর বাবু মশায়, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এই দেখুন আজ তিন বছর চাকুরী নেই। কোন দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার বয়স হয়েছে হাজরা মশাই, এ বয়সে আর চাকুরী আপনার পোষাবে না। আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভাল জিনিষের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখনকার কালে সব হয়েছে মেকি, মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটী জিনিসের চেয়ে বেশী। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাষ্টারের দলের ভৃগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাক্‌টার ভৃগু সরকারের পায়ের পায়ের ধুগ্যি আছে!

আরও বারকয়েক প্রশংসা করে এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা করে ক্রমশঃ জানলুম এই মশলার দোকানই বৃদ্ধের আশ্রয়-স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোন ঠাকুর-বাড়ীতে একবেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে।

কার্য্যোপলক্ষে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি আর বাল্যকালের সেই একটা রাত্রির স্মৃতির টানে ফিরবার সময়ে যদু হাজরার সঙ্গে একটু গল্প করি। একদিন বৃদ্ধ বললে—বাবু মশাই, একটা কথা বলব? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি।

সেদিন সঙ্গে পয়সা ছিল না। পরের দিন একটা ভাল রেষ্টোরেণ্টে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। তার খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হল, বৃদ্ধ কতদিন ভাল জিনিস খেতে পায় নি। দুজনে গিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। রাত তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চলে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে বসে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই

বললে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর করে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয় দেখে কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতী-বাঁধার রাজা নিজের গায়ের শাল খুলে ওর পায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমি বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুচ্ছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভাল লাগে, সেই যখন রাজা বললেন, 'তোমরা প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত-ধরাধরি করে চলে যাও'—সেই জায়গাটা। এখনও ভুলিনি। বৃদ্ধ নট সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যৌবন-কালের পুরোনো দীপ্তি যেন ফিরে এল। বললে—ওঃ সে কতকালের কথা যে! ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন—করে দেখাব?

এ প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত। আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম মনে আছে আপনার? দেখান না?

ভাগ্যে পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল—আমি হলুম মধুচ্ছন্দা। ও নিজের পার্ট বলে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলে নি। তারপর আমার দিকে ফিরে জলদগম্ভীর স্বরে বললে—যাও মধুচ্ছন্দা, তোমরা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত-ধরাধরি করে চলে যাও। তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্র্যাজিক স্বরে 'হা-হা-হা-হা' করে আমার দিকে ছুটে এল। কি অপূর্ব সে স্বর! কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যই এ ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুচ্ছন্দা ওকে উপেক্ষা করে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলে গেল। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট যদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাস খানেক পরে একদিন বেনেতলায় সেই মশলার দোকানটাতে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে।

দিদি

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

আজকে আমি তো চা টা খাব না মা, চা দিতে বারণ কর!
ভাইফোঁটা আজ, তাও ভুলে গেছ? মা তুমি কেমনতর?
বিনু অমলুকে ফোঁটা দেব আমি, উঠেছি তাই তো ভোরে!
বাগানেতে গিয়ে দূর্ব্বো ও ফুল এনেছি আঁচলে কোরে।
শিউলীর মালা গাঁথা হয়ে গেছে, দূর্ব্বো হয়েছে বাছা!
স্নান-টান সব সেরেছি সকালে, হয়েছে কাপড় কাচা।
চন্দনটুকু ঘষা হোল শেষ; ধান চাই দু'টিখানি,
আর কি কি চাই বলে দাও না মা, আমি কিগো সব জানি?
বিয়ে হয়ে 'বধি তিনটি বছর দিইনি তো ভাইফোঁটা!
প্রতি বছরেই কেঁদেছি এ'দিনে, ননদে দিয়েছে ফোঁটা।
সারাদিন মাগো মন করে হু হু—জল আসে চোখে শেষে,
ভাইদ্বিতীয়ার দিনটিতে কি মা থাকা যায় দূর দেশে?

ফোঁটার জোগাড় যা' করেছি দেখো বাটায় আর কি রাখে?
এইবেলা মাগো বলে দাও যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে!
চুয়া চন্দন, ঘীয়ের পিদিম, টাট্‌কা ফুলের মালা,
নতুন আসন ফলমূল মেওয়া মিষ্টি সাজানো থালা।
নতুন কাপড় নতুন চাদর,—মশলা এলাচ পান,
রূপোর রেকাবে আশীর্ব্বাদের রেখেছি দূর্ব্বোধান।

ভায়েদের আজ পরমান্নটা বোনই রেঁধে দেয়,—নয় ?
কাঁচা দুধ আর গাওয়া ঘী মিশিয়ে গণ্ডূষ দিতে হয়।
পায়স তা' হলে রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়মই আছে।
আরো আবদার আছে মা আমার আজকে তোমার কাছে।
মাছের কালিয়া পোলাও মাংস রাঁধব নিজের হাতে,
পায়ে পড়ি মাগো, মত দাও তুমি, বাবা না বকেন যাতে।
···খুব পারব মা,···হবে না কষ্ট, পুড়বে না হাত মোটে !···
দেখো মা এ'কথা এখন যেন না বাবার কাণেতে ওঠে।
খাওয়ানো দাওয়ানো চুকে গেলে সব, তখন বোলো মা তাঁকে !
অবাক্ হবেন নিশ্চ'ই বাবা ;—বকুনি দেবেন কা'কে ?···

পশমের দু'টি আসন বুনেছি,—ছাঁটাফুল কাটা শিখে !
"আশীর্ব্বাদিকা দিদি—" এই কথা দু'রঙে দিয়েছি লিখে।
বাপের বাড়ীর জন্যে সেখানে তৈরী করতে কিছু
লজ্জা করে মা !—জবাবদিহিতে মাথা যেন হয় নীচু।
ওদের আমি তো নানান জিনিষ দিয়েছি তৈরি ক'রে,
সে বাড়ীর কেউ বাকী নেই,—তবু মন তো ওঠেনি ভ'রে !
অম্লু বিনুকে কিছু করে দিলে অনেক তৃপ্তি হয় !···
কোলে পিঠে করা ছোটো ভাই যে মা, এ মায়া যাবার নয়।
মনটা আমার সব চেয়ে বেশী ওদেরি জন্যে কাঁদে,
বিকেল বেলায় ঘুড়ি নিয়ে যেই ছেলেরা উঠত ছাদে—
বিনুর কথাই মনে হোতো খালি, জল এসে যেত চোখে।
লুকিয়ে আড়ালে ফেলতুম মুছে, দেখে ফেলে পাছে লোকে।

জান মা, আমার খোকন কিন্তু ঠিক মামাদেরি মত !
এখন থেকেই বিনুর মতন ধরণ-ধারণ যত।
বিশেষ করে ও ছোটমামাটির স্বভাব কেন যে পেলে !
—অমনি বিষম অভিমানী আর মহাদুরন্ত ছেলে।
মনে আছে কি মা ছোটবেলা বিনু বাঁ হাতে ছুঁড়ত বল !
খোকাও আমার বাঁ হাতেই খেলে তেমনিই অবিকল।
বাথ্‌টবে বিনু জলের ভিতরে করত কেমন চান !
জল চাপড়িয়ে দু'হাতে ছিটোত, গাইত চেঁচিয়ে গান।
চানের সময় খোকাও তেমনি ফাটায় গানের চোটে !
খল্ খল্ হেসে জল চাপড়ায়, উঠতে চায় না মোটে।
সত্যি মা, আমি খোকার কাণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখি যত !
বিনু অম্লুর ছোটো বেলাটাই মনে পড়ে যায় তত।

সব গোছগাছ সারা হল, অ—ঝি ! 'দাদাবাবু'দের ডাক্ !
বল্—ফোঁটা নিতে ডাকছেন দিদি' অ—মা, তুমি ধর শাঁখ !

কবি কামিনী রায়

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
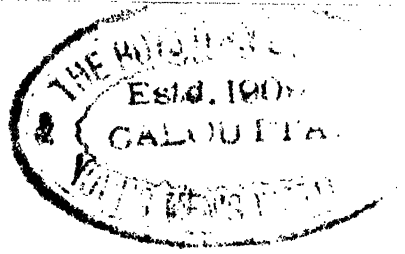
বর্ষচক্র দ্বিতীয়বার আবর্তিত হইয়া আসিল, গত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন মহাষ্টমী তিথিতে, ইং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়ের শততম মৃত্যুবাসরে, প্রতিভার বরপুত্রী, "আলো ও ছায়া"-র যশস্বিনী রচয়িত্রী, সুকবি কামিনী রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। শৈশব হইতে আমি সেই বিদুষী মহিলা কবির নাম শ্রদ্ধা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। কৈশোর হইতে আমি তাঁহার রচনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, শান্ত গাম্ভীর্য্য, অনির্বচনীয় রস মাধুর্য্য, সরল আন্তরিকতা, পবিত্র রুচি ও অতুলনীয় ভাব-সম্পদে বিমোহিত হইয়াছিলাম। পরে, দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়া, সাহিত্যালাপ করিয়া এবং তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত একটি কথাও লিখিবার প্রয়াস পাই নাই। কবি কামিনী রায়ের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিলে আমি "মাতৃ-স্মৃতি" লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলাম, যেখানে স্নেহের ঋণ অপরিসীম, সেখানে কথা গাঁথিয়া শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদানের প্রয়াস ব্যর্থ হইবেই। সেই জন্য আমি দ্বিতীয়বার এরূপ প্রয়াস হইতে বিরত ছিলাম।

আমি যে কখনও কবি কামিনী রায়ের সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনার সুযোগ পাইব, তাঁহার হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের বিবিধ সদ্‌গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইব, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাঁহার সৌজন্য ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের, বিনয় ও শিষ্টাচারের মধুর স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়পটে সমুজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কয়েকখানি পত্র আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন-চরিত-রচয়িতার উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়া এই পত্রগুলি আজ এই ক্ষুদ্র ভূমিকা সহ প্রকাশিত করিতেছি।

কবি কামিনী রায়ের পিতা, "মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "অযোধ্যার বেগম" প্রভৃতি বিখ্যাত ইতিহাস-মূলক গ্রন্থের প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের

কবি কামিনী রায়।

সহিত মুন্সীগঞ্জে, বোধ হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, আমার পিতৃদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলাপ হয়। চণ্ডীবাবু তখন মুন্সীগঞ্জে মুন্সেফ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের উজ্জ্বল রত্ন লেফটেনান্ট কর্ণেল জ্যোতিষ দে

মহাশয়ের পিতা (এক্ষণে অবসর-প্রাপ্ত সবজজ) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এবং শঙ্কর ঘোষের বংশীয় ৺অনন্তরাম ঘোষ (ইহাঁকে চণ্ডীবাবু গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য "মহর্ষি" আখ্যা

চণ্ডীচরণ সেন।

দিয়াছিলেন) মহাশয়গণও সেখানে তখন মুন্সেফ ছিলেন। পিতৃদেব অল্পকালের জন্য সেখানে অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফ হইয়া গিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মুখে চণ্ডীবাবুর নানা প্রকার রঙ্গ-রহস্যপূর্ণ গল্প আমি বাল্যকালে শুনিতাম। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে,চণ্ডী বাবু দুই জনের খুব সুখ্যাতি করিতেন। একজন ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান ৺কেদারনাথ রায় এবং অপর জন (অধুনা অবসর-প্রাপ্ত জিলা জজ) শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র-নাথ ঘোষ বাহাদুর। তখনও কেদারনাথের সহিত কামিনী সেনের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তখন "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল এবং কেদারনাথ রায় এবং অন্যান্য সুপণ্ডিত ব্যক্তির উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা কবির নামগোপনের প্রয়াস বিফল করিয়া গৃহে গৃহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মহিলা কবি কামিনী সেনের নাম সুপরিচিত করিয়াছিল। আমি শৈশবেই 'আলো ও ছায়া' পুস্তকখানি দেখিয়াছিলাম। সেকালে আজিকালিকার মত সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই হইত না বটে, কিন্তু সেকালের পক্ষে বইখানির গেট-আপ (got-up) যে খুব সুন্দর হইয়াছিল, একথা বেশ স্মরণ আছে। পিতৃদেব রাজকার্য্যে নানা স্থানে গিয়াছিলেন, আমার সাহিত্যানুরাগিণী জননী প্রবাসে অবসর-বিনোদনের জন্য যে সকল বাছা বাছা পুস্তক সঙ্গে রাখিতেন, তন্মধ্যে "আলো ও ছায়া" একখানি সর্ব্বদা থাকিত, এবং যখন ভাবপরিগ্রহের সামর্থ্য ছিল না, তখনও শৈশবকালে আমি নিঃসঙ্গ প্রবাসে কবি কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া'-র সরল কবিতাগুলি পড়িবার চেষ্টা করিতাম। বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ-কালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "কবিগাথা"-য় কবি কামিনী রায়ের কয়েকটি অতুলনীয় কবিতাপাঠ ও কণ্ঠস্থ করি। অতঃপর তাঁহার গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রাদিতে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইত, সমস্তই আনন্দসহকারে পাঠ করিতাম। "সাহিত্যে" আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহপাঠী (পরে পাটনায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব) ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় 'আলো ও ছায়া'-র যে সুন্দর সমালোচনা লিখিয়া-

কেদারনাথ রায়।

ছিলেন, তাহার প্রতিও আমার মাতৃদেবী কৈশোরেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

যখন আমি নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত বাঙ্গালা সাময়িক

পত্রে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার আবাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের অনুরোধে তৎসম্পাদিত "যমুনা"য়

কামিনী সেন (কৈশোরে)।

কবি কামিনী রায়ের নবপ্রকাশিত দৃশ্যকাব্য "অম্বা"-র সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত-নামা লেখকের পক্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠা কবির কাব্যসমালোচনা করিতে যাওয়া যে কিরূপ ধৃষ্টতার পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য। এ রচনা কবির গোচরে কখনও আসিয়াছিল কি না জানি না, আমি এখনও তাঁহার নিকট উহার উল্লেখ করি নাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, 'বাঙ্গালার মোপাঁসা" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত সম্বন্ধে তৎকালে আমার কোন জ্ঞান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা হেমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্মৃতিকথা ও সংরক্ষিত পত্রাদি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিলাম। এদেশে যাঁহারা জীবন-চরিত সঙ্কলন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উপকরণ সংগ্রহ করা কিরূপ দুঃসাধ্য। নিকটতম আত্মীয়গণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে অধিকাংশস্থলে সাহায্য করেন না। বলা বাহুল্য, আমি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলির উত্তর পাইলাম, অনেকগুলিরই পাইলাম না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর কবি কামিনী রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, যথাসময়ে তাহার উত্তর না পাইয়া ভাবিলাম উহার উত্তর আর পাইব না। আমি একজন অপরিচিত-নামা নবীন লেখক, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কোনও মতেই তাহার উপযুক্ত নাহ, হয়ত কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কয়েকদিন পরেই সঙ্কল্পচ্যুত হইব, সেই জন্য কবি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই পত্রের উত্তর দেন নাই। স্মারক-লিপি প্রেরণের সাহস হইল না।

'আলো ও ছায়া'-র পূর্ব্বে কোন উৎসর্গ-পত্র ছিল না,

কামিনী রায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভকালে)।

কেবল উহার শেষভাগে "মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক" নামক খণ্ডকাব্যদ্বয় তাঁহার এক অজ্ঞাতনামা সতীর্থের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট

হইয়াছিল। এই সতীর্থ যে তাঁহার অন্তরঙ্গ। পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) মিসেস কুমুদিনী দাস তাহা এখনও

কুমুদিনী দাস (তরুণ বয়সে)।

অনেকে হয়ত জানেন না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া'-র ষষ্ঠ সংস্করণে কাব্যখানি "পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"কে রচয়িত্রী উৎসর্গীকৃত করেন। উৎসর্গ-পত্রটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল :—

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার,
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপে আপনারে লুকাইয়া রাখি,
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব,
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরস ধরি' যেই গীত হার,
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় ;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
চরণ-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে মর্ত্ত্যের বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

উপরিধৃত উৎসর্গ-পত্রটি পাঠ করিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, কবি হেমচন্দ্রের প্রতি কবি কামিনী রায়ের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং এ যে কেবল আমার অযোগ্যতার জন্যই হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনায় তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলাম না, সে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল।

যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা লইয়াই কার্য্যারম্ভ করিলাম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে (ফাল্গুন ১৩২৪) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে "হেমচন্দ্র"-এর প্রথম পরিচ্ছেদ (উপক্রমণিকা) প্রকাশিত হইল। উহা স্মারক-লিপির কার্য্য করিয়াছিল কি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

না বলিতে পারি না, কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই কবির স্বহস্ত লিখিত ২রা মার্চ্চ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত নিম্নোদ্ধৃত

র্ণ পত্রখানি হস্তগত হইল। উহার প্রথম অনুচ্ছেদে পত্রো-র প্রদানে অযথা বিলম্বের জন্য কবি কৈফিয়ত দিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়)।

ক সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয় এবং হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া'-র ভূমিকা লিখিয়া দেন, তাহা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা রায় (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী) এবং লেডি অবলা বসু মহোদয়াগণের স্বনামধন্য পিতা দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় কিরূপে হেমচন্দ্রের সহিত কামিনী সেন পরিচিতা ন, তাহা পত্রখানিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

হাজারিবাগ

২রা মার্চ্চ ১৯১৮

মান্যবরেষু,

আপনার ২৪শে ডিসেম্বরের পত্রখানির উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল সেজন্য অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। পত্রখানি কংগ্রেসের সময় হস্তগত হয়। আমি তাহার ৭।৮ মাস পূর্ব্বেই ৪২ হাজরা রোড ছাড়িয়া হাজারিবাগে আসিয়া বাস করিতেছিলাম। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা যাই; আপনার চিঠি কলিকাতা হইতে হাজারিবাগ এবং হাজারিবাগ হইতে কলিকাতা পুনঃ প্রেরিত হয়। তখন অবসরের অভাব বলিয়া পরে উত্তর দিবার ইচ্ছায় চিঠি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখি। আজ তিন মাস পরে চিঠিখানি বাহির হইল। ইচ্ছাপ্রণোদক নহে, কিন্তু মনের ভুলে এই ক্রটি ঘটিয়াছে, ক্ষমা করিবেন।

আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক একথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের সচ্ছলাবস্থায় তিনি হেম বাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম।— কবিবর কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং

লেডি অবলা বসু (তরুণ বয়সে)।

খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটি কে হে?" দুর্গামোহন বাবু

বলিলেন "ছেলে নয়, মেয়ে।" তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় এবং সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি. কে. রায় (দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটী লইয়া তাঁহাদের রডন

দুর্গামোহন দাস।

ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখো-পাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে "হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে" ইত্যাদি কয়েকছত্র পড়িয়া বলিলেন, "না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।" তখন খুব ভাবের সহিত 'বঙ্গ-সঙ্গীত', পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখা-সাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্য-রচনায়ও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেইজন্য দ্বিতীয়বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'-র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই। 'নির্ম্মাল্য' ও 'পৌরাণিকী' প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষুপীড়ার জন্যই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা-জগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন একথা আমার 'নিশার স্বপ্নের'ও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে, আলো ও ছায়া'-র ৬ষ্ঠ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম।

শীঘ্রই সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া 'আলো ও ছায়া'-র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে লিখিব। আগামী কল্য আমি কার্য্যানুরোধে কলিকাতা যাইতেছি। এবার নানা প্রকারে ব্যস্ত থাকিবার সম্ভাবনা। অন্য কখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুখী হইব।

কবিবর হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আপনার সফল হউক। ইতি

শুভার্থিনী
শ্রীকামিনী রায়

এই পত্রপ্রাপ্তির পর আমার সঙ্কোচ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। অতঃপর আমি মধ্যে- মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতাম এবং কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশ লইতাম। আমার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে স্বহস্তে উপহার দিয়া আসিতাম এবং তিনিও তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমাকে উপহার দিতেন। প্রথম যেদিন তাঁহার ৪২-এ হাজরা রোডস্থিত বাটীতে দেখা করিতে যাই, সেদিনের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। প্রথমে দ্বিতলের ড্রয়িংরুমে কবির সহোদরা ডাক্তার যামিনী সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিলেন, কবির একটি কন্যা সঙ্কটজনক পীড়ায় আক্রান্ত, কবি তাঁহার কন্যার রোগশয্যা-পার্শ্বে আছেন। যাহা হউক, সংবাদ পাইবামাত্র কবি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। নানা বিষয়ে সাহিত্যালাপ হইল। কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল না। তিনি তাঁহার এক আই-এ পরীক্ষার্থিনী কন্যাকে "প্রভাস" কাব্য পড়াইয়েছেন। তাহার স্থানে স্থানে এরূপ অর্থহীন প্রলাপ আছে যে, তিনি বলিলেন, সে সকল অংশের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি কবি হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিতার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি "উঠ মা আমার" "জাগো মা আমার" ইত্যাদি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারত-উদ্ধার" পাঠ করিবার পর সেগুলি ধ্বংস করেন। তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় কবিতা "সেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন" ইত্যাদিতে একটি গানের সুর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণও "মা আমার মা আমার" এই অংশটিতে তাঁহার মনের মত সুর দিতে পারেন নাই।

পিতার নিকটে তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ঋণী। তাঁহার পিতার 'টীকাকার কুটীরে'র অনেকাংশ পাঠ্যাবস্থায় তিনিই লিখিয়াছিলেন।

কন্যার রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি শীঘ্র বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া শান্তভাবে আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করিলেন। মনে হইল, সাহিত্যানুরাগী বা সাহিত্য-সেবকগণের সহিত দুই দণ্ড আলাপ করিলে যেন তিনি আন্তরিক আনন্দ লাভ করেন। তিনি আমাকে তাঁহার প্রকাশিত বইগুলি উপহার দিলেন। অধিকাংশই আমার পুস্তকাগারে ছিল, যে দুই একখানি ছিল না, (যেমন পারিবারিক শ্রাদ্ধসভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী) সেগুলি সংগৃহীত হইল।

পুত্রগণ পরিবেষ্টিত কবি কামিনী রায়।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে "হেমচন্দ্র" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার সময় যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত বা উপদেশ লইবার আবশ্যকতা বোধ হইত, তখনই কবি কামিনী রায়ের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া উপকৃত হইয়া আসিয়াছি। তাঁহার অভিমতগুলি অধিকাংশ সময়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমতের সহিত মিলিত। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার মাতৃদেবীর নিকট আমি আমার সাহিত্যরুচির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী ছিলাম, কোন গ্রন্থপাঠের

পর তাঁহার সহিতই উহার দোষগুণের আলোচনা করিতাম এবং মাতৃদেবী কবি কামিনী রায়ের তিন বৎসরের মাত্র বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে একই প্রভাবের মধ্যে থাকায় উভয়ের সাহিত্যরুচি প্রায় একই প্রকারের ছিল। কবি কামিনী রায়ের সহিত সাহিত্যালোচনাকালে অনেক

কবি কামিনী রায়ের হস্তাক্ষর।

সময় মনে হইত আমার মাতৃদেবীর সঙ্গেই সাহিত্যালোচনা করিতেছি।

বোধ হয় কোনও বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল বলিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। কয়েকমাস পূর্বে তিনি তাঁহার প্রিয় দুহিতা লীলাকে হারাইয়াছিলেন এবং বোধ হয় কলিকাতায় সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আমার পত্র পাইয়া তিনি নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখেন—

৪২।এ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে বড়ই বিলম্ব ঘটিল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার উপর দিয়া অনেক দুঃখ বিপদ গিয়াছে সবিস্তার সব লিখিবার আবশ্যক নাই। সম্প্রতি একটু মাথা তুলিবার অবসর হইয়াছে। আপনার সুবিধামত যে কোন দিন আসিবেন—কেবল পূর্বে একটু সংবাদ দিলে ভাল হয়।

নিবেদিকা
কামিনী রায়

আমার ডায়েরীতে দেখিতেছি ২৭শে ফেব্রুয়ারি হাজরা রোডে কবি কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। কবি হেমচন্দ্রের আবৃত্তিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ অভিমত সংগৃহীত হইয়াছিল। স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে লিখিয়াছিলেন এবং আচার্য্য কৃষ্ণকমলও বলিয়াছিলেন যে হেমেন্দ্র sing-song way-তে পাঠ বা আবৃত্তি করিতেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে কাশীতে অবস্থানকালে হেমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'ভারতসঙ্গীত' আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং বলিতেন হেমচন্দ্রের আবৃত্তি তত ভাল লাগে না। পক্ষান্তরে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' আবৃত্তির উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন, এবং স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী হেমচন্দ্রের আবৃত্তির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, যিনি হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' আবৃত্তি শুনিয়াছেন তিনি অমর পদবী লাভের যোগ্য। কবি কামিনী রায় হেমচন্দ্রের আবৃত্তি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অভিমতের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ মনঃপূত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে। য়ুরোপীয় মহিলাদের গান অনেক বাঙ্গালীর ভাল না লাগাই সম্ভব, আবার আমাদের দেশী সুর য়ুরোপীয়দিগের ভাল না লাগিতে পারে, সেকালে আমাদের দেশের লোক যে সুর ভালবাসিত, একালে আমাদের দেশের লোকের তাহা ভাল না লাগিতে পারে,

শ্রোতার ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি ও অভ্যাসের উপর কোন আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই দিনেও তিনি হেমচন্দ্রের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, এ যুগে অনেকেই অতীত যুগের লেখকদের কোন সন্ধান রাখেন না। হেমচন্দ্রের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, এখন সেরূপ সমাদৃত হয় কি না সন্দেহ। আমার নিজের মতের কোন মূল্য নাই বলিয়া আমি হেমচন্দ্রের জীবনীতে সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচকদিগের অভিমত সঙ্কলিত করিতেছি, কিন্তু আধুনিক জীবিত মনীষিগণ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন, তাহা গ্রন্থপরিশেষে দিলে ভাল হয়। উহা হয়ত আধুনিক পাঠকগণকে হেমচন্দ্রের কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইবে ও হেমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক যুগে যেরূপ, এ যুগেও সেইরূপ যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবেন। আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে এইরূপ অভিমত লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কামিনী রায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বাটী ফিরিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমার 'অশোক-সঙ্গীত' আপনাকে দিয়াছি কি?" বালক পুত্র অশোকের স্বর্গারোহণের পর শোকদগ্ধ হৃদয়ে কবি যে ক্ষুদ্র শোককবিতা-গুলি লিখিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছিল। পুস্তকখানি পূর্ব্বে পাই নাই শুনিয়া তিনি উহার একখণ্ড আমাকে দিলেন। কবিতাগুলি অতি মর্ম্মস্পর্শিণী, কিন্তু উহার মূল্য কত তাহা কয়েক মাস পরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। জুন মাসে আমার নয় বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অমলচন্দ্রকে জগজ্জননী নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সেও অশোকের মত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে অল্প কয়েকদিন মাত্র ভুগিয়া অকস্মাৎ আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। শেষ দিনও সে প্রশান্ত চিত্তে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, তাহার কোনও কষ্ট নাই, তাহার জন্য আমরা যেন কাতর না হই এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভক্ত বালক গভীর আনন্দে "মা এসেছে, মা এসেছে" বলিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে চলিয়া যায়। তাহার কতকগুলি কথা, কতকগুলি ব্যবহার কামিনী রায়ের কিশোরবয়স্ক পুত্র অশোকের সহিত যেন মিলিয়া যায়। অমলের পরলোক প্রয়াণের পর 'অশোক সঙ্গীত' পুনঃ পুনঃ পাঠে যে সান্ত্বনা ও শোকবিমিশ্রিত আনন্দ পাইয়াছি, তাহা আর কোন গ্রন্থে পাই নাই। যে ভাষা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, যে বাণী উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই, তাহা যেন কবি এক স্বর্গীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থখানি যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বর্গারোহণের পর আমি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলাম। শরীর ও মন উভয়ই ভগ্ন হইয়াছিল।

বামাসুন্দরী সেন।

যেটুকু কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে নহে তদ্ব্যতীত আর কিছুই করি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে আর কবির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের শেষ পরিচ্ছেদগুলি লিখিবার সময় আসন্ন হইল। আবার কবি কামিনী রায়ের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি শিলংএ গিয়াছেন। 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা ৺ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরীর নিকট হইতে তাঁহার ঠিকানা লইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার পিত্রালয় বেলতলা রোড হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখেন।

৯৮ বেলতলা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা
১১ই জুলাই ১৯২৩।

মান্যবরেষু—

আপনার পত্রখানি শিলং ঘুরিয়া আসিয়া গতকল্য সন্ধ্যায় আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি চার পাঁচ দিন হইল কলিকাতা ফিরিয়াছি। এই মাসেই হাজারিবাগ যাইবার ইচ্ছা, হইয়া উঠিবে কি না জানি না। উপরে আমার বর্ত্তমান ঠিকানা দেখিবেন।

আপনি আপনার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে হারাইয়াছেন শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। ৬৫ বৎসর হইলেও আপনার হৃদয় হইতে আঘাতের ব্যথা যায় নাই; জীবন হইলেও তাঁহার দাগ যাইবার নহে,

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

তাহা জানিতেছি। আমার 'অশোক সঙ্গীত' শোকের মধ্যে আপনাকে একটু সঙ্গ ও সহানুভূতি দিতে পারিয়াছে জানিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি। যে উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় তাহা সার্থক হইতেছে। একাধিক শোকার্ত্ত পরিবারের নিকট শুনিয়াছি। ইহাও এক রকম সান্ত্বনা।

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়ে, অর্থাৎ আলো ও ছায়াতে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাঁহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাঁহারা তাঁহার কবিতা পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্যবিলাসীগণ তাঁহার খুঁতগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সেজন্য আপনার আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরণের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজ কাল রবীন্দ্র যুগ—এ যুগে 'আর্টের' দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কাণের উপর যতটা ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, গীত-রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীতি-রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্ত্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরি-স্রোতের কলকল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানাবর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এ গুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা—এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অন্ধকারমত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকী রহিয়া গেল, সেটা এই, 'মহাকাব্য' এখন out of fashion. কবিতার গুণদোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি কবিতারই কথা।

বিনীতা—
শ্রীকামিনী রায়

এই পত্রপ্রাপ্তির কয়েক দিন পরে (১৫ই জুলাই ১৯২৩) ভবানীপুরে বেলতলা রোডে কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। সেখানে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা ৺ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরীও গিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ বাবু অল্পকাল পরেই চলিয়া গেলেন। কামিনী রায় আমাকে জলযোগ করাইয়া সাহিত্যালোচনা করিতে বসিলেন। ফুল্লনলিনী তাঁহার শ্বশুর ও স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নব্য-ভারতকে কোনও রকমে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কামিনী রায়ের তিনি খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ ও সহযোগিতা লাভের জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। ঢাকা হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত "প্রাচী" নামক মাসিক পত্র হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচী শীর্ষক দুইটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরে আমার নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে স্বহস্তে দিয়া আসিতাম, কারণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অলস জীবনে যেন সাহিত্যসেবার একটা উৎসাহ ও প্রেরণা আসিত।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার সহিত কয়েকদিন দেখা হয়। সম্মেলনের পরবর্ত্তী রবিবারে (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০) তাঁহার হাজরা রোডস্থিত বাটীতে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎ করিবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

আমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জননী ও সহধর্ম্মিণীদের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিলাম। তাঁহার জননী বামাসুন্দরী দেবীর একখানি প্রতিকৃতির প্রয়োজন ছিল। তিনি চা-পান ও জলযোগ করাইয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে জগত্তারিণী মেডেল পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কথা হইল। তিনি তাঁহার জননীর একখানি ফটো দিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে পড়িবার জন্য আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুরোধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহার জীর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে পড়িতে দিলেন। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিতেছে, সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছা আছে যে, তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন না করিয়াই একটি গ্রন্থে মুদ্রিত করিবেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সকল কবিতারই একটি বিশেষত্ব আছে এবং তাহা সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কবিতাগুলি "দীপ ও ধূপ" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একখণ্ড তিনি আমাকে দিলেন।

এই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎসম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য 'দীপ ও ধূপ'-এর একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়া দিতে বলেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ থাকায় আমি একখানি পত্রে কবিকে মুদ্রিত সমালোচনার লিপিপ্রমাদগুলি দেখাইয়া দিই। সেকালের সমাজের একটি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জননীর জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাবটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। আমার নিকট উক্ত প্রস্তাবটির সুখ্যাতি শুনিয়া আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উহা তৎসম্পাদিত 'বিচিত্রা'-য় প্রকাশ করিতে অভিলাষী

হওয়ায় আমি উহা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করিবার জন্য কবির অনুমতি ভিক্ষা করি। নিম্নোক্ত পত্রে কবি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

৮১।এ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা
৩১শে জুলাই ১৯৩০

মান্যবরেষু,

আপনার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্রখানি সেই তারিখ রাত্রেই পাইলাম। মনে হইতেছে, আমি আপনাকে যে পত্র ইতিমধ্যে লিখিয়াছি এবং গত মার্চ মাসের ২০শে তারিখ যে পুস্তকখানি পাঠাইয়াছি তাহা আপনার হস্তগত হয় নাই। ১১ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীটের ঠিকানায় চিঠি

কামিনী রায় (মধ্য বয়সে)

ও বই পাঠাইয়াছিলাম। এতদিন আপনার নিকট হইতে কোন পত্র না পাইয়া এবং ছবি ও প্রবন্ধ ফিরৎ আসিল না দেখিয়া একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইতেছিলাম। আশা করি আমার এ চিঠি আপনি পাইবেন।

বিচিত্রায় মাতৃদেবীর স্মৃতি মুদ্রিত হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা যে তাঁহার মৃত্যুর ৮ দিন পরে তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে লিখিত ও পঠিত হয় তাহার উল্লেখ থাকা উচিত। সময়ান্তরে হয়তো আরও ভাল করিয়া এবং অন্য আকারে লেখা যাইত। আমার পিতৃ-পরিবারের একটা ছবি আছে, তাহাতে আমি এবং আমার মধ্যম ভ্রাতা নিশীথ নাই। আমাদের সেকালের অপর ছবি চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি না।

আপনি যে কোন একদিন এখানে আসিলে এ বিষয়ে কথা হইতে পারে। বিচিত্রার ছাপা ও ছবি বেশ ভাল তাহা দেখিয়াছি। আমি মাসিক পত্রিকা বিনা মূল্যেই কতগুলি পাইয়া থাকি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনটির গ্রাহক এ পর্যান্ত হই নাই, সেই জন্য প্রবাসী বিচিত্রা ও বঙ্গশ্রী পড়া হয় না। সময়ও বড় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের মাসিক ও সাপ্তাহিক গুলির অবশ্য মূল্য না দিলে নয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর লেখা আরও উচ্চদরের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমি অসুস্থ হইয়া মাস খানেক পুরী গিয়াছিলাম। গত ১৬ই তারিখ ফিরিয়াছি। আশা করি আপনার সর্ব্বথা কুশল। নমস্কার জানিবেন।

বিনীতা
শ্রীকামিনী রায়

অতঃপর একদিন অপরাহ্নে (৩রা আগষ্ট ১৯৩০) বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়া কবির হাজরা-রোডস্থিত ভবনে সাক্ষাৎ করি। তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের কবিতা একত্র করিয়া "জীবনপথে" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উপহার দিলেন। তাঁহার মাতৃস্মৃতির সহিত প্রকাশের জন্য কতকগুলি ফটোগ্রাফ ব্লক করিবার নিমিত্ত চাহিয়া আনিলাম। সেদিন আমাদিগকে চা-পান ও জলযোগ করাইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি উৎসাহের সহিত আমাদের সহিত সাহিত্যালোচনা করেন। শরৎবাবু ও উপেনবাবু কেমন করিয়া উপন্যাস লিখেন, উপন্যাসের প্লট পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লন কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার 'দীপ ও ধূপ' সম্বন্ধে কোন নবীনা লেখিকা নাকি বলিয়াছিলেন, কবিতাগুলি সব না ছাপিলেই ভাল হইত, উহাতে তাঁহার যশঃ ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, উহার উত্তরও আছে। তাহা তিনি দুইটী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে কবিতা দুইটী পড়িতে বলিলাম। তিনি তাঁহার খাতা আনিয়া স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠে পড়িলেন :—

অনির্ব্বাচন

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝি না জমেছে গীত যত ;
কি যে তার দামী, কি যে ফেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

আছে কিছু চিরন্তন সর্বদেশে কালে
মানবপ্রাণের অন্তরালে,
কখনো ধ্বনিয়া উঠে ছন্দে আর সুরে
অনিতেই স্বতঃ প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগে,
জানে যাহা জানে নাই আগে,
আঁধার আলোকে যায় পূরে।

সেই টুকু অজানার চাবি,
সে টুকুতে সকলেরি দাবী :
নিজস্বতা কারো তাতে নাই।
যদি মোর কোনো ক্ষুদ্র গীতে
পশে তাহা থাকে কোনো চিতে
সব কটা তাই রেখে যাই।

আমার ভাষণ

আমার ভাষণ যদি না লাগে মধুর,
আমার গানেতে যদি নাহি পায় সুর,
পদ্যে মোর নাহি পায় পদের ঝঙ্কার,
অনুপ্রাসহীন গদ্য রিক্ত অলঙ্কার
যদি লাগে, সেই ভয়ে নব ছন্দে লেখা
নহে চেষ্টা। এ বয়সে যায় কিছু শেখা?
যে কথা এসেছে মনে লিখিয়াছি সোজা
মনের সহজ সুরে; শব্দ বোঝা বোঝা
করি নাই স্তূপাকার; মিলের সন্ধানে
ভাবে করি নাই শ্রান্ত দীর্ঘ-পদটানে।

কাহারো লেগেছে ভালো সেই সোজা সুর
করুণ, নিভৃত-ব্যথা করিয়াছে দূর
সমবেদনার রসে। তার বেশী কিছু
ছিল না প্রত্যাশা কভু। জনতার পিছু
ছুটি নাই যশোলুব্ধ। আড়ালে বিজনে
যা পেয়েছি আশা তারো ছিল না ত মনে,
যা পেয়েছি নতশিরে লয়েছি তুলিয়া
দূরাগত শ্রদ্ধা প্রীতি বেদনা ভুলিয়া।

আমরা এই কবিতা দুইটি 'বিচিত্রা'য় ছাপিবার জন্য লইয়া সিলাম। কামিনী রায় আমাকে তাঁহার জননীর জীবনচরিত-টির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিতে বলেন। মল্লিখিত ক্ষুদ্র ভূমিকাসহ জীবনীটি ১৩৩৭ সনের ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়।

কামিনী রায় (পরিণত বয়সে)।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের শেষে আমি রাজকার্য্যানুরোধে দিল্লী যাই। সেখানে অক্টোবর মাসে আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে আমার প্রাণাধিকা দৌহিত্রী এবং পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে আমার পরমপূজনীয়া জননীকে হারাই। এই সকল পারিবারিক বিপদের জন্য তাঁহার নিকট আমি আর যাইতে পারি নাই, কখনও কখনও সভা-সমিতিতে দেখা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু দেখা না হইলেও আমি প্রায়ই তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদি পাঠকালে তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতাম এবং তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আমার মাতৃবিয়োগকাতর হৃদয়ে আমি দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম।

কবি এণ্টনি-সাহেব

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

কলিকাতায় মির্জ্জাপুরে দপ্তরী-পাড়ায় এণ্টনি-বাগান লেন নামক একটী গলি আছে। এই অঞ্চলে এণ্টনি-নামক একজন পর্টুগিজ বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গলির নাম "এণ্টনি-বাগান লেন" হইয়াছে। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে কলিকাতা, বেহালা-বড়িষার সুপ্রসিদ্ধ সাবর্ণ্য চৌধুরী বাবুদের জমীদারী ছিল। উক্ত এণ্টনি-সাহেব তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার লবণের ব্যবসায় ছিল। লালদীঘির উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যেখানে এখন "ওয়েষ্ট-এণ্ড-ওয়াচ্ কোম্পানী"র (West End Watch Co'র) দোকান আছে, সেইখানে সাবর্ণ্য-চৌধুরী বাবুদের বাড়ী ছিল। এণ্টনি-সাহেব এই বাটীতে বসিয়া কাছারী করিতেন। সাবর্ণ্য বাবুদের ৺শ্যামরায়-নামক বিগ্রহ ছয় মাস বেহালা-বড়িষায় ও ছয় মাস এই কাছাড়ী-বাড়ীতে থাকিতেন। ৺দোলের সময় কাছাড়ী-বাড়ীতে বিশেষ সমারোহ ও ফাগ্-খেলা হইত।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে আগষ্ট, রবিবার জব-চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই দিনই ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। জেনারল পোষ্টাফিস (General Post Office) হইতে ফেয়ারলী প্লেস্ (Fairlie Place) পর্য্যন্ত স্থানে জব চার্ণক সোরা ও অন্যান্য দ্রব্যের গুদাম করিয়াছিলেন।

একদিন সাবর্ণ্য বাবুদের কাছারী-বাড়ীতে ৺দোলযাত্রা-ও ফাগ্-খেলা হইতেছে, এমন সময় জব চার্ণকের কর্ম্মচারিগণ সেই স্থানে তামাসা দেখিতে যান। কিন্তু তাঁহারা ক্রিশ্চান বলিয়া কাছারী-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অনুমতি না পাওয়ায় জব-চার্ণক আসিয়া এণ্টনি-সাহেবকে বেত্রাঘাত করেন। এণ্টনি মনের দুঃখে সাবর্ণ্য বাবুদের অনুমতিক্রমে শ্যামনগরে গিয়া বাড়ী-নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুকালে এণ্টনি-সাহেব বহু টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার দুইটী পৌত্র ছিলেন, কলি-এণ্টনি (Cally Antony) ও হেন্‌স্‌ম্যান্-এণ্টনি (Hensman Antony)। এই শেষোক্ত এণ্টনিই কবি হইয়াছিলেন। কলি-সাহেব পিতামহের সঞ্চিত অর্দ্ধেক টাকা লইয়া পর্টুগালে গমন করেন। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা লইয়া এণ্টনি সাহেব এদেশেই আজীবন বাস করেন।

ফরাসডাঙ্গা-নিবাসী সৌদামিনী-নাম্নী একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া গোদলপাড়ার নিকট-বর্ত্তী গরাটীর বাগান-বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী "বার মাসে তের পার্ব্বণ" করিতেন। এণ্টনি সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। এণ্টনি স্বভাবতঃ বিলাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার সহবাসে থাকিয়া তিনি হিন্দুর উপযোগী আহার করিতেন ও কাপড়-চোপড় পরিতেন। ক্রমে ক্রমে নিজ বাড়ীতে যাত্রা ও কবির দল দিয়া এবং বিলাসিতা প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীর নিকটে এণ্টনি বিলক্ষণ বাঙ্গালা-ভাষা শিখিতে লাগিলেন।

অবশেষে এণ্টনি-সাহেব কবির দল করিবার ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণীকে এই কথা বলিলে তিনি তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। এণ্টনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোরক্ষনাথ যোগী নামক একটী লোককে মাসিক ২০৲ টাকা বেতন দিয়া বাঁধনদার নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে পাঁচ ছয় আসর তিনি কবি-গাহনা করিলেন।

(১) তেলিনীপাড়ায় ভোলা ময়রা ও এণ্টনি সাহেব

তেলিনী-পাড়ার বাড়ুয্যে বাবুরা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁহারা একবার ৺দুর্গাপূজার সময় ভোলা ময়রা ও এণ্টনি সাহেবকে বায়না করিয়া তেলিনী-পাড়ায় লইয়া গিয়াছিলেন। এণ্টনির আসরে নামিবার সময় উপস্থিত হইল। গোরক্ষ-নাথ যোগী এণ্টনির বাঁধনদার ছিল। এণ্টনি তাহাকে আগমনীর গান বাঁধিতে বলিলেন। গোরক্ষনাথ কহিল, "আমার তিন মাসের মাহিনা পাওনা আছে। এই টাকা অগ্রে না দিলে আমি আগমনীর গান বাঁধিব না।" এণ্টনি কহিলেন, "কল্য বাবুদের নিকটে প্রাতঃকালে টাকা পাইলেই তোমাকে দিব।" তথাপি গোরক্ষনাথ শুনিল না। এই সকল কথা

ভোলানাথের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি এণ্টনির নিকটে গেলেন। এণ্টনি ও ভোলানাথ আসরে বসিয়া বিবাদ ও গালাগালি করিতেন, কিন্তু আসরের বাহিরে তাঁহাদের পরস্পর পরম সৌহার্দ্দ্য ছিল। ভোলানাথ বলিলেন, "এণ্টনি! গোরক্ষনাথ গান বাঁধিবে না, বলিতেছে; এখন উপায় কি?" এণ্টনি কহিলেন, "আমি স্বয়ং গান বাঁধিব। মা জগদম্বার প্রতি যদি আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তিনিই আমার মুখ দিয়া গান বাহির করিয়া দিবেন।" ইহা বলিয়া আসরে নামিয়াই এণ্টনি এই গান ধরিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম গান :—

(চিতেন)

জয়, যোগেন্দ্র-জায়া, মহামায়া, মহিমা অসীম তোমার।

(পর চিতেন)

একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভব-সিন্ধু-পার।

(ফুকো)

মা তাই শুনে এই ভবের কূলে
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপৎ-কালে,
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ;

(মেল্‌তা)

তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোর্‌লে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?
অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে
আপনিও কুমাতা হ'লে আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমন পাষাণ-কুলে
ধর্ম্ম তেমন রেখেছ।

(মহড়া)

দয়াময়ি! আজ আমায় দয়া করবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ?
জানি তোমার চরণ-সাধন করি
ব্রহ্মা হ'লেন, ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী,
দেখ, সকল ফেলে ক্ষীরোদ-জলে ভাস্‌লেন শ্রীহরি ;
আবার শূন্য ক'রে সোণার কাশী, ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশান-বাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

(খাদ)

নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা-হীন হ'য়েছ ;

(২য় ফুকো)

মা তুমি দক্ষরাজ-কুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে :
শিব বিহনে, শিব-অপমানে
মা সেই অভিমানে
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি
দক্ষরাজায় নিদয় হলি
আপনি মলি, তারেও মেলি
পিতার দুঃখ ভাবলি নে।

(২য় মেলতা)

তখন যার অপমান শুনে কাণে
প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ-মনে দক্ষ-ভবনে,
আবার আপনি কঠিন-প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।
তারা তার' তার' তার', না তার' না তার'
আপনার গুণে তরবো,
দুর্গা নাম তরি মস্তকেতে ধরি
যতন করিয়ে রাখবো
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌বো

(২য় চিতেন)

মা অসাধ্য তোমার সাধন করলে সাধন
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

(২য় পর-চিতেন)

একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা ত মায়ের ধারা নয়।

(৩য় ফুকো)

মা রাবণ-রাজা অন্তিম-কালে, রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে,
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে, তার দুঃখ ভাব্‌লিনে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখলিনে।

(৩য় মেল্‌তা)

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডঙ্কা, অতি তেজ ডঙ্কা
আবার ছল ক'রে তার সোণার লঙ্কা
দগ্ধ ক'রে এসেছ।

(২) বাগবাজারে ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেবের কবি-লড়াই

একবার বাগবাজারে বারুদখানায় ভোলানাথ ও এণ্টনি-সাহেবের কবি-লড়াই হইতেছিল। এণ্টনি-সাহেব স্বয়ং দুর্গা সাজিয়া ও ভোলানাথকে শিব কল্পনা করিয়া এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে বলিলেন :—

যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি, সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ,
কহ দেখি ভাই ভোলানাথ! এর বিশেষ বিবরণ।
জান না কি শিব! আমি তোমার শিবানী,
তোমায় গর্ভে ধ'রে আমি, এখন হলেম তোমার রমণী।
সমুদ্র-মন্থন-কালে, বিষ পান ক'রেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে, রক্ষা কর আপনি।
ঢ'লে ছিলে বিষপানে, বাঁচালেম স্তন্যদানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় ব'লে ছিলে জননী?

ভোলানাথ এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিয়া অন্যভাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন :—

(ওরে) আমি সে ভোলানাথ নই,
(আমি সে ভোলানাথ নই)
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই।
চিন্তামণির চরণ চিন্তি ভাজনা-খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
সবাই পূজে ভোলার * *
আমার * * পূজে কই।
মেজো আমার খই, নেজো গাঁটালের দই,
পেরিণ[১]এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই,
কাছে বাগবাজারের খাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল,
দড়ি-কলসী নিয়ে ব্যাটা! হ'গে জল-সই॥

(৩) ভোলা-ময়রা, এণ্টনি-সাহেব ও রাজা হরিনাথ[২]

রাজা হরিনাথ কবি-গাহনা শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

১। বাগবাজারে হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্ হইতে গঙ্গাতীর, এবং মারহাট্টা ডিচ্ হইতে বাগবাজার ষ্ট্রীট্ পর্য্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে পেরিন্ সাহেবের বাগান (Perrin's garden) ছিল। এই স্থানেই ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শ্বশুর-বাড়ী ছিল। এই স্থানে এখন "সার্ব্বজনীন পূজা" হইয়া থাকে। এই স্থানেই এখন শ্রীযুত হরিদাস সাহা মহাশয়ের চূণের গুদাম ও শ্রীযুত নৃত্যলাল দত্ত মহাশয়ের বাটী ও সুরকীর কল হইয়াছে।

২। রাজা হরিনাথ, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কাশিমবাজার-নিবাসী কান্ত-বাবুর পৌত্র, রাজা লোকনাথের পুত্র এবং স্বর্গত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের মাতামহ।

তাঁহার কাশীমবাজারের বাড়ীতে প্রত্যেক বৎসর ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেবের কবি-গাহনা হইত। একবার উভয়ে তাঁহার বাটীতে গাহিতে গিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, "ভোলানাথ ও এণ্টনি! তোমরা বাঙ্গালা-দেশে অনেক স্থানেই গিয়া থাক। কোন্ স্থানে কি ভাল জিনিস দেখিয়াছ, তাহা বল।" এণ্টনির উত্তর তত ভাল হয় নাই এবং সে উত্তরও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভোলানাথ তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দিলেন :—

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুরী ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুরশিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
মেদিনীপুরের শাশুড়ী ভাল, সোহাগ সদাই।
শান্তিপুরের শালী ভাল, ভাল তার খোঁপা,
গুপ্তিপাড়ার গিন্নী ভাল, ভাল তার চোপা।
সুখ-সাগরের নারী ভাল, বড় রসবতী,
কাটোয়ার ভাজ ভাল, দেওরেতে প্রীতি।
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই,
গোয়াড়ীর গুণ্ডা ভাল, তুল্য তার নাই।
দিনাজপুরের কায়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি,
পাবনা-জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্দ্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশ-পরগণার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিশ ভাল, কিন্তু বংশ-লোপ।
মাণিক-কুণ্ডের মূলো ভাল মুড়ি দিয়ে খেতে,
চন্দ্রকোণার ঘৃত ভাল অন্ন-ব্যঞ্জনেতে।
বীরভূমের আচার ভাল, মোরব্বা ভাল তার,
হালি-সহরের দোকো বেগুন-পোড়া মজেদার।
জয়নগরের মোয়া ভাল, খোসবয়ে প্রাণ হরে,
জনাইয়ের মনোহরা ভাল, জিবে জল সরে।
মানকরের কদমা ভাল, বালীর পটোল,
বৈঁচিবাটীর কুমড়ো ভাল, কিন্তু পেটের গণ্ডগোল।
হুগলীর ভাল কোটাল-লেটেল, মল্লভূমির খোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল,— হরি হরি বোল।

(৪) বাগবাজারে এণ্টনি-সাহেব ও ঠাকুরদাস সিংহ

বাগবাজারে ভগবতীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীতে একবার এণ্টনি-সাহেব ও ঠাকুরদাস সিংহের কবি-লড়াই

হইয়াছিল। কবিবর রাম বসু, ঠাকুরদাস সিংহের দলে বাঁধনদার ছিলেন। রাম বসু এণ্টনিকে লক্ষ্য করিয়া গান বাঁধিলেন :—

বল হে এণ্টনি ! আমি একটা কথা শুনতে চাই,
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।

ইত্যাদি।

এণ্টনি ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি তখন মুখের মতন এই জবাব দিলেন :—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি,
হ'য়ে ঠাকুর-সিংহের বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি।

ইত্যাদি।

পুনর্ব্বার রাম বসু গান বাঁধিলেন :—

সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
ও তোর পাদরী-সাহেব জানতে পারলে গালে দেবে চুণকালী।

ইত্যাদি।

এণ্টনি এইরূপে ইহার জবাব দিলেন :—

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভেদ নাই রে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে র'য়েছে,
আমার মানব-জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

(৫) কাশীমবাজারে ভোলা ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব

একবার কাশীমবাজার-রাজবাটীতে ভোলা-ময়রার সহিত এণ্টনি-সাহেবের কবি লড়াই হইয়াছিল। এণ্টনি-সাহেব কোর্ত্তা-টুপি ছাড়িয়া বাঙ্গালীর বেশে আসরে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় ছড়া বাঁধিতেছেন ও গান ধরিতেছেন, ইহা দেখিলে বিস্ময়জনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, এণ্টনি অত্যন্ত পেটুক ছিলেন। ধনাঢ্য লোকের বাটীতে গাহিতে যাইলে এণ্টনি আকণ্ঠ আহার করিতেন। ব্রাহ্মণীর সাহচর্য্যে থাকায় বাঙ্গালীর মত তাঁহার আহার ও আচার-ব্যবহার হইয়া আসিয়াছিল। একথা ভোলা-ময়রা স্বরচিত কবিতায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভোলানাথ আসরে দাঁড়াইয়া

পেদরু ফিরিঙ্গী ব্যাটা, পেরু কাটা,
ব্যাটা কি সাহেব কলিয়েছে।
ব্যাটা ছিলো ভালো, সাহেব ছিলো,
হ'লো বাঙ্গালী,
এখন কবির দলে এসে মিলে
ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী।
জন্ম যেমন যার, কর্ম্ম তেমন তার,
এ ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে, নেমক ছেড়ে, (১)
কবির ব্যবসা ধ'রেছে।
কেউ বা কচ্চেন ব্যারিষ্টারী, কেউ বা ম্যাজিষ্টারী,
এলেমের জোরে কেউ বা কচ্চেন জজগিরি,
আর এ ব্যাটা পুজোর বাড়ী তুজোর লোভে
* * নাচাতে এসেছে॥

(৬) তেলিনী-পাড়ায় ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব

একবার তেলিনী-পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-প্রিয় বাঁড়ুযো বাবুদের বাটীতে ভোলানাথের সহিত এণ্টনির কবি-লড়াই হইয়াছিল। এণ্টনি আপনাকে 'ভক্ত' ও ভোলানাথকে 'দুর্গা' সাজাইয়া গান ধরিল :—

ওমা শিবে মাতঙ্গি !
ভজন-সাধন জানি না মা,
আমি জেতে ফিরিঙ্গী।

ইত্যাদি।

উক্ত গানটী শুনি ভোলানাথ দুর্গা সাজিয়া এণ্টনিকে উত্তর দিলেন :—

তুই জাত্-ফিরিঙ্গী, জবড়-জঙ্গী
আমি পারবো নাকো তরাতে।
(তোকে পারবো নাকো তরাতে)
শোন্ রে ভ্রষ্ট, বলি স্পষ্ট,
তুই রে নষ্ট, মহাদুষ্ট,
তোর কি ইষ্ট কালীকৃষ্ণ,
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে।

(৭) কাশীমবাজারে রাজা হরিনাথের নিকটে ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেবের আত্ম-পরিচয় প্রদান

রাজা হরিনাথের সময়ে ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব

(১) কবি হেন্সম্যান্ এণ্টনি-সাহেবের পিতামহ, এণ্টনি সাহেব লবণের ব্যবসায় করিতেন। এই হেতু, "নেমক ছেড়ে" বলা হইয়াছে।—লেখক

প্রত্যেক বৎসর কাশিমবাজারে তাঁহার বাটীতে কবি-গান করিতে যাইতেন। কবি-গাহনা শেষ হইলে রাজা হরিনাথ ভোলানাথকে বলিলেন,, তোমার আত্ম-পরিচয় দাও।" তখন ভোলানাথ কহিলেন :-

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
(ওগো) সন্দি গন্মি নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস ষড়্-ঋতুর হয় নাশ
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥
শীতে ভাজি মুড়ি খই গর্ম্মি-কালে ঘোল মই
বারমাস ভিঁয়াই সন্দেশ।
খাইতে ভোলার গোল্লা এণ্টনি ফিরিঙ্গি মোল্লা
হল্লা ক'রে তাল্লা দিয়ে বসে॥
কালোমেঘে বর্ষা কালে বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের প্যাপমে বাহার।
ষড়্ঋতু বারমাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতীয় ব্যাপার॥
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পুজো হ'লে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তির চন্দন সনে
কৃষ্ণ-পদে মন-ফুল সাজি॥
যা কিছু পয়সা যোটে নাহি তাহা দিই পেটে
কবির নেশায় দিই ঢালি।
কি শরতে কি হেমন্তে কি শিশিরে, কি বসন্তে
ভোলার খোলা ওগো নাহি খালি॥
তবে যদি কবি পাই হ'টে কভু নাহি যাই
হোক্ ব্যাটা যত বড় মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে লাগায়ে দাও
ভোলা নয় কিছুতেই জব্দ॥
হরু ঠাকুরের চেলা তাঁর পদে নত ভোলা
নমি তাঁরে আসরে নামিল।
'ভোলা এল' এই বোল বাজিল তিমুর ঢোল
গণ্ডগোল চৌদিকে পড়িল॥
আসরে নামিলে ভোলা শিউরে উঠে কবি-ওয়ালা
কত * * দেয় গালাগালি।
বাবু তারা সমজদার করি সূক্ষ্ম সুবিচার
ভোলারে দেয় জয়ডঙ্কা তুলি॥
নবকৃষ্ণ লালাবাবু সব বাবুকে করেন কাবু
ঠাসা রস তাঁদের ভিতরে।
বাবু ত বৈকুণ্ঠ মুন্সী যেন চাবি আর মুন্সী
মুন্সীআনা কবির আসরে।
অন্য বাবু যত সব যেন এক এক শব
সঙ্গীতের না বুঝেন মর্ম্ম।
ওস্তাদী কবির দল সুমধুর নিরমল
রসবোধ প্রাজ্ঞনের কর্ম্ম॥

(৮) ফরাসডাঙ্গায় ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব

একবার ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেব ফরাসডাঙ্গায় কবি-গান করিতে গিয়াছিলেন। একখানি বাটীর ভিতরেই দুই দলের লোক বাসা পাইয়াছিলেন। ভোলানাথ ও এণ্টনি পরস্পর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আসরে নামিলেই কাহারও দিগ্-বিদিগ্-জ্ঞান থাকিত না। এণ্টনি হাসিতে হাসিতে ভোলানাথকে "ময়রা" বলিয়া তাঁহার জাতি-নিন্দা করিলেন। তখন ভোলানাথও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা আসরে গিয়াই ইহার জবাব দিব।" আসরে নামিয়া ভোলানাথ গাহিলেন :—

বামুন বলে 'আমি বড়', কায়েত বলে 'দাস',
বদ্যি বলে 'দ্বিজ আমি, ঢাকা জেলায় বাস'।
যুগী বলে 'যোগী' আমি, চাষা বলে 'বৈশ্য',
শূদ্রও শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য।
বলে উগ্র 'নহি শূদ্র, ধরি তলোয়ার'
হ'লে রাত্রি উগ্রক্ষত্রী, ভয়ে পগারপার।
চাষা ধোপা 'সচ্চাষী' বলে, কৈবর্ত্ত 'মাহিষ্য,'
সবাই বড় হ'তে চায় কেউ কারো নয় বশ্য।
এণ্টনি ফিরিঙ্গি-বাচ্চা, না আছে তার কাচ্চা-বাচ্চা,
ব্যাটা বড় নচ্ছারের শেষ,
(তার) বাপ-মায়ের খপর নিলে, কিছু না মিলে ধরাতলে,
ব্যাটার যেমন ধর্ম্ম, কর্ম্ম তেমন বেশ।
আমি ময়রা-ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই বার মাস,
জাতি পাতি নাহি মানি, ওগো মোর কৃষ্ণপদে আশ।

(৯) ভোলা-ময়রা এণ্টনি-সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়া "উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিয়া আনিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন প্রেসিডেন্সী-কলেজের সংস্কৃত-প্রোফেসর রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি ভোলা-ময়রার কথা তুলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর

মহাশয় কহিলেন, "ভোলার মত তেজস্বী, বুদ্ধিমান্ ও উপস্থিত কবি দেখি নাই। ভোলার জুড়ি মেলা ভার। আসরে দাঁড়াইয়া সে যে কি করিয়া উপস্থিত জবাব দিত, তাহা এখন ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। বাঙ্গালা-দেশে সমাজের অবস্থা দিন দিন কলুষিত হইয়া যাইতেছে। এখন ভোলা ময়রা নাই যে, দু-কথা কয়। ভোলার গান ও কবিতায় খাঁটি ভাব ও ভাষা আছে। এখনকার কবিদের মত ভোলা 'ধোঁয়া কবি' বা 'কোয়াসা-কবি' ছিল না। যে টুক বলিবার কথা, তা সে অতি সরল ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, 'হুতুম-প্যাঁচা'র লেখকের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা-ময়রার ন্যায় কবি-ওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে ভোলার প্রশংসা ধরিত না। তিনি বলিলেন, "একদিন হাল্‌সী-বাগানে ভোলার কবিগান শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, ভোলা ও এণ্টনির লড়াই হইবে। ভোলা এণ্টনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল"—

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি,
তোর কটা বাপ্ বল শুনি।
না বল্‌তে পারলে দেখবি আজ, ভোলার কেমন শক্ত পানি।
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা,
তোর মত হাবা-গোবা আমি আর দেখিনি।
পথে ঘাটে দেখিস যারে, অমনি বাপ বলিস্ তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি।
শোন্ রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশ-রক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বাম্‌নী। (১)
তোর রসবতী গুণবতী ঘরের শ্রীমতী,
জুটবে তার কত শত সুরসিক পতি,
কফিনে পা দিবি পুরে, ঢুকবি গিয়ে অন্ধ গোরে,
যীশু বল্‌বি বদন ভ'রে, তার উপায় কি বল্ শুনি।
না ভজিলে যীশু-নাম, তোর গোরে ডাকবে ব্যাং,
ভেংগে দেবে তোর ঠ্যাং, যত মামদো ভূত আর পেত্নী।

(১) এই বাম্‌নী এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাহার নাম সৌদামিনী। এণ্টনি-সাহেব এই ব্রাহ্মণ-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ও তাহাকে লইয়া গরুটীর বাগান-বাড়ীতে আজীবন বাস করিয়াছিলেন।

(১০) ভোলা-ময়রা, এণ্টনি-সাহেব ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"রিজ এণ্ড রাইয়ৎ" (Reis and Rayyat) নামক বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সুবিদ্বান্, সুলেখক ও সুরসিক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভোলা ময়রা ও এণ্টনি সাহেবের বিষম গোঁড়া ছিলেন। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তাঁহারও মুখে ভোলা-নাথের প্রশংসা ধরিত না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইতাম। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন, "Bhola's exodus, Bhola's presence of mind."

শম্ভু বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি একবার শ্রীরামপুরে একজন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম, অদ্য রাত্রিতে শ্রীরামপুরে ভোলা-ময়রা ও এণ্টনি-সাহেবের কবি-লড়াই হইবে। শুনিবামাত্র আমি আসরে গিয়া বসিলাম। ভোলা ময়রা আসরে নামিয়াই এণ্টনিকে প্রশ্ন করিলেন :—

নাট্‌র নীচে নাড়ু নড়ে, লাড্ডু নয় ভাই,
বৃন্দাবনে ব'সে দেখ বসু ঘোষের রাই।
ঘোমটা খুলে চোম্‌টা মারে, কোম্‌টা বড় ভারী,
তিন লক্ষে লঙ্কা পার, হাস্‌চে শুক-সারী।
বাঁজা মেয়ের ব্যাটা হ'ল, অমাবস্যার চাঁদ,
এণ্টনি ! জবাব দাও, নইলে বাঁধবে বিষম ফাঁদ।

এণ্টনি জবাব দিতে না পারিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।[১]

(১১) হাল্‌সীবাগানে এণ্টনি সাহেব ও রামসুন্দর স্বর্ণকার

একবার হাল্‌সীবাগানে বারোয়ারী-তলায় রামসুন্দর-স্বর্ণকারের সহিত এণ্টনি-সাহেবের কবি-সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহাতে গোরক্ষনাথ যোগী, এণ্টনি সাহেবের ও রাজকিশোর বন্দোপাধ্যায়, রামসুন্দর স্বর্ণকারের বাঁধনদার ছিলেন।

(১) এণ্টনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। আমরাও দিতে পারিলাম না। পাঠক-মহাশয়-গণের উপরি উত্তর দিবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

ধরতা

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।

রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত।

(১ চিতেন)

কথাতে প্রবোধ না মানে, হ'য়েছি অধৈর্য্য সবাই।

(১ পর-চিতেন)

এল ব্রজেতে ঋতুরাজ, এ সময় ব্রজরাজ

সুখের ব্রজধামে নাই।

(১ ফুকো)

তুমি ত সেই শ্যামের শ্রীচরণ-চিহ্ন

জানত সব গোপীর অনন্যগতি কৃষ্ণ ভিন্ন।

(১ মেল্‌তা)

পড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ ব'লে

তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান।

(মহড়া)

আশা-বাক্যে পদাঙ্ক বাঁচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ।

করে গুণ গুণ স্বর মধুকরে

কোকিলের কুহুস্বরে

হানে আবার তার পঞ্চশর পঞ্চবাণ।

(খাদ)

এ জ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নির্ব্বাণ

(২ ফুকো)

যদি হও রাধার পক্ষে সপক্ষ হে তুমি

এনে দাও গোকুলে সাধের গোকুল-স্বামী

(২ মেল্‌তা)

গেছে লো অনেকবার অনেক জন

আন্তে সেই কৃষ্ণধন

সকলে হয়ে এল অপমান।

উত্তর।

গোরক্ষনাথ যোগীর রচিত।

এণ্টনি-সাহেবের দলে গীত।

(১ চিতেন)

গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য।

(১ পর-চিতেন)

কারে কই সই শুনতে রাধার যন্ত্রণা

ও যে শ্যাম-চরণ-চিহ্ন।

(১ ফুকো)

সখি ঐ যার পদচিহ্ন

সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝলে না।

অরণ্যে রোদন করিলে এখন

ঘুচবে না মনের বেদনা।

(১ মেল্‌তা)

রাধার সুখের ত কপাল নয়

তা হলে কি এমন দশা হয়?

কাঁদে কৃষ্ণহীন হ'য়ে রাধা প'ড়ে ভূতলে।

(মহড়া)

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই,

কি হবে ব্যাকুল হ'লে,

এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই কিশোরী

হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণ-মূলে।

(খাদ)

কেন ব্রজধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম

রাধার দুঃখের কপাল না হ'লে।

(২ ফুকো)

মনে জ্ঞান হয় জন্মান্তরে

আমরা কৃষ্ণ হরি সখি ছিলাম কার।

বুঝি সেই পাপে এই মনস্তাপে

দহিল প্রাণ গোপিকার।

(২ মেল্‌তা)

নহিলে যাঁর নামে বিপদ্ যায়

প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়

এখন রাধার প্রাণ যায়,

গোকুল ভাসে দুখ-সলিলে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের চিত্রকলা

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় রূপসাধনাক্ষেত্রে যে বিচিত্র সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে চিত্রকলাই তার ভিতর সব চেয়ে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ধারাবাহিকভাবে চিত্রকলার পরম্পরা পাওয়া দুল এবং যা কিছু পাওয়া গেছে তা নিয়েও কালগত ও দেশগত বিতর্ক ফেনিল হয়ে উঠেছে। রীতিগত বিচারও সামান্যভাবে আলোচনা ...

ঐতিহাসিক তারানাথ দেবরীতি যক্ষরীতি ও নাগরীতির উল্লেখ করেছেন। এতে উপলব্ধি হয়, রস গ্রন্থাদির অনুশাসন সত্ত্বেও চিত্রকলা ভারতে কখনও নীরস বা একঘেয়ে হয় নি। তারানাথ দেশগত বৈচিত্র্যেরও উল্লেখ করেছেন। তিনটি প্রধান চিত্রচক্র পশ্চিম, মধ্যদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মধ্যদেশ হ'ল অনেকটা আধুনিক যুক্ত-প্রদেশ স্থানীয়, রাজপুতানা হচ্ছে পশ্চিম অঞ্চলের রীতির জন্মভূমি এবং পূর্ব্বাঞ্চল ছিল পাল সাম্রাজ্যে বাঙ্গালা দেশ। বস্তুতঃ তারানাথ ভারতীয় চিত্রকলার ত্রিমূর্ত্তি অনুধাবন করে যথাক্রমে এসবকে যক্ষ, দেব ও নাগরীতি বলে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

বর্ষাবিহার: রাজপুত চিত্রকলা।

অথচ এযুগে আমরা হিন্দু শীলতার এই পরিপূরক রূপ-শ্রীর নানাদিক দেখতে কুণ্ঠিত হই। প্রতিপদেই সন্দেহ ও সংশয়। বাঙ্গালার চিত্রকলার কৌলীন্য স্থলবিশেষে অস্বীকৃত হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের সারবান্ সংগ্রহ অদৃশ্য হয়েছে এবং পশ্চিমের নানা বিভাগের অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রসংগ্রহ একটা নূতন নাম পেয়েছে, সেটা হচ্ছে রাজপুত চিত্র। বস্তুতঃ ... চিত্রকলাই রাজপুত নাম নিয়ে বাজারে চলে যাচ্ছে। অথচ এ সব একান্তভাবে রাজপুতানায় যে আবদ্ধ তা নয়।

যাকে রাজপুত-চিত্র বলে আধুনিক যুগে আলোচকগণ আত্মহারা হন, তা নিয়েও অনেক গলদ আবিষ্কৃত হয়েছে

সার যদুনাথ সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে এই শ্রেণীর চিত্রকলার রাজপুতত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন :—

"What Dr. Coomaraswamy calls the Rajput School of Paintings is not an indigenous Hindu product, nor has it any natural connection with Rajputana. It is the work of immature pupils of the old masters of the Mughal Court working in a less cultured atmosphere."

সরকার মহাশয়ের অনুমানের সহিত অধিকাংশ আলোচক একমত হবেন না, সন্দেহ নেই। তবে এশ্রেণীর আলোচনার

রাজপুত চিত্রকলা : স্নান।

ভিত্তি হচ্ছে এই উভয়শ্রেণীর চিত্রকলার সমসাময়িক অস্তিত্ব। মুসলমান যুগেই মোগল-চিত্র ও রাজপুত-চিত্র এই উভয়ের উদ্ভবকাল: অন্ততঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজপুত-চিত্র পাওয়া দুর্লভ। অবশ্য হস্তলিখিত সচিত্র পুঁথির দোহাই দিয়ে হিন্দু-চিত্রকলার কালকে আরও প্রাচীন প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। জৈন পুঁথির ছবি বা রস ও বিলাসের নমুনা ঠিক সুবিস্তৃত রাজপুত-চিত্রকলার মত ব্যাপার নয়। কুমারস্বামী বলেছেন, বোষ্টন ম্যুজিয়ামে ও অজিত ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহের রাগমালা চিত্রগুলি খাটি রাজপুত-চিত্রকলার আদিতম নমুনা। এগুলির রচনাকাল হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। কাজেই যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উক্তিকে প্রতিবাদ করবার উপযুক্ত ও সারবান্ মালমশলা এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে মনে হয় না। এজন্য পার্সি ব্রাউন (Percy Brown) সাহেব বলেছেন :—

"With the decline of Buddhism in India in the seventh century A. D. the art of painting appears to have come to a standstill and for nearly a thousand years except for a few Jaina book illustrations of the fifteenth century, there is not a single specimen of Indian painting revealed to us."

বস্তুতঃ রাজপুত-চিত্রকলা নামে পরিচিত চিত্রপর্যায়ের উৎপত্তি, প্রসার ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানারূপ গভীর সন্দেহ এই জন্যই চারিদিকে মুখর হয়ে উঠেছে। এ সব নিয়ে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর ও আত্মবিরোধী। প্রতি পদেই সে সব কণ্টকে পরিপূর্ণ। রাজপুত শীলতার প্রকৃতি ও রূপভঙ্গ নিয়েও বিশেষ আলোচনা হয় নি, যা হয়েছে তা একান্ত লঘু ও বহির্মুখীন।

এজন্য শুষ্ক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চ্চা করেন, তাঁরা হিন্দু চিত্রকলার মর্ম্মস্থলে আঘাত করতে ইতস্ততঃ করেন নি। মোগল ইতিহাসে অভিজ্ঞ যদুনাথ সরকার মহাশয় এই জন্যই বলেছেন, তিনি অনেক হিন্দু-চিত্র মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত হয়েছে দেখতে পেয়েছেন :—

"I have seen some beautiful and genuinely old Indo-Saracen Hindu pictures which represent the elders of Mathura dressed and armed like Mughal courtiers going out to meet Krishna and Rama, advancing to the conquest of Lanka with his army marching in exact divisions with all the arms, equipment and transport of the Mughal Imperial army, artillery not left out!"

সরকার মহাশয়ের উক্তিকে একান্ত উদ্ভট বলা যায় না, অথচ অপর পক্ষেও বলবার অনেক আছে। মুসলমান চিত্রকরের আঁকা দেবমূর্ত্তিগুলির গলদ যে সহজেই ধরা যায়, শুধু এই কথাটুকুই তাঁর উক্তি হতে প্রমাণিত হয়। রাজপুত-কলার অসংখ্য নমুনায় এরকমের বিরোধ পাওয়া যাবে না। মুসলমান চিত্রকর কর্ত্তৃক হিন্দু-বিষয় আঁকা বা হিন্দু চিত্রকর কর্ত্তৃক মুসলমান-বিষয়ে রচনা করা ভারতে বিস্ময়ের বিষয়

নয়। ভারতবর্ষের সম্রাটেরা, অন্ততঃ যাঁরা চিত্রকলার পক্ষপাতী ছিলেন, কখনও উৎকট ধর্ম্মগত বৈষম্য নিয়ে আত্মহারা হন নি, বরং সম্রাট আকবর প্রভৃতি ইসলাম ধর্ম্মের যে একটা সর্ব্ববিরোধী দিক ছিল, তাকে দূর করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আকবরের ধর্ম্মকেও ঠিক মুসলমান ধর্ম্ম বলা চলে না। তিনি বিবাহাদি বন্ধনে একটা সাধারণ সর্ব্বগ্রাহ্য ভারতীয় শীলতার জন্মদান করেন। বাঙ্গালাদেশের বাদসাহগণও রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। কাজেই চিত্রকলাদি-ক্ষেত্রেও কোন কোন স্থলে একটা সমভূমি গড়ে উঠা অস্বাভাবিক নয়।

অথচ এ কথাও বলা প্রয়োজন, হিন্দু শীলতার যে একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও প্রাণবস্তু আছে, তা' কিছুতেই মুসলমানের কূলপ্লাবী সাম্যের সমভূমিতে নামেনি। সেটা আনন্দেরই বিষয়, কারণ সাম্যবাদী ইস্‌লামের রচনাও এমন একটা রসবস্তু দান করেছে, যা অধিকারবাদী হিন্দুর বিচিত্র, বিভিন্ন ও উদ্ধশির জীবনতরঙ্গে কখনও বিকশিত হয়ে উঠেনি। এমনি করে সহজেই প্রাণলাভ করেছে দুটি স্রোত—সাম্যবাদী ও বৈচিত্র্যবাদী। বৈচিত্র্যবাদীর রসমূর্চ্ছনা একান্তভাবে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষুরধার পথে গেছে এবং কোথাও উচ্ছ্বাসের অভ্রভেদী রূপযানে নিজকে বিকশিত করেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ বিভেদটি চিত্রকলাপ্রসঙ্গে খুব কম আলোচকই লক্ষ্য করেছেন। মোগল দরবারের স্ফীত আড়ম্বর, ধনপুষ্ট গর্ব্বের উষ্ণ পক্কতা, অশ্রান্ত শ্রমের অনিদ্র নৈপুণ্য অপেক্ষাকৃত রিক্ত আবহাওয়ায় পাওয়া দুর্লভ হবে। এই জন্যই যদুনাথ সরকার মহাশয় মোগল-কলার শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে মুখর হয়েছেন। এই জন্যই তিনি রাজপুত-চিত্রকলা সম্বন্ধে বলেছেন :—

"The immature pupils of the old masters of the Mughal Court working in a less cultured atmosphere and for poorer patrons."

অথচ গ্রাম্যশিল্পীর সহজ-সাধনা, অক্ষত রসদৃষ্টির তারুণ্য ও আত্ম-সমর্পণের ঋজুতা বর্ণের যে আলোক ও রেখার, যে উর্ম্মিভঙ্গের জন্মদান করেছে, তা মোগল দরবারের শস্ত্রকণ্টকিত চত্বরে পাওয়া যাবে না।

পশ্চিম হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে অর্থাৎ তিহরি-গাড়্‌হওয়াল হ'তে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যে চিত্রপদ্ধতি চলে এসেছে, তা'কে এক কথায় রাজপুত পাহাড়ী বলা হয়। এর ভিতর কাংড়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাজপুত চিত্রের সরস রেখাকৌলীন্য, বর্ণের স্বচ্ছ ও কোমলতার ছটা এবং অঙ্কনশ্রীর দুর্লভ ভঙ্গী মোগল-দরবারের দস্তুর ফরমায়েসে সৃষ্ট হ'তে পারে নি। কাংড়ার রীতির সৌন্দর্য্য বোষ্টন মিউজিয়ামের রক্ষিত নল দময়ন্তীর চিত্রাবলীতে পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ কোন কোন বিষয়ে কাংড়া চিত্রশৈলী [illegible] আলোকের মত ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভাকে মুক্ত করেছে। গাড়্‌হওয়ালের চিত্রকলা পাহাড়ী রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও রসবিজ্ঞান উদ্ঘাটনে এবং সূক্ষ্মতম অলঙ্করণের কৃতিত্বে বিজয়-মুকুট লাভ করেছে। এক্ষেত্রে মোলারামের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাহাড়ী শিল্পের কিছুটা ইংরাজ আমলের রূঢ় স্পর্শ হ'তে মুক্ত ছিল—অন্যত্র [illegible] আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই নিষ্প্রভ হয়েছে।

দামোদর : রাজপুত কাংড়া।

সম্প্রতি পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা বলতে মুখ্যতঃ এই দুটি ধারাই বুঝায়। বস্তুতঃ এই দুটি ধারার ভিতর দিয়ে

সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতের জীবনস্পন্দনের দুটি দিকই উদ্ঘাটিত হয়েছে। রাজপুত চিত্রকলায় আছে ভারতীয় রস-

রাজপুত প্রাচীচিত্র।

লীলার অসীম ভঙ্গ ও অধ্যাত্ম-বেপথুর ললিত ছন্দ। অরূপের রূপ নিয়ে মত্ত হিন্দু শিল্পী এ রাজ্যে অদৃশ্য রাগিণীকে চিত্রাপিত করতে উৎসাহিত হয়েছেন। প্রোচ্য রূপকে চক্ষুগোচর করবার চেষ্টা জগতের ইতিহাসে শুধু ভারতেই সম্ভব হয়েছে। অতি সূক্ষ্মতম ভাবসমাবেশ, জন্মান্তরগত সাধনা ও পেলব রূপ-চর্চ্চার ভিতর দিয়ে দীপ্যমান হয়েছে রাগিণীকল্পনার বায়বীয় স্বপ্ন। সাম্যবাদী ও রূপদ্রোহী ইসলামীয় শীলতায় তা সম্ভব হয়নি। একদিকে সঞ্চারিত হয়েছে তপোবনের স্নিগ্ধ স্মৃতি, গোচারণের মাঠ, গোষ্ঠলীলাদি এবং প্রাকৃতিক রূপবিজ্ঞানের সংযত সমারোহ সৃষ্টি করার উৎসাহ। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে এসেছে, সমগ্র হিন্দু-চিত্রকলার ভিতর জীবন-মরণের বহুমুখী সমস্যা, হৃদয়তন্ত্রীর অফুরন্ত ও অসীম গমক। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভিতর দ্যোতিত হয়েছে মানব-জীবনের অসীম রূপসম্পর্ক ও রসপ্রপাত। এসব মোগল-চিত্রকলায় জন্মায়নি। ঐশ্বর্য্যের আজগবী প্রলোভনে ও দম্ভের কঠিন শাসনে মোগল রাজ্যের সিংহাসনতলে জীবনের অশ্রান্ত জোয়ার-ভাটার এ রকমের অভিনয় সম্ভব হয় নি। অপর দিকে মোগল-কলা নিয়ে এসেছে দরবারের সুসজ্জিত চিত্রকলা। আদব-কায়দার হিল্লোলিত শাসন ও কঠিন রূপবিধানের লৌহবেষ্টনীতে জীবন মথিত হয়ে ফেনিল করে তুলেছে নিয়ন্ত্রিত ও আড়ষ্ট হৃদবৃত্তিকে। ভারতীয় আবহাওয়ায় তাতেও দুর্লভ ফসল ফলেছে। চৌষট্টি কলার বিকৃত পট উজ্জয়িনীর উষ্ণতা ও চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্রাতপ যেন শোভাযাত্রা করে ভারতের বক্ষে রূপসাধনার দিগ্বিজয়ী সমারোহ উপস্থিত করেছে। মোগলের বাদশাহেরা রূপের খেলার সমঝদার ছিলেন। চীনদেশের মোগল সম্রাট কাবলা খাঁ ভারতীয় আনিকোকে (Anico) নিজের রূপ শিল্পের দপ্তরের নায়ক করেছিলেন। ভারতের মোগল দরবারেও হিন্দুর রূপগুণের সমাদর সামান্য ছিল না। রূপবিমুখ ইসলামের ভারতে আবার পুনর্জ্জন্ম হয়েছিল। সাম্য-বাদীর বিরাট ও নিরঙ্কুশ প্রভা, মহত্ত্বের প্রতি বিমুখীনতা, জাতিভেদের স্তরের প্রতি নির্ম্মম দৃষ্টি মোগল শিল্পে এনে-

নেপাল চিত্র : রাধাকৃষ্ণ।

ছিল রহস্যবাদ নয় বাস্তবতা। সমরকন্দ ও হিরাটের স্মৃতি অনেকটা ধূসর হয়ে যায় দিল্লীর আবহাওয়ায়। আবুল

ফজলের উক্ত ফরক্ আবদল সমাদ, সৈদ আলী প্রভৃতি মুসলমান চিত্রকরগণ বাসোয়ান, দশনাথ, কেশবদাস প্রভৃতি হিন্দু শিল্পীর প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। হিন্দু

নাগী গরুড় : নেপাল।

শিল্পীরাও পারস্য কবি নিজামীর গ্রন্থকে চিত্রযুক্ত করেছিল। এমনিভাবে গড়ে উঠে মুক্তরৌদ্রে মোগল রূপায়ন—যা' কখনও বা প্রভাতের স্নিগ্ধতা, কখনও বা মেঘালিঙ্গিত ছায়াঘন কারুতা দ্বারা ভারতীয় ভাবের গালিচাকে বর্ণে ও ছন্দে বিচিত্র করে তোলে। ইসলামের ঐহিকতা যে বাস্তব-প্রিয়তার জন্মদান করে, তার ফলে ছুটি মুগ্ধকর পরিণতি ঘটে ছুটি চিত্র-শাখায়, অর্থাৎ মোগল ও রাজপুত-প্রতিচিত্রে। ইউরোপীয় সমঝদারগণও মোগল-কলার এই বাস্তবপ্রিয়তা লক্ষ্য করেছেন। পার্সি ব্রাউন বলেছেন :—

"Realism is its keynote."

রাজপুত-রচনাক্ষেত্রে এই বাস্তব রচনার সম্পর্ক যে প্রতিচিত্র সৃষ্টি করে, তার মুখ্য উপাদান ছিল পল্লী-জীবন। কোন লেখক বলেছেন—

"When the artist represented realistic scenes of rural life, his animal drawing indicated a knowledge of nature surpassed only by the Japanese."

এ প্রশংসা সামান্য নয়। অতি নিখুঁত ভাবে জাগ্রত রচনার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির অবতারণা। অপর দিকে বৈষ্ণব ও শৈব সাধনার প্রতিফলক রচনার সংখ্যাও সামান্য নি। এর ভিতরও গ্রাম্য ও আরণ্য দৃশ্যে এই বাস্তবতার ক্রিয়া বিশিষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

মোগল-প্রতিচিত্র-রচনার ক্ষেত্রে (Portraiture) ভগবতী ও ছনার প্রভৃতি হিন্দু শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। অপর দিকে রাজপুত শিল্পেও প্রতিফলিত সমসাময়িক বাস্তবতার ঢেউ দু'টি চিত্র-চক্র সৃষ্টি করে—একটা হচ্ছে কাংড়াচক্র, অন্যটি হচ্ছে জয়পুরচক্র। অপর হিন্দু চিত্রকলা মুখ্যতঃ বাস্তব-প্রিয় ছিল না। ব্রাউন সাহেব স্বীকার করেন :—

"Unlike the Mogul the Rajput artist was not by inclination a portrait painter, but probably owing to the fashion set by the Mogul emperors he was responsible for a considerable number of likenesses of a very interesting type."

গরুড় : অজন্ত্র।

পল্লী জীবন, আশ্রম-কক্ষ ও পৌরাণিক কাহিনীর স্নিগ্ধ চর্চ্চা হয়েছে রাজপুত কলায় ; আরণ্য-যাত্রা, শিকার কাহিনী, তাঁবুর জীবন, জয়যাত্রার সুস্পষ্ট ছটা ফলিত হয়েছে মোগল-শিল্পে। জাহাঙ্গীরের আদেশে বাস্তব শিল্পীরা বুনো পাখী ও পশুকে হুবহু ভাবে আঁকতে উৎসাহিত হ'ত। এদের রচনা দেখে ইউরোপীয় শিল্পীদেরও তাক লেগে গেছে।

যশোদা : বাঙ্গালার পট।

"The Palm tree framed against the sky or the fleshy leaved plantains with its purple flower hanging heavily the golden Palm tree or the young red shoots of the mango and all the numerous trees and shrubs of the garden are to be readily identified in the pictures of the Mogul school."

এমনি ভাবে দেখা যাবে, এ দু'টি চিত্ররীতির ভিত্তি বিভিন্ন হলেও সমসাময়িক বলে' সেকালের বিশাল ভারতীয় জীবনে এ দুটিই একটা সমান ভূমি অবলম্বন করে' অগ্রসর হচ্ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পশ্চিম-ভারতের এ দুটি রীতিই পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নব্য-প্রতীচ্য আলোচকদের জয়-জয়কার সত্ত্বেও পশ্চিম-ভারতের রীতিকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। তারানাথ পূর্ব্ব-ভারতে নাগরীতি প্রবর্ত্তিত দেখতে পান। মোগলের আলোড়নে মধ্য ও পশ্চিম-ভারত একটা মিশ্র পদ্ধতির জন্মদান করে। পূর্ব্বাঞ্চলের রীতি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই অগ্রসর হয়। এ অঞ্চলে অনেক খাণ্ডবদাহ হয়েছে এবং কালাপাহাড়ী আমলে ধ্বংস-লীলার প্রবর্ত্তনও সামান্য হয় নি। বিশ্ববিশ্রুত প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে নিশ্চিহ্ন করার উৎকট উৎসাহও এ অঞ্চলে দেখা গেছে। গৌড় সাম্রাজ্যের মগধ, বঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম এবং পূর্ব্ব ভারতের অন্যতম গৌরবতিলক নেপালকে নিয়ে পূর্ব্ব ভারতীয় শীলতা একটা মুগ্ধকর রস-বিজ্ঞান সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ ভাস্কর্য্যক্ষেত্রে প্রাক্-ভারতীয় শিল্পের দান অসামান্য। কোন সুনিপুণ আলোচকের মত গৌড়ে এক শতাব্দীতে যত মূর্ত্তি রচিত হয়েছে, পশ্চিম-ভারতের পক্ষে সমগ্র মূর্ত্তিসংগ্রহ যোগ করেও সে সংখ্যাকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এ প্রবন্ধে ভাস্কর্য্যের আলোচনার অবসর নেই। প্রাক্-ভারতীয় চিত্রকলাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' সমগ্র বিচারের সূত্রপাত করাও সম্ভব নয়।

মোগল বাদসাহদের প্রভাব এবং পশ্চিমের রাজপুত হাওয়ার মদগর্ব্বও বাঙ্গালা দেশকে বা পূর্ব্বাঞ্চলকে অবনত করতে পারেনি। নালন্দায় যে কাপড়ের উপর চিত্রাঙ্কন হ'ত, একথা চৈনিক সাহিত্য হ'তে জানা যায়। বাঙ্গালা দেশের ও উড়িষ্যার লোকচিত্র (folk painting) স্বীয় অসামান্য প্রভাবের মর্য্যাদায় অমর হয়ে আছে। মুসলমান প্রভাবে সে সব জীর্ণ হয় নি। সেগুলি অন্তরঙ্গ বা expressional সৃষ্টি। এ শ্রেণীর সৃষ্টি আজ জগতের সর্ব্বত্রই বন্দিত হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি বিষয় পূর্ব্ব-ভারতীয় শিল্পীর হস্তে একটা স্বাধীন রীতিতে চিত্রিত হয়ে আসছে। উড়িষ্যায় এখনও এ রীতি জীবন্ত ও প্রাণবান্। ইউরোপের গ্রীস প্রদেশে এথস্ (Athos) পাহাড়ে পাদরী শিল্পীরা খ্রীষ্টের যেরূপ মূর্ত্তি এখনও আঁকছেন, তার সহিত তুলনা করলে বুঝা যাবে, পূর্ব্ব-ভারতীয় অন্তরঙ্গ রীতি কিরূপ মার্জ্জিত ও সুসম্পন্ন।

অপর দিকে অন্য রীতির প্রভাবও সামান্য নয়। মূর্ত্তি-রচনার সহিত চিত্ররীতি একান্তভাবে জড়িত। অনেক সময় মাটির মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দেবতা চিত্রেও অঙ্কিত হন। 'সরা'-র উপর আঁকা দেবীমূর্ত্তি অতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে

ভাস্কর্য্যের অপেক্ষাকৃত বাস্তবমূলক রীতিতে অঙ্কিত হয়ে এসেছে। বিশেষতঃ চালচিত্রে যে ছন্দ এদেশে রীতি হয়ে এসেছে, তার তুলনা আধুনিক ভারতে পাওয়া যাবে না। শুধু নেপাল, তিব্বত ও চীনে সে শ্রেণীর ক্রমবিন্যস্ত চিত্রধারাও প্রচলিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। রূপকৌশলে, ভাব-গভীরতায় ও মার্জ্জিত রুচিতে এ শ্রেণীর রচনা পশ্চিম-ভারতীয় রীতিকে সহজেই হতশ্রী করে দেয়। কাজেই পশ্চিমের রীতি পূর্ব্ব-ভারতে না চলবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এ রচনার ধারা বাঙ্গালা ভাস্কর্য্যের সহিত সমতান রক্ষা করেছে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত দেবমূর্ত্তির ছন্দেই এই চালচিত্র প্রাণবান্ হয়েছে। কালী-ঘাটের পটের ছন্দও একটা লোক-কলার মহার্ঘ বার্ত্তার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এবং দুটি রীতি মিশ্রিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটা দেবচিত্র অঙ্কনের রীতি সৃষ্টি করে, তা'র নমুনাও দুর্লভ নয়।

বস্তুতঃ, পূর্ব্ব-ভারতে প্রতিচিত্রের ফরমায়েস সামান্য ছিল বলেই বাস্তবতামূলক রীতি উদ্ঘা-টনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি; অথচ ভাস্কর্য্যে দেখা যায়, বাঙ্গালা দেশে ও পূর্ব্ব-ভারতে বাস্তব-তার সহিত আদর্শবাদের এমন একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, যা' মোগল-শিল্পের সাম্যবাদের মত একঘেয়ে হয়ে যায়নি। বাঙ্গালার প্রতিমা-রচনায় এবং নানা জায়গায় আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তিতে এ সঙ্গম সুস্পষ্ট হয়। বাঙ্গালার চালচিত্র সার্থক ভাবে যুগাগত প্রাক্‌ভারতীয় শীলতার এই প্রতি-বিম্বটি রক্ষা করে চলেছে। মোগল ও রাজপুত-কলার খণ্ডতা ও প্রবাহহীনতা এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।

নেপালের বিস্তীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথির গ্রন্থাগারে প্রায় হাজার বছর পূর্ব্বের একখানি প্রাচীনতম পুঁথিতে যে দশা-বতারের চিত্র আছে তা' প্রাক্-ভারতীয় রীতিকে সুস্পষ্ট করেছে। এ শ্রেণীর পুঁথিগুলি ভারতে দুর্ভাগ্যক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

ইদানীং মুসলমান আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি চিত্র লেখক কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাও প্রাক্-ভারতীয় রীতির প্রতিফলক। চিত্রখানির ভঙ্গী প্রাচীন উড়িষ্যা-শিল্পের, কিন্তু ভিতরকার গুলিতে পূর্ব্ব-ভারতীয় ধর্ম্ম প্রস্ফুট হয়েছে। দশাবতারের চিত্রও চিত্রখানিতে আছে।
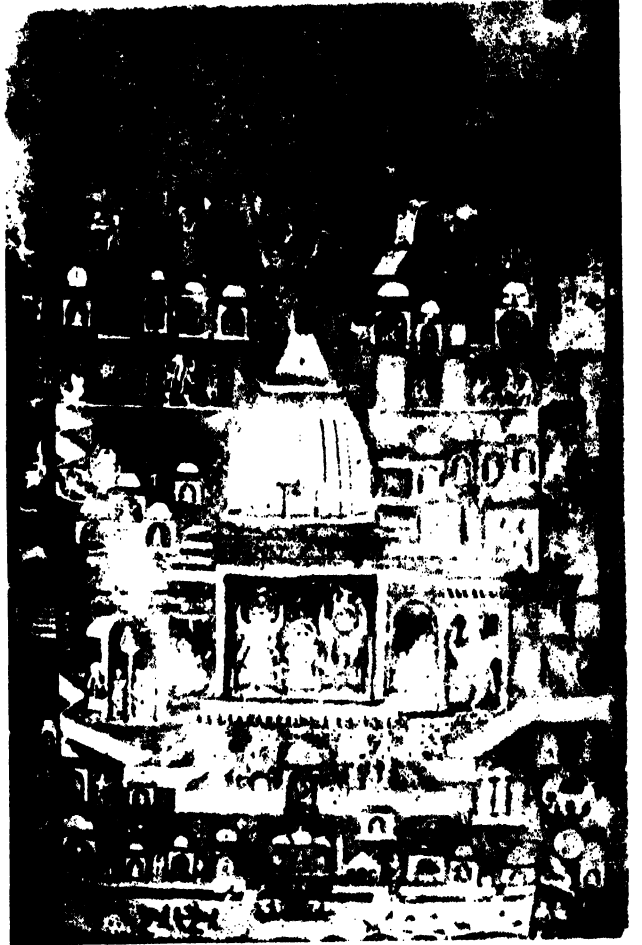
নেপাল চিত্রকলা (মুসলমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী)।

নেপালের সহিত বাঙ্গালা দেশ ও উড়িষ্যার রূপশিল্পগত যোগ এ চিত্রে সুস্পষ্ট হয়। বস্তুতঃ তারানাথের মতে ধীমান ও বিটপাল বাঙ্গলাদেশ হ'তে নেপালে শিল্পরীতি প্রবর্ত্তন করেন। যদিও রাজপুত শাসকগণ নেপালে মাঝে মাঝে পশ্চিম-ভারতীয় রীতির কিছু কিছু প্রবর্ত্তন করেন, তবুও নেপালের চিত্রকলা প্রাক্-ভারতীয় রীতির প্রতিফলক। মুসলমানেরা যখন পূর্ব্ব-ভারতের বিহার ও বিদ্যাপীঠগুলি ধ্বংস করতে থাকেন, তখন

পণ্ডিত ও শিল্পীদের অনেকেই নেপালে প্রস্থান করেন। বস্তুতঃ নেপালে চিত্রকলাপ্রসঙ্গে যে তান্ত্রিক দেবদেবীর রচনা সম্ভব হয়েছে, তা একান্তভাবে পূর্ব্বাঞ্চলের। পশ্চিম-ভারতের রচনায় এ শ্রেণীর দেবমূর্ত্তি আশা করা বৃথা, এমন কি সে রীতির পক্ষে এ শ্রেণীর ভাবগত ঐশ্বর্য্যকে উদ্ঘাটন করা অসম্ভব ছিল। রাজপুত-কলার প্রচ্ছন্ন বাস্তববাদ ও ঐহিকতা পশ্চিম-ভারতীয় রীতিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন করে' তোলে। প্রাক্-ভারতীয় রীতি চীন, জাপান ও তিব্বতকে অফুরন্ত রসসম্পদ দান করে' মন্ত্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মবিধানকে রূপের ভাষা দান করে। এ দান জগতের ইতিহাসে সামান্য নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাক্-ভারতীয় রীতি এ দেশের একটা বিশিষ্ট সম্পদ। অগণিত ভাস্কর্য্য ও দুরূহ চিত্র-শ্রীকে জন্মদান করে' এ রীতি অমর হয়ে গেছে। ইংরাজ আমলের ফরমায়েস এ রীতিকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। কবিবর ব্রাউনিংএর কবিতায় হেমেলিনের (Hammelin) বংশীবাদকের একটা বিবরণ আছে। বাদকের বাঁশীর আওয়াজের প্রভাবে পাড়ার সকল ছেলেদের নেচে উঠতে হয় এবং পিছনে যেতে হয়। এমনি করে দেশের শিশুদলকে মুগ্ধ করে বংশীবাদক ধীরে ধীরে নদীতে নামে। মন্ত্রমুগ্ধ শিশুরাও তার পিছনে গিয়ে জলমগ্ন হয়ে প্রাণ হারায়। ইংরাজ আমলেও প্রতীচ্য-শীলতার বাঁশীর আওয়াজ এমনি করে রাজপুত-শিল্পকে বিপথগামী করে চিরকালের জন্য অতল জলধিতলে নিমজ্জিত করেছে। গুহাবদ্ধ অজন্তা শৃঙ্খলিত হয়ে মমির ন্যায় পড়ে আছে—মোগল-কলা বাদসাহী আমলের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তমিত হয়েছে। ভারতের নব্য-নিরাকারবাদী মুসলমান-সম্প্রদায় জাতিভেদ-নিরাসক ইসলামীয় শীলতায় পুষ্ট হয়েও একটা নূতন caste বা জাত-রচনায় উৎসাহিত। ইদানীং অনেকেই আরব জাতির বংশধর বলে নিজের মর্য্যাদা বাড়াচ্ছেন—তুরস্ক ত' বহুকাল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় মোগলরীতির প্রেমিক কোথা?

বস্তুতঃ প্রাক্-ভারতীয় শীলতাই একটা বিশ্বভারতীয় রূপ-রচনার অধিকারী, কারণ এখনও চিত্রকলাক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ প্রেরণা এ অঞ্চলে সম্ভব। বিধাতার কৃপায় পাষাণ-প্রতিমা বর্জ্জিত হয়ে—এদেশে মৃন্ময় সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তাতে করে পূর্ব্ব-ভারতীয় রূপের ধারা এখনও জীবিত ও প্রাণবান্। বাঙ্গালার চালচিত্র ও পট, উড়িষ্যার মূর্ত্তি ও চিত্র-শিল্প এখনও চলছে। কাজেই এদেশ হ'তে অন্তঃসলিলা ফল্গুকে আবার উজান বয়ে প্রবাহিত করার কল্পনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ অবস্থায় রূপের খবর বা রসের দান পাওয়ার জন্য পূর্ব্ব-ভারতের শিল্পীরা যদি কখনও অজান্তা, কখনও বা মোগল, কখনও বা রাজপুত, পারস্য বা জাপানের দ্বারে ধরনা দেয়, তবে কবীরের সেই প্রাচীন বাক্য মনে হয়:—

> দৌড়ো কোশ হাজারো
> বৈঠে লছমী পাশ।

হাজার ক্রোশ দৌড়চ্ছ বটে, কিন্তু লক্ষ্মী পাশেই বসে আছেন।

ভারত-শিল্পের ধারা

…প্রকৃত উন্নতির যুগে সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতির ভিতর সকল রকম বিধি-ব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবে, ভারতের উন্নতির যুগে সকল রকমের শিল্পের আদর্শের অস্তিত্ব ছিল, তাহা অনুমান করা খুবই সঙ্গত বটে, কিন্তু কোনও শিল্পের ধারা উন্নত ভারতীয়গণ অন্যান্য জাতিকে না শিখাইয়া এবং অনুকরণ করিবার সুযোগ না দিয়া নিজস্ব বলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে।

অনবগুণ্ঠিতা

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বিষ্ণুরথের উঠিতে একটু বেলা হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের বড় হল-ঘরে তখন দাবা পড়িয়াছে। দুইজন খেলিতেছে, আর বাকী সকলে একটা না একটা পক্ষে চাল বলিতেছে। উঁকি দিয়া একবার দেখিয়াই বিষ্ণুরথের আর ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া ছিল, তাহাতেই উপবেশন করিল।

ওদিকের বারান্দায় কর্ম্মচারীরা দুইজন নিরীহ প্রজাকে লইয়া কি যেন একটা গুরুতর ব্যাপারের দর কষাকষি করিতেছিল। বিষ্ণুরথকে বাহিরে বসিতে দেখিয়া তাহারা হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহারা দেখিল বিষ্ণুরথের ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, তখন অগত্যা ইঙ্গিতে প্রজা দুইজনকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিষ্ণুরথ তাহাদের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ব্যাপারটা সে দেখিয়াও দেখিতে চাহিল না।

পূজার আর বেশী দেরী নাই। সকালের সোনালী রোদে তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোণের শিউলি গাছের নীচেটা অজস্র ঝরা ফুলের রাশিতে শাদা হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একতারার ঝঙ্কারে বিষ্ণুরথ চমকিয়া উঠিল।

—বাবু মশায়কে একটা গান শুনিয়ে দি।

একজন বাবাজি। রঙটা মাজা কালো। দীর্ঘ দেহ মাংসল না হইলেও হাড় বেশ মোটা। গায়ে শতগালিযুক্ত বিচিত্র বর্ণের বহির্ব্বাস পায়ের গোছ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। চুল-দাড়ি গেরো দিয়া বাঁধা। পায়ে নূপুর। বাম বগলে একতারা ও ডান হাতে ডুবকি।

বাবাজি কোন প্রকার সাদর সম্ভাষণের অপেক্ষা না করিয়া সম্মুখের গাছতলার ছায়ায় আরাম করিয়া বসিল। একখণ্ড ন্যাকড়া মাথায় পাগড়ীর মত করিয়া বাঁধা ছিল। সেটা খুলিয়া মুখ মুছিয়া গোঁফজোড়া চোমরাইয়া লইল। তারপর একতারাটা কানের কাছে আনিয়া দুটা ঝঙ্কার দিয়া সুর ঠিক করিল। ডান হাতের ডুবকিটা ডান হাঁটুতে ঠুকিয়া তাল দিল এবং প্রসারিত বাঁ পা মাটিতে ঠুকিয়া নূপুর বাজাইয়া গান ধরিল :

> হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
> তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি।
> ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ :
> এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ।
> ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই,
> তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই॥

বিষ্ণুরথ চেয়ারে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। এ বাউল গায় কি? মুক্তি কোথাও নাই? মানুষের মনের কমল ফোটে, ফোটে ফোটে—তাহার আর শেষ নাই? সে কমলের মধুর লোভে স্বয়ং প্রভুও বাঁধা পড়িয়াছেন?

বাবাজির কণ্ঠ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, কিন্তু আশ্চর্য্য মধুর। চোখ বুজিয়া বুজিয়া সে যেন সুরে সুরে কেবলই কমলের পর কমল ফুটাইয়া চলিতেছে, তাহারও যেন আর শেষ নাই।

এ অঞ্চলে প্রায় সকল বাবাজিকেই বিষ্ণুরথ জানে, অন্তত মুখ চেনে। কিন্তু ইহাকে যেন নূতন মনে হইল। যাহারা দাবা খেলার চাল বলিতেছিল, তাহারাও ইতিমধ্যে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহারা হৈ হৈ করিয়া আব্দার ধরিল, আর একখানা বাবাজি, আর একখানা।

ওদিকে কর্ম্মচারীদের ঘর হইতে একটা চাকর একটা সাজা কলিকা আনিয়া বাবাজির সম্মুখে নামাইয়া দিল। দেখিয়া বাবাজির মন প্রফুল্ল হইল। ঝুলি হইতে একটা ছোট কাঠের হুঁকা বাহির করিয়া আপন মনে মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

তার পরে আবার একতারায় ঝঙ্কার দিয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুন্দর কণ্ঠে গান ধরিল :—

> আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
> কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে!
> গভীর কালোর যমুনাতে চলছে লহরী
> —রসের লহরী—

ও তার   জলে ভাসে কাদের আজ রসের নাগরী !

—সাঁইয়ের নাগরী—

আমি   বাহিরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি

ঘর ছাড়িয়ে

শুধু   কেঁদে মরি ভাসাই কৃষ্ণ রসের নীরে।

আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে॥

গান শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুরথের মন সীমাহীন পথের জন্য উদাস হইয়া উঠিল। গৃহ-পরিজনের মমতা, শক্তি ও দম্ভের মোহ জীর্ণ পত্রের মত খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত মন ধীরে ধীরে ধীরে রসের তিমিরে ডুবিয়া গেল।

গান শুনিয়া ভাল সকলেরই লাগিয়াছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির আখড়া কোথায়?

কলিকাটা চাকরে বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বাবাজি একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, আখড়া আর পাততে পেলাম কই বাবু মশায়? ঠাকুর আমাকে পথে বসিয়েছেন।

বাবাজি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, ঘুরতে ঘুরতে, ভাসতে ভাসতে এসে কাল সন্ধ্যায় আপনাদের ওই দীঘির ধারে রসিকদাসের আখড়ায় এসে উঠেছি। এখন দেখি, প্রভু আবার কোন্ পথে টানেন!

বিষ্ণুরথের বন্ধুরা তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। বলিল, আর পথের টানাটানি শুনছি না বাবাজি। এসে যখন পড়েছ, তখন আর ছাড়ছি না।

বাবাজি এক গাল হাসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আপনাদের দয়া হলে কি না হয়!

—দয়া যথেষ্ট হবে। তুমি খোদ দয়াময়ের কাছে এসে হাজির হয়েছ। ইনি আমাদের বাবু। ঘর-ছাওয়ানো থেকে আরম্ভ করে যা যা দরকার সব ঠিক করে দিচ্ছেন। কোনো ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। সকালে সন্ধ্যায় বিনোদ রায়কে গান শুনিয়ে যাবে আর দুটি করে প্রসাদ পাবে। একা তো? না সঙ্গে···

—আছে বই কি বাবু মশায়। আমরা রসের বেসাতী করি। একা থাকার যো কি!

বাবাজি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বন্ধুরা বলিল, তা হোক্। তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। মোট কথা এখান থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। কি বল হে বিষ্টুবাবু?

বিষ্ণুরথকে কিছুই বলিতে হইবে না। গান শোনা পর্যন্ত তাহার মন বাবাজির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শুধু গান নয়, তাহার চোখে, হাসিতে, কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটি চমৎকার সারল্য আছে যে, মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। বিষ্ণুরথ তখনই কর্মচারীদের হুকুম দিল, আজকের মধ্যেই রসিকদাসের আখড়া সংস্কার করিয়া দিতে হইবে। সংস্কার করিবার বিশেষ কিছু নাই। হয়ত চালে একটু গোঁজাগুঁজি দিতে হইবে। বহুদিন অব্যবহার্য্য পড়িয়া থাকায় উঠানে আগাছা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। দরজা জানালা আশা করা যায় ঠিকই আছে। না থাকিলে বদলাইয়া দিলেই চলিবে। বিশেষ হাঙ্গামা নাই।

বাবাজি এই ব্যবস্থায় খুসী হইয়া গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। বিষ্ণুরথকে দেখিয়া তাহার ভাল লাগিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে দীঘির ধারে এই জায়গাটিও মনোরম। বাবাজি এতদিন পরে একটা মনের মত জায়গা পাইয়া বাঁচিয়া গেল। ভরসা হইল, জীবনের বাকী কয়টা দিন এই খানেই রাধাকৃষ্ণের নাম গান করিয়া, আর বিনোদ রায় জিউর প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দে কাটিয়া যাইবে।

দীঘির এধারে লোকালয়, ওধারে রসিকদাসের আখড়া। লোকালয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। এ অঞ্চলটা একেবারে ফাঁকা। চারিদিকে কেবল ধানের জমি। মাঝে মাঝে দুই একটা আম-বাগান, তালের বন অবশ্য আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব কম। ঝোপ জঙ্গলের বালাই একেবারেই নাই। কেবল রসিকদাস বাবাজির চেষ্টায় ও যত্নে এই স্থানটি ঝোঁপে-জঙ্গলে, বড় বড় গাছের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। ফাঁকা মাঠ পার হইয়া এই খানটায় আসিলে নয়ন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ভিতরে গিয়া বসিলে আর মনেই হয় না যে, ইহার বাহিরে লোকালয় আছে। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী এইটুকুর মধ্যেই সম্পূর্ণ। ছোট ছোট পাখীর কিচ্ কিচ্ শব্দে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে এই ছায়াচ্ছন্ন স্থানটি সর্বক্ষণের জন্য শব্দময়।

এই ছোট্ট জঙ্গলটুকু পার হইলে রাংচিতার বেড়া। তার পরে ছোট্ট এক টুক্‌রা উঠান সর্ব্বদা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বাঁ দিকে তুলসী-মঞ্চ, তার উপরেই চারিদিকে উঁচু দাওয়া-ওয়ালা একখানি এক-কুঠারী ঘর। পিছনে আরও একটু জায়গা পড়িয়া আছে। বাবাজির আখড়ার সদর খিড়কীর বালাই নাই। এখান হইতেই এক সরু পথ সামনের আলে গিয়া পড়িয়াছে। রসিকদাস বাবাজির মৃত্যুর পর সামনের পিছনের দুইটি রাস্তাই ঘাসে ঢাকিয়া গিয়াছিল। নূতন বাবাজির আগমনে আবার লোক-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তাও বাহির হইতেছে।

তখন ছয়টার কাছাকাছি। বেলা শেষ হইতে আর বড় বাকী নাই। নূতন বাবাজি দাওয়ার উপর একা বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে আর হাঁটুতে তাল দিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ওদিকে বড় নিমগাছের তলায় যে উঁচু করিয়া বেদী বাঁধানো হইয়াছে, তাহার উপর দুপুর বেলা হইতে গ্রামের একদল বকাটে ছোকরা পাশা পাড়িয়াছে। এখনও খেলা শেষ হয় নাই। তাহারা ক্রমাগত বিড়ি ফুঁকিতেছে আর এক একটা পাশার দানে এক এক পক্ষ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এমন সময় বেড়ার আগড় ঠেলিয়া বিষ্ণুরথ প্রবেশ করিল। একা বিষ্ণুরথ, সঙ্গে মোসাহেবের দল নাই।

ছেলের দলের চীৎকার বন্ধ হইল। বাবাজি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—এই যে বাবু মশায়, আসুন আসুন। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম, আমার নূতন আখড়ায় সবাই এলেন, কেবল বাবু মশায়ের পায়ের ধুলো পড়ল না। আসুন, আসুন। আসনটা কোথায় গেল, ও রাইমণি?

একটি একুশ বাইশ বৎসরের অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সেই রাইমণি। বিষ্ণুরথকে আসিতে দেখিয়া ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল। তাহার দিকে বিষ্ণুরথের দৃষ্টি পড়িতেই তাড়াতাড়ি আসন আনিতে ঘরের ভিতর গেল।

ছেলেরা তখন পাশার ছক্ গুটাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিল। বাবাজির পিছু পিছু বিষ্ণুরথ কুটিরের দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিল, এই হতভাগারা কি রোজই আসে নাকি?

বাবাজি প্রসন্ন হাস্যে বলিল, আসবে বই কি বাবু মশায়! আমার এ রাধাকৃষ্ণের আখড়া, পাঁচজনের আসা যাওয়া যে চাই!

হাঁ, চাই। ছেলেদের কতক কতক ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছিল। যে ক'জন ছিল তাদেরই ধমক দিয়া বিষ্ণুরথ জিজ্ঞাসা করিল, তোরা এখানে কি করতে আসিস রে হতভাগা? ফের যদি কোনো দিন···

বাবাজি তাড়াতাড়ি হাত যোড় করিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, থাক্ থাক্, বাবু মশায়, ওদের কিছু বলবেন না। আহা, কৃষ্ণরসের রসিক,—ওরাই তো আমার ঘর ভাঙে। আসুক, আসুক, সবাই আসবে। নইলে ঘর ভাঙবে না যে! পথ পাব কি করে?

বাবাজি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাইমণি দাওয়ায় আসন পাতিয়া দিতেছিল। বাবাজির কথায় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘরের ভিতর লুকাইল।

ঘর ভাঙিবারই ব্যাপার! এতগুলি কৃষ্ণরসের রসিক এক সঙ্গে জুটিলে লোহার ঘরও ভাঙিয়া যায়। বাবাজি বলিয়াই এতদিন টিকিয়া আছে, অন্য কেহ হইলে কোন্ দিন পথ দেখিত।

আসন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুরথ বলিল, মনটা ভাল নেই বাবাজি। তোমার গান শুনতে এলাম। একটু অসময় হয়ে গেল বোধ হয়।

বাবাজি একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, বিলক্ষণ! রাধাকৃষ্ণের নাম শোনাব, তার আবার সময় অসময় আছে নাকি? একতারাটা দাওতো রাইমণি, বাবু মশায়কে একখানা গান শুনিয়ে দিই।

রাইমণি নিঃশব্দে আসিয়া ডুবকি, একতারা বাবাজির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া গেল।

বাবাজি একতারাতে একটা ঝঙ্কার দিয়া কি মনে করিয়া বলিল, তুমিই একখানা গাও রাইমণি। বাবুমশায় এত কষ্ট করে এসেছেন। আমার গান তো রোজই শোনেন।

বাবাজি একতারাটা ভিতরে পাঠাইয়া ডুবকিতে চাটি দিল।

রাইমণি নীরবে একতারাটা লইয়া দরজায় ঠেস দিয়া একটু আড়ালে বসিল। বৈষ্ণবের মেয়ে, গান গাহিতে তাহার লজ্জা নাই। বলিতে গেলে ইহা শুধু তাহার পেশা নয়, ধর্ম্মের অঙ্গ। রাইমণি গাহিল :—

আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল, বল রে শ্রবণে—
সে এসেছে সে এসেছে পুরব গগনে।
তোরা বল গো ঘ্রাণে বল, বল রে শ্রবণে—
তোর বন্ধু এসেছে এসেছে সে পুরব গগনে।
কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি,
ওরে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।

রাইমণির গলা বাবাজির মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নয়, বাঁশীর মত মিষ্ট। তাহাকে দেখা যাইতেছিল না, তবু মুখখানি তো দেখা। কিন্তু গানের কথা ও সুর তাহাকে বর্ত্তমানের সকল কিছু হইতে ঠেলিয়া পিছাইয়া দূর অতীত কালের বিরহিণীর কাছে পৌঁছাইয়া দিল, যে বন্ধুকে প্রথমে না দেখিয়া কিছুতেই চোখ মেলিবে না।

গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু হাওয়ায় তখনও সুরের রেশ ফুরাইয়া যায় নাই। ফুলে ফুলে তখনও থাকিয়া থাকিয়া শিহরণ উঠিতেছিল।

বিষ্ণুরথ অনেকক্ষণ পরে শুধু বলিল, বেশ।

বাবাজি ডুবকি রাখিয়া খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। বিষ্ণুরথের কথায় চোখ মেলিয়া চাহিয়া হাসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া রাইমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। একতারাটা বাবাজির কাছে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে যে গামছা ও কলসী পড়িয়া ছিল, তাহা কক্ষে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাবাজি একতারা হাতে বহুক্ষণ নিঃঝুম হইয়া মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া রহিল। বিষ্ণুরথেরও কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে বাবাজি হাসিয়া বলিল, এর পর আর আমার গান জমবে না। কি বলেন বাবুমশায়?

বিষ্ণুরথ একটু ইতস্ততঃ করিল। দুইজনেই ভাল গায়। তার মধ্যে কে বেশী ভাল গায় বলা কঠিন। বিষ্ণুরথ কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, কেন? তুমিও তো ভালই গাও বাবাজি!

বাবাজি একতারা ডুবকি স্পর্শও করিল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, না। এর পর আর গান জমে না। আজকে এই থাক্ বাবুমশাই, আমার গান আর একদিন আপনাকে শোনাব।

বিষ্ণুরথেরও মনে হইতেছিল, এই থাক্। এমন গান একখানি শোনাই ভাল। সে আরও একটুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল।

রাংচিতার বেড়ার পরেই একটি সরুপথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া দীঘির উঁচু পাড় অতিক্রম করিয়া ঘাটে পড়িয়াছে।

এ ঘাটে আর কেহ নামে না। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বড় জোর দুই একটি রাখাল, কি দুই একটি গরু বাছুর নামিয়া জল পান করিয়া যায়। এটি বিশেষ করিয়া বাবাজির আখড়ার সদর এবং খিড়কির ঘাট। জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়াই বিষ্ণুরথ দেখিল, কক্ষে জলভরা কলসী লইয়া সিক্তবস্ত্রে রাইমণি হন হন করিয়া আসিতেছে।

কাছাকাছি আসিতেই বিষ্ণুরথ পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোন। এসব গান তুমি কোথায় সংগ্রহ করেছ?

রাইমণি তাহার প্রশ্নে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলো তাহার অনবগুণ্ঠিত সুন্দর মুখের উপর পড়িল। আস্তে আস্তে বলিল, কত জায়গায় কত গান পেয়েছি, তাকি আর মনে থাকে বাবু মশায়?

—হুঁ। আর এই বাবাজিটির সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল?

রাইমণি বাবাজির প্রসঙ্গে কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমন একদিন পথে পথেই আলাপ, আর কি! পথ ছাড়ুন, সন্ধ্যে বয়ে যায়।

- হাঁা।

বলিয়া বিষ্ণুরথ চলিয়া গেল। একবার মনে হইল, বলে, তোমার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার সময় পাইল না।

অতঃপর বিষ্ণুরথের আখড়া পরিদর্শন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম দুই একদিন অন্তর যাইত। এখন প্রত্যহ যায়। বন্ধুরা ইহা লইয়া হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুরথ সে সমস্ত গ্রাহ্য করে না। হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। কথাটা তাহার স্ত্রীর কানেও পৌঁছিয়াছে। সে মুখে কিছুই বলিতেছে না, ঈশানের মেঘের মত থম্ থম্ করিতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে বর্ষণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিষ্ণুরথ আর সেদিক মাড়াইতেছে না। বেচারা মনে মনে লজ্জা পায়। চেষ্টা করে আখড়ার দিকে আর যাইবে না। কিন্তু পারে না, বিকাল হইলেই কে যেন তাহার পা দুইটাকে টানিয়া লইয়া যায়। আরও মুস্কিল হইয়াছে, বাবাজির সদাহাস্যময় মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে: তাহা হইলে বিষ্ণুরথ কোনো রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিত।

সেদিন বিষ্ণুরথ যাইতেই রাইমণি আসন পাতিয়া দিয়া অদূরে বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিষ্ণুরথ এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজি কোথায়?

—চুলোয়।

বিষ্ণুরথ তাহার উত্তর দিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কাছের চুলোয়, না দূরের চুলোয়?

রাইমণি আয়ত চোখে বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, তার মানে দূরের চুলো হলে বুঝি ঘরে বসতেন?

বিষ্ণুরথ বিভ্রান্ত ভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

রাইমণি গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, না। কাছেই গেছে।

বিষ্ণুরথ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। রাইমণি উঠিয়া বলিল, বসুন সন্ধ্যেটা দিয়ে নিই।

রাইমণি দীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় গড় হইয়া প্রণাম করিল। তার পর সেই প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া বিষ্ণুরথের মুখের কাছে একবার ঘুরাইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল, দুপুর বেলায় গেছে, এখনও ফিরল না কেন, কে জানে!

—তাই ভাবনা হচ্ছে?

রাইমণি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তা হবে না? আপনি না হয় আরও একটু থাকবেন, সমস্ত রাত ত আর আমাকে পাহারা দিতে পারবেন না!

বিষ্ণুরথ চোখ টিপিয়া বলিল, একটা রাতই তো। না হয় দিলাম।

অন্য দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে রাইমণি বলিল, হুঁ। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি! দুপুর রাতে গিন্নী এসে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে। তখন?

কাজলীর কথায় বিষ্ণুরথ সত্য সত্যই ভয় পাইয়া গেল। সে যে রকম জেদী মেয়ে, সব পারে।

কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, রাইমণি, বাবাজিকে সত্যি সত্যিই পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছ? না…

—সত্যি সত্যিই পথ থেকে।

—পথেই আলাপ, পথেই মালাবদল?

—হুঁ।

বিষ্ণুরথ আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা রাইমণি, বাবাজি যদি আর না ফেরে? ওরা তো পথের পথিক, ঘরে ফেরার তাগিদ কিছু নেই।

এ সম্ভাবনা যেন নূতন কিছু নয় এমনি নিশ্চিন্তভাবে রাইমণি উত্তর দিল, তখন আপনি তো আছেন?

—আমার উপর ভরসা করতে পার?

—না পেরে উপায় কি?

ইহার উপর আর কথা নাই। বিষ্ণুরথ নিরুত্তরে রাইমণির সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এমন সময় বাবাজির গলা শোনা গেল:

রাইমণি, রাইমণি গো!

রাইমণি ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

বিষ্ণুরথকে দেখিয়া বাবাজি আশ্বস্তভাবে বলিল, এই যে, বাবু মশায় রয়েছেন! রাইমণি একলা আছে বলে আমি যে কি তাড়াতাড়ি আসছি! কৃষ্ণ হে! প্রাণগৌর! বেশ বেশ!

রাইমণি বাবাজীর পা ধোয়ার জল আনিয়া দাওয়ার উপর রাখিল। কলিকায় তামাক সাজাই ছিল। টিকায় আগুন

ধরাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বলিল, বাবু মশায় ভাবছিলেন তুমি যদি আর না ফেরো।

বাবাজি পা ধুইতে ধুইতে হো হো করিয়া আসিয়া উঠিল। বলিল, না ফেরাই বটে। পথে বেরুলে আর ইচ্ছা হয় না ঘরে ফিরি।

রাইমণি বলিল, তাতে আমিও ভয় পাই না। বাবু মশায় আমার ভার নিতে খুব পারবেন।

বাবাজি আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

—তা পারবেন। বাবু মশায় কৃষ্ণরসের রসিক আছেন। তোমার ভার নিতে খুব পারবেন। কৃষ্ণ হে! প্রাণ-গৌর!

কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুরথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ইহারা কি তাহাকে লইয়া পরিহাস করিতেছে? অথবা এই ব্যাপারটা ইহাদের কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে?

—রাইমণি, বাবু মশায়কে একটা গান শুনিয়ে দাও।

বিষ্ণুরথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, আজ থাক্ বাবাজি। রাত হয়েছে। এইবার উঠি।

বাবাজি ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি! কৃষ্ণনাম গান একটু শুনবেন না?

রাইমণি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, না না। আর একদিন শোনাব বরং। রাত হয় নি? উনি তো রোজই আসেন, গান শোনাব, ভাবনা কি?

বাবাজি অগত্যা বলিল, তা হলে বাবু মশায়কে আলোটা একটু দেখিয়ে এস বরং। অন্ধকার হয়েছে। এই জঙ্গলটাও বড় ভাল নয়।

রাইমণি আলো লইয়া আগে আগে চলিল। জঙ্গলটা সত্যই অন্ধকার। সাপ-খোপের ভয়ও আছে। নিঃশব্দে পার হইয়া খোলা মাঠে আসিয়া রাইমণি দাঁড়াইল।

হাসিয়া বলিল, এইবার যেতে পারবেন তো? না, আরও এগিয়ে দিতে হবে?

বিষ্ণুরথ কি যেন ভাবিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল বুঝা গেল না। রাইমণির দিকে একবারও না চাহিয়া, এতখানি পথ আলো দেখানোর জন্য একটাও ধন্যবাদের কথা না কহিয়া সোজা গ্রামের পথ ধরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। রাইমণি আরও কিছুক্ষণ আলো হাতে করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আখড়ার দিকে চলিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিষ্ণুরথ সংবাদ পাইল, বাবাজি রাইমণিকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। যাওয়ার সময় কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয় লোক উঠিবার পূর্ব্বেই রাত থাকিতে চলিয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুরথ আখড়ায় গিয়াছিল, আখড়া খাঁ খাঁ করিতেছে। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য কিছু ছিল না। দুটি লোকের পক্ষে নিতান্ত যা না হইলে নয় তাহাই মাত্র ছিল। সে কয়টা জিনিস বাবাজির ঝোলাতেই দিব্য আঁটিয়া যায়। পড়িয়া আছে মাত্র, যে মাটির কলসী লইয়া রাইমণি জল আনিতে যাইত সেইটি। এখনও জল ভরাই আছে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র গিয়াছে, ইহারই মধ্যে উঠানটির দিকে যেন চাওয়া যায় না। কেমন শ্রীহীন দেখাইতেছে।

বিষ্ণুরথ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থান খুঁজিল। কোথায় যে তাহারা গেল, রাইমণি তাহার একটা চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই,—একখানা চিঠি, কিম্বা একটা ইঙ্গিত, কিছুই না। বিষ্ণুরথের ধারণা জন্মিল, বাবাজির দুপুরে বাহির হইয়া যাওয়াটা আর কিছুই নয়, সে কেবল আর একটি মনের মত আখড়ার অন্বেষণে গিয়াছিল।

এখন কথা এই, রাইমণি এ সংবাদ পূর্ব্বেই জানিত, কি জানিত না? তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, অথবা স্বেচ্ছায় গিয়াছে? এতদিন যে মেলামেশা করিল তাহার সঙ্গে, তাহা কি শুধুই খেলা, না তাহার মধ্যে সত্য বস্তু কিছু ছিল? কিন্তু রাইমণি নাই, এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবারও যে উপায় নাই।

এল জিজিরের ইসলাম তীর্থ

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

ভারতের বন্দর ছেড়ে পশ্চিমাভিমুখে পাড়ি দেবার সময় জাহাজ প্রথম বিশ্রাম নেয় এডেন বন্দরে। এ বন্দর আজ ইংরাজের দখলে, কিন্তু স্থানটা আরব দেশের উপকূলে। আরবেরা তাদের দেশকে বলে 'এল জিজিরে' অর্থাৎ 'দ্বীপ'। যদিও ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে আরব দেশটাকে ঠিক দ্বীপ বলা চলে না বটে, তবে এর তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে দুস্তর এক মরুভূমি থাকায় দেশটা দ্বীপেরই সামিল হয়েছে। এই বিশাল মরুভূমির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপর পারের সঙ্গে এদের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে। জলপথে সমুদ্র পার হয়ে আরবে পৌছানো সহজ, কিন্তু স্থল-পথে এই মরু উত্তীর্ণ হয়ে আরবে প্রবেশ করা শুধু দুরূহ নয়, এ পথ একান্ত দুর্গম। মরুযাত্রী ক্ষণকালের জন্য পথে কোথাও বিশ্রাম নিতে পারে এমন কোনো আশ্রয় নেই সেখানে। মধ্যপথে যদি তাদের খাদ্য বা পানীয় কিছু নিঃশেষ হয়ে যায় তা হলেই সর্বনাশ। ফিরে যাওয়া বা অগ্রসর হওয়া এই উভয় দিকেই মৃত্যুর করাল ছায়া তার আঁধার রূপ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় নিরুপায় পথিককে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হয়ে অন্তহীন মরু-প্রান্তরের অকরুণ উত্তপ্ত বালুরাশির বক্ষে অতি শোচনীয় শেষ-শয্যা গ্রহণ করতে হয়।

জেমজেমের জল: এই পবিত্র কূপের জল বিক্রয় হয়। কথিত আছে 'ইশমাইলে'র জন্য 'হাজার' এই কূপ থেকেই জল তুলে দিয়েছিলেন। এর জল ঈষৎ উষ্ণ। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে, এই কূপের জলে সকল রোগ আরোগ্য হয় এবং সকল পাপ ধুয়ে যায়।

দক্ষিণের দুরন্ত মরুভূমিকে আরবেরা বলে 'রুবা এলখালি' অর্থাৎ 'রিক্তার আবাস!' এই মরুভূমির বিশাল ব্যবধান সাগরোপকূল হ'তে দেশের অন্তঃস্থকে এত দূরে ঠেলে রেখেছে যে, সমুদ্রতীর হতে আজ পর্য্যন্ত কোনো মানুষ এ পথে আরবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। সারা দেশ কখনো সুশীতল মেঘধারার স্পর্শ পর্য্যন্ত পায় না। তরুলতা, তৃণগুল্মের স্নিগ্ধ শ্যামলতা হতে সে দেশ একান্তভাবে বঞ্চিত। বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানকার সমস্ত পয়ঃপ্রণালী নিষ্ঠুর শুষ্কতা নিয়ে তৃষ্ণার্ত্তদের উপহাস করে। কাজেই লোকের বসবাস এদেশে অতি অল্প। আয়তনে আরবদেশ পনর

লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত, কিন্তু জনপদ আছে এখানে মাত্র পাঁচটী। মক্কা ও মদিনা এই উভয় জনপদই ইসলাম ধর্ম্মের মহাপুণ্য তীর্থ। শাক্কা ইয়েমেনের প্রধান নগর। আর আছে 'হেইল' ও 'রিয়াদ'। উত্তর ও দক্ষিণ নেজদের যুগল অধিপতি ইবন্ রশিদ ও ইবন্ সাউদের রাজধানী। আরবের এই পঞ্চনগর ভূপর্যাটকদের চিরদিন প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের এ পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ। আরবেরা তাদের দেশে কাফেরকে ঢুকতে দেয় না।

তীর্থশ্রেষ্ঠ মক্কা ইসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃকেন্দ্র; প্রত্যেক মুসলমানের ঐহিক ও পারলৌকিক প্রগতির পরম পুণ্যালোক। নমাজ বা উপাসনার সময় জগতের কোটি কোটি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের শ্রদ্ধাবনত শির এই পবিত্র ভূমির উদ্দেশে তাদের সভক্তি প্রণতিখানি নিবেদন করে দেয়। মৃত মুসলমানের শবদেহ কবরে সমাহিত করবার সময় এই পুণ্যতীর্থের দিকেই তার সহজ গতির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ধ্রুবতারা যেমন অকূল সমুদ্রে নাবিকদের লক্ষ্য স্থির রেখে দিঙনির্ণয়ে

মক্কার মসজিদ : এই বিরাট ব্যোমাচ্ছাদিত মসজিদের মধ্যস্থলে রেশমি চিকণ কালো পর্দ্দাঢাকা পবিত্র কা-আবা। কা-আবার এই কৃষ্ণ-যবনিকা বা কিশবে প্রতি বৎসর বদলে নূতন দেওয়া হয়। কা-আবার চারিদিকে কোরাণের ধর্ম্মোপদেশ স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কা-আবার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পবিত্র কৃষ্ণশিলা প্রতিষ্ঠিত। জেমজেমের পুণ্য কূপও এই কা-আবার সঙ্গে সংলগ্ন।

শুধু যে পথের বাধাই একমাত্র বাধা তা নয়, বরং ধর্ম্মের বাধা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা প্রভৃতির তুলনায় তা' যৎসামান্য। এ ছাড়া বেদুইনদের লুঠতরাজ, রাহাজানি ও খুন মরুযাত্রীদের সব চেয়ে বড় বাধা। মক্কা ও মদিনায় বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ, তথাপি সেখানকার কড়া পাহারা এড়িয়ে অনেক য়ুরোপীয় ছদ্মবেশে সে-দেশ বেড়িয়ে তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করে এসেছেন। ধরা পড়লে তাঁদের প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা কঠিন হ'ত। কারণ পয়গম্বরের আদেশ যে, অবিশ্বাসীরা যেন সেখানে পদার্পণ না করে। জীবনে একবার অন্ততঃ এ তীর্থ দর্শন করে আসা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মের অঙ্গ ও পবিত্র কর্ত্তব্য।

সাহায্য করে, পুণ্যভূমি মক্কাও তেমনি ধ্রুবতারার মত প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসী ভক্ত মুসলমানকে সুপথ দেখিয়ে সর্ব্বশক্তিমান আল্লার চরণে উপনীত করে।

মক্কায় তীর্থ-যাত্রা করাকে বলে 'হজ' করা। সকল তীর্থস্থানের মত এখানেও পাণ্ডাদের প্রাদুর্ভাব আছে। এখানকার পাণ্ডাদের বলে 'মুতোওয়িফ্'। মুতোওয়িফ্‌রা যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেন ও পথ-প্রদর্শকের কাজ করেন, বিনিময়ে যাত্রীদের নিকট প্রচুর দক্ষিণাও আদায় করেন। পৃথিবীর সকল দেশ হতেই নানা ভাষা-ভাষী মুসলমান তীর্থ-যাত্রীরা এখানে সমবেত হন, সেই লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভিড়ের

মধ্যে মিশে গিয়েই ছদ্মবেশী তীর্থযাত্রীরা এই পুণ্যস্থানে প্রবেশ করবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু, মুতোওয়াফদের চক্ষে ধূলা দিতে না পারলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী, কারণ তাদের কাছে হজযাত্রীদের সাত-পুরুষের নাম-ধাম লেখা থাকে, তবে ভূগোল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান খুব বেশী না থাকায় তাদের ঠকানো তত কঠিন নয়। এমন একটা কাল্পনিক দেশের নাম করা যেতে পারে, যে দেশের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই। সব চেয়ে সুবিধা, কোনো একজন আধপাগলা ফকীর দরবেশ বা ধর্ম্মোন্মাদ সেজে যাওয়া, কারণ তা হলে আর পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের প্রত্যেক খুঁটিনাটি, বিধিব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলবার মধ্যে কোনো ত্রুটী-বিচ্যুতি কারুর চক্ষে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না। পাগলার সাতখুন মাপ!

আরাফাত পর্ব্বত: হজযাত্রীরা আরাফাত পর্ব্বতে এসে 'বুকুফ' পালন করছেন। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী [illegible]-তোপদেশ শ্রবণ ও ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

পবিত্র মক্কাধাম গিরিবেষ্টিত একটি পার্ব্বত্য পুরীর মত। বাতাস পর্য্যন্ত সে পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সারাদিনের প্রখর সূর্য্যতাপ সেই পাথরের বুকে এমন অক্ষয় হয়ে সঞ্চিত থাকে যে, সারারাত্রি তার উত্তপ্ত অস্তিত্ব অনুভব করতে পারা যায়। পূর্ব্বে তীর্থ-যাত্রীদের সকলকেই পদব্রজে যেতে হ'ত, আজকাল হেজাজ রেলপথ হওয়ায় যাত্রীদের খুব সুবিধা হয়েছে। ট্রেণ একেবারে মদিনার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাত্রীদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু, যে সব পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রী প্রাচীনপন্থী লোক, তাঁরা আজও পদব্রজে যান, রেলে ওঠেন না।

মদিনায় হজরত মহম্মদের সমাধি-মন্দির আছে। হজ-যাত্রীদের মধ্যে শতকরা তিরিশজন প্রায় পয়গম্বরের কবরে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যায়। হজের সঙ্গে হজরতের সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ করবার কোন শাস্ত্রীয় বিধি নেই ব'লে অধিকাংশ যাত্রীই মাত্র মক্কার মসজিদ প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে যায়, মদিনায় আর নামে না।

হজযাত্রীদের ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে বেডুইনের দল। বেডুইনদের জীবিকানির্ব্বাহের কোন স্থিরতা নেই। শহরের বুকের উপর গিয়ে পড়ে' তারা বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে না। নগরের উপকণ্ঠেই শিকার-সন্ধানের অপেক্ষা করে তারা। লুঠ-তরাজই তাদের একমাত্র উপাজীবিকা। কায়িক পরিশ্রম করাকে তারা অত্যন্ত ছোট কাজ ভেবে ঘৃণার চক্ষেই দেখে। আরবরা পর্য্যন্ত বলে ওরা বর্ব্বর। মক্কা থেকে মদিনা পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতেও আজকাল চোরের উপদ্রব সুরু হয়েছে। বেডুইনদের ঠিক খাঁটি মুসলমান বলা চলে না, কারণ তারা

নিয়মিত নমাজ পড়ে না। তবে বিদেশী ও বিধর্ম্মীরা এসে যে পূত মক্কায় তাদের অপবিত্র স্পর্শ রেখে যাবে, এটাও তারা সহ্য করতে পারে না।

আল্লার দরবার : লক্ষ লক্ষ হজযাত্রী মক্কার মসজিদে সমবেত হয়ে নমাজ করেছেন। এই হজের নমাজ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এত ভক্তজনের সমাবেশ জগতের অন্য কোন তীর্থে হয় না।

যাঁরা তরুতৃণ, লতাগুল্ম প্রভৃতি সবুজের শ্যামসমারোহে চিরদিন অভ্যস্ত, তাঁরা ঠিক আরবের অবস্থা বোধ হয় ধারণা করতে পারবেন না। মরুভূমির দেশ বলে আরব দেশের রহস্যজড়িত মূর্ত্তি আমাদের অনেকেরই কল্পনার দৃষ্টিতে জেগে উঠতে পারে। মনে হ'তে পারে সেখানে প্রকৃতির রূপ নেই, বৈচিত্র্য নেই, সৌন্দর্য্য নেই, শোভা নেই—কেবল একঘেয়ে বালুকারাশি অনন্ত বিস্তৃত পড়ে আছে। প্রকৃতির এই রুক্ষ মূর্ত্তির মধ্যে কোন সুষমা নেই—কোন স্নিগ্ধ শ্রী নেই, সবই হয়ত নীরস কঠিন ও কঠোর বলে মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আরবের মরুভূমি যারা পার হয়ে ফিরে এসেছে, তারা বলে মরুবক্ষে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। উষাকালে, অরুণোদয়ে, দীপ্ত মধ্যাহ্নে, শান্ত অপরাহ্নে বা স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, চন্দ্রালোকিত রাত্রে বা জ্যোৎস্না-বিধৌত নিশীথে মরু-প্রকৃতি নিত্য নব নব রূপে ক্ষণে ক্ষণে নবীনা হয়ে দেখা দেয়। মরীচিকার মাধুরী শুধু অভিনব নয়—অতি অপরূপ!

হজযাত্রার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে শীতের প্রারম্ভে বা শীতের শেষে। কারণ অন্য সময় এ মরুদেশের উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে। এই তীর্থদর্শনের শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে, মোসলেম বর্ষ-পঞ্জীর শেষ মাসের শেষ দশ-দিনের মধ্যে যাত্রীদের পরিক্রমা শেষ করতে হবে। মোসলেম বর্ষ-পঞ্জী চন্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হয় বলে' বর্ষচক্র ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ঋতুতেই একমাস করে পিছিয়ে পিছিয়ে বর্ষশেষ বিবর্ত্তিত হ'য়ে আসে। সুতরাং শীতের প্রারম্ভে বা শীতের শেষে হজযাত্রার সুযোগ জীবনে একাধিকবার ঘটতে পারে। দুর্গম দীর্ঘ পথের দুঃখ ও বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে তীর্থযাত্রীরা যখন মক্কা বা মদিনার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়, তখন সমস্ত দেহ মন তার আনন্দে বেপথু হ'য়ে ওঠে। বহু দিনের সাধ, বহু দিনের স্বপ্ন, জীবনের ঐকান্তিক কামনা তার চরম সার্থকতার সম্মুখীন হয়ে তাকে অসহ্য পুলকে নির্ব্বাক করে দেয়। একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব-ঘন রসে তার সমস্ত অন্তর কাণায় কাণায় ভরে ওঠে। সকল চঞ্চলতা ও চাপল্য স্থির হ'য়ে গিয়ে তার চিত্ত শান্ত সমাহিত ও ভক্তিপ্লুত হয়ে পড়ে। তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করে' এই সত্যটুকুই সেদিন বড় হয়ে ওঠে যে, চির-আকাঙ্ক্ষিত সেই মহাতীর্থের পাদমূলে সে আজ এসে পৌঁছতে পেরেছে, যে

আরব-সুন্দরী : হেজাজজননী কন্যাদ্বয় সহ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা।

তীর্থের দিকে সারাজীবন ধরে দিনের পর দিন ব্যাকুল ভাবে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে চেয়ে সে ভগবানের নাম করেছে। প্রত্যহ

অন্ততঃ পাঁচবার করে যে পুণ্যলোকের উদ্দেশে তার মাথা নত হয়েছে, আজ সশরীরে সেখানে উপস্থিত হয়েছে সে

বারি-বালা : কূপ থেকে পানীয় জল নিয়ে ঘরে ফিরছে।

মদিনা দূর হ'তেই যাত্রীদের দৃষ্টিপথে পড়ে। তারা মহা উল্লসিত হয়ে আল্লার জয়ধ্বনি ক'রতে ক'রতে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হয়। কিন্তু তীর্থশ্রেষ্ঠ মক্কা উপত্যকার অন্তরালে যাত্রীদের দৃষ্টিপথের অগোচরে সংগোপনে থাকে। পথশ্রান্ত প্রতীক্ষাব্যাকুল উৎসুক যাত্রীদের সাগ্রহ দৃষ্টির সম্মুখে অবশেষে পবিত্র মক্কা-ধাম যখন সহসা আত্মপ্রকাশ করে – পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রথম ইসলাম ধর্ম্মের উপাসনা মন্দির অর্থাৎ মক্কার মহান্ মস্জিদের চূড়া তাদের চোখে পড়ে, সকলে তারস্বরে চীৎকার করে, "জয় আল্লার জয়।" ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানেরা অকপটে বিশ্বাস করেন, এই অলোকসামান্য পুণ্য-ভূমি আল্লার রক্ষিত ধর্ম্মক্ষেত্র। জীবনে একবার এখানে পদার্পণ করবার পরম সৌভাগ্য যার ঘটে, তার মানব-জন্ম ধন্য ও সার্থক হয়ে যায় সকল পাপতাপ হ'তে সে উদ্ধার পায়।

পুণ্যধাম মক্কার পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে প্রত্যেক যাত্রীকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে শ্বেতশুভ্র নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ক'রতে হয়। মস্তকের উষ্ণীষ বা টুপি নামিয়ে নগ্নশিরে ও পায়ের পাদুকা খুলে নগ্নপদে সেখানে প্রবেশ ক'রতে হয়। নবাব, বাদশাহ, আমীর ও সুলতান যিনিই কেন হোন না, এখানে আসতে হ'লে তাঁকে সকল পদমর্য্যাদা ভুলে ভিখারী ফকিরের সঙ্গে একত্রে এক বেশে এক সমান হয়ে আসতে হবে। ভগবানের দ্বারে ছোট বড় কেউ নেই। ইসলাম ধর্ম্মের এই সুন্দর সাম্যবাদ সকল ধর্ম্মের অনুসরণীয়

গুণ্ঠিতা : পথে বেরুতে হলে আরব-রমণীরা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করে পথ চলেন।

আদর্শ। মক্কাযাত্রীর প্রধান কাজ হ'চ্ছে তায়ুফ্ বা 'কা-আবা' প্রদক্ষিণ। 'কা-আবা' হ'ল বেইত্-উল্লাহ বা উল্লাহ থেকে জানা যায়, আদম নাকি এটি নির্ম্মাণ করেছিলেন, তাঁর ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান স্বর্গ-সৌধের অনুকরণে। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্ত্যলোকে তাঁর পতন হবার পূর্ব্বে নাকি বেহেস্তের এমনি একটি হর্ম্ম্যে তিনি বসবাস করতেন। তারপর পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটে। প্রলয়ের পরে আব্রাহাম ও ইসমাইল এ মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে মক্কাবাসীরা পৌত্তলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করে যখন ভ্রান্তপথে এগিয়ে চলেছিল, সেই সময় তাদের রক্ষা করতে ও শাশ্বত সত্যপথে পরিচালিত ক'রতে পীর-পয়গম্বর হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হয়। হজরত তাদের কাছে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের পুণ্য বাণী প্রচার করে তাদের সত্যধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের যে উপাসনা-মন্দির, তারা পৌত্তলিকতার সংস্পর্শে অপবিত্র ক'রে তুলেছিল, তিনি তাকে পুনরায় নির্ম্মল ও পবিত্র ক'রে দিয়েছিলেন। সেই থেকে মক্কা হয়ে উঠেছে ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। পৃথিবীর যেখানে যখন কোন মুসলমান নমাজ করেন, তাঁর লক্ষ্য চলে পশ্চিমের দিগন্ত ভেদ ক'রে মক্কাধামের উদ্দেশ্যে, তাঁর

রাজ-প্রহরীদয়ঃ হজযাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরবের কর্তৃপক্ষ সামরিক ও পুলিশ পাহারার সুবন্দোবস্ত করেন।

মরু-সৈনিক: এরা বেদুঈন সর্দ্দার, আরবেশ্বরের অধীনে মরুবাহিনী পরিচালনা করে।

নিকেতনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই পুণ্যগেহ—যা ইসলাম জগতের পবিত্রতম পীঠ। প্রাক্-ইসলামিক যুগেও 'কা-আবা' পূত ক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ ছিল। আরবদের পুরাকাহিনী ধ্যানদৃষ্টি কত অরণ্য, পর্ব্বত, মরুভূমি, সাগর, নগর সমস্ত লঙ্ঘন করে চলে যায় সেই সুদূর হেজাজের একপ্রান্তে পুণ্যজ্যোতি 'কা-আবা'-র পবিত্র মন্দিরে, যেখানে ধর্ম্মের সদাজাগ্রত ঘণ্টা

মদিনার রাজপথ : মদিনার মুসলমান স্থাপত্যকলার বিশেষত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভক্ত মুসলমান এসে পৌঁছয়, সে কেমন যেন এক গভীর ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। 'কিশ্‌বের' খস্ খস্ ধ্বনিটুকু তার কাণে এসে লাগে যেন দেবদূতগণের পক্ষবিধূননের মত। তারা আনন্দাশ্রু'বগলিত নেত্রে মন্দির-দ্বারের যবনিকা বুকে চেপে ধরে, 'কা-আবা'-র পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানায়, বারম্বার সেই পুণ্য শিলায় শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করে, 'কা-আবা'-র চারিদিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ ক'রে ঘোরে। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে ভগবানের শ্রেষ্ঠ বন্দনা, মুতোওয়িফ্‌রা তাদের হাত ধ'রে প্রদক্ষিণ করায়। প্রত্যেকবার পবিত্র-মধ্যে পবিত্র কৃষ্ণশিলায় তাদের সভক্তি চুম্বন এঁকে রাখে। এই সপ্তপদী পরিক্রমা প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্রথম সাতদিন প্রত্যহ ক'রতে হয়। তারপর যাত্রীরা পবিত্র কূপ জেম্‌জেমের তীর্থবারি পান করেন। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ পারাবতগুলিকে শস্য বা তণ্ডুলকণা খেতে দেন। তারপর তাঁদের 'এল শাঙ্গি' অনুষ্ঠান পালন ক'রতে হয়। 'এল শাঙ্গি' হচ্ছে—সাফা ও মারওয়া নামে দুই পবিত্র পর্ব্বতের মধ্যে সাতবার ছুটে ছুটে আসা-যাওয়া ক'রতে হয়—পুণ্য কোরাণবাণী উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে। এই পুণ্য
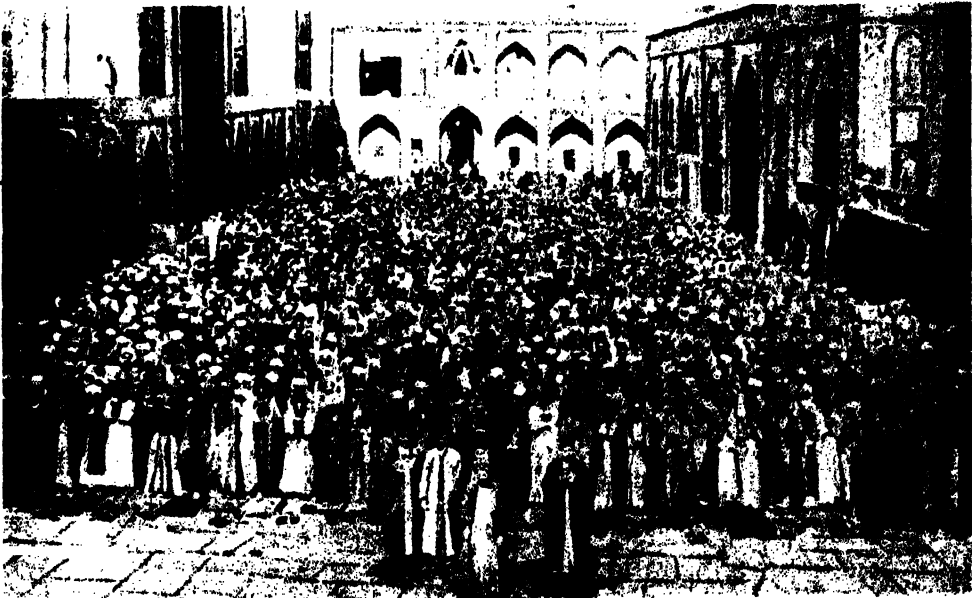
'কা-আবা' দর্শন : ভক্ত তীর্থযাত্রীর দল করযোড়ে 'কা-আবা' দর্শন ও অভিবাদন করছেন।

ঈশ্বরের দরবারে এসে হাজিরা দেবার জন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসীদের নিয়ত আহ্বান করছে। এ হেন তীর্থে যেদিন সত্যই কোন অনুষ্ঠানের ফলে তীর্থযাত্রীর জীবনের সমস্ত পাপ খণ্ডন হ'য়ে যায়।

এখানে হাজার হাজার হজযাত্রী যখন একত্রে নমাজ করেন, তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব সকলের চোখে পড়ে। প্রত্যেক মসজিদে ও উপাসনা-স্থানে ভক্তেরা দলে দলে সরল রেখায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পশ্চিমমুখী হয়ে 'কিব্‌লা'র দিকে ফিরে দাঁড়ান। কারণ কিব্‌লার অবস্থানবিন্দু সঠিকরূপে তাঁদের 'কা-আবা'-র দিক নির্দ্দেশ করে দেয়। অর্থাৎ নমাজের নিয়মই হচ্ছে 'কা-আবা'-র দিকে লক্ষ্য রেখে ভগবানের উপাসনা করা। কিন্তু হজযাত্রীরা যখন সেই খোদ 'কা-আবা'-তেই উপস্থিত, তখন তাঁদের আর 'কিব্‌লা'-রও প্রয়োজন নেই এবং পশ্চিম মুখে ফিরে দাঁড়াবারও আবশ্যক করে না। সুতরাং তাঁরা 'কা-আবা'-র চারিদিকেই গোল হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নমাজ করেন। নমাজের এ অভিনব দৃশ্য জগতের অন্য কোথাও আর দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

সপ্তাহকাল 'কা-আবা' প্রদক্ষিণের পর অষ্টম, নবম ও দশম দিনে যাত্রীদের 'আরাফাত' সন্দর্শনে যেতে হয়। আরাফাত যেতে না পারলে হজযাত্রাই বৃথা, কারণ 'কা-আবা'-র পর আরাফাত যাওয়াটা এই তীর্থযাত্রার একটা প্রধান অঙ্গ। কেবল মাত্র 'কা-আবা' ঘুরে এলেই হজযাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁরা আরাফাত দেখে ফিরতে পারেন, তাঁরাই কেবল 'হাজী' এই গৌরবময় উপাধিতে ভূষিত হবার অধিকারী হন। এই আরাফাত যাত্রা একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য। কারণ কেবলমাত্র হজযাত্রীরাই নন, সারা মক্কা সহরের ছোট বড় সমস্ত সক্ষম অধিবাসীরাও সেদিন হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভ্রবেশে সজ্জিত হয়ে নগ্ন শিরে ও নগ্ন পদে আরাফাত পর্ব্বতাভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হন। কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়েও যান। নবম দিনে আরাফাত পর্ব্বতের উপর দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উপাসনা চলে। একে বলে 'বাকুফ্‌' অনুষ্ঠান। দশম দিনে তাঁরা পৌত্তলিকতা ধ্বংসের পুনরভিনয় করেন। প্রাক্‌-ইসলামিক যুগে যে যে মূর্ত্তি যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সেই স্থান চিহ্নিত করে এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে রাখা হয়েছে। হজরত পয়গম্বর স্বহস্তে সেই সব মূর্ত্তি ধ্বংস করেছিলেন, তাই আজও প্রতি বর্ষশেষে সেখানে সেই ধ্বংসলীলার পুনরাভিনয় হয়। অর্থাৎ সমগ্র যাত্রী প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রে সেই স্তম্ভগুলিকে আঘাত করেন। এ থেকে একটা ব্যাপার বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, পৌত্তলিককে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীরা কতটা ঘৃণা করেন।

ধ্বংসোৎসবের পর, শ্মশ্রু গুম্ফ ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলে হজ-যাত্রীরা 'কা-আবা' হয়ে যে যাঁর ঘরে ফিরে যান। যাবার পথে কেউ কেউ মদিনায় নেমে হজরতের সমাধি দেখে যান। সেখানেই আবুবেকর ও ওস্মান—এই দুই হজরতের ও খালিফের কবর আছে। কিছু দূরে পয়গম্বরের কন্যা ফতিমারও সমাধি দেখতে পাওয়া যায়।

আরব দেশ হজরত মহম্মদের যুগে যে অবস্থায় ছিল, আজও অনেকটা সেই অবস্থাতেই রয়েছে। বারোশো বছর আগে সে দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা, সমাজবিধি যেমনটি ছিল, আজ তা থেকে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি।

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসবে বিশ্বময়ী ও আত্মময়ী এক হইয়াছেন। মা আমার দশভুজা, দশদিক্‌-প্রসারিণী, ব্রহ্মাণ্ডে ভাণ্ডোদরী। আবার মা আমার দেহঘট-মধ্যস্থা কন্যা উমা—দক্ষিণা কালী। মায়ের দালান-জোড়া ঘর-আলো-করা প্রতিমার দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি! নারিকেলের মধ্যে যেমন জল থাকে, কি জানি কোথা হইতে সে জল আসে, কেমন করিয়া আসে কেহ জানে না, তেমনই দেহের মধ্যে রসময় আত্মা, রসময়ী ভাবময়ী আত্মশক্তি টল টলরূপে বিরাজ করিতেছে। এই দুইজনকে দুই আত্মাকে এক করিবার উপাসনাই দুর্গোৎসব।

বাঙ্গালার আগমনী-সঙ্গীত

—স্বামী প্রেমঘনানন্দ

ভারত-সভ্যতায় বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য তার ধর্ম্মে, সমাজে, শিল্পে, সঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে। সুজলা সুফলা বাঙ্গালা মায়ের দান ভারত কখনো অস্বীকার করতে পারবে না।

মানুষের দুটি জিনিষ,—হৃদয় ও মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক করে বিচার, হৃদয় করে অনুভব। মস্তিষ্ক করে—বস্তুর ভালমন্দ, লাভক্ষতি, উচিত-অনুচিত বিচার; আর হৃদয় করে তার রসাস্বাদন। মস্তিষ্কের বিকাশে মানুষ হয়,—জ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক। হৃদয়ের বিকাশে মানুষ—ভাবুক, কবি, শিল্পী, গায়ক, ভক্ত, দাতা, সেবক হয়। এ দুটি বৃত্তির সমান বিকাশ সাধারণতঃ মানুষের হয় না। যাঁদের মধ্যে হয়, তাঁরা জগতে বিশেষ উন্নতি করেন।

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যেমন মস্তিষ্কের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়,—তেমনি পাওয়া যায়, হৃদয়ের পূর্ণ পরিণতি। যেখানে মস্তিষ্কের অসাধারণ বিকাশ, মানুষ সেখানে তাই দেখে অবাক হয়, প্রশংসা করে। কিন্তু তার অন্তরের ঐকান্তিক পূজা, শ্রদ্ধা, পায় হৃদয়বান। বাবা,—গুরু, পূজ্য, দেবতা; মা কিন্তু শুধু গুরুই নন, তিনি অন্তর-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাবা ও মায়ে কি তফাৎ তা বলার চেয়ে অনুভব করা সোজা।

মস্তিষ্কের রাজ্যে বাঙ্গালী বিশেষ উন্নতি করলেও, লোকে বলে—"ভাবুক বাঙ্গালী জাতি"। প্রাকৃতিক লালাময়ী বাঙ্গালা মায়ের নিকট থেকেই হয়ত এ ভাবুকতা বাঙ্গালা পেয়ে থাকবে।

ভারত-জননীর মন্দির ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পূজারীর দল, সেবকের দল, দলে দলে সুখ-নিদ্রামগ্ন। এই মন্দিরে জাগল প্রথম—বাঙ্গালী; জেগে ধূপে দীপে মায়ের মঙ্গল আরতি করল; সুমধুর বন্দনা গীতি গাইল; শঙ্খ, ঘণ্টা, দামামা, কাড়া, দেবীর দ্বারে বাজাল। ধীরে ধীরে জাগল তখন নিদ্রাতুর সন্তানগণ। তন্দ্রাজড়িত চক্ষে, অবাক হয়ে তারা চেয়ে দেখল, মার নূতন রূপ, আশার আলোয় দীপ্ত মুখছটা, স্নেহপ্রসারিত বরাভয়কর। নব-ভারতে এনেছে বাঙ্গালী, নবীন রূপ, অভিনব চেতনা—ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, নৃত্যে, গীতে।

একটা জাতির বিশেষত্ব কোথায় দেখতে হলে, দেখতে হয়—তার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ইত্যাদি। যে যেমন, তার প্রতি চিন্তাটি সেই ভাবেই হয়,—প্রতি কাজটিও তার সেইরূপই হয়। কথায় বলে,—মানুষের হাতে পড়ে ভগবানকেও মানুষের মত হতে হয়েছে। কেউ বা তাঁর হাতের সংখ্যা, মাথার সংখ্যা বাড়িয়েছেন; কেউ সর্ব্বপ্রকার আকার থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেও হাত, পা, কোল থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন নি। কি জানি তাঁকে ছোট করে ফেলা হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁর কোন রকম রূপ কল্পনা করতে মানা করেছেন, তবুও তিনি স্বর্গের সিংহাসনে বসেন, নানা কর্ম্মচারী বেষ্টিত হয়ে বিচার করেন, পুরস্কার দেন, দণ্ড বিধান করেন। উপায় নেই। যতদিন মানব মানব থাকবে, ততদিন তার প্রতি কল্পনা, প্রতি কর্ম্ম মানব-ভাবাপন্ন না হয়েই পারে না। সুতরাং যারা বাঙ্গালী—তাদের সাধনায়, তাদের কর্ম্মধারায় একটু বাঙ্গালাত্ব থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়, অন্যায়ও নয়।

দেবী-পূজা, দেবী-মন্দির, দেবী-উপাসক ভারতের বহু স্থানে আছে। তবুও দুর্গাপূজা বাঙ্গালার একান্ত নিজস্ব।

দুর্গাপূজা শাস্ত্রীয় পূজা—বাঙ্গালীদের দেশাচার বা আর কিছু নয়। বছরে দুবার মায়ের পূজা হয়। শরৎ-কালে শারদীয়া পূজা আর বাসন্তী পূজা বসন্তে। বাসন্তী পূজার চেয়ে শারদীয়া পূজা বেশী ব্যাপকভাবে হয় এবং তাতে উৎসবানন্দও অনেক বেশী হয়। দুর্গাপূজা বলতে সাধারণতঃ এই শারদীয়া পূজাকেই বুঝায়।

রোগ, মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, উপবাস, দারিদ্র্য এবং তার ফলস্বরূপ অশান্তি ও কলহ-বিবাদের তাণ্ডবলীলা চলছে আজ বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে। তবুও মায়ের আগমনে, অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার বাঙ্গালীর মন উৎসবানন্দে মেতে

উঠে। চোখের জল শুকাতে না শুকাতে, সন্তানের মুখে হাসি ফোটে,—মায়ের আগমনে। যারা আত্মীয়-বন্ধু ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, কর্ম্মের জন্ম দূরদেশে বাস করেন, এ সময় তাঁরাও ঘরে ফিরে যান। যাঁরা তা পারেন না, তাঁরা যেখানেই থাকুন, এ সময় মায়ের পায়ে দুটি জবা-বিল্বদল দেবার আয়োজন, সেখানেই করে থাকেন।

বাঙ্গালার লোক-সাহিত্য, পল্লী-গীতিকা শিব-দুর্গার কাহিনীতে ভরা। দুর্গাপূজা যেমন বহুকাল ধরে চলে আসছে, এই সব কাহিনীগুলোও লোকপরম্পরায় বহুকাল হতে চলে আসছে ও ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এগুলোর মূল হিন্দুদের পুরাণ শাস্ত্র। যে ভাবধারা নিয়ে বাঙ্গালার আগমনী-সঙ্গীত জন্মলাভ করেছে ও চলে আসছে, তা অপূর্ব্ব। গ্রাম্য কবিগণ ও রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ তারই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন,—নিপুণ তুলিকায়।

দুর্গার আগমনই আগমনী-সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু। দুর্গা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা। উমার মার নাম মেনকা। ভোলানাথ শিবের সঙ্গে তাঁরা মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। শিবের ঘর করতে মেয়ে চলে গেছে কৈলাসে। অনেক দিন যায়, মেয়েকে না দেখে মেনকার মন বড় উতলা হয়ে উঠেছে। গিরিরাজ পাষাণ, তাঁর মনে দুঃখের লেশও যেন নেই। কিন্তু মা আর থাকতে না পেরে মিনতি করে স্বামীকে বলছেন,—

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
আমি, দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা, মা মা বলে কেঁদেছে।
সোনার বরণী গৌরী আমার ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ, তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে।

সত্যই বাঙ্গালার মাতৃহৃদয় রূপ নিয়েছে তার আগমনী-সঙ্গীতে। কোথায় দুর্গা বিশ্বজননী, মহাশক্তিরূপিণী? তিনি যে আমাদের বাঙ্গালারই এক দুঃখিনী মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের প্রাণে যে ব্যথা যুগ যুগ ধরে বেজে এসেছে, তাই মূর্ত্ত হয়েছে,—বাংলার সাধক কবিদের কণ্ঠে। মা ভাবেন,—আমি না দেখলে উমাকে আমার কে দেখবে? আহা! বাছার বুঝি কত দুঃখই না হচ্ছে! আবার নিজের অবস্থা কত অসহায়। স্বামী গিরিরাজ, তিনিও যে পাষাণ। পাষাণের মধ্যে কি আর দয়ামায়া থাকে? তবুও অসহায় রমণীর স্বামী ছাড়া উপায়ও নেই,—

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে
আনন্দে রয়েছো ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি
তাই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।
সতিনী সরলা নহে
স্বামী সে শ্মশানে রহে
তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে।

ভক্তি-সাধনায় বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাঁচটি পথ বলা হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তি সাধককে ভগবানের একান্ত আপনার করে। ভক্ত তাই ভগবানের সঙ্গে একটা জাগতিক সম্পর্ক পেতে নেয়। এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ মধুর ভাব, তারপরই বাৎসল্য-ভাবের স্থান। বাৎসল্যভাবে ভগবানকে আপন সন্তানের মত ভালবাসতে হয়।

বঙ্গ-জননীরা মা মেনকার স্থান গ্রহণ করে মহামায়াকে নিজ কন্যারূপে আরাধনা করে থাকেন। বাঙ্গালার আগমনী-সঙ্গীত এই। তাঁরা মনে করেন উমা স্বামীর ঘর থেকে তিন দিনের জন্য দুঃখিনী মাকে দেখতে আসেন।

ছেলে মেয়ে সংসারে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বহু লোক তাকে মান্য করছে, প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, এসব দেখবার জন্য কোন মা বাপের না কামনা হয়? মেয়ের কথা ভেবে ভেবে গিরিরাণী স্বপ্নে দেখেছেন—উমা রাজরাজেশ্বরী।

উমা আমার সামান্যা মেয়ে নয়,
গিরি তোমারি কুমারী, তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়,
ওযে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয়।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়,
ওকে গরুড়বাহন, কালোবরণ
যোড় হাতে করে বিনয়।
... ...

সন্তানের জন্য অকাতরে হৃদয়ের সবখানি দান করাই মাতৃত্ব। উমার জন্য মেনকা আজ উন্মাদিনী। শয়নে, স্বপনে,

জাগরণে, শুধু উমা, উমা, এক চিন্তা। শ্বশুর ঘরে মেয়ের আমার কত কষ্ট, কেউ না দেখে! পাগলা জামাই, শ্মশানে মশানেই তার দিন যায়,—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
জামাই, শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না।

তারপর অনেক কান্নাকাটিতে, সাধা সাধনায়, সত্যই একদিন—

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার—
এই যে গিরি নন্দিনী আইল।

গিরিরাজ কৈলাসে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। উমা এবার দশভূজা, মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ। মা বাপ—যেমন ছেলেমেয়ের ঐশ্বর্য্য, রূপ-সম্পদ এ সব দেখতে চান তেমনি আবার চান—মেয়ে যেন চিরদিন মেয়েই থাকে। অম্বিকার এ রাজরাজেশ্বরী-রূপ দেখে মা ভয় পেলেন,—

কর্ত্তা অরি' পরে আনিলে হে কারে, কৈ গিরি মম নন্দিনী।
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা, এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী।
কিবা সে দক্ষিণে গজেন্দ্রবদন, প্রকাশিত যেন প্রভাতী তপন,
ষড়ানন বামেতে শোভন, কমলা ভারতী সহকারিণী।
দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে আর পদ আরোপিয়া অসুরেতে,
দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে, মনে হয় পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী।

তারপর মা যখন বুঝতে পারলেন, দশভূজা আর কেউ নয়, তাঁরই সাধের উমা, যার ভাবনায় তাঁর চোখে ঘুম নেই, তখন মায়ের প্রাণে কি আনন্দ!

এলি কি গো উমা, হর মনোরমা,
কৈলাস চন্দ্রমা হলি কি উদয়?
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার
না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়।

নৈন নীলাম্বরে নিরখি যখন,
তোমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে মা তোর ও চাঁদবদন,
শত ধারে চক্ষে বারিধারা বয়।

মিলনের প্রথম ভাবটা যখন কেটে গেল, তখন আসল ঘরকন্না, সুখদুঃখের কথা। মাতৃহৃদয়ের উদাসীনতাই হোক বা ভালবাসাই হোক, মায়ের মন,—হাজার লোক সন্তানকে দেখবার থাকলেও, কিছুতেই শান্ত হয় না, নিজে না দেখলে, মার মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

কেমন করে হরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে হরে, বলবো উমা ঘরে নাই।
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে, তোর সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই।

এভাবের শত শত আগমনী-গান বাঙ্গালায় আছে। বাঙ্গালার মাতৃহৃদয়ের একটা সত্যকার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এই সব আগমনী-গান আলোচনা করলে। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ ভালবাসাই যে শুধু এ গানে আছে তা নয়, আছে তাতে, বাঙ্গালার পারিবারিক জীবনের নিত্যকার সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, আছে বাঙ্গালার রীতি নীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার।

বাবা ছোটছেলেকে বাবা বলে ডাকেন, জ্যেঠামশায়, ছোট ভাইপোকে জ্যেঠামশায় বলে আদর করেন। আর কিছুই নয়, বাৎসল্য ভাবের একটি রূপ—এই বিপরীত দৃষ্টিতে প্রেম উপভোগ মাত্র। বিশ্বজননীকে নিজের মেয়ের মত জ্ঞান করাও একই বস্তু। এভাবে ভগবৎ সাধন অতি উচ্চের বলে সাধু মহাপুরুষগণ মত প্রকাশ করে থাকেন।

যেখানে ভাব নেই, অনুভূতি নেই, শুধু কল্পনা বা বুদ্ধি খরচ করে তার নিখুঁত ছবি অঙ্কন করা সম্ভব নয়। ভারতে নারীজাতির চরম আদর্শ, একান্ত কাম্য মাতৃত্ব। মাতৃত্বের যে ছবি আমরা বাঙ্গালার আগমনী-সঙ্গীতে পাই, তা বাঙ্গালা কেন সারা ভারতের অতি গৌরবের বস্তু।

শক্তিরূপিণী মহামায়া কন্যারূপে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আগমন করুন। তাঁর আগমনে তাঁর আবির্ভাবে, বাঙ্গালার মাতৃজাতি ধন্য হোক, বাঙ্গালা ধন্য হোক।

ক্ষুদ্র শত্রু

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

[১]
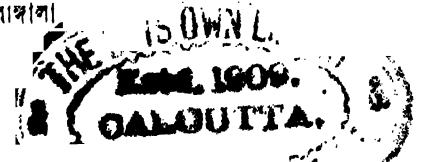
কর্ণাটক দেশের হুবলী শহরে সিদ্ধাপ্পা শিবলিঙ্গাপ্পা শেট্টি তামাকের একজন বড় ব্যাপারী। তাহার তামাক এক-দিকে মাদ্রাজ, অপর দিকে কলিকাতা ও রেঙ্গুনে রপ্তানি হয়।

বাজারের বড় রাস্তার উপরে শেটির প্রকাণ্ড আড়ৎ। তার এক কোণে একখানা বড় তক্তাপোষের উপর বসিয়া সিদ্ধাপ্পা বেচাকেনা করে। পাশে একটী হেলান-দেওয়া বেঞ্চ ও ছইখানা চেয়ার। সেখানে বহুলোক ও বহুজাতের লোক সিদ্ধাপ্পার কাছে আসে যায়। স্বজাতীয় লিঙ্গায়তেরা আসে, জৈন আসে, মারাঠা আসে, মাদ্রাজী চেটি আসে, গুজরাটী শেঠ ও বোরা আসে। কখন কখন কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী বাবু পর্য্যন্ত সেখানে দেখা দেয়। তাহা ছাড়া ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর সাহেবেরা আসা-যাওয়া করে, কখনও কখনও তাহাদের পার্শী কর্ম্মচারীও আসিয়া থাকে। সিদ্ধাপ্পা নিজ কন্নড় ভাষা ছাড়া মারাঠী হিন্দী গুজরাটী তেলেগু এবং তামিল ভাষা বেশ সহজ ভাবেই বলিয়া থাকে। তাহার দোকানের হুণ্ডী বোম্বাই হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়।

সিদ্ধাপ্পার যে কত অর্থ তাহা লোকে কল্পনাই করিয়া উঠিতে পারে না। সে কয়েক শত টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেয়, কিন্তু সরকার কি শেটির মত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সব আদায় করিতে পারে? ইনকাম-ট্যাক্সে তাহার ধনের সামান্যই পরিমাণ হইয়া থাকে।

সিদ্ধাপ্পার চেহারাটা কৃষ্ণবর্ণ, জবরদস্ত, গোলগাল। ভুঁড়ির দিক দিয়া একটু অতিরিক্ত রকম বিস্তৃত। বেশ জাঁদরেল দেহ, দেখিলেই ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যয় জাগে। অর্দ্ধেক মাথায় টাক, ঘন জ্র, শক্ত জোড়ালো গোঁফ। পক্ব-কেশের পরিমাণ দেখিয়া মনে হয়, বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। দাড়ি কামানো, তবে পাতলা মখমলের শার্টের নীচে, দাড়ির অভাব পূরণ করিয়া, বক্ষের উপর এক-রাশ অর্দ্ধপক্ব লোম শোভা পাইতেছে। তাহারই উপর দিয়া, তাহার ধর্ম্মের লক্ষণ স্বরূপ, একটী সুতলীতে বাঁধা রূপার ডিবার ভিতর শিবলিঙ্গ ঝুলিতেছে।

শার্টই সাধারণতঃ তাহার উপরের পোষাক। তবে কোনওখানে যাইতে হইলে তাহার উপর সিল্কের গলাবন্ধ লম্বা কোট পরে, মাথায় জরিদার লাল পাগড়ী বাঁধে এবং পায়ে জরির ফুল দেওয়া একজোড়া পায়তন লাগায়। সিদ্ধাপ্পার চোখগুলি বড় বড় এবং খুব দৃঢ়তাপূর্ণ। নাসারন্ধ্রগুলি একটু বেশী রকম স্ফীত, সে অবসরের সময় তাহাতে হাতের মুঠা ভরিয়া নস্য দেয়।

এহেন ব্যক্তির জীবন কানায় কানায় সুখে পরিপূর্ণ থাকা উচিত। কিন্তু বিধাতার নিয়মই এই, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় না। আজ সকাল হইতে সিদ্ধাপ্পার বুকের ভিতরটা একটু অস্বাভাবিক রকম ঢিব্ ঢিব্ করিতেছে। তাহার কারণ বিধাতা তাহার জীবনের প্রতি খুব সদয় হন নাই।

[২]

সিদ্ধাপ্পা আজ সকালে দোকান খুলিয়া, কর্ম্মচারীদিগকে গদীতে বসাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরিল। তাহার বাড়ী দোকান হইতে অল্প দূরে বাজারেরই সঙ্গে। বিশাল একখানা ঘর, তিন পুরুষ যাবৎ তাহাতে শেট্টিদের বাস। এখনও স্ত্রী-পুরুষ শিশু মিলিয়া পঁচিশ ত্রিশজন শেট্টি তাহাতে বাস করিতেছে।

কিন্তু বাড়ীখানা দেখিলেই মনে কেমন অসন্তোষের ভাব জাগে। বাহিরে আস্তর, রং, চিত্র, সকলই আছে, কিন্তু ভিতরের দিকে যতই দেখা যায়, ততই এক অপরিসীম অস্পষ্টতা চোখে তাক লাগাইয়া দেয়। বড় বড় অন্ধকার ঘর, দিনের বেলায় তাহাতে আলো জ্বালাইতে হয়; অন্ধকার সিঁড়ি, হাতড়াইতে হাতড়াইতে উপরে উঠিতে হয়। হয়ত অর্থকে নিরাপদ করিবার জন্য, এক সম্মুখের ও পিছনের দরজা ব্যতীত বাহিরের সঙ্গে কোনই সংস্রব রাখা হয় নাই।

ঘরের সম্মুখের চাতাল পাথর দিয়া বাঁধানো। আজ তাহার উপর চাটাই ফেলা হইয়াছে। সে চাটায়ে একদল

বাদ্যকর বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী সানাই ঢোল বাজাইতেছে। বাদ্যকরের সরদার গঙ্গু চৌহান মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঢোলের উপর হাত বুলাইতেছে। আর তাহার ছেলে লক্ষ্মণ গাল ফুলাইয়া ফুলাইয়া সানাই ফুঁকিতেছে।

সিদ্ধাপ্পা বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, সম্মুখের ঘরের, চৌকাঠের উপর হইতে শোলার ফুল ঝুলিতেছে, ঘরের মেঝের উপর সতরঞ্চ, তার উপরে চাদর ও তাকিয়া পাতা হইয়াছে। এবং সেখানে তাহার পড়শী স্বজাতীয় ডুইচারি-জন লোক আসিয়া বসিয়াছে।

সিদ্ধাপ্পা অভ্যর্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাহারা উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইল।

বাদ্যকর ও অতিথিদের আগমনের কারণ, আজ সিদ্ধাপ্পার বিবাহ,—চতুর্থ বারের। তাহার প্রথম তিন ভার্য্যা পরলোক-গতা।

[৩]

সিদ্ধাপ্পার পিতা শিবলিঙ্গাপ্পা বাসবাপ্পা শেঠি যখন ইহ-লোক ত্যাগ করেন, তখন সিদ্ধাপ্পাকে দিয়া যান, বিশাল তামাকের কারখানাটি, শতেক বিঘা তামাকের জমি, তিনটি বৈমাত্রেয় ভাই, একটি বৈমাত্রেয় ভগ্নী এবং ত্রয়োদশ বর্ষীয়া ভার্য্যা গৌরী-আম্মা। তাহার মাতা এবং ডুইজন বিমাতা পূর্ব্বেই স্বর্গগতা হইয়াছিলেন। গৌরী আম্মা যখন বিবাহের আড়াই [illegible] পূর্ব্বে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহে বাস করিতে আসিল, তখন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ভার পড়িয়াছিল সিদ্ধাপ্পার অনূঢ়া ভগ্নী পার্ব্বতীর উপর। সে ঘটনার ছয় মাস পরে সিদ্ধাপ্পা বেশ ঘটা করিয়াই পার্ব্বতীর বিবাহ দিল। কিন্তু তখন হইতে তাহার বৈমাত্রেয় ভায়েরা পৃথক হইয়া গেল। সে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া বাড়ীর, জমির এবং দোকানের মূলধনের অংশ দিল।

গৌরীর সঙ্গে তাহার জীবনযাত্রা বেশ সহজ ভাবেই গড়িয়া উঠিল। তাহার এক কারণ গৌরী তাহার মামাতো বোন। বোনের ছেলের কাছে মেয়ে দিয়া ভাইবোনের সম্বন্ধটাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথা এদেশে খুব প্রচলিত। এত বেশী যে, কন্নড় ভাষায় সাধারণতঃ শ্বশুরকে মামা বলা হয়। পিসীর বাড়ী ভাইঝির অপরিচিত নয়, সুতরাং গৌরী বয়সে কাঁচা হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহিণীর পদে পাকা হইয়া বসিল।

বাহিরে সিদ্ধাপ্পা দোকান চালায়, ভিতরে গৌরী-আম্মা সংসার চালায়; উভয়ের কাজ এমন নিপুণ এবং স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিতে লাগিল যে, পাঁচটি বৎসর কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিল না। সে পাঁচ বৎসরের শেষে বিধাতা তাহাদের আঁধার ঘরের কোণে একটু আলোর কণা ফেলিয়া দিলেন—ক্ষুদ্র একটি শিশুর রূপে। ছোট্ট মৈত্র হইল মা বাপের অতি আদরের ধন। বৃদ্ধা পড়শীরা ঠোঁট বাঁকা করিয়া বলিল, "মেয়ে হয়েছে!" কিন্তু বোধ হয় মেয়ে বলিয়াই মৈত্র পিতার হৃদয় বেশী করিয়া জুড়িয়া বসিল।

মৈত্রর জন্মের সময় গৌরীর যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল, তাহা আর গড়িল না। সিদ্ধাপ্পা তাহাকে লইয়া পনর ক্রোশ দূরে বীরশৈব মঠে গেল, সেখানে গুরুকে ষোড়শোপচারে পূজা দিল, কোনও প্রকার অর্থকৃচ্ছ্রতা করিল না। গুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া গৌরী-আম্মার হাতে নারিকেল, মাটির ভার, শুকনো ফল তুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার ফল দর্শিল না। ধীরে ধীরে গৌরীর দেহ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। প্রথম সামান্য জ্বর হইত, তার পর জ্বর বাড়িল। প্রথম খুস্‌খুসে কাসি ছিল, পরে তাহা প্রবল বেগ ধারণ করিল। এক-দিন গৌরী স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া মাখনের মত কোমল মৈত্রর সোনার চুড়িপরা গোল হাত ডুটি ধরিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ইহলোক ত্যাগ করিল। মৈত্র মাতামহীর আশ্রয়ে গেল।

সিদ্ধাপ্পার বয়স তখন এখনকার অর্দ্ধেক। গৌরী-আম্মার মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরেই তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহের যোগাড় হইল। লোকে বলে, বিবাহ নিয়তির ব্যাপার। এবার সিদ্ধাপ্পার নিয়তিতে ছিল সুদূরের এক মহারাষ্ট্র-দুহিতা (অবশ্য ধর্ম্মে লিঙ্গায়ত)। মঞ্জুলাভাই মহাদেব মুর্কুলে (শেষ ডুইটি নাম তাহার পিতার এবং পিতৃবংশের) বিবাহের মুকুট পরিয়া হইয়া গেল ভাগীরথী সিদ্ধাপ্পা শেঠি। ভাগীরথীর পিতামাতা অর্থে দরিদ্র, কিন্তু ভাগীরথী রূপে ঐশ্বর্য্যবতী।

শেট্টি পরিবারে ঐ রকম ফর্সা রংয়ের বধূ বোধ হয় এই প্রথম।

ভগবান যাহাদিগকে রূপ দেন, তাহাদিগকে সে রূপ রক্ষা করিবার জন্য একটা বিশিষ্ট রকম রুচিও দেন। ভাগীরথী স্বামীগৃহে আসিয়া ধীরে ধীরে নিজের বেশভূষার চালে-চলনে এমন একটা সৌখীনতা আনিল যে, সিদ্ধাপ্পা প্রথমত তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। মাস দুই পর্য্যন্ত, সে তার স্ত্রীর শুধু রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই, তাহার পোষাকের বর্ণচ্ছটায় ও পারিপাট্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। ভাগীরথী বাহিরে যাইতে রঙিন শাড়ী তো পরিতই, ঘরের ভিতরেও কখনও কচি ঘাসের রংয়ের, কখনও আশমানী রংয়ের, কখনও কেশর রংয়ের কাপড় পরিয়া থাকিত। আর সে কাপড়ের ভিতর দিয়া তাহার অঙ্গরেখাগুলি এমন শালীনতার সহিত ফুটিয়া উঠিত যে, সিদ্ধাপ্পার জ্ঞাতিবধূরা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাহা বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিত।

কিন্তু সিদ্ধাপ্পা কাজের লোক এবং ব্যবসায়ী মানুষ। তাহার ভার্য্যা বেশভূষায় অযথা সময় এবং অর্থনষ্ট করিতেছে একথা ধীরে ধীরে তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। তাহার পদে পদে মনে পড়িল গৌরী-আম্মার কথা; সে কেমন সাদাসিধে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিত। বাড়ীতে অতিথির ভিড় হইলে কতদিন সে দিবসভোর রান্নাঘরেই কাটাইয়াছে। গৌরী-আম্মা শুধু সিদ্ধাপ্পার স্বধর্ম্মী ছিল তাই নয়, সে তাহার স্বজাতি ছিল। ভাগীরথী স্বধর্ম্মী হইলেও বিজাতীয়। এ যেন আর্য্য-অনার্য্যের চিরন্তন বিরোধ, যদিও শেট্টি বংশে এত যুগের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা আর্য্য রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে।

এজাতীয় বিরোধের সঙ্গে ছিল আর একটা বৈষম্য, ভাষার। সিদ্ধাপ্পা আজন্ম কন্নড় ভাষা বলিয়া, লিখিয়া আসিয়াছে। শুধু ব্যবসায়ের খাতিরে দোকানে কাহারও সঙ্গে মারাঠী বলে। কিন্তু ভাগীরথীর কন্নড়-জ্ঞান অতি সামান্য এবং তাহাও বহু ভুলপ্রমাদগ্রস্ত। সে অনেক কথাই মারাঠীতে বলিয়া থাকে এবং এমন এক একটা মেয়েলি কথা বলে, যাহা সিদ্ধাপ্পা জীবনেও শোনে নাই। সিদ্ধাপ্পা কোনও কথা না বুঝিলে ভাগীরথী কোথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিবে,—তাহার বদলে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। ইহাতে সিদ্ধাপ্পার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। সে ভাবে ও-রকম বৌ ঘর করিবার জন্য নয়, তাকে তুলিয়া রাখিবার জন্য। আজ যাহা ভাবে, কাল তাহা আভাসে বলে, পরশু সেটা আর একটু পরিষ্কার হইয়া পড়ে। এ রকম করিতে করিতে অবশেষে সে সব কথা রাগের চোটে চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে।

ভাগীরথীর সহিত সিদ্ধাপ্পার বিরোধটা ঘনীভূত হইয়া উঠিল, মৈনুর আগমনে। সিদ্ধাপ্পা ভাবিল, এখন পাকা ভাবে সংসার পাতা হইয়া গিয়াছে, এবার মৈনুকে নিজের কাছে আনিবে। কিন্তু আনিয়া দেখিল, মৈনু ভাগীরথীর চক্ষুশূল। বাধ্য হইয়া মৈনুকে আবার শাশুড়ীর কাছে পাঠাইতে হইল। ইহাতে তাহার মেজাজ বিশেষ রকম খারাপ হইয়া গেল।

মেজাজ ভাল থাকুক আর মন্দ থাকুক, সময় বসিয়া থাকে না। শত সংঘর্ষ, শত বিরোধ, শত চিত্তবিক্ষোভের ভিতর দিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল।

ভাগীরথী যখন পিতৃগৃহে যায়, তখন ঝগড়া থামে, ফিরিয়া আসিলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত শান্তি বিরাজ করে, কিন্তু আবার ঝগড়া ফিরিয়া আসে। ভাগীরথী সিদ্ধাপ্পাকে পুত্রমুখ দেখাইল, কিন্তু সে পুত্র মাত্র দ্বাদশ দিন ধরাতলে বাস করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল। ইহাতে সিদ্ধাপ্পার মন ভাগীরথীর প্রতি আরও বিরূপ হইয়া গেল। সে স্থির করিল, [illegible] অলক্ষণা স্ত্রী। মনে মনে সংকল্প করিল, শীঘ্রই আর একটা বিবাহ করিবে। কিন্তু সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ভাগীরথী ক্রমাগত তিন চার দিন রক্ত-বমি করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল এবং সেখান হইতে একমাস পরে খবর আসিল, সে আর ইহজগতে নাই।

[৫]

ভাগীরথীর মৃত্যুর পর সিদ্ধাপ্পার বৈমাত্রেয় বোন পার্ব্বতী আসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর। নইলে এত বড় সংসার ছারেখারে যাবে।" সিদ্ধাপ্পা নিজে বিবাহ না করিয়া পার্ব্বতীর বার বৎসরের ছেলে বীরাপ্পার সহিত নিজের আট বছর মেয়ে মৈনুর বিবাহ দিল। এ বিবাহে বহু ঘটা করিল। ইংরাজী বাদ্য আনিল, শহরের সমস্ত লিঙ্গায়তদেরে

খাওয়াইল এবং হাজার হাজার কাঙ্গাল বিদায় করিল। তা ছাড়া মঠের গুরুকে মস্ত এক ভেট পাঠাইল।

মৈত্তু বিবাহের পরে পিতৃগৃহের বদলে মাতামহের গৃহে গেল; সিদ্ধাপ্পার ঘর একেবারে খালি হইয়া পড়িল। তখন সিদ্ধাপ্পা প্রথম উপলব্ধি করিল, এতকাল যাবৎ ভাগীরথীর সঙ্গে যে বিরোধে কাটাইয়াছে, সে বিরোধই তাহাদের জীবনের একমাত্র ইতিহাস নয়।

সে বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী তাহার চিত্তেরও অগোচরে এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার ব্যবসায়ীর প্রাণ, সে মায়ার কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করে নাই। হয়ত সেইটাই তাহাদের বিরোধের পরোক্ষ কারণ ছিল। ভাগীরথীর স্বামী যদি বাস্তব-পন্থী দ্রাবিড় না হইয়া কল্পনা-পন্থী আর্য্য হইত, তবে হয়ত সে মায়ায় অভিভূত হইয়া তাহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিত। আজ ভাগীরথীর রূপের, সৌকুমার্য্যের, সৌখীনতার স্মৃতি তাহার চিত্ত অধীর করিয়া তুলিল।

সিদ্ধাপ্পা ব্যবসায়ের মধ্যে সমস্ত ভুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যবসায় তাহার পীড়িত হৃদয়কে কোনও শান্তি দিতে পারিল না। সিদ্ধাপ্পা সমাজে মিলিতে চাহিল, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য সে এতকাল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিয়া আসিয়াছে; সমাজে মেশা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাহার দোকান ভোর হইতে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে; [illegible] সামাজিক জীবন-যাপনের অবকাশ নাই। সিদ্ধাপ্পা গুরুর প্রসাদে নিজের চিত্তের আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিল; গুরু আশীর্ব্বাদ দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে চিত্তের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

অবশেষে সিদ্ধাপ্পা আশ্রয় লইল সুরার এবং বাজারের গোলাপ জানের। গোলাপের প্রতি হঠাৎ প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইবার কারণ, সে ভাগীরথীর মধ্যে যে রূপ হারাইয়াছে, গোলাপের মধ্যে তাহা নূতন মূর্ত্তিতে পাইল, আর পাইল গৃহিণীর রুক্ষতার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়িনীর স্তোক-বাক্য।

সিদ্ধাপ্পার ব্যবসা বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু গৃহ আঁধার হইয়া গেল।

[৬]

সে আঁধার দূর করিল সিদ্ধাপ্পার মেয়ে। দশ বছরের মৈত্তু, বাপের গলা জড়াইয়া, কালো লম্বা লম্বা চোখের পক্ষ্ম গুলি অশ্রুতে ভিজাইয়া বলিল, "বাবা, তোমার আবার বিয়ে করতে হবে। আমার একটী ভাই আসবে, বংশের নাম রাখবে।" অবশ্য এগুলি শেখানো কথা; কিন্তু মৈত্তু তাহা একেবারে বুঝিতে পারে নাই তাহা নয়। যাহারা শৈশবে দুঃখের কোলে লালিত, তাহারা সংসারকে অতি শীঘ্র চিনিয়া থাকে। আর মৈত্তু যে পারিবারিক আবেষ্টনের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে বৃদ্ধদের আলাপে শিশুদের অনধিকার প্রবেশ হয় না।

কন্যার কাছে সিদ্ধাপ্পার পরাজয় মানিতে হইল। এবার সে বিবাহ করিল একজন বিধবাকে। সে স্বল্পভাষী, স্বভাষিণী এবং বংশমর্য্যাদাসম্পন্না। সিদ্ধাপ্পা বলিল, "বড় বংশের বড় গুণ।" কিন্তু বোধ হয় সীতা বিধবা বলিয়াই অতিশয় নম্র হৃদয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে উৎসর্গ করিয়া দিল। হয়ত বয়সের জন্য কৈশোরের চাপল্য-দোষ হইতে মুক্ত ছিল; হয়ত যে একবার হারাইয়া পায়, তাহার সে পাওয়ার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিনয় ফুটিয়া উঠে। এক্ষেত্রে সীতা এবং সিদ্ধাপ্পা উভয়ের পক্ষেই সে কথা খাটে।

যে কারণেই হোক, সিদ্ধাপ্পার দাম্পত্য-জীবন এবার অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হইল। সীতা তাহার জন্য শুধু মুখরোচক আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না (ভাগীরথীর মহারাষ্ট্রী খাদ্য সিদ্ধাপ্পার মুখে বহুদিন পর্য্যন্ত রুচে নাই); সে সিদ্ধাপ্পার অসুখের সময় প্রাণপণে সেবা করিত। চরিত্রদোষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধাপ্পার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল, কি রোগ তাহা অবশ্য সে কখনও উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করায় নাই। তা ছাড়া এখন তাহার কন্যা মৈত্তু তাহার কাছে থাকিতে আসিল। মৈত্তুর দেহখানি ফুলের মত কোমল, মনটি তাহার চেয়েও অধিক। তাহার বালিকা-স্বভাবের এক দিকে স্বাভাবিক চাপল্য, অপর দিকে তেমনই স্বাভাবিক—যদিও ক্ষণস্থায়ী লজ্জা, এ দুয়ে মিলিয়া সিদ্ধাপ্পার গৃহে ও হৃদয়ে একটা অপরূপ মাধুর্য্যের স্রোত বহাইল।

সীতা হইতে সিদ্ধাপ্পা পরিপূর্ণ গৃহ-সুখ পাইল, কিন্তু অপত্যসুখে বঞ্চিত রহিল। বিধাতা সীতাকে এক একটী সন্তান দিয়া কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। সিদ্ধাপ্পা মন্দিরে মন্দিরে গিয়া মাথা খুঁড়িল, কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না।

দেখা গেল, সিদ্ধাপ্পার অদৃষ্টের মাপটা যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। একবার ব্যবসা উপলক্ষে বোম্বাই গিয়া সে এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, তাহার একা ঘরে ফেরা কঠিন হইল। তাহার ভগ্নীপতি তথা বেহাই পরাপ্পা তাহাকে আনিতে গেল। গৃহে আসিয়া সিদ্ধাপ্পা বহুদিন পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। পরাপ্পার কথায় বোম্বায়ে ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌শন লইয়াছিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারই চিকিৎসা চলিল। রোগ আর সারে না, সিদ্ধাপ্পার দেহ মন উভয়ই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। সীতাকে দেখাইয়া লোকে বলিতে লাগিল, 'কপাল একবার ভাঙিলে আবার জোড়া কঠিন'।

[৭]

কথায় বলে, চিরদিন সমান যায় না, সুখেরও না, দুঃখেরও না। সিদ্ধাপ্পার অসুখ সারিল। এবার বুঝি ভগবান তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিবাহের ছয় বৎসর পরে মৈনুর আশা পূর্ণ হইল। সীতার কোল আলো করিয়া মৈনুর একটী ভাই আসিল। সিদ্ধাপ্পার বোন, তথা বেহান পার্ব্বতী, আর মেয়ে মৈনু, দুয়ে মিলিয়া গৃহে আনন্দের হল্লা তুলিল।

এক উৎসবের পর আর এক উৎসব আসিল। সিদ্ধাপ্পা মৈনুর বিবাহে যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিল, তেমনি আড়ম্বরের সহিত এবার মৈনুর স্বামী গৃহযাত্রার উৎসব সম্পন্ন করিল। শেটিদের আবাস-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। শহরের ভিতর দিয়া বাগু বাদ্য সহকারে প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হইল। রাত্রিতে গ্যাসের আলোকে সমস্ত মহল্লাটা উজ্জ্বল হইয়া রহিল।

মৈনুর স্বামীগৃহযাত্রার পরদিন সিদ্ধাপ্পা দেখিল, তাহার স্ত্রী সকালে বহুকাল পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া আছে। সে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" সীতা বলিল, "কিছু না।"

কিন্তু তার পর হইতে মাঝে মাঝে সীতা তাহার ছেলেটীকে পাশে খেলা দিয়া বসাইয়া নিজে বিছানায় শুইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "কিছু না, খেটেখুটে শরীরটা ক্লান্ত হয়েছে।" বিছানা হইতে উঠিয়া রান্নাবান্না করে, খাওয়ায় দাওয়ায় আবার শোয়। কিন্তু দিনের পর দিন তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে যখন আহারে অরুচি দেখা দিল, শরীর শীর্ণ হইয়া উঠিল, চোখের কোণে কালি পড়িল, তখন সিদ্ধাপ্পা গৌরী ও ভাগীরথীর কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সিদ্ধাপ্পা সহরের বড় ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তারের কাছে ভাবের আবেগে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তার সাহেব, আমার স্ত্রীকে আরাম করে দাও, আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।"

ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে সময় চলে গেছে। রোগের প্রথম অবস্থায় যদি তাহাকে বাহিরে কোথাও খোলা হাওয়ার মধ্যে নিয়ে রাখতে, তবে দেখা যেত।"

সিদ্ধাপ্পা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বাইরে কেন? এ যে আমার পৈত্রিক ভিটা!"

ডাক্তার একটু বক্রভাবে বলিল, "তোমার এসব ঘর যক্ষ্মার বাসা। শুধু তোমার স্ত্রী কেন, আরো লোক এর ভিতর মরতে পারে!"

সিদ্ধাপ্পা পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমার পূর্ব্বের দুই স্ত্রীও এইখানেই মারা গেছে। তবে এ ঘরকে অপয়া বলতে হবে?"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিল, "ঘরের দোষ নেই, ঘরেতে এক সময় যক্ষ্মার বীজাণু প্রবেশ করেছিল, তারা আঁধার পেয়ে বেঁচে রয়েছে, আর একের পর এক জীবন নষ্ট করছে।"

"বীজাণু কি?"

"ছোট্ট পোকা।"

"ঐ সব ছোট পোকায় একের পর ঐ বলিষ্ঠ লোক-গুলোকে মেরেছে? তাও সম্ভব? তা' কখন হয়? আমাকে ঠাট্টা করছ ডাক্তার!"

"ক্ষুদ্র শত্রু অনেক সময় বড় শত্রুর চেয়ে বেশী অনিষ্ট করে।"

"ক্ষুদ্র শত্রু? ওরা আমার শত্রুতা করেছে? ঐ সব ছোট ছোট পোকারা?"

"সহরের বাইরে গিয়ে বাংলা বেঁধে বাস করলে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।"

"ও কথা আমি এক মুহূর্ত্তের তরেও বিশ্বেস করিনে, ডাক্তার সাহেব। ওসব শুধু হেঁয়ালি।"

সিদ্ধাপ্পা গভীর বিরক্তি ও অসন্তোষের সহিত ডাক্তারকে বিদায় করিল। ডাক্তারের কথার পর হইতে তাহার সমস্ত মন নিবিড় বিষাদে ভরিয়া গেল। সারাজীবন সে কাজ করিয়াই গিয়াছে। অনুভব করিবার অবসর পায় নাই। আজ জীবনের সঞ্চিত ব্যথা তাহার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। লোকে অবাক হইয়া দেখিল, সিদ্ধাপ্পা শেঠির মুখে ব্যবসায়ীসুলভ মোলায়েম হাসি আর নাই; তাহার পরিবর্ত্তে নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা।

মানুষ হাসুক আর কাঁদুক, জীবন নিজ প্রবাহে দ্রুত বহিয়া যায়। ডাক্তার দেখাইবার কিছুদিন পরেই সীতা ইহলীলা সংবরণ করিল। সিদ্ধাপ্পা তাহার তৃতীয় স্ত্রীকে সমাধিস্থ করিয়া মৌন চিত্তে, নিস্পন্দ দেহে পরলোকগতা স্ত্রীর শূন্য শয্যার পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

সিদ্ধাপ্পা শিবলিঙ্গাপ্পা শেঠি, যাহার হুণ্ডী টিক্কাপুর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত লোকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করে, যাহার মাল করাচী হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত সরবরাহ হয়, যে জীবনে অর্থের স্তূপের উপর লালিত পালিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সে অঞ্চলের সমস্ত মন্দির, ধর্ম্মপীঠ সমৃদ্ধ—তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করিয়া দিল ক্ষুদ্র মানবচক্ষুর অদৃশ্য কতকগুলি পোকা? হয়ত ও কথাটা একটা ব্যঙ্গ মাত্র, নয়ত ভাগ্য নিয়ন্তা আজীবন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছে!

ধীরে ধীরে সিদ্ধাপ্পার মনে পড়িতে লাগিল, গৌরী, [illegible] সীতা ও তাহাদের কথা। তাহারা একই ভাবে রোগে ভুগিয়াছে, একই ভাবে ধীরে ধীরে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। একই অবস্থায় মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে।...তবে কি ডাক্তার যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক?

সেদিন রাত্রিতে সিদ্ধাপ্পা পানাহার করিল না। বহুকাল পর্য্যন্ত শূন্য গৃহে, শূন্য শয্যার পাশে বসিয়া রহিল।

ভাবিল, যদি সে এসব বিষয় পূর্ব্বে জানিত, আর গৌরীকে লইয়া এ বাড়ীতে থাকিতে না আসিত—তবে হয়ত তাহাকে দ্বিতীয় বারও দারপরিগ্রহ করিতে হইত না! যদি গৌরী মরিবার পরও সে বিষয় জানিত, আর ভাগীরথীর অনুরোধ-মত পুণা বা বোম্বাই গিয়া দোকান খুলিত? যদি সীতাকে লইয়া সহরের বাহিরে মাঠের উকীলের বাড়ীর পাশে একখানা বাংলা বাড়ী করিয়া থাকিত।

বাকির শেষের দিকে সিদ্ধাপ্পার মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল। যত সব অবাস্তর কল্পনা জাগিতে লাগিল। একবার মনে হইল, আচ্ছা, ঐ মাঠের উকীলের বাড়ীর কাছে যদি উকীলের বাড়ীর মতই একটি বাংলা বাড়ী বানিয়া সে বাস করিত, তবে কাহাকে লইয়া বাস করিলে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইত? গৌরীকে, না ভাগীরথীকে, না সীতাকে?... কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হার মানিয়া সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিল।

তার পর তাহার মাথায় আর একটা নূতন কল্পনা জাগিল। সেটা প্রথম এত অদ্ভুত মনে হইল যে, সিদ্ধাপ্পা কতক্ষণ নিজের প্রতি নিজে অবাক হইয়া রহিল। সিদ্ধাপ্পা ভাবিল, ঐরকম বাংলো-বাড়ীতে থাকিলে যদি স্ত্রী নীরোগ জীবন যাপন করে, আর একটা নূতন সংসার পাতিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বাধা কি? আবার বিয়ে করাটা কি অসম্ভব?

তাহা যে অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ আজিকার উৎসব। প্রাচীন সংস্কারের বশে এ উৎসব পৈত্রিক বাড়ীতেই হইতেছে। সে বাড়ীর সামনের ঘরের দরজায় সোনার কলস ঝুলিয়াছে! ভিতরে মেঝের উপর গালিচা, চাদর, তাকিয়া পাতা হইয়াছে; সেখানে এক দিকে অতিথিরা এবং অপর দিকে সিদ্ধাপ্পা বসিয়াছে।

বাহিরের চাতালে চাটাই পড়িয়াছে। তাহার উপর বসিয়া বাদ্যকরের দল মনের আনন্দে বাঁশী সানাই ঢোল বাজাইতেছে। বাদ্যকরের সরদার গঞ্জু চৌহান মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঢোলের উপর চাঁটি মারিতেছে আর তাহার ছেলে লক্ষ্মণ গাল ফুলাইয়া ফুলাইয়া সানাই ফুঁকিতেছে।

উপরের জানালা দিয়া সপ্তদশবর্ষীয়া মৈত্রু তাহার দুই বৎসরের বৈমাত্রেয় ভাই ঈশ্বরা আর তাহার এক বৎসরের কন্যা ললিতা, এ তিনজনের ছয়টি কোমল চক্ষু অনিমেষ ভাবে সে দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছে।

বাঙ্গালায় শিব

—শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

ইংরাজীতে একটি কথা আছে God created man after his own image. এই উক্তিটিতে কতটুক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। আমাদের মনে হয়, এই উক্তিটিকে একটু ঘুরাইয়া বলিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে না। আমরা বলিব "Man created God after his own image." ইহার দৃষ্টান্ত আমরা বহুস্থলে পাইয়াছি, আজ তাহার একটি দিকের আলোচনা করিতেছি।

মানুষ যখন দেবদেবীর কল্পনা করে, তখন নিজের জীবনের মাপকাঠিতে দেবতার সুখদুঃখ নির্ণয় করে। এমন কি দেবতার মূর্ত্তি-কল্পনায়ও সেই কথা খাটে। দ্বিহস্ত-বিশিষ্ট মানবের দ্বিহস্তের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া দশভুজে দশ প্রহরণধারিণী দশভুজার কল্পনা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা এস্থলে পৌরাণিক বা বৈদিক দেবদেবীর আলোচনা করিব না; আমরা বর্ত্তমানে বাঙ্গালার লৌকিক দেবতা শিব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। অবশ্য তাহা শিবের কৌলীন্যের গবেষণা নহে, বাঙ্গালাদেশে সাধারণ লোক-সমাজে শিবের যে সাধারণ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। লৌকিক দেবদেবী, শিব, সত্যপীর, ত্রিনাথ, চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি কুলীন দেবতা নহেন, যদিও ব্রাহ্মণ্য মতে ইঁহাদের অনেকেরই সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তথাপি আমাদের চোখে ইঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ সহজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিবের কৌলীন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের 'রজত-গিরিনিভ' সৌম্যশান্ত নির্ব্বিকার শিব সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্ত্তিতে বাঙ্গালার পল্লীতে, তথা বাঙ্গালার লোক সাহিত্যে বিরাজ করিতেছেন।

বাঙ্গালায় শিব 'ধাঙ্গড় বৃদ্ধ চাষা'। এই শিবকে আবেষ্টন করিয়া খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালায় যে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর বহু সুখ দুঃখের কাহিনী জড়িত। শিবের গানে বাঙ্গালী ঘরের কত অশ্রু জড়িত রহিয়াছে, শিবের গানে বাঙ্গালার মাতাপিতার করুণ ...। যেমন যখন গ্রামে 'ন্যায়রত্নে'র দেব-মন্দিরে সুস্পষ্ট "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং" মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখন পাড়া মণ্ডলের বাড়ীতে ত্রিনাথের সেবায় অথবা গাজনতলায় ভাঙ্গড় শিবের ছড়া-গানে পল্লীর চাষাভূষা নৃত্য করে। আবার বাঙ্গালার কুমারী বৈদিক মন্ত্রে নহে, ঠাকুরমা অথবা দিদিমার বাঁধা-ছড়ায় শিবের কাছে মনোনীত বর মাগিয়া লয়। নয় দশ বছরের মেয়ে যখন মধুর কণ্ঠে "শিব শিলাটিন শিলে বাটন" ছড়ায় গৌরীকে আহ্বান করে, তখন বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনে শিবের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাঙ্গালী নারীর স্বামীর আদর্শ উদাসী শঙ্কর।

শঙ্কর দরিদ্র,—কিন্তু তার গুণই বাঙ্গালার মেয়েকে আকর্ষণ করিয়াছে, শঙ্করের ভিক্ষার ঝুলি বাঙ্গালার মেয়ের অতুল সম্পদ, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নহে। শিব ও উমাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। রূপে গুণে অতুলনীয় রাজার মেয়ে উমা ভিখারী শঙ্করকে বরণ করিয়াছে। বাঙ্গালার লোক-সাহিত্যে উমার গান করুণ বেদনায় আপ্লুত। বাঙ্গালার দুর্গা বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে। বাঙ্গালার সমাজে গৌরীদান—এই রীতিকে আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার শিব হাড়মালা জপেন, সদা বাঘছাল পরেন :—

> হাড়মালা জপেন সদা বাঘছাল পরে।
> কেহ নাহি কাছে যায় ভুজঙ্গের ডরে॥
> ভাঙ্গ খেয়ে চড়ে ষাঁড়ে শ্মশানে বেড়ায়।
> চন্দন বলিয়া চিতাভস্ম মাখে গায়॥
> শ্মশানে মশানে রয় নাহি বাসস্থান।
> দেবতাবর্গেতে তারে না করে সম্মান॥

তাই ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত চাষা ব্রাহ্মণ্য ত্যাগের আদর্শ জানে না, সে তাহার প্রাণের ঠাকুরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। শিবের দারিদ্র্য তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বিকার যোগী শিবকে ভক্ত সংসারী চাষী হইবার উপদেশ দিতেছেন।

> যখন আছেন গোসাঞি হইয়া দিগম্বর।
> ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর॥
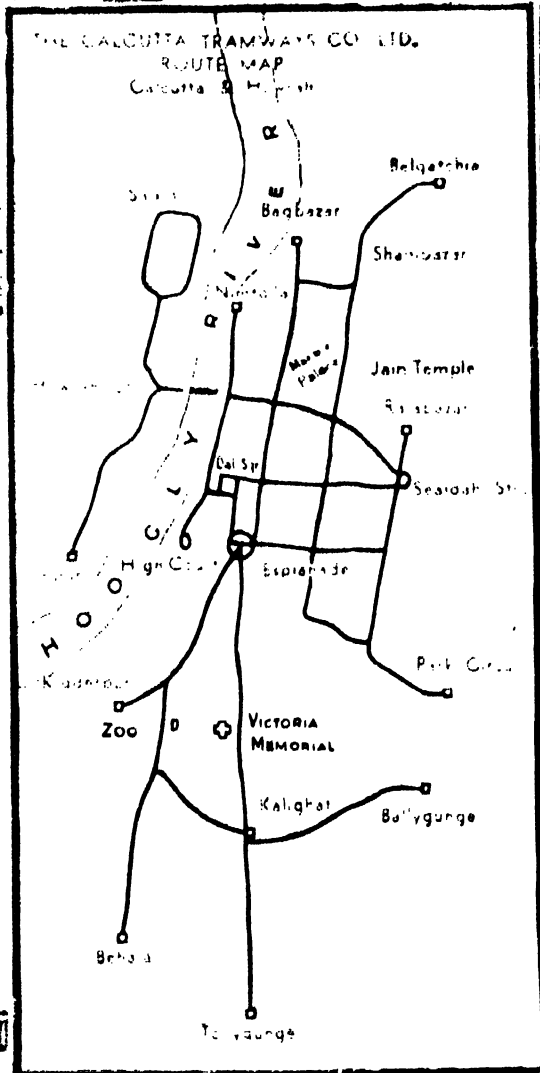
THE CALCUTTA TRAMWAYS CO. LTD.
ROUTE MAP

Belgatchia
Bagbazar
Shambazar
Jain Temple
Esplanade
Zoo
VICTORIA MEMORIAL
Kalighat
Ballygunge
Behala

রজনী পরভাতে ভিক্খার লাগি যাই।
কুথাএ পাই কুথাএ না পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরষ গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত॥
আমার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘের ছড়॥

ভক্তের মিনতিতে প্রভুর আসন টলিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেব বাঙ্গালার মাঠে চাষীরূপে নামিয়াছেন। কি পরিমাণ মনের বলে যে, ভক্ত তাঁর আরাধ্য দেবতাকে কৈলাসের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে বাঙ্গালার মাঠে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যাহা পারেন নাই, সরলপ্রাণ চাষা তাহা করিয়াছে। চাষা তার প্রাণের ঠাকুরের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া বুঝিয়াছে। হিমালয়ের ব্যবধান তাহাকে দূরে রাখিতে পারে নাই। তাই আমরা বৃদ্ধ শিবকে বাঙ্গালার মাঠে দেখিতে পাই—ইহা সুজলা সুফলা বাঙ্গালার মাঠেই সম্ভব।

ক্ষেতে বসি কিষাণে ঈশান দিলা বলে।
চারিদণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল ঠেলে॥
বাদ নাহি বাগ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্দ্ধযামে সারি উঠে শত শত কুড়া॥

বাঙ্গালার মাঠে শত শত বৃদ্ধ শিব যে প্রাণপাত করিয়া সোনা ফলাইয়া থাকেন, ইহা তাহারই চিত্র। কে না জানে চাষীর সে অক্লান্ত সহিষ্ণুতার কথা। তাহারই প্রাণপাতে বাঙ্গালার মাঠে প্রাচীন কাল হইতে কত ধান্যের শ্রী ফুটিয়া উঠে—

হরিশঙ্কর হইল ধান্য হাতিপাঞ্জর চূড়া।
হরিকেলি হাতিনাদ হিঙ্গ হলুদ গুঁড়া॥
কেলেকানু কেলেজীরা কালিয়া কার্ত্তিকা।
কয়া বাচ্চা কালীফুল কপোত কণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুমশালিকা কনকচূড়।
দুধরাজ দুর্গাভোগ পরদেশী ধুস্তুর॥
কৃষ্ণশালি কোঙরভোগ কোঙর পূর্ণিমা।
কল্মীলতা কনকলতা কামোদ গরিমা॥

আমরা শিবের গানে এইরূপ অসংখ্য প্রকার ধান্যের নাম পাই। বিশেষতঃ ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন শস্যের চাষ আবাদের কথা ও নিয়মপ্রণালী অতি সুন্দর ভাবে তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল নিয়মপ্রণালী বর্ত্তমান কৃষিবিজ্ঞানের চেয়ে কোন অংশে অনুন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী চাষী তাহার পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ফল ছড়ায় ও গানে রাখিয়া গিয়াছে। তাহার সন্তানেরা কৃষিবিজ্ঞান-কলেজে কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা করে না।

চাষী তার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য হয়ত সিদ্ধি-গাঁজার নেশা করিয়া থাকে, তাই নিরক্ষর মূর্খ চাষী তার প্রাণের দেবতার শ্রম লাঘব করিবার জন্য তাঁহাকে সিদ্ধিখোর ভাঙ্গড় করিয়াছে। আবার বৃদ্ধ শিবকে 'কুচনী' পাড়ায় লইয়া রসিক করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার কিষাণপল্লীতে এইরূপ চিত্র বিরল নহে—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কাপাস বুনিয়া শিব গেল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এল সাড়া॥

কুচনী-পাড়ার রঙ্গরসের চিত্র আমাদের 'সভ্য' চক্ষুকে পীড়িত করিলেও, বাঙ্গালা পল্লীর ঠাকুরদাদা বা দাদামশায়ের রঙ্গরসের চিত্র মিথ্যা কল্পনা নহে। পল্লীর বৃদ্ধ দাদামশাইকে ঘিরিয়া যে রসের সাগর লোকজনকে রসাল করিয়া তুলে, তাঁহার মূল্য কম নহে। সহরের অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহাকে দীর্ঘ দিন পার্কে অথবা ময়দানে বিরস মনে কাটাইতে হয় না। পাড়ার নাতি-নাতনীদিগকে লইয়া পল্লীবৃদ্ধ জীবনকে সরস করিয়া তুলেন।

কুচিবাসে হেরি যত কুচের রমণী।
বুড়া আইল বলে হেসে ওঠে সব ধনী॥
কোন ধনী কহে ওহে রসিকের চূড়া।
আমাসভে ভুলে কোথা ছিলে ওহে বুড়া।
তোমারে না হেরে বুড়া মনোদুখে মরি।
এত বলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী॥
... ...
এইরূপে শিবসহ হয় আলাপন।
কোন ধনী কহে হরে চামর ব্যজন॥

অগুরু চন্দন কেহ শ্রীঅঙ্গে ছিটায়।
কেহ বা কুসুম লয়ে ফেলে শিবপায়॥
কেহ বা কুসুম লয়ে পরায় কৌতুকে।
মিঠা পান সেজে কেহ যোগায় সম্মুখে॥
গাঁজা ভাঙ্গ কেহ হরে করে সমর্পণ।
কেহ বা শিবের করে চরণ সেবন॥

এই স্থলে আমরা শিবের সংসারের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। এই প্রবন্ধে তাহার দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নহে। সকলেই জানেন, বাঙ্গালাদেশে এক সময়ে নবমবর্ষে কন্যাদান বা গৌরীদান হইত। জাতি বা সমাজরক্ষার জন্য অনেক ধনীও নিজ কন্যাকে অনেক সময়ে অত্যন্ত দরিদ্র বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন। আজিও সর্ব্বত্র তাহার চিহ্ন যে লুপ্ত হইয়াছে মনে হয় না। এই অবস্থায় কন্যাকে অনেক সময়ে অশেষ লাঞ্ছনা বা বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত। অনেক রাজরাণীসদৃশা উমা শিবসদৃশ ভাঙ্গড়ের ঘরে ভিখারিণী সাজিতেন। বাঙ্গালার শিবের গান কল্পনাপ্রসূত নহে; পূর্ব্বোক্ত বাস্তব সত্যের উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালার মা, দিদিমা, তাই মেয়ে বা নাতনীকে শৈশবেই শিবমন্ত্রে সেই আমৃত্যু ধৈর্য্যের শিক্ষা দিতেন। তাই বাঙ্গালার নারীর আদর্শ "সতীরাণী", বাঙ্গালী নারী "পিতা দক্ষে"-র যজ্ঞস্থলে "ভিক্ষুক শিবে"-র নিন্দায় প্রাণ হারায়। তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালার উমা বলিতেছে—

শুন হে জটিলবর পাব বলে ভাল বর
পূজা করি দেব মহেশ্বর।
আমার মনের আশ অন্যেতে নাহি পিয়াস
ত্রিভুবনে আছে যতজন।
অনুগ্রহ করি মোরে শিব যদি বিভা করে
তবে বিভা করিব এখন॥

ভূতনাথ ভিখারী শঙ্করের সঙ্গে উমার বিবাহ হইল। সতীরাণী জানিয়া শুনিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন। পিতা তাহার নগাধিপ রাজেশ্বর গিরিরাজ, উমা স্বামীর কুটীরে আনন্দমনে চলিলেন; বাঙ্গালার মা গিরিরাণী কাঁদিতেছেন—

উমার গমনকথা শুনে শিখরিণী।
ধরাতলে পড়ে কাঁদে যেন উন্মাদিনী॥
কুররী পক্ষিনী প্রায় কাঁদে উমা বলে।
ইল রাণী নয়নের জলে॥

রাণী বলে ওগো উমা কি করি উপায়।
কোন্ প্রাণে তোমা ধনে দিব গো বিদায়॥

বাঙ্গালায় কন্যা-বিদায়ের করুণ দৃশ্যে কাহার না নয়ন সজল হইয়া উঠে? বাঙ্গালা-মায়ের সে আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে আজিও ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালার পূর্ব্ব অংশে আজিও শারদীয়া পূজায় উমার গানে মায়ের বেদন উথলিয়া উঠে। সারা বৎসর মা তাঁর গৌরীর জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায় অবস্থান করেন—

উমা বিনে গিরিরাণী পাগলের প্রায়।
অন্নদা অভাবে অন্নজল নাহি খায়॥

তারপর শরৎ ঋতু আসিল, মেনকা অধীর হইলেন; দুর্গাপূজা ঘরে ঘরে, এই সময়ে তাহার পরাণপুতলী উমা কোথা?

হেনকালে মেনকার যত প্রতিবাসী।
রাণীকে ভৎর্সনা করে সবে কহে আসি॥
কেমনেতে হে গো রাণি আছ প্রাণ ধরে।
সুবর্ণপ্রতিমা উমা সঁপে পাগলেরে॥
তত্বটা না কর তারা আছে গো কেমন।
ধন্য তুমি ওগো রাণি কঠিন তব মন॥
মেয়েরে আনিতে নাম নাই মা মুখেতে।
উদরেতে অন্ন রাণি দেও কি সুখেতে॥

আবার শুনা যায়—

জামাতার কথা তব শুনি বিপরীত।
উমার সঙ্গেতে নাকি নাহি তার পীরিত॥
সিদ্ধি খেয়ে ষাঁড়ে সাপিনী লইয়ে।
শ্মশানে মশানে ফেরে উমারে তেজিয়ে॥

গিরিরাণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর নিকটে ছুটিলেন—

রাজা উমাকে আনিতে চলিলেন। বাঙ্গালীর তিন দিনের দুর্গাপূজার বাঙ্গালা মা ও মেয়ের বেদনার আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ; তাই তাহা এত মধুর। বাঙ্গালার উমা রাজরাজেশ্বরী নহে, ভিখারিণী; তাই শিবের কুটীরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাই—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতি।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিনজনে একুণে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥

তিনজনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ী পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা॥

নানা ব্যঞ্জন উমা পরিবেশন করিতেছেন, বাঙ্গালার মা অন্নপূর্ণা। নিজহাতে স্বামী-পুত্রের পরিচর্য্যা যে কত আনন্দের, তাহা বাঙ্গালার মা-ই জানেন। তাই দেখি ক্লান্ত উমার মাতৃমূর্ত্তি—

চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রণ রণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার॥
দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
হরবধূ অন্নমধু দিতে আরবার।
খসিল কাঁচলি হৈল পয়োধর ভার॥

আবার হরগৌরীর মধুর কোন্দলে বাঙ্গালার কুটীর মুখরিত হইয়া উঠে; রাজার মেয়ে ভিখারীর গৃহিনী উমা দু'গাছি শাঁখার জন্ত কোন্দল করিতেছেন—

চার ছেইলায় মাও হইলাম তোর দেবের বরে।
দয়া করি চারখান শাঁখা না পিন্ধাইস মোরে॥

বাঙ্গালী মেয়ে বৎসরান্তে একবার 'নাইও'-র বা পিতৃগৃহে আসিবার জন্ত কিরূপ ব্যগ্র হয়, তাহাও দেখিতে পাই—

একথা শুনিয়া চণ্ডি আনন্দিত মন।
নাইওর লাগিয়া চণ্ডি করিল গমন॥
কার্ত্তিক গণেশ নিল ডাইনে বাঁয়ে সাজাইয়া।
অগ্নিপাটা সাড়ী নিল পরিধান করিয়া॥

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শিব সম্বন্ধে এইরূপ বহু ছড়া-গান ও কাব্য বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা শিব, আর বাঙ্গালীর দুর্গা—বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। বাঙ্গালীর হিন্দুত্বের বিশেষত্ব তাহাকে হিন্দু জাতির অন্যান্ত শাখা হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব অভ্যুদয়ে যখন উত্তর-ভারত শঙ্খ-ঘণ্টা ও কাংস্য-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বারাণসী ধামে রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার জয়গান উঠিলে অথবা কৈলাসে শিবকে বন্দী করিলেও অন্নপূর্ণা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার বধূর ছদ্মবেশে বাঙ্গালা-কুটীরে কুটীরে অন্ন বিতরণ করিতেছেন; আর দেবাদিদের শিব বাঙ্গালার চাষীর বেশে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে বাঙ্গালার মাঠে নামিয়াছেন। কাশীতে অন্নপূর্ণা অথবা বিশ্বেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের নামের সার্থকতা দিয়াছে বাঙ্গালী।*

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট মহাশয়ের "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" হইতে গৃহীত।

তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি
নিবাও এ দীপ যদি।'—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

—মাইকেল

মিথ্যা

—শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র

[অন্ধকার কক্ষ। জানালা দিয়া পূর্ণিমার চাঁদের আলোর একফালি আসিয়া মেজের উপর পড়িয়াছে। খাটের উপর স্বামী-স্ত্রী নিদ্রিত। স্ত্রী অকস্মাৎ দেখিতে পাইল, অদূরে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল।]

মূর্ত্তি। বীণা! বীণা!

স্ত্রী। (নিরুত্তর)

মূর্ত্তি। বীণা!

স্ত্রী। কে?

মূর্ত্তি। আমি।

স্ত্রী। তুমি কে?

মূর্ত্তি। চিনতে পারছ না? এখন তা পারবে না বটে, নতুন বন্ধুটিকে পেয়ে সব ভুলে গেছ যে।

স্ত্রী। (কথা কহিল না)

মূর্ত্তি। না ভুলতে পারলে কি আবার এমন হয়! অতি নির্ব্বোধ আমি কি না, তাই অনেক আশা করেছিলুম!

স্ত্রী। তুমি কে?

মূর্ত্তি। আমি কে? প্রেমময়ী, জীবনের প্রথম শুভলগ্নে সহযাত্রীরূপে যাকে বরণ করে নিয়েছিলে, আমি সেই হতভাগা। পতিস্মৃতি ছাড়া যার আর অন্য কিছু ধ্যান নেই, সেই সাধ্বী স্ত্রীকে একবার দেখতে এলুম, অপরাধ হয়েছে কি?

স্ত্রী। (বিহ্বল নয়নে চাহিয়া রহিল)

মূর্ত্তি। চিনতে পেরেছ এবার, কি বল?

স্ত্রী। তুমি কেন এলে?

মূর্ত্তি। কেন এলুম? তোমাকে দেখতে এলুম, তোমার সুখের সংসার দেখতে এলুম, আর কেমন নতুন জীবটিকে ফাঁদ পেতে ধরেছ, তাই দেখতে এলুম। বাহাদুরী আছে তোমার, লীলাময়ীরই জাত বটে। আচ্ছা দেখ, আমার মৃত্যু-শয্যায় কি বলেছিলে, মনে পড়ে?

স্ত্রী। (নিরুত্তর)

মূর্ত্তি। পড়ে না? না পড়াই ভাল। বলেছিলে কি জান, বলেছিলে, তুমি চলে গেলে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারব না, আমার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়বে, এমনি আরও কত কি! আমি তখন রহস্য করে বলেছিলুম, আবার বিয়ে ক'রো, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সে কথা শুনে তুমি কি করেছিলে, মনে আছে? দুকানে আঙ্গুল দিয়ে কত অভিমানের কথা বলেছিলে, আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে বলেছিলে, মনে পড়ে? উত্তর দাও।

স্ত্রী। (অস্ফুটস্বরে কি কহিল, বুঝা গেল না)

মূর্ত্তি। আবার জান, তোমার সেই সব কথা শুনে আমার বড় তৃপ্তি হয়েছিল, বেশ রহস্য নয় কি? কিন্তু মিনতি করি, কেন এ করলে, আমায় খুলে বল। আমার এত ভালবাসার প্রতিদান কি এই ভাবেই করতে হয়! কেন করলে একবার বল। (স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া হঠাৎ তীব্র স্বরে) বল।

স্ত্রী। (চমকিয়া উঠিয়া) আমি আশ্রয়—

মূর্ত্তি। আশ্রয়। কচি খুকি আর কি! আশ্রয়! পথের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিলেন! এখনও ধাপ্পাবাজি দিতে ছাড় না দেখছি। বল ঠিক করে, কি বল।

স্ত্রী। (ভয়ার্ত্ত ভাবে ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল)

মূর্ত্তি। ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবটা এখনও যায়নি দেখছি। (হঠাৎ করুণ স্বরে) চোখের জলটা মুছে ফেল বীণা, তোমার চোখে জল দেখলে এখনও আমার বুকটা হু হু করে উঠে। চোখটা মুছে ফেল, (বীণা চোখ মুছিল)। কিন্তু বীণা, যদি এইই করবে জানতে, তা হলে মিথ্যে কথা দিয়ে আমায় ভুলিয়েছিলে কেন? ভালবাসি, ওগো, ভালবাসি! এই ছলনার কি প্রয়োজন ছিল? এবার থেকে যারা ভালবাসার নাম করবে, তাদের হাড় গুঁড়িয়ে দেব। (বীণা শিহরিয়া উঠিল) ভয় পেয়ো না। দেখ, এই কবিগুলো, এরাই যত বদমাইস, শুধু প্রেম, আর প্রেম, এই করেই যত লোকের মাথা খারাপ করে দেয় এই হতচ্ছাড়ার দল। তা যাক্, এই বন্ধুটি হয়েছেন কেমন?

স্ত্রী। ভাল।

মূর্ত্তি। আমার চেয়ে? ঠিক করে বল।

স্ত্রী। (উত্তর দিল না)

মূর্ত্তি। যদি বল আমার চেয়ে ভাল, তা হলে কি হিসেবে ভাল বুঝিয়ে দাও; আর যদি বল, না, তা হলে এই বাঁদরটাকে—আহা ওই ভদ্রলোককে আবার গলায় ঝুলোবার কি দরকার ছিল বল।

স্ত্রী। (সমস্যায় পড়িয়া ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল)

মূর্ত্তি। আচ্ছা থাক্, আর বলতে হবে না। (স্নেহের স্বরে) বীণা, আজকের এই পূর্ণিমা রাত্রি, তোমার মনে পড়ে, এমনি রাত্রে কতদিন তুমি আমায় নিজের হাতে গেঁথে মালা পরিয়েছ, ছাদে বসে কত ভালবাসার কাহিনী শুনিয়েছ, মৃদু হেসে কত আকাশ-কুসুমের কথা বলেছ, ওঃ, সে সব ভাবলে আজ বড় কষ্ট হতে থাকে। এখন আমার দিন আর

কাটতে চায় না বীণা, বড় একলা, বড় নিঃসঙ্গ আমি, প্রাণ যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হাঁপিয়ে উঠছে। বীণা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এই লোকালয় ছেড়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে চল। অতি দূর এক গ্রামের নদীর ধারের একটি কুটীরে আমরা বাস করব, শুধু তুমি আর আমি। যাবে?

বীণা। (অতি মৃদুস্বরে) না—

মূর্ত্তি। না কেন? এত সাধের সংসার ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না, না? যদি সাধের সংসারটা আমি নষ্ট করে দিই, তা হলে কি হয়? জান, তোমার নবীন বন্ধুটির ভবলীলা এক্ষুনি সাঙ্গ করে দিতে পারি এমনি করে। (বলিয়া গলা টিপিবার ভঙ্গীটা দেখাইয়া দিল)

স্ত্রী। (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া) মা গো!

মূর্ত্তি। ভয় পাচ্ছ? ভয় নেই, কিছু করব না। আমি অত হীন নই। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলেও উল্টে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করব না। ভয় নেই। তা ছাড়া এ বেচারীকে আর মেরেই বা লাভ কি, তুমি কালই হয়ত আবার একটাকে ধরে বসবে, কি বল?

স্ত্রী। (নিরুত্তর)

মূর্ত্তি। যাক্, তোমাকে আমি ক্ষমা করলুম। ক্ষমা, বীণা, ক্ষমা। বীণা, বীণা—আ—আ—

স্ত্রী। ও গো—

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ঘর। কি করিবে, কি না করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ কি মনে পড়াতে স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল, তিনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল

ভগবান!

পথিক-বধূ

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধার মেঘময়ী রাতি
ভবন কোণে কোণে　　পবন শনশনে
শয়ন-শিরে নাই বাতি।
নদীর কূলে কূলে　　লহর ফুলে ফুলে
গরজি করে মাতামাতি।

গহন সুনিবিড় নিশা
গোপন চপলার　　চকিত আঁখিধার
পথিক নাহি পায় দিশা।
দাঁড়ায়ে বাতায়নে　　আকুল দু'নয়নে
চাহিয়া আছে মৃগদৃশা।

হায় রে মরমের কথা।
লুকায়ে মনে মনে　　রাখিল সযতনে
ঢাকিয়া যার ব্যাকুলতা—
কেন সে আজি এই　　বরষা নিশীথেই
হানিল নিদারুণ ব্যথা।

প্রবোধ হিয়া নাহি মানে
আজিকে তার বুকে　　বাদল শতমুখে
বেদনা সূচীসম হানে
শীকর, মুখে তার　　মুছায় বারেবার
অগুরু গুরু অভিমানে।

অশনি ডাকে ঘন ঘন
ঝরিছে অনিবার　　মুষল বারিধার
পবন বহে শন-শন।
ঘাটের পদমূলে　　আছাড়ি কূলে কূলে
তটিনী ভাঙে তন-মন।

আসিবে নাকি আজ সেহ!
শয়ন রবে হায়　　শীতল নিরাশায়
নীরব রবে কি রে গেহ!
নয়নে টলমল　　ঝরিবে আঁখিজল
সফল নাহি হবে দেহ?

তালের তরু শিরে শিরে
উঠিছে হাহাকার,　　রোদন খরধার
মেঘের হিয়া চিরে চিরে।
কেয়ার বনে কার　　আকুল কেশভার
ছড়ায় ঘন সুরভি রে।

—আঁধার মেঘময়ী নিশা
পথিক-বধূ ওলো　　কুসুম-ভূষা খোলো
বাদল মিটাবে না তৃষা।
নূপুর নাচিবে না　　কাঁকণ বাজিবে না
হায় গো হায় মৃগদৃশা।

দৈবাৎ

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

বাড়ী বিক্রয়ের যে সামান্য কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল, চাকুরীর সন্ধান করিতে করিতে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। অসিত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এক-জনের নীচের তলার ছোট দুইটী ঘর ভাড়া লইয়া সে থাকে, মাসে দশটী করিয়া টাকা তাহাকে দিতে হয়। নিজেরা দুইজন, দুইটী ছেলেমেয়ে, তাহাদের স্কুলের মাহিনা, দুধ জল-খাবার, তাহা ত বন্ধ করা যায় না। যায় না সত্য, কিন্তু দু'দিন পরে তাহাও যে বন্ধ হইয়া যাইবে, পেটে ত আগে দুমুঠো ভাত পড়া চাই।

নিভৃতে অসিত মনোরমাকে কহিল, "তাই ত মনু,—বাড়ী বিক্রী করে ত আমায় বাঁচিয়ে তুললে, তার পর? এইবার আমরা কি খেয়ে বাঁচব, আর ত কোথাও কিছু নেই! চাকরীর যে বাজার, কোন আশা নেই।"

মনোরমা কহিল, "আমি অত ভাবি না, ওপরে একজন আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।"

অসিত ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "সে বিশ্বাস আর দু'দিন পরে থাকবে না।"

মনোরমা জোর দিয়া কহিল, "খুব থাকবে। এ বিশ্বাস আমি কোনদিন হারাব না।"

অসিত আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত দৃঢ় বিশ্বাস! তাহার হতাশ অন্তরের মধ্যে যেন আশার সঞ্চার হইল।

পরদিন দ্বিগুণ উৎসাহে সে চাকুরীর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ কাটিয়া গেল, চাকুরী ত মিলিলই না, শীঘ্র মিলিবে এমন আশাও সে কোথাও পাইল না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলের সঙ্গেই সে দেখা করিয়াছে। অনেকেই মৌখিক সমবেদনা জানাইয়াছে, এই পর্য্যন্ত। নিজের ধান্ধায় বিব্রত, পরের ভাবনা কে ভাবিতে যায়! তবে একেবারে যে কেহ ভাবে না, এমন কথাও বলা যায় না।

সেদিন রবিবার। তাহার দুই বন্ধু ধীরেশ ও যামিনী তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধীরেশ কহিল, "ওহে অসিত, দোকান চালাতে পারবে?"

অসিত কহিল, "আমার যা অবস্থা, যে কাজ বলবে তাই করতে পারব।"

ধীরেশ কহিল, "একটা মনোহারীর দোকানের সমস্ত ভার তোমায় নিতে হবে। পার ত বল, আমি দোকানটা কিনে ফেলি, খুব সস্তায় বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ হাজার টাকার মাল আছে, দু' হাজার টাকায় পাওয়া যাবে। অত টাকার জিনিস যার, তার হাতে ত বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারি না। আমার নিজের সময় নেই তা ত তুমি জান, দেখা শোনা আমার দ্বারা কিছু হবে না। তা ছাড়া তোমার যাতে চলে যায়, সেই জন্যেই দোকানটা নেওয়া,—আমার আসল টাকাটা মারা না যায়, আর কিছু সুদ পেলেই হল।"

গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অসিত বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরেশ কহিল, "তা হলে তুমি রাজি ত?"

গদগদ কণ্ঠে অসিত কহিল, "তুমি আমাদের অন্নের সংস্থান করে দিচ্ছ—"

বাধা দিয়া ধীরেশ কহিল, "ঐ ত তোমার দোষ। একটা সুবিধা পাওয়া গেল তাই। যাক্, আজই সব লেখাপড়া করে নিতে হবে, অন্যদিন আমার সময় হবে না, তা ছাড়া দেরী হ'লে হাত-ছাড়া হয়ে যেতেও পারে।"

যামিনী কহিল, "দেখ ধীরু, তুমিও আমার বন্ধু, অসিতও আমার বন্ধু। দোকান সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই।"

ধীরেশ কহিল, "যা বলবার বলেই ফেল না, অত ভণিতার দরকার কি।"

যামিনী কহিল, "তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা পাকা লেখাপড়া করে নেওয়া দরকার।"

ধীরেশ কহিল, "খুব ভাল কথা, তুমিই একটা মুসবিদে করে দিও।"

যামিনী কহিল, "তা দেব, কি রকম সর্ত্ত থাকবে, সেটা তোমরা আগে বল।"

ধীরেশ কহিল, "আমার যা সর্ত্ত তা ত আমি আগেই বলে দিয়েছি। মোট কথা, এই দোকান থেকে অসির সংসার চলা চাই, আমার টাকাটারও সুদ বলে কিছু চাই। বাস্ সোজা কথা।"

অসিত কহিল, "না যামিনী, লেখাপড়ার কোন দরকার নেই—যে আমার কষ্ট দূর করবার জন্যে দু'হাজার টাকা বের করে দিচ্ছে, তার সঙ্গে—"

বাধা দিয়া ধীরেশ কহিল, "তোমার বক্তৃতা থামাও অসি। এখনই গিয়ে আগে ত দোকানটা কিনে নি, তারপর যামিনী যে ভাবে বলবে, সেই রকম একটা লেখাপড়া করে নিলে হবে। আমি এখন চললুম,—তুমি তৈরী হয়ে থাক অসি, দুই একদিনের মধ্যেই কাজে লাগতে হবে।"

উভয়ে চলিয়া গেল। মনোরমা কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি ত ভেবেই শয্যা নিচ্ছলে, কেমন, একটা কিনারা হ'ল ত?"

অসিত কহিল, "আশা ত হচ্ছে, কিন্তু দোকান চালাতে পারব ত? কখনও ত এ কাজ করি নি।"

মনোরমা কহিল, "কর নি তাতে কি হয়েছে, ভারি ত কাজ, শিখে নিতে কতক্ষণ, আমাকে ভার দিলে আমিও পারি।"

অসিত হাসিয়া কহিল, "তা তুমি পার—এ কথা আমি স্বীকার করি"; একটু থামিয়া গম্ভীর হইয়া আবার কহিল, "ভয় হয় যদি লোকসান হয়ে যায়। আমার উপর বিশ্বাস করে অতগুলো টাকা ধীরু বের করছে, তার না ক্ষতি হয়।"

মনোরমা কহিল, "লোকসানই বা হতে যাবে কেন, ও রকম কথা মনেই আনতে নেই।"

অসিত কহিল, "না, ও সব কথা আর ভাবব না, কাজে ত লেগে পড়ি, তারপর যা হয় হবে।"

যামিনীর একান্ত চেষ্টায় পাকা লেখাপড়া হইল বটে, কিন্তু ধীরেশ মুখে যে সর্ত্তের কথা বলিয়াছিল, লেখাপড়া করিবার সময় তাহা অন্যরূপ ধারণ করিল। মোটামুটি এইরূপ দাঁড়াইল—দোকানের সমস্ত সত্ত্ব ধীরেশেরই রহিল, অসিত পারিশ্রমিক স্বরূপ দৈনিক এক টাকা করিয়া পাইবে এবং বৎসরের শেষে যা লাভ হইবে, তাহারও অর্দ্ধেক সে পাইবে। তবে যামিনী আর একটা সর্ত্ত লিখিয়া লইল, তাহাতে ধীরেশও কোন আপত্তি করিল না বরং আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই বলিল, 'অসিতের জন্যেই দোকান নেওয়া, সে ত আমি আগেই বলেছি—আমার ত আর দোকান থেকে সংসার চালাতে হবে না।'

সর্ত্তটী এই,—তিন বৎসরের মধ্যে ধীরেশ ইচ্ছা করিলে অসিতকে দোকান হইতে সরাইতে বা লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তারপর যদি কোন দিন উভয়ের মনোমালিন্য হয় এবং অসিত নগদ দুই হাজার টাকা এবং লাভের অংশ যাহা বাকি থাকিবে,—তাহা ধীরেশকে দিতে পারে, তাহা হইলে—দোকান অসিতেরই হইয়া যাইবে।

লেখাপড়ার সময় অসিত কোন মতামতই প্রকাশ করিল না।

দিন পাঁচেক পরে অসিত দোকান খুলিয়া বসিল, প্রথম প্রথম তাহার খুবই অসুবিধা হইতে লাগিল। একটা জিনিষের দাম বলিতে অন্য জিনিষের দাম বলিয়া ফেলে, কোন একটা জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে,—হয় ত খুঁজিয়াই পায় না, খরিদ্দার ফিরিয়া যায়। ধীরেশ ও যামিনী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানে আসিয়া বসে, অসিত তাহার দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করিলে, তাহাকে উৎসাহ দেয়,—'আরে প্রথম প্রথম ও রকম হয়, দু' দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।' হইলও তাহাই—এক মাস যাইতে না যাইতেই অসিত নিজের দোষ ত্রুটি সব সংশোধন করিয়া লইল। তখন আর বিলম্বের জন্য কিম্বা কোন জিনিষের অভাবে খরিদ্দারকে ফিরিয়া যাইতে হয় না। বাজার অপেক্ষা কোন জিনিষের মূল্য এক পয়সা বেশী কাহাকে দিতে হয় না। বরং দুই এক পয়সা কমেতেই সকলে জিনিষ পায়। ক্রমে তাহার দোকানে খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসিতের সে কি উৎসাহ! সে যেন আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতে তাহার অধিক রাত্রি হইত। মনোরমা হাসিয়া বলিত, "কোন্ দিন আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা না একেবারে ত্যাগ করে বস।"

অসিত বলিত, "রোজই মনে করি সকাল সকাল ফিরব, কিন্তু কিছুতেই কাজ শেষ করে উঠতে পারি না। না, কাজ ফেলে রেখেও সকাল সকাল ফিরব।"

মনোরমা তেমনি ভাবে হাসিয়া বলিত, "তা যা ফিরবে, তা খুব জানি গো,—কাজ দিন দিন বাড়বে বৈ ত কমবে না।" তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিত,—"কিন্তু অত পরিশ্রম ত তোমার শরীরে সইবে না—খানিকটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। দুপুর বেলা ত নাকে মুখে ভাত গুঁজে ছোট,—দু' মিনিট বসবার সময় পাও না, তা করলে চলবে না।"

অসিত কহিত, "দোকানটা প্রায় গুছিয়ে এনেছি,—আর দুটো দিন, তারপর ভাত মুখে দিয়ে আর ছুটতে হবে না, জিরোবার সময় পাব। দোকানের উপর এমন মায়া পড়ে গেছে যে কি বলব—নাওয়া-খাওয়ার কথা যেন মনেই থাকে না। চাকরীর চেয়ে দেখছি এতে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়—অথচ এর পেছনে ক বেশী খাটতে হয়, তবে সে খাটনি যেন গায়েই লাগে না।"

মনোরমা বলিত, "আমায় আর অত বোঝাতে হবে না, মোট কথা, অত খাটা তোমার চলবে না।"

শুধু মুখে বলিয়া মনোরমা ক্ষান্ত হইল না, সপ্তাহ খানিক পরে মধ্যাহ্ন-আহারের পর সে স্বামীকে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম লইতে এবং রাত্রে এগারটার মধ্যে বাড়ী ফিরিতে বাধ্য করিল।

মাস তিনেক সে দৈনিক এক টাকা করিয়াই লইতেছিল, কিন্তু দশ টাকা বাড়ী-ভাড়া দিয়া বাকি কুড়ি টাকায় সংসার চালান কষ্টকর হইত, তাই ধীরেশকে বলিয়া সে পারিশ্রমিক মাসে আরও দশ টাকা বাড়াইয়া লইল।

ধীরেশকে বলিতে সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন হে, তোমারই লাভের ভাগ থেকে তুমি নেবে, তাতে বলবার কি আছে?"

অসিত বলিয়াছিল, "তুমি দোকানের মালিক, তোমাকে না বলে নেওয়াটা অন্যায়।"

ধীরেশ বলিয়াছিল, "কথা খুব শিখেছ বটে।"

দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ধীরেশ ছয় মাস অন্তর মাসিক এক টাকা হারে, সুদের টাকাটা নিয়মিত ভাবে দোকান হইতে লইয়াছে। লাভের অংশও ফেলিয়া রাখে নাই।

এমন সময় ধীরেশ একদিন অসিতকে কহিল, "দেখ অসিত দোকানে একজন লোক রাখা দরকার। তোমার খুব বেশী পরিশ্রম হচ্ছে।"

অসিত কহিল, "আমিও তোমায় সেই কথা বলব মনে করেছিলুম। একজন বিশ্বাসী লোকের সন্ধান করতে হবে।"

ধীরেশ কহিল, "আমার এক সম্বন্ধী বসে আছে,—তাকে বলে কয়ে যদি দোকানের কাজে লাগাতে পারি দেখি, তার ত খাওয়া-পরার ভাবনা নেই—বাড়ীতে সে সংস্থান তাদের ভাল রকমই আছে, মাথার উপর তার বাপ রয়েছেন। মাস দুই পরে তাকে হাত-খরচ বলে কিছু দিলেই হবে।"

অসিত আগ্রহভরেই কহিল, "বেশ ত, দেখ না যদি তাকে কাজে লাগাতে পার,—আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।"

ধীরেশ কহিল, "দেখি চেষ্টা করে, যদি রাজি না হয়, তখন অন্য লোকের চেষ্টা দেখলেই হবে।"

শুনিয়া যামিনী কহিল, "কাজটা ভাল হচ্ছে না অসি।"

অসিত কহিল, "কেন বল দিকি? এর ভিতর মন্দটা কি দেখলে?"

যামিনী কহিল, "প্রথম কথা,—সে কোন দোষ করলে তুমি তাকে কিছু বলতে পারবে না, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেই হয় ত দু'দিন পরে দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসবে, তোমাকেই তার তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। এত পরিশ্রম করে দোকানটাকে তুমি দাঁড় করিয়েছ, তার হাতে পড়ে হয় ত দোকান আবার পড়তি হয়ে যাবে, সে কথা কি একবার ভেবেছ?"

তাই ত, এ কথাটা ত সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। এমন যে হইতে পারে, সে সংশয় ত তাহার মনে জাগে নাই। কিন্তু উপায়ই বা কি? ধীরেশ যদি তাহাকে দোকানে আনিয়া বসায়, সে কি করিতে পারে? কিন্তু সত্যই যদি তাহার হাতে-গড়া দোকান নষ্ট হইয়া যায়? প্রকাশ্যে সে যামিনীকে এই সব কথাই বলিল।

যামিনী কহিল, "মুস্কিলের কথা বটে! ধীরুকে ত আর

এ সব কথা বলা চলে না, অথচ কি যে করা যায়, তাও ত ভেবে পাচ্ছি না।"

অসিত কহিল, "করবার আর কি আছে। তবে সে যে খারাপ লোকই হবে, এমন কোন কথা নেই। মিলে-মিশে কাজ করলে সুবিধেও হ'তে পারে।"

যামিনী কহিল, "হয় ত হ'তে পারে। তবে তোমাকে খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে।"

ইহারই দিন দুই পরে ধীরেশ তাহার শ্যালক নিরাপদকে আনিয়া দোকানে বসাইয়া দিল। অসিতের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল, "অসি যা বলবে, তাই করবে, বুঝলে? তার কথা মত চলবে।"

নিরাপদ কহিল, "হাঁ। তাই করব।"

ধীরেশ কহিল, "নিয়মমত আসবে, কাজ কামাই করবে না।" তারপর অসিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি একে শিখিয়ে পড়িয়ে নিও ভাই।"

অসিত কহিল, "সে তোমায় বলতে হবে না

মাসখানেক পরে অসিত যামিনীকে বলিল, "বড় মুস্কিল হয়েছে,—সাবানটা, এসেন্সটা প্রায়ই হারাচ্ছে। কি করি বল দিকি?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যামিনী কহিল, "একটা গোলমাল যে হবে আমি তা আঁচ করে নিয়েছিলুম, তবে যে এই রকম চুরি করবে তা আমি ভাবতে পারি নি। দেখ আর দু'চার দিন, তারপর ওকে সরাবার চেষ্টা করতে হবে। ও রকম লোককে দোকানে রাখা চলবে না। তবিল খুব সাবধান, টাকা-পয়সার বাক্সে ওকে হাত দিতে দিও না।"

অসিত কহিল, "তা দিই নি, কিন্তু ও যা বিক্রী করে সব পয়সা জমা দেয় বলে ত মনে হয় না,—তবে এখনও ঠিক ধরতে পারি নি।"

যামিনী কহিল, "যার ও রকম অভ্যেস সে পয়সাও ঠিক সরাচ্ছে। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চ'ল ভাই, আর কি বলব! তবে যত শীগ্‌গীর হ'ক ওকে সরাতেই হবে। দেখি ভেবে কি উপায় করা যায়।"

আরও কিছুদিন গেল। দোকানে চুরির মাত্রা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। একদিন অসিতের সতর্ক দৃষ্টি নিরাপদ এড়াইতে পারিল না, সে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গেল। চোদ্দ আনায় এক শিশি এসেন্স বিক্রয় করিয়া পয়সাটা সে পকেটে ফেলিবামাত্র অসিত তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "এসেন্সের পয়সাগুলো পকেটে রাখলে কেন?"

নিরাপদ প্রথমটা কেমন থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আপনি কি বলতে চান, আমি চুরি করেছি?"

স্পষ্ট উত্তর দিতে অসিতের মুখে বাধিল, সে ঘুরাইয়া কহিল, "পকেটে রাখলে তাই বলছি।"

নিরাপদ রুখিয়া কহিল, "খবরদার, আমায় আপনি চোর বলবেন না।"

অসিত আর কি বলিবে! বাধ্য হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। সে যে কাহার জোরে তাহাকে চোখ রাঙাইল, তাহা ত সে বোঝে। রাত্রে যামিনীর সহিত দেখা হইলে তাহাকে আজিকার ব্যাপারটি জানাইয়া কহিল, "যখন চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, তখন সে ত সামনাসামনি চুরি করবে।"

যামিনী কহিল, "আর চুপ করে থাকা চলবে না, এখনই ধীরুর কাছে যাচ্ছি, গিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি সব বলব। দোকানে ওকে রাখা হবে না তাও জানিয়ে দেব।"

অসিত কহিল, "যা ভাল বোঝ কর, যে ভাবে পার ওকে দোকান থেকে সরাও ভাই।"

যামিনী তখনই গিয়া ধীরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ধীরেশ কহিল, "এস হে যামিনী, এত রাত্রে যে—কি খবর?"

প্রথমেই যামিনী কিন্তু কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, কহিল, "বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি—দেখ, নিরাপদকে তুমি অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দাও, দোকানের কাজ তার দ্বারা হবে না।"

ধীরেশ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "অসি পাঠিয়েছে বুঝি তোমায় ঐ কথা বলতে?"

ধীরেশের কানে কি চুরির কথা উঠিয়াছে? একটু ভাবিয়া যামিনী কহিল, "না অসি পাঠায় নি, আমি নিজেই এসেছি।"

ধীরু কহিল, "তা বেশ করেছ, কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে যাওয়াই ভাল। নিরুর ওপর চুরির অপবাদ দিতে এসেছ এই ত?"

ধীরু তাহা হইলে চুরির কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার কথা বলার ভঙ্গী যামিনীর ভাল লাগিল না। সে কহিল, "ক'দিন থেকে দোকানে এটা-ওটা চুরি যাচ্ছিল—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া ধীরেশ অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "আজ নগদ পয়সা চুরি গেছে কেমন? আর নিরু সেই পয়সা চুরি করেছে? কিন্তু কার নামে চুরির অপবাদ দিতে এসেছ তা জান?"

যামিনী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কহিল, "জানি সে তোমার সম্বন্ধী।"

ধীরেশ জোর দিয়া কহিল, "ঐটুকু পরিচয় ওর যথেষ্ট নয়, সে কত বড় ঘরের ছেলে তা জান? চুরি করার প্রবৃত্তি তার হ'তে পারে না। তার বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে সে খবর কদিন থেকে আমি পাচ্ছি।"

গভীর বিস্ময়ে যামিনী কহিল, "এসব কি বলছ ধীরু?"

ধীরেশ শ্লেষ দিয়া কহিল, "ঠিকই বলছি যামিনী, এতটুকু বেঠিক বলিনি। চুরির নালিশ যে আমার কাছে আসবে তা আমি আগে থেকেই জানি। শুধু তাই নয়, কেন আসবে তাও জানি। দোকানের ভিতরের খবর কেউ জানে অসির এটা ইচ্ছে নয়, নিরাপদ দোকানে থাকলে অসির নানা রকম অসুবিধে—তাকে সরান দরকার,—দাও চুরির অপবাদ চাপিয়ে।"

যামিনী মনে মনে বলিল, কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে! নিরাপদ এত বড় শয়তান। ধীরেশের নিকট প্রতিকারের ত কোন আশাই নাই। তাহার কোন কথাই ত সে বিশ্বাস করিবে না।

ধীরেশ কহিল, "দোকানে কি হয় না হয় তুমিও কোন খবর রাখ না, আমিও রাখি না। অসি যা তোমাকে বুঝিয়েছে তুমি তাই বুঝেছ। ভিতরের ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর নি। এখন বুঝলে ত?"

যামিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, "না, কেন না অসিকে আমি তোমার চেয়ে ভাল করেই চিনি, কোনরকম নীচ কাজ করা তার স্বভাবের বাইরে। যা সত্য তাই সে বলেছে।"

ধীরেশ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সে কহিল, "তুমি ত ওকথা বলবেই। কেন না যতকিছু গোলমালের মূল হচ্ছ তুমি।"

যামিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আমি!"

ধীরেশ কহিল, "হ্যাঁ। তুমিই। তিন বছর পরে দু'হাজার টাকা দিলে দোকান অসির হয়ে যাবে এ সর্ত্ত কে করিয়ে নিয়েছিল? সে তুমি। তখন আমি অত বুঝি নি। অসি খেতে পাচ্ছিল না, তাই আমি ঘরের টাকা বের করে তার সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, বড় দোষ আমার হয়েছিল! আমিই এখন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। যাক যা হবার হয়েছে। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, না হলে কালই আমি তোমার কাছে যেতুম। দেখ যখন সর্ত্ত করিয়ে নিয়েছ তখন উপায় নেই—দোকানটি অসিই নিয়ে নিক, আমার দু'হাজার টাকা আমায় ফেলে দিক, লাভের টাকার যদি কিছু পাওনা হয় তাও দিয়ে দিক। হ্যাঁ আর এক কথা, বেশী দেরী আমি করতে পারব না, সাত দিনের ভিতর টাকাটা আমায় দিতে হবে, যদি না দেয়, দোকানের সঙ্গে অসির কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাও তাকে বলে দিও।"

যামিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে স্পষ্ট বুঝিল, এই মতলব করিয়াই ধীরেশ তাহার শ্যালককে দোকানে পাঠাইয়াছে। দোকান যে খুব ভাল চলিতেছে সে খবর সে পাইয়াছে, মালপত্রও যে যথেষ্ট আছে তাহাও সে জানিয়াছে এবং ইহাও সে বেশ জানে, এত অল্প সময়ের মধ্যে অসিতের পক্ষে দুহাজার টাকা সংগ্রহ করা সহজ নহে, বরং অসম্ভব। তাহার নিজের অবস্থাও ধীরেশের অবিদিত নাই।

ধীরেশ কহিল, "অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার যা বলবার তা তোমায় বলে দিলুম, তুমি অসিতকে জানিও।"

"হ্যাঁ জানাব।" এই বলিয়া যামিনী সে স্থান ত্যাগ করিল। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে চলিতে লাগিল, ঐ রকম সর্ত্ত করিয়ে নিয়েছিলুম, তাই সাতদিনের সময় দিয়েছে, না হলে সঙ্গে সঙ্গে অসিকে বিদেয় করে দিত। লোভ এমনই জিনিষ,—মানুষকে অমানুষ করে তোলে, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন জ্ঞানই মানুষের থাকে না। এখন টাকার কি হবে? লাভের অংশ ত ধীরু বাকি ফেলে রাখে নি —দু'হাজার টাকা দিলেই হবে—দেখি অসিকে বলে, যদি সে জোগাড় করতে পারে। তার শালা শুনেছি বেশ অবস্থাপন্ন, সে হয় ত তাকে সাহায্য করতে পারে। দোকান হাত-ছাড়া

হয়ে গেলে সে বেচারা ভারি কষ্টে পড়ে যাবে। সংসার চলাই দায় হবে।

পরদিন প্রত্যুষেই যামিনী অসিতের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন অসিত দোকানে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

অসিত কহিল, "আজ খুব ভোরে উঠেছ দেখছি। চল গল্প করতে করতে এগুনো যাক।"

যামিনী গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। দোকানে পরে গেলেই চলবে।"

অসিত ভীত হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি হে! তা হলে বসি।"

উভয়ে বসিল। যামিনী তাহাকে সবিস্তারে সমস্ত কথা বলিল। অসিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাকে দোকান ছাড়িতে হইবে? দু'হাজার টাকা সে কোথায় পাইবে! আবার দুটি অন্নের চেষ্টায় তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু দোকানের মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে? কি করিয়া দোকানের উন্নতি করিবে, ইহাই যে তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল। খাইতে বসিয়া সে দোকানের কথা ভাবিত, পথ চলিতে চলিতে সে দোকানের কথা ভাবিত, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে দোকানের স্বপ্ন দেখিত।

হতাশভাবে অসিত কহিল, "কি হবে যামিনী?" বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কথাগুলো যেন বাহির হইয়া আসিল।

যামিনী কহিল, "টাকাটা জোগাড় করতে হবে।"

অসিত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "অত টাকা কে আমায় দেবে?"

যামিনী কহিল, "তোমার শালা দিতে পারেন না?"

অসিত কহিল, "অনায়াসেই পারে, কিন্তু দেবে কেন?"

যামিনী কহিল, "দেবেন না কেন, তোমার স্ত্রীকে আজই সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

অসিত কহিল, "যেতে বলব। দেখ ভাই, আমি ত কোন অপরাধ করি নি, আমায় তাড়াচ্ছে কেন?"

যামিনী কহিল "অপরাধ কর নি! তার শালাকে চুরি করতে দেখেছ, অপরাধ করনি! বল কি! তার শালা কত বড় ঘরের ছেলে তা জান, সে করবে চুরি!"

অসিত আর কি বলিবে, চুপ করিয়া থাকিল।

যামিনী কহিল, "ভেবে আর কি করবে, চেষ্টা করে দেখ। দেরী হ'য়ে গেল, দোকান খোল গে। সাত দিন দোকান চালাও ত।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অসিত কহিল, "হাঁ যাই, আজ যেন পা চলছে না। ভিতরে একবার খবরটা দিয়ে আসি।"

ভিতরে যাইতে মনোরমা কহিল, "সব শুনেছি, তুমি অত মুসড়ে পড়লে কেন? যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই।"

অসিত কহিল, "ব্যবস্থা আর হবে কোত্থেকে, এক যদি তোমার দাদা ধার বলে টাকাটা দেয়।"

মনোরমা কহিল, "সে যা হয় হবে, তুমি এখন দোকানে যাও ত, এমনই দেরী হয়ে গেছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অসিত কহিল, "হাঁ যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে কোন রকম উদ্বেগ প্রকাশ না করিলেও, ভিতরে ভিতরে মনোরমা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার কাছে টাকা পাইবার আশা নাই, সে তাহা বেশ জানে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, শুধু হাতে অতগুলো টাকা ধার দিবে। কিন্তু ভাবিয়াও ত কোন লাভ নাই! উপরে যিনি আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই বিশ্বাসের জোরেই কোন অবস্থাতেই সে বিচলিত হয় নাই, আজই বা সে কেন হইবে? মন হইতে সমস্ত চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া সে সংসারের কাজে মনঃসংযোগ করিল।

দরজা খুলিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া অসিত কিছুক্ষণ মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নানাবিধ দ্রব্য থরে থরে সাজান রহিয়াছে, সেদিকে আজ যেন সে চাহিতে পারিতেছিল না। এ সবই তাহার নিজের হাতে সাজান। কত যত্ন করিয়া সে সাজাইয়াছে। আর কটা দিন! সাত দিন পরে এ দোকান ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার আসিয়া কহিল, "শীগ্‌গির এক পয়সা নস্যি দিন ত! গাড়ীর সময় হয়ে এসেছে।"

অসিত তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া নস্য দিতে গেল। তাহার যে হাত এতদিন বাঁধা যন্ত্রের মত কাজ করিত

আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। নস্যের বদলে দুইটী নিব খরিদ্দারের হাতে ফেলিয়া দিল।

খরিদ্দার বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি হয়েছে আপনার? চাইলুম নস্যি, দিলেন নিব। রইল আপনার জিনিস, আমি চললুম, গাড়ী ফেল করব নাকি।"

সে চলিয়া গেল, অসিত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! তাই ত এ রকম ভুল ত তাহার কোন দিন হয় না। না না, তাহাকে শক্ত হইতে হইবে, এত বিচলিত হইলে ত চলিবে না। এখনও ত সাত দিন সময় আছে। প্রতিদিনের মত সে ঝাড়ন লইয়া এটা-ওটার ধুলা ঝাড়িতে লাগিল। জিনিষ গুলার উপর তাহার কত মায়া।

আজ আর নিরাপদ আসিল না, সে একাই খরিদ্দারকে জিনিষ সরবরাহ করিতে লাগিল। চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহার মাঝে মাঝে ভুল হইতে লাগিল। যে জিনিসটার চোদ্দ পয়সা দাম, সেটার চারে আনা বলিয়া ফেলিয়া খরিদ্দাদের কাছে কথা শুনিল। আবার ছয় আনা দামের জিনিষ খরিদ্দারকে চারি আনায় দিয়া দুই আনা লোকসান করিল। এমনই ভাবে তাহার কেনাবেচা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর যামিনী যথানিয়মে দোকানে গিয়া দেখিল দোকান বন্ধ। সে তাড়াতাড়ি অসিতের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া অসিতকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল।

যামিনী কহিল,"কি হে আজ থেকেই দোকান ছেড়ে দিলে না কি?"

অসিতের দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "ধীরু নিজে এসে দোকান বন্ধ করে দিয়ে গেছে।"

যামিনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ওঃ এত বড় বদমায়েস। কিন্তু দোকান ত এখনও তার হয় নি। টাকা না দিতে পারলে তবে ত তার দোকান হবে।"

অসিত কহিল, "সাতদিন দোকান বন্ধ থাকবে, আমি যদি টাকা দিতে পারি, তবেই দোকান আমি খুলতে পারব, না হ'লে এই পর্যান্ত।"

যামিনী কহিল, "হুঁ, কি করব, আমি গরীব মানুষ, এমন কিছু নেই যে বেচে কিনে দু'হাজার টাকা জোগাড় করতে পারি, তা হ'লে একবার দেখে নিতুম। হাঁ৷ তোমার শালার কাছে পাঠিয়েছ?"

অসিত কহিল, "অসময়ে বাড়ী ফিরে আসতেই ব্যাপার কি শুনে, তখনই সে তার দাদার কাছে গেছে।"

যামিনী কহিল, "যাক, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একবার দোকানটা তোমার হাতে আসুক, তারপর ধীরুকে দেখব।"

অসিত কহিল, "ধীরু উকিলের চিঠি দিয়েছে। তাতে ঐ কথাই লেখা আছে। সাতদিনের ভিতর উকিলের বাড়ী গিয়ে টাকা পৌছে দিয়ে আসতে হবে। দোকানটার উপর এত মায়া পড়েছিল। আমার অন্নের সংস্থানও বন্ধ হয়ে গেল।"

যামিনী কহিল, "কি ধড়িবাজ, কি পাষণ্ড। তখন যে কি করে' ঐ রকম সর্ত্তে রাজি হ'ল তাই ভাবছি। সে ঠিক ভেবেছিল, অসি টাকা কোথায় পাবে, দিতে পারবে না, দোকান ওরই থাকবে, যখন ইচ্ছে হয় তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারবে। কোন রকমে টাকাটা হাতে এসে পড়ে!"

হতাশভাবে অসিত কহিল, "সে আশা খুব কম, আমার মত গরীব দুঃখীকে কোন্ ভরসায় লোকে টাকা দেবে, আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। কি করে সংসার চলবে, এখন তাই খালি ভাবছি।"

যামিনী কহিল, "একেবারে হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? আমিও চেষ্টা দেখি। তা হ'লে এখন চললুম, তুমি অত ভেব না।"

* * *

একটু পরে মনোরমা দাদার গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিল। অসিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

মনোরমা একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া শুধু কহিল, "দাদা বললেন, পরের টাকা নিয়ে দোকান করতে যাওয়া বোকামি।—ও সব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টা করুক।"

তাহার দাদা বৌদিদি যে সব মর্ম্মান্তিক টিপ্পনি কাটিয়াছেন, তাহার উল্লেখ মাত্র করিল না।

যদিও অসিত জানিত, টাকা দিবার লোক তাহার শ্যালক নহেন, তবুও সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই, ছোট বোনের কাকুতি-মিনতিতে যদি দাদার মন ভেজে! তাই মনোরমার কথায় সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মনোরমা শিহরিয়া উঠিল। আপাততঃ কথাটা তাহাকে না বলিলেই হইত। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল, "পারুলের কথা তোমার মনে আছে?"

অসিত ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, "কে পারুল?"

মনোরমা কহিল, "সেই যে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকত, খুব গরীব। তুমি যখনই যেতে—"

অসিত কহিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। মেয়েটাকে আমার বেশ লাগত, কথা কি মিষ্টি।"

মনোরমা কহিল, "আজ দাদার ওখানে তার সঙ্গে দেখা হ'ল। কি সুন্দর চেহারা হয়েছে, গায়ে এক গা গয়না,—তার স্বামী পাটনার একজন বড় উকিল হয়েছে, অনেক টাকা রোজগার করে। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সে-ই আমায় দেরী করিয়ে দিলে, না হ'লে অনেক আগে চলে আসতুম। পারুলকে দেখে মনে হ'ল,—মানুষের অবস্থা কখন্ কি দাঁড়ায় কে বলতে পারে! আজ আমরা কষ্টে পড়েছি, দু'দিন পরে এ কষ্ট থাকবে না।"

অসিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, সে বুঝিল, তাহাকে ভুলাইবার জন্য মনোরমা পারুলের অবতারণা করিয়াছে।

মনোরমা কহিল, "আসল কথাই তোমায় এখনও বলা হয় নি,—দাদা পারুলকে তোমার চাকরীর কথা বলে দিয়েছেন, সেখানে তার স্বামীর খুব খাতির। পারুল আমায় জিজ্ঞেস করলে, মনুদিদি পশ্চিমে যেতে পারবে ত? আমি বললুম, আমাদের পশ্চিমই বা কি, আর কলকাতাই বা কি! পারুল হেসে বললে, জামাই বাবু হচ্ছেন কারবারী লোক, তিনি কি পরের দাসত্ব করতে পারবেন? আমি বললুম, দুটি ভাতের জন্য তিনি সব করতে পারবেন। পারুল তেমনই ভাবে হেসে বল্লে, মনুদির সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই।"

অসিত কহিল, "কি বুঝলে—চাকরী পাওয়ার আশা আছে? দোকানের আশা আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি—যার চাল নেই চুলো নেই, তাকে কেউ টাকা দেয়? —তা দু পাঁচ টাকা নয়, দু' হাজার টাকা!"

মনোরমা কহিল, "চাকরী একটা তোমার হবেই। আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে থাকব না, এ বিশ্বাস আমার আছে। এই ত দোকান থেকে তিন বছর ত চলল। না হয় চাকরী করেই চলবে।"

অসিত কহিল, "সে হয় ত চলবে,—কিন্তু আমার নিজের হাতে গড়া দোকান থেকে আমি এমনি ভাবে বঞ্চিত হলুম। তুমি ত জান কি পরিশ্রমই আমার করতে হয়েছে।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর আবার ভারী হইয়া উঠিল।

"অনেক রাত হয়ে গেছে, রান্না চড়াতে হবে।" এই বলিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিল।

* * *

দেখিতে দেখিতে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অসিত ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কত কথাই ভাবে। তাহার কেবলই মনে হয়, দোকানের সাজান জিনিসগুলির গায়ে এত দিন কত ধুলা পড়িয়াছে, কত জিনিসের গায়ে দাগ ধরিয়া যাইতেছে, সেগুলো আর খরিদ্দারে লইবে না, লোকসান হইয়া যাইবে। তখনই আবার মনে পড়ে, দোকানের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? সে ত বিতাড়িত হইয়াছে। দোকানের কথা সে আর ভাবিবে না।

যামিনী প্রত্যহ দুই বেলা আসিয়া তাহার খোঁজ লইয়া যায়। দোকানের নাম উল্লেখও সে করে না। সেও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, টাকা সংগ্রহ হইবার কোন আশাই নাই।

কিন্তু ছয় দিনের দিন এক অঘটন ঘটিল। অসিত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, হঠাৎ বাড়ীর সামনে মোটর থামার শব্দে সেইদিকে চাহিতেই দেখিল, একটী যুবতী মোটর হইতে নামিয়া সেই ঘরের দিকে আসিতেছে। অসিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধুলো লইয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ লোক যা' হক আপনি জামাইবাবু, আমায় চিনতেই পারলেন না?"

অনেক দিন দেখে নাই। অসিত সত্যই চিনিতে পারিল না।

যুবতী হাসিয়া কহিল, "আমি পারুল, একেবারে চিনতে পারছেন ?"

অসিত অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "অনেক দিন দেখিনি।"

পারুল কহিল, "হাঁ, অনেক বদলে গেছি। মনুদিদি কোথায় ?"

অসিত কহিল, "ঐ যে আসছে।"

মনোরমা অগ্রসর হইয়া আসিলে পারুল হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি পর দিনই তোমার এখানে আসব মনে করেছিলুম মনুদিদি, তা হয়ে উঠল না, দেরী হয়ে গেল।"

মনোরমা কহিল, "তুমি যে মনে করে এসেছ, এই আমাদের কত ভাগ্য।"

পারুল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "এ রকম ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে জানলে আমি সত্যিই আসতুম না।"

অসিত কহিল, "আমি এখনই আসছি, একটু কাজ আছে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মনোরমা কহিল, "বেশ ভাই আর বলব না। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে, কিন্তু কোথাই বা তোমায় বসাব ?"

পারুল কহিল "আবার ঐ কথা। আজ না হয় ভগবানের দয়ায় উনি দু'পয়সা রোজগার করেছেন, বিয়ের আগে আমাদের কি অবস্থা ছিল, তা ত তুমি জান। তবে একটা কথা তোমরা জান না মনুদিদি ? কার জন্যে আজ আমার এই সৌভাগ্য, তা জান ? মেসোমশায়ের।"

পারুল মনোরমার পিতাকে মেসোমশায় বলিয়া ডাকিত।

আশ্চর্য্য হইয়া মনোরমা কহিল, "আমরা ত কিছু জানি না ভাই।"

পারুল কহিল, "তিনি কি সে কথা প্রকাশ করবার মানুষ। তোমাদের বাড়ীরও কেউ জানত না, আমাদের সংসারের যা কিছু খরচ সব তিনিই দিতেন, আমার বিয়ের সমস্ত খরচই তিনি দিয়েছেন, পাত্রও তিনি ঠিক করেছেন। গরীবের মেয়ের মত আমার বিয়ে হয় নি, তা ত তুমি দেখেছ—অথচ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল কেউ কিছু জানতেই পারলে না। পাড়ার পাচজনে বলাবলি করতে লাগল, আমার মার হাতে লুকোন টাকা ছিল। অন্য লোকে যা বলুক আমরা ত জানি। থাক সে কথা, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে মনু দিদি।"

মনোরমা কহিল, "কি ভাই ?"

পারুল কহিল, "ভেবে দেখলুম, জামাইবাবু কারবারী লোক, পরের দাসত্ব করা তাঁর পোষাবে না।"

মনোরমা কহিল, "খুব পোষাবে। বরাবর চাকরীই ত করে এসেছে, আজ না হয় তিন বছর কারবার করছিল। তা ছাড়া টাকা কোথায় ? তুমিও ত ছিলে তখন, দাদা বৌদির কথা শুনলে ত ? কি রকম বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বললে, আমি কি সে সব কথা এখানে কিছু বলেছি ভাই।"

পারুল কহিল, "আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল মনুদি, তাই ত উঠে গেলুম। মেসোমশায় ছিলেন দেবতা, আর তাঁর ছেলে কিনা—কি আর বলব ?"

মনোরমা কহিল, "আমি কাঁদিনি ভাই, এক ফোটা চোখের জল বেরুতে দিই নি। কিন্তু কি করে যে জল চেপে রেখেছিলুম, তা ভগবান জানেন।"

পারুল কহিল, "আমার এখনই বাড়ী ফিরতে হবে, বিশেষ কাজ আছে, আর একদিন আসব ভাই মনুদি। দেখ মনুদি, এই চিঠিখানি তুমি রেখে দাও, এখনই পড়ে দেখ, ফেলে রেখে দিও না আমার আসতে দেরী হয়ে গেছে ভাই।"

এই বলিয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর সশব্দে স্থান ত্যাগ করিল।

গভীর কৌতূহল বশতঃ মনোরমা তাড়াতাড়ি খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভিতরের কাগজ টানিয়া বাহির করিল। একি ? দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মনোরমা দেখিল, তিন খানি হাজার টাকার নোট। সেই সঙ্গে একখানি ছোট চিঠিও ছিল। কম্পিত হস্তে তাহা সে পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে লেখা ছিল,—মনুদি, দাদা বৌদির কথায় আমি বড় আঘাত পেয়েছি। দাদা যে মেসোমশায়ের ছেলে! জামাই বাবুর দোকান উদ্ধার করতেই হবে। আমার নিজের এই তিন হাজার টাকা ছিল, তুমি নিও ভাই মনুদি। নিতে কিন্তু ক'র না, না হয় ধার বলেই নিও। তোমার মেয়ের বিয়ের সময় আমার নাম করে তাকে ঐ টাকায় গয়না গড়িয়ে দিও, তা হ'লেই তোমাদের ধার শোধ দেওয়া হবে। ইতি,

তোমার ছোট বোন
পারুল।

গ্রীষ্ম ও শীত। | শিল্পী—ফ্যান সু

কর চি পাই-সি : ইনি বর্ত্তমানে পিপিং শহরে বাস করিতেছেন, চীনের চিত্র-জগতে ইঁহার নাম বিশেষ পরিচিত। পাশ্চাত্য প্রভাব ইঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স একষট্টি বৎসর হইয়াছে। ইনি সূ ত্র ধ র চি ত্র-ক র নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক শিল্পীগণ ইঁহাকে খনিজ হীরকের সহিত তুলনা করিয়াছেন ; খনিজ হীরক মসৃণতার অভাবে সম্পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য-লাভ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহার স্বাভাবিক দীপ্তি বড় কম নহে। চি-পাই-সি যে প্রাকৃতিক নানা গুণাবলীতে বিভূষিত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইঁহার অঙ্কিত সমুদ্রোত্থিত প্রভাতের রক্তবর্ণ সূর্য্যনিরীক্ষণকারী 'করমোরাণ্ট' পক্ষি-দলের চিত্রটি সম্পূর্ণ প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুবিখ্যাত শিল্পী জু পিয়ান ইঁহারই শিষ্য।

কুং-পা কিং দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকরগণের অগ্রণী। কয়েক বৎসর হইল ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আধুনিক চৈনিক

বর্ত্তমানে চীনে যে সকল শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অধিক-সংখ্যক চিত্রকর পুরাতন পন্থী ; ইঁহারা চিন্তাশক্তির দ্বারা এবং কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন শিল্পরথীগণের চিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকেন। কখনও কখনও এগুলি বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ইহা চিত্ত-বিনোদনের জন্যই অঙ্কিত হয়।

এই সনাতন-পন্থী দলের প্রধান চিত্র-

পর্ব্বতের দৃশ্য শিল্পী—জু পিয়ন

শিল্পীগণ একজন বিশিষ্ট পথপ্রদর্শক হারাইয়াছেন। চীনের আবহমানকাল প্রচলিত শিল্পধারা যখন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইনিই তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর অবদানের কাহিনী বোধ হয় চীনের বর্ত্তমান শিল্পরসপিপাসুগণের কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইনি সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং স্ব-ব্যয়ে এক কলাভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন শিল্পরথীগণের চিত্রাবলীর অনুকরণে ছাত্রগণ শিল্প-শিক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে ইনি অতীত ও বর্ত্তমান কালের চিত্রাঙ্কন-বিধির একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। ইঁহার বংশের সকলেই চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন ও হইতেছেন। ইঁহার সহোদরা শ্রীযুক্তা ওয়াং-ও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। ইঁহারা উভয়ে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পুরাতন জাতীয় ধারাকে একেবারে বিস্মৃত হন নাই।

সাগর-দোলা। শিল্পী · লি সু

চীনের নিজস্ব প্রথায় চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে ঐ দেশেরই সনাতন কাল হইতে প্রচলিত রঙের ব্যবহার করা উচিত বলিয়া সাধারণ্যে পরিগণিত হয়; কিন্তু এই ধাতব রঙ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। সাধারণ চিত্রকরগণ ইহা ব্যবহার করিতে পারেন না, কেন না ইহা তাঁহাদের পক্ষে ভয়ানক ব্যয়সাপেক্ষ। অতীত চিত্রাঙ্কনের উপযোগী রঙ সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং পুরাতন ধারানুযায়ী অঙ্কিত চিত্র আধুনিক রঙে চিত্রিত হওয়ার ফলে পুরাতন চিত্রের সহিত এই নবীন শিল্পের সাদৃশ্য একেবারেই নাই বলিলে চলে।

তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকরগণ আধুনিক প্রতীচ্য চিত্র-কৌশল অনেকাংশে আয়ত্ত করিয়াছেন। এই সকল চিত্রের মধ্যে পাশ্চাত্য কৌশল থাকিলেও নিপুণতার যথেষ্ট অভাব। পাশ্চাত্য নগ্নচিত্রও চীনা চিত্রকরগণ অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত নীরস ও ভাবশূন্য।

লিউ-সু তৃতীয় দলের একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তাঁহার সকল গুলিই তৈল-চিত্র,—পাশ্চাত্য প্রথায় অঙ্কিত। সকল-গুলিরই পশ্চাতে এক অপূর্ব্ব বাস্তবতা ও বিশ্বাসপ্রবণতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ১৯৩২ সালের চীন-জাপান-সংঘর্ষের চিত্রও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই বাস্তবতার স্পর্শ ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। চীন-চারু-শিল্পে এই বাস্তবতার প্রভাব প্রথম পরিলক্ষিত হইল।

বর্ত্তমানে ক্যান্‌কিঙের জু পিয়নই এই তৃতীয় দলের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। ইনি ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়াছেন; ইঁহার অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি বিশেষজ্ঞগণের বিশিষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইনি পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং চীনের অতীত যুগের শিল্প-সাধনার ধারায় চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। এই চিত্রাবলীর পরিকল্পনায়ও তিনি আপনার কল্পনা ও চিন্তাধারা সংযোজিত করিয়াছেন।

কো-কি-ফেংও এই দলের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। জীব-জগতের (material world) চিত্রাবলীর অন্তরালেও যে কোন অননুভূত আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়, তাহার অভাব পাশ্চাত্য শিল্পে অনুভব করিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ঊষা, গোধূলি, প্রাকৃতিক

মঙ্গলবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনের ছুটি শ্যাম দা'র মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। এই মঞ্জুর হওয়ার গোড়ায় ওই একটা ছোট কথা আছে। শনিবার ছুটির দরখাস্তখানা শ্যাম দা' সাহেবকে দিতে গিয়া যখন তাঁহার মিলিটারী মেজাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন যে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় গৃহে আজ মেম-সাহেবের সহিত ঝগড়া হইয়াছে, হয় ত তাঁহার সেই অনুমান সত্যই এবং এ অনুমানও হয় ত সত্য যে, সেই ঝগড়া পরদিন রবিবার আপোষে মিটিয়া যায় এবং তাহার ফলে সোমবার যখন সাহেব আফিসে আসেন, তখন তাঁহার মুখখানা প্রফুল্ল এবং হাসিভরা এবং মেজাজ তাঁহার অসম্ভব রূপ দিলদরিয়া। আসিয়াই তিনি শ্যাম দা'কে ডাক দেন এবং শ্যাম দা' আসিলে তিনি বলেন—"শ্যামাচরণ সেডিন টোমার ফীট হোইয়াছিলো—টোমার মাঠা ভারি উইক্ আছে, টুমি ভাল ডক্টর ডেখাইয়া একটা টনিক ওষুড খাও, উহার ডাম হামি টোমাকে ডিয়ে ডেবে!"

শ্যাম দা' তখন ভাবিতেছিলেন—"টেলিগ্রামখানা এখনো আসছে না কেন, এই সময় এলেই ভাল হোতো।'

সাহেব কহিলেন—"টুমি এখন ঢীরে ঢীরে আসটে আসটে কাজ করিবে। হামি হরিশকে বলিয়া ডেবে টোমায় খুব কম কাজ ডিটে।"

হরি! হরি! শ্যাম দা'র টেলিগ্রাফ আসিয়া হাজির।

টেলিগ্রাফ পড়িয়া শ্যাম দা' সাহেবের সম্মুখে মেজের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তবে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন না। কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান, এইরূপ ভাব। হাত হইতে টেলিগ্রাম খানা খসিয়া পড়িল। সাহেব তাহা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন :—

Father Expired Come Sharp
Gour.

সাহেব সান্ত্বনার বাক্যে শ্যাম দা'কে কহিলেন—"শ্যামাচরণ, টুমি এখনি চোলিয়া যাও, ডশ ডিন টোমার Special Leave রহিল। চিণ্টা করিও না, ভোগোবান টোমার সহায়টা কোরিবেন।"

পিতৃ-মৃত্যু-সংবাদে যৎপরোনাস্তি কাতর ও বিচলিত হইয়া শ্যাম দা' তৎক্ষণাৎ আফিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এক দিন রাধেশদের ওখানেই তাঁহার কাটিয়াছে। এই তিন দিন শ্যাম দা' ঘরের ভিতরই দিনরাত আবদ্ধ হইয়া আছেন। একটীবারও ঘরের বাহির হন নাই। কি জানি যদি আফিসের কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া যায়। পর পরের কথা, এই কয়দিন তিনি বৈঠকখানায় পর্য্যন্ত বসেন নাই, যদি অবাঞ্ছিত কেহ আসিয়া পড়ে। শুধু কাল বরানুগমনের সময় তাঁহাকে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবে এখন রাত্রিকাল, আর সদর এবং সোজা রাস্তা রসা রোড দিয়া বর না লইয়া গিয়া, তিনি একটু ঘুরিয়া অন্দরের রাস্তা ধরিয়া মনোহরপুকুর রোডে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তারপর বিয়ের কার্য্য নির্ব্বিবাদেই সুসম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল একটু গোল বাধিয়াছিল, ছোট ছোট কয়েকটী বর ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে। রাধেশ ও সোমেশের পুত্র কয়টী অর্থাৎ পাবু, ফাবু, ভাবু, বাবু ও মাবু বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিল। কন্যাযাত্রীর একটী ক্ষুদ্র রেজিমেণ্ট আসিয়া তাহাদের কয়জনকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার পরই তাহাদের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ :—

"তোমার নাম কি ভাই?"

"আমার নাম ভাবু।"

"ভাবু? আমার নাম গাবু। কোন্ ক্লাশে পড় ভাপ্লাত?"

"ক্লাশ টু-তে।"

"আচ্ছা বল দেখি, কোন্ জিনিসটা কাটলে বাড়ে।"

ভাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভয়ানক অপ্রস্তুত হইবার উপক্রম। পাবু ভাবুকে রক্ষা করিতে একটু এদিকে সরিয়া আসিয়া বসিয়াই কহিল—"কোন্ জিনিসটা কাটলে বাড়ে? তোমার নাক কাণ কেটে দেখ, সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যাবে। নিজে না পার, ছুরি নিয়ে এস, আমরা কেটে দেখিয়ে দি।"

উত্তর শুনিয়া ও-দলের ছেলেটী একটু মুসড়িয়া গেল। তখন ফাবু তাহার সিল্কের পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে ফুল-তোলা রুমালখানা লইয়া মুখখানা একবার মুছিয়া লইবার পর ও-দলকে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, এইবার তোমরা বল দেখি—"How many elephants can stand upon the needle-point?"

এমন সময় আহারের ডাক আসিল। সে ডাকের বন্যায় ছুঁচও ভাসিয়া গেল, হাতীও ভাসিয়া গেল।

তাহার পর বিশেষ কোন ঘটনা আর ঘটে নাই।

আজ প্রাতে শ্যাম দা' নব বধূ লইয়া দেশে যাইবেন, সেই একটা মস্ত ঘটনা। রাধেশকে কহিলেন—"তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে! আর বৌমাদের নিয়ে সোমেশ না হয় কাল যাবে'খন।"

রাধেশ কহিল—"তাই হবে।"

"আর একটা কথা। এখান থেকে বেরুতে দেখছি ১০টা বেজে যাবে। গাড়ী হচ্ছে বুঝি এগারটায়? আচ্ছা, কোন্ পথ দিয়ে ষ্টেসনে যাবে?"

"বরাবর রসা রোড দিয়ে, তারপর চৌরঙ্গী, ড্যালহাউসী, আপনার আফিসের সামনে—

"ওরে বাবা রে!" লাফাইয়া উঠিয়া শ্যাম দা' বলিলেন—"ওরে বাবা রে! তুমি কি আমাকে 'দয়ে মজাতে' চাও নাকি? অফিসের সামনে দিয়ে যাই আর সব আমাকে দেখতে পাক, শেষকালে সাহেবের কাণে উঠুক! সে হবে না; গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"বেশ তাই হবে। কোথা দিয়ে যাওয়া হবে, বলুন।"

একটু ভাবিয়া শ্যাম দা' বলিলেন—"আচ্ছা, দার্জ্জিলিং মেল শিয়ালদহ ছাড়ে কখন?"

চোখ কপালে তুলিয়া রাধেশ কহিল—"তোমার মাথা কি খারাপ হোল শ্যাম দা'? যাবে তুমি ব্যাণ্ডেল হোয়ে কাটোয়া, তুমি ই. বি. আরের নৈহাটী ঘুরে—"

"আরে, ঘুরি কি সাধে! কেউ দেখে ফেললে যে মহা বিপদ! তুমি বুঝছ না ভায়া। জল-জীয়ন্ত ফাদারকে এক্সপায়ার্ড করা হোয়েছে, সুতরাং—"

"সুতরাং যা করবার সে আমি করব, এখন তোমার ও-সব দুশ্চিন্তার দরকার নেই।"

শ্যামদা'র দুশ্চিন্তা অতঃপর বাহিরে ফুটিয়া বাহির না হইলেও ভিতরে তাহা জমিয়া রহিল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাঁহাদের ট্যাক্সিখানা যখন গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া, হাইকোর্টের দক্ষিণ পথ ধরিয়া গঙ্গার ধারে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে আসিয়া পড়িল, তখন শ্যাম দা'র সচকিত ভাব। তাঁহার আফিসের পিছনকার ফটক—ঐ সামনে! রাধেশের ভয়ে, মুখে আর কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না। ক্রমে গাড়ী টার্ণবুল কোম্পানীর আফিসের পিছনকার ফটকের কাছে আসিয়া পড়িল। শ্যাম দা' মনে মনে বলিলেন—'আজ আবার ঘোড়ার ডিম—'মেল ডে'! ঐ রে! নব মিত্তির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে! সব্বনাশ! বেটা যে আমার পরম শত্তুর! দেখতে পেলে নাকি?' তিনি তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরখানা খুলিয়া তদ্দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। রাধেশ কহিল—"এ কী শ্যাম দা'?" শ্যাম দা' কহিলেন—"চুপ কর ভাই, বিপদ যে কত, তা তুমি বুঝবে না। Fifteen years-এর service, —বুঝছ না?"

রাধেশ আর কিছু না বলিয়া একটু হাসিল, কিঙ্করও মনে মনে বোধ হয় একটু হাসিল। নব-বধূটী হাসিল কি না, তাহার এক-গলা ঘোমটার আড়ালে তাহা আর দেখা গেল না।

[৪]

ব্যাণ্ডেল ষ্টেসন।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

কাটোয়ার গাড়ী ১টা ৩৯এ ছাড়িবে। শ্যাম দা' বলিলেন—"রাধেশ।"

"কি বলছ?"

"না—থাক্।"

"থাকবে কেন—বল না।"

"বলছি কি, বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে পারলে বাঁচা যায়।"

"হুঁ।"

"দেখ, রাধেশ?"

—"বলি, অ শ্যাম দা'—শ্যাম দা'!" ও দিক্‌কার প্ল্যাট্‌ফরমে কতকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্য হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে শ্যাম দা'কে ডাকিতে লাগিলেন।

"শ্যামদা' শুনতে পাচ্ছ না? অ শ্যামদা'?"

শ্যাম দা' নীরব, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার। মুখখানাকে অসম্ভবরূপ বিকৃত করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। রাধেশ কহিল,—"সাড়া দাও না শ্যাম দা'।" শ্যাম দা' ঝাঁকি দিয়া কহিলেন—"তুমি চুপ কর, রাধেশ। লক্ষ্মীছাড়াটা কে বল দেখি? তুমি ওদিকে আর চেও না।"

পুনরায় চীৎকার—"বাড়ী যাওয়া হচ্ছে না কি, অ শ্যামদা? বিয়ে কার হোলো?

রাধেশ কহিল—"সাড়া দাও, শ্যাম দা'; তোমার কোন ভয় নেই।"

"কে শ্যাম দা'! শ্যাম দা' ফ্যাম্ দা', এখানে কেউ নেই বাবা! উঃ! এখানে পর্য্যন্ত—। নাঃ,—Father expired নিয়ে একটা বিপদ না ঘটে আর যাবে না দেখছি। ঘোড়ার ডিমের চাকরী এবার না হয় ছেড়েই দেবো। ৩০ বিঘে জমী ত আছে ভাগে দেওয়া। চাষবাসই লাগিয়ে দেবো। এতেও ত ডাল-ভাতের বেশী কিছু হয় না, তা'তেও ডাল-ভাত দুটো হোয়ে যাবে'খন। বরং এই ভয় ভয়, উদ্বেগ আর গোলামীর হাত থেকে বাঁচা যাবে।"

ও-প্লাটফরমের ভদ্রলোকটীর কিন্তু অসীম ধৈর্য্য। এবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার সুরু করিল—"শ্যাম দা' কি কালা হোলে, না, চিনতে পাচ্ছ না?"

শ্যাম দা' এবার মরিয়া হইয়া উঠিলেন। একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ভদ্রলোকটীর দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"এই, ছোট ভাইয়ের বে দিয়ে বউ কনে নিয়ে দেশে যাচ্ছি। Father expired বলে দিন দশেকের ছুটী নিয়েছি। আর শীগ্গীরই চাকরীর মাথায় তিনটে লাথি মেরে, চাষ-বাসের ব্যবস্থাটাই করব। তুমি ভাল আছ ত? যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?"

লোকটী সব কথাগুলোর মানে বুঝিতে পারিল না। কহিল—"ত্রিবেণীতে একটা তাগাদা ছিল, তাই এসেছিলুম, বৈঁচি ফিরে যাচ্ছি। রতনপুরের খবর সব ভাল ত?"

মনে মনে অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া, মুখখানাকে তোলা-হাঁড়ি করিয়া, ব্যঙ্গ করিবার মত স্বরে শ্যাম দা' কহিলেন—"খবর খুব ভাল—চমৎকার। আর কিছু বলবার-টলবার আছে?" গজ্ গজ্ করিয়া শ্যাম দা' অতঃপর কি বলিতে লাগিলেন, তাহা বুঝা গেল না।

রাধেশ কহিল—"শ্যাম দা', তোমার মাথা ঠিকই খারাপ হয়েছে।"

"ভাই, বোঝ না; fifteen years' service। বড় ভয়ে ভয়ে, বুঝে-সুজে হুঁসিয়ার হয়ে তবে কাজ করতে হয়। লোকটার কি আক্কেল দেখ দেখি! বলি, শ্যাম দা' কি তোমার মেসো, না পিসে, না ভগ্নীপতি যে, এত ডাকা-ডাকি করে শুধু দুটো বাজে কথা কইতে হবে? ধানের আড়তদার কিনা তাই ঐ রকম 'ধান-কাটা' বুদ্ধি।"

রাধেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—"আচ্ছা, শ্যাম দা',—"

"হাসি নয় রাধেশ, ব্যাপার খুব সঙ্গীন জেনো। ষ্ট্যাণ্ড রোডের ফটকে যত্ন মিস্ত্রির বেটা যদি দেখতে পেয়ে থাকে, তা হ'লে জানবে—সব্বনাশ। এই পনর বচ্ছর 'সার্ভিস' করছি, পনর বচ্ছরই বেটা পেছনে লেগে আছে। না—রাধেশ, যা বলছিলুম; চাকরি আমি সত্যিই ছেড়ে দোবো।"

"দিয়ে চাষ-বাসে লাগবে?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, সোমেশ যদি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়, তা' হলে ওর মত, সব কাগজে কাবতা-গল-টল্প লিখতে পারব না? তা পারব বোধ হয়। তা' হলে তা'তেও কিছু কিছু হবে।"

মনে মনে রাধেশ হাসিয়া কহিল—"হাঁ, তাই হবে'খন। ঐ গাড়ী এসে পড়েছে, চলুন এখন, গিয়ে সব উঠে বসি।"

সাড়া শব্দ করিয়া কাটোয়ার গাড়ী আসিয়া প্লাটফরমে লাগিল।

[৫]

রতনপুর। শ্যাম দা'র গৃহ।

কাজ কর্ম্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে আগা-গোড়া যাহা খরচ হইয়াছে, শ্যাম দা' তাহার হিসাব লিখিতে বসিয়াছেন। কাল তাঁহার দশ দিনের ছুটী শেষ। কালই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। খালি খরচপত্রের হিসাবটা একবার মিলান দরকার।

সেদিন আফিসের ৪১২৯।৵৮ পাইয়ের হিসাবটা মিলাইতে না পারিলেও, শ্যাম দা' হিসাবে কিন্তু খুব পাকা। তাঁহার কাছে একটী আধলা গরমিল হইবার যো নাই। বিয়ের বাবদ তাঁহার কাছে ছিল—সর্ব্বসমেত ৫৩৭॥৶০ আনা। কিন্তু সব রকম খরচ লিখিয়া শ্যাম দা'র 'টোট্যাল' হইতেছে ৫৩৬৸৵০। তের আনা পয়সা আর কিছুতেই মিলিতেছে না। একবার, দুইবার, তিনবার যোগ দেওয়া হইল;—সেই ৫৩৬৸৵০ আনা। শ্যাম দা'র মাথা ঘুলাইয়া গেল। আর ৸৵০ আনার হইল কি? সকলেই সেখানে বসিয়া ছিলেন। কিঙ্কর কহিল—"থাক গে ৸৵০। তের আনার জন্যে আর অত মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই দাদা।"

"তা কি হয় রে বোকা, ৮/০ আনা যাবে কোথা? মিলতেই হবে।"

শ্যাম দা'র বৃদ্ধ পিতা হেমবাবু তক্তাপোষের একধারে শুইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুধু তের আনা?"

কিঙ্কর কহিল—"হাঁ।"

রাধেশ বলিল—"চারটে পয়সা হাওড়ায় যে সেই ভিখিরীকে দিয়েছিলে,—যাকে বললে—আশীর্ব্বাদ কর, যেন বড় মিস্ত্রির না দেখতে পেয়ে থাকে?"

"ঠিকই বটে। কিন্তু ও ত চার পয়সা, আরও বার আনা যে চাই।"

শচীন লাফাইয়া উঠিল,—"কাকা, Father expired-এর বার আনা যে আমায় দিয়ে গিয়েছিলে, সেটা ধরেছ ত?"

হেমবাবু কহিলেন—"Father expired? ব্যাপারটা কি?"

শ্যাম দা' তাড়াতাড়ি কথাটাকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিলেন—"ও কিছু নয়। বাবা, আপনি আজ ওষুধ খেতে ভোলেন নি ত?"

যাক, হিসাব ঠিক মিলিয়া গেল।

আবার ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন।

শ্যাম দা' সকালের ট্রেণে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতেছেন। দশটায় হাওড়ায় পৌঁছাইয়া সরাসরি তাঁকে আফিস করিতে হইবে। সঙ্গে আছে রাধেশ।

"দেখ রাধেশ, একটু একটু লিখতে সত্যিই আমি অভ্যাস করব। সোমেশ বই লিখে বছরে চার পাঁচ হাজার পায়, আমি চার পাঁচ শ'ও ত পাব বটে। বাড়ীতে বসে কাল একটু চেষ্টা কচ্ছিলুম।"

"কবিতা না গল্প?"

"কবিতা। কবিতা ক' লাইন কিন্তু বেশ মিলিয়ে ফেলেছিলুম। মনে আছে আমার। শুনবে?-

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
আকাশে সোনালী রংয়ের খেলা,
গাঁথিছে কে আজ কিরণ মালা?
নীরবে একেলা, কে তুমি গো বালা,
কে তুমি গো অবগুণ্ঠনা?—

—রাধেশ রাধেশ! সর্ব্বনাশ! আসল কাজেই একেবারে ভুল!" বলিয়াই শ্যাম দা' লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "ট্রেণ আসবার আর দেরী কত বল দেখি?"

"তা আধ ঘণ্টার ওপর হবে। কেন? হঠাৎ তোমার আবার হোল কি?"

"আরে হোল আমার মাথা আর মুণ্ড। Father expired—নেড়া হতে হবে না? উঃ ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল! নইলে এই এক মাথা চুল শুদ্ধ আফিসে গিয়ে পড়লেই—ঐ একটা নাপিত রাস্তার ধারে বসে রয়েছে,—ডাক—ডাক ওকে শীগ্‌গির"

শীগ্‌গীরই নাপিতকে ডাকিয়া আনা হইল এবং শ্যাম দা' মাথাটা তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বসিলেন।

শরৎ

(সুর ও স্বর-লিপি—শ্রীনরোত্তমদাস ঘোষ)

কথা—শ্রীঅনুরূপা দেবী

আজ শরতের সুপ্রভাতে
শিউলি ফুলের মালা গলায়
কাশের গুচ্ছ কার দুহাতে।

নীল গগনে মেঘের তরী
যাচ্ছে ভেসে দেশবিদেশে
হাজার ফুলের গন্ধ হরি'
করছে হাওয়া পাগল এসে

মর্ম্মরিয়া লতায় পাতায়
উঠছে কী গান আজ প্রভাতে
কোয়েল দোয়েল পাপিয়ারা
কণ্ঠ মিলায় কাহার সাথে

মিশ্র-ভৈরবী—কাওয়ালী

সা ণা সা সা I দা । সা সা I জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা I
০ আ জ শ র ০ তে ০ র সু ০ প্র

ঋা । সা । I । সা দা দা I পা মা জ্ঞা ঋজ্ঞা I
ভা ০ তে ০ ০ আ জ শ র ০ তে ০ ০

। মা । জ্ঞা I ঋা । সা সা I
র সু ০ প্র ভা ০ তে ০

। সা পা পা I পা । ঋা পা I । পা ণা ণা I
০ শি উ লি ফু ০ লে ০ র মা ০ লা

দা । পা পা I । সা ঋা জ্ঞা I পা । ণদা ঋা I
গ ০ লা য় ০ কা শে র গু ০ চ্ছ ০

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I ঋা । সা । I
০ ০ কা র ড হা ০ তে ০

। মা দা দা I দা পা পা র্সা I । সা ঋা মা I
০ নী ল গ গ ০ নে ০ ০ মে ঘে র

জ্ঞা ঋা সা । I । সা পা পা I পা । পা । I
ভ ০ রী ০ ০ যা চ্ছে ভে ০ সে ০

। জ্ঞা মা দা I দা ণা ণা র্সা I । পা দা ণা I
০ দে শ বি দে ০ শে ০ ০ বা জা র

র্সা । র্জ্ঞা । I । দা ণা র্সা I দা । র্সা । I
ফু ০ লে র ০ গ ন্ধ ভ ০ রি ০

। পা ণা দা I পা । জ্ঞ । I । মা মা জ্ঞা I
০ ক র ছে হা ও য়া ০ ০ পা গ ল

ঋা । সা । I
এ ০ সে ০

। জ্ঞা মা মা I ণা দা দা ণা I । ণা র্সা র্সা I
০ ম র ম রি ০ য়া ০ ০ ল তা য়

সা । র্সা র্সা I । পা দা ণা I র্সা র্ঋা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
পা ০ তা য় ০ উ ঠ ছে কী ০ গা ন

র্ঋর্সা র্সা র্ঋা র্মা I র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । I
০ ০ আ জ প্র ভা ০ তে ০

। র্সা র্সা র্সা I র্সা র্ঋা র্সা র্সা I । ণর্সা ণা । I
০ কো য়ে ল দো ০ য়ে ল ০ পা০ পি ০

দা । পা । I । সা ঋা জ্ঞা I পা । ণদা ঋা I
য়া ০ রা ০ ০ ক ণ্ ঠ মি ০ লা০ য়

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I ঋা । সা । II
০ ০ কা হা র সা ০ থে ০

আদি ও অন্ত

প্রথম পর্ব

শিয়ালদহ ষ্টেশন।

ষ্টেশনে জনারণ্য দেখিয়া ধরেন্দ্রের ধড় হইতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিল। আমেদাবাদ মিলের নক্সা আঁকা চাদরে বালিশ মুড়িয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া সে হাঁ করিয়া লোকের ভিড়, কুলিদের দৌড় ঝাঁপ, মাল কাড়াকাড়ি, কথা কাটাকাটি লক্ষ্য করিতেছিল, একটা ভিড় আসিয়া তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল এবং সহজেই ষ্টেশন পার করিয়া দিল। সহজে বটে, তবে অক্লেশে নহে—ভিড়ে ভুঁড়িটি ব্যাং-চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছিল, সাত দিন গায়ে ব্যথা ছিল, এক পাটি স্যাণ্ডেল পাওয়া গেল না।

ষ্টেশনের বাহিরে যখন লোকের ভিড়, গাড়ীর দৌড়াদৌড়ি একটু কমিল, ধরেন্দ্র একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, মেসের বাসা কোথায় ?

লোকটি বলিল, কোন্ মেসের বাসা ?

ধরেন্দ্র বলিল, মেসের বাসা।

এইবার লোকটি একটু হাসিল ; জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় বাড়ী ?

—ঢাকা।

লোকটি ষ্টেশনের সামনে কতকগুলা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐখানে যাও।—বলিয়া চলিয়া গেল।

ট্রাম, বাস, মোটর-গাড়ী, লরী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, মানুষ-গাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদির করাল কবল এড়াইয়া ধরেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেই গেঞ্জীপরা একটা লোক মহাসমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। একটা ঘরে মাদুর বিছানো তক্তাপোষের উপর মেরজাই-গায়ে একটি লোক হুঁকায় তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা মুখ হইতে একটুখানি সরাইয়া, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দিয়া আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া, বেশ খাতির করিয়া বলিল, বসুন।

ধরেন্দ্র 'বিছানা' বগলে বসিল।

—আপনার বাড়ী ?

—ঢাকা।

হুঁকা-হাতে লোকটি ভড়াক্ ভড়াক্ শব্দে হুঁকা টানিতে লাগিল।

—রমেশ দা কোথায় ?

রমেশ পাকড়াশী ?

—না, না, রমেশ শঙ্খনিধি।

—র-মে-শ শ-ন্-খো-নি-ধি ! আখাড়ুমি হোটেল ঠিকানা দিয়েছেন ?

ধরেন্দ্র তাহার বগল হইতে বিছানাটি নামাইতে ছিল, পুনশ্চ বগলদাবায় পুরিয়া বলিল, এটা হোটেল নাকি ?

—হাঁ, কেন বাইরে লেখা রয়েছে, দেখেন নি ?

—না—বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

হুঁকাহাতে লোকটি বোধ হয় হোটেলের ম্যানেজার, তাহারও বাড়ী ঢাকায়। একটু দয়া হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, মেসের বাসার ঠিকানা জানেন না ?

—না, রমেশ দা'র মেস, কলকাতার ভদ্রলোক সবাই চেনে।

ম্যানেজার একটু ক্ষুণ্ণ হইল—যেন, সে ভদ্রলোক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। রূঢ়স্বরে বলিল, খুঁজে দেখ গে কোন্ চুলোয় তোমার রমেশ দা।

—হ। দেখবই ত! বলিয়া ধরেন্দ্র বাহির হইল। বাহিরে আবার সেই জনতা। ফুটপাথে মানুষ ধাক্কাধাক্কি করিতেছে আর রাস্তার গাড়ী মোটরগুলা যেন কি খাই ও কারে খাই করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

ফুটপাথের উপর ঝুড়ি রাখিয়া কয়েকটা মুটিয়া বসিয়া ছিল, তাহারা শিকারান্বেষণ করিতেছিল, আক্রমণ করিয়া একটানে বিছানা (মানে সেই চাদরাবৃত বালিশ) ছিনাইয়া লইল। ধরেন্দ্র এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল

না। কিয়ৎকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকটিকে বিপুল বিক্রমে পুনরাক্রমণ করিয়া বিছানা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পক্ষে অবোধ্য এবং অন্য অনেকের পক্ষে দুর্বোধ্য ভাষায় কতকগুলি কট্‌কাটব্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে চোখে পড়িল -

জীবনতোষিণী হোটেল

পরম পরিতোষপূর্ব্বক হিন্দু ভোজনালয়

ধরেন্দ্র দাঁড়াইল। তাহার উদরে তখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড দাউ দাউ জ্বলিতেছেন। এতক্ষণ রমেশ দা'র মেসের বাসার চিন্তায় আগুন চাইচাপা ছিল, এখন জীবনতোষিণীর দর্শন মাত্রে বায়ু-সঞ্চাড়নে ছাই অপসৃত হইল। ধরেন্দ্র পাঠ করিল :—

ভাত	৴১০	মাছ ভাজা	৴১
ডাল	৴৫	মাছের ঝোল	৴১
ভাজা	৴৫	মাছের কালিয়া	৴১
শুক্ত	৴৫	মাংসের কালিয়া	৴০
চচ্চরী	৴৫	দধি	৴১
ডালনা	৴৫	মিষ্টান্ন	৴১০

হিসাব করিয়া দেখিল, সওয়া পাঁচ আনা হইলে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন হয়। পয়সা তাহার কোমরের গেঁজেতেই ছিল, ধরেন্দ্র সটান্ ঢুকিয়া পড়িল। কালো-কোলো আধা-বয়সী গোলগাল একটী স্ত্রীলোক আসিয়া, একটু মুচকি হাসিয়া সোনার তাগা পরা হাতখানি তাহার বালিশ-বিছানার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেই, ধরেন্দ্র দু' পা পিছাইয়া গেল। কি বিপদ! সকলেরই নজর কি ছাই ঐ বস্তুটির উপর। স্ত্রীলোকটি বলিল, ভয় নেই গো, ভয় নেই, তোমার বিছানা আমরা খেয়ে ফেলব না। রেখে দিতুম, খাওয়ার পর, যাওয়ার সময় তুমি নিয়ে যেতে! বলিয়া আবার মুচকি হাসিল, হাসির সঙ্গে এবার একটি কটাক্ষও ছাড়িল। লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। তন্মুহূর্ত্তে বালিশ-বিছানা স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

—অ ঠাকুর, একথালা ভাত আন।—ঠাকুরকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া গজেন্দ্রগামিনী ধরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে উপনীত হইল, সেখানে ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ ষাটজন লোক কাঠের পিঁড়িতে নিতম্ব রক্ষা করিয়া অন্নব্যঞ্জন আহার করিতেছে। আহার করিতেছে কিম্বা যুদ্ধ করিতেছে, অথবা করাতে কাঠ কাটিতেছে তাহা বলা দায়;—শব্দ উঠিতেছে, হাপুস হুপুস হুস।

স্থূলাঙ্গিনী একখানা খালি পিঁড়ি ধরেন্দ্রকে দেখাইয়া দিল এবং আর একবার ঠাকুরকে সরসকণ্ঠে ডাক দিল, ধরেন্দ্র বসিল।

—কি কি দেবে বল গো বাবু, বলিয়া সেই নবজলধরবর্ণী স্ত্রীলোকটি আর একটি বাণ নিক্ষেপ করিল।

আহারান্তে পয়সার গেঁজে বাহির করিয়া ধরেন্দ্র বলিল, আমার বিছানা?

—আছে গো, আছে।—বলিয়া মন্থরগামিনী বিছানা আনিয়া, একগাল হাসিয়া, বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দেখ গো বাবু, তোমার মালপত্তর সব ঠিক আছে ত?

'বিছানাটা' পরীক্ষা করণান্তর ধরেন্দ্র কহিল, হু, ঠিক আছে।

—পান দেব? দু' পয়সা লাগবে কিন্তু।

—বেশী লাগিলেও পান না খাইয়া পারা যাইত না 'কিন্তু'র সঙ্গে যে ভুবনভুলান হাসিটা ভুবনমোহিনী হাসিল, তাহাতে গেঁজের পয়সা আপনিই গেঁজে ছাড়িয়া আসিতে চাহিতেছিল।

রমেশ শঙ্খনিধি-দাদার বাসা পাওয়া গেল না। তা' পাওয়া গেল না বটে, অন্য যে যে বস্তু পাওয়া গেল, তাহাদের তুলনা বিরল। জীবনতোষিণী হোটেলের অন্ন-পরিদ্দারগণের মনমোহিনী বলিল, বাবু মশাই গো, ঐ কোণের ঘরটাতে জায়গা আছে, থাকুন না যতদিন খুশী। ভাড়া লাগবে না, এক কোণে ঠাকুর থাকে আর এক কোণে আমি পড়ে থাকি। মাঝখানে তুমি! যেন,

দু' পাশে দুই কলা গাছ
মধ্যিখানে মহারাজ!

কেমন?—আবার হাসি!

সুতরাং বাসা মিলিল। তার পর কাজকর্ম্মের চেষ্টা।

কলিকাতার সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়। রমেশ দা' সেবার দেশে গিয়া ভরসা দিয়া আসিয়াছিল, ক'লকাতায় কাজের ভাবনা নাই; আসিয়া পড়িতে পারিলেই কাজ জুটিয়া যাইবে। রমেশ দা' 'ধরো'কে তাহার মেসে আসিতেই

বলিয়া আসিয়াছিলেন। ঠিকানাও তিনি একটা দিয়াছিলেন, সেটা খোওয়া গিয়াছে; আর রমেশ দা' একথাও বলিয়া ছিলেন, 'শ্যালদা'র সামনেই আমাদের মস্ত মেস। রমেশ দা'র কথা সে জানিত। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই তিনি মেস্ করেন, তারপর টিউসনী, তারপর ব্যারিষ্টারের বাবু! পূজ্যপাদ রমেশ দা'র এখন খুব বোল্‌-বোলাও। রমেশ দা'র শ্রীমুখাৎ সে শুনিয়াছে, যে বাড়ীতে দু'টি ছেলেকে পড়াইয়া মাষ্টার পূর্ব্বে দশ টাকা আদায় করিত, রমেশ দা' সেই দু'টি ছেলেকেই পাঁচ টাকায় পড়াইতে সুরু করিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে করিতেই রমেশ দা' আজ উন্নতির গিরিশিখরের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছেন। পূজ্যাদর্শ রমেশ দা'কে সামনে পাইলে ভাল হইত; কিন্তু তা' যখন পাওয়া গেলই না, দাদার আদর্শ লইয়া শ্রীমান ধরেন্দ্র কলিকাতার সমুদ্রে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিল।

ধরেন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া তাম্বুল-চর্চ্চিত অধরে কলিকাতা চষিয়া সন্ধ্যার পর জীবনতোষিণীতে ফিরিয়া আসে। রোজ যায় রোজ আসে। একদিনও ভুল করে না—না যাইতে, না আসিতে। কিন্তু কাজকর্ম্মের কোন সুবিধা আজও হয় নাই। না হইবার অনেক কারণ, কলিকাতার লোকেরা হঠাৎ উদার হইয়া উঠিয়াছে; ব্যয়-বিচারে তাহাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই, সস্তার কথায় তাহারা আর ভিজিতে চায় না। কলিকাতার 'খটি'দের ফোতো বাবুয়ানীতে ও বাজে খরচের চাপেই তাহারা যে মরিতে বসিয়াছে, ইহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চায় না। মনমোহিনী সব দেখে, সব বোঝে। একদিন বলিল, কি গো বাবু, চাকরী-বাকরী কিছু হ'ল?

হয় নাই শুনিয়া সেই লোকবিমোহিনী বলিল, চাকরী কি নারকেলের কাঁদি নাকি যে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই অমনি হল? সেই কালেই বললুম, বাবু ভাতের হোটেল দাও, তা'ত শুনলে না! শুনলে এতদিনে টাকা রাখবার ঠাঁই জুটত না।

অতঃপর একটি হিতৈষিণী পরামর্শদাত্রীও জুটিল! হিতৈষিণী কহিল, হোটেল দাও, তুমি দেখবে, এই যে এত খদ্দের সব ঝেঁটিয়ে তোমার হোটেলে যাবে।

—কেন, এখান থেকে যাবে কেন?

—আ তোমার পোড়াবুদ্ধি! হোটেলে এত যে খদ্দের আসে, সে কি ঐ মুখপোড়া ভশ্চাজ্জিকে দেখে আসে, না ঐ উনুনমুখো উড়ে ম্যাড়াদের জন্যে আসে?

—ওরা ত সব খেতে আসে।

—তোমার বাছা, রাগ ক'র না বাপু, বুদ্ধিসাধ্যি কিছু নেই। তুমি যে ষ্টীমার থেকে পদ্মায় ধপাস্ ক'রে পড়ে যাওনি কেন আমি শুধু তাই ভাবি। বলি, এতদিন এখানে আছ ত! চোখ বুজে থাক, না খুলে থাক? একদিন যদি খাবার সময় আমি না থাকি কি রকম কাণ্ডকারখানা হয়, তা কি চোখ মেলে কোনদিন দেখনি?

কাঠের উনানের মত, বুদ্ধির কুণ্ডে একটু ইন্ধন জোগান দিলে অনেকেরই বুদ্ধি খুলিয়া যায়; ধরেন্দ্রেরও বুদ্ধি খুলিয়া গেল; বলিল, তা বটে। বুদ্ধির নিয়ম এই, একবার খুলিতে সুরু করিলে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ধরেন্দ্র দ্বিতীয় দফায় বলিল, আমি হোটেল খুললে তুমি আমার হোটেলে যাবে ত?

মনমোহিনী একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করিল। প্রথমে গালে হাত দিল; পরে ভ্রূভঙ্গী করিল; তারপর মুচকি হাসিল; তারও পরে সাগরতরঙ্গের মত বেলাভূমিতে গড়াইয়া পড়িল; অধরে আদর নয়নে সোহাগ আনিয়া বলিল, তবে আর বলছি কি গো! যাব গো, যাব, তবে আধাআধি বখরা। আমি সব করব কম্মাব, তুমি দেখবে শুনবে, বিড়ি সিগ্রেট ফুঁকবে, হল একদিন বা থিয়েটার-মিয়েটার দেখলে, একদিন বা টাকিগান শুনলে। কেমন, রাজী ত?

—খুব রাজী।

—শেষ কালে অবস্থা ফিরলে আমায় ভাসাবে না ত?—বলিয়া সেই ভুবনমনমোহিনী বিলোল কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিল।

ধরেন্দ্র ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া বলিল, ভাসাব কেন? আর কোথায় ভাসাব?

—তোমার ছাপের বুড়ীগঙ্গায়। আবার কোথায়?

—বুড়ীগঙ্গায় জল নেই! বলিয়া ধরেন্দ্র হাসিল।

—এই যে কথা বেরিয়েছে। যা হ'ক বাপু, এখন কাউকে কিছু ব'ল ট'ল না; আমি বাড়ী-টাড়ী খুঁজি, লোকজন সব

ঠিক করি, দোকান-টোকানে উটনোর ব্যবস্থা করি, তুমি শুধু দেখে যাও।

আমাদের ম্যাড়াকান্ত পাঠক ও ধূম্রাঙ্ককার প্যান্ট্রি-বিহারিণী পাঠিকা, সাতদিনে কি অসাধ্য সাধিত হইয়া গেল, ৩০ হর্স-পাওয়ার সংযুক্ত দ্রুতগামী মোটরযানে আরোহণ করিয়া কল্পলোকে ছুটাছুটি করিলেও আপনারা তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। মিছাই হাত পা ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গ-শায়ী হইবেন। আপনারা রাগ করিবেন না; কল্পনা-প্রবণ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকেও যে আমি কট্কাটব্য করিতে সাহসী হইলাম ইহাতেই বুঝিবেন, অসম্ভবের উপরেও কিছু ঘটিয়াছে! কি ঘটিয়াছে এখন তাহাই বলি শুনুন: শুনিয়া চক্ষু স্থির না হয় ত—খুড়ি থাকিল!

শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেশনের সম্মুখে ঐ যে বিরাট ত্রিতল গৃহ, উহার বারান্দার মধ্যস্থলে কি লেখা রহিয়াছে, দেখুন ত!

পল্লবিনী প্রাণতোষিণী ভোজনালয়

আচ্ছা ভিতরে আসুন! কেমন, দেখিয়া চক্ষু জুড়ায় না কি? চারিধার তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঘরে লম্বা লম্বা টেবিল, বড় বড় ইলেকট্রিক ফ্যান, গোল গোল সাদা কাচের বাতি; আবার ঐ দেখুন, বামদিকে Ladies Section, মহিলা বিভাগ। ডান দিকে ম্যানেজারের অফিস। অফিস-ঘরের সামনে কাঠের বোর্ডে—

ভাত ৵১০

ইত্যাদি। [জীবনতোষিণীর নকল, ইহা কাপিরাইট এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত নহে।]

নিম্নে—N. B. এখানে থাকিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। মহিলারাও থাকিতে পারেন। ভাড়া ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য পুরুষগণ ম্যানেজারের নিকট ও মহিলারা লেডী ম্যানেজারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

ম্যানেজার কে, আর লেডী ম্যানেজারই বা কে? এ প্রশ্নেরও যদি জবাব প্রত্যাশায় কোন দুষ্ট পাঠক (বা পাঠিকা) লেখকের মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহেন, তিনি যেন এইখানেই গল্প পাঠ বন্ধ করেন, এই আমাদের মাথার দিব্য রহিল।

জীবনতোষিণীর (পাঠক জীবনতোষিণী ও প্রাণতোষিণী একাকার করিয়া ফেলিবেন না) অধিকারী ভশ্চাজ্জির কাছে পাওনাগণ্ডা যাহা জমা ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া যে এত বড় কাণ্ডটা চক্ষুর নিমিষে গড়িয়া তুলিল, সাইনবোর্ডে তাহার নামটা ধরেন্দ্রই উদ্যোগ করিয়া দিল। তাহার গেঁজেতে ক'টা টাকাইবা ছিল? পঞ্চাশটি বই ত নয়! কত পঞ্চাশ যে সে চালিয়াছে তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে? তাহার নাম পল্লবিনী। বোধহয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহার দেহ 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' ছিল, নামটা তখনকার; এখন পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন হইলেও, তাহা সম্ভব নয়। কথায় বলে, খেলতে জানলে সিনিকড়িতে খেলা যায়। পল্লবিনী তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। ভশ্চাজ্জির ওখানে যাহা পাওনা ছিল, তাহা বাড়ীওলাকে অগ্রিম দিতেই নিঃশেষ, বাকীটা কিরূপে কি হইয়াছে, ধরেন্দ্র তাহা জানে না। পল্লবিনী যখন যে কাগজ দিয়াছে, সে তাহাতে সই করিয়াছে, পল্লবিনী তাহাকে ম্যানেজার করিয়া বসাইয়া দিয়াছে—সে বসিয়াছে, বলিয়াছে, আধাআধি বখরা—পাকা কথা।

প্রথম দিনে লভ্য হইল, কুড়ি টাকা বার আনা।

রাত্রি ১১টার সময় ধরেন্দ্র যখন আহারাদি করিয়া শয্যায় বসিয়া (শয্যা এখন আর সে আমেদাবাদের চাদর ও আবরণ-বিহীন একটি বালিশ নয়, এখন শয্যা! সু-শয্যাও বলা যায়)। বিড়ি ফুঁকিতেছে, পল্লবিনী আসিয়া খাটের ধারে বসিল। আঁচলের খুঁট খুলিয়া দশটাকা ছ'আনা বাহির করিয়া বলিল, এই নাও গো, তোমার আজকের পাওনাগণ্ডা। ধরেন্দ্রের কালোমুখ রক্তে রাঙাইয়া বেগুনে বা ভায়োলেট্ হইয়া উঠিল। পল্লবিনী বলিল, বাবুর কি একটু গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দোব?

হ্যামলেটের মত দ্বিধায় পড়িয়া ধরেন্দ্র বলিল, হাঁ, না, থাক্। দ্বিধার কারণ ছিল, নামে যাহাই হউক, পল্লবিনী বিংশ শতাব্দীর লোক নয়। মনটা কেমন যেন ছম্ ছম্ করে।

পরদিন লাভ হইল, ছাব্বিশ টাকা ছ' আনা এক পয়সা।

তের টাকা তিন আনা আধ পয়সা পাইয়া ধরেন্দ্র বিছানায় উঠিয়া বসিল। পল্লবিনী সেবা 'অফার' করিল। ধরেন্দ্র হ্যামলেটের মত অত বোকা নয়, আজ বলিল, হাঁ—

সেবাসন্তুষ্ট ধরেন্দ্র বলিল, আজকাল ডাক্তাররা এমন দাঁত বাঁধিয়ে দেয় যে বুঝা যায় না।

পল্লবিনী কহিল, আমায় বাঁধিয়ে দেবে গা?

* * *

বিড়ি ছাড়িয়া সিগারেট ধরিয়াছিল বলিয়া পল্লবিনী রাগ করে নাই, চার আনায় টকী দেখা যায় জানিয়াও ধরেন্দ্র এক টাকা দুই আনা নষ্ট করিয়া টকী দেখিয়াছে শুনিয়া পল্লবিনী রণচণ্ডীর রূপ ধারণ করিল।

—অবাক করলে মা! এমনি করলেই তুমি হাতে পয়সা রাখবে আর কি! দু'দিনে ছারে গোল্লায় যাবে! না, আর একটি পয়সা আমি তোমার হাতে দিচ্ছি নে বাবু! আমার কাছেই জমবে, দেশে যাবার সময় পাবে।

সেইদিন হইতে সেই ব্যবস্থাই হইল। অবশ্য, লাভের কড়ি হাতে না আসিলেও ধরেন্দ্রকে অর্থকষ্টে পড়িতে হইল না। যখন যাহা চায়, সে তাহাই পায়; উপরিও কিছু পায়, সেটা পল্লবিনীর কৃত্রিম দাঁতের অকৃত্রিম হাসি। রাত্রি দ্বিপ্রহরে পল্লবিনী রোজই হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া, সেবা করিয়া যায়। মাসান্তে ধরেন্দ্রের ভাগে তিনশত টাকা জমিয়াছে।

দ্বিতীয় মাসান্তে তিনশত—প্রায় ছয় শত; তৃতীয় মাসের শেষে সহস্র পূর্ণ হইল। ধরেন্দ্র এইবার দেশে যাইবে, পল্লবিনীকে তাহা বলিল। পল্লবিনী একটু শুষ্ক হইল, একটু বিমর্ষ হইল, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, গিয়ে বে-থা করবে ত? তখন কি আর আমাদের কথা মনে থাকবে?

মনে যে থাকিবেই, ইহা বুঝাইয়া দিতে ধরেন্দ্র ত্রুটী করে নাই। ধরেন্দ্র কাল ঢাকা মেলে দেশে যাইবে, কাল দুপুরে পল্লবিনী পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া আনিবে কথা স্থির আছে। হঠাৎ সকালে হোটেলের বড় ঠাকুর আসিয়া নিবেদন করিল, গিন্নী-মাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

পায়খানা, কলঘর, ছাদ, গলি, ঘুঁজি, নর্দামা, আস্তাকুঁড় পাতি-পাতি করিয়া সন্ধান করা হইল, গিন্নী-মাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পোষ্টাফিসেও নাই, শিয়ালদহ ষ্টেশনেও নাই; পথে ঘাটে বাজারেও না।

তাঁহাকে পাওয়া গেল না বটে, তবে উত্তম-মধ্যম অনেক পাওয়া গেল। যে মুদী চাল ডাল নুনতেল দিত, যে হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা আলু ও আনাজ দিত, যে গোয়ালা দুধ দিত, যে ব্যক্তি ডিম দিত, যে কসাই মাংস দিত, সকলে মিলিয়া ধরেন্দ্রকে 'গো-বেড়েন' দিল। কত যে দিল, আর কত যে দিল না, তাহার একটা হিসাবনিকাশ হইবার পূর্ব্বেই বাড়ীওয়ালা তাহাকে পুলিশের সুকর-কমলে-সমর্পণ করিল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া ধরেন্দ্র দেখিল, খবরের কাগজ বিক্রয়ে বিশেষ কোন কষ্ট নাই, লাভ নিশ্চয়ই আছে। একখানি সান্ধ্য-পত্রের খুবই বিক্রয়—ট্রামে বাসে প্রত্যেকে না হউক, একশত জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন সেই কাগজ ক্রয় করে। ধরেন্দ্র একখানি কাগজ ক্রয় করিয়া, কাগজপ্রাপ্তির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিল। কমিশন বন্দোবস্তে কাগজের হকার-পদ লাভ হইল।

কাগজ বিক্রয় চলিতে লাগিল। ধরেন্দ্র কাগজ বিক্রয় করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না—লোকে কাগজ কেনে কেন, কাগজে কি থাকে, কি থাকিলে কাগজ হু হু করিয়া কাটে, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করিতে লাগিল। রাত্রে জীবনতোষিণী (পাঠক প্রাণতোষিণী ও জীবনতোষিণী একাকার করিয়া ফেলিবেন না যেন! প্রাণতোষিণী প্রাণঘাতিনী হইয়া নিরুদ্দেশ।) হোটেলে এক পয়সার ভাত, দু'পয়সার কালিয়া ভক্ষণান্তর বাসায় ফিরিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠনের সামনে বসিয়া যখন সান্ধ্য-পত্রখানি লইয়া গবেষণায় নিরত থাকিত, তখন নিম্নলিখিত বিষয় কয়টিই যে সংবাদপত্র পাঠকের নিকট বিশেষ আকর্ষণের বস্তু তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইত না। নিম্নে যে সংবাদ-তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, প্রাত্যহিক পত্রেই তালিকান্তর্ভুক্ত সংবাদসমূহ হয় সম্পূর্ণ, না হয় আংশিকভাবে স্থান লাভ করিত।

তালিকা

১ নম্বর, বড় ঘরের কেলেঙ্কারীর খবর

২ নম্বর, কলেজের ছাত্রীদের কেলেঙ্কারীর খবর

৩ নম্বর, দাম্পত্য-কলহের বিশদ বৃত্তান্ত

৪ নম্বর, দাম্পত্য কলহসূচক মামলার বিবরণ

৫ নম্বর, অবৈধ প্রেমের কাহিনী (গদ্যে ও পদ্যে)

গবেষক ধরেন্দ্র ইহাও লক্ষ্য করিল, যেদিন পঞ্চবাণের এক বা ততোধিক বাণের অভাব থাকে, সেদিন কাগজ বিক্রয় কম হয়, অবিক্রীত সংখ্যা লইয়া বাসায় ফিরিতে হয়। আর

যেদিন পঞ্চশরের অধিক শর নিক্ষিপ্ত হয়, সেদিন কাগজ পড়িতে পায় না—হাঁকিতে হয় না, নেবেন বাবু, নেবেন বাবু বলিয়া সাধিতে হয় না, বাবুরাই ট্রাম বাসের জানালা দিয়া হাত গলাইয়া হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিতে থাকেন।

ছয় মাসে হাতে দু'পয়সা হইয়াছে। ধরেন্দ্র স্থির করিল, আর কাগজ বেচিবে না; একখানা কাগজ বাহির করিবে। বিজ্ঞেরা বলেন, পুরুষসিংহগণ কখন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন না।

হকারগণের সঙ্গে ধরেন্দ্রের সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎসাহ দিতে লাগিল। একটি শুভ দিন দেখিয়া ধরেন্দ্র সাপ্তাহিক "পূর্ব্বাকাশ" বাহির করিয়া ফেলিল। নিবেদনে লিখিত হইল:—

"সমাজের সর্ব্বাঙ্গে দগ্‌দগে ঘা—সর্ব্বদাই পুঁজ, রক্ত নির্গত হইতেছে, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান দায়। আমরা সমাজ-পতিগণের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিব। আমরা নিরপেক্ষ-ভাবে বড় ছোট, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলের দোষ ও গুণ দেখাইব। আমরা কাহারও তোয়াক্কা রাখিব না। আমাদের বিশেষত্ব হইবে—

১ নম্বর, বড় ঘরের কেলেঙ্কারীর খবর

২ নম্বর, কলেজের ছাত্রীদের ঐ ঐ

৩ নম্বর, স্কুলের ছাত্রীদের ঐ ঐ

৪ নম্বর, মেয়ে-বোর্ডিং সমূহের গুপ্ত খবর

৫ নম্বর, দাম্পত্য কলহের বিশদ বৃত্তান্ত

৬ নম্বর, দাম্পত্য কলহসূচক মামলার আমূল বিবরণ ও ঠিকানা ইত্যাদি

৭ নম্বর, অবৈধ প্রেমের কাহিনী (গদ্যে ও পদ্যে, ছড়ায় ও গাথায়)।

আমাদের পাঠকগণ দেখিবেন, পূর্ব্বে যে সান্ধ্য-পত্রের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার বিশেষত্বের উপরে দুই নম্বর বিশেষত্ব "পূর্ব্বাকাশে" চাপিয়াছে।

সম্পাদক হইলেন, শ্রীধরেন্দ্রনাথ খাস্তগীর। প্রথমটা, সম্পাদক হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। ছিল না, কারণ তাঁহার বিদ্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত ঈশপ সাহেবের গল্পের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। আরও কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল, সম্পাদক হইতে হইলে কাগজে লিখিতে হয়। কিন্তু তাঁহার হকার বন্ধুরা তাঁহার ভ্রম অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহারা বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের নজীর দেখাইয়া বলিলেন যে ক-অক্ষর নিষিদ্ধ মাংস এমন ব্যক্তিও স্বগর্ব্বে ও স্বগৌরবে পত্র-সম্পাদনার কাজ করিয়া জগজ্জয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সপ্তাহান্তে দুইটি করিয়া সচল রৌপ্যমুদ্রা দিলে অমুক লেখক হইতে অমুক লেখক পর্য্যন্ত কাগজ ভরাইয়া, চাই কি, ভাসাইয়া দিয়া যাইবে। তাঁহারাই সেইরূপ. কয়েক জনের নাম ও ঠিকানা দিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, কাগজ বাহির হইল।

শুধু বাহির হইল বলিলে সব বলা হইল না। অনেক কাগজই ত বাহির হয় কিন্তু সেই পর্য্যন্ত! পাঠকে তাহাদের মুখ দেখে না, ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ বাহির হয়, তারপর বাঙ্গালা দেশের শিশুদের মত, স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। বাঙ্গালা দেশের বেকারদের সম্মুখে দুইটি দ্বার উন্মুক্ত—(১) ইন্সিওরেন্সের দালালী (২) পত্রিকা সম্পাদনা। ইন্সিওরেন্সের দালালীতে কখন কখন দুই চারি পয়সা ঘরে আসে; পত্রিকা সম্পাদনা প্রায়শঃ বেনোজলের মত, ঘরের কড়িও বাহির করিয়া লইয়া যায়। তবু যে প্রতি মাস, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, প্রতি প্রভাত, প্রতি সন্ধ্যা—এমন কি প্রতি মুহূর্ত্তে কাগজ জন্মাইতেছে, ইহা বিস্ময়েরও বিস্ময়। সে যাহাই হউক, "পূর্ব্বাকাশের" অদৃষ্ট ভাল। কয়েক সপ্তাহ কাগজ বিক্রয় হইতে লাগিল যেন hot cakes, অথবা রথতলার পাঁপড় ভাজার মত। চারি দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, কলিকাতা শহরের ভদ্র ও শিষ্টজনগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। "পূর্ব্বাকাশে" প্রত্যহই যেরূপ সাত নম্বর, কখনও কখনও আট দশ নম্বর পর্য্যন্ত হড় হড় গড় গড় করিয়া বাহির হইতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার কথা বটে। ছিদ্র অল্প-বিস্তর বা ছোট-বড় সকলেরই আছে—তাহাতে কুৎসার তৈলের মশাল জ্বালিয়া গদ্যে পদ্যে ছড়ায় গাথায় প্রচারিত হইতে থাকিলে কুৎসাবুভুক্ষু লোকের কাছে সেই সামান্যও যে অসামান্যে, সাধারণ অসাধারণে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

পদ্মবিনীর শোক কমিয়া আসিয়াছে। পুত্রহারা জননী যেন নবকুমার কোলে পাইয়াছে। আজ ধরেন্দ্র একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাহার নামে সভাসমিতির নিমন্ত্রণ-পত্র আসে, থিয়েটার বায়স্কোপ চিঠি পাঠায়, সান্ধ্য-সম্মিলনাদিতেও আহ্বান

আসে। এখন সে একজন কিষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে। তবে সে কোথায়ও যায় না; বলে, অনেক কাজ, সময় করিতে পারি না। কাজটাজ বাজে কথা, আসল কথা একবার পল্লবিনীর কাছে ঠকিয়াছে, বার বার ঠকিতে সে রাজী নয়। সভাসমিতিগুলিকে সে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া চলে, তাহার ভয় বিপ্তা ধরা পড়িবার অমন স্থান আর নাই! তাহার যে রকম নাম-ডাক, তাহাতে কেহ যদি ধরিয়া বক্তৃতা দিতে তুলিয়া দেয়, তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি! পৃথিবী অবিরত ঘুরিতেছে, মানুষ তাহার হদিস বড় পায় না, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলে ঘূর্ণায়মান জগৎ তাহাকে নাগরদোলায় চাপাইয়া ছাড়িবে। একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিবার উপক্রম করিয়াছিল। সাতু খানসামার গলির তুগতুরণ-ক্লাবের মেম্বাররা তাহাদের এক সভায় ধরেন্দ্রকে সভাপতি করিয়া টেবিলের উপর চেয়ারে লটকাইয়া দিল। বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা করিয়া গেল, সর্ব্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ। সেদিন বড় গুমট, কোথাও এতটুকু হাওয়া ছিল না, ঘরের মধ্যে সকলে গলদঘর্ম্ম হইতেছিল, হঠাৎ সভাপতি সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়া চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন; চেয়ার উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া যাইতেন, চেয়ারের পশ্চাদ্দিকের দেওয়াল সে যাত্রা প্রাণ বাঁচাইল। মান আগেই বাঁচিয়াছিল, এখন প্রাণও বাঁচিল। তদবধি সভাসমিতির নামে তাঁহার বড় ডর।

এতদিনে হাতে দুপয়সা জমিয়াছে, ধরেন্দ্র শীঘ্রই দেশে ফিরিবে। দেশ হইতে মাতাঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন, আড়াই-হাজারীর দত্তবংশের একটি ডানাকাটা পরীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া আছে, ধরেন্দ্র আসিবা মাত্র শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।

হঠাৎ একটু মুস্কিল বাধিয়া গিয়াছে। দুই সপ্তাহ হইতে কাগজ আর বিকায় না। হকাররা লইতে চায় না, বিজ্ঞাপনদাতারাও বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দিতেছে, প্রেসের বিল বাকী পড়িতেছে, অকস্মাৎ এই ব্যাপার ঘটিতে লাগিল।

হকারদের নিকট অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, লেখা-টেখা আর তেমন গরমাগরম হইতেছে না বলিয়াই পাঠকগণ বিরূপ হইয়াছেন। আজকালকার পাঠক বাজারে মৎস্য-ক্রেতার ন্যায় যাচাই করিয়া কাগজ ক্রয় করে, তাহাদের চোখে ধুলা দিবার যো নাই।

ধরেন্দ্র তাহার লেখককে ধরিল। এই মারে ত সেই মারে! তাহার বাড়ী বরিশালে, মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। সেও চক্ষু পাকাইয়া ঘুঁষি বাগাইল দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইল। সেন, ওয়ান্, টু, থ্রি র ওয়াস্তা!

দুই জনেরই মেজাজ যখন ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামিল, তখন লেখক যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—কল্পিত মিঃ সেন, মিঃ রায়, মিসেস্ বোস, মিস চাটার্জ্জীর কেলেঙ্কারীর কথা অর্থাৎ থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড় নাড়াচাড়া করিয়া আর কত লেখা যায়? তাহার ভাঁড়ার খালি!

আসল কথা, সে লোকটিকে অন্য এক কাগজওয়ালা ভাঙ্গাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই কিছুদিন ধরিয়া পূর্ব্বাকাশে যত বাজে কথা লিখিতেছে, আর কাজের কথাগুলা সেই কাগজটায় বাহির হইতেছে। ধরেন্দ্রের নিকট সেই ব্যক্তি মাসে দশ টাকা পাইত, নূতন কর্ম্মস্থলে পনেরো পাইতেছে। দুইটাকে হাতে রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, তাহা যখন সম্ভব হইতেছে না, তখন মূল্য যথায় অধিক মিলে, তৎপ্রতি অবহিত হওয়াই বিধেয়।

লোকটার সহিত বচসা করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া ধরেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া পূর্ব্বাকাশের ফাইল লইয়া বসিল; বসিল, মানে গবেষণা করিতে বসিল। গবেষণায় মগ্ন হইয়া দেখিল, জিনিষটা খুবই সোজা। সোজা যে যতই ভাবে, তাহার হাসি পায়!

পূর্ব্বেকার লেখাগুলার নাম ধামগুলা বদলাইয়া নূতন করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য 'কাপি' প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পুরাতন মিঃ রায়, নূতন মিঃ চ্যাটার্জ্জী হইলেন; তখনকার মিঃ চ্যাটার্জ্জী এখনকার মিঃ পাকড়াশী, মিঃ গুপ্ত মিঃ চাকলাদার হইয়া আবার 'পূর্ব্বাকাশ' রাঙাইয়া তুলিলেন। কাগজ আবার বিক্রয় হইতে লাগিল।

একদিন হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিল একটি যুবতী ও একটি যুবক রঙ-তামাসায় গলিয়া ঢলিয়া যাইতেছে। মেয়েটির হাতে কতকগুলা বই, চোখে চশমা, পায়ে স্যাণ্ডাল, সে যে কলেজের মেয়ে দেখিলেই বুঝা যায়। ছেলেটি বোধ হয় তাহার কাজিন

(কলিকাতায় আজকাল কাজিনেশনের খুব চলন সে শুনিয়াছে), কলেজ হইতে মেয়েটিকে লইয়া থিয়েটার, বায়োস্কোপে বা অন্য কোথায় স্ফূর্ত্তি করিতে লইয়া যাইতেছে।

পর সপ্তাহের কাগজে ধরেন্দ্র খুব রঙ ফলাইয়া ব্যাপারটা লিখিল। লিখিল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, লেখক স্বয়ং যেন উট্‌রাম ঘাটের জনবিরল নারী-আশ্রয় কক্ষে দু'জনকে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। কাগজ বিক্রয় হইল।

আর একদিনও সেই যুবক যুবতীকে দেখা গেল। তাহারা রাস্তা পার হইবে বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ধরেন্দ্র তাহাদের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইল। আজও হাসি তামাসা রঙ-ঢং চলিতেছিল। ট্রাম-বাসগুলা চলিয়া যাইতে, রাস্তা একটু খালি হইলে যুবক বলিল, চল্ অরু!

নামটা তবে অরু! অরুণা কিম্বা অরুন্ধতী? অরুণালাও হইতে পারে! পর সপ্তাহে লিখিল—

কে তুমি হে তরুবর অরুরে
কলেজ হতে ভুলায়ে লইবারে
যাও নিতি নিতি—
ইত্যাদি।

কথায় বলে, লিখিতে লিখিতেই সরে। কথাটা ঠিক। এই দেখুন না, ঈশপ-সাহেবের গল্প মাত্র-সম্বল ধরেন্দ্র আজকাল কিরূপ সুন্দর সুন্দর কবিতা (অহো, কি সুন্দর!) লিখিতেছে।

এবার যেদিন সেই যুগল মূর্ত্তিকে দেখিল, সেদিন তাহার এক অনুগত হকারকে দিয়া একখানা কাগজ যুবকটিকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিল। যুবাও লইবে না, হকারও ছাড়িবে না।

পর সপ্তাহে পূর্ব্বাকাশে লিখিত হইল—

আহা, ভাগীরথীতটে নির্জ্জন সে ঘাট উট্‌রাম
প্রেয়সী অরুরে লয়ে নিরালায় লভিতে বিশ্রাম—

ইত্যাদি! শেষকালে বলা হইয়াছে, আমরা সব জানি'। শীঘ্রই অরুর গুরুজনকে সংবাদ দিতেছি। ইত্যাদি।

রবিবার ধরেন্দ্র বাসায় ফিরিতেছে, দরজার কাছে সেই যুবকটিকে দেখিয়া তাহার মন মেঘোদয়ে ময়ূরের মত নৃত্য করিয়া উঠিল। সে শুনিয়াছিল, কেলেঙ্কারীর আভাসমাত্র প্রকাশ পাইলে, কেলেঙ্কারীর আসামীরা কাগজের মুখবন্ধ করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধরেন্দ্র কাছে আসিয়া সাগ্রহে বলিল, কি চাই?

মেসের পাচক দ্বারের কাছে বসিয়া গুণ্ডি পাণ চিবাইতেছিল, ধরেন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, এই ধরেন্দ্র বাবু।

যুবক পকেট হইতে "পূর্ব্বাকাশ" বাহির করিয়া বলিল, এ সব কার লেখা?

—হেঁ হেঁ।

—ঘোড়া চাক ডাকছ যে! দাঁড়াও ঘোড়ার চাবুকটা বের করি।

উল্টা বুঝিলি রামের ফলে কি হইল, তাহার বিশদ বৃত্তান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ধরেন্দ্র ধরাশয্যায় যখন চক্ষুরুন্মীলন করিল, তাহার কম্পিত অধরোষ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল, মা!

খুব ভিড় জমিয়াছিল; জনতা সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা কোথায়?

ধরেন্দ্র সম্মুখে শিয়ালদহ ষ্টেশন দেখাইয়া দিল।

লোকগুলা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিল, কৈ তোমার মা?

—ঢাকা।

লোকগুলা ভাল, সহৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন, চাঁদা করিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ীতে শোয়াইয়া দিল।

গায়ের ব্যথা মরিয়াছিল, গাড়ী ছাড়িবারও দেরী ছিল! আর সেই লোকগুলাও ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছিল, ধরেন্দ্র 'জীবনতোষিণী'তে গিয়া, বিছানা বালিশ, টাকা পয়সা, জুতা জামা, ব্যাগ ছাতা, ঘটি, মগ, বিড়ির কৌটা, সিগ্রেটের বাক্স, পূর্ব্বাকাশের ফাইল, পল্লবিনীর পরিত্যক্ত একখানা শাড়ীতে বাঁধিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই, গার্ড সাহেবের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।
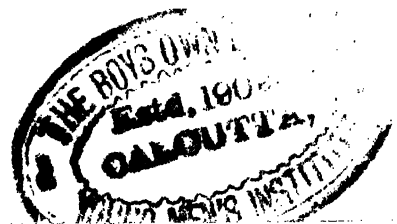
আলোচনা

'পণ্ডিত' শব্দের সংজ্ঞা

পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা : 'বঙ্গশ্রী'র অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য

['অবতার'-এ প্রকাশিত]

[গত ১৯শে ভাদ্র তারিখের 'অবতার' পত্রিকায় "পণ্ডিত পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা : 'বঙ্গশ্রী'র অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য" শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয় : ২৬শে ভাদ্র তারিখে উহার প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। নিম্নে ঐ বাদ-প্রতিবাদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।]

১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'ভারতীয় মহামণ্ডল' শীর্ষক এক সুদীর্ঘ আলোচনা (প্রকারান্তরে গালাগালি) প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই পত্রের পাঠকদিগকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গশ্রীতে উল্লিখিত প্রবন্ধ (?) সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া তৎপরে আমার চিঠি পর্য্যালোচনা করেন। এই আলোচনায় লেখক পাণিনিকৃত 'পণ্ডিত' শব্দের ব্যাখ্যায় ও গীতায় কথিত পণ্ডিত শব্দের ব্যাখ্যায় উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন-"দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও সংস্কৃতবিদ্ যদি নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি সংস্কৃতবিদ্ নহেন এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থবোধ তাঁহার নাই।" তাঁহার বক্তব্যের একমাত্র সহজ ও সরলার্থ এই যে, যদি কোনও সংস্কৃতবিদ্ নিজেকে কখনও পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা হইলে সেই অভিহিত করার জন্যই তিনি সংস্কৃতবিদ্ নহেন এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থবোধ তাঁহার নাই। যদি লেখকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকে, তাহা হইলে আমাদের মতে এবংবিধ হাস্যকর যুক্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তাহা অবিলম্বে কাড়িয়া লওয়া উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর বিষয় হইতেছে এই যে, 'বঙ্গশ্রী'র এই শ্রাবণ সংখ্যায়ই 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা' শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটী আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বত্র 'ভারতীয় বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্‌গণকে' 'পণ্ডিত'-আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তদুপরি উক্ত সংখ্যাতেই 'বঙ্গশ্রী'র কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহের একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—অমুক প্রকরণ পণ্ডিত তমুকতীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, অমুক ভেদতন্ত্র—পণ্ডিত অমুক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্তব্য অনাবশ্যক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে এবং এম-এ কোর্সে পাণিনি ব্যাকরণ ও গীতা পাঠ্য নির্ব্বাচিত আছে। লেখকের বিদ্যার গণ্ডী সুস্পষ্ট। গীতা ও পাণিনি ব্যতীতও যে শত সহস্র স্থানে 'পণ্ডিত' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, তাহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত, সংস্কৃত ভাষায় অমরকোষ, হেমচন্দ্র, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি কয়েকখানি অভিধান আছে। এই গণ্ডীবদ্ধ বিদ্যা জাহির করিবার পূর্ব্বে যদি তিনি অন্ততঃ উহাদের একখানিও খুলিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন "নায়ং দর্পণস্যাপরাধঃ যদেনং অন্ধোন পশ্যতি।"

আলোচনা-কারী আরও লিখিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে প্রকৃত লক্ষণসম্পন্ন কোন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন নাই। বরং পণ্ডিতাখ্যাত ব্যক্তিগণ গত তিন হাজার বৎসর হইতে ভারতীয় দর্শন বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে কতকগুলি কাল্পনিক কথার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে জগতের পূজনীয় ঋষিদিগের হত্যাসাধন করিয়াছেন। এখনও এই পণ্ডিতাখ্যাধারী লোকগুলি প্রায়শঃ ঋষিদিগের 'ঘাতক'তার কার্য্যেই লিপ্ত আছেন।" লেখক নিশ্চয়ই কোথায়ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। সেইজন্যই তিনি ইঙ্গিতে বলিতে পারিয়াছেন,—আজকালকার সংস্কৃত-বিদেরা দূরে থাকুক, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার রত্নগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, কুমারিলভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী, লেখকের "পাণিনিদেব" (ইঁহারা সকলেই গত ৩০০০ হাজার বৎসরের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) কেহই প্রকৃত পণ্ডিত নহেন। সবাই ঘাতক মাত্র। ইহার উপর মন্তব্য করিতে ঘৃণাবোধ হয়। আগামী বারে আলোচনার অন্যান্য অদ্ভুত অংশের পর্য্যালোচনা করিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ

৩০ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা (প্রতিবাদ-পত্র)

['অবতার'-এ প্রকাশিত]

শ্রীযুক্ত 'অবতার' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার ১৯শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় 'পণ্ডিত' শব্দের সংজ্ঞা-সম্বন্ধীয় 'বঙ্গশ্রী'র অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য শীর্ষক একটী বিবৃতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ বিবৃতিটীর

লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ এবং উহা আমাদের শ্রাবণ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত "ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল"-শীর্ষক মন্তব্যের প্রতিবাদ।

"আজকাল যাঁহারা নিজদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করেন তাঁহাদিগকে সংস্কৃতবিদ্ বলা যায় না" ইহাই ছিল আমাদের বক্তব্য। আমাদের কথা আরও পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে বর্ত্তমান কালে আর নিজেকে কেহ 'পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন না, কারণ উহা একটী উপাধি এবং কোন উপাধিতে যথাযথ ভাবে বিভূষিত হইতে হইলে উহার শব্দগত অর্থানুসারে যে যে গুণ ও কার্য্যক্ষমতা বুঝায়, তাহার সমস্ত অর্জ্জন করিতে হয়। আমরা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তদনুসারে 'পণ্ডিত' শব্দে যে যে গুণ ও কার্য্যক্ষমতা বুঝায়, তাহা গত তিন হাজার বৎসর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। কাযেই যুক্তির অনুসরণ করিলে এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও যথাযথ ভাবে 'পণ্ডিত' বলা যায় না। অথচ এই কালের মধ্যে অনেকেই নিজেকে বস্তুতঃ পক্ষে পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। 'পণ্ডিত' আখ্যায় বিভূষিত হইতে হইলে ঐ শব্দের অর্থানুসারে—যে সমস্ত গুণ ও কার্য্যক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন না করিয়াও যদি কেহ নিজেকে 'পণ্ডিত' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয় তিনি প্রতারক, নতুবা 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ তাঁহার অপরিজ্ঞাত। 'পণ্ডিত' শব্দটীর উদ্ভব হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা হইতে। যিনি এই শব্দটীর অর্থ জানেন না, তিনি সংস্কৃতবিদ্ নহেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কাযেই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা নিজদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা যে সংস্কৃতবিদ্ নহেন, তাহাও বলা যাইতে পারে।

'পণ্ডিত'—শব্দের যথাযথ অর্থ কি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রথমতঃ আমরা সংস্কৃত ভাষার মূল ব্যাকরণ 'পাণিনি' ব্যবহার করিয়াছি এবং তদনুসারে আমাদের বিবেচনানুযায়ী 'পণ্ডিত' শব্দের যে অর্থ হয়, তাহার যুক্তিযুক্ততা স্থির করিবার জন্য 'গীতা'য় 'পণ্ডিত' শব্দের যে সংজ্ঞা আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া 'পাণিনি' এবং 'গীতা'র অর্থ যে এক, তাহা দেখাইয়াছি।

উপরোক্ত অর্থানুসারে 'পণ্ডিত' বলিতে যে গুণ ও কার্য্যক্ষমতা বুঝায় তাহা যখন যে-দেশের একজনও লাভ করিতে পারেন, তখন সেই দেশের অবনতি হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গত তিন হাজার বৎসর হইতে আমাদের দেশ ক্রমশঃ অবনত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাযেই যুক্তি অনুসারে বলিতে হয় যে, এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রকৃত 'পণ্ডিত' জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইতিহাস পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয়, ভারতবর্ষ একদিন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ যাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাদৃশ উন্নতি আর কোনও জাতি অদ্যাবধি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য যে যুক্তিমূলক, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা গত কয়েক মাস হইতে আমাদের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধের সমাবেশ করিয়াছি ও করিতেছি।

ভারতবর্ষের এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ভারতীয় ঋষিগণ এবং তাহার পরিচয় আছে তাঁহাদের বেদ, দর্শন, পুরাণ এবং সংহিতাদি গ্রন্থে। এই বেদ, দর্শন, পুরাণ এবং সংহিতাদি গ্রন্থগুলির অর্থ পরবর্ত্তীকালে বিকৃত হইয়াছে বলিয়া কি উপায়ে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সমগ্র ভারতবাসী অন্নাশন ও অন্ধবসনক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যে ভাষায় এই গ্রন্থগুলি লিখিত—তাহারই নাম সংস্কৃত ভাষা এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই এখন আর কেহ আমাদের ঋষিগণের গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারেন না। 'বঙ্গশ্রী'তে এই সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শনাদি গ্রন্থের অর্থ বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি কাল্পনিক কথার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন ভারতবর্ষের গত তিন হাজার বৎসরের তথাকথিত 'পণ্ডিতগণ'। আমাদের মতানুসারে, গ্রন্থকারের বক্তব্য যথাযথ অর্থে ব্যাখ্যা না করিয়া বিকৃতার্থে প্রচার করিলে গ্রন্থকারকে হত্যা করা হয় এবং এতাদৃশ বিকৃত ব্যাখ্যাকারি-

গণকে 'ঘাতক' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে আমরা গত তিন হাজার বৎসরের এবং বর্ত্তমানের ভারতীয় তথাকথিত 'পণ্ডিতগণ'কে ঋষিগণের 'ঘাতক' বলিতে বাধ্য এবং তাহাই বলিয়াছি।

পঞ্চতীর্থ মহাশয় আমাদের উপরোক্ত লেখার কোন্ কোন্ অংশের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে আমরা বুঝিতে পারি নাই।

তাঁহার লেখা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) তাঁহার মতে আমাদের যুক্তি হাস্যাস্পদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া কোন 'ডিগ্রী' আমাদের থাকিলে তাহা কাড়িয়া লওয়া উচিত।

(২) অমরকোষ, হেমচন্দ্র, 'শব্দরূপকল্পদ্রুম'(?) প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে "পণ্ডিত" শব্দের যে অর্থ, তাহা পাণিনিদেবের ব্যাকরণ ও ব্যাসদেবের গীতানুসারে ঐ শব্দের যে অর্থ হয়, তাহার বিরুদ্ধ; কাযেই পাণিনিদেবের ব্যাকরণ ও ব্যাসদেবের গীতানুসারে পণ্ডিত হইতে হইলে যে যে গুণ ও কর্ম্মক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা অর্জ্জন না করিয়াও পণ্ডিতাখ্যাত হইতে পারা যায়।

(৩) গত তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষে কোনও প্রকৃত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহারা লোকতঃ পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত, তাঁহারা বস্তুতঃ পক্ষে ঋষিদিগের ঘাতকতার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিলে অথবা স্বীকার করিয়া লইলে, যখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার রত্নগণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, কুমারিলভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদন সরস্বতীপ্রভৃতি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে 'অপণ্ডিত' অথবা 'ঋষিগণের ঘাতক' বলা হয়, তখন নিশ্চয়ই এই কথা অযৌক্তিক।

(৪) 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা"শীর্ষক প্রবন্ধে যখন "ভারতীয় বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ" ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার আছে—তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকগণও ভারতীয় বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্গণকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের কথার সামঞ্জস্য নাই।

(৫) মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদকগণকে যখন তাঁহারা নিজেরাই পণ্ডিত নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন, তখন কাহাকেও অপণ্ডিত বলিবার তাঁহাদের অথবা 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকগণের অধিকার নাই।

(৬) 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকগণের বিদ্যা গণ্ডীবদ্ধ এবং তাঁহারা "অপণ্ডিত"।

(৭) পাণিনিদেব গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৮) আমরা খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে গালাগালি করিতেছি এবং আমাদের এবংবিধ গালাগালির আলোচনা করাও ঘৃণার যোগ্য।

পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের বক্তব্যগুলির জবাবে আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা এই—

(১) আমাদের কোন্ যুক্তিটী হাস্যাস্পদ এবং কেন তাহা হাস্যাস্পদ, তাহা তিনি আমাদিগকে অথবা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি? তিনি কি বলিতে চান যে, কোন বিশেষ বিশেষ গুণ এবং কার্য্যক্ষমতা অর্জ্জন না করিতে পারিলেও এবং ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় না দিতে পারিলেও, ভারতীয় ঋষিগণ মানুষকে পণ্ডিতাখ্যাত হইবার অথবা করিবার অধিকার দিয়াছেন?

বর্ত্তমান জগতে পরস্পর-গুণকীর্ত্তনকারী-সমাজের (Mutual Admiration Society) সভ্যগণ সম্পূর্ণ যথাযথ ভাবে মানুষের গুণ ও কার্য্যক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়াও মানুষকে যে বিবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন তাহা সত্য এবং তাহার ফলে প্রায়শঃ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও সত্য, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের কোন্ মূল গ্রন্থের কোন্ সূত্রে এবংবিধ উপাধিদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারেন কি?

সংস্কৃত ভাষার জন্মদাতা ঋষিগণের ব্যাকরণানুসারে "রত্ন", "ভগবান্", "বাচস্পতি", "সরস্বতী"প্রভৃতি শব্দের কি অর্থ এবং ঐ সমস্ত আখ্যায় বিভূষিত হইতে হইলে ঋষিদিগের নির্দ্দেশানুসারে কোন্ কোন্ গুণের ও কার্য্যক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন কি? যদি বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে গত তিন হাজার বৎসর হইতে পতনশীল ভারত যাঁহাদিগকে রত্ন, ভগবান্, বাচস্পতি, সরস্বতী

প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণ ও কার্য্যক্ষমতা যে সর্ব্বতোভাবে ঐ সমস্ত উপাধির উপযোগী, তাহা উহাঁদের কার্য্যাবলী ও রচিত ভাষ্য হইতে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

"গণ্ডীহীন" অথবা "অসীম" বিদ্যার অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (১ম অঃ ; ৯ম সূত্র) এই সূত্রটীর অর্থ বুঝিতে পারেন কি ? যে সমস্ত কথা কোন বস্তুর প্রকাশসাধন না করিয়া কেবল কথায় পর্য্যবসিত হয়, সেই সমস্ত কথার ব্যবহার আরম্ভ করিলে মানুষ অমানুষ হইয়া পড়ে, ইহা পতঞ্জলি দেবের নির্দ্দেশ, তাহা অসীম বিদ্যার অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহাশয় ধারণা করিতে পারিবেন কি ? গত তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত 'রত্ন', 'ভগবান্', 'বাচস্পতি', 'সরস্বতী'প্রভৃতি আখ্যাধারীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা যে দেবোপম জগদুদ্ধারকর্ত্তা ভারতীয় ঋষির বাস্তব দর্শন ও বেদগুলিকে 'বিকল্পিত' ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করিয়া তাহাদের বাস্তবতা নষ্ট করেন নাই, অথবা কথার ঝঙ্কারে পর্য্যবসিত মেটাফিজিক্সের (Metaphysics) সৃষ্টি করেন নাই, তাহা পণ্ডিতবর প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি ?

আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে তাহা ঠিক এবং আমরা তাহার উপযুক্ত নহি তাহাও ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের ডিগ্রী কাড়িয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না, তবে পঞ্চতীর্থ মহাশয় জানিয়া রাখুন, আমরা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কখনও উহার বিদ্রোহী নহি। তাঁহার নির্দ্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় মানিয়া লইলে তাহা কার্য্যকরী করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

আমরা আশা করি, পঞ্চতীর্থ মহাশয় উপরোক্ত কথাগুলির যথাযথ জবাব দিয়া এবং তাঁহার প্রমাণগুলি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আমরা যে প্রকৃত পক্ষে হাস্যাস্পদ তাহা প্রতিপন্ন করিবেন, নতুবা মনুষ্যোচিত লজ্জা আশ্রয় করিয়া পুনরায় লেখনীধারণ হইতে বিরত থাকিবেন।

(২) সংস্কৃত ভাষার মূল ব্যাকরণের রচয়িতা পাণিনিদেব অথবা গীতার রচয়িতা ব্যাসদেবের নির্দ্দিষ্ট কোন শব্দের অর্থ অমরকোষ, হেমচন্দ্র অথবা শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট কোন অর্থের বিরোধী হইলে পাণিনিদেব অথবা ব্যাসদেবকে উপেক্ষা করিয়া অমরকোষাদির প্রণেতৃগণকে মানিয়া লইতে হইবে—ইহাই কি পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ?

(৩) তাঁহার প্রথম কথার জবাবে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই কি এই তৃতীয় কথার জবাব দেওয়া হয় নাই ?

(৪) কেবল "ভারতীয় সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ" না বলিয়া একটী "বর্ত্তমান" শব্দ যোগ করিলে এবং "ভারতীয় বর্ত্তমান সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ" এবংবিধ বাক্যের ব্যবহার করিলে কি "বর্ত্তমান" সংস্কৃতবিদ্‌গণের পাণ্ডিত্যের উপর কটাক্ষ করা হয় না ? অবশ্য যেরূপ ভাবে শব্দ ব্যবহার করিলে কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মানুষ বুঝিতে পারে, সমস্ত জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব না হইতেও পারে। আমাদের কি বুঝিতে হইবে, "পঞ্চতীর্থ মহাশয়" মনুষ্যেতর একটা কিছু জীব ?

(৫) পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের বক্তব্যের ৫ম দফার নির্দ্দিষ্ট অপরাধে আমরা অপরাধী, তাহা সত্য। কিন্তু গত তিন হাজার বৎসরের অথবা তদধিক সময়ের জঞ্জাল একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলে, যে জাতীয় মস্তিষ্কাধিকারের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা পণ্ডিতবরের থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের নাই।

(৬) জনসাধারণ এবং আমাদের "পঞ্চতীর্থ মহাশয়" জানিয়া রাখুন যে, "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকগণের বিদ্যা এত গণ্ডীবদ্ধ যে, তাঁহাদিগকে "অপণ্ডিত," "মূর্খ" ইত্যাদি বলা যায় এবং তাঁহারা যে মূর্খ তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। পঞ্চতীর্থ মহাশয় এবং তাঁহার সমশ্রেণীর দাম্ভিক পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য এই যে, তথাকথিত দাম্ভিক পণ্ডিতগণ জানেন না যে, তাঁহারা কত বড় মূর্খ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন, আর "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকগণ তাঁহাদের নিজ মূর্খতার কথা পরিজ্ঞাত।

(৭) পাণিনিদেব যে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ যুক্তিযুক্ত কি না, তাহার বিচার করিবার সামর্থ্য পণ্ডিতবরের আছে কি ?

(৮) আমরা যে ভারতের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে পরোক্ষভাবে গালাগালি করিতেছি তাহা খুবই সত্য এবং প্রকৃত গালাগালি করা যে সাধারণের দৃষ্টিতে অতীব ঘৃণার

যোগ্য তাহাও সত্য ; কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণের দর্শন ও বেদাদি গ্রন্থে কোন্ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় বস্তু আছে এবং তাহা কিরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে, ইহা যদি পঞ্চতীর্থপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বিন্দুমাত্রও অনুমান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা যে কি বেদনার সহিত উপরোক্ত পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেন। পঞ্চতীর্থ মহাশয় জানিয়া রাখুন, যাঁহারা এই জাতীয় বিরুদ্ধ সমলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণসন্তান এবং তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণও উপরোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণকে দেবতাসদৃশ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় ঋষির জ্ঞান একদিন সারা জগতের সম্যক্ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দিতে পারিয়াছিল এবং তাঁহাদের জ্ঞান বিকৃত অর্থে প্রচারিত হওয়ায় আজ জগৎ হইতে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

জগতে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইলে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইতে পারে, ইহা বুঝা কি খুব কষ্টসাধ্য ?

মনুষ্যজাতিকে এবংবিধ দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ভারতীয় ঋষিগণের গ্রন্থের যথাযথ অর্থ পুনরুদ্ধার করা।

আমাদের কথা যে বিবেচনাযোগ্য, তাহা "বঙ্গশ্রী" ক্রমশঃ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে।

ভারতীয় ঋষিগণের গ্রন্থগুলির যথাযথ অর্থ উদ্ধার করিতে হইলে প্রচলিত অর্থ যে ভ্রমাত্মক, তাহা না বলিয়া পারা যায় না। কাযেই প্রচলিত ভাষ্যকারগণকে বাধ্য হইয়া পরোক্ষভাবে নিন্দা করিতে হইতেছে। জনসমাজ কি আমাদিগকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন না ?

মোটের উপর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের সমলোচনায় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের(?) পরিচয় আছে। ইহাই কি বর্ত্তমান সংস্কৃত শিক্ষার সুপরিচালনার নিদর্শন

সম্পাদক মহাশয়, সর্ব্বশেষে আপনার কাছে আমাদের একটী নিবেদন আছে। সে নিবেদনটী এই যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে কৃষিকার্য্য অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভারতীয়-জমীর উর্ব্বরতাশক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, এখন আর কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া নিজ জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না। যে দেশে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য অসাধ্য হয়, সে দেশে মানুষের জীবনধারণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহারই ফলে বর্ত্তমান ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতি। এই দুর্গতি রোধ করিবার একমাত্র উপায় জমীর উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধিসাধন। কি উপায়ে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষিকার্য্য লাভজনক করিতে হয়, তাহা জগতে একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ জানিতেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান আমেরিকা এবং রুসিয়া প্রকৃত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বর্ত্তমান কোন কোন জাতি একটা তথাকথিত কৃষিবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে জমীর উর্ব্বরতাশক্তিও কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহাও সত্য, কিন্তু তাহাতে কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় না এবং উৎপন্ন দ্রব্য সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, ভারতীয় ঋষির উপরোক্ত কৃষিবিজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। ভারতের "রত্ন", "ভগবান্", "বাচস্পতি", "সরস্বতী" প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কৃতকার্য্যের ফলে—এবং এখনও ঐ বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার-কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন এই "পঞ্চতীর্থ" জাতীয় কাণ্ডজ্ঞানহীন তথাকথিত পণ্ডিতগণ। আমাদের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের বক্তব্যের প্রথম দফার জবাবে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। যাহাতে ভারতীয় ঋষির কৃষিবিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করা যায় এব তাহা জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা "বঙ্গশ্রী"র অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমাদের আশঙ্কা হয়, পঞ্চতীর্থজাতীয় পণ্ডিতগণের কথা প্রচারিত হইলে, জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং যাহাতে ঐ বিভ্রান্তি না আসিতে পারে তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কাযেই এই জাতীয় কথা প্রচারিত হইলে তাহার জবাব দিতে বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে আমরা বাধ্য হই। ঐ বিভ্রান্তিকর কথাগুলি আপনাদের কাগজে ছাপা

না হইয়া প্রতিবাদিগণ মৌখিক জবাবের জন্য আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে তাঁহাদের সন্দেহভঞ্জনের সুযোগ হয় এবং তাহাতে সকলের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে আমাদিগকে সুযোগ দেওয়া হয়। আপনার নিকট হইতে কি আমরা এইটুকু সহায়তা আশা করিতে পারি না? ইতি—

বিনীত—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সহ-সম্পাদক, কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ

৫৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় দর্শন

[গত ১৬ই ভাদ্রের 'বৈতালিক' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুইটি প্যারাগ্রাফ প্রকাশিত হয়; উহার যে উত্তর ২৭শে ভাদ্র তারিখের 'বৈতালিক'-এ প্রকাশিত হয়, 'বৈতালিক'-এর মন্তব্যসহ তাহা নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।]

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে অপণ্ডিত ও অশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণিত করিবার জন্য একদল লোক যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাতে মনে হয় উহা লইয়া আন্দোলন সৃষ্টি করায় ব্যক্তিগত লাভ আছে, এমন কোন ব্যক্তি আপনার বা আপনার মুরুব্বির বাক্তিত ও অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই হাস্যকর আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য নহেন—সুতরাং একাজ তাঁহার দ্বারা সাধিত না হওয়াই সম্ভব; তবে কি কোন পাঠক নিজকে অমর করিয়া তুলিবার জন্য এই সহজ পন্থাটা বাংলাইয়াছেন?

*

যিনিই যাহা করুন না কেন—পর্ব্বতকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে পর্ব্বতের কিছুই হইবে না, নিজেরই নখরবিহীন হইবার সম্ভবনা ঘটিবে। ডাক্তার দাশগুপ্ত যে শুধু ভারতের নহে—দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ভারতীয় দর্শনকে পাশ্চাত্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তিনি যে ভারতের গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, একথা আজ সকলেই জানে। তাঁহাদ্বারা ভারতের অমর্য্যাদা হইবে, এমন হাস্যকর কথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না।

ভারতীয় দর্শন ও ডাঃ দাশগুপ্ত : শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

['বৈতালিক'-এ প্রকাশিত]

শ্রীযুক্ত "বৈতালিক"-সম্পাদক মহাশয়ের

করকমলে—

মহাশয়,

আপনার ১৬ই ভাদ্রের বৈতালিকের সংখ্যার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে একটি "প্যারাগ্রাফ" আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

আপনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে, একদল লোক ডাঃ দাশগুপ্তকে অপণ্ডিত ও অশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আপনি কাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন, তাহা আপনার লেখা হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না বটে, কিন্তু আমার মনে হইয়াছে, আপনার উপরোক্ত প্যারাগ্রাফে "বঙ্গশ্রী"র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা"-শীর্ষক প্রবন্ধের উপর কটাক্ষ আছে।

"বঙ্গশ্রী"র ঐ প্রবন্ধ আমি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লিখিয়াছিলাম এবং তাহার সম্পাদকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি কাহারও প্রতি কোনরূপ দ্বেষ-হিংসামূলক বিবেচিত হইলে দায়িত্ব আমার। কাযেই জনসাধারণের অবগতির জন্য আমার কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি এবং তাহাই আমি দিতে বসিয়াছি। আপনার কাগজে আমার কৈফিয়ৎ প্রকাশিত হইলে আমি অনুগৃহীত হইব।

আমি একজন অৰ্দ্ধশিক্ষিত বৈশ্যভাবাপন্ন দোকানদার। ঋষিদিগের রক্ত শরীরে আছে বলিয়া শুনিয়াছি বটে, কিন্তু নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করিতে পারি, এমন কোন কারণ নিজের ভিতর খুঁজিয়া পাই না। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, অথবা কোনরূপ প্রকৃষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া জনসাধারণের নিকট কখনও পরিচিত হই নাই এবং হইবার চেষ্টাও করি নাই এবং ঐ জাতীয় কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। বংশগত সংস্কারানুসারে ঋষিদিগের পুস্তকগুলি নাড়াচাড়া করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা হইতে সামান্য যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে নিজেকে অত্যন্ত মুর্খ বলিয়াই মনে করিতে হয় এবং তাহাই করিয়া থাকি। আমি যদি বলি যে, কোন ব্যক্তিগত লাভের আশায় ডাঃ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা করি নাই, তাহা কি আপনি অথবা আপনার পাঠকবর্গ বিশ্বাস করিবেন না?

বণিক্‌ভাবে জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দিকে আমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, গত বিশ বৎসর হইতে বর্ত্তমান জগৎ ক্রমশঃই বিপদের

সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার প্রধান কারণ জগতের সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরতাশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কোন জমীতে একটা সর্ব্বনিম্ন উর্ব্বরতাশক্তি না থাকিলে কৃষকের পক্ষে তাহার চাষ করিয়া লাভবান হওয়া সম্ভব নহে এবং কৃষক লাভবান না হইতে পারিলে কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম সার দ্বারা জমীর উর্ব্বরতাশক্তি কতক পূরণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে তদ্দ্বারা কৃষক লাভবান হইতে পারে না এবং তাহারই জন্য জগতের সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্যের উপর উপেক্ষার উদ্ভব হইয়াছে। কৃষিকার্য্য না চলিলে শিল্প অথবা বাণিজ্য চলা সম্ভব হয় না এবং ক্রমশঃ মানুষের জীবন ধারণ করা অতীব কষ্টকর হইয়া পড়ে।

কি করিয়া জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিয়া কয়েক বৎসর হইতে আমি ভারতীয় ঋষিদিগের দর্শনের উৎকর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছি এবং আমি অনুসন্ধান করিয়া আমার বুদ্ধিদ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয়, জগতে বর্ত্তমানে বিজ্ঞান বলিয়া যাহা যাহা চলিতেছে, তাহার সমস্তই বিকৃত এবং প্রকৃত বিজ্ঞান একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ জানিতেন। ঐ বিজ্ঞানের লক্ষণ রহিয়াছে ঋষিগণের "পূর্ব্ব" ও "উত্তর" মীমাংসা নামক দুইটি মীমাংসায়, তদনুসারে কার্য্য করিবার "বিচেষ্টা" রহিয়াছে "অথর্ব্ববেদে" এবং ইহার ভিত্তি "ঋক্", "যজু" এবং "সাম" নামক তিনটি বেদ। ঋষিগণ প্রকৃত বিজ্ঞান জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এক সময়ে সারা জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সারা জগৎ এক-মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের আগে "বৈদিক" ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ধর্ম্মের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যে ভাষায় ঋষিগণের ঐ বিজ্ঞান লিখিত, তাহা কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই জন্য এখন তাঁহাদের বাস্তব দর্শন (observations) যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে মানুষ কাল্পনিক মেটাফিজিক্‌স্ (Metaphysics) বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

মনে রাখিবেন, উপরোক্ত সমস্তই আমার ব্যক্তিগত ধারণা এবং আপনাদের প্রবৃত্তি না হইলে আমি কাহাকেও উহা বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না।

দৈনিক সংবাদপত্র পড়িবার সময় ডাঃ দাশ গুপ্তের বক্তৃতা আমার নজরে পড়ে। ডাঃ দাশ গুপ্ত আমার পূর্ব্বপরিচিত এবং তিনি দার্শনিক বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। ইয়োরোপে আমার পরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ একজন দার্শনিক ভারতীয় ঋষির কথা প্রচার করিতেছেন দেখিয়া আমি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। হয়ত অপর কেহ ঐ জাতীয় কথা বলিলে আমার উপেক্ষা আসিত, কিন্তু যাঁহার উপর বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃত শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহার মুখ হইতে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি বিকৃত কথা ঋষিদিগের কথা বলিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমি নিজে যেরূপ অশিক্ষিত, তাহাতে অত বড় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমার পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয়, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ঋষিদিগের কথা আমার মতানুসারে বিকৃত ভাবে ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া ক্ষোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। পরন্তু ঋষিদিগের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন নামে ডাঃ দাশ গুপ্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা আমি করিয়াছি; তজ্জন্য আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি।

"দার্শনিক" বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা ডাঃ দাশ গুপ্ত লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহার উপযোগী কিনা, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাতে আমার সন্দেহ হয়। তদনুসারে আমি তাঁহার সমালোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু তখনও আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয় নাই।

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি তাঁহার যে যে কথা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি এবং ডাঃ দাশ গুপ্তকে কতক-গুলি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার জবাব দিবেন এবং আমি তাঁহার উপর আমার বিলুপ্ত শ্রদ্ধা আবার ফিরাইয়া আনিতে পারিব। জবাবের জন্য "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকগণ আমার অনুরোধানুসারে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরে তিনি সম্পাদক-গণকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার বক্তৃতা যথাযথ ভাবে সংবাদ পত্রওয়ালাগণ প্রচার করেন নাই।

আমার মনে হয়, "তাঁহার বক্তৃতা যে সংবাদপত্রওয়ালাগণ যথাযথ ভাবে প্রচার করেন নাই"—এই কথা হয় অসত্য এবং কাপুরুষতামূলক, নতুবা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

আমি তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা করিয়াছি অন্ততঃ পক্ষে উহা প্রচারিত হইবার দুইমাস পরে। যদি বাস্তবিক পক্ষেই সংবাদপত্রে উহা অযথাযথ ভাবে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি এই দুই মাসের মধ্যে ডাঃ দাশ গুপ্ত উহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না? তাহা না করায় কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই? এবংবিধ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কি একটি কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষে শোভনীয়?

একদিকে খবরের কাগজে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে আমি অনভ্যস্ত এবং তাহা করিতে হইলে দুঃখানুভব করি। অন্য দিকে আমাদের দেবোপম ঋষিদিগের কথার বিকৃত প্রচার হইলেও কষ্ট হয়।

বাস্তবিক পক্ষে ডাঃ দাশ গুপ্ত প্রকৃত দার্শনিক কিনা এবং দার্শনিক আখ্যার কলঙ্ক করিতেছেন কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি হইতেও বহুল পরিমাণে দেখান যায়। এই জাতীয় অপ্রীতিকর আলোচনা যাহাতে অনতিবিলম্বে স্থগিত হয়, তাহা করা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব নহে? তিনি যদি আবার ইয়োরোপে গিয়া ঐ জাতীয় কোন বক্তৃতা করিয়া ঋষিদিগের সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়গণকে বিভ্রান্ত করেন এবং তাঁহার অযৌক্তিকতা আমি ইয়োরোপীয়গণকে দেখাইয়া দিবার অথবা তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় সন্দেহমূলক কথায় যদি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি আমার পক্ষে তাহা অসঙ্গত হইবে? ইতি

বিনীত
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ
২৮, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা : 'বঙ্গশ্রী'র অপূর্ব্ব 'পাণ্ডিত্য'

['অবতার'-এ প্রকাশিত]

[গত ২৩শে ভাদ্র তারিখের 'অবতার'-এ পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনার শেষাংশ প্রকাশিত হয়, তদবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধসহ উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

লেখকের মতে—"বর্ত্তমানে কেবলমাত্র তথাকথিত সংস্কৃতভাষা এবং বিকৃত স্মৃতির কয়েকটী নির্দ্দেশ টিয়াপাখীর মত উচ্চারণ করিতে পারিলেই "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করা যায়।" তথাকথিত সংস্কৃতভাষা কি জিনিস তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, উপরোক্ত বিষয়েরও অংশ না জানিয়া যাঁহারা 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের পায়ে যথেষ্ট সমপ তৈল মালিস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলা উচিত?

লেখক দর্শন ভাল জানেন,—এই কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করার চেষ্টা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মহামহোপাধ্যায়েরা দর্শন জানেন না,—তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। আমি লেখককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তাঁহার ইচ্ছামত যে কোনও মহামহোপাধ্যায়কে বিচারে আহ্বান করিয়া যদি ১০ মিনিট কাল তিনি দর্শন শাস্ত্রের বিচার চালাইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই মহামহোপাধ্যায় সেইদিনই তাঁহার সকল উপাধি বর্জ্জন করিবেন।

এই মহাপণ্ডিত আরও লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা কোনও দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা কি যাহারা গভর্ণমেণ্টের উপাধিবিতরণের পরামর্শদাতা, তাঁহাদিগের 'পণ্ডিত' শব্দের প্রকৃত অর্থের অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?" আমরা যতদূর জানি,—ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ভাগবত শাস্ত্রী প্রভৃতি এই উপাধিবিতরণের পরামর্শদাতা। ইঁহারা কেহই কি দর্শন-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বা কাহারা দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানেন, তৎসম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন না? আশা করি, তাঁহারাই উপরোক্ত মন্তব্যের সম্যক্ আলোচনা করিবেন।

এই দার্শনিক লেখকের শেষ উক্তি হইতেছে—"কি করিলে নিজের অথবা নিজ আত্মীয়স্বজনের উন্নতিসাধন হইতে পারে, বর্ত্তমানে তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, এমন লোক বেশী আছেন বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস হয় না।" চমৎকার উক্তি! মন্তব্য করা নিরর্থক। কেবলমাত্র উন্নতিসাধনের একটী উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছি,—যদি কোনও বর্ত্তমান মহামহোপাধ্যায় একখানি মহাকাব্য লেখেন, তাহা যদি পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয় এবং আধুনিক মহাকাব্য পাঠ্য করিলে সংস্কৃতভাষা, সাহিত্য ও দর্শন রসাতলে যাইবে—এই বলিয়া চীৎকার করিয়া যদি উক্ত পাঠ্য-পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে খুসী হইয়া ব্যক্তিবিশেষ মাসে মাসে পাঁচ সাত শত টাকা করিয়া দিলেও দিতে পারে।

আর এক কথা,—এই সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় মন্তব্যে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে এবং ভাইস চেন্সেলার শ্যামাপ্রসাদবাবুকেও আক্রমণ করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের সংস্কৃতের 'আশুতোষ-চেয়ার' না পাওয়ার সহিত এবংবিধ আক্রমণের কোন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে কি?

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ
৩০ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

"বঙ্গশ্রী", "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা" ও পাণ্ডিত্যাভিমান

["অবতার" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ২৮শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা" শীর্ষক পত্র অবলম্বনে লিখিত]

শ্রীযুক্ত অবতার সম্পাদক মহাশয়ের

করকমলে -

মহাশয়,

আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি আপনার বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইলে অনুগৃহীত হইব :--

"বঙ্গশ্রী" একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা। ইহা মেট্রো-পলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস লিঃ নামক কোম্পানী দ্বারা ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত।

আমি ঐ কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর এবং পরিচালনার দায়িত্বভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের ডিরেক্টর সভার সভ্য :—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল লিঃ, চেয়ারম্যান

বিখ্যাত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এল-সি, এটর্ণী

" স্যার হরিশঙ্কর পাল, সওদাগর

" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

যে সমস্ত কথা বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট "বঙ্গশ্রী" নিবেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ এই—

* * *

[এইখানে বর্ত্তমান সংখ্যায় "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" প্রবন্ধের শেষাংশ ("১। জগতের সর্ব্বত্র জমীর উর্ব্বরতাশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে" হইতে শেষ পর্য্যন্ত) পাঠ করিতে হইবে। ঐ অংশই 'অবতার'-এর পাঠক-বৃন্দের অবগতির জন্য বর্ত্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ অংশ ব্যতীত এই আলোচনার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝা যাইবে না, সুতরাং এই 'আলোচনা'র পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ অংশ পাঠ করিয়া এই আলোচনা পাঠ করিবেন।]

* * *

সংক্ষেপতঃ উপরোক্ত কথাগুলি ফুটাইয়া উঠাইবার জন্য আমি গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে 'বঙ্গশ্রী'তে "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সবস্থা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি।

আমি যে এই কথাগুলি বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ আমার স্বীয় "প্রাণের দায়"। দেশব্যাপী যে হাহাকার উঠিয়াছে তাহার গুরুত্ব এত অধিক বলিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, তাহার গতি অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে, আমাদের কাহারও ব্যবসা লাভজনক থাকিবে না। আমি যে কথাগুলি বলিতেছি, তাহা সাধারণতঃ নেতাগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। হয়ত কেহ কেহ মনে করিবেন, আমি নেতৃত্ব করিয়া অমর হইবার আকাঙ্ক্ষায় এই কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার কাহারও উপর কোনরূপ নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই—তাহা আপ-নারা বিশ্বাস করুন। আমি যাহাদের পরিচালক, তাঁহাদের কাহারও জনসাধারণের উপর নেতাগিরি করিবার আশা করা অসঙ্গত; কারণ আমি নিজেই একজন অৰ্দ্ধশিক্ষিত বৈশ্য-ভাবাপন্ন বণিক্।

আমি বৃদ্ধ হইয়া যথোপযুক্ত প্রবীণতা লাভ করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ বিবিধ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাটাইতেছি এবং মুখ্যতঃ তাহাদের দেওয়া অন্নে স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধিত হইতেছে এবং তাহাদের দেওয়া অর্থে অভিমানজ্ঞাপক মোটরগাড়ী, অট্টালিকা প্রভৃতির ব্যবহার করিতেছি। আমার জীবনব্যাপী সামান্য কার্য্যের ফলে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে বলিতে হয়, একজন সাধারণ শ্রমজীবীর যে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতা আছে, তাহা আমার নাই। কাযেই যদি আত্মপ্রতারণা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, যদিও আমাকে ঘটনা-চক্রে আমার ব্যবসায়ের কার্য্যালয়ে নেতৃত্ব করিতে হয়, তথাপি আমার শিক্ষা ও চরিত্র যে কাহারও উপর নেতৃত্ব করিবার অনুপযোগী, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

মুখ্যতঃ আমি আমার অনুপযুক্ততার কথা পরিজ্ঞাত বলিয়াই "বঙ্গশ্রী"তে প্রাণের দায়ে আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা প্রচ্ছন্ন নামে চলিতেছে।

"পঞ্চতীর্থ" মহাশয় 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে যে মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা আমার লেখা।

তিনি বলিয়াছেন যে, আমি দর্শন ভাল জানি—ইহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ঠিক নহে। খুব সম্ভব

তিনি মনোযোগসহকারে আমার লেখা পড়েন নাই। আপনারা শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গশ্রী'র ঐ অংশ পড়িয়া দেখুন। আমি ঐ জাতীয় কোন কথা লিখি নাই; কারণ ঐ জাতীয় মনোভাব আমার হৃদয়ে নাই। আমার আরাধ্য ঋষিদিগের বিশাল দর্শন-শাস্ত্রের (observations) কথঞ্চিৎ আস্বাদ আমি অনুভব করিতেছি তাহা সত্য, কিন্তু ঐ দর্শনগুলিকে যথাযথ 'দর্শন' করিবার উপযোগী চক্ষু আমি চেষ্টা করিয়াও লাভ করিতে পারিতেছি না বলিয়া সর্ব্বদা দৈন্যানুভব করিয়া থাকি। যদি আমার লেখায় দৈন্য ব্যতীত কোনরূপ দম্ভের প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমি আত্মপ্রতারক এবং শাস্তি পাইবার উপযোগ্য এবং আমার লেখা অনতিবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে।

যাঁহারা উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া ভারতীয় ঋষির দর্শন কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইবার অনুপযুক্ত—ইহা ব্যাসদেবের উপদেশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। ব্যাসদেবের উপদেশ অনুসারে প্রকৃত পাণ্ডিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা দেশের মধ্যে একজনেরও থাকিলে দেশে সর্ব্বব্যাপী এইরূপ হাহাকার উঠিতে পারিত না—ইহাও আমার ধারণা। ইহারই জন্য আমি লিখিয়াছি যে, গত তিন হাজার বৎসর হইতে আমাদের ভারতবর্ষে প্রকৃত পণ্ডিত জন্মেন নাই এবং যাঁহারা নিজদিগকে পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত জানেন না।

পঞ্চতীর্থ মহাশয় তাঁহার চিঠির এক স্থানে লিখিয়াছেন—"* * * যদি কোনও বর্ত্তমান্ মহামহোপাধ্যায় একখানি মহাকাব্য লেখেন, তাহা যদি পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয় এবং আধুনিক মহাকাব্য পাঠ্য করিলে, সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন রসাতলে যাইবে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া যদি উক্ত পাঠ্য পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে খুসী হইয়া ব্যক্তিবিশেষ মাসে মাসে পাঁচ সাত শত টাকা করিয়া দিলেও দিতে পারে" ইত্যাদি।

ইহার সঙ্গে তাঁহার মূল বক্তব্যের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পঞ্চতীর্থ মহাশয় কোন প্রকৃত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চিঠির ঐ অংশ লিখিয়াছেন কি না তাহা প্রকাশ করেন নাই। আংশিক রূপে উহার উপমেয় একটি ঘটনা আমার জানা আছে। আমি পাঠকদিগের বিদিতার্থে তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি, কারণ তাহা না করিলে আমার আশঙ্কা হয়, একটি নির্দ্দোষ লোকের অনিষ্ট হইতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নামক একটি পণ্ডিতকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। তিনি আমার কাছে কয়েক বৎসর আগে কিছু টাকার জন্য আসিয়াছিলেন এবং আমাকে তাঁহার গুরুবংশ বলিয়া একটা সম্মান দেখাইবার অভিনয়প্রসঙ্গে আমার সন্তুষ্টি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আমার ধারণা হয় যে, তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক। তিনি ভারতীয় ঋষির কোন দর্শন অথবা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন কি না তদ্বিষয়েও আমার সন্দেহ হয় এবং আমি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পূরণ করি নাই; তাঁহার উপর আমার বিচার সঙ্গত হইল কি না তাহা নির্ণয়-কল্পে তাঁহার প্রণীত ২১ খানি কাব্যের টীকা ও অনুবাদ স্থানে স্থানে আমি পড়িয়াছিলাম এবং তিনি যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহার প্রণীত একখানি "কাব্য" সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে বসিয়াছেন। ঐ জাতীয় পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অধিকতর বিকৃতি সাধিত হইতে পারে, ইহা আশঙ্কা করিয়া যাহাতে উহা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত না হয়, তদনুরূপ প্রতিবাদ করিবার জন্য আমার বন্ধু—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুরকে আমি অনুরোধ করি। পরিশেষে আমি জানিতে পাই যে, ঘটনা-চক্রে ডাঃ ঠাকুর উহার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ পান নাই।

ডাঃ ঠাকুর আমাদের কোম্পানীর শাস্ত্র-প্রচার বিভাগের অবৈতনিক সম্পাদক। আমরা তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য অদ্যাবধি কোনরূপ আর্থিক সহায়তা করি নাই, অথবা বেতন প্রদান করি নাই।

আমার বিশ্বাস, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থ যাহাতে পাঠ্য না হইতে পারে, তাহার ঔৎসুক্য তিনি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি যাহাতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরক্তিভাজন হন, তাহার একটা

চেষ্টা স্থানে স্থানে চলিতেছে এবং পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপরোক্ত উক্তি তদনুরূপ একটি মনোবৃত্তির প্রকাশক।

আজকালকার পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেক অমায়িক, সত্যবাদী লোক আছেন। আমি তাঁহাদিগকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। পঞ্চতীর্থ মহাশয় যদি আমার লেখা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে, আমি সমস্ত পণ্ডিতসমাজের কুৎসা রটনা করি, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বৃথা অভিমানী হইলেও পরিশ্রমী এবং সময় সময় লোকমুগ্ধকর কথা কহিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। ব্যক্তিগত ভাবে কোন্ পণ্ডিত কতখানি বিদ্যার অধিকারী, তাহা আমার আলোচ্য নহে।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যদি বাস্তবিক পক্ষেই ভারতীয় দর্শন জানিবার ও বুঝিবার উপযোগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভ্রান্তিমূলক এবং আমি অপরাধী এবং আমাকে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

অবশ্য আমার এখনও বিশ্বাস, তিনি সংস্কৃত জানেন না এবং অসঙ্গতভাবে তাঁহার পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই প্ররোচনায় দেশের এই সঙ্কটকালে পঞ্চতীর্থ মহাশয় আমাদের "বঙ্গশ্রী"কে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পঞ্চতীর্থ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"আমি লেখককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—তাঁহার ইচ্ছামত যে কোনও মহামহোপাধ্যায়কে বিচারে আহ্বান করিয়া যদি ১০ মিনিটকাল তিনি দর্শন শাস্ত্রের বিচার চালাইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই মহামহোপাধ্যায় সেই দিনই তাঁহার সকল উপাধি বর্জ্জন করিবেন

পাঠকগণ, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, উপরোক্ত উক্তি দম্ভপ্রসূত কিনা এবং ইহার পশ্চাতে কোন মহামহোপাধ্যায় আছেন কিনা। যদিও আমিই লেখক, তথাপি ইহার জন্য আমি কাহাকেও বিচারে আহ্বান করিব না, কারণ আমার বিশ্বাস, ভারতীয় ঋষিগণের 'দর্শন'গুলি স্বীয় মনে মনে বিচার করিয়া 'দর্শন' করিবার ও উপলব্ধি করিবার বস্তু। তাহা বুঝিবার জন্য অধ্যাপক ও সতীর্থগণের সহিত তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা লইয়া নিজ প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য কাহারও সহিত বাদানুবাদ চলিতে পারে না।

যাঁহারা নিজ প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য অপরের সহিত "দর্শন" লইয়া বাদানুবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা ভারতীয় ঋষির দর্শনের প্রথম উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমার ধারণা; অধিকন্তু আমি ভারতীয় ঋষির "দর্শন" বুঝিবার মত যথোপযুক্ত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইতে পারি নাই—তাহা আগেই বলিয়াছি।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রকৃত সংস্কৃত জানেন না বলিয়া আমার ধারণা—তাহাও আমি প্রকাশ করিয়াছি। ঋষিদিগের সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ভাষার মূল ব্যাকরণ পাণিনির সহিত কথঞ্চিৎ পরিমাণে যথাযথভাবে পরিচিত হইলে উহার "অ কারাদি" বর্ণমালার কোন্‌টীর কি অর্থ এবং কেন তাহার ঐ অর্থ, তাহা জানা যায়।

ঋষিদিগের বাক্যানুসারে মানুষের শরীরে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে তাহার তাৎকালিক "বৃত্তি" অনুসারে অঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রূপে কার্য্য হয় এবং তদনুরূপ শব্দ নির্গত হয়। কাযেই মানুষের অঙ্গ, বৃত্তি, উপাদান, গুণ অথবা অবস্থা তাহার শব্দের অর্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহারই জন্য "বাক্যপদীয়" নামক গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে যে—

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ"

(১ম কাণ্ডের ২৩ শ্লোক)।

প্রকৃত সংস্কৃত ভাষানুসারে কোন প্রকৃত সংস্কৃত শব্দের অথবা পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, এই শব্দটি অথবা পদটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয় যে, উহা মানুষের কোন্ অঙ্গের কীদৃশ অবস্থায় কি উপাদান-সঞ্জাত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে এবং উহা উচ্চারণের ফলে কোন্ শ্রেণীর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

আমার মত অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের পক্ষে কাহাকেও পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা আমি বুঝি এবং স্বীকার করি। অথচ যাঁহারা বৃথা দম্ভে উন্মত্ত, তাঁহারা যে দাম্ভিক, তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করাও সমাজ-সেবায় প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

কাজেই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে আমি প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইতেছি।

পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের কথানুসারে তিনি আমাকে দশ মিনিট সময় দিয়াছেন।

প্রথম মিনিটের প্রশ্ন—

"দর্শন" শব্দের শব্দগত অর্থ কি? এবং "দর্শন" বলিতে যে কার্য্য বুঝায় তাহা কীদৃশ কার্য্য এবং শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের কোন্ কোন্ অবস্থার কোন্ কোন্ উপাদানের মিশণে ঘটিয়া থাকে, তাহা শব্দটীকে বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

দ্বিতীয় মিনিটের প্রশ্ন—

আমার পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ বলিয়া বসেন যে, যাহারা স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞানের ছোটত্ব-বড়ত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা মনুষ্যাবয়বী হইলেও অথবা সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইলেও,ঋষিদিগের ভাষা অনুসারে "মানুষ" ও "ব্রাহ্মণ" নহে, পরন্তু "পশু" ও "চণ্ডাল" এবং ঋষিদিগের ভাষা অনুসারে এই সচ্চিদানন্দবাবু, সিদ্ধান্তবাগীশ এবং পঞ্চতীর্থ, এই তিনটি জীবকে "পশু" ও "চণ্ডাল" বলা যাইতে পারে, তবে বাক্যটি অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়ায় তাহা সত্য, কিন্তু যুক্তি অনুসরণ করিলে, আমরা যে "পশু" এবং "চণ্ডাল" নহি, তাহা জনসমাজে প্রতিপন্ন করিতে প্রথমতঃ "মানুষ" ও "ব্রাহ্মণ" এই দুইটী শব্দের শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, "মানুষ" ও "ব্রাহ্মণ" বলিতে যে যে উপাদান, গুণ ও কর্ম্মক্ষমতাসম্পন্ন জীব বুঝায়, আমাদের সেই সেই উপাদান, গুণ ও কর্ম্মক্ষমতা আছে, অতএব আমরা "মানুষ" এবং "ব্রাহ্মণ"।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "মানুষ" এবং "ব্রাহ্মণ" এই দুইটি শব্দের "শব্দগত" অর্থানুসারে কি কি উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মক্ষমতাসম্পন্ন জীব বুঝায়, তাহা উহার অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দটির সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া আগামী সংখ্যায় পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

যদি যথাযথ না বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বীকার করিবেন কি যে, গভর্ণমেণ্টের উপাধিদানের পরামর্শদাতাগণ প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন এবং তিনি "পশু" ও "চণ্ডাল"?

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি নিজেকে সর্ব্বদাই "পশু" ও "চণ্ডাল" বলিয়া মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছি। কাজেই আমার বালাই নাই।

"পঞ্চতীর্থ" জীবটিকেও যুক্তিযুক্ত ভাবে কিছু বলা যায় না, কারণ তিনি মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধান্তবাগীশের প্ররোচনায় লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহার লেখা হইতে মনে হইতেছে। যদি সিদ্ধান্তবাগীশ তাহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে পাঠকবর্গের বুঝিতে হইবে যে, আমি সিদ্ধান্তবাগীশকে কিছুই বলিতেছি না এবং আমার সমস্ত উক্তি "সিদ্ধান্তবাগীশের" স্থলে "পঞ্চতীর্থ" বলিয়া প্রযুক্ত।

পঞ্চতীর্থের কথানুসারে, যে-কোন মহামহোপাধ্যায় আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারিলে তিনি তাঁহার সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। সমস্ত মহামহোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি করা পঞ্চতীর্থের কাণ্ডজ্ঞানের ন্যূনতার পরিচয় হইলেও, একটি মহামহোপাধ্যায় যে তাঁহার পশ্চাতে আছেন এবং সেই মহামহোপাধ্যায়টি যে তথাকথিত "মহাকারোব" প্রণেতা "সিদ্ধান্তবাগীশ", তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই সিদ্ধান্তবাগীশকে আমার বলিতে হইতেছে যে, তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিলেও আমি তাঁহাকে তাঁহার "উপাধি" বিসর্জ্জন করিতে বলিব না, কারণ ঐগুলি মানুষকে প্রতারণা করিবার অলঙ্কার হইলেও উহা দ্বারা তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। যদি তিনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ থাকিবে তিনটি, যথা—

(১) তিনি দম্ভ পরিত্যাগ করুন এবং নিজে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করুন এবং ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করুন।

(২) তাঁহার ভাবাপন্ন স্বজাতীয় সঙ্গীগণকেও দম্ভ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন এবং তাঁহাদের মধ্যেও যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এখন আর নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করুন এবং তাঁহারা কি হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহার চিন্তা করুন।

(৩) 'সংস্কৃত'-শিক্ষার্থিগণ যাহাতে তাঁহার দ্বারা প্রতারিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার তথাকথিত "মহাকাব্য"খানি আর যাহাতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বন্ধুবর ডাঃ দাশগুপ্তের দ্বারা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।

পাঠকগণ, আমি আপনাদের অনেক সময় লইয়াছি। এখন আপনারা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জবাবের প্রতীক্ষায় থাকুন। দেশের ও মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাকে অনেক অভদ্রোচিত শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আপনারা তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন ও বিদায় দিন। ইতি—

বিনীত
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ
২৮ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শারদ-শ্রী

-শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাদলের ধারা বহে না ক' আর, মাদল বাজে না গগনমাঝে,
লিখিল দেউলে দিক্‌বধূদল, শারদ উষার আলোকে রাজে।
সারা-মাঠভরা ধানের শিশুরা বাতাসের সাথে করিছে খেলা,
বিলের ভিতরে গাঙ্‌শালিকেরা ভ্রমিয়া বেড়ায় প্রভাতবেলা।
ওপারের ওই দূর বালুচরে বটের ঝুরির চরণমূলে,
ভাদরে নদীর ভরাযৌবন-জলতরঙ্গ উঠিছে দুলে।
নীলনভোগাঙে গাহন করিয়া সবুজ রঙের শাড়ীটি পরি'
শারদ-লক্ষ্মী আসে ধীরে ধীরে ধান্যডালিটি শীর্ষে ধরি।
আঙিনায় ফুল ঘুম ভেঙে উঠে।শিশির-সিক্ত সুবাসমাখা,
মধুপ সেথায় গুঞ্জনরত বিছায়ে তাহার কাজলপাখা।

মেঘলা আঁধার দূর করে ওই আশাবরী গাহে অরুণ কবি,
শুভ্র কাশের পড়িয়াছে সাড়া সুরের পুলক পরশ লভি';
মৃদুল হাওয়ার মর্ম্মরধ্বনি বেণুবনে জাগে মধুর প্রাতে,
পল্লীরাণী যে শ্যামল দীঘিতে সাপ্‌লা ফুলের মালা গাঁথে।
সাজি নিয়ে কত ছোট ছোট মেয়ে চলেছে পুষ্প-চয়ন তরে
তাদের নূপুর নিক্কণ শুনি' আকাশ-বধূর হাসিটি ঝরে।
বিহগ-বলাকা হরষে বিভোল শুভ্র আকাশে উড়িয়া যায়,
পাপিয়া দোয়েল তরুশাখা'পরে আগমনী-গান বসিয়া গায়।
মঙ্গল-শাঁখ বাজিছে কোথায়? আজি কি মোদের পুণ্যতিথি!
ভোরের বেলায় ভেসে আসে কাণে দেবী-বোধনের বাদ্যগীতি।

মনে পড়ে যায়, দূর অতীতের রামায়ণী কথা এ শুভক্ষণে,
সীতার লাগিয়া রঘুকুলমণি দেবীরে পূজিল মরণপণে।
আর্য্যঋষির ধেয়ানে গভীর মন্ত্র জাগিল সিন্ধুতটে,
হিমালয় হ'তে জননী আসিয়া দাঁড়ালো পূজার বোধন ঘটে।
সেদিন ভারতজাতির জীবন বিশ্বভুবন করেছে আলো,
স্বর্গ সেথায় এসেছে নামিয়া মহাভারতেরে বাসিয়া ভাল;
আজি ভারতের অতি দুর্দ্দিন কাঁদিছে ভূতলে অভাগা দেশ,
নাহি আর সেই শৌর্য্য তাহার, অতীত সুরের রয়েছে রেশ।
ক্ষুধিত পীড়িত আর্ত্তমানব দুঃখঅঙ্কিত প্লাবনে ভাসে,
বাসুকী-নাগের রুদ্ররোষেই ভূমিকম্পনে মরিছে ত্রাসে।

যদিও জানি হে, এমন দিনেই কত না চোখেই ঝরিছে জল,
জীবনের পথে শুকায়ে গিয়াছে সাধের কুসুম ছিন্নদল,
তবুও সে সব বেদনা মাখিয়া থেক না বন্ধু নীরব ম্লান,
দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া নবজীবনের রচিব গান।
পূজারী যেথায় স্বস্তি-বাচন কহিছে দেবীর চরণতলে,
ভক্ত, সেথায় আবাহন কর দেবীরে ভক্তি গঙ্গাজলে।
পূজা-উপচার সাজায়ে শেফালি সঁপিবে হৃদয়-অর্ঘ্য-ডালা,
অঞ্জলি দিতে পঙ্ক-দুহিতা দাঁড়াবে দুয়ারে কমলবালা।
শক্তিপূজার মন্ত্র সাধিয়া আমরা ফিরাবো দেশের গতি,
শান্তি-সমীর বহিবে ধরায়, লভিব আবার স্বরগ-জ্যোতি।

দক্ষিণাপথ

পনেরো দিনে ভ্রমণ শেষ করতে হবে; সময় অল্প, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অল্প ছিল না। আশ বড়, হাত ছোট হ'লে যেমন হয় তেমন আর কি! ইচ্ছেটা পনেরো দিনে ভারত ভ্রমণ শেষ ক'রে যদি সময় থাকে, এসিয়া খণ্ডটাও দেখে নিই। পুঁজি কত তা আর বলে কাজ নেই! The less said the better. বিয়ের আগে কোন্ ছেলে বা কোন্ মেয়ে রাজা মহারাজা শ্বশুর কল্পনা না করে?

কলকাতা থেকে এক দৌড়ে পুরী,—পুরী থেকে কণারক, কণারকটা আগে দেখা হয় নি। কি-বারই "গন্ধমাদন", খুড়ি, ওর-নাম-কি 'তিনি' ও তাঁর শাবকবৃন্দ সঙ্গে থাকতেন, এবার অতি কষ্টে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য এই মহাজন বাক্যটি মেনে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। জগন্নাথ দেবের পূজা দিয়েই রওনা হওয়া গেল—কণারকের উদ্দেশে। মোটরগাড়ী, মোটরবাস চলে, গোরুর গাড়ীও চলে। বিশেষ কারণে আমি গোরুর গাড়ীর শরণ নেওয়া সঙ্গত বোধ করলাম। বিশেষ কারণ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ছিল, যথা—(১) গোরুর গাড়ী স্বদেশী শিল্পের নিদর্শন (২) এই থেকেই স্বদেশীর দুটো গোরু একটি চালক, আর চালকের পরিবারের অন্নের সংস্থান হবে। মোটরগাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতা করলে আমেরিকা ধনী হতে পারে, তাতে আমার কি!

বড় ডাণ্ডা: জগন্নাথপুরী।

কণারকের স্বর্গামন্দির দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তখন আকাশে সবে মাত্র তরুণ অরুণের রাঙা আলো ফুটছে, কালো মন্দিরের গায়ে এসে পড়ছে সেই অরুণ আলো! ভারতের ভাস্কর্যের বিরাটত্ব ও কল্পনার অভিনবত্ব ভাবতে বসলে জ্ঞান হারাতে হয়। কত যুগ অতীত হয়েছে, দুর্বার কাল কত জিনিষ, কত শোভা, কত সম্পদই ত নষ্ট করেছে, তবু যা আছে, তাতেই মাথা নুয়ে পড়ে তাঁদের পায়ের কাছে,—যাঁরা এই সব বিরাট জিনিষের কল্পনা ক'রে তাতে মূর্ত্তি দিয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সময়াভাবে হ'ল না। ভুবনেশ্বরটা ভাল করে দেখা হয় নি, মনের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুবনেশ্বরের চিত্র, কেবল মুক্তেশ্বর মন্দিরের বিচিত্র সুন্দর তোরণটি মনের চোখে আজও জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাত-বাগে তার একটি ছবি রয়েছে দেখলাম। এবার চক্ষু মুদে ভুবনেশ্বরের রাতুল চরণে বার বার প্রণিপাত করে সুদূরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

সূর্য্য-মন্দির : কণারক।

দশহরা মহীশূর : (মাইসোর)।

তিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, ত্রিভুবনের কোন খবরই তাঁর অজ্ঞাত নয়, আমি যে নিতান্তই অনিচ্ছাসহকারে, কেবল সময়াভাবে তাঁর দরবারে 'প্রক্সি' চালিয়ে গেলাম, এটা জানতে তাঁর বাকী নেই, সুতরাং অপরাধ যে তিনি নেবেন না তা আমি জানি! এত অল্পে দেবতারা অপরাধ নিলে মানুষের সাধ্য কি ছিল, পৃথিবীতে দু'দণ্ড টেঁকে!

খুরদা রোডে ট্রেণ ধরে চললাম। পথে পড়ল চিল্কা। সবে মাত্র সমুদ্র (বঙ্গ-উপসাগর) দেখে এসেছি, তবু চিল্কা দেখতে খারাপ লাগল না। খুব সুন্দরী চপলা তন্বী দেখেও একটি শান্তশিষ্টা ব্রীড়াবনতা গোরোচনা গৌরী দেখতে খারাপ লাগে কি? যারা চিল্কা যান, তাঁরা রম্ভায় নামেন: আর

মুক্তেশ্বর মন্দিরের তোরণ: ভুবনেশ্বর

যাঁরা চলতি গাড়ীতে বসেই চিল্কার শোভা উপভোগ করেন, তাঁরা রম্ভার পর থেকেই গাড়ীর দোর জানালা আশ্রয় করেন। দিগন্তবিস্তৃত নীল বারিবক্ষের মাঝে মাঝে লতাপুষ্প-সমাকীর্ণ দ্বীপগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; চিল্কার এক পাশ থেকে চলে গেছে, সেই বিখ্যাত ওয়েষ্টার্ণ ঘাট পর্ব্বতমালা—কোথাও সুউচ্চ গগনস্পর্শী কোথাও বা সমতল-ভূমির কাছে নেমে এসেছে। চিল্কা খুব গভীর নয়, মাত্র ছয় ফুট গভীর, সাড়ে ছয় ফুট মানুষ ইচ্ছা করলে হেঁটে বেড়াতে পারে। বায়ুতাড়নে জলে এ মৃদু লহরী লীলা। উঠতে তার বেশী ঢেউ কোথায় নেই, তবে মানিকপাটনের কাছে শুনেছি খুব উঁচু ঢেউ, সমুদ্রের সঙ্গে চিল্কার কোলাকোলি সেইখানেই

আমার গাড়ীতে একটি গুজরাটি দম্পতী যাত্রী ছিলেন। খুরদা ছাড়ার পরেই তাঁরা বিভিন্ন বার্থে শয্যা নিলেন, দুজনেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন যে, চিল্কা এলে যেন তাঁদের আমি তুলে দিই। কথা দিলাম, না দিয়ে কি করি? বিশেষ করে মহিলাটি অনুরোধের সঙ্গে মিনতি মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হচ্ছে আর আমি টাইমটেবল ও হাত-ঘড়ি মিলিয়ে যাচ্ছি; উঠে বসলাম রম্ভার আগের ষ্টেশনে।

উপরের বাঙ্কে স্বামী আর নীচে ওপাশের বার্থে স্ত্রী, দুজনেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। স্বামী মহাশয়টি ঘরসুদ্ধ লোককে জানান দিয়ে ঘুমুচ্ছেন; স্ত্রী নিঃশব্দ বটে, কিন্তু প্রায় স্পন্দনহীনা। এখন তাঁদের ডাকতে হবে! স্বামী মহাশয়টির কাছে গিয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিলাম, ভদ্রলোকটির হুঁস হ'ল বলে মনে হচ্ছে না; দিলাম একটু ঠেলা, তাতেও না; এবার ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে ভদ্রলোক পার্শ্বপরিবর্ত্তন করলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে নাসাগর্জ্জন সুরু করলেন। আর **একটা** ধাক্কা, আর একটু জোরে। ভদ্রলোক আবার **right about turn** করলেন; তাঁর নাসিকা স্বকীয় কার্য্য 'যথাপূর্ব্বং' সম্পন্ন ক'রে যেতে লাগল। কি মুস্কিলেই পড়া গেল গা!

রম্ভা এল এবং গেল—এইবারই চিল্কা। চাঁদ উঠেছে—ধরণী বিবাহের বধূর মত সেজেছে, হয় পূর্ণিমা, না হয় প্রতিপদ,

প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বাঙ্গে রূপালী কাপড়। ঐ চিল্কা! জীবনে যে বা যারা ভাল বেসেছে, যাদের ভালবাসা দেহের সৌন্দর্য্য যেন আর কোথাও নেই, সব ঐ নীল জলের উপর রক্তের সঙ্গে স্পন্দনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অণু পরমাণুতে

পর্ব্বত স্তম্ভ (Pillar Rocks) : কোদাইকোনাল।
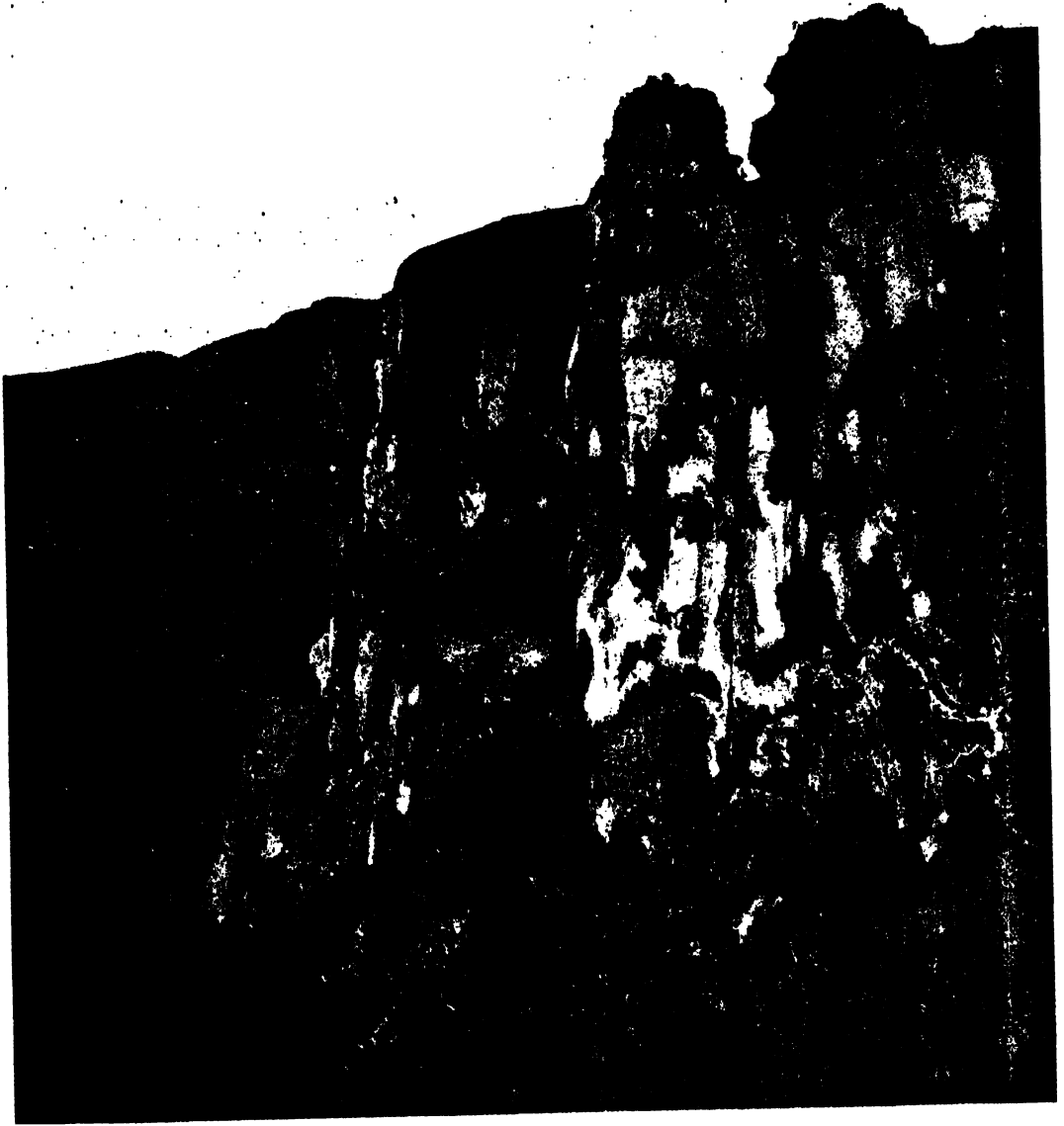
ছড়িয়ে পড়েছে। একলা দুচোখে এ দৃশ্য দেখে যেন আশা মেটে না! সাধ পুরে না। মনে হয়, যাকে ভালবাসি, মিশে গেছে, তাকেই ডেকে এনে দেখাই! একটা ভাল কিছু, সুন্দর কিছু, দেখলেই আমার কি জানি কেন, তাদের

কথাই মনে পড়ে, যাঁদের আমি ভালবাসি, যারা আমায় ভালবাসে। জীবনে কাকে কত বেশী বা কত কম ভাল বেসেছি, তার মাপ করবার চেষ্টা কখনও করি নি, জানি কত লোককেই ভালবেসেছি, আর কত লোকের ভালবাসাই পেয়েছি। এই সব সময় তারা এসে মনের মধ্যে গাদি লাগিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সে কথা যাক্, এই কুম্ভকর্ণ-দম্পতীকে নিয়ে আমি কি করি গা? স্বামীটির আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, স্ত্রীটিকে চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি? বাঙ্গালীর মেয়ে নয় যে,

চিল্কা।
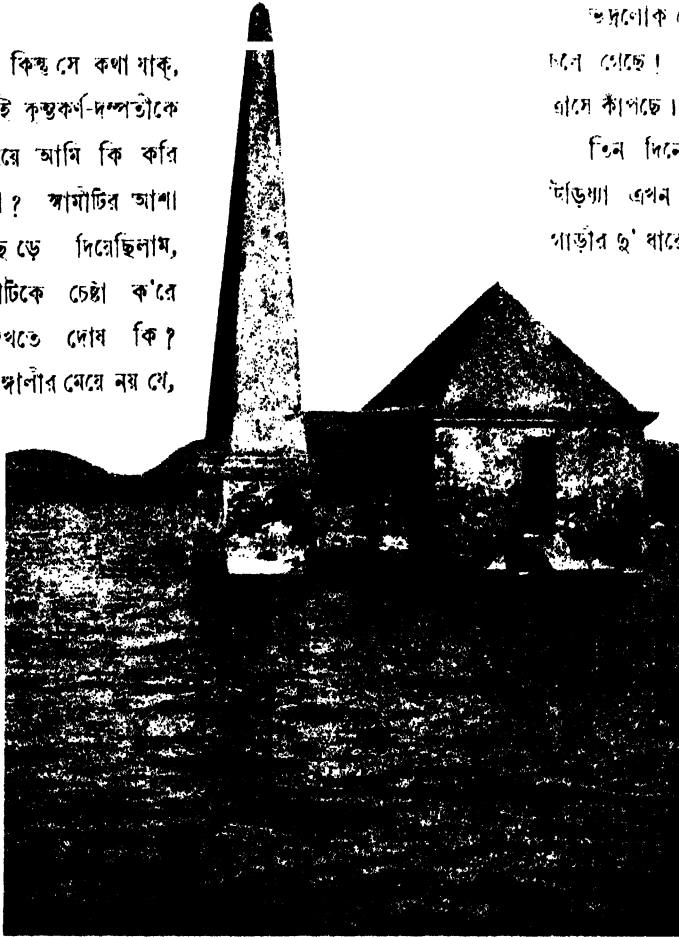
ঠুনকো শালীনতায় আঘাত লাগবে বা ভয় পেয়ে কাণ্ড ক'রে বসবে! ডাকলাম, 'ম্যাডাম' বলে! দেখলাম যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী বটে! ভগবান যেন খুঁজে খুঁজে জোড় মিলিয়েছেন। অনেকবার অনেক রকমে ডাকলাম, সা রে গা মা পা ধা নি, সপ্তস্বরের খেলা দেখালাম, কিন্তু কোন ফলই ফলল না। অগত্যা স্ত্রীকে ছেড়ে আবার স্বামীকে আক্রমণ করলাম—মাথার বালিশটা ধরে এক টান! ভদ্রলোক রক্তচক্ষুতে চেয়ে দেখতেই বললাম—মশাই গো, চিল্কা চলে যায় যে।

—ওকে তুলে দাওনি? বলে বিরাট বপুটিকে নামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম; ভাবলাম, তিনি নামুন, নেমে তাঁর স্ত্রীকে তুলুন।

ভদ্রলোক নেমে স্ত্রীকে তুললেন, কিন্তু চিল্কা তখন সত্যই চলে গেছে! জোৎস্নায়াত প্রান্তর দৈত্যের হুঙ্কারে ত্রাসে কাঁপছে।

তিন দিনে, তিনটি প্রদেশ চলে এসেছি বাঙলা, বিহার উড়িষ্যা এখন চলেছে মাদ্রাজ। দিন রাত গাড়ী ছুটছে, গাড়ীর দু' ধারে নদ-নদী, পর্ব্বত-প্রান্তর, গ্রাম, সহর-সরোবর, 'ছুটছে'। গাড়ী থামলে ওরাও 'থামছে', নইলে সমানে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে চোখে শ্রান্তি এসে পড়ে।

ফসল কি রকম হইবে জানি নে, তবে বেশীর ভাগ মাঠই পড়ে রয়েছে, অকর্ষিত। দেশের লোক যেন চাষের কাজ ভুলে গিয়েছে। বিচার করে দেখলে বুঝা যায়, চাষ করতে তারা ভোলে নি বটে, তবে বাধ্য হয়ে ভুলতে বসেছে বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় তার অন্যতম কারণ। আগেকার কালে—বেশী দিনের কথা নয়—পনের কুড়ি বছর আগেও চাষের দরকার ও সময় মত প্রাকৃতিক বর্ষণ হ'ত, চাষীরা মনের আনন্দে লাঙ্গল ঘাড়ে গরুর লেজ মলতে মলতে মাঠে যেত, চাষ করত, সময় মত ফসল তুলে ঘরে আনত। প্রকৃতি তার স্বভাব বা নিয়ম বদলে ফেলেছে। গত ক' বছরই চাষের সময় হচ্ছে অনাবৃষ্টি। আর সময় অতীত হলে হয়, অতিবৃষ্টি। একে ত ফসল নেই, তার ওপর অতিবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদপাতে চাষী বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হচ্ছে।

দেশের কোন নদীই বৎসরের অধিকাংশ সময় জলভারসমৃদ্ধ থাকে না। নদী বক্ষ জলভারসঞ্চিত না থাকলে জমি

জলপ্রপাত (Silver Cascade falls) : কোদাইকোনাল ।

রসগ্রহণে বঞ্চিত হয়, আকাশ বৃষ্টি না দিলে জমি ফুটিফাটা ও উষর পড়ে থাকে। গত ক' বছর ধরে এই রকমই হচ্ছে। ফসল না জন্মালে কৃষক খাবেই বা কি, জমিদারের প্রাপ্যই বা দেবে কি করে, তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই বা কিনবে কি করে? তাই (অন্য প্রদেশের দৃশ্য চোখে না দেখলেও বাঙ্গালার সে দৃশ্য সমস্তক্ষণই চোখে পড়ছে) বাঙ্গালা দেশে কৃষকের অবস্থা শোচনীয়তম হয়ে উঠেছে। কৃষক কৃষিকাজের আশা-

ত্রিচিনপল্লী।
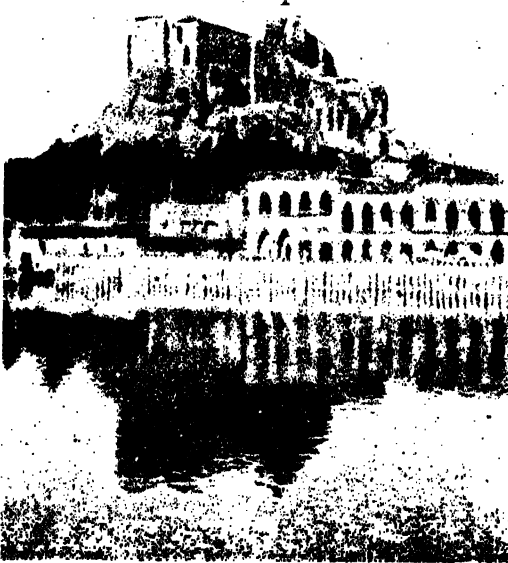
ভরসা ছেড়ে দিয়ে আমাদের মত চাকরী-বাকরীর আশায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্ছি।

এই তিন দিনে কত নদ-নদী, খাল-বিল, রেলের তলা দিয়ে, পাশ দিয়ে 'চলে গেল', কোনটার বুকভরা জল দেখলাম না। কোনটাতে জল আছে—নামে, পায়ের পাতা ডোবে না, কোনটার বুক শুধু বালুভরা, কোনটা সম্পূর্ণ সমতল হয়ে গেছে। এই সকল নদীর বালুকা উদ্ধার করে বারিসমৃদ্ধ করা কি একান্তই অসম্ভব? মাঝে মাঝে আমরা সরকারের চেষ্টায় খাল (Irrigation Canal) খননের কথা শুনি, সরকার যে কৃষকের চাষবাসের কাজের উন্নতি সাধন করবার জন্যেই খাল খনন করান, তাও বুঝতে পারি; কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কয়েকটা Irrigation Canal যে সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদসম, তা কি আর বলতে হবে? ভারতের মানচিত্রে ভারতবর্ষের নদীসমূহ ও জমির অবস্থান লক্ষ্য করলে এ সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সারা দেশের জমি যাতে নদীর জল থেকে সকল সময়ই রস সংগ্রহ ক'রে উর্ব্বরা ও ফসলসমৃদ্ধ হয়, অতীত—সুদূর অতীতকালে কে যেন চেষ্টা করে তাই করেছিল। নদীর উৎপত্তি-স্থান পর্ব্বতশিখর হতে নদীর সঙ্গমস্থান সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত নদীতে আবার যদি জলরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে যে কৃষি-কাজ কৃষক ছাড়তে সুরু করেছে, যে কৃষির অবনতির সঙ্গে দেশের অবনতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেই কৃষি-কাজ আবার লাভজনক হবে, কৃষক আবার জাত-ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হবে; দেশের লুপ্ত সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

আমি বৈজ্ঞানিক নই, বিজ্ঞানের কথা বলবার অধিকার আমার নেই, তবু বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি "বঙ্গশ্রী"তে যা বেরোয় তা পাঠ করে এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানও দেশের কৃষি-সম্পদ অপহরণে যথেষ্ট সহায়তা করছে। "বঙ্গশ্রী"র পাঠকদের দৃষ্টি আমি ঐ অমূল্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলির প্রতি সসম্ভ্রমে আকৃষ্ট করছি এবং দেশের একজন অতি তুচ্ছ সেবকরূপে জনসাধারণকে দেশের দুর্দ্দশা ও তার মোচনের উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

এই যে রেলের দু' ধারে দিগন্ত-প্রসারিত উষর ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, তাতে চাষের ব্যবস্থা করতে পারলে যে, ভারতের দুর্দ্দশার অবসান হবেই সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কৃষি উন্নত হ'লে, কৃষকের অবস্থা ফিরলে, দেশের শিল্প বল, বাণিজ্য বল, ধনরত্ন বল—সবই সমৃদ্ধ হবে। আজ যে জগদ্ব্যাপী হাহাকার, অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে, তার অবসান অবশ্যম্ভাবী হবে। কৃষি উন্নত হলে, তাঁতি আবার মনের আনন্দে তাঁত বুনবে, শিল্পী শিল্প কাজে মন দেবে, বণিক্ ব্যবসায়ে একাগ্রচিত্ত হবে, শাস্ত্রবিদ নিশ্চিন্তচিত্তে শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করবে, অধ্যাপক সন্তুষ্ট মনে পঠন-পাঠনের কাজ করবে, গৃহস্থ গৃহধর্ম্মে স্বর্গের সন্ধান পাবে। কল্পনানেত্রে সোনার ভারতবর্ষের এই সমৃদ্ধ-চিত্র দেখতে দেখতে চোখে জল

এসে পড়ে! মনে হয়, আজ যা কল্পনায় দেখছি, বাস্তবে কি কোন দিনই তা সম্ভব হবে না?

জাঁকজমকের কথা বলতে গেলে বিরাটকায় একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে—আজ আর তা সম্ভব নয়; পরে লিখতে চেষ্টা

দৃশ্য: কে. দাই: বানাল।

মাদ্রাজের কথা পরে প্রবন্ধান্তরে বলব। শুধু মাদ্রাজ নয়, পথে যে 'মহিষুর' দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম, তার কথা, তার করব। ভাগ্যবশে মহিষুর (মহীশূর নয়!) "দশহরা" 'দসারা' দেখা হয়ে গেল।

যাঁরা কখনও দক্ষিণ-প্রদেশে যান নি, তাঁরা কল্পনা করতেও পারবেন না যে, দক্ষিণ দেশের মন্দিরগুলি কত বড়, কত বিরাট, কত সূক্ষ্ম কারুকার্যসম্পন্ন! এক একটি মন্দির যেন সুচিত্রিত পর্ব্বত! দেখে মনে হয় না যে, মানুষ এ সব মন্দির

জলপ্রপাত (Gersoppa falls)।

তৈরী করেছে বা তৈরী করবার ক্ষমতা মানুষের আছে! মাদুরা 'মহিমর' প্রসঙ্গে সে কথা বলব; মাদুরাকে ইংরেজ পর্য্যটকরা Athens of India বলে থাকেন।

পল্লীর গিরিমন্দিরের একটি চিত্র দিলাম।

এইবার গন্তব্য স্থানের কথা বলি। কোদাইকানাল নামে একটি জায়গা আছে। দক্ষিণ প্রদেশ যাঁরা ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা কোদাইয়ের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ ত হয়েছেনই, কোনও দিন ভুলবেন এমন ভরসাও রাখেন না। পাল্নি পর্ব্বতোপরিস্থিত মনোরম কোদাই-এর শোভা-সৌন্দর্য্য দার্জ্জিলিঙের চেয়ে কম ত নয়ই, বরং অধিক। যে বিখ্যাত Pillar Rocksএর ছবি দিলাম, তিন খানি গ্রানাইট প্রস্তর গায়ে গায়ে মিশে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চ দাঁড়িয়ে আছে—এ দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না।

প্রকৃতি দেবী অকৃপণ হয়ে কোদাইকে সৌন্দর্য্য দান করেছেন। মানুষও কম দেয় নি বা কম দিতে চেষ্টা করে নি; কিন্তু প্রকৃতির দানের তুলনায় মানুষের দান নিতান্তই তুচ্ছ। কোদাইয়ের নিকটে তিনটি প্রপাত আছে—তিনটিই সুন্দর। Silver Cascadeটির সৌন্দর্য্য তুলনাতীত।

কোদাইকানালে একটি লেক্ আছে কৃত্রিম নয়, অকৃত্রিম। তবে লেকের শোভা বা সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য মানুষ যা করবার তার ক্রটী করে নি।

কোদাইকানালে একটি মাত্র বাঙ্গালী পরিবার তখন ছিলেন, তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই দূরদেশে, বাঙ্গালী-বর্জ্জিত স্থানে বাঙ্গালীকে পেয়ে বাঙ্গালীর যে আনন্দ, তা বোধ করি বলবার দরকার হয় না। তবে এই আনন্দ-নাটকের শেষাঙ্ক বড় করুণ!

কোদাইকানালের কাছ থেকে সেদিন ভারানত হৃদয়ে বিদায় নিলুম, ছুটির আর চার দিন বাকী, কাজেই ডাউন ট্রেণের খবর রাখা ছাড়া আর কোন কথাই তখন মনে ছিল না।

আসন্ন বিদ্রোহ

অতি দ্রুতগতিতে ভারত যে জ্বলন্ত বিদ্রোহের সম্মুখে আগুয়ান হইতেছে, তাহা ২৭ কোটি বুভুক্ষু কৃষকের বিদ্রোহ। মনে রাখিবেন, তাহারা নির্দ্দোষ, নিরীহ, সংখ্যায় ২৭ কোটি এবং ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইয়া সারা সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছে। কোন কামান-বন্দুক অথবা কূটনীতি এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিবে না। ২৭ কোটি কৃষক অন্নাভাবে বিদ্রোহ করিলে ভারতের বাকী ৮ কোটি লোক যে অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অন্নাভাব পূরণ করিতে পারিবেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত

বঙ্গীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, বাঙ্গালী জনসাধারণের দাবী এবং ইংরাজের কর্ত্তব্য

গত মাসে শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের সমালোচনা হেতু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট চল্লিশটী উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

আচার্য্য স্তর পি. সি. রায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ দেশনেতাগণ সরকারের নূতন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনার্থ "এডুকেশন-লীগ" গঠিত করিয়াছেন।

দেশীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মতে গভর্ণমেণ্টের এই নূতন শিক্ষার পরিকল্পনায় দেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষার বিবিধ সুফল হইতে বঞ্চিত করা হইবে। তাঁহারা ঐ মতানুসরণ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

আমাদের মতে, গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অথবা "এডুকেশন লীগের" ও দেশীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের সমালোচনা কতখানি সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, জনসাধারণ "শিক্ষা" চাহেন কেন। জনসাধারণ কেন শিক্ষা চাহিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলিবেন। "আমরা শিক্ষার জন্য শিক্ষা চাহি" অথবা "সত্যের জন্য শিক্ষা চাহি" অথবা "কৃষ্টির জন্য শিক্ষা চাহি" অথবা "মানবতারজন্য শিক্ষা চাহি" অথবা "পরকালের জন্য শিক্ষা চাহি",—এবংবিধ বড় বড় কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের এই আলোচনা নহে। আমরা জানি, ঐ জাতীয় কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হইলেন বর্ত্তমান কালের প্রকৃত প্রতিভাশালী (talented) উচ্চস্তরের মহামানব (?)। তাঁহাদের কথার অর্থ জনসাধারণের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে, কারণ উচ্চস্তরের (?) ঐ কথাগুলি প্রায়শঃ বাস্তবতাশূন্য এবং উহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা অনুসারে "বিকল্প" বলিতে হয়। ভারতীয় ঋষির মতে ঐ জাতীয় কথা মানুষের "ক্লিষ্টাবৃত্তি"মূলক এবং তাহাতে মানুষ অমানুষ হইয়া পড়ে।

জনসাধারণ কেন শিক্ষা চাহেন, তাহা স্থির করিতে হইলে, জনসাধারণের নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া নিজের প্রতি প্রশ্ন করিতে হইবে, "আমি আমার ছেলেকে অথবা ভাইকে স্কুলে পাঠাই কেন", অথবা "আমি স্কুলে যাই কেন"। ছেলে যাহাতে লেখাপড়া শিখিয়া কিছু রোজগার করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটান সম্ভব হয়, তাহারই জন্য ছেলেদের লেখাপড়া—ইহাই কি উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হইবে না? উচ্চস্তরের মহামানবগণ (?) ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি, যাঁহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপরোক্ত কথা ব্যতীত আর কোন কথা বলিবেন?

কাযেই শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের কোন যাচ্ঞা করিতে হইলে, আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, "হে গভর্ণমেণ্ট, আমাদিগকে এমন শিক্ষা প্রদান করুন, যাহার দ্বারা আমরা কিছু রোজগার করিতে পারি এবং ভবিষ্যতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের দিন কাটান সম্ভব হয়।"

ইহার উত্তরে, গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ-পরিচালকগণ যদি বলিয়া বসেন যে, "আমরা বিদেশী, তোমাদের কি হইলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটান সম্ভব হইবে, তাহা আমরা জানি না"—তাহা হইলে যদ্দ্বারা আমাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটান সম্ভব হয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়।

কি হইলে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটান সম্ভব, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা

ঐ ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ (common), তাহাদের নাম—

(১) জনপ্রতি দৈনিক অর্দ্ধসের চাউল অথবা আটা, কিছু ডাল অথবা মৎস্য, কিছু শাকসব্জী, একটু লবণ, একটু তেল।

(২) খাদ্য সিদ্ধ করিবার উপযোগী সামান্য কিছু বাসন এবং কাষ্ঠ।

(৩) জনপ্রতি বাৎসরিক দুইখানি ধূতি অথবা শাড়ী, একখানি উড়ানি অথবা একটা জামা, একখানি গামছা এবং প্রতি তিন বৎসরে একটী ছাতা।

(৪) শয়নের জন্য একটী মাদুর, একটী বালিশ এবং গোলপাতার অথবা যে কোন রকমের একটী আচ্ছাদন।

(৫) স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আবাসগৃহ নির্ব্বাচন করিবার উপযোগী জ্ঞান।

(৬) পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ না করিয়া পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার মত জ্ঞান।

(৭) রাজা, দেশ ও সমাজ-নেতাগণকে শ্রদ্ধা করিবার মত জ্ঞান।

(৮) মন যাহাতে শান্তিতে রাখা যায়, তদুপযোগী জ্ঞান।

(৯) শরীর যাহাতে ভাল রাখা যায়, তদুপযোগী জ্ঞান।

(১০) সর্ব্বত্র বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(১১) সর্ব্বত্র জল যাহাতে ভাল থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(১২) অসুস্থ হইলে আরোগ্য লাভ করিবার মত জ্ঞান।

(১৩) পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহ হইলে তাহার মীমাংসা করিবার মত জ্ঞান।

উপরে তের দফায় যাহা যাহা দেখান হইল, তাহা চাহেন না, এমন কোন মানুষ জন-সমাজে আছেন কি? মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা, সিনেমা, গ্রামোফোন, বেতার, টেলিফোন প্রভৃতি যে যে জিনিষ সভ্যতার (?) জন্য অনেকে চাহিয়া থাকেন, সেই জিনিষগুলিকে এখনও জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষনীয় বলিয়া নির্ব্বাচিত করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের লোকসমষ্টির বড় অংশ(majority) কৃষক। তাঁহারা এখনও ঐ সমস্ত জিনিষ আকাঙ্ক্ষা করিবার উপযোগী "সভ্যতা" লাভ করিতে পারেন নাই। সভ্যতার (?) উন্নতি সাধন করিয়া যদি কখনও তাঁহাদের প্রাণে ঐ বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যায়, তখন অবশ্য ঐ গুলিকেও জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বলিতে হইবে।

জনসাধারণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যাচ্ঞা এবং তাঁহাদের কার্য্যবিধি

গভর্ণমেণ্ট যখন আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ঐ পরিকল্পনা যাহাতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হয়, তজ্জন্য বাঙ্গালী জনসাধারণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে গভর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত যাচ্ঞাগুলি উপস্থাপিত করা যুক্তিযুক্ত :—

(১) বাঙ্গালী জনসাধারণ যাহাতে নিজ নিজ চেষ্টায় স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য উপরোক্ত ১ম দফা হইতে ৫ম দফায় কথিত আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও আবাস-গৃহ উপার্জ্জন করিতে পারে, তদনুরূপ সামর্থ্য অর্জ্জন করিবার শিক্ষা।

(২) বাঙ্গালী জনসাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য বাঙ্গালার জল-হাওয়া ভাল রাখিতে হইলে ১০ ও ১১ দফায় যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা।

(৩) স্বকীয় শরীর ও মন ভাল রাখিতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন (৮ম ও ৯ম দফা দেখুন) তাহা লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা।

(৪) পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ না করিয়া পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার এবং দ্বন্দ্ব-কলহ ঘটিলে তাহা মিটাইবার জ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা (৬ষ্ঠ ও ১৩শ দফা)।

(৫) বর্ত্তমানে যে রকম বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে প্রায়শঃ একটা না একটা রোগে আক্রান্ত হইয়া সভ্যভাবে (?) অর্দ্ধমৃতপ্রায় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা না করিয়া যাহাতে অসুস্থ হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়, তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা (১২শ দফা)।

৬। রাজপুরুষ ও নেতৃবৃন্দের উপর যাহাতে শ্রদ্ধা সর্ব্বদা অটুট থাকে, তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা (৭ দফা)।

বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা ভাবিয়া দেখুন, উপরোক্ত যাজ্ঞার একটীও অপ্রাকৃত কি না। আপনাদের জনসাধারণের মধ্যে একদিন যে ঐ ছয়টী জ্ঞান ছিল এবং তাহা লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতিও একটা নিশ্চয়ই ছিল, তাহা কি আপনাদের কৃষকবর্গের চালচলনের দিকে লক্ষ্য করিলে এখনও বুঝা যায় না? বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে থাকিয়া চাকুরী না করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও আবাস-গৃহের সংস্থান করিতে পারেন নাই কি? চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র জল-হাওয়া ভাল ছিল না কি? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র সকলের হৃদয় সারা বৎসর আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত না কি? আমাদের সমাজে দলাদলির প্রবৃত্তি অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু আমরা কথায় কথায় এখনকার মত আদালতে মামলা করিতে যাইতাম কি? সালীশ ও সমাজপতিগণ আমাদের দ্বন্দ্ব-কলহ কিছুদিন পূর্ব্বেও মিটাইয়া দিতেন না কি? এখন আমাদের 'সভ্যতা'র সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ছিপ্‌ছিপে শরীর ও খিট্‌খিটে মেজাজের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এত ছিল কি?

এখন যেরূপ কথায় কথায় আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন হয়, আমাদের পিতামহীগণের সময়ে তাহা হইত কি? এখন যেরূপ ডাক্তারের হাতে একবার গেলে আর তাঁহার নিত্য-প্রয়োজনীয়তা ভুলিবার উপায় নাই, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও ঐরূপ ছিল কি? এখন যেরূপ কথায় কথায় আমাদের ছেলেরা রিভলভার ও লাঠী হাতে লইয়া রাজপুরুষদিগের, নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলেন, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও তাহা করিতেন কি?

একদিন যাহা ছিল, এখন তাহা নাই বলিয়া খেদ করিলে চলিবে না। যাহা ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া কাহারও উপর দোষারোপ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাতঃকালের পর দ্বিপ্রহর যখন আসে, তখন প্রাতঃকালের স্নিগ্ধতা ও শীতলতা থাকে না। কিন্তু ঐ স্নিগ্ধতা ও শীতলতা থাকে না বলিয়া কাহারও উপর দোষারোপ করা যায় কি?

আপনারা আর একবার চেষ্টা করিয়া আপনাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাজ্ঞাগুলি স্যার জন এণ্ডারসনের কর্ণে পৌঁছাইবার চেষ্টা করুন। তাঁহাকে বলুন, "শিক্ষার কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে—আমাদের শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক হইবে, তাহা আমরা জানি না এবং আপনার গভর্ণমেণ্ট এই পদ্ধতি সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা যে কিরূপে আমাদের মূল উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি যদি মনে করেন যে, তাহা আমাদের প্রার্থিত উদ্দেশ্যগুলির সাধনের সহায়ক, তাহা হইলে ঐ পরিকল্পনাগুলির যুক্তিযুক্ততা আপনার শিক্ষা-মন্ত্রী যাহাতে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তাহার ব্যবস্থা করুন। নতুবা, যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মূল উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হয়, তদনুরূপ তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করুন।"

আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন কিছু যাজ্ঞা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে অসহযোগের প্রবৃত্তি রাখিলে চলিবে না। কারণ, অসহযোগের প্রবৃত্তি থাকিলে আপনারা কপট ও কৃত্রিম হইয়া যাইবেন এবং তাহাতে আপনাদের নৈতিক সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। আমাদের পরামর্শানুসারে আপনাদিগকে গভর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে।

আপনাদের সকলের পক্ষে হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে স্যার জন এণ্ডারসন পর্য্যন্ত পৌঁছান সম্ভব হইবে না, অথচ আপনাদের প্রত্যেকেরই আপনাদের সন্তানগণের অথবা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল-রত্নগুলির শিক্ষাসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য আছে। আমাদের বাঙ্গালীর শিক্ষার প্রধান বাহন—দুই হস্ত-সমন্বিত আমাদের গভর্ণর—তাঁহার একটী হস্তের নাম "শিক্ষামন্ত্রী" এবং অপর হস্তটী দুই খণ্ড বিশিষ্ট। এক খণ্ডের নাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং অপর খণ্ডের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার। শিক্ষা বিভাগের অপরাপর বাহনগণের নাম—ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন, সিনেটের সভ্যগণ, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ, কলেজের সপারিষদ অধ্যক্ষগণ, স্কুলের সপারিষদ প্রধান শিক্ষকগণ।

সকলের পক্ষে গভর্ণর পর্য্যন্ত পৌছান সম্ভব না হইলেও উপরোক্ত শিক্ষা-বাহনগণের মধ্যে কাহারও না কাহারও কাছে পৌছান আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর। শিক্ষা-বাহনগণের মধ্যে যাঁহার কাছে যিনি পৌছিতে পারেন, তাঁহার কাছে পৌছিয়া আপনাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত দাবী পেশ করুন এবং তিনি যাহাতে আপনাদের ঐ দাবী তাঁহার উপরওয়ালার নিকট পৌছাইয়া দেন এবং ক্রমশঃ যাহাতে উহা গভর্ণর মহোদয়ের নিকট পৌছাইতে পারে, তাহার সম্ভাবনার ব্যবস্থা করুন। মনে রাখিবেন, এই শিক্ষার ব্যবস্থাই আপনাদের জীবন-মরণের অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা।

শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এবং তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যসূত্র

কোন গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি দৃঢ়মূল করিতে হইলে, শিক্ষা-পদ্ধতি যে কতদূর সুচিন্তিত এবং জনসাধারণের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা-(common desire)-পূরণের সহায়ক হওয়া উচিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জনসাধারণ যাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, ব্যবহার্য্য এবং বাসস্থান উপার্জ্জন করিতে পারেন, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এবং কার্য্যতঃ জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের স্বোপার্জ্জনে খাদ্যাদির সংস্থান করা সম্ভব হইলে, তাঁহারা স্বতঃই গভর্ণমেণ্টের উপর অনুরক্ত হইয়া থাকেন। ইহার পর, যদি আবার তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও শান্তি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা ও জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কি কোন শক্তি দুর্দ্দৈব হইলেও জনসমষ্টির সমক্ষে গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে?

শিক্ষা সম্বন্ধীয় পদ্ধতির অপূর্ণতা বশতঃই গ্রীকগণের সময় হইতে অদ্যাবধি কোন রাজত্ব জগতে ছয় শত বৎসরের অধিক প্রভুত্বসম্পন্ন হইতে পারে নাই, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। শিক্ষা-পদ্ধতির অপূর্ণতার জন্যই বর্ত্তমান ইয়োরোপের অশান্তি এবং বেকারের প্রাদুর্ভাব এবং তাহারই জন্য ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে নানা রকমের অশান্তি স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান অশান্তি দেখিলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষা-সংস্কার সুফলপ্রদ হয় নাই। লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষা-সংস্কার যে সুফলপ্রদ হয় নাই, তাহা আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন বুঝিতে পারিয়াছেন—ইহাও মনে করিবার কারণ আছে।

স্যার জন এণ্ডারসন যে ভাবে শিক্ষার নূতন পরিকল্পনাগুলি লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে, তিনি যে তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি সতর্ক না হইলে ঐ পরিকল্পনাগুলি বিচারের জন্য জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইত না। আমরা তাঁহার দূরদর্শিতার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনাগুলি যে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সহায়ক হইবে না, তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

জনসাধারণ যে যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য বিদ্যার্থী হইয়া থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শিক্ষা-পদ্ধতিকে ঐ আকাঙ্ক্ষাপূরণের সহায়ক করিতে হইলে—প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে চাকুরীর বিনা সহায়তায় আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও বাসস্থানের সংস্থান হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ থাকিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যখন কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের মধ্যে আহার্য্যের, ব্যবহার্য্যের ও বাসস্থানের সর্ব্বব্যাপী একটা অনটন উদ্ভূত হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই অল্প বয়স হইতে একটা না একটা অসুস্থতায় ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলি যে দোষযুক্ত, তাহা সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। কি কি উপায়ে জনসাধারণের আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও বাসস্থানের সংস্থান অথবা দেশের জল-হাওয়ার স্বাস্থ্য সাধন ব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত না করিয়া তাহার উপার্জ্জন করিবার কোন শিক্ষা-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইতে পারে কি?

এই দুইটী ব্যবস্থা করা খুব সহজ নহে, কারণ স্যার জন এণ্ডারসনের নিজের দেশ ইংলণ্ডকে ভুলিলে চলিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশ হইতে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে হইবে, নতুবা কোন দেশের কোন নূতন ব্যবস্থা—বিপন্ন ব্রিটিশ-জনসাধারণের দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে, তাহা আমাদিগকে

মনে রাখিতে হইবে। স্যার জন এণ্ডারসনের পক্ষে কি তাঁহার মন্ত্রী-সভার সহায়তায় উভয় কূল রক্ষা করা যাইতে পারে, এমন একটা অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান-বিধায়ক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে? আমরা তাঁহার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার দ্বারা ঐরূপ একটা ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে। যদি শৃঙ্খলিত ভাবে তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে একটা শিক্ষা-সংস্কারের অভিনয় করিয়া কি ফলোদয় হইবে?

শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে এডুকেশন-লীগের ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার যৌক্তিকতা

"এডুকেশন-লীগ"-গঠন-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং সেখানে যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই আমাদের নেতা ও সম্মানার্হ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের অনেকেরই শিক্ষা-গুরু। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার বক্তৃতা পুরাপুরি বুঝিতে পারি, এমন শিক্ষাও আমরা তাঁহার নিকট পাই নাই। আংশিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, তাঁহার মতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভার বিকাশ সাধন করিয়া পণ্ডিতের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে তাঁহাদের দুঃখদারিদ্র্যের উৎপত্তি হইতেছে।

তাঁহার এই কথার উত্তরে আমরা তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টী জিজ্ঞাসা করিতে চাই—

(১) বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিভার বিকাশ সাধিত হইতে পারে এবং হইতেছে, এই বিশ্বাস যদি তাঁহার থাকে, তাহা হইলে তিনি এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়টীকে গোলদীঘিতে নিমজ্জিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন কেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষার সংস্কারেই বা প্রয়োজন কি?

(২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন প্রকৃত প্রতিভাবান্ পণ্ডিতের উদ্ভব যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের অন্ন-বস্ত্র-সংস্থানের ক্ষেত্রের অভাব হইতেছে কেন? আমাদের পণ্ডিতগণ জনসাধারণের অন্ন-সংস্থানের জন্য যে যে যুক্তিযুক্ত দাবী গভর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোন্‌টী গভর্ণমেণ্ট পূরণ করেন নাই, তাহা আচার্য্যদেব আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন কি?

আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতটুকু দেখিতে পারিয়াছি, তদনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, গভর্ণমেণ্ট আমাদের অন্নসংস্থানের কোন যুক্তিযুক্ত দাবী অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু কি হইলে আমাদের সকলের অন্নসংস্থান হইতে পারে, তাহার শিক্ষা আমাদিগের পণ্ডিতগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে পান নাই বলিয়া এবং তাঁহাদের তাহা জানা নাই বলিয়া আমাদের সার্ব্বজনীন অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যুক্তির অনুসরণ করিলে, ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ অধিকতর দায়ী। মনে রাখিতে হইবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণই আমাদের গভর্ণমেণ্টের মেম্বার, মন্ত্রী, ইত্যাদি। জনসাধারণ, এই পণ্ডিতগণকে চিনিবার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনাদের রক্ষা নাই।

দেশীয় সংবাদদাতাগণের মতানুসারে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের বিবিধ উপকার সাধন করিয়াছে। আদালতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং তদনুসারে ইংরাজী ভাষা আমাদের জানা দরকার, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইংরেজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের অনিষ্ট ব্যতীত কি ইষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি ইংরাজের জ্ঞান এতই প্রয়োজনীয় ও ইষ্টপ্রদ হয়, তাহা হইলেই বা শিক্ষার সংস্কারের কি প্রয়োজন আছে?

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষা

শিক্ষা-জগৎসংশ্লিষ্ট সংবাদসমূহের মধ্যে গত প্রায় এক মাস সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য :

> নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জি. আর. হাণ্টার কর্ত্তৃক ঐ শহরের কনভোকেশন-হলের বক্তৃতা। ডাঃ হাণ্টার ভারতের ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, এদেশের উন্নতির পথে ইহার জলবায়ুই প্রতিবন্ধক।

নিশ্চয়ই এমন একটা অসভ্য দেশ আর জগতে নাই! প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে চমৎকার জ্ঞানের পরিচয় বটে!

> লণ্ডনের কোনও ছাত্র-সভায় প্রদত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা। তাঁহার মতে জাতীয় গৌরব কিংবা কোন কিছুর হানি না করিয়া ভারতীয় ভাষাসমূহে ব্যবহৃত লিপি রোমান লিপিতে পরিবর্ত্তিত করা চলে।
>
> (গৌহাটী সাহিত্য-পরিষদে ৯ই আগষ্ট তারিখে এই বিষয়ে এক তর্ক-সভারও অধিবেশন হয়।)

জাতীয় গৌরবও থাকিবে অথচ নিজস্ব ভাষাও বিসর্জ্জন করা চলিবে—এমন সুন্দর "সোনার পাথরের বাটী" দেখিবার জিনিষ বটে! কাহারও যদি পয়সা থাকে, তাহা হইলে ডাঃ চাটুয্যের মাথাটা কিনিয়া রাখিবেন; সময়ে জমীর সারের কার্য্য চলিবে।

> গত ২০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা রোটারি-ক্লাবে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডব্লিউ. এ. জেঙ্কিন্স-এর 'শিক্ষা ও জাতীয় আন্দোলন'শীর্ষক বক্তৃতা। রুশিয়া, ইটালী ও জার্ম্মানীর বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, একমাত্র শিক্ষা-নীতির সাহায্যেই ইচ্ছানুরূপ দেশবাসীর গঠন সম্ভব।
>
> বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রী এই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

খুব বেশী হইলেও, আর ৮।১০ বৎসর অপেক্ষা করিলেই ইয়োরোপীয় প্রত্যেক দেশটীর শিক্ষার উন্নতির চরম যে কি বস্তু, তাহা সকলের চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিবে। ততদিন অনেক কথা আমাদিগকে শুনিতেই হইবে।

> ঐ তারিখেই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক লাট সাহেব লর্ড ব্রাবোর্ণের বক্তৃতা। প্রকৃত 'জ্ঞান' অর্জ্জন এবং তৎসহিত মানসিক উৎকর্ষই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য; পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা নিতান্ত গৌণ কারণ।

ইয়োরোপীয়গণের মুখে প্রকৃত 'জ্ঞান' ও মানসিক উৎকর্ষের কথা খুব ভাল শুনায়! প্রকৃত 'জ্ঞান' ও 'মন' কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অসাধারণ!

> বোম্বাই সহরে ডাঃ বি.এস. মুঞ্জে কর্ত্তৃক 'হিন্দু জাতি ও সামরিক শিক্ষা'শীর্ষক বক্তৃতা: হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা তুলিবার একমাত্র উপায় সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনা।

নিশ্চয়!—বর্ত্তমান সামরিক বিজ্ঞানে ও শিক্ষায় ইয়োরোপে যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে, তাহা ভারতবর্ষে না আনিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নহে (?)।

> কালীঘাটে কাঞ্চী কামকোঠী পীঠের জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা। তাঁহার মতে বর্ত্তমান কালের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ 'বুদ্ধিমূলক'; 'আধ্যাত্মিক' ভাবের সহিত বিন্দুমাত্র সংযোগ না থাকায় এই শিক্ষা পাশ্চাত্যাহারের মত্ত মানুষের কোন উপকারে আসে না।

"বুদ্ধি" ও "আত্মা"য় এতখানি তফাৎ! ভারতীয় ঋষির প্রণিধানযোগ্য কথা বটে!

> ৩০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত জি. এল. মেটার 'সভ্যতার সংঘর্ষ' বিষয়ে বক্তৃতা: কৃষিকার্য্য কি কুটীর-শিল্পের যুগে ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অশোভন, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অশুভ ফলসমূহের কথা ভাবিলে ইহা ব্যতীত আর পথ নাই বলিয়াই মনে হয়।

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা (?) ছাড়িয়া অসভ্য কৃষি ও কুটীর-শিল্প গ্রহণ করিবার মত দুঃখের কথা আর কিছু নাই (?), ইহা নিশ্চিত সত্য!

> ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রদত্ত কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীর বক্তৃতা। বক্তৃতায় তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, সংস্কৃত পুরাণগুলিতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০০ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত আছে।

ভারতীয় ঋষির "পুরাণ"গুলিতে ইতিহাসের কথা আছে, ইহা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানার সম্যক্ পরিচয় (?), তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই!

> কাশী বিদ্যাপীঠের সমাবর্ত্তন-সভায় দিল্লীর ডাঃ জাকির হোসেনের বক্তৃতা: ভারতের উন্নতির একমাত্র পন্থা 'জাতীয় শিক্ষা'।

আমাদের বোধ হয়, পশুজাতির শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে ভারতবাসীদের উন্নতি আরও দ্রুত হইবে।

মাদ্রাজ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রাও বাহাদুর এ. টি. পান্নির-সেলভাম কর্তৃক কুম্ভকোনাম বিদ্যালয়ে বক্তৃতা: কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে শিক্ষিত আখ্যাত হওয়া যায় না।

রাও বাহাদুরকে আমাদের নমস্কার না জানাইয়া পারিলাম না। পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি-র যুগে এতখানি বলা দুঃসাহসিকতার পরিচয় বটে!

*

এই মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট সংবাদসমূহ:

ভূ-পদার্থবিদের ভূতলস্থ খনিজদ্রব্য-সন্ধান-সহায়ক বৈদ্যুতিক চৌম্বক ও বিস্ফোরক সংক্রান্ত উপায় আবিষ্কার।

বিস্ফোরিত হওয়ার তথ্যটী কবে আবিষ্কৃত হইবে?

আমেরিকার বয়ডেন বেধশালায় এবং অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের মেজেলস্পুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছায়াপথের অপর পার্শ্বের জ্যোতিষ্কসমূহের গতিবিধি পর্য্যালোচনার্থ অতি প্রবল শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণযুক্ত ক্যামেরা স্থাপন।

ইহার পর মনুষ্যজাতির ছায়াপথ পর্য্যন্ত উড়িবার কথা! পাঠকগণ ঐ তথ্যের অপেক্ষায় থাকুন। এখন সব পথ ছায়া-ছায়া দেখা যাইবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার শাহ মোহাম্মদ সোলেমান কর্তৃক স্থানীয় বিজ্ঞান-পরিষদে তাঁহার নূতন আপেক্ষিক বাদের তৃতীয় পর্য্যায় আলোচনা প্রদান।

প্রণিধানযোগ্য আলোচনা বটে!

দিনেমার ইঞ্জিনীয়ার এম. রাউন কর্তৃক বৈদ্যুতিক মারণরশ্মি আবিষ্কারের দাবী।

আমাদের অবোধ্য।

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ডাঃ এস. কে. মিত্র কর্তৃক আয়নমণ্ডল বিষয়ক আলোচনার উদ্বোধন।

ইহার পর আবার স্বয়ং "বিশ্বামিত্রে"র জন্ম-পরিগ্রহ পাঠকগণ আশা করিতে পারেন।

যুক্তপ্রদেশের বিজ্ঞান-পরিষদে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ নীলরতন ধর কর্তৃক ঝোলাগুড়ের সার হইবার বিশেষ উপযোগিতা বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ।

এত সস্তা সার না হইলে কি কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়? হতভাগা চাষীরা এই সমস্ত বিজ্ঞানের তথ্য বুঝে না বলিয়াই ত তাহাদের মরণ।

বোম্বাই রোটারি-ক্লাবে কোলাবা মানমন্দিরের আবহতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত এস. সি. রায় কর্তৃক দেশে ভূকম্পন-প্রতিরোধক শাস্ত্রালোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন এবং এই সম্পর্কে জাপানের আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

ইহা একটা তথ্য বটে! ভূমিকম্প কেন হয় তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের জানা হইয়া গিয়াছে, এখন বাকী আছে তাহার প্রতিরোধক উপায়গুলি জানা!

শিকাগোর ই. ডব্লিউ. ক্রফট নামীয় জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণের প্রয়াস।

ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে এবং বর্ত্তমান জ্যোতিষের আর একটা অধ্যায় গড়াইয়া যাইবে!

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. লরেন্স কর্তৃক সুলভে কৃত্রিম রেডিয়াম প্রস্তুতের আশা।

কৃত্রিমতা যত বাড়ে ততই সমাজের মঙ্গল! কাযেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগকে আমাদিগের ধন্যবাদ দিতেই হইবে।

ইন্দোরে আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের সংবাদ।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান সজীব না রাখিতে পারিলে মানুষের জীবনই বৃথা (?)।

*

আসাম প্রদেশের সংবাদ:

জয়ন্তী ও খাসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পাহাড়ী বালকবৃন্দের জন্য অধিকসংখ্যক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ।

মুসলমান জগতের সংবাদ:

(ক) মৈমনসিংএ বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রসম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন।

(খ) ইসলাম সভ্যতার পাশ্চাত্যে প্রচারার্থ আমেদাবাদে আন্তর্জ্জাতিক ইসলামীয় পত্রিকার পরিকল্পনা।

ইংলণ্ডের সংবাদ:

(ক) অক্সফোর্ডে বিশ্বশিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের যোগদান।

(খ) ইংলণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশনের বিবরণী প্রকাশ।

বিবিধ:

(ক) লক্ষ্ণৌএ ছাত্রশিক্ষার্থ সিনেমার সাহায্য গ্রহণ।

(খ) যুক্তপ্রদেশের নিউ-এডুকেশন-ফেলোশিপ নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ।

(গ) পাটনায় মৌর্য্য এবং প্রাক্‌-মৌর্য্যযুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার সংবাদ।

(ঘ) বৌদ্ধ-সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় চীনা, জাপানী, বর্ম্মী, সিংহলী, তিব্বতী ইত্যাদি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা।

গত প্রায় এক মাস সময়ের মধ্যে প্রকাশিত কৃষিসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

লাহোর রোটারি-ক্লাবে ফোরমান ক্রীশ্চান কলেজের ডাঃ ডি. ডি. লুকাস কর্ত্তৃক পাঞ্জাবের পল্লীর অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা। তাঁহার মতে গত দশ বৎসরে পাঞ্জাবের কৃষকের অবস্থা দুর্দ্দশার চরমে নামিয়াছে; ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত কিন্তু পাঞ্জাব ভারতের মধ্যে সর্ব্বোন্নত ছিল এবং এই উন্নতির মূলে প্রদেশ-ব্যাপী সরকারের খাল খনন এবং রাস্তা ও রেল নির্ম্মাণ, কিন্তু এই সব সত্ত্বেও কৃষকের মানসিক অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন না আসাতে বর্ত্তমান দুরবস্থা।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৮ই আগষ্ট এবং ৭ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের ষ্টেটসম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন, দেশের কৃষকের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইলে কৃষাণীগণকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত করিতে হইবে।

ইংলণ্ড যেরূপ কৃষিপ্রধান দেশ তাহাতে ইংরাজগণের পক্ষে কৃষকের পূর্ণ উন্নতি সম্বন্ধীয় তথ্য নির্ভুলভাবে জানা অবশ্যম্ভাবী! আমাদের মনে হয়, কৃষাণীগণকে উপযুক্ত 'সভ্যতা'-মূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অভাব পূরণ করিবার জন্য কতকগুলি পুরুষকেও শাড়ী পরাইবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে। কোন সভায় যদি আমরা এই প্রস্তাব করি, তাহা হইলে কি আমাদিগের পাঠকগণের নিকট হইতে একটীও ভোট পাইব না ?

যুক্ত প্রদেশের সেচ-বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্যর উইলিয়ম ষ্টাম্প কর্ত্তৃক রুড়কীতে উত্তর-ভারতের ছাত্রবৃন্দকে ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা। তাঁহার মতে অনেক স্থলে ইঞ্জিনীয়ার-গণের দায়িত্বহীনতার ফলে বহু সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। বর্ত্তমানে প্রদেশের সরকার কৃষকগণের অবস্থার উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রতি কৃষকের বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারেন কেবল ইঞ্জিনীয়ারগণ।

নিশ্চয়! ইঞ্জিনীয়ারগণ যদি এই কার্য্যটী না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। খাদ্যের সঙ্গে বুদ্ধির সমতা আছে ইহা পাঠকগণ স্বীকার করেন না? যদি না করেন, তাহা হইলে আমরা প্রমাণ দেখাইব।

যুক্ত-প্রদেশের জাতীয় কৃষক সভার মীরাট অধিবেশনের সভা-পতি নবাব স্যর আহম্মদ সৈয়দ খাঁর বক্তৃতা। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে দেশের জমিদার ও রায়ত, দুইয়ের অবস্থাই এমন দাঁড়াইয়াছে যে, যদি উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা না আসে, তবে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য্য।

'হাইড্রলিক-প্রেস' দ্বারা অনেক বস্তুর সহযোগিতা সাধিত হয় বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। আমাদের বোধ হয়, ঐরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা করিলে, মানুষের সহযোগিতাও সম্ভব হইতে পারে। বিজ্ঞানের যুগে একটা 'এক্সপেরিমেণ্ট' করিতে আপত্তি কি?

মাদ্রাজ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী স্যর এ. পি. পাত্রের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে বক্তৃতা। তাঁহার মতে পল্লীবাসীরা অমিতব্যয়ী ও বিষয়ী না হইতে শিক্ষা করিলে যে, অনুপাতে ভারতের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে (অথচ চাষের জমি বাড়িতেছে না), তাহাতে অবস্থা ভীষণ দাঁড়াইবে।

তদুপযোগী সাহিত্যেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের মনে হয়, দুই একজন পি. এইচ. ডি. নিযুক্ত করিলেই উপযুক্ত সাহিত্যের অভাব পূর্ণ হইবে এবং শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের মনোবাঞ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

*

বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিষয়ক সংবাদ :

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয়ের উক্তি পশ্চিম বাঙ্গালার কৃষকের বর্ত্তমান দুরবস্থা স্থায়ী বলিয়া সরকার বিশ্বাস করেন না, কৃষিদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের জন্যই বর্ত্তমান দুরবস্থা।

এত বড় অবিশ্বাস্য কথা মন্ত্রীবরের কিছুতে বিশ্বাস করা উচিত নহে! কৃষকের দুরবস্থা কোথায় তাহা ত আমরাও দেখিতে পাইতেছি না! মূল্যের হ্রাসের জন্য সাময়িক একটু কিছু যাহা হইয়াছে, খুব সম্ভব কর্ম্মকার-বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে মূল্যকে একটা 'পোড়া' দিতে পারিলেই তাহাকে বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এ কথার 'অথরিটী' (authority) আছে, যথা heat expands body ইত্যাদি।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কৃষি-ঋণ-লাঘব-সমস্যা-বিল সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা এবং সিলেক্ট কমিটিতে ঐ বিল অর্পণ।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই বিলটীর যাহা উদ্দেশ্য, তাহা কি উত্তমর্ণ শ্রেণীর মর্ম্মে আঘাত না দিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নহে?

কৃষিমন্ত্রী কর্ত্তৃক পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ এবং উত্তর-দানপ্রসঙ্গে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের অসাফল্য-বার্ত্তার উল্লেখ।

পাট যেরূপ প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং তাহার 'মনোপলি' (monopoly) যখন বাঙ্গালার আছে, তখন ইচ্ছামত তাহার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বাঙ্গালার সরকার নিশ্চয়ই করিতে পারিবেন। পাঠকগণ, আপনারা এখন বগল বাজাইয়া একটু সিনেমা দেখিয়া আসুন। আপনাদের অবস্থায় আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমাদের কথা—আর পাঁচ বছর অপেক্ষা করুন। যে জাতীয় মস্তিষ্কের কারখানা চলিতেছে, তাহা আর পাঁচ বছর চলিলেই অনেক বিদ্যার বহর বাহির হইয়া পড়িবে! তবে দুঃখ, কতকগুলি নিরীহ লোক বোধ হয় মারা পড়িবে!

*

কৃষি-দুর্দ্দশা সংশ্লিষ্ট সংবাদ :

(ক) মধ্যপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রীর নিকট ওয়ার্দ্ধা অঞ্চলের কৃষাণগণের দুর্দ্দশা-প্রতীকারার্থে নিবেদন

(খ) বোম্বাই অঞ্চলে মহাজন ও শ্রমিক বিবাদের ফলে গমের মূল্যহ্রাস
(গ) মহীশূরে বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টিতে কৃষিশস্যের সমূহ ক্ষতি
(ঘ) পুনরায় ভারতবর্ষে পঙ্গপাল আক্রমণের বিষয়ে জনৈক পঙ্গপাল-গবেষকের আশঙ্কার প্রকাশ
(ঙ) মাদ্রাজ প্রদেশের গণ্টুর অঞ্চলস্থ কৃষকগণের ঋণ-ভার প্রতীকারার্থে সরকারকে নিবেদন
(চ) সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, কৃষিদ্রব্যের মূল্যহ্রাসজনিত কুর্গের কৃষকগণের গত দুই বৎসরে (১৯৩৩-৩৪) দুর্দ্দশার চরম।

এই সভ্যতার সময় 'অনার্য্য' কৃষির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পেটে ভাত থাকুক আর না থাকুক, বিজলী পাখা আর টেলিফোন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভয় কি ?

*

কৃষি-বিষয়ক বিবিধ সংবাদ
(ক) বিহার প্রদেশের বনবিভাগ কর্ত্তৃক আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বন-বিভাগের জমীর অবস্থায় বনের প্রভাব বিষয়ে পরামর্শ আমন্ত্রণ
(খ) মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে অপরাপর প্রদেশের অনুকরণে রেডিয়োর সাহায্যগ্রহণে অর্থাভাবজনিত অক্ষমতার উল্লেখ
(গ) বিহার ব্যবস্থাপক সভায় কৃষিঋণ বিষয়ে যাবতীয় সমস্যা নির্দ্ধারণার্থ বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং সেচবিষয়ক প্রাদেশিক অনুসন্ধান প্রস্তাব
(ঘ) যুক্তপ্রদেশে 'জাতীয় কৃষকদল' সংগঠন
(ঙ) অন্ধ্র অঞ্চলে সরকার কর্ত্তৃক তামাকু চাষের প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত তদন্ত
(চ) সিন্ধু প্রদেশের ইঞ্জিনীয়ার বিভাগ কর্ত্তৃক সেতু-নির্ম্মাণ বিষয়ক নূতন গবেষণা
(ছ) বরোদা এবং বারোয়ারী দেশীয় রাজ্যের কৃষি-বিষয়ক আধুনিক সংস্কারকার্য্যে আগ্রহ।
(জ) বাঙ্গালার লাট স্যর জন এণ্ডারসন কর্ত্তৃক চুঁচুড়ায় জেলার জমিদারমণ্ডলী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির অভিনন্দনের উত্তর প্রদান বক্তৃতা।
(ঝ) বঙ্গীয় সরকারের ১৯৩৪-৩৫ সনে কৃষি-বিষয়ক ঋণ ৭।০ লক্ষ টাকা এবং জমির উন্নতি-বিষয়ক ঋণ ৪৫ হাজার টাকার বিবৃতি প্রকাশ।

প্রায় সমস্ত কৃষির ব্যাপারেই বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ চলিতেছে। হয় ত রোগী মরিলেও মরিতে পারে, তথাপি অস্ত্র-প্রয়োগ (operation) যে ভাল হইয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে !

শিল্প

গত একমাস কাল সময়ের মধ্যে শিল্পসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বক্তৃতা।

দিল্লীতে ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ী সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত বি. এম. বিড়লার বক্তৃতা। তাঁহার মতে ভারতীয় শর্করা শিল্প এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারতকে শর্করার জন্য অতি সামান্য ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

সুসংবাদ !

বোম্বায়ে ভারতীয় তুলা-কেন্দ্রীয়-সমিতির সভায় স্যর টি. বিজয় রাঘবাচার্য্যের বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতায় লাকাশায়ার কর্ত্তৃক ভারতীয় তুলা ব্যবহারের বৃদ্ধির উল্লেখ আছে।

তুলার কৃষকদিগের দুর্দ্দশা এবার ঘুচিবে !

(ক) ঐ সভাতেই বোম্বাই প্রদেশের লাট সাহেব লর্ড ব্রাবোর্ণের বক্তৃতা।
(খ) বোম্বায়ে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যর জেম্স্ গ্রীগ্ কর্ত্তৃক ভারতীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধিগণের আবেদনের উত্তর। তাঁহার মতে দেশের শিল্প বিষয়ে সরকারের সর্ব্বাধিক সহায়, সুলভ মুদ্রার বন্দোবস্ত, এবং ভারত সরকার তাহা করিতেছেন।

ভারত সরকার যে শিল্পের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন এবং ভারত-শিল্পের যে যথেষ্ট বিস্তারলাভ ঘটিতেছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অস্বীকার করা যায় না। তথাপি লোকের দুর্দ্দশা ঘুচে না কেন, তাহা ভারত-সরকার একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের একটি সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতা : দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু কৃষিকার্য্যের দ্বারা আর অন্ন-সংস্থান হওয়া কঠিন, সুতরাং দেশে নূতন শিল্পব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজন বিষয়ে উল্লেখ।

এই সমস্ত বক্তৃতা স্কুলের কেতাবের কথা। উহা কলেজের ক্লাসে আবৃত্তি করিলেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত ভাল শুনায়।

*

ভারত সরকার কর্ত্তৃক শিল্পসংশ্লিষ্ট কার্য্য :—
(ক) ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে শিল্প বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ সরবরাহার্থ ও পরামর্শের জন্য শিল্প-সংবাদ ও গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা।
(খ) ভারত সরকারের প্রেরণায় এবং অধীনে সীমান্ত প্রদেশের মুলাগড়ী অঞ্চলে মার্ব্বেল পাথরের সন্ধান ও কার্য্যসূচনা।

ভারত-সরকারের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় নয় কি ?

*

ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর ইত্যাদি কতিপয় দেশীয় রাজ্যে রবার, সিমেণ্ট ইত্যাদি শিল্পের বিস্তার।

ইহাও একটা সরকারী সুসংবাদ।

*

শিল্প বিষয়ে বিবিধ সংবাদ—
(ক) শর্করা শিল্পের কারখানার বৃদ্ধি
(খ) জাপানের অনাচার বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বাই মিল মালিকগণের সতর্কতা
(গ) বোম্বায়ে ভারতীয় রবার শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন
(ঘ) পাটের বাজারের মন্দা
(ঙ) বাঙ্গালা সরকারের কুটীর-শিল্প সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ
(চ) ইংলণ্ডে রেডিয়ো শিল্পের উন্নতি
(ছ) শ্রমিক ও ধনিকের সংঘর্ষবৃদ্ধির ফলে শিল্পের ক্ষতি
(জ) আসামে তাঁত-শিল্পের প্রসার চেষ্টা
(ঝ) চা-শিল্পের প্রসার চেষ্টা

আমাদের পাঠিকাগণ, আপনারা হুলুধ্বনি দিবেন না ?

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসাবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রকাশিত পত্র :—

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সি. এন. ভকিল লিখিত ভারতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রের অর্থ-সমস্যাশীর্ষক ১৮ই আগষ্ট ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত পত্র। ভারতের ব্যবসায় পরিচালনার বেশীর ভাগ অর্থই মহাজনের হাতে, অথচ এ বিষয়ে বিশেষ আইনের অভাবের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন।

আইনের খসড়া কাউনসিলে আলোচনা আরম্ভ হইলে আমরা ভোট যোগাড় করিবার চেষ্টা করিব।

'টাইম্‌স' পত্রিকার সিমলাস্থ পত্রদাতা 'ভারতীয় ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মুদ্রামানের স্থিরতার উপর ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আমরা ত আশা করিতেছি যে, 'বৈজ্ঞানিক' ভাবে 'এক্‌শ্চেঞ্জ' স্থির করা হইলেই আমাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। ইহাও কি সেই কথা নয়?

জনৈক ভারতীয় 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটির রিপোর্ট ভারতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রকে যে শুভাবে প্রভাবান্বিত করিবে, এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

আমাদেরও মনে হয়—ভালই করিবে।

*

ব্যবসাবাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিবিধ সংবাদ :

(ক) ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য ও সংবাদ-বিভাগের অধ্যক্ষ প্রকাশিত ভারত সরকারের জুলাই মাসের হিসাবে প্রকাশ—এই মাসে আমদানীর বৃদ্ধি এবং রপ্তানীর হ্রাস হইয়াছে

(খ) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড কর্তৃক ৫ লক্ষ পাউণ্ডের স্বর্ণক্রয়ে ব্যবসায়ী মহলে আশার সঞ্চার

(গ) ভারতবর্ষে ও সিংহলে বাণিজ্যচুক্তির সম্ভাবনা

(ঘ) কয়লার মূল্য-সমস্যার সমাধানকল্পে ঝরিয়ার কয়লা-ব্যবসায়িগণের সংঘ-গঠনের পরিকল্পনা

(ঙ) ব্যবস্থা-পরিষদে উত্তরদানপ্রসঙ্গে জার্ম্মানি, ইটালি, তুরস্ক, ইরাণ ইত্যাদি দেশের ভারতীয় মালের আমদানী হ্রাসপ্রসঙ্গে স্যর জাফরুল্লা খাঁ বলিয়াছেন, ইহার সহিত অটোয়া-চুক্তির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

(চ) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আফগানিস্থানে ভারতীয় পণ্যের বাজার অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ দিয়া জনৈক পত্র-লেখক ষ্টেটসম্যানে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন।

সু-সংবাদে বোঝাই!!!

রাজ্যশাসন

গত-মাসে প্রকাশিত রাজ্যশাসন সম্পর্কিত সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ : বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার লাট স্যর জন এণ্ডারসনের বক্তৃতায় অন্তরীণ বাঙ্গালী যুবকগণের জন্য সরকার কর্তৃক কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থার উল্লেখ।

এই ব্যাপারটীকে ঠাট্টা করিতে পারিব না। আমাদের বাঙ্গালার লাট সাহেবের কার্য্যকলাপে অনন্যসাধারণত্ব কিছু যে আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্তরীণ যুবকদিগের চরিত্র সংশোধন করিবার চেষ্টা অভূতপূর্ব্ব তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মিঃ মিত্রের প্রস্তাবিত শিল্প দ্বারা যুবকদিগের স্বাবলম্বনে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থাটা কিরূপ হয় তাহা দেখিবার বস্তু বটে!!!

*

বিবিধ :

[ক] বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় জনরক্ষা বিল আরও তিন বৎসরের জন্য আইনরূপে গৃহীত

[খ] বাঙ্গালা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বন্যার প্রকোপ

[গ] সিকান্দ্রাবাদ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

[ঘ] যুক্তপ্রদেশের জেল-বিবরণী প্রকাশ

[ঙ] ষ্টেটসম্যান কর্তৃক সম্পাদকীয় স্তম্ভে নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করিবার জন্য নূতন দল সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ।

ব্যক্তিগত

[১] ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের চতুঃষষ্টি জন্মোৎসব পণ্ডিচেরীতে অনুষ্ঠিত

[২] ৩রা সেপ্টেম্বর জহরলাল নেহরুর নৈনীতাল জেল হইতে মুক্তিলাভ

বিবিধ

[১] ১৭ই এবং ১৮ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত সি ওয়াই. চিন্তামণির সভাপতিত্বে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত।

[২] জর্জ লান্সবারি (ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা) কর্তৃক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লীগ অব নেশনসের আহ্বানে যাহাতে মানবজাতির বর্ত্তমান দুর্গতি নিরাকরণার্থে একটি সর্ব্বধর্ম্ম সম্মেলন হইতে পারে, তজ্জন্য অনুরোধ।

[৩] রিশব্যাঙ্কের (জার্ম্মানী) প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সাখ্‌ট কর্তৃক জার্ম্মানীর আর্থিক দুরবস্থার ইঙ্গিত এবং সে দুরবস্থা যে কিছুতেই অবাস্তব উপায়ে দূর করা যাইবে না, এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি।

[৪] নাগপুরে বৈদ্যক মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত পৌরাণিকের বক্তৃতা : আজও শতকরা ৮০ জন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার স্বপক্ষে।

[৫] বাঙ্গালী বেকার সমিতি কর্তৃক বেকার যুবকগণের মধ্যে আত্মঘাতীর তালিকা প্রকাশ।

শোক-সংবাদ

বসন্তকুমার দাশ

একনিষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী, আমাদের বন্ধু বসন্তকুমার দাশ গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। স্বর্গতঃ সুরেন্দ্র নাথের "বেঙ্গলী" পত্রে বসন্ত বাবু সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, "এ্যাডভান্স" পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়াছে। সারাজীবন তিনি একনিষ্ঠভাবে সংবাদপত্রেরই সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মত অক্লান্তকর্ম্মা, সদাহাস্যমুখ, নিরহঙ্কার ও সদালাপী লোক সংসারে বিরল। আমরা বন্ধুবিয়োগে কাতর-হৃদয়ে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আমরা উক্ত কোম্পানীর ১৯৩৪ সনের একখানি উদ্ধৃত-পত্র সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর সাধারণ বিভাগে ১ কোটি ৮৪ হাজার ২ শত ৫০ টাকা এবং ২ শত পাউণ্ডের জন্য ৫ হাজার ১ শত ৫০টি প্রস্তাব-পত্র পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭ শত ৭০ টাকা এবং ২ শত পাউণ্ড মূল্যের ৪ হাজার ৩ শত ৩২টি প্রস্তাব বীমা-রূপে গৃহীত হইয়াছে। গত-পূর্ব্ব বৎসর (অর্থাৎ ১৯৩৩ সনে) কোম্পানীর বীমার পরিমাণ ছিল ৬৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা এবং ১ হাজার ১ শত ৫০ পাউণ্ড।

এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর বীমাপত্রের মোট সংখ্যা হইয়াছে ১৪ হাজার ৬ শত ৫২ খানি; ইহাদের মোট মূল্য (লভ্যাংশ সহ) ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫ শত ৮ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে সাধারণ বিভাগে, মৃত্যুজনিত দাবী হয় ১২৫টি এবং বীমাকালপূরণে দাবী হয় ৪৫টি; যথাক্রমে ইহাদের মূল্য (লভ্যাংশ সহ) ৩ কোটি ৫ লক্ষ ১ শত ২৯ টাকা এবং ৭৭ হাজার ৩ শত ৬১ টাকা।

কোম্পানীর জীবনবীমা-তহবিলের টাকা ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ৫২ টাকা হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৫৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ৪৬ টাকা হইয়াছে।

কোম্পানীর এই হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দেশীয় কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা উত্তম এবং পরিচালনা-ব্যয়ও দূষণীয় নহে। আমরা এই কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শিল্প-ভবন

বাঙ্গালী-পরিচালিত যে-সমস্ত দোকান সাধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু সরবরাহ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এ. বর্ম্মণ এণ্ড কোম্পানীর শিল্প-ভবন একটি প্রথম শ্রেণীর দোকান। আমরা ইহাদের সহিত কারবার করিয়া খুশী হইয়াছি।

বনকুসুম কেশতৈল

আমরা এই কেশতৈল ব্যবহার করিয়াছি। সাধারণতঃ বাজারে প্রচলিত কেশতৈল অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

তাই নাকি?

সত্য নাকি কখনও কখনও কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর হয়। কোনো সত্য যখন আমাদের কাছে প্রথম প্রতিভাত হয় তখন অন্ততঃ আমাদের সেই রকমই মনে হয়। আপনা থেকেই আমরা বলে উঠি,—"তাই নাকি?"

উত্তর আসে "হাঁ, তাই।" বয়স বাড়বার সঙ্গেই আমাদের জ্ঞানও বাড়ে।

সাধারণ সুস্থ বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসু একজন লোকের কথাই ধরা যাক। নিজের যার ওপর হাত নেই এমন কোনো অবস্থার দরুণ হয়ত সে বিশেষ কোনো হিতকর খাদ্য বা পানীয়ের কথা জানবার সুযোগ পায়নি। সম্প্রতি কোন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাকে সে খবর দিয়েছে। প্রথমটা তার পক্ষে একটু সন্দিগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধুর লোভনীয় দান গ্রহণ করবার আগে তার গুণ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হতে চায়। গোড়ায় হয়ত একটু তর্কও উঠতে পারে, কিন্তু সে রকম তর্ক হওয়া ভালো; কারণ চট্ করে কোনো গভীর ধারণা গড়ে উঠা উচিত নয়। দুই বন্ধুতে তাই ভাল মন্দ সব দিক ধরে ব্যাপারটাকে চুটিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করে।

নূতন কোন খাদ্য বা পানীয় সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করবার সব চেয়ে ভালো উপায় হ'ল জিনিষটিকে একবার নিজে পরীক্ষা করে বিচার করা। অন্ততঃ এদেশে যে শত শত নতুন লোক নিত্য চা-রসিকদের দলে ভিড়ছে তাদের বেলা এ কথা বারবার সত্য হয়েছে বলে আমরা জানি। চায়ের নাম যে সম্ভবতঃ কখনও শোনেনি তাকে হয়ত এক পেয়ালা চমৎকার ভারতীয় চা খেতে দেওয়া হ'ল। একগুঁয়ে বা অবুঝ সে নয়; একটু অনুরোধ করতেই পেয়ালায় একটি চুমুক সে হয়তো দিলে। তারপর! তারপর আর কি! সে পেয়ালা শেষ করে সে হয়ত আরেকটু চেয়েই বসবে! চায়ের পেয়ালা শেষ না করে উঠে গেছে এমন লোক কোথাও কেউ দেখেছে কি—হোক না কেন সেই তার প্রথম চা-খাওয়া!

চা পানীয় হিসাবে জনপ্রিয় হতে বাধ্য। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে সস্তা অথচ মধুর এবং তেজস্কর পানীয়ের জন্য সকলেই ব্যাকুল; সেখানে চায়ের আদর ত হবেই। এ দেশের চা-প্রীতির প্রসার খুব বেশী দিন আগে থেকে আরম্ভ হয়নি, কিন্তু বহুদিনের মধ্যে এর চেয়ে আশাপ্রদ ঘটনা কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।

ভারতীয় চা জিনিষটি আসলে কি, দেশবাসীর সামাজিক নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের কল্যাণ-সাধনে তার দান কতখানি, এ সমস্ত তত্ত্ব এখন আর শুধু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সুদূর গ্রামের অত্যন্ত সরল কৃষকও আজ চায়ের মূল্য সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছে। চায়ের চেয়ে ভালো বিশুদ্ধ ও সুলভ পানীয় যে আর নেই এ-কথা সে নিজেই আবিষ্কার করেছে। মাত্র একটি পয়সা খরচ করলে সে পাঁচ পেয়ালা চমৎকার পানীয় পেতে পারে। এ পানীয় যা থেকে তৈরী হয় সেই চা সম্পূর্ণভাবে তার দেশজ জিনিষ। দৈনন্দিন জীবনে তাই সে চায়ের এমন কদর করতে শিখেছে।

"তাই নাকি?"

আমরা উত্তরে জোর করে বলি,- "নিশ্চয় তাই।"

কার্ত্তিকের 'বঙ্গশ্রী' পূজাবকাশের বন্ধের জন্য অপেক্ষাকৃত বিলম্বে অর্থাৎ মাসের ১লা কার্ত্তিকের পরিবর্ত্তে ১৫ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বেঙ্গল ইমিউনিটী—গবেষণা-মন্দির

বেঙ্গল ইমিউনিটী কোম্পানীর খ্যাতি আজ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, সাগর-পারে যে সমস্ত দেশ গবেষণার প্রধান কেন্দ্র, সেখানেও তাহাদের সুনাম গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বরানগরে বিস্তীর্ণ জমির উপরে তাহাদের গবেষণাগারের বাড়িগুলি অনেক বাড়ান হইয়াছে। সেগুলিতে আধুনিক গবেষণার উপযুক্ত কোন যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব নাই। অভিজ্ঞ, বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে সেখানে সকল প্রকার গবেষণা ও ঔষধ প্রস্তুতের কাজ চলে।

বাঙ্গালা দেশে বেঙ্গল ইমিউনিটির মত জৈব ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার পরিকল্পনা প্রথম অভাবের তাড়না হইতেই আসে। গত মহাযুদ্ধের সময়, দরকারী সমস্ত ঔষধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠায় রোগী ও চিকিৎসকের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। বিদেশী ঔষধের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করার বিপদ ভালো করিয়াই সকলে উপলব্ধি করেন। যুদ্ধের সময়ের মত অন্য সময়ে বিদেশী ঔষধ দুষ্প্রাপ্য না হইলেও সব সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হয় না। বিদেশ হইতে সমুদ্র-পথে বহুদূর প্রতিকূল আবহাওয়ায় আনার ফলে সেগুলি ঠিক সরেস থাকে না। তা ছাড়া সেরাম, ভ্যাক্সিন প্রভৃতি স্থানীয় বীজ হইতে টাট্‌কা তৈয়ারী হইলেই যে অধিক ফলদায়ক হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল ইমিউনিটি গবেষণা-মন্দিরের একটি পার্শ্বদৃশ্য

বেঙ্গল ইমিউনিটির গবেষণাগার হইতে যে সমস্ত চিকিৎসার উপকরণ এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, সেগুলি বিদেশী শ্রেষ্ঠ ঔষধের সঙ্গে অনায়াসে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে বিদেশের জিনিষকেও তাহারা হার মানাইয়াছে।

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে গবেষক—যেমন ডাঃ শীগা, ডাঃ হাটা, হাফকিনস্ ইনষ্টিটিউটের কর্ণেল স্যাকি, পাঞ্জাবের আই, জি, এইচ কর্ণেল ব্যাকল, নিজাম রাজ্যের ডি, জি, মেজর খাজা মহিনুদ্দিন, বোম্বাইএর গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ দালাল ও ক্যাপ্টেন ভাটিয়া, সাংহাইএর ডাঃ হিক্‌স প্রভৃতি বেঙ্গল ইমিউনিটির গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অভাবের অনুভূতি হইতেই বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর প্রথম সৃষ্টি হয়। গোড়ার দিকে কিন্তু কোম্পানী তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত, কোম্পানীর ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লওয়ার পর হইতেই কোম্পানীর উন্নতি আরম্ভ হয়। সে উন্নতি এখনও সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গবেষণাগারে ও ঔষধের বাজারে সর্ব্বত্রই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। শুধু চিকিৎসা-জগতের অভাবই তাঁহারা পরিপূরণ করেন নাই, বাঙ্গালার অর্থ নৈতিক দুর্দ্দশা-মোচনে সাহায্য করিয়া স্বাবলম্বী হইবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। পীড়িত মানবের কল্যাণ ও দেশের আর্থিক উন্নতি এই দুই আদর্শ তাঁহাদের কাছে একাকার হইয়া আছে।

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড— ৪র্থ সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[কার্ত্তিক — ১৩৪১

Balmer Lawrie & Co., Ltd.

Stockists of

Tata Tested, B. S. S. and

Untested Steel.

British and Continental

Sections.

JOISTS - ANGLES - TEES - CHANNELS

ROUNDS - FLATS - PLATES - ETC:

'Phone.
Cal: 4320

Enquiries
Invited.

103 Clive Street,
Calcutta

কার্ত্তিক, ১৩৭২

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

এই প্রবন্ধে কি পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ বিষয় লেখা হইতেছে তাহা আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পাঠকদিগকে ভাদ্র সংখ্যার "পূর্ব্বানুবৃত্তি" অংশ পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রথমতঃ, "যাবতীয় সমস্যা পূরণের উপায় কি" তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশের একটা সমগ্র জাতির জীবন-যাপনে অসুবিধার উদ্ভব হইলে কি কি কারণে এবংবিধ অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কোন্ কোন্ কারণে একটা দেশে একটা সমগ্র জাতির প্রত্যেকের জীবন-যাত্রায় অসুবিধা হইতে পারে, তাহা যথাযথভাবে জানা থাকিলে ভারতবর্ষে আমাদের জীবন-যাত্রায় কতখানি অসুবিধা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কারণ কি এবং কি হইলে ঐ অসুবিধাগুলি দূর করা যায় ইত্যাদি স্থির করা সম্ভব হইতে পারে।

কোন্ কোন্ কারণে একটা দেশে একটা সমগ্র জাতির প্রত্যেকের জীবন-যাত্রায় অত্যধিক অসুবিধা হইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে "দেশ" কাহাকে বলে, "জাতি" কাহাকে বলে ইত্যাদি জানিবার প্রয়োজন হয়। তদনুসারে আমরা প্রথমেই "জাতি" ও "দেশ" কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

জাতি ও দেশের মূল উপাদান মানুষ, জমী ও জলহাওয়া। এই তিনটী উপাদান যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত থাকিলে কোন দেশে কোন জাতির কাহারও জীবন-যাত্রায় কোনরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারে না। যখনই কোন দেশে কোন জাতির অধিকাংশ লোকের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ব্যাপক ভাবে অত্যধিক অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে ঐ দেশে হয় মানুষের আপন কর্ত্তব্য পালনে, নতুবা জমী ও জলহাওয়ার অবস্থায় অস্বাভাবিক কিছুর উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের প্রত্যেকের জীবন-যাত্রায় যে অত্যধিক অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা আমাদের নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করিতে পারি না। কাজেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, হয় আমরা আমাদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনে বিরত হইয়াছি, নতুবা আমাদিগের জমীতে ও জলহাওয়ায় কোনরূপ বিকৃতি দেখা দিয়াছে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন-যাত্রায় যে অত্যধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার কারণ এই দুইটীর মধ্যে কোন্টী, তাহা জানিতে হইলে মানুষের কর্ত্তব্য কি কি, জমী কি হইলে ফসলবান্ হয় এবং কেনই বা তাহার উৎপাদন-শক্তি কমিয়া যায়, জলহাওয়া কি হইলে বিকৃত হইয়াছে বলা যায়, এবংবিধ তথ্য জানিবার প্রয়োজন হয়। মানুষের কর্ত্তব্য কি কি তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইলে মানুষ কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত, কোথা হইতে মানুষের উপাদানগুলির সরবরাহ হয়, কি কি কারণে তাহার কার্য্যশক্তির উদ্ভব হয়, কেন বিভিন্ন মানুষের কার্য্যশক্তি বিভিন্ন রকমের হয়, কি করিলে মানুষের কার্য্যশক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন আছে। মানুষ-সম্বন্ধীয় তথ্য সম্পূর্ণ জানা না থাকিলে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে কি না, তাহার সঠিক মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। তাহারই জন্য এই প্রবন্ধে মানুষসম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইতেছে। ঐ তথ্যগুলির আলোচনা যে রূপ বিস্তৃত ভাবে

করা হইতেছে, তাহা শেষ করিতে হইলে এখনও ঐ বিষয়গুলি লইয়াই 'বঙ্গশ্রী'র অনেক সংখ্যা অতিবাহিত করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি এবং তাহা পূরণের উপায়সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের বক্তব্য কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের পাঠকগণ কৌতূহল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাযেই আমরা এই সংখ্যায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যার সংক্ষেপবর্ণনা

দেশের চারিদিকে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলে বলিতে হয়, বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা তিনটী :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার-প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব।

(২) শিক্ষিত যুবকদিগের ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি।

(৩) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানপ্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে ভাল আছে ইহা যুক্তিযুক্তভাবে বলা যায় না। আবার তাহাদিগকে অন্নাভাবে জর্জ্জরিত বলিয়াও মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণের সম্পূর্ণ সংখ্যার তুলনায় যাহারা আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতীব মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন কলের মজুরকে বাদ দিলে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ২৭ কোটী শ্রমজীবী অবশিষ্ট থাকে। তাহারা যে প্রায়শঃ স্ব স্ব অভাবের তাড়নায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহাদিগের কার্য্যকলাপের দিকে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া সহস্র সহস্র বৎসর হইতে নানা রকমের ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া আসিতেছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ঝঞ্ঝাবাতে ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কালে ভদ্রলোক, মধ্যবিত্ত অথবা ধনী বলা হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে, কিন্তু ভারতের শ্রমজীবিসম্প্রদায় বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায়শঃ অচল ও অটল ছিল, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

যে ব্রাহ্মণ আজ ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত, সেই ব্রাহ্মণগণই যে ভারতের ঋষির ও মুনির সন্তান, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আজ কোন ব্রাহ্মণের চালচলন দেখিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যে অতীব মহান্ এবং তাহা যে এক সময়ে সমস্ত জগতের আরাধ্য হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিন যে সারা জগৎ দ্বেষ, হিংসা ভুলিয়া গিয়া একমতাবলম্বী হইয়াছিল এবং ভারতের ব্রাহ্মণের নির্ণীত পন্থায় পরিচালিত হইয়া সর্ব্ব রকম দুঃখদৈন্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও সহজেই প্রমাণ* করা যায়।

জগতের ঐকমত্য নষ্ট হইয়া যে সময় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সময়টীকে বলিতে হইবে মনুষ্য-জীবনের বর্ত্তমান ঝঞ্ঝাবাতের প্রারম্ভ-কাল। ব্রাহ্মণগণই সারা জগতের ঐকমত্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই কার্য্য-ফলে আবার জগতে দ্বেষ, হিংসার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল। "কারণ" ও "চক্রে"র + উদ্ভব-কালকে বর্ত্তমান জগতের ঝঞ্ঝা-বাতের প্রারম্ভ-কাল বলিতে হইবে। এই সময়ই সর্ব্ব-প্রথমে তাৎকালিক জগদ্‌বরেণ্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে খণ্ডিত করিয়া "প্রাচীন-পন্থী" ও "তান্ত্রিক" নামক দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও ভারতের শ্রমজীবিগণ প্রায়শঃ অচল এবং অটল ছিল। ভারতের ভদ্রলোকগণ তাহার পর একে একে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টানপ্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে আপনাদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানগণের রাজত্বের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আমাদের শ্রমজীবিগণ প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডিত ছিল। মুসলমানগণের রাজত্ব-কালে কতিপয় শ্রমজীবীর সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার ফলে

* ভারতীয় ঋষির প্রদর্শিত পথ যে সশ্রদ্ধভাবে সারা জগৎ একদিন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা এই প্রবন্ধের আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে প্রকাশিত অংশে প্রমাণিত হইয়াছে।

+ আধুনিক তন্ত্রমতে মদ্যকে "কারণ" বলা হয় এবং তন্ত্র-সাধনায় "কারণ" গ্রহণের জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলিত সঙ্ঘকে "চক্র" বলা হয়।

শ্রমজীবিসম্প্রদায় আংশিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মোট সংখ্যার তুলনায় যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। একটীর পর একটী করিয়া কত রাজত্বের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতে ভদ্রলোকগণ বিচলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রমজীবিগণ ভ্রূক্ষেপও করে নাই। একশত বৎসর আগে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-সন্তানের আপন আপন বৃত্তি ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবার বহু পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কৃষক, তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকারপ্রভৃতির সন্তানগণের মধ্যে স্ব স্ব বংশীয় পেশা পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিবার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল।

ত্রিশ বৎসর আগেও বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত কৃষক কৃষি ছাড়িয়া কলের চাকুরী করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহাদের কি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার আপনারা চাহিয়া দেখুন। যে কৃষক একদিন কলের চাকুরী ঘৃণা করিয়াছে, আজ সেই কলের চাকুরী যাচ্ঞা করে না, এমন কৃষক দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরন্তু এখন তাহাদের অধিকাংশই কলের চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়াও তাহা পায় না। যাহারা একদিন "মনিব"কে নজর দিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, যাহাদিগের নিকট হইতে চাঁদা ও ভেট পাইয়া জমীদারগণ দোল-দুর্গোৎসব করিতেন, আজ তাহাদিগের নিকট হইতে নিয়মিত খাজানাটী পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। কৃষিতে যে এখন আর তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না, ইহা কি তাহারই পরিচয় নহে? একদিন যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে আলস্য বোধ করিত, আজ তাহারা পেটের জন্য যেখানে সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের কষ্ট যে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা কি ইহা হইতে বুঝা যায় না?

প্রত্যেক দেশে কৃষকপ্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাবই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। কৃষি ছাড়া মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় আছে আর তিনটী। তাহাদের নাম—(১) কলকারখানা, দোকানদারী, চালানীপ্রভৃতি শিল্পের ও বাণিজ্যের কার্য্য। (২) ওকালতী, ডাক্তারীপ্রভৃতি ব্যবসায় ও শিক্ষকতা। (৩) সরকারী চাকুরী। কৃষি লাভজনক না হইলে এবং কৃষকের ক্রয় করিবার সামর্থ্য না থাকিলে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য লাভজনক হইতে পারে না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লোকসান হইতে আরম্ভ করিলে দেশের সর্ব্বসাধারণের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানুষের জীবিকার উপায় ঐ তিনটী। সর্ব্বসাধারণের বিপন্ন হইবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গভর্ণমেণ্টের বিপন্ন হওয়া। গভর্ণমেণ্ট বিপন্ন হইলে কোন চাকুরীও নিরাপদ থাকিতে পারে না। কাজেই কৃষি এবং কৃষক বিপন্ন হইলে দেশে সর্ব্বব্যাপী বিপদ্ ও অশান্তি অনিবার্য্য।

অন্যদিকে কৃষিদ্বারা দেশের যত মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ সম্ভব, আর কোন পন্থায় তাহা হওয়া সম্ভব নহে। আগেই বলিয়াছি, কৃষি ছাড়া মানুষের জীবিকার উপার্জ্জনের উপায় আছে আর তিনটী, যথা:—শিল্প ও বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিক্ষকতা এবং চাকুরী। এই তিনটী উপায়ের মধ্যে ওকালতী, ডাক্তারীপ্রভৃতি ব্যবসায় ও শিক্ষকতায় এবং চাকুরীতে যে দেশের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় অতি অল্প লোকেরই স্থান হইতে পারে, তাহা বাস্তব জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিবার জন্য শিল্পের প্রয়োজন হয় এবং যাহা লইয়া মানুষ বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটী, হয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নতুবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানুষ যত কিছু বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই কৃষক, শিল্পী ও বণিকের সমষ্টিগত-শ্রমজাত। মানুষের খাইবার জন্য ভাতের প্রয়োজন হয়। ভাত পাইতে হইলে প্রথমতঃ ধানের প্রয়োজন হয়, তাহা কৃষকের শ্রমজাত। দ্বিতীয়তঃ ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা শিল্পীর পরিশ্রমজাত। তাহার পর তৃতীয়তঃ এই চাউল যাহাতে সর্ব্বত্র পৌঁছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, উহা বণিকের শ্রমজাত।

মানুষের নিরাপদে থাকিতে হইলে সৈনিকের প্রয়োজন, পুলিশের প্রয়োজন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের প্রয়োজন। উহা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের শ্রমজাত। প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনে যত কিছু বস্তু লাগে তাহার প্রত্যেকটীর কোন্ কোন্ অংশ কৃষিজাত, কোন্ কোন্ অংশ শিল্পজাত, কোন্ কোন্ অংশ ব্যবসায় ও বাণিজ্যজাত এবং কোন্ কোন্ অংশ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের পরিশ্রমজাত, তাহার পরীক্ষা

করিলে এবং ঐ ঐ অংশে কয়জন কৃষকের, শিল্পীর, ব্যবসায়ীর, বণিকের এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, তদুৎপাদনার্থ সর্ব্বসমেত যে কয়জন বিভিন্ন ব্যবসায়ীর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহার ৬/৮ ভাগ কৃষক, ১/৮ ভাগ শিল্পী এবং ১/৮ বণিক্, উকিল, ডাক্তারপ্রভৃতি ব্যবসায়ী ও গভর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী। কাযেই বলিতে হইবে, সারা জগতের সমস্ত মানুষের জন্য যত কিছু বস্তু লাগে, তাহা উৎপন্ন করিতে হইলে সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম মানুষের সংখ্যার আট ভাগের ছয় ভাগ কৃষিকার্য্যে, ১ ভাগ শিল্পে এবং ১ ভাগ বাণিজ্য, ব্যবসায় এবং গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাগান যাইতে পারে। কোন দেশে জীবিকার্জ্জনের কোন পেশার উপরোক্ত অনুপাতানুসারে যে লোকসংখ্যা হয়, তদতিরিক্ত লোক নিযুক্ত হইলে নিজ দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং সেই দেশের পরমুখাপেক্ষী হওয়াই অনিবার্য্য।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষি উপেক্ষিত হইয়া শিল্প ও বাণিজ্যাদিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক লোক নিযুক্ত আছে বলিয়া তাহাদের মাল কাটতির জন্য অন্যদেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যখন কোন পেশায় সারা জগতের প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকসংখ্যা নিযুক্ত হয়, তখন সর্ব্বত্র মনুষ্য-জাতির ক্লেশ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান কালে যে জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে এবং সকল দেশেই শিল্পজাত দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের (over-production) কথা শুনা যায়, তাহার কারণ কৃষির প্রতি উপেক্ষা এবং শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও চাকুরীতে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকের নিয়োগ। আবার অন্য দিকে দেখা যাইতেছে, কৃষিকার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারাও বিপন্ন। একদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও চাকুরীতে যে লোকসংখ্যা নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হ্রাস সাধন করিয়া কৃষিকার্য্যে অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। আবার অন্যদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, যাহারা কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত তাহাদেরই চলিতেছে না, এই অবস্থায় আরও অধিকসংখ্যক লোক কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলে—মানুষের জীবনযাত্রার উদ্বেগশূন্য হওয়ার আশা কোথায়?

কাযেই বলিতে হইবে, কৃষি-সমস্যা অথবা কৃষক প্রভৃতির অন্নাভাবই এখন মনুষ্যজাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্বেগের কারণ।

মানুষের দ্বিতীয় উদ্বেগের কারণ, শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার অবস্থা। আমাদের শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও কার্য্যাক্ষমতা লাভ করে না তাহা সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বভাবতঃ উজ্জ্বল রত্ন তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে লক্ষ লক্ষ যুবক বিনিদ্র রজনী অতিক্রম করিয়া উচ্চ উপাধিগুলি অর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারা কত আশা ভরসা বুকে লইয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য কি কঠোর পরিশ্রম করে, তাহা বেকার যুবকগণের মুখের দিকে চাহিলে সহজেই অনুমান করা যায়। তাহাদিগকে যাহা শিখান হইয়াছে তাহাই তাহারা শিখিয়াছে, যে রকম ভাবে তাহাদিগকে চলাফেরা করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবেই তাহারা চলাফেরা করিয়া থাকে। তাহারা প্রায়শঃ চাহে মানুষের মত পরিশ্রম করিয়া বিধবা মাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে। যুক্তিযুক্তভাবে তাহাদিগকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, অথচ আমাদের ব্যবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ছেলেরা পরিশ্রম করিয়া অন্নোপার্জ্জন করিতে চাহিলেও পরিশ্রমের ক্ষেত্র কোথায় তাহার সন্ধান কেহ তাহাদিগকে দিতে পারেন না। কেহ তাহাদিগকে বলেন, কৃষি কর, কেহ বলেন, বাণিজ্য কর, কেহ বলেন, শিল্প কর, কেহ বলেন, জুতা সেলাই কর, কেহ বলেন, হকারী কর, কেহ বলেন, পানের দোকান কর, কেহ বলেন, রিকৃশ টান, কত অযাচিত উপদেশ তাহাদিগের উপর বর্ষিত হয়। যিনি যাহা তাহাদিগকে বলিতেছেন, অবিলীলাক্রমে তাহারা তাহাই করিতে প্রস্তুত। তবুও তাহাদের মধ্যে অনেকেই "বেকার" থাকিয়া যায়। অল্প কয়েকজন যাহারা কর্ম্ম-নিয়োগ পায় তাহাদের মধ্যেও অনেকেরই প্রায়শঃ দুঃখদারিদ্র্যকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, অর্থাভাবজনিত দৌর্ব্বল্য, তাহাদের মানসিক চালচলনে বিশ্বের প্রতি অবিশ্বাস সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রায়শঃ তাহারা স্ব স্ব মনোবেদনা বুকের ভিতর লুক্কায়িত

রাখে এবং তাহাদের এক এক খানি বুক এক একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডবৎ হইয়া থাকে। স্থান পাইলে নিজেরা কাঁদে এবং শ্রোতাকে কাঁদায়; কিন্তু প্রায়শঃ কোন ফল হয় না। আপনারা চাহিয়া দেখুন, আমাদের কত উজ্জ্বল রত্ন কি ভীষণ ভীষণ কাহিনী মনে লুক্কায়িত রাখিয়াছে, এমন কি অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইতেছে। যিনি একবার সন্তানের পিতা হইয়াছেন অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার দাদা হইয়াছেন, তিনি কি ঐ সমস্ত নিদারুণ কাহিনী ও ঘটনা শুনিয়া অবিচলিত থাকিতে পারিবেন? কাযেই শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার অবস্থাও আমাদিগের একটী ভীষণ সমস্যার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের তৃতীয় উদ্বেগের কারণ।

মানুষ যে ক্রমশঃই ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাহারও কোন রিপোর্ট অথবা স্বাস্থ্য-বিবরণীর প্রতি নির্ভর না করিয়া যাঁহারা আপনাদের স্ব স্ব পরিচিত তাঁহাদিগের সকলের স্বাস্থ্য কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করুন। সারাজীবনে চোখের হউক, অথবা দাঁতের হউক, অথবা বুকের হউক, অথবা পেটের হউক, অথবা শরীরের কোন অঙ্গের কোন ব্যাধিহীন কয়টী দিন আমরা অতিবাহিত করিতে পারি তাহার হিসাব করুন। ধনবান্ হউন অথবা নির্ধন হউন, শিক্ষিত হউন অথবা অশিক্ষিত হউন, যুবক হউন অথবা বৃদ্ধ হউন, কুড়ি টাকা বেতনের কর্ম্মচারী হউন অথবা ৫০০০৲ বেতনের কর্ম্মচারী হউন, উকিল হউন, ডাক্তার হউন, শিল্পী হউন, বণিক্ হউন, কৃষক হউন—সকলেই জীবনের অধিকাংশ সময়ই যে, কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, মানুষের জীবনে এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহাকে কোন সমস্যা মনে করা সঙ্গত নহে। তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, বর্ত্তমানে যেরূপ প্রায়শঃ জীবনের অধিকাংশ দিবসই কোন না কোন রোগে কষ্ট পাইতে হয়, ত্রিশ বৎসর আগেও শারীরিক অসুস্থতা এত ব্যাপক ছিল কি? তাহা যদি না দেখা যায়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে না যে, এত অসুস্থতা স্বাভাবিক নহে? তাহার পর যদি একটী মানুষকেও দেখা যায় যে, তিনি ষাট বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই কোন অসুস্থতা ভোগ না করিয়া নিয়মিত ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে না যে, মানুষের পক্ষে অসুস্থতা ছাড়াও জীবন যাপন করা সম্ভব এবং প্রতিনিয়ত অসুস্থতা অস্বাভাবিক? মানুষের অকালমৃত্যু যে ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অকাল-মৃত্যু হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কত বৎসর মানুষের জীবন-কাল তাহা প্রথমতঃ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যদি একটী মানুষকেও দেখা যায় যে, তিনি একশত কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে বাকী মানুষ যে কেন ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে এবং ১২০ বৎসরের আগে যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা অকাল-মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে। কোন দেশে অকাল-মৃত্যু না থাকিলে, প্রতি বৎসর যে কয়টী শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে ইহা আশা করা যুক্তিযুক্ত। কাযেই অকাল মৃত্যু না থাকিলে ৩০ বৎসর আগে যে কয়জন এক বৎসরের ছিলেন তাঁহাদের সকলের আজ ৩১ বৎসরের হইবার কথা, যাঁহারা দুই বৎসরের ছিলেন তাঁহাদের আজ ৩২ বৎসরের হইবার কথা ইত্যাদি। যদি তাহা না হইয়া তদপেক্ষা কম সংখ্যক লোক ৩১ বৎসরের অথবা ৩২ বৎসরের হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, দেশে অকাল-মৃত্যু চলিতেছে। তাহার পর যদি দেখা যায় যে, কোন বিশ বৎসর জন্মহারের যে অংশ মৃত্যুর হার ছিল, তাহার তুলনায় তৎপরবর্ত্তী কোন বিশ বৎসরে মৃত্যুর হার জন্মহারের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, দেশে অকাল-মৃত্যু বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষে লোক-গণনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ১৯০১ সাল হইতে। তদবধি প্রতি দশ বৎসর অন্তর সর্ব্বসমেত চারিবার লোক-গণনা হইয়াছে। লোক-গণনার এই চারিটী রিপোর্ট পরীক্ষা করিলে আমাদের দেশে অকাল-মৃত্যু কি ভীষণ ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

ঐ রিপোর্ট চারিটী পরীক্ষা করিলে মৃত্যুর হার যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বয়স	১৯০১ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত মৃত্যুহার	১৯১১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত মৃত্যুহার
২০-২৫ বৎসর	২০·৪%	৩৫·৪%
৩০-৩৫ ”	৪৭·৯%	৫৮·২%
৪০-৪৫ ”	৫৩·৪%	৬৮·৪%

ইয়োরোপ এবং মার্কিণ দেশে প্রতি বৎসর যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার শতকরা ৫৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় ৫০ বৎসর বয়সের আগে।

দেশের প্রত্যেক লোক যে স্ব স্ব জীবন-যাত্রায় অসন্তুষ্ট তাহা নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া প্রশ্ন করিলেই জানিতে পারা যায়।

কৃষকের সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়া মনে করিতেছেন একটা বড় চাকুরী না পাইলে জীবন বৃথা, জমীদার-সন্তানগণ মনে করিতেছেন শিল্পী অথবা বণিক্ না হইতে পারিলে আজকালকার প্রকৃত ধনবান্ হওয়া যায় না, উকিল এবং আইন-ব্যবসায়িগণ মনে করিতেছেন একটা নির্দ্দিষ্ট বেতনের চাকুরী না হইলে জীবনযাত্রার অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী, শিল্পী ও বণিক্‌গণ মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদের ঝঞ্ঝাটের জীবন অপেক্ষা বাড়ী-ভাড়ার আয় অথবা কোম্পানীর কাগজের সুদের আয় অনেক নিরাপদ, আবার বড় বড় চাকুরীয়াগণ দেখিতেছেন যে, চাকুরীতে শান্তি নাই এবং তদপেক্ষা পানের দোকান করিয়া ডাল ভাত খাওয়া ভাল, কেহ কাহারও স্বীয় ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। কেহ বা স্বীয় উপার্জ্জনের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ, কেহ বা অন্য ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জ্জন হয় মনে করিয়া সর্ব্বদা আপন ব্যবসায়ে অসন্তুষ্টি ভোগ করিয়া থাকেন।

এমন কোন মানুষ নাই, যিনি পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহেন, অথচ বর্ত্তমান জগতে প্রায় সকলেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে, চাকুরীয়াগণই একমাত্র পরমুখাপেক্ষী এবং যাঁহারা জীবিকার জন্য কৃষি, শিল্প অথবা ব্যবসায় ও বাণিজ্য অবলম্বন করেন তাঁহারা স্বাধীন; কিন্তু এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত নহে। কৃষক তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের জন্য সরকারী জলসিঞ্চন-প্রণালীর উপর নির্ভরশীল এবং উৎপন্ন শস্যের মূল্যের জন্য বাজারের দরের উপর নির্ভরশীল। তাহার স্বীয় চেষ্টায় দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস এবং বৃদ্ধি হয় না এবং যথোপযুক্ত মূল্য না পাইলে তাহাকে অভাবগ্রস্ত হইতে হয়। আইন-ব্যবসায়িগণ মোকদ্দমার সংখ্যা ও মক্কেলের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ রোগীর সংখ্যা ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল। শিল্পী ও বণিক্‌গণ বাজার-মূল্যের উপর নির্ভরশীল। যিনি অশেষ পরিশ্রমের ফলে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন তাঁহারও নিস্তার নাই। কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ভূসম্পত্তি প্রভৃতির দরের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য আজ যিনি লক্ষপতি, কাল হয়ত তিনি দুই লক্ষপতি, আবার পরশু তিনি পঞ্চাশ হাজারের মানুষ হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবর্ষে এক দিন ছিল, যখন মানুষ পুরুষানুক্রমিক জমীদারী ও তেজারতি প্রভৃতিদ্বারা বড়মানুষী করিতে পারিত, কিন্তু গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বড়মানুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ আবার এই দেড়শত বৎসরের মধ্যেই গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। তিন পুরুষের অধিক এখন আর প্রায়শঃ কাহারও ভাল অবস্থা রক্ষিত হয় না।

কাযেই দেখা যাইতেছে সমস্ত মানুষ যাহা যাহা চাহে, ভারতবাসীর পক্ষে তাহার প্রত্যেকটী পাইবার অসুবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষক। তাহাদের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে।

মধ্যবিত্ত সন্তানগণের মধ্যে অধিকাংশই বেকার।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সন্তুষ্টি এবং স্বাবলম্বন প্রত্যেক মানুষের কাম্য, অথচ ভারতবাসী প্রায়শঃ স্বাস্থ্যহীন, অসন্তুষ্ট, পরমুখাপেক্ষী এবং অকালে মরণশীল।

অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবই আমাদের প্রধান সমস্যা। ইহা সমীচীন কি না তাহা চিন্তার যোগ্য। স্বাধীনতা থাকিলে দেশের অধিবাসিবৃন্দ যাহা যাহা চাহেন তাহা পাইবার ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলেই যে মানুষ অত্যন্ত কাম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে তাহা সত্য নহে। তাহার দৃষ্টান্ত ইয়োরোপীয় এবং মার্কিণ প্রভৃতি

অপরাপর জাতিগণ। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু ঐ ঐ দেশেও অন্ন-বস্ত্রের অভাব, বেকার সমস্যা, অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি, পরমুখাপেক্ষিতা খুব ব্যাপকভাবেই বর্ত্তমান আছে।

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ

কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের অন্নাভাবের প্রধান কারণ দুইটী :—যথা (১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, (২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity)।

এক জন কৃষক সারা বৎসরে ৭।৮ বিঘার বেশী জমী চাষ করিতে পারে না। ঐ ৭।৮ বিঘা জমী হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষক-পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ নির্ব্বাহ না হইলে তাহাদের অভাবগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের জমী হইতে প্রত্যেক বিঘায় গড়ে কিঞ্চিদধিক ৭১/ মণ শস্য উৎপন্ন হইত। ঐ স্থানে বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে কিঞ্চিদধিক ৩১/ মণ অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও কম। তাহাতে কৃষক-পরিবারের এখন পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান হইতেছে। কিন্তু প্রায়শঃ জমীদারের খাজানা অথবা স্ব স্ব পরিবারের বস্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতেছে না। প্রতি পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণে উৎপন্ন শস্যের হার কমিয়া যাইতেছে, তাহার অবরোধ সংঘটিত না হইলে, অনতিবিলম্বে কৃষকের উদরান্নের জন্যও অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিবার আশঙ্কা আছে।

যে যে স্থানে উৎপন্ন শস্যের হার অপেক্ষাকৃত একটু বেশী, সেই সেই স্থানে কৃষকের উদরান্নের সংস্থান করিয়া কিছু শস্য উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর মূল্যের মধ্যে কোন সাদৃশ্য (parity) না থাকায়, কার্য্যতঃ কৃষকের বহু প্রয়োজনীয় বস্তুরই অভাব থাকিয়া যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদিগের ও শ্রমজীবীদিগের বেকারাবস্থার ও অসন্তুষ্টির কারণ তিনটী—(১) কৃষকপ্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের অন্নাভাব ; (২) জীবিকার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থায় উপার্জ্জন-সম্ভাবনার অসামঞ্জস্য ; (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বিভ্রাট।

প্রত্যেক দেশেই জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা সাধারণতঃ চারিটী যথা (১) কৃষি ; (২) শিল্প ও বাণিজ্য ; (৩) শিক্ষকতা ও ব্যবসা (৪) সরকারী চাকুরী। এই চারিটী বিভাগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে : —যথা (১) শ্রমজীবী (manual worker) ; (২) সহকারী পরিচালক (sub-ordinate officer) ; (৩) পরিচালক (officer)। হস্তপদাদি কার্য্যক্ষম হইলেই শ্রমজীবী হওয়া যায়, কিন্তু কোন কার্য্যের পরিচালনা করিবার উপযুক্ত হইতে হইলে শিক্ষা দ্বারা মস্তিষ্কের অথবা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রয়োজন হয়। হস্তপদাদির পটুতাভেদে শ্রমজীবিগণের কার্য্যক্ষমতার তারতম্য হয় বটে, কিন্তু ঐ তারতম্যের পরিমাণ খুব বেশী হয় না। শ্রমজীবিগণকে জীবিকার্জ্জনের যে কোন পন্থাতেই নিযুক্ত করা যাক্ না কেন, তাহারা তাহাদের হস্তপদাদি দ্বারা প্রায় একরকম কার্য্যই উৎপন্ন করিয়া থাকে। কাযেই প্রত্যেক বিভাগের শ্রমজীবিগণের মজুরীর হারের সাদৃশ্য থাকা যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার দ্বারা সাধারণতঃ বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং তাহার ফলে কার্য্যক্ষমতা বাড়িয়া যায় বলিয়া শিক্ষিত লোকগণকে শ্রমজীবিগণের উপরিস্থিত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাঁহারা অধিকতর বেতনে শ্রমজীবিগণের পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত হন।

বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে পরিচালকগণের (officers) কার্য্যক্ষমতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তাঁহাদের বেতনেরও তারতম্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া কার্য্য-পরিচালনযোগ্য হইতে হইলে "বুদ্ধি" কাহাকে বলে এবং শরীরের মধ্যে কোথায় তাহার স্থান, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা হইতে পারে একমাত্র কার্য্যস্থলে। কোন পুস্তকে কি লেখা আছে তাহা স্মরণ আছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার নির্ণয় করা যায় না।

বুদ্ধির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধিত হইলে মানুষ জীবিকার্জ্জনের যে কোন পন্থায়ই নিযুক্ত হউন না কেন, তাঁহার কার্য্যের উৎপাদিকা শক্তি প্রায় একরকমই হইয়া থাকে। যিনি ভাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারেন, তিনি জীবনের প্রারম্ভে চেষ্টা

করিলে ভাল ডাক্তার অথবা ভাল আইন-ব্যবসায়ী অথবা ভাল অধ্যাপক অথবা ভাল ব্যবসায়ী অথবা ভাল কৃষি-পরিচালক কেন হইতে পারিবেন না তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাযেই দেশ-সংগঠনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা কয়টীর উপর দৃষ্টি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়:—

(১) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

(২) চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের মজুরীর সাদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবস্থা।

(৩) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী ও বিভিন্ন পরিচালকগণের পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

(৪) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

বর্ত্তমান কালে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষকতা, ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরীতে শ্রমজীবীর কার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলে যেরূপ লাভবান্ হওয়া যায়, কৃষিকার্য্যে সেরূপ লাভবান্ হওয়া যায় না। পরন্তু জমীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হওয়ায় কৃষিকার্য্যে গরীবানা ভাবেও স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। তাহার ফলে প্রায় সমস্ত কৃষক কৃষি ছাড়িয়া দিয়া শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের অন্যান্য পন্থায় নিয়োগপ্রার্থী হইয়াছে। জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ণ কার্য্যক্ষম লোকসংখ্যার মধ্যে কৃষকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে কয়টী দেশে ইহার ব্যতিরেক দেখা যায়, সেই কয়টী দেশ প্রায়শঃ কোন না কোন কৃষিপ্রধান দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষে কৃষকের সংখ্যা প্রায় বার আনা। যে পন্থায় এতগুলি লোকের অন্নসংস্থান হইত, সেই পন্থা উপেক্ষাযোগ্য হইলে অন্য কোন পন্থায় তাহাদের কর্ম্মনিয়োগ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে বহু শ্রমজীবী বেকার ও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

জগতে বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। তদবধি পরীক্ষায় উপাধি প্রদান করিবার প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা আরম্ভ হইবার আগে মানুষের শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত হইতে হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইতে হইত। নিউটন, লাপ্লাস প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যক্ষমতার ফলে তাঁহাদের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথানুসারে ডিগ্রীলাভ করিতে পারিলেই মানুষ শিক্ষিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন এবং প্রায় সমস্ত রকম পরিচালনার কার্য্যের উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হন। অথচ বুদ্ধি কাহাকে বলে, শরীরের মধ্যে তাহার স্থান কোথায়, কোন্ কার্য্যে বুদ্ধির হ্রস্বতা হয় এবং কোন্ কার্য্যে তাহার উৎকর্ষ হয়, তদ্বিষয়ক কোন শিক্ষা পাইবার সুযোগ ছাত্রগণকে দেওয়া হয় না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান করিবার জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ছাত্রের বুদ্ধির কোন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না এবং তাঁহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হয় না। ফলে প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন এবং কার্য্যক্ষমতা লাভ না করিয়াও শিক্ষিত ও কার্য্য-পরিচালনাযোগ্য বলিয়া অভিহিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

একে শ্রমজীবিগণের উপার্জ্জন অত্যন্ত কম, তাহাতে আবার শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হওয়া অতি সহজ হওয়ায়, তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। ফলে শিক্ষিত যুবকদিগের অধিকাংশেরই বেকার হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যদিকে প্রকৃত বুদ্ধি ও পরিচালনা-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা না হইয়াও শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইবার সুযোগ হওয়ায় বহু অনুপযুক্ত লোকের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নিয়োগ পাইবার সম্ভাবনা হইতেছে এবং যাঁহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ তাঁহারা বেকার থাকিয়া যাইতেছেন। ইহাতে বেকারগণের অসন্তুষ্টির মাত্রা এবং নৈরাশ্য আরও বাড়িয়া যাইতেছে এবং অনুপযুক্ত লোকের হাতে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম-পরিচালনার ভার পড়ায় জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃই অধিকতর অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইতেছে।

যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী কর্ম্মচারী অথবা অধ্যাপক, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী আইন-ব্যবসায়ী অথবা বণিকের

পদব্রজে ইংলণ্ডের পল্লীপথে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ ম্যাক্ উইলিয়াম্‌স্ একজন তরুণ আমেরিকান—তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও ভবঘুরের জীবন আস্বাদ করবার

ওয়েল্‌স্ : পার্ব্বত্য অঞ্চলে নির্জ্জন কুটীর।

আনন্দে সম্প্রতি ইংলণ্ডের পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এঁর হাতে অর্থ ছিল না। পথে কাজকর্ম্ম করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এই তরুণ ভবঘুরে-ভ্রমণকারীর লেখার মধ্যে আমরা ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের একটা চমৎকার ছবি পাই :

…রাত দুপুর। ব্লুম্‌সবেরির পথঘাট জনশূন্য, আমি আমার বাসা থেকে বার হয়ে হাইড্ পার্ক কর্ণারে একটা কফির দোকানে একদল লোকের সঙ্গে মিশে কফি খেলাম।

কফি-পানের সময় দলের সকলকেই একবার ভাল ক'রে দেখে নিলাম। আমার পাশে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক, বোধ হয় সে সৈন্যদলে কাজ করত, তারই সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল।

সে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ইংরেজ নও বোধ হয়—না?

আমি বললাম—না। কেন?

—তুমি আস্তে আস্তে কথা বলছ, তাই থেকে মনে হচ্ছে। তুমি আইরিশ না স্কচ্?

—আমি আমেরিকান।

—আমেরিকান! ডলারের দেশ থেকে আসছ?

—আসছি বটে, কিন্তু আমি নিজে প্রায় নিঃসম্বল। আমি পায়ে হেঁটে ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র বেড়াব স্থির করেছি। পথে কাজ খুঁজে নেব অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্যে।

—কাজ কোথায় পাবে? ইংলণ্ডের লোকই কত বসে আছে কাজের অভাবে।

—দেখাই যাক, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। শোন, আজ সারা রাত লণ্ডন সহরটা হেঁটে বেড়িয়ে দেখব। এস না আমার সঙ্গে?

—সে বেশ হবে—আমার কোন আপত্তি নেই।

কফি-পান শেষ করে দু'জনে হাঁটতে সুরু করি। টেম্‌সের

ওয়েল্‌স্ : চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ কনওয়ে কাস্‌ল (Conway castle)।

ধারে এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট প্রায় জনশূন্য, দু একজন পুলিশম্যান্ কেবল এখানে ওখানে ঘুরছে, একস্থানে একটী স্ত্রীলোক পথের

ধারে ঘুমুচ্ছে। লণ্ডনের নৈশ জীবন বড় বিচিত্র, কত অসহায় গৃহহারা হতভাগ্য লোক যে রাতে পার্কের বেঞ্চিতে, পথের ধারে এভাবে শীতের রাত্রি যাপন করে!

ওয়েল্‌স্‌ঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে মেষপালের চারণা।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের কাছে একজন লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে এল। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা সিগারেট আছে কি?

আমি বাক্স থেকে একটা সিগারেট বার করে তাকে দিলাম।

লোকটা বললে—বড্ড বাতের বেদনায় ভুগছি। আজ রাত্রে একটা বিছানা-ভাড়ার দাম দিতে পার?

—কত ভাড়া লাগবে?

—আট পেনি।

আমি পয়সা বার করবার পূর্ব্বেই আমার বন্ধু একটা শিলিং তার হাতে দিয়ে বললে—কিন্তু সাবধান, এই পয়সায় মদ খেও না যেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ থেকে আমরা চন্দ্রালোকিত টেম্‌সের দিকে চেয়ে রইলাম—মাঝে মাঝে বজ্‌রা কি মালবোঝাই নৌকা নদী-বক্ষকে একটু চঞ্চল করে দিচ্ছে, লণ্ডন সহর নিস্তব্ধ, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কম।

ল্যাম্বেথের দিকে নদীর ধারের বেঞ্চিগুলোতে অনেক লোক ঘুমুচ্ছে। এ সব বেঞ্চে রাত্রে শুয়ে থাকা আইন-বিরুদ্ধ, শায়িত লোকদের উঠিয়ে দিয়ে গেল একজন পুলিশম্যান। এই সব গৃহহারা হতভাগ্যদের টেম্‌স্‌ নদীর ধারের বেঞ্চি ছাড়া অন্য শয়নের স্থান নেই—কারণ এরা শোওয়ার জায়গার ভাড়া দিতে পারে না। পুলিশ পিছন ফিরতেই অনেকেই আবার শুয়ে পড়ল। উপায় কি বেচারীদের?

বড় অন্ধকার, একটা বেঞ্চে একটী শায়িত মনুষ্যদেহের উপর আর একটু হ'লে আমরা বসে পড়েছিলাম আর কি! পরে দেখি একটী বৃদ্ধা সেখানে শুয়ে—গায়ে ছেঁড়া একটা আলোয়ান, ভাঙা তোবড়ানো হ্যাটের তলায় তার উস্কো খুস্কো রুক্ষ চুল দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধা একটু নড়ল, তার পর ধীরে ধীরে যেন কষ্টের সঙ্গে পাশ ফিরলে। ভয়ে ভয়ে চোখ চেয়ে আমাদের দিকে চাইলে, যেন ভূত দেখছে।

আমি বললাম—ভয় পাবার কোন কারণ নেই। চল তোমায় এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে তুমি ভাল বিছানায় শুতে পারবে।

কথা শেষ করেই আমি তার হাতে একটা ফ্লোরিণ দিলাম—দু-শিলিং। রৌপ্যমুদ্রা হাতে পড়তেই তার ঘুমের ঘোর যেন কেটে গেল। সে বললে—ভগবান তোমাদের ভাল করুন। এতে আমার দু'দিন চলে যাবে।

গ্রীষ্মকালের প্রভাত হবার দেরী নেই বেশী। যদিও এখন রাত মাত্র সাড়ে তিনটে—এরই মধ্যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ দিয়ে তরিতরকারী বোঝাই গাড়ী যেতে সুরু করেছে।

আমরা কভেণ্ট গার্ডেনে এলাম—লণ্ডনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাজার এই কভেণ্ট গার্ডেন। কুলীরা মালবোঝাই গাড়ী থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে মাল নামাচ্ছে, টাট্‌কা গোলাপের গন্ধ ভুর ভুর করছে ভোরের হাওয়ায়। শাক-সবজি কত ধরণের—চমৎকার সুপক্ক ষ্ট্রবেরি, হট্‌-হাউসে তৈরী বড় বড় টোমাটো, মটরশুঁটি, খড়ের আঁটি

হার্টফোর্ডশায়ার: এ্যালবারির প্রাচীন প্রথায় শাস্তির ব্যবস্থা (দক্ষিণে দ্রষ্টব্য): অনেকটা আমাদের 'তুড়ুঙ' জাতীয়।

বাঁধা কচি এ্যাস্প্যারেগাস শাক, পেঁয়াজ, কচি গোলাপী রংয়ের রুবার্ব, নানারকম জলজ শাক।

তরকারী ও টাটকা ফল দেখে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল—একটা দোকান থেকে আমরা কিছু কমলালেবু ও আপেল কিনলাম।

ফুলের বোঝা যেখানে নামাচ্ছে, সেখানে চমৎকার চমৎকার গোলাপ, প্যান্সি, লাল কার্নেশন, হলদে আইরিস্, সাদা হাইড্রান-জিয়া—নানা ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধে কভেণ্ট গার্ডেনের সে প্রান্ত আমোদ করেছে।

একটা ছোট্ট আইরিসের তোড়া কিনে আমি ব্রেক্‌ফাষ্টের জন্যে বাসায় ফিরে এলাম।

লণ্ডনের হৈ চৈ, গোলমাল ভাল লাগছিল না। ইংলণ্ডের শান্ত পল্লীপ্রান্তের জীবনধারার মোহ আমাকে টানছে। শুধু তাই নয়, হাতে আমার আর মোটে কুড়িটী শিলিং অবশিষ্ট আছে—কাজ খুঁজে না দিলে আর চলবে না। লণ্ডনের যা ভয়ানক খরচ, তাতে কুড়ি শিলিংএ অর্দ্ধ সপ্তাহও চলবে না।

কাজেই দু একদিনের মধ্যেই লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়-লাম। সকলে পথে আমার দিকে চায়—আমার মত পোষাক পরে না কোন ইংরেজ।

টাওয়ার ব্রিজ; লণ্ডন: টেম্‌স নদীর উপরে, উচ্চতা ১৪২ ফুট।

লণ্ডন আর ছাড়াতে পারি নে—চলেছে তো এর আর শেষ নেই। লণ্ডন সহর যে কত বড়, পায়ে হেঁটে লণ্ডনে না বেড়ালে তা বুঝা শক্ত হবে। লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডের অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত সহর সঙ্গেই চলেছে—সেই ভিড়, সেই আলোর সারি, ফুটপাথ, ট্রাম, ঘরবাড়ী। লণ্ডন সহর থেকে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী হাইওয়াইকুম্ব না অতিক্রম করা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত পল্লী-অঞ্চল চোখে পড়ে না।

কিন্তু যখন চোখে পড়ল, তখন মনে হ'ল ইংলণ্ডের এই পল্লীপ্রান্ত প্রথম গ্রীষ্মের দিনে কি মনোমুগ্ধকর! ফুল, ফুল, ফুলে আলো করে আছে মাঠ, মাঠের বেড়া, লোকের বাড়ী বাগান—মাঠে ফুটেছে বাটারকাপ্ ও কুইন এ্যানের লে (একরকম সাদা সাদা বন্যপুষ্প), লোকের বেড়াতে ফুটে লতানে গোলাপ।

অক্সফোর্ড থেকে রওনা হলাম ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-এ্যাভনে। ষ্ট্র্যাটফোর্ডে পৌঁছবার কিছু পূর্ব্বেই আকাশ মেঘে ঘোরালো করে এল, বৃষ্টি পড়তে সুরু করে দিলে—আমার সঙ্গে একটা হাল্কা রেন্‌কোট ছিল—খুলে সেটা গায়ে দিলাম। গোধূলির কিছু পূর্ব্বে এ্যাভন্ নদীর উপরিস্থিত ক্লপটন ব্রিজ পার হয়ে আমি অমর কবির পদচিহ্নপূত ষ্ট্র্যাটফোর্ডে প্রবেশ করলাম।

দূরে এডিনবরা কাসল: সম্মুখে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী

গ্রীষ্মকাল, জুন মাস। আমেরিকান টুরিষ্টদের ভিড় এস্থানে অত্যন্ত বেশী। ষ্ট্র্যাটফোর্ডের শান্ত, গম্ভীর আবহাওয়া মাটী করেছে এই চটুলচিত্ত, আমোদপ্রিয় টুরিষ্টদের দল।

ভিড়ের ভয়ে আমি খুব সকালে উঠে হেনলি ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে সেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, সেই বাড়ীর বাগানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এলিজাবেথের রাজত্বকালের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত বাড়ী, সেকেলে জানালা, বাড়ীর সামনের বাগানে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পাখী ডাকছে—পণ্ডিতদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—আমার পক্ষে এই বাড়ীই যথেষ্ট।

এখান থেকে গ্রাম্যপথ দিয়ে আমি এ্যান হ্যাথাওয়ের পিতৃগৃহ দেখতে গেলাম নিকটবর্ত্তী শটারি গ্রামে। নির্ম্মল, মেঘহীন আকাশ, সুনীল—লণ্ডনের ধোঁয়া ও কুয়াসার পরে চোখ ও মন তৃপ্ত হ'ল এখানে এসে।

একটা বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গির্জ্জা। গির্জ্জাটা এমন নির্জ্জন স্থানে বনের মধ্যে অবস্থিত—স্কটের 'আ ই ভ্যা ন হো' তে বর্ণিত ফ্রায়ার টাকের গির্জ্জার কথা মনে পড়ে। একটু দূরে বন ছাড়িয়েই এ্যানের সুন্দর খড়ে ছাওয়া ঘর, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত যে, মনে হয় এ্যান বুঝি এখনও এখানেই বাস করে—আমি তার সঙ্গেই দেখা করতে চলেছি।

এ্যানের পৈতৃক ফার্ম্ম এখনও আছে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখনও সে ফার্ম্মে চাষবাস চলে—বর্ত্তমান মালিক এক মাইল দূরে অন্য একটী গ্রামে থাকেন। আমার পকেটে

মাত্র আট শিলিং সম্বল, হ্যাথাওয়ে ফার্ম্মে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখাই যাক্ না, সেখানে কোন কাজ পাওয়া যায় কি না!

অল্পক্ষণেই সেখানে পৌছে গেলাম। ইংরেজ কৃষকদের যেমন বাড়ী হয়, তেমনি ধরণের বাড়ী—আইভিলতার মণ্ডিত পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি ঢুকতেই একটা তিত্তির পাখী খাঁচার মধ্যে থেকে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল—একটু দূরে গ্রীষ্মকালের মর্শুমী ফুলের ক্ষেতের সামনে একটা রূপগর্ব্বিত ময়ূর এদিক ওদিক পায়চারী করছে।

তিত্তিরের কর্কশ রব শুনে একটী মেয়ে ঘর থেকে বার হয়ে ব্যাপার কি দেখতে এল। তার পিছনে পিছনে এল একজন মোটা মত লোক।

আমি তাকে বললাম—এখানে কোন কাজ খালি আছে কি?

—আমি তো জানি নে, আমার বেলিফকে বরং বল। ঐ তার বাড়ী—আচ্ছা, আমি তোমাকে এইমাত্র এ্যান হ্যাথাওয়ের বাড়ীতে দেখলাম না?

—দেখতে পার, সেখানে ছিলাম খানিক আগে।

—আমি আর আমার স্ত্রী মোটরে করে এই মাত্র ওই পথ দিয়েই আসছিলাম। দু'জনেই তোমাকে দেখেছি ওখানে। তুমি লাঞ্চ খেয়েছ?

—না।

আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে—এস, লাঞ্চ খাবার সময় হ'ল, আগে লাঞ্চ খেয়ে নাও, তারপর তুমি গিয়ে আমার বেলিফের সঙ্গে দেখা ক'র।

ফার্ম্মের মালিকের স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা—ওদের ছেলের বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশী, মা ও ছেলে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলে। একটী অল্পবয়সী ঝি অনেকগুলি সুস্বাদু স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল ও এক বোতল বিয়ার। খাওয়া শেষ হলে কৃষকের ছেলে তার সিগারেটের বাক্স আমার দিকে এগিয়ে দিলে। পয়সার অভাবে আজ দুদিন সিগারেট খাইনি—প্রাণভরে ধূমপান করা গেল।

বেলিফের বাড়ীতে গিয়ে দরজায় ঘা দিতেই একজন যুবক বার হয়ে এল—সেই বেলিফ্। আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে বললে—তুমি গোরু দুইতে জান?

বেপরোয়া ভাবে বললাম—খুব জানি।

অথচ জীবনে একবার মাত্র একটা কৃষকের বাড়ীতে দেশে ওই কাজটা করেছিলাম।

বেলিফ্ বললে—গোয়াল পরিষ্কার রাখা ও দুধ দোয়ার জন্যে একটা লোক আমাদের দরকার। আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারাই কাজ চলবে। মাইনে হপ্তায় ত্রিশ শিলিং—তার মধ্যে হপ্তায় সতের শিলিংএর মধ্যে আমি আমাদের এক প্রজার বাড়ীতে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পারব।

গোরুর রাখাল করা কাজটা যদিও আমার মনঃপূত নয়—কিন্তু এদিকেও হাত খালি। নেওয়া যাক কাজটা। হপ্তায়

ষ্ট্র্যাটফোর্ড: সেক্সপীয়ার-প্রেয়সী অ্যান হ্যাথাওয়ের বাসগৃহ।

খাওয়া বাদে ১৩ শিলিং বাঁচবে—এক মাস এখানে কাজ করলেই আবার রাস্তায় দু' সপ্তাহ চালিয়ে নেবার মত অর্থ সঞ্চয় করতে পারব এখন।

বড় রাস্তা পার হয়ে গরীব লোকের ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর। তারই একটীর সামনে আমরা এসে দাঁড়ালাম। বাড়ীর বাইরেটা শ্রীহীন, জানালায় কাঁচ বসানো নেই। একটী স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে দিলে। বেলিফের প্রশ্ন শুনে বললে, থাকার জায়গা সে দিতে পারে না—আমি কি তার ছেলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব? তার ছেলেও ওই ফার্ম্মেই কাজ করে।

আমি বললাম—তাতে আমার কষ্ট হবে না। তুমি কি নেবে?

স্ত্রীলোকটী একটু ইতস্ততঃ করে বললে—আমার ছেলে যা দেয়—তাই তুমি দিও, সতেরো শিলিং।

বেলিফ্ পথে আসতে আসতে আমায় বললে—তুমি কোন্ কাপড় পরে কাজ করবে? অন্য কোন পোষাক আছে তোমার?

এইখানেই গোলমাল বাধল। আমার আর কোনো পোষাক নেই, অথচ গোরু-সেবার কাজে থাকলে এ কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যাবে। কুড়ি শিলিংএর কম আর এক প্রস্থ.পোষাক হবে না। কুড়ি শিলিং জমাতে জমাতে গ্রীষ্ম-

ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন: সেক্সপীয়ারের সমাধি-প্রস্তর।

কাল কেটে যাবে। সুতরাং কাজ পেয়েও ছাড়তে হ'ল—আবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নানা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। এ সব গ্রামে সবাই গরীব।

ক্রমে আমি ওরস্টার সহরে পৌছলাম। সহরের পাশেই সেভান নদী ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ। একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, আমি থাকবার ঘর খুঁজছি কি না। তার ভগ্নীর বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া দেবে।

তার পর সে বললে—আমায় কিছু সাহায্য কর না? সাত মাস আমার চাকুরী নেই, ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। ওই দেখ আমার স্ত্রী—কাছেই একটা ছোট ঘরের দরজায় একটী স্ত্রীলোক বসে ছিল—তার কোলে একটী শিশু এবং তার চারি ধারে মলিন পোষাক পরণে ছেলেমেয়ের দল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

—তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু আমার পকেট খালি। চল বরং তোমাকে বিয়ার খাওয়াই।

একটা মদের দোকানে গিয়ে তাকে বিয়ার খাওয়ালাম। তার পর সে আমাকে তার ভগ্নীর বাড়ী-ঘর দেখাতে নিয়ে চলল। ইংলণ্ডের পাড়াগাঁয়ে সব বাড়ীতেই সামনের দিকে একটু ফুলের বাগান থাকে, এমন কি অতি গরীব লোকের বাড়ীতেও। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পোষাক-পরা মেয়ে এসে দোরে দাঁড়াল। সে তার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে—ও, তুমি? খুব সময়ে এসে পড়েছ। আমরা সবে চা খেতে যাচ্ছি—চায়ের সময় আজ একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত ভালই আছে। সঙ্গে এটী কে?

—উনি একটা ঘর ভাড়া চান। তোমার তো একটা ঘর আছে, না?

—থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে—

তার পর মেয়েটী আমার দিকে ফিরে বললে—এসে ঘরের মধ্যে ব'স। উঃ তুমি যে লম্বা।

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসেছি, মেয়েটী হাত দুটো উপরের দিকে তুলে আশ্চর্য্য হবার সুরে বললে—উঃ, লম্বা বটে! তোমাকে শুতে দেওয়ার মত খাট আমার বাড়ীতে কোথায়?

আমি বললাম—চল দেখি, কি রকম খাট তোমার আছে।

মেয়েটী আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরটীতে বেশ হাওয়া আসে, আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে দু'খানা খাটো—একটাতে মেয়েটীর ছোট ভাই থাকে—সে নিকটবর্ত্তী কারখানায় কাজ করে। আর একটা ঘর আছে পাশে, মেয়েটী বললে, সে ঘরে সে নিজে, তার ছোট্ট মেয়ে এবং তার বোন থাকে।

—বেশ, ভাড়া কত?

—যদি এখানে তুমি আস, থাকা আর খাওয়ার জন্তে তুমি দৈনিক চার শিলিং দিও।

বেশ সস্তা বলেই মনে হ'ল—আমি মেয়েটার প্রতি আরও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, যখন সে অগ্রিম কিছু টাকা চাইলে না ভাড়া বাবদ। চাইলে দিতে পারতাম না।

আমরা আবার বাইরে ফিরে গেলে, মেয়েটী বললে—তুমি এক পেয়ালা চা খাবে কি?

ভালই খেতে দেয়। খাওয়ার পরে হাই ষ্ট্রীট্ বেয়ে চাকরী খুঁজতে বার হলাম। যতগুলো হোটেল ছিল কাছাকাছি, তাদের একটাতেও কোন কাজ খালি নেই। একটা হোটেলের কর্ত্রী স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটী আমায় দেখে হেসে উঠে বললে—কাজ খুঁজতে এসেছ? তোমার চাকরীর দরকার কি? তুমি দেখছি আর একজন পাগলা আমেরিকান—বোধহয় তুমি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাজী ফেলেছ যে, তুমি এই
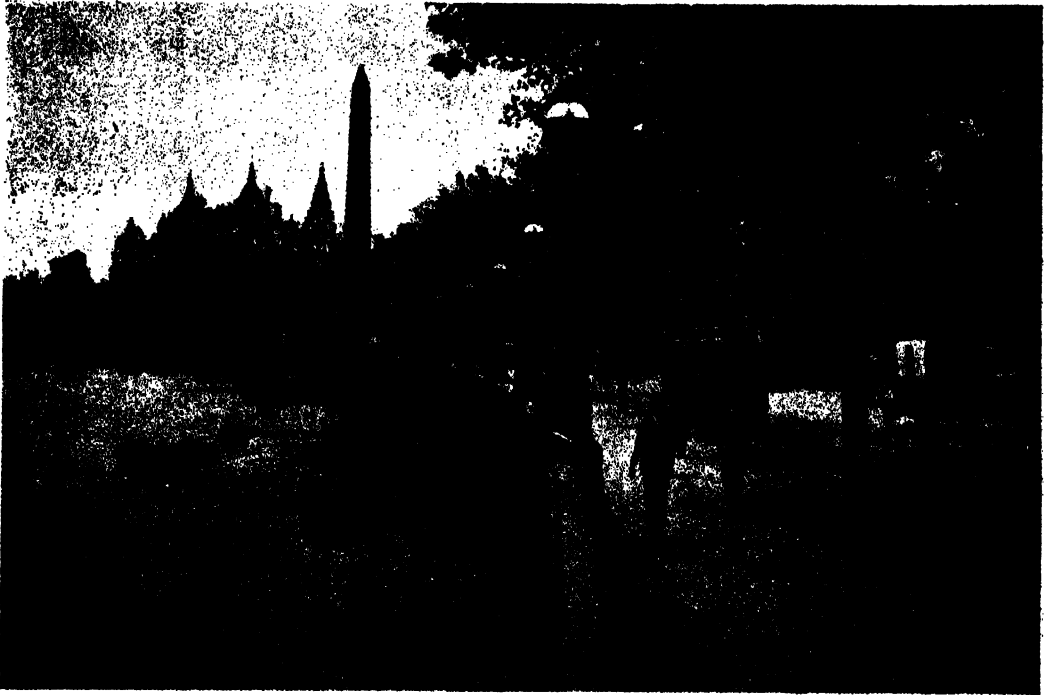
ভিক্টোরিয়া এম্বাঙ্কমেণ্ট; লণ্ডন: দৃষ্ট-স্তম্ভটী 'ক্লিয়োপেট্রার সীবনী' (Cleopatra's Needle) নামে খ্যাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া রটনা; ১৮৭৮ সনে ইহা ইংলণ্ডে আনীত হয়।

—যদি তৈরী থাকে দিতে পার, কিন্তু চা করার কষ্টের মধ্যে যেও না।

—চা করার কষ্ট আর কি? তুমি বিস্কুট আর চিজ্ পছন্দ কর?

একটু পরে মেয়েটী একটা প্লেটে খানকতক ক্র্যাকার ও খুব খানিকটা চিজ্ নিয়ে এল। ইংরেজরা দিনে তিনবার খায়—ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ আর ডিনার—এ ছাড়া বিকেলে চা খায়, রাত আটটার সময় আর একবার চা খায়, একে এরা বলে high tea।

পরদিন ওদের বাড়ীতে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে বুঝলাম ওরা

বাজারেও চাকরী যোগাড় করতে পার কি না এই নিয়ে—ঠিক নয় কি, সত্য কথা বল তো?

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনে আমার কৌতুক হল, রাগও হ'ল। বললাম—কে বললে আমি অষ্ট্রেলিয়ান নই? আর সত্যিই কাজ খুঁজছি না?

সে একটু নরম হয়ে বললে—আমি ভেবেছিলাম তুমি আমেরিকান। তা, এখানে কোন কাজ খালি নেই।

এ দেশের পাড়াগাঁয়ে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে যে, প্রত্যেক আমেরিকানই টাকার কুমীর। তাদের আর চাকরী করে খেতে হয় না। আমার স্বদেশ থেকে টুরিষ্ট দল এসে

এদের মনে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। তাই হোটেল-কর্ত্রীর ভুল ভেঙে দেবার জন্যে বললাম—তুমি সত্যিই আন্দাজ করেছ, আমি আমেরিকানই বটে, কিন্তু আমার পকেটে টাকা ঝম্‌ ঝম্‌ করছে না। আমি নিজের খরচে কাজ করে চালিয়ে পায়ে হেঁটে সারা ইংলণ্ড বেড়াব মতলব করেছি।

হোটেল-কর্ত্রী বললে—কাজকর্ম্ম এখানে পাওয়া যাবে না। তোমাকে বন্ধুর মত বলছি।

সেখান থেকে বার হয়ে অনেকগুলো রেষ্টুরেণ্ট, মদের দোকান খুঁজলাম—সর্ব্বত্র এক কথা—চাকুরী কোথাও খালি নেই। অনেক কারখানা থেকে লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে—নতুন লোক নেওয়া তো দূরের কথা। এতক্ষণ পরে মনে হ'ল হাথাওয়ে ফার্ম্মের চাকুরীটা না নিয়ে কি অন্যায় কাজই করেছি।

ওয়েষ্টমুরল্যাণ্ড: ইংরাজী সাহিত্যে খ্যাত লেক উইণ্ডমিয়ারের অনতিদূরে।

পরদিন আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম—ওয়েল্‌সের বনাকীর্ণ পথে। আমার সামনে বড় পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের ঢালুতে হিদারের বন, আর কিছু দিন পরে আগুনের মত রাঙা ছোট ছোট ফুল ফুটে পাহাড়ের ঢালুতে আগুন লাগিয়ে দেবে। একজন মেষপালক ভেড়া চড়িয়ে ফিরছে, সে আকাশে উড়ন্ত একটা সিন্ধু-শকুন দেখিয়া বললে—ঝড়বৃষ্টি আসবে, পাখীটা কত নীচুতে উড়ছে, দেখছ না? এই বেলা কোথাও আশ্রয় নাও।

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি নামল, কিন্তু বাতাস ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজেই পথ চলেছি, আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। বার তের মাইলের মধ্যে একখানা মোটরগাড়ীও চোখে পড়ল না। তারপর অন্ধকার হয়ে এল, বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে আমি রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যে যাচ্ছি, কিছুই ঠিক করতে পারি না,—মহা বিপদে পড়ে গেলাম। আমার সামনে শুধু তৃণাবৃত প্রান্তর ও ছোট ছোট পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড়।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা বাড়ী দেখা গেল। আনন্দে ও আগ্রহে সে দিকে চললাম, কিন্তু বাড়ীটার খুব কাছে এসে মনে হ'ল বাড়ীটা জনহীন, পরিত্যক্ত। তবুও দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। আমার অদৃষ্ট ভাল, একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলে। আমি বললাম—তুমি রাত্রে আমায় একটু জায়গা দিতে পার? আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

স্ত্রীলোকটী বললে—অসম্ভব, আমাদেরই জায়গা হয় না।

আমি যথাসম্ভব সুমিষ্ট সুরে বললাম—কিন্তু এক পেয়ালা চা তুমি অবশ্য আমায় দেবে?

—আমরা বড় গরীব, শুধু তোমাকে প্লেন চা দিতে পারি।

ঘরে ঢুকে আমি আগুনের কাছে বসলাম। একটু পরে ঘরে একজন ষণ্ডামার্ক গোছের লোক ঢুকে আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলে, কে এ?

স্ত্রীলোকটী যেন একটু ভয়ের সুরে ইতস্ততঃ করে আমার ব্যাপার যা জানে বললে। লোকটা তখন নরম সুরে বললে—এমন দিনে রাস্তায় বেরতে আছে? আমাদের এখানে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না রাত্রে। আর একটীমাত্র ঘর আছে, তাতে আমার মেয়ে শোয়। মাইল তিনেক দূরে একটা ফার্ম্ম আছে, সেখানে যাও।

স্ত্রীলোকটী চা নিয়ে এল—চায়ের সঙ্গে রুটী, মাখন ও জ্যাম। সব জিনিস টাটকা, দিয়েছেও প্রচুর পরিমাণে। খেয়ে সারাদিনের পথ হাঁটার কষ্ট দূর হ'ল। চা খাওয়া শেষ করে বললাম—কত দাম দিতে হবে?

স্ত্রীলোকটী বললে—এক শিলিং।

আমি স্ত্রীলোকটীর হাতে একটা শিলিং দিলাম—সে ওর মেয়েকে ডাকলে—মেয়েটীর পরণে চেকের গাউন, বয়স অল্প, একটু লাজুক। তার মা তারই হাতে শিলিংটা দিলে—শিলিংটা পেয়ে মেয়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—কতকাল বোধ হয় পয়সা হাতে পাইনি।

বাইরে ঘোর অন্ধকার—বাতাস জোরে বইছে—ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে লিণ্ডমিনিষ্টারের দিকে রওনা হলাম।
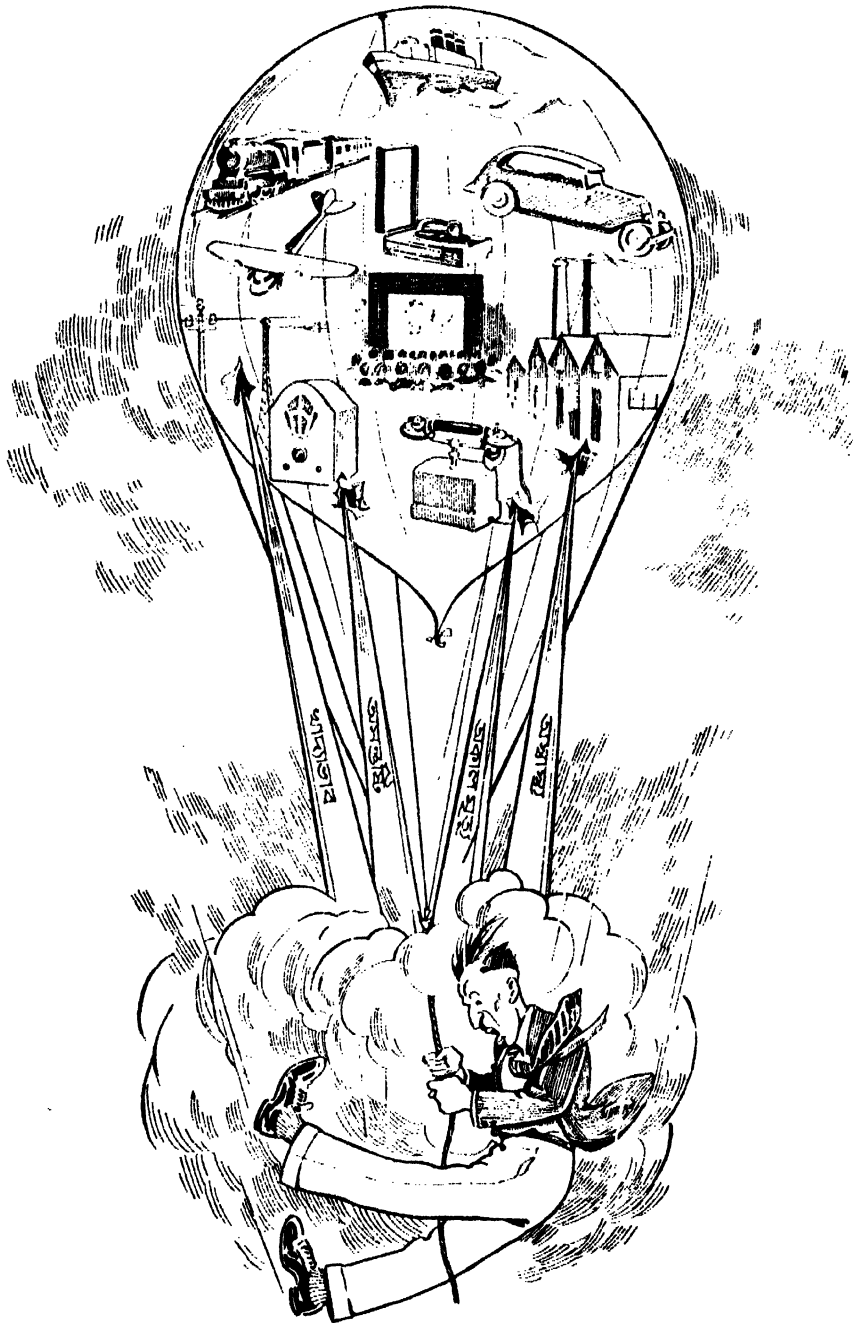
বিজ্ঞানের ব্যোমযান যত ঊর্দ্ধে উঠে
খাদ্যাভাব বাড়ে দেশে, অন্ন নাহি জুটে ;
বুঝে না'ক ভ্রান্ত নর কোথা তার গতি
চারিদিকে অসন্তুষ্ট, কি ভীষণ ক্ষতি।

অকালমৃত্যুর হার না হয় নির্ণয়
অস্বাস্থ্যের মুক্তদ্বার বন্ধ নাহি হয় ;
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বলি সবাই অজ্ঞান,
পশিতেছে যমালয়ে তবু নাহি জ্ঞান।

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৭]

ভাষা-শিক্ষা

অভ্যাস করাইলে পাখীকেও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎপাদন শিক্ষা দেওয়া যায়। মূক-বধির শিশুকে শব্দের উৎপাদন করিতে শিক্ষা দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত পদ্ধতিতে, আমরা কথা বলিতে যে সব শব্দ উচ্চারণ করি, তাহা সমস্তই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে কোন বাধা হইতে পারে না। কোন কোন শিশু শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহার কারণ তাহার বধিরত্ব নয়, ইহার কারণ তাহার মূকত্ব। এইরূপ অনেক শিশু দেখা যায়, যাহাদের শ্রবণশক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে, তথাপি কথা বলিতে পারে না। তাহারা ভাষা বুঝে, কোন কথা বলিলে তাহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু কথা বলিয়া নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এই অবস্থাকে ইংরাজিতে speech-aphasia বলে।

বহুবিধ কারণে এইরূপ মূকত্ব হইতে পারে। যে কোন বাগ্-যন্ত্রের, বিশেষতঃ জিহ্বার কার্য্যকরী ক্ষমতা আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে না থাকার জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণ মূকত্ব হইতে পারে। শিশু কাণ দিয়া কথা শোনে, শ্রুত কথা মস্তকে ধরিয়া রাখে, পরে শক্তি-সঞ্চালক স্নায়ু মণ্ডলীর (motor nerves) সাহায্যে নিজে উচ্চারণ করে। মস্তিষ্কের ব্যাধির জন্য যদি কোন শিশু শ্রুত শব্দ স্মরণ করিয়া রাখিতে না পারে, অথবা যদি তাহার শক্তি-সঞ্চালক স্নায়ুর কার্য্যকরী শক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে তাহার ব্যাধির গুরুত্ব অনুযায়ী আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণভাবে মূক হইবে। এইরূপ মূকত্বের সহিত মূক-বধিরত্বের কোন সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নাই। অনেক সময় মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত পাইলে বা মানসিক আঘাত পাইলে, স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্যকরী শক্তি লোপ পাইয়া মূকত্ব-উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

ভাষা মানুষের কেবল নিজস্ব অধিকার নয়। ইতর জীব-জন্তুরও ভাষা আছে। মূক-বধিরের ইঙ্গিতের ভাষা আছে। আমার এই প্রবন্ধে 'ভাষা' বলিতে, আমি এই সব ভাষা ধরিতেছি না। আমি ধরিতেছি কথিত ও লিখিত ভাষা, যাহাতে কেবল মানুষের অধিকার আছে এবং যাহার জোরে মানুষ সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্ট জীবের উপর রাজত্ব করিতেছে। কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলেই ভাষা হয় না। শব্দের সহিত ভাবের সম্পর্ক হইতে ভাষার উৎপত্তি। মূক-বধির শিশু যত পরিষ্কার করিয়াই শব্দের উচ্চারণ করিতে শিখুক না কেন, উহা তাহার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন হইবে, যতক্ষণ না সে উচ্চারিত শব্দের সহিত ভাবের সমন্বয় করিতে পারিবে। শব্দের সহিত ভাবের **এই সমন্বয় শিক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ ভাষা শিক্ষা দেওয়া মূক-বধির-শিক্ষকের সব চেয়ে বড় ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত কাষ।**

কি উপায়ে মূক-বধির শিশুকে সহজে ও উপযুক্ত ভাবে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা একটি সমস্যা। কোনও একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম বা পদ্ধতি লিখিয়া দেওয়া চলে না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। গৃহে সাধারণ শিশু যে ভাবে শুনিয়া শুনিয়া ভাষা শেখে, মূক-বধির শিশুরও সেই ভাবে "দেখিয়া দেখিয়া" অর্থাৎ কথা বলিতে বক্তার ওষ্ঠ ও অন্যান্য বাগ্-যন্ত্রের গতির সহিত ভাবের সমন্বয় করিয়া ভাষা শিক্ষা করা উচিত। সাধারণ শিশু ঘরে-বাইরে, তাহার পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে ভাষা শিক্ষা করে। মূক-বধির শিশুর পক্ষেও তাহাই খাটে।

সাধারণ শিশু যখন গৃহে তাহার মা'র কাছে, বাবার কাছে আত্মীয়-স্বজনের কাছে, বাইরে পরিচিত-অপরিচিত নানা লোকের কাছে শুনিয়া শুনিয়া ভাষা শেখে, তখন সে ব্যাকরণের কোন ধারই ধারে না। মূক-বধির শিশুও যখন শিক্ষকদিগের, বাবা—মা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের "মুখ দেখিয়া দেখিয়া" ভাষা শেখে, তখন সে ব্যাকরণের কোন ধার ধারে না।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত পদার্থের, পশু-পক্ষীপ্রভৃতির নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করি, বারংবার সেই সমস্ত নামের উচ্চারণ অভ্যাস করাইয়া এবং উহাদিগের সহিত পদার্থগুলির সম্বন্ধ দেখাইয়া ভাষা-শিক্ষার ভিত্তি আরম্ভ হয়। কতকগুলি চলতি 'নাম' বলিতে পারার পর ছোট ছোট বাক্যের অবতারণা করা হয়। কিন্তু বাক্য 'বলিতে' পারার আগে 'বুঝিতে' পারা দরকার, নতুবা ভাষার দিক দিয়া বাক্য-বলার কোন অর্থই হয় না। উদাহরণ স্বরূপ 'দৌড়ান' ক্রিয়াপদটিকে লওয়া যাউক। হয়ত' একদিন ক্লাসে কোন ছেলে কোন কারণ বশতঃ একস্থান হইতে অন্য স্থানে দৌড়াইয়া গেল। ক্লাসের ছেলেদের সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। শিক্ষক এই ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া 'দৌড়ান' ক্রিয়াপদটি শিক্ষা দিতে পারেন। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সুবোধ কি করেছে? অবশ্য কেহই উত্তর দিতে পারিবে না। তিনি তখন বলিলেন,—সুবোধ দৌড়েছে। তিনি সমস্ত ছাত্রকে বলিলেন, তুমি দৌড়াও, তুমি দৌড়াও। কয়েকবার বলার পরই "দৌড়াও" বলিতে বাগ্-যন্ত্রের প্রচেষ্টার সহিত দৌড়ান ক্রিয়াটির সম্বন্ধ ছেলেরা বুঝিতে পারিবে। তখন একটা নূতন উৎসাহে সব ছেলেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে। 'তুমি দৌড়াও' বাক্যটির 'প্রাণ' তাহারা উপলব্ধি করিয়া লইল, বাকী রহিল শুধু, বলা। তখন শিক্ষক মহাশয় 'দৌড়েছি, দৌড়েছ, দৌড়েছে' এই পদগুলি প্রত্যেক ছেলেকে বলিতে শিক্ষা দেন। তখন ছেলেরা নিজেরাই বলিতে আরম্ভ করে, আমি দৌড়েছি, তুমি দৌড়েছ, সুবোধ দৌড়েছে। কোন ছেলে হয়ত বাইরে, রাস্তায় একটা কুকুরকে দৌড়াইতে দেখিল। অমনি সে বলিয়া উঠিল,—কুকুর দৌড়েছে। এই ভাবে নূতন

নূতন কর্ত্তৃপদের সহিত "দৌড়ান" ক্রিয়াপদটির ব্যবহার করিয়া, ছাত্ররা এক নূতন ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিল। এই ভাবে একটির পর একটি করিয়া দৈনন্দিন জীবনের চলতি ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলির শিক্ষা দেওয়া হয়।

দয়া, রাগ, হিংসাপ্রভৃতি গুণবাচক পদগুলি শিক্ষা দিবার আগে পদগুলির ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থা হওয়া দরকার। 'দয়া' বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা কেহ দয়া করিতেছে বা শিশু নিজে দয়া করিতেছে, এই অবস্থা না হইলে, 'দয়া' কথাটি শিক্ষা দেওয়া চলে না। স্বতঃই এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে ভাল, অন্যথায় অবস্থা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। 'দয়া', 'মমতা', 'করুণা'প্রভৃতি পদগুলির মধ্যে কি পার্থক্য তাহা সাধারণ শিশুর ন্যায়, মূক-বধির শিশুও ব্যবহার করিতে করিতে শেখে।

চার পাঁচ বৎসরে, ব্যবহার করিতে করিতে, মূক-বধির শিশু তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভাষাই ব্যবহার করিতে পারে। ক্লাসে, মাঠে, বাড়ীতে সব সময়ই তাহার সহিত কথা বলা দরকার। কারণ ভাষার যে কোন প্রয়োগের (language formation) বহুবার পুনরাবৃত্তি হওয়া চাই। ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ শিশু হাজার বার শুনিয়া ও বলিয়া ভাষা প্রয়োগ করিতে শেখে। মূক-বধির শিশুকেও সেইরূপ হাজারবার 'দেখিয়া' ও বলিয়া শিখিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। প্রকৃত শিক্ষকের বিশেষত্ব হইতেছে, তিনি পুনরাবৃত্তির মধ্যেও সর্ব্বদাই নূতনত্বের ছাপ দিতে পারেন, যাহাতে ছেলেদের উৎসাহের অভাব হয় না। এই শক্তি কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। মাজিয়া-ঘষিয়া প্রকৃত শিক্ষক তৈয়ার করা যায় না, শিক্ষক হিসাবে উৎকর্ষতা লাভ করিতে হইলে, নিজের স্বাভাবিক শক্তি থাকা দরকার।

একবার ভাষার গোড়া-পত্তন হইয়া গেলে, পরে আর কিছুই ভাবিতে হয় না। বালক তখন বই পড়িয়া, দশ জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া, ভাষার অধিকতর জটিল প্রয়োগ সহজেই শিখিতে পারে। কিন্তু গোড়া-পত্তন ঠিক না হইলে, উপরের কায কেবল ভারে বৃদ্ধি পায়, সামান্য আঘাতেই 'হুড়মুড়' করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে।

মূক-বধিরদের ভাষাশিক্ষা বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে, কিন্তু উহা অত্যন্ত technical হইবে বলিয়া, সে-সব লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। (ক্রমশঃ)

হান বজ্র হান দেব

—শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

হান বজ্র হান দেব,
এই সব ক্ষুদ্র নীচ মনুর সন্তানে
হান তব তীক্ষ্ণ খড়্গ,
দয়া নয়, ক্ষমা নয়, নয় তৃষ্ণাবারি,
অতি হেয়, অতি পশু, অন্ধ অল্প-আয়ু
ক্লিষ্ট-প্রাণ, ক্ষুদ্রগতি এরা—
গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়া হান বজ্রবাণ।

তোমার সৃষ্টির মাঝে এ কি কীর্ত্তিনাশা!
এ কি সব কঙ্কালের বিশীর্ণ বিদগ্ধ
কলরব! একি সব অসুন্দর কৃমির লালসা—
লোভাতুর, আত্মজ্ঞানহীন যত উলঙ্গ শয়তান
তোমার মহান্ রাজ্যে করে বসবাস!

কত দূরে আছ তুমি হে রুদ্র দেবতা,
এ সৌর জগতে?
মুক্ত করি দাও, শিব, তোমার—
নিষ্ঠুর, মত্ত, নগ্ন সর্পরাজি এদের অশক্ত শিরে।
দয়া নয়, ক্ষমা নয়—
উদাত্ত কণ্ঠের বাণী সব নিরর্থক
পৃথ্বী কাঁপে থর থর।
তোমার সৃষ্টিরে এরা দেয় লোপ করে,
হান পিতা, হান বজ্র ইহাদের শিরে।

কোন্ সে আদিম কালে
ধূম্র, উষ্ণ বায়ু-ভরা এই পৃথিবীতে
এল এই ঘৃণ্য পশুকুল,
সৃষ্টিরে করিল ক্ষুণ্ণ,
মহানেরে না দিল সম্মান,
আলোরে পরায়ে দিল খদ্যোতের বেশ।
সেই হ'তে অবিশ্রান্ত চলেছে
যে অসত্যের খেলা
আজও তার নাই শ্রান্তি নাই, পরিশেষ।

ওগো বৈশ্বানর, তব জ্যোতি বিন্দু পুঞ্জ—
হতেছে নিঃশেষ, তারকার আত্মহত্যা,
রবির বিলীন!

দয়া নয়, ক্ষমা নয়—
তোমার নিষ্ঠুর দণ্ড, পড়ুক ঝঙ্কারি
নিষ্কলুষ হোক্ মর্ত্ত্যতল,
কোথা তব রূঢ় সত্য, কঠিন বর্ব্বর?
কোথা তব ক্ষাত্র তেজ? কোথা তব
বীর্য্য? তব কোথা ব্রহ্মতেজ?
হান অগ্নি, হান মৃত্যু এদের উপরে,
নির্ম্মল হউক্ ধরা, উজ্জ্বল হউক্ আলো
দীপ্তিময়, সত্যময়, সুন্দর, সবল,
হউক বিশ্বের বক্ষ পূর্ণ সুষমায়।

বিদ্রোহী

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবব্রত আমার বন্ধু ছিল না। কিন্তু আজ এই ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণ-সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে বহু দূরে বসিয়া ষোল বৎসর পূর্ব্বের এমনি আর একটি সন্ধ্যার কথা বার বার মনে পড়িতেছে। রামতনু লাইব্রেরীর রীডিং-রুমে আমরা কয়জন টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া ছিলাম, আর দেবব্রত আমাদের সম্মুখে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো তাহার উগ্র সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহার বজ্রকঠিন মুখ ধীরে ধীরে রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল, ঠোঁট দুটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—

সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

তখন কলিকাতা থাকিয়া এম-এ পড়ি ও সন্ধ্যার পর রামতনু লাইব্রেরীতে বসিয়া আড্ডা দিই। রামতনু লাইব্রেরী কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার মত আরও গুটিকয়েক প্রবীণ ছাত্রের স্থায়ী আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তন্মধ্যে দেবব্রত ও সুরেনদাদা উল্লেখযোগ্য। বাকিগুলি বিশেষত্বহীন, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

সুরেন দাদা একাদিক্রমে বহু বৎসর ল'-কলেজের ছাত্র থাকিয়া, অভিজ্ঞতা, কলেবর ও বয়োমর্য্যাদার বলে 'সার্ব্বভৌম 'দাদা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম দেশে তাঁহার গুটি তিন চার পুত্র-কলত্র আছে। আমরা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

দেবব্রত আমার সহপাঠী ছিল; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে আমার বন্ধু ছিল না। দেবব্রতের বন্ধুভাগ্যটা ছিল খারাপ; আজ পর্য্যন্ত সে একটিও সত্যকার বন্ধু লাভ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

দেবব্রত বড়মানুষের ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পিতা যখন তাহার তরুণ হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা ও আরও অনেক বিষয়সম্পত্তি রাখিয়া ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এই অভিভাবকহীন যুবক এইবার বহু ইয়ার জুটাইয়া পিতৃ-অর্থ দু'হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিবে। তাহাকে কাপ্তেন পাকড়াইবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছিল। কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছিল: তাহার জীবনযাত্রা বা মতামতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমরা রামতনু লাইব্রেরীর আড্ডাধারীগণ তাহাকে পছন্দ করিতাম না। তাহার বুদ্ধির এমন একটা কুণ্ঠাহীন অনাবৃত নগ্নতা ছিল যে, আমাদের চোখে তাহা অশ্লীল দুর্নীতির রূপান্তর বলিয়া মনে হইত। আমরা বাঙ্গালী জাতি. অনাবশ্যক তর্ক করিতে পশ্চাদ্‌পদ, এ অপবাদ কেহ কখনও দিতে পারে নাই; কিন্তু দেবব্রতের সঙ্গে তর্ক বাধিলে আমরা কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, তর্কে আর রুচি থাকিত না। তাহার তর্ক করিবার রীতি দেখিয়াই আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, ঋষিবাক্য কিছুই সে স্বীকার করিত না, কেবল বুদ্ধির জবরদস্তি দ্বারা সকলকে কাবু করিবার চেষ্টা করিত। বলা বাহুল্য, এরূপ লোক বড়মানুষ হইলেও তাহার সহিত সদ্ভাব রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাহার চেহারা ছিল উগ্র রকমের সুন্দর। ছ' ফুট লম্বা গৌরবর্ণ ধারালো মুখের উপর বাঁকা নাকটা যেন খড়্গের মত উদ্যত হইয়া আছে। চোখের চাহনি এত তীব্র ও নির্ভীক যে, সাধারণতঃ তাহাকে অত্যন্ত দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়।

টাকার গর্ব্ব অবশ্য তাহার ছিল না, কারণ টাকা জিনিষটাকে সে গর্ব্বের বস্তু বলিয়া মনে করিত না। অযথা বড়মানুষী করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, সে হাঁটিয়া কলেজে যাইত। তাহার গর্ব্ব ছিল শুধু বুদ্ধির। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইত, বুদ্ধির বলে সে মানুষের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত ধাপ্পাবাজি ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমাদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ জীবের প্রতি তাহার করুণার অন্ত নাই।

তাহার উদ্ধত মতবাদ প্রায়ই নাস্তিকতার পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। মনে আছে, একবার কি একটা আলোচনার প্রসঙ্গে দাদা বলিতেছিলেন যে, বিবাহ নামক সংস্কারটাই মনুষ্য-সমাজকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যাহারা বিবাহ-

বন্ধনকে শিথিল করিতে চায় তাহারা সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। দেবব্রত একটা বিলাতী মাসিকপত্রের ছবি দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, বিবাহ জিনিষটার স্বকীয় মূল্য কি?

দাদা বলিলেন, পৃথিবীতে কোনো জিনিষেরই স্বকীয় মূল্য নেই, সব আপেক্ষিক। বিবাহ আমাদের মহামূল্য সম্পদ, কারণ সমাজকে সে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

—'প্রেমের বন্ধন' কোথা থেকে এল? বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি?

দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বিবাহ আর প্রেমের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে?

—অনিবার্য্য সম্বন্ধ আছে, এটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন ত ভাল হয়।

দাদা রুষ্টমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তা যদি নাও থাকে, তবু সমাজের বন্ধন হিসাবে বিবাহের মূল্য কমে না।

—কিন্তু তা হলে প্রশ্ন ওঠে, একটা কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখা কি সঙ্গত?

—কৃত্রিম বন্ধন? মানে?

—যে বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধরা দেয় না, সে বন্ধন কৃত্রিম নয় ত কি?

দাদা চটিয়া উঠিলেন। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মুখে কোনও কথা বাধে না, তিনি মোটা গলায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন! অর্থাৎ তোমার পূর্ব্ব-পুরুষদের বিবাহকেও তুমি পবিত্র বলে মনে কর না?

দেবব্রতও মুষ্টি পাকাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—না—স্বীকার করি না—

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে তার হৃদয় নহিলে
মনে কি ভেবেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সগর্জ্জনে আবৃত্তি করিলে শুনিতে মধুর হয় না; বিশেষতঃ নিজের পূর্ব্ব-পুরুষদের বিবাহ অপবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে যে কুণ্ঠিত হয় না এরূপ বর্ব্বরের মুখে। দাদাও গুম হইয়া গেলেন, এত বড় ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন,—তুমি তা হলে কিছুই মান না বল?

দেবব্রতও কণ্ঠস্বর কিয়ৎ পরিমাণে নামাইয়া বলিল,—মানি। কেবল একটা জিনিষ।

দাদা বলিলেন,—জিনিষটি কি?

সংক্ষেপে দেবব্রত বলিল,—প্রেম।

দাদা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—বল কি? বিবাহ মান না, তার মানে বিবাহ-সম্ভূত যতকিছু সম্বন্ধ সবই অস্বীকার কর। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম এ সব নিশ্চয় তোমার কাছে ভুয়ো। অথচ প্রেম মান—তার মানেটা কি?

—মানেটা খুব সহজ। ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃস্নেহ এগুলো মানুষের মনগড়া জিনিষ,—তাই কথনো কথনো মা নিজের হাতে সন্তানকে খুন করেছে এ কথা শোনা যায় এবং ভ্রাতৃপ্রেম যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা উপলক্ষে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হয় তা সকলেই জানে। সুতরাং ও ঠুটো ঝুঁটো জিনিষ—খাঁটি নয়। খাঁটি যদি কিছু থাকে ত সে প্রেম—যা আত্মীয়তার অপেক্ষা রাখে না, যার মূল্য আপনার বিবাহের মত আপেক্ষিক নয়, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ; স্বকীয়।

দাদা বলিলেন,—হুঁ। প্রেম ত বড় ভাল জিনিষ দেখছি। কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম বা মাতৃস্নেহের চেয়ে ওটা উচ্চ কোন্‌খানে তা এখনও হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

দেবব্রত তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল,—হৃদয়ঙ্গম হবে কোত্থেকে! হৃদয়ের চারপাশে তিন ইঞ্চি পুরু কুসংস্কার জমা করে রেখেছেন যে। নৈলে, প্রেমই মায়ের মনে গিয়ে মাতৃস্নেহে পরিণত হয় এবং ভ্রাতার বুকে প্রবেশ করে, কখনও কখনও লক্ষ্মণের মত ভাই তৈরী করে, এটা বুঝতে দেরী হ'ত না। মাতৃস্নেহ বলে স্বতঃসিদ্ধ কিছু নেই, তা যদি থাকত তা হলে প্রত্যেক মা তার সবগুলি সন্তানকে সমান ভালবাসত। কিন্তু পৃথিবীতে কোনও মা তা বাসে না।—এখন দেখছেন যে, মাতৃস্নেহ বলে বস্তুতঃ কিছু নেই! আছে শুধু প্রেম!

দাদা আবার ধৈর্য্য হারাইলেন; বাস্তবিক এরকম কথা শুনিলে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি দুই

বাহু শূন্যে আস্ফালিত করিয়া উগ্র কণ্ঠে কহিলেন,—মাতৃস্নেহ যদি না থাকে তবে প্রেমও নেই। তুমি প্রেমের এত দালালি করছ কেন তবে? আজকাল প্রেম করছ বুঝি?

দেবব্রত এবার সজোরে হাসিয়া উঠিল, বেশ প্রাণখোলা সকৌতুক হাসি। বলিল,—দাদা, প্রেম কি চেষ্টা করে করা যায়? ওটা সহজ—যত্নসাধ্য নয়—তাই ওর আর একটা নাম অহৈতুকী প্রীতি।

দাদা শ্লেষ করিয়া বলিলেন,—জয় রাধেশ্যাম! হরি হরি বল।

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম, এবার খুব শান্তভাবে বলিলাম, দেবব্রত, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

—পার।

—বিবাহকে তুমি যখন সত্য বন্ধন বলে স্বীকার কর না, তখন স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনেও তোমার কোন আপত্তি নেই?

দেবব্রত বলিল,—কিছুই না। আর, আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?

—তা হলে কুস্থানে যেতেও তোমার কোনও নৈতিক বাধা নেই?

—কুস্থান?—ও! দেবব্রত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—দাদা একদিক থেকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করেছিলেন, তুমি আর এক পথ ধরেছ।—না, যাকে তুমি কুস্থান বলছ সেখানে যেতে আমার কোনও বাধা নেই।

আমি তীক্ষ্মস্বরে বলিলাম,—তবে যাও না কেন?

—রুচি নেই বলে।

—অর্থাৎ রুচি থাকলে যেতে?

—আলবৎ যেতুম, একশবার যেতুম।

—ও!—তা হলে আমার আর কিছু বলবার নেই।

দেবব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল,—বলবার তোমার কোন কালেই কিছু ছিল না, কেবল 'কুস্থানের' ভয় দেখিয়ে আমাকে কাৎ করবার চেষ্টায় ছিলে। কিন্তু তা হয় না বন্ধু। ও ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দাও। তার চেয়ে বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ কর, সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা কর; দেখবে সুস্থান কুস্থান বলে কোথাও কিছু নেই, সূর্য্যের আলো সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে। আরও বুঝবে, পৃথিবীতে একটিমাত্র বন্ধন আছে—মাতৃস্নেহ নয়, ভ্রাতৃপ্রেম নয়, জেলখানার গারদ নয়—তার নাম প্রেম। Omnia Vincit Amor!—চললুম, যদি পার ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা ক'র। বলিয়া চক্ষে অসহ্য বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিল।

চিত্তবৃত্তি যাহার এই ধরণের সে যে শীঘ্রই বিপদে পড়িবে তাহা আমরা জানিতাম, বুদ্ধির এমন অমিতাচার ভগবান সহ্য করেন না। কিন্তু স্বখাত-সলিলে দেবব্রত যে এমন করিয়া ডুবিবে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

একটা শনিবারে, রাত্রি ন'টার সময় সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম; গিয়া দেখি দেবব্রত পাশের আসনে বসিয়া আছে। কথাবার্ত্তা বড় কিছু হইল না, যাহার সহিত প্রত্যহ দেখা হয় তাহাকে নূতন কিছু বলিবার থাকে না। অভিনয় শেষ হইলে দুজনে একসঙ্গে ফিরিলাম। আমার মেস ও দেবব্রতের বাড়ী একই রাস্তার উপর; মধ্যে দশ বারটা বাড়ীর ব্যবধান। চৈত্র মাসের চমৎকার রাত্রি, তাই পথ অনেকটা হইলেও পদব্রজেই চলিয়াছিলাম।

সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল; পথ নির্জ্জন। মিনিট পনের নীরবে হাঁটিবার পর, একটা গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমি বলিলাম,—আমেরিকায় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ যে উচ্ছৃঙ্খল পথে চলেছে, তাতে ও জাতের অধঃপতন হতে আর দেরি নেই। সদ্যদৃষ্ট ফিল্মটার কথাই মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল।

দেবব্রত একটু ভাবিয়া বলিল,—আমার তা মনে হয় না। যাকে তুমি উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করছ প্রকৃতপক্ষে তা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ওরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে, সমাজের প্রত্যেকটি বিধি-বিধান নূতন করে যাচাই করে নিচ্ছে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তারা সাবেক নিয়মগুলোই মেনে নেবে; কিন্তু বর্ত্তমানে পুরাতন সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ এসেছে, তাই তারা—'টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।' যাদের চিন্তা করবার শক্তি আছে, সংস্কারকে যারা বুদ্ধির আসন ছেড়ে দেয়নি—দেবব্রতের কথা শেষ হইল না, হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল।

যেখানে আমরা পৌঁছিয়াছিলাম সেখানে গলিটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ইট বাঁধানো। দুধারে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী, দেয়ালে সংলগ্ন গ্যাসবাতির নীচে অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে। হঠাৎ পাশের একটা দরজা খুলিয়া গেল, পুরুষ কণ্ঠের একটা মস্ত কর্কশ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই অন্ধকার দ্বারপথ দিয়া একটি স্ত্রীমূর্ত্তি যেন প্রবল ধাক্কা দ্বারা তাড়িত হইয়া একেবারে দেবব্রতের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। দরজা আবার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

আকস্মিক সংঘাতের তাল সামলাইয়া দেবব্রত স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া ফেলিল। গ্যাসের আলোয় দেখিলাম, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে, পরণের শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া প্রায় লজ্জা-নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে ব্যাকুল ত্রাসে একবার আমাদের দিকে তাকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সেই বন্ধ দরজার উপর আছড়াইয়া পড়িল, চাপা রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল,—খোল—ওগো—দোর খুলে দাও।

দ্বারের অপর পার হইতে কিন্তু কোন সাড়া আসিল না। সে আবার কবাটে ধাক্কা দিল, কিন্তু এবারও উত্তর আসিল না। তখন সে বুকভাঙা ব্যাকুলতায় সেই দরজার সম্মুখে মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

আমরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া ছিলাম। এখন দেবব্রত অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিল,—শুনুন। এটা কি আপনার বাড়ী?

সে মুখ তুলিয়া আমাদের যেন প্রথম দেখিতে পাইল; লজ্জায় তাহার বসনহীন দেহ সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেল। ছেঁড়া কাপড়ে কোনও মতে দেহ আবৃত করিয়া সে জড়সড়ভাবে দরজার পৈঠার উপর বসিয়া রহিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে?

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

দেবব্রত আবার প্রশ্ন করিল,—যিনি আপনাকে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন তিনি কি আপনার স্বামী?

মেয়েটি হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত তখন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল,—দেখুন, আপনাকে এভাবে ফেলে আমরা যেতে পারছি না। এ বাড়ীতে যদি আপনার কেউ আত্মীয় থাকে ত বলুন, তাকে ডাকবার চেষ্টা করছি; আর, যদি না থাকে তাও বলুন, দেখি যদি অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি।

মেয়েটি তখন অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—আমার কেউ নেই।

—কেউ নেই! অর্থাৎ যিনি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন আপনি তাঁর স্ত্রী নন্?

মেয়েটা মাথা নাড়িল।

—রক্ষিতা?

বিদ্যুদাহতের মত মুখ তুলিয়া সে আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত বলিল,—হুঁ, সহরে আর কোথাও যাবার যায়গা আছে?

মেয়েটার চাপা কান্না হঠাৎ কোলের ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—না।

দেবব্রত কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুপুররাত্রে অজানা পল্লীতে হঠাৎ এই বিশ্রী ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই ফাঁকে বলিলাম,—দেবব্রত, চল আমরা যাই—

দেবব্রত মুখ তুলিয়া মেয়েটাকে বলিল,—পুলিসে যেতে রাজি আছেন?

মেয়েটা এবার মুখ তুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—না—আমি পুলিসে যাব না—

তাহার কপালে রক্তের সহিত চুল জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, চোখ দিয়া ধারার মত জল গড়াইয়া পড়িতেছিল; পতিতা হইলেও দেখিলে কষ্ট হয়। কিন্তু দেবব্রত এই সময় যাহা করিয়া বসিল, তাহা সহানুভূতি বা সমবেদনা নয়, চূড়ান্ত পাগলামি। পতিতার প্রতি দরদ দেখাইতে দোষ নাই, কিন্তু দরদেরও ত একটা সীমা আছে!

দেবব্রত মেয়েটার খুব কাছে গিয়া বলিল,—পুলিসে যেতে হবে না, আপনি আমার বাড়ীতে চলুন। যাবেন? আমি একলা থাকি, কিন্তু কোনও ভয় নেই। আসুন।

মেয়েটা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে বলিলাম,—দেবব্রত, কি পাগলামি করছ?

দেবব্রত আমার কথা শুনিতে পাইল না, মেয়েটার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল,—যাবেন ত? না গেলে এই রাত্রে কোথায় থাকবেন? যাবার যায়গাও ত আপনার নেই। কি,

আসবেন? আপনি আশ্রয়হীন, আমার বাড়ী আছে,—তাই সেখানে যেতে অনুরোধ করছি। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসতে পারবেন। ভয় করবেন না, আমার মনে কোনো মৎলব নেই।

মেয়েটা তবু মৌন হইয়া রহিল

তখন দেবব্রত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয় কণ্ঠে বলিল,—চলুন। আমার বাড়ী এখান থেকে মাইল খানেক দূর—হেঁটে যেতে পারবেন না, বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।

মেয়েটি বাধা দিল না, আপত্তি করিল না, যন্ত্র-চালিতের মত দেবব্রতের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সদর রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দেবব্রত তাহাকে তুলিয়া দিয়া আমাকে বলিল,—এস মন্মথ।

আমি শক্ত হইয়া বলিলাম,—না, তুমি যাও। আমি হেঁটেই যাব।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবব্রত আমার পানে তাকাইল; তাহার মুখে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, —ও—আচ্ছা। তারপর নিজে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল,—হাঁকো।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

সোমবার সন্ধ্যায় দেবব্রত লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিবা মাত্র দাদা বলিলেন,—এই যে! শনিবার রাত্রে খুব রোমান্স করেছে শুনলুম? বলা বাহুল্য, ঘটনাটা আমি আড্ডায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম।

দেবব্রত চেয়ারে বসিয়া সহজভাবে বলিল,—হ্যাঁ।

সকলেই উৎসুক ভাবে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু দেবব্রত যখন আর কিছু বলিল না, তখন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারপর, রোমান্স গড়াল কতদূর?

দেবব্রত হাল্কা ভাবে হাসিয়া বলিল,—বেশীদূর গড়ায় নি এখনও, এই ত সবে আরম্ভ। বলিয়া একটা মাসিক-পত্র টানিয়া লইল।

গর্হিত কার্য্যের প্রতি যথোচিত ঘৃণা থাকিলে সেই সঙ্গে একটু কৌতূহল দোষাবহ নয়; বস্তুতঃ অধিকাংশ সজ্জনের মনেই দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে ঘৃণা ও কৌতূহলের নিবিড় সংমিশ্রণ দেখা যায়। দাদাও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন,—তবু? ভাব-সাব আলাপ-পরিচয় হয়েছে ত?

দেবব্রত মুখ তুলিয়া বলিল,—খুব সামান্য। সেই যে সে-রাত্রে কাঁদতে আরম্ভ করেছে এখনও থামে নি। কাজেই আলাপের চেয়ে বিলাপই বেশী হয়েছে

—পরিচয় জানতে পার নি?

—পরিচয় নূতন কিছু নেই। গেরস্ত-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। বিয়ে হয় নি—স্কুলে পড়ত। মাস ছয়েক আগে একটা লোকের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে। সেই লোকটার সঙ্গেই ছিল—লোকটা মাতাল; তারপর পরশু রাত্রের ঘটনা।

—তা হলে কুলত্যাগিনী—পেশাদার নয়? দাদা কথাগুলি বেশ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন।

—হ্যাঁ—কুলত্যাগিনী।

—কোন্ কুল আলো করে ছিলেন, তার কোনও সন্ধান পেলে?

—সন্ধান নিইনি।

—হুঁ। এখন তা হলে পদ্মিনীটি তোমার স্কন্ধেই আরোহণ করে আছেন? তুমিও একলা মানুষ, তার উপর কুসংস্কারের বালাই নেই। যোগাযোগটা হয়েছে ভাল। তা—এখন এই ভাবেই বসবাস চলবে তা হলে?

—চলা ছাড়া আর উপায় কি? যতক্ষণ তিনি নিজে কোথাও না যাচ্ছেন ততক্ষণ আমি তাড়িয়ে দিতে পারছি না। বলিয়া সম্মুখস্থ কাগজে মনোনিবেশ করিল।

তাহার প্রখর বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল মুখখানার দিকে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুঃখ হইতে লাগিল। সমাজ-বন্ধন যে মানে না, বিবাহকে যে কৃত্রিম বন্ধন বলিয়া উপহাস করে, তাহার নৈতিক চরিত্র যে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অতি সহজে নির্ব্বিঘ্নে অধঃপথে যাইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

দাদাও সেই কথাই বলিলেন; একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—যাক, এতদিন শুধু মুখেই দুর্নীতি প্রচার করছিলে, এবার সত্যি সত্যিই গোল্লায় গেলে?

চকিতে মুখ তুলিয়া দেবব্রত বলিল,—তার মানে?

—তার মানে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমার ভবিষ্যৎ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর সকলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখতে পাবে।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—দাদা একজন পাকা রোমান্টিষ্ট। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু রস মরে নি। বৌদি'র বয়স কত হবে দাদা?

দাদা ক্রুদ্ধ ভাবে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীকে লইয়া রসিকতা তিনি পছন্দ করিতেন না।

ইহার পর যখনই দেবব্রত আড্ডায় আসিত, তখনই আমরা তাহাকে নানাবিধ প্রশ্নের আড়ালে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা দিতাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিল ভয়ানক পিউরিটান, তাহার নাম বোধ হয় জিতেন—সে দেবব্রতের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহীর কিন্তু কিছুমাত্র ভাব-বিপর্য্যয় দেখা গেল না। সে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দিত; আশ্রিতা যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সহজভাবে উত্তর দিত—লুকোচুরি করিত না। মেয়েটার নাম অনিমা—সে দিব্য আরামে দেবব্রতের বাড়ীতে বাস করিতেছে, চলিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ নাই; দু' জনের মধ্যে পরিচয় বেশ ঘনীভূত হইতেছে; এ সমস্ত খবর তাহার নিজের মুখেই আমরা শুনিতে পাইতাম। কেবল একটা প্রশ্ন সোজা ভাবে বাঁকা ভাবে অনেক প্রকারে করিয়াও আমরা জবাব পাইতাম না। দেবব্রত কখনও গম্ভীর হইয়া থাকিত, কখনও হাসিয়া এড়াইয়া যাইত, উত্তরটা আমরা অবশ্য মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম।

ক্রমে দেবব্রতের আড্ডায় আসা কমিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে যখন আসিত, তখন তাহার মুখে একটা অতৃপ্ত ক্ষুধিত ভাব দেখিয়া আমরা মনে মনে হাসিতাম। বেশীক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, কিছুক্ষণ ছটফট্ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। শেষে তাহার লাইব্রেরীতে আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

কলেজেও তাহাকে দু'মাস দেখিলাম না। বুঝিলাম, পড়াশুনায় আর মন নাই, এখন সে অন্য পথে চলিয়াছে। দাদা মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন, ছোঁড়া একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। জানতুম, ওরকম চিত্তবৃত্তি যার, সে এক দিন না একদিন অধঃপাতে যাবেই। তবু আপশোষ হয়, বুদ্ধির দোষে ছোঁড়া নষ্ট হয়ে গেল।

আমারও দুঃখ হইত। সে রাত্রে সেই গৃহ-নিষ্কাশিতা মেয়েটার রক্তমাখা মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া যদি তাহার শিভাল্‌রি না জাগিত, হয় ত কোনোদিন ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিত, ক্রমে বুদ্ধির অহঙ্কারদৃপ্ত নাস্তিকতাও কাটিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর তাহার উদ্ধার নাই। অধঃপথের স্বাদ একবার যে পাইয়াছে. সে আর ভাল পথে ফিরিবে না।

তার পর একদিন শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় তাহাকে শেষ দেখিলাম। মাস তিনেক তাহাকে দেখি নাই। লাইব্রেরীতে আমরা সকলে বসিয়া ছিলাম, সে আসিয়া ছড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইল।

আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, ধারালো মুখ যেন মাংসের অভাবে আরো ধারালো হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠে একটা শ্রীহীন শুষ্কতার আভাস।

আমরা কোনও সম্ভাষণ করিলাম না; আমার মনে হইল, দেবব্রত যেন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও আমাদের মধ্যে যোগসূত্র নাই। সেও যেন এই দূরত্বের ব্যবধান বুঝিতে পারিল, গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, দাদা, আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

দাদা নিরুৎসুক ভাবে বলিলেন, অনেকদিন পরে দেখছি। বস। কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ে করছ নাকি?

দেবব্রত বসিল না, বলিল, হ্যাঁ বিয়ে করছি। আত্মীয় স্বজন আমার কেউ নেই, বন্ধুর মধ্যে আপনারা। তাই নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, সশরীরে উপস্থিত থেকে শুভকার্য্য সম্পন্ন করাবেন। তাহার শুষ্ক মুখে পরিহাসের চেষ্টা ভাল মানাইল না।

দাদা সহসা জবাব দিলেন না; পকেট হইতে কয়েক খণ্ড সুপারি বাহির করিয়া গালে ফেলিয়া চিবাইলেন, তারপর বলিলেন, বিয়ে করছ? বিয়েটা অবশ্য কৃত্রিম বন্ধন, তোমার মত জ্ঞানী লোক ইচ্ছে করে কেন এ ফাঁস গলায় পরছে বুঝা যাচ্ছে না, তা সে যাক। তোমার সেই অপদেবতাটি ঘাড়

থেকে নেমেছে, এতেই আমরা খুসী। কোথায় বিয়ে করছ ?

দেবব্রতের মুখখানা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হইয়া গেল ; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, আমি তাকেই বিয়ে করছি।

দাদার সুপারি-চর্ব্বণ বন্ধ হইয়া গেল ; আমরাও বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলাম। তাহাকেই বিবাহ করিতেছে ! সে কি !

দাদা বলিলেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না। যে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে তুমি নিজের কাছে রেখেছিলে তাকেই এতদিন পরে বিয়ে করতে চাও—এই কথাই কি আমাদের জানাতে এসেছ ?

দেবব্রত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কথা বাহির করিল, সে ভ্রষ্টা নয়। ছেলে মানুষ—একজনের প্রলোভনে পড়ে—কিন্তু সে সত্যই মন্দ নয়, আমি তার পরিচয় পেয়েছি—দেবব্রতের এরকম কণ্ঠস্বর আমি কখনও শুনি নাই, সে যেন মিনতি করিতেছে। তাহার ঠোঁট দুটা কাঁপিতে লাগিল।

দাদা কঠিন স্বরে বলিলেন,—ভাল-মন্দের বিচারক তুমি একলা নয়, আমরাও কিছু কিছু বিচার করতে পারি। মাথার উপর সমাজ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা দু'জনে যেভাবে ছিলে সেই ভাবেই থাকলে পারতে, তাতে নিন্দে হত বটে, কিন্তু সমাজের মুখে চুণকালি পড়ত না। এ বিয়ের ভড়ংয়ে দরকার কি ?

তেমনি পাণ্ডুর মুখে দেবব্রত বলিল, দাদা আমি—আমরা একবাড়ীতে আছি বটে, কিন্তু কখনো—তাহার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পূর্ব্বতন তীক্ষ্ণতা ফিরিয়া আসিল—ছি! আপনি কি মনে করেন, যার মন পাইনি তাকে আমি—

দাদা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—ও সেই পুরোনো পন্থ—"অপবিত্র ও কর-পরশ।" দাদা আবার খানিকটা হাসিলেন—যা হোক এতদিনে মন পেয়েছ তা হলে ?

—পেয়েছি বলেই মনে হয়।

—একেবারে অহৈতুকী প্রীতি ! খাঁটি জিনিষ বটে ত ? ও বাজারে মেকিও চলে কি-না তাই জিজ্ঞাসা করছি। সে যাক্। তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছ। তুমি আশা কর আমরা এই বিয়েতে যোগ দেব ? কেন—তুমি বড়লোক বলে ?

দেবব্রত নীরবে মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বিবর্ণ, লাঞ্ছিত মুখখানা দেখিয়া আমার ক্লেশ হইতে লাগিল। দাদার কথাগুলা সত্য হইলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই সুরটা নরম করিবার জন্য আমি বলিলাম,—দেবব্রত, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না, একজন অপরিচিতা নারীকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে চাই—কিন্তু এ রকম একটা অনুষ্ঠানে আমি—

দেবব্রত আমার পানে চাহিল, তাহার চোখের মধ্যে একটা কাতর অনুনয় দেখিতে পাইলাম। সে বলিল, মন্মথ, তুমিও আমার বিয়েতে যাবে না ?

আমি দাদার দিকে চাহিলাম, দাদা জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—যার ইচ্ছে যেতে পারে, কিন্তু আমি এসব ভ্রষ্টাচারের মধ্যে নেই, সমাজের মাথায় যারা লাথি মারে, তারা সমাজের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে কোন্ মুখে ?

দেবব্রত আবার বলিল,—মন্মথ তুমি—?

আমি মাথা নাড়িলাম,—আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু আমি পারব না।

দেবব্রত আর সকলের দিকে ফিরিল, তোমরাও কেউ যাবে না ?

সকলেই মাথা নাড়িল।

দেবব্রত কিছুক্ষণ হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িটা তুলিয়া লইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, —আচ্ছা বেশ—

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না ; মনে হইতে লাগিল তাহার কাছে কত বড় অপরাধ করিতেছি।

দেবব্রত চলিয়া গেল।

তারপর ষোল বৎসর দেবব্রতকে দেখি নাই। এতদিনে তাহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেল। কেমন আছে কোথায় আছে জানি না, হয়ত সেই পুরাতন বাড়ীতেই বন্ধুহীন আত্মীয়হীন ভাবে বাস করিতেছে।

দেবব্রত বিবাহের বিরোধী ছিল, তবু কেন যে সেই মেয়েটাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আজও ভাল বুঝিতে পারি নাই। হয়ত, যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল, অন্যে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে তাহা সহ্য করিতে পারে নাই ; তাই সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যার সমস্ত বুদ্ধির অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। কিম্বা—কিন্তু আর কি হইতে পারে ?

সেদিন দুষ্কৃতির প্রশ্রয় আমরা দিই নাই ; তাহাকে অশেষ ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাহার ভালবাসার পাত্রীকে অপমান করিয়াছিলাম। অন্যায় করিয়াছিলাম, এমন কথাও বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি না। তবু আজ এই ক্লান্ত-বর্ষণ সন্ধ্যায় তাহার সেদিনকার পীড়িত বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া মনটা অন্যায় ভাবে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন তাহারা কেমন আছে—কে জানে, আছে কি-না তাই বা কে জানে ! আমাদের সার্ব্বভৌম দাদার ধারণা, দুষ্কৃতরা অধিকদিন ধরার ভার বৃদ্ধি করিতে সুযোগ পায় না।

চোখে কেন জল আসে মা ?

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

চোখে কেন জল আসে মা ? পোড়া চোখের জল
এমন করে' কেন আমায় করে মা বিহ্বল !
মুখ চেয়ে এ নয়ন দু'টির মেটে না মা তৃষা
মনের কোণে ঝড় ওঠে মা হারিয়ে ফেলি দিশা।
বুকের মাঝে ঘনিয়ে ওঠে মা-হারান ব্যথা
মনে পড়ে' দুয়োরাণীর নির্ব্বাসনের কথা।
সুয়োরাণীর সুখ ধরে না, কথায় কথায় মান
দেখলে লাগে ফুলের ঘায়ে কখন মূর্চ্ছা যান।
গল্প বলে' ছাতিম গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
গোয়াল-ঘরে দুয়োরাণীর দুখের নাহি কমি।
রাজপুত্তুর মনের দুখে শিকার করার ছলে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় গেছে চলে ;
মায়ের দুখে রাজকন্যা হলেন বনবাসী
এত দুখেও দুয়োরাণীর মুখটি হাসি-হাসি—
সে হাসিতে লুকিয়ে আছে কত মায়ের কাঁদন
টন্‌টনিয়ে উঠছে ব্যথায় লক্ষ পাকের বাঁধন।

তোমার চোখে জল কেন মা, তোমার চোখে জল ?
তোমার বুকেও ধাক্কা দিলে দামোদরের ঢল ?
দুখের আগুন জ্বালিয়ে তোমায় করলে খাঁটি সোনা।
সতীন দিলে নির্ব্বাসনের অনেক প্ররোচনা,—
রাজার প্রাসাদ রইল পড়ে', রাজমহিষীর মান
নিজের হাতে রাজাই যদি করলে শতেক খান,
নিরুদ্দেশে পুত্র গেল, কন্যা গেল বনে,
রাণী নামে ঘেন্না তাতেই এল মায়ের মনে।
—তাই ত মা তুই পায়ে ঠেলে বাইরে এলি চলে,
নাই মা বলুক রাণী তোমায় ডাকছে ত' মা বলে।

ডাকছে তোরে হাজার ছেলে, হাজার মেয়ের ডাকে
আজ এ-দিনে চোখ মুছে যে, উঠতে হবে মাকে !
তোরেই মা যে চাইতে হবে আজকে করুণ চোখে,
নাম-হারাদের নাম ধরে' মা ডাকতে হবে তোকে।
ভুলে যা' মা নিঠুর যে-জন মিথ্যে মোহের ঘোরে
পরের কথায় আপন ঘরে ঠাঁই দিলে না তোরে ;
ছেলের মায়া করলে না ক', মেয়ের অন্বেষণে
পাঠালে না লোক-লস্কর রইল আনমনে,
ভাবলে না তার পাট-মহিষী জন্মকালের বাঁজা,
এই বয়েসে ভোগের বাতি জ্বালিয়ে রাখে রাজা
হোক্ না রাজা, হোক্ না স্বামী, হোক্ না কেন পিতা
মূর্খ সে-জন রাজ্যপাটে জ্বালিয়ে দিলে চিতা।

—সে কাহিনী বলব না আজ—নাই বা কে বা জানে ;
ঘর ছেড়ে মা সকল ঘরে এলি যাদের টানে,
তারাই তোরে মাথায় করে' রাখবে নিরবধি
প্রণাম করে' ফিরিয়ে দেবে রাজা আসেন যদি।
আজকে তোরেই যত্ন করে' সাজিয়ে পূজার ডালা,
আঁধার পূজা-মন্দিরে মা জ্বালতে হবে আলা।
সন্ধ্যা-পূজার ঘণ্টা শুনে পূজার আঙিনায়
রাজকন্যা প্রদীপ দিতে চিনবে রাণীমায়।
সুদূর পথে চলতে একা, দেখবে রাজার ছেলে
মায়ের বুকের দুধের ধারা জিহ্বা ফিরে পেলে,
হঠাৎ তখন মায়ের কথা পড়বে তাহার মনে,
ফিরিয়া ঘোড়া রাজপুত্তুর মায়ের অন্বেষণে
হঠাৎ এসে হাজির হবে পূজার আঙিনায়,
ছেলের কি মা দেরী লাগে চিনতে আপন মায় !

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[৯৫]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত-কাব্য ছাড়া ষোড়শ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য-সমূহের বৈচিত্র্যহীন একতানের মধ্যে মুকুন্দরামের বর্ণিত ফুল্লরা, খুল্লনা ও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র সুরবৈচিত্র্য আনয়ন করে। অনেকটা এই কারণেই আধুনিক কালে শিক্ষিত সমাজে মুকুন্দ-রামের কিছু খ্যাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাউয়েল (Cowell) সাহেব মুকুন্দরামের কাব্যের কিছু কিছু অংশ ইংরেজি পদ্যানু-বাদ করিয়াছিলেন। ইনি মুকুন্দরামকে চসারের (Chaucer) সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। ইহাও মুকুন্দরামের খ্যাতির কতকটা কারণ বটে। যাহা হউক, এ বিষয়ে মুকুন্দরামকে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক লেখকের তুলনায় সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। যে কারণেই হউক, মুকুন্দরাম যে তাঁহার প্রাপ্য খ্যাতির কতকটা পাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন কবির বরাতজোর সন্দেহ নাই।

[৯৬]

মুকুন্দরামের কাব্যরচনার তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। অনুমান হয়, ইহা ষোড়শ শতকের চতুর্থ পাদের কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। স্বীয় কাব্যের প্রারম্ভে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, কবির ছয় সাত পুরুষের বাস ছিল রত্নানু নদের তীরে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে (বর্তমান বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার দক্ষিণ প্রান্তে)। মামুদ সরিপ নামক ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুকুন্দরাম সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া আড়রা গ্রামের (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত) জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাঁকুড়া রায় তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। এই স্থানেই কাব্যটি রচিত হয়। কাব্যের ভণিতাংশ হইতে কবির সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়, তাহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

শুধু আত্মচরিত বা কবিচরিত বলিয়া নহে, বর্ণনাভঙ্গির জন্য ও বাস্তব বর্ণনা হিসাবে কাব্যটির এই অংশ অপূর্ব। ছয় সাত পুরুষের ভিটায় স্বচ্ছন্দে থাকিয়া কবি (এবং তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা) অনির্বচনীয় অত্যাচার ভোগ করিলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার পথে যে মনোবেদনা ও কষ্ট, তাহা আরও গুরুতর। কিন্তু দুঃখতাপের তীব্রতামাত্রহীন এই বর্ণনায় সামান্য উপকারের কৃতজ্ঞতায় কবির চিত্ত অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বল্পপরিসর কাহিনীটুকুর মধ্যে প্রতাপ-প্রচণ্ড শক্র মামুদ সরিপ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য যদুকুণ্ডু তেলি, যে কবিকে তিন দিনের ভিক্ষা দিয়াছিল, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আত্মকাহিনী অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যার চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গউৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয়[১] খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে[২] অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইলা কাল খিলভূমি লেখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥

১। 'বেপারি ক্ষত্রিয়' পাঠান্তর। ২। 'বৈষ্ণবের হল্য' পাঠান্তর।

ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু[১] গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে[২] প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া[৩] দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি[৪]
টাকাকের বস্তু[৫] দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর[৬] সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ[৭] ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
ভেঠনায়[৮] উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বহিয়া গোড়াই[৯] নদী সদাই সোঙরি বিধি
তেউট্যায়[১০] হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতনগিরি[১১]
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা[১২] নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে॥
আশ্রয় পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া[১৩]
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই তরিয়া[১৪] যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত॥

১। 'প্রিয়' ঐ। ২। 'জাঁদা রহে প্রতি নাছে' ঐ। ৩। 'জাঁতিয়া' ঐ। ৪। 'ঘর কুটতালি' ঐ। ৫। 'টাকার দ্রব্য বেচে' ঐ। ৬। 'খবির খাঁ,' 'গম্ভীর খাঁ' ঐ। ৭। 'রামানন্দ' ঐ। ৮। 'ভালিয়ায়' ঐ। ৯। 'মুড়াই' ঐ। ১০। 'ভেওটিয়ায়' ঐ। ১১। 'পাণ্ডলপুরী' ঐ। ১২। 'গুছিত্যা' ঐ। ১৩। 'করিলা অনেক দয়া দিলা চরণের ছায়া' ঐ। ১৪। 'বাহিয়া' ঐ।

আড়রা[১৫] ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান[১৬]॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
সুতপাঠে[১৭] কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর[১৮] নন্দী যে জানে স্বপন[১৯] সন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান॥

দামিন্যায় কবির পৈতৃক দেবতা সিংহবাহিনীর পুরোহিত-দিগের নিকট যে পুঁথিখানি ছিল, তাহাতে এবং কাইতি গ্রামে প্রাপ্ত একখানি পুঁথিতে প্রাপ্ত আত্মজীবনী অংশের সহিত উপরি উদ্ধৃত অংশের এতটুকুও মিল নাই। দামিন্যার পুঁথি-টিকে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি মনে করিয়া উহাকেই মূল ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক বি ক ঙ্ক ণ চ ণ্ডী র পাঠ ধার্য্য হইয়াছে। ভূমিকায় একস্থানে বলা হইয়াছে যে, পুঁথিটি তালপত্রে লিখিত (ভূমিকা পৃঃ ৭), অপর স্থলে বলা হইয়াছে, ইহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত (পৃঃ ১২)। পুঁথিটির মধ্যে নাকি একখণ্ড চিরকুট পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নাকি ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ কর্তৃক কবির পুত্র শিবরামকে নিষ্কর ভূমিপ্রদানের দলিল! ইহা হইতেই পুঁথিটির ও প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় যে, পুঁথির পাঠ অধিকাংশক্ষেত্রেই অর্ব্বাচীন ও ভ্রান্তিমূলক। কাইতির পুঁথিও অর্ব্বাচীন, ১১৮২ সালের অনুলিপি।

এখন এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রামাণ্য বিচার করিব।

১৫। 'আরড়া' ঐ। ১৬। 'রাজা দিল দশ আড়া ধান' ঐ। ১৭। 'শিশুপাছে' ঐ। ১৮। 'ডামাল' ঐ। ১৯। 'স্বরূপ' ঐ।

কুলে শীলে নিরবদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামিন্যাতি সজ্জন প্রধান।
অতিশয় গুণবাড়া সুধন্য দক্ষিণ পাড়া১
সুপণ্ডিত সুকবি সমান ॥
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর ॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল ধ্রুবদত্ত
কতকাল তথাই বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া সুরকুল তেয়াগিয়া
চলদলে করিলা সঞ্চার ॥
গঙ্গা সব সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে ॥
হরিনন্দী ভাগ্যবান শিবে দিলা ভূমিদান
মাধু২ ওঝা ধামাদিকরণী।
দামন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী ॥
পাষাণ্ড কুলের অরি শ্রীরমন্ত অধিকারী
কল্পতরু নানা উমাপতি।
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জন বসতি ॥
কাঁটা দিয়া বন্দী ঘাটী বেদান্ত নিগম পাটী
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী বন্দ্য সে বাঙ্গালপাসী
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয় ॥
কাঞ্জড়ি কুলের সার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যের নিধান।
কয়াড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম ॥
তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর
বাসুদেব মহেশ সাগর ॥
সর্ব্বেশ্বর৩ অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
একভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর ॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা সুকবি সুকৃতকর্ম্মা
নানা শাস্ত্রে মিশ্রয় (?) বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥৪

প্রথম আত্মকাহিনীটি যে খাঁটি তাহা যাঁহার বিন্দুমাত্রও রসবোধ ও সাহিত্যজ্ঞান আছে তাঁহার পক্ষে বুঝিতে এতটুকুও বিলম্ব হইবে না। দ্বিতীয় কাহিনীটি ঢের পরেকার রচনা। তখন কবি বা তাঁহার বংশধরদিগের দেশে কিছু প্রতিপত্তি হইয়াছে, সেইজন্য দেশস্থ ব্রাহ্মণ ও ধনিব্যক্তিদিগের স্তুতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। দামিন্যার কোন চণ্ডীমঙ্গল গায়কের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে। আর যদি যথার্থই মুকুন্দরামের রচনা হয়, তবে বলিব যে, কবি প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধবয়সে স্বগ্রামে প্রত্যাগত হইবার পরে এই কাহিনীটুকু রচনা করেন, কারণ কবির (?) উক্তিই দেখিতেছি "রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান"। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে কোথাও পৌত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। "কবি হই শিশুকালে রচিলাম তোমার সঙ্গীতে"—ইহাতেই বুঝিতে পারি যে, চণ্ডীমঙ্গল (অন্ততঃ প্রথম অংশ) কবির প্রথম বয়সের রচনা।

[৯৭]

মঙ্গলকাব্যের বাঁধা খাতে কবিত্ব ফলাইবার অবকাশ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সুতরাং যদি বলি, মুকুন্দরাম একজন বড় কবি ছিলেন, তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না। মুকুন্দরামের বিশেষত্ব হইতেছে কবিসুলভ সহৃদয়তার সহিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও রসবোধ। কি আত্মকাহিনীতে, কি দরিদ্র গৃহস্থালীর বর্ণনায়, কি স্বামী-স্ত্রীর বা সতাসতীনের কোন্দলে, কি ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রচিত্রে, কি বাঙ্গাল মাঝির হাস্যতাশে, সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও সহৃদয়তার অনন্যসুলভ ছাপ দেদীপ্যমান। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকারের প্রতিভা লইয়া মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একেবারে প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন।

১। 'রাঢ়া' পাঠান্তর। ২। 'মাধব' পাঠান্তর।

৩। 'সর্ব্বেশ্বর' ঐ। ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃঃ ২০-২৪।

ফুল্লরা ও কালকেতুর দারিদ্র্যের সংসার। কোন দিন শিকারের মাংস বেচিয়া অন্ন জুটে, কোনও দিন জুটে না। ফুল্লরার বারমাসই দুঃখ। বাসের জন্য কেবল একখানি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তার আবার ছাওনি তালপাতার, ভেরেণ্ডার খুঁটি কোনও রকমে ঠাড়ো করিয়া রাখিয়াছে। ফুল্লরার গায়ের বস্ত্র মাথায় দিতে কুলায় না। তৈজসপত্রের মধ্যে দুই একখানি মেটে পাথরের খোরা, তাহাও আবার বাঁধা পড়িয়াছে। ডাল তরকারির পরিবর্ত্তে আমানি দিয়াই বেশীর ভাগ দিন ভাত খাইতে হয়। আমানি রাখিবার পাত্র নাই। ঘরের দাওয়ায় মাটির গর্ত্ত করা আছে। ফুল্লরাকে হাটে গিয়া মাংস বেচিতে হয়। কিন্তু বৎসরের অর্দ্ধেক দিন আবার লোকে মাংস খায় না। সুতরাং ফুল্লরার দুঃখ ন্যায্য বলিতে হইবে বৈ কি। ছদ্মবেশিনী দেবীকে ভাগাইবার জন্য ফুল্লরা নিজের বারমেসে দুঃখ-কষ্টের এইরূপ বর্ণনা করিতেছে—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী। ভাঙ্গা কুড়াখর তালপাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল-সম১ বসন্তের খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
বৈশাখ হল্য বিষ গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাত্যে নারি। দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
মাংসের পসরা লয়্যা ফিরি ঘরে ঘরে। কিছু খুদ কুড়া পাই উদর না পূরে॥
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়। কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায়॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস জল। কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মর২ ফল॥
বড় অভাগা মনে গুণি বড় অভাগ্যা মনে গুণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। সকলে দরিদ্র বীর অন্নেতে বিকল॥
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার। হেন বন্ধু জন নাহি যেবা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হইলে কুড়্যার ভাস্যা যায় বান॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। ছাগ মেষ মহিষ কর়য়ে বলিদানে॥
উত্তমবসনে বেশ করয়ে বর্ণিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সভাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
মাস মধ্যে মাইষর আপনি ভগবান৩। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান॥
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন। তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তূলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপন। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম। ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝাটী। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিপাক। মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস। সর্ব্বজন নিরামিষ করে উপবাস॥
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে। পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত বাতাসে॥
যুবতী পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে॥
রামা শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী। কোন সুখে মোর সহ হইবে ব্যাধিনী॥
মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ। মালতীরে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
অনলসমান পোড়ে চইতের খরা। চালু সেরে বান্ধা দিলু মাটিয়া পাথরা॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
দারুণ দৈবদোষে গো দারুণ দৈবদোষে। একত্র শয়ন স্বামী যেন যোল ক্রোশে॥৪

কাব্যের অবান্তর চরিত্রগুলির অঙ্কনে কবিকঙ্কণ অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মূল চরিত্রগুলির মধ্যে কবির রং ফলাইবার খুব বিশেষ অবকাশ নাই। সেই জন্য আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলিতেই কবির অনন্যসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ও সহানুভূতির পরিচয় পাই। কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে মুরারি শীলের ভূমিকা অতি অবান্তর। কিন্তু কয় ছত্র ত্রিপদী ও পয়ারের ভিতর মুরারি শীল ও তাহার স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে কালকেতু দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে মুরারি শীল বণিকের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল। কালকেতুর গলার আওয়াজ শুনিয়া বেনে তাড়াতাড়ি অন্দরে প্রবেশ করিল, ভাবিল, কালকেতু ধারে মাংসবিক্রয়ের পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। অন্দরে গিয়া মুরারি শীল স্ত্রীকে ঠেকাইয়া দিল কালকেতুকে বিদায়

১। 'সমান'। ২। 'কর্ম্মের'।

৩। তুলনীয় গীতা—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্।" ৪। বঙ্গবাসী তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৮-৬৯।

করিবার নিমিত্ত। স্ত্রীর সহিত কালকেতুর কথোপকথনে যখন বেনে জানিতে পারিল যে, সে অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি খিড়কীর পথে বাহির হইয়া গিয়া সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পর আলাপ আপ্যায়ন করিয়া অঙ্গুরীটি পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, ইহা সোনার নহে, পিতলের। কিন্তু কালকেতু ঠকিবার পাত্র নহে। অবশেষে অঙ্গুরীয়কের পূর্ণ মূল্যই দিতে হইল।

বেনে বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ
আমি আইলাঙ তার হেতু॥

বীরের শুনিয়া বাণী হাস্যে বলে বাণ্যানী
ঘরেতে নাহিক পোতদার।
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার॥

আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাঠ আন্য একভার একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥
শুন গো শুন গো খুড়ি কার্য্য কিছু আছে দেড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।
আমার জুহার খুড়ি কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥

কালু এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সাহস করিয়া বাণী আসি বলে বাণ্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া বাস আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেনে খড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী কাক্ষেতে করিয়া থলি
সাপড়ি তরাজু লয়্যা হাথে॥
খুড়া খুড়া বীর ডাকে বান্যা পায়ে ধুলা মাখে
করে বীর বেনেকে জোহার।
বেনে বলে ভাইপো এবে নাই দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার॥

খুড়া প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
হাতে শর চারি পর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসার করে সন্ধ্যাকালে আস্যে ঘরে
এই হেতু নাহি আসি আমি॥
খুড়া, ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।
হয়্যা মোরে অনুকূল উচিত করিবে মূল
বিপদসমুদ্রে যেন তরি॥

... ...

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর। দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি। চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥

... ...

কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই। যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই॥
বেণে বলে দরে নাহি বাড়ে এক বট। আমা সনে সওদা কর না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনাদেনা। তাহা হৈতে ভাইপো হয়াছ সিয়ানা॥
কোন কথা লাগি বাপু কর হুড়াহুড়ি। যদি না লও চালু খুদ দিব সব কড়ি॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া॥

হৃদয়ে চিন্তিয়া বেনে বড় মহাবীরে। এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে॥১

ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রও মুকুন্দরামের নিজস্ব সৃষ্টি নহে। কিন্তু তাহা না হইলেও মুকুন্দরামের হস্তে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র অপূর্ব্ব বাস্তবতা লাভ করিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যের ভাঁড়ুদত্ত নিতান্তই ভাঁড়, মুকুন্দরামের কাব্যের ভাঁড়ুদত্ত পরোপজীবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি কুচক্রী। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তকে যেন চিনি চিনি বলিয়া মনে হয়, যেন কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে একটি জীবন্ত চরিত্র।

কালকেতু বন কাটিয়া গুজরাট নগরের পত্তন করিলে নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, কালকেতুও সকলকে যথাযোগ্য সাহায্য করিল। ভাঁড়ু তো ঝড়ের আগে এঁটো পাত!

ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ু দত্তের পয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান॥

১। পৃঃ ৭৩-৭৪।

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহুনাড়া ॥
আইলুঁ বড় প্রত্তি আশে বসিতে তোমার দেশে
আগেতে১ ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলশীল বিচার মহত্বে ॥
কহিয়ে আপন তত্ব আমল হাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমর্পণ ॥
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কায়স্থ আছে২
মোর ঘরে করয়ে ভোজন
পটবস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন৩ ॥

ভাঁড়ু অল্পেতে তুষ্ট হইবার লোক নহে। তাহার মত চতুর ব্যক্তি কালকেতুকে হাত করা ভিন্ন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। প্রথম দিনেই ভাঁড়ু কালকেতুর কানে কানে সাধারণ ও প্রধান প্রধান প্রজাদিগের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল।

সঘনে হেলায়্যা শিরে চাতুরী প্রবন্ধ ধীরে
ভাঁড়ু দত্ত কহে কাণকথা।
যে হৈলে প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে
একে একে প্রজার বারতা ॥
তাড় বালা দিবে মান করজ বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয় ॥
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় যেন জন
অবশেষে নাহি পাবে দাগা ॥
দিয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা আগু আন মোর পূজা
কয়্যা দিব প্রকার সকল ॥

পরি দু-পণের কাচা ভানিত আমার ভাচা
সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের হাথে খাওা বহুড়ী জনের ভাণ্ডা
পরিণামে বড় পায় দুখ ॥৪

ভাঁড়ু ও তাহার পুত্রের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হইয়া প্রজারা কালকেতুর নিকট নালিস করিল। কালকেতুকে সভায় ডাকাইয়া আনিয়া ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ু ও কালকেতুকে শাসাইল—

হরি-দত্তের বেটা হও জয়-দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাও বীরের ঘোড়া হাথী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাঁড়ু ঠিক করিল, কলিঙ্গরাজকে দিয়া কালকেতুকে জব্দ করিতে হইবে।

অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক। রাজভেট নিল কাঁচকলা পুঁইশাক ॥
চুপড়ি করিয়া নিল কদলীর মোচা। মায়ের বসন পরে ভুমে নামে কোঁচা ॥
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ। কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ ॥
কৈফিয়তী পাজীখানা নিল সাবধানে। শ্রীহরি বলিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কানে ॥
ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা। পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা ॥
ছোট ভাই সাম্য বাক্যে নিবারিল ক্রোধ। বিভা হয় নাই তার দুই পায়ে গোদ ॥
বড়ে ভাঁড়ুদত্ত ভাই দর কর হিয়া। এবার মণ্ডলী পাইলে করাইব বিয়া ॥
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন। ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন ॥

পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে, বিশেষ করিয়া আচার ও ভাষা লইয়া বিদ্রূপ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে আবহমান কাল দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্য্যাপদে৫ পাই—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

"ভুসুকু, আজ তুই বাঙ্গালী (=বাঙ্গাল) হইলি, (যেহেতু তুই) চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণীরূপে লইয়াছিস।"

বৃন্দাবন-দাস শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে৬ বলিয়াছেন, যে, শ্রীচৈতন্য কৈশোরে

বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

১। 'আহ্বানে' পাঠান্তর। ২। 'গঙ্গার দুকূল পাশে যতেক কুলীন বসে' পাঠান্তর। ৩। পৃঃ ৮৪-৮২।

৪। পৃঃ ৮৫। ৫। ৩৯, ৩-৪। ৬। ১, ১২।

ষোড়শ শতকের দিকে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীর নিকট পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা কিরূপ শোনাইত তাহা মুকুন্দরামের কাব্য হইতেই আমরা প্রথম জানিতে পারি। মুকুন্দরাম যে বাঙ্গাল নাবিকদিগকে লইয়া মস্করা করিয়াছেন তাহা অবশ্য **theoretical** বাঙ্গাল; এবং সংস্কৃত নাটকের মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নাটকের বাঁকুড়াবাসী পরিচারিকার ভাষার মত মুকুন্দরামের বাঙ্গাল নাবিকদিগের ভাষাও অনেকটা পরিমাণে **conventional** বা কৃত্রিম। তবে ভাষা লইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি মুকুন্দরামের কাব্যে প্রথম পাওয়া গেল। মুকুন্দরামের কাব্যে তিন স্থানে বাঙ্গাল নাবিকের রোদন বর্ণিত হইয়াছে।

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ। হলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো। বিদেশে বহিলুঁ না দেখিলুঁ মাগু পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল। কালী গুরী দুটী মাগু সেই কোথা গেল॥
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল। জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল॥১
নায়ের বাঙ্গাল কাঁদে গাঁঠার পাবর। আর না যাইব বাই উজানী নগর॥
এক বাঙ্গাল কাঁদে বাফই বাফই। যাদুয়ার পাকে হরবস ধন গেল অরে বাই॥
আর বাঙ্গাল কাঁদে তার চক্ষে পড়ে লো। ভাঙ্গের ছাকনা গেল তারে বড় মো॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ। বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ॥
আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো। মাগু মরিবে আর না দেখিব পুনি পো॥২
কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফই বাফই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
পলায় বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোলা। হেঁঠ মাথা করি তোলে কাঁথতলির মলা॥
আর বাঙ্গাল বলে মিছে কৈলুঁ দ্বন্দ্ব। পুরুষ সাতের মুক্তি হারালুঁ কাসন্দ॥ ইত্যাদি।৩

ডিহিদারের অত্যাচারে কবিকে সাতপুরুষের অধ্যুষিত গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কবির মনে ইহা কাঁটার মত বিঁধিয়া ছিল। ইহারই জন্য চণ্ডীমঙ্গলে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারী ভূস্বামীর উপর কঠোর কটাক্ষ আছে। যথা—

উইচারা খাই পশু নায়েতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥৪

বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালামিশ্রিত ব্রজবুলিতে রচিত কয়েকটি স্বতন্ত্র কবিতা বা পদ মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যায়। তাহা হইতে ঘুমপাড়ানী গানটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আয় আয় রে বাছা আয়। কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল। একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার। প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগনমণ্ডলে পাতিব ফান্দ। ধরিয়া আনিব গগনচান্দ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোঁটা। কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাথাব চুয়া। কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া। দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়। কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়। অম্বিকামঙ্গল মুকুন্দে গায়॥৫

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে সূক্তির অভাব নাই। তাহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে এবং কতকগুলি পরবর্ত্তীকালে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে। এখানে কতিপয় উদাহরণ দিতেছি।

সেই বরযোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥৬
হরিণ জগতবৈরী আপনার মাংসে॥৭
(তুলনীয়:—চর্য্যাপদ—"আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী";
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—"আপণার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।")
সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাখী।
তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি॥৮
পুরাণবসন-ভাতি অবলাজনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক৯ যতনে।১০
রূপ নাশ কৈল প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে।১১
নারীর যৌবন কেবল আধন
যেমন জলের ফোঁটা।১২
(তুলনীয়:—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন "তোমার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।")
কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের গাভা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন বিদ্যুতের শোভা॥১৩
ভুখিল বাঘের হাতে যেমত হরিণী॥১৪
কল্পতরু ত্যজি হীনজনা ভজি
সেওড়াতলে সাধ মান।১৫

১। পৃঃ ২৯৮। ২। পৃঃ ২০৭-২০৮। ৩। পৃঃ ২১৯। ৪। পৃঃ ৫৪।

৫। পৃঃ ২১১-১২। ৬। পৃঃ ৪৭। ৭। পৃঃ ৫৪। ৮। পৃঃ ৬৯। ৯। 'পরম' পাঠান্তর। ১০। পৃঃ ৭০, ১৭৬। ১১। পৃঃ ১২০। ১২। পৃঃ ১৩৫। ১৩। পৃঃ ১৫৩। ১৪। পৃঃ ১৭৮। ১৫। পৃঃ ২৬৫।

[৯৮]

পরবর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের উপরই মুকুন্দরামের প্রভাব পড়িয়াছিল। সুন্দরদর্শনে নারীদিগের পতিনিন্দা এবং ঈশ্বরী পাটনিকে দেবীর শ্লেষাত্মক আত্ম-পরিচয়-দান এই দুইটির মূল মুকুন্দরামের কাব্যে রহিয়াছে। যেমন হওয়া উচিত, মুকুন্দরামের কাব্য অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কাব্যে উহা আরও মার্জ্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে। মকুন্দরামের কাব্য হইতে দেবীর আত্মপরিচয় অংশ দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভারতচন্দ্রের বর্ণনাটি সুপরিচিত বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না।

দেবী ফুল্লরাকে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন—

ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্যাবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।১
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥২

কোটালের নিকট দেবীর আত্মপরিচয়—

পিতা মোর কুলে বন্দ্য কুলে শীলে নহে নিন্দ্য
স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি দরিদ্র পাইলুঁ স্বামী
বুঢ়া বৃষ সবে যার ধন॥
অবনীতে নাহি ঠাঁই সমুদ্রে ডুবিল ভাই
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।
দারুণ দৈবের দোষে দুই পুত্র নাহি পোষে
কত দুখ করিব বাখান॥৩

[৯৯]

মুকুন্দরামের কাব্য সচরাচর কবিকঙ্কণ চণ্ডী নামেই প্রসিদ্ধ। ভণিতায় কবি স্বীয় কাব্যকে প্রায়ই অভয়ামঙ্গল এবং কখনও কখনও অম্বিকামঙ্গল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যটি দুইটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত, ফুল্লরা-কালকেতু উপাখ্যান এবং খুল্লনা-ধনপতি উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানটি বিশেষ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নিজস্ব। দ্বিতীয় কাহিনীটির সহিত মনসা-মঙ্গলের সনকা-ধনপতি উপাখ্যানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বস্তুত মনে হয় যে, বণিকদিগের মধ্যে প্রাচীনকালে দেবীমাহাত্ম্যদ্যোতক একটি মাত্র মূল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তাহা পরে দুই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চণ্ডী দেবী ও মনসা দেবীর মাহাত্ম্যসূচক দুইটি উপাখ্যানে পরিণত হয়। ইহা শুদ্ধ অনুমান মাত্র নহে। চণ্ডী ও মনসার (পূজা ও পূজক লইয়া ?) বিবাদ মনসামঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে দেখি পদ্মা (মনসা) দেবীর সাহায্য-কারিণী অনুচরী, দেবীর অপমানকরী ধনপতির ডিঙ্গা তিনি ডুবাইয়া দিবেন বলিতেছেন। ফুল্লরা-কালকেতু উপাখ্যানে কিন্তু পদ্মা বা মনসা বা অন্য কোন দেবীর উল্লেখমাত্র নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যরচনার তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। দুই একটি পুঁথিতে এবং তদবলম্বনে প্রস্তুত মুদ্রিত সংস্করণে রচনাকালজ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওয়া যায়—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥৪

এখানে রস অর্থে ছয় ধরিলে মানসিংহের কাল পাওয়া যায় না, নয় ধরিলে পাওয়া যায়। ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ কাব্যটির রচনাকাল হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং পয়ারটি প্রকৃত অর্থাৎ কবির রচনা বলিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি।

মুকুন্দরাম যে চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি নহেন তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই ধরা পড়ে। তিনি অনেক স্থলেই ভণিতায় বলিয়াছেন যে, তিনি নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেছেন।

উমাপদে হিতচিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥৫
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
নৌতুন মঙ্গল পরবন্ধে॥৬

[১০০]

পূর্ব্বে আলোচিত আত্মজীবনী অংশ হইতে কবির জীবনী সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, ডিহিদারের অত্যাচারে তিনি সপরিবারে সাতপুরুষের বাসভূমি দামিন্যা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণভূমি আড়রায় গিয়া তথাকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন এবং সেখানেই তাঁহার কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যের ভণিতা হইতে কবির ও কবির পৃষ্ঠপোষকদিগের সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা করিতেছি।

১। 'বন্দ্যাবংশে জন্ম বাপ স্বামীয়া ঘোষাল' হইবে কি? ২। পৃঃ ৬৩।

কবির পিতামহের নাম জগন্নাথ-মিশ্র, রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, কোয়ারি গাঞি। ইনি মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া কবিত্ব-লাভের আশায় অনেক দিন ধরিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া গোপালের পূজা করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম হৃদয়-মিশ্র; ইনি গুণিরাজ-মিশ্র বলিয়াও বহুবার উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং "গুণিরাজ" ইহাঁর উপাধি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়-মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥১
কুয়াড়ি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥
গুণিরাজ মিশ্র-সুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥২

ভণিতা হইতে জানিতে পারি, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম (উপাধি?) ছিল কবিচন্দ্র। আর আত্মপরিচয় হইতে জানিতে পারি যে, কবির সঙ্গে ভাই রামানন্দ (পাঠান্তর 'রমানাথ') ছিলেন। ইনি কি কবির অনুজ? না, ইনিই কবিচন্দ্র?

ভণিতায় কতিপয় স্থলে শিবরাম, চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশের জন্য দেবীর দয়া ভিক্ষা করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুধু শিবরামের জন্য দয়া ভিক্ষা করা হইয়াছে।

উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥৩
করগো করুণাময়ী শিবরামে দয়া ॥৪

প্রবাদ অনুসারে কবির পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা, কন্যার নাম যশোদা এবং জামাতার নাম মহেশ ('মহীশ' পাঠান্তর)।

কোন কোন পুঁথিতে "দৈবকীনন্দনে ভণে" ইত্যাকার ভণিতা পাওয়া যায়।[৫] দৈবকীনন্দন কোন স্বতন্ত্র কবি না হইলে বুঝিব যে, কবির মাতার নাম ছিল দৈবকী। দৈবকী-নন্দন ভণিতা বঙ্গবাসী সংস্করণের কুত্রাপি নাই।

সম্ভবতঃ কবি শিশুকাল হইতে গ্রামদেবতা রামাদিত্যের সেবাপরায়ণ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের উপজীব্য পুঁথিতে গ্রামদেবতার নাম চক্রাদিত্য।

দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য। শিশুকাল হৈতে তায় সেবা করি নিত্য ॥৬

কবির পৃষ্ঠপোষক বীর বাঁকুড়া রায় ব্রাহ্মণভূমের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, পালধি গাঞি। ইহার পিতার নাম ছিল বীরমাধব, শ্বশুরের নাম দুলাল-সিংহ, ভার্য্যার নাম দনা-দেবী এবং পুত্রের নাম রঘুনাথ।

বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥৭
দুলাল-সিংহের সুতা দনা দেবী পাটমাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ॥৮

কবি আড়রাতে বসিয়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও তদানীন্তন পৃষ্ঠ-পোষক রাজা রঘুনাথের আদেশে কাব্যটি রচনা করেন। তখন বাঁকুড়া রায় জীবিত নাই। কবি ভণিতার মধ্যে বহুবার রঘুনাথের জন্য দেবীর দয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

পালধি বংশেতে জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।৯
চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥১০
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ
সুখে থাকি আরড়া নগরে ॥১১
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণে গান
রঘুনাথ দিল অনুমতি ॥১২

কবিকঙ্কণ উপাধি সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা অথবা চণ্ডী-মঙ্গলের বড় গায়কেরা ব্যবহার করিতেন। অন্ততঃ ইহা যে মুকুন্দরাম ছাড়াও অন্য চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। [ক্রমশঃ

১। পৃঃ ৩, ইত্যাদি। ২। পৃঃ ২২০, ২৩৫-৩৬, ৩১২। ৩। পৃঃ ৪৫, ইত্যাদি। ৪। পৃঃ ৩০৩, ইত্যাদি। ৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ, পৃঃ ১৪-১৫। ৬। পৃঃ ১৭৬। ৭। পৃঃ ৭। ৮। পৃঃ ১৪১। ৯। পৃঃ ৩৬, ইত্যাদি। ১০। পৃঃ ৪৮, ইত্যাদি। ১১। পৃঃ ৮৭, ইত্যাদি। ১২। পৃঃ ২৫৬।

ক্ষমা

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সুধাকর যতই ভাবিতে লাগিল, ততই বিচলিত হইতে লাগিল। দর্পণ যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাতে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি বিকৃত দেখায়। বিচলিত চিত্তে সে কেবলই অতিরঞ্জিত দৃশ্য প্রতিফলিত দেখিতে লাগিল। রোগশয্যায় তাহাকে অসহায় অবস্থায় অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া থাকিতে হইবে, হাসপাতালের কথাই কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—রোগীরা আহার, পানীয় সকলেরই জন্য শুশ্রূষা-কারীদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। সে সমস্ত জীবনে স্বাস্থ্যই সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে; কাজেই তাহার কাছে রোগীর জীবনের কল্পনাও অসীম যন্ত্রণার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

সে কি করিবে?

সে স্বয়ং চিকিৎসক। রোগের ও রোগীর অবস্থা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এখন সে কেবল রোগীর ভবিষ্যতই ভাবিতে লাগিল; চিকিৎসার কথা, আরোগ্যলাভ-সম্ভাবনা তাহার মনে স্থান লাভ করিল না। বোধ হয়, আরোগ্যলাভ করিতে তাহার আগ্রহও ছিল না; সে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল। লোক তাহাকে সংসারের সুখে সুখীই মনে করিত বটে, কিন্তু যাহার অভাবে সুখের বহু উপকরণ লাভ করিতে পারিয়াও মানুষ সুখলাভ করে না, সে তাহারই অভাব অনুভব করিত। দেহে জীবন আছে বলিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল এবং কলের মত প্রতি দিনের কাজ করিয়া যাইত। আজ যখন জীবন যাইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন সে তাহাকে রাখিবার কথা আর মনে করিল না। বিশেষ তাহার কৌলিক দৌর্ব্বল্য তাহাকে যে পথ দেখাইতে লাগিল, সে পথে এত দিন তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। বহুদিন কারাবদ্ধ ব্যক্তি কারাগৃহের প্রাচীর বহুবার পরীক্ষা করিবার পর একদিন যদি সহসা দেখে, কারাকক্ষের গবাক্ষ তাহার স্পর্শমাত্রে নামিয়া আসিল, তবে সে কি মুক্তিলাভ-সম্ভাবনার আগ্রহে মুক্তিপথে আর যে বাধাবিঘ্ন থাকিতে পারে তাহাও ভুলিয়া সেই পথে বাহির হইতে যায় না?

যে দিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় সুধাকর সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরদিন সে যথাকালে কলেজে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে উপস্থিত হইবার পরই শিক্ষকদিগের বসিবার ঘরে একটা জটলা আরম্ভ হইল; সকলেই তাহাকে পূর্ব্বদিনের ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুধাকর হাসিয়া বলিল, "তোমাদের সকলেরই কি রোগীর এত অভাব যে, আমাকে রোগী করবার চেষ্টায় আছ;—ভাগাড়ে গরু পড়লে শকুনের মত উৎফুল্ল হচ্ছ?"

অধ্যাপকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাহার সমবয়সী তাঁহারা বলিলেন, "ও সব চালাকী চলবে না, সুধাকর। তোমার নিশ্চয়ই একটা অসুখ করেছে, তুমি তা' গোপন করছ।"

সুধাকর বলিল, "আমি ত দেখছি, তোমাদের মস্তিষ্কের অসুখ প্রবল হয়ে উঠেছে।"

তাহার পর সুধাকর পড়াইতে গেল; ভাবিতে ভাবিতে গেল—সে যে ধরা পড়িবে!

তখন শীতকাল—কলেজে শবব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মের সময় তাহা বন্ধ রাখিতে হয়। পূর্ব্বদিন সুধাকর ছাত্রদিগকে নরদেহ সম্বন্ধে যাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল, সে দিন শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষে শব লইয়া তাহাই দেখাইয়া দিতে হইবে। ছাত্ররা তাহার নির্দ্দেশানু-সারে শব কাটিয়া শিক্ষালাভ করিবে।

শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধাকর দেখিল, সে দিন যে কয়জন ছাত্রের আসিবার কথা, তাহারা পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ডোমও উপস্থিত আছে। সে আসিয়া শব আনিতে বলিলে ডোম দুইটি শব লইয়া আসিল। শব হাসপাতাল হইতে সংগৃহীত হয়। যাহাদিগের আত্মীয়রা সৎকারার্থ শব লইয়া যায় না—সেই সব "যার-কেহ-নাই" শ্রেণীর লোকের শব বেওয়ারিশ বলিয়া কলেজে ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়—দরিদ্র মানব মরিয়াও মানুষের উপকার করে, দেহ দান করিয়া

বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে সাহায্য করে - মানুষের রোগক্লেশ-নিবারণের উপায়-নির্দ্ধারণে সহায় হয়।

শব ঔষধ-প্রয়োগে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে অনিবার্য্য বিকৃতি বিলম্বিত হইলেও নিবারিত হয় না—হইতে পারে না। শবব্যবচ্ছেদ-গৃহে প্রবেশ করিলেই দুর্গন্ধ তাহা জানাইয়া দেয়। যাহারা ডাক্তারী পড়িতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে শতকরা কয় জন সেই পরিবেষ্টনে কাজ করিতে না পারিয়া সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

ডোম দুইটি শব আনিয়া টেবলের উপর স্থাপিত করিল। যাহার শব সে বলিষ্ঠ পুরুষ ছিল; তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু চাহিয়া আছে, মরণেও মুদিত হয় নাই। সে যেন সেই চক্ষুতে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া আছে—তাহার মৌন জিজ্ঞাসা, জীবনে কেবলই সংগ্রাম করিয়াছি, মরিয়াও কি দরিদ্রের নিস্তার নাই?

ছাত্ররা শবের অংশগুলি ভাগ করিয়া লইল এবং এক এক অংশ লইয়া পুস্তক দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সুধাকর ভাবিতে লাগিল, কয় দিন পূর্ব্বে এই ব্যক্তি সংসারে সংগ্রাম করিয়াছে; আজ তাহার সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে—সে আজ সুখ দুঃখ সকলের অতীত। আজ আর কোন উদ্বেগ, কোন দুশ্চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না; রোগে সে কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হয় না—ভোগে কেহ তাহাকে হিংসা করে না। সে কি সত্য সত্যই সুখী নহে? কে বলিতে পারে? সে যে অজ্ঞাত রাজ্যের প্রজা হইয়াছে, তথা হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না—কেহ তথায় তাহার অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করিতে পারে না; সবই অনুমান। তবে?

বিষাক্ত ধূম নিশ্বাসের সহিত দেহমধ্যে গৃহীত হইলে যেমন মানুষকে আচ্ছন্ন—অবসন্ন করিয়া ফেলে, সেই শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষের দুর্গন্ধ সুধাকরকে তেমনই আচ্ছন্ন ও অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। ছাত্রদিগের কাযের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু সে চলিয়া যাইতে পারিল না—সেই কক্ষে থাকিয়া শবের উন্মীলিত দৃষ্টিহীন চক্ষুর দিকে বারবার চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, কে যেন তেমনই তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছে; সে যে মৃত্যু—তাহাই সে বুঝিতে পারিল না।

ঘণ্টা শেষ হইয়া গেলে সে যখন সেই কক্ষ ত্যাগ করিবে, তখন এক জন যুবক তাহার নিকটে আসিল। সুধাকরের মনে হইল, সে কিছু বলিতে চাহে, কিন্তু ভরসা করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সে ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বলবার আছে?"

ছাত্রটি সাহস পাইয়া বলিল, "হাঁ, সার।"

"কি? বল।"

ছাত্রটি যেন অপরাধী এই ভাবে বলিল, "আমার একটি দিন হাজিরা কম আছে; সেই জন্য আমার এ বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হয় না।"

"অনুপস্থিত হ'লে কেন?"

"সার, দাদার টাইফয়েড হয়েছিল, তাই তাঁ'র সেবা করতে হয়েছিল।"

"তিনি সেরেছেন?"

"না—মারা গেছেন"—যুবকের গলাটা ধরিয়া আসিল।

সুধাকর প্রশ্ন করিয়া জানিল, দাদাই যুবকদিগের সংসার প্রতিপালন করিতেন—সংসারে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাহার হৃদয় যুবকের প্রতি দয়ায় আর্দ্র হইল। সে বলিল,—"আমি কাল তোমার জন্য অতিরিক্ত ক্লাস করব। কাল রবিবার আছে।" সে ডোমদিগকে বলিয়া-দিল, পর দিন রবিবার হইলেও সে এক ঘণ্টার জন্য আসিবে, তাহারা যেন উপস্থিত থাকে।

এই সংবাদ যখন ছাত্রদিগের মধ্যে প্রসারিত হইল তখন তাহাদিগের মধ্যে সুধাকরের সুখ্যাতি আরও বাড়িয়া গেল। সে ছাত্রদিগের সহিত অবাধে মিলিত বলিয়া তাহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট ও তাহার অনুগত ছিল।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজে আসিয়া সুধাকর দেখিল, ছাত্রটি উপস্থিত আছে।

উভয়ে শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দিন আর কোন ছাত্র আসে নাই—বৃহৎ কক্ষ প্রায় শূন্য। ডোমরা পূর্ব্বদিন-ছিন্ন শবের অংশগুলি টেবলের উপর রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল—ছাত্রটি একটি অংশ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

ছাত্রটির নিকট হইতে অদূরে শবের অন্যান্য অংশ রক্ষিত ছিল। কিছুক্ষণ পরে সুধাকর একটি অংশ লইয়া তাহাতে ছুরিকা বিদ্ধ করিল—শবের বিকৃতি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল—তাহা বিশেষরূপ বিষাক্ত।

কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে শবাংশ চিরিতে চিরিতে সে সহসা ছুরিকাখানি তুলিয়া তাহা দিয়া আপনার বাম হস্তে একটু স্থান চিরিয়া ফেলিল এবং তাহার পর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধরিল।

সুধাকর লক্ষ্য করে নাই, ছাত্রটি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

ছাত্রটি ভীত হইয়া আসিয়া বলিল, "সার, হাতে ছুরী লেগে গেল।"

সুধাকর বলিল, "ও কিছু নয়।"

"রক্ত পড়েছে?"

সুধাকর তাহার কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল, "ভয় পেও না।"

"না, সার, ওষুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।"

"আচ্ছা—আমি চললাম; কাল এসে তোমায় 'উপস্থিত' লিখে দেব।"

সুধাকর চলিয়া গেল।

ছাত্রটি ভাবিতে লাগিল, একি হইল? এইরূপ শব-ব্যবচ্ছেদে যে ছুরিকা ব্যবহৃত হয়, তাহা পরিষ্কৃত না করিলে বিষাক্ত থাকে—তাহা মানুষের দেহে রক্তের সহিত স্পৃষ্ট হইলে সেই বিষ মানবদেহে ব্যাপ্ত হইয়া যায়; তাহার ফল—মৃত্যু। সে কি করিবে? সে দিন রবিবার; কলেজ বন্ধ; নহিলে সে অন্য অধ্যাপকদিগকে এ কথা বলিয়া দিত—তাঁহারা যথাকর্ত্তব্য করিতেন। উপস্থিত কেবল হাসপাতালের স্থায়ী চিকিৎসকরা, তাঁহাদিগের সহিত সুধাকরের তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই। সে যদি তাঁহাদিগকে এ কথা বলে—সুধাকর হয়ত মনে করিবে, সে অনধিকারচর্চ্চা করিতেছে। সে কি করিবে স্থির করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তির ভাব প্রবল হইয়াই রহিল।

এদিকে ঘরের বাহিরে যাইয়া সুধাকর দেখিল—ক্ষত প্রায় দুই ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে। তখন রক্তপাত বন্ধ হইয়াছে। সে অন্য ঘরে হস্ত ধৌত করিয়া রুমালখানা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

[১০]

যে ছাত্রটির জন্য সুধাকর সে দিন কলেজে আসিয়াছিল, সে বুঝিতে পারে নাই, সুধাকর ইচ্ছা করিয়া শবব্যবচ্ছেদান্তে ছুরী দিয়া আপনার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সুধাকর অসাবধান হইয়াই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাহার মনে স্বস্তি ছিল না। সে মনে করিতেছিল, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তাহার জন্যই হইবে। সে ছাত্রাবাসে যাইয়া তাহার সঙ্গে এক ঘরের বাসী ছাত্রটিকে সব কথা বলিল। সতীর্থ বলিল, "তুই কি এর মধ্যেই সারের চেয়ে বড় ডাক্তার হয়েছিস যে, তিনি যা'তে ভয় পান নি, তাতেই ভয়ে আড়ষ্ট হচ্ছিস!" ছাত্রটি আর কোন কথা বলিল না।

পরদিন সুধাকর যথাকালে কলেজে আসিল এবং অধ্যাপনা করিয়া গেল। ছাত্রটি লক্ষ্য করিল, সে ভালই আছে।

এইরূপে কয় দিন গেল। সুধাকর চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল—তবে কি তাহার শরীরে বিষের ক্রিয়া হইল না? তাহার পর তাহার জ্বর হইল। সুধাকর যেন মুক্তির সন্ধান পাইল। প্রথম দিন সে জ্বর গোপন রাখিল। দ্বিতীয় দিন আর তাহা সম্ভব হইল না। চতুর্থ দিন জ্বরের লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল, অবিরাম সান্নিপাতিক জ্বর।

সুধীর ব্যস্ত হইল—ডাক্তার ডাকিতে চাহিল। সুধাকর বলিল, "কিছু নয়—সেরে যাবে।"

কিন্তু সুধাকর যখন অসুস্থ হইয়া কলেজে অনুপস্থিত হইল তখন ছাত্রটি উৎকণ্ঠিত হইল এবং বলিবে কি বলিবে না, ভাবিয়া শেষে এক জন অধ্যাপককে সে দিনের ঘটনার কথা বলিয়া দিল।

তখন কলেজের ডাক্তারদিগের মধ্যে সেই কথার আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বা ছাত্রটির কথা বিশ্বাস করিলেন, কেহ বা করিলেন না! শেষে দুই জন ডাক্তার স্থির করিলেন, তাঁহারা পরদিন সুধকরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তাররা দেখিয়াই বুঝিলেন, ছাত্রটির কথা ও অনুমান সত্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মনে হইল, বিষের ক্রিয়া যে

অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে জীবন-মৃত্যু-সংগ্রামে জীবনের জয়ী হইবার আশা সুদূরপরাহত। তাঁহারা সুধাকরকে বলিলেন, "তুমি এমন অসাবধান হ'লে!" সে কেবল হাসিল।

ঝড়ের বেগে নৌকা যখন আবর্ত্তের মধ্যে যাইয়া পড়ে, তখন তাহাকে রক্ষা করা যেমন দুষ্কর, এ অবস্থায় রোগীকে রক্ষা করা যে তেমনই দুষ্কর তাহা সুধাকর জানিত।

কথাটা শুনিয়া সুধীর ভাবিল, এ কি? সুধাকর যে অসতর্ক হইয়াছিল এবং অসতর্ক হইবার পর ঔষধ ব্যবহার করে নাই—ইহা একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবে কি তাহার পিতা ইচ্ছা করিয়াই এ কাজ করিয়াছেন? তবে কি বংশের অভিশাপে তাঁহাকেও অব্যাহতি দেয় নাই? কিন্তু সহসা সুধাকরের এই দৌর্ব্বল্যের কারণ কি? সুধীরের মনে যে সন্দেহের উদয় হইল, সে তাহা দূর করিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহা ততই প্রবল হইয়া তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

এদিকে বিষক্রিয়ার ফল রোগের সব লক্ষণই সুধাকরের দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কোন ঔষধেই তাহার গতি প্রহত হইল না।

করুণাময়ী প্রথমে স্বামীর অসুখের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই; যখন পারিল, তখন গভীর জলে পতিত সন্তরণে অভ্যাসহীন লোকের মত হইয়া পড়িল। তাহার ভাব দেখিয়া সুধীর পিতার রোগের কারণ তাহাকে জানাইল না বটে, কিন্তু ডাক্তারদিগের আলোচনা হইতেই তাহার মনে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল। সে সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তাররা কি বলছিলেন—ও কি আত্মহত্যা?" সুধীর বলিল, "কে বললে?"

সুধাকর করুণাময়ীর মুখভাব লক্ষ্য করিল। তাহার যে ভালবাসা প্রতিদান না পাইয়া এত দিন তাহাকেই পীড়িত করিয়াছে—যাহার প্রত্যাখ্যানে সে জীবনে বিষম চাঞ্চল্য ভোগ করিয়াছে—যশ, অর্থ, কর্ম্মের বাহুল্য, পুত্রের সশ্রদ্ধ স্নেহ—কিছুতেই যাহার প্রতিদানের অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই, তাহার সেই ভালবাসা আজ করুণাময়ীর মুখভাবমালিন্যে তাহাকে ব্যথা দিতে লাগিল। সে করুণাময়ীর উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া এত দিন তাহার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আজ করুণাময়ীর অন্তর্নিহিত শঙ্কার বহির্বিকাশ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তবে কি সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, ভুল করিয়াছে? কিন্তু ভুল হইলেও ফিরিবার আর ত উপায় নাই!

কিন্তু করুণাময়ীর মুখভাব তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে সে ডাক্তারদিগকে বলিল, "এ খাটের মড়া নিয়ে তোমাদের আচ্ছা বিপদ হয়েছে! তোমরাও বুঝছ, আমিও বুঝছি—সারবার আর কোন আশা নাই, বড় জোর দু' তিন দিন; কিন্তু তোমাদের ছুটোছুটির বিশ্রামও নাই। তা'র চেয়ে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল।"

ডাক্তাররা ভাবিলেন, প্রস্তাবটা মন্দ নহে। মানুষ কি কখনও আপনার সুবিধা ত্যাগ করে?

কেবল সুধীর আপত্তি করিল, "কেন বাড়ীতে কি অসুবিধা হচ্ছে?"

সুধাকর বলিল, "এই বন্ধুদের অসুবিধা, বাবা। আর ভেবে দেখ, রোগ, রোগী, ডাক্তার—এই পরিবেষ্টনের মধ্যে মরাও কি ডাক্তারের পক্ষে ঠিক নয়?"

তাহাই পিতার শেষ ইচ্ছা বুঝিয়া সুধীর আর আপত্তি করিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, সুধাকর যেন ক্রমে মায়ার সব বন্ধন নিজ হস্তে মুক্ত করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে কি তাহাদিগের কাহাকেও তাহার সেবায় বঞ্চিত করিতে চাহে—কাহারও সেবা-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেছে? না—সে পরবশ্যতায় স্বাভাবিক অনিচ্ছাহেতু হাসপাতালে যাইতে চাহিতেছে?

সুধাকর যাইবার জন্য একটু ব্যস্ত হইল দেখিয়া ডাক্তাররা তাহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

যখন তাহাকে জীবিতাবস্থায় মৃত্যুপথযাত্রী জানিয়া তাহাকে তাহার পরিচিত গৃহ হইতে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন গৃহে তাহার দৃষ্টি যতক্ষণ দেখা গেল—করুণাময়ীর প্রাচীর-বিলম্বিত প্রতিকৃতিতে বদ্ধ রহিল। সে প্রতিকৃতি করুণাময়ীর তাহার সহিত বিবাহের কয় বৎসর মাত্র পরে গৃহীত ফটো হইতে অঙ্কিত করান হইয়াছিল। সেই অল্প বয়সের ছবিখানির প্রতি করুণাময়ী কখনই সদয় ছিল না—সে বলিত, "ওখানা আবার কেন?" কিন্তু সুধাকর সেই খানিকেই বড় করিয়া অঙ্কিত করাইয়াছিল—সেই ছবিখানি

তাহার শয়ন-কক্ষে রক্ষিত ছিল। তাহা করুণাময়ীর যে বয়সের ছবি, সেই বয়সেই সে করুণাময়ীকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল—আর সে ভালবাসা অবজ্ঞায় উপেক্ষায় বিপদে সম্পদে কখনও ম্লান বা লুপ্ত হয় নাই। তাই গৃহত্যাগের সময় সেই সময়ের কথাই বুঝি সুধাকরের মনে পড়িতেছিল!

যখন সুধাকরকে গাড়ীতে তুলা হইল, তখন বাড়ীর মধ্যে কণা ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল, "আমি দাদুর সঙ্গে যা'ব।" সে কথা সুধাকরের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল। হায় মায়ার বন্ধন!

গাড়ী চলিয়া গেল।

করুণাময়ী শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকভাঙ্গা বেদনায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার বুক বিদীর্ণ করিয়া যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ব্যাকুলতা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, মুখে তাহা প্রকাশ পাইল না—"কোন্ অভিমানে তুমি এমন কাজ করলে; কি অভিমানে তুমি মরবার জন্য বাড়ী ছেড়ে গেলে?"

[১১]

করুণাময়ী কতক্ষণ এই ভাবে—যেন বাহ্যসংজ্ঞাহত হইয়া কাঁদিল, তাহা সে আপনি জানিতেও পারিল না। ইহার মধ্যে অরুণা আসিয়া দুইবার তাহাকে ডাকিয়াছিল, উত্তর না পাইয়া আর ডাকিতে সাহস করে নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে করুণাময়ীর দুই দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাই তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। তাহার মেজ দিদি বলিলেন, "তাই ত! আমি সেদিন যখন এসেছিলাম, তখনও সুধীরের মুখে ঐ আত্মঘাতের কথা শুনে আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আর তাই হ'ল!"

প্রস্রবণের মুখে যে পাথর ছিল তাহা যেন সরিয়া গেল; করুণাময়ী কাঁদিয়া উঠিল, "মেজদি, সে দিন তুমি আমায় যা' বলেছিলে, তা'তেও আমার চোখ খুলে নি!"

মেজদিদি বলিলেন, "ছেলে কত রাগ করতে লাগল। তোর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম—রোগেও সেবা করবি না! আমি বললাম, তা তুই উত্তর দিলি অদেষ্টে যা আছে তা' হ'বেই।"

"সব দোষ আমার—নইলে এমন হবে কেন?" সে কাঁদিতে লাগিল।

বড় দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসপাতালে গেল কেন? এ কি কথা?"

করুণাময়ী বলিল, "আমি বুঝতে পারছি, আমার উপর অভিমানই যা'বার কারণ।"

"ঐ ত কাল হ'ল—যেমন অভিমান তোর, তেমনই তার।"

"বড় দি, অভিমান নিয়ে ত তিনি যাচ্ছেন—কিন্তু পোড়া কপাল আমার—আমার অভিমানের কোন্ ঠাঁই রইল? এমন অভিমানের মুখে কেন আগুন দিই নি?"

"তুই যেতে দিলি কেন?"

"বড়দি, আমার কি আর কোন কথা বলবার মুখ আছে? আমিই যে এর জন্য অপরাধী।"

"ছেলেও বারণ করলে না?"

মেজ দিদি বলিলেন, "বড়দি, জন্মে জন্মে তপিস্যে করেও লোক অমন ছেলে পায় না—ছেলে বাপ-অন্ত প্রাণ। সে কি এ সময় বাপের কথায় আপত্তি করতে পারে? হয় ত মা'র উপর তা'রও অভিমান হয়েছে। আমি যখন আগে এক দিন এসেছিলাম, তখনও মাথার অসুখ নিয়ে বাপ বেরিয়েছিল বলে ছেলে করুণার উপর কত রাগ করলে! সেদিনের কথাই আমি তোমাকে বলছিলাম।"

"এখন উপায় কি?"

"তাইত!" তিনি করুণাময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তাররা কি বললে?"

করুণাময়ী বলিল, "আমি তা জানি না।"

মেজ দিদি অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, সুধীর কি কিছু বলেছে?"

অরুণা বলিল, "কেবল বলেছেন, বাবা নিজের হাতে মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে ফেললেন।"

"তবে কি বাঁচবার আর কোন আশা ডাক্তাররা করে না?"

"না"—বলিয়া অরুণা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্বশুরের জন্য তাহার যে দুঃখ, তেমন দুঃখ সে পূর্ব্বে কখন অনুভব করে নাই। তিনি তাহাকে কত স্নেহ দিয়াছেন! পূর্ব্বদিনও তাহাকে বহুক্ষণ তাঁহার সেবা করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, অনেকক্ষণ বসে আছ; যাও একটু বিশ্রাম কর গে।" গৃহ হইতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে—বিদায় লইবার সময়

তাঁহার শেষ কাজ, কণাকে একটি বড় পুতুল দেওয়া; সেই শেষ স্নেহোপহারের সামগ্রী তিনি যে দিন প্রথম জ্বর বুঝিতে পারেন সেই দিন স্বয়ং যাইয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার কন্যা, পুত্র, স্বামী, আর সে—তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া থাকিবেন, অরুণা তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। শ্বশুরের কথা সে যতই মনে করিতেছিল, ততই কাঁদিতেছিল।

সুধাকরকে যখন লইয়া যাওয়া হয়, কণা তখন হইতেই কাঁদিতেছিল। অরুণা কিছুতেই তাহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিতে পারে নাই। দাদুর শেষ উপহার পুতুলটিকে সে একবারও বুক হইতে নামায় নাই। সে কেবলই অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, দাদু গেল কেন?" সে জানিত, মানুষের অসুখ হইলে সে বাড়ী হইতে কোথাও যায় না; তাই দাদু যে অসুখ হইল বলিয়া চলিয়া গেলেন, ইহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে তাহার বাবাকে আর মা'কে কাঁদিতে দেখিতেছিল, নিজে কাঁদিতেছিল; এখন সে দিদাকেও কাঁদিতে দেখিল। সে বুঝিল, অসাধারণ একটা কিছু ঘটিয়াছে—আতঙ্কে তাহার শিশু-হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে আবার অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দাদু কখন আসবে?" অরুণা উত্তর দিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। করুণাময়ীর বড় দিদি কণাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "চুপ কর, দিদিমণি।" কণা হতাশভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কা'র সঙ্গে খেলা করব?" হায়, শিশু—সে যদি অনুমান করিতে পারিত, তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার কল্পনায় তাহার সেই খেলার সাথীটি কত কষ্ট অনুভব করিতেছে!

মেজ দিদি অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না?"

অরুণা বলিল, "না।"

"কেন?"

"টানাটানি সইবে না—এমনিই"—সে যে শুনিয়াছে, ডাক্তাররা বলিয়াছেন, মেয়াদ আর দুই দিনের অধিকও নহে—সেই নিষ্ঠুর কথাটা অরুণা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বড় দিদি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!"

করুণাময়ী ভাবিতেছিল—ভাবনার অন্ত নাই; সে ভাবিতেছিল, আর কাঁদিতেছিল। আজ সে বুঝিয়াছে—সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাকে কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। সে বুঝিয়াছে—তাহার পিতৃগতপ্রাণ পুত্র মুখে কিছু বলুক আর না-ই বলুক, তাহাকেই এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মনে করিবে। সে বুঝিয়াছে—যে সাধব্যের গর্ব্বে সে স্বামীকেও উপেক্ষা করিয়াছে, আজ স্বামী সেই সাধব্য চূর্ণ করিয়া দিয়া, তাহার গর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া দিয়া—যেন তাহাকে দারুণ উপহাস করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছেন; জীবনে তাহার আর কোন অবলম্বন থাকিতেছে না। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রজনীতে অন্ধকার যেমন প্রান্তর পূর্ণ করে, আজ নিরাশা তেমনই তাহার হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল; তাহার চারিদিকে যেন কেবলই অন্ধকার—অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

কেহ যদি তাহার চারিদিকে শুষ্ক তৃণস্তূপ সজ্জিত করিয়া ফল না বুঝিয়া তাহাতে অগ্নি যোগ করে, তবে তৃণস্তূপ হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইলে—বাহির হইবার আর কোন পথ নাই দেখিয়া—সে যেমন করে—আপনার অবিবেচনার ফলে আপনি যেমন যন্ত্রণা ভোগ করে, করুণাময়ী তেমনই করিতেছিল। দিদিদের কথা—তাঁহাদিগের মৌখিক সহানুভূতি তাহাকে কি সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে?

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল—সুধীর আসিল না। সন্ধ্যার পর পিতা পুনঃপুনঃ বলায় সে আহারের জন্য এক বার গৃহে আসিল; আহার্য্য সম্মুখে লইয়া বসিল মাত্র—খাইতে পারিল না। করুণাময়ী বলিল, "কিছুই যে খেলি না!" সে কোন উত্তর দিল না। করুণাময়ীর মেজ দিদি বলিলেন, "সারাদিন রোগীর কাছে বসে ছিলে, আবার সারারাত্তির জাগবে?" সুধীরের ধৈর্য্যের বন্ধন বিছিন্ন হইয়া গেল; সে বলিল, "দুঃখ এই যে, আর জাগতে পা'ব না, মাসীমা। বাবা আমাদের তাঁ'কে সেবা করবার সৌভাগ্যও দেবেন না—তিনি তাঁ'র ভাবনা থেকেও আমাদের মুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যদি বৎসর কয়েক রোগশয্যায় পড়ে থাকতেন, আর অনাহারে অনিদ্রায় তাঁ'র সেবা করতে পেতাম, তা' হ'লেও আপনাকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম; তা'তেও তাঁ'র স্নেহের ঋণ শোধ হয় না।" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ও অভিমানের চাঞ্চল্যে তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও কম্পিত হইতেছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। অরুণা রোদনের শব্দ গোপন করিতে পারিল না।

করুণাময়ীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না—পুত্রের কথা কাহার জন্য উচ্চিষ্ট—সে কথা কাহাকে তিরস্কার।

মেজ দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কি বলেছেন?"

সুধীর বলিল, "কি আর বলবেন? তবে একটা কথা আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন; হাসপাতালে গিয়েই বললেন "বাবা, একটা কথা বলা হয় নি। অনেক দিনের কথা—তোমার মা একদিন কথায় কথায় কা'কে বলছিলেন—স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কা'রও উপর কোন দাবী থাকে না। সেই কথা শুনে, যা'তে আমার অবর্ত্তমানে তাঁ'কে কা'রও উপর কোন রকমে নির্ভর করতে না হয়—তোমার উপরেও নয়—সে ব্যবস্থা আমি করে গেছি। সে টাকা তাঁ'র; তিনি জলে ফেলে দিলেও তুমি কিছু ব'ল না।"

করুণাময়ীর মনে হইল, স্বামীর এই ভালবাসার পরিচয় তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত তাহার বুকে প্রবেশ করিল।

করুণাময়ীর বড় দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা করুণাকে দিয়েছে?"

সুধীর এই প্রশ্ন অশোভন ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক মনে করিল; বলিল, "তা' দেখবার প্রবৃত্তি আমার হয় নি; সে সময়ও আমার এখন নয়। তবে আমার বিশ্বাস, বাবা সুব্যবস্থাই করেছেন; আর আপনারা এইটুকু বিশ্বাস করবেন যে, তিনি যা' দিতে আদেশ করেছেন, আমি তা'র কিছুতে হাত দেব না।"

এই কথা বলিয়া সুধীর বড় মাসীমা'র দিকে চাহিল। মা'র দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িলে সে মা'র বিবর্ণ মুখে বেদনার বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইল।

সুধীর হাসপাতালে চলিয়া গেল।

সে যাইবার পরেই করুণাময়ীর দুই দিদি বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মেজ দিদি অরুণাকে বলিলেন, "বৌমা, চাকরকে বলে দাও, আমার গাড়ী এলেই খবর দেয়। দিদিকে নামিয়ে দিয়ে যেতে হ'বে।" অল্পক্ষণ পরে তাঁহার গাড়ী আসিলে উভয়ে আর এক দফা আক্ষেপোক্তি করিয়া বিদায় লইলেন।

অরুণা শাশুড়ীর আহার্য্য আনাইয়া তাঁহাকে ডাকিল করুণাময়ী বলিল, "বৌমা, আমি খা'ব না।"

শয্যায় শয়ন করিয়া করুণাময়ী কেবলই ভাবিতে লাগিল; আর তাহার বুকের মধ্য হইতে রুদ্ধ ক্রন্দন কেবলই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল; সে স্বপ্ন দেখিল—সম্মুখে সুধাকর, তাহার মুখে শবের পাণ্ডুতা, চক্ষুতে অস্বাভাবিক দৃষ্টি; করুণাময়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দুই করে বুক চিরিয়া ফেলিল; করুণাময়ী দেখিল, বুকের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে; তাহার মনে হইল, অগ্নির উত্তাপ সে তাহার বক্ষে অনুভব করিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

[১২]

সুধাকর স্থির করিয়াছিল, সে জীবনকে উপহাস করিয়া মৃত্যুর রাজ্যে চলিয়া যাইবে। সেইরূপ ভাবেই সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে তাহার সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল—সংশয়। সে বাড়ী হইতে আসিবার সময় করুণাময়ীর মুখে যে কাতরতার ও নিরাশার ভাব দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই সেই সংশয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ণ যেমন রঞ্জকের হস্তে তাহার রঞ্জন রাখিয়া যায়, সেই কাতরতার ও নিরাশার ভাবের স্মৃতি তেমনই তাহার মনকে রঞ্জিত করিয়াছিল। আর তাহার ভালবাসাই সে রঞ্জনের জন্য জমী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। যখন তখন সেই স্মৃতি তাহার মনে দেখা দিতেছিল।

হাসপাতালে ডাক্তাররা পালা করিয়া সুধাকরের ঘরে থাকিতেছিলেন; আর সুধীর পিতৃসেবা যেন সাধনার ভাবেই করিতেছিল। সুধাকর ডাক্তারদিগের সঙ্গে কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবতারণা করিতেছিল। সকল সময়েই হাসিয়া কথা বলিতেছিল। সে আপনি ডাক্তার; তাহার পর সে যে ভাবে মৃত্যুর উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে পর পর কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, কিরূপ লক্ষণ-বিকাশ হয়, তাহা সে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিল। একটির পর একটি লক্ষণ-বিকাশ হইতেছিল, আর পরের লক্ষণ কি হইবে, তাহা সে ডাক্তারদিগকে বলিতেছিল।

যে দিন সে হাসপাতালে আসিয়াছিল, তাহার পরদিন প্রভাতেই সে বলিল, "আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশী নয়।"

উপস্থিত ডাক্তার বলিলেন, "কেন ?"

সুধাকর বলিল, "তুমি কি বুঝতে পারছ না ?"—সে রোগের লক্ষণবিচারে প্রবৃত্ত হইল, যেন রোগী দেখিয়া সে আর এক জন ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তব্য স্থির করিবার অভিপ্রায়ে পরামর্শ করিতেছে।

সে দিন পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে সুধীরের মন সরিতেছিল না। আজ শেষ দিন—আর সে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে পারিবে না—আর তাহার ডাকের উত্তরে স্নেহগাঢ় কণ্ঠে "বাবা" শুনিতে পাইবে না। তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। মধ্যাহ্ন হয়, তবুও সে উঠিল না দেখিয়া সুধাকর বলিল, "বাবা, খেতে গেলে না ?"

সুধীর বলিল, "আমি খাবার আনিয়ে নেব।"

"না। বাড়ী যাও। দাদুরা সব কি করছেন, দেখে এস। এখনও দেরী আছে।"

সে আর একবার বলিলে সুধীর আর কিছু বলিতে পারিল না—বাড়ী গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া সুধীর বলিল, "বাবা, কণা একবার আসবার জন্য বড় কাঁদছে। আনব কি ?"

সুধাকর একবার চক্ষু মুদ্রিত করিল—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যেন আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সে বলিল, "বাবা, আন।"

সুধীর উঠিয়া যাইয়া মোটরগাড়ীর ড্রাইভারকে বলিয়া আসিল, "বাড়ীতে গিয়ে কণাকে নিয়ে এস।"

কণাকে আনিতে বলিয়া সুধাকর পুনঃ পুনঃ ঘরের দিকে চাহিতে লাগিল—কখন সে আসিবে। তাহার পর যখন দ্বার হইতে "দাদু" বলিয়া ডাকিয়া কণা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিল, "একেই বলে, শ্মশানে সোনার প্রদীপ।"

তাহাই বটে, হাসপাতাল ব্যাধির গৃহ, মৃত্যুর ক্ষেত্র—তথায় শিশুর আবির্ভাব মৃত্যুর বুকে জীবনের বিকাশ—শ্মশানে সোনার প্রদীপই বটে।

কণাকে লইয়া অরুণা আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সুধাকর বলিল, "মাও বুঝি ছেলেকে দেখতে এসেছে ?"

তাহার পর সে কণার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুধাকর পূর্ব্বেই দুই এক বার সুধীরকে বলিয়াছিল, "বাবা, মা'কে আর দাদুকে বাড়ী রেখে এস"—কিন্তু কেহই যাইতে চাহে নাই। এ বার সে বলিল, "বাবা, ঠাণ্ডা লাগবে তুমি বাড়ী রেখে এস।" কণা বলিল, "আমি আবার আসব।" সুধাকর বলিল, "না, দাদু, ঠাণ্ডা লাগবে।"—কিন্তু সেই কথা বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

অরুণা কাঁদিয়া ফেলিল—কণাও কাঁদিল।

অরুণা উঠিয়া সুধাকরের পদধূলি গ্রহণ করিল—কণাও তাহাই করিল।

তাহারা চলিয়া যাইলে সুধাকরের মনে হইল, যেন সব অন্ধকার।

[১৩]

অরুণাকে ও কণাকে বাড়ীতে রাখিয়া সুধীর শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। হাসপাতালে যে ঘরে সুধাকর মৃত্যুশয্যায়, সে ঘরের বৈদ্যুতিক দীপের উজ্জ্বল আলোকের ঔজ্জ্বল্য আবরণ দিয়া হ্রাস করা হইয়াছিল। ঘর স্বচ্ছান্ধকারাবৃত। সুধীর আসিয়া পিতার মস্তকের নিকটে চেয়ারে বসিল। যে ডাক্তার ঘরে ছিলেন, তিনি বাহিরে গমন করিলেন।

সুধাকর বলিল, "সুধীর,—বাবা, সব রেখে এলে ?"

সুধীর বলিল, "হাঁ, বাবা।"

"দাদু আর কিছু বললেন না ?

"বড় কাঁদছে।"

সুধাকর একবার চক্ষু মুদিল। সহসা দারুণ আঘাত অনুভব করিলে মানুষ যেমন করে, সে তেমনই করিল ; তাহার পর বলিল, "বাবা, দিন কতক ওর বড় কষ্ট হ'বে। ছেলে মানুষ—ভুলে যাবে।" যেন সে আপনাকে আপনি বুঝাইতেছিল। তাহার পর সে আবার বলিল, "বাবা, জানি, তুমি কখনও ছেলে মেয়েকে তিরস্কার করবে না ; তবুও বলে যাই—দিন কতক এ খ্যাৎখেঁতে হ'বে ; সে সময়টা তোমারও মন ভাল থাকবে না—যেন ওর আব্দারে ধৈর্য্য হারিও না—তিরস্কার কর' না।"

সুধীর আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না ; দুই বিন্দু অশ্রু সুধাকরের কপালের উপর পড়িল।

সুধাকর বলিল, "বাবা, তোমারও কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে কত ভালবাস, তা' আমি জানি। বাবার স্নেহ

পাই নি, মার স্নেহের বিকাশ দেখি নি, তা'র পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুধাকর বলিল, "কিন্তু তুমি সব শূন্য পূর্ণ করে দিয়েছিলে—কোন অভাব রাখ নি। ভেবেছিলাম—"

সহসা সুধাকরের মনে হইল, তাহার চরণে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, পা'র কাছে কি কেউ বসে আছেন ?"

সুধীর যখন বাড়ী হইতে আসে, তখন করুণাময়ী বলিয়াছিল, "আমি যা'ব, সুধীর।" মা'র মুখের দিকে চাহিয়া সে মুখের বিষণ্ণ—ব্যথিত ভাব দেখিয়া সে "না" বলিতে পারে নাই।

সুধীর বলিল, "মা।"

সুধাকর বলিল, "বাবা, তুমি ত জান আমার আর বেশীক্ষণ নাই। তখন—এর মধ্যে ওঁকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়বে।"

সুধীর কিছু বলিল না।

সেই সময় কক্ষদ্বার হইতে ডাক্তার একটা কথা বলিবার জন্য সুধীরকে ডাকিলেন। সুধীর বাহির হইয়া গেল।

সুধাকরের স্মৃতি তখন অতীতের রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল—কত পুরাতন কথা এক সঙ্গে তাহার মনে উদিত হইতেছিল!

সে করুণাময়ীকে বলিল,—"তুমি এসেছ! ত্রিশ বছর আগে, যদি আমাকে কোথাও যেতে হ'ত, তুমি রাগ করতে, কিন্তু তবুও সব এগিয়ে দিতে। সেদিন অনেক দিন গেছে। আর এ মহাযাত্রা—এতে ত কিছুই সঙ্গে নিতে হয় না।"

করুণাময়ী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; তাহার পর বলিল, "তোমাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।"

"তা' হবে না। আমি যে ফিরবার উপায় রাখি নি, করুণা।"

আজ সুধাকরের কথায় সেই তরুণ জীবনের ভালবাসার সুর। করুণাময়ীর বুকের মধ্যে ব্যথা যেন কুরিয়া কুরিয়া প্রবেশ করিতেছিল। সে বলিল, "কেন তুমি এ কাজ করলে? আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না?"—সে সুধাকরের চরণ দ্বয়ের মধ্যে মুখ লুকাইল—কাঁদিতে লাগিল।

সুধাকর বলিল, "আমার অনেক কাজে ভুল বুঝেছ; শেষ কাজে ভুল বুঝ না। আমি তোমার উপর রাগ করি নি। যখনই রাগ করেছি, তখনই রাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অভিমানকে জয় করতে পারি নি। হয় ত অন্যায় আশা করেছিলাম, তাই নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি নি। তাই নিজের উপর প্রতিশোধ।"

সুধাকর হাঁপাইতে লাগিল।

করুণাময়ী স্বামীর চরণদ্বয়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুধীর ফিরিয়া আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল।

খানিকটা বিশ্রামের পর সুধাকর পুত্রের হাত ধরিয়া ডাকিল, "বাবা!"

অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে সুধীর উত্তর দিল, "কি বাবা?"

সুধাকরের হাত তখনও কাঁপিতেছিল; সে কোনরূপে হাত তুলিয়া সুধীরের স্কন্ধের উপর দিল। সুধীর মুখ নামাইয়া পিতার মুখের কাছে লইল। সুধাকর পুত্রের ললাট চুম্বন করিল। তাহার পর সে কবি টেনিসনের একটি কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করিল :—

> "সূর্য্য যায় অস্তাচলে—সন্ধ্যাতারা ছুটে,
> আমার আহ্বান ওই দিকে দিকে উঠে।"

সুধাকরের মন যেন তখন জগতাতীত লোকের সন্ধান করিতেছিল। সে বহুক্ষণ কথা বলিল না। সুধীর এক একবার লক্ষ্য করিতে লাগিল—বক্ষের স্পন্দন সহসা বন্ধ হইয়া যায় নাই ত?

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সুধাকরের যন্ত্রণা আরম্ভ হইল—সে মৃত্যু-যন্ত্রণা। সে করুণাময়ীকে বলিল, "করুণা, তুমি হয়ত রাগ করছ—আমি এখনও বিব্রত করছি। কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয়!"

করুণাময়ী কিছু বলিল না, কেবল সুধাকর তাহার দুর্ব্বল পদের তলে করুণাময়ীর মুখের চাপ অনুভব করিল। আর তাহার মনে হইল, সে যেন তথায় অধরের স্পর্শও অনুভব করিল। এ কি সত্য?

ইহার পর সুধাকর ডাকিল, "বাবা!"

"বাবা!" বলিয়া সুধীর উত্তর দিল।

"এই বার।—তোমার মুখও আর ভাল দেখতে পাচ্ছি না।"

সুধীর মুখ নত করিয়া পিতার মুখের পার্শ্বে রাখিল—তাহার অশ্রুর উৎস তখন মুক্ত হইয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরে ডাক্তার সুধীরকে ডাকিলেন "আর কেন?"

সুধীর এক বার বুকভাঙ্গা বেদনায় ডাকিল—"বাবা!"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

তাহার পর সুধীর আপনাকে সংযত করিয়া মা'কে বলিল, "মা, উঠ। বাবা তাঁ'র সম্বন্ধে শেষ উদ্বেগ থেকেও মুক্তি দিয়ে গেছেন।"

সে করুণাময়ীর হাত ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল। করুণাময়ীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল। [সমাপ্ত

বিজ্ঞান জগৎ

ব্যক্তিত্ব

§ গ্রন্থির প্রভাব

-শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

ব্যক্তিত্ব (Personality) বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সকলেরই একটি মোটামুটি ধারণা আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বিভিন্ন গুণ, কর্ম্মশক্তি ও চিত্তবৃত্তির সমাবেশ একটি কোন বিশেষ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব।

আমরা নিম্নে বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদের গবেষণানুযায়ী ব্যক্তিত্বের মূলে কি বস্তু তাহার সন্ধান দিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কয়েকটি করিয়া গ্রন্থি বা 'গ্ল্যাণ্ড' (gland) আছে। এগুলিকে প্রকৃত পক্ষে শরীরের অভ্যন্তরস্থিত রসায়নাগার বলা চলে। ইহারা রক্তের মধ্যে হইতে বিভিন্ন দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক নানা প্রকার রস (secretion) পৃথক্ করিয়া এই রসগুলি শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রয়োগ করে। এই গ্রন্থিগুলিকে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থিগুলি নিঃসৃত রস প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিকার (duct) সাহায্যে প্রেরণ করে ; উদাহরণ স্বরূপ লালাগ্রন্থি (salivary gland) ও অশ্রুগ্রন্থির (tear gland or lachrymal gland) উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থিগুলির প্রবাহিকা নাই এবং এই গ্রন্থিগুলির মধ্যে যে সকল দ্রব্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহা পুনরায় রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস শরীর ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ফলে ব্যক্তিত্ব নিরূপণে ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট। প্রবাহিকাহীন গ্রন্থি (ductless glands) হইতে নিঃসৃত এই সকল নিয়ন্ত্রক রস 'হর্‌মোন্' (hormone) নামে অভিহিত হয়।

অনেকে মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র 'হর্‌মোন্' নিঃসরণের উপরই নির্ভর করে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারণের প্রধান দুইটি অঙ্গ 'মানসিকতা' (mentality) ও চিত্তবৃত্তি (emotions)। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির প্রাখর্য্য অথবা অল্পতা নির্ভর করে তাহার মানসিকতার উপর। বুদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে পিতৃপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত মস্তিষ্কের উপর, কিন্তু এই মস্তিষ্কের বিকাশ ও ক্রিয়া বহুল পরিমাণে 'হর্‌মোন'গুলি উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারণে বুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তবৃত্তির পরিচয় অধিকতর প্রয়োজনীয়। আমরা সদানন্দ প্রকৃতির লোককে পছন্দ করি, কিন্তু কোন উদ্ধত বা নীরস প্রকৃতির লোককে পছন্দ করি না। চিত্তবৃত্তির সহিত সহ-

মনুষ্যদেহে বিভিন্ন গ্রন্থির অবস্থান।
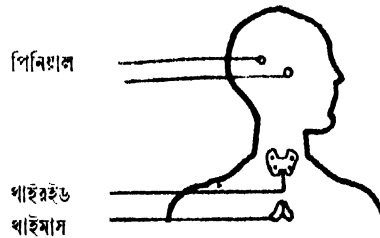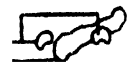
জাত বুদ্ধির (instinct) সম্বন্ধ অতি নিকট। সহজাত বুদ্ধির ব্যক্তিগত বিকাশকেই চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে। 'হর্‌মোনের' পরিমাণ ও প্রকার প্রধানতঃ সহজাত বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

'হর্‌মোন'গুলি অত্যন্ত শক্তিশালী পদার্থ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে আমাদের শরীরে 'থাইরইড' গ্রন্থি (thyroid gland) হইতে নিঃসৃত 'হর্‌মোনে'র পরিমাণ মাত্র ১ গ্রেনের পঞ্চমাংশের অধিক নহে।

এক বৎসরে আমরা এই 'হরমোন' প্রায় সাড়ে তিন গ্রেন মাত্র ব্যবহার করি, অথচ এই সামান্য পরিমাণ দ্রব্যের অভাবে আমরা নিতান্ত জড়বুদ্ধি হইয়া পড়িব। ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রকারের 'হরমোন' আছে। আমরা এখানে বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোনের আলোচনা করিব।

মস্তকের মধ্যস্থলে মস্তিষ্ক হইতে 'পিটুইটারী' গ্রন্থি (pituitary gland) বিলম্বিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থিটি সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় না হইলে লোকের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। দৈহিক এই অসঙ্গতির কারণ দূরীভূত করিতে না পারিয়া, অসঙ্গতি অন্য কোন উপায়ে পূরণ করিবার জন্য সকল সময় সচেষ্ট থাকার ফলে ব্যক্তিত্বের উপর ইহার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়।
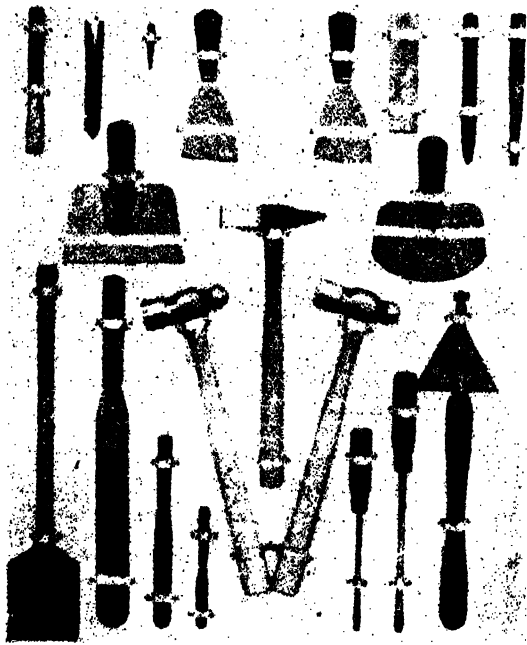
'বেরিলিয়াম'তামা নির্ম্মিত কয়েকটি স্ফুলিঙ্গহীন যন্ত্র। পরপৃষ্ঠা

যদি কোন কারণে 'পিটুইটারী' গ্রন্থি শিশুকাল হইতেই অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে দৈহিক আকার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। ১৭ বৎসর বয়সে আট ফুটেরও অধিক লম্বা ব্যক্তির কথা জানা গিয়াছে। শিশুকাল হইতে অতিমাত্রায় সক্রিয় 'পিটুইটারী'র ফলে দৈহিক বৃদ্ধি সর্ব্বাঙ্গীন হইয়া থাকে, কিন্তু এই গ্রন্থির অধিকতর সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে আরম্ভ হইলে দৈহিক বৃদ্ধি সর্ব্বাঙ্গীন না হইয়া কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং ব্যক্তিটি গোরিলার ন্যায় কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়ে। অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি আরম্ভ হইবার প্রারম্ভে ব্যক্তিটির শক্তি, সামর্থ্য ও উৎসাহ বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে 'পিটুইটারী' গ্রন্থির সক্রিয়তা যখন কমিতে থাকে, তখন তাহার কোন বিষয়ে একাগ্রতা থাকে না, কোন কাজ করিতে গেলে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং শারীরিক শক্তিও ঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারে না এবং শেষ পর্য্যন্ত অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোকের দলবৃদ্ধি করে।

'পিটুইটারী' হইতে নিঃসৃত অন্য একটি 'হরমোন' মানুষের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া মনে করা হয়। আধুনিক চিকিৎসকের মতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এই 'হরমোন' নিঃসৃত না হওয়ার ফলে যৌন ব্যাপারে অনেকে শিশুর ন্যায়ই থাকিয়া যায় এবং সকল ক্ষেত্রে না হইলেও, অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত গোঁড়া সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখা দেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার শক্তির অভাব তিনি পূরণ করিতে চান, সমস্ত জগতের লোককে নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিয়া এবং ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

'পিটুইটারী' হইতে অপর একটি 'হরমোন' নিঃসরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এই 'হরমোন'টিকে বলা হয় 'প্রোল্যাক্‌টিন্' (prolactin)। গর্ভস্থ শিশুকে খাদ্য সরবরাহ এবং মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার 'প্রোল্যাকটিন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন। বৈজ্ঞানিকরা আরও মনে করেন যে, মাতৃভাবও 'প্রোল্যাক্‌টিন' দ্বারা প্রভাবিত। ইঁদুরের উপর পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন ইঁদুর সন্তান প্রসব না করিয়াও কেবল 'প্রোল্যাকটিন' প্রয়োগের ফলে বহু ইঁদুরছানার লালনপালন করিতেছে।

গলার নীচের দিকে 'থাইরইড' গ্রন্থি অবস্থিত। এই গ্রন্থির রস 'থাইরক্‌-সিন'এর (thyroxin) সম্পূর্ণ অভাব ঘটিলে জীবনীক্রিয়া সকল অত্যন্ত স্বল্পগতি হইয়া পড়ে। 'থাইরক্‌সিন'-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উৎসাহহীন, জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ও অল্প-স্মৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় এই প্রকার লোকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু 'থাইরইড' গ্রন্থির সক্রিয়তার সামান্য বিকার বহু লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাল চিকিৎ-সকেরা পর্য্যন্ত ইহা ধরিতে পারেন না। এরূপ লোকের অনেক ক্ষেত্রেই মেদবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, যদিও সকল সময়ে এই নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়া এবং অতি সামান্য কারণে চটিয়া উঠা ইহার লক্ষণ। অল্প সময়ের জন্য হয়ত অনেকে নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু তাহা শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না। চিকিৎসকেরা যাঁহাদের 'নিউ-র‍্যাস্থেনিক' (neurasthenic)বা 'সাইকোনিউরটিক' (psychoneurotic) বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'থাইরক্‌সিন'-স্বল্পতায় ভুগিতেছেন। অবশ্য একমাত্র 'থাইরক্‌সিন'-স্বল্পতা ছাড়া অন্যান্য নানা কারণেও ইহা হইতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রথম কারণটি বর্ত্তমান সেখানে রোগের চিকিৎসা অতি সহজেই 'থাইরকসিন'-সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা করা যাইতে পারে। ১ গ্রেনের দশম ভাগ হইতে প্রায় ১ গ্রেন পর্য্যন্ত সাধারণ দৈনিক মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

'থাইরইড'-রসের অভাব অপেক্ষা উহার আধিক্য আরও অধিক পরিমাণে ক্ষতিকর। ইহার ফলে জীবনীক্রিয়া সকল এত দ্রুতগতি হইয়া পড়ে যে, অপরিমিত ভাবে অধিক আহার করিয়াও শারীরিক ক্ষয় পূরণ করা যায় না, ফলে কেবল এই কারণেই অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বক্ষোদেশের উপরিভাগে 'থাইমস' গ্রন্থি (thymus gland) অবস্থিত। ইহার ক্রিয়া বহুকাল হইতেই গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ইহার সঠিক তত্ত্ব মাত্র অল্পদিন হইল জানা গিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ 'থাইমস্' গ্রন্থির সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 'থাইমস'-রসের অল্পতা ঘটিলে লোক দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া থাকে। 'থাইমস্'-রস-প্রযুক্ত ইঁদুরের সন্তানগণের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অত্যন্ত দ্রুত উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। একমাস বয়সের উপযুক্ত বুদ্ধি তাহারা মাত্র কয়েকদিন বয়সের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। মনুষ্য-শরীরে 'থাইমস'-রস প্রয়োগের ফল কি তাহা এখনও পর্যাপ্ত পরীক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য জন্তুদের প্রতি প্রয়োগের ফলে বোধ হয় যে, যে সকল শিশু বয়সের অনুপাতে তৎপর নহে, তাহাদের চিকিৎসায় ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে।

মূত্রাশয়ের (kidney) ঠিক উপরে 'অ্যাড্রেনাল' (adrenal) গ্রন্থি অবস্থিত। ইহা হইতে নিঃসৃত রস 'অ্যাড্রেনালিন' (adrenalin) নামে সুপরিচিত। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে 'অ্যাড্রেনালিন' কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসে বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন না; কিন্তু কোন অসাধারণ অথবা আকস্মিক ঘটনা ঘটিলে 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হয় এবং তাহার প্রভাবে আমাদের প্রতিরোধ করিবার মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় থাকিলে কোন আকস্মিক ঘটনায় আমরা মুহ্যমান হইয়া পড়ি এবং যথাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি না। সভ্যতার উন্মেষের পূর্ব্বে আকস্মিক ঘটনা মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে দৈহিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন ঘটে সংযমের এবং পরিষ্কারভাবে চিন্তা করিবার শক্তির। বিপদে স্থৈর্য্য ও চিন্তা করিবার শক্তি ব্যক্তিত্বের একটি বড় অঙ্গ, সুতরাং ব্যক্তিত্ব-নির্দ্ধারণে 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থির প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।

'অ্যাড্রেনাল' হইতে 'কর্‌টিন্' (cortin) নামে আরও একটি 'হর্‌মোন্' পাওয়া যায়। ইহার ধর্ম্ম বিশেষভাবে জানা যায় নাই, তবে ইহার প্রভাব শরীরের সমস্ত জীবন্ত কোষের (cell) উপর আছে বলিয়া বোধ হয়। 'কর্‌টিন'-এর স্বল্পতা ঘটিলে 'অ্যাডিসনে'র রোগ (Addison's disease) বলিয়া এক প্রকার ব্যাধি হয়। এই রোগাক্রান্ত হইলে শারীরিক দুর্ব্বলতা, চাঞ্চল্য, অল্পে রাগিয়া যাওয়া, কোন বিষয়ে সহযোগিতা না করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে 'কর্‌টিন' প্রয়োগ করিলে রোগী শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠে এবং তাহার শক্তি ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে। দৈনন্দিন জীবনে 'কর্‌টিন'-এর প্রভাব কি তাহা এখনও পর্য্যাপ্ত বিশেষ জানা যায় নাই। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বর্দ্ধিতায়তন 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থির ফলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই পুরুষোচিত গুণ প্রকৃষ্টরূপে প্রকট হইয়া থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তির পৌরুষ নির্ভর করে 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থির উপর, কিন্তু 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি হইতে যে রস নিঃসারিত হইয়াছে, তাহার এরূপ কোন গুণ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

পরিশেষে যৌনগ্রন্থি (sex glands) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ (ovaries) ও পুরুষদের অণ্ডকোষ (testes) গুলিও গ্রন্থিবিশেষ এবং এই গুলিকে যৌনগ্রন্থি বলা হয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই গৃহপালিত পশুর যৌনগ্রন্থি বিনষ্ট করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অল্প বয়সে পশু অথবা মনুষ্যের যৌনগ্রন্থি ছেদন করিলে দেখা যায় যে, উত্তরকালে তাহাদের যৌন প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাব হইয়া পড়ে। অধিক বয়সে যৌনগ্রন্থি ছেদন করিলে কি ফল হয়, তাহা সকল সময় ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মেজাজের কোন স্থিরতা থাকে না এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অতি সামান্য কারণেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের উভয়েরই মেদবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

মাস্তুলযুক্ত এরোপ্লেন। পর পৃষ্ঠা
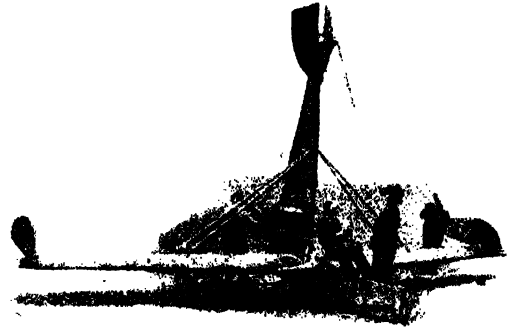
ব্যক্তিত্ব-নিরূপণে হর্‌মোনের প্রভাব যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হয় নাই, কিন্তু সংপ্রতি এদিকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

তামার নূতন ব্যবহার

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু পুরাতন জিনিষ নূতন কাজে লাগান হইতেছে। তামা ইহাদের মধ্যে একটি।

পূর্ব্বে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার সময় গলন্ত ইস্পাত লোহার পাত্রের উপর ঢালা হইত, কিন্তু আজকাল সেইস্থানে তামা ব্যবহার করা হইতেছে। ইস্পাত ২৭০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (fahrenheit) উত্তাপে গলিয়া যায়; কিন্তু মাত্র ১৯৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ তামা গলাইবার পক্ষে যথেষ্ট, সুতরাং গলন্ত ইস্পাত তামার উপর ঢালিলে তামা তৎক্ষণাৎ গলিয়া যাইবে মনে করাই স্বাভাবিক; পরীক্ষার ফলে কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, তাহা হয় না। ইহার কারণ তামার তাপ পরিচালনের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক এবং ফলে ইস্পাত অত্যন্ত শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তামার এই প্রকার ব্যবহারের ফলে ইস্পাত প্রস্তুতের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে, কারণ লোহার দামের অপেক্ষা তামার দাম বেশী হইলেও তাহা বহুবার ব্যবহার করা

চলে। পূর্ব্বে যখন ইস্পাত ঢালিবার জন্য ঢালাই লোহার পাত্র ব্যবহার করা হইত, তখন পাত্রগুলি ৮০ বারের অধিক ব্যবহার করা চলিত না, কিন্তু তামার পাত্র ১০০০ বার ব্যবহার করা চলে।

কেন্দ্রাপসারী বাত্যাযন্ত্র (centrifugal blower) চালিত এরোপ্লেন।

বহু প্রকার নূতন ধাতুশঙ্করে (alloys) তামা ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে 'সিলিকন'-তামা (silicon-copper) ও 'বেরীলিয়ম' তামা (beryllium-copper) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধাতুশঙ্করগুলির প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা ইহাতে কোনরূপ মরিচা পড়ে না এবং ইহাদের দৃঢ়তা (strength) অত্যন্ত অধিক। 'বেরীলিয়ম'-তামা সেইজন্য নানা প্রকার 'স্প্রিং' (spring) ও স্ফুলিঙ্গহীন যন্ত্রাদি (non-sparking tools) তৈয়ারী করিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

তামা বাতাসে রাখিয়া দিলে তাহাতে এক প্রকার সবুজ রঙের মরিচা পড়িয়া যায়। একবার মরিচা পড়িয়া গেলে ভিতরের তামার আর কোন ক্ষতি হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে তামার চাদর দিয়া ছাদ ঢাকিবার প্রথা বহুদিন হইতে বর্ত্তমান এবং পুরাণো বাড়ীর ছাদে এই প্রকার সবুজ মরিচা অনেকেই পছন্দ করেন। স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ মরিচা পড়িতে ২০ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু রাসায়নিকদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ মরিচা পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তামা হইতে রঙ বা 'তরল তামা' প্রস্তুত করা হইয়াছে (এ প্রসঙ্গে শ্রাবণের 'বঙ্গশ্রী' দ্রষ্টব্য) এবং ইহার বহুল প্রচলন হইলে 'ইলেক্ট্রোপ্লেটিং' এর (electroplating) ব্যবহার কমিয়া যাইবে।

বাতাসে তামার উজ্জ্বল্য অবিকৃত থাকে না বলিয়া তামার উপর কলাই বা মিনা (enamel) করিবার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে তামার উপর যে কলাই করা হইত তাহা অত্যন্ত ভঙ্গুর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ইহা স্থিতিস্থাপক হইয়াছে। ইহাতে নানা প্রকার স্বচ্ছ রঙ ফলান যাইতে পারে। অলঙ্করণ-শিল্পে ইহার বহুল প্রচলনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

তামার চাদরের উপর উদ্গাত চিত্র (relief design) বা কর্ত্তিত চিত্র (openwork tracery) আঁকিবার একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক খণ্ড লেস(lace) বা সুতার 'ডিজাইন' রবারের আঠায় (latex) নিমজ্জিত করিয়া একখণ্ড তামার উপর রাখা হয়; তাহার পর উহার উপরে অতিশয় বেগে প্রক্ষিপ্ত বালির ধারা (sand blast) দেওয়া হয়। যেখানে ডিজাইনটি আছে তাহার উপর স্থিতিস্থাপক রবারের আস্তরণ থাকায় বালি সেখান হইতে প্রতিহত হইয়া চলিয়া আসে, কিন্তু অন্যস্থানে ক্রমশঃ গর্ত্ত হইয়া যায়। ইচ্ছানুসারে বালির স্রোত বন্ধ করিলে উদ্গাত চিত্র অথবা কর্ত্তিত ছবি পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, ইস্পাতে বহুল পরিমাণে তামা ব্যবহৃত হইতেছে এবং তামার সাহায্যে নানা প্রকার বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ইস্পাত (special steel) তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে।

কয়েকটি বিচিত্র এরোপ্লেন

ছবি (৫৪৩ পৃষ্ঠা) দেখিলে বোধ হয় যে, এরোপ্লেনটি উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এরোপ্লেনটির ডানার উপর একটি মাস্তুলের মত জিনিষ সোজা উপরে উঠিয়াছে,—উড়িবার সময়ে ইহা এইরূপ অবস্থাতেই থাকে। এরোপ্লেনটির নির্ম্মাতা জনৈক ফরাসী। ডানার দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট এবং এরোপ্লেনটির ওজন মাত্র ৫ মণ। একটি ২৫ অশ্বক্ষমতার ইঞ্জিনের সাহায্যে এরোপ্লেনটি চালিত করা হয়। ডানার ঠিক উপরে চালকের আসন।

জনৈক মার্কিন সৈনিক কর্ম্মচারী আর একটি নূতন ধরণের এরোপ্লেন পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার ডানা একটি উলটানো পিরিচের মত। একটি কেন্দ্রাপসারী বাত্যাযন্ত্রের (centrifugal blower) সাহায্যে ডানার উপর হইতে বাতাস টানিয়া লওয়া হয় এবং সেই বাতাস ডানার তলায় সজোরে প্রতিহত হয় এবং তাহার ফলে এরোপ্লেনটি উপরে উঠিতে সক্ষম হয়। সম্মুখ
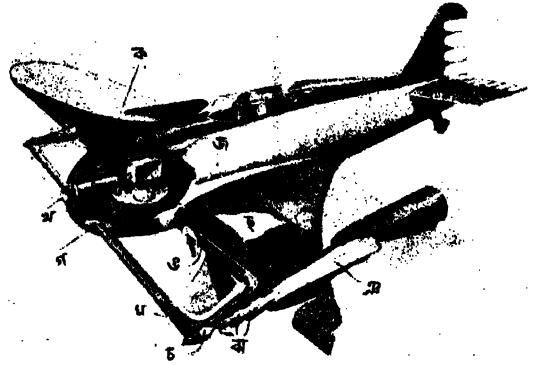
রকেট এরোপ্লেন: (ক) জলীয় বাষ্পের সাহায্যে সংকোচন-কক্ষে (compression chamber) প্রবিষ্ট বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করা হইতেছে (খ) বাতাসের প্রবেশ-পথ (গ) 'কনডেনসারে'র মধ্যে সংকুচিত বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প পৃথক্ করা হইতেছে (ঘ) নলের সাহায্যে সংকুচিত বাতাস বার্ণারে (burner) নীত হইতেছে (ঙ) বাতাসচালিত জ্বালানী তৈলের পাম্প (চ) এই স্থানে বাতাস ও তৈলের মিশ্রণ জ্বালান হয় (ছ) জ্বালানী তৈল রাখিবার আধার (জ) তৈলচালিত বয়লার (ঝ) সম্পূর্ণ দহনের জন্য অতিরিক্ত বাতাস আসিবার পথ (ঞ) বাষ্পের প্রতিঘাতে এরোপ্লেনটি সম্মুখে চালিত হইতেছে (ট) বার্ণারে তৈল যাইবার নল।

দিকে চালিত করিতে হইলে সম্মুখের কয়েকটি ছিদ্র বিশেষ পরদা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং বাতাসের প্রতিঘাতের ফলে যন্ত্রটি সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় এরোপ্লেনটিও জনৈক ফরাসী আবিষ্কারক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার

নির্ম্মাণকৌশল অনেকটা রকেটের (rocket) মত এবং প্রকাশ যে, ইহাতে ঘণ্টায় ৬০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বেগ সৃষ্টি করা যাইবে। প্রচলিত অর্থে আমরা যাহাকে 'মোটর' (motor) বলি ইহাতে সেইরূপ কিছু নাই। দুই পার্শ্বে স্থিত দুইটি মুখনলে (nozzle) জ্বালানী তৈল ও বাতাসের মিশ্রণ প্রেরণ করা হয়। এই মিশ্রণটি জ্বালাইলে আগুন ও বিপুল চাপে অবস্থিত গ্যাস পিছন দিকে ধাবিত হয় এবং তাহার প্রতিঘাতে যন্ত্রটি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য কোনরূপ 'পাম্প' (pump) বা 'কমপ্রেসর' (compressor) ব্যবহার করা হয় না। তৈল-চালিত 'বয়লার' (boiler) হইতে বিপুল বেগে নির্গত জলীয় বাষ্প এবং বাহির হইতে বাতাস টানিয়া লইয়া একটি সংগ্রাহকের (condenser) মধ্য দিয়া বাতাস ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ চালিত করিলে জলের বাষ্প পুনরায় জলে পরিণত হয় এবং সঙ্কুচিত বাতাস (compressed air) তৈল জ্বালাইবার কাজে লাগান হয়।

গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী 'ওজোন' প্রস্তুতের যন্ত্র।

জল বিশুদ্ধ করিবার নূতন ব্যবস্থা

সংপ্রতি কলিকাতা শহরের পানীয় জল সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের পৌরসভা ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশে 'ওজোনে'র (ozone) ব্যবহার সুপ্রচলিত, কিন্তু 'ওজোন' সাহায্যে জল বিশুদ্ধ করিতে বিরাট যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সংপ্রতি গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী একটি ক্ষুদ্র 'ওজোন' প্রস্তুত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে অতি অল্প ব্যয়ে জল বিশুদ্ধ করিতে পারা যাইবে। যন্ত্রটির আকার মাত্র ১৯×৮½×৬½ ইঞ্চি। ১১০ 'ভোল্ট' (volt) চাপের বৈদ্যুতিক শক্তি 'ট্রান্সফরমার' (transformer) সাহায্যে ৮৫০০ ভোল্টে পরিবর্ত্তিত করা হয়। একটি কাচখণ্ডের একদিকে এলুমিনিয়ম্ ও অপর দিকে তামার 'ইলেকট্রোড' (electrode) আছে। কাচ ও এলুমিনিয়মের মধ্যে অল্প পরিসর আছে। এই পরিসরের মধ্য দিয়া বাতাস চালিত করা হয়। নিঃশব্দ বৈদ্যুতিক প্রবাহ (silent electric discharge) যখন তামা ও এলুমিনিয়মের মধ্য দিয়া চালিত হয়, তখন বাতাসের অক্‌সিজেন (oxygen) 'ওজোনে' (ozone) পরিণত হয়। আগমন-নলে জলের সহিত 'ওজোন' মিশ্রিত হইয়া যায় এবং জল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। পরিস্রুত জল সকল প্রকার বীজাণু, জীবাণুর
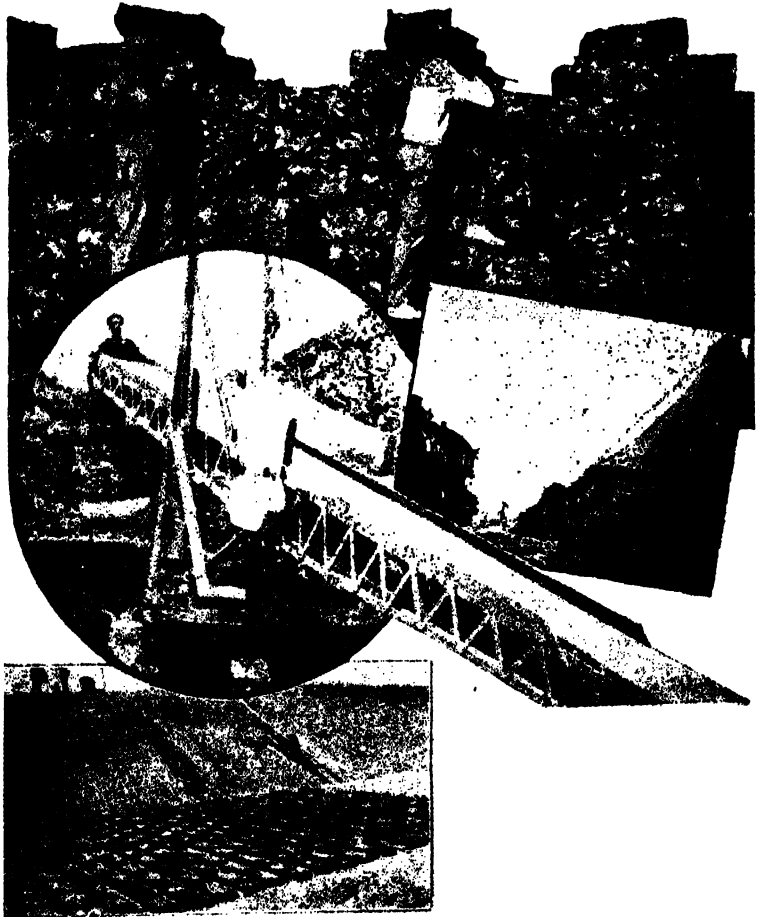
উপরে—টিনের কৌটা হইতে নির্ম্মিত গুলিনিবারক আশ্রয়। মধ্যে বামে—এই 'কনভেয়ারে'র (conveyor) সাহায্যে টিনের কৌটা হইতে প্রস্তুত ইট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। মধ্যে দক্ষিণে—গুলিনিবারক কুটীর। নীচে—নদীর পাড় ভাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য এই ভাবে ইটগুলি সাজান হয়। [পর পৃষ্ঠা

(micro-organism), বর্ণ ও গন্ধ হইতে নির্মুক্ত হয়।

পুরাতন টিনের কৌটার ব্যবহার

টিনের কৌটার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমরা সাধারণত তাহা ফেলিয়া দিয়া থাকি, কিন্তু সংপ্রতি টিনের কৌটা কাজে লাগান হইতেছে। আমরা টিনের কৌটাই বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু টিনের কৌটাতে 'টিন' বা রাঙের পরিমাণ শতকরা দুই ভাগেরও অল্প, বাকি সমস্তই অংশই ইস্পাতের চাদর। টিনের কৌটাগুলি প্রথমে গরম করিয়া শুখাইয়া লওয়া হয় এবং টিনের গায়ের লেবেলগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহার পর বিপুল চাপ প্রয়োগে কৌটাগুলি বিভিন্ন আকারের ইটের মত করা হয়। এই প্রকার ইস্পাতের ইট দিয়া বন্দুকের গুলি-নিবারক ঘর তৈয়ারী করা যায়। মাঞ্চুরিয়ার ডাকাতের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য এরূপ বহু ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। জলের স্রোতের বেগে যাহাতে নদীর পাড় ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সে জন্যও এইরূপ টিনের কৌটা হইতে নির্ম্মিত ইট ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক ইটে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে একটি ইস্পাতের দণ্ড চালাইয়া দিয়া শিকলের মত তৈয়ারী করা হয়; এইগুলি নদীর তলায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পুঁতিয়া রাখিলে স্রোতের বেগ কমাইয়া দেয়।

জ্বরের উপকারিতা

কোন চিকিৎসক যদি রোগীর জ্বর আরাম করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্বর আনয়নের চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমরা হয়ত তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিব। কিন্তু সংপ্রতি চিকিৎসকদের গবেষণার ফলে দেখা যাইতেছে যে, জ্বরেরও উপকারিতা আছে এবং ইহার সাহায্যে রোগ আরাম করা সম্ভব। ভিয়েনার ডাক্তার ভাগনের ফন্ য়াউরেগ্ (Wagner von Jauregg) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, ম্যালেরিয়ার তীব্র জ্বর উপদংশ রোগ আরাম করিতে পারে। তাহার পর বহু চিকিৎসক কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করিতেছেন। বিদ্যুৎ-প্রবাহ, অতি অল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, (short radio waves) গরম জলে স্নান প্রভৃতি নানা উপায়ে রোগীর দৈহিক উত্তাপ এত বৃদ্ধি করা হইতেছে যে, পুরাতন পন্থীদের মতে তাহা বিপজ্জনক। জ্বর সৃষ্টি করিবার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক উপায় 'এয়ার-কণ্ডিশনিং' (air conditioning) অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে কক্ষস্থ বায়ুর উত্তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা। সংপ্রতি জনৈক আমেরিকান চিকিৎসক এফ্. ডব্লিউ. হার্টমান (Dr. F. W. Hartman) এই প্রকার একটি যন্ত্র প্রদর্শিত করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত ইহা বাজারে দেখা দেয় নাই, তবে শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়,—দাম পড়িবে আন্দাজ ১০০৲ টাকা। পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা মনে মনে করিতেন যে, জ্বরের সময় দৈহিক উত্তাপ অধিক হওয়ায় রোগের বীজাণু মরিয়া যায়। কিন্তু এখন তাঁহাদের ধারণা এই যে, উত্তাপের ফলে দেহের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ করিবার যে সকল ব্যবস্থা আছে সেগুলি আরও সক্রিয় হইয়া উঠে।

কলের দুরমুশ

জার্ম্মানীতে রাস্তা পিটিবার জন্য এক প্রকার কলের দুরমুশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিতরে বিস্ফোরণের ফলে ইহা শূন্যে লাফাইয়া উঠে ও সম্মুখে অল্প একটু আগাইয়া যায়। বেনজল (Benzol) বাষ্পের সাহায্যে প্রতি মিনিটে প্রায় ষাট বার করিয়া ইহা লাফাইতে পারে। যন্ত্রটি অত্যন্ত ভারী, কিন্তু ইহা চালাইতে মাত্র ১ জন লোকের আবশ্যক হয়।

ইংলণ্ডের শিক্ষা

ইংলণ্ডের ফ্যাসান সম্পর্কে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছিলেন, "এখানে মনুষ্যজীবন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিতব্যয়ী ও আলস্যপরায়ণ, পোষাক-বিক্রেতা ও দর্জ্জী এবং ফুলবাবু ও মূর্খ স্ত্রীলোকেরাই এখানে মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রণ করে।"

যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তুত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ খেলো বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক্!……

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

আষাঢ়ের মেঘনিবিড় অপরাহ্ণ। একখানি কোমল কাল সজল মেঘের ছায়ায়, রৌদ্রদীপ্ত কলিকাতা সহরটির উপর স্নিগ্ধতার আবরণখানি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। কলেজ ফেরৎ মীরার গাড়ী বাড়ীর লাল সুরকী ছড়ানো রাস্তাটি অতিক্রম করিয়া, ড্রয়িংরুমের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া থামিতেই মীরা ত্বরিতহস্তে আপনিই দ্বার খুলিয়া নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে তাহার মাসতুত বোন রমা বেড়াইতে আসিয়া ক'দিন হইতে এখানেই ছিল, মীরার মা বসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, মীরা তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলপদে ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, পানু দা কখন এল মা!

—পানু দা? পানু দা কোথায়? কে বললে পানু এসেছে?

—বাঃ রে, ঠাট্টা করছ বুঝি? আমি নিজে দেখলাম পানুদাকে।

মায়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, কহিলেন, আর কাউকে দেখেছিস হয়ত, পানু কই? পানু ত আসে নি, কোথায় দেখলি? বিস্ময় মীরারও কিছু কম হয় নাই, কলেজ হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ একবার একটা রাস্তার মোড়ে যাকে চোখে পড়িল, সে কি তবে পানু দা নয়? কি অসম্ভব ব্যাপার! দুজনে চোখোচোখি হইতে মীরা মুখ বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতে যাইতেই মুহূর্ত্তে সে হঠাৎ একটি গলির ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল,—রাত্রি নয়, স্বপ্ন নয়,—দিনের আলোয় এমন পরিষ্কারভাবে তাহাকে দেখিয়াও মীরা তাহাকে চিনিতে ভুল করিবে? সমস্ত রাস্তাটা মীরা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে হঠাৎ চমকিত করিয়া দিতেই পানুর এই লুকোচুরি খেলা! কিন্তু তবু এ পানু দা নয়? মুহূর্ত্তে মীরার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গিয়া অনেকগুলি কথা মনে পড়িয়া গেল, সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগের দিনের রাত্রিটার কথা। কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা হবে মা, আর কাউকেই ভুল করেছি—কিন্তু বাঃ তোমরা যে সব বসে রয়েছ মা, এখনো চা-টা খাবে না বুঝি আজ? পাঁচটা বেজে গেল যে।

রমা কহিল, তুই কাপড় ছেড়ে আয় না, তোর জন্যেই ত আমরা বসে আছি।

—এই যে যাচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে আমার! বাবার টিফিন ঠিক সময় গেছ্‌ল মা?

নিতান্তই সহজভাবে কথাগুলি বলিয়া মীরা তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। আরো মিনিট পনের পরে রমা তাহাকে এ ঘর হইতে দুই তিনবার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া, যখন পর্দ্দা সরাইয়া মীরার ঘরে ঢুকিল, তখনও মীরার কাপড় ছাড়া হয় নাই, টেবিলের উপর নোটবুক ও বইখানি রাখিয়া নিতান্তই অন্যমনস্কভাবে টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া, হাতের পেন্সিলটি টেবিলের উপর ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চক্ষু দুটি মুদিয়া যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কিসের সন্ধান করিতেছে।

—ওরে মীরু।

—কি ভাই?

—বেশ ত! কি করছিস তুই, ওদিকে চা ঢেলে টেবিলে আমরা সব বসে রয়েছি, জুড়িয়ে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল যে!

—ওমা তাই নাকি?' এই যে হয়ে গেল আমার রমা দি, ইংলিশের প্রফেসর কিসের যেন টাস্ক একটা কালকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন ভাই, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

যথারীতি হাসি-গল্প এবং রহস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে চা'পান শেষ হইল, তাহার পর চাকর ঠাকুরদের জলখাবার ইত্যাদি দিয়া মীরা একটি গানের কি একটি লাইন গাহিতে গাহিতে বাগানে নামিয়া গেল। মা রান্নার তদারক করিয়া আসিয়া উপরের বারাণ্ডায় গিয়া সেলাই লইয়া বসিলেন, রমা একখানি ডিটেকটিভ নভেল হাতে মাসীর পাশে আসিয়া বসিল, কাছেই খেলায় রত তাহার সুসজ্জিত সুন্দর পাঁচ বছরের পুত্রটির পানে মাঝে মাঝে তাকাইতে তাকাইতে মীরার মা'র বহুদিনের পূর্ব্বের একটি স্মৃতি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

বাগানে গেটের কাছে কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মীরা অন্যমনস্ক মনে যুঁই বেলি তুলিয়া আঁচল ভরিয়া তুলিল, মালী দূরে বসিয়া নূতন ফুলগাছ লাগাইবার জন্য মাটী খুঁড়িতেছে, মাঝে মাঝে উপরে মুখ তুলিয়া আকাশের পানে তাকাইতে তাকাইতে হাতের জোর তাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, মীরা মালীর দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিল, চার পাশের ছড়ানো মেঘগুলি মাথার উপরে ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া আকাশটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, যে কোন মূহুর্ত্তেই নামিয়া আসিয়া পৃথিবীটিকে চাপিয়া পিষিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেই যেন তাহার সকল আয়োজন। শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আকাশের আসন্ন বর্ষণোন্মুখ জমাট কাল মেঘগুলির পানে তাকাইয়া থাকিয়া মীরা আবার ধীরে ধীরে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় কত লোক, ভীত সন্ত্রস্ত-দৃষ্টিতে উর্দ্ধে আকাশের পানে বারবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া সকলেরই চরণের গতি বাড়িয়া যাইতেছে, বাহিরের কাজের আকর্ষণে যে যেখানে গিয়াছিল আসন্ন রাত্রির দারুণ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা সকলকেই গৃহে তাহার ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকুর কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। একটি পুষ্পিত রক্তকরবীর আড়ালে, মীরা রাস্তার ব্যাকুল জনতার পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—মনটা কেন যেন কি রকম হইয়া উঠিয়াছে, মেঘলা দিনের এই শীতল হাওয়ার স্পর্শ টা মানুষের মনটায় কি বিশ্রী একটা বিরসতার সৃষ্টি করিয়া দেয়!

গেটের বাহিরে বেঞ্চির উপর দ্বারোয়ান বসিয়া ছিল, পিওন আসিয়া তাহার হাতে একটি চিঠি দিয়া গেল।

একখানি পোষ্টকার্ড, ফুলপুর হইতে সুরেন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, মীরা এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, পুত্রের ব্যবহারে তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের আর সীমা নাই, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার লজ্জায় সে এবার আর কিছুতেই তাহার মায়ের সম্মুখে যাইতে রাজী হইল না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই এবার তাহাকে তাঁহার নিজের গৃহে রাখিতে হইল। তাহার পর আরও অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পুত্র যদিও তাঁহার, তথাপি তাহার জন্মাবধি এতকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই, সে ভার যাঁহার হাতে ছিল পানুর সেই মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ হইতে এখনও সে বঞ্চিত হইবে না, ইহাই তাঁহার আশা।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেইখানে দাঁড়াইয়াই মীরা বারবার করিয়া কতবার চিঠিখানি পড়িল, পানু দা এইবারে তাহাদের আশ্রয় সত্যসত্যই ছাড়িয়া গেল।

যাক্ ভালই হইল, বাবাও আজকাল আর পছন্দ করিতেন না বেচারাকে।

চিঠিখানি মালীর হাতে মার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, মীরা খুরপী হাতে মালীর পরিত্যক্ত কাজে বসিয়া গেল।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে কখন্ এক সময়ে প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল, মীরা তবু উঠিল না, মালী আসিয়া সবিস্ময়ে দুই তিন বার খুরপী চাহিয়া চাহিয়া, অবশেষে সম্মুখেই একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া কোন প্রকারে নিজেকে প্রবল বৃষ্টির ধারা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মীরা কিন্তু ভিজিতেই লাগিল। অবশেষে রমা যখন ছাতা মাথায় দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মীরা মুখ তুলিয়া চাহিয়া নিতান্তই ছেলেমানুষের মত হাসিয়া কহিল, ভিজতে কি চমৎকার লাগছে রমা দি।

—হাঁ, চমৎকার লাগছে, কি মেয়েই তুই হয়েছিস মীরু! জানিনে বাপু, ওঠ, চুলটুল ত সব গেছে একেবারে, এখন এই একগোছা চুল রাত্তিরে শুকুবে কি করে? মাসীমা বাপু, আদরে আদরে মাথাটি তোর খেয়েছেন একেবারে।

—না গো না, মাথাটি ঠিকই আছে, চল, ওরে জগন্নাথ, তুইও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিস? যা, যা, ঘরে যা।

মালী তাহার স্বদেশী ভাষায় বহুসংখ্যক সুমিষ্ট বুলি উচ্চারণ করিতে করিতে ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

দুই বোনে ছাতা মাথায় দিয়া দ্রুতপদে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, রমা ছাতা বন্ধ করিতে করিতে কহিল, মাসীমা ত ফেন্ট (faint)!

—কেন?

—পানুর বাবার চিঠি পড়ে', তুই পড়িস নি সে চিঠি? মালী ত এ দিক থেকেই নিয়ে গেল।

—ওঃ! পানু দার বাবার চিঠি? তা কি হয়েছে? বড় হয়েছে ত, কতদিন আর পরের বাড়ী থাকবে? ওরই কি তা' ভাল লাগে নাকি?

সবিস্ময়ে রমা ঘাড় ফিরাইয়া মীরার পানে তাকাইল। অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া মীরা হাতে জড়াইয়া জড়াইয়া

চুলের জল ঝরাইবার চেষ্টা করিতেছে, রমা কহিল, আশ্চর্য্য রকমের পাষাণ মেয়ে তুই মীরা, আমারই কেমন লাগছে, কত ছোট্ট থেকেই দেখে আসছি ওকে এখানে, কত আপনার মত, আর তুই বলছিস, কি আর এমন হয়েছে তাতে! তোর একটুও লাগে না?

মীরা মুখ তুলিয়া হাসিতে লাগিল। রমা বিরক্ত হইয়া কহিল,—থাম বাপু, হাসির যদি তোর আর মাথামুণ্ড কিছু থাকে! চল ওপরে, কাপড় জামা ত সব একেবারে গেছে ভিজে, জ্বর না হলে হয় এখন।

উভয়ে নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেল, বারাণ্ডায় মা তখনও সেই একই ভাবেই চিঠিখানি হাতে বসিয়া আছেন, কন্যার পানে তাকাইয়া কহিলেন, দেখেছিস ওর কাণ্ডখানা মীরু।

মীরা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া কহিল, তাতে তুমি এরকম করছ কেন মা, যাবে না ও কোন-দিন নিজের বাড়ী?

—তা বলে এখনি গিয়ে একলা থাকবার ওর সময় হয়েছে? কি যে তুই বলিস!

—ওর চেয়ে ছোট বয়সে ছেলেরা বিদেশে বোর্ডিংএ গিয়ে থাকে না মা? তা ছাড়া পারবে তুমি চিরকাল ওকে নিজের কাছে রেখে দিতে?

রমা তাড়া দিয়া কহিল, যাঃ যাঃ তোর আর সর্দ্দারী করতে হবে না এখানে দাঁড়িয়ে, জলে যে বারাণ্ডা ভিজে গেল একেবারে, যা বাথরুমে গিয়ে হাতপায়ের কাদা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আয় গে যা, আমি ততক্ষণ একটু চা করি, যা বৃষ্টি নেমেছে!

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলে মীরা যখন বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল, বারাণ্ডার এক পাশে মা তখন একটি ইজিচেয়ারে শুইয়া আছেন, আর ফুটন্ত জলের কেটলী ষ্টোভের উপর বসাইয়া রাখিয়া রমা তাহার পাশে বসিয়াই তাহার অর্দ্ধ সমাপ্ত ডিটেক্‌টিভ নভেলটির খুবই একটা আতঙ্কজনিত ঘটনার উপর উৎকণ্ঠিত চিত্তে মনোনিবিষ্ট হইয়া আছে, দ্বার খোলার শব্দে মুখ তুলিয়া মীরার পানে চাহিয়াই সে চমকিত হইয়া কহিল, কি সর্ব্বনাশ! চোখ মুখ যে একেবারে ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে মীরু, কলতলায় বসে এক ঘণ্টা ধরে খুব বুঝি নেয়ে এলি?

মীরা উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিয়া কাপড় মেলিতে চলিয়া গেল। মা মুখ তুলিয়া একটিবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন, ওর কি বুদ্ধি আছে কিছু! ওই রকমই করে ও যখন যা ইচ্ছে।

ওপাশের পিছনের বারাণ্ডায় কাপড় মেলিয়া দিয়া, মীরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারের ভিতরে বৃষ্টি ঝরার একটা করুণ রূপের পানে তাকাইয়া রহিল, বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে বাগানের এই দিকটার আলো সাধারণতঃই জ্বালানো হয় না, ওদিক হইতে আলো পড়িয়া যেখানটায় অন্ধকার সামান্য একটু হাল্কা হইয়াছে, সেই দিকে তাকাইয়া মীরা দেখিতে লাগিল, দেওয়ালের পাশের গোটাকতক দেবদারু গাছ, কয়েকটি পুষ্পিত অন্য ফুলের গাছ মাথাটি একটু নীচে হেলাইয়া কেমন নিঃশব্দে তখন হইতে কেবল ভিজিয়াই চলিয়াছে। মীরার মনে মনে উহাদের জন্য বেদনা বোধ হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, মানুষের অজ্ঞাত যে একটি মূকপ্রাণ দিবারাত্র ইহাদের ভিতরে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সঞ্চিত সকল বেদনা কি এক একদিন এমনি করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে থাকে? পৃথিবীর এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, এত ফুল ফল হাসি নাচ গান প্রকৃতির বুকে চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ব্যথাও ত কম নহে!

চা খাইতে খাইতে মা ও রমা যখন পানুর বিষয়েই কথা কহিতেছিলেন, মীরা তখন চা পান শেষ করিয়া রমার পুত্র মণ্টুর পাশে গিয়া বসিল। মণ্টু তাহার সদ্যোক্রীত রেল-গাড়ীটি লইয়া গভীর গবেষণায় মগ্ন, গাড়ীর চেয়েও গাড়ীটির ভিতরে ইঞ্জিনের যে বাঁশীটি আছে, সেইটিই মণ্টুর মনোহরণ করিয়াছিল বেশী এবং কি প্রকারে সেই বাঁশীটি বাহির করিয়া আনা যায় তাহাই হইয়াছিল তাহার চিন্তার বিষয় এবং সেই জন্যই মাঝে মাঝে কখনও দরোজার চৌকাঠে কখনও টেবিলের পায়ায় বা বারাণ্ডার রেলিংএ গাড়ীটি ঠক্ ঠক্ করিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছিল। মীরা গিয়া সেইখানে বসিল, তাহার পর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ছেলেটির সঙ্গে খেলা করিয়া, কখনও তাহাকে হাসাইয়া, কখনও কাঁদাইয়া, সম্মুখোপবিষ্ট অপর দুইটি প্রাণীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া মীরা নিজের গৃহে পলাইল

এবং নীচে পিতার গাড়ী থামিবার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত আর বাহির হইল না।

[১৮]

দিন দশ বার পরের কথা।

কলেজ হইতে ফিরিয়া শ্রান্ত পানু চা খাইয়া, বাগানের গাছতলায় ইজি চেয়ারটিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা রাস্তার উপর মোটর থামিবার শব্দ এবং সুতীক্ষ্ণ সুমিষ্ট একটি কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। গাড়ীর উপর হইতে কে হাসিয়া কহিতেছে, ঐ যে পানু দা ঘুমুচ্ছে মা, গাছতলায়! পানু দা ও পানু দা।

পানু সচকিতে সবিস্ময়ে অগ্রসর হইয়া আসিয়া গাড়ীতে যাহাদের দেখিতে পাইল, এই সময়ে এই অবস্থায় একবারও সে ইঁহাদের আশা করে নাই, কম্পিত হস্তে দরজা খুলিয়া সে মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। মা অতি ধীর কোমল কণ্ঠে কহিলেন—পানু! তারপর কন্যার পানে ফিরিয়া কহিলেন, নাম মীরু, চল ভিতরে যাই। মায়ের পশ্চাতে মীরা নামিয়া হাসিয়া কহিল, পানু দা ত দেখছি গাছতলায় বেশ একটি কুঞ্জ কুটীর সাজিয়ে নিয়ে তোফা কবি হয়ে বসে আছ, সেই গানটা জান ত'—সেই যে—"কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে অতিথি এসেছে আজ—!" মা হাসিলেন, পানুও হাসিতে লাগিল এবং এই হাসির ভিতর দিয়াই ব্যাপারটা সহজ হইয়া উঠিল।

—বাঃ বেশ ত' সুন্দর ফুলগুলি, ফুলদানীটিও চমৎকার, বাঃ, এত চমৎকার করে' কে সাজিয়ে রেখেছে পানু দা? তুমি?

—কেন, আমি কি সাজাতে জানিনে না কি কিছু?

—হ্যাঁ তুমি বই কি, মালী ফুল তুলে এনে সাজিয়ে রেখে গেছে, আর তোমার হাতটি এখনো এতে পড়ে নি, নিশ্চয়, তাই সুন্দর রয়েছে, তোমার বাঁশীটি কই পানু দা?

—এই যে দেখ না, ভাঙ্গিনি এখনো, তুমি যে রিবণটি বেঁধে দিয়েছিলে, দেখ মীরু, এখনো তেমনি চক্‌চকেই রয়েছে।

—ওমা, তাই ত! মীরা হাসিতে লাগিল।

মা চেয়ারে বসিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন, কহিলেন—হ্যাঁরে পানু ফেল্ কি কোন ছেলে হয় না, আর তার জন্যে বাড়ী ঘর ছেড়ে পালায় না কি সবাই?

পানু এক পাশে দাঁড়াইয়া নিরুপায় ভাবে হাসিতে লাগিল।

—এসেছিস, তা একখানা চিঠি পর্য্যন্ত নেই, তোর বাবাকে চিঠি লিখে এ বাড়ীর ঠিকানা আনালুম, ক'দিন মনটা কি ছট্‌ফট্‌ই করেছে! হ্যাঁরে পানু, কি করে চলে এলি, একটু মায়া পর্য্যন্ত হ'ল না তোর আমাদের জন্য?

—না মা তা নয়, কি যে তুমি ব'লছ সব,—

পানুর গলার স্বর কাঁপিয়া বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে জোর করিয়াই সে কেবল হাসিতেই লাগিল। মা কহিলেন, তা নয় যদি তবে চল আমার সঙ্গে, আমি তোকে নিতেই এসেছি।

পানু বিপন্ন হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা কহিলেন, 'চল তবে, বই টইগুলো বেঁধে টেধে নিয়ে উঠে পড়, আর কিছু নেবার দরকার নেই।

—না মা, আমি যাব, তবে এখন নয়, দিনকতক থাকি না মা একটু দূরে, একটু অভ্যেস হোক, তুমি ছাড়া যে একদণ্ড আমার চলে না সেটা একটু সইয়ে নিই।

করুণ আর্দ্র স্বরে মা কহিলেন, সইয়েই যে নিতে হবে তার এমন কি কথা আছে, বাছা।

—'না মা, মনে কর দূরে বিদেশে কখনও যেতে হলে, কি কষ্ট তখন হবে বল ত', এখন থেকে, তোমার কাছে কাছে থেকেই সইয়ে নিই, যখন ইচ্ছে হবে, যাব আসব—এই ত এতটুকু রাস্তা মা, কতক্ষণই বা যেতে আসতে লাগে, কত ছেলে কত ছোট বয়সে বোর্ডিং স্কুলে যায়, তাদের মা'রা কি করে থাকে মা?

কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া নিয়া মা কহিলেন, তুই বড় পাষাণ পানু।

পানু সরিয়া আসিয়া মার চেয়ারের হাতলে বসিয়া কহিল, আমি তোমার দুরন্ত অবাধ্য বুনো ছেলে মা।

যে জল মা কষ্টে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইবারে চক্ষু ফাটিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, চল্ তোর রান্নাঘর দেখে আসি।

বাড়ীর চারিদিকে দেখিয়া, ঠাকুরের রান্নাঘরের বাসন কোসন হাঁড়ি কড়াই সকল কিছুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে

ঠাকুর চাকরকে মিষ্ট মধুর ভাবে বার বার উপদেশ দিয়া, মা দ্বিতলে পান্নুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।—মূল্যবান বৃহৎ একখানি পালঙ্কের উপর মলিন একখানি ক্ষুদ্র শয্যা এলোমেলো ভাবে পাতা রহিয়াছে, অল্পবয়স্ক প্রভুটির অমনোযোগিতার সুযোগ পাইয়া, চাকররা এই দিকটায় বোধ করি একবারও আসে না—মায়ের বক্ষখানি আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। আরও মিনিট কয়েক পরে এই দিককার সমস্ত ব্যবস্থাই যখন ঠিক হইয়া গেল, মা তখন কহিলেন, কিন্তু পান্নু আজ ত তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে, বাড়ীতে আজ কাজ আছে একটু।

মুহূর্ত্তে একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়া পান্নু কহিল, কিসের কাজ মা, পার্টিটার্টি কিছু বুঝি?

—হ্যাঁ তোর কাকাবাবুর ইচ্ছে ক'জনকে ডেকে এনে একটু আমোদ-টামোদ করা। চারটে বাজে, সময় ত আর নেই বাবা, এক্ষুণি যাওয়া দরকার—পান্নুর মনটা আবার একটু বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, চল।

বড়লোকের বাড়ীর উৎসব যেমন হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে, সাজে সজ্জায় বা অন্য কিছুতে কোন ত্রুটি কোথাও কিছু নাই, সন্ধ্যার আলো জলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট বড় কত রকমের মোটর আসিয়া বাগানের প্রান্তে থামিতে লাগিল, দোতলার বারাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পান্নু নীচের এই জনসমাগমের পানে তাকাইয়া রহিল

গৃহে আসিয়া পৌঁছিবার পর রমা আনন্দ-কলরব তুলিয়া মহাসমারোহে পান্নুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে, হাসিয়া কহিয়াছে, মাসীমা তোমার এই ছেলেটিকে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে নিতে হবে নাকি?—এমনি করিয়া হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়া বিষয়টি সকলেই হাল্কা করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু পান্নুর মন তেমন হাল্কা হইল কই! হয়ত হইতে পারিত, কিন্তু আজিকার উৎসবের এই বিপুল আয়োজন, সমাগত নিমন্ত্রিতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস পান্নুকে ভিতরে ভিতরে আবার বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরাজয়ের লজ্জা যে কত গভীর, প্রতি মুহূর্ত্তে সেই কথাটিই মনের মধ্যে তাহার টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

বাড়ী হইতে আসিবার সময় টেবিলের যে ফুলদানীটা দেখিয়া মীরা এত খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, সেটি এবং বাগানে যত ফুল ফুটিয়াছিল, সবগুলি তুলিয়া একটা জার্ম্মান সিলভারের সুন্দর প্লেটে সাজাইয়া আনিয়া মীরার হাতে দিয়া পান্নু কহিয়াছিল, এই নাও মীরু আতিথ্যের উপহার, কুঞ্জকুটিরে এসেছিলে, কুঞ্জকুটিরে যত ফুল ফুটেছিল সব নিয়ে যাও। মীরা প্রথমে খানিকক্ষণ খুব হাসিল, তাহার পর দুই হাত বাড়াইয়া পান্নুর হাত হইতে সেগুলি তুলিয়া লইল। বাড়ী আসিয়া মীরা নিজের কক্ষে গিয়া আগে সেগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়া তার পর অন্য কাজে আসিয়াছে, পান্নু তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, তবু পরাজয়ের এ বেদনা তাহার কেন! চির-হাস্যময়ী, চির আনন্দময়ী মীরা জয়ের আনন্দে তাহাকে ত অবহেলা করে নাই, মায়েরও চিরদিনের স্নেহের এতটুকু ব্যতিক্রমও ত প্রকাশ পায় নাই, তবু তাহার এত দুঃখ এত লজ্জা কেন!

নীচে ছোট ছোট মেয়েদের ছোট একটি গীতিনাট্য অভিনয়ের জন্য বাগানে একটি ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত পুরুষ এবং মেয়েরা তাহারই সামনে নিজের নিজের জায়গায় গিয়া বসিতে লাগিলেন, মাঝখানে লাল সালু দিয়া পুরুষ এবং মহিলাদের বসিবার স্থানটি বিভিন্ন করা হইয়াছে। অভিনয় হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে, তাই বিস্তৃত বাগানখানির অন্য এক পাশে চেয়ারে বসিয়া যাঁহারা গল্প করিতেছিলেন, তাঁহারা এখনও সেখানে বসিয়া আছেন। পান্নু নীচে নামিয়া বাগানখানির এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মীরার তরুণী বন্ধুরা অনেকেই আসিয়াছে, সুসজ্জিত বেশে, সৌন্দর্য্যে, হাস্যে আলাপে বাগানের এক প্রান্তে ইহারা আনন্দোচ্ছ্বাস বহাইয়া দিয়াছে।

এই পরিবারের বৃদ্ধ প্রৌঢ় বা যুবক বন্ধুদেরও আজ অভাব ছিল না, তাঁহারা পরস্পর কেহ বা রাজনীতিক, কেহ বা সামাজিক কেহ বা অন্য কোন বিষয়ে, এধারে ও ধারে বসিয়া তর্কে বিতর্কে মত্ত ছিলেন। কোথাও বা একটি মিষ্ট হাসির টুকরা ভাসমান, কোথাও বা সঙ্গীতের একটু ঝঙ্কার, কিন্তু পান্নু কোথাও কোনস্থানেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না, সকলের তুলনায় নিজেকে তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে এত

বেশী হীন, এত বেশী ছোট বোধ হইতে লাগিল যে, কোথাও সে বসিতে পারিল না।

মীরার মা ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পানু শরীর কি খারাপ লাগছে বাবা ?

শ্রান্ত স্বরে পানু কহিল, তেমন ভালও লাগছে না মা, দাও, কিছু খেয়ে বাড়ী চলে যাই।

—না, না, না, বাড়ী আজ যাবি কি! চল্ কিছু একটু খেয়ে তোর ঘরে গিয়েই তুই শুয়ে থাক, বিছানা আমি করিয়ে রেখেছি।

কিছু খাইয়া পানু বিছানায় শুইয়া, বালিশটিতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মীরার মা আসিয়া সস্নেহে পানুর ললাটে একবার একটু হস্তস্পর্শ করিয়া গেলেন। শরীর খারাপ বলিতেছিল, জ্বরে নহে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাহির হইয়া গেলেন। পানু চাহিয়া দেখিল, একটু কাছে রাখিবার জন্য, ঐ কোমল কোলখানির উপর ক্লান্ত মাথাটি একটু ধরিয়া রাখিবার জন্য, পানুর মনে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার আগেই মা চলিয়া গেলেন।

কে জানে কেন আজ পানুর মনে হইতে লাগিল, যত স্নেহ, যত ভালবাসা বা যত আকুলতাই থাক্, তবুও পরের মা পরেরই মা, নিজের নহে!

পরের মা যে কোন রকমেই নিজের মা হইয়া যাইতে পারে না, একথা মনে পড়িয়া পানুর চক্ষু ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নীচের বাগান হইতে কতকগুলি সুমিষ্ট হাসির ঝঙ্কার ও পিয়ানোর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কাণ রাখিয়া গভীর রাত্রে পানু ঘুমাইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ

মধুমানব

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সত্যম্‌শিব্‌লোকে অসীম সৃষ্টিশ্লোকে রূপ-দোলে ওঠে ঘন ছন্দ,
রসের মহোৎসবে ওঠে লীলা-উৎসব ফলে ফুলে ভরে ওঠে গন্ধ।
লীলাদোলবন্ধনে গন্ধের চন্দন ঝর্ঝর ঝরি পড়ে বিশ্বে,
মর্ত্ত ও স্বর্লোকে কোলাকুলি একাকার ভরে ওঠে অমৃতের দৃশ্যে।
অমৃতদৃশ্য-মধুপদ্মের দলে দলে মানব রচিল মধু নীড় গো,
সংসার-কুঞ্জের ভৃঙ্গেরা আসি সেথা মধুপান লাগি করে ভীড় গো।
মধুভরা সংসার ছোটে মধুরংধার রংদার হোল গৃহ-মন্দির,
নরনারী হোল দোঁহে অমৃতের সন্তান সন্ধান পেল চিদানন্দীর।
মধুভরা কর্ম্মের প্রাঙ্গন হতে তারা ঘরে ঘরে মধু নিয়ে ফির্‌তো,
মর্ত্ত যে সেই থেকে হোল হেথা স্বর্গরে গৃহতল হোল প্রেমতীর্থ।
সেই আদি ঝর্ণার অমৃতের নদী থেকে বিশ্বে বয়েছে মধু-বন্যা,
দোলে তরী-হিন্দোল দে দোল্ দে দোল্ দোল্ অমৃতের
পুত্র ও কন্যা।

* * *

বন্ধু গো ভয় নাই ফিরে ওই দেবযুগ রূপায়িত জীবনের কুঞ্জে,
বিশ্বের ভীড়ে বাজে ওই তারি আগমনী ব্যাকুলিয়া ওঠে
হিয়াপুঞ্জে।
বিরাটের নিঃশ্বাসে অনাগত সৃষ্টির বীজ ওই ঝরে' পড়ে বিশ্বে,
ঝরে রস চিন্ময় পান করে মৃন্ময় ঐ নাচে রসময় দৃশ্যে।
অজানার কোন্ পথে আসে দেবসঙ্গীত ছন্দিয়া ওঠে প্রাণ নিত্য,
তাহারি ছন্দে কবি নন্দিছে ঐ গান ছন্দিছে শিল্পসাহিত্য।
মর্ত্তের গৃহতলে পুনঃ রসউৎসব দেরী নাই ঐ বাজে বংশী,
ঐ শোনা যায় নবগঙ্গার কুলকুল ডাক দেয় ওই শুভাশংসী।
ঐ বুকে আসে দেবজন্মের ব্রহ্মা গো চিত্তের নীলপাখী
দিল্‌খোল্,
নবজন্মের ঘাটে ভাবী যুগসৃষ্টির বৃষ্টির লাগে এসে হিল্লোল।
পচা সৃষ্টির দধি মন্থিয়া মহাকাল ননী তোলে দোলে রস-তক্র,
ঐ নাচে রবি সোম ছন্দিত সারা ব্যোম নারায়ণ ঘোরায় রে
চক্র।
বিশ্বের জীবনের উদ্বেগ ভেঙ্গে যাক্ আয় নবজন্মের যাত্রী,
কর্ম্মের প্রাঙ্গন হোক পুনঃ রঙ্গীন অবসান হয়ে আসে রাত্রি।
তমসার পরপারে আলোকের উৎসের খুলে যায় ঐ বুঝি ঐ দ্বার,
নবযুগাদিত্যের জেগে ওঠে নটরাজ হুঙ্কার শোনা গেছে ঐ তার।
ঐ শোনা যায় দূরে তারি জয়ডঙ্কারে নামে বুঝি স্বরগের বন্যা,
দোলে যুগহিন্দোল দে দোল্ দে দোল্ দোল্ অমৃতের
পুত্র ও কন্যা
দেবজন্মের পিছে লুকাইয়া আসে ঐ ভাগবতজন্মের বর গো,
সব পাপতাপ ঝেড়ে দাঁড়া পুনঃ নরনারী ধরাতলে নামে ঐ স্বর্গ।
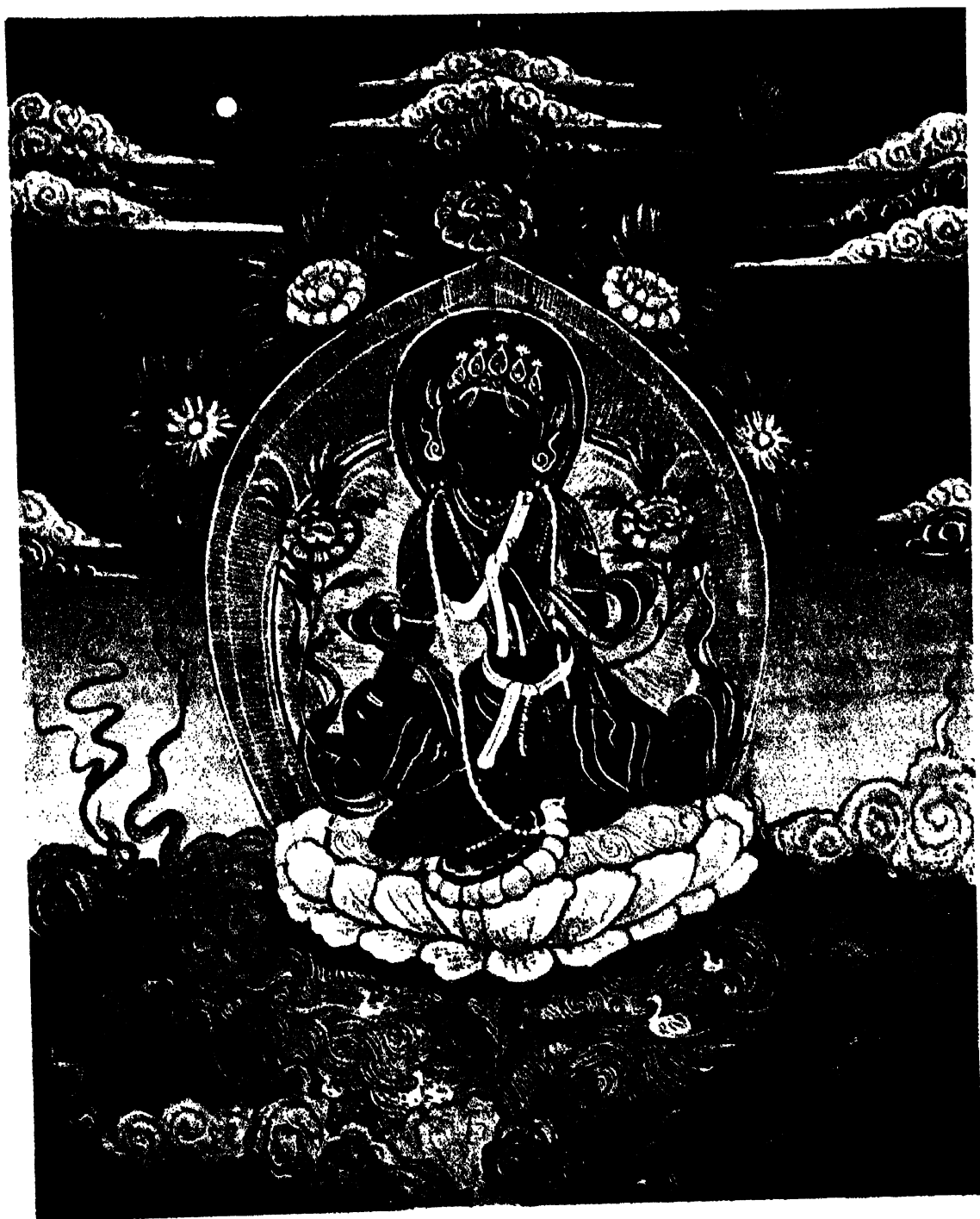
নীলতারা

(নেপালী চিত্র)

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(৪) কলেজ খুলিবার পরেই বন্দোবস্ত

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২৮ জানুয়ারি (১২৪১ বঙ্গাব্দে, ১৬ মাঘ, বুধবার) দিবসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) একটী নূতন 'মেডিকাল-কলেজ' খুলিবার আদেশ দিয়া সাধারণ নিয়মাবলী ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন যে সকল ব্যবস্থা করা হইল, তাহা এই :—

১। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্র্যামলীকে (Mountford Joseph Bramley কে) 'মেডিকাল-কলেজের' সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) নিযুক্ত করিলেন। ২৮ জানুয়ারী তারিখে তিনি নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ১ ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি বেতন পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ১২০০৲ টাকা ধার্য্য হইল। এতদ্ভিন্ন, সামরিক-বিভাগে থাকিলে তিনি যে বেতন ও ভাতা পাইতেন, তাহাও তিনি প্রাপ্ত হইবেন।

২। ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাক্তার এচ্‌-এচ গুডিভ (Dr. H. H. Goodeve) সাহেব, ডাক্তার ব্র্যাম্‌লীর সহকারী (Assistant) নিযুক্ত হইলেন। তখন গুডিভ্‌ সাহেব মেদিনীপুরে ছিলেন। তিনি সেখান হইতে আসিয়া ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেডিকাল-কলেজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মাসিক বেতন ৬০০৲ টাকা ধার্য্য রহিল। ইহাও নির্দ্ধারিত রহিল যে, ডাক্তার ব্র্যামলী ও ডাক্তার গুডিভ কলেজ হইতে বাহিরে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

৩। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত বৈদ্যরত্ন প্রথমতঃ সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎপরে তিনি সেখানে অধ্যাপকও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মেডিকাল-কলেজে' আনিয়া 'এসিস্‌ট্যাণ্ট টিচার' (Assistant teacher) নিযুক্ত করা হইল। দুই জন বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহার সহকারী রহিলেন।(১)

(১) এই দুইজন বাঙ্গালী হিন্দুর নাম কি, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহা জানিতে পারি নাই। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে পরম উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

৪। 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন', 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস' ও 'মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস' (Native Medical Institution, Medical Class in the Sanskrit College and Medical Class in the Madrassa College),—এই তিনটী স্কুলের লাইব্রেরীতে যে সকল পুস্তক ও যন্ত্রাদি ছিল, তাহা সমস্তই নূতন মেডিক্যাল-কলেজে আনীত হইল।

এচ. এল্‌. ভি. ডিরোজিয়ো।

৫। এনাটমী (Anatomy) শিখাইতে হইলে যে সব বস্তু বা বিষয়ের প্রয়োজন, তাহা ইংলণ্ড হইতে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইভান্স-সাহেব (Mr. Evans) 'কিউরেটর' (Curator) নিযুক্ত হইলেন। একটী 'মিউসিয়াম্‌' (Museum) প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার উপর ভার দেওয়া হইল।

৬। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ সমাপ্ত হইতে না হইতেই দেখা গেল যে, দুইটী মাত্র শিক্ষক (Drs. Bramley and Goodeve)

দ্বারা কাজ চলা অসম্ভব। ব্র্যামলী সাহেব 'সুপারিনটেণ্ডেণ্ট' (Superintendent) ছিলেন। তিনি এখন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ৫ আগষ্ট) 'প্রিন্সিপ্যাল' (Principal) নাম প্রাপ্ত হইলেন। গুডিভ সাহেব 'এসিস্‌ট্যাণ্ট টু দি প্রিন্সিপ্যাল' (Assistant to the Principal) ছিলেন। এখন তিনি 'প্রোফেসর' (Professor) নাম ধারণ করিয়া 'মেডিসিন্ ও এনাটমী'র (Medicine and Anatomy-র) অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। নূতন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় 'উইলিয়ম ব্রুক ওসানেসী' (William Brooke O'Shaughnessy) একজন 'অতিরিক্ত প্রোফেসর' (Additional professor) হইলেন। 'মেটিরিয়া মেডিকা' (Materia Medica) ও রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শিক্ষা দিবার ভার তাঁহার উপরি অর্পিত হইল।(১)

(৫) মেডিক্যাল-কলেজে পাঠারম্ভ

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলেজ খুলিবার সময় হইতেই ডাক্তার 'এচ-এচ গুডিভ' (H. H. Goodeve) সাহেব 'মেডিসিন ও এন্যাটমী' (Medicine and Anatomy) পড়াইতে লাগিলেন। 'উইলিয়ম ব্রুক ওস্যানেসী' (William Brooke O'Shaughnessy)(২) 'মেটিরিয়া-মেডিকা ও রসায়ন-বিদ্যা' (Materia Medica and Chemistry) বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 'মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্র্যামলী' (Mountford Joseph Bramley) অবশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে স্বয়ং বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তিন জনে মিলিয়া ৫০টী ছাত্রকে ডাক্তারী বিদ্যার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে যে কিরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শিক্ষকগণও যেরূপ অসীম যত্ন ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, ছাত্রগণ সেরূপ অনন্ত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন পর্য্যন্ত নূতন মেডিক্যাল-কলেজে শবচ্ছেদ-প্রথা ছিল না। কুকুর, ছাগল ও ভেড়া চিরিয়াই 'এনাটমী' (Anatomy) শিক্ষা দেওয়া হইত। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও তাঁহার কমিটী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শবচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত না হইলে ডাক্তারী-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ডাক্তার ব্র্যামলী জানিতেন যে, হিন্দু ছাত্রগণ শবচ্ছেদ করিলে হিন্দু-সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। এই হেতু, তিনি জোর করিয়া ছাত্রগণকে শবচ্ছেদ করিতে বলেন নাই। ছাত্রগণও এই কার্য্য করিতে যে সম্পূর্ণ-রূপে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে। যত ছাত্র মেডিক্যাল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই প্রাচীন হিন্দু-কলেজ, হেয়ার-স্কুল ও জেনারল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন (Hindu College, Hare School and General Assembly's Institution) হইতে আসিয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দু-কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ হিন্দু-সমাজের কুসংস্কার বর্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে চলিতে ছিলেন। তাঁহারা দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না। মদ্যপান ও মুসলমান-গণের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটী, শূলা ও সিদ্ধ মাংস ভক্ষণ

(১) লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) উক্ত ওস্যানেসী-সাহেবের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি লিখিলেন, "ওস্যানেসী যে রসায়ন-শাস্ত্র পড়াইতে পারিবেন, ইহা অসম্ভব।" "Would it be a good thing for the instruction of Medical Science in this country that Dr. O'Shaughnessy should read lectures on Chemistry to the Medical students?" [Book I, p. 25] 11th. July, 1835.

(২) লর্ড মেকলে ডাক্তার ওস্যানেসী (Dr. W. B. O'Shaughnessy) সাহেবকে 'মূর্খ' বলিয়া গালি দিয়া গিয়াছেন। মেকলে তাঁহাকে যতই গালি দিন, ওস্যানেসী-সাহেব বড় সহজ লোক ছিলেন না। আজ যে সমগ্র ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ বিদ্যমান রহিয়াছে, ওস্যানেসী সাহেবই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ওয়েষ্টন-সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ২১ জুন, মঙ্গলবার দিবসে সর্ব্বপ্রথমে টেলিগ্রাফের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা সুবিধা-জনক হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, ১ ডিসেম্বর, সোমবার দিবসে ওস্যানেসী সাহেবের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত দিবানিশি সংবাদ প্রেরিত হইতে লাগিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ২৪ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা হইতে আগরা পর্য্যন্ত সংবাদ যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাউলপিণ্ডী, পেশোয়ার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে এবং তৎপরে সমগ্র ভারতবর্ষে লোকে সংবাদ পাঠাইতে আরম্ভ করিল। ওস্যানেসী সাহেবের কৃপায় ভারতের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। গভর্ণমেণ্ট সেই জন্য তাঁহাকে ২০,০০০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। ছিদ্রান্বেষী দুর্ম্মুখ মেকলে, ওস্যানেসী সাহেবকে যে 'গালি' দিয়াছেন, তাহাতে ওস্যানেসীর কিছুমাত্র ক্ষতি বা মানের লাঘব হয় নাই। ওস্যানেসী সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, মেকলে তাহার তুলনায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

করিতে লাগিলেন। খাদ্যাখাদ্য তাঁহারা বিচার করিলেন না। বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, হিন্দু-কলেজ হইতে ছুটী লইয়া গোলদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তাঁহারা আড্ডা করিয়া মদ্যপান করিতেন। এই পীঠস্থান খুঁড়িলে এখনও শত সহস্র বোতল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেন্‌রি লুইস্ ভিভিয়ান্ ডিরোজিও (Henry Louis Vivian Derozio) সাহেবের শিক্ষাদানের ফলে হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার মানিতেন না। 'Down with idolatry, down with superstition became the general cry of the students.' তৎকালে 'দি ওরিয়েণ্ট্যাল ম্যাগাজিন্' (The Oriental Magazine) নামক একখানি কাগজে লিখিত হইয়াছিল, 'The Native managers of the Hindu College were alarmed at the progress which some of the pupils were making by actually cutting their way through ham and beef and wading to Liberalism through tumblers of beer.' অর্থাৎ হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ বলিতে লাগিলেন, 'পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার রসাতলে যাক্।' হিন্দু-কলেজের দেশীয় মেম্বার-গণ তখন ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন, "ছাত্রগণ গো-মাংস ও শূকর-মাংসের মধ্য দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং বিয়ার-মদ্য আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার দিকে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।"

উক্ত উদ্দাম ও বিশৃঙ্খল ভাব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণও ঐরূপ ভাবাপন্ন ছিল। তাহারা কুসংস্কার মানিল না। শবচ্ছেদ করা যে হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ইহা আর তাহাদের মনে স্থান পাইল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা মড়ার হাড় ও মাথা স্পর্শ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

ডাক্তার ব্র্যামলী, গুডিভ ও ওশ্যানেসী, এই তিন জন শিক্ষক মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণকে সর্ব্ব শাস্ত্রই পড়াইতে লাগিলেন। ব্র্যামলী ও গুডিভ সাহেব এনাটমী ও ফিজিওলজী (Anatomy and Physiology) পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সার্জ্জারী (Surgery) পড়াইবার ভার ব্র্যামলী-সাহেবের উপর এবং ফিজিক্স্ (Physics) পড়াইবার ভার গুডিভ-সাহেবের উপর অর্পিত হইল। ওশ্যানেসী সাহেব, ন্যাচারাল ফিলজফী (Natural Philosophy) কেমিষ্ট্রী (Chemistry), বট্যানী (Botany), মেটিরিয়া-মেডিকা (Materia Medica) ও ফার্ম্মেসী (Pharmacy) পড়াইতে লাগিলেন। তৎকালে এই সকল শাস্ত্র পড়াইবার নিমিত্ত উপযুক্ত গ্রন্থ ও যন্ত্রাদি না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রগণ নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। তবে শিক্ষক-গণ যেরূপ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে শিক্ষা দিতে

মধুসূদন গুপ্ত।

লাগিলেন, ছাত্রগণও সেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ছাত্র-সংখ্যা ৫০টী মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক ছাত্রকে চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান থাকে, তৎকালে সেরূপ ব্যবধান ছিল না। উভয়ের মধ্যে যেরূপ প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ছিল এখন আর সেরূপ নাই। তখন ছাত্রগণকে তিরস্কার বা দণ্ড-বিধান করিতে হইত না। একটী মাত্র মিষ্ট কথা বলিলেই যথেষ্ট ফল

হইত। সে সোণার দিন চলিয়া গিয়াছে। আর সে দিন ফিরিয়া আসিবে না। (১)

(৬) মেডিক্যাল-কলেজে শিক্ষকের অল্পতা

ডাক্তার ব্রামলী, গুডিভ ও ওগ্যানেসী, এই তিন জন সাহেব ডাক্তারী বিদ্যার সকল বিষয়ই পড়াইতেছিলেন। কিন্তু বিষয় এত অধিক যে, তিন জনে এত বিভিন্ন বিষয় পড়াইয়া তাহা শেষ করিতে পারিতেন না। ইহা দেখিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের 'ইণ্ডিয়া জর্ণ্যাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' (*The Editor of the India Journal of Medical*

এচ্. এচ্. গুডিভ।

Science, July 1836.)-নামক কাগজের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"এখন মেডিক্যাল-কলেজে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইতেছে, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ডাক্তার ব্রামলী ও গুডিভ এই দুইজন মাত্র কি মেডিসিন্ ও সার্জ্জারী (Medicine and Surgery)সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন? ইহা কি সম্ভবপর যে, দুই জনে এতগুলি বিষয় শিখাইতে পারিবেন? আমরা বিলক্ষণ জানি যে, তাঁহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং ডাক্তারী বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী। অন্ততঃ পাঁচজন 'প্রোফেসর' (Professor) না থাকিলে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা অসম্ভব। অল্প-পরিমাণে ডাক্তারী-বিদ্যা শিখিলে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। 'এনাটমী' (Anatomy) শিখাইবার প্রোফেসর আছেন, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু 'মেটিরিয়া-মেডিকা', 'বটানী', 'ফার্ম্মেসী', 'কেমিষ্ট্রী', 'মিডওয়াইফারী', 'সার্জ্জারী' (Materia Medica, Botany, Pharmacy, Chemistry, Midwifery, Surgery) এই সকল শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য প্রোফেসারের প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন একজন 'ক্লিনিক্যাল লেক্‌চারার' ও 'মেডিসিন'-শিক্ষকের (Clinical lecturer and teacher of medicine) প্রয়োজন। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, লণ্ডন-নগরে 'কার্প্‌নী' (Carpne)-নামক একজন এনাটমীর প্রোফেসর ২০০ ছাত্রকে এনাটমী পড়াইতেন। তিনি অন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া কেবল এই কার্য্যেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। 'রুক্‌স্ (Brookes)-নামক আর একজন সাহেবও একমাত্র এনাটমী পড়াইয়া জীবন-ক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই একটী বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং আমরা ডাক্তার ব্রামলীকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি আরও কতকগুলি নূতন প্রোফেসর রাখিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করেন।"

(৭) কোন্ বৎসরে, কোন্ মাসে ও কোন্ তারিখে মেডিক্যাল-কলেজ বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল?

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন বুদ্ধিমান্, বিবেচক ও সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা জর্ন্যাল অফ মেডিসিন' (Calcutta Journal of Medicine)-নামক স্বীয় সাময়িক-পত্রে লিখিয়াছেন :—

"১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১ জুন, [১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার] তারিখে প্রাচীন হিন্দু-কলেজের পশ্চাদ্-ভাগে একখানি পুরাতন বাড়ীতে (১) সর্ব্ব-প্রথমে মেডিক্যাল-

---

(১) Alas! it seems as if those golden days are gone by never to return, days, when the teachers could command respect of the taught by affection and love and not by the enforcement of discipline and threats of punishment.—Dr. Mahendra Lal Sarkar, *The Calcutta Journal of Medicine* 1873.

১। ইহাই রামকমল সেন মহাশয়ের বাড়ী। বহুকাল পরে এই বাড়ীতেই 'এল্‌বার্ট-কলেজ' (Albert College) বসিয়াছিল।

কলেজ বসিয়াছিল। কলেজ খুলিবার দিনেই সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্র্যামলী-সাহেব (Superintendent Mr. Bramley) এই বাড়ীতেই প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই কয়েক মাস ধরিয়া কলেজ বসিয়াছিল; কিন্তু সে কত মাস, তাহা কোন রেকর্ডে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি 'ফাউন্‌ডেসন-ছাত্রের' (Foundation pupils-এর) মুখে শুনিয়াছি যে, অন্ততঃ ৬ মাসের কম নহে। ডাক্তার ব্র্যামলী তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'ডাক্তারী-বিদ্যার যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে শিখাইতে হইবে। কিন্তু ইহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। উপযুক্ত বাড়ী নাই এবং যন্ত্রাদি নাই। এই সব যোগাড় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাড়ীও নির্ম্মিত হইবে, এবং যন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তখন ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।' ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ৯ জুলাই তারিখে একজন পত্র-প্রেরক *India Journal of Medical Science* নামক একখানি সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন, 'আরও প্রোফেসরের প্রয়োজন। যে দুই তিন জন আছেন, তাহাতে চলিবে না। কলেজ এই বাড়ী হইতে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেলেই আরও কয়েকজন নূতন প্রোফেসর রাখা উচিত।'

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২৪ মার্চ্চ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India)-নামক কাগজে লিখিত হইয়াছে, 'অদ্য (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭ মার্চ্চ তারিখে) মেডিক্যাল-কলেজের নূতন বাড়ীতে ডাক্তার ব্র্যামলী, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের (Lord Auckland) সম্মুখে নূতন মেডিক্যাল-কলেজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কর-মর্দ্দন করিলেন (২)।' কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে না যে, ঠিক কোন্ তারিখে নূতন বাটীতে মেডিক্যাল-কলেজ আসিয়া বসিয়াছিল। আমরা কলেজের 'ফাউনডেসন্' পিউপিলদিগের (উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রভৃতির) মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ডাক্তার ব্র্যামলী যেদিন বক্তৃতা করেন, তাহার একমাস পূর্ব্বেই মেডিক্যাল-কলেজ পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৯ মার্চ [শনিবার] তারিখের "সমাচার-দর্পণে" লিখিত হইয়াছে:—

"নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়। এতদ্দেশীয় লোকেরদের

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

নিমিত্ত গত বৃহস্পতিবারে নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত গবরনর্ জেনারল বাহাদুর [লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড] ও শ্রীল শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।"

এখন স্পষ্টই সপ্রমাণ হইল যে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭ মার্চ তারিখে [১২৪২ বঙ্গাব্দে, ৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার দিবসে] 'মেডিক্যাল-কলেজ' রামকমল সেনের বাটী হইতে বর্ত্তমান নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসে।

২। "At the close of this eloquent address of Principal Bramley, which was received with loud plaudits, Lord Auckland walked round the table and cordially shook the Principal by the hand, and intimated the deep interest which he felt in the welfare of this noble Institution." *Friend of India*, 24 March, 1836.

(৮) মেডিক্যাল-কলেজে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুরস্কার-প্রদান

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২৪ মার্চ তারিখে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্র্যাম্‌লী সাহেবকে (Dr. Bramley কে) যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই :—

"মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণ আপনার শিক্ষাদানের ফলে যেরূপ কৃতবিদ্য হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই হেতু,

লর্ড অকল্যাণ্ড।

আমি আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কলেজের উপযোগী যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী না থাকায় আপনি যে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে, ছাত্রগণকে পুরস্কার-দান করিয়া উৎসাহিত করিতে পারিলে আপনারও কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। আমি বাঙ্গালী। ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। সুতরাং সজাতীয়ের উপকার করিতে পারিলে আমিও ধন্য হই।

"ছাত্রগণকে পুরস্কার দিলে তাহারা আরও উৎসাহ সহকারে শিক্ষালাভ করিতে থাকিবে। প্রত্যেক ছাত্রকে ৩ বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি প্রত্যেক বৎসরে ২০০০৲ (দুই হাজার) টাকা আপনার হস্তে দিব। আমার ইচ্ছা যে, ৮ কি ১০টী পুরস্কার দেওয়া হউক। এই টাকা যেন এদেশীয় ছাত্র-গণকেই দেওয়া হয়। কোন্ বিষয়ের জন্য কত টাকা দিতে হইবে, তাহা আপনিই বিবেচনা-পূর্ব্বক ভাগ করিয়া দিবেন।"

'এডুকেশন কমিটী' স্থির করিয়া দিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত ২০০০৲ টাকা ১০ জন ছাত্রকেই দেওয়া হইবে। যাহারা 'এনাটমী শাস্ত্রে' (Anatomy তে) ভাল ফল দেখাইতে পারিবে, তাহাদের নিমিত্ত ৬টী পুরস্কার এবং যাহারা রসায়ন-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইবে, তাহাদের নিমিত্ত ৪টী পুরস্কার দেওয়া হইবে :—

'এনাটমী ক্লাস' (Anatomy class)

প্রথম পুরস্কার	৪০০৲ টাকা
দ্বিতীয় "	৩৩০৲ "
তৃতীয় "	২৬০৲ "
চতুর্থ "	১৯০৲ "
পঞ্চম "	১২০৲ "
ষষ্ঠ "	৫০৲ "
	১৩৫০৲ টাকা

'কেমিষ্ট্রী ক্লাস' (Chemistry class)

প্রথম পুরস্কার	২৭৫৲ টাকা
দ্বিতীয় "	২০০৲
তৃতীয় "	১২৫৲
চতুর্থ "	৫০৲
	৬৫০৲ টাকা

সর্ব্ব-সমেত ২০০০৲ টাকা

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'এনাটমী' (Anatomy র) নিমিত্ত কোনরূপ পুরস্কার দেওয়া হইল না। যদিও ছাত্রগণ অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিল, 'এনাটমী-শাস্ত্রে' তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইল না। ইহার কারণ এই যে, তখন পর্য্যন্ত ছাত্রগণ কার্য্যতঃ 'এনাটমী' শিক্ষা করে নাই, অর্থাৎ তখনও মেডিক্যাল-কলেজে শবচ্ছেদের (মড়া-চেরার) ব্যবস্থা করা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর-মাসের শেষ ভাগেই সর্ব্ব-প্রথম শব-

চ্ছেদ করা হইয়াছিল। ছাত্রগণ রসায়ন-শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া প্রশ্নকারি-গণের নিতান্ত আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২০ অক্টোবর তারিখে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India-য়) লিখিত হইয়াছিল, "প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার ব্রামলী জেনারল কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সনে (General Commiteeতে) লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ছাত্রগণের পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষ-জনক।"

তৎকালে পরীক্ষায় কিরূপ প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

CHEMISTRY.

1. Describe what is meant by the "Specific Gravity" of matter. Explain the mode of finding the specific gravity of a solid mass lighter than water, stating in detail the reasons for each step in the process.

2. Describe fully the chemical history of *Cyanogen*, and the mode of effecting its analysis. Describe the compounds it forms with *Hydrogen*, *Potassium* and *Iron*, especially with reference to the subjects of prussic acid and its antidotes, and the manufacture of prussian blue, an exact account of the composition of all these substances is desired.

3. Explain the meaning of the term *isomeric*, and give illustrations of the subject with diagrams.

4. Describe the experimental proofs both analytic and synthetic of the composition of water, especially the evidence derived from the ectric and the galvanic agents.

ছাত্রগণ রসায়ন শাস্ত্র-পরীক্ষায় যে উত্তর লিখিয়াছিল, তাহা অতি মনোহর। ডব্লিউ-বি ওস্যানেসী (William Brook O'Shaughnessy) সাহেব লিখিয়াছেন, "বড় বড় রসায়ন-শাস্ত্র-বেত্তা পণ্ডিতগণের সম্মুখে এই সকল উত্তর আমি সাহস করিয়া ফেলিয়া দিতেছি। তাঁহারা ইহার কোনরূপ দোষ ধরুন।" তৎকালে একজন ইংরাজ ডাক্তার 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India) কাগজে লিখিয়াছিলেন, "ছাত্রগণ যে উত্তর দিয়াছে, তাহা পড়িয়া আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছি।" 'ইণ্ডিয়া জর্ন্যাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' (India Journal of Medical Science)-এর সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন, "ছাত্রগণ যে উত্তর লিখিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচায়ক।"

ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত হইল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার লর্ড অকল্যাণ্ড (Lord Auckland) বাহাদুর স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিলেন। ইহাই 'মেডিক্যাল-কলেজে' প্রথম-পরীক্ষার প্রথম-পুরস্কার-বিতরণ। গভর্ণমেণ্ট ২টী পদক দান করিলেন, একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও আর একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত। মুক্তহস্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ৭৫০৲ টাকা দান করিলেন। বহু-সংখ্যক গণ্যমান্য দেশীয় ও বিদেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। ৬টী

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

ছাত্রের উত্তর প্রায় একরূপই হইয়াছিল। তাহাদিগের সর্ব্বনিম্ন পুরস্কার ৭৫৲ টাকা মাত্র। তাহাদিগকে কি প্রকারে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, ইহাই তখন বিবেচ্য হইল। প্রথমতঃ স্থির করা হইয়াছিল যে, এই ৭৫৲ টাকা ৬ জনকে সমান-ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা অতি অল্প টাকা হয় বলিয়া মহাত্মা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তখন স্বয়ং ৩৭৫৲ টাকা দান করিলেন। যিনি যে পুরস্কার দিলেন, এবং যে ছাত্র যে পুরস্কার পাইল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

নাম	পুরস্কার
গভর্ণমেন্ট-প্রদত্ত	একটী স্বর্ণমুদ্রা ও একটী রৌপ্যমুদ্রা
দ্বারকানাথ-প্রদত্ত	৭৫০, টাকা
লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড-প্রদত্ত	৩৭৫, টাকা
ছাত্রের নাম	পুরস্কার
শিবচন্দ্র কর্ম্মকার	২৬২॥০ টাকা
নবীনচন্দ্র পাল	২৬২॥০ টাকা
সি-জে সাইমন্‌স্	স্বর্ণ-পদক
ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলী	১৫০, টাকা
ডব্লিউ ক্ষয়	রৌপ্য-পদক
ঈশানচন্দ্র দত্ত	প্রত্যেকে ৭৫, টাকা
রাজকৃষ্ণ দে	
উমাচরণ শেঠ	
শ্যামাচরণ দত্ত	
রামনারায়ণ দাস	
দ্বারকানাথ গুপ্ত	
নবীনচন্দ্র মিত্র	অতি নৈপুণ্য-সূচক সার্টিফিকেট
রামকুমার দত্ত	
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	
মহেশচন্দ্র নান	নৈপুণ্য-সূচক সার্টিফিকেট
বেণীমাধব মজুমদার	
জেম্‌স্ পোট্	

বিজ্ঞবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "তখন মেডিক্যাল-কলেজের শৈশবাবস্থা। রসায়ন-শাস্ত্রের স্থায় দুরূহ শাস্ত্রে ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তথাপি ছাত্রগণ যে সদুত্তর দিয়াছিল, তাহা তাহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তৎকালে শিক্ষকগণ যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন, ছাত্রগণও সেইরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া শিক্ষালাভ করিত। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করিলে ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারে, তৎকালের শিক্ষকগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সযত্নে ও সাগ্রহে শিক্ষাদান এবং অযত্নে ও অনাগ্রহে শিক্ষা-দানের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। ডাক্তার ওস্তানেসী রসায়ন-শাস্ত্রে যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, সেরূপ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তিনি ছাত্রগণকেও শিক্ষাদান করিতেন। ইহার ফলেই ছাত্রগণ মেডিক্যাল-কলেজের শৈশবাবস্থাতেও এরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।" (১) [ক্রমশঃ

(১) বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। যিনি যে বিষয় শিক্ষা দিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। কোন বিষয় কি প্রণালীতে বুঝাইয়া দিলে তাহা ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাও তাঁহার জানা উচিত। সুপ্রসিদ্ধ D. L. Richardson ৺গৌরীদাস বসাক মহাশয়কে তিন খানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে আছে। বর্ত্তমান ভাইস-চান্সেলার, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ইহা একদিন দেখাইয়াছিলাম। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "পূর্ণ বাবু, সে সব প্রোফেসারও আসিবেন না এবং সে সব ছাত্রও মিলিবে না।" শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কথাগুলি আমার প্রাণে গাঁথিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রায় ফাঁকতালায় কাজ সারিয়া দিবার চেষ্টায় থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

... বার্ণার্ডশ যে বলেন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কেবল বাবুয়ানা শিক্ষা দেয় এবং ক্ষমতা থাকিলে তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ভূমিসাৎ করিতেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যে বলিয়াছেন, "আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশের পক্ষে হিতকর না হইয়া ক্ষতিকর হয়," তাহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে।

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

ওড়ার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কে বলে বিমানে ভ্রমণ বিপজ্জনক? ইহা একটি মস্ত ভুল ধারণা। এরোপ্লেনের মত নিরাপদ দ্রুত পরিচ্ছন্ন ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ যাতায়াতের যান আর নাই।" কথাটা খুব সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু যাঁহার মুখ হইতে এইরূপ অদ্ভুত মন্তব্য শুনিলাম, বৈমানিক হিসাবে, অন্ততঃ ভারতে বাঙ্গালী বৈমানিকদের ভিতরে তাঁহার মত নিতান্ত উপেক্ষার নয়। কাজেই ব্যাপারটা একটু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিবার একটা ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিল। খবরের কাগজ খুলিলেই যেমন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমা স্বরূপ স্ত্রীজাতির নিগ্রহ ও ধর্ষণের বাহুল্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া কাগজ পড়া একটা বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ বিমানপোতের দুর্ঘটনার ইতিহাসও যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে বলিয়া মনে একটা ধারণা ছিল; আজ হঠাৎ এইরূপ মত শুনিয়া একটু চমকাইয়া গেলাম; তবে কি একটা ভুল আতঙ্ক মনে পোষণ করিতেছি? মনে পড়িল, অতি পুরাকালে (মান্ধাতার যুগে বলিলেও হয়) প্রথম "হেগুলি পেজে" কলিকাতা প্রদক্ষিণের দক্ষিণা ৫০৲ মুদ্রার বিনিময়ে মরিয়া হইয়া একবার এরোপ্লেন চড়িয়াছিলাম, তখনকার মনের ভাব বা experienceকে মনে জাগাইতে চেষ্টা করিলাম। লুপ্ত স্মৃতি সাড়া দিল না. অনেক ঝড়-ঝাপটার চাপে সে সামান্য experienceএর কথা একেবারে লুপ্ত, চেতনা নাই, জাগিবে কিসে? কাজেই নিজের অনুভূতির দিক হইতে এই মতামতের পোষকতা বা বিরুদ্ধতার মাল-মশলা আমার নিজস্ব নাই দেখিলাম। কথা হইতেছিল স্বনামধন্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিমানপোত ও তাহার চালনা সম্বন্ধে একটা আলোচনা হইল এবং পরেও তাঁহার সহিত এইরূপ আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছে। আলোচনায় যাহা বুঝিয়াছি লিখিলাম, আশা এই যে পাঠ করিয়া হয়ত আমারই মত অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে।

এক বন্ধু জানিতে চাহিলেন "আপনি কি আজকাল ওড়েন?"

কথাটা বড় কটু শোনাইল। চলিত বাঙ্গালায় "উড়ার" সহিত ৺পিতৃদেবের কষ্টার্জ্জিত পয়সার "আদ্যশ্রাদ্ধের" দ্বারা পুত্রের "কাপ্তেন" আখ্যা অর্জ্জনের যেন একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রচ্ছন্ন থাকে। অথচ চলিত বাঙ্গালায় এমন অন্য শব্দ নাই, যাহার ব্যবহার বৈমানিকের activities সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে। উত্তরে বলিলেন, "আমি ত উড়িই, অধিকন্তু আজকাল উড়া এত নিরাপদ মনে করি যে বিধবার একমাত্র সম্বল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও আমার একমাত্র পুত্রের উড়াতেও কোনরূপ বাধা দিই না।" ইহার উপর আর কথা চলে না। ইহার পর কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিলে যেন সূর্য্যদেবের পূর্ব্বে উদয়রূপ ধ্রুব সত্যের উপরও সন্দেহ প্রকাশ সম্ভব হয়।

"আমার দুই বৎসরের নাতিটিও (দৌহিত্র) আমার সঙ্গে ওড়ে। প্রথম যখন উড়িতে শিখিলাম, সঙ্গে যাইবার আরোহীর বড়ই অভাব, অথচ একক উড়িতে ভয় ভয় করে, যদি বিপদ হয় একজন সঙ্গী থাকিলে যেন অনেকটা শান্তি আসিবে; এই যে বিনা পয়সার এমন "ফরাক্কাবাদ" যাত্রার সুযোগও কেহ লইতে চাহে না, আমার "কাঁচা হাতের" উপর অনাস্থাই তাহার কারণ। অবশেষে জগতের সেরা বন্ধু প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিলেন, আমার স্ত্রী পার্থিব অস্থিগুলির মায়া ত্যাগ করিয়া আমার প্রথম flight-এর আরোহী হইয়া আমাকে ধন্য ও সহধর্ম্মিণী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন; ওঃ সে কি উৎসাহ ও আনন্দ! তারপর অনেক স্থানে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছি কিন্তু সে আনন্দ হয় না; নূতনের এমনই আকর্ষণ ও মোহ।

"আজকাল যাঁহারা একবার আমার সঙ্গে উড়েন, পুনরায় free ride-এর প্রলোভন সম্বরণ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়।"

এই কথায় একটা মজার গল্প মনে পড়িয়া গেল। গল্পের সত্যাসত্যের জন্য লেখক দায়ী নহে (এটা সাধারণ সম্পাদকীয় মন্তব্য, শুনিতে মন্দ লাগে না)। কোনও এক মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক "এরোপ্লেন চড়িয়াছি" এই "নামকো ওয়াস্তে"

মরিয়া হইয়া ৫০৲ খরচ করিয়া একদিন এরোপ্লেনে চড়িয়া বসিলেন। জমি ছাড়া মাত্র দারুণ অনুশোচনা আরম্ভ হইল এবং ক্ষণপরেই শরীর-গতিকও সুবিধা বোধ করিলেন না; নিরুপায় হইয়া প্রাণের দায়ে কবুল করিলেন "চহড়ানেকো ৫০৲ লিয়া উতার দেও সাহেব ৫০০৲ দেগা"। সাহেব অবস্থা বুঝিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু the mischief was done. যখন plane ভূমি স্পর্শ করিল তখন "ভুত্তোর মা কালি" হইয়া গিয়াছে; সাহেবের ন্যায্য প্রাপ্য "৫০০৲ রুপেয়া" আদায় করিয়াছিল কি না গল্পে তাহার উল্লেখ নাই।

এইরূপ অবস্থা কখনও পাইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "Sea sickness-এর মত air sickness অনেকের হয়, তবে বাকিটা বোধ হয় গল্পের ঝোঁকে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কি রকম হয় জানেন? মনে করুন ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছেন; আমি সাধারণ জোর হাওয়ার কথা বলিতেছি না; এরূপ ঝড় যাহার গতি-বেগ ঘণ্টায় ৬০ বা ৭০ মাইল। সমুদ্রে ঝড় উঠার সঙ্গে যেরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, জাহাজ একবার ঢেউয়ের চূড়ায় (crest) উঠে এবং পরমুহূর্ত্তেই ঢেউয়ের খাদে (trough) পড়ায় একটা ভীষণ দোলানির আরম্ভ হয়, সেইরূপ আকাশেও ঝড় উঠিলে air pockets হইয়া থাকে; এই স্থানে হাওয়ার ঘনতা অত্যন্ত কমিয়া যায়। ধরুন আপনি এরূপ ঝড়ের ভিতরে যাইতেছেন, air pocket-এ পড়িলেন, আপনার plane, side slip করিয়া ২।৪ শত ফিট নামিয়া পড়িল, আবার ঘন হাওয়া পাইবামাত্র ঠেলিয়া উঠিল, আবার পতন, আবার উত্থান—অনবরত এই ভাব, ঠিক ঢেউয়ে জাহাজের মত দোল খাইতে লাগিল, তফাৎ এই যে হাওয়ার ঢেউয়ের উচ্চতা চারি শত ফুট হওয়াও স্বাভাবিক। এখন এই ভীষণ দোলানির মধ্যে stomach বেচারা যদি "কৃষ্ণকে জবাব দেয়" তবে তার বেশী দোষ দেওয়া চলে না। একদিন আমি উড়িলাম, উর্দ্ধে উঠিবার ইচ্ছা; ১৫০০০ ফিট ওঠার পর ভীষণ ঝড় পাইলাম, নীচে কিছু নাই। তাড়াতাড়ি ৫০০০ ফিটে নামায় ঝড়ের হাত এড়াইলাম। Ærodrome-এ ফেরার পর আর একটি R.A.F. machine-ও ফিরিল। Pilot report করিল ৮০০০ ফিটে সেই ঝড় সে পাইয়াছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সেই ঝড় পৃথিবীতে পৌছিল, তিন দিন ধরিয়া দারুণ cyclone চলিল। আজকাল "হাওয়া আফিসের" অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাঁহাদের forecast এবং খবর প্রায়ই পাকা হয়; একটু সাবধানে খবরপত্র সংগ্রহের পর long flight-এ বাহির হইলে কোনও অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।"

প্রশ্ন করিলাম "তবে কি flight (উড়ার)-এর এই অবস্থা একটা আনুষঙ্গিক অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে?" উত্তরে বলিলেন "কোথায় এ অসুবিধা নাই বলুন? জাহাজে sea-sickness একটা মস্ত বিভীষিকা; অনেকে মোটরে বেশী চড়িলে sick হইয়া পড়েন, এমন কি রেলে ভ্রমণের সময়ও লোককে sick হইতে দেখা যায় না কি?

"আজকাল যে ভাবে planes গঠন হয় এবং যে পরিমাণ margin of safety রাখা হয়, তাহাতে পূর্ব্বের মত হঠাৎ কিছু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন্ part (অংশ)কে কত strain বহন করিতে হইবে তাহা অতি সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হইয়াছে এবং যতটা strength (দৃঢ়তা) হইলে ঐ strain বহন করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা অন্তত সাতগুণ বেশী মজবুত ও দৃঢ় করিয়া parts তৈয়ারী করা হয়। কাজেই পাখা ভাঙ্গিয়া, struts ছিঁড়িয়া পূর্ব্বে যে সব accident হইত এখন আর তাহা হয় না। এখন শুধু ভয় engine failure (ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ) হইলে। উড়িবার একটা safe height (নিরাপদ উচ্চতা) আছে। সাধারণত ৪০০০ হইতে ৫০০০ হাজার ফুটের ভিতর ওড়া উচিত। নামিবার সময় engine বন্ধ করিয়া নামিতে হয়, তাহাকে vol-planing বলে। দেখা গিয়াছে ৪০০০ হাজার ফুট উপরে engine বন্ধ করিয়া ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যে কোনও দিকে জমি ছুঁইবার পূর্ব্বে ১৩ মাইল যাওয়া যায় এবং ঐ ৪০০০ হাজার ফুট উচ্চ হইতে দৃষ্টি প্রায় ৪০।৫০ মাইল প্রসার লাভ করে, অতএব দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া vol-plane করিলে ভারতে ১৩ মাইলের মধ্যে forced landing-এর উপযুক্ত স্থানের অভাব হয় না। আমি একবার পরীক্ষার জন্য বালেশ্বরের নিকট একটি আইনমুক্ত চষা

ক্ষেত্রে forced landing করিয়াছিলাম, যাহার প্রসার মাত্র ১২০ ফুট।"

কথাটা বলা সোজা, কিন্তু এই forced landing-এর মধ্যে pilot-এর কৃতিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইল তাহাই কি সাধারণ মাপকাঠি বলিয়া ধরিতে হইবে? আমি নিজে আর একটি forced landing এর ইতিহাস জানি। আমাদের বিশেষ পরিচিত রায় কিছুদিন air mechanic-এর কার্য্য লইয়াছিল, দুইবার দুর্ঘটনার পর মায়ের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে এখন অন্য কার্য্য করে, আর plane-এ চড়ে না। Pilot হাঁকিলেন, engine miss করিতেছে, তখন তাঁহারা প্রায় ৩০০০ ফিট উপরে; চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু তথাপি engine দেহ রক্ষা করিল, vol-planing আরম্ভ হইল, মনোমত landing পাওয়া গেল না, আগে মিলিবে আশায় শেষে যখন crash অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল, তখন pilot "hold tight Roy" বলিয়াই এক প্রকাণ্ড বটগাছের ঘন শাখার ভিতর planeকে ফেলিয়া দিল। নেহাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সেই জন্য pilot ও mechanic উভয়েই বাঁচিয়া গল্প বলিবার অবসর পাইয়াছেন। এই ঘটনা ঝাঝার নিকট ঘটিয়াছিল। ঝাঝার আশেপাশে ১২০ ফুট লম্বা মাঠ বা ক্ষেতের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে ভবদেব বাবু যাহা করিতে পারেন তাহা সব pilot যে পারে না এটা সুনিশ্চিত, কাজেই দুর্ঘটনাও ঘটে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আজকাল সমস্ত রকম যান-বাহনে প্রতি লক্ষ মাইল গমনাগমনে দুর্ঘটনায় যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার সুমার (census বা statistics) হইয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, railway, ship, motor bus এবং car এই সকল যান অপেক্ষা plane এ মৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা কম।"

অবশ্য এই statistics-এর মধ্যে প্রকাণ্ড fallacy বর্ত্তমান আছে। একখানি জাহাজ বা একটি ট্রেনের দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার একটি এরোপ্লেনের দুর্ঘটনার মৃত্যুহার অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব, কারণ একখানি plane-এ যে সংখ্যক লোক চলাচল করে, জাহাজে বা ট্রেণে তাহা অপেক্ষা সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় এই দুইয়ের দুর্ঘটনার মৃত্যুহারের তুলনার মাপকাঠি যথাযথ হয় না; তবুও এই statistics এরোপ্লেনের স্বপক্ষে একটা বিশ্বাসের ভাব মনে স্বতই লইয়া আসে।

যাক্, কতকগুলি প্রয়োজনীয় নীরস কথার পর প্রবন্ধকে একটু সরসতা দিবার চেষ্টা করাই বিধেয়। ভবদেব বাবু বলিতে লাগিলেন, "দেখুন সময়ের দিক দিয়া এরূপ যান আর নাই। প্রাতে দুইজন বন্ধু লইয়া পাড়ি দিলাম, পুরীতে গিয়া সমুদ্রে স্নান সারিয়া, মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া (বাঙ্গালীর যে মৎস্যগত প্রাণ) বাড়ী ফিরিয়া যথা সময়ে আহারাদির পর ১১টার সময় যথানিয়ম আফিসে গিয়াছি! অন্য যানে যে ইহা সম্ভবপর নহে একথা মানিতেই হইবে। অথচ তিনজনের যাতায়াতের খরচ মাত্র ৩১৲ টাকা লাগিল, দেখুন কত সস্তা, রেলের থার্ড ক্লাসের ভাড়া অপেক্ষাও কম।"

চমক লাগিল বটে, এত অল্প খরচে এরোপ্লেন চলে জানা ছিল না।

"সকালে বাহির হইয়া সুন্দরবনে সিক্ত বেলাভূমিতে নামিলাম। হরিণ মারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম করা গেল। খুড়ীমাতা ঠাকুরাণী সাগর যাইবেন ধরিলেন, প্রাতে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে সাগর স্নান করাইয়া ৪ ঘণ্টার ভিতর বাড়ী ফিরিলাম।"

এইরূপ বৃত্তান্ত শুনিলে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাকা স্থান বিশেষ প্রস্তুতের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দেওয়ার মত, যা থাকে বরাতে বলিয়া একখানি এরোপ্লেন সংগ্রহের ইচ্ছা বোধ হয় অনেকের মনেই জাগিয়া ওঠে। তারপর শুনা গেল আজকাল আন্দাজ ১৪,০০০৲ টাকার একখানি ভাল পাঁচ "ফিটার" প্লেন এবং মাত্র ২৫০০৲ টাকায় একখানি "সোলো মেসিন" সংগ্রহ হয়। ঐ রূপ ব্যয় অনেকে মোটরগাড়ীর জন্য করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইল piloting-(চালনার)-এর মধ্যে কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন? উত্তরে বলিলেন, "Landing, আর সব বিষয় plain sailing. প্রথম উড়িবার সময় গতির বেগ যথেষ্ট হইলেই plane আপনিই মাটি ছাড়িয়া দিবে, তারপর শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখা দরকার কোন গাছের মাথায় ধাক্কা না লাগে। Direction ঠিক করিয়া লইয়া safe height-এ উঠিবার পর plane ছাড়িয়া দিন, joy stick (পরিচালন-দণ্ড) ধরিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই, looking

device আছে, look করিয়া অনায়াসে পুস্তকপাঠে রত হইতে পারেন শুধু rudder-এ পা রাখিয়া চলিলেই হইল, নতুবা direction বদল হইয়া যাইতে পারে। এখানে জামাই বাবুটি সাজিয়া চড়িয়া বসুন, দিল্লীতে গিয়া ঠিক জামাই বাবুই নামিবেন; শ্বশুরগৃহে গমনে বেশ-পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যকতা নাই। শুধু নামিবার সময়ই খুব সাবধানতার প্রয়োজন। Cock-pit হইতে উচ্চতা দেখা যায় না, সামনে দেখিয়া আন্দাজ করিয়া লইতে হয়, দুইটি চাকা ও tail-skid এক সঙ্গে জমি স্পর্শ করা আবশ্যক, নতুবা ধাক্কা খাইতে হইবে, এমন কি কাৎ হইয়া plane উল্টাইয়া পড়িতে পারে। Plane-এর গুরুত্ব হিসাবে জমি ছুঁইবার সময় একটা গতি বজায় রাখিতেই হয়, নতুবা "উড়িয়া নামার" পরিবর্ত্তে "পপাত চ" হইতে হয়। আমার plane-এর গতি-বেগ ৪৫ মাইল রাখিতে হয় এবং solo machine খানি ৩০ মাইল গতিতে জমি স্পর্শ করে। দু চারিবার একটু সাবধানে উঠা নামা করিলেই আপনিই সব আন্দাজ আসিয়া যায়।"

"Engine failure ছাড়াও দুর্ঘটনা কেন ঘটে?"

"তার একমাত্র কারণ আমার মনে হয় অসাবধানতা। যে সব accident হয় তাহার শতকরা ৯০টি হয় এমন pilot-এর দ্বারা যাঁহারা মাত্র ১০ ঘণ্টার মধ্যে উড়িয়াছেন কিম্বা যাঁহারা ১০০ ঘণ্টার বেশী উড়িয়াছেন; পাকা হাতের দ্বারাও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। কারণ কি? কাঁচা হাতে accident হওয়া সম্ভব confidence আসে না, judgment হয় না, accident হইতে পারে; অবশ্য ১০ ঘণ্টা হইতে ১০০ ঘণ্টার উড়নদারদের ভিতর accident প্রায়ই হয় না, কারণ judgment আছে। কিন্তু সাবধানতা ত্যাগ করিলেই মুস্কিল; over-confidence-ই সর্ব্বনাশের মূল; তারপর হাত পাকিলেই তখন কেবল উড়িয়া আশা মেটে না। Exhibition flight বা stunts যথা, nose-diving, spining, looping the loop, figure-flight ইত্যাদির উপর ঝোঁক যায় এবং যে সব সাধারণ নিয়ম অবশ্যপালনীয় তার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হয়, ফলও হাতে হাতে ফলে। আমার যে accident হইয়াছিল তাহা হইতেও একটা ধারণা বেশ করা যায়। Race-এ নাম দিলাম; লাহোর হইতে start, ৭৫০ মাইল পরে finish, আমাকে handicap দিল ১ঘণ্টা ৪০ মিনিট। রাত্রে মীরাটে এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিলাম, প্রাতে মোটরে আসিতে রাস্তায় দেরী হওয়ায়, মাত্র আমার start-এর ১০ মিনিট পূর্ব্বে Ærodrome-এ পৌছিলাম। দেখিলাম ১২টি বালির বস্তা plane-এ চাপাইয়া দিয়াছে অথচ petrol দিয়াছে অর্দ্ধেক tank. Plane petrol খাইবে, বালি ভক্ষণ সম্ভব নহে। বলিলাম বালি কম কর, tank ভরিয়া petrol দাও। তাহাই হইল, অতি তাড়াতাড়ি ৬ বস্তা বালি নামাইয়া ৩৬ গ্যালন petrol ভরিয়া দিল। প্রথম plane-এর ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পরে রওনা হইলাম। ৭৫০ মাইলের মধ্যে সকলের আগে পৌছিলে তবে জয় হইবে। উপরে উঠিয়া দেখিলাম "সামনের হাওয়া" (head wind) গতির বেগ হ্রাস করিয়া দেয়। ২৫০ ফুটে হাওয়া নাই, ওই height-এই তীরবেগে ছুটিলাম। ৪০০ শত মাইল যাইবার পর দেখা গেল, আমি প্রথম plane খানির মাত্র ২০ মিনিট পশ্চাতে আছি এবং এ পর্য্যন্ত আমার গতির বেগ average ১৩৭ মাইল হইয়াছে। Ærodrome-এর মধ্যে লম্বাভাবে দুইটি তীর-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল; ওই দুইটি তীরের মধ্যে দিয়া গেলে তবে সময় লইবে নতুবা নহে। নীচু দিয়া উড়ার জন্য আগে কিছুই দেখিতে পাই নাই; যখন উপরে আসিয়া পড়িয়াছি, দেখিলাম তীর-চিহ্ন right angles-এ cut করিতেছি; ঘুরিয়া আসিতে হইলে অন্ততঃ এক মিনিটও নষ্ট হইবে। Sharp banking করিয়া বাঁয়ে ঘুরিলাম লাইনের মধ্যে প্রবেশ করিতে। ডাইনে ঘুরিলে plane-এর nose উর্দ্ধমুখ হয় এবং বাঁয়ে ঘুরিলে নীচের দিকে মুখ হয়। যেমন মুখ নীচু হওয়া, ৬টি sandbag হুড়মুড় করিয়া সামনে আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়িতে ভাল বাঁধা হয় নাই, তাহাতে plane টাল সামলাইতে পারিল না, "এক বগ্‌গা" ঘুড়ির মত "গোঁৎ" খাইয়া nose-dive করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। সামান্য কাটিয়া কুটিয়া গিয়াছিল, plane খানি কিন্তু একেবারে চুরমার হইয়া গেল। এখন বুঝুন কত রকমের অসাবধানতা ও নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য এই accident ঘটিল। প্রথমত অত তাড়াহুড়া করিয়া start, তারপর এত low flight, তারপর বাঁয়ে sharp turn, তারপর loosely tied sandbags ইত্যাদি। তবুও দোষ বোধ হয় বেচারী

planeকে লইতে হইবে। একবার crash-এর পর আর সে plane-এ চড়িতে সাহস বা ইচ্ছা হয় না, engineটি খুলিয়া লইয়াছি মাত্র।

"মেঘের ভিতর দিয়া যাইতে কিরূপ মনে হয়? সাদা যে মেঘ তাহা অত্যন্ত হালকা হয় এবং তাহার ভিতর দিয়া যাইবার সময় ঠিক দার্জ্জিলিংএর কুয়াশার (fog) মত বোধ হয়। কতকটা ঝাপ্সা হইয়া যায়; খুব বেশী দূরে দৃষ্টি চলে না, কেমন একটা ভিজা ভিজা ভাব মনে হয়। কালো ঘন মেঘের মধ্যে পড়িলে দৃষ্টি আদৌ চলে না,তখন compass ও altimeter যন্ত্র দেখিয়া চালনা করিতে হয়। ওইরূপ মেঘের মধ্যে পড়িলে মেঘ ফুঁড়িয়া উপরে উঠিয়া যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। উপরে পরিষ্কার সূর্য্যকিরণ, নীচে কালো মেঘের উপর উজ্জ্বল গোলাকার "রামধনু", তাহার মধ্যে বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় plane-এর ছায়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সে এক চমৎকার দৃশ্য। ১৫,০০০ ফিট উপরে দারুণ শীত অনুভূত হয়। হাওয়ার চাপ হঠাৎ হ্রাস হওয়ায় অধিক উচ্চে উঠিলে অনেক সময় নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়। অধিক উচ্চ হইতে হঠাৎ নীচে নামিলে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কানে কিছুই শুনা যায় না। হাওয়ার চাপের তারতম্যের জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে। রাত্রে ওড়ার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় নতুবা একবার direction হারাইলে বড়ই মুস্কিল। আমি মাত্র একবার রাত্রে উড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তবে আজকাল তত আশঙ্কা নাই। এখন সবই সহজসাধ্য হইতেছে। ধরুন রাত্রে মহাশূন্যে আপনি এক "পথভোলা"; উপায়? উপায় আছে বৈ কি! আপনার বেতার মহাশূন্যে হাঁকিতে লাগিল, "Croydon Croydon Croydon, Lost! Lost!! Lost!!!" (ক্রয়ডন্, পথভ্রান্ত হইয়াছি) উত্তর মিলিল "পরিচয় দাও।" আপনার নম্বর, কোথা হইতে কখন রওনা হইয়াছেন, এখন কত উচ্চে উড়িতেছেন, আপনার average গতি-বেগ সব জানাইলেন; সেই মহাশূন্যে "বেতার বাহু" Croydon হইতে হাজার হাজার মাইল হস্ত প্রসার করিল আপনাকে plane সমেত গ্রেপ্তার করিতে, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হইল, "maintain height and move in a circle. পুনরায় বেতার বলিল, পাইয়াছি। তোমার সর্ব্ব নিকটস্থ Ærodrome "X", path দিলাম, অগ্রসর হও। তারপর কুহকী বিজ্ঞানের সে কি ইন্দ্রজালের খেলা! হাজার হাজার মাইল দূরে চক্ষের পলকে সেই মহাশূন্যে আপনার জন্য প্রস্তুত হইল কুড়ি ফিট চওড়া এক পথ, যাহা হইতে বিচ্যুত হইবার আর উপায় নাই। কানে buzzer বন্ধ হইয়া বুঝাইল, পথ ছাড়িয়াছেন ডাহিনে চাপিতে হইবে, এইরূপে buzzer বাজিয়া ও বন্ধ হইয়া ডাহিনে, বাঁয়ে, নীচে, উপরে তাড়াইয়া লইয়া চলিল Ærodrome-এর দিকে, যেখানে পথভ্রান্ত পথিককে আলো দেখাইয়া অভ্যর্থনার জন্য ৫০ মাইল লম্বা beam-এর beacon light, বেতারে সজাগ হইয়া আপনাকে ইসারায় ডাকিতেছে। Ærdrome-এর উপরে আসিলেন, flood-light জ্বলিয়া উঠিল, প্রতি তৃণগাছি পর্য্যন্ত দেখা যায়. safe landing, তার পর বিশ্রাম, নিরুদ্বেগে—যতক্ষণ না মোটা বিল পৌঁছিল এই বেকুফির আক্কেল সেলামি স্বরূপ।

"আমেরিকায় সম্প্রতি autogyro বিমান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। লম্বা চার খানি পাখা উপর দিকে শূন্যে ঘোরে। পুরাতন বিলাতী windmill-এর ছবিতে যেরূপ পাখা দেখা যায় অনেকটা সেইরূপ। এত stability দেয় যে, শূন্যে প্রায় স্থির হইয়া থাকা যায় এবং একটি বড় ছাদের উপরে নামা, উঠা যায়। বিমানের উন্নতি যে খুব দ্রুত হইতেছে সন্দেহ নাই।

Stratosphere-এ উঠিয়া experiment হইতেছে যাহাতে গতি-বেগ যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যায়। এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন ভারতে চা পান করিয়া বিলাতে পৌঁছিয়া বলা চলিবে, I had my tea in India *tomorrow* (আগামী কল্য ভারতে চা খাইয়া রওনা হইয়াছি)। ধরুন আজ এখানে ২০শে বিলাতে এখন ১৯শে চলিতেছে। এই ১৯শে ও ২০শের ব্যবধানটুকুর মধ্যেই (বাং সামান্য ৬ ঘণ্টা মাত্র) আপনি ভারত হইতে বিলাত পাড়ি দিয়াছেন।"

উন্নতি হইতে থাক, উন্নতিকারী ও কামীরা আমার মাথার মণি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তত এক বৎসর কাল নিয়মিত দিনের পর দিন খবরের কাগজে একটিও এরোপ্লেন দুর্ঘটনার কথা প্রকাশের সুযোগ ঘটিবে না, ততদিন (যদি বাঁচিয়া থাকি) বিধি নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া এই পুরাতন চিরপ্রচলিত শক্ত মাটির উপরই যাতায়াত করা যাক্; আপনারা কি বলেন?

প্রাচীন শিল্পের ধারা

-শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রাচীন ব্যাবিলন

(খৃঃ পূঃ ৪০০০ হইতে ৭৪০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত)

নীলনদের তীরে যেমন প্রাচীন মিশরের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তেমনি মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রাটীস এবং
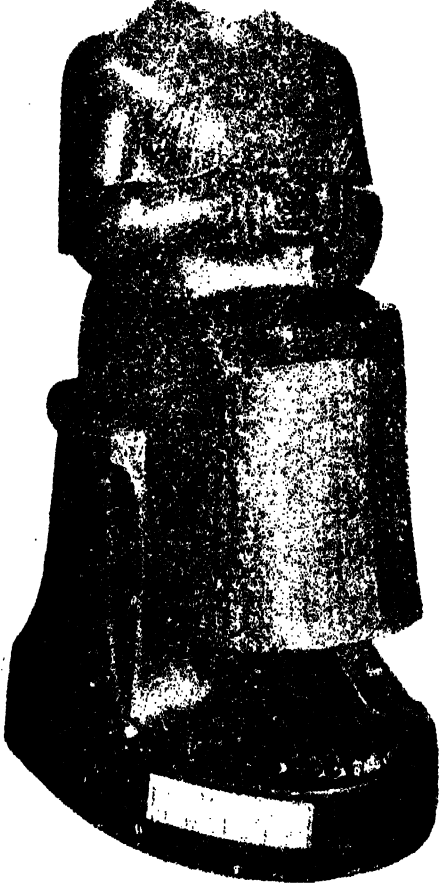
ব্যাবিলন (৩০০০ খৃঃ পূঃ) : সম্রাট গুডিয়ার মূর্ত্তি (লুভর্ চিত্রশালা, প্যারি)।

তিগ্রীস নদীর মধ্য-ভূভাগে প্রাচীন খালদেয়া এবং আসিরিয়ার সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। আক্কাদ-সুমের জাতি খালদেয়া সভ্যতার সূত্রপাত করে; আক্কাদ-সুমের জাতি প্রাচীন যুগের তাতার-তুরাণী জাতির সহিত যুক্ত। অনেকে এই আক্কাদ-সুমের জাতির সহিত ভারতের দাবিড় সভ্যতার সংস্রব প্রমাণ করিতে চান।

জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রাচীন খালদেয়ার দান আছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের মতে জ্যোতিষ-বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল এই খালদেয়ার মেষপালকদের ভিতর। রাত্রে তাহারা নির্ম্মল আকাশের তারকাগুলীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল। জ্যামিতি এবং স্থপতি-বিজ্ঞানের অনেক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেই তাহাদের জ্ঞান ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খালদেয়া রাজ্যের রাজধানী 'ব্যাবিলন'। বাইবেলে উক্ত স্বর্গোদ্যান ব্যাবিলনেই ছিল। বাইবেলের 'বেবেল টাওয়ার'-এর চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। পাথর কাছাকাছি পাওয়া যাইত না বলিয়া এখানকার ইমারত হইত রোদে পোড়ান ইট দিয়া। 'বেবেল টাওয়ার' অনেক স্তরযুক্ত ইটের এক বিরাট স্তূপ, উপরে ইহার দেবতার

ব্যাবিলন (৩০০০ খৃঃ পূঃ) মস্তক : টেলোর রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত (লুভর্ চিত্রশালা, প্যারি)।

মন্দির, বাহির দিয়া সিঁড়ি উপরে যাওয়ার।

বর্ত্তমান টেলো নামক স্থানে সম্রাট এবং ধর্ম্মযাজক

গুডিয়ার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে—বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ প্রাসাদ, দেওয়ালে রঙীন 'মোজেইক' কাজ। প্রাচীন খালদেয়ার কিছু মূর্ত্তিও পাওয়া
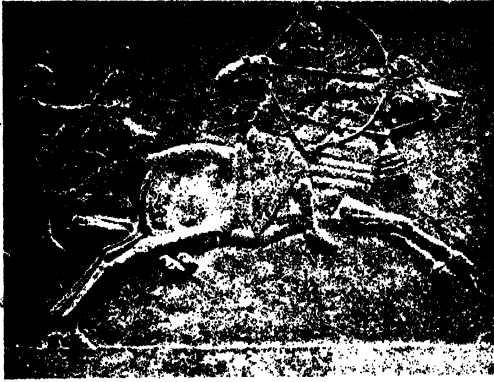
এসিরিয়া (খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) যুদ্ধনিরত সম্রাট, প্রস্তর ফলকে স্বল্প খোদিত মূর্ত্তি (বা রিলিফ) [ব্রিটিশ মিউজিয়াম]।

গিয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল সম্রাট গুডিয়ার কয়েকটি মূর্ত্তি। একটি মূর্ত্তির কোলের কাছে স্থপতির একটি মানদণ্ড এবং কম্পাস রাখা। এই মূর্ত্তি খৃঃ পূঃ প্রায় ২৮০০ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করা হয়।

গুডিয়ার প্রাসাদ হইতে অনেক ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন খাল্‌দেয়া এবং এসিরিয়ার ইতিবৃত্ত ইটের পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়। এই পুস্তক ইটের টালির উপর লোহার শলা দিয়া লেখা হইত, এ লিপিকে বলা হয় 'বান-মুখো লিপি।' কেন না, অক্ষরগুলি ছিল তীরের ফলার ন্যায় দেখিতে।

এসিরিয়া

(৮৮৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৬০৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত)

এসিরিয়রা খালদেয়দের হইতে অধিক দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাহারা খালদেয়দের জয় করিলেও বিজিতদের দ্বারা পরাভূত হইল। খালদেয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, এসিরিয়রা গ্রহণ করিল। রোমানেরা ছিল সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধপ্রিয়; ললিত কলার ধার ধারিত না; তাহারাও ঠিক এমনি গ্রীক-দের জয় করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীকদের জ্ঞান এবং শিল্প গ্রহণ করিয়াছিল।

এসিরিয়দের রাজধানী ছিল নিনেভা নগরে। প্রাচীন সম্রাট অসুরনাজিরপাল (৮৮৫ খৃঃ পূঃ) সারগণ, সেনাচরিব, অসুরবনিপাল (৬৬২—৬২৬ খৃঃ পূঃ) প্রভৃতিদের প্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খালদেয়রা ইটের বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু এসিরিয়রা নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে পাথর এবং গাছ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রাসাদ এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এসিরিয়দের মন্দির ছিল পিরামিডের ন্যায় চতুষ্কোণ, সপ্ততলবিশিষ্ট, বিরাট স্তূপের উপর। প্রত্যেক তল এক এক গ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত হইত। সকলের উপরে থাকিত গোলাকৃতি এক মন্দির, সোনালি তার গম্বুজ ছিল। উপরিতল ছিল 'বেল' অথবা সূর্য্যদেবতার অধিষ্ঠান।

নিনেভার প্রাচীন রাজাদের প্রাসাদের বিবরণ ধ্বংসস্তূপ হইতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভগ্ন অংশ এক সঙ্গে গাঁথিয়া প্রাসাদের আভাস ঠিকরূপেই পাওয়া গিয়াছে। সুরক্ষিত প্রাসাদের চারিদিকে উচ্চপ্রাকার এবং তাহার মাঝে মাঝে স্তম্ভ থাকিত। প্রবেশ-পথে প্রকাণ্ড বড় ব্রোঞ্জের তোরণ এবং তোরণের দুইদিকে প্রকাণ্ড বড় মানুষের মাথা এবং পাখা-

এসিরিয়া (খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) সিংহশিকার, প্রস্তর ফলকে স্বল্প খোদিত মূর্ত্তি (বা রিলিফ) [ব্রিটিশ মিউজিয়াম]।

ওয়ালা সিংহ বা ষাঁড়ের মূর্ত্তি থাকিত। দেওয়ালে অনেক যায়গায় পালিশ করা রঙীন টালি এবং ষ্টুকো কাজ পাওয়া যায়।

ভাস্কর্য্য

অসুরনজির পাল এবং আরও দুই একটি মূর্ত্তি ছাড়া, পূর্ণ খোদিত মূর্ত্তি নাই। এই খোদিত মূর্ত্তির বিশেষ কিছু কলানৈপুণ্য নাই। এসিরিয়া যেসব মূর্ত্তির জন্য খ্যাত, সে-গুলি সবই 'হাই' বা 'লো'-রিলিফ, অর্থাৎ পাথরের গায়ে বেশী উঁচু করিয়া অথবা নীচু করিয়া খোদিত মূর্ত্তি।

এসিরিয়ার মূর্ত্তিতে কোন মাধুর্য্য পাওয়া যায় না, দেহের গঠন, বিশেষ করিয়া মাংসপেশীর দৃঢ়তা দেখাইতে শিল্পী চেষ্টা করিয়াছে। এখানে শিল্পী পুরাপুরী বস্তুতন্ত্রী। শিল্পী যেখানেই

এসিরিয়া: আলঙ্কারিক কার্য্য।
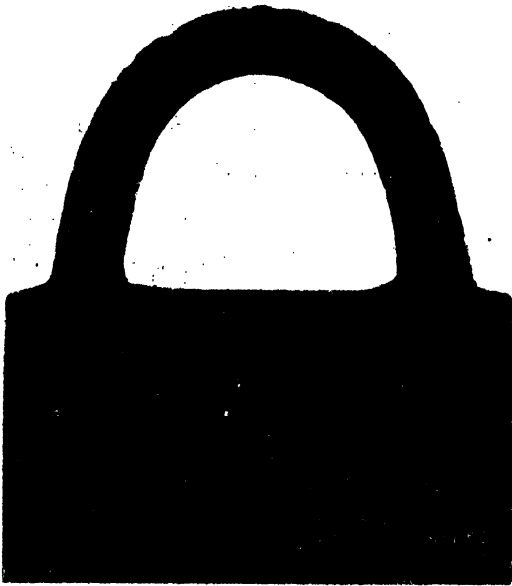
নিপুণ, সেখানে বাস্তবতা দেখাইতে পারিয়াছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর শিল্পীরা অযথা দেহের খুঁটিনাটি লইয়া রহিয়াছে, তাহা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। মিশরের শিল্পী তাহার 'ট্রেডিশন' বা লোক-পরম্পরাগত প্রথা অবলম্বন করিয়া উহা অপেক্ষা সুফল পাইয়াছে। এসিরিয়-শিল্পী এক বিষয়ে মিশরের শিল্পী হইতে শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্তির ভিতর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন অধিক দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে।

রাজাদের অনেক যুদ্ধের দৃশ্য বা শিকারের দৃশ্য 'বা-রিলিফে' খোদিত আছে। এসব বিষয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। এসিরিয়ার এক সম্রাট ইটের পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, "আমার যুদ্ধরথ মানুষ, জন্তু এবং শত্রুর দেহ চূর্ণ করে। মানুষের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া মৃতদেহের স্তূপ আমি নির্ম্মাণ করি। যে সকল শত্রুকে জীবন্ত বন্দী করিয়াছি, তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলি।" সম্রাটদের ছিল যেন রক্তের নেশা। সম্রাট ঐহিক এবং পারমার্থিক দুই জগতেরই নেতা ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞার অবমাননা করিলে প্রাণদণ্ড হইত। শিল্পী তাহার শিল্পে এই সম্রাটদের তুষ্টি সাধন করিয়াছে। ক্রমাগত যুদ্ধ, আক্রমণ, দুঃখ-ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে, শিল্পীর নিজের অন্তস্থল দেখিবার অবসর ছিল না। মিশরের শিল্পীরা তাহাদের আর্টে যে একটি রহস্য সৃষ্টি করিয়াছে, মূর্ত্তির ভিতরে একটি চিন্তারত ভাব আছে, সে জিনিস এসিরিয়ার কাজে পাওয়া যাইবে না।

এসিরিয়ার সব মূর্ত্তিই বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে; সুদীর্ঘ চক্ষু, বক্র নাসিকা, মাংসপেশী, স্নায়ুমণ্ডলী সব যেন পাশবিক শক্তির পরিচয়—মানুষের ভিতর যে হত্যাকারী আছে, তাহারই প্রকাশ যেন মূর্ত্তির ভিতরে।

এসিরিয় শিল্পে রমণীর মূর্ত্তি পাওয়া যাইবে না, রমণীর কমনীয়তা শিল্পীকে মুগ্ধ করে নাই।

এক বিষয়ে এসিরিয় শিল্পী পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন কালের শিল্পীকে পরাস্ত করিয়াছে। জন্তুকে যে রকম করিয়া সে প্রকাশ করিয়াছে, সে রকম কোন শিল্পী পারে নাই। শুধু প্রাচীন যুগে নয়, পরবর্ত্তী যুগেও কোন শিল্পী এসি-রিয় শিল্পীদের মত এ বিষয়ে সফলকাম হয় নাই। একটি চিত্র—রাজা অসুরবনিপালের সিংহ শিকার। রাজা রথে চড়িয়া চলিয়াছেন, পিছনে এক বাণবিদ্ধ সিংহ আক্রমণ করিয়াছে, সিংহের সম্মুখের দুই পা রথের উপর তোলা; বেদনায় গর্জ্জন করিতেছে। পশুরাজের মূর্ত্তিই বটে। আর একটা সিংহ পড়িয়া আছে ঘোড়ার পায়ের নীচে।

ইহার পরে আর এক দৃশ্য দেখা যাইতেছে, রাজা রথ হইতে নামিয়াছেন। ভৃত্য মৃত সিংহের কেশর ধরিয়া আছে এবং প্রভুর দিকে তাকাইয়া আছে, রাজা হাত প্রসারিত করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছেন। রাজার পিছনে দুইটি ঘোড়া, সরু পা, সিংহের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—একটু যেন ভয় হইতেছে অগ্রসর হইতে, নাক দিয়া বোধ হয় তীব্র নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

মরণোন্মুখ সিংহীর চিত্র—ইহার তুলনা পাওয়া মুস্কিল কোন শিল্পে। পিঠের উপরে তিনটি বাণ, সামনের পায়ে ভর দিয়া কোন রকমে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, পিছনের পায়ে আর শক্তি নাই, মাটীর সঙ্গে একেবারে সমান হইয়া গিয়াছে, কোন রকমে টানিয়া হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। শেষ মুহূর্ত্তে কি তীব্র চেষ্টা, শরীরের রেখায় কি শক্তির পরিচয়!

সকল জন্তুর চিত্র প্রাণবন্ত এবং গতিবান, কোথাও কোন জড়তা নাই, দ্বিধা নাই। মানুষের চিত্রে এসিরিয় শিল্পী যেন ছিল রাজার দাসত্বে আবদ্ধ, জন্তুর চিত্রে সে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার কল্পনা, কলাকৌশল জন্তুর চিত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে।

এসিরিয়ার শিল্প বিশেষ করিয়া প্রভাবিত করিয়াছে প্রাচীন পারস্যের এবং ইজিয়ান শিল্পকে।

নতুন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য

(৬০৬—৫৩৮ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত)

নিনেভা ধ্বংস করিয়া নবুনাটসার (গ্রীক উচ্চারণ —নব নাশর) নতুন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র, নেবুকাডনেজারের আমলে ব্যাবিলন নগর বহু সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের পরিধি ১৭০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল বলিয়া কথিত। ইউফ্রাটিসের দুই তীরেই নগর বিস্তৃত ছিল। এই আমলেই ব্যাবিলনের বিখ্যাত শূন্য-উদ্যান নির্ম্মিত হয়; ইহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য। মিশরের ফেরোয়া দ্বিতীয় রামসেসের মত নেবুকাডনেজার তাঁহার সাম্রাজ্যে অনেক মন্দির এবং স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; মন্দিরে সূর্য্যদেবতার অধিষ্ঠান ছিল। মন্দিরে সোনার মূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরের সু-উচ্চ সোনালী গম্বুজ ব্যাবিলনের মরু-পথে 'কারাভান' শ্রেণীকে পথ দেখাইত।

হিত্তী, ফিনিশিয়ান, সুমের সভ্যতা

এশিয়া মাইনরে এই তিন প্রাচীন জাতির সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা প্রাচীন মিশরের সমসাময়িক।

ফিনিসিয়া: আলঙ্কারিক কার্য্য (ক্রিজ—লুভর্)।
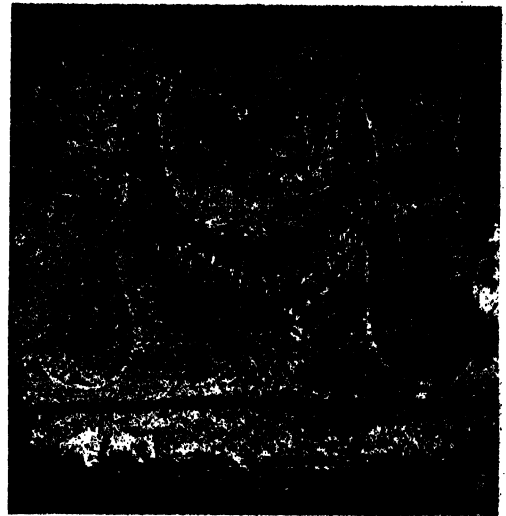
৩০০০ খৃঃ পূঃতেও ইহাদের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফিনিশিয়ানরা ছিল বণিক জাতি। প্রাচীন সকল সুসভ্য রাজ্যে তাহাদের বাণিজ্যসম্ভার লইয়া যাইত। প্রবাদ, ফিনিশিয়ানরাই জগতে প্রথম ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালা সৃষ্টি করে।

জাতির জীবন

তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও, অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু তোমাদের সম্মুখে কর্ম্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

চিত্র-স্বয়ম্বরা

—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

[১]

আজকাল কন্যাদায়ের কথা সর্ব্বত্রই কত রকমে আলোচিত হইয়া থাকে। কন্যাদায় আছে। আছে দরিদ্রের —ধনীর কি? ভাত ছড়াইতে পারিলে কাকের অভাব হয় না; টাকা ছড়াইতে পারিলে কন্যা যেমনই হউক বরের অভাব হয় না। চাই কেবল এইটুকু যে কন্যা যত নীরস, সরস বরের জন্য রূপার শিকলীটা তত লম্বা আর মোটা করিয়া দিতে হইবে। ব্যস! তা যদি কেউ পারে, হাঁদা-খাঁদা একটি কালো কন্যার জন্যও সওয়া গণ্ডা চাঁদের মত বর বাঁধিয়া আনা যায়।

সচরাচর অবশ্য বেশী আমদানী—কাঁচা মালের ন্যায় কনে যাচিয়া বাছিয়া বেড়ান, ওঠান, বসান, হাঁটান, চলান, পড়ান, লেখান; খোঁপা তুলিয়া চুল দেখেন, কাপড় তুলিয়া পা দেখেন, চাওয়াইয়া চোখ দেখেন, আবার গান শোনেন, নাচের কসরৎও কেহ কেহ আজকাল দেখিয়া লয়েন। আবার হালফ্যাসানী বিলাতফেরত কি হবু বিলাতফেরত বর কেহ কেহ একা ঘরে কনে লইয়া দরজা বন্ধ করেন কি বাড়ীর ছাদে গিয়া ওঠেন, মোটর-বিহারেও বাহির হন। কোর্টশিপে কনে বাজাইয়া লইতে চান। এসব বরের লোভ বড় বেজায় লোভ; পাইলে মা বাপের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আহা, যদি পছন্দ করে, মেয়ে যদি কোনও মতে বাগাইয়া লইতে পারে, বিবি হইয়া যে কত বাহার সে দিবে!

সচরাচর সাধারণ লোকের মধ্যে কনের বাছাই যাচাই এমনই এখন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচুর টাকা ঘরে থাকিলে কনের বাবাও বর আবার এমনই বাছাই যাচাই করিয়া লইতে পারেন। তেমন তেমন হইলে কনে নিজেই না কোন্ বরকে একা ঘরে বাজাইয়া লইতে পারে? কি জানি তেমন কনে বোধহয় এখনও এদেশে জন্মায় নাই। তবে তেমন বেশ জোরাল রূপার শিকলি গলায় পড়িলে, এমন বাপ এমন বর কমই আছে, যাচাই বাছাই করা দূরে থাক, নিজেরাই যাচাই বাছাই হইতে সে টানে না গা ছাড়িয়া দেন।

বড় কোনও দৈনিক কাগজে এমনই একটা বিজ্ঞাপন এক দিন বাহির হইল, যথা—

'কোনও উচ্চপদস্থ ধনীর সুশিক্ষিতা কন্যার জন্য একটি অতি সুরূপ ব্রাহ্মণ-জাতীয় পাত্র চাই। পাত্র উদার মতাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। ঐ শিক্ষার এবং অনুরূপ বৃত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সমস্ত ব্যয় কন্যার পিতা বহন করিবেন; প্রচুর যৌতুকও দিবেন। ফোটোসহ···নং বক্সে সত্বর আবেদন করহ।'

ব্রাহ্মণবংশীয় গ্রাজুয়েটমহলে সেদিন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অবশ্য খুব ঢাকঢোল পিটান লোক জানান, প্রকাশ্য একটা সাড়া যে পড়িয়াছিল, তাহা নয়। তবে আপন আপন অন্তরে আর নিভৃত ঘরে জনে জনে যে সাড়াটা পড়িয়াছিল, তাহা যদি সব বাহিরে সদরে একজোট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত, তবে অতি বড় একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারই ঘটিত সন্দেহ নাই।

পয়সার মালিক শ্বশুর, বহু যৌতুক, আবার বিলাত যাওয়ার ও অন্ততঃ ব্যারিষ্টারীতে বসিবার সব খরচ, মায় ভাল বাড়ী, মোটর গাড়ী, রেডিও সেট—দশ পনের স্যুট অন্ততঃ দামী পোষাক—কি না মিলিবে! শ্বশুরের মেয়ে যেমনই হউক—মেয়ে বলিয়া কোন বস্তু থাক্ কি না থাক্—ইহাতেই যে সকল সাধনার চরম সিদ্ধি, সকল কামনার পরম পূর্ত্তি! আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের পক্ষে ইহার বড় কাম্য, ইহার উপরে সাধ্য, আর কি থাকিতে পারে? সাড়া পড়িবে না কেন? সদরে একটু লজ্জার বাধা আছে। কিন্তু অন্দরে কার ভয়? তাই অন্দরে অন্দরে, আপন আপন ঘরে, বেজায় মন জাগান, প্রাণ নাচান সাড়াই সেদিন পড়িয়া গেল। অকৃতদার ব্রাহ্মণযুবক সেদিন অল্পই এই কলিকাতার মেসে বা গৃহাবাসে ছিল, যার নাকি বিজ্ঞাপন পড়িয়া বুকটা দুরু দুরু

না করিয়া উঠিল, দেহ ভরিয়া পুলকোষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাস চঞ্চলে নাচিয়া শিরায় শিরায় না ছুটিল, ত্রস্ত কম্পিত চরণে যে নাকি তখনই গিয়া আরসীতে মুখ না দেখিল!

রূপগর্ব্বিত সকলেই প্রায় গোঁফ কামাইল, সাবান মাখিল, কড় ষ্টার্চ্চকরা কামিজ বাহির করিয়া বা কিনিয়া পরিল। কেহ বা টাই-কলার-কোট-ভেষ্টে সাহেব সাজিল। তারপর সাহেব-বাড়ীতে গিয়া খাসা কায়দা-করা 'বাষ্টে'র ফোটো তুলিল। ফোটোওয়ালাদের যেন মরসুম পড়িয়া গেল!

কয়েক দিনের মধ্যেই শত শত ফোটো সহ আবেদন খবরের কাগজের সেই···নং বাক্সে গিয়া পড়িল। ম্যানেজার হাসিয়া সেগুলি বস্তা বাঁধিয়া কুলির মাথায় দিয়া স-কুলিভাড়া-বিলসহ বিজ্ঞাপনদাতার গৃহে পাঠাইলেন।

গৃহে হাসির রোল উঠিল। বিজ্ঞাপনদাতা বাঙ্গালী সাহেব মিষ্টার সি. ডি. গ্যাটাক (চন্দ্রবিহারী ঘটক) কন্যা 'লরা'(লহরা)কে চিত্র-স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিলেন। লরা অনেক দেখিয়া অনেক পরখ করিয়া একখানি ফোটো বাছিল। ভগ্নী ফ্লোরা (ফুল্লরা) কহিল, "তোর রুচিকে বলিহারি দিদি! ওটা কি বাছলি?"

লরা উত্তর করিল, "ছবি ত চেহারা দেখেই বাছতে হবে? সব চেয়ে ওই চেহারাটাই ভাল নয় কি?"

"ছাই ভাল! লোকটা—আজকালকার মত কেতাদোরস্তই নয়।"

"কিসে?"

"মুখে যে গোঁফ রয়েছে।"

"তাতে কি হ'ল?"

"দূর! বলিস্ কি? আজকালকার এলিগ্যাণ্ট ফ্যাসানে কেউ গোঁফ রাখে? রামঃ! কি বিশ্রীই দেখায়? যেন থিয়েটারের সেপাই কি খোট্টা দারোয়ান!"

"আমার চোখে ত বেশ দেখায়।"

"তোর একার চোখে ভাল দেখালেই হ'ল? আমাদের চোখ বুঝি কিছু নয়?"

"তা আমার বর—আমার চোখে যদি ভাল দেখি, সেই ঢের হ'ল।"

"বর ত তুই একা দেখবিনি, আমরাও দেখব। দেখে আমাদেরও ভাল লাগা চাই। নইলে বোনাই ব'লে আদর করব কি ক'রে?"

লরা কহিল, "মানুষটি যদি ভাল হয়, তবেই ভাল। মুখে গোঁফ থাকলেই কি মানুষ আদরের অযোগ্য হয়?"

"তা হয় বই কি? গোঁফ যদি থাকল, তবেই বুঝতে হবে তার উঁচু সমাজের উন্নত রুচির মত রিফাইন্‌মেণ্ট কিছু হয় নি। কাজেই সে আমাদের আদরের যোগ্য হতে পারে না। জানিস ত সেদিন যে শ্রী চাটার্জ্জির বিয়ে হল, বর তার কথা-মত গোঁফ কামিয়ে আসে নি—শ্রী কি হুলুস্থুলই বাধিয়ে তুলল। বিয়ের আসরে বর আগে গোঁফ কামাল, তবে শ্রী তাকে বিয়ে করল।"

লরা উত্তর করিল, "শ্রীর সেটা বড় বিশ্রী বাড়াবাড়িই হয়েছিল। বরটা আদতে পুরুষই নয়। নইলে বিয়ের কনে বলতে পারে, গোঁফ আগে কামাও, তবে বিয়ে করব? অমন কনেকে নাথি মেরে চলে গেল না কেন?"

"ইস্! নাথি অমনি মারে আর কি? সে দিন আর নেই দিদি। তা তুই তবে ঐ গুঁফো বর ছাড়বিনি? ওর নাথিই খাবি? জানিস মুখে যার চোয়াড়ের মত গোঁফ, নাথি সেই মারে?"

লরা কহিল, "তা চেহারায় আর স্বভাবে তেজী ধাঁচের হলেই পুরুষকে বেশী মানায়।"

"তাই বলে তার নাথি খেতে হবে বুঝি?"

"বলিস কি ফ্লোরা? পুরুষ তেজী হলেই কি মেয়েমানুষকে নাথি মারে? রাম সীতাকে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে কখনও নাথি মেরে ছিলেন? অমন যে রাবণ, সেও মন্দোদরীকে নাথি কখনও মারে নি।"

"ও বাবা! তুই যে একেবারে ত্রেতা দ্বাপর গিয়ে পড়লি! স্বয়ম্বরা হচ্ছিস কি না? তা ত্রেতা দ্বাপর আর নেই যে। ঘোর কলিও কেটে যাচ্ছে। নতুন আলো নিয়ে নতুন সত্যিযুগ আসছে জানিস? সেই যুগের মত তোর ও বরের কিছুই নেই। আছে কেবল কলির গোঁফের কলঙ্ক, আর কিছু নয়।"

হাসিয়া লরা কহিল, "আর কি নেই রে?"

ফ্লোরা কহিল, "দেখছিস না শুধুই কামিজ-পরা ফোটো, কলার-টাই নেই—কোট নেই—"

"তা এখনও ত বিলেত যায় নি। যখন যাবে, তখন পরবে। সাহেবী পোষাকে যারা ফোটো তুলেছে, তারা যে

সর্ব্বদা সাহেবী পোষাক পরেই থাকে তা নয়। অনেকে হয়ত আর কারওটা ধার করে নিয়ে গিয়েই ফোটো তুলিয়েছে।”

“তা হলেও তাদের এটুকু আক্কেল অন্ততঃ আছে—এটুকু তারা জানে কি ভাবে কি সাজে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে হবে। আদব-কায়দার জ্ঞান কিছু আছে।”

হাসিয়া লরা কহিল, “তা বাঙ্গালীর ছেলে কোট-কলার-টাইতে না সাজলেই বে-আদব কি বে-কায়দা হয় না। আর জানিস ত বাবা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—তাতে বড় লোকও চান নি আর বড়লোকের ছেলে কেউ বিয়ের জন্য দরখাস্তও করে নি। ধার-করা বড়মানষী সাজের চাইতে গরীবের মোটা সাজই ভাল। তাতে তার স্বভাবের এইটুকু পরিচয় অন্ততঃ পাওয়া যায় যে, আপনার উপর একটা মর্য্যাদাবোধ কিছু আছে।”

“তা যদি বলিস দিদি—তবে উচিত কথাই বলতে হয়। বাবার ঐ বিজ্ঞাপন দেখে লোভে পড়ে যে দরখাস্ত করেছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ তার আদবেই নেই।”

ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লরা কহিল, “ঠিক বলেছিস ফ্লোরা। বাবা এমন একটা বিজ্ঞাপন না দিলেই বুঝি ভাল হত।”

বলিয়া কতক্ষণ ফোটোখানির দিকে চাহিয়া রহিল। আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, “লোকটি কে জানিনে। তবে দরখাস্ত যদি ও না করত তা হলেই ভাল হ’ত।”

“অমন পছন্দমত বর তবে কোথায় মিলত?” হি হি করিয়া ফ্লোরা হাসিয়া উঠিল।

“জানি না। যাক! যা এই ফোটো নিয়ে বাবাকে দিগে যা।”

ফ্লোরা কহিল, “আরও খানকতক বরং বেছে রাখ। আলাপে যদি দেখা যায় এটা একেবারেই অচল, তখন ত আর একটা খুঁজতে হবে!”

“দূর! বর কি একেবারে পাঁচটা বাছতে আছে? আমি ত আর দ্রৌপদী নই।”

“এটা যদি না চলে?”

“চলবে—চলবে—চলতেই হবে! পছন্দ করলাম যে! তুই যা।”

“তা তোর খুসী। তবে আবার এই ফোটোর গাঁদি ঘাটতে হবে বলে রাখলাম।”

বলিয়া ফোটোখানি লইয়া ফ্লোরা পিতার কাছে গেল।

[২]

মেছোবাজারের রাস্তায় এক মেসের বাড়ীতে পিয়ন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলিয়া গেল। হুটপাট করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। মেসবাসী যুবক অনেকেই নববিবাহিত, কেহ বা নূতন প্রণয়ী, আরও অনেকে ‘wanted’ বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরীর দরখাস্তও এখানে ওখানে করিয়াছে। প্রিয়-তমার প্রেমলিপি অথবা চাকরীদাতা কোনও মনিবের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্তে ডাকের সময় অধিকাংশই ইহারা প্রত্যাশা করিত। পিয়নের সাড়া পাইলে দুপদাপ চটাপট চরণশব্দে সিঁড়িবারান্দা সব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। বাক্স খুলিতে খুলিতেই চিঠি লইয়া কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত, এই কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়িতে চিঠি ছেঁড়াছিঁড়ি এবং ঝগড়াঝগড়িও কত হইয়া গিয়াছে। চিঠি-বিলির কত নিয়ম বাঁধা হইয়াছে, নিয়মের প্রতিলিপি ঘরে ঘরে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনও চেষ্টাই দীর্ঘ সাফল্য লাভ করে নাই। সেদিনও যখন পিয়ন চিঠি দিয়া গেল, তখন হুটাপুটি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল, তেমনই ধপাধপ চটাপট ‘স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ!’

কয়দিন ধরিয়া বিরহী প্রেমিক এবং চাকরী-প্রত্যাশী ব্যতীত আরও কতিপয় যুবকও কিসের প্রত্যাশায় যেন উহা-দের অপেক্ষাও খরতর আবেশে ছুটিয়া আসিত, আজও আসিয়াছিল। বাক্স খুলিতেই দেখা গেল সকল চিঠি যেন আঁধার করিয়া নন্দগোপালের নামের ঠিকানাসহ বড় এক-খানা পুরু খাম বাক্সের মধ্যে জাঁকিয়া রহিয়াছে। নন্দ গোপাল অমনি থাবা দিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইল।

“কি রে নন্দা! ও কার চিঠি? দেখি—দেখি—”

অনেকে গিয়া নন্দকে ধরিয়া চিঠিখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

“দূর হ হতভাগারা! যার চিঠি হ’ক তোদের কি? ছাড়—ছাড়—”

চিঠিখানি দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া নন্দ সকলকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের দিকে চলিল। সকলের কৌতূহল আরও ড়িল। কেহ কেহ বলিল, "বিয়ের ডাক পেলি না কি রে? দরখাস্ত করেছিলি?"

"বটে। বটে। ওরে ধর্ ধর্। দেখি না লোকটা কে?"

সকলে এবার নন্দকে ঘিরিয়া চাপিয়া ধরিল। তবে নন্দও ছিল বেশ বলিষ্ঠগঠনের যুবা। দৃঢ়পেশল দুই বাহুর সজোর সঞ্চালনে ও বলিষ্ঠ দেহের ধাক্কায় সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ত্বরিতে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, দ্রুত ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সকলে গিয়া দরজার উপরে পড়িল; কতক্ষণ খুব ধাকাধাক্কি করিয়া অগত্যা শেষে নিরুপায় হইল। নন্দের প্রতিদ্বন্দ্বীও কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে ছিল। মনটার মধ্যে তাহাদের বড়ই খোঁচাখুঁচি করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি? নন্দ যে দরজা খোলেই না। দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে গেলে খেসারৎ দিতে হইবে যে।

বেলা হইল, স্নানাহার করিয়া কলেজ আফিস যাহাদের ছিল, বাহির হইয়া গেল। নন্দ তখন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া স্নানাহার করিল। বলা বাহুল্য ঘটকদুহিতা লরা যে যুবকের আলোকচিত্রখানি পছন্দ করিয়াছিল, মেছুয়া-বাজারের মেসবাসী আমাদের এই নন্দগোপালই সেই যুবক। মেসে থাকিয়া সে তখন এম-এ আর ল পড়িতেছিল, যেমন আর পাঁচ ছেলেও পড়িয়া থাকে। পত্র সি. ভি. গ্যাটাকের নিকট হইতেই আসিয়াছিল। তারিখ ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া নন্দ বা এন. জি. ঘোষালকে তিনি বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

সেদিন অপরাহ্ণ ও রাত্রি নন্দ বড় মধুর কল্পনার স্বপ্নে বিভোর হইয়া কাটাইল। এ স্বপ্ন যে প্রেমের নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহার মধ্যে ভাবী শ্বশুর অবশ্য একজন ছিল, কিন্তু সেই ভাবী শ্বশুরের কন্যা কোনও প্রেমপাত্রীর অস্তিত্ব একরূপ ছিলই না। তবে শ্বশুর ও বিবাহের কথা যখন আছে, শ্বশুরের কন্যা কেহ থাকিবেই। কিন্তু সেই কন্যা পরী কি পেত্নী, ময়ূরী কি ভেকী, এ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান কি অনুভূতি নন্দর ছিল না। এখনও বিশেষ কোনও চিন্তা সে করিল না। ধনীর কন্যা—সাহেবী ধরণ—চলনসই অবশ্যই হইবে। তাই যথেষ্ট। নন্দ ভাবিতেছিল, ভাবিয়া মত্ত হইতেছিল, সে বিলাত যাইবে। সিভিলিয়ান—না, সে বয়স কি প্রতিভা নাই। নাই থাকিল, ব্যারিষ্টারী পড়িবে, বিলাতী হোটেলে থাকিবে, দেশে ফিরিয়া সাহেবী কলিকাতায় তাড়িত আলো পাখায় সমুজ্জ্বল ও সুশীতল সুশোভন বাড়ীতে থাকিবে, মোটর হাঁকাইয়া হাইকোর্টে যাইবে, নামজাদা সব বড় বড় ব্যারিষ্টারের সমকক্ষ হইবে, টাউন-হলে গিয়া বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিয়া কত বাহবা পাইবে, ছুটীতে সস্ত্রীক ফার্ষ্ট ক্লাস সেলুনে চড়িয়া দূর দূর পাহাড়ে কি সাগরতীরে হাওয়া খাইতে যাইবে। ইয়োরোপ ভ্রমণেও সস্ত্রীক মধ্যে মধ্যে বাহির হইবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বঙ্গীয় যুবকের জীবনসিদ্ধির পক্ষে যাহা কিছু কাম্য হইতে পারে, সব আজ তার হাতের মুঠোয় আসিয়াছে! বস্ আর চাই কি?

কেন সে মোহন স্বপ্নের মোহবিভোরতায় জীবনে প্রথম এই অননুভূতপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত মধুযামিনীর মাধুরী উপভোগ করিবে না?

[৩]

চারিটা বাজিতে ঠিক দুই মিনিট বাকী; নন্দ ঘটক সাহেবের বৃহৎ অট্টালিকার ফটক পার হইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিল। বেয়ারা সেলাম করিল। নন্দ তার হাতে কার্ড দিল। বেয়ারা দর্শনপ্রার্থীদের আসন নন্দকে দেখাইয়া নিঃশব্দ সাবধান পদক্ষেপে উপরে গিয়া উঠিল।

সাহেবের হাতে কার্ড পৌছিল। ঘড়ির দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন চারিটা বাজিতে মাত্র আধ মিনিট বাকী আছে। চারিটার সময় সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হাঁ, ছোকরা কেতাদুরস্ত পাংচুয়াল বটে। ঘটক সাহেব হৃষ্ট হইলেন; একটু মাথা নাড়িয়া স্বগত সেই আনন্দটুকুও ব্যক্ত করিলেন।

বেয়ারা আসিয়া নন্দকে উপরে যাইতে সঙ্কেত করিল। নন্দ উঠিল, সম্মুখের দেয়ালে আয়নার দিকে একবার চাহিল। ক্ষিপ্রহস্তে রুমালে কপাল ও কপোল মুছিল। গোঁফজোড়াটিতে অঙ্গুলীস্পর্শে মৃদু একটু চাড়া দিল। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সব সারিয়া ধীর অথচ দৃঢ় চরণক্ষেপে উপরে

গিয়া উঠিল; মুখে একটু মুচকি হাসিও ফুটিল; যদিও বুকটা ঈষৎ দুরু দুরু কাঁপিতেছিল।

বেয়ারার ইঙ্গিতে পরদা সরাইয়া নন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, ভাবী শ্বশুর জামাতায় চারিচক্ষুর মিলন হইল।

শ্বশুর দেখিলেন, জামাতৃপদপ্রার্থী আগন্তুক এই যুবক সুপুরুষ বটে। বেশভূষা—সাহেবী না হইলেও সুরুচির পরিচায়ক। বাজারের নূতন কেনা নয়—কিন্তু খাসা পরিচ্ছন্ন ও ডিসেণ্ট ধুতি পাঞ্জাবী; তার উপরে মিহি সূতার সাদা ধবধবে উড়ুনী দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া বাম স্কন্ধের উপরে উঠিয়াছে। পায়ে পাতলা মোজার উপরে হাল ফ্যাসানের পামসু, তাহাও সদ্যঃ ক্রীত নহে, অথচ বেশ পরিচ্ছন্ন। মাথায় ঘনকৃষ্ণ ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, তৈলনিষিক্ত নহে, সহজভাবে বিন্যস্ত—সুরুচির পরিচায়ক। কপোল ও চিবুকের শ্মশ্রু তীক্ষ্ণ ক্ষুরে অতি নিপুণহস্তে মুণ্ডিত, গুম্ফ ও সুবিন্যস্ত, কিন্তু অতিরিক্ত আগা বাঁকান, কায়দা কিছু নাই। মুখভরা সহজ একটি প্রফুল্লভাব; সাক্ষাৎমাত্র প্রসন্ন মৃদু হাসিতে সুকৃষ্ণতার আয়ত চক্ষু দুটি উজ্জ্বলে মধুর এবং অধর, ওষ্ঠ বড় মোহনভঙ্গীতে ঈষৎ প্রসারিত ও স্ফুরিত হইল। ঈষৎ শির নোয়াইয়া শিথিলমুষ্টি দক্ষিণহস্ত তুলিয়া ভাবী শ্বশুরকে নন্দ অভিবাদন করিল। শ্বশুরও বড় প্রীত হইলেন, সম্মুখস্থ চেয়ারে ভাবী জামাতাকে শিষ্টসম্ভাষণে বসিতে আদেশ করিলেন। সহসা এক পাশের দিকে রুদ্ধকণ্ঠে মৃদু হাসির ধ্বনি উঠিল। নন্দ চাহিয়া দেখিল, চটুল স্মিতনয়না, উৎফুল্ল স্মিতবদনা সুন্দরী এক তরুণী মূর্ত্তি পর্দ্দাটা ফাঁক করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সহসা তাহার চকিতদৃষ্টি পড়িবা মাত্র পর্দ্দাটি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল।

ঘটক ধমক দিলেন, "ফ্লোরা! ছিঃ! ও কি!"

নন্দর মুখখানিও একটু লাল হইয়া উঠিল। একটু উষ্ণ উচ্ছ্বাসও বক্ষ হইতে দেহমধ্যে চিন্ চিন্ করিয়া নাচিয়া ছুটিল! এই বুঝি তবে—বাঃ—বেশ ত! ঘটক সাহেব নন্দর দিকে চাহিয়া একটু কাসিলেন। তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ, তুমি তবে এন. জি. ঘোষাল?"

বিনীত ভাবে নন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম নন্দগোপাল ঘোষাল।"

"নন্দ—গো—পাল"—ধীরে ধীরে আপন মনে কি ভাবিতে ভাবিতে নামটি একবার উচ্চারণ করিয়া ঘটক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী এই কল্‌কেতায়?"

"আজ্ঞে না, পাড়াগাঁয়ে।"

"—পাড়াগাঁয়ে? কোথায়?"

নন্দ আপনার গ্রাম ও জেলার নাম বলিল।

—"বাড়ীতে কে আছেন?"

নন্দ উত্তর করিল, "অনেক আছেন—মা, বাবা, খুড়ো, ভাই, বোন—"

"—বাবা আছেন? হুঁ!—তাঁর কি করা হয়?"

"তিনি আমাদের জমিদারের নায়েব। গ্রামের কাছেই কাজ করেন, বাড়ীতেই থাকেন।"

"—হুঁ! লেখাপড়া কদ্দূর তাঁর হয়েছিল?"

"—বাঙ্গলা মন্দ জানেন না। তবে ইংরেজি বেশী শেখেন নি।"

ঘটক কহিলেন, "তা কিছু মনে ক'রো না বাবা, এ সব বুঝতেই পারছ—আমার জানা দরকার। তা—বাড়ীর অবস্থা কেমন?"

"খেয়ে পরে এক রকম চলে যাচ্ছে।"

"পাড়াগাঁয়ের মত।"

একটু হাসিয়া নিঃসঙ্কোচেই নন্দ উত্তর করিল "হাঁ, পাড়াগাঁয়ের মতই বই কি?"

—মনে মনে কহিল, বাবা যদি সহুরে সাহেব বড়লোকই হবেন, তবে বিয়ের ক্যাণ্ডিডেট হয়ে এখানে হাজির হব কেন? বিলেতে ত বাবাই পাঠাতে পারতেন।

"তোমার চালচলন ত পাড়াগাঁয়ের মত মনে হচ্ছে না?"

এবারও নন্দর একটু হাসি পাইল; কহিল, "আজ্ঞে ক'বছর ত সহরে আছি। এদিকের আদব-কায়দা একটু শিখেছি বই কি?"

"হুঁ—তা আরও বোধ হয় শিখতে হবে।"

একটু হাসিয়া ঘটক সাহেবও এই মন্তব্য করিলেন। নন্দও তেমনই একটু হাসিয়া কহিল, "তা দরকার হলে শিখব বই কি?"

ঘটক সাহেব চেয়ারে হেলিয়া নন্দর দিকে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন। তারপর কহিলেন, "তা বাড়ী-ঘর একদম ছেড়ে আসতে পারবে ত?"

চমকিয়া নন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে—অতটা কি দরকার হবে?"

"তা হবে বই কি? তোমার পিতা কি এই সম্বন্ধ গ্রহণ করবেন মনে কর?"

"সম্ভব নয়।"

"তবে?"

"তবে আপনারা যদি মনোনীত করেন, তাঁর অমতে নিজের কর্ত্তৃত্বেই বিয়ে করতে হবে।"

"তা হলে ত বাড়ীঘর আগে করতেই হবে। তোমার বাবা কি ক্ষমা করে তোমাকে আর গ্রহণ করবেন?"

"এখনই করবেন না। তবে আমি যদি না ছাড়ি, তিনিও একেবারে ছাড়তে পারবেন না। আজ না হয় কাল ছেলে বলে আবার আমাকে গ্রহণ করবেনই।"

ঘটক কহিলেন, "তা বাবাকে এতটা চটাতে কেন চাচ্ছ?"

নন্দ উত্তর করিল, "নিজের উন্নতির জন্য। তাঁর আশার অতিরিক্ত উন্নতি যদি হয়, আর আমার শ্রদ্ধা যদি তাঁর উপর থাকে—থাকবে বলেই ভরসা করি, সব শেষে ভুলে তিনি যাবেন।"

"তবু তাঁর অমতে কেবল নিজের কর্ত্তৃত্বে বিয়ে করা কি ভাল?"

নিঃসঙ্কোচে নির্ভীক ভাবেই নন্দ উত্তর করিল, "আপনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তাতে বিবাহার্থী যুবককে তার নিজের কাছেই চেয়েছিলেন, পিতার কাছে নয়। আজ তবে একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে আসবে, আমার মতই আসবে। কোনও পিতা স্বেচ্ছায় এই রকম বিজ্ঞাপনের ডাকে ছেলের সম্বন্ধ করতে আসেন না।"

ঘটক উত্তর করিলেন, "ছেলে আসতে চাইলে তাকে অনুমোদনও করতে পারে না।"

"মর্য্যাদাবোধ থাকলে তাও পারেন না।"

একটু হাসিয়া ঘটক ধীরে ধীরে কহিলেন, "মর্য্যাদাবোধ থাকলে ছেলে নিজেই কি আসে?"

নন্দ উত্তর করিল, "আজকালকার পক্ষে লোভটা বড় বেশী দেখিয়েছেন। আর যাকে কেউ মেয়ে দিতে চায়, তাকে অমর্য্যাদাও করে না। তাই নিজের অমর্য্যাদার বোধটাকে একটু চেপে ছেলে অনেকেই আসতে পারে, যেমন আমি এসেছি। আর আপনি চেয়েছেনও ত এই রকম ছেলে। যেমন চেয়েছেন, তেমনি ত পাবেন।"

"ব্রাভো! তোমার হেকামৎ বেশ আছে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, একটু পরীক্ষা তোমাকে করছিলাম। তা খাসা উৎরেছ তুমি। লোভে এসেছ বটে, তা সে লোভও তোমাতে অশোভন হয়নি। মন-খোলা সরলতা আর সাহস' ভরসা যদি থাকে, সব দোষ তাতে সাদা করে দেয়। লরা তোমার ফোটো পছন্দ করেছে; আলাপেও যদি পছন্দ করে, তবে তোমার সঙ্গেই তার বিবাহ দেব।"

লরা? ফ্লোরা নয়? ঐ মেয়েটি তবে বুঝি লরার ছোট বোন হইবে। তাই বটে! নইলে—বিয়ের ক'নে কোথাও এত বেহায়া হয়?

ঘটক আবার কহিলেন, "লরা যদি পছন্দ করে, বিয়ে আমি দেব। তবে তুমি যেমন নিঃসঙ্কোচে সব কথা বললে, আমিও গোটাকত কথা তেমনি বলতে চাই।"

"বলুন।"

ঘটক কহিলেন, "যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছি আমি; সম্পত্তিও মন্দ করিনি। একটি ছেলে বিলেতে পড়ছে, আর ঐ দুটি মেয়ে, এই মাত্র আমার সন্তান। আমি চাই এরা বেশ সুখে থাকে তার জন্যে খরচা করতেও প্রস্তুত। বুঝলে?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

ঘটক কহিলেন "হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ একেবারে স্বাধীন হতে পারে না। তারপর যে ভাবেই থাকি আর চলি ফিরি, এটা বোধ হয় জান আমি হিন্দু—"

"আজ্ঞে, না। এটা ত—জানতাম না।"

"তবে কি জানতে? ব্রাহ্ম?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া নন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে—কিছুই জানতাম না। ওটা ভাবিইনি মোটে।"

"বটে! বিয়ে করতে এসেছ, আর শ্বশুর হিন্দু কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান—কোন্ ধর্ম্মের কোন্ সমাজের লোক—এটা ভাবইনি মোটে?"

সহজ ভাবেই নন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আপনাদের মত বড়লোক যাঁরা কলকাতায় ইয়োরোপিয়ান ষ্টাইলে

থাকেন, তাঁদের যে কোনও ধর্ম্ম আছে বা থাকতে পারে, এটা সত্যিই কখনও মনে ভাবিনি। হিন্দু কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান যখন যেটা সুবিধে হ'লেই হয়। আর সমাজ—সে ত আপনাদেরই নতুন একটা সমাজ হয়েছে।"

একটু হাসিয়া ঘটক উত্তর করিলেন, "হাঁ, যা বলেছ ঠিক বাবা। তবে কি জান, সুবিধের জন্যেই বল আর যাই বল, আমি হিন্দু বলেই পরিচয় দিই। মেয়েরা এই ষ্টাইলে থাকে বটে, কলেজেও পড়ে, তবে রামায়ণ মহাভারত-টারত এসব বইও পড়তে দিই যে, হিন্দুর আদর্শও কিছু শেখে।"

"হুঁ! মেয়ের বিয়েও তবে হিন্দু মতেই দেবেন?"

"সেই রকমই ইচ্ছে আছে। তাই ত বিজ্ঞাপনে বামুন পাত্রই চেয়েছি। জেতে আমিও বামুন কি না? তা তোমার কি এতে কিছু আপত্তি আছে? বেহ্ম টেহ্ম হওনি ত?"

একটু হাসিয়া নন্দ কহিল, "আজ্ঞে না, ওসব বাই আমার কিছু নেই। তবে বড় একটা বাই বরাবর আছে বিলেত যাবার। তাই বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছি।"

ঘটক সাহেব কহিলেন, "হাঁ—তারপর যা বলছিলাম। মেয়ে মানুস—আরও—হিন্দুর মেয়ে একেবারে স্বাধীন কিছু আর হতে পারে না। বিয়ে দিলেই স্বামীর অধীন হয়ে সংসার তাকে করতেই হবে—"

"হুঁ—"

"তবে জান বাবা, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্—"

নন্দ হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। সম্ভাবিত এহেন শ্বশুরের মুখে সহসা এরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রবচন—সমস্ত মনটা ভরিয়া হঠাৎ যেন অসহনীয় একটা সুড়সুড়ি সে পাইল। হাসিটা শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া সশব্দেই ধ্বনিয়া উঠিল। রুমাল চাপা দিয়া নন্দ মুখ নীচু করিল।

ঘটক মহাশয় রুষ্ট হইলেন না। সরল সপ্রতিভ এই যুবকের সকল কথা সকল ব্যবহারই তাঁহার বড় মিঠা লাগিতেছিল। হাসিয়াই তিনি কহিলেন, "তা হলে বাবা—হেসেই একটু নেও। আমার মুখে সংস্কৃত বচন—হাসবারই কথা বটে! তা কি জান, সংস্কৃতও কিছু পড়ি। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না। তবে দর্শন—এই সাংখ্য আর বেদান্তটা কিছু আলোচনা করে থাকি।"

নন্দর হাসি থামিল। হাসির উচ্ছ্বাস এরূপ অবস্থায় চাপিতে গেলে আরও বাড়ে। আর যদি কারও ভয়ে বা সম্ভ্রমে চাপিবার প্রয়োজন না হয়, তবে সহজেই ভাঁটিয়া পড়ে।

রুমালে চক্ষু মুখ বুজিয়া শান্ত ভাবেই তখন সোজা হইয়া সে বসিল। কেবল একটু চটুল মৃদু হাসি চোখের কোণে খেলিতেছিল। শ্বশুরেরও অবস্থা তদ্রূপ। চোখে চোখে দৃষ্টি পড়িল। উভয়েই উভয়ের মনটা যেন তাহাতে বেশ চিনিয়া লইলেন।

ঘটক কহিলেন, "কি জান বাবা, মেয়ে দুটোকে বড্ড ভাল বাসি। তাই ভাবলাম, অধীনতাটা যদি কিছু কমান যায়, তবে সুখে থাকবে। বড় ঘরের তৈরী ছেলেও পেতাম—টাকা খরচও হয়ত কম হ'ত। কিন্তু সে মনে করত, মেয়ে বিবাহ করে ভারী অনুগ্রহ আমাকে করেছে। বিশেষ একটা শ্রদ্ধা কি আদর হয়ত তাকে করত না। তবে এমন যদি কোনও ছেলে পাই, তাকে আমিই মানুষ করে দেব—উচু পদে বসিয়ে দেব—সে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার মেয়েকেও খাতির করে চলবে। সে যাতে সুখে থাকে, কিছু স্বাধীনতা পায়, সে দিকেও বেশ দৃষ্টি রেখে চলবে।"

ঘটক থামিলেন। নন্দ নীরবই রহিল, ভালমন্দ কিছু বলিল না। একটু পরে ঘটক আবার কহিলেন, "তা বাবা, সব খুলে তোমাকে বললাম। আমি এইটে চাই আমার লরাকে একেবারে চেপে পিষে রাখবে না। সে যাতে সুখে থাকে—ইচ্ছেমত একটু নড়তে চড়তে চলতে ফিরতে পারে—যেন সব তার নিজের, কিছুর জন্য কারও উপরে নির্ভর না করে, কারও মুখ চেয়ে তাকে চলতে না হয়—এমনি ধারা একটা স্বচ্ছন্দ ভাবে সুখে সে থাকতে পারে, তেমনি ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। সেটা পারবে ত?"

কথাগুলি কেমন যেন নন্দর ভাল লাগিতেছিল না। অবশ্য এটা এমন বেশী কিছু নয়। শ্বশুরের টাকায় বড় হইলে, শ্বশুরের মেয়েকে খাতির করিয়া চলিতেই হয়। কিন্তু এমন ধারা একটা কড়ারে আবদ্ধ হওয়া—সেটা যেন কেমন বড় বিশ্রীই তার লাগিল। যাহা হউক, একটু ভাবিয়া সে কহিল, "এটা আর আপনাকে বলতে হবে কেন? আপনার টাকাতেই যদি মানুষ হই, কৃতজ্ঞ থাকবই। আর আপনার মেয়ে যাতে সুখে থাকেন, তার জন্যেও যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব।"

ঘটক কহিলেন, "ওটা বাবা, পাশ কাটিয়ে এড়াবার মত কথা হ'ল। তা—হ'ক! এ সব মন নিয়ে কথা। মন বুদ্ধি বিগড়ে যায়, কোনও কড়ারে বেঁধে কাউকে তার কর্ত্তব্য কি প্রতিশ্রুতি কিছু পালন করান যায় না। যা হ'ক, আমার কথা সব খুলেই বললাম, মনে রেখ। এখন তবে লরার সঙ্গে একবার দেখা কর।"

ঘটক সাহেব বেল টিপিলেন—'ঠুং'! 'বয়' (বালক ভৃত্য) প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল। ঘটক কহিলেন, "মিস্ ফ্লোরাকো আনে বোলো।"

'বয়' বাহিরে যাইতে না যাইতেই ফ্লোরা পাশের ঘরের দরজার পর্দ্দাটা সরাইয়া চোখমুখভরা মিটিমিটি একরাশি দুষ্টু হাসি চাপিতে চাপিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। করিয়াই নন্দর দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত হাসিভরা চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

ঘটক কহিলেন, "তুই বুঝি ওই পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলি? ভারী দুষ্টু হ'য়েছিস ত?"

ফ্লোরা উত্তর করিল, "হুঁ—আমি একাই বুঝি শুনছিলাম? মা ছিলেন, আর—না, তা বলব না এখন, তা ডাকছিলে কেন?"

"তোদের বসবার ঘরে ওকে নিয়ে যা। লরাকেও গিয়ে বল্—"

"সে যাবে না।"

"যাবে না? সে কি রে?"

"বললে—সব শুনল কিনা আড়ালে দাঁড়িয়ে—তা বললে, তার আর দেখা করবার দরকার কিছু নেই। বড্ড লজ্জা করবে তার।"

বলিয়া টিপিটিপি হাসিয়া নন্দর দিকে একবার চাহিল।

"আচ্ছা তুই-ই তবে দুটো আলাপ-সালাপ না হয় কর্। আমি আসছি। তুমি ব'স বাবা, ব'স। আসছি।"

বলিয়া ঘটক সাহেব বাহির হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, লরা ত পাশের ঘরেই আছে। যদি একবার আসে।

[৪]

ফ্লোরা তেমনই দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল, আর নন্দর দিকে এক একবার চাহিতে লাগিল। দৃষ্টি বড় চটুল, আর হাসির তীব্র ছটাগুলি যেন নন্দর চোখে মুখে সকল গায়ে গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। ফ্লোরা নীরবে দাঁড়াইয়া দুষ্টুর মত কেবলই চাপিয়া চাপিয়া হাসিতেছিল। নন্দও নীরব; হাসি তারও বড় পাইতেছিল। অপরিচিত এই গৃহে অপরিচিতা এই তরুণীর সঙ্গে মুখে এই হাসির অভিনয়—এমন একটা অসহনীয় কৌতুককর অদ্ভুত রসের সুড়সুড়ির সৃষ্টি করিল যে, নন্দ আর সহিতেই পারিল না, একেবারে উচ্চ হাস্যই করিয়া উঠিল। ফ্লোরা উচ্চহাস্যে তার প্রতিধ্বনি তুলিল না বটে, কিন্তু তেমনই মুখচাপা হাসির মুখে হাসিভরা স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

নন্দ হাস্য সম্বরণ করিল। ফ্লোরা তখন কহিল "আপনি হাসলেন যে বড়?"

নন্দ উত্তর করিল, "হাসি পেল যে বড়। কি করব?—তা ভালই করলাম, হেসেছিলাম, তাই না তোমার মুখে কথা বেরুল।"

ফ্লোরা কহিল, "আপনি কথা কিছু বললেন না, আমি মেয়ে মানুষ—গায়ে প'ড়ে আগে কথা বলতে পারি?"

"মুখ টিপে টিপে হাসছিলে ত খুব।"

"হাসি পাচ্ছিল—"

"কথা পাচ্ছিল না?"

"তাও পাচ্ছিল। তবে কথা পাওয়া সামলান যায়, হাসি পেলে সামলান দায়। আমি ত পারি না। আপনিও পারেন না। তবু আমি চুপি চুপি হাসছিলাম। আর আপনি ত দু'-দু'বার হিহি করেই হেসে ফেললেন।"

নন্দ কহিল, "হাঁ। তবে কি না—হাসি পেলে আমি সামলাতেই কখনও পারি না। আজ ত এখানে কিছু বেয়াদবীই করে ফেলেছি।"

"সেটা আর না বললেও হ'ত। আমাদেরও একটু বুদ্ধি আছে।"

"তা বেয়াদবীটা মাফ করতে পারবে ত?"

"না করে আর যাই কোথায়? হাসিতে আর দুষ্টুমীতে বেয়াদব আমিই কি কম? তবে ভয় পাবেন না। দিদি আমার মত নয়। খুব ঠাণ্ডা আর গম্ভীর; হাসেও কম।"

"সেইটেতেই বরং ভয় পাবার কথা। তোমার মত হাসলেই ভাল হ'ত, সমান সমান মিলত ভাল। তা তোমার

বাবা ত এক রকম পছন্দ করলেন আমাকে। এখন তোমাদের পছন্দটা—"

ফ্লোরা কহিল, "যার দরকার তার হ'য়েছে। দিদি বেশ পছন্দই করেছে।"

"আর তুমি ?"

"আমার পছন্দে অপছন্দে এমন যায় আসে কি ?"

"যায় আসে না ? তুমি হ'লে—না হয় হবে—"

"সিষ্টার-ইন্-ল,—শালী নয় কিন্তু। ওটা বড় বিশ্রী কথা। লোকে ঐ বলে গালাগাল দেয়।"

"বেশ তাই হবে। শালী নয়, সিষ্টার-ইন্-ল। তা সিষ্টার-ইন্-ল—"

"ফিউচার (future)। এখনও হয়নি যে, হব।"

"বেশ! তবে হে উড্ বি সিষ্টার-ইন্-ল! ফিউচার বোনাইটি যে তোমারও পছন্দ চায়।"

ফ্লোরা কহিল, "আমারও এক রকম হয়েছে। তবে একটু খানি বাকী ছিল, তাও যেন হব হব হ'য়ে এল।"

"কি বাকী ছিল ?"

"তা বলব না। বড় লজ্জা করে। দিদির কাছে শুনবেন।"

"তোমার দিদির সঙ্গে ত দেখাই হ'ল না।"

"বিয়ের পর হবেই।"

"আগে হবে না ? দেখা শুনো না হ'লে—"

"ফ্লোরা কহিল, "দেখা শুনো—তা বাবার সঙ্গেই আড়াল থেকে দিদির হ'য়ে গেছে। পছন্দও হ'য়েছে। আর দরকার কি ?"

"তাঁর না থাক, আমার ত আছে। দেখা শুনো আমার ত হ'ল না।"

"আপনার কি তার কোনও দরকার আছে ?"

"দরকার নেই ? বল কি ? দেখা শুনো করেই না লোকে পছন্দ করে।"

"আপনি ত দিদিকে পছন্দ করতে আসেন নি।"

"তবে কি করতে এসেছি ?"

"বাবার মেয়ে বিয়ে করতে। বিয়ের কথাবার্ত্তা হ'য়ে গেল। দিদিকে পছন্দ করবার অপেক্ষাও ত কিছু রাখলেন না। দিদির অবিশ্যি পছন্দের দরকার ছিল। তা সেটা ত আড়াল থেকেই তার হয়ে গেল।"

ফ্লোরা অসংযত ভাবেই কথাগুলি সব একেবারে বলিয়া ফেলিল। কথাবার্ত্তায় ফ্লোরা এমনই অসংযত ছিল। যা যখন মনে উঠিত, টপাটপ সব বলিয়া ফেলিত, চাপিতে কিছু জানিত না। কথাগুলি সব সত্য। নন্দও অনুভব করিল, অতি কঠোর—অতিশয় গ্লানিকর সত্য! মিছরীর ছুরী হইলেও ছুরী বটে—আর ধারও বড় তীক্ষ্ণ—যেন পাকা ইস্পাতের! বড় তীব্র ভাবেই এ ছুরীর আঘাত নন্দর বুকে গিয়া বিঁধিল। ধিক্! পুরুষ হইয়াও এত বড় একটা হীনতায় সে নামিয়া আসিয়াছে! যে নারী তাকে পতিত্বে বরণ করিবে তারই তাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকার ছিল, দেখাও হইল। আর সে পুরুষ—টাকার লোভে উচ্চ পদের লোভে মাত্র ধনীর কন্যাকে পত্নীতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে! সেই কন্যা যে কি, তার যোগ্য হইবে কি না, পত্নীরূপে তাকে ভাল লাগিবে না, এ সব বিচার বিবেচনার কোনও প্রয়োজনই তার নাই! ধিক! পুরুষের পক্ষে ইহার বড় হীন দীনতা আর কি হইতে পারে ? আরও ধিক, সেই দীনতা সেই ধনীর কন্যাও ধরিয়া ফেলিয়াছে! সে যে তার বাপের টাকায় কেনা গোলাম হইবে ? বাপও স্পষ্ট তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ছি ছি! আগে এটা সে বুঝিতে পারে নাই কেন ? ভাবে নাই কেন ? সহসা স্বপ্নের সাজান হর্ম্ম্য নন্দর চুরমার হইয়া ধূলিতে পড়িল। অলীক ইন্দ্রজালের আলোক নিভিল; সব আঁধার হইল! সব আঁধার। কিন্তু সেই আঁধারের মধ্যেই সত্যকার একটি আলোক তাহার চক্ষের সমক্ষে যেন ফুটিয়া উঠিল। ধিক্ তার বিলাত যাওয়ায়, ধিক্ তার ব্যারিষ্টারীতে! স্ত্রীর গোলাম হইয়া তার আবার উচ্চ পদের ও ঐশ্বর্য্যের গৌরব কি ? ইহা অপেক্ষা তার পিতার সেই নায়েবী—তাও যে অনেক বড়!

কথাটা শুনিয়াই নন্দর মুখখানি প্রথমে লাল হইয়া উঠিল। তারপর ক্রমে কেমন একটা বেদনার বিবর্ণতা ব্যক্ত করিল। ফ্লোরাও কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নন্দর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বুঝিল, ভাবী ভগ্নীপতির মনে বড় ব্যথা সে দিয়াছে। বড় একটা লজ্জা—বড় দুঃখও তার হইল। একটু কাছে আসিয়া

ধীর স্বরে কহিল, "আপনি রাগ করলেন? বড় অন্যায় কথা আমি বলেছি।"

চমকিয়া নন্দ আত্মসম্বরণে প্রয়াস পাইয়া কহিল, "না না, রাগ কেন করব? অন্যায় কি? ঠিক কথাই তুমি বলেছ।"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ-ভরা সেই স্ফূর্ত্তির চটুল মধুর দীপ্তি আর ভাতিয়া উঠিল না।

ফ্লোরা কহিল, "আমি সামলে কখনও কথা বলতে পারিনে। যা যখন মনে আসে, বলে ফেলি। ওটা আমার বড় একটা দোষ।"

নন্দ কহিল, "দোষ নয়, বড় একটা গুণ। মনের কথা এমন সরল ভাবে বলতে সবাই পারে না।"

অতি সঙ্কুচিত ভাবে ফ্লোরা কহিল, "তা হঠাৎ মনে উঠল, নইলে ওটা যে ঠিক আমার মনের কথাই, তা নয়। আর হলেও আমারই কথা। দিদির নয়, এটা জানবেন।"

তেমনই শুষ্ক নীরস হাসি হাসিয়া নন্দ কহিল, "তাঁর হলেও এমন অন্যায় কি অস্বাভাবিক কিছু হ'ত না।"

নন্দ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, এ কথায় তাহার মনে কিছু আঘাত লাগে নাই। পূর্ব্বের ন্যায় রঙ্গ-তামাসার ভাবেই কথাটাকে সে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ফ্লোরা সেরূপ বুঝিল না, বুঝিল, বড় একটা অপমানের আঘাত ভগ্নীর পাণিপ্রার্থীকে সে করিয়াছে।

লোকটা তেজী, কি জানি কি হয়! একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "দিদির সঙ্গে একটি বার দেখাই করুন না, তাকে এখানে ডাকি?"

"না, না! আজ থাক! এরপর যেদিন আসব, দেখা হবে। ইস্! ছ'টা যে বাজে, আসি তবে আজ। বাইরে বড্ড জরুরী একটা কাজ আছে। তোমার বাবা কোথায়?"

"বোধ হয় ঐ বারান্দায় আছেন।"

"আচ্ছা, উঠি তবে আজ। নমস্কার।"

অতি কুণ্ঠিত ভাবে ফ্লোরা কহিল, "আসুন তবে, নমস্কার। আপনাকে—বরং চলুন বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উভয়ে বাহিরে আসিল। ঘটক সাহেব বারান্দার রেলিং ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতেছিলেন। ফ্লোরা ডাকিয়া কহিল, "বাবা, নন্দবাবু যাচ্ছেন এখন।"

ফিরিয়া কাছে আসিয়া ঘটক কহিলেন, "এখুনি! সে কি?"

নন্দ কহিল, "হাঁ, এখুনি যেতে হবে। বাইরে একটু কাজ আছে।"

"চা' টা কিছু খেলে না—এখুনি যাবে কি? ওরে শীগ্‌গির যা—গিয়ে খাবার টাবারের যোগাড় কর ফ্লোরা।"

বিনীত ভাবে নন্দ কহিল, "আজ্ঞে, আজ মাফ করবেন। জরুরী কাজ, না গেলেই হবে না। চা'টা এর পরে যে দিন আসব, খাব। আজ আসি, নমস্কার।"

"আচ্ছা, এস তবে। গুড বাই!"

করমর্দ্দন করিয়া ঘটক সাহেব নন্দকে বিদায় দিলেন। ফ্লোরা কেমন বিমর্ষ—কেমন মনভাঙ্গা ভাবে চাহিয়া রহিল।

"কিরে পাগলী?"

"না, কিছু না বাবা। তুমি চা খাবে এখন?"

"হাঁ, আন,—খেয়ে এখুনি বেরোব।"

অন্যমনস্ক হইবার একটা উপলক্ষ্য পাইয়া ফ্লোরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। চঞ্চল চরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

[৫]

"বাবা! নন্দ বাবু ত আর আসছেন না?"

"সে হতভাগা আর আসবে না ফ্লোরা।"

ফ্লোরা চমকিয়া উঠিল। মুখখানি বিশুষ্ক বিবর্ণ এবং চক্ষু দুটিও ছল ছল হইয়া উঠিল। কহিল, "আসবেন না! কেন বাবা? সব ত ঠিকই হয়ে গিয়েছিল—"

বিরাগে মুখ বাঁকাইয়া ঘটক সাহেব কহিলেন, "আর ঠিক! এই সব ছোকরাদের কথার কিছু ঠিক আছে? ওদের উপর কিছুতে নির্ভর করাই ভুল।"

"কেন বাবা? সম্বন্ধ কি তিনি ভেঙ্গে দিতে চান?" অতি ভীত দৃষ্টিতে ফ্লোরা কহিল।

"হাঁ।"

"কেন?"

"কেন আর কি? বাবা খুড়ো বুঝি সব গাঁ থেকে এসে খুব চেপে ধরেছে, এখন ভড়কে গেছে। হতভাগা! সেদিন কথাবার্ত্তা বেশ বলছিল। তা সব যে ফাঁকা—আর বাস্তবিক সে যে এত দুর্ব্বল, তা মনেও তখন হয়নি।"

এসেছে না কি বাবা? তাই কি লিখেছেন?"

ঘটক উত্তর করিলেন "তাই কি আর খুলে লিখবে? লিখেছে সব বড় বড় ভাবের ভণিতে করে! সে আগে তার মন বুঝতে পারেনি; কেবল টাকার লোভে বিয়ে করা তার বড় হীনতা বলে মনে হচ্ছে এখন। লোভে যে আপনাকে এমন বিকিয়ে দিতে পারে, তার মত হীনচেতা কাপুরুষের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়—এই সব আর কি? এই যে হতভাগার চিঠি—পড়ে দেখ।"

ফ্লোরা চিঠিখানি পড়িল। মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়া তখনই আবার একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। নত মুখে কিছুকাল থাকিয়া শেষে কহিল "বাবা পত্রে তিনি ঠিক কথাই লিখেছেন।"

"হাঁ ঠিক বই কি! ছুতো—সব ছুতো! বাপের চাপে পেছোচ্ছে—সেটা ত খুলে বলতে পারে না। তাই এখন এই সব সেন্টিমেণ্টের (sentiment) ছুতো দেখাচ্ছে। এসব সেন্টিমেণ্ট বাপু তোর আগে কোথায় ছিল?"

"চাপা ছিল, শেষে আঘাত পেয়ে মনে জেগে উঠেছে। বাবা, তোমায় লুকোব না, লুকোতে পারব না—লুকোন উচিতও হবে না। সেদিন থেকে লজ্জায় আমি মরে আছি। এ আঘাত আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। হঠাৎ অসাবধানে গোটাকতক কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে প'ল। তাতে যে তিনি বড় অপমানিত বোধ করলেন আর ব্যথাও বড় পেলেন, তখনই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আঘাত একবার করলে ত আর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না?"

ঘটক যার পর নাই বিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি রে? কি বলেছিলি? আর তুই কি মুখ সামলাতে কখনও শিখবিনি? এ যে আচ্ছা এক বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেছিস্! আঁ!—তা কি হয়েছিল সব বল ত? কি বলেছিলি?"

ফ্লোরা সব কথা খুলিয়া পিতাকে বলিল।

"হুঁ—তাই হঠাৎ অমনি ব'লে গেল—এত বললাম চা খেয়েও গেল না। কাজ বাইরে ওদের কি এমন থাকতে পারে যে, এইটুকু সবুর সইল না? হুঁ—তা চটবেই ত চটবেই ত —কথাগুলো বড় বিশ্রীই বলে ফেলেছিলি। বিলেত যাওয়ার লোভে ছোঁড়াদের আক্কেল ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, নইলে ছোকরার মনে বেশ তেজ আছে! প্রার্থী হয়েই ত এসেছিল, তা খাতির করে কি মন যুগিয়ে একটি কথাও বলে নি, তেমন ভাবও কিছু দেখায় নি। ছোকরার তেজ আছে—তেজ আছে। এত বড় অপমানটা করলি, সইবে কেন?"

কাঁদ কাঁদ হইয়া ফ্লোরা কহিল, "এখন তবে কি হবে বাবা?"

"কি আর হবে? মাফ চেয়ে একটা চিঠি লিখব। বিয়ে এখানে সে আর করবে না। তেজী ছেলে কেউ তা করতে পারে না। কি করব! বেশ লেগেছিল! খাসা ছেলে, দিব্বি চেহারা, আর কথাবার্ত্তায় এমন সপ্রতিভ! খাসা ছেলে—কেমন একটা মনতাই হয়ে গিয়েছিল তা সব মাটিকরে দিলি ছুঁড়ী! যাক্ কি আর করব, খুব শিক্ষা হ'ল, বুঝলি অমন বেফাঁস কথা আর কখনও যেন মুখে না বেরোয়।"

"দিদির বিয়ের কি হবে বাবা?"

"বিয়ের জন্য এমন ভাবনা কি? আর একটি এখন দেখতে হবে। তবে অমনটি কি আর মিলবে? খাসা বেছেছিল লরা—মুখের চেহারা দেখেই যেন মনটা চিনে নিয়েছিল। তা—তাকে বল্ আর একটা ছবি বেছে দিক।"

"সে তা আর দেবে না।"

"তবে পাঠিয়ে দিস ফোটোগুলো! ওবেলা আমি আর তোর মা একটা বেছে নেব। তুইও থাকতে পারিস।"

ফ্লোরা কহিল, "মিছে আর ঘেঁটে কি করবে? দিদি আর কাউকে পছন্দ করবে না

"সে কিরে ফ্লোরা, বলিস কি? আঁ!"

"বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে বাবা! মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কি হবে বাবা? দিদি যে আর কাউকে বিয়ে করবে না। নন্দ বাবুকেই যে বড্ড তার মনে ধরে গিয়েছিল বাবা—"

স্তম্ভিতভাবে ঘটক সাহেব কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "লরা কি এই রকম কিছু বলেছে?"

ফ্লোরা কহিল, "স্পষ্ট বলে নি কিছু। বলবেও না। দিদি সে রকমই নয়। তা না বললে কি বুঝিনি কিছু? দিদি সব শুনেছিল, তখনই আমাকে বললে ফ্লোরা ভাল করিস নি। তারপর এই কদিন ত একেবারে মনমরা হয়ে আছে। আজ আমাকে নিজেই বললে, বাবাকে জিজ্ঞাসা

কর্ না ফ্লোরা, কবে আসবেন কিছু লিখেছেন কি না। আহা, একথা শুনলে কি করবে জানি না। কি করে দিদিকে মুখ দেখাব বাবা? কি করে এ দুঃখ সইব? আমি নিজে যে তার এই সর্ব্বনাশ করলাম বাবা!"

কি ভাবিতে ভাবিতে ঘটক সাহেব কহিলেন,"হুঁ বুঝেছি। তা—এ ত হতেই পারে। অমন ছেলে! ভারী মুস্কিল হল ফ্লোরা। বেজায় একটা পাগলামো এবার করে ফেলেছিস পাগলী। তবে ছোকরার প্রাণটা বড় আছে। লরার অবস্থা সব জানলে দয়া করে রাজি হতেও পারে। কিন্তু সেটা বড় লজ্জার কথা হবে ফ্লোরা।"

ফ্লোরা উত্তর করিল, "আমার এ লজ্জার চাইতে কোনও লজ্জাই যে বড় হতে পারে না বাবা? দিদি যদি আমার দোষে এত বড় দুঃখু পায়, আমি মরে যাব। সে যদি বিয়ে না করে আমিও করব না, কোন মুখে করব? হাঁ, তাও কিন্তু বলে রাখলাম বাবা।"

"আচ্ছা যা যা, এখন যা। অত অধীর হ'সনে আগেই। দেখি কি করতে পারি।"

ফ্লোরার হাসির চোখে আজ অশ্রু বহিল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

[৬]

"দিদি! দিদি! আমায় কি মাফ করতে পারবি?"

"এসব কি বলছিস্ ফ্লোরা? পাগলী! মাফ আবার কিসের? তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি?"

"সেই যে আমার আরও দুঃখ দিদি? রাগ যদি করতিস, তাও যে আমি সইতে পারতাম। কিন্তু এত বড় অপরাধটা যে অপরাধ বলেই ধরে নিলিনি, এত ভালবাসিস তুই, আর এত বড় সর্ব্বনাশটা তোর করলাম, মনে করতেও আপনার মনেই যে মরে যাচ্ছি দিদি।"

একটু ম্লান অথচ শান্ত হাসি হাসিয়া লরা কহিল "ফ্লোরা সত্যি তুই বড় পাগল! আহ্লাদেও একেবারে নেচে উঠিস আবার দুঃখ কিছু হলেও একেবারে এলিয়ে পড়িস। এমন হলে কি আর এ পৃথিবীতে কারও চলে?"

ফ্লোরা উত্তর করিল, "যেমন তেমন দুঃখ একটা হ'লে কি আর এলিয়ে পড়তাম দিদি? এ যে সইবার মত দুঃখ নয়। তোর জীবনটাই যে মাটি করে দিলাম—আর তাও নিজের বেসামাল মুখের দোষে। ছি ছি! জিভ কেন আমার খসে প'ল না? সাঁড়াশী দিয়ে যে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"এই শোন পাগলীর কথা! জীবনটা মাটি হ'ল কিসে? বিয়ে—তা যদি নাই হয়—তাতেই জীবনটা অমনি মাটী হয়ে যাচ্ছে?"

"কি করবি তবে? বিয়ে কি সত্যিই আর করবি নি—উনি—উনি যদি—"

"থাক্ এখন ও কথা ফ্লোরা—"

ফ্লোরা কহিল, "বাবা বলেছেন নন্দ বাবুকে চিঠি লিখবেন।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লরা কহিল, "আর কিছু চাই নে ফ্লোরা। তবে কেউ যদি তাঁকে এইটি বুঝিয়ে দিতে পারত আমরা বাস্তবিক তাঁকে ছোট মনে করিনি, কোনও অপমান করে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিতে চাইনি, তবে বড় ভাল হ'ত। বড় লজ্জাই হচ্ছে আমার ফ্লোরা। আমাদের কথা তিনি কি ভাবছেন? ধনগর্ব্বে—যিনি স্বামী হবেন তাঁকে এমন অবজ্ঞা আমরা করতে পারি—অবজ্ঞা করেও আবার তাঁকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হতে পারি—এত হীন আমরা—এই যে একটা ভাব নিয়ে তিনি গেলেন - সেইটে ভাবতেও লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছি। অবিশ্যি বড় ব্যথাও একটা পেয়েছেন—বড় মর্ম্মান্তিক ব্যথা—তা কি আর করব? যা হবার হয়ে গেছে। তা বাবা যদি একটু বুঝিয়ে লেখেন—"

"লিখবেন ত বলেছেন।"

"বুঝে যদি তিনি ক্ষমা করেন—ব্যথাটা ভুলতে পেরেছেন জানতে পারলে সত্যি বড় সুখী হব ফ্লোরা। আর ঐ যে একটা ধারণা আমাদের সম্বন্ধে নিয়ে গেছেন, সেটাও দূর হয়েছে যদি জানতে পারি—"

"মুখোমুখি যদি দুটো কথা তাঁকে বলতে পারতাম দিদি—তা বাবা ত লিখবেন বলেছেন। যদি একটিবার আসেন—"

"তাই কি আর আসবেন? কেন আসবেন?" বলিতে বলিতে লরা মুখখানি ফিরাইয়া লইল। ত্রস্ত জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ফ্লোরা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

[৭]

"আজ্ঞে এমন একটা কথা যে স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি নি। তা আমা হতে এতটা অশান্তির কারণ আপনাদের ঘটেছে, এতে বাস্তবিক বড় লজ্জিত হচ্ছি।"

"তা বাবা, কেবল লজ্জিত হলেই ত হবে না। অতি উন্নতচেতা সহৃদয় যুবক বলেই তোমাকে মনে হচ্ছে, তাই একথা বলতে ভরসা পাচ্ছি। এখন পেছুলে চলবে না বাবা। লরাকে তোমার বিবাহ করতেই হবে।"

ঘটক সাহেব তাঁহার আফিসে নন্দকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে নিভৃত এক গৃহে বসিয়া উভয়ে কথা বলিতেছিলেন। সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া নতমুখে নন্দ কহিল, "আজ্ঞে, এ অবস্থায় অস্বীকার করতে আমি পারিনে। যেমন আদেশ করবেন তাই করব। তবে একটি নিবেদন আমার আছে।

"কি বাবা?"

"আপনি আদর করে দিচ্ছেন, আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করব, করে কৃতার্থই হব। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, কোনও রকম আর্থিক সাহায্য আমি নিতে পারব না।"

অতি বিস্ময়ে চমকিত হইয়া ঘটক সাহেব নন্দর দিকে চাহিলেন, নীরবে স্তব্ধভাবে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

"সে কি বাবা! কিছুই নেবে না? বিলেত যাওয়ার খরচটা ত অন্ততঃ নিতেই হবে।"

"আজ্ঞে না, তাও পারব না।"

"কি করে তবে যাবে?"

"যাব না।"

"যাবে না? যাবে না—সত্যিই যাবে না? তা হলে—কি করবে?"

"দেশে থেকেই যা পারি, করব। সবাই ত আর বিলেত যায় না।"

"হুঁ কিন্তু তাতে কি আর চলবে? তেমন ষ্টাইলে থাকতে পারবে?"

নন্দ উত্তর করিল, "তা পারব না জানি। আপনার মত ষ্টাইলে থাকা কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে ধনীর মত কোনও ভোগসুখ আমার সংসারে না ঘটলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের নারীদের মত আপনার মেয়ে যাতে থাকতে পারেন, তার জন্য প্রাণপণ যত্ন করব।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘটক সাহেব কহিলেন, "হুঁ? তা ধর, তুমি নিজে কিছু নেবে না বলছ, নাই নিলে। কিন্তু আমার ত মেয়ে—টাকাও আছে—আমি যদি তাকে কিছু দিই—"

"স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন। নিষেধ করবার অধিকার আমার কিছুই নেই। তবে আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য তা থেকে এক পয়সাও আমি কখনও নেব না।"

ঘটক সাহেব বলিলেন, "বাবা! ফ্লোরা বড় অবোধ মেয়ে, একটা ভুল করে ফেলেছে, তাকে কি মাফ করতে পারবে না?"

নন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, মাফ কিসের করব? তিনি ত অন্যায় কিছু করেন নি। বরং বড় একটা উপকারই আমার করেছেন। বড় একটা মোহে আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। সে মোহ কাটিয়ে নতুন একটা দৃষ্টি তিনি আমায় দিয়েছেন। তার জন্য—তাঁকে বলবেন,—যারপর নাই কৃতজ্ঞই তাঁর কাছে আমি আছি।"

"যাক্! কাজের কথাই এখন হ'ক। তুমি ত কাজকর্ম্ম এখনও কিছু কর না। আরম্ভ করতেও দেরী কিছু হবে। তোমার বাবাও বোধ হয় এ বিয়েতে অনুমোদন করবেন না?"

"সম্ভব নয়। তা—বিয়ে যখন করতেই হবে, তাঁকে না জানিয়েই করব। শেষে তাঁকে খুলে সব লিখব। যদি ক্ষমা করেন ভাল। আর যদি না করেন--"

"তবে? কি করবে তবে? তোমার পড়াও ত শেষ হয় নি। মানুষ হতে হ'লে, আরও ত পড়তে হবে। তারপর ধর—"

নন্দ কহিল, "নিজে কাজকর্ম্ম করে পড়ার খরচ চালিয়ে নেব। তবে বিয়েটা যদি এখন স্থগিত রাখতে পারেন—"

মাথা নাড়িয়া ঘটক কহিলেন, "না! সেটা—না, এখন স্থগিত রাখা আর চলে না। বিয়ে এখুনি করতে হবে।"

নন্দ একটু ভাবিয়া কহিল, "তাহলে যদ্দিন না আমি মানুষ হ'তে পারি, আপনার মেয়ে আপনার কাছেই থাকবেন।

শেষে কাজকর্ম্মের একটা সুবিধে আমার হলেই তিনি তাঁর নিজের সংসারে যাবেন।"

"এই তবে বাবা তোমার স্থির সংকল্প ?"

"আজ্ঞে, মাফ করবেন, এই-ই আমার স্থির সংকল্প। অন্য রকম কিছু করতে পারব না। তবে অর্থে আর পদে না পারি, আমার স্নেহে আপনার কন্যার সুখ যত দূর হতে পারে তার ক্রটি কিছু হবে না।"

বড় গম্ভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘটক কহিলেন, "ভাল, তাই তবে হবে। বাড়ীতে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ের দিন একটা স্থির হলে তোমাকে জানাব।"

"যে আজ্ঞে।"

ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে সম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া নন্দ বিদায় গ্রহণ করিল।

[৮]

দিন স্থির হইল যথা সময়ে সরল অনাড়ম্বর ভাবেই বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরেই অকপট ভাবে সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়া নন্দ পিতাকে পত্র লিখিল। উপসংহারে নিবেদন করিল "আমি যাহা করিয়াছি, তাহার পর আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন, এরূপ ভরসা করি না। আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকেও বাধ্য করিয়া আপনার গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। তবে আপনারা অধমকে মার্জ্জনা করিলেন, এইটুকু জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। তারপর একবার গৃহে গিয়া আপনাদের চরণ বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব।"

চার পাঁচ দিন পরেই পিতার পত্র আসিল। এই ঘটনায় যতই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকুন, তাঁহাদের পরম স্নেহাস্পদ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। বিবাহের পূর্ব্বে সকল ঘটনা জানিতে পারিলে তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিতেন। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে। এখন শ্রীমতী বধূমাতাকে লইয়া শ্রীমান নন্দগোপাল গৃহে গেলে তাঁহারা সুখী হইবেন এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবেন।

নন্দ পত্রখানি বারবার পড়িল। পিতামাতার স্নেহ স্মরণ করিয়া তার চক্ষে জল আসিল। উদ্দেশ্যে পিতামাতার চরণে সহস্র প্রণতি সে করিল।

এখন কি কর্ত্তব্য ? অনেকক্ষণ বসিয়া নন্দ ভাবিল। মনে হইল, যাহাই শেষে কর্ত্তব্য হউক লরাকে এই পত্র তাহার দেখান উচিত। পত্র লইয়া সে শ্বশুর-গৃহে গেল। বিবাহের পর মেসেই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

লরা পত্র পড়িল। একটু হাসিয়া কহিল, "তা বেশ ত! আমায় নিয়ে চল।"

"সে কি লরা ? তুমি সেখানে যাবে ?"

"কেন যাব না ? এখন তোমাদের ঘরের বউ যে আমি।"

নন্দ কহিল, "লরা! তুমি বুঝতে পারছ না। একটা ভাবের বশেই কথা বলছ। সেখানে গিয়ে একটি দিনও তুমি থাকতে পারবে না। পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থঘরের সংসার যে কি, আর নতুন বউকে কি ভাবে সেই সংসারে চলতে হয়, কখনও দেখনি ত ? ধারণাও করতে পারছ না ?"

একটু হাসিয়া লরা কহিল, "তা কি হবে ? তোমাদের ঘরে যখন পড়েছি, তখন না গিয়ে আর উপায় কি আছে ? ক্লেশ যাই হ'ক, দুদিনে সবই লোকের সয়ে যায়, সইয়ে নিতেও হয়।"

নন্দ কহিল, "লরা, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাব, এটা মনেও কখনও করিনি। তোমার বাবার সঙ্গেও সে কথা হয়নি। তাঁকে বলেছিলাম, যদ্দিন মানুষ না হই, তুমি এখানেই থাকবে।"

"তা না হয় থাকতাম। কিন্তু ওঁরা যে যেতে বলেছেন।"

নন্দ কহিল, "আমাদের সে সংসার—না, না, সে যে একেবারেই তোমার যোগ্য হবে না লরা।"

ধীরভাবে লরা উত্তর করিল, "আমার যোগ্য অযোগ্য কি হবে, কেবল কি তাই-ই ভাবব ? আমি তোমাদের যোগ্য হ'তে পারি কি না, তার একটু চেষ্টা করতেও আমাকে দেবে না ? সেইটেই যে এখন বড় দরকার। বাবাকে বল, আমাকে নিয়ে চল। আমি যাব।"

"আচ্ছা, তাই তবে হবে। তোমার যা ভাল লাগে, তাই আমি করব।"

ঘটক সাহেব আপত্তি করিলেন না। বস্তুতঃ লরার ব্যবহারে মনে মনে তিনি বড় একটা গৌরবই অনুভব করিতে-ছিলেন। জামাতার সহৃদয়তা ও উচ্চপ্রাণতা তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল, মোটের উপর তিনি উন্নতচেতা ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিই ছিলেন।

যাত্রার সময় ফ্লোরা ভগ্নীপতিকে প্রণাম করিয়া কহিল, "জামাইবাবু! তোমাকে আমারও খুব পছন্দ হয়েছে এখন। দিদিও খুব ভাল। তবে আমি বড় অবোধ। এবার কিন্তু মনে মনে আমায় মাফ ক'রো। আমিও দিদির মত হব।"

হাসিয়া নন্দ কহিল, "তাই হ'য়ো। যদি পারি, তবে তোমাকে মাফ করব। নইলে কিন্তু নয়, বুঝলে ফ্লোরা ?"

সমুদ্রের আদি ইতিহাস

§ জীবনের পদচিহ্ন সন্ধান

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর জলে স্থলে আজ যে অসংখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়, সমুদ্রই যে তাদের আদিজননী, সমুদ্রে জন্মলাভ করেই যে সমস্ত প্রাণীজগৎ কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নানারূপে ছড়িয়ে পড়েছে, সে কথা তোমরা আগেই শুনেছ। সমুদ্রকে 'হে আদি-জননী সিন্ধু' বলে কবি অর্থহীন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি, বিজ্ঞানের গূঢ় সত্যকেই ভাষা দিয়েছেন।

সমুদ্রে সমস্ত প্রাণী আলাদা আলাদা ভাবে হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয় নি। একটি জলের ধারা থেকে যেমন অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বেরুতে পারে, তেমনি মূল একটি উৎস থেকে বেরিয়ে অসংখ্য শাখাপথে সমস্ত প্রাণী-জগৎ এমন বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। ব্যাপারটা একদিনে যে ঘটেনি তা বলাই বাহুল্য। আদি সমুদ্রের আদিম প্রাণকণিকা থেকে তার বংশধরেরা কোটি কোটি যুগ ধরে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপ গ্রহণ করতে করতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এক হিসাবে সমস্ত প্রাণী-জগৎই পরস্পরের জ্ঞাতি, সমুদ্রের বিশাল তিমির সঙ্গে আমাদের ঘরের দেওয়ালের মাকড়শারও সম্পর্ক আছে, কিন্তু সে সম্পর্ক খুঁজে বার করতে গেলে কোটি কোটি বছরের কুলজী ধরে সৃষ্টির গোড়ার আদিম সমুদ্রে নেমে যেতে হবে।

প্রথম প্রাণকণিকা যখন আবির্ভূত হয়, সমুদ্রের চেহারা তখন আজকালকার মত ছিল না মোটেই। সমুদ্র তখন এমন গভীর নয়, নোনা ত নয়ই। আকাশ তখন প্রায়ই থাকত ঘন মেঘে ঢাকা আর সমস্ত পৃথিবীতে সারাক্ষণ অসহ্য গুমোট। সেদিন সমুদ্রের নাতিশীতল জলে আমরা যাকে মুষল ধারে বলি তার চেয়ে অনেক প্রবলভাবে অনবরতই পড়ত বৃষ্টি। সেদিন পৃথিবী নিজের চারিধারে আরো বেগে পাক খেত বলে দিন রাত্রিও ছিল অনেক ছোট।

এই বিরামহীন বৃষ্টির জলেই পৃথিবীর প্রথম সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। এই পৃথিবী যে একদিন সূর্য্যের মত জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছিল তা তোমরা জান। সেই বাষ্পাকারে জ্বলন্ত গোলক ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে তরল হয়ে উঠবার সময় আমাদের চাঁদ একদিন তার দেহ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। পৃথিবী তারপর আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, পৃথিবী-দেহের ভারী সমস্ত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টানে মাঝখানে গিয়ে জমা হতে থাকে। হাল্কা তরল পদার্থগুলি উপরে ভেসে ওঠে। সেই হাল্কা তরল পদার্থগুলি প্রথম ঠাণ্ডা হয়ে সরের মত জমে গিয়ে পৃথিবীর উপরকার খোলস তৈরী করে। মোটা কম্বলের মত সেই সরের আচ্ছাদন পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপকে আর বাইরে বেরুতে দেয় না। উত্তাপ তাই পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত যায় বেড়ে এবং নীচের ভারী পদার্থগুলি গলে উঠে আগ্নেয় গিরির লাভার মত উপরে ফিনকি দিয়ে উঠে বেরিয়ে আসে বা পাৎলা উপরকার খোলস ভেদ করে চুঁইয়ে ওঠে। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা এই যে এই ভারী পদার্থগুলির চাপেই পৃথিবীর উপরকার খোলস অনেক জায়গায় বসে যায়। সেই বসে-যাওয়া নীচু জায়গাগুলিই প্রথম সমুদ্রের আধার। আধার তৈরী হলেও প্রথমে জল সেখানে ছিল না। আকাশে তখন ঘন উষ্ণ বাষ্পের মেঘ আর পৃথিবীতে উত্তপ্ত পাথর। উষ্ণ বাষ্পের মেঘ শীতল হয়ে বৃষ্টিধারায় সে তপ্ত পাথরের উপর পড়তে না পড়তেই আবার বাষ্পাকারে যায় উড়ে।

এমনি ভাবে বহুদিন যাবার পর পৃথিবী সৃষ্ট, আর একটু শীতল হ'ল। বৃষ্টির জল তখন আকাশ থেকে পড়ছে অবিশ্রান্ত, আর পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে জমছে গিয়ে সাগরে। এমনি ভাবে সমুদ্রসৃষ্টির পর, অবশ্য প্রাণের আবির্ভাব হয়নি। অনেক যুগ কেটে গিয়েছিল তার পূর্ব্বে। তখনও আকাশে মেঘের পর মেঘের পুরু আবরণ। মেঘের সে আটপুরু স্তর ভেদ করে সূর্য্যের আলো পৃথিবীর উপর পড়তেই পারত না। প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঠিক পৃথিবীর কি অবস্থায় কেমন করে হয়েছিল তা বলতে না পারলেও, সূর্য্য ও পৃথিবীর প্রথম চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে যে, ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। আকাশের মেঘ অপেক্ষাকৃত হাল্কা হওয়ার সঙ্গে সূর্য্যের আলো প্রথম যে মুহূর্ত্তে সাগরের জলে এসে পড়েছিল, জীবনের সে যে পরম স্মরণীয় ক্ষণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম প্রাণকণিকার রূপ কি ছিল, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা এখনও একমত হতে পারেন নি। কারুর কারুর মতে প্রথম প্রাণকণিকা ছিল জীবাণু বা উদ্ভিদ জাতীয় কিছু। হয় গোড়া থেকেই তাতে উদ্ভিদের প্রধান বিশেষত্ব 'ক্লোরোফিল' বা গাছের সবুজ পদার্থ ছিল এবং তারই সাহায্যে সে সূর্য্যের আলোকে জীবনী শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত, কিম্বা অনেক জীবাণুর মত শুধু বাতাস ও জলের জড় পরমাণুকে কাজে লাগিয়েই বেঁচে থাকবার ক্ষমতা তার ছিল। অনেকে আবার মনে করেন যে, কল্পনাতীত সুদূর অতীত যুগে পৃথিবীতে নানা কারণে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের মত জৈবিক পদার্থ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম হয়ত বিন্দু বিন্দু রূপে অনেক সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু জীবিত বলতে আমরা যা বুঝি তা সবগুলি ছিল না অনেকেরই লীলা বংশবৃদ্ধি না করতে পেরে হয়ত শেষ হয়ে গেছে। শুধু তার মধ্যে যেটি বা যে কয়েকটি নিজেকে দুভাগ করে বংশবৃদ্ধি করবার উপায় বার করেছিল, তারাই পৃথিবীতে টিঁকে গিয়ে ভাবীকালের জীবন-বৈচিত্র্যের সূত্রপাত করেছে।

সৃষ্টির শৈশবে আদিম সমুদ্রে যে ভাবেই প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাক, ব্যাপারটা আগাগোড়া আজকালকার বৈজ্ঞানিকের কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ সে উদ্ভবের সাক্ষী কেউ নেই, আদিম প্রাণকণিকা নিজের কোন পরিচয়-চিহ্ন রেখে যায় নি।

তখন প্রাণীদের দেহ ছিল কোমল জৈব পদার্থে তৈরী। সে জৈব পদার্থ প্রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যেত। কোন কঙ্কাল বা কঠিন কোন খোলস দেহের মৃত্যুর পর তার সাক্ষী হিসেবে কালের গর্ভে সঞ্চিত থাকত না। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান এই যে, অন্ততঃ ৫০ কোটি বৎসর জীবনের উদ্ভব সত্ত্বেও এই কারণে প্রাণীদেহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তারপর থেকে সামুদ্রিক জীবের ইতিহাস খুঁজে উদ্ধার অসম্ভব নয়। কারণ তখন থেকে নাগপ্রাণীর কঙ্কাল বা খোলস ভূপৃষ্ঠের পর পর স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে। বহু কোমল-দেহ জীবেরা তখন হয় পশু-খোলস নয় কঙ্কাল আশ্রয় করতে সুরু করেছে। সেই সমস্ত কঙ্কাল ও খোলস থেকে তখনকার প্রাণীদের পরিচয় ও ইতিহাস বৈজ্ঞানিকেরা গড়ে তুলেছেন। কঙ্কাল ও খোলসগুলি যেন জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ছেঁড়া পোকায় কাটা পাতা। ধৈর্য্যসহকারে বৈজ্ঞানিকদের তার লিপি উদ্ধার করে সমস্ত বইখানির সুসম্বদ্ধ অর্থ করতে হয়েছে। তাঁদের উদ্ধার-করা ইতিহাস সত্যই অপরূপ ও কল্পনাতীত।

আন্দাজ ৫০ কোটি বর্ষ আগে এই পৃথিবীর অনতিগভীর সাগরের তলায় নানাপ্রকার স্পঞ্জ, শামুকের মত জীব ও ট্রিলোবাইট নামে আদিম একরকম পোকা বিচরণ করত। তখনও ডাঙ্গায় কোন প্রাণী উঠতে পারে নি। সমস্ত স্থল ছিল মরুভূমির চেয়েও জনপ্রাণীহীন। আমাদের মত মেরুদণ্ডবিশিষ্ট কোন প্রাণী তখনও দেখা দেয়নি, কোন প্রকার মাছও নয়। সত্যিকারের কোন পোকা বা মাকড়শা তখন ছিল না। ট্রিলোবাইটই ছিল সে যুগের সৃষ্টির অধীশ্বর। ট্রিলোবাইটকে ঠিক পোকা বলা উচিত নয়, কারণ সে অনেক নিম্নস্তরের প্রাণী। আজকালকার পোকার মত এত জটীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার ছিল না। আদিম সমুদ্রের তলায় কাদার উপর সে বিচরণ করত। অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহই ছিল তার আহার। ট্রিলোবাইটেরা লম্বায় দু ফুট পর্য্যন্ত হ'ত

ট্রিলোবাইটেরা পৃথিবীতে দশ কোটি বৎসর রাজত্ব করেছিল বলা যেতে পারে। তার পরে রাজত্ব সুরু হয় সামুদ্রিক কাঁকড়া-বিছের। এই সামুদ্রিক কাঁকড়া-বিছে সত্যিই বর্ত্তমান

কালের কাঁকড়া-বিছে, মাকড়শা প্রভৃতির আদি পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞাতি। তারা ধীরে ধীরে আকারে ও শক্তিতে ট্রিলোবাইটদের ছাড়িয়ে গিয়ে তাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দেয়। সাগর-বিচ্ছু বা ইউরিষ্টেরিডস্ লম্বায় নয় ফুট পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। তারাও সমুদ্রের তলায় ঘুরে বেড়াত। ধীরে ধীরে পিছনের পা দুটিকে দাঁড়ের মত ব্যবহার করে তারা সাঁতরাতে পারত। সাগর-বিচ্ছুদের সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, সাগরে উদ্ভূত হয়ে গোড়ার দিকে সাগরেই জীবন কাটালেও তাদের বংশধরেরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে নদী, হ্রদ প্রভৃতির মিষ্ট জলের জগতে বাস করতে সুরু করেছিল। সাগর-বিচ্ছুর জ্ঞাতগোত্র সবাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, হয়নি শুধু একটি। তাদের নাম 'রাজকাঁকড়া'। 'রাজকাঁকড়া' আমেরিকার উপকূলে কোথাও কোথাও এত প্রচুর পাওয়া যায় যে, তাদের মৃতদেহ সার হিসাবে সেখানকার লোকেরা ব্যবহার করে।

এই সমস্ত পোকা জাতীয় জীবের সঙ্গে আর একটি প্রাণীও সমুদ্রে নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল। সে হ'ল 'তারামাছে'র আদিপুরুষ। তারামাছের গোষ্ঠী কেউ সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় উঠতে পারে নি, কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে, তাদের মাথা বলতে আমরা শরীরের যে অংশ বুঝি, তেমন কিছুও সৃষ্টি হয় নি। তারা সৃষ্টির কবন্ধ জানোয়ার, স্পঞ্জের চেয়ে এক ধাপ উচু। কিন্তু তারামাছের বংশ একটা অসাধ্য সাধন করেছে। সাগর-বিচ্ছুদের সময়ে তারামাছেরা এখনকার মত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারত না তাদের পুরুষেরা সকলেই থাকত গাছের মত এক জায়গায় আটকে। ধীরে ধীরে তারা সেই অচলতা কাটিয়ে উঠেছে। উপরের দিকে মুখ তাদের তোলা থাকত। এখন তাদের মুখ নীচের দিকে, পাঁচদিকে পাঁচটি পাও অনেক পরে তাদের বেরিয়েছে। আগে তারা এমন পাঁচকোণা ছিল না।

ট্রিলোবাইটদের সঙ্গে ৫০ কোটি বছর আগেকার সমুদ্রে যে শামুকের মত প্রাণী দেখা যেত, তাদের ধারা থেকেই বর্ত্তমান কালের বিশাল অক্টোপাস থেকে ছোট গুগলি শামুক পর্য্যন্ত বেরিয়ে এসেছে। অক্টোপাসের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকটা আজকালকার শামুকের মতই সমুদ্রের তলায় বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াত। তাদের তখন অনেকটা শামুকের মতই খোলস ছিল বাইরের দিকে। আন্দাজ দশ কোটি বছর আগে বর্ত্তমান অক্টোপাসদের মত এক রকম জীব দেখা যায়। তাদের বাইরে কোন খোলস নেই। অনেকটা আমাদের মেরুদণ্ডের মত, খোলসের বদলে তাদের শরীরের ভিতরে হাড়ের শক্ত কাঠাম গড়ে উঠেছে। তারা বেগে চলাফেরাও করতে পারে সমুদ্রের ভিতরে।

পৃথিবীতে আজ মেরুদণ্ড যাদের আছে, সেই সমস্ত জানোয়ারেরই প্রাধান্য। বুদ্ধিতে ও বলে শুধু নয়, আকারেও তারা সব জানোয়ারের চেয়ে বড়। তিমির চেয়ে বিশাল জানোয়ার পৃথিবীতে নেই।

সৃষ্টির গোড়ার দিকে এই মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী কিন্তু ছিল নগণ্য। তখন সাগরে পোকামাকড় এবং অন্যান্য প্রাণীরই রাজপাট। ট্রিলোবাইটদের সময় শেষ হবার অনেক দিন পরে প্রথম সমুদ্রে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের ভিতরই ছিল বর্ত্তমান হাঙ্গরদের আদি পুরুষ। হাঙ্গরদের মেরুদণ্ড কিন্তু ঠিক অস্থিতে নয়, 'কার্টিলেজ' বা উপাস্থি দিয়ে তৈরী। অস্থির মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মাছ এদের পরে সমুদ্রে দেখা দেয়। তখন তাদের আকার ছিল অদ্ভুত। অধিকাংশেরই গায়ে কঠিন বর্ম্ম থাকত। সে বর্ম্মের আচ্ছাদনে তাদের আজকালকার মাছের আত্মীয় বলে চেনাই কঠিন। তাদের অনেকটা পোকামাকড়ের মতই দেখাত।

যে কয়েকটি সেকালের মাছের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের ঠিক বংশধর এখন আর কেউ টিঁকে নেই। কিন্তু তাদেরই নানা অখ্যাত আত্মীয় আজকালকার পৃথিবীর অধীশ্বর মানুষ থেকে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষ।

এ পর্য্যন্ত যত প্রাণীর কথা বলা হ'ল তারা সবাই সামুদ্রিক। তাদের সময়ে ডাঙ্গা কোন জীব জয় করতে পারে নি। জীবজগৎ তখনও জলেই আবদ্ধ।

বৈজ্ঞানিকেরা অতীত যুগের প্রস্তর-স্তর সন্ধান করতে করতে প্রথম মেসোজোইক যুগে একটি পদচিহ্ন পান। সে পদচিহ্নের মূল্য ও ইঙ্গিত যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। পাথরের বুকে অক্ষয় ভাবে মুদ্রিত সেই পায়ের দাগ, সামুদ্রিক জীবের স্থলরাজ্য-বিজয় ঘোষণা করছে।

বর্ত্তমান কালের মানুষের পক্ষে মঙ্গল গ্রহ জয় করার চেয়ে আদিম সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর সেই স্থল-বিজয় কম বিস্ময়কর নয়। ডাঙ্গার রাজ্য তখন সত্যই অজানা, কল্পনাতীত। কোন প্রাণী সেখানে তার আগে নিশ্বাস গ্রহণ করেনি, স্থল-পথে চলাফেরার কৌশল কোন প্রাণী তার আগে আয়ত্ত

মেসোজোইক যুগ স্থল-বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাসের জন্যই অসাধারণ হয়ে আছে। সমুদ্র থেকে নানা প্রাণী নানা ভাবে এই নূতন অজানা জগতে সেদিন উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ডাঙ্গার নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেমন তাদের মানিয়ে চলতে বাধা পেতে হয়েছে, তেমনি প্রাণী-বহুল সমুদ্রে জীবনের হিংস্র প্রতিযোগিতা থেকেও তারা সেদিন কতকটা রক্ষা পেয়েছে!

স্থল-রাজ্যের এই অভিযান আমাদের আলোচ্য নয় এই অভিযানে অনেক দূর গিয়ে আবার যে কয়েকটি প্রাণী সমুদ্রে ফিরে এসেছিল, তাদের কথাই কিছু বলব। ইতিপূর্ব্বে তিমি ও শীলের প্রসঙ্গে এ রকম ফিরে আসার কথা জানান হয়েছে। তিমি ও শীল বিবর্ত্তনের অনেক উঁচু ধাপে উঠে তারপর ফিরেছিল সমুদ্রে। কিন্তু তাদের অনেক আগে আরো বহু প্রাণী সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। ইকথিওসোরস ও প্লিসোরস এমনি দুটি প্রাণী। এ দুইটিই ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ। সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় উঠে বংশ-পরম্পরায় তারা সেখানে চলাফেরা ও নিশ্বাসগ্রহণের কৌশল আয়ত্ত করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে তাদের মন টেঁকেনি বলা যেতে পারে। তাদের বংশধরেরা জলে নামলেও স্থল-প্রবাসের স্মৃতি কিন্তু ভুলতে পারেনি, সে প্রবাসের জীবন তাদের কাজেও লেগেছিল। স্থল-পথে যে পায়ে তারা হাঁটত, জলে নেমে তাই সাঁতার কাটবার জন্য তাদের ব্যবহার করতে হয়েছে একটু আধটু অদল বদল করে, কিন্তু বুদ্ধিতে ও শক্তিতে তারা ঘরকুণো অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের চেয়ে বড় ছিল বলেই মনে হয়।

ইকথিয়োসোরস ও প্লিসোরাস আজকাল অবশ্য টিকে নেই। তাদের স্থলরাজ্যের জ্ঞাতিভাই ডাইনোসরদের মতই তারা হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেছে আশ্চর্য্য ভাবে। সরীসৃপ বংশের জাতি এখন টিকটিকি গিরগিটি থেকে আরম্ভ করে কুমীর ইগুয়ানা প্রভৃতি প্রাণীকে আশ্রয় করে টিমটিম করে জ্বলছে মাত্র। সমুদ্রে গ্যালাগ্যাগোস দ্বীপের সামুদ্রিক ইগুয়ানা ছাড়া আর কোন প্রতিনিধি তাদের নেই বললেই হয়। পৃথিবী-গর্ভে কয়লা যেদিন সঞ্চিত হচ্ছিল, তখনকার ডাইনোসরদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

মেসোজোইক যুগের পর যত বর্ত্তমান কালের দিকে এগিয়ে আসা যায়, ততই আধুনিক সমস্ত প্রাণীর সন্ধান মিলতে থাকে সমুদ্রে। অক্টোপাসেরা ক্রমশঃ দেখা যায় শক্তিমান হয়ে উঠছে, ঝিনুক কাঁকড়া চিংড়ি নানা বিচিত্ররূপ প্রাণীর কাছে সামুদ্রিক মাছেরা তাদের সমস্ত বিশেষত্ব আয়ত্ত করে ফেলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে প্রবালেরা তাদের দ্বীপ-নির্ম্মাণের বিশাল আয়োজন সুরু করেছে। প্রাচীন কালের অন্যান্য প্রাণীদের হটিয়ে দিয়ে সমুদ্রের রঙ্গমঞ্চ আধুনিক যে সমস্ত জীব দখল করে বসেছে, কালের পরীক্ষায় তাদের মধ্যেও কজন বেঁচে থাকবে কে জানে! ট্রিলোবাইটদের, সাগর-বিচ্ছু-দের যুগান্তব্যাপী রাজত্বের সময়ে বর্ত্তমান কালের মাছেদের, এমন কি অক্টোপাসদের সাড়াটুকুও পাওয়া যায় নি। ডাইনো-সারদের আধিপত্যের সময়ে স্তন্যপায়ী জীব ছিল অখ্যাত, একেবারে নগণ্য। কিন্তু তার পর দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাগ্যও গিয়েছে বদলে। আজকের দিনের অখ্যাত নগণ্য কোন জীব ভবিষ্যতে হয়ত প্রধান হয়ে উঠবে আশ্চর্য্য ভাবে। সমুদ্রে জীবজগতের উদ্বর্ত্তনের ধারায় মানুষ যে অনেকখানি ওলট-পালট করে দেবে তাও ঠিক। এরি মধ্যে তার হাতে শীল ও তিমি মাছ লুপ্ত হতে বসেছে। যে সমস্ত সাগরে মানুষের জাহাজ অনবরত চলাচল করে, সেখানকার জল তেলে নোংরা হয়ে মাছেদের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন ও লোভের তাগাদায় মানুষ সাগর-রাজ্যে আরো ব্যাপক ভাবে হানা দেবার সঙ্গে প্রকৃতির নিজস্ব ছক যে অনেক বদলে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ফল কি রকম দাঁড়াবে এখন থেকে অনুমান করা যায় না।

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবন যদি একটি ফুলের জীবনের মত সহজ হ'ত, তবে এই প্রবন্ধ লিখবার আমার কোনো প্রয়োজন আজকে থাকত না। একটা অতি স্বাভাবিক, অতি অনাড়ম্বর নিয়মের ভিতর দিয়ে ছোট্ট, সবুজ কুঁড়িটির ভিতর থেকে ফুল আত্মপ্রকাশ করে; ধীরে ধীরে আপনার আনন্দে আপনি বিকশিত হ'য়ে ওঠে—বর্ণে, গন্ধে, প্রাণের পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যে। তারপরে তার দুদিনের নিশ্চিন্ত জীবনের ঘটে এক স্বাভাবিক পরিণতি। অনায়াসে সে এসেছিল, আলো-বাতাসের চুম্বন-আদর-আলিঙ্গনের ভিতরে অনায়াসে সে বেঁচে ছিল, যথাসময়ে অনায়াসে গেল সে বিদায় নিয়ে। নিজের জীবন নিয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অসন্তোষ নেই, কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু মানুষের জীবনের প্রথমারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত এক বিচিত্র জটিলতা; তার চলবার পথে প্রতি পদে পদে বহুরকমের বহুবিস্তৃত সমস্যা;

হিপোক্রাটিস: (৪৬০-৩৭৭ খৃঃ পূঃ)

তার প্রতিদিনকার অস্তিত্বের পশ্চাতে বহু বিচিত্র, সুকঠোর সংগ্রামের বিপুল ইতিহাস, নিজেকে নিয়ে তার মুহূর্ত্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের মাঝখানে বহু গ্লানির ভার ওঠে জ'মে, সহস্র বিঘ্নের ঝড়ের ভিতরে ক্ষত-বিক্ষত দেহ-মন নিয়ে তার সাবধানে জ্বালা সার্থকতার প্রদীপখানি বারে বারে আসে নিভে। সমস্ত জীবনখানি তার সাগর-তরঙ্গের মতই বিক্ষুব্ধ।

জীবনের যাত্রা-পথে মানুষকে যে অসংখ্য প্রকার সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হয়, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম তার মধ্যে অন্যতম। লক্ষ কোটি ব্যাধির তাড়নায় মানুষের স্বাস্থ্য উঠছে জর্জ্জরিত হ'য়ে; তার মধ্যে যে বিশিষ্ট ব্যাধিটি আমার আলোচনার বিষয়, সেটি হ'চ্ছে বুকের একটি ব্যাধি। বুকের ব্যাধিও আছে অনেক প্রকারের; কিন্তু তার ভিতরকার দুরন্তমটির কথা আমি ব'লব—যেটিকে সাধারণভাবে লোকে জানে "যক্ষ্মা ব্যাধি" বলে। ইংরাজীতে একে বলা হয়—Consumption, Phthisis, Tuberculosis ইত্যাদি। Tuberculosis কথাটাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা হ'য়েছে T. B., অন্য নামগুলিও সাধারণের অজ্ঞাত নয়। যাদের এই ব্যাধি হয়েছে, তাদের বলা হয়ে থাকে—Consumptives

আমি নিজে ডাক্তার না হ'য়ে যে এই ব্যাধি সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—এটা যে ঠিক "অব্যাপারেষু ব্যাপারং" করছি না, সে কথাটা আগে বলে রাখি। আমি নিজে একজন এই রোগী এবং এই রোগ সম্বন্ধে যে কোনো ডাক্তারের চাইতে আমার "interest" এক তিলও কম নয়—এ কথা আমি বলতে পারি সাহসের সঙ্গে। তারপরে, এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। কথাটি এই, ভয়ংকরভাবে এই ব্যাধি সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করে চতুর্দ্দিকে বিরাজ করছে মূর্ত্ত বিভীষিকার মত, সমাজের প্রত্যেকটি স্তর আজ এই ব্যাধির দ্বারা যে ভাবে হয়েছে বিড়ম্বিত, তাতে ক'রে যে দিক থেকেই হ'ক না কেন, এই ব্যাধির আলোচনা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন আমার আছে—সমাজের একজন লোক হিসাবে। শুধু এই-ই নয়; আরও আছে। এই ব্যাধি সব চেয়ে সাঙ্ঘাতিক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে ছাত্র এবং যুবাবয়স্কদের ভিতরে। সহস্র সহস্র যুবকের দীপ্তিময় যৌবন এই ব্যাধির দ্বারা হয়েছে কলঙ্কিত, তাদের সমস্ত শক্তি, ঐশ্বর্য্য—বহুমুখী প্রতিভা, সম্ভাবনা—হয়েছে অকরুণ ভাবে লাঞ্ছিত। এই ব্যাধির ধ্বংস-স্পর্শে তাদের জীবনের অনন্ত স্বপ্ন গেছে ধূলির মত চূর্ণ হয়ে। আমি নিজে যুবক এবং আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার আগে আমিও যাপন করছিলাম ছাত্র-জীবন। কাজেই তাদের একজন হ'য়ে এ বিষয়ে চিন্তা করবার সম্পূর্ণ অধিকারই আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধিটি নিতান্ত আধুনিক নয়। আমরা সন্ধান নিলে দেখতে পাব প্রাচীনকালেও এই ব্যাধির অস্তিত্ব ছিল। Neolithic অথবা New Stone Age যে সময়টাকে বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মানব-সভ্যতার সেই আদিমতম অবস্থায়—যখন নাকি তারা পশু-প্রতিপালন, অস্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ইত্যাদি শিক্ষা ক'রেছে, একখানি কঙ্কাল থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, সেই সময়েই মানুষকে এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হয়েছে। এই কঙ্কাল ১০,০০০ হাজার বছর আগেকার এবং ব্যাধির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল মেরুদণ্ডের অস্থিতে। তার পরে মিশর দেশীয় মামীগুলিকে পরীক্ষা ক'রে তাদের ভিতরে এই ব্যাধির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। এগুলি ৩,০০০ হাজার বছরের পুরাণো। ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক চরক এবং সুশ্রুতের আবির্ভাব হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে। তাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ চরক তাঁর গ্রন্থে এই ব্যাধিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে এই ব্যাধির কারণ, লক্ষণ এবং

চিকিৎসা বিষয়ে যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, আড়াই হাজার বছর পরে আজকার চিকিৎসকেরাও তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ বিষয়েই একমত না হ'য়ে পারেন না।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪৬০ থেকে ৩৭৭ সালের ভিতরে হচ্ছে ও দেশে গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রাটিস-(Hippocrates)-এর কাল। ওদেশে হিপোক্রাটিসকে বলা হয়ে থাকে Father of Medicine, ওদের জন্মদাতা। হিপোক্রাটিসের আগে ব্যাধিকে ভাবা হ'ত দেবতার অসন্তোষ অথবা দৈত্য দানার "নজর" বলে। কিন্তু মানুষের মন থেকে হিপোক্রাটিস এই ধারণ উৎপাটিত করতে প্রয়াস পান। ওদেশে সর্ব্বপ্রথম হিপোক্রাটিসই অনেকটা যথাযথভাবে যক্ষ্মাব্যাধির বিবরণ দিতে সক্ষম হন এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদেরাও বহুকাল পূর্ব্বেকার ওই চিকিৎসকের এই ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা সমর্থনই করে থাকেন। তবে হিপোক্রাটিস এই ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে অথবা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হ'লে ফুসফুসের কি অবস্থান্তর ঘটে, সে সব বিশেষ কিছু জানতেন না। এর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও খুব সুস্পষ্ট এবং যথাযথ ছিল না। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী অনেকে এই ব্যাধি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করে এসেছেন।

প্রাচীন কাল ছেড়ে এবারে আমরা আধুনিক কালে আসতে পারি। প্রাচীন কালে যক্ষ্মাব্যাধির অস্তিত্ব থাকলেও তার ব্যাপকতা যে বর্ত্তমান কালের মত অধিক ছিল না এবং তা যে বর্ত্তমান কালের মত সমাজে তখন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি।

মানুষের আগেকার জীবন ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। আহারে, বিহারে, শয়নে তারা প্রকৃতির ক্রোড়ে করত এক অবিকৃত জীবনযাপন। কিন্তু ক্রমে মানুষের জীবন-ধারার রূপ বদলাল; তার চিন্তায়, তার কর্ম্মে এসে এসে লাগতে লাগল নতুন নতুন রঙ। ধীরে ধীরে হাজার হাজার বছরের ভিতর দিয়ে তার পর্ব্বতগুহার ঘর, তার কুঁড়ে-ঘর পরিণত হ'ল সুধা-ধবলিত, অপরূপ কারুকার্য্য-খচিত বহুতল প্রাসাদে, তার বল্কলবাস খুলে গিয়ে তার অঙ্গে শোভা পেল বিচিত্র বহুমূল্য পরিচ্ছদের স্তূপ, অর্দ্ধ দগ্ধ মাংসের পরিবর্ত্তে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে তার গৃহে হ'ল সুপাচিত, সুস্বাদু, পরম পরিতৃপ্তিকর চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়ের সহস্র আয়োজন! সমাজ গড়ে উঠল; এল শিল্প, এল বাণিজ্য, এল রাজনীতি। ছড়িয়ে পড়ল এসে সঙ্গীত, সাহিত্য, কলাবিজ্ঞানের গাঢ় ছায়া। অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে সেখানে স্থান ক'রে দিল লক্ষ লক্ষ যন্ত্র-ঘর্ঘরিত সুসমৃদ্ধ, সুরম্য মহানগরীর; আত্মপ্রকাশের এবং এই পৃথিবীকে উপভোগ করবার বিচিত্র প্রচেষ্টায় মানুষ হয়ে উঠল জটিল হতে জটিলতর। মানবসভ্যতার এই ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সহস্র সহস্র নতুন ব্যাধির ঘটল আবির্ভাব এবং বহু পুরাতন ব্যাধি অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে মানুষের সমাজে নিজেদের ঘটাল বীভৎসভাবে ক্রমবিস্তার।

আজ সমস্ত সভ্যজগৎ ব্যেপে যক্ষ্মাব্যাধির যে প্রলয়-তাণ্ডব সুরু হয়েছে, তাতে সমাজ-সেবীদের চিন্তিত হবার কারণ ঘটেছে। মোটামুটি হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর এক-সপ্তমাংশ লোক এই দুরন্ত ব্যাধির বিষাক্ত নিশ্বাসে শুকিয়ে ওঠে। এই ব্যাধি বিধাতার এক রুদ্র অভিশাপ।

অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে আপাততঃ আমরা আমাদের মাতৃভূমির দিকেই দৃষ্টিপাত করব।

একজন বিশেষজ্ঞের এই কথাটি অত্যন্ত বেদনার সাথেই উল্লেখ করছি যে, ভারতবর্ষ হয়েছে "A hot bed of Tuberculosis." ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সংখ্যাতীত লোকের এই ব্যাধিতে জীবনান্ত ঘটছে। দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী স্যানাটোরিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট Dr. Frimot Moeller এই কথা বলেছেন:—

"If the question of effectively combating the increase of tuberculosis in tropical and eastern lands is not seriously tackled during the next thirty years, it will not only mean great suffering and early death of millions who might have been spared it, but it will mean also that the work of checking the progress of tuberculosis in these parts of the world will later on be many times more difficult."

অর্থাৎ—এদেশে যক্ষ্মাব্যাধির সাথে যুদ্ধটা উঠে পড়ে যদি করতে না লাগা যায়, তবে লক্ষ লক্ষ লোক যে শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাই নয়, এর পরে এখানে এ ব্যাধির বিস্তারকে রোধ করা হাজার গুণ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তার মুলারের এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্যাটা কতখানি গুরুতর হয়ে ওঠাতেই তিনি এ দেশের লোকের প্রতি এই সতর্ক-বাণী ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বস্তুতঃ যক্ষ্মাব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু বাঙ্গালা দেশের একটা হিসাব দিই। বাঙ্গলায় কয়েক বৎসর যাবৎ একটি Tuberculosis Association স্থাপিত হয়েছে। এঁদের গণনা মতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ১,০০০,০০০ অর্থাৎ দশ লক্ষ লোক ভুগছে; এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশে এই ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটছে প্রতি বৎসরে ১০০,০০০ অর্থাৎ এক লক্ষ লোকের। শুধু কলিকাতা সহরে এই ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার; এবং বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা ৩,০০০ তিন হাজার।

একই রকম ভাবে ভারতবর্ষের যে কোন অন্য একটি প্রদেশের কথাও বলা চলে। সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের সিভিল হসপিটালের যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই, ঐ প্রদেশে এই ব্যাধি ক্রমশঃই কি প্রবলভাবে বিস্তারলাভ করছে। বলা হয়েছে, ১৯১৪ সালে এই রোগীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৮,৬৮৯, সেখানে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৩ সালে হয়েছে ৩৮,৪৩০।

আমি পূর্ব্বেই একটি কথা বলেছি যে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোক এই ব্যাধির দ্বারা জর্জ্জরিত হচ্ছে এবং বিধাতার এই রুদ্র অভিশাপ সব চেয়ে অকরুণ ভাবে এসে পড়েছে যুবক সম্প্রদায়ের উপরে—তথা ছাত্র সম্প্রদায়ের উপরে। ১৬ থেকে সুরু করে ৩৫ বৎসর—যা নাকি একজন মানুষের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়, সহস্র আশা, সহস্র আকাঙ্ক্ষা, সহস্র শক্তি, সম্ভাবনা নিয়ে যখন একজন মানুষ কল্পনা-জগতে, কর্ম্ম-জগতে আপনাকে করবে প্রকাশ, করবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে যখন মাথায় তুলে নিতে

হয় তার ব্যর্থতার নিদারুণ বোঝা, তখন তার সমস্ত বুক ছেয়ে যে হাহাকার বেজে ওঠে, যে গভীর বেদনায় তার সমস্ত প্রাণ নীরবে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়, তা বোধ হয় বিস্তারিতভাবে আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার নয়।

মদনাপল্লী স্যানাটোরিয়ামের ১৯৩৩-৩৪ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে একটি তালিকা দিই। কোন্ কোন্ বয়সের কত রোগী ঐ স্যানাটোরিয়ামে এসেছিল এটা তারই তালিকা।

বয়স		পুরুষ		স্ত্রীলোক
১-৫ বৎসর	...	-	...	—
৬-১০ "	...	৪	...	১
১১-১৫ "	...	১১	...	৬
১৬-২০ "	...	৩৪	...	৩০
২১-২৫ "	...	৫৪	...	৩২
২৬-৩০ "	...	৬১	...	১৯
৩১-৩৫ "	...	৪৮	...	১২
৩৬-৪০ "	...	১৯	...	৭
৪১-৪৫ "	...	১৪	...	২
৪৬-৫০ "	...	১১	...	
৫১-৫৫ "	...	৫	...	—
৫৬-৬০ "	...	৩	...	—
৬১-৬৫ "	...	—	...	—
৬৬-৭০ "	...	—	...	—
৭১-৭৫ "	...	১	...	—

এই তালিকা থেকে যুবকদের দুর্দ্দশা সকলে উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন। তারপরে আর একটি তালিকা দেখুন। এটাও ঐ অ্যানুয়াল রিপোর্টটি থেকে আমি নিয়েছি। এই তালিকা থেকে বুঝতে পারবেন, দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ভিতরে এই ব্যাধির কি রকম প্রাদুর্ভাব এবং তার ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা ছাত্রদের সংখ্যা কত অধিক। এঁরা সবাই ঐ স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার্থী ছিলেন।

ব্যাঙ্কার	৩	ধর্ম্মপ্রচারক	১
বাইবেল-ওম্যান	১	মোটর-চালক	৪
ছুতোর	২	পিয়ন	৫
সিনেমার লোক	২	পুলিশ বিভাগের লোক	২০
কেরাণী	৪০	পোষ্টাফিস এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের লোক	৩
কম্পাউণ্ডার	১		
কনট্রাকটার	২	ষ্টেনোগ্রাফার	২
পাচক	১	ষ্টোর-কিপার	১
কুলি	৮	ছাত্র	৫৩
কৃষি-জীবী	৩৩	সুপারভাইসার	৬
দন্ত-চিকিৎসক	১	উকীল	৯
ডাক্তার	১২	ওয়ার্ড বয়	২
সম্পাদক	২	ইঞ্জিনিয়ার	১
বিদ্যুৎ কারখানার লোক	৪	সেলাইকারিণী	২
পাদ্রী	১	নার্স	১১
আবগারীর লোক	৬	ছাপাখানার লোক	৩
বাগানের মালী	১	P. W. D.-র লোক	৩
সরকারী কর্ম্মচারী	৪	রেলওয়ে কর্ম্মচারী	১৯
স্বর্ণকার	১	ঝাড়ুদার	১
হোটেল ম্যানেজার	১	দরজী	৫
জমিদার	১৩	শিক্ষক	২০
বাণিজ্য বিভাগের লোক	১৭	টাইপিষ্ট	১
ব্যবসায়ী	৫১	টিকাদার	১
		তাঁতি	৩

বাঙ্গালার টিউবারকুলাসিস অ্যাসোসিয়েসানের একটি ডিস্পেনসারিতে আগত ৫০০ রোগী সুপরিচিত যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমূল্যচরণ উকীল এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করেছেন: *

	শতকরা		শতকরা
ছাত্র	১৬.৪	বেয়ারা এবং পাচক	৪.৪
কেরাণী	১২	কৃষক	৪.২
দোকানদার	৫.৮	ইয়োরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৪.৭৫
গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী	৫.৮		
মেকানিক্স	৫.৪	শিক্ষক	২.২
ব্যবসায়ী	৫ ২	স্বর্ণকার	২
প্রেসের লোক	২	নানা রকম—(বুক বাইণ্ডার, প্যাকার, ষ্টেশন মাষ্টার, কার্টার, তামাক ব্যবসায়ী, জুটমিল ওয়ার্কার, ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী, ঝাড়ুদার ইত্যাদি)	৬
দরজী	১.৬		
ফেরী-আলা	১.২		
মোটর চালক, কম্পাউণ্ডার, ট্রাম কণ্ডাক্টার, তাঁতি, পুলিশ কনেষ্টবল প্রত্যেকে	১		

এই সব তালিকা থেকে ছাত্র এবং কেরাণীদের দুরবস্থা সহজেই বুঝতে পারা যাবে।

কিন্তু ডাঃ উকীল তার পরেই বলছেন—"Seventeen percent of the cases diagnosed by us occurred among young women, who thus topped the list." অর্থাৎ মেয়েদের সংখ্যাই তালিকাতে বেশী ছিল। বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞেরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের দেশে পুরুষদের চাইতে মেয়েদের ভিতরে এই রোগের প্রসার অনেক অধিক, এমন কি ৫।৬ গুণ হবে। এর যে কি কারণ, তা' আমি কিছু পরে বলব।

* Calcutta Municipal Gazette, Health Number, March, 1933.

শুধু এই সবই নয়, বিশেষজ্ঞেরা আরও যে সব কথা বলছেন, তা' শুনলে শিউরেই উঠতে হয়। তাঁরা বলছেন যে, প্রত্যেক ব্যাধিগ্রস্তের সংবাদ

লুই পাস্তুর।

কর্পোরেশান অথবা মিউনিসিপালিটিতে দিতে হবে—এমন কোনো বাধ্যতা-মূলক আইন আমাদের দেশে নেই, কাজেই হেলথ-অথরিটির পক্ষে এ বিষয়ে যথাযথ খবর রাখা অনেক সময়েই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুমান করা গিয়েছে যে, যত লোকের সন্ধান জানা যায়, তার চাইতে ৯ গুণ বেশী লোক প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধিতে ভোগে। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আর কি হতে পারে?

আর অন্যান্য বহু ব্যাধির তুলনাতেই এই ব্যাধির ভয়ানকত্ব যে কত বেশী, সে সম্বন্ধে দুটি একটি কথা এখানে না বলে পারছি না। প্রথমতঃ এই ব্যাধি সারতে এত দীর্ঘ সময় নেয় যে, একজন রোগীর মন তিক্ত, বিষাক্ত হয়ে ওঠে—নানা ভাবে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাধির চিকিৎসা বহু ব্যয়সাধ্য; এবং এত দীর্ঘ সময় নেবার দরুন অনেকের পক্ষেই শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা চালানো পৌঁছায় গিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভবের কোঠায়, কারুর কারুর হতে হয় পথের ভিখারী। তৃতীয়তঃ চিকিৎসার গুণে ব্যাধির শান্তি হলেও এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও সম্পূর্ণ একজন সুস্থ দেহীর মত জীবন-যাপন এই ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হয়। সহস্র বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে, সহস্র পঙ্গুতা নিয়ে তাকে জীবনের বোঝাটাকে কোনো মতে চলতে হয় ব'য়ে। চতুর্থতঃ, যাদের এই ব্যাধি হয়েছে, তারা যদি হয় অতিরিক্ত অজ্ঞ এবং অসতর্ক, তবে তারা হয়ে দাঁড়ায় আরও অসংখ্য লোকের অসুস্থতার কারণ—এই জন্যে যে, যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি।

এবারে যক্ষ্মা রোগের কারণ এবং অন্যান্য দু একটি বিষয় বলব।

আজকে Louis Pasteur-এর লুই পাস্তুরের নাম কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। ১৮৫২-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চর্ম্মচক্ষুর অগোচর "জীবাণুর" দলই যে মানুষের বহু ব্যাধির কারণ, এই তথ্য আবিষ্কার করে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এনে দিলেন এক নতুন যুগ, এবং Bacteriologyর করলেন ভিত্তি স্থাপন। তাঁর আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে Robert Koch তাঁর গবেষণাগারে বসে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহা আবিষ্কার করলেন যে, যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয় এক প্রকার জীবাণু দ্বারা। নিজে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে ঐ সালের ২৪শে মার্চ্চ রাত্রিবেলা বার্লিনের Physiological Societyর সভ্যদের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কার।

তিনি দেখালেন, মানুষ এবং নানা রকম জন্তুর দেহ থেকে (যারা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে) এই জীবাণু গ্রহণ করে' অন্য সুস্থ জন্তুর দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এর ছ' বছর পরে George Cornet দেখালেন যে, যক্ষ্মা রোগীদের ব্যাধি যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে গয়ের উঠতে থাকে, তখন তার ভিতরে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া যায়। এই সব রোগীরা অত্যন্ত অসাবধানতার সাথে যেখানে সেখানে গয়ের নিক্ষেপ করে' অপর সুস্থ দেহীদের ভিতরে করে ব্যাধির বিস্তার।

যক্ষ্মা-জীবাণু যে মানুষের কোন্ স্থানে আক্রমণ না করে, সে কথাই বলা কঠিন। বক্ষ, মেরুদণ্ড, টন্‌সিল, ল্যারিংস, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, অন্ত্র, কটি, অণ্ডকোষ, মস্তিষ্ক, চর্ম্ম, হস্তপদাদির অস্থি-সংযোগ-স্থান, চক্ষু—সমস্ত কিছুই আক্রান্ত হতে পারে এর দ্বারা। তবে ফুসফুসই আক্রান্ত হয় বেশীর ভাগ। অন্যান্য স্থানের রোগযুক্ত লোক যত আছে, তাদের চাইতে ফুসফুসের এই রোগযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক এবং "যক্ষ্মা" বললেই সাধারণতঃ লোকে বুকের কথাই আগে বুঝে থাকে। আমার প্রবন্ধে আমি শুধু বুকের যক্ষ্মার বিষয়ই বলব।

বহু সুস্থ ব্যক্তিই হয়ত জেনে একটু আশ্চর্য্য বোধ করবেন যে, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের দেহেই তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ে কোন না কোন ভাবে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশলাভ করেছে। যক্ষ্মাজীবাণুর এই যে সুস্থদেহে প্রবেশ, একেই বলা হয়ে থাকে infection. সাধারণতঃ শৈশবেই infected হবার সুযোগ সব চেয়ে বেশী, কারণ শিশুর দেহের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি সব চেয়ে কম। কিন্তু তাই বলে infected হ'লেই যে রুগ্ন হয়ে পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ প্রচুর পরিমাণে যক্ষ্মা-জীবাণু যদি শরীরে প্রবেশ না করতে পারে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তবে এই ব্যাধিগ্রস্ত হবার ভয় কিছুই নেই। Infection এবং প্রকৃত ব্যাধি এক জিনিস নয়।

রবার্ট কখ্‌।

বস্তুতঃ অল্প জীবাণু শরীরে থাকা ডাক্তাররা ভাল বলেই বলেছেন। সকলেই জানেন বসন্ত রোগ যাতে না হয় এজন্যে টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এই টিকা

দেওয়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে একটু বসন্তের বিষই শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়—এই বিষ ঐ রোগ-প্রতিষেধকের কাজ করে। শরীরাবস্থিত অল্প পরিমাণ যক্ষ্মাবিষ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। সহরেই infection-এর সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী এবং সহরবাসীরাই সব চেয়ে বেশী infected. গ্রামে সে সম্ভাবনা সহরের চেয়ে কম, গ্রামের চেয়ে বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বতে আরও কম। দেখা গিয়েছে যে, অসভ্য জাতির ভিতরে এই ব্যাধির প্রকোপ নিতান্তই কম এবং তাদের পক্ষে infected হ'বার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম। প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশের দেহই এই রোগ-জীবাণুমুক্ত। ঠিক এই কারণেই তাদের স্বাস্থ্য হাজার ভাল হ'লেও একবার যদি তারা কোনভাবে আক্রান্ত হয় এই ব্যাধি দ্বারা, তবে তারা শেষ হয়ে যায়
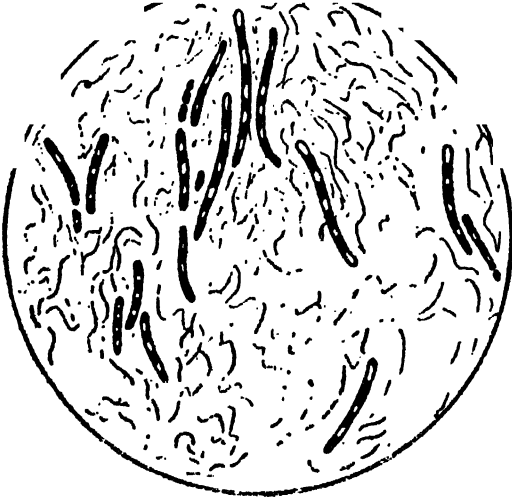
যক্ষ্মা-জীবাণু।

একেবারে দুদিনে। একবার আক্রান্ত হলে অতি অল্প সময়ের ভিতরে তাদের ভিতরে এই ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করে এবং প্রাণ রক্ষা করা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। কিন্তু সহরবাসীর ভিতর এই রোগ চট্ করে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে না এবং হলেও সারবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু এই একটি ব্যাধি বলে নয়, প্রায় প্রত্যেক ব্যাধি সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। রোগকে বাধা দেবার এবং রোগের সাথে যুদ্ধ করবার শক্তি যে সমাজে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সেই সমাজের লোকেই অর্জ্জন করে থাকে। এই শক্তিকে বলা হয়ে থাকে—power of resistance. Resistance কথাটার সাথে যেন স্বাস্থ্য কথাটার কেউ খিচুড়ী না করে ফেলেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান লোক চট্ ক'রে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, অথচ একজন দুর্ব্বল লোক কিছুতেই অসুস্থ হচ্ছে না—এর কারণ ঐ সুস্থ লোকটির ভিতরে resistance power অত্যন্ত কম এবং ঐ দুর্ব্বল লোকটির ভিতরে সেটি বেশী।

সাধারণতঃ প্রথমে এই জীবাণু শরীরে প্রবেশলাভ করে নাকের ভিতর দিয়ে অথবা মুখের ভিতর দিয়ে। তার পরে ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে অবশেষে স্থান নেয় এসে ফুসফুসে। কিন্তু তাদের এই চলার পথটা নিতান্ত সহজ নয়। মানুষের দেহে প্রহরীরূপে আছে যে শ্বেতকণিকার দল, তারা এদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে বিপুল সংগ্রাম। মানুষের পরম বন্ধু চিরজাগ্রত সেনানী—এই যে শ্বেতকণিকার দল, এরা আপ্রাণ চেষ্টায় সুরু করে যক্ষ্মা-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করতে। এই সংগ্রামে কখনো জয়ী হয় এপক্ষ, কখনো ওপক্ষ। শ্বেতকণিকাগুলিকে যদি যক্ষ্মা-জীবাণুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, তবে সেখানে ঘটে গেল সমস্ত মানুষটিরই পরাজয়; আনন্দের সাথে ধ্বংসলীলা চালানোর পক্ষে যক্ষ্মা-জীবাণুর রইল না কোন বাধা। যক্ষ্মা-জীবাণুর প্রথম দেহ-প্রবেশ থেকে সুরু করে কেমন করে তারা আপনাদের সংখ্যা বিস্তার করে, কোথা দিয়ে কি ভাবে চলে, কোথায় কোথায় কি ভাবে আশ্রয় লাভ করে, ফুসফুসের কি কি পরিবর্ত্তন তারা পর পর সাধন ক' চলে, তাদের সাথে শ্বেতকণিকার যুদ্ধপ্রণালী, তাদের অবরোধ-প্রক্রিয়া, যক্ষ্মা-জীবাণুগুলির ধ্বংসসাধন ইত্যাদি বিষয়গুলি এত জটিল এবং বিচিত্র যে, এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া চিকিৎসক এবং অনুসন্ধিৎসু অথবা এই ব্যাধি সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানপিপাসু ছাড়া সর্ব্বসাধারণ—যাদের জন্যেই আমি বিশেষ ভাবে লিখছি—তাদের সামনে অত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়গুলি বর্ণনা করবার একান্ত আবশ্যকতা প্রথমেই নেই বলেই মনে করি।

এবারে কোন্ কোন্ সূত্র থেকে সাধারণতঃ একজন সুস্থ লোক টি. বি গ্রস্ত হবার সুযোগ পায়, আমি তার আলোচনা করব।

বলেছি T. B. Bacilli মানুষের দেহে এই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। যে লোক যক্ষ্মাক্রান্ত হয়েছে, কাসির সাথে তার যে গয়ের ওঠে, সেই গয়েরের ভিতরে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা-জীবাণু থাকে। একজন অজ্ঞ অথবা অপরিচ্ছন্ন রোগী যখন কেসে ইতস্ততঃ গয়ের নিক্ষেপ করে, অন্যের সর্ব্বনাশ ঘটবার পথ তখনই সে করে পরিষ্কার। এই গয়ের শুকিয়ে মেশে ধূলির সাথে; হাওয়ায় ওড়ে সে ধূলি; ধূলি-বাহিত জীবাণু নিশ্বাসের সাথে করে অপরের দেহ-প্রবেশ। অথবা সেই গয়েরের উপরে এসে বসে মাছি, সেই মাছি গিয়ে বসে আবার খাদ্য দ্রব্যের ওপরে; খাদ্যের সাথে জীবাণু গিয়ে আশ্রয়লাভ করে মানুষের দেহে। পরিবারের একটি লোকের যখন হয় এই ব্যাধি, যত্রতত্র সে গয়ের ফেলে—উঠানে, ঘরের মেঝেতে—আর শিশুরা ঘরময়, বাড়ীময় করে খেলাধুলো। হাত দিয়ে তারা কত সময়ে স্পর্শ করে সেই গয়ের, কতভাবে তারা সেই বিষাক্ত গয়েরের সংস্পর্শে আসে। ফলে অনতিবিলম্বে তারা আক্রান্ত হয় এই ব্যাধির দ্বারা।

অনেক টি. বি. রোগীর এমন বদ অভ্যাস আছে, অন্যের মুখের উপরে তারা কাসে। অতি ভয়ানক এই অভ্যাস—কারণ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, যক্ষ্মারোগী যখন জোরে জোরে কাসে, তাদের কাসির সাথে থুতুর কণা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই কণাগুলি জীবাণুপূর্ণ। অনেক সময়ে যক্ষ্মারোগীর পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র ব্যবহার করার ফলে এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত

হওয়া সম্ভব। অনেক রোগী নিজের মুখের কাছে হাত নিয়ে কাসে, কিন্তু সেই হাত বেশ ভাল করে ধুয়ে ফেলবার আর প্রয়োজন বোধ করে না। সেই হাত দিয়ে সে যখন অন্যকে স্পর্শ করে অথবা অন্যের অপর জিনিষপত্র, খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে, তখন সে ডেকে আনে অনেক সময়ে সেই লোকটির বিপদ। চুম্বন দ্বারা অনায়াসে সে এই ব্যাধি সংক্রামিত করে দিতে পারে অপরের দেহে। যে পাত্রে একজন রোগী খেয়েছে, উপযুক্ত ভাবে তা সংশোধিত না করে' যদি সেই পাত্রে কেউ ভক্ষণ করে, অথবা খাদ্যাবশিষ্ট কেউ ভক্ষণ করে, তবে বিপদের বোঝা সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড়ে তুলে সে নেয়। তার পরে দুধ। দুধের বাঁটে যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীর দুধে থাকে প্রচুরপরিমাণে যক্ষ্মা-জীবাণু। অনেকের মতে এই দুধ পান করে' মানুষ—বিশেষ করে শিশুরা পড়ে এই ব্যাধির কবলে। শিশুদের ভিতরে যক্ষ্মারোগের যে এমন প্রকোপ, যক্ষ্মাজীবাণুযুক্ত দুধ, তাদের মতে তার জন্যে প্রচুর পরিমাণে দায়ী। কিন্তু অনেকে এই মতের সমর্থন করেন না। তাদের মতে যে শ্রেণীর জীবাণু গাভীর দেহে এই রোগ উৎপন্ন করে, সেই শ্রেণীর জীবাণু (bovine type) কদাচিৎ মানুষের দেহে রোগ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে বহুজনেই এই মত পোষণ করতেন যে, এই ব্যাধি বংশানুক্রমিক (hereditary)। পিতামাতার যদি এই ব্যাধি থাকে, তবে সন্তানেও তা বর্ত্তে। কিন্তু এ ধারণা বহুদিন সম্পূর্ণরূপে ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। অনেকের মতে পিতামাতা যক্ষ্মাগ্রস্ত হলে সাধারণতঃ তাদের স্বাস্থ্য হয়ে পড়ে দুর্ব্বল। তারা যে সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তাদের স্বাস্থ্যও থাকে দুর্ব্বল, শিশুর দুর্ব্বল শরীরের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিয়ে তাকে যখন সবল করবার চেষ্টা না করা হয়, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতামাতা যখন থাকে অমনোযোগী, তখন সহজেই তাদের সন্তান হয়ে পড়ে যক্ষ্মাক্রান্ত। যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের যক্ষ্মা দুরকমে হতে পারে: প্রথম, পিতা বা মাতার ব্যাধি যদি সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং রোগের সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করে' অত্যন্ত অসাবধানতা এবং অমনোযোগের সাথে শিশুর লালন পালন তারা করতে থাকে, তবে সেই শিশু অচিরাৎ হয়ে পড়ে রোগাক্রান্ত। দ্বিতীয়, infection পিতামাতার কাছ থেকে না হলেও, পিতামাতার কাছ থেকে দুর্ব্বল স্বাস্থ্যলাভ করবার ফলে যে কোন স্থানে বাহিরের যে কোন সূত্র থেকে শিশুরা সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমানে এরও বিরুদ্ধ মত প্রচার হচ্ছে। এঁরা বলতে চান যে, যক্ষ্মাক্রান্ত পিতামাতার সন্তান খানিক পরিমাণে ঐ রোগ থেকে নিরাপদ থাকবার শক্তি (immunity) অর্জ্জন করে থাকে এবং সুস্থ, পিতা মাতার সন্তানদের চেয়ে এদের যক্ষ্মারোগপ্রবণতা (susceptibility to T. B.) কম থাকে। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শিশু কোন মতেই এই ব্যাধি অর্জ্জন করে না, করে ভূমিষ্ঠ হবার পরে—প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরেও যক্ষ্মাব্যাধির প্রসার অনেক নির্ভর করে বলে' কেউ কেউ বলেছেন। অতিরিক্ত বৃষ্টি যে সব জায়গায় হয়, যে সব স্থান সর্ব্বদা স্যাঁৎসেঁতে, সে সব স্থানের অধিবাসীদের জীবনীশক্তি সাধারণতঃ দুর্ব্বল হয়ে থাকে। আমাদের দেশের এই প্রচণ্ড গরমও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। জীবনীশক্তি যেখানে ক্ষীণ, যক্ষ্মার প্রতাপ সেখানে প্রবলতর।

যক্ষ্মাজীবাণু সম্বন্ধে যত কথাই বলা হ'ক না কেন, Tuberculosis-এর Germ-Theory-র উপরে অনেকে যত জোরই দিন না কেন, T. B. Bacilli অনেকের কাছে যতই যথাসর্ব্বস্ব এবং একমাত্র হয়ে উঠুক না কেন, Dr. Muthu ঠিক কথাই বলেছেন—

"The etiology of tuberculosis lies deeper than infection with Tubercle bacilli. There are two causes of disease—the external and internal, the visible and invisible, the material and the mystic, the seed and the soil. The soil is more important than the seed, as resitance is more important than infection. However perfect and selected the seed corn may be, if it is sown in a soil of gravel and sand it will produce no harvest. So no amount of microbes can produce tuberculosis if a man's constitution is robust and resistant. Behind microbe and infection there is the social and economic background which predispcses the soil and activates disease."*

অর্থাৎ—"দেহে জীবাণু প্রবেশই শুধু নয়, যক্ষ্মারোগের কারণ-তত্ত্ব আরও গভীর। ব্যাধির দুটি কারণ আছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক, দৃশ্য ও অদৃশ্য, বাস্তব এবং অতীন্দ্রিয়, বীজ এবং ক্ষেত্র। বীজের চেয়ে ক্ষেত্র প্রধান, সংক্রমণের চেয়ে প্রতিরোধ-শক্তি প্রধান। বীজ যত উৎকৃষ্ট এবং সুনির্ব্বাচিত হ'ক না কেন, প্রস্তর এবং বালুর জমিতে বপন করলে কোন ফলই ফলবে না। ঠিক সেই ভাবে জীবাণুও যক্ষ্মা উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না যদি নাকি একজন লোকের স্বাস্থ্য সুগঠিত হয়। জীবাণু এবং সংক্রমণের পিছনে আছে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক পরিপার্শ্ব যা' নাকি ক্ষেত্র গঠিত করে এবং ব্যাধিকে করে তোলে সক্রিয়।"

বাস্তবিক পক্ষেই এই ব্যাধির কারণ-তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সমাজের যে চিত্র আঁকবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাতে মন হয়ে আসে অবসন্ন। আজ যে এই দুরন্ত ব্যাধি দাবানলের মত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, তার জন্যে আমাদের সামাজিক আবহাওয়া যে কতখানি দায়ী, চিন্তা করতে করতে অবশেষে ক্লান্তি আসে। সামাজিক আবহাওয়া এমনতর দূষিত হবার পিছনে রয়েছে সহস্র অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—রয়েছে আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। জানি না, কতদিনে হবে এর আমূল পরিবর্ত্তন, এর প্রকৃত প্রতিকার। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি যতই ঘটে চলেছে—ততই বেড়ে চলেছে যক্ষ্মা ব্যাধির দুরন্ত আস্ফালন। স্বাস্থ্যহানি কেমন করে ঘটছে সেকথা বলতে প্রথমেই আসে খাদ্যের কথা। এমনই দুর্ভাগা দেশ—ভালভাবে উদর পূরণ করবার জন্যে দুটি বেলার অন্নসংস্থান হয় না অধিকাংশ দেশবাসীর। ক্ষুধার জ্বালায় জীর্ণ, জর্জ্জরিত। ওদি

* Pulmonary Tuberculosis—David C. Muthu P, XXXIX

ভেতরে যারা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, যারা কোন গতিকে দুটি মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করতে পারে, তারা জানে না খাওয়ার পদ্ধতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সহজ নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করবার ফলে দেহ হয়ে পড়ে পীড়িত। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করবার মত আর্থিক অবস্থা মুষ্টিমেয় লোকেরও আছে কি না সন্দেহ। যা' খেয়ে জীবন ধারণ করবার চেষ্টা করতে হয় আমাদের তা' প্রথমে অপর্য্যাপ্ত, তার পরে অখাদ্য। সহরবাসীর পক্ষে বিশুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে তাদের দেহ হয়ে উঠেছে নানা ব্যাধির আকর।

তারপরে আলো বাতাস। একটি মহানগরীর বুকে মানুষকে যে ভাবে জীবন যাপন করতে হয়—সে চিত্র মনে একটি বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। ধূলো, কলকারখানার ধোঁয়া সারা আকাশকে গ্রাস করে বিরাজ করে রাহুর মত—বিধাতার অজস্র, অনন্ত আশীর্ব্বাদ আলো, বাতাস ওঠে বিক্ষুব্ধ,

মাইক্রোস্কোপ দ্বারা থুতু পরীক্ষা।

বিষাক্ত হয়ে। যে সব কক্ষে মানুষের বাস করতে হয়—সেখানে তারা প্রবেশ করতে পারে না, তাদের কল্যাণ স্পর্শে সে সব স্থানকে পারে না নির্দ্দোষ, সুন্দর করে তুলতে। অসীম দারিদ্র্যের তাড়নায় একটি ক্ষুদ্র কক্ষকে অধিকার করতে হয় একটি সমগ্র পরিবারের, পরস্পরের বিষাক্ত প্রশ্বাস পরস্পরকে করতে হয় গ্রহণ। এর পরে আছে সহস্র দুশ্চিন্তা। অর্থের নিদারুণ অস্বচ্ছলতা—অথচ প্রয়োজন একান্ত। প্রতিদিনকার অভাবের তাড়না, প্রতিমুহূর্ত্তের সহস্র ব্যর্থতার নিদারুণ হাহাকার, প্রতি পদে পদে মানসিক শান্তির বিপুল বিপর্য্যয়—এবং তারি সাথে সাথে হয় এই ব্যাধির প্রশস্ত পথের দ্বারোদ্ঘোচন! Dr. Muthu বলতে প্রয়াস পেয়েছেন—

"Tuberculosis is mainly the expression of hunger --for clean air, clean food, clean surroundings and clean mind. And only on these four corner stones can a palace of health be built for suffering humanity for the cure and prevention of tuberculosis--yea, for all disease!"

অর্থাৎ "টিউবারকিউলোসিস প্রধানতঃ মানুষের বুভুক্ষার প্রকাশ বিশুদ্ধ বাতাসের, বিশুদ্ধ খাদ্যের, বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের এবং বিশুদ্ধ মনের। এবং এই চারিটির উপরে ভিত্তি করেই পীড়িত মানবজাতির জন্য স্বাস্থ্য-মন্দির নির্ম্মিত হতে পারে—টিউবারকুলোসিস্, তথা সমস্ত ব্যাধির প্রশমন এবং প্রতিষেধ প্রতিকল্পে।"

অনেকের মতে, আমি পূর্ব্বে বলেছি, যে গাভীর দুধে থাকে যক্ষ্মা-জীবাণু, সেই দুধপানের ফলে মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের যক্ষ্মাগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু মনে রাখবেন তার চেয়ে অনেক বড় কারণ হচ্ছে আদৌ দুধ পান না করতে পারা। ভারতবর্ষে গাভীর ভিতরে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য অত্যন্ত কম এবং দুধ যে ভাবে জ্বাল দিয়ে এদেশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে দুধ থেকে শিশুর দেহে যক্ষ্মাজীবাণুর প্রবেশ লাভ করবার সম্ভাবনা একরকম নেই বললেই চলে। তাছাড়া দেশের আর্থিক দুরবস্থা এমন চরম সীমায় পৌছেছে যে, অতি মুষ্টিমেয় লোকেই তাদের শিশুর জন্যে একটু দুধের ব্যবস্থা করতে পারে। তবুও ভারতবর্ষে শিশুদের ভিতরে যক্ষ্মার প্রকোপ এত বেশী যে, অন্য কোনো দেশের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। এবং এর কারণ দুধ থেকে infection নয়—এর কারণ তাদের দুধ থেকে অসহায় ভাবে বঞ্চিত হওয়া—যা নাকি তাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। ডাক্তার উকীল বলছেন:

"We may safely say, from the work already done by us here, that the infection rate in India to-day is only half of that in European countries. The resistance of our people to tubercular infection and disease is, however, greatly handicapped by faulty nourishment, bad hygienic surroundings and frequent preventable diseases. such as Malaria, Kala-Azar, etc., as also by the Purdah system, early marriage and motherhood."

অর্থাৎ "অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ভারতবর্ষে জীবাণু সংক্রমণের ব্যাপার ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশের তুলনায় একেবারে অর্দ্ধেক। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের এই ব্যাধিকে বাধা প্রদান করবার শক্তি এত অল্প হবার কারণ হচ্ছে পুষ্টির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক এবং ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। এ ছাড়া আরও আছে—অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি।

আমি আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছি যে, ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ভিতরে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রবলতর। এর এই-ই কারণ যে, আমাদের দেশে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের অধিকতর ভাবে স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন করে চলতে হয়। মেয়েদের যে রকম অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, বাল্য-বিবাহের ফলে তাদের স্বাস্থ্য যে রকম কুৎসিত ভাবে জীর্ণ হয়ে ওঠে—অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ছাড়াও তাতে তাদের দেহে টিউবারকুলোসিস

বাসা বাঁধতে পারে আরাম করে। তাছাড়া আরও অনেক ভাবে ছেলেদের চাইতে মেয়েরা নিজেদের স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিক অমনোযোগী—কখনো বাধ্য হয়ে, কখনো অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষার ফলে। মেয়েদের ভিতরে আছে আর একটি অদ্ভুত মনোবৃত্তি—পরিবারের আর সকলের সর্ব্বপ্রকার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে নিজেদের দেহকে তারা অতি অকরুণ ভাবে পীড়া দেয় এবং নিজেদের এমনতর কষ্ট দিয়ে, স্বাস্থ্যের প্রতি এমন বীভৎস অবহেলা দেখিয়ে এক বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে। নিজেদের যেন মনে করে তারা martyr বলে'! কোনো গুরুতর অসুস্থতা ঘটলে অধিকাংশ সময়ে তা চায় না প্রকাশ করতে, সব সহ্য করে নীরবে। ওদের ভিতরে স্বাস্থ্যনাশ যে আরোও বেশী মাত্রায় ঘটবে—টিউবারকুলোসিস যে ওদের আরো বেশী করে ভালবাসবে—এতে আর বিচিত্র কি!

সহরের আলো, আকাশ, বাতাস, পথ-ঘাট, গৃহ-কক্ষ, খাদ্যদ্রব্য সব কিছু দূষিত, সহরের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে যক্ষ্মাজীবাণুর মেলা। সংক্রমণের ভয় সহরে লক্ষ গুণে বেশী এবং ডাঃ উকিল যে বলেছেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সংক্রমণের হার মাত্র অর্দ্ধেক, তার কারণ আমাদের দেশে সহরবাসীদের চাইতে পল্লীবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশী। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে যেখানে শতকরা ৮০ জন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যেখানে ৫৬·২ জন এবং কানাডায় যেখানে ৫৩·৭ জন সহরবাসী, আমাদের দেশে সেখানে সহরবাসী মাত্র শতকরা ১১·০ জন। কিন্তু মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সহরগুলি এবং বাংলার প্রত্যেকটি পল্লী যে এই নিদারুণ ব্যাধি দ্বারা উপদ্রুত হয়ে উঠেছে—যক্ষ্মাজীবাণু ছাড়া তার অন্য গুরুতর কারণ আছে—লোকের নিদারুণ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, তাদের শোচনীয় স্বাস্থ্যহীনতা, অনাহারে এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধির নিত্য তাড়না। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যেতে পারে যে—আলো-হাওয়া শূন্য স্থানে বাস, ধূলি ধোঁয়া দ্বারা দূষিত হাওয়া নিশ্বাসরূপে গ্রহণ, অনাহার, পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব, অত্যন্ত জনাকীর্ণ স্থানে বাস ইত্যাদি এই ব্যাধির প্রধান কারণ। অতিরিক্ত মানসিক অশান্তি, অনিয়মিত স্নানাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এই ব্যাধির প্রধান কারণ। ভীতি, গভীর দুঃখ অথবা শোক, অথবা গুরুতর রকমের যে কোনো স্নায়বিক বিশৃঙ্খলার পরেও এই ব্যাধিকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। সর্ব্ব বিষয়ে কঠোর প্রতিযোগিতা, কর্ম্মপ্রবাহের উদ্দামতা এবং বিভিন্ন পথে জীবনসংগ্রামের প্রচণ্ড অস্থিরতা মানুষের মনোজগতে যে বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়ে চলেছে—সভ্য জগতে যে টিউবারকুলোসিস এত বেশী প্রসার লাভ করেছে, তার কারণ রূপে এগুলিরও নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

মহাঝঞ্ঝা

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আসে যদি মহাঝঞ্ঝা দুর্নিবার পৃথিবীর 'পরে
মরণের হিন্দোলায় আর্ত্তনাদ নিরবধি উঠে,
বিদায়ের অশ্রু-গীতি বিহঙ্গের কণ্ঠ হ'তে ঝরে
বন হ'তে বনান্তরে পুষ্প যদি আর নাহি ফুটে,
তুমি যেন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের তুলিও না সুর
জীবনের অভ্যুদয় ভবিষ্যতে হইবে মধুর।

মরণের মহোল্লাসে নাহি ক্ষতি জগতের মাঝে,
মেঘমন্দ্রে বজ্রপাত হয় যদি পলকে পলকে,
প্রলয়ের গরজনে কাল-সিন্ধু-উর্ম্মিদল নাচে
চূর্ণ হয়ে যায় যদি গ্রহতারা ঝলকে ঝলকে,
তুমি যেন ভেব নাক' নিরুদ্দেশে রহিবে সকলি,
তাহারা জাগিবে পুনঃ জীবনের শুনিয়া কাকলী।

আসে যদি মহাঝঞ্ঝা, অমঙ্গল ভাবিও না ভুলে,
রহে যদি অস্তাচলে স্বর্ণারুণ সুনিদ্রিত হয়ে'
বাদলের বার্ত্তা বহি শর্ব্বরীর চিত্ত যদি দুলে,
মহাকাশ-অন্ধকারে শশাঙ্কের তনু যায় ক্ষয়ে,
তুমি যেন ধ্বংসমাঝে নিঃস্ব প্রাণে হ'য়ো না আকুল,
নূতনের রূপ নিয়া জীবনের জাগিবে মুকুল।

প্রতিদিন পুঞ্জীভূত সংসারের যত মহাপাপ
দূর হবে মহাঝঞ্ঝা স্পর্শ লভি এই পৃথ্বী হ'তে,
বন্ধনের নাগপাশে দুর্ব্বলের আত্ম-অনুতাপ
পীড়নের বহ্নিশিখা নাহি রবে প্লাবনের স্রোতে।
তুমি যেন হাসি মুখে আত্মদান করিও তখন,
ফুরায়ে দিও না যেতে সৃজনের বিবাহ-লগন।

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তিনজনে এক সঙ্গে ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আলিপুরের ছায়াসমৃদ্ধ পথের ধারে ইন্দুদের গাড়ী ওদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইন্দু বলিল, আমাদের সঙ্গে যাবে ত?

বিমল ইতস্ততঃ করিতেছিল।

—রাস্তায় কোথাও নেমে গেলেই ত হবে।

বিমল বলিল, তা বেশ।

ক্ষণা আগে-ভাগে উঠিয়া ড্রাইভারের পাশের স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল; বিমল তাহাকে ভিতরে ডাকিল; ক্ষণা আড়চোখে ভ্রূকুটি করিয়া বসিয়া রহিল। ইন্দু একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক্ষণা বসুক না, তুমি ওঠ।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে যাব?

ইন্দু বিমলের পানে চাহিল, বিমল ইন্দুর উদ্দেশে কহিল, বাড়ী যাবে ত?

—বাড়ী ত যাব, তুমি?

—আমি রাস্তায় নেমে যাব।

—গয়নার ঐ অত বড় পুঁটলী নিয়ে হেঁটে যাবে? না, না, তায় কাজ নেই, চল তোমায় বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

ড্রাইভারকে তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া হইল। জনবিরল প্রশস্ত রাজপথ, গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, ইন্দু বিমলের একখানি হাত হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি ভাবছ?

বিমল বলিল, ছায়ার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ বল না?

বিমল বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য মেয়ে ও। ক'দিন আগেও দেখেছি, কথাবার্ত্তা শুনেও বুঝেছি অশোকের জন্যে ও একটুও ভাবে না। স্পষ্ট বলত বিয়েই হয়েছে মাত্র, তার জন্যে ওর একটুও টান নেই। দেখতুমও তাই। ছায়ার কাজিনরা আসত, তাদের বন্ধুরা আসত, তাদের সঙ্গে হাসি, গান, গল্প করেই ওর দিন কাটত; অশোককে একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখত না! কাজিনরা কেউ নাচের আসরে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ রাত দুপুরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, দল বেঁধে সিনেমা যাচ্ছে—কেউ 'প্রেজেণ্ট' দিচ্ছে 'সেণ্ট', কেউ দিচ্ছে শাড়ী, কেউ তুলছে ফটো, কেউ গান শেখাচ্ছে,—কেউ—বলিতে বলিতে বিমল থামিল, একমুহূর্ত্ত পরে আবার বলিল, দেখে এক এক সময় ওদের সমাজের উপর ঘৃণা হত!

বিমল থামিল, ইন্দু সাগ্রহে তাহার মুখের পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিল; তাহার দুই আঁখিতে সহস্র প্রশ্ন নীরবে জাগিতে লাগিল। বিমল তাহা বুঝিল, পুনশ্চ বলিতে লাগিল, সেই ছায়া আজ তার গায়ের শেষ গয়নাখানি পর্য্যন্ত খুলে দিলে, বেচে তাকেই টাকা পাঠাতে, যার এতটুকু খবর নেবার ইচ্ছে পর্য্যন্ত কোনদিন দেখি নি। আশ্চর্য্য মেয়ে!

ইন্দুর আগ্রহের, আকুলতার অবসান তখনও হয় নাই, তখনও সেই তৃষ্ণাব্যাকুলিত দুইটি চক্ষু বিমলের মুখের পানে পাতিয়া বসিয়া আছে।

বিমল বলিল, টাকা পেতুম পড়াতুম, তা ছাড়া আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কেউ এতটুকুও করে নি, নইলে যা সব দেখতুম, তাতে ঘৃণা হয়ে যেত! ঐ যে সেই প্রণয় বাবু না কি, তোমরা ত তাঁকে ভালই চেন, একদিন রাত একটা পর্য্যন্ত ছায়াকে নিয়ে কোথায় মাঠে ঘাটে ঘুরে এলেন, পরের দিন মাথার যন্ত্রণায় ছায়া উঠতেই পারল না, তার পর গোড়ালিঢাকা প্যাণ্ট পরা ধুম্বো-ধুম্বো কাজিনরা কেউ এসে চোখ টিপে ধরছে, কেউ মাথায় অডিকলোন ঢালছে, কেউ শাড়ীর কোঁচকানো সোজা ক'রে দিচ্ছে—দেখতে যে কি বিশ্রীই লাগত! একদিন দেখি, ঘর অন্ধকার ক'রে দু' তিনটেতে মিলে ছাই পাশ সেবা করছে—ছায়ার মাথা ধরেছে না কি হয়েছে কে জানে! এসব ছায়ার মা জানতেন, দেখতেন, অথচ কিছুই বলতেন না, ওদের সমাজে এসব বোধ হয় দোষের নয়। ঐ সবের জন্যেই ত ছায়া অশোকের কথা ভাবতও না, তার খবরও রাখত না।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করে জানলে—সে ভাব না ?

—আমি দেখতুম না রোজ ?

—লোকে প্রিয়জনকে ভাবে বুঝি লোককে জানিয়ে-জানিয়ে ? সাক্ষী রেখে ? নোটীশ দিয়ে ? না ?

—তবু, দেখে বুঝা যায় না ?

ইন্দু মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, না, বুঝা যায় না। ক্ষণকাল থামিয়া নতমুখে আবার বলিল, বাইরে দেখে মানুষ কতটুক বুঝতে পারে ?

—পারে না ?

—না, পারে না।

ইন্দু একটু চুপ করিল, তার পর আস্তে আস্তে আবার বলিল, বাইরে দেখে যদি বুঝা যেত, তা হ'লে তুমিও আমায় বুঝতে ! আমায় ভুল বুঝে দেখা হলে মুখ ভার করে পালিয়ে যেতে চাইতে না।

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র বুঝিয়া বিমল মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, আঁখি-পাতে জল টল টল করিতেছে, আর একটু হইলেই ঝরিয়া পড়িবে। বিমলের তাহাতে কষ্ট হইল। হইবারই কথা, বিমল ইন্দুকে ভালবাসিত, ভালবাসার ধনের চোখে জল দেখিলে যাহার চোখে জল না আসে, হয় সে ভাল বাসে না, না-হয় তাহার ভালবাসা খাঁটি সোনা নয়, তাহাতে খাদ আছে, কৃত্রিমতা আছে।

বিমল কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইন্দু তাহার আগেই বলিয়া উঠিল, এতদিন পরে তুমি আমায় ভুল বুঝলে !—বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল এবং যে বারিবিন্দুগুলি এতক্ষণ চোখের পাতায় জমা ছিল, তাহাই এক্ষণে ঝর ঝর করিয়া ঝড়িয়া পড়িল। বর্ষার জল যেন গাছের পাতায় জমা ছিল, বাতাসে তাহা ঝরিয়া পড়িল। ইন্দু বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

বিমল ইন্দুর হাত ধরিয়া করুণস্বরে বলিল, আমায় মাপ কর ইন্দু; আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি।

এইটুকু আদরের ভরও ইন্দু যেন সহিতে পারিল না; তাহার বক্ষ নিঙাড়িয়া উৎসাকারে অশ্রু উদ্গত হইয়া আসিতেছিল, পাছে তাহাই আবার প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে চক্ষু মুদিয়া রহিল; ধীরে ধীরে মাথাটি কাৎ হইয়া বিমলের স্কন্ধের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে শতসহস্র যানবাহিত, লক্ষ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত রাজপথে, লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু দৃষ্টির সম্মুখে এই ভাবে পথ চলিতে বিমলের যেন মাথাকাটা যাইতেছিল, পথচারীদের মধ্যে পরিচিত লোকও থাকিতে পারে, তাহারা কি ভাবিতেছে, অপরিচিতরাই বা কি ভাবিতেছে, ইহা ভাবিয়া মনে মনে অতিমাত্রায় শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইলেও, ঠিক এই সময়ে প্রণয়াভিমানিনী নারীকে জাগাইবার—তাহার ভাবাবেশে বাধা জন্মাইবার সাহস বা প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সেও সকলের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইত।

একটু পরে ইন্দু বিগলিত অভিমানভরে কহিল, কেন তুমি আমায় ভুল বুঝলে ? কেন তুমি—সে চুপ করিল। কথাটা যেন বড় কঠিন, বড় মর্ম্মান্তিক।

বিমল বলিল, আমার সঙ্গে কোন সুন্দরী সুবেশিনী মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে তুমি ভুল বুঝতে না ?

ইন্দু দৃঢ় স্বরে কহিল না, কথ্খন না। আর সে পরীক্ষা ত সেদিন হয়ে গেছে।

—কবে ?

—কেন, প্রণয়বাবুদের বাড়ীর থিয়েটারের দিন। তুমি ছায়াকে নিয়ে এলে, আমি ত দেখলুম।

বিমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভেবেছিলে ঠিক করে বল দেখি ? কিন্তু, বাড়ী এসে গেল যে। আর একটা মোড় ঘুরলেই—

ওদিক হইতে ক্ষণা বলিয়া উঠিল, দিদি, স্বদেশী প্রদর্শনীটা কোন্ মাঠে হবে ভাই ?

—সে ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রে !

—আমি কখনও দেখি নি, চল না ভাই দেখে আসি।

বিমল হাসিয়া ইন্দুর পানে চাহিল, বিমল হাসিল, ইন্দুও হাসিল, বলিল, চল্ দেখেই আসা যাক্।

ড্রাইভার, প্রভুকন্যার মনের ভাব বুঝিয়া গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া লইল।

বিমল বলিল, এইবার বল।

ইন্দু বলিল, প্রথমেই মনে হ'ল—সব বলব ?

—নিশ্চয় !

—মনে হ'ল, মেয়েটি আমার চেয়ে সুন্দরী, পোষাক-আষাক আমার চেয়ে অনেক ভাল, হাব-ভাবও অনেক ভাল ! তোমার কোন আত্মীয় নয়, সে ত আমি জানি ! তবে কে ? যেমন মনে হল কে, আমার মন অমনি বললে, তোমার মুখেই শুনতে পার কে, ভেবে কি হবে ! সত্যি বলছি এ ছাড়া আর কিছুই আমার মনে হয় নি।

এক মুহূর্ত থামিয়া আবার বলিল, একথা ঠিক, গার্ভিস সাহেবের উপন্যাসের জেলাসি জাগে নি গো মশায়, একটুও জাগে নি।

—কেন জাগে নি, সেইটেই ত আশ্চর্য্যের কথা।—বলিয়া বিমল হাসিল।

ইন্দু কহিল, কেন জাগে নি তা' জানি নে, তবে জাগতেই হবে তার কি মানে আছে ?

—মানে জানি নে, তবে সৃষ্টির নিয়মে নরনারীর মধ্যে ঐ বৈচিত্র্য চিরদিন আছে তাই জানি।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তাই না কি ? আচ্ছা, ছায়ার কাজিনদের ব্যবহারে তোমার জেলাসি হত ?

বিমল বলিল, দূর ! তা কেন হবে ? আমি কি তাকে ভালবাসি ?

ইন্দু মুখটি নত করিল। ঐ কথাটিই সে শুনিতে চাহিতেছিল, আরও স্পষ্ট করিয়া, আরও শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। ভালবাসার একমাত্র অধিকারিণী জানিয়াও নারী কেন যে আমরণ প্রেমাস্পদের মুখে ঐ কথাটি বারবার শুনিতে চায় ইহা এক পরম বিস্ময়।

বিমল স্বল্পভাষী। তাহার গভীর হৃদয়ে প্রসারতার অভাব না থাকিলেও কণ্ঠের বাধা তাহার অপরিসীম। কত কথাই সে বলিতে চায়, কথা কণ্ঠে আসিয়াই লয় পায়। কিন্তু আজ তাহার কণ্ঠেরও মাদকতা আসিয়াছে। নিজেই কথাটার জের টানিয়া বলিল, আমি যদি ছায়াকে ভালবাসতুম, তার কাজিনদের সঙ্গে লাঠালাঠি হ'ত; আর তা হ'লে কাজিনরাও আমাকে ছাড়ত না।—বলিয়া সে হাসিল, আবার বলিল, আমি যাকে ভালবাসি, যে শুধুই আমার, তা'কে অন্যের সঙ্গে বাদলা-রাতে নির্জ্জন গড়ের মাঠে বেড়াতে দেখলে আমার ভাল লাগে না, লাগতে পারে না। বুঝলে ?

—বলিয়া সে বাহুমূল দিয়া ইন্দুর কাঁধে একটু চাপ দিল। আবেশে ইন্দুর চক্ষু মুদিয়া আসিল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কও আসিয়া পড়িল। কণা বলিয়া উঠিল, এই যে সাজান আরম্ভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ তা' হবেই ত ! পরশু খুলবে না ভাই দিদি !

ড্রাইভার উদ্যানের ফটকের সম্মুখে গাড়ী থামাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কণা বলিল, না না, থামাতে হবে না। শিয়ালদার দিক দিয়ে বিমলদা'র বাড়ী হয়ে যেতে হ'বে।

কণা বক্তব্যটা ঐখানেই শেষ করিল না, একবার এদিকে মুখ ফিরাইয়া, ইহাদের দেখিয়া লইয়া বলিল, বিমল দা' আর কোথায়ও একজিবিসন-টিবিসন হবে না, সে পার্কগুলোও দেখে নিতুম !

ইন্দু ও বিমলের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল; ইন্দু হাসিয়া বলিল, বড্ড জ্যাঠা হইছিস তুই কণা !

কণা বিমলকে বলিল, আপনারও কি সেই মত বিমল দা ? আমি জ্যাঠাইমা হইছি ?

বিমল ঝুঁকিয়া পড়িয়া কণার পিঠে দু'টা আদরের চড় মারিয়া কহিল, না, না, না, তুমি বড় ভাল মেয়ে !

হঠাৎ একটা গির্জ্জার গম্বুজে ঘড়ি দেখিয়া বিমল মনে মনে চমকিত হইয়া বলিল, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে যে !

ইন্দুও মুখ বাড়াইয়া ঘড়িটা দেখিয়া লইল। মন তাহারও শঙ্কিত হইল, কিন্তু মুখে বলিল, বাজুক গে ! তারপর কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, আজ কত কাল পরে, বল ত ?

বিমলও প্রতিধ্বনির মত বলিল, কত কাল !

ইন্দু পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে কহিল, কত কাল পরে তোমায় কাছে পেলুম বল ত !

বিমলের বাড়ীর সামনে আসিয়া গাড়ী থামিতে, বিমল পুঁটলী লইয়া নামিয়া দাঁড়াইতে ইন্দু বলিল, ভিতরে গিয়ে একটু বসবার কি যে ইচ্ছে করছে তা বলবার নয়। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, আজ আর নামব না। কিন্তু আবার ক'বে দেখা হবে বল ?

—তুমি বল ?

ইন্দু হতাশ কণ্ঠে কহিল, কোথায়ই বা হবে ?

ক্ষণা অন্যদিকে মুখ করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া ছিল, এক্ষণে কহিল, দিদি, ছায়া-দি'র নতুন বাড়ীতে যাবি বলিছিস না?

উভয়ের অধরেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, ছায়ার শ্বশুরবাড়ী যেতে পারি ত আমরা?

—তা বোধ হয় পার। কাল পরশু ত আমি যাচ্ছি, সব দেখে আসি। এসে খবর দেব।

—দেবে?

—দোব।

—কিন্তু কি ক'রে দেবে? তুমি ত চিঠি লিখবে না প্রতিজ্ঞা করেছ।

বিমল হাসিয়া বলিল, আমি ভীষ্মদেব নই, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি।

ইন্দু বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, তাই ক'রো।

ক্ষণা দ্বার খুলিয়া এদিকে আসিয়া দিদির পাশে বসিতে বসিতে নিম্ন কণ্ঠে বিমলকে শুনাইয়া বলিল, আর দাঁড়িয়ে কেন মশাই, বেলা যে পড়ে এল, ভাল মানুষ মেয়ে দু'টি বাড়ী ফিরবে না?

বিমল স্নেহভরে ক্ষণার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, পরমুহূর্ত্তে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটিকে চার খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রথম খণ্ড—প্রভাত, দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন, তৃতীয় খণ্ড—অপরাহ্ন, চতুর্থ খণ্ড—রাত্রি।

প্রথম খণ্ড—প্রভাত

গাড়ী বাড়ীর যত কাছে আসিতেছে, যে মায়াজালখানি আজ সারা সকাল ধরিয়া রচিত হইয়া, তাহারই মধ্যে মাকড়সার মত ইন্দুকে আবদ্ধ আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, তাহা ততই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। বেলা দশটা বাজে, ফুলবাগানখানি রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন কাঁপিতেছে। লাল কঙ্করাবৃত পথ হইতে, গাছপালার শীর্ষ হইতে, সর্ব্বত্রই যেন একটা কম্পমান শিখা উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রৌদ্রে মিশিয়া যাইতেছে। বাগানের মালীরা মাথায় গামছা জড়াইয়া এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতেছে, দারোয়ান তাহার খাটের উপর ভুঁড়ি কাৎ করিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে, গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিতেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথামত দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল।

—বাবু কাঁহা দরোয়ান?

—হুজুর ত বাহার গয়া দিদিমণি।

দুই বোনে নীরব ভাষায় যে কথাটি কহিল, তাহা এই যে, বাবাকে হয় ত ট্যাক্সি করিয়া বাহিরে হইতে হইয়াছে।

ক্ষণা তাহার 'পেটেন্টেড' হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ট্যাক্সিমে গিয়েছেন হ্যায়?

দরোয়ান বলিল, জী! অর্থাৎ হাঁ।

মা ঠিক সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—মুখে আষাঢ়ের আকাশ নামিয়াছে। ইন্দু আগে, ক্ষণা পিছনে উঠিতেছিল, মা ইন্দুকে কিছু বলিলেন না, যেন দেখিলেন না, ক্ষণার ঘাড়টা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া পরুষকণ্ঠে কহিলেন, কোন্ চুলোয় গেছলে শুনি? ভোর বেলা না খাওয়া, না পড়া—কোথায় গেছলি বেলা এগারটা পর্য্যন্ত?

ক্ষণা বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, সপ্রতিভ ভাবে কহিল, কোনও চুলোয় নয় মা, বেড়াতে গেছলুম।

মা অধিকতর রুষ্ট হইয়া বলিলেন, কোথায়, কোন্ চুলোয়, কোন্ মেসোপিসের বাড়ী গেছলি আড্ডা দিতে, তাই শুনতে চাই।

—চিনতে পারবে না বোধ হয়, আমরা ছায়া-দি'র বাড়ী গেছলুম।

মা বুঝিলেন। চোখ দুইটা ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দুর উপরেও পড়িল। বলিলেন, বড্ড আস্পর্দ্ধা বেড়েছে তোমাদের, স্বাধীন জেনানা হয়েছ। কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, গাড়ী নিয়ে যেখানে খুশী গেলেই হ'ল, না?

ক্ষণা উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল, মা পুনরায় বলিলেন, আপিসের কাজ, দশ জায়গায় ঘুরতে হবে, আর গাড়ী নিয়ে ওঁরা গেলেন আড্ডা দিয়ে বেড়াতে, আর ট্যাক্সি নিয়ে কাজে বেরুতে হ'ল।

ক্ষণা বলিল, তার জন্যে তুমি অত ভাবছ কেন মা, দশ বিশ টাকা খরচ করতে আমার বাবার কষ্ট হয় না। আমার বাবা পয়সা রোজগার করতেও ডরান না, খরচ করতেও ডরান না, খরচ করতেও পেছোন না।—বলিয়াই সে দ্রুত-

পদে—এক রকম দৌড়িয়াই চলিয়া গেল। ইন্দু ধীরে ধীরে ক্ষণার অনুসরণ করিয়া চলিল।

মা আর কিছু বলিলেন না বটে; কিন্তু বয়স্ক সন্তানদের বশেও যখন আনা যায় না, শাস্তিও যখন দেওয়া চলে না, সেই সময়কার যে ভীষণ মনোভাব, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ অবরুদ্ধ বহ্নি লইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণা দ্বার বন্ধ করিয়া, খিল দিয়া, দিদির সম্মুখে আসিয়া বলিল, কেমন বলিছি, দিদি?

ইন্দু বলিল, বেশ বলেছিস্। আজ সিল্কের স্কার্ফ বুনে তোকে উপহার দেব।

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল, গল্প করিল, তারপর স্নানাহারের সময় হইয়াছে বুঝিয়া স্নান-কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন

বাড়ীর কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন। কর্ত্তার মস্ত ভুঁড়ি, মস্ত আসন, মস্ত থালা, মস্ত গেলাস, অনেকগুলা বাটী, ছোট, ন', সেজ, মাঝারি, বড়, অনেকগুলা রেকাবি—কোনটায় ফল, কোনটায় মিষ্টান্ন, কোনটায় ভাজা-ভুজি।

সামনে পাখা হাতে গৃহিণী। পাখা হাতেই আছে, বড় নড়িতেছে না; নড়ার দরকারও বড় নাই, কারণ মাথার উপরে বিদ্যুৎ-পাখা ঘুরিতেছে।

কর্ত্তার দুই দিকে, প্রায় আধ হাত করিয়া দূরে দুই কন্যা উপবিষ্টা। কর্ত্তা কখনও কাহারও হাতে একখানি বেগুনি, কাহারও হাতে খানিক পাঁপর, কাহারও হাতে একটু মাছ বা একটু মাংসের টুকরা তুলিয়া দিতেছেন, হিন্দুরা যে ভাবে দেব-মন্দিরের প্রসাদ 'ধারণ' করে, মেয়ে দু'টি ঠিক সেই ভাবে পিতার দান গ্রহণ করিতেছে।

কর্ত্তার দুই জানু প্রায় স্পর্শ করিয়া দুইটি হৃষ্টকায় মার্জ্জার বসিয়া আছে। কর্ত্তা মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়, কতক এ পাশে, কতক ওপাশে রাখিতেছেন, মেয়ে দু'টিও তাহাই করিতেছে। মার্জ্জার দুইটি বোধ হয় নিদ্রামগ্ন। চক্ষু চতুষ্টয় মুদ্রিত, দেহ নিঃসাড়, নিস্পন্দ। নিদ্রামগ্ন যদি নাও হয়, তাহারা ভাবমগ্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন একখানি সুখ-নীড় দেখিলে কাহার না নয়ন মুদিয়া ভাবাবেশ হয় গা?

কর্ত্তাটি আমাদের হেরম্ব বাবু। দৃশ্যস্থিত অন্যান্য কুশীলব-গণের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। তবে মার্জ্জারদ্বয়ের সম্বন্ধে দু'টি কথা বলার প্রয়োজন আছে। তাহারা চিরদিন এমন শান্ত শিষ্ট সভ্য ভব্য ও ভাবপ্রবণ ছিল না, আহারের মাঝে মাঝে কাঁটাটা-আসটার জন্য মুখ-বা মুলো যে না বাড়াইত, এমন নহে, ক্ষণা তাহাদের গার্জ্জেন টিউটর হওয়ার পর হইতে তাহাদের অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ক্ষণা শিখাইয়াছে, বাবার খাওয়া হইয়া গেলে, মা প্রসাদ পাইবার পরে তাহারা যাহা খুশী করিতে পারে, তৎপূর্ব্বে বেয়াদপি করিলে তাহাদের পৃষ্ঠের রোম, ছাল, মাংস কিছুই থাকিবে না, এই বুঝিয়া তাহারা যেন কাজ করে। তাহারা অবুঝ নয়, বুঝিয়াছে ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। ক্ষণা তাহাদের বলিয়াছিল, দেখ, তোমাদের দৃষ্টি ভাল নয়, লোকে যখন খাইবে, তখন তোমরা বাপু, সেদিকে দৃষ্টি দিও না। এটা নিশ্চিত জানিও যে, লোকে যাহাই খাক্ আর যতই খাক্, তোমাদের প্রাপ্য হইতে কেহ তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সুতরাং একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে দোষ কি! তাঁহারাও ইদানীং এমনই গুড চিলড্রেন হইয়াছে যে, একদিনও একটু এদিক ওদিক করে না।

কর্ত্তার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া ঠাকুর ও চাকর যাহারা আদেশ-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়-মান ছিল, তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

সেই ঘরেই একখানি ইজি-চেয়ার থাকিত, দুই পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার ও একটি মার্ব্বেল পাথরের টিপয় থাকিত। আচমনান্তে কর্ত্তা আসিয়া ইজি চেয়ারে শুইলেন, কন্যাদ্বয় দুই পার্শ্বের দুই চেয়ার দখল করিল; কেহ পাকা চুল বাছিতে মন দিল, কেহ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল; টিপয়ের উপর পানের কৌটা, খড়িকা ও জলের গ্লাস বসিল; ভৃত্য সাগ্নিক কলিকাশোভিত রূপার আলবোলাটি দূরে বসাইয়া নলটি কর্ত্তার ইজি-চেয়ারের আওতায় আটকাইয়া দিয়া গেল; গৃহিণী ভোজনে বসিলেন; মার্জ্জারদ্বয় নয়ন মেলিয়া পরিবর্ত্তনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যেদিন আপিসে বাহির হইতে হইত না এবং অসময়ে 'তাস পাশা পাঁচালী'র আড্ডা বসিত না এবং বাহিরে বাঈ নাচ বা যাত্রার আসরের আকর্ষণ থাকিত না, সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজ-নের পর আসর ঐরূপ ভাবে জমিত এবং আসরের শেষাংশে কন্যাদের সেবাসন্তুষ্ট পিতা গল্প করিতে করিতে ইজি-চেয়ারেই

ঘুমাইয়া পড়িতেন। আজ আপিসে যাইবেন না, সামান্য যা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ ছিল, তাস-সঙ্গী মহেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, সেই কথাটাই আলবোলা টানিতে টানিতে বলিলেন।

ক্ষণা সুযোগ খুঁজিতেছিল, বলিল, বাবা, কত টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লাগল আজ?

—মহেন্দ্ররের বাড়ী পর্য্যন্ত, কত আর, দেড় টাকা বুঝি! তারপর ত মহেন্দ্ররের গাড়ীতেই ঘুরলুম, সেই ত বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ক্ষণা বলিল, মা ত ভেবেই অজ্ঞান, না জানি কত কত টাকা তোমার আজ ট্যাক্সিতে খরচ হয়ে গেল।

পিতা বলিলেন, গুরুতর ভাবনারই কথা বটে!

কথাটা স্পষ্ট হইল না—বোধ হয় অর্থও নির্ণীত হইল না। পাছে কেহ স্পষ্ট অর্থ করিয়া লইতে চায়, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মা-লক্ষ্মীরা সকাল বেলা কোথায় ঘুরে এলে বল ত?

ইন্দু বলিল, বেশ স্পষ্ট মধুর কণ্ঠে কহিল, আলিপুরের সেই জজ সাহেবের বাড়ী গেছলুম বাবা। সেই যে আর একদিন তোমাতে আমাতে যাব বলে বেরিয়ে ঠিকানা পেলুম না, ফিরে এলুম।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পিতা বলিলেন, দেখা হল? জজ সাহেব কি বললেন? ছ' মাস ফাঁসী না, এক সেকেণ্ড জেল?

ক্ষণা হাসিয়া বলিল, আমরা বুঝি জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম?

—ও, তাঁর সঙ্গে নয়? তবে?

—জজ সাহেবের মেয়ে ছায়া দি'র সঙ্গে দেখা করতে।

পিতা গম্ভীর পরিহাস কণ্ঠে কহিলেন, তারপর ছায়া-দিদি কি বললেন?

ক্ষণা বলিল, ছায়া দি' শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন, সেইখানে আমাদের যেতে বলেছেন। আমরা একদিন যাব, কেমন বাবা?

—এই নতুন দিদিটির শ্বশুরবাড়ীটি কোথায় ক্ষণুরাণী?

জায়গার নাম জানা ছিল না, ক্ষণা দিদির পানে বিভ্রান্ত ভাবে চাহিতে লাগিল।

ইন্দু বলিল, জান বাবা, ছায়ার স্বামী বিলেতে পড়ছিলেন, ছায়ার মা তাঁর খরচ বন্ধ করে দিতে সেখানে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছে, তিনি ছায়াকে চিঠি লিখেছেন। ছায়া বাপ মাকে না বলে তার সমস্ত গয়না বেচে বিলেতে স্বামীকে টাকা পাঠিয়েছে।

পিতা আলবোলার মুখনলটি সরাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু বলিতে লাগিল, ছায়া তার বাপের বাড়ীতেও থাকবে না বাবা। তার শ্বশুর খুব গরীব, কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁদের বাড়ী, ছায়া অত বড় লোক, বিলেতফেরত জজ সাহেবের মেয়ে ত, তবু কালই চলে যাচ্ছে সেখানে; এখানে আর আসবেও না।

কথাগুলি বলিতে ইন্দু যে বিশেষ গর্ব্ব বোধ করিতেছে তাহা তাহার দৃপ্ত কণ্ঠের স্বরেই সুপ্রকাশ। কথা বলিতেছে এমন ভাবে, যেন সে কতকাল হইতে সেই ছায়াকে, তাহার পিতামাতা, শ্বশুরশাশুড়ী, তাহাদের ঘরসংসার সমস্ত জানে। সেই একদিনের, একবেলার দেখা নারীটির উজ্জ্বল ত্যাগের মহিমায় পরম গৌরব অনুভব করিতে তাহার আনন্দ হইতেছে।

মা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন। গলার স্বরটি বেশ খানিক বাঁকা করিয়া বলিলেন, ও-ও এক-রকম বিলাতী ঢং আর কি! বাপ মার সঙ্গে বনল না, মেয়ে এক-বস্ত্রে চললেন—

ইন্দুর মনখানি তখনও ছায়ার গৌরবে গৌরবদীপ্ত ছিল, মধুর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তোমাদের রামায়ণ মহাভারতের সীতা দময়ন্তীও ত অমনি একবস্ত্রে গেছলেন মা, সেও কি বিলিতী ঢং?

মা বলিলেন, তাঁরা হলেন দেবতা! তাঁদের সঙ্গে কার কথা!

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তা হলে তোমার মতে দেবতা আর বিলাতী সাহেব এক, না মা?

—তারা সাহেব!

—দেবতাদের দোষ নেই, সাহেবদেরও দোষ নেই, যত দোষ কি এই মানুষের বেলা!

ক্ষণা নিবিষ্ট মনে পিতার কেশবিরল মস্তকে পাকা চুল খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—

দেবতার বেলা নীলে খেলা
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

মা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, থাম্, পাকা মেয়ে! বই খাতা নিয়ে আয় ক্ষণা, দেখি কদিন কি করিছিস্!

মা মুখ হাত ধুইতে বাহিরে গেলেন, মার্জ্জারদ্বয় পরিত্যক্ত পাতের দুই দিক আক্রমণ করিল। ক্ষণা নিঃশব্দে কক্ষান্তরে ঢুকিয়া অকাতরে 'ঘুমাইয়া' পড়িল।

তৃতীয় খণ্ড—অপরাহ্ন

বাঙালীর ছেলে বাঙালীকে কোন্ পোষাকে মানায় ভাল বল ত? আমি অনেক শ্রীমান, কান্তিমান, সুদর্শন বাঙালীর ছেলেকে ফেরঙ্গ পোষাকে দেখিয়াছি, মনে মনে কখনও যে তাহাদের পোষাকের প্রশংসাও না করিয়াছি এমন নহে; আবার তাহাদিগকেই বাঙালীর ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-পরিশোভিত দেখিয়া বারম্বার বলিয়াছি, ইহারা অন্য পোষাক পরে কেন? বাঙালীর ছেলেকে বাঙালী পোষাকে যেমন মানায়, এমনটি যে আর কিছুতেই মানায় না একথা তাহারা বুঝে না কেন?

প্রণয়কুমার সাহেবী পোষাক ছাড়া পরিতেন না। তিনি সুশ্রী, কান্তিমান, প্রিয়দর্শন, কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সাহেবীয়ানার মধ্যে তাঁহার কমনীয়তাটুকু ফুটিতে পাইত বলিয়া কোন দিনই মনে হয় নাই। আজ তাঁহাকে ধুতি-পাঞ্জাবী চাদরে দেখিয়া মনে হইল, বাঙালী জাতিটার স্বাস্থ্য নাই সত্য, কিন্তু শোভা-সৌন্দর্য্যের অভাব এ জাতির এখনও হয় নাই।

ইন্দুর মনটি আজ যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত বাতাসে ভর করিয়া বেড়াইতেছিল, খুব সহজেই সে প্রণয়কুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া বাগানের বেঞ্চেই বসাইল। বাগানে আজ ফুলের কতকগুলি কচি চারা বসান হইতেছিল, মালীরা গাছ বসাইতেছিল, ইন্দু তদারক করিতেছিল, এমন সময় প্রণয়কুমারের শুভাগমন।

চাকরকে ডাকিয়া চায়ের ফরমাস করিয়া ইন্দু বলিল, গাছ ক'টা বসান হয়ে যাক্, আপনি ততক্ষণ এখানেই বসুন, তারপর উপরে গিয়ে চা খাবেন, কেমন?

প্রণয়কুমার বলিলেন, বেশ ত! কিন্তু তুমি একটি ঝারি নিয়ে আলবালে জল সিঞ্চন কর, দেখে আমিও আবৃত্তি করি—

ইন্দু হাসিয়া বলিল, দুঃখের বিষয় এই হবে যে, এটা কণ্ব মুণির আশ্রমও নয়, পিতা কণ্ব প্রবাসবাসীও ন'ন্। তিনি আজ গৃহবাসী আর আমিও দুষ্মন্ত-প্রার্থিত শকুন্তলা নই। আপনার শ্লোক-আবৃত্তি নিষ্ফল হবে।

কথাগুলার মধ্যে আর যাহাই থাক্, উত্তাপ ছিল না, অবজ্ঞা ছিল না, অবহেলাও ছিল না। কিন্তু প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের যে গূঢ় ইঙ্গিতটি ছিল, প্রণয়কুমার তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, সেকালের কণ্বমুণির আশ্রম ত দেখছি নে ইন্দু, আমি দেখছি—

—বেশ ত, দেখুন। আপাততঃ আমাকেও দেখতে হচ্ছে, মালীটা সারটা বেঁকিয়ে ফেলছে। ওরে পুণ্ডরীক, ও কি করলি—বলিতে বলিতে ইন্দু চলিয়া গেল।

দৃশ্য রম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরাহ্নের স্বর্ণরশ্মি যদি কোন তরুণীর অজ্ঞাতে তাহার মুখের উপরে আসিয়া স্থায়িত্ব লাভ করে, সেই তরুণী যদি আবার সুন্দরী হয় এবং তাহার বসনভূষণে অস্বাভাবিক চাপ বা গুরুত্ব না থাকে, তাহা হইলে যুবচিত্তে যে দোলা লাগে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে কে? প্রণয়কুমারকে দোষ দেওয়া যায় কি? প্রণয়কুমার বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিলেন। যেখানে বসিয়া ইন্দু মালীকে দড়ি ধরিয়া সারির সরল রেখা বুঝাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দুর বস্ত্রাঞ্চল ধূলায় লুটাইতেছিল,—বাগানে কাজ করিতে গেলে অমন কত ধূলাকাদা লাগে—প্রণয়কুমার তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলখানি তুলিয়া ধরিতেই ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, চলুন, এতক্ষণে চা হয়ে গেছে।

—চায়ের জন্যে আমার তাড়া নেই, ইন্দু।

—চায়ের কিন্তু ঠাণ্ডা হ'বার তাড়া আছে।

তাহারা যখন দ্বিতলের সিঁড়ি উঠিতেছিল, ক্ষণার অঙ্কের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মা একবার ইহাদের দেখিয়া লইলেন মাত্র। আবার ক্ষণাকে সহজ ত্রিগুণাঙ্ক শিখাইতে মনঃসংযোগ করিলেন।

চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়িতে নাড়িতে প্রণয় বলিলেন, আজ "কিশোরী"র ড্রেস-রিহার্সাল।

ইন্দু নিঃশব্দ।

—দেখতে যাবে ত ?

ইন্দু স্পষ্টস্বরে কহিল, না।

প্রণয়কুমার বিস্ময়াভিভূতের মত কহিলেন, যাবে না ? কেন ?

—এমনই ; কোন কারণ নেই।

—কারণ যখন নেই, বারণও যখন নেই, তখন যাবে না কেন ?

—অকারণেও ত অনেক কাজ হয়।—গম্ভীরভাবে কথা কয়টি বলিয়া ইন্দু নীচের বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে অনেকগুলো দরকারী কথা ছিল। তোমার সেই কি-বলে-তার চাকরীর কথা।

ইন্দু কথা বলিল না।

প্রণয় বলিতে লাগিলেন, সে সব কথা অবশ্য এখানে বসেও যে হতে পারে না, তা নয় ; কিন্তু বদ্ধ জায়গায় বসে ভাল করে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। রিহার্সালে না যাও, নাই গেলে, চল, খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

ইন্দু বলিল, না।

প্রণয় বলিলেন, গেলে কিন্তু খুব ভাল হ'ত। তার—অর্থাৎ তোমার কি-বলে তার কাজের সব ঠিক ক'রে ফেলেছি প্রায়, চল-না ঘুরে আসি একটু, সব বলব'খন।

ইন্দু পুনশ্চ কহিল, না।

প্রণয় খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন—যাবে না ত ?—তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন দুঃখে গদগদ।

ইন্দুর সেই উত্তর—না।

প্রণয়কুমার অর্দ্ধসমাপ্ত পেয়ালাটি ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া আবার বলিলেন—যাবে না ?

এইবার লইয়া পাঁচবার ; ইন্দু বলিল, না।

প্রণয়কুমার অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, কেন যাবে না, সেটা কি জানতে পারি না ইন্দু ? না, তাও বলবে না ?

ইন্দু বলিল, আমি ত বলেছি, কোন কারণ নেই।

—বাড়ীর কেউ কি—

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, প্রণয়বাবু।

প্রণয়-অভিমানী প্রণয়ীসুলভ কণ্ঠে কহিলেন, তবে যাবে না কেন বল ? তার মানে কি এতদিন পরে এই বুঝব আমি যে, ইউ ডোণ্ট লাইক্ মি ? (তুমি আমায় পছন্দ কর না ?)

ইন্দু কথা কহিল না। পাশের ঘর হইতে ক্ষণার পড়ার শব্দ আসিতেছিল, ইন্দু কাণ পাতিয়া যেন তাহাই শুনিতে লাগিল।

প্রণয়কুমার উদ্বেলিত অভিমানভরে কহিলেন, কিন্তু আমি যে তোমাকে—

ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল ; করজোড়ে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিল, মাপ করবেন ; বাগানে আমার কাজ বাকী আছে।- বলিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

প্রণয়কুমার দুই এক মিনিট মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তারপর চাদরটি গুছাইয়া ছড়িটি লইয়া নীচে নামিতেছেন, ক্ষণা বই হাতে জানালার ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পি আর ই ওয়াই—প্রে মানে কি প্রণয়বাবু ?

প্রণয়কুমার দাঁড়াইয়া পড়িলেন ; চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনল ধাবিত হইতে লাগিল।

ক্ষণা আড়চোখে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া, বইয়ের পাতাটি খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখুন, বাঘের গল্প—He is in search of a new prey. মানে কি প্রণয়বাবু ?

খুব তৈরী হয়েছ দেখছি জ্যেঠা মেয়ে !—বলিয়া ক্ষণাকে প্রায় ভস্ম করিয়া দিয়া প্রণয়কুমার অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড—রাত্রি

রাত্রে কর্ত্তা-গৃহিণীতে আলাপ হইতেছিল।

গৃহিণী। ছায়ার গল্প ত শুন্‌লে। কি বুঝলে বল দিকিন ?

কর্ত্তার তন্দ্রাবেশ হইতেছিল, কহিলেন, বড় ভাল মেয়ে !

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুমি থাম, গুণ ব্যাখ্যানা শুনতে কে চেয়েছে ?

চট করিয়া তন্দ্রা ছুটিয়া গেল ; কর্ত্তা বলিলেন, কি বলছ ?

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়ের কথা কি ভাবছ ?

—তাই ত !

—মেয়েটা অধঃপাতে যাবে, বাপ হয়ে বসে বসে তাই দেখবে ?

কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ওকে বলি, কি বল ?

গৃহিণী চিন্তিতভাবে কহিলেন, বলে' কি বালীগঞ্জের লেকের জলে সেই কাণ্ড করাবে ? যে দিনকাল, মা-বাপের কড়া কথা মেয়েরা বরদাস্ত করে ?

কর্ত্তা নীরব।

গৃহিণী বলিলেন, একটা উপায় যা-হয় কর গো, নইলে সেই হা-ভাতে হা-ঘরে ছোঁড়াটা আমার মেয়ের মাথা খাবে। বুঝলে না, মেয়ে ভোর রাত্রে কাউকে না বলে' তারই উদ্দেশে ছুটল, ও ছায়া-টায়া সব বাজে

কর্ত্তা তথাপি নীরব। গৃহিণী উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, অন্ধকারে স্বীয় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি চুপ ক'রে আছ কেমন ক'রে গো, আমার যে মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে করছে। তবুও চুপ করে রইলে, হ্যাঁগা ? সব দায় কি একা আমারই, সব ভাবনা কি একা আমিই ভাবব ? তুমি কি ওদের বাপ নও, তোমার কি কোন কাজ নেই! মাগো, আমি কি করি গো ?

যেন এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ঠিক এই সময়ে কর্ত্তার নাসিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গৃহিণী বিছানায় আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চায়ের পেয়ালায় ঝড় উঠিয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণের আইনজ্ঞানের অভাব আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেই যত বিরোধ। ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বলিতেছি

মিসেস ঘোষ বলেন, সে বিয়ে বিয়েই নয়, আমি আবার আমার মেয়ের বিয়ে দোব।

জজ সাহেব মিষ্টার ঘোষ বলেন, সে হয় না, হবার নয়। হিন্দু পুরুষ যতবার খুশী, বিয়ে করতে পারে, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে এক স্বামী বেঁচে থাকতে কোন অবস্থাতেই আবার বিয়ে করতে পারে না।

—পুরুষে যা পারে, মেয়েরা তা পারবে না কেন ?

—কেন, তা বলা শক্ত ; তবে একটা কারণ এই যে আইন পুরুষদের স্বাধীনতা দিয়েছে, মেয়েদের তা দেয় নি।

—সাহেবদের পুরুষরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিয়ে করে ডাইভোর্স করে, মেয়েরাও তাই করে। হিন্দু আইনে ডাইভোর্স নেই কেন ?

– যাঁরা আইন তৈরী করেছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করতে পার।

- আইন বদলান দরকার। তোমরা আছ কি করতে ? এই সব বুনো আইন ঘাঁটতে তোমাদের লজ্জা হয় না ?

জজ সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা লজ্জাহীন হয়েই কাটিয়ে গেলাম ; কিন্তু বেশী দেরী নেই তরু, (তাঁহার স্ত্রীর নাম তরুলতা) হয়ে এল বলে। হিন্দু সমাজে যাতে ডাইভোর্স চলে, তার চেষ্টা হচ্ছে। আইন-সভায় আইন পেশ বলে। সে আইন পাস হলে হিন্দু পুরুষও এক স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে, হিন্দু স্ত্রীও স্বামী ছেড়ে পত্যন্তর চেখে বেড়াতে পারবে।

জজ-পত্নী তরুলতা উল্লাসভরে কহিলেন, তাই হওয়াই উচিত। এই দেখ না, কার সঙ্গে ছায়ার একরাত্রের একটা মালা-বদল হয়ে গেছে, সে বিলেতে যা খুশী করুক, যত রোগই নিয়ে আসুক, ছায়াকে বাধ্য হয়ে সেই পাষণ্ডের স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে।

জজ সাহেব বলিলেন, হিন্দু আইন যখন তৈরী হয়েছিল, তখন এ সমস্যা জাগবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন পতিকে পত্নীরা দেবতা জ্ঞান করতেন, দেবদর্শন যেমন কোনদিনই সুলভ নয়, পতিদেবতাদর্শন সুদুর্লভ হলেও পত্নীরা তাঁদের ধ্যান করে পুজো করেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন ; পত্যন্তর গ্রহণের কল্পনাও জাগত না তাঁদের মনে। আবার এক-জন স্বামী দশটি স্ত্রী গ্রহণ করলেও স্ত্রীরা রাগ করে ডাইভোর্স-আদালতের শরণ নিতেন না। বলিয়া জজ সাহেব একটি কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হায় রে সেকাল।

শয়নকক্ষে বসিয়াই এই সব আলোচনা হইতেছিল, তখনও প্রভাতের রৌদ্র কড়া হয় নাই, এইবার মুখহাত ধুইয়া খানা-কামরায় প্রবেশানন্তর ছোটা হাজরী খাইবার কথা।

ছায়া কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, বাবা, আমি আসব ?

—আয় রে!—বলিয়া জজ সাহেব রাত্রিবসনের উপর কিমনোটি জড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন।

ধীরমন্থরপদবিক্ষেপে ছায়া ঘরে ঢুকিল। তাহার বেশ-ভূষা দেখিয়া পিতামাতার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মিলের লাল পাড় একখানি শাড়ী, পায়ে জুতা নাই, তার বদলে পুরু করিয়া আল্‌তা পরা, কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটি আধলা টিপ, বামহস্তের মণিবন্ধে সোণাবাঁধা লোহা গাছি ছাড়া দেহে স্বর্ণের চিহ্নটুকুও নাই।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে মিষ্টার ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যোগিনী বেশ কেন ছায়া? প্রণয় মামার থিয়েটারে পার্ট নিইছিস্ নাকি রে? স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, বেশ দেখাচ্ছে ছায়াকে না?

মিসেস ঘোষ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কন্যাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন, হোয়াট ইজ দিস নুইসেন্স ছায়া? (এ সব নোংরামী কি?)

ছায়া নতমুখে, নম্রকণ্ঠে বাঙ্গালায় কহিল, মা, আজ সুপ্রভাতে আমি তোমাদের প্রণাম করতে এসেছি।

—ডোণ্ট বি সিলি (বাজে ব'ক না)। হোয়াট ডু ইউ মিন? (তুমি কি বলতে চাও?)

—মা, তোমাদের প্রণাম করে আমি এখান থেকে চলে যাব।

পিতা লাফাইয়া উঠিলেন, চলে যাবি? কোথায় রে?

ছায়া কহিল, আমার শ্বশুরবাড়ীতে, বাবা।

মিসেস ঘোষ তিক্ত কটু কণ্ঠে কহিলেন, শ্বশুরবাড়ী! তোমার শ্বশুরবাড়ী? কোথায় তোমার শ্বশুরবাড়ী?

ছায়া মুখ তুলিল না, নতাননে কহিল, রামনগর।

—না, না, না। সেখানে তোমার কেউ নেই। সে বিয়েকে আমি বিয়ে বলেই মনে করি নে।

পিতা ডাকিলেন, এখানে আয় ছায়া, বস।

ছায়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে, পিতা সস্নেহে বহিলেন, বস ছায়া।

ছায়া বসিল না। পিতা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, আর অনুরোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্নেহসিক্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু ছায়া সে যে ভারী পাড়াগাঁ, খালি ম্যালেরিয়া, আর কেই বা আছে সেখানে, সেই বনের মধ্যে? সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি কেন?

ছায়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, পারব বাবা।

মা পুরুষকণ্ঠে কহিলেন, পারলেই বা কে তোমায় থাকতে দিচ্ছে!

ছায়া নীরব।

—ডুটো ড্যাম ওল্ড স্যাভেজ ফুলস্ (অসভ্য বর্ব্বর বোকা) সেবার কম অপমানটা আমাদের করেছে, আমরা তাদের ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছি, আমরা ডাইনী! বুনো উইজার্ড উইচ কোথাকার! সেইখানে গিয়ে থাকবে আমার মেয়ে!

ছায়া নীরবে দুটি চক্ষু তুলিয়া পিতার পানে চাহিল। দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে—পদ্মের পাপড়িগুলির মধ্যে বারি সঞ্চিত হইয়াছে। তারপর আস্তে আস্তে নত হইয়া, মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া চরণ স্পর্শ করিল।

পিতা বলিলেন, তুই কি এখনই যাবি না কি ছায়া?

—হ্যাঁ বাবা।—বলিয়া সে মাকেও প্রণাম করিল, পাদ-স্পর্শ করিয়া আবার নতমুখে জোড় হাতে দাঁড়াইল।

মা রোষভরে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া, শান্তস্বরে কহিলেন, রাগারাগির কথা নয়, শোন্ ছায়া। তুই যে যাবি সেখানে, তাঁদের কোন খবর দিয়েছিস?

—না।

—তবে? তাঁরা যদি—তোর শ্বশুরশাশুড়ী পাড়াগেঁয়ে লোক, আমরা বিলেতফেরত ব্রাহ্ম বলে যদি তোকে তাদের বাড়ীতে না ঢুকতে দেন? তার চেয়ে আমি বলি, তুমি যেতে ইচ্ছে করেছ—যাও, আমি মানা করব না, কিন্তু একটি চিঠি লিখে তাঁদের মত নিয়ে যাওয়াই কি উচিত নয়?

ছায়া নীরবে দাঁড়াইয়া কহিল।

মিসেস ঘোষ বলিলেন, কি তুমি পাগলের মত যা-তা বক্‌ছ? আমার মেয়ে যাবে সেই গো-ভাগাড় দেশে? সেই ছোটলোকদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আমাদের? সেই ছোট লোক, যারা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না, যারা মানীর মান রাখতে শেখে নি, তাদের বাড়ীতে যাবে আমার মেয়ে? তুমি কি পাগল হয়েছ? না, তোমার ভীমরতি হয়েছে?

ছায়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, আমি যাই বাবা!—বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পিতামাতা সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গাড়ী-বারান্দায় ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, ট্যাক্সির পার্শ্বে বিমল দণ্ডায়মান।

তাহাকে দেখিয়াই মিসেস ঘোষের দুই চক্ষুতে আগুন ধরিয়া গেল। ভদ্র নারীর খোলসটা যেন এক মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়িল; রুক্ষ পরুষকণ্ঠে কহিলেন—তুমিই কি পরামর্শদাতা?

ছায়া বলিল, উনি শুধু পৌছে দিয়েই ফিরে আসবেন। পরামর্শ ওঁর নয়, আমিই ওঁকে নিয়ে যচ্ছি। আসি বাবা! দুই হাত তুলিয়া দুইবার কপালে ঠেকাইয়া দুইজনকে নমস্কার করিয়া ছায়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। পাছে চোখের জল ধরা পড়ে, উঠিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া বসিল। বিমল ট্যাক্সির দ্বার বন্ধ করিয়া চালকের পার্শ্বে বসিতে যাইতেছে, অনুমানে তাহা বুঝিয়া ছায়া বলিল, না দাদা, আপনি এই-খানেই বসবেন আসুন।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল, প্রথমে বাগানের হাতা ঘুরিয়া, ফটক অতিক্রম করিল; আবার তখনি পিছু হঠিয়া সেই গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল। ছায়ার পিতামাতা সেই-খানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ছায়া বলিল, বাবা আমার গয়নাগাটি যা ছিল, সব আপনার দেওয়া—আপনি আমাকে দিয়েছেন, সেগুলো বেচে আমি তাঁকে বিলেতে টাকা পাঠিয়েছি, দেশে ফেরবার জন্যে। এলে তিনি তাঁর দেশেই থাকবেন। আর আমার কাপড়-চোপড় সবই রইল, আমি শুধু বিয়ের দিনের লজ্জাবস্ত্রটি পরে আপনার বাড়ী থেকে একবস্ত্রে গেলাম।—বলিয়াই সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাথার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া বিমলকে বলিল, চলুন দাদা, জোরে চালাতে বলুন।

মেয়ে-বিদায়ের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের মায়ের হৃদয়ের কি করুণ যোগাযোগ! কোথায় রহিল আধুনিকতা, কোথায় রহিল ইঙ্গবঙ্গভাব, আর কোথায়ই বা রহিল সভ্য সমাজ—মার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। পিতা কিমনোয় চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া পত্নীর বাহু ধরিয়া কহিলেন, চল, ঘরে যাই। [ক্রমশঃ

পথে-পথে

—শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশ

জীবনের কলসুর শুব্ধ হ'ল সব,
পৃথিবীর পথে শুনি শুষ্ক কলরব,
পশুত্বের কোলাহল। কামনার ধূলি
ওড়ে কালবৈশাখীর ক্ষ্যাপা ঝড় তুলি'
দিক্ হ'তে দিগন্তরে—বিষাক্ত বাতাসে,
প্রকৃতির সুস্থশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে।

দেখি আজ হেয়তম প্রকাণ্ড নগ্নতা
বর্ব্বর যুগের পঙ্কে আকণ্ঠ-মগ্নতা,—
প্রতিভার পরিচয়! নিত্য অভিনয়
স্তূপাকার হীন স্তুতি প্রেম-অনুনয়;
মোহার্ত্ত মর্ত্তের নর দেহের উৎসবে
আত্মার আহুতি দেয়। ম'রে গেল কবে

শিবত্ব-সৌন্দর্য্য-বোধ? এখানেতে আজ
দগ্ধপ্রায় মীনকেতু যেন মহারাজ!

আলোচনা

আনন্দবাজার ও বঙ্গশ্রী

[দৈনিক বসুমতী (১৪ই আশ্বিন) হইতে উদ্ধৃত]

গত ৯ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার "আনন্দবাজার পত্রিকা"র "পূজার সং"শীর্ষক বঙ্গশ্রীর যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্রখানি আনন্দবাজারে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রকাশ না করায় আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিলাম।

শ্রীযুক্ত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার ৯ই আশ্বিন তারিখের কাগজে দেখিলাম, আপনারা আমাকে "পূজার সং" সাজাইয়াছেন।

আপনারা আমাদের "গণপতি"। আপনারা যে নাটকের যে অংশ অভিনয় করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন, তাহা আমায় মাথায় করিয়া লইতেই হইবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই। পরন্তু আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। প্রচ্ছন্ন নামে আজ দশ মাস ধরিয়া কত কথা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা দয়া করিয়া এতদিন তাহা কেহ পড়িলেন না এবং শুনিলেন না। এতদিন পরে তবু কয়েকটা কথা আপনাদের কাণে প্রবেশ করিয়াছে এবং যাহা হউক একটা সজ্জা আমাকে দিয়াছেন। কাজেই ধন্যবাদ না দিয়া পারি কি?

কিন্তু এখনও আপনাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকিবে। এই দশ মাস ধরিয়া আমি বঙ্গশ্রীতে যে সমস্ত "রাবিশ" লিখিয়াছি, তাহার কিছুই আপনারা মনোযোগ দিয়া পড়েন নাই। যদি পড়িতেন, তাহা হইলে আমি যে বাস্তবিকই সং-এর অভিনয় করিবার উপযোগী এবং তাহার উপকরণ যে আমার লেখায় আছে, তাহা উহা হইতে জনসাধরণকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। আপনারা সংবাদপত্রের মালিক। আপনাদের উপদেশে আমাদের জনসমাজের উঠিবার বসিবার কথা। আর আপনারা ঐ জনসমাজের একজন "রাবিশ"-লেখকের সম্বন্ধে এতগুলি মন্তব্য পাশ করিলেন, অথচ সেই রাবিশগুলি পড়িলেন না এবং মন্তব্যগুলি একটিও যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না! যুক্তি না দেখাইয়া কাহারও সম্বন্ধে মন্তব্য পাশ করা কি কোন কাগজের দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদনের রীতিসম্মত? জনসমাজ যে "রাবিশ"ই লিখিয়া থাকে—ইহা চিরন্তন সত্য। যাঁহারা তাহাদের চালক, তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে মন্তব্য পাশ করিতে হইলে, তাঁহারা এই রাবিশ পড়িতে এবং কোথায় কে "সং"-এর মত ব্যবহার করিতেছে এবং কেন তাহাকে "সং" বলা যাইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহেন কি? আমার কি বুঝিতে হইবে যে, ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যের ফলে সবই উল্টাইয়া গিয়াছে?

আমার বিরুদ্ধে আপনাদের যে কয়টি মন্তব্য পাশ হইয়াছে আমার বিবেচনা অনুসারে তাহার একটিও যথাযথ হয় নাই। আমি আমার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছি। বিচারের ভার থাকিবে আপনাদের উপর।

আপনাদের প্রথম কথা যে আমি 'সব ঝুট হ্যায়' 'সব ঝুট হ্যায়' বলিতেছি। 'সব গোলমালমে গির গিয়া' যখন দেখা যাইতেছে, তখন 'সব ঝুট হ্যায়' বলা কি অসঙ্গত? সোনার ভারতে চাষারা সব চাষ ছাড়িয়া দিয়া কলের চাকুরী চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, চাঁদপানা ছেলেগুলি গাদায় গাদায় পাশ করিতেছে আর প্রতি বছর বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—এইরূপ ভাবে যদি আর কিছুদিন চলিতে থাকে, তাহা হইলে কি আশঙ্কা করা যায় না যে, অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষে মানুষের বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর হইবে? ইহার পর যদি কেহ মনের বেদনায় বলে যে, "বিদ্যাকা নাম মে যো চলতা হয় উসমে সব ঝুট হ্যায়, পণ্ডিতকা নামমে যো সব

আদমী হামলোক্‌সে সেলাম মাঙতা হ্যায় ও লোককা ভিতর বি বহুত গরবর হ্যায়' তাহা হইলে কি বড় ভুল করা হয়? যে বিদ্যায় এবং পাণ্ডিত্যে অন্নসংস্থান হয় না—মানুষের পক্ষে সে বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের সার্থকতা কোথায়? আপনারা দয়া করিয়া ভাদ্র মাসে প্রকাশিত "স্যার জন এণ্ডারসন ও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা"শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন কি?

আমি বর্ত্তমান 'বিজ্ঞান'কে 'কুজ্ঞান' বলিয়াছি, তাহা সত্য, কিন্তু কেন বলিয়াছি তাহার যুক্তি ভাদ্র মাসে প্রকাশিত "বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক"শীর্ষক প্রবন্ধে এবং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আপনারা তাহা পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন কি?

আমি বর্ত্তমান সাহিত্যকে 'বিকৃত সাহিত্য' বলিয়াছি তাহাও সত্য, কিন্তু কেন বলিয়াছি তাহার কারণ দেখাইয়াছি শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে।

যে ভাষায় ভারতীয় ঋষির বেদ ও দর্শনাদি লেখা তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা অন্ততঃ পক্ষে ছয় হাজার বৎসর হইতে মানুষ ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখন আর কোন মানুষ এই সংস্কৃত ভাষা জানেন না এবং এখন বেদ ও দর্শন যে অর্থে চলিতেছে সেই অর্থ আমাদের ঋষিগণের ভাষাসম্মত নহে—এই জাতীয় কথাও আমি বলিয়া আসিতেছি তাহাও সত্য। কেন এই কথাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় তাহা প্রধানতঃ দেখান হইয়াছে—শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে। আংশিক ভাবে ঐ কথা "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে প্রত্যেক সংখ্যায় বলা হইয়াছে।

আপনারা আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, আমি কোথায় ভুল করিয়াছি এবং কেন তাহাকে ভুল বলা যায়? "পণ্ডিতেরা" সংস্কৃত জানেন না বলায় আপনারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং বেদনা পাইয়াছেন। আপনারা খুব সম্ভব জানেন না যে, আমি যাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছি, তাঁহাদের শুক্রে আমার জীবন এবং আমার শিরায় শিরায় ঐ রক্ত এখনও প্রবাহিত হইতেছে। "কালাপাহাড়" এবং "পাগল" না হইলে আমি পণ্ডিতগণকে "অজ্ঞ" বলিতে পারিতাম না তাহা সত্য, কিন্তু কত বেদনার সহিত কেন এই কথা আমায় বলিতে হইতেছে, তাহা আপনারা আমার প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা কি করিয়া পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহার একটা ফর্দ্দ আমি আশ্বিন মাসের "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি তাহা সত্য।

কিন্তু আমার "স্থূল হস্তাবলেপে" সমস্ত ভুল অবলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে এই জাতীয় ভাবনাও আমার নাই। আপনারা আমার কোন্ লেখায় ঐ শ্রেণীর দম্ভের চিহ্ন দেখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন—তাহা হইলে কি আপনারা স্বীকার করিবেন না যে, কাগজের সম্পাদক হইলে সত্য বিকৃত করিয়াও মানুষকে গালাগালি করা যায়?

আপনাদের বড় অভিযোগ যে, আমি কোন প্রকৃষ্ট পণ্ডিতকে প্রতারক বলিয়াছি, ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্তকে অজ্ঞ ও মূর্খ বলিয়াছি এবং ডাঃ সুনীতি চাটুয্যেকে নিন্দা করিয়াছি।

আমার লেখা মনোযোগসহকারে পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলি নাই। পরন্তু অনেকেরই উপর আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা আছে।

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃত সংস্কৃত না জানিয়াও যে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া প্রচারিত হইবার চেষ্টা করেন, অথচ তাঁহারা যে প্রকৃত সংস্কৃত জানেন না, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের কাহারও নাম ধরিয়া সংস্কৃত শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আর তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতারক বলা কি একই কথা?

ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার যৌক্তিকতা কোথায় তাহা দেখান হইয়াছে—"ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা"শীর্ষক প্রবন্ধে। আমার কথা যদি অযৌক্তিকই হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডাঃ দাশগুপ্ত যুক্তি দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করেন না কেন? যদি অযৌক্তিক

না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা বিদেশে গিয়া না বুঝিয়া দেবোপম ভারতীয় ঋষিগণকে কাল্পনিক আখ্যা দিতে পারেন, তাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিন্দার্হ নহেন কি? আপনারা আমাদের গণপতি, অথচ আপনারা আমাদের ঋষিদিগের নিন্দাকারীর পোষকতা করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাই কি বর্ত্তমান জগতের দেশপ্রেমের পরিচয়?

ডাঃ সুনীতি চাটুয্যে সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছি—"জাতীয় গৌরবও থাকিবে অথচ নিজস্ব ভাষাও বিসর্জ্জন করা চলিবে—এমন সুন্দর সোনার পাথরের বাটী দেখিবার জিনিষ বটে। কাহারও যদি পয়সা থাকে, তাহা হইলে ডাঃ চাটুয্যের মাথাটি কিনিয়া রাখিবেন, সময়ে জমির সারের কার্য্য চলিবে।"

ডাঃ চাটুয্যে যে আমাদের বাঙ্গালা অক্ষরের লিখন-প্রণালী পর্য্যন্ত পরের নিকট ধার করিতে চান, ইহা কি দেশ-প্রেমিকতার লক্ষণ? আপনারা কি ইহার পোষকতা করিতে চাহেন? ইহার বিরুদ্ধে কথা কওয়া কি প্রাণের দৈন্য জানান নহে? তাহাতে কি দাম্ভিকতার পরিচয় দেওয়া হয়?

তাহার পর যদি আপনারা খুঁজিয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, জগতে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন পালি, হিব্রু এবং আরবী ভাষাও অনেক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু সংস্কৃতের মত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নহে। সংস্কৃত ভাষার সন্তান যে কয়টি ভাষা আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক না হইলেও, আধুনিক অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক পরিমাণে উৎকর্ষসম্পন্ন। ইংরাজী ভাষা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। ভাষা জানার প্রধান উদ্দেশ্য, পরের মনের ভাব নিখুঁত ও নিশ্চিত-ভাবে বুঝিতে পারা। ইংরাজী ভাষায় তাহা পারা যায় কি? যদি পারা যাইত, তাহা হইলে একই অর্থে লিখিত আইনের ধারাগুলির বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব হইত কি? এতাদৃশ ইংরাজী অক্ষরের লিখন, প্রণালীর জন্য নিজেদের স্বকীয় লিখন-প্রণালী বিলাইয়া দিলে কি cultural conquest-এর সহায়তা করা হয় না? তাহার নিন্দা করা কি বড়ই গর্হিত?

আমি হয়ত আমার স্বীয় অনুপযুক্ততার জন্য বাঙ্গালীর আদরের বঙ্গলক্ষ্মী নষ্ট করিয়া ফেলিব, এই আশঙ্কা আপনারা জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। আমি বঙ্গলক্ষ্মীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নহি, অবশ্য আমি যে কার্য্যতঃ ইহার প্রধান কর্ম্মচারী তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। এতাবৎ বঙ্গলক্ষ্মীর কোন অনিষ্ট আমার দ্বারা হয় নাই এবং বঙ্গলক্ষ্মীর অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা তাহার Balance Sheet দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

দেশের যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে অদূরভবিষ্যতে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেক ব্যবসার বিশেষ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে—ইহা আমার অভিমত। অথচ জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া এখনও চেষ্টা করিলে, আমরা প্রত্যেকে ঐ বিপদের হাত হইতে সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও বহু পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারি। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা জনসাধারণকে জানাইবার জন্য আমি আমার বক্তব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রধান সংবাদপত্রের পরিচালক—আপনাদের মনোবৃত্তি দেখিয়া আমার অনেক বিষয় আবার নূতন করিয়া ভাবিতে হইতেছে।

দেশ যে দিকে চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে দেশের প্রত্যেক ব্যবসা বিপন্ন হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা, ইহা আমি আগেই বলিয়াছি। তদনুসারে বঙ্গ-লক্ষ্মীরও বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে এবং দেশের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে আমি যে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইব, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আপনারা চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর মনোরম গদীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি? আমি ও আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র ন্যায্য মূল্য পাইলেই গদী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

আপনারা আমাকে যত পারেন গালাগালি করুন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। মাথায় গোলমাল না হইলে কি কখনও কেহ এবংবিধ অবস্থায় দেশের কথা ভাবিতে ও কহিতে আরম্ভ করে? তাই একটু ভাবিয়া দেখুন, আমার মাথায় এই গোলমাল হইল কেন? নেতাগিরির জন্য গোলমাল আসিলে প্রচ্ছন্ন নামের ব্যবহার ও সভাসমিতিতে না যাওয়া থাকিত কি?

আমার অনুরোধ, নিরপরাধ ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরকে ইহার মধ্যে জড়াইবেন না। তিনি বহু কথায় আমার সহ সর্ব্বতোভাবে একমতাবলম্বী পর্য্যন্ত নহেন। তাঁহার অনিষ্ট করিয়া আপনাদের কি লাভ হইবে?

বঙ্গশ্রীকে জনসাধারণের অপ্রিয় করিবার জন্য তাঁহার ঘাড়ে কোন অমূলক অপবাদ অযথা চাপাইলেই বা কি ফলোদয় হইবে? ইতি—

বিনীত—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য,
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অফিস
কলিকাতা, ২৭।৯।৩৫।

বাঙ্গালার দুর্গোৎসব ও বাঙ্গালীর মেয়ে

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব শারদোৎসব হইয়া গেল। শরতে অনুষ্ঠিত হয় তাই ইহার নাম, শারদোৎসব। নহিলে ইহা দুর্গোৎসব। ইহাকে দুর্গোৎসব বলিলেই ঠিক হইবে; কেন না, এই উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, দশভুজা দুর্গার পূজা। ইহাকে অকালবোধনও বলে। রাক্ষস-সমরে বিপর্য্যস্ত শ্রীরামচন্দ্র দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার পূজা অকালে করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম অকালবোধন।

দুর্গোৎসব কি কেবল হিন্দুরই উৎসব? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় এই উৎসবের কোন না কোন অংশে সকল ধর্ম্মের লোকই যোগদান করে। আজকাল মুসলমানরা হিন্দুর দুর্গোৎসবে যোগ বড় দেন না, কিন্তু পনের কুড়ি বৎসর আগে, আমি দেখিয়াছি, মুসলমান মেয়ে ও ছেলেরা আমাদেরই মত নূতন ও রঙীন জামা ও কাপড় পড়িয়া হিন্দুর ঠাকুর-দালানের সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া হিন্দু মেয়ে ও ছেলের মতই তন্ময় হইয়া প্রতিমা দেখিত; পূজান্তে বা আরতিশেষে হিন্দুরা যেমন গড় হইত, তাহারাও তেমনই গড় হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিত; আবার পুরুত মহাশয় যখন মস্ত বড় বারকোষ বা পিতলের থালা হাতে প্রসাদ বিতরণ করিতেন, হিন্দু ছেলে মেয়েদের মত মুসলমান ছেলে মেয়েও যোড়করে ভক্তিভরে প্রসাদ লইত। আখ, কলা, ছোলা, মুগভেজা, শাঁকআলু, কেশুর, বাতাসা, মোণ্ডা প্রভৃতি পাইয়া তাহারাও মা-দুর্গার প্রসাদ খাইয়াছে, আর অসুখ বিসুখ হইবে না ভাবিয়া আনন্দে আটখানা হইত। আমাদের যে গ্রামে বাড়ী ছিল, সে গ্রামে অনেক মুসলমানের বাস ছিল, আমি দেখিয়াছি পূজাবাড়ীতে পাত পাতিয়া মুসলমান বয়োবৃদ্ধদের লুচি মোণ্ডা সন্দেশ খাইতে কোনদিনই অনিচ্ছা, অরুচি বা অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। সেই গ্রামে একঘর দেশীয় খৃশ্চান বাস করিতেন, তাঁহারাও দুর্গাপূজার সময় পূজাবাড়ীতে প্রায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন, আমোদে যোগ দিতেন, আহার করিতেন। আজকাল মুসলমানেরা হিন্দুদের কোন পূজাপার্ব্বণ বা উৎসবে যোগ দেন বলিয়া শুনি না। দেশীয় খৃশ্চানগণ কি করে‍ন সে সংবাদও আমি বলিতে পারি না। সহরে সাহেবেরা দুর্গা-পূজার ছুটির কয়টি দিন খুব আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়ান ইহা দেখিতে পাই। মুসলমান বা খৃশ্চানেরাও তাহা করেন। কাজেই তাঁহারাও যে এক রকম পূজার আনন্দোৎসবে যোগ দিতেছেন, ইহা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে কি?

আরও কথা আছে। সাহেবেরা যে এই পূজোৎসব মানেন তাহার অন্য প্রমাণও আছে। আমি এই কলিকাতা সহরের দৃষ্টান্ত দেখাইব। কলিকাতা এক কালে ভারত রাজ্যের রাজধানী ছিল, এখন আর নাই এবং রাজধানীটির নাকে দড়ি দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে টানিয়া লওয়া হইলেও কলিকাতার প্রাধান্য একটুও কমিয়াছে কি? আজও কলিকাতাতেই সাহেবদের যত বড় বড় আফিস, দোকান, আদালত ইত্যাদি আছে। বড়লাট সাহেব মরশুমের সময় কলিকাতাতে আসিয়া থাকেন। দেখাদেখি যত বড় সাহেব-মেম আর যত রাজ্যের রাজা-রাণী, মহারাজা-মহারাণী হইতে ঘুঁটেকুড়ানী সকলেই শীতকালের বড়দিনের বড় উৎসব যাপন করিতে ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কলিকাতায় সাহেবদের খুব প্রাধান্য ও প্রতাপ। এই কলিকাতায় সাহেবদের বড় বড় দোকানগুলিকে দুর্গাপূজার সময় নানা সাজসজ্জা দিয়া সাজাইয়া থাকেন এবং বিজ্ঞাপনে 'পূজার আয়োজন', 'পূজার সেল্', 'পূজার কনসেসন' এই সকল কথাও লিখিতে লজ্জা করেন না। মুসলমানদের সম্বন্ধেও আমার এই কথা খাটে কি না মুসলমানগণই তাহা বলিবেন।

এত কথার পর যদি দুর্গোৎসবকে বাঙ্গালাদেশের সার্ব্বজনীন উৎসব বলি, কেহ তাহাতে সঙ্গত আপত্তি করিবেন কি?

পনের কুড়ি বৎসরে কত পরিবর্ত্তন না দেখিতে পাইলাম। আমি পল্লীগ্রামের মেয়ে, পল্লীগ্রামে জন্ম, চৌদ্দ বৎসর সময় পল্লীগ্রামেই কাটাইয়াছি। পল্লীগ্রামে আমার ছেলে বয়সে যেরূপ উৎসব দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে সহরের উৎসবের একটুও মিল নাই, পল্লীগ্রামে এখন যে উৎসব হয় তাহার সহিতও কোনরূপ সামঞ্জস্য দেখি না। আমরা সেই সময়ে কি দেখিয়াছি তাহা বলিব।

আমাদের গ্রামে একখানি মাত্র পূজা, দশ ক্রোশের মধ্যে আর ছিল না। এই দশ ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম আছে সমস্ত গ্রামের লোক শতকে শতকে কাতারে কাতারে এই পূজাখানি দেখিতে আসিত। মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিত, পুরুষদের আলাদা আলাদা দলে আসিতে দেখিতাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পুরুষদের দলেও থাকিত, মেয়েদের সঙ্গেও থাকিত। পুরুষরা কোরা কাপড় (সাধারণতঃ) পরিত, ধোয়া চাদর চুণোট-করা ও পাকান গলায় ঝুলিত। সেই সময়ে জুতার চলন বড় ছিল না। কচিৎ কাহারও পায়ে খুব মোটা চটি বা স্প্রীং-আঁটা ক্যাম্বিসের শু দেখা যাইত। পূজাবাড়ীতে প্রবেশ করিবার আগে তাঁহারা বাড়ীর বাহিরে কোথাও জুতা খুলিয়া, নিকটবর্ত্তী পুকুরে পা ধুইয়া আসিতেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অ-ধোয়া ডুরে ও বিলাতী বা মিলের লালপাড় শাড়ীর খুব চলন তখনকার দিনে ছিল। ছোট মেয়েরা, যাহাদের বিয়ে হয় নাই, তাহারা নীলাম্বরী বা ডুরে পরিয়া আসিত, রঙীন শাটীনের জামা (জ্যাকেট্‌?) দুই দশটা দেখিতাম। ছোট ছেলেরা নীল ঢালা (অ-ধোয়া) দিশী কাপড়, তার উপরে শাটীন বা পাৎলা রেশমের জামা পরিত, তার উপর চুণোট-করা পাকান চাদর। যে বাড়ীতে পূজা হইত, তাঁহাদের অবস্থা ভাল। তাঁহারা সকলকে পাতা পাতাইয়া খাইতে দিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু নারিকেলের নাড়ু, চিঁড়া, মুড়ী, মুড়কী সকলকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেন —হিন্দু মুসলমান খৃশ্চান ভেদ ছিল না। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর ঠাকুর-দালানের নীচে বিস্তৃত অঙ্গনে যখন ঢাকের সঙ্গে পাড়ার লোকের নৃত্য হইত, তখন বাজনার তালে তালে ছেলে বুড়ো, হিন্দু মুসলমান গরীব বড়লোক সবাই নাচিত। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া লোকে যেন পাগল হইয়া উঠিত; সে দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইতে পারি এমন কি সাধ্য আমার? ঢাকী নাচিতেছে, ঢুলী নাচিতেছে, সানাইয়া নাচিতেছে, কাঁসিওলা নাচিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বুড়ো সবাই নাচিতেছে। মা চলিয়া গিয়াছেন, কৈলাস হইতে আসিয়াছিলেন, পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গিয়াছেন, আবার সেখানে সেই ভূত-প্রেতের সংসার করিবেন, ভাঙ ঘুটিবেন, ভোলার সঙ্গে শ্মশানে-মশানে ঘুরিবেন, ইহা ত গৌরীর বাপের বাড়ীর ও বাপের বাড়ীর দেশের লোকের পক্ষে দুঃখেরই কথা, তবুও লোকে নাচে কেন? শুনি, যাইবার সময় গৌরীর কাণে কাণে সেই যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার আসিও, সেই পুনরাগমনের কল্পনা করিয়া লোকে আনন্দে নৃত্য করে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন ব্যাখ্যা আছে কি না তাহা আমি জানি না। আমরা ঠাকুর মা, পিসিমা, মাসীমা, দিদিমার কাছে যাহা শুনিয়াছি, শুধু তাহাই জানি।

ইহার পরে লাল কালীর দোয়াত আসিত, শরের কলম ও তালপত্র আনা হইত। প্রত্যেকে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া মাথায় ঠেকাইতেন, তারপর ভাঙ খাওয়া হইত।

পুরোহিত মহাশয় শান্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শান্তিজল ছিটাইয়া দিতেন, লোকে পা ঢাকা দিয়া বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে শান্তিজল লইত আর ভাবিত, সকল অশান্তি দূর হইয়া গেল। আমি দেখিয়াছি, চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে কেহ কেহ রুগ্ন ছেলেমেয়েকে কোলে করিয়া বিজয়ার দিন বিকাল হইতে পূজাবাড়ীর আঙ্গিনায় বসিয়া থাকিত, শান্তি-জলটুকুর আশায়। শান্তিজল স্পর্শে কোন রোগী শিশুর অসুখ সারিয়াছে অথবা সারে তাহা আমি বলিতে পারিব না, তবে বছরের পর বছর, প্রতি বছর নূতন নূতন রোগীকে দেখিতাম, সেই জন্য মনে হইত, হয়ত বা রোগ সারিত। আজকাল সহরের আত্মীয়দের কাছে যখন এই গল্প করি, সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। আমার এক 'মাষ্টার অফ সায়েন্স' দেবর আছেন তিনি রঙ্গ করিয়া শান্তিজল পেটেণ্ট করিয়া বেচিয়া লক্ষপতি হইবেন এবং আমাকে 'রয়েল্‌টি' দিবেন বলেন।

রঙ্গ সবাই করিতে পারে, সব ব্যাপারেই রঙ্গ করা যায়; কিন্তু সত্যই কি কিছু ছিল না? কিছুই যদি না থাকিবে তবে লোক এমন করিয়া আসিত কেন? এই সকল গুরুতর কথার অর্থ ও রহস্য ভেদ করা আমার কর্ম্ম নয়, তাহা আমি

মানিতেছি। সেই সাথে ইহাও মানিতেছি, এতকাল পরে আজও আমার মনে সেই সময়কার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর'। তবে আমরা একালে জন্মাইলেও, আমাদের মন হয়ত সেকালের, সেই ধাঁ। তা কি করিব!

কলিকাতায় এখন দেখি, বার-ইয়ারী পূজার বড় ধুম। এখানে বারোয়ারী পূজা বলে না; বলে, সর্ব্বজনীন দুর্গা পূজা। খবরের কাগজে পড়ি কলিকাতার প্রত্যেক পাড়ায় সর্ব্বজনীন পূজা হয়। কোন কোন পাড়ায় দলাদলির ফলে দুইটি, তিনটি সর্ব্বজনীন পূজাও হয়। পাড়ার ছেলেরাই উদ্যোগ আয়োজন করিয়া চাঁদা তুলিয়া, আটচালা বাঁধিয়া, ঢাক-ঢোল সানাই বাজাইয়া, বিদ্যুৎ আলোকে মণ্ডপ সাজাইয়া পূজা করে। দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে; আবার থিয়েটার করে, বায়োস্কোপও দেখায়। পাড়ায় পূজার কয়দিন সত্য সত্য দুর্গোৎসব লাগিয়া থাকে।

আমি জানি না সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা যাহারা করে, তাহারা 'সর্ব্বার্থসাধিকা'র প্রতি ভক্তিতেই তাহা করে, অথবা হুজুগে মাতিয়া করে, এত লোক ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ে যদি মা বলিয়া ডাকিত, শক্তিময়ীর আরাধনা করিত, তাহা হইলে মা-দুর্গে দুর্গতিনাশিনী বিপদভয়বারিণী মহিষমর্দ্দিনী অসুর-বিনাশিনী রিপুদলবারিণী দুর্গা কি সন্তানের দুর্গতি দূর না করিয়া থাকিতে পারিতেন? কিন্তু আমাদের দুর্গতি দূর হওয়া দূরের কথা, দুর্গতি বৃদ্ধিই পাইতেছে না কি?

বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান উৎসব—দুর্গোৎসব। দুর্গাকে কবি আনন্দময়ী আখ্যা দিয়াছেন, "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে" কবিচক্ষুতে কবি তাহাও দেখিয়াছেন। কবিরা যাহা দেখিতে পান, সাধারণ লোকে সব সময়ে তাহা দেখিতে পায় না; অথচ কবির দৃষ্টি ভুলও দেখে না। তাই কবির মত সাধারণ লোকে আনন্দের সন্ধান পাইলেও, আনন্দে দেশ ছাইয়া যাইতে দেখিতে পায় না। যদি সত্য কথা বলিবার সাহস হয়, তাহা হইলে এমন কথাও বলা যায় যে, দেশ হইতে আনন্দ অবলুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে সর্ব্বজনীন পূজাও দেখিলাম, সহস্র সহস্র নরনারী বালকবালিকাকে উৎসব-স্থলে উপস্থিত থাকিতেও দেখা গেল, তন্মধ্যে একশত বালক-বালিকাকেও নববস্ত্রে ভূষিত দেখিতে পাওয়া গেল কি না সন্দেহ। পূজার আনন্দের সঙ্গে নূতন কাপড়-জামার এমন একটা সম্পর্ক আছে যে, নূতন জামা-কাপড় না পরিলে যেন আনন্দ আসিতেই পারে না। পূজা সর্ব্বজনীন হইলেও, সর্ব্বজনীন আনন্দ উৎসব কেমন করিয়া বলিব?

একটা কথা অত্যন্ত লজ্জার হইলেও বলিতে হইতেছে। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বাঙ্গালী মেয়েদের বসন-ভূষণের আড়ম্বর শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পল্লীগ্রামের কথা আমি (আজকালকার) জানি না, আমি কলিকাতার কথা বলিতেছি। কলিকাতার মেয়েদের কাপড়-জামার এত বৈচিত্র্য দশ বৎসর আগেও ছিল না। হঠাৎ এই জাঁকজমক বৃদ্ধি পাইল কেন, তাহা আমি জানি না। তবে এই জাঁক-জমক যে অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থকে বিপদাপন্ন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি; সে খবরও পাই। শাস্ত্রে (শুনিয়াছি) কর্জ্জ করিয়া ঘি খাওয়ার বিধি আছে, এখন কর্জ্জ করিয়া কাপড় ক্রয় করিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। সহরের কাপড়ের দোকানগুলির সামনে দিয়া চলিলেই ইহা বুঝা যায়। যে-জিনিষের খরিদ্দার নাই সে জিনিষ দোকানদারেরা কখনও সাজাইয়া রাখে না। যে জিনিষের খরিদ্দার যত বেশী, দোকানদার সেই জিনিষ ভাল করিয়া সাজাইয়া তাহার বাহার দেখাইয়া দোকানে ঝুলাইয়া রাখে। যে কোন কাপড়ের দোকানের সামনে গেলেই দেখা যাইবে যে, যত রকমের রঙীন, সৌখীন ও দামী শাড়ীর বাহার!

আমাদের পিতামহদের সময়েও পুরুষদের কাপড়-জামায় কিছু কিছু সৌখীনত্ব ছিল, এখনকার পুরুষদের পোষাকে তাহা একটুও নাই। একশ'র মধ্যে নিরানব্বই জন পুরুষ মিলের ধুতিতেই সন্তুষ্ট, একজন ফরাসডাঙ্গা বা শান্তিপুরী কাপড় পরেন। তাঁহাদের জামা অধিকাংশেরই সাদা, রঙীন জামা কদাচিৎ কোন ভদ্রলোকের অঙ্গে উঠে। বাহুল্যবোধে তাঁহারা উত্তরীয় বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—ইহা ভাল হইয়াছে অথবা মন্দ হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সাজে না। গান্ধী-আন্দোলনের পর হইতে, পুরুষদের পোষাকের বৈচিত্র্য বা বাহুল্য একেবারেই ত্যক্ত হইয়াছে, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত খদ্দর-অভ্যাস সকলেই (তাই বা কেন, অনেকেই) রাখেন নাই সত্য; কিন্তু বেশভূষায় বাহুল্যও কেহ করেন না। বাঙ্গালার মত গরীব

দেশ ও বাঙ্গালীর মত গরীব জাতির পক্ষে জীবনযাত্রার কোন অংশেই বাহুল্য করা চলে না। পুরুষরা তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু আমরা? মিলের কাপড়ের কথা যাউক, আমাদের কয়জনের শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার কাপড়ে মন উঠে? আমার এই কথাগুলা খুব কঠোর তাহা জানি; কিন্তু সত্য কথা নয় কি? আমি একটি খুব গরীব পরিবারের কথা জানি। তাঁহাদের বাড়ীর বধূটি মহীশূর জর্জ্জেটের কাপড়ের বায়না ধরিয়া না পাইয়া শ্বশুরবাড়ীর চৌকাঠে লাথি মারিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। বধূর স্বামী নবমীর দিন ধার-ধোর করিয়া ৩২৲ টাকা দিয়া একখানি জর্জ্জেট কিনিয়া স্ত্রীর পিত্রালয়ে পাঠাইতে সে যাত্রায় অব্যাহতি পাইলেন। কোথায় ধার করিয়াছেন, কে তাঁহাকে ধার দিল, এই সকল সংবাদ কাহারও রাখিবার কথা নয়; কেহই রাখিত না। কিন্তু কিছুদিন হইতে ভোর হইতে-না-হইতে ইঙ্গিল-মিঙ্গিল-ভাষা, বড় পাগড়ী ও লম্বা লাঠি দেখিয়া সবই বুঝা যাইতেছে। এই ভদ্রলোকটি নিজের ছেলেমেয়েকে এমন সত্যবাদী তৈরী করিতেছেন, তিনি বাড়ী থাকিলেও ছেলেমেয়েরা বাড়ীর দরজায় লোক দেখিলেই বলে, 'বাবা ত বাড়ী নেই।' ভদ্রলোকের মহাজনের সংখ্যা করা দায়। পাড়ার লোকে বলে, তাঁহার লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীর কল্যাণেই সমস্ত।

বড়লোকেরা যাহা করেন, মধ্যবিত্তরা তাহার অনুসরণ করেন, মধ্যবিত্তদের দেখাদেখি গরীবরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করেন। ইহা সর্ব্বদেশে দেখা যায়। আমাদের দেশেও তাহাই দেখা যাইতেছে। বড় লোকদের দেখাদেখি. রঙের নেশা আমাদিগকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, খুব গরীব মেয়েরাও বোম্বাই মিলের রঙদার শাড়ী ছাড়া পরিতে চান না। বড়লোকদের যাহা সাজে, সাধারণ লোকদের তাহা সাজে না; তাঁহাদের যাহা শোভা পায়, আমাদের তাহা শোভা পায় না; তাঁহারা যাহা করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না, ইহা যে আমরা কেন বুঝি না, কে জানে! কাপড়ে রঙ যদি দেহের অথবা মনের রঙকে রঙাইয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে নিন্দার কিছু ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনা বাঙ্গালীর মেয়ের দেহের বর্ণ বিবর্ণ। দেহের বর্ণ বিবর্ণ হইলে মনের বর্ণ উজ্জ্বল থাকিতে পারে কি না তাহা বিজ্ঞজন ভাল জানেন।

আর একদিকে বাঙ্গালীর মেয়েদের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আগে বাঙ্গালীর মেয়ের আট দশ বছর বয়স হইলে পায়ে কখনও জুতা উঠিত না, এখন যত বয়স বাড়ে, জুতার বাহারও তত বাড়ে। একটি সময় ছিল, যখন রমণীর চরণ-সরোজের বর্ণনা করিতেও কবিদের লেখনীর আনন্দ ধরিত না। মনে হয়, সেই সময় কোন কবি লিখিয়াছিলেন, রমণীর অলক্তক-রঞ্জিত চরণের স্পর্শে অর্থাৎ ললনা-চরণাঘাত—না পাইলে অশোক ফুটিত না। তখনকার মেয়েরা যদি জুতা পরিতেন, তাহা হইলে কবির মনে এই কাব্যপুষ্প ফুটিত কি? জুতা-পরা দূষণীয় এমন একটি কথাও আমি বলিতেছি না—বলিবার মুখই বা কই? আমি বলিতেছি, জুতার জন্য একটি খরচ বাড়িয়াছে। যে সে জুতায় আবার অনেকের মন ওঠে না। মেমেদের মত উঁচাহিল জুতার চলন আজ-কাল খুব বাড়িয়াছে। এ বিষয়েও তাঁহাদের ব্যয়বাহুল্য পুরুষকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, স্কুল-কলেজে হইতে এই সমস্ত বাহুল্যের জন্ম! ধনীর মেয়েরা স্কুলে বা কলেজে নিতুই নব জামা-কাপড়, জুতা পরিয়া আসেন, তাঁহাদের সেই সকল চাকচিক্যময় বেশভূষা সহপাঠিনীদের দৃষ্টি ঝলসাইয়া দেয়; তাহাদেরও ঐরূপ পোষাক-আষাক না হইলে চলে না। তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আব্দার ধরিয়া বসে। পিতামাতা ভ্রাতা বা অভিভাবকেরা তাহাদিগকে বিমুখ করিতে প্রায় অধিকাংশ সময়ই পারেন না। ফ্যাসান এইরূপেই সংক্রামিত হইতে থাকে।

এত দুঃখের কথা, একটি সুখের কথাও আছে। গয়না-গাটীর জন্য বঙ্গরমণীদের আব্দার আগের চেয়ে কমিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। গয়না পরার রেওয়াজটাও যেন কমিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। সকল অঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া চলন্ত রেলগাড়ীর মত ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ করিয়া সাড়ম্বরে নিমন্ত্রণে যাইতে আজকালকার কোন মহিলা পছন্দ করেন বলিয়া শুনি নাই। এখন দুই চারিখানা সৌখীন গয়না হইলেই মেয়েরা সন্তুষ্ট। গয়নার চেয়ে এখন কাপড়-জামা-জুতায় মন অনেক অধিক পড়িয়াছে।

অনেকে মনে করেন, ইহা একটি দুর্লক্ষণ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন. গয়না গড়াইলে, ঘরে সোণাটা থাকিত,

দায়ে-অদায়ে সোণা বেচিয়া দাম পাওয়া যাইত, স্থাকড়ার বোঝা শুধুই বোঝা। একথা খুব ঠিক। আবার গয়না দিবার ক্ষমতা কয়জন পিতা বা কয়জন স্বামীর যে আছে তাহা বলা শক্ত। এ কথাও খুব ঠিক।

আমি যে কথাটা আমার ভগিনীদের বলিতে চেষ্টা পাইয়াছি, হয়ত তাহা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই, তবু কথাটা এই যে, আমাদের যে অবস্থা আমরা (মেয়েরা) তাহা না বুঝিয়া চলিতেছি বলিয়া আমাদের অবস্থা প্রতিনিয়ত খারাপ হইতেছে। যদি কেহ বলেন, ব্যয়বাহুল্যকর বস্ত্রাদি পুরুষরা দেয় বলিয়াই ত আমরা নিই। ইহা কি ঠিক কথা হইল? পুরুষ নারীর মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিবেই, নারীর কি উচিত নয়, আকাশের চাঁদ ধরিবার বায়না না করা? সংসার গঠন ও রক্ষা করিবার জন্যই ত নারীর সৃষ্টি, যে নারী তাহা করিতে পারেন, তাঁহার নারী-জীবন সার্থক হয় এবং যে নারী তাহা না পারেন, তিনি বুঝুন আর নাই বুঝুন, স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহার নারী-জন্ম বিফল। সংসারের অনর্থ বৃদ্ধি করিতেও যেমন নারী অসীম শক্তিশালিনী, সংসারকে শ্রী দিতে শান্তির আগার করিতেও তিনি তেমনই পারেন। সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আমার পাঠিকাদের মধ্যে যাহারা নারী, তাহারা নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গালার নারী চেষ্টা করিলে বাঙ্গালার শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের চেষ্টায় যেমন সংসারের, তেমন দেশেরও শ্রী ফিরিতে পারে। সেই চেষ্টা কি নারীরা করিবেন না?

সুখে-দুখে

—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ

ওঁ-কারপূত ঝঙ্কার মাঝে
রক্তিম নব রাগে,
নীহার-নয়নে ধারা নেহারিয়া
বাল-রবি যবে জাগে;
স্নিগ্ধ শান্ত অন্তরতলে
ফুল্ল কুসুম হাসে দলে দলে,
তখন কি তুমি অরুণের ছলে
চকিতে ছুঁইয়া যাও,
অশান্ত মম ব্যথাতুর হিয়া
সমাহিত করে' দাও?

মধ্যাহ্নের বন্ধুর পথে
চলিতে পন্থা ভুলি,
অজানা কাহার পরশন আশে
যবে দুটি বাহু তুলি;
চারিদিকে শুধু অগ্নির মালা
সাহারার মত বারিহীন জ্বালা,
তখন কি তুমি মাতাল-উতালা
শীতল মলয়া-বেশে
নব-বাসন্তী কেতন উড়ায়ে
ছুঁয়ে যাও হেসে হেসে?

সন্ধ্যায় যবে অন্ধকারের
ছায়া পড়ে ধরাপর,
নিকষ কাজল মাখিয়া তিমির
ক্রমে ছায় চরাচর,
দ্বিধা-ভয় লয়ে শঙ্কিত প্রাণে
চারিদিকে খুঁজি, আলো কোনখানে,
তখন কি তুমি খুশীর বিমানে
চাঁদ হয়ে দেখা দাও,
আমার সকল তিমির নাশিয়া
হাসিয়া ভাসিয়া যাও?

প্রতি দিবসের প্রতি অবদানে
তুমি আস ধরা দিতে;
এ কেমন ভুল, অন্তর মম
পারে না তো চিনে নিতে।
তোমার আলোক, তোমার আঁধার,
সুখ-দুখ হাসি কান্না তোমার,
এ কথা বুঝিতে দেহ অধিকার
ওগো ও পাগল-করা!
প্রতি দিবসের প্রতি অবদানে
অন্তরে দেহ ধরা।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—তৃতীয় খণ্ড শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। আষাঢ় ১৩৪২। মূল্য পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৷৷০, সাধারণের পক্ষে ৩৷০।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ইতিপূর্বে প্রথম দুই খণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের কথা প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমান খণ্ড সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া তিনি এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রয়োজন কত তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যিনি ইতিহাস লিখিবেন, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কথা লিখিতে বা জানিতে চাহিবেন, তাঁহার নিকট 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। এমন সুনির্বাচিত ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ ইহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় কখনও বাহির হয় নাই। ১৮৬৪-৬৯ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা গেজেট' হইতে নানা বিষয়িণী আলোচনার একখানি বিশেষ ও বিশিষ্ট সংগ্রহ-পুস্তক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংগ্রহ মাত্র কলিকাতা গেজেটের, আর তাহা ইংরেজিতে লিখিত। স্বর্গত রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় উনবিংশ শতকের বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি সংবাদপত্রের কথা লইয়া দুই খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্র অবলম্বন করিয়া এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্র বাবুর পূর্বে কেহ হস্তার্পণ করেন নাই। বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতে কিরূপ বিষয় দিলে দেশের ও দশের উপকার হইবে বর্তমান গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। দেশের লোকও এই শ্রেণীর গ্রন্থের উপকার উপলব্ধি করিয়া এই সকল গ্রন্থের আদর করিতেছে। এই সকল গ্রন্থ যতই বাহির হইবে নানা বিষয়িণী আলোচনার ততই সুবিধা হইবে। বিলাতে এইরূপ গ্রন্থের শত শত সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের দেশে একটা সংস্করণ কাটিতে কত দিন যায়। সুখের বিষয় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথার' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আশা করা যায় তৃতীয় খণ্ডের মূল্য কত লোকে তাহা বুঝিবে। ব্রজেন্দ্র বাবু যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই তিনটী খণ্ড সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ ও অপূর্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গ্রন্থে প্রদত্ত উপকরণ অনেক সময় প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। গ্রন্থখানি এমন সুবিন্যস্ত ও সুখপাঠ্য, কৌতূহলী পাঠক একবার খুলিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। সাহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তকখানি বাহির করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্য আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থে কয়েকখানি অতি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা যত সুন্দর, ভিতরের জিনিস ততোধিক সুন্দর। গ্রন্থের শেষে 'সূচী'তে যিনি চোখ বুলাইবেন তিনিই বইখানি আগাগোড়া পড়িতে বাধ্য হইবেন।

—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

রত্নাকর—এখানি নাট্যকাব্য, রাজশ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বীরবর প্রণীত ও মেদিনীপুর—মনোহরপুরগড় রাজবাটী হইতে কুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় বীরবর কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের কথার উল্লেখ নাই।

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই, রাজবাটীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া অশিক্ষিত প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উন্মেষই ইহার প্রধান লক্ষ্য। গ্রন্থখানির অধিকাংশ সংখ্যাই রাজাসাহেব স্বীয় শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবগণকে সাদরে উপহার দিয়াছেন। ইহা পুরাণমূলক নাটক—কেবল যে পল্লীগ্রামে অভিনয়ের উপযুক্ত তাহা নহে, মহাকবি বাল্মীকির অলৌকিক জীবনী আলোচনায়, আসক্তির এই হাবুডুবু খাইবার দিনে, সহরের শিক্ষিত অনেকের হয়ত চক্ষুরুন্মীলন হইতে পারে। আর্টের নামে সহরে কি অভিনয়ে, কি উপন্যাস-রচনায় আজকাল যাহা চলিতেছে, তাহাতে "রত্নাকরের" মত গ্রন্থের আবির্ভাবে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যোন্নতির কিঞ্চিৎ আশা করা যাইতে পারে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে কাব্য-ঝঙ্কার সাহিত্যের উচ্চস্তরের পরিচয় প্রদান করে। ধনিসন্তানের এই প্রচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ।

—অ

লীলারহস্য বা বিশ্বপ্রহেলিকা—শ্রীধরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বি-এস-সি প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ২।২।এ চন্দ্রমাধব রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় পাগলের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। "কেহ কোন সৎসাহসিক(?)কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়া তিনি 'কেহ টাকার পাগল', 'কেহ রূপের পাগল' ইত্যাদি পাগলের ভাগ ঠিক করিয়াছেন। কারণটা বুঝিলাম না। সৎসাহসিক কার্য্যটা কি তাঁহার এই লীলারহস্য প্রকাশ? কিন্তু ইহা তো সৎসাহসিক নয়, ইহা দুঃসাহসিক! সমস্ত কেতাবখানির মধ্যে কোন কথার পুর্ব্বাপর সামঞ্জস্য পাইলাম না। উপক্রম-উপসংহারেও মিল নাই। যাহা বলিতে চাহেন, তাহাও গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। লেখকের উদ্দেশ্যটা কি? আবার হুঁসিয়ারীও আছে, তাঁহাকে যাহারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করিবে তিনি তাহাদিগকেও পাগল বলিয়াছেন। গল্প আছে না—নীচে-পাড়ার রাম উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গ্রামের পথে চলিতেছিলেন। কে জিজ্ঞাসা করিল, রাম দা চললে কোথায়? রাম বলিলেন, উপর-পাড়ার শ্যাম ক্ষেপেছে তাই তত্ত্ব করতে যাচ্ছি!

প্রেম ও বিরহ—শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ৬ নুর মহম্মদ লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। গুটী তেইশ আন্দাজ কবিতা আছে। প্রথম কবিতার নাম প্রেম ও শেষ কবিতার নাম বিরহ। লেখক চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, এমন কি নানান্ রকম ছন্দের কসরৎ ভাঁজিয়া গদ্য-কবিতা লিখিয়া ভাল ভাল কথা গাঁথিয়া ছয়ষট্টি পৃষ্ঠার বইখানি পূর্ণ করিয়াছেন। কবিতা হয় ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রেম ও বিরহের সন্ধান পাইলাম না।

এই কয় পাতার বইএর এ-ক-টা-কা দাম?

ত্রিগুণবাদ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ৩৮।৭৯ নং হাউস কাটরা, বেনারস সিটী হইতে শ্রীসত্য হরিদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৴০ দশ আনা।

এই দেড় শত পৃষ্ঠার পুস্তকখানিতে প্রবীণ গ্রন্থকার নিজস্ব দৃষ্টিতে গীতা গ্রন্থ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু, উত্তম মহৎ এবং আলোচনা আন্তরিক সহানুভূতি পূর্ণ। তিনি নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া গীতার সহিত তত্তৎ শাস্ত্রের একটা সামঞ্জস্য আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গীতা অনন্ত রত্নের আকর। ভারতের প্রত্যেক আচার্য্যই স্ব স্ব মতের পোষকতায় গীতার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, গীতা হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের সহিত মতভেদ স্বাভাবিক। তথাপি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতেছি। তিনি আস্তিক্য বুদ্ধি লইয়াই অকপটে আপন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এহেন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা এবং কাগজ ভাল।

— হরিচন্দন

আজব বই—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী সম্পাদিত, দেব সাহিত্য-কুটীর, ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, মূল্য ১৸০।

প্রত্যেক পূজোয় দেব-সাহিত্য-কুটীর একখানা সচিত্র বড় বই বের করেন। এবার বের করেছেন 'আজব বই'। এবারের বই-এর বিশেষত্ব এই যে, কেবল গল্প ও কবিতায় এই 'আজব বই' ভরা নয়। নানা রকম আধুনিক বিজ্ঞানের খবর এতে আছে। রকমারি ছবি দিয়ে এই বিজ্ঞানের লেখাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর নানা রকম 'আজব' খবর এতে পাবে। আজবগাছ, ছবিতোলা, বিজ্ঞানের যাদু, চোখের ধাঁধা, ছবির বই, লেখা ইত্যাদি নানারকম লেখা পড়ে ছেলেমেয়েদের নানা বিষয়ের জ্ঞান বেড়ে যাবে। এ ছাড়া কবিতা, গল্পও অনেক আছে। ছোট ছোট এক রঙ্গা ছবি আছে অসংখ্য—রঙ্গীন ছবির সংখ্যাও অনেক।

উপহার হিসাবে 'আজব বই' একখানি ভাল বই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাশিয়া ভ্রমণ—(২১ খানি চিত্রসম্বলিত) শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নিত্যনারায়ণ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন, সাময়িক পত্রিকার পাঠক মাত্রেরই তাঁহার রচনার সহিত অল্পাধিক পরিচয় আছে। সুলেখক ও দৃষ্টিসম্পন্ন ভাবুক লোক বলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাশিয়া সম্পর্কে অসংখ্য না হইলেও বাংলায় বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে। তাহার কোনটিতেই রাশিয়া সম্বন্ধে বর্ত্তমান পুস্তকের মত জ্ঞাতব্য তথ্য মিলিবে বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ হইয়াও পুস্তকের রচনাভঙ্গী অতি সরস। নিত্যনারায়ণ বাবুর হাত মিঠা, মন তরুণ, এবং সে মনের ঔৎসুক্য উল্লেখযোগ্য। বয়সে সুকুমার হইলেও, অনেক স্থলেই তাঁহার মত সুপরিণত। এ পুস্তক পাঠে আনন্দ ও জ্ঞান দুইই মিলিবে। যাঁহারা অদ্ভুত-রাজ্য রাশিয়া সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁহাদিগকে আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

রাতের ফুল—(উপন্যাস) শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী প্রণীত। কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানীর মিঃ এ. সি. দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

উপন্যাসখানি পড়িয়া পাঠিকারা সন্তুষ্ট হইবেন। গল্পটি সহজ, সরল, বর্ণনাও সহজ ও সরস; কোথায় ভাষার বা ঘটনার প্যাঁচ-কসাকসি নাই। লেখিকা যাহা বলিতে চান, তাহা বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন, পাঠিকাদের নিকট কোন স্থানে একটুও ধোঁয়ার মত লাগিবে না। লেখিকার উদ্যম ও সাধনা সার্থক হইয়াছে একথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

আঁকা বাঁকা—(উপন্যাস) শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত।

গল্পাংশ সহজ ও সাধারণ। উপন্যাসপ্রিয় ব্যক্তিগণ পাঠ করিয়া বিরক্ত হইবেন না।

সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষর এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরগুলি যাহাতে রোমান টাইপে লিখিত হয়, তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যথেষ্ট উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। তাঁহার মতে সংস্কৃত অক্ষর-মালার বিন্যাসে (arrangement) বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা অনুসৃত হইলেও তাহার মুদ্রণ-কার্য্যে তিনটী অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ, ঐ অক্ষরগুলি যে আকারে লিখিত হয়, তাহা শিক্ষার্থীদিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অক্ষর ছাপাইতে হইলে ছোট ছোট টাইপ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এবং তাহার ফলে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষর-মালার সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলির (conjunct consonants) মুদ্রণ অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ। রোমান টাইপ ব্যবহৃত হইলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হইবে না। "অতএব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরগুলির বর্ত্তমান লিখন-প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়া রোমান অক্ষরে লিখিত হওয়া বিধেয়"—ইহাই তাঁহার সার কথা বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি।

অক্ষর কাহাকে বলে, অক্ষরের "মাত্রাগ্রহণ", "কারগ্রহণ" এবং "বর্ণগ্রহণ" কি ব্যাপার, অক্ষরমালার "প্রত্যাহার" এবং "অনুক্রান্তি" কোন্ শ্রেণীর কার্য্য, "ভাষাতত্ত্ব" কাহাকে বলে এবং "ভাষাতত্ত্বে" অক্ষরের স্থান কোথায়, এবংবিধ কোন আলোচনা মানুষের মনে উপস্থিত হইলে অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর এবং লিখন-প্রণালীর কি সম্বন্ধ তাহা সর্ব্বপ্রথমে মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করে। অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর এবং লিখন-প্রণালীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি, তাহা জানা থাকিলে, কোন লিখন-প্রণালী যথেচ্ছা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে না।

অক্ষর কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহা বুঝিতে হয়, তাহা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঋক্, যজু, ও সাম এই তিনটী বেদ ঐ আলোচনায় পরিপূর্ণ। অক্ষর হইতে ভাষার উৎপত্তি হয় কি প্রকারে তাহার কথা আছে "অথর্ব্ব বেদে"। ভাষার মৌলিক ও মিশ্রিত প্রকৃতি কেন এবং কত রকমের হয়, তাহার কথা আছে "পূর্ব্ব মীমাংসায়"। আমাদের ভাগ্যদোষে আজ সমগ্র বেদ ও পূর্ব্বমীমাংসা বিকৃত অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। "অক্ষর" ও "ভাষা"সম্বন্ধে যে কি শ্রেণীর কত কথা ঐ সমস্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা "প্রকৃত" সংস্কৃত ভাষার "প্রকৃত" ব্যাকরণ "প্রকৃত" অর্থে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকদিগকে বুঝান যাইবে না। পাঠকগণও প্রকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণকে প্রকৃত অর্থে না জানিতে পারিলে অক্ষর ও ভাষাসম্বন্ধীয় ঐ সমস্ত গূঢ় কথার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কাজেই অক্ষর সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় কি কি কথা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য বেদ ও মীমাংসার সাহায্য লওয়া চলিবে না।

ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষার "অক্ষর" লইয়া কিরূপ বালকোচিত খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের বুঝিবার জন্য "অক্ষর" সম্বন্ধে "গীতা"প্রভৃতি প্রচলিত গ্রন্থে কি কি কথা আছে, তাহা আমরা পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব।

ব্যাসদেব তাঁহার গীতাতে "অক্ষর"কে "অব্যক্ত" ও "পরমাগতি" বলিয়াছেন (১)। তাঁহার কথানুসারে "অক্ষর" হইতে "ব্রহ্মের" উদ্ভব হয় (২) এবং শরীরের মধ্যে "ব্রহ্মের" প্রথম স্পর্শানুভূতি লাভ করা যায় অক্ষরের সাহায্যে (৩)।

অক্ষরকে কেন "অব্যক্ত" ও "পরমাগতি" বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে এবং "অক্ষর" হইতে যে "ব্রহ্মের" উদ্ভব হয় ও অক্ষরের সাহায্যে যে ব্রহ্মের স্পর্শানুভূতি লাভ করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ "অ", "অহ" এবং "অহং" এই তিনটী শব্দের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। "অ", "অহ" এবং "অহং" এই তিনটী শব্দের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা জানিতে হইলে "পুরুষ" অথবা "আসল মানুষটী" কি জিনিষ, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। "পুরুষ" অথবা "আসল মানুষ", এই শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে মানুষের আভ্যন্তরীণ সেই বস্তুটী, যাহার কার্য্যের ফলে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন ঋতুতে ও দিবসের বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন কার্য্য-শক্তিসম্পন্ন হইতেছে। মানুষের আভ্যন্তরীণ সেই "পুরুষকে" কি উপায়ে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের নবম ও দশম শ্লোকে (৪) এবং তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে ঋক্, যজু এবং সামবেদে ও পাণিনি ব্যাকরণে। ঐ সমস্ত কথা কার্য্যতঃ পরীক্ষা* করিতে হইলে, প্রথমতঃ, স্বীয় শরীরের বাহ্যিক রূপ ও শ্বাস-গ্রহণ-পদ্ধতি কি তাহা জানিতে হইবে। শরীরের তিনটী ভাগ আছে; যথা—পশ্চাদ্‌ভাগ, অন্তঃ(মধ্য)ভাগ এবং সম্মুখভাগ। পশ্চাদ্‌ভাগ এবং সম্মুখভাগের সন্ধি (সংযোগ) পাঁচটী; যথা—দুইটী হস্ত, দুইটী পদ এবং গুহ্যদ্বার। সম্মুখভাগের ও অন্তঃভাগের সন্ধি কেবলমাত্র একটী, যথা—জিহ্বা। স্বীয় শরীরের তিনটী ভাগ ও ছয়টী সন্ধি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি হইলে জিহ্বাটীর অগ্রভাগ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখাটীর উপর রাখিয়া চুপ করিয়া বসিতে হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর যে স্পর্শ জিহ্বা গ্রহণ করিতেছে, সেই স্পর্শ শরীরের সম্মুখভাগের কতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনুভব করিতে হয়। জিহ্বার এই কার্য্যকে আভ্যন্তরীণ "পুরুষ"কে বুঝিবার দ্বিতীয় কার্য্য বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় কার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হইলে "গুহ্যদ্বারে" যে শরীরের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগের সন্ধিস্থল আছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং অন্তঃভাগটী ঐ সন্ধিস্থল হইতে কতখানি উচ্চে ও শরীরের তিনটী ভাগের মধ্যে কোথায় কতখানি ব্যবধান এবং ঐ ব্যবধানস্থিত প্রদেশে কি কি বস্তুর কি কি কার্য্য হইতেছে, তাহার ধারণা হয়। আভ্যন্তরীণ "পুরুষ"কে বুঝিবার দ্বিতীয় কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ হইবার পর জিহ্বাটীর অগ্রভাগকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর স্থাপিত রাখিতে হয় এবং লক্ষ্য করিতে হয় যে, নাসিকা, কর্ণ এবং লোমকূপের মধ্য দিয়া শরীরের ভিতর বায়ু কিরূপভাবে প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং শরীরের কোন্ স্থানে বায়ুর কিরূপ স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে এবং ঐ বায়ু কি কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কোন্ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর বিভিন্ন স্পর্শ, বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতি এবং বিভিন্ন পরিণতি পরিজ্ঞাত হওয়াকে আভ্যন্তরীণ "পুরুষ"কে বুঝিবার তৃতীয় কার্য্য বলিতে হইবে। "আভ্যন্তরীণ" পুরুষকে বুঝিবার এই তিনটী কার্য্যে অভ্যস্ত হইবার পর, পুনরায় জিহ্বাটীর অগ্রভাগকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর স্থাপিত করিয়া, "ভ", "ক্", "ত্", "য", "আ"—যে আকারে বাঙ্গালায় অথবা নাগরীতে লিখিত হয়—সেই আকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর চিন্তা করিতে

১। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮।২১

২। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩।১৫

৩। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩

৪। কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৮।৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন,
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্,
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮।১০

* এই পরীক্ষা কঠিন হইলেও প্রয়োগসাধ্য। সে প্রয়োগের বিন্দু-বিসর্গও না জানিয়া সংস্কৃত ভাষা এবং অক্ষর সম্পর্কে স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করা চলে না। সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইবে জানিয়াও এইখানে সেই প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কথা বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে। এ বিষয়ে যদি কেহ বিশেষ জিজ্ঞাসু হন, তবে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া আসিলে আমরা সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিব।

করিতে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হয়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর কিরূপ স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে, দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তৃতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হয়, চক্ষুরাদি "ধী"-ইন্দ্রিয়গুলির ও "বাগাদি" কর্ম্মযোনিগুলির কার্য্যেচ্ছা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর জিহ্বার অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া "ভ", "ক্", "ত্", "য্", "আ" এই পাঁচটী শব্দের মিশ্রিতরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঐ পাঁচটী শব্দকে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেচ্ছার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করাকে আভ্যন্তরীণ "পুরুষ"কে বুঝিবার চতুর্থ কার্য্য বলিতে হইবে। এই চারিটী কার্য্যে অভ্যস্ত হইবার পর পুনরায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর জিহ্বার অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া প্রথমতঃ "অ" এই শব্দটীর রূপ চিন্তা করিতে করিতে উহা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, 'অ', 'হ' এই দুইটী শব্দের মিশ্রিত রূপ চিন্তা করিতে করিতে "অহ" এই মিশ্রিত শব্দটী উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তৃতীয়তঃ "অ", "হ", "ম্" এই তিনটী শব্দের মিশ্রিত রূপ চিন্তা করিতে করিতে "অহং" এই মিশ্রিত শব্দটী উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে "অ", "অহ" এবং "অহং" এই তিনটী শব্দের রূপচিন্তা এবং উচ্চারণকার্য্যকালে চক্ষুরাদি দশটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেচ্ছার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে "অ" এই শব্দটীর রূপ-চিন্তা এবং উচ্চারণকার্য্যকালে চক্ষুরাদি দশটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেচ্ছার যে অবস্থা হয়, তাহার নাম পুরুষের "সাত্ত্বিক" অবস্থা। "অহ" এই শব্দটীর রূপচিন্তা এবং উচ্চারণ-কার্য্যকালে চক্ষুরাদি দশটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেচ্ছার যে অবস্থা হয়, তাহার নাম পুরুষের "রাজসিক" অবস্থা। "অহম্" এই শব্দটীর রূপচিন্তা এবং উচ্চারণকার্য্যকালে চক্ষুরাদি দশটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেচ্ছার যে অবস্থা হয়, তাহার নাম পুরুষের "তামসিক" অবস্থা।

"পুরুষ"কে উপলব্ধি করিবার উপরোক্ত চারিটী কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে পারিলে পুরুষের কোন্ অবস্থা সাত্ত্বিক তাহা সঠিকভাবে জানা যায়। অথবা সঠিকভাবে সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিবার উপায়,—পুরুষকে উপলব্ধি করিবার উপরোক্ত চারিটী কার্য্যে অভ্যস্ত হওয়া এবং জিহ্বার অগ্রভাগকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া "অ" এই শব্দটীর রূপ (অথবা লিখন-প্রণালী) চিন্তা করিতে করিতে তাহার উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা। সঠিকভাবে সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া "অ" এই শব্দটীর রূপ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর চিন্তা করিতে করিতে তাহার উচ্চারণ চেষ্টাকালীন শরীরের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিলে অনুভব করা যায় যে, আভ্যন্তরীণ পশ্চাৎ, অন্তঃ ও সম্মুখভাগে যে কার্য্যরেখা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা "অ" এই শব্দটীর লিখন-প্রণালীর অনুরূপ। স্থান ও সময়ভেদে এই রেখার কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু মূলতঃ এই তিনটী রেখার সমাবেশ এক—ইহা বলা যাইতে পারে। শরীরের বাহিরের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ কি রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলে কতদূর হইতে নিজের শরীরে বায়ু আসিতেছে এবং ঐ বায়ু কত রকমের স্পর্শযুক্ত হইতেছে এবং উহা নাসিকার মধ্য দিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিরূপে চক্ষুর ও কর্ণের আভ্যন্তরীণ ভাগের সহিত মিশ্রিত হইতেছে এবং আভ্যন্তরীণ বায়ু কত রকমের তেজের ও জলের স্পর্শযুক্ত হইতেছে, তাহা অনুভব করা যায়। শব্দগত অর্থানুসারে "ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ "অম্বুজ তেজ" এবং "ব্যোমজ স্পর্শানুভূতি"। ব্রাহ্মণগণ যে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে আপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃতের মিশ্রণকে "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে(৫)। প্রকৃত সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া "অ" এই শব্দটীর বিধিবদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলে, কোথা হইতে কত রকমের স্পর্শ-যুক্ত বায়ু শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ বায়ু কত রকমের তেজের ও জলের স্পর্শযুক্ত হইতেছে, তাহা অনুভব করা যায় বলিয়াই নন্দিকেশ্বর তাঁহার কাশিকায় অকারকে 'ব্রহ্মের রূপ'(৬), 'প্রকাশের কারণ' এবং 'পরমেশ্বর'(৭) বলিয়াছেন।

প্রকৃত সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া 'অ' 'অহ' এবং 'অহং' এই তিনটী শব্দের বিধিবদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলে

৫। আপোজ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম।

৬। অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যান্নির্গুণঃ সর্ব্ববস্তুষু।
চিৎকলামিং সমাশ্রিত্য জগদ্রূপঃ উণমীশ্বরঃ॥ ৩॥

৭। পর পৃষ্ঠা ৮ নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

পুরুষের সর্ব্ববিধ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া নন্দিকেশ্বর বলিয়াছেন—আদি এবং অন্তের সংযোগে পুরুষের অথবা পূর্ণ 'অহং'এর উৎপত্তি হইয়া থাকে (৮)।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রকৃত সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিলে আদি অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর সহিত তাহার রূপ অথবা লিখন-প্রণালীর কি সম্বন্ধ তাহা পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে, পুরুষের কোন্ চেষ্টার পর কোন্ চেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। কোন্ চেষ্টার পর কোন্ চেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নাম অক্ষরের 'অনুক্রান্তি' পরিজ্ঞাত হওয়া। যখন যে চেষ্টার উদ্ভব হয়, তখন শরীরের পশ্চাৎ, অন্তঃ ও সম্মুখভাগের আভ্যন্তরীণ অংশে কার্য্যরেখা কোন্ রূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রতিভাত হইতেছে তাহার পর্য্যবেক্ষণের নাম—অক্ষরের "বর্ণগ্রহণ" অথবা অক্ষরের লিখন-প্রণালী কি হইবে তাহার স্থিরীকরণ।

সংস্কৃত অক্ষরের লিখন-প্রণালী যে ঋষিগণ উপরোক্ত উপায়ে স্থির করিয়াছেন, তাহা সাত্ত্বিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া বিধিবদ্ধ উপায়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যস্থিত রেখার উপর জিহ্বার অগ্রভাগ স্থাপিত করিলে এবং যে কোন অক্ষরের রূপ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর চিন্তা করিতে করিতে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, বাঙ্গালা অক্ষর অথবা নাগরী অক্ষরের লিখন-প্রণালীতে অনেক তফাৎ রহিয়াছে, কিন্তু অক্ষর সম্বন্ধীয় উপরোক্ত চিন্তায় অভ্যস্ত হইলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, অকারাদি অক্ষরযুক্ত ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার বিভিন্ন লিখন-প্রণালীতে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। আপাতদৃষ্টিতে যে যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থান ও কালের প্রভেদ মাত্র এবং উহা অতি নগণ্য। বর্ত্তমান জগতে স্থান ও কাল কি বস্তু, তাহা সাধারণতঃ জানা নাই বলিয়াই ভারতীয় বর্ণমালার বিভিন্ন লিখন-প্রণালীর পার্থক্য অনেকখানি বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়।

এই প্রবন্ধের আগেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহা বুঝিতে হয়, তাহা একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ আলোচনা করিয়াছেন।

যদি ভগবদিচ্ছায় আবার কখনও সমগ্র পাণিনি প্রকৃত অর্থে প্রতিভাত হন, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিবে যে, ভারতীয় ঋষিগণ সমগ্র চর ও অচর বস্তুর শব্দের সমতা কোথায়, মৌলিক শব্দ কি কি, তাহার মিশ্রণের অনুক্রান্তির রকম কি, জীবের সত্ত্বাদি অবস্থাভেদে শব্দের ভেদ কিরূপ হয় ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋষিগণ চরাচর সমস্ত জীবের শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই পতঞ্জলি দেব প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান হইলে সমস্ত প্রাণী কি অভিপ্রায়ে কিরূপ শব্দ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়(৯)।

পাণিনি ব্যাকরণ বর্ত্তমানে যে অত্যন্ত বিকৃত অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহার ফলে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া প্রচলিত, তাহার কোন খানিই যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ নহে এবং বর্ত্তমানে ঋষিগণের বেদ, দর্শন, সংহিতা ও পুরাণের কোন গ্রন্থই যে যথাযথ অর্থে প্রচলিত নহে, তাহা অনেক রকমেই প্রমাণ করা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রমাণই বর্ত্তমানের সংস্কারগ্রস্ত পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভগবদিচ্ছা বলিয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাতে বলা যায়, খুব বেশী হইলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে পাণিনির চারি সহস্র সূত্র আবার প্রকৃত অর্থে প্রতিভাত হইবে এবং শিক্ষা ও সাধনাক্ষেত্রে ভারতীয় ঋষির স্থান যে কোথায়, তাহা আবার জগৎ জানিতে পারিবে। আমরা অক্ষর সম্বন্ধে এবং পুরুষ বুঝিবার কার্য্যাদি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই পাণিনির কথা এবং ঐ সমস্ত কথাই প্রত্যক্ষ করা যায়।

পাণিনির অর্থ বিকৃত হইবার পর আর বহুদিন জগৎ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে নাই। ভাষাতত্ত্ব

৮। অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।
আদ্যমন্ত্যেন সংযোগাদহমিত্যেব জায়তে॥ ৪॥

৯। শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্।
পাতঞ্জল দর্শন—বিভূতিপাদ। ১৭শ সূত্র।

সম্বন্ধে গ্রীকদিগের অথবা রোমকদিগের প্রণীত কোন গ্রন্থ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বর্ত্তমান জগতে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতের যে কয়জন গ্রন্থকারের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে হুইট্‌নি (Whitney), পিল (Peile), ব্রাগম্যান (Bragmann), ব্রিল (Breel), সুইট (Sweet), গিলস (Giles) এবং এডমণ্ডস্ (Edmonds)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের বক্তব্য সমালোচনা করিতে হইলে "ভাষাতত্ত্ব" ও "ভাষার প্রয়োগ" – এই দুইটী শব্দের ভিতর কি পার্থক্য তাহা মনে রাখিতে হয়। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তদনুসারে বলিতে হয়, ইঁহাদের কেহই ভাষার **তত্ত্ব** অথবা সমস্ত জীবের শব্দের সমতা কোথায়, অথবা শব্দের মৌলিকতা কিরূপ ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, অথবা শব্দের মিশ্রণ কাহাকে বলে এবং মিশ্রণের বিধি কি তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানের মানুষের ভাষার **প্রয়োগে** কি কি পার্থক্য ও সমতা দেখা যায়, তাহার আংশিক আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। ভাষার প্রকৃত তত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাদিগের জানা না থাকায়, তাঁহাদের আলোচনাগুলি ভ্রমশূন্য হয় নাই এবং অল্পবুদ্ধি মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। তথাপি তাঁহারা মনুষ্য-সমাজের ধন্যবাদযোগ্য, কারণ ভাষার বাস্তব অবস্থা তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যমত পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের ভাষাবিদ্ অথবা ভাষাসম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে কয়খানি গ্রন্থের সহিত আমি পরিচিত হইতে পারিয়াছি, তাহাদের কোন খানিতে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কোন চিহ্নের অস্তিত্বের পরিচয় থাকা ত' দূরের কথা, ভাষা-তত্ত্ব ও ভাষার প্রয়োগ, এই দুইটী শব্দের অর্থে যে পার্থক্য আছে, তাহাও তাঁহার জানা আছে কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরমালাকে রোমান টাইপে লিখিবার জন্য তিনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই দেখান হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব জানা থাকিলে অথবা ভাষার তত্ত্ব কি শ্রেণীর জ্ঞান তৎসম্বন্ধে কল্পনার শক্তি থাকিলে অক্ষরমুদ্রণকার্য্যে কোন্ উপায়ে সুবিধা অথবা অসুবিধা আসিতে পারে, মুখ্যতঃ তাহার চিন্তাই আসিতে পারিত কি ?

বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থা দেখিয়া ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশেষজ্ঞকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একজন হিন্দু অথবা একজন ভারতবাসী ব্যাসদেবের "ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্', 'অক্ষরং ব্রহ্মপরমং', 'অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম' ইত্যাদি বাক্যকে বিন্দুমাত্রও না বুঝিতে পারিয়া এতদূর উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছেন এবং যথেচ্ছা সংস্কৃত অক্ষরমালার লিখন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা কোন প্রকৃত হিন্দু অথবা ভারতবাসীর পক্ষে ক্ষমার যোগ্য কি ?

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনার পদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত করা কেন হইবে না, তাহা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

ভারতীয় রাজনৈতিকচাঞ্চল্য ও বাঙ্গালার শিক্ষা-সংস্কার

ইংরাজদিগের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতীয়গণ বিভিন্ন স্বাধীন দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন এবং স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইংরাজীশিক্ষার বিস্তার রোধ করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। বাঙ্গালার শিক্ষা-সংস্কারের নামে জনসাধারণের সম্মুখে যে প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার মূলে উপরোক্ত মতবাদের কোন সংস্রব আছে কি না তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ না থাকিলেও ঐ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে ইংরাজী ভাষাশিক্ষার বিস্তৃতি যে খর্ব্ব করা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইংরাজীশিক্ষার যাহাতে বিস্তৃতি ঘটে, তাহা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক চাহিতেছেন, অথচ গভর্ণমেণ্ট এমন একটী কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে বসিয়াছেন, যাহাতে ইংরাজী শিক্ষার পরিসর হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এতাদৃশ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য জনসাধারণের দৃষ্টিতে

সন্দেহজনক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে কার্য্য করিলে দেশের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হইতে পারে, তাহা জনসাধারণের অপ্রিয় হইলেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অবলম্বন করার যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষার বিস্তৃতি খর্ব্ব করিলে দেশের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে কি না তাহা চিন্তার যোগ্য। কোন্ কার্য্যপদ্ধতি দেশের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দূরীভূত করিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমতঃ, রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয় কেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয় সাধারণতঃ দুই কারণে। এক—অন্য দেশের তুলনায় কোন দেশের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার অপেক্ষাকৃত কম হইলে ঐ অধিকারগুলি লাভ করিবার জন্য।

দুই—যখন প্রজাগণ ব্যাপক ভাবে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানারূপ আর্থিক দুঃখদারিদ্র্যে নিপতিত হয়, তখন ঐ দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার জন্য।

অন্য দেশের তুলনায় কোন দেশের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার কম হইলে, যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত লোকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের ভিতরই আবদ্ধ থাকে। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য না হইলে এই শিক্ষিত লোকগণের চাঞ্চল্য অথবা আন্দোলন বশতঃ রাজশক্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার আশঙ্কা প্রায়শঃ উপস্থিত হয় না। ইতিহাসে মধ্যবিত্তগণের অসন্তুষ্টি ও ষড়যন্ত্রের ফলে যে যে রাজশক্তি পরিবর্ত্তন হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা রাজকর্ম্মচারিগণের অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রজাগণের দুঃখদারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে, যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা দেশময় ব্যাপক হইয়া থাকে। দুঃখদারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ অপসারিত করিয়া বাস্তব শিক্ষার দ্বারা প্রজাগণকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন না করিতে পারিলে এতাদৃশ চাঞ্চল্য রোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং অবশেষে রাজশক্তির পরিবর্ত্তন হওয়া অনিবার্য্য হয়।

যে ভাষা শিক্ষা করিলে বিভিন্ন দেশের অবস্থা জানিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মচারিগণের আশঙ্কান্বিত হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু দেশে যখন সর্ব্বসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য উপস্থিত হয়, তখন গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য দ্বারা যাহাতে রাজকর্ম্মচারিগণ প্রজাবৃন্দের অসন্তুষ্টিভাজন না হন, তাহা সর্ব্বথা লক্ষণীয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায়শঃ সর্ব্বসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখদারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলিতে আমরা বাধ্য। বর্ত্তমানে যে জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাতে একটা ভাষাবিশেষ লিখিতে ও পড়িতে জানা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন বিজ্ঞানের অথবা বিষয়ের শিক্ষা হয় না এবং তদ্দ্বারা ঐ সর্ব্বব্যাপী দুঃখদারিদ্র্যের কারণ অপসারিত করা ত' দূরের কথা, তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই সম্ভব হইতেছে না। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপ ও মার্কিন দেশে এরূপ সর্ব্বব্যাপী দুঃখদারিদ্র্য থাকিতে পারিত না। এই শিক্ষার বিস্তার না হইলে জনসাধারণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে ইহা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের যে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দেশের সর্ব্বসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য যেরূপ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে খুবই আশা করা যায় যে, জনসাধারণ একদিন এই শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ অপসারিত করিয়া ফেলিবে এবং ঐ দিন খুব দূরবর্ত্তী নহে। যাঁহারা দেশের নেতা ও পরিচালক, তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে দেশময় যেরূপ বিভিন্ন প্রহসনের অভিনয় দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঐ দিনের বিকটতা কিরূপ ভীষণ, তাহা কেহ যে অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা মনে করা যায় না বটে, কিন্তু শান্তিকামী জনসাধারণের পক্ষে ঐ বিকটতা ঈপ্সিত হইতে পারে না।

কাযেই আমরা এখনও বলি—শিক্ষাসংস্কারের যে অভিনয় চলিতেছে, তাহা অবিলম্বে বন্ধ হইয়া যাহাতে দুঃখদারিদ্র্য অপসারিত করিবার উপযোগী প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়,

তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের ও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রচারাবধি বাঙ্গালা দেশময় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার একটা প্রবৃত্তির সাড়া পাওয়া যাইতেছে। খুলনার আইনজীবিগণ, নদীয়ার জিলা-সমিতি, কলিকাতার শিক্ষক-সংঘ, নোয়াখালীর আইন-জীবী সংঘ, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সংঘ, বঙ্গীয় শিক্ষা সংঘ প্রভৃতি অনেক সংঘ হইতে অনেক কথা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত হইতেছে। আমরা জানি যে, ডিমোক্রেসীর যুগে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও হস্তপদাদির ক্ষমতা স্বভাবতঃ অসমান হইলেও তাহাকে সমান বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে এবং তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বর্ত্তমান রীতিবিরুদ্ধ এবং বিপজ্জনক। অথচ দেশের অবস্থা যেরূপ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িতেছে এবং ঐ অবস্থার সঙ্গে শিক্ষার পদ্ধতি যেরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তাহাতে দুই একটী কথা না বলাও কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কর্ত্তব্যের কথা নানা জন নানা ভাবে বলিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের চাঁদপানা ছেলেগুলি যে কেন বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এবং বড় বড় উপাধিগুলিতে ভূষিত হইয়াও দুইটী উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে অস্ত্রোপচার (operation) সফল হইতে পারে বটে, কিন্তু রোগী বাঁচিয়া থাকিবে কি না তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তার পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণিধানযোগ্য ইহা বলাই বাহুল্য। গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আচারানুযায়ী একটী কমিটি সংগঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, মিঃ এন্‌. সি. রায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাঁদের প্রত্যেকেই যে বিশেষজ্ঞ তাহা স্বতঃসিদ্ধ, কাযেই ইহাঁদের মুখ হইতে শিক্ষাবিষয়ক যে সমস্ত বাণী নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের মত জনসাধারণের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা কি বলিতেছেন তাহা আপনারা শুনিয়া রাখুন:—

ইহাঁদের প্রথম কথা—

> "বহুবিধ ত্রুটী সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সুফল ফলিয়াছে এই সত্য অস্বীকার করা চলে না। ১৮৫০ সনের বাঙ্গালা দেশের সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, দেশের বর্ত্তমান উন্নতির কতখানি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগুলি সংসাধিত করিয়াছে।"

মনে রাখিবেন, এই উক্তি শিক্ষা-বিভাগের প্রধান মন্দির হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বাছা বাছা বিশেষজ্ঞগণের কলম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। হইতে পারে, ১৮৫০ সালে বাঙ্গালার অশিক্ষিত(?) জমীদারগণ দেনার দায়হইতে মুক্ত থাকিয়া উন্নত মস্তকে দেশের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, আর আজ তাঁহাদের সন্তানগণ প্রায়শঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও সর্ব্বদা নানারূপ অভাবের তাড়নায় অস্তিত্বশূন্য হইতে চলিয়াছেন—কিন্তু তথাপি দেশে শিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে তাহা বলিতেই হইবে, কারণ এই কথা আমাদের বিশেজ্ঞগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে! হইতে পারে যে, তখন বাঙ্গালার অশিক্ষিত তিলী, সাহা প্রভৃতি বৈশ্যগণ নানারূপ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া স্বাধীনভাবে দেশের মহাজন বলিয়া পরিচিত থাকিতে পারিয়াছিলেন, আর তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানগণ মহাজন হওয়া ত দূরের কথা, আজ নিজেরাই প্রায়শঃ দেনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন এবং স্ব স্ব উদরান্নের জন্য চাকুরীর অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেছেন কিন্তু তথাপি দেশে শিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ এই কথা আমাদের স্বনামধন্য পুরুষগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে! হইতে পারে, তখন গ্রামের শতকরা নব্বইজন অশিক্ষিত লোক গ্রামে বসিয়া চাকুরী না করিয়া স্ব স্ব গ্রামগুলিকে সারা বৎসর আনন্দের ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া রাখিতে পারিত, আর আজ বড় বড় উচ্চ উপাধিধারিগণ গ্রামে বসিয়া খোলা মাঠে আনন্দে কালযাপন

করা ত' দূরের কথা—অনেকেই সহরের অস্বাস্থ্যকর গৃহে নিজ নিজ স্বাস্থ্য তিল তিল করিয়া বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইয়াও উদরান্নের পর্য্যন্ত সংস্থান করিতে পারিতেছেন না—কিন্তু তথাপি দেশের যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যাইবে না, কারণ ইহা আমাদের সরস্বতীর বরপুত্রগণের মন্তব্য! স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে পারিবারিক শান্তি সম্বন্ধে দেশের উন্নতির বাকী চিত্র স্ব স্ব মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া আপনারা দেখিয়া লউন। আপনাদের ছেলেরা স্বীয় উদারান্নের সংস্থান কি করিয়া করিতে হয় তাহা শিখিতে পারুক আর না পারুক, জীবনের একটা দিনও কি করিয়া সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে হয়, তাহা আপনারা শিখিতে পারুন আর নাই পারুন, আপনাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আপনাদের দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কারণ এই কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে বাছা বাছা সভ্যগণের অভিমত অনুসারে পাশ হইয়াছে!

এই কমিটির দ্বিতীয় কথা—

> "তথাপি এই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অনতিবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে সংস্কার হইতে উপকার আশা করিলে, উহাকে জনসাধারণের মতের অনুকূল করিতে হইবে।"

এই কথাটী যে ডিমোক্রেসীর যুগের সমঞ্জস তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে বিশেষজ্ঞগণের যথেষ্ট স্বার্থত্যাগের পরিচয় আছে। জনসাধারণের মতের উপর তাঁহারা যখন এত শ্রদ্ধাশীল, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই যাহাতে জনসাধারণের ও বিশেষজ্ঞগণের পার্থক্য অপসারিত হইয়া সিনেট-সভায় "অ-বিশেষজ্ঞ" জনসাধারণের স্থান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

পায়ে হাঁটিয়া চলিতে মানুষের পায়ে বড় বেদনার উদ্ভব হয়। এতদিন মনুষ্যজাতি পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেছে, কাযেই মানুষের পাগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাথাগুলি অনেক দিন হইতে বিশ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমাদের মতে বর্ত্তমানে পাগুলিকে বিশ্রাম দিয়া মাথা দ্বারা কিরূপে হাঁটিতে হয়, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে মানুষের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে। আমরা জনসাধারণ। কাযেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণের ফতোয়ানুসারে আমাদের মতের অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার দাবী আমরা করিতে পারি। আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞগণ আমাদের এই দাবী পূরণ করিবেন ত?

এই কমিটীর তৃতীয় কথা—

> "যদি মধ্য-স্কুলকেই সাধারণতঃ বাঙ্গালী ছেলের পাঠ্য-জীবনের শেষ অধ্যায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির পক্ষে নিশ্চিত বাধার সৃষ্টি হইবে।"

খুব আশঙ্কার সময় আসিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই আশঙ্কার কোন কারণ নাই; এখন ছেলেরা বাপের অথবা শ্বশুরের পয়সায় কেহ বা ভারতবর্ষে বসিয়া আর কেহ বা বিলাতে বসিয়া থিসিস লিখনে বছরের পর বছর কাটাইতে পারিতেছে!

মানুষের অবোধ্য কতকগুলি কথা লিখিয়া একটা থিসিস রূপে পেশ করিলেও পি-এইচ-ডি, ডি-এস-সি প্রভৃতি উপাধি লাভ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর সংখ্যাও গাদায় গাদায় বাড়িয়া যাইতে পারিতেছে। উপরোক্ত আশঙ্কার সময় উপস্থিত হইবার আগে যাহাতে দেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির চরম দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, তদনুরূপ একটা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের এখনই করা বিধেয় নহে কি?

এই কমিটীর চতুর্থ কথা—

> "যদি দেশবাসীকে পল্লীমুখী করিতে হয় তাহা হইলে পল্লীগুলির সংস্কার হওয়ার দরকার। গ্রাম্য স্বাস্থ্য, গ্রামপ্রাণতা কৃষিপ্রভৃতি বিস্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রাথমিক অথবা মধ্য-বিদ্যালয় সংগঠিত করিলেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাইবে না।"

ইহাও খুব খাঁটি কথা! গ্রামে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হউক আর না হউক, গ্রাম বাসের যোগ্য থাক আর না থাক, চিন্তার প্রসারতা, জীবনের উচ্চতা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা জানিবার উপযোগী শিক্ষা যুবকগণকে দেওয়া হউক আর নাই হউক, শিক্ষক অথবা শিক্ষার বিশেষজ্ঞগণ চিন্তার প্রসারতা, জীবনের উচ্চতা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা জানুন আর নাই জানুন, যুবকগণ যাহাতে এই কথাগুলি কেবল টিয়াপাখীর মত আওড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে!

ইহা ছাড়া উপরোক্ত শ্রেণীর আরও অনেক কথা ঐ কমিটীর কলম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। আসল যায়গায়

স্পর্শ না করিয়া কতকগুলি অর্থহীন ও অযৌক্তিক ফাঁকা কথায় রিপোর্ট বোঝাই করিলে দেশের কোন উপকার সাধন করা যায় কি?

কমিটীর সভ্যগণের ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করিতে বসিলে হয়ত আমরাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইহাঁদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহার অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার সারথ্য-গ্রহণে অধিকতর উপযুক্ত লোক বাঙ্গালা দেশে নাই। তাদৃশ লোক এই কমিটীর ভিতর থাকা সত্ত্বেও যখন উহা হইতে কোন আসল কাযের কথা বাঙ্গালী শুনিতে পায় নাই, তখন কি বুঝিতে হইবে না যে, বাঙ্গালা দেশের অবস্থা প্রায় সমস্ত বিভাগেই অত্যন্ত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞগণ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের অধিকতর সতর্ক হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে?

বিশেষজ্ঞগণের নিকট আমাদের অনুরোধ, এখনও তাঁহারা তাঁহাদের ফাঁকা-খেলা বন্ধ করুন, তাঁহারা এখনও চক্ষু মেলিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, কি ভীষণ অভূতপূর্ব্ব নিদ্রিত শক্তি ক্ষুধার জ্বালায় জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। এখনও ঐ শক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার সুযোগ ও অবসর আছে। আর কিছু দিন এইরূপ খেলায় নিযুক্ত থাকিলে ঐ শক্তির ঝঞ্ঝাবাতে সকলের উড়িয়া যাইতে হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির ১৯৩৪ সনের বিবরণীতে প্রকাশ, স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং যক্ষ্মাব্যাধির প্রকোপ ভীতিজনক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

তবু কেহ স্বীকার করিবেন না যে, কোন্ খাদ্য ও বাসস্থান ভাল তাহার যথাযথ জ্ঞান না থাকায় আমাদের ছেলেদের এত দুর্গতি হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য!

লোকবৃদ্ধি

ভারত সরকারের সাধারণ স্বাস্থ্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Public Health Commissioner) কর্ণেল রাসেল 'ইণ্ডিয়ান মেডিকাল গেজেট' পত্রিকায় ভারতের লোকবৃদ্ধি সমস্যা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতের লোকসংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী অত্যন্ত নিম্নস্তরের; তৎসত্ত্বেও লোক-সংখ্যার হ্রাস না ঘটিলে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব ঘটিবে।

পার্লামেণ্টের সভ্য স্যর আর্ণল্ড উইলসনও লণ্ডনের এক বক্তৃতায় ভারতের লোকবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ! চল্লিশ বৎসর আগেও যখন দেখা যায়, ভারতবর্ষে বিঘাপ্রতি উৎপন্ন শস্যের হার দ্বিগুণ ছিল, তখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলে খাদ্যাভাব অনিবার্য্য, এবংবিধ মতবাদ চিন্তাযোগ্য নহে কি? ঐ মতবাদ যখন গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের একজন কর্ণেল সাহেব এবং পার্লামেণ্টের একজন সভ্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তখন উহা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত এবং সত্য! এই শ্রেণীর সর্ব্বদর্শী মানুষগুলির চিন্তাশীলতার ফলেই যে ইংলণ্ড বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা আমরা কবে বুঝিতে পারিব?

বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসা

ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ. সি. পাইবাস বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসার বিবিধ উন্নতির উল্লেখ করিয়া লণ্ডনে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদিও অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যা নানা অসাধ্য সাধন করিতে পারে—মানুষের ফুসফুসের ছিদ্র নিবারণ এবং মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অপহরণ ইত্যাদি সমস্ত কাজই অস্ত্র-চিকিৎসায় সম্ভব, তথাপি ইহাতে কোন ফল নাই। একটি সমগ্র জাতির কাহারও না কাহারও কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন—এমন অবস্থা আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। বর্ত্তমানে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে ব্যাধি না হইতে পারে।

যাহাতে ব্যাধি না হইতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইলে যে, মানুষের প্রকৃত হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাধির প্রকৃত নিরোধ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে বর্ত্তমান অস্ত্রোপচার বন্ধ করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা আমাদের ডাক্তারগণ স্বীকার করিবেন কি?

বিজ্ঞান

কৃষি ও বৈজ্ঞানিক

কইম্বাটুরে এক বিজ্ঞান-বিতর্ক সভায় স্যর সি. ভি. রমণ বলিয়াছেন :—এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, রসায়ন ও পূর্ত্তবিদ্যা (engineering) ভারতের সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতের মূল-'শিল্প' (basic industry) কৃষিকে প্রাণীতত্ত্বের গবেষণা সাহায্যে সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা না করিলে আর চলিতেছে না।

ইয়োরোপীয় গ্রন্থকারগণ "কৃষি"কে "শিল্পে"র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু "শব্দ-শাস্ত্রের" উপর কোন শ্রদ্ধা থাকিলে "কৃষি"কে "শিল্প" বলা যায় না। "কৃষি" প্রকৃতির কার্য্য আর "শিল্প" মানুষের কার্য্য। দুইএর ভিতর অনেকখানি পার্থক্য। স্যর রমণের মত কৃতী পুরুষের মুখে শব্দ-ব্যবহারে অসতর্কতা দেখিলে হতাশ হইতে হয়।

প্রাণীতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা কৃষিতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব নহে, ইহা সত্য হইলেও বর্ত্তমান প্রাণীতত্ত্বে যে তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা কৃষিতত্ত্বের কি সহায়তা সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বড়লোকের বড় বড় কথা আমাদিগকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া শুনিতেই হইবে।

শিল্প ও বুদ্ধি

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজ-অব সায়ান্সের ফলিত রসায়ন শাখা কর্ত্তৃক ঐ বিভাগে যে সকল কার্য্যকরী গবেষণা হইয়াছে তাহার একটি প্রদর্শনী-সভায় প্রোফেসার এইচ. কে. সেন বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের ফলেই শিল্পানুগতা (industrialism); সুতরাং কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কি অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে ইহার স্থান অত্যন্ত উচ্চে।

"বুদ্ধি" এবং তাহার "বৃত্তি" সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে ঐ শ্রেণীর উক্তি কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না! অসভ্য ভারতীয় ঋষিগণ বর্ব্বর ছিলেন বলিয়াই বৈশ্যগণকে ব্রাহ্মণগণের উপদেশাধীন করিয়াছিলেন—ইহাই কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে?

বিজ্ঞান ও অর্থনীতি

বিলাতের 'পিপ্‌ল' পত্রিকার একজন প্রতিনিধির নিকট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-অধ্যাপক নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বনামখ্যাত ফ্রেড্‌রিক সডি বলিয়াছেন :—যদি বিজ্ঞানের মতানুযায়ী পৃথিবী চলিত, তবে আগামী কল্যই পৃথিবীর সমস্যা মিটিয়া যাইত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য্য আসিয়া যাইত সুতরাং যুদ্ধ থাকিতে পারিত না। কিন্তু অর্থনীতিকদের জন্যই ইহা সম্ভব হইতেছে না। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাকে যে মানুষ মারিবার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে, ইহাতে বৈজ্ঞানিক মাত্রেই ক্ষুব্ধ। সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মিলিত সভায় অর্থনীতিকদের এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবিধান হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যে এতখানি তথ্য কোথায় আছে তাহা আমাদের জানা নাই। বিজ্ঞানের কোন্ পুস্তকে পৃথিবীর বর্ত্তমান সমস্যা এবং যুদ্ধ ও কলহপ্রিয়তা মিটাইবার উপযোগী জ্ঞানের সন্ধান আছে, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি? আমাদের মনে হয়, আজকাল উপাধি থাকিলে আর মুখে লাগাম রাখিবার প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতি কোন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে কি? যে ভ্রমাত্মকতার ফলে এতখানি অনাসৃষ্টির উদ্ভব হয়, তাহার উৎপত্তি হয় কেন, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

স্ত্রীশিক্ষা

পুণার থাকারসে মহিলা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে বোম্বাই প্রদেশের লাটপত্নী লেডি ব্র্যাবোর্ণ ভারতে পুরুষ ও স্ত্রীশিক্ষাকল্পে ব্যয়িত অর্থ-পরিমাণের পার্থক্য উল্লেখ করিয়া স্ত্রীশিক্ষাকল্পে যাহাতে আরও অধিক অর্থ সাধারণে দান করেন, এই নিবেদন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রবেশাবধি ইংরাজগণের পারিবারিক সুখশান্তি যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ঐ শ্রেণীর শিক্ষা আমাদের অবশ্যগ্রহণীয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে মানিয়া না লইয়া, ইংরাজগণের পারিবারিক সুখশান্তির প্রকৃত রূপ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে, বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

শিক্ষা ও ইংলণ্ড

মান্দ্রাজের এক যুবক-সমিতিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদলিয়ার বলিয়াছেন :—গ্ল্যাডষ্টোন, ডিস্রেলি, অ্যাস্‌কুইথ, ব্যালফুর ইত্যাদি ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দ সকলেই শিক্ষিত। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহই ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দকে সৃষ্টি করিয়াছে।

শিক্ষার ইতিহাসের এই নূতন সংবাদটী আমরা কোন ইয়োরোপীয় গ্রন্থকারের গ্রন্থে খুঁজিয়া পাই নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি প্রধানতঃ সুরু হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু আগে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এই সময়বর্ত্তী ইংলণ্ডের অবস্থাকে ভাল যে কি যুক্তিতে বলা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ডিমোক্রেসী

কলিকাতা মোসলেম ইনষ্টিটিউট হলে সৈয়দ এ. রফিক এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর পৃথিবী পরিভ্রমণের পর সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। মুসোলিনি, পোপ, আলবেনিয়ার রাজা, পালেষ্টাইনের শাসনকর্ত্তা এবং ইরাকের নৃপতি, প্রত্যেকের সহিত তিনি দেখা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত দেশেই ডিমোক্রেসীর যুগের শেষ না হইলেও, ডিমোক্রেসীর সম্পর্কে লোকের অবিশ্বাস আসিয়াছে এবং রাজা ও প্রজার নূতন সম্পর্কের সূচনা হইয়াছে।

আমাদের দেশের সুধীমণ্ডলী ডিমোক্রেসীর প্রহসন একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি?

পুরাণ ও ইতিহাস

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে গত ২১শে সেপ্টেম্বর হিন্দুর পুরাণ হইতে শ্রীরামচন্দ্র যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২১২৪ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এতখানি যখন প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন আমাদিগের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, "দশমুণ্ড" রাবণ এখন আর দেখা যায় না কেন? হনুমানের গোষ্ঠী এখন আর কথা কহিতে পারে না কেন? মাটীর ভিতর এখন আর দুই একটা "সীতা" জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না কেন? এসব কবে প্রমাণিত হইবে?

প্রাচীন ভারত

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ পি. কে. আচার্য্য 'প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা' প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রাচীনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি একই প্রকারের ছিল। উভয়েরই প্রথম উদ্দেশ্য, জ্ঞান পরীক্ষা করা কিংবা কোনও যুক্তি কি তথ্য স্মৃতিশক্তির সহায়তায় লিখিবার শক্তি পরীক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ পত্রাদি লিখিবার শক্তিপরীক্ষা।

স্মরণ করিয়া রাখিবার উপযোগী সংবাদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই! প্রাচীন ভারত বলিতে কোন্ যুগের ভারতকে বুঝিতে হইবে, তাহার সংবাদ আচার্য্য তাঁহার শ্রোতাদিগকে দেন নাই। সাধারণতঃ ভারতীয় বেদ ও দর্শনের যুগকে প্রাচীন ভারত বলা হয়। ডাঃ আচার্য্য বেদ, দর্শন, সংহিতা এবং পুরাণের কুত্রাপি "বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটীর ব্যবহার পাইয়াছেন কি? আমরা ভারতীয় ঋষিগণের শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি, তদনুসারে শিক্ষার যে পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতির বিরুদ্ধ। ঐ শ্রেণীর পদ্ধতি বরং ভারতীয় ঋষিগণের নিন্দিত। কার্য্যতঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে বিচার করিলে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ইয়োরোপের অনিষ্টই করিয়াছে ইহা যুক্তিযুক্তভাবে স্বীকার করিতে হয়। যদি ইয়োরোপীয়গণের শিক্ষাপদ্ধতিই ঠিক হইত, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে প্রিয়তম পরিবারবর্গ ও জন্মভূমি ছাড়িয়া উদরান্নের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত? শিক্ষায় দোষ না থাকিলে এত ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা, কৃষি সমস্যা, বাণিজ্য সমস্যা প্রভৃতির উদ্ভব হইতে পারিত কি?

ইয়োরোপে যখন অমুক ব্যবস্থাটী আদৃত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহা ভাল এবং আমাদেরও প্রাচীন ভারতে উহা নিশ্চয়ই ছিল, এইরূপ একটা মনোবৃত্তি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যেই দেখা যায় এবং ডাঃ আচার্য্যের এই মতবাদ খুব সম্ভব উপরোক্ত মনোবৃত্তিপ্রসূত।

ইউরোপের শিক্ষা

কলিকাতার কোন সভায় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত এস. এন. মল্লিক প্রশ্ন করিয়াছেন:—শিক্ষাদীক্ষা অপেক্ষা ক্ষুধার দাবী অধিকতর। ইয়োরোপের শিক্ষানীতি ও সামাজিক গঠন ভারতবর্ষের মাটিতে রোপণ করা চলিবে কি?

ইহা ছাড়া আমরা আর একটি প্রশ্ন করি—ইয়োরোপীয়গণের পক্ষে তাঁহাদের শিক্ষানীতি ও সামাজিক গঠন পদ্ধতি মঙ্গলজনক হইয়াছে কি?

কৃষি

স্বদেশ

কৃষকের অবস্থা

দেশের গত মাসে প্রকাশিত কৃষি-সম্পর্কিত সংবাদসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য:—১৯৩৪-৩৫ সনের ভূমি-রাজস্ব শাসন-বিবরণী বিষয়ে বোর্ড অব রেভেনিউ-এর মন্তব্য সম্পর্কে বঙ্গীয় সরকারের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের মতে, এদেশের কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, কেন না ধান এবং চাউলের মূল্য অধিকাংশ জেলাতেই খুব বেশী

না হইলেও, বাড়িয়াছে। পাটের বাজারও সরকারী পাট-হ্রাস আন্দোলনের ফলে একটু ভাল। ইহার ফলে, এই বৎসরে ঋণগ্রহণের একটু কমতিও দেখা যায়।

এই রিপোর্টগুলির মূল্য কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। যাহা হইলে ধান, চাউল এবং পাটের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে ভাল হইয়াছে ইহা বলা যায়—তাহা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কোন মানুষের অবস্থা অনুসন্ধান করা যায়, তাহারই অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়াছে শুনা যায় কেন ?

জলসিঞ্চন

বঙ্গীয় জলসিঞ্চন বিভাগের (Bengal Irrigation Deptt) ১৯৩৩-৩৪ সনের বিবরণীতে প্রকাশ, এই বৎসর এই বিভাগে ব্যয় হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা ; এ পর্য্যন্ত এই বিভাগে মোট ব্যয় হইয়াছে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

জল-সিঞ্চন বিভাগের ব্যয়ের ও তদ্বিরের কোন ক্রটী নাই তাহা সত্য। তবে দুঃখ এই যে, বাঙ্গালার জমীর উর্ব্বরাশক্তি প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু কমিয়া আসিতেছে।

পুরাতন নদী

১২ই অক্টোবর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নদীয়া রিভার্স ডিভিসনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মানসিংহ 'পুরাতন নদী-গর্ভে জলসঞ্চালন(Flushing) শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা তৎ তৎ অঞ্চলের স্বাস্থ্যেরও উৎকর্ষ সাধন হয় এবং বাঙ্গালা দেশের মুক্তি—কৃষিগত, স্বাস্থ্যগত এবং অর্থগত—ইহার দ্বারাই হইবে। কিন্তু অর্থাভাবেই কিছু করা সম্ভব হইতেছে না এই প্রবন্ধে সে উল্লেখও আছে।

এই প্রবন্ধটীতে যে চিন্তার খাদ্য আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নদীগুলিকে তাহাদের উৎপত্তি-স্থান হইতে আরম্ভ না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের সমুদ্রের সহিত মিলন-স্থানে অথবা মধ্যের কোন স্থানে সংস্কার করিলে, কোন স্থায়ী ফলের আশা সুদূরপরাহত।

কৃষকের ঋণ

বঙ্গীয় কৃষকের ঋণ-লাঘব বিল সম্পর্কে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বেঙ্গল কাউন্সিলের সেক্রেটারির নিকট যে মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় ঋণবিষয়ক সন্ধিসংস্থাপক বোর্ড দ্বারা বঙ্গীয় কৃষি-সমস্যা সমাধান কি করিয়া হইবে তাহা বুঝা কঠিন। কেন না, কৃষির অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়াই কৃষকেরা ঋণ করে, কৃষকেরা ঋণ করে বলিয়া কৃষির অবস্থা খারাপ হয় নাই।

খুব সত্য কথা। কৃষকের ঋণভার যাহাতে কমিয়া যায় তাহার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের দৈনিক আয় যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৈনিক আয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র ঋণভার কমাইবার ব্যবস্থা করিলে কোন স্থায়ী ফলোদয় হইবে না। কারণ পুনরায় কৃষকের ঋণভারাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে। অধিকন্তু মহাজনগণ যাহাতে অসন্তুষ্ট ও বিপন্ন না হন, তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য করাও গভর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য।

গোপালন

ভারত সরকারের দেওয়া পল্লী-উন্নয়নের টাকা হইতে বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক দেশের ভিতরেই যাহাতে উৎকৃষ্ট গরু মিলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে এই কল্পে বাঙ্গালা সরকারের বাৎসরিক ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা ; দশ বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত ব্যবস্থা সাহায্যে বঙ্গীয় সরকার এই অর্থব্যয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন, আশা করিতেছেন।

জমীর উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের অথবা গরুর উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। কাযেই গভর্ণমেণ্টের এই বিষয়ক ব্যবস্থা ফলপ্রদ হইবে কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

দেশের অবস্থা

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিনাজপুরের যে-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, অকালবৃষ্টির ফলে সেখানে ধানের ক্ষতি হইয়াছে এবং ধান ও পাট দুয়ের বাজারই সেখানে মন্দা।

বহরমপুরের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পত্রে প্রকাশ যে, সেখানে এক জনসভায়, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং সরকার ও জমিদারের খাজানা আদায় বিষয়ে বিবেচনা করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

বগুড়ার ২৫শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জুন কিস্তী খাজানার অনাদায় হেতু বগুড়া কলেক্টরের আদালতে ৭৭টি সম্পত্তি নীলামে উঠিয়াছিল। মাত্র তাহার একটি সরকার কর্ত্তৃক ১৲ টাকায় ক্রীত হইয়াছে।

শুধু এই তিনটি জেলাতেই নয়, দেশের সর্ব্বত্রই কৃষির অবস্থা সমান। কৃষক ও জমীদারের অবস্থাও শোচনীয়। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না পাইলে কৃষকের অবস্থা উন্নত

হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে জমিদারের খাজানা আদায়ের সম্ভাবনাও থাকে না।

পল্লী-উন্নয়ন

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইকনমিক্সে প্রোফেসার বি. এন. ব্যানার্জ্জী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পল্লী-উন্নয়নের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুব্যবস্থা পল্লীসমিতি সংগঠন করিয়া তাহাদিগের নিজের ব্যবস্থা নিজ-দিগকে করিতে বলা, এমন কি ট্যাক্সের ভারও তাহাদের হাতে রাখা। কেন না, সরকারীই হউক বে-সরকারীই হউক—পল্লীবাসীর সদিচ্ছা ও সমর্থন ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কোন প্রতিষ্ঠানই উন্নত করিতে পারিবে না।

এই সকল কথা বক্তৃতায় শুনিতে বেশ। কিন্তু পল্লী-গ্রামের প্রকৃত অবস্থা যাহারা　　　আছেন, তাহারা বলিবেন, দেশে কৃষির অবস্থা খারাপ হওয়ায় পল্লীগ্রামের লোকের অবস্থা অতীব ভীষণ; অস্বাস্থ্যকর বায়ু ও জল পল্লীগ্রামকে শ্মশান করিয়া ফেলিতেছে। সেই পল্লীগ্রামের উন্নতি করিতে হইলে কাজের কাজ কিছু করিতে হইবে।

মাপ-কাঠি

পুণা সার্ব্বজনিক সভায় শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার "ভারতে জাতীয় গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থা (National Rural Economic Policy for India)" শীর্ষে সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ধুয়া লইয়া, আমরাও ফ্যাক্টরি ও কারখানা, ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, রেলরোডের বিস্তার এবং আমদানী-রপ্তানীর অবস্থা দেখিয়া দেশের উন্নতি হইতেছে বলিতে শিখিয়াছি, কিন্তু যেখানে শতকরা নব্বইটী লোক গ্রামে কৃষিসম্বল জীবনযাপন করে, সেখানে এই মাপকাঠি একেবারেই ভুল।

কৃষি কি করিয়া লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামবাসিগণকে 'কৃষি কর' এই কথা বলিলে কোনই ফলোদয় হইবে না।

কৃষক শিক্ষা

পাটনা বি. এন. কলেজে শ্রীযুক্ত পি. কে. সেন কৃষিবিষয়ক অর্থতথ্য-(Agricultural Finance)শীর্ষক একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট কৃষিঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। কোন প্রকারে এই ঋণ পরিশোধ সম্ভব হইলেও, কৃষক যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঋণগ্রহণে প্রবৃদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে মিতব্যয়ী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করা দরকার।

আমরা—শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষালাভ করিয়া যথেষ্ট মিত-ব্যয়ী (?) হইয়াছি! এখন কৃষকদিগকে শিক্ষা দিয়া আমাদের মত মিতব্যয়ী করিতে পারিলে ষোলকলা পূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

কৃষকদল

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ২৬ জন সদস্য মিলিত হইয়া 'কৃষকদল' নামে ব্যবস্থা-পরিষদে একটি নূতন দল গঠন করিয়াছেন। তাহারা পরিষদের সাহায্যে ভারতীয় কৃষকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবেন।

দলগঠনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঠিকই হইয়াছে।

বিদেশ

ইউরোপের কৃষি

লণ্ডনের ১লা অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ—হাউস অব লর্ডের রয়াল গ্যালারিতে ৩১টি দেশ হইতে আগতপ্রায় ২০০ প্রতিনিধি একটি বৈঠকে অন্যান্য বহু সমস্যার সহিত ইউরোপের কৃষি-সমস্যারও আলোচনা করিয়াছেন। চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার নেভিল চেম্বারলেন এই বৈঠকে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গত ৯ বৎসরে পৃথিবীর সমস্যা কল্পনাতীত ভাবে জটিল, এবং বিপদসঙ্কুল হইয়াছে। অবশ্য তিনি এই অবস্থার অচিরাৎ পরিবর্ত্তন আশা করেন।

বৈঠকের শেষে সস্ত্রীক প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

'জটিল ও বিপদসঙ্কুল অবস্থা' বিবেচনার বৈঠক আমোদ-প্রমোদাগারে পরিণত হয় কেমন করিয়া তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত!

ইংলণ্ডের কৃষি

৭ই অক্টোবরের ষ্টেটসম্যানে লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ—কৃষি-মন্ত্রী-বিভাগের হিসাবানুযায়ী গত দুই বৎসর কৃষিজীবী শ্রমিকের বেতনব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

কৃষিজীবী শ্রমিকের বেতনবৃদ্ধিতে কৃষির উন্নতি হইবে ত?

আন্তর্জ্জাতিক কৃষি

লীগ অব নেশন্স প্রকাশিত ১৯৩৪-৩৫ সনের নিখিল বিশ্বের আর্থিক অবস্থা (World Economic Survey) হইতে দেখা দেখা যায় যে, ১৯৩৪ সনে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে শতকরা ৬ ভাগ হ্রাস হইয়াছে।

গতিরোধ না হইলে আরও হইবে!

শিল্প

স্বদেশ

শিল্প-উন্নতি

বাঙ্গালা সরকারের শিল্প-বিভাগের বিবরণীতে (১৯৩৩-৩৪) প্রকাশ, যে-সকল শিল্পের সহিত বহির্জ্জগতের সম্পর্ক—যেমন, পাট,

ভেজিটেবল তৈল ইত্যাদি—সেগুলির অবস্থা মন্দা হইলেও, দেশান্তর্গত ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট শিল্পের অবস্থা এই বৎসরে ভালই ছিল। তুলার বস্ত্র-ব্যবসায়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদির হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভারতে ও জাপানে এ ব্যবসায় ভালই চলিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ১৯৩২ হইতে এই পর্য্যন্ত ৮টি মিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শর্করা-শিল্পেও দেশের উন্নতি হইয়াছে। শিল্প-প্রদর্শনী দল অনেক কাজ করিয়াছে। অটোয়া চুক্তির ফলেও অনেক শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

উন্নতি খুবই হইয়াছে ও হইতেছে, অভাব কেবল অন্নমার বস্ত্রের।

পাটশিল্প

পাটশিল্প বিষয়ে নূতন একটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কলিকাতা রোটারি ক্লাবে "পাট-সমস্যা" শীর্ষক এক বক্তৃতায় ডাঃ এন্‌. নেমেনাই করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাজারের চাহিদার অপেক্ষা পাট-কলগুলির উৎপাদন-শক্তি অনেক অধিক। সুতরাং ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনকে বাধ্য হইয়া তদন্তর্গত মিলগুলিকে কম সময় খাটিবার নির্দ্দেশ দিতে হয়। কিন্তু এসোসিয়েশনের বাহিরের মিলগুলি বেশী সময় কাজ করিতেছিল। বাহিরের কয়েকটি মিলের সহিত এসোসিয়েশনের একটি রফা অনুযায়ী এতদিন কাজ চলিয়াছিল। সম্প্রতি এই রফা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ব্যতীত এ বিপদে গত্যন্তর নাই।

সমস্যা কি কেবল পাটেরই ?

ভারতীয় শিল্প

মহীশূরের এক সংবাদে প্রকাশ, সস্তা হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোনের জ্বালায় মাগাদী গ্রামের সঙ্গীতযন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে।

বাঙ্গালোরে চামড়া শিল্প প্রায় যাই-যাই হইয়াছে।

নিখিল ভারত গ্রাম শিল্প সমিতি বিক্রমপুরের এক গ্রামে হাতে তৈয়ারী কাগজ শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছেন।

রেঙ্গুনে ভারতীয় জাহাজ শিল্পের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সূচিত হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশ।

যুক্তপ্রদেশের সরকার অনুষ্ঠিত তাঁত শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষকে শিল্পপ্রধান ভারত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সুসংবাদ

অমৃতবাজার পত্রিকার নিউ-দিল্লীর সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—গত ৫ বৎসর ধরিয়া দেশে সর্ব্বত্র যে কঠিন অবস্থা দেখা দিয়াছিল, ১৯৩৪-৩৫ সন হইতে তাহার তিরোধান সুরু হইয়াছে।

সংবাদদাতার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক !

বিদেশ

জাপানী শিল্প

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনস্থ ষ্টেটস্‌ম্যানের এক সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—স্থানীয় কৃষকেরা দুরবস্থা বশতঃ স্বদেশীয় শিল্পের মঙ্গল ভুলিয়া সুলভ জাপানী শিল্পের সমর্থন করিতেছে।

দোষ কাহার ? নিউজিল্যাণ্ডের, না জাপানের, না ভাগ্যের ?

বিলাতী কয়লা

'ডিপার্টমেণ্ট অব মাইন্‌স-এর চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিবরণীর মতে ব্রিটিশ কয়লা শিল্পের গত বৎসরের অবস্থা ১৯৬০ সন হইতে বর্ত্তমান সনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খুব ভাল কথা !

ইতালীয় শিল্প

রোমের ৬ই অক্টোবর তারিখের সংবাদ :—ফ্যাসিষ্ট শিল্প-সমিতির জনকয়েক প্রতিনিধি মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছেন যে, যদি বাহির হইতে কাঁচামালের আমদানী বন্ধ হইয়াও যায়, তবু ইতালীর বিশেষ ভয় করিবার কিছুই নাই।

অন্যান্য দেশের শিল্পনায়কগণ কি বলেন ?

শিল্প-উন্নতি

'লীগ অব নেশন্স'-প্রকাশিত সেপ্টেম্বর সংখ্যার মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ :—সমগ্র পৃথিবীর শিল্প-উন্নতি ১৯৩৪ সালে শতকরা ৯ ভাগ বাড়িয়া ১৯২৯ সালের উন্নতির শতকরা ১৪ ভাগ কমে আসিয়া ১৯৩৫ সনে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

ততঃ কিম্ ?

সমরসজ্জা ও বেকার

লণ্ডনের ১৩ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ :—হিটলারের ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী এবং নাৎসি দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হের গ্রেগর ষ্ট্রাসের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রের প্যারিস্থিত সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন—জার্ম্মেনীর সমরসজ্জা শেষ হইলেই ১০।০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইবে।

সমরসজ্জা চিরস্থায়ী হইলে বেকার সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব !

শিল্প-নিমন্ত্রণ

লণ্ডনে ১৯৩৬ সনে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ব্রিটিশ পণ্যের যে মেলা বসিবে, সরকার কর্ত্তৃক সেই প্রদর্শনীতে ভারতীয় মাল পাঠাইবার নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

চেষ্টার ত্রুটি নাই, এ জন্য ভারত কৃতজ্ঞ।

ব্যবসা-বাণিজ্য

অটোয়া চুক্তি

ভারত সরকারের ১৯৩৪-৩৫ সনের অটোয়া চুক্তির কার্য্যবিবরণী তৈয়ারী হইয়া ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ হইয়াছে। আগামী অধিবেশনে ইহার আলোচনা হইবে। ষ্টেটস্‌ম্যানের মতে—এই রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যে লাভ হইতেছে এবং ব্রিটিশ বাজারে যে সকল পণ্যদ্রব্যের অপেক্ষাকৃত সমাদর (preference) লাভ করিবার কথা, ১৯৩৪-৩৫ সনের রপ্তানী-বাণিজ্যের শতকরা ৬২ ভাগ সেই সকল দ্রব্যের জন্য।

লাভ ত হইতেছে কিন্তু লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় কৈ ?

স্বর্ণ-রপ্তানী

ব্যবস্থা-পরিষদের স্বর্ণ-রপ্তানীর এক প্রস্তাব আলোচনায় সম্পর্কে ফিনান্স সেক্রেটারি মিঃ পি. সি. টালেন্টস বলিয়াছেন :—স্বর্ণ-রপ্তানীতে ভারতবর্ষের ৩৮ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে।

ভারতের ভাগ্য ভাল বলিতেই হইবে !

ব্যবসায়-শিক্ষা

ত্রিবেন্দ্রামে এক মানপত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত জে. ই. এ. পেরাইরা বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবসায়িগণের পাশ্চাত্যে গিয়া সেখানকার আধুনিকতম ব্যবসায়-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া আসা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় এই শ্রেণীর লোকের উদ্দেশেই বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের কুকুর হইতে পণ্ডিত সকলেই পূজ্য।

বণিক সঙ্ঘ

স্পেশাল টারিফ বোর্ড সংক্রান্ত ভারত সরকারের কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে ভারতীয় বণিকসঙ্ঘের কমিটি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বোর্ডে ভারতীয় ব্যবসায়ীকে স্থান না দেওয়ায় প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বোর্ডে ভারতবাসীকে স্থান দিলেই যেন সব সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া যাইত !

আমদানী-রপ্তানী

করাচী বন্দরে গত সেপ্টেম্বর মাসে ১ ২৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য দ্রব্যের আমদানী এবং ৯১ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর হইতে আমদানী ১৮ লক্ষ টাকা কম এবং রপ্তানী ২১ লক্ষ টাকা বেশী।

হিসাবনিকাশে সব পরিষ্কার !

নরউইচ ও ভারতবর্ষ

গত ২রা অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের নরউইচ ও পূর্ব্বাঞ্চলের দোকানী-পশারীদের এক প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতবর্ষের হাই-কমিশনার স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়াছেন :—নরউইচের প্রধান শিল্প 'মাষ্টার্ড' ও জুতা ভারতবর্ষ সরিষার বীজ ও যাবতীয় প্রকারের চামড়ার রপ্তানী করে ; সুতরাং নরউইচ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পরস্পর দুই দেশেরই উপকার সাধন করিতে পারেন।

এইবার তাঁহারা বিজয়ার কোলাকুলি করুন।

ভারতের অবস্থা

গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ইণ্ডিয়ান, বার্ম্মা ও সিলোন নিউজ-পেপার্স লিমিটেডের এক ভোজ-সভায় মাকুইস অব জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন :—ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা ভাল হইতেছে কিন্তু ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে এখনও কৃষ্ণছায়া দেখা যায়।

পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়, পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার !

সম্রাটের বাণী

লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতিক পার্লামেণ্ট সমূহের বাণিজ্য-বৈঠকের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সম্রাট নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেন :—বর্ত্তমান সময়ে অর্থনীতিক দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণের ইঙ্গিত যখন পাওয়া যাইতেছে, এই বৈঠকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাতে পরিস্ফুট হয় যে, বিচ্ছিন্ন হইয়া নহে, সহযোগিতার দ্বারাই উন্নতি সম্ভব।

সম্রাটের শুভেচ্ছা পূর্ণ হউক !

রাজ্য-শাসন

অন্তরীণ ও বাঙ্গালা সরকার

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় লাট সাহেবের ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অন্তরীণদের নিমিত্ত তিনটি কৃষি এবং ১৪টী শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য সূচনা করিতে মানস করিয়াছেন। কৃষি অপেক্ষা শিল্পের প্রতি প্রথমে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে, শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে শিল্পের প্রতি অনুরাগ অধিক। এই সামান্য কেন্দ্রগুলিই যে বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে সমগ্র দেশের বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে পারে—প্রকাশিত সংবাদে তাহার উল্লেখ আছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের এই চেষ্টাকে সমর্থন করিয়াছেন।

সরকার অন্তরীণদের কল্যাণ কামনা করেন তাহা বেশ বুঝা যায় ; কিন্তু কৃষিকে কোণঠাসা করিয়া শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা কতখানি কল্যাণকর হইবে তাহা চিন্তার বিষয়।

সৈন্যদল ও ভারতীয় করণ

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কাউন্সিল অব ষ্টেটে সৈন্যদলকে ভারতীয় করণসূচক একটি বক্তৃতায় স্যর ফিলিফ চেটউড বলেন :—সৈন্যদলকে ভারতীয়করণে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ভারতীয়দের মধ্য হইতে 'অফিসার' হইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া দরকার, কিন্তু যে শ্রেণীর

লোক পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার অপ্রসন্ন হইবার কারণ আছে।

তবে না হয় ভারতবর্ষ কাটা-সৈনিকের ভূমিকাই অভিনয় করুক! ভারতবাসীর পায়ে আধুনিক মতে কুচ-কাওয়াজ ভাল মানায় না, ইহা আমাদেরও ধারণা।

রেলের ক্ষতি

অর্থসচিব স্যর জেমস গ্রীগ ব্যবস্থা-পরিষদে সাধারণ আয়-ব্যয়ের বিবরণী পেশ করেন। ভারতীয় রেলসমূহের ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া এই বিবরণীতে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য বিশেষ কারণ দেখান হইয়াছে।

ক্ষতি নিবারণের উপায় কি?

দেশান্তর আইন

ভারতীয় দেশান্তর গমন আইনের (১৯২২) ১৯৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, কর্ম্মনিয়োগ আশায় বহুলোক সিংহলে গিয়াছে, তন্মধ্যে ৮৮৮০৮ জন এমিগ্রাণ্ট ও ৫১৭৯৯ জন নন-এমিগ্রাণ্ট। ইহাদের অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতের তামিল অঞ্চলের কৃষিজীবী শ্রমিক, তন্মধ্যে ত্রিচিনপল্লীর লোকই ৩৬০০০।

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি চিরকাল বিদেশীকে ভারতবর্ষে আকৃষ্ট করিত; এখন অন্নের আশায় ভারতবাসীকে বিদেশে ছুটিতে হইতেছে।

ফৌজদারী আইন সংশোধন

১৯০৮ সনের ফৌজদারী আইন সংশোধন আক্ট বাতিল করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত বি, দাস আনীত প্রস্তাব ৭২ বনাম ৬০ ভোটে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বড়লাট উহা বিশেষ ক্ষমতা সাহায্যে পুনরায় বলবৎ রাখিয়াছেন।

জনগণ-প্রতিনিধিবর্গ যাহা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু থাকিতে পারে না; আবার সরকার যাহা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা যে কিছু নাই ইহাও বলা যায় না। কিন্তু জনমত ও সরকারী মতের সামঞ্জস্য বিধান কবে সম্ভব হইবে?

নূতন লাট

ভারতবর্ষের নব-নিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড লিংলিথগো ১৮ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের এক পশারী প্রদর্শনীর ভোজ-সভায় বলিয়াছেন:— কিছুদিনের মধ্যেই আমি ভারতে যাইতেছি, সেখানে আমাকে শাসন-কার্য্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ইহা বহু বৎসরের বহু পরিশ্রম ও ক্রমোন্নতির ফল; বিভিন্ন জাতি, বর্ণ এবং বিভিন্ন রাজনীতিকবর্গ সকলে মিলিয়া এই পরিবর্ত্তনের জন্য খাটিয়াছেন।

শুভমস্তু।

বিবিধ

ডক্টর আম্বেদকর ও হিন্দুসমাজ

গত ১৩ই অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ: নাসিক জেলার য়েওলা নামক স্থানে ডাঃ আম্বেদকারের উপদেশানুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, হিন্দুগণের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যে ধর্ম্মে সেই ধর্ম্মাবলম্বী সকল ব্যক্তির সহিত সমপদমর্য্যাদা ও আচরণলাভের প্রতিশ্রুতি পাইবে অনুন্নতগণ সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

এই প্রস্তাবে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু নেতাদের মনে একটা আশঙ্কার ভাবও দেখা দিয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডাঃ আম্বেদকারকে নিষেধবাণী পাঠাইতেছেন, তাঁহাদের অনেকের কথার মধ্যে ডাঃ আম্বেদকারকে উৎকোচ দিবার ভাবও বর্ত্তমান। অপরাধী যখন অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

উন্নত-অনুন্নত এই সকল সাম্প্রদায়িক আখ্যা বর্ত্তমান হিন্দু 'সম্প্রদায়ে'র সৃষ্টি। এই সম্প্রদায় যে বিরাট ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ, তাহা কখনও মানুষের শ্রেণীবিভাগ করে নাই বরং সর্ব্বজীবের সমতা উপলব্ধি করিয়াছিল। আমাদের মতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা সেই ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের সাদৃশ্য অধিক। সুতরাং ডাঃ আম্বেদকারের এই কাজে দোষ দিব কিরূপে?

তবু ডাঃ আম্বেদকারকে আমরা বলি, তাঁহার এই চোখের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাইবার মতি কেন? পৈত্রিক ভিটায় দুই ভায়ের সমান অধিকার; কে ছোট কে বড়, তাহার বিচার হইবে পৈত্রিক ভিটার মর্য্যাদারক্ষার সামর্থ্যে। এই সামান্য কথাটি কি ডাঃ আম্বেদকার এবং তাঁহার অনুগতবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন? অধিকন্তু যে প্রতিশ্রুতি পাইলে তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন ঘোষণা করিয়াছেন, সে প্রতিশ্রুতি দিবে কে এবং দিলেও তাহার মূল্য কি?

ফৌজদারী আইন ও দেশীয় পত্রিকা

বড়লাট কর্ত্তৃক ফৌজদারী আইন সংশোধন আক্ট সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহৃত হওয়ায় ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় এবং অন্যত্র অনেক ভারতীয় পরিচালিত দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই।

ইতালী ও আবিসিনিয়া

৩রা অক্টোবর তারিখে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ: ইতালী ও আবেসিনিয়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে।

বলি ও অনশন

রামচন্দ্র শর্ম্মা নামে এক জয়পুরী ব্রাহ্মণ কালীঘাটে পাঁঠা বলি বন্ধ করিবার জন্য অনশন করিতেছিলেন। ৩২ দিন অনশনের পর গত মহানবমীর রাত্রে তিনি অনশন ত্যাগ করেন।

শোক সংবাদ

যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

কলিকাতার বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক আমাদিগের বিশিষ্ট বন্ধু যতীন্দ্রনাথ মৈত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মৈত্র মহাশয় স্বীয় ব্যবসায়ে যেমন প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরহিতেও তিনি তেমনই অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেসের কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সদালাপী, অমায়িক, পরহিতব্রতী সজ্জন নাগরিক হিসাবে শহরে তাঁহার অসীম খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখানুভব করিতেছি।

মনোমোহন পাঁড়ে

মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। পাঁড়ে মহাশয় থিয়েটার করিয়া ধনশালী হইয়াছিলেন, তাঁহার সদ্ব্যয়ের সংখ্যা করা যায় না। বৎসর দুই পূর্ব্বে কাশীধামে একটি বিরাট ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তীর্থযাত্রী-দিগের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল; বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার অর্থ সাহায্যের বলে উন্নত ও সংস্কৃত হইয়াছিল। পাঁড়ে মহাশয়গণ মূলতঃ বাঙ্গালী না হইলেও বঙ্গদেশকেই মাতৃভূমি বলিয়া জানিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর পিতা স্বর্গতঃ বীরেশ্বর পাঁড়ে রচিত বাঙ্গালা ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি এক সময়ে বঙ্গদেশে আদরলাভ করিয়াছিল।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে বাঙ্গালীমাত্রের বুক গর্ব্বে স্ফীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ যেমন এদেশের রাজনীতির জন্মদাতা বলিয়া পূজিত, দুর্ব্বল জাতির মধ্যে বীর ও শক্তিধর বলিয়া তাঁহারই অনুজ জিতেন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র সম্মানিত। এই বঙ্গগৌরব জিতেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ছেলেদের দৈহিক শক্তি চর্চ্চার চেষ্টা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, সেই ব্রত সাধনোদ্দেশে তিনি লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মার সদ্গতি ও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় হউক।

অপরাধ-প্রবণতা

গত মাসে কয়টি প্রদেশের—বাঙ্গালা, দিল্লী, বিহার-উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বোম্বাই – শাসন-বিবরণীর সার সংগ্রহ করিয়া ভারত-ব্যাপী অপরাধবৃদ্ধির পরিচয় দেখান হইল।

বাঙ্গালা :—সামান্য সামান্য অপরাধের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২ শত ৪৮ হইতে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২ শত ৯১ এ নামিলেও বিশেষ ও মারাত্মক অপরাধের সংখ্যা ৬৭ হাজার ৬ শত ৬৬ এবং ৪৩ হাজার ৩৩ হইতে যথাক্রমে ৭০ হাজার ১ শত ২৮ এবং ৪৫ হাজার ২ শত ২৮ হইয়াছিল। খুন, ডাকাতি ও দস্যুতার সংখ্যা ৬০৯, ১৫১৮ ও ৬৪৯ হইতে ৫৩৪, ১২৮০ ও ৬৩০এ নামিয়াছিল।

দিল্লী :— ১৯৩৩ সনে বিশেষ অপরাধের সংখ্যা ১২০০০ ও ৮৮১৬; ১৯৩২ সনে ছিল ৭২৭৮ ও ৬৫২৮। অপরাধ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, নারীসংক্রান্ত অপরাধ, বাজে কোম্পানী এবং চাকুরীদাতা এজেন্সী ইত্যাদির অপরাধমাত্রা বিশেষ বাড়িয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশ :—১৯৩৪ সনে ৬০টি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, ১৯৩৩ সনে ছিল ৮। ১৯৩২ ও ৩৩ সনের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলেও ১০৩৪ সনের সাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ১৯২৮ সন অপেক্ষা ৪০০ অধিক। ৮টি স্ত্রীলোক নিজেদের শিশুহত্যার নিমিত্ত দণ্ডিত হইয়াছে। সিঁদ চুরি ও শুধু চুরির সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে।

বোম্বাই :— ফৌজদারী অপরাধের সংখ্যা ১৯৩৪ সনে, ১৯৩৩ সন অপেক্ষা ২৩১৬৫ অধিক।

পাঞ্জাব :— ১৯৩৪ সনে ১৯৩৩ সন অপেক্ষা অপরাধ অধিক সংঘটিত হয়। ১৯৩৪ সনে নরহত্যার সংখ্যা ৮৭৫; ১৯২৪ সনের হিসাব অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ বেশী।

নীচে ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত 'ষ্টেট্সম্যান' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে দৈনিক প্রকাশিত মারাত্মক অপরাধ সমূহের সংবাদের একটি মোটামুট শ্রেণী বিভাগ করিয়া, তাহাদের সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

	আত্মহত্যা	ডাকাতি	স্ত্রীলোকসংক্রান্ত	নরহত্যা	দাঙ্গাহাঙ্গামা
২৫শে সেপ্টেম্বর	৭	২৫	৬	৭	৫
২৬শে "	২	১	৩	×	১
২৭শে "	×	১	×	১	×
২৮শে "	×	×	×	৫	×
২৯শে "	×	×	১	২	১
৩০শে "	১	×	×	২	×
১লা অক্টোবর	২	১	১	১১	১
২রা "	×	২	২	৪	১
৩রা "	×	১	২	৮	১
৪ঠা "	২	×	১	৫	×
৫ই "	×	১	×	১	×
৬ই "	×	×	×	৬	১
৭ই "	×	১	×	×	×
৮ই "	×	১	×	২	১
৯ই "	১	×	×	৬	১
১০ই "	১	১	×	৪	২
১১ই "	১	৪	×	৫	×
১২ই "	১	×	×	২	×
১৩ই "	×	৪	×	১০	৪
১৪ই "	×	১	×	৫	×
১৫ই "	১	×	২	২	×
১৬ই "	×	১	১	৬	১
১৭ই "	৪	১	২	৪	×
মোট ২৩ দিন	২৩	৪৬	১৮	৯৫	

বিজয়ার শুভ সম্ভাষণ

"বঙ্গশ্রী"র পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন-দাতা, বিক্রেতা, সকলকে আমরা বিজয়ার অভিনন্দন ও আলিঙ্গন জ্ঞাপন করিতেছি। জগন্মাতা সকলের কল্যাণবিধান করুন, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের কামনা।

গত কয়েক মাস হইতে "বঙ্গশ্রী" জনসমাজে যথেষ্ট আদর-লাভ করিয়াছে, "বঙ্গশ্রী"র বিক্রয়াধিক্যই তাহার প্রমাণ। "বঙ্গশ্রী" যে উদ্দেশ্য লইয়া বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে সমাগতা হইয়াছে, বঙ্গদেশবাসীর নিকট তাহার সমাদর হইবারই কথা। তাহারই সূচনা দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হইতেছি এবং পাঠকসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যেমন খুসী তেমন

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'আপরুচি খানা, আর পররুচি পরনা'। কথাটা খাঁটি; ব্যাপারটা এই রকমই হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত খাদ্য ও পানীয় বেছে নিয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী তা তৈরী করিয়ে গ্রহণ করে থাকি। আহার ও পানীয়ের ব্যাপারে 'আপরুচি খানা'র নীতিই অনুসৃত হয়ে থাকে; সে নীতি থেকে একচুল কেউ নড়তে রাজী নয়।

যেমন কেউ কেউ হাল্কা চা খেতে ভালবাসে। কেউ ভালবাসে কড়া। কেউ চায়ে প্রচুর দুধ ও চিনি মিশিয়ে খায়, কেউ বা দুধ দেয়, চিনি একেবারে বাদ দিয়ে। চিনি ও দুধ কিছুই না দিয়েও অনেকে চা পছন্দ করে। আর সব উপকরণ সম্বন্ধে রুচিভেদ যতই থাক, চা সম্বন্ধে অনুরাগের তারতম্য কোথাও নেই। সকল রকমের রুচিকে তৃপ্ত করতে চায়ের মত আর কোন পানীয় পারে না। নিজের খুসী মত যেমন ভাবে ইচ্ছা চা তৈরী করা যাক না কেন, পানীয় হিসাবে তার বিশেষ গুণ ও উপকারিতার কোন তফাৎই হবে না। আসল জিনিষ হ'ল চা—সেইটিই সকলের কাম্য; তার অনুপাণ কি হ'ল না হ'ল সেটা বাহ্যিক। মিষ্টি করে চা খাওয়া যার অভ্যাস, কোন সময়ে হাতের কাছে দুধ চিনি না পেলে চা খাওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত রাখবে এ কথা ভাবা ভুল। যথা সময়ে পেলে দুধ চিনি বাদ দিলেও চায়ের পেয়ালা সে সমান আগ্রহে গ্রহণ করবে।

দুধ ও চিনি দিয়ে খাওয়াই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রচলিত রীতি। কিন্তু চা খাওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। পানীয় হিসাবে চা যত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, নানা নতুন ধরণে তা পান করবার পদ্ধতিও তত লোকে খুঁজে বার করছে। দেহ ও মনের তেজস্কর পানীয় হিসাবে চা যদি গ্রহণ করা যায়, তা হ'লে দুধ বা চিনি বাদ দিলে তা উপভোগের কোন দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় বলে মনে হয় না। এক পেয়ালা চা, সামান্য 'সুতার' করবার জন্যে একটু টাটকা নেবুর রস দিয়ে পান করেই আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের পক্ষে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা চা আদর্শ পানীয়। ঠাণ্ডা চা তৈরী করা অত্যন্ত সহজ। আধ সের জলের জন্য দু চামচ চা নিলেই হবে। যথারীতি চা তৈরী করে, একটি পাত্রের ভেতর বরফের ওপর সেই গরম চা ঢালতে হবে। তার পর পছন্দমত দুধ ও চিনি মিশিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হবার পর সে চা পান করা উচিত।

চা যে রকম ভাবে ইচ্ছা তৈরী করে পান করা যায়, শুধু আসল জিনিষটি যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব হয়, কারণ ভারতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর চা কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহের বলে এই কলিকাতা নগরীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য:—(১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা প্রচার; (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং অসহায়া মহিলাদিগকে আশ্রয়দান এবং জীবন-ধারণোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাদান; এবং (৩) আদর্শ নারী-জীবন-যাপনের পথে সহায়তা করা। সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে এবং ব্রহ্মচর্য্য বিধি নিয়মে আশ্রমটী পরিচালিত হয়। আশ্রমের সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রীনিবাস এবং একটী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। শিক্ষাদান এবং আভ্যন্তরীণ কার্য্য-পরিচালনার ভার উপযুক্ত নারীকর্ম্মিসঙ্ঘের উপর সম্পূর্ণ-ভাবে ন্যস্ত। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে—আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষা সমাজ এবং ধর্ম্মমূলক এই নারী-শিক্ষাশ্রমটী এযাবৎ একান্ত স্থির এবং অনাড়ম্বরভাবে সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন একটা সময় আসিয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আর আমাদের কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় এবং ইহার কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসারলাভ করে তাহা আমাদের করিতে হইবে। মাতাজীর অনুমতি লইয়া দেশবাসী সকলের নিকট আমাদের নিবেদন জানাইতেছি যে—আমাদের অসহায়া মাতা ও ভগিনীগণের দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ হয় তাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আশ্রমের সাহায্য করুন। তাঁহাদের এই ত্যাগ দেশবাসী, তথা নিখিল জগতের কল্যাণকামী ভবিষ্যযুগের সহৃদয় নরনারীগণ অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন।

অতি সামান্য সাহায্যও সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, বি-এ, সাংখ্যতীর্থা, সম্পাদিকা, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬নং রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বীরবালা

শিল্পী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাবৃত্তি

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের অথবা শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত জগতের বর্ত্তমান সমস্যা প্রধানতঃ তিনটী, যথা :—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব ;

(২) শিক্ষিত যুবকদিগের ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি ;

(৩) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতার জন্য যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিব্রত, তাঁহাদের মধ্যে উকিল, ব্যারীষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়িগণ, চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ এবং বণিকগণের নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত দুরবস্থার কারণ তেরটী, যথা :—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity) ;

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and sub-ordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, দুরবস্থার এই তেরটী কারণের উদ্ভব হইয়াছে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রটী ও বিচ্যুতি হইতে এবং যদিও বিদেশীগণ আমাদের ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিবার কোন সুসঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কি উপায়ে আমাদের উপরোক্ত দুরবস্থা দূর করা যাইতে পারে তাহা বর্ত্তমান সংখ্যার আলোচ্য।

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার উপায় ও তৎসম্বন্ধীয় মূলসূত্র

রোগের কারণ অপসারিত হইলেই রোগ প্রশমিত হয় এবং আরোগ্যলাভ করা যায় ইহা চিরন্তন সত্য। তদনুসারে, আমাদের দুরবস্থার যে তেরটী কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অপসারিত করিতে পারিলেই আমাদের দুরবস্থা দূরীভূত হইবে এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার যথার্থ মনুষ্যনামের যোগ্য হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে।

কাযেই যদ্দারা আমাদের দুরবস্থার তেরটী কারণ অপসারিত করিতে পারা যায় তাহাই হইবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাপূরণের মূলসূত্র।

আমাদের দুরবস্থার তেরটী কারণ অপসারিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ঐ ঐ কারণ নির্ম্মূল করিবার পদ্ধতি কি কি (method of removing the causes) এবং দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, যে-পদ্ধতিতে ঐ ঐ কারণ নির্ম্মূল করা যায়, তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা কি কি, (practical means of applying the methods for the removal of the causes)।

ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ নির্ম্মূল করিবার পদ্ধতি (Method of removing the causes of distress)

যে তেরটী কারণের জন্য ভারতবাসী অথবা মনুষ্যসমাজ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম কারণ (অর্থাৎ জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস) সম্বন্ধীয় আলোচনা "কৃষি"-বিষয়ক।

দ্বিতীয় (পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব), তৃতীয় (জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব), চতুর্থ (চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের মজুরীর সাদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবস্থার অভাব), ষষ্ঠ (বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব), এবং সপ্তম কারণ (জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ উপার্জ্জন একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থার অভাব) সম্বন্ধীয় আলোচনা "বাণিজ্য"-বিষয়ক।

পঞ্চম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ এবং ত্রয়োদশ কারণ সম্বন্ধীয় আলোচনা "শিক্ষা"-বিষয়ক।

দ্বাদশ কারণটী (অর্থাৎ জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব) "শাসন"-(administration)-বিষয়ক।

কাযেই ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ নির্ম্মূল করিতে হইলে বর্ত্তমান কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া তাহাদের কোথায় ভ্রম আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-বিভাগের পরিচালনা-প্রণালী যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ফল কিরূপ হইয়াছে তাহার পরীক্ষার দ্বারা বৃক্ষটীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচয় প্রকাশ হইয়া থাকে*—ইহা একটী প্রাথমিক সত্য।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন বিষয়ক কারণে প্রজার দুঃখের উদ্ভব হইয়াছে, তখন ঐ ঐ বিষয়ের জ্ঞানে এবং পরিচালনায় যে ভ্রম আছে, তৎসম্বন্ধে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। তাহার পর যখন জানা নাই যে, ঐ ঐ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞান ও পরিচালনার নিয়মের মধ্যে কোন্‌টী ভ্রমাত্মক এবং কোন্‌টী ভ্রম-পরিশূন্য, তখন তৎ তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক জ্ঞান ও পরিচালনার নিয়ম পুনঃ পরীক্ষা ও পুনঃ সংস্কারযোগ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সারা ভারতবর্ষের প্রতিবিঘা জমীর উর্ব্বরাশক্তির যে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু হ্রাস হইতেছে তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির বাৎসরিক কৃষি-বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কোন জমীর বাৎসরিক উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কয়েক বৎসর ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে

* ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে।

পারা যায়। কেন যে জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইতেছে তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমতঃ উর্ব্বরাশক্তি কাহাকে বলে এবং দ্বিতীয়তঃ জমী যাহাতে উর্ব্বরাশক্তি পায়, তজ্জন্য প্রকৃতি দেবী কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় কি কি কথা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত জ্ঞানসমূহকে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে :—

(১) বৈদিক ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(২) হিন্দুদিগের * জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৩) বৌদ্ধদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৪) খৃষ্টানদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৫) মুসলমানদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৬) গ্রীকদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৭) রোমানদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
(৮) আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক।

ইহা ছাড়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে প্রাচীন মিশরবাসী, ফিনিসিয়ান এবং চীনাগণের একটা প্রকাণ্ড জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিচয় আছে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত মর্ম্মে একটা মন্তব্যমাত্র প্রকা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মন্তব্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইতে ঐ ঐ জাতির উল্লেখযোগ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক কোন প্রাচীন ধারাবাহিক গ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। কাযেই জমী অথবা কৃষি-বিষয়ক কোন বিজ্ঞান প্রাচীন মিশরবাসী, ফিনিসিয়ান এবং চীনাগণের ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, গ্রীক এবং রোমানদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও কোন পুস্তকে উর্ব্বরাশক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার প্রাকৃতিক নিয়ম কি, তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেবলমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু কিছু আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার প্রবর্ত্তক বিখ্যাত চার্লস্ রবার্ট ডারউইন *।

ডারউইনের পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লভেল এবং লিলিও এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন।*

ইঁহারা প্রত্যেকেই উদ্ভিদ ও জীব কি করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু জমীর উর্ব্বরাশক্তি কাহাকে বলে এবং প্রাকৃতিক কোন্ নিয়মবশতঃ জমী উর্ব্বরাশক্তি লাভ করে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে মৃত্তিকার (soil) উপাদান (ingredients) দুই শ্রেণীর ; যথা—

(১) খনিজ পদার্থ (mineral matter) অর্থাৎ বালু, এঁটেল কর্দ্দম (clay) এবং চূর্ণজ অঙ্গার (carbonate of lime)।
(২) উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসোৎপন্ন ধাত্বিক পদার্থ (organic matter or humus resulting from the decay of plant and animal material)।

কোন্ জমীতে কতটুকু বালু, কতটুকু কর্দ্দম,

* যদিও বৈদিক ঋষিগণের সন্তান হিন্দু বলিয়া পরিচিত এবং হিন্দুগণ তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঋষিদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তথাপি আমি হিন্দুদিগের বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বৈদিক ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করি। তাহার কারণ, যে ভাষায় ঋষিদিগের মূল বেদ, দর্শন, মীমাংসা, পুরাণ, সংহিতা, স্তোত্র এবং কবচাদি লিখিত, তাহা বর্ত্তমান হিন্দুদিগের অপরিজ্ঞাত এবং তাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ক কোন প্রাচীন গ্রন্থের কোন মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা ত দূরের কথা, কোন ভাষ্যের বিনা সহায়তায় ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম। এক্ষণে যাহা বৈদিক ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচলিত তাহা মূলতঃ পরবর্ত্তী ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র এবং স্বামী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের স্বকপোল কল্পিত কথা। কাযেই, ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র এবং স্বামী প্রভৃতির ভাষ্য ও মৌলিক গ্রন্থগুলিকে পৃথক্ ভাবে হিন্দুদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক বলা যাইতে পারে।

* চার্লস্ রবার্ট ডারউইনের এই বিষয়ক পুস্তকের নাম—The Variation of Plants and Animals under Domestication। ইহা ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয়।

* লভেলের পুস্তকের নাম—The Flower and the Bee। ইহা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। লিলির পুস্তকের নাম—Problems of Fertilization। তাহাও ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

কতটুকু চূর্ণজ অঙ্গার এবং কতটুকু যান্ত্রিক পদার্থ (humus) আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার পরিচয়ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু কোথা হইতে, কি উপায়ে, কোন্ নিয়মে জমীতে বালু, কর্দ্দম, চূর্ণজ অঙ্গারের উৎপত্তি হয় এবং জমী কেন শস্যপ্রসবিণী হয়, তাহার কোন আলোচনা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য ও মার্কিন জাতিগণের কৃষিসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে অন্তঃসারশূন্য, তাহা ঐ ঐ জাতির কৃষকদিগের দুরবস্থা এবং উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজনানুরূপ কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অনেকে মনে করেন, ফরাসী, জার্ম্মান, রাশিয়ান এবং মার্কিনগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশীয় কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার বিবেচনানুসারে ইহা একটী মতবাদ মাত্র এবং কার্য্যতঃ অর্থহীন।

কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইলে কৃষকগণ স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়। যে দেশে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, সেই দেশে কৃষকের অন্নাভাব ও বেকার সমস্যা থাকিতে পারে না। যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, জগতের কোন দেশেই এখন আর শ্রমজীবীকৃষক স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যেক দেশেই কৃষকের অন্নাভাব রহিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যাও যথেষ্ট, তখন কোন দেশে প্রকৃত ফলপ্রসূ কৃষি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রহিয়াছে ইহা মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

প্রকৃত (আ-মূল) কৃষি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণের গ্রন্থে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ সাধ্যমত অধ্যয়ন করিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে, তদনুসারে বলিতে হয়, প্রায় ধার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আরাধ্য, দেবোপম ঋষিগণ প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে সারা জগতের জমীর উর্ব্বরাশক্তির যাহাতে উন্নতি সংঘটিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সাধারণকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের প্রত্যেক কৃষক কিছুদিন পূর্ব্বেও স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান তখন প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই সমাজের অধিকাংশ লোক তখন কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত এবং কৃষকের উপর ও কৃষিজাত দ্রব্যের বণিকের উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট লোকেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতীয় ঋষির এই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসী সহস্রাধিক বৎসর হইতে রাষ্ট্র-পরিচালনায় পরাধীন হইলেও সেদিন পর্য্যন্ত আর্থিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। জগতে বর্ত্তমানে আমরা যাঁহাদিগকে সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী জাতি অথবা দেশ নাই—যাহাদের উদরান্নের জন্য ভিন্ন জাতির দ্বারস্থ হইতে হয় না, অথবা কিছু না পাইয়াও অপর জাতিকে কিছু দান করিলে যাঁহারা বিপন্ন হন না।

বিনিময়ে কিছু না পাইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে দিবার সামর্থ্য ছিল একমাত্র আমাদের ভারতমাতার। আমাদের মা-র যে সামর্থ্য হইয়াছিল তাহা আর কোন দেশের হয় নাই। আমাদের মা-র সন্তানগণের উদরান্নের জন্য কোন দিন কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। অধিকন্তু মা আমাদের অন্যান্য দেশের সন্তানগণকে চিরদিন অন্ন বিতরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছেন। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে এখনও জগতের প্রত্যেক জাতি ধনোপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য দেশকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন কেন? অতি পুরাকাল হইতে যদি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাভাজন না হইত, তাহা হইলে নবম শতাব্দীতে যখন ইয়োরোপীগণ প্রথম অন্নাভাবগ্রস্ত হইয়া বিদেশে গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তখন জগতের অন্যান্য দেশের কথা স্মরণ না করিয়া একমাত্র ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন?

ভারতবর্ষ যে জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা একটু ভাবুকতার সহিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের এই সর্ব্বোচ্চতা কাহার দান অথবা কাহার সংগঠনের

ফল, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিকগণ অথবা সন্ন্যাসীগণ, অথবা ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্যকারগণ ভারতবর্ষের এতাদৃশ উন্নতি বিধান করেন নাই।

অভূতপূর্ব্ব অথবা বর্ত্তমান বুদ্ধির কল্পনাতীত ঐ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা। ঐ উন্নতির বিকৃতি প্রথম সাধিত হইয়াছে তান্ত্রিকগণের হস্তে এবং ঐ বিকৃতির পূর্ণতা ঘটিয়াছে তথাকথিত সন্ন্যাসীর হস্তে। এই বার হাজার বৎসরের মধ্যেই আর একবার ভারতবর্ষ প্রায়শঃ বর্ত্তমান কালের মতই বিপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে যেরূপ সার্ব্বজনীন উদরান্নের ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার ক্লেশের মাত্রাও খুব কম হয় নাই। তখন ভারতবর্ষকে অথবা জগৎকে আংশিক ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। কি করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তাহার কোন উপদেশ বুদ্ধদেবের কথায় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হইলে, হয় ত ভারতবর্ষ বর্ত্তমান অন্নাভাবজনিত দুরবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাঁহার কথাগুলি না বুঝিতে পারিয়া ঐ কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া জনসাধারণের অবজ্ঞার বিষয় করিয়াছেন। ব্যাসদেবের বিরোধী একটী কথাও বুদ্ধদেবের মূল উপদেশে পাওয়া যায় না। পরন্তু ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের প্রায় প্রত্যেক কথা ব্যাসদেবের বিরোধী। যে শঙ্করাচার্য্যকে আজ জনসাধারণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন, তিনি আগাগোড়া ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির রচয়িতা ব্যাসদেবের বিরোধী কথা জনসাধারণকে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেব আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, জগৎই "শাশ্বত"—

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥
গীতা, ৮ম অঃ—২৬॥

অথচ শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২১॥
ব্রহ্মনামাবলীমালা।

ব্যাসদেব বলিতেছেন, জীবের জীবন অবিনশ্বর—

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত। ইত্যাদি॥
গীতা, ২য় অঃ—৩০॥

অথচ শঙ্করাচার্য্য তাহাকে "চপল" বলিয়া আখ্যাত করিতেছেন—

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্। ইত্যাদি।
মোহমুদ্গর—৪র্থ শ্লোক॥

ব্যাসদেব বলিতেছেন ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিবার অন্যতম উপায় "অর্থার্থী" হওয়া—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
গীতা, ৭ম অঃ—১৬॥

অথচ শঙ্কর অর্থকে অবজ্ঞেয় বলিয়া তাহা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্। ইত্যাদি।
মোহমুদ্গর—১৩শ শ্লোক॥

মানুষ যাহাতে তথাকথিত সন্ন্যাসী না হইয়া প্রকৃত কর্ম্মী হয়, তজ্জন্য ব্যাসদেবের উপদেশ—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
গীতা, ৩য় অঃ—৬ শ্লোক॥

অথচ শঙ্কর নিজে সন্ন্যাসী হইয়া যাহাতে তাঁহার সম্প্রদায়ের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব বলিতেছেন, অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
গীতা—৩য় অঃ—১৫।

অথচ শঙ্কর ব্রহ্মকে একমাত্র স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্ ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥
ব্রহ্ম-নামাবলী-মালা

ব্যাসদেব বলিয়াছেন, মানুষের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অন্যতম উপায় বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
গীতা—২য় অঃ—৬৪।

অথচ শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যে ছত্রে ছত্রে কপিল প্রভৃতি ঋষিগণের প্রতি অযথাভাবে যে বিদ্বেষ ছড়াইয়া

গিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিভিন্ন মতবাদ-নিরসন বিষয়ক কথাগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত মানুষের দুঃখ কি করিয়া দূর হইতে পারে তাহা এই বার হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বুদ্ধদেব চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর ঐ চিন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন চৈতন্যদেব। বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কেহ সকল মানুষের দুঃখ-কষ্ট কি করিয়া বিদূরিত করা যাইতে পারে, তাহার কথা এই বার হাজার বৎসরের মধ্যে চিন্তা করেন নাই। কি করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রসারতা সাধিত হইবে, তাহার চিন্তা ব্যতীত সকল মানুষের দুঃখ-কষ্ট কি করিয়া প্রশমিত হইবে, তদ্বিষয়ক কোন কার্য্যোপযোগী চিন্তা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসীর কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ব্যাসদেবপ্রমুখ ঋষিগণের দ্বারা এবং বর্ত্তমানে যে অন্নহীন দুরবস্থা আসিয়াছে, তাহার প্রারম্ভ হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের দ্বারা এবং আমরা যে প্রকৃত অবস্থা এখনও বুঝিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা।

সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে "উর্ব্বরা" শব্দের অর্থ বাহ্যিক রূপ, রস মিশ্রিত তেজ, এবং রস-মিশ্রিত তেজের কার্য্য। যে ক্ষমতা দ্বারা জমী তাহার বাহ্যিক রূপ, রসমিশ্রিত তেজ এবং রসমিশ্রিত তেজের কার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহার নাম জমীর উর্ব্বরা-শক্তি। রসমিশ্রিত তেজের তারতম্যানুসারে যে, জমীর উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হয়, তাহা জমীর দিকে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জমীতে জলসিঞ্চন না করিলে অথবা রৌদ্র না লাগিলে যে, কোন ফসল হয় না, তাহা কৃষিবিষয়ক সাধারণ কথা। জমীতে তেজহীন রসের মাত্রা অত্যধিক হইলে জমী অনুর্ব্বর জলাময় (marshy) হইয়া যায় এবং রসহীন তেজের মাত্রা অত্যধিক হইলে জমি মরুভূমি (desert) হইয়া যায়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। জমীমধ্যস্থিত রসমিশ্রিত তেজের পরিমাণের সহিত তাহার রসমিশ্রিত তেজের কার্য্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং রসমিশ্রিত তেজের কার্য্যের সহিত তাহার উৎপাদিকা শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাযেই জমির "উর্ব্বরাশক্তি" বলিতে বুঝিতে হইবে তাহার "উৎপাদিকা শক্তি" এবং উহা তাহার তেজ ও রস নামক দুইটী উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

কি করিলে জীবের ও জমীর উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার (অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির) পরিবর্দ্ধন সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় কথা অল্প-বিস্তর ভাবে ভারতীয় ঋষির প্রত্যেক গ্রন্থেই লিখিত রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমস্ত কথা প্রায়শঃ পৃথক্ অর্থে প্রচারিত রহিয়াছে। মূল ব্যাকরণ পাণিনি যথাযথ অর্থে ব্যাখ্যাত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিলে তাহার অর্থ লইয়া মত-পার্থক্য উপস্থিত হইতে পারে।

কাযেই ঐ সমস্ত কথা উদ্ধৃত না করিয়া কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবতার সহিত মিলাইলে যেরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপে আমি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আমি যে কথাগুলি বলিব, তাহার প্রধান অবলম্বন বৈশেষিক দর্শন, ঋক, যজু এবং অথর্ব্ব বেদ।

ভারতীয় ঋষিদিগের কথানুসারে প্রত্যেক জীব ও জমীর উপাদান পাঁচটী ; যথা—ব্যোম, বায়ু, অপ্ (অথবা রস), বহ্নি (অথবা তেজ), এবং কারণ * (অথবা ক্ষিতি)। এই পাঁচটী মৌলিক যুগ্ম-উপাদান হইতে বিভিন্ন গুণের সৃষ্টি হয়। জীব অথবা জমীর কর্ম্মশক্তির অথবা উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব মূলতঃ ঐ পাঁচটী মৌলিক যুগ্ম-উপাদান হইতে হইয়া থাকে।

কিন্তু জীব উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃত রহস্য না বুঝিতে পারিয়া মনে করে যে, তাহার গুণ হইতে উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব হইতেছে। এই ভ্রমবশতঃ জীবের ও জমীর উৎপাদিকা শক্তি অকালে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং জীব ও জমী অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অন্য পক্ষে মৌলিক ঐ পাঁচটী উপাদান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে জীবের ও জমীর উৎপাদিকা শক্তি অটুট থাকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ থাকিলে জীবের ব্যোম ও বায়ু-উপাদানের অস্তিত্ব ও তাহার কার্য্য স্বতঃই পরিচালিত হয়। ব্যোম ও বায়ু-উপাদানের অস্তিত্ব ও কার্য্য অটুট

* ব্যোম, বায়ু, অপ্ এবং বহ্নি এই চারিটী উপাদানের মিশ্রণের ফলে যে মিশ্রিত বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে জীবের বাহ্যিক রূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ মিশ্রিত বস্তুর নাম "কারণ" অথবা "ক্ষিতি"।

রাখিবার উপায় বায়ুমণ্ডল যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, তদুপযোগী ব্যবস্থা। কিন্তু বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ থাকিলেও রস ও তেজ-উপাদানের অস্তিত্ব ও কার্য্য আপনা হইতে যথাযথ থাকে না। জীব ও জমীর শরীরে রস ও তেজের পরিমাণ ও কার্য্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে চাহে। রস ও তেজের পরিমাণ ও কার্য্য যথাযথ রাখিতে হইলে জীবের প্রযত্ন অথবা সাধনার প্রয়োজন হয়।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রস ও তেজের পরিমাণের তারতম্যানুসারে জমীর উর্ব্বরাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে এবং তেজহীন রস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অথবা রস-হীন তেজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জমী অকর্ম্মণ্য অথবা অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। কাযেই জমীর উর্ব্বরতা সাধন করিতে হইলে জমীতে যাহাতে সমান ভাবে রস ও তেজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, জমীর রস ও তেজের পরিমাণ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রকৃতি দেবী কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, বৃষ্টির সহায়তায় জমিতে রসের সৃষ্টি হইতে পারে এবং রৌদ্রের সহায়তায় তাহার তেজের উদ্ভব হয়। কিন্তু বাহ্যিক বৃষ্টি ও রৌদ্রে যে পরিমাণ রস ও তেজের উদ্ভব হয়, তাহা অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী এবং তাহাতে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। বাহ্যিক রৌদ্র এবং বৃষ্টিকেই যদ্যপি জমীর উর্ব্বরাশক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উপায় বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির ব্যবস্থা অতি অসম্পূর্ণ এই উপসংহারে উপনীত হইতে হয়। অথচ সাধারণতঃ প্রকৃতির ব্যবস্থায় কুত্রাপি অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। কাযেই জমীর অভ্যন্তরে কি ব্যবস্থা অথবা সংগঠন রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

জমীর অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা ও সংগঠন সহজেই লক্ষ্য করিতে পারা যায়ঃ—

(১) প্রত্যেক জমী চারিটী স্তরে বিভক্ত ;

(২) সর্ব্বনিম্ন স্তরে আছে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি তেজোময় খনিজ পদার্থ এবং খনিজ তৈল।

(৩) নিম্ন হইতে দ্বিতীয় স্তরে আছে জল আকর্ষণ করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নিছক বালুর স্তর।

(৪) নিম্ন হইতে তৃতীয় স্তরে আছে রস ও তেজ-মিশ্রিত বাষ্প-পরিচালনার শক্তিসম্পন্ন মিশ্রিত বালু ও কর্দ্দমপূর্ণ মৃত্তিকার স্তর। এই স্তরের মৃত্তিকায় বালু ও কর্দ্দম উভয়েরই অস্তিত্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে বালুকার অংশই বেশী।

(৫) সর্ব্বোপরি স্তরের মৃত্তিকায় বালু ও কর্দ্দম উভয়েরই অস্তিত্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রায়শঃ কর্দ্দমের অংশই বেশী।

ইহা ব্যতীত জমীর সংস্রবে প্রকৃতির নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলিও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :—

(১) প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু ব্যবধানে ছোট বড় কয়েকটী নদী থাকে।

(২) সাগর-সঙ্গমের সহিত নদীর উৎপত্তি-স্থানের উচ্চতার তারতম্যে, তাহার গভীরতার এবং স্রোতের বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

(৩) উৎপত্তি-স্থানের আয়তনের (area) তারতম্যের সহিত নদীর প্রস্থের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

জমীর আভ্যন্তরীণ ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সর্ব্বনিম্ন স্তরস্থিত খনিজ পদার্থ হইতে প্রতিনিয়ত তেজোময় বাষ্পোদ্গম হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের বালুকা জলমিশ্রিত থাকিলে ঐ তেজময় বাষ্প রসমিশ্রিত হয় এবং তৃতীয় স্তরের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বোপরি স্তরের রস ও তেজ-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সংঘটিত করে এবং তখন জমীর উর্ব্বরাশক্তি সংসাধিত হইয়া থাকে। নদীগুলি জমীর দ্বিতীয় স্তরস্থিত বালুকা পর্য্যন্ত গভীর থাকিলে বালুকা সহজেই জলমিশ্রিত হয় এবং নদীর স্রোতের বেগের তারতম্যা-নুসারে নিম্নস্তরের বাষ্পোদ্গমের বেগের তারতম্য হইয়া থাকে। কাযেই দেশের নদীগুলি জমীর দ্বিতীয় স্তরস্থিত বালুকা পর্য্যন্ত গভীর থাকিলে এবং নদীর স্রোতের বেগ যথোপযুক্ত হইলে দেশের জমী অনুর্ব্বর হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের পাহাড়গুলির উচ্চতার জন্য এখানকার নদী-গুলির স্রোতের বেগ যে একদিন খুবই প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং তাহারই জন্য ভারতবর্ষের জমীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাকৃতিক উর্ব্বরতা লাভ করিয়া-

ছিল। কিন্তু এখন আর নদীগুলি প্রায়শঃ জমীর দ্বিতীয় স্তরের বালুরাশি পর্য্যন্ত গভীর নহে। পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই গভীরতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে জমীর দ্বিতীয় স্তরের বালুরাশি এখন আর নদী হইতে জল পায় না এবং দেশের জমীগুলি প্রায় সারা বৎসর শুষ্ক হইয়া থাকে এবং তাহাদের অনুর্ব্বরতা সাধিত হয়। নদীর গভীরতা প্রতি বৎসরই কমিয়া আসিতেছে বলিয়া জমীর উর্ব্বরতাও প্রতি বৎসর কমিয়া আসিতেছে।

কাযেই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের নদীগুলি তাহাদের উৎপত্তি স্থান হইতে সর্ব্বত্র জমীর দ্বিতীয় স্তরের বালুকারাশি পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইলে এবং সর্ব্বনিম্ন স্তরের খনিজ পদার্থ বজায় থাকিলে রসমিশ্রিত তেজের চলাচল অব্যাহত থাকিতে পারে এবং প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি সম্ভব হয়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি সর্ব্বনিম্ন স্তরের খনিজ পদার্থ এখন আর বজায় নাই। প্রতি বৎসরই কুজ্ঞানের ফলে তাহা উত্তোলিত হইতেছে। কাযেই এখন আর জমীর সর্ব্বোচ্চ প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু নদীগুলি উপরোক্ত ভাবে উৎপত্তি-স্থান হইতে দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইলে প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি কতক পরিমাণে উন্নীত হইবে এবং আবার খনিজ পদার্থের সঞ্চয় ক্রমশঃ সম্ভব হইবে এবং তখন আবার পূর্ণ উর্ব্বরাশক্তি লাভ করিবার সম্ভাবনা হইবে। নদীগুলিকে গভীর করিয়া খনন করা অর্থসাপেক্ষ এবং দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে।

প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি না থাকিলে কৃত্রিম সার দ্বারা যে উর্ব্বরাশক্তির উদ্ভব হয়, তাহাতে কৃষি অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয় এবং তাহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় না। ইহারই জন্য ইয়োরোপে এবং মার্কিন দেশে কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতেছে না এবং প্রায় সমস্ত কৃষকই কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে নূতন নূতন ভাবে পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্ত আয়োজন চলিতেছে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতেছে তাহা প্রকৃত কৃষকের প্রতিষ্ঠান নহে। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ ধনিক দ্বারা পরিচালিত, তাহাতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে ঐ ঐ দেশের গভর্ণমেণ্ট অর্থ-সহায়তা করিতেছেন। ঐ অর্থ-সহায়তার ফলে ঐ ঐ দেশে সাময়িক ভাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতপক্ষে লাভজনক হয় নাই এবং গভর্ণমেণ্টের সহায়তা (subsidy) বন্ধ হইলে যে কোন সময়ে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি অচল হইবার আশঙ্কা আছে।

পাশ্চাত্য জাতিগণ জমীর প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তির রহস্য পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-পদ্ধতির এবং বাষ্প-পরিচালিত লাঙ্গলের উদ্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-প্রণালী (modern irrigation) কুজ্ঞানসম্ভূত এবং তাহা প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টজনক। যে যে স্থানে বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রথম কয়েক বৎসর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস অবরুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি সংঘটিত হয় নাই এবং কয়েক বৎসর পরে আবার উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু ঐ ঐ স্থানে অস্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে। যে যে স্থানে বিশ বৎসরের উপর বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের অবস্থা একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বাষ্প-পরিচালিত লাঙ্গলও জমী এবং কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইষ্টপ্রদ হইতে পারে না।

যে বেগের সহিত এই লাঙ্গল পরিচালিত হয়, তাহাতে জমীর ভিতর অত্যধিক তেজের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং পরিশেষে জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত কৃষিকার্য্যে বাষ্প-পরিচালিত লাঙ্গলের ব্যবহার হইলে সমাজে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জমী হইতে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণতঃ তিনটী কার্য্যের প্রয়োজন, যথা—(১) লাঙ্গল দেওয়া, (২) নিড়ান, এবং (৩) শস্য কাটা। যে পরিমাণ জমীতে লাঙ্গল দিতে ১টী মানুষের প্রয়োজন হয়, ঐ পরিমাণ জমী নিড়াইতে এবং তাহার শস্য কাটিতে ৪।৫টী লোকের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কৃষক-পরিবারের কর্ত্তা জমীর লাঙ্গল দেওয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, আর নিড়ান ও শস্যকাটা কার্য্যে কৃষক-গৃহিণী ও কৃষকের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাপ্রভৃতি সমস্ত কৃষক-পরিবার নিযুক্ত হইত। কাযেই এক একটী কৃষক-

পরিবার অপর কোন মজুরের বিনা সহায়তায় একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমী হইতে শস্যোৎপাদন করিবার সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

পাশ্চাত্যদেশে লাঙ্গল দেওয়া কার্য্যে বাষ্পের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। হস্ত-পরিচালিত লাঙ্গল ব্যবহার করিলে একজন শ্রমজীবী যে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারেন, বাষ্প-পরিচালিত লাঙ্গল ব্যবহার করিলে ঐ শ্রমজীবী তাহার বহু গুণ জমী চাষ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐ জমীর নিড়ান ও শস্যকাটা-কার্য্য কোন বাষ্প-পরিচালিত যন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে এবং কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। ফলে নিড়ান ও শস্যকাটা-কার্য্যে কতকগুলি শ্রমজীবীকে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়। কাযেই যে সমস্ত শ্রমজীবীকে সাময়িকভাবে নিড়ান ও শস্যকাটার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা বৎসরের বাকী সময় বেকার থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। অধিকন্তু সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করা হয় বলিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তাহাতে কৃষিকার্য্য অতিরিক্ত ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে।

জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদানের জন্য ভারতীয় ঋষিগণ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মানুষের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হইয়াছিল এবং সমাজের মধ্যে কাহারও প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের জন্য বিব্রত হইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতিগণ জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদানের মূল সূত্র কি হওয়া উচিত, তাহা এখনও যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির রহস্য তাঁহাদের অজ্ঞানা থাকায় শস্যোৎপাদন-কার্য্য সাধারণতঃ অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা মনে করেন, জিনিষ-পত্রের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা সংঘটিত হইলেই শ্রমজীবিগণের লাভবান হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কৃষক যে-সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা যে লাভবান্ হয় তাহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াও অবশ্যম্ভাবী এবং কোন কৃষকের পক্ষেই শিল্পজাত কোন না কোন দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। ফলে কৃষক স্বীয় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, তদপেক্ষা তাহার অধিক ব্যয় হয় প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য-ক্রয়কার্য্যে। কাযেই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার নীতি কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু পরোক্ষভাবে তাহার দারিদ্র্য সংঘটিত করে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শাসন-বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটী কৃষি-বিজ্ঞানের ন্যায়ই ভ্রমপরিপূর্ণ। ঐ সকল বিজ্ঞানের মূল সূত্র ও প্রয়োগ কি হওয়া উচিত, অথবা কি হইলে মনুষ্যজাতি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার সন্ধান একমাত্র ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষ কারণে উহার আলোচনা হইতে আমি আপাততঃ নিবৃত্ত থাকিব।

ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ নির্ম্মূল করিবার পদ্ধতি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা

আগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসন-বিভাগের বর্ত্তমান অব্যবস্থা হইতে ভারতবাসীর, অথবা শুধু ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগতের দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা গিয়াছে যে, নদীগুলিকে তাহাদের উৎপত্তি-স্থল হইতে সর্ব্বত্র জমীর বালুকাময় দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি সাধিত হইলে এবং ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে হ্রাস হয় তদনুরূপ সূত্র অবলম্বিত হইলে কৃষি-সম্বন্ধীয় অব্যবস্থা দূরীভূত হইতে পারে। একমাত্র কৃষি-সম্বন্ধীয় অব্যবস্থা দূরীভূত হইলেই যে, দেশের সকলের সমস্ত দুরবস্থা দূরীভূত হইবে তাহা বলা যায় না বটে, তবে উহাদ্বারা বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী অন্নাভাব হইতে যে প্রায়শঃ রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষি লাভজনক হইলে তদ্দ্বারা দেশের বার আনা লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং তখন বাকী চারি আনা লোকেরও শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও চাকুরী দ্বারা

লাভবান হওয়া ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কৃষি অথবা অন্যান্য বিষয়ক বর্ত্তমান অব্যবস্থা দূরীভূত করিবার পদ্ধতি বলিয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা কি?

দেশের শাসনকার্য্য দেশীয় লোকের মতানুসারে পরিচালিত না হইলে কোন অব্যবস্থাই দূরীভূত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসিগণের দ্বারা পরিচালিত নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ যদিও পরিবর্ত্তিত শাসনপদ্ধতি অনুসারে রাজ্য-পরিচালনার প্রায় সমস্ত কার্য্যই জনসাধারণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীগণের হস্তে সমর্পিত হইতে চলিয়াছে, তথাপি যখন দেখা যাইতেছে যে, অর্থনিয়ন্ত্রণ (finance) ও দেশরক্ষা-(self defence)-বিভাগ হস্তান্তরিত হইবে না, তখন রাজ্য পরিচালনা মূলতঃ যে দেশীয় লোকগণের দ্বারা সাধিত হইবে না, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

কিন্তু দেশের শাসনকার্য্য দেশীয় লোকের মতানুসারে পরিচালিত না হইলে কোন অব্যবস্থাই দূরীভূত হইতে পারে না ইহাও যেমন সত্য, তেমনই দেশীয় লোক একমতাবলম্বী না হইলে অথবা তাঁহাদের ঐক্য (unity) সাধিত না হইলে রাজ্য পরিচালনা-কার্য্যের প্রকৃত দায়িত্ব পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, ইহাও ততোধিক সত্য।

কাযেই দেশীয় শাসনকার্য্যের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ক অব্যবস্থাগুলি দূরীভূত করিবার পদ্ধতি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে হইলে, দেশীয় লোকের মধ্যে যাহাতে ঐক্য সাধিত হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বন করিতে হইবে। দেশীয় লোকের ঐক্য সাধন করাই ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইহা বলা বাহুল্য। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কংগ্রেসের বয়স হইয়াছে, অথচ দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় লোকের ঐক্য সাধন করা ত দূরের কথা, তাঁহাদের দলাদলির মাত্রা ও দলের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা চিন্তাশীলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা হয়ত কোন কোন অদূরদর্শী পাশ্চাত্য রাজনৈতিকের বুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবেন যে, দলাদলির (party-politics) উদ্ভব হওয়াই দেশের সজীবতার লক্ষণ। যাঁহারা বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই এবং যাঁহাদের যুক্তি-তর্ক কেবল কোন ব্যক্তিগত অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের কথা বাদ দিলে, দলাদলির সংখ্যা বাড়িয়া গেলে যে, দেশের মধ্যে অনৈক্য বাড়িয়া যায় এবং দেশের মধ্যে অনৈক্য বাড়িয়া গেলে যে, শাসনকার্য্যের প্রকৃত দায়িত্ব পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, যদিও ভারতবাসীর ঐক্য-সাধন ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি ভারতীয় কংগ্রেস তাহার এই উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হয় নাই এবং তাহার কার্য্য-পদ্ধতি নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়:—

প্রথমতঃ—কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসন (Home-Rule or Self-Government) লাভ করা এবং তখন গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করাই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পন্থা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ—তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল স্বরাজ লাভ করা এবং তখন নিষ্ক্রিয় বাধা দান (Passive Resistance) ও বিদেশী বর্জ্জন (Boycott of British and Foreign goods) হইয়াছিল ঐ প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পন্থা।

তৃতীয়তঃ—স্বরাজ লাভ করার উদ্দেশ্য অপরিবর্ত্তিত ছিল, কিন্তু কার্য্যপন্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিষ্ক্রিয় বাধাদানের (Passive Resistance) স্থানে অসহযোগ (Non-Co-operation) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশ্য অসহযোগের রকম সম্বন্ধে দেশীয় নেতাগণের মতপার্থক্যের অস্তিত্ব সংঘটিত হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ—তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে স্বাধীনতা লাভ করা। অথচ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা কংগ্রেস স্থির করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা

নাই। যাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করার প্রস্তাব কংগ্রেসের অধিবেশনে পাশ করাইয়াছেন তাঁহারা প্রধানতঃ "সোস্যালিষ্ট" (Socialist) এই পর্য্যন্ত দেখা যায়।

যতদিন পর্য্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল এবং ঐ উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য আবেদন নিবেদন করাই পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত দেশের প্রকৃত অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। কেবল মাত্র দেখা গিয়াছে যে, দেশ সম্বন্ধে দেশীয় লোকের একটা কর্ত্তব্য আছে, এই বোধটা জাগ্রত হইতেছিল।

স্বরাজ লাভ করা যখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয় এবং তদর্থে যখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বিত হয়, তখনই প্রথম দেখা গিয়াছে যে, দেশীয় লোকের মধ্যে যাহাতে অনৈক্য হয়, তাহার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের দল নামক দলাদলির প্রকটতার প্রথম উদ্ভব হইয়াছে।

অসহযোগ এবং আইন-অমান্য নীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির প্রকটতা এবং সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ভারতবাসী অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব নামে মাত্র থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার কোন পরিচয় নাই, ইহা পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কংগ্রেসের উপরোক্ত ইতিহাস হইতে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়। আমার মনে হয়, যে-কোন ব্যক্তি দেশে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, তাঁহাকেই বাস্তবতঃ "দেশীয় লোক" বলিতে হইবে এবং ন্যায়তঃই হউক অথবা অন্যায়তঃই হউক দেশীয় কোন ব্যক্তি যাহাকে তাঁহার স্বীয় স্বার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহাকেই "দেশীয় লোকের স্বার্থ" বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দেশীয় কাহারও স্বার্থের বিরোধী কোন নীতি জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা অবলম্বিত হইলে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনৈক্যের উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনৈক্যের উদ্ভব হইলে তাহা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা অনিবার্য্য।

অন্য পক্ষে, দেশীয় লোক যাহা যাহা তাঁহাদের স্বীয় স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত, কতকগুলি সম্প্রদায়গত আর কতকগুলি সার্ব্বজনীন (common)। যে স্বার্থগুলি ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত, তাহা লইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনৈক্য অথবা মতবিরোধ অনিবার্য্য হয় বটে, কিন্তু যে স্বার্থগুলি সর্ব্বসাধারণের তাহা অর্জ্জন করা কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হইলে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ অনৈক্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয় না এবং ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত গতি অনিবার্য্য।

শ্রমিক আন্দোলনে (Socialist Movement) ধনিকগণের সহিত (Capitalist) বিরোধ অনিবার্য্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান তাহা অবলম্বন করিলে তাহাকে সমগ্র জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

দেশের মধ্যে কোন প্রাদেশিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে প্রদেশে প্রদেশে বিরোধ এবং জাতীয় শক্তির হ্রস্বতা অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদিও ইয়োরোপীয়গণ স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে প্রায়শঃ বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অস্থায়ী ভারতবাসী বলিয়া মনে করিতে হইবে। জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের স্বার্থের বিঘ্নকর কোন কথা উত্থাপিত হইলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে বাধা উপস্থাপিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, কংগ্রেসে স্বাধীনতা লাভ, বিদেশী বর্জ্জন, অসহযোগ, আইন-অমান্য প্রভৃতি ইয়োরোপীয়গণের স্বার্থের বিরোৎপাদক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই দেশের মধ্যে এত দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে এবং কংগ্রেস বাস্তবিক পক্ষে কার্য্যশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের দুরবস্থার প্রকৃতি অথবা কারণ বলিয়া যাহা যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তিগত অথবা কোন সম্প্রদায়গত নহে। ঐ সমস্ত বিষয়ে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় জনগণ সকলেই অল্পাধিক সংশ্লিষ্ট। কি করিলে ঐ দুরবস্থার কারণগুলি বিদূরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া কংগ্রেসের আন্দোলন আরম্ভ হইলে, তাহার কোনরূপ বিরোধিতা করার কোন যুক্তি কাহারও থাকিতে পারে না। পরন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা সম্প্রদায়গত অথবা প্রদেশগত স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও ঐক্য সাধিত হইয়া সকলে মিলিয়া একটী অপ্রতিহত জাতিরূপে দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা হইবে।

কাযেই বলিতে হইবে যে, ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ নির্ম্মূল করিবার পদ্ধতি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা—ভারতীয় সাধারণ দুরবস্থার কারণগুলিকে বিষয় করিয়া কংগ্রেস আন্দোলনের সৃষ্টি করা।

বিশেষ কারণে এই প্রসঙ্গের অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা হইতে আমাকে আপাততঃ প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[১০১]

মনসা বা বিষহরির কাহিনী প্রাচীনকালে খুব লোকপ্রিয় ছিল তাহা পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে লেখা দুইখানি মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিজয় গুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গের এবং বিপ্রদাস পিপলাই পশ্চিমবঙ্গের লোক। ষোড়শ শতকে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আওতায় পড়িয়া, মনসামঙ্গল প্রভৃতি নিছক লোকসাহিত্যের আদর পশ্চিমবঙ্গে খুবই কমিয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এই সাহিত্যের যথেষ্ট কদর ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মনসার কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং বোধ হয় এখনও আছে। ইহার ফলে ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট জন মনসামঙ্গলগীতি-কবির হিসাব পাওয়া যাইতেছে। ইহাঁদের সকলেই অবশ্য এক একটি করিয়া সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেন নাই; অনেকেই শুধু এক-আধটি পালা লিখিয়াছেন, অনেকে আবার অপরের লেখার মধ্যে নিজের কিঞ্চিৎ রচনা অথবা শুধুই ভণিতামাত্র যোগ করিয়া কবিত্বখ্যাতির প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও পূর্ব্ববঙ্গে নূতন করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। ষোড়শ শতকে পশ্চিমবঙ্গে কোন কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

[১০২]

ষোড়শ শতকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে বংশীদাস রায় বা বংশীবদন চক্রবর্ত্তীর পদ্মাপুরাণই সমধিক উল্লেখযোগ্য।[১] বংশীদাসের কাব্য ১৪৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

১। বংশীদাসের কাব্যের একাধিক সংস্করণ ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (১৩১৮ সাল) সংস্করণই শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান আলোচনায় এই সংস্করণটি এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত মণিমোহন দাস প্রকাশিত (১৩২২ সাল) সংস্করণ অবলম্বিত হইয়াছে।

জলধির বামে ত ভুবন মাঝে দ্বার। শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥[২]

বংশীদাসের বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাড়ী বা পাটুয়ারী বা পাটোয়াড়ী গ্রাম। বংশীদাস রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটি গাঁই। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাস করেন।

> বন্দ্য ঘটি গাঁই গোত্রে রাঢ়ীর প্রধান॥
> রাঢ় হৈতে আইলান লৌহিত্যের পাশ।[৩]

বংশীদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ এবং মাতার নাম অঞ্জনা। ভণিতার বহুস্থলে কবি পিতৃনাম গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

> দ্বিজ বংশীদাসে গায় যাদবানন্দ-সুতে।
> অপূর্ব্ব পুরাণ-গীত রচিয়া কৌতুকে॥
> (অপূর্ব্ব পুরাণগীত রচিয়া অমৃতে॥)
> ইত্যাদি

বংশীদাসের একমাত্র কন্যার নাম চন্দ্রাবতী। ইনিও উত্তরাধিকারসূত্রে কবিত্বপ্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় রামায়ণে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে বংশীদাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

ইহা হইতে জানিতে পারি, কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা এবং পত্নীর নাম সুলোচনা। কবি সুদরিদ্র ছিলেন, মনসার গীত গাহিয়া অতি কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন।

> ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
> বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
> ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
> বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥

ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়। কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

* * *

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে। ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে। চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥

২। কলিকাতা সংস্করণ পৃঃ ১৪। ৩। ঐ, পৃঃ ১৩।

বাড়াতে দারিদ্র্যের জালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্র অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তি ভরে। চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥
* * *
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥ ১

চন্দ্রাবতীর জীবন বড় ট্রাজিক; ময়মনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর ব্যর্থপ্রেমকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। চন্দ্রাবতীর রচনা কিছু কিছু বংশীদাসের কাব্যে থাকা অসম্ভব নহে। প্রবাদ আরও বলে যে, চন্দ্রাবতীর হবু-স্বামী জয়ানন্দের রচনাও কিছু কিছু ইহার মধ্যে আছে।

[১০৩]

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ-কাহিনীর একটি সূচী দিতেছি। ইহা হইলে মনসামঙ্গল কাব্যের সাধারণ কাঠামো কতকটা বুঝা যাইবে।

গণেশবন্দনা, দশাবতারবন্দনা, সর্ব্বদেবদেবীবন্দনা, সৃষ্টি-বর্ণনা, লক্ষ্মীর জন্ম, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, শিবের বৈরাগ্য, মদনভস্ম, শিবের শাপপ্রাপ্তি, উমার জন্ম, উমার তপস্যা, উমার বিবাহ, উমার দ্বিতীয় বার তপস্যা (গোত্রবর্ণ পরিবর্ত্তনের জন্য), গণেশের জন্ম, কার্ত্তিকের জন্ম, ডোমনীবেশে দেবীকর্ত্তৃক শিবকে ছলনা, নেতার জন্ম, পদ্মার জন্ম, পদ্মার বিষে শিবের মূর্চ্ছা, পদ্মাকর্ত্তৃক শিবকে পুনরুজ্জীবন, হালুয়াদিগের নিকট হইতে পদ্মার পূজা আদায়, জালিকদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়, মুসলমানদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়, চণ্ডীর সহিত পদ্মার বিবাদ, গঙ্গা ও চণ্ডীর কোন্দল, পদ্মার বিবাহ, নেতার বিবাহ, পদ্মার ব্রহ্মশাপ, আস্তীকের জন্ম, জরৎকারু ও আস্তীকের গৃহত্যাগ, নেতার সহিত পদ্মার কালীদহতীরে বাস, চন্দ্রধরের জন্ম, চন্দ্রধরের বিবাহ ও পুত্রলাভ, চন্দ্রধরের পুত্রদিগের বিবাহ, চন্দ্রধরের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট পদ্মার পূজা আদায়ের ইচ্ছা, চম্পকনগরে পদ্মার পূজা প্রচার, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পূজাভঙ্গ, পদ্মার সহিত চন্দ্রধরের বিবাদ, পদ্মার ক্ষোভ, চন্দ্রধরের নিকট হইতে পদ্মাকর্ত্তৃক মহাজ্ঞান হরণ, পরীক্ষিতের কাহিনী, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, পদ্মাকর্ত্তৃক ধন্বন্তরিকে অপসারণ, চন্দ্রধরের ছয়পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু, চন্দ্রধরের বাণিজ্যগমনের আয়োজন, পদ্মার ইন্দ্রসভায় গমন, পৃথিবীতে স্বীয় মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে পদ্মাকর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিকট উষা ও অনিরুদ্ধের মানবজন্ম প্রার্থনা, উষার শাপ-প্রাপ্তি, চন্দ্রধরের সফরে যাত্রা, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পুরীভঙ্গ, পদ্মাকর্ত্তৃক দক্ষিণ সমুদ্রে বিবিধ উৎপাত সৃষ্টি, রাক্ষসদিগের হাতে চন্দ্রধরের লাঞ্ছনা ও মুক্তি, চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটনে আগমন, স্বপ্ন পাইয়া দক্ষিণ পাটনের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রধরের বিপক্ষভাব অবলম্বন, দক্ষিণ পাটনের রীতিনীতি বর্ণনা, পাটনবাসিদিগের নারিকেল ও তাম্বুলভক্ষণে লাঞ্ছনা, চন্দ্রধরের কারাবাস, লক্ষ্মীন্দরের জন্ম, বিপুলার জন্ম, চণ্ডীর দয়ায় চন্দ্রধরের কারামুক্তি, রাজসভায় চন্দ্রধরের সম্মানলাভ, নারিকেলের জন্মকথা, বাঙ্গালা দেশের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের বদলে চন্দ্রধরের স্বর্ণরৌপ্যাদি লাভ, রাজা ও সভাসদ্দিগের চটের কাপড় পরা, রাজা ও সভাসদ্দিগের প্রতি চন্দ্রধরের শ্লেষোক্তি, চন্দ্রধরের গৃহযাত্রা, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পূজা প্রত্যাখ্যান, চন্দ্রধরের তরী সকল ডুবাইবার জন্য শিবের নিকট মনসার আজ্ঞাপ্রার্থনা, চন্দ্রধরের বিপুলকায় তরী ডুবাইবার উপযুক্ত জল না থাকায় সমুদ্রের জল বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট পদ্মার প্রার্থনা, সমস্ত নদনদীর সমুদ্রে গমন, চণ্ডীকর্ত্তৃক চন্দ্রধরের তরীরক্ষণ, শিবকর্ত্তৃক চণ্ডীকে চন্দ্রধরের তরীরক্ষাকার্য্য হইতে অপসারণ, চন্দ্রধরের তরীনিমজ্জন, সমুদ্রে পতিত চন্দ্রধরের কথঞ্চিৎ প্রাণরক্ষণ, বিবস্ত্র চন্দ্রধরের তীরে উত্থান, স্নানরতা নারীগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের লাঞ্ছনা, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চন্দ্রধরকে বস্ত্রখণ্ড প্রদান, পদ্মার মায়ায় চন্দ্রধরের বিবিধ উৎকট লাঞ্ছনা, চন্দ্রধরের গৃহে আগমন এবং দাসী ও পুত্রবধূদিগের হস্তে লাঞ্ছনা, পত্নীকর্ত্তৃক পরিজ্ঞান, পুত্র লক্ষ্মীন্দরের সহিত পরিচয়, লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ, বিপুলার শাপপ্রাপ্তি, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক বিপুলার পরীক্ষা, বিপুলার সহিত লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ, লৌহ-মঞ্জুষা নির্ম্মাণ, লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু, লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহ লইয়া বিপুলার ভেলায় যাত্রা, আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বিপুলাকে নিবৃত্ত করিবার বিবিধ চেষ্টা, বিপুলাকর্ত্তৃক লক্ষ্মীন্দরের গলিত শবরক্ষা, নেতা ও পদ্মাকর্ত্তৃক বিপুলাকে ছলিবার চেষ্টা,

১। "মহিলাকবি চন্দ্রাবতী," শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা; বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১০৫-১০৬।

গোদাকর্তৃক বিপুলাকে প্রলোভন দর্শন ও বলপ্রকাশের চেষ্টা, বিপুলার কৈলাসের ঘাটে আগমন, পদব্রজে বিপুলার স্বর্গে প্রবেশ, বিপুলার নৃত্যে শিব ও চণ্ডীর সন্তোষ, শিবকর্তৃক পদ্মাকে দেবসভায় আহ্বান, পদ্মার অনাগমনে নারদকর্তৃক পদ্মাকে আনয়ন, দেবসভায় বিপুলার নৃত্য, দেবসভায় বিপুলা ও পদ্মার অর্থী ও প্রত্যর্থীভাব অবলম্বন, বৃহস্পতির মধ্যস্থতা, পদ্মার রোষত্যাগ, চন্দ্রধরের মৃতপুত্রদিগের পুনরুজ্জীবন এবং নষ্টধন প্রাপ্তি, অবশেষে চণ্ডীর আদেশে চন্দ্রধর কর্তৃক বিষহরি পূজা।

[১০৪]

এইবার বংশীদাসের কাব্য ও কবিত্বের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। বংশীদাস কুত্রাপি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তথাপি তিনি যে সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ছিলেন তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার সারল্য এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গিই বংশীদাসের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

বন্দনা অংশের এই কয়েকটি ছত্রে তত্ত্বকথা বেশ সহজ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে বন্দিনু দেবদেব নিরঞ্জন। পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার অনাদি নিধন॥
নির্গুণ সগুণ কিছু নাহি রূপরেখা।
আছে হেন শব্দ কারো সনে নাহি দেখা॥
সকল ঘটের মধ্যে আত্মরূপে আছে।
ব্রহ্মা আদি কীট যত পতঙ্গ জন্মিছে॥
তাহাতে সকল হয় কেন নাহি ছাড়া। কলার ছোপায় যেন একত্রেতে জোড়া॥
একই প্রদীপ যেন স্থলে দীপ্যমান। তাহাতে অনেক দশা লাগে স্থানে স্থান॥
অনন্ত অর্ব্বুদ১ যেন নাহি লেখা জোখা। একত্র হইলে পুন সেই এক শিখা॥
একই ঘাটের জল যেন ভরি ঘাটে। নানামতে ভরিলেও তবু নাহি টুটে॥
একই পৃথিবী বৃক্ষ নানামতে লিখি। একই আকাশে জল নানামত দেখি॥
একই ছাঁচের মধ্যে বিম্ব উঠে নানা। রূপভঙ্গ নানারূপ নাহিক গণনা।
একই বিত্তায় যেন ঘটে নানামতে। নানা অলঙ্কার ভাঙ্গি কররে একত্রে॥
পুন: পুনঃ প্রণমহ সেই নারায়ণ। তারপর প্রণমহ গৌরীর চরণ॥
ইত্যাদি॥

ডোমনীবেশে চণ্ডীর মহাদেবকে ছলনা অংশ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মনেতে ভাবিয়া মায়া করিলা সুস্থির। বিজয়া হইল নদী অগাধ গম্ভীর॥
জয়া পুনঃ নৌকা হৈয়া সেই জলে ভাসে। নৌকা আগে বৈসে চণ্ডী ডোমনীর বেশে।
পিত্তলের অলঙ্কার করিয়া সাজন। রাঙ্গাপাট দিয়া কেশ বান্ধিল লোটন॥
সিন্দুরের বিন্দু যে কপালে শোভে ভাল। নায়ের আগে বৈসে চণ্ডী হাতে করি হাল॥২
গলায় বেড়িয়া দিছে মালতীর মালা। নিরবধি গুয়া খায় করে হাস্যলীলা॥
দেড় প্রহর আছে বেলা আড়াই প্রহর বাদে। আসিয়া মিলিল শিব ভবানীর কান্ধে॥৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মায়া এড়ান না যায়। আপনি ঠেকিলা শিব সেইত মায়ায়॥
দেখিল অগাধ নদী অতি খরস্রুত।৪ নৌকার উপর দেখে ডোমনী অদ্ভুত॥
ডাকিয়া শঙ্কর বলে নৌকা আন ঘাটে। দূরেতে যাইতে চাই পার কর ঝাটে॥
তাঁরে দেখি মহামায়া আড়-আঁখি চায়। নানান ভঙ্গিমা করি বৈঠা তুলি বায়॥
বচন-চাতুরী করে থাকিয়া ভাসানে। মোহিল শিবের মন কটাক্ষের বাণে॥
শিব বলে ডোমনী সত্বরে কর পার। যাইব কমলবনে পুষ্প আনিবার॥
ঘরেতে এড়িয়া এনু পরম রূপসী। যাহার আকৃতি তোমা চিনি হেন বাসি॥
এহেন যৌবনকালে ঘাটের খেয়ানী। কার স্ত্রী কার কন্যা কহ সুবদনি॥
ডোমনী বলে বাপ গিরিরাজ পাটনী। সরূপাই নাম মোর জাতিতে ডোমনী॥
আমার ডোমনা হয় রসিক নাগর। অনেক বিলম্ব আছে আসিতে তাহার॥
নিরবধি ভাঙ্গ খেয়ে সদাই বেড়ায়। বিনা উপার্জ্জনে নিত্য ভক্ষণ করায়॥
দেখিয়া এতেক দুঃখ উঠে অবিশ্রাম। থাকিতে এতেক কার্য্য নাহি করে কাম॥
ভাঙ্গ পায় মিনসে সদা করেন কারণ। ছোট বড় সকল যতেক বিদ্যমান॥
বুড়া দেখি মোর মিনসে খেদাই ঘর হতে।
এসব কারণে আমি আছি খেয়া দিতে॥
সে জনের যত কথা কহিতে অন্ত নাই। ঠাকুর সকলে জানে আমি স্বরূপাই॥
কতজন দেখিয়াছি ভ্রমিতে তপস্বী। ব্রহ্মচারী উদাসীন যতেক সন্ন্যাসী॥
আগে কিছু কড়ি দেহ মদ আমি কিনি।
তার পাছে করি পার খাইয়া বারুণী॥
খেয়া না দিয়া কি মতে পার হৈতে চাও।
খেয়া-কড়ি বুঝাইয়া তবে উঠ নাও॥
শিব বলে খেয়া-কড়ি কোন প্রয়োজন।
নিকটে অধিক আছে বহুমূল্য ধন॥
ঘাটেতে লাগাইয়া নাও পার কর মোকে।
তবে সে ইনাম পাবা সঙ্গে যাহা থাকে॥
ইহা শুনি মহামায়া হাসিয়া কৌতুকে।
কূলেতে লাগাইলা নাও শিবের সম্মুখে॥
দেখিয়া ভবানীরূপ দেব পঞ্চানন। থাপা দিয়া ধরিলেক গায়ের বসন॥
না ছোঁও না ছোঁও আমি হই ডোমনারী।
তুমি ভাল জটাধারী ভাল ব্রহ্মচারী।

১। 'অর্ব্বুদ'। ২। 'হাল'। ৩। 'কান্ধে'। ৪। 'খরস্রোত'?

ডোমের ঘরণী আমি ছুঁইলে জাতিনাশ। আমার কাপড় এড়ি হও একপাশ ॥১
ইত্যাদি।

দক্ষিণ পাটনের অধিবাসীদের আকৃতির ও রীতিনীতির বর্ণনা বেশ কৌতুকাবহ।

দেখিয়া রাজার সভা চাঁদ ভাবে মনে। সকল নির্ব্বোধ হেন বুঝি অনুমানে ॥
এক এক জন দেখি দীঘল ডাগর। রাঙ্গা রাঙ্গা চক্ষু কর্ণ রাঙ্গা ওষ্ঠাধর ॥
মা বাপ মৈলে তারা রাথে শুখাইয়া। বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ করে ক্লেশ পাইয়া ॥

মৈলে পুত্র কিছু নহে ভাগিনা২ অধিকারী।
সর্ব্বস্ব বাটিয়া নেয় বেধার বর গিরি ॥

সহোদর ভাই অংশ না পায় বেহাই৩ মৈলে মুখানল করে শালার বেয়াই ॥
ভাগিনা ভাগিনী আর ভাগিনা-বৌয়ারী। এ সকলে মিলিয়া করয়ে হুড়াহুড়ি ॥

ভাগিনাবধূ গীত গায় মামাশ্বশুর নাচে।
জামাইয়ে পাখোয়াজ বাজায় শ্বাশুড়ীর কাছে ॥
গুরু গর্ব্বিত পাইলে মারে ঘন ঠেলা।
কোন আঙ্গুলে মারিলাম কহ দেখি শালা ॥

খুড়তু শ্বশুর পাইলে কান মুচড়িয়া। হাততালি দিয়া বলে আইলা বে ভাড়িয়া ॥

বিয়া কৈলে যৌতুক পায় মামী শাশুড়ীরে।
কন্যা যাবৎ যোগ্যা না হয় শাশুড়ী ঘর করে ॥

শালার বধূ দেখি তারা অধিক লজ্জিত। শালীর পদে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিত ॥
এই মত দেখি তার দেশের আচার। মনে মনে চন্দ্রধর কৌতুক অপার ॥৪

নারিকেলের জন্মকথা বলিয়া চন্দ্রধর রাজাকে সন্তুষ্ট করিতেছে —

চান্দ বলে নারিকেলের শুন জন্মকথা। যে মতে নারিকেল জন্মিয়াছে যথা ॥
বিশ্বামিত্র নামে হয় গাধির নন্দন। অনেক তপস্যা করে হইতে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনী পাইলেক বর। অনেক বৎসর তপ করে নিরন্তর ॥
তথাপি ও অধোমুখে ব্রহ্মারে করে ধ্যান। তার ডরে ইন্দ্র আদি দেব কম্পবান্।
তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা আইল বর দিতে তারে। ব্রাহ্মণ হইলা তুমি যাহ নিজ ঘরে
বিশ্বামিত্র বলে যদি হইনু ব্রাহ্মণ। মনের বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইব এইক্ষণ ॥
এই মত বলি ব্রহ্মা নিজ স্থানে যায়। বিশ্বামিত্র নারিকেল সৃজিল আজ্ঞায় ॥
মনুষ্যের মুণ্ড হেন বড় বড় ফল। চাড়ার ভিতরে জল অমৃত কেবল ॥
এই মতে সৃজিলেক বিশ্বামিত্র মুনি। যেমত ইহার গাছ কহি শুন আমি ॥
পৃথিবীতে জন্মিল কৃষ্ণ কংস বধিবারে। অবতার হইলা হরি বসুদেব ঘরে ॥
গোকুলে নন্দের ঘরে জন্মিল কানাই। ষোল শত শিশু সঙ্গে চরাইল গাই ॥

কালিন্দীর হ্রদে তথা কালী নাগ বৈসে।
জল খাইতে নারে তার কালকূট বিষে ॥
তাতে এক শিশু মৈল সেই জল খাইয়া।
সেই কোপে নারায়ণ চলিলেক ধাইয়া ॥

উপরে না উড়ে পক্ষী নাকের নিশ্বাসে। ইহা দেখি নারায়ণ কোপ করি রোষে ॥
কালিন্দীতে ঝাঁপ দিয়া কালী নাগ ধরি। তথা হইতে খেদাইলা দেবতা শ্রীহরি ॥
সেই হইতে কালী নাগ সাগরেতে গেল। সেই বিষে শ্রীকৃষ্ণের শরীর কাল হৈল ॥

কালী নাগের শ্বাসে টুটে কালিন্দীর জল।
কেহ তারে খাইতে নারে হৈল দাবদল ॥

অগম্য হইল তাতে কচু আর তারা। তারি মধ্যে জন্মিলেক নারিকেল চারা ॥
মূলে তার ফল পাত ওপরে শিকড়।৫ মৌ-আলুর গোটার মত ধরে নারিকেল ॥

আনিয়া দিতে পারি নারিকেলের চারা।
ঢেকিয়া লতের মত নারিকেলের পাড়া ॥

রাজা বলে চিনিলাম না কহিও কথা। চিনিলাম মহাবৃক্ষ মানের মত পাতা ॥৬

চন্দ্রধর রাজসভায় মহামূল্য বলিয়া চটের কাপড় গস্ত করিতেছে। রাজা আদি সকলে চটের কাপড় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু মনে সান্ত্বনা যে মহার্ঘ্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। চন্দ্রধর কিন্তু রাজা ও সভাসদদিগের মূর্খতার উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেছে না। এই অংশটির অনাবিল হাস্যরস বেশ উপভোগ্য।

ডুলাই কাঁড়াবী জানে বাণিজ্যের ভাও। তরী হতে খসাইল ভুটী ভরা তাও ॥
দিঘল পসর যত বড় বড় পড়া। চিত্র বিচিত্র যত রাঙ্গা পাটের ডোরা ॥
রাঙ্গা পাটের খোপণ ফুল সারি সারি। চটের চান্দোয়া খসায় চটের মশারি ॥
চটের দুলিচা খসায় চটের বিছানা। চটের তাম্বু বিকায় চটের শাহবানা ॥
চটের পালঙ্ক খসায় চটের বন্দিস। চটের ইজারবন্দ চটের বালিস ॥
চট কিনিয়া রাজা বসিল সভায়। চটের কামড়ে রাজার গাও চুলকায় ॥

* * *

হরষিতে চট রাজা পিন্ধিল আপনে। তার পাছে পিন্ধিলেক পাত্রমিত্রগণে ॥
খুঁয়ার ধুতি তবে পিন্ধে পুরোহিত। শণ পাট পবিত্র বড় শাস্ত্রেতে বিদিত ॥
মহাদেবীগণে পিন্ধে চটের ডুরাশাড়ি। চটের পাছড়া আর চটের উড়নি ॥
চটের কামড়ে গাও খাজোয়ায় বড়। চন্দ্রধরে বলে মিতা খানিক হৈয়া দড় ॥
তোমার দেশের লোনাপানি খাইছ বিস্তর। দুষ্ট রক্ত যত মারিয়া করে দূর ॥
কামড় খাইয়া অষ্ট চারি থাক। রোগ পীড়া ব্যাধি যত না রহিবে এক ॥
পাত্র মিত্রে বলে আমি অনুমানে জানি। চুষিয়া খাইছে যত গায়ের লোনাপানি ॥

* * *

চান্দ বলে মিত্র তুমি বড় ভাগ্যবান। পাত্র মিত্র যত তোমার দেবতা সমান ॥
আপনি মহাশয় দেবতা চরিত্র। আমার দেশেতে হৈল হালের নিচিন্ত ॥
তোমার সমান আমার দেশের দেবতা। তাহার যতেকগুণ শুন কহি কথা ॥
সাক্ষাতে বিষ্ণু-অংশ দেবতা চরিত্র। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত ভুবন পবিত্র ॥
বনের তৃণ খায় লোক পরিতোষে। যে জনে তাহারে সেবে লক্ষ্মী তথা বৈসে ॥
সংসার পবিত্র হয় পড়ি পদধূলি। গো দেবতা করি আমরা তারে বলি ॥

১। ঢাকা সংস্করণ, পৃঃ ৭০-৭১। ২। 'ভাগ্নে'। ৩। —তেহাই?
৪। ঢাকা সংস্করণ পৃঃ ১৭৭।
৫। 'শিখর'। ৬। ঢাকা সংস্করণ, পৃঃ ১৯১-১৯২। ৭। ধুপ।

সেই দেবতার লক্ষণ আছে তোমার ঠাঁই। সবে মাত্র মিতা তোমার লেজ শিঙ্গা নাই॥
এই দুইখান যদি থাকিত তোমার। যে মারিত গোবধ প্রায়শ্চিত্ত হইত তার॥

* * *

চান্দ বলে মিতা তোমার বুদ্ধি অপার। আমার দেশে হৈলে পারি হাল চষিবার॥১

বিবস্ত্র চন্দ্রধর কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া তীরে উঠিয়াছেন। সেখানে কতকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা চন্দ্রধরকে দেখিয়া দানব মনে করিয়া পলাইয়া নগরে খবর দিল। চন্দ্রধর নারীদের পরিত্যক্ত বস্ত্র হইতে একখানি লইয়া পরিধান করিলেন। ইতিমধ্যে নগরিয়া লোক তাহাকে নির্ঘাত মারিয়া বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া খেদাড়িয়া দিল। এমন সময় চন্দ্রধর দেখিল এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ স্নান করিতে আসিতেছে। তাঁহার নিকট তিনি বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। বংশীদাস অল্প কথায় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ঔদার্য্য সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

হেন কালে এক দ্বিজ স্নান করিবারে।২ ব্রাহ্মণ দেখিয়া চান্দ বলে ধীরে ধীরে॥
করযোড় করি চান্দ কৈল নমস্কার। একখানি বস্ত্র পাইলে পারি পরিবার॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জানে যাচকের ব্যথা। একখানি বস্ত্র পিন্ধন কান্ধে মাত্র পৈতা॥
তথাপি ব্রাহ্মণ জাতি দয়া[৩]র নিধান। পরিধান বস্ত্র চিরি দিল অর্দ্ধখান॥৪

মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়ে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গীয় কবির কাব্যে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানের যথাযথ উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিদের নিকট ভাগীরথীতীরবর্ত্তী অঞ্চলের মোটেই পরিচয় ছিল না, কেবল দুই একটি স্থানের নাম মাত্র জানা ছিল। সেই কারণে তাঁহাদের কাব্যে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে স্থানের উল্লেখে verisimilitude নাই। সেই হেতুই বংশীদাসের কাব্যেও দেখি শ্রীপুর নগরের পর পলাশবাড়ী, তাহার পর বিজয়নগর, গোপালপুর, কামারহাটী, তাহার পর ত্রিবেণীর নিকটেই চম্পকনগর, তাহাও আবার সমুদ্রের তীরে। এই তো চন্দ্রধরের ফিরিবার বেলা। আর যাইবার বেলায়—

নিজ রাজ্য ছাড়াইল হাস্য পরিহাসে। কামারহাটী ছাড়াইল আঁখির নিমেষে॥
মধ্যপুর কুলাচল দক্ষিণে থুইয়া। দুর্জ্জয় প্রতাপগড়া ছাড়াল বাহিয়া॥
গোপালপুর ছাড়াইল রামের নগর। জন্মুতীর্থ বাহিয়া পড়ে কালীদহ সাগর॥
দক্ষিণে গন্ধর্ব্বপুর বামে বীরকুনা। শুকসরা বাহিয়া ধরে মন্দারের থানা॥
পেছলদা বামেতে যায় তাড়াতাড়ি। সম্মুখে নগর দেখে বামে বিষ্ণুপুরী॥৫

বংশীদাসের কাব্যে দুই একটি ছোট ছোট পদ আছে, সেগুলি করুণরসসংযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। হয় ত সেগুলি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচনা। একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বেহুলারে কোলে করি সুমিত্রাএ যে সুন্দরী
কান্দে মায়ে সকরুণ হৈয়া।
মোর ঘরে আছিলা যেন স্বপ্নের কৌতুক হেন
কাল তোরে জামাইয়ে যাইবে লৈয়া॥

* * *

বেহুলার বলয়ে৬ মাও কি লাগিয়া চিন্তা পাও
কন্যা আমি দৈবে পরাধিনী।
ভাল মন্দ যত হৈবে আমার সহিতে যাইবে
তুমি থাক জন্ম-এয়োরাণী॥
সাত ভাই সুখে রৌক রাজার কল্যাণ হৌক
আমার লাগি না কর ক্রন্দন।
কপালে লিখিছে যারে কে তারে খণ্ডাইতে পারে
বলে দ্বিজ বংশীবদন॥৭

[ক্রমশঃ

১। ঢাকা সংস্করণ, পৃঃ ১৯৭-১৯৯।
২। হেনকালে এক বিপ্র আইল দেখিবারে। পাঠান্তর। ৩। মায়ার পাঠান্তর। ৪। ঢাকা সংস্করণ পৃঃ ২১৫, কলিকাতা সংস্করণ, পৃঃ ৪২২-৪২৩।
৫। ঢাকা সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪।
৬। বলয়ে। ৭। ঢাকা সংস্করণ, পৃঃ ২৫০-২৫১।

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রবন্ধটিতে আমি যক্ষ্মা ব্যাধির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এই ব্যাধি আমাদের সমাজে কি ভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, কি ভাবে এটি আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কি কি কারণে এবং কি কি ভাবে আমাদের দেহ এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, এর আলোচনা করেছি। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় এই ব্যাধিসংক্রান্ত অন্য প্রসঙ্গ।

এই ব্যাধির কারণ জানবার পরেই আমাদের জানবার দরকার হয়—এই ব্যাধি দ্বারা যে দেহ আক্রান্ত হয়েছে কি কি লক্ষণ তা সূচিত করে।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধি আকস্মিকভাবে কতকগুলি প্রবল উপসর্গের সাথে আবির্ভূত হয়ে রোগীকে নিমেষমধ্যে শয্যাশায়ী করে ফেলে না—অধিকাংশ সময়েই এই ব্যাধির আবির্ভাব ধীর এবং নিঃশব্দ, অথচ দৃঢ় এবং নিশ্চিত। এই ব্যাধির প্রথম অবস্থায় সাধারণ লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিনই হয়ে পড়ে যে, সে এমন নিষ্ঠুর, এমন কুটিল, এমন হিংস্র একটি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

প্রায়ই এমন হতে দেখা যায় যে, সামান্য পরিশ্রমের পরেই কেমন যেন বোধ হয় একটা দুর্ব্বলতার ভাব—বুকটার ভিতরে কেমন যেন ধড়ফড় করে। নিজেকে কেমন যেন নিস্তেজ লাগে। পড়াশোনা, কাজকর্ম্মে মন লাগতে চায় না, একাগ্রতা বার বার নষ্ট হয়ে যায়, কেমন যেন "কিছু ভাল লাগে না।" যখন তখন সারা দেহে আসে একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদের আভাস, কেমন একটা শূন্য ভাবনায় ইচ্ছে করে সময় কাটাতে। ভাল করে খেতে ইচ্ছে হয় না, খিদে বোধ হয় না। মাঝে মাঝে পেটের গোলমাল লেগেই থাকে—পেটটা কিছুতেই চায় না ভাল থাকতে। সন্ধ্যা বেলার দিকে চোখ-মুখটা একটু জ্বালা করে, হাত-পায়ের তেলোগুলো একটু জ্বালা করে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হতে চায় না, ভোর বেলার ঘুম থেকে উঠবার সময়ে নিজেকে ভারি অবসন্ন বোধ হয়। কখনো কখনো বা রাত্তিরে কপালটা অথবা গা'টা একটু ঘামে।

হঠাৎ একদিন একটু সর্দ্দি করে বসে। এক দাগ ইনফ্লুয়েঞ্জা-মিকশ্চার অথবা এক ফোঁটা আকোনাইট অথবা তুলসীপাতার রস দিয়ে এক পুরিয়া মকরধ্বজ খেয়ে সে সর্দ্দির কোনই উপকার হতে চায় না। একটু হয়তো সর্দ্দিটা কমছে, কিন্তু সুরু হয়ে যায় খুশখুশে কাসি। কখনো কখনো কাসিটা "খুশখুশে" ভাবেই চলতে থাকে, কখনো কখনো বা ওঠে জোরে মাথা চাড়া দিয়ে। ফুটপাথের ওপাশেই যে বিজ্ঞাপনওয়ালা কবরেজ আপনার নজরে পড়ে, আপনি তাঁর কাছ থেকে আনেন একটা পাঁচন লিখিয়ে; অথবা আপনার যে মামা অথবা পিসেমশাই ডাক্তার—তাঁর ডিস্পেনসারী থেকে বিনি পয়সায় নিয়ে আসেন একটা ল্যাল্‌চে রঙের থ্রোট-পেন্ট এবং তুলি করে মহা উৎসাহে লাগাতে সুরু করেন গলায়। কিন্তু সে কাসির উপশম আর কিছুতেই হয় না। একদিন আপনি কেসে থুতু ফেলেন, হঠাৎ খেয়াল করে দেখতে পান, তাতে পরিষ্কার রক্তের ছিটে অথবা সবটুকুই রক্ত; কখনো কখনো বা বেশ কয়েক ঝলকই এল উঠে।

বস্তুতঃ কাসি, রক্ত ওঠা এসব এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণগুলির অন্যতম। এ ছাড়া অন্য প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—জ্বর। ম্যালেরিয়া জ্বরের মত সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে এ জ্বর আসে না, আমাদের পিতামহীদের ভাষায় "ঘুশঘুশে" জ্বর বলে এর প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারি। সাধারণতঃ বিকেল বা সন্ধ্যার দিকেই জ্বরটা বোধ হয়—থার্ম্মোমিটার লাগালে হয়তো নিরেনব্বই অথবা সাড়ে নিরেনব্বই অথবা একশ' খানেক ওঠে। কখনো
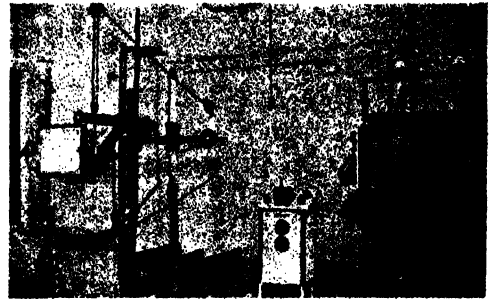
এক্স-রে ফোটো তুলিবার যন্ত্র।

কখনো বা সব সময়েই গায়ে অল্প জ্বর লেগেই থাকে। গাল দুটি হয় একটু অ-স্বাভাবিক ভাবে রক্তিম আভাযুক্ত। নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে।

যক্ষ্মাগ্রস্তের পক্ষে এই নাড়ির বেগটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ঘুশঘুশে জ্বর এই রোগের অত্যন্ত প্রধান লক্ষণ, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে নাড়ির বেগের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরও আছে—অনেক সময়ে গলার স্বর হয়ে যায় ভাঙা-ভাঙা। বুকে বার বার বেদনা হয়। বুকের এই বেদনার ঠিক কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কখনো একটা অস্বস্তিকর চাপ-চাপ বোধ হয়, কখনো বা নিশ্বাস একটু জোরে টানতে গেলেই একেবারে ছুরি বেঁধানোর মত বোধ হয়। তবে অধিকাংশ সময়ে বুকের তেমন কিছু ব্যথা থাকে না। শিশুদের দেহ যখন এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাদের ভিতরেও এই সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। তারা উৎসাহহীন এবং অপটু হয়ে যায়। তাদের যে রকম বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সে রকম হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

একেবারে শুকিয়ে যায়। ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব হয়। বুকের আকার হয় চেপ্টা, গলায় এবং ঘাড়ে জাগে গ্রন্থি-স্ফীতি (enlarged glands.)।

টিউবারকুলোসিসের আর একটি প্রধান লক্ষণ, ক্রমান্বয়ে দেহের ওজনের হ্রাস। আপনার শরীর কিছুতেই ভাল থাকছে না, গলাটা একটু থুশ-থুশ করে, বিকেলের দিকে বেশ ঘুষ-ঘুষ লাগে। একদিন হয়তো শিয়ালদা ইস্টিসানে আপনার মাসিমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে শুধুই একটু মজা দেখবার জন্যে—just for a fun মাল ওজন করবার স্কেলের উপরে একটু উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দেখলেন, অনেক দিন আগে একবার যে আপনি আপনার ওজন নিয়েছিলেন, তার চাইতে বেশ অনেক খানি কমে গেছেন। অমনি একটু চিন্তান্বিত হয়ে আবার পনের বিশ দিন অথবা মাসখানেক পরে আবার নিজের ওজনটা নিলেন। আরও কয়েক পাউণ্ড কম!

বুকের এক্স-রে ফোটো।

ওজনের কথায় প্রথমেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, একজন লোকের দেহের স্বাভাবিক ওজন কত হওয়া উচিত। আমি একটি তালিকা দিলাম—কত ফিট কত ইঞ্চি লম্বা লোকের কত ষ্টোন্ কত পাউণ্ড ওজন হওয়া উচিত এই তালিকায় রয়েছে। ১৪ পাউণ্ডে এক ষ্টোন্ এবং ১ পাউণ্ড—আধ সেরের সামান্য কম।

পুরুষ (পোষাক সহ)

উচ্চতা		ওজন		উচ্চতা		ওজন	
ফিট্	ইঞ্চি	ষ্টোন্	পাউণ্ড	ফিট্	ইঞ্চি	ষ্টোন্	পাউণ্ড
৫	০	৮	০	৫	৭	১০	৮
৫	১	৮	৪	৫	৮	১১	১
৫	২	৯	০	৫	৯	১১	৮
৫	৩	৯	৭	৫	১০	১২	১
৫	৪	৯	১৩	৫	১১	১২	৬
৫	৫	১০	২	৬	০	১২	১০
৫	৬	১০	৫	৬	১	১৩	০

স্ত্রীলোক (পোষাকসহ)

উচ্চতা		ওজন		উচ্চতা		ওজন	
ফিট্	ইঞ্চি	ষ্টোন্	পাউণ্ড	ফিট্	ইঞ্চি	ষ্টোন্	পাউণ্ড
৪	১০	৭	০	৫	৪	৯	২
৪	১১	৭	৪	৫	৫	৯	৯
৫	০	৭	৭	৫	৬	৯	১৩
৫	১	৭	১২	৫	৭	১০	৮
৫	২	৮	২	৫	৮	১১	৪
৫	৩	৮	৯	০	০	০	০

বালক

বয়স	ওজন		বয়স	ওজন	
বৎসর	ষ্টোন্	পাউণ্ড	বৎসর	ষ্টোন্	পাউণ্ড
৬	৩	২	১১	৫	৩
৭	৩	৭	১২	৫	৯
৮	৩	১০	১৩	৬	০
৯	৪	৪	১৪	৬	৮
১০	৪	১৩	১৫	৭	৫

বালিকা

বয়স	ওজন		বয়স	ওজন	
বৎসর	ষ্টোন্	পাউণ্ড	বৎসর	ষ্টোন্	পাউণ্ড
৬	৩	০	১১	৪	১৩
৭	৩	৫	১২	৫	৮
৮	৩	১১	১৩	৬	৫
৯	৪	০	১৪	৭	০
১০	৪	৬	১৫	৭	৮

(এই তালিকাটা আমি নিয়েছি H. Hyslop Thomson, M. D., D. P. H. প্রণীত Tuberculosis, its Prevention and home treatment নামক বইখানা থেকে।)

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকেরই দেহের ওজন অনেক কম—স্বাভাবিক ভাবে যতটা থাকা উচিত, তার চাইতে। তবে ওজন কম থাকাটাই যক্ষ্মা রোগের পরিচায়ক নয়; যে ওজনটা একরকম ভাবেই চিরদিন রয়েছে, অকারণে যদি সহসা ক্রমান্বয়ে তার চাইতে কমতে সুরু হয়, তবেই সন্দেহের নজরে তাকে দেখতে হবে।

একটা কথা বলে রাখা ভাল, দেহ যক্ষ্মাগ্রস্ত হলে প্রথমেই যে সব কটি লক্ষণ একসাথে আবির্ভূত হবে তার কোন মানে নেই এবং সব কটি লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবার চেষ্টা না করা কিছুমাত্র নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেকের এটা বিশেষ ভাবে সমঝে রাখা উচিত যে, বুকের ক্ষত অধিক দূর অগ্রসর হয়ে গেলে এ রোগ থেকে সারবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এতগুলির ভিতরে যে কোন একটি লক্ষণও যদি আপনার দেহে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, অবিলম্বে আপনাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কোথাও কিছু নেই, বেশ ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একদিন খক্ করে একটা কাসি মতন হল—মাটিতে ফেললেন খানিকটে রক্ত! আপনার মাসিমা বললেন—ও কিছু নয়, দাঁত থেকে বেরিয়েছে; তাঁরও একদিন ঐ রকম বেরিয়েছিল। আপনার পিসিমা

বললেন—কিছু নয়, কিছু নয়, গলাটা একটু চিরে বেরিয়েছে; ওই রকম তারও একদিন বেরিয়েছিল। আপনি এই সান্ত্বনায় কর্ণপাত না করে ডাক্তারকে দিয়ে আপনার বুকটা দেখান এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করুন। রক্ত হয়ত আপনার একটুও না উঠতে পারে; শুধুই হয়ত একটা দীর্ঘদিনকার কাসির উৎপাতে কষ্ট পেতে হয় আপনার। অথবা আর কিছুই নেই, খালি বিকেলের দিকে কেমন জ্বর-জ্বর লাগে। এ সবের যে উপদ্রবটাই আসুক না কেন, আপনাকে সাবধান হতে হবে। কখন কখন হয়ত দুটি তিনটি এক সাথে অনুভব করেছেন—জ্বর, কাসি আর বুকে একটু বেদনা। অথবা জ্বর, ওজনে কমে যাওয়া, রাত্তিরে একটু ঘাম। অথবা জ্বর, থুতুর সাথে মাঝে মাঝে রক্তের ছিটে, পেটের গোলমাল—ইত্যাদি। মনে রাখবেন, শরীরের এ সব অবস্থান্তর ঘটবার পরে নিজের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে যত করবেন আপনি বিলম্ব, আপনার অলক্ষ্যে, অদৃশ্যভাবে—ততই ঘনিয়ে আসতে থাকবে আপনার কাল। শেষে আপনার অনুতাপের পরিসীমা থাকবে না—যখন আপনার চিকিৎসক আপনাকে নিষ্করুণ ভাবে শুনিয়ে দেবেন যে, এখন তাঁর সাধ্যের প্রায় অতীত হয়ে গিয়েছে এবং আগে এলে আপনাকে সুস্থ করে তোলা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক, এসব উপদ্রবের আবির্ভাবের সাথে সাথে যে বুদ্ধিমান রোগী নিজের সম্বন্ধে চট্ ক'রে হুঁশিয়ার হয়ে উঠতে পারেনও, অনেক সময়ে তাঁর আর একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হয় ডাক্তার নিয়ে। কোন্ ডাক্তারের পরামর্শ নিলে ভাল হবে, কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকা নিরাপদ—এটা অধিকাংশ সময়ে বহুজনের পক্ষেই হয়ে পড়ে চিন্তার বিষয়। সত্যি কথা বলতে গেলে যাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষ ভাবে নাড়া-চাড়া না করেছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে এই ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক সেই ডাক্তারকেই খুঁজে বের করতে হবে—Pottenger-এর ভাষায় "Who understands Tuberculosis"—অর্থাৎ "যিনি টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন।" Pottenger এর এই কথাটা হালকা ভাবে নেবার জিনিষ নয়। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়ে যে কত সংখ্যাতীত টি-বি রোগীর অক্লেশে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়ে গেছে, তা বলা শক্ত। একজন ডাক্তার একটি অতি খারাপ টাইফয়েড অথবা নিউমোনিয়ার রোগীকে চোক্ষের নিমেষে সুস্থ ক'রে দিয়েছেন, কিম্বা একজন ডাক্তার দারুণ রকমের একটি অ্যাপেনডিসাইটিস্ অথবা ইনটেস্‌টাইন্যাল্ অবস্ট্রাক্‌শানের উপর অস্ত্রোপচার ক'রে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েছেন—কোনো টি-বি রোগী যদি এই সব গল্প শুনে সেই ডাক্তারের কাছে যায় নিজের চিকিৎসার জন্যে; অথবা প্রকাণ্ড একজন M. D. ডাক্তার—যাঁর নাকি বাজারে ভীষণ নাম এবং উপার্জ্জন ততোধিক ভীষণ—যায় তাঁর কাছে নিজের ব্যবস্থা নিতে—তা' হলে সে গুরুতর রকম ভুল করবে। যেতে হবে শুধু তাঁরই কাছে—"Who understands Tuberculosis"—আর কারো কাছে নয়। এবং একথাও ব'লে রাখতে পারি যে, এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা খুব অধিক নয় আমাদের দেশে এবং নিরর্থক বাজে ডাক্তারের কাছে গিয়ে অর্থে, দেহে, মনে সর্ব্বস্বান্ত হবার আগে সেই সব বিশেষজ্ঞদের সন্ধান নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করতে হবে। কতজনে যে কত ডাক্তারের নাম করবেন তার অন্ত নেই, কতজনে যে কত ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে বলবেন তারও অন্ত নেই। কিন্তু রোগীর এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের নিজেদের মস্তিষ্ক রাখতে হবে স্থির। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিতে হবে নিজেদের পথ বেছে—এই ব্যাধির সর্ব্বপ্রকার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব আগে থাকতে উত্তমরূপে উপলব্ধি ক'রে।

রোগী অত্যন্ত অধিকাংশ সময়েই এই রকম ডাক্তারের সংস্পর্শে আসবেন, যিনি প্রথমেই রোগীকে তার থুতুটা পরীক্ষা করিয়ে আনতে বললেন। থুতুটা পরীক্ষিত হয়ে আসবার পরে রিপোর্টে হয় তো দেখা গেল যে থুতুতে T-B

ষ্টেথেসকোপ দ্বারা বুক পরীক্ষা।

Bacilli অর্থাৎ যক্ষা-জীবাণু পাওয়া যায় নাই। অমনি হয় তো ডাক্তার বলে বসবেন স্পিউটাম যখন নেগেটিভ, তখন তিনি নিশ্চয় করে কিছুতেই বলতে পারেন না যে, এই ব্যধি হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাঁরা এই একটি মাত্র অজুহাত দেখিয়ে এই ব্যাধিকে অস্বীকার করতে পান প্রয়াস। Lawrason Brown ঠিক এই ধরণের চিকিৎসকদের সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন যে, "He who always waits for tubercle bacilli to appear in the sputum before making a positive diagnosis, is apt to come to the conclusion that many cases of Pulmonary cases of Pulmonary Tuberculosis have slight chances of recovery." অর্থাৎ যিনি না কি সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করবার আগে কেবলই থুতুতে যক্ষা-বীজাণুর আবির্ভাবের অপেক্ষা করেন, তিনি ধরে রাখতে পারেন যে, তা হলে খুব কম যক্ষা রোগীরই সারবার সম্ভাবনা আছে। রোগের প্রথম অবস্থায়

অনেক সময়ে থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া যায় না। প্রথম অবস্থায় কেন, অনেক সময়ে রোগ যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গেলেও থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু আবির্ভূত হয় না, অবশ্য যদিও অধিকাংশ সময়েই সাধারণত হয়ে থাকে। থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু না পাওয়া গেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবার মত মারাত্মক ভুল যেন কখনও কেউ না করেন। যাদের থুতুতে জীবাণু পাওয়া যায় এবং যাদের পাওয়া যায় না,—বিশেষজ্ঞেরা open cases এবং closed cases এই দুই ভাগে তাদের দু' দলকে ভাগ করেছেন।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বুক পরীক্ষা করে কোন সন্দেহের কারণ দেখলেই বুকের একখানা "এক্স-রে" ফটো নেবার জন্যে নিশ্চয়ই বলবেন। বুকের অবস্থা ভাল ভাবে নির্ণয় করবার জন্যে "এক্স-রে" আজকাল অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ষ্টেথোস্কোপের পরীক্ষায় বুকের সব দোষ ধরা পড়ে না; এক্স-রে দ্বারা সেগুলি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। বুকের এক্স-রে ফটো তুলতে রোগীর কিছুমাত্র অন্যথা করা উচিত নয়।
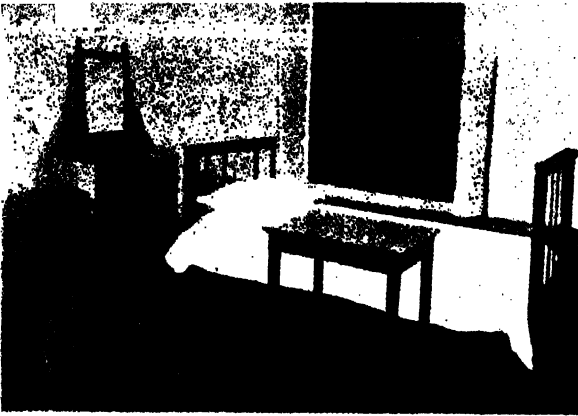
টি. বি. রোগীর শয়নকক্ষ (যাদবপুর হাসপাতাল)

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে কয়েকটি ঠিকানা আমি দিচ্ছি। বাংলা দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ একটি টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসান স্থাপিত হয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েসান কতকগুলি কেন্দ্র খুলেছেন, সেখানে সমাগত রোগীদের বুক পরীক্ষা করা হয়, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়, বুকের এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও অল্প-বিস্তর করা হয়। কিন্তু এসব আউট-ডোরের চিকিৎসায় এ ব্যাধির চিকিৎসা কুলায় না—টানা-হ্যাঁচড়া করে রোগীর আরও ক্ষতিই করা হয়। শরীর খারাপ হবার সাথে সাথে যখন মনে সংশয় এসে উপস্থিত হয়, তখন এসব স্থানে গেলে রোগ নির্ণয় সঠিক ভাবে হবে এবং ডাক্তারের কাছে ভাল করে জিজ্ঞাসা ক'রে নিজের তখনকার কর্ত্তব্য মোটামুটি জেনে আসা চলবে।

এই কেন্দ্রগুলিতে সমাগত রোগীদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হয় না, তবে এক্স-রের জন্যে যৎসামান্য চার্জ্জ করা হয়। রোগী নিতান্ত দরিদ্র হলে এটুকুও মাপ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রগুলির ঠিকানা :—

১। ২৪নং গোবরাচাঁদ রোড, ইটালী, কলিকাতা।
২। জেনারেল হাসপাতাল, হাওড়া।
৩। বুক-পরীক্ষা বিভাগ, মেডিকেল কলেজ, কলুটোলা ষ্ট্রীট।
৪। ইস্‌লামিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, ১নং বলাই দত্ত ষ্ট্রীট।
৫। ২৬নং স্যার গুরুদাস রোড, নারিকেল ডাঙ্গা।

এখানে আর একটি কথা আমি বলতে চাই। অনেক ডাক্তার এবং অনেক রোগীর আত্মীয়-স্বজনের একটি বদ্‌অভ্যাস আছে—রোগীর কাছে তার অসুস্থতার বিষয় গোপন রাখা। কিন্তু এর চেয়ে অন্যায় এবং নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না—অন্ততঃ যেখানে এই রোগের কথা আসে। হ'তে পারে হয় তো কোন কোন ব্যাধি এমনতর থাকতে পারে, যার গুরুত্ব অনেক সময়ে কিছুটা চেপে রাখবার দরকার হয়—বিশেষ করে রোগী যদি অত্যন্ত ভীতু স্বভাবের হয়; কিন্তু এই রোগ নিয়ে এই সব চাপাচাপি অতিরিক্ত মাত্রায় অসঙ্গত। রোগীকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে, তার কি ব্যাধি হয়েছে, এই ব্যাধি থেকে সারতে হলে তাকে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতেই হবে, তার থেকে যাতে অপর কারুর এই ব্যাধি না হয় সে জন্যে সে নিজে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য এবং নিজের দোষে সে নিজের কি গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। মোটের উপর তার ব্যাধির প্রকৃতি এবং তার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রথমটা হয় তো রোগী একটা কঠিন আঘাত পাবে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে তা উঠতে পারবে সামলে। মনে রাখা উচিত, এ রোগে অনেকটা রোগী নিজেই নিজের চিকিৎসক এবং তার নিজের উপরে নিজের ভাল-মন্দ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। অবশ্য সর্ব্ববিষয়ে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে রোগীকে সর্ব্বদাই নিরুপায় হয়ে পড়তে হয়; কিন্তু পারিপার্শ্বিক যেখানে অনুকূল, আমি সেখানকার কথাই বলছি। আর রোগীর নিজেরও কোন রকম লুকোচুরী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কোন মতেই; আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি তার ভিতরে তিল মাত্রও থাকা উচিত নয়। শরীর যখন সুস্পষ্ট রূপে খারাপ হ'তে সুরু করেছে, তখন "কিছু নয়" বলে উড়িয়ে দেওয়া নয়, থুতুর সাথে রক্তের ছিট দেখা গেলে তাকে দাঁতের অথবা গলার বলে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করা নয়—দাঁড়াতে হবে সত্যের একেবারে মুখোমুখি —সাহসের সাথে বুক বেঁধে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক নানা উপায়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে যখন টি-বি বলে মত প্রকাশ করবেন তখন চিকিৎসকের প্রতি অতি মাত্রায় বিরূপ হয়ে উঠে তাঁর মুণ্ডপাত করা অথবা তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য মনে মনে প্রকাশ করা নয়—দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিতে হবে নিজেকে ব্যাধিগ্রস্ত ব'লে এবং অবলম্বন করতে হবে নিজেকে সুস্থ ক'রে তুলবার যথাযথ উপায়।

এবারে এই ব্যাধির চিকিৎসার বিষয় কিছু ব'লব। এই ব্যাধির চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হচ্ছে—বিশ্রাম। এই "বিশ্রাম" কথাটির অর্থ যে কতখানি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে হবে, তা' বিশেষভাবে বুঝিয়ে না বললে হয় ত

অনেকে কল্পনাই করতে পারবেন না। সর্ব্বসাধারণের কথা ছেড়ে দিই—ডাক্তারদের ভিতরেও খুব কম লোকই জানেন যে, একজন টি-বি রোগীর পক্ষে গুরুত্ব কতখানি হওয়া উচিত। রোগীর কাছে এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ তিনিই বলতে পারেন, যিনি নাকি টিউবার কুলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন—"Who understands Tuberculosis." প্রকৃতপক্ষে একজন টি-বি রোগীর অধিকাংশ উপসর্গের প্রাবল্য কমিয়ে আনবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সূর্য্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্য্যাস্ত অবধি—সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রিই রোগীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। যদি প্রত্যেকটি উপসর্গ প্রবল হয় এবং ফুসফুসে ব্যাধির বিস্তৃতি যদি বেশী হয়, তবে বিছানার উপরে উঠে বসা পর্য্যন্ত নিষেধ। একে ইংরাজীতে বলা হয়েছে—"Absolute rest in bed." একজন রোগীকে যতদিন পর্য্যন্ত "absolute rest" নিতে হবে, তখন তার খাবার জন্যে উঠে বসা, উঠে বসে হাতমুখ ধোয়া, নিজে নিজের শরীর স্পঞ্জ করা, উঠে মলত্যাগ করতে যাওয়া, লেখা, পড়া, কথা বলা, নিজের বিছানা নিজে পাল্টানো, দাঁড়িয়ে থাকা···ইত্যাদি ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ। তবে উপসর্গগুলি যদি বিশেষ রকম প্রবল না থাকে এবং ফুসফুস্ যদি বেশী রকম ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দু' পাঁচ মিনিটের জন্য উঠে বসে খাওয়া, অথবা এক এক সময়ে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের জন্যে হালকা কোন বই পড়া বা দু'চার পা হেঁটে মলত্যাগ করতে যাওয়া, বিছানায় বসে চুলটা একটু আঁচড়ে মুখখানাকে একটু মিষ্টি করা···ইত্যাদি অতি হাল্কা এবং অতি সংক্ষিপ্ত দু'চারটি কাজ দিনের ভিতরে অতি সামান্য বারের জন্যে করা চলতে পারে। বিশ্রাম যে কতকাল যাবৎ নিতে হবে তার কোনই বাঁধাধরা নিয়ম নেই—রোগীর বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু করবে নির্ভর। খুব অল্পদিন নেবারও প্রয়োজন হ'তে পারে, আবার খুব দীর্ঘদিন নেবারও প্রয়োজন হ'তে পারে। বিশ্রামের অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কেমন করে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং কে কতখানি শ্রমের উপযুক্ত হবে তার আলোচনা যথাস্থানে থাকবে।

এই বিশ্রাম কথাটার অর্থ ঠিক মত বুঝতে না পেরে কত অসংখ্য রোগী যে নিজের সর্ব্বনাশ করে তা' বলবার নয়। আর রোগীর দোষও প্রকৃত পক্ষে নয়, দেখা যায় যে ডাক্তাররাই (যে সব ডাক্তার জানেনই না তাঁদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, যাঁরা জানেন তাঁরাও) খুব কম সময়েই রোগীকে একথা একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন যে, বিশ্রামের অবহেলা করলে রক্তসঞ্চালনের সাথে ব্যাধির বিষ কেমন করে দেহে বেশী করে ছড়িয়ে পড়বে, এবং "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" বস্তুটা ঠিক কি। আমেরিকার National Tuberculosis Association থেকে প্রকাশিত Outdoor-Life Journal-এর একটি সংখ্যায় ডাক্তার J. H. Elliot, M. D. The Value of Rest নামক একটি প্রবন্ধে দু'জন রোগীর যে কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছেন, তা' এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"রোগীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কাজকর্ম্ম এখন সে করতে পারবে না, আর ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থেকে তার বিশ্রাম নিতে হবে। সে ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে তার বিবেচনায় বিশ্রাম পালন করতে থাকল। খাওয়াটা অবিশ্যি বিছানাতেই সেরে সে তার সকালের শয্যা ছাড়ত বেলা এগারোর সময়ে, তারপরে বেরিয়ে পড়ত সহরের রাস্তায় খানিক ঘুরবার জন্যে। প্রথমে ঢুকল হয়ত এক নাপিতের দোকানে, সেখানে বসে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারল, আর এক জায়গায় ঢুকে আরো খানিকটা সময় হয়ত কাটাল। তারপর বাড়ীতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে আবার বিকেলে এক বন্ধুকে নিয়ে মোটরগাড়ী করে হাওয়া খেতে বেরুল অথবা এক পাড়াপড়শীর সাথে খানিক খোসগল্প করে এল—সারাটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সম্পূর্ণ বিশ্রাম

"আর একটি রোগী খাওয়ার জন্যে উপরতলা থেকে নীচতলায় আসত দিনে তিনবার করে। দাড়ি কামাবার জন্যে এবং নানান্ জন্যে বাথরুমে করত কয়েকবার যাতায়াত। তা' ছাড়া একটা কিছু ভুলে ফেলে রেখে এল—সেটা আনবার জন্যে আরও বার কত করত উপর-নীচে ওঠা-নামা। এসব জেনে একদিন আমি তাকে বললাম একটা Pedometer ব্যবহার করতে—দেখবার জন্যে যে সে দৈনিক কতটুকু করে হাঁটছে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, সে দৈনিক ঠিক দেড় মাইল করে হাঁটছে।"

ডাক্তার ইলিয়ট্ তাঁর একটি রোগিণীর কথা বলেছেন যে, সেই মেয়েটি সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে খানিকটা ত্যাগস্বীকার এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে পুরো দুটি বছর কড়া বিশ্রামে থেকে কেমন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বামী এবং সন্তানের সাথে আবার মিলিত হয়েছে এবং সেই মেয়েটিরই আর দুটি বন্ধু, যারা নাকি তাদের ডাক্তারকে এই ভাবে বলত: "ডাক্তারবাবু, আমাকে একটি দিনের জন্যে কি চায়ের পার্টিতে যেতে দেবেন না? অথবা, শুধু একটি দিনের জন্যে একটু মোটরে চড়ে আসতে দেবেন না? অথবা, শুধু একটি বারের জন্যে এই ফিল্মটি দেখে আসতে দেবেন না? আমি ভারি সতর্ক থাকব, এবং হৈ চৈ একটুও করব না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি

মনে করেন যে, এই রকম একটু আধটু পরিবর্ত্তন দ্বারা আমার কোন ক্ষতি না হয়ে বরং উপকারই হবে!"—সেই মেয়েটির সেই দুটি বন্ধু শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ডাক্তার ইলিয়ট তাঁর প্রবন্ধের শেষে আক্ষেপ করে বলছেন,—

"With relative rest patients do exceedingly well as a rule. They gain weight, lose their fever and lose other troublesome symptoms but the lesion in the lungs retrogress but little, and slowly but surely with increasing laxity in the rest cure, it flames up again with disastrous results. We all know such cases. How many do well for a time only to relapse! And in many of these cases it is due to the relaxation of the rest restrictions."

অর্থাৎ, "বিশ্রাম সম্বন্ধে কড়াকড়ি খানিকটা কমানর অবস্থাতে রোগীদের বেশ ভালই থাকতে দেখা গিয়েছে। ওজন বাড়ে, জ্বর কমে, অন্যান্য কষ্টদায়ক উপসর্গগুলিও কমে; কিন্তু বুকের ক্ষত খুব অল্পই কমে এবং একটু একটু করে বিশ্রামের অবহেলার সাথে সাথে সেই ক্ষত সহসা একদিন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে রোগীদের সর্ব্বনাশ ঘটায়। আমরা এ সব ঘটনা জানি। অত্যন্ত সাময়িক একটু উন্নতির পরে কত জনের ব্যাধিই যে প্রবল ভাবে বেড়ে পড়ে! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা ঘটে শুধু বিশ্রামের ত্রুটির ফলেই।"

আর রোগী যেন বিশ্রাম বলতে শুধু শরীরের বিশ্রামই না বোঝেন, সাথে সাথে মনকেও দিতে হবে বিশ্রাম। এবং এই মনকে বিশ্রাম দেওয়াই হচ্ছে আরও ঢের শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যে করেই হোক রোগীকে ক্রমাগত চেষ্টা করে মনের বিশ্রাম অভ্যাস করতেই হবে। শরীরকে বিছানার উপরে জোর ক'রে কোনমতে লম্বা করে রেখে নিজের ব্যাধি নিয়ে, সাংসারিক আরও দশটি বিষয় নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে—কেবলই যদি মনের ভিতর তোলাপাড়া করতে থাকা যায়, সহস্র দুশ্চিন্তার ঘোড়ায় চড়িয়ে মনকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকা যায় দিল্লী আর লাহোর—তা' হলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, রোগীর আরোগ্যের মূলে যথেষ্ট কুঠারাঘাত হবে। কোন ভাবনা নয়, কোন চিন্তা নয়—শরীর এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে ঢিল করে দিয়ে থাকতে হবে বিছানায় পড়ে। বিশ্রাম নিতে হবে—একজন ডাক্তারের ভাষায়—in very much the attitude in which you would expect to find a dead soldier lying on the battlefield. অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের একজন মৃত সৈনিকের মত পড়ে থেকে। এই ডাক্তার বলেছেন যে, বিশ্রাম নেবার সময়ে নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবেই সচেতন থাকতে পারবে না এবং নিজের শরীর-মনকে এত "ছেড়ে দিয়ে" পড়ে থাকতে হবে যে, কেউ যদি তোমার খাটের ফিতে কেটে দেয় তবে তোমার collapse on the floor will be complete—অর্থাৎ মেঝের ওপরে সটাং চিৎপটাং।

বিশ্রাম ছাড়া এই ব্যাধির চিকিৎসায় আর একটি প্রধান অঙ্গ পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এই ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা এই ব্যাধির চিকিৎসায় অপরিহার্য্য। এখন পুষ্টিকর খাদ্য বলতে মোটামুটি কি বোঝায় সেটা দেখা দরকার। কোন্ কোন্ খাদ্য-দ্রব্যের ভিতরে কোন কোন নম্বরের ভিটামিন কি কি পরিমাণ করে আছে, খাদ্যের ভিতরে কোনটি প্রোটিন জাতীয়, কোনটি কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয়, কোনটি ফ্যাট্ জাতীয়, অথবা কোনটির কি কার্য্য—এ সবের ফিরিস্তি এখানে দেবার কোন প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। এই রোগীর পক্ষে খাওয়ার দ্রব্য সম্বন্ধে খুব বেশী বাছ-বিচার কিছু করবার দরকার হয় না, অথবা ভয়ানক রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিষের দোষগুণের হিসাব করে খেতে হয় না। সাধারণ সুস্থ মানুষ যা' খায়, একজন টি-বি রোগী সে সবই খেতে পারে। সাগু বার্লি খেয়ে থাকতে হবে সে রকমও কিছু নয়, অথবা কলা খাব তো মূলো খাব না, মূলো খাব তো সজনে খাব না—সে রকমও কিছু নয়।

টি-বি রোগীর পক্ষে দুধটা মস্ত দরকারী জিনিষ—প্রতিবারের খাবারের সাথে বেশ খানিকটা করে দুধ খাওয়া দরকার। এক একবারে এক পোয়া, দেড় পোয়া করে একজন টি-বি রোগীর দৈনিক একসের দেড়সের দুধ খেতে চেষ্টা করা উচিত। মাছ, মাংস, ডাল, সবরকম তরিতরকারিই রোগীর খেতে হবে। ডিম, মাখন খাওয়ার দরকার। খাওয়ার উপকরণের সাথে নানারকম ফলমূলও থাকবে। ভাত, রুটি, লুচি সবই চলবে।

শুধু যে জিনিষগুলির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হচ্ছে এই: রোগীর খাবারের প্রত্যেকটি জিনিষ টাটকা হওয়া দরকার। মাছ, মাংস ডিম—এগুলি যদি ভালরকম টাটকা না পাওয়া যায় তবে একদম ব্যবহার না করাই ভাল। রোগীর রান্নায় বেশী মশলাপাতি থাকা একেবারেই উচিত নয়—যাতে নাকি জিনিষের গুণ নষ্ট হয় এবং গুরুপাক হয়ে ওঠে। অত্যন্ত কম মশলায় তরি তরকারি যথাসম্ভব সুস্বাদু করে রোগীর জন্যে বেশ হালকা রান্না করতে হবে। প্রতিদিনকার খাওয়া একেবারে একঘেয়ে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর মুখে অরুচির ভাব না থাকে এবং আহার্য্যগ্রহণকালে তার মন বিমুখ হয়ে না থাকে। কোন রকম ভাজা জিনিষ রোগীর একেবারেই ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীর খাবার জিনিষের উপরে মাছি, ধুলো, বালি যেন না পড়তে পারে।

আগেকার দিনে এই রোগীকে একেবারে পেট বোঝাই করে খাওয়ানর ব্যবস্থা ছিল। ওজনে কেবলই বাড়াতে হবে—এদিকেই ছিল ডাক্তারদের লক্ষ্য। সেকালের সেই Nordrach treatment-এর over-feeding-এর হাওয়া আজকাল সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে বইতে সুরু করেছে। যক্ষ্মা-রোগীকে ঠেসে খাওয়ানর ব্যবস্থা—যেমন না কি আমরা Dr Gibson-এর Nordrach Treatment ধরণের বইতে দেখতে পাই—আজকাল সব জায়গা থেকে উঠে গিয়েছে। রোগীকে ওজনের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, কিন্তু অতিরিক্ত মোটা হবার তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। Lawrason Brown বলছেন "The patient should eat as little as it is possible in order to gain gradually in weight. Too great a gain, however, may be a serious handicap." অর্থাৎ ধীরে ধীরে ওজনে বাড়াবার জন্যে যথাসম্ভব কম

করেই খাওয়া উচিত। আর অতিরিক্ত ওজনে বাড়াটা বিঘ্নজনক। বস্তুত শরীরে অতিরিক্ত চর্ব্বি জমবার ফলে নূতনর রকমরকম উপসর্গ দ্বারা রোগীর বিড়ম্বিত হওয়া যথেষ্ট সম্ভব।

এ ছাড়া আর একটি দিক আছে, অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে অতিরিক্ত ওজনে বাড়াবার কু-চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক রোগী তাদের পেটের একেবারে এমন সর্ব্বনাশ করে বসে, যার প্রতীকার নাকি শেষে সারাজীবনের চেষ্টাতেও আর হয় না। খাওয়াটাকে চালাতে হবে পেটের দিকে লক্ষ্য রেখে, যাতে করে কোনো ভাবেই পেটটা খারাপ না হয়। অধিকাংশ টি-বি রোগীর প্রায়ই পেটের গোলমাল লেগে থাকে এবং পেটটা ভাল রাখতে না পারলে শরীরের উন্নতি যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে। কি জিনিষ খেয়ে পেটের গোলমাল হয় সেটা খুব লক্ষ্য রাখা দরকার। কারুর কারুর মাছ-মাংস খেলে পেটের গোলমাল হয়। তাদের মাছ মাংস ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারুর কারুর দুধ খেলে পেটের গোলমাল হয়। এ রকম হলে দুধকে অন্য কোনভাবে তৈরী করে খেতে চেষ্টা করা যেতে পারে, যেমন ঘোল করে অথবা দই করে অথবা ছানা করে। দরকার হলে বেঞ্জারস ফুড বা গ্ল্যাসমন অ্যারারুট ইত্যাদি জাতীয় জিনিষ দিয়ে দুধ তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে। দুধ যাদের সহ্য হতে চায় না, তাদের একবারেই বেশী পরিমাণে দুধ খেতে চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমে অল্প থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে পরিমাণ সহ্যমত বাড়াতে হবে।

যক্ষ্মারোগীর দিনের ভিতরে কবার খাওয়া উচিত এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। সুস্থ লোকেরা সাধারণতঃ দিনের মধ্যে চারবার খেয়ে থাকেন সকালে, দুপুরে, বিকালে এবং রাত্রে। যক্ষ্মারোগীরাও ঠিক এই নিয়মেই খাওয়া চালাতে পারেন অথবা পেটের অবস্থা সুবিধাজনক না থাকলে বিকালের আহার একেবারে তুলে দিতে পারেন। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই টি-বি রোগীর পক্ষে তিনবার আহারই সব চেয়ে ভাল বলে মনে করেন এবং বিকালে কিছু খেলেও অত্যন্ত হাল্কা ধরণের কিছু অতি সামান্য পরিমাণে খেতে হবে। খানিকটা দুধ এই সময় না খাওয়াই ভাল, এতে প্রায়ই পেটের গোলমাল হয়। অনেক সময়ে ডাক্তার রোগীকে কড-লিভার অয়েলের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন; কিন্তু পেট খারাপ করে কি না সেদিকে লক্ষ্য রেখে কডলিভার অয়েল ব্যবহার করতে হবে। পেটের গোলমাল হলে ব্যবহার করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অনেক সময়ে রোগীকে সামান্য পরিমাণে বার বার খাওয়ানরও প্রয়োজন হতে পারে। সে ব্যবস্থা ডাক্তার অবস্থা বুঝে করবেন। আর পেটের গোলমাল বলতে এখানে আমি সব রকমই বোঝাচ্ছি—অ্যাসিডিটি, ডাইরিয়া, কনসটিপেসান, ডিসেণ্টেরী ইত্যাদি।

ভাল খাওয়া ছাড়া আর একটি জিনিষ হচ্ছে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ু—যা নাকি যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ু বলতেও সাধারণ লোকের আছে নানা রকম ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, যেমন না কি বিশ্রাম সম্বন্ধে। রোগীর জন্যে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা কেমন করে করতে হবে আমি এখানে বলছি।

প্রথমতঃ রোগী যদি সহরবাসী হন এবং সে সহর যদি কলকাতার মতন হয়, তবে রোগীর সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত, সেখান থেকে সরে পড়া এবং মফঃস্বলে কোনো একটা গ্রামের মত জায়গায় গিয়ে বাস—যেখানে ধুলো, ধোঁয়ার উৎপাত কিছুমাত্র নেই। তবে বেশী দূরে গেলে যদি নানা কারণে—বিশেষ করে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ার দিক থেকে সুবিধাজনক না হয়, তবে একেবারে সহরের ভিতরে না থেকে সহরের বাইরে যে সব জায়গায় ধুলো, ধোঁয়া, ঘিঞ্জী অনেক কম—সেখানে অথবা সহর ছেড়ে পাঁচ সাত মাইল দূরে গিয়ে অন্তত রোগীর থাকতে চেষ্টা করা উচিত। তারপরের কথা হচ্ছে রোগী যে ঘরে শোবে—সে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দরজা-জানালা থাকা চাই এবং সেই দরোজা-জানালা খুলে রাখতে হবে সমস্ত দিন এবং রাত—কি গ্রীষ্ম, কি শীত—সব দিনে এই ভুল ধারণা মন থেকে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে যে, রাত্তিরে দরজা-জানালা খুলে শুলে পরে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। প্রকৃতপক্ষে দরজা-জানালা খুলে শুলে ঠাণ্ডা লাগে না—ঠাণ্ডা লাগে সব বন্ধ করে শুলেই। খোলা বাতাসের প্রতি ক্রমাগত বিমুখতার ফলে আমাদের শরীর এমনভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে যে, একটুক্ষণ খোলা জায়গায় থাকলে যখন তখন সামান্য কারণেই যায় আমাদের ঠাণ্ডা লেগে। ধীরে ধীরে একবার যদি জানালা-দরজা খুলে শোওয়া অভ্যাস করে ফেলতে পারা যায়, তবে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আর কস্মিন কালেও থাকবে না এবং একবার ভাল রকম অভ্যাস হয়ে গেলে তখন বন্ধ ঘরে শুতেই হাঁপিয়ে উঠতে হবে—শুধু তাই নয়, শুতে অবশেষে ঘৃণা বোধ হবে। প্রচণ্ডতম শীতের দিনেও গায়ে ভাল করে লেপ-কম্বল জড়িয়ে রোগী অনায়াসে ঘরে দূরে থাক—বারাণ্ডায়ও এসে শুয়ে সারাদিন রাত কাটাতে পারেন—তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। "ক্ষতি হবে না"—শুধু কি বলছি—সারবার মতলব থাকলে দস্তুরমত এইভাবেই রোগীকে শোবার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, সমস্ত শরীরটা এবং মাথা যদি ভালভাবে ঢাকা থাকে—প্রত্যেক ঋতুর প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্রে—তবে খোলা বাতাসে শুলে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় কিছুমাত্র থাকে না। এখানে একটা সতর্কবাণীর প্রয়োজন—মুখ ঢেকে যেন রোগী কদাচ না শোন্।

মুক্ত, বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকবার উপকারিতা কিছুদিনের ভিতরেই বেশ বুঝতে পারা যায়। জ্বর বেশ কমে আসতে থাকে, হজমশক্তি একটু একটু করে বাড়তে থাকে, বিবর্ণ দেহে বেশ অল্পে অল্পে রক্তের আভা দেখা দেয়। আর, আমি বিশ্রাম নেবার কথা যা বলেছি, যার গুরুত্ব নাকি টি-বি-র চিকিৎসায় অত্যন্ত বেশী—সে রকম বিশ্রাম মুক্ত বায়ুতে ছাড়া নেওয়া প্রায় অসম্ভব। বদ্ধ ঘরের বিষাক্ত, গুমোট হাওয়ায় মন ছটফট করতে থাকে এবং বিশ্রামের হয় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত। কিন্তু মুক্ত বায়ুতে একেবারে তার উল্টো। বাইরের মনোরম, ঝিরঝিরে হাওয়ার কোমল, সস্নেহ স্পর্শ শরীরে এসে লাগবার সাথে সাথে মস্তিষ্কের উত্তেজনা আসে কমে, মনে জাগে বেশ একটা শান্ত ভাব। বেশ চুপচাপ শুয়ে থাকতে অতটা আর কষ্ট হয় না।

আর একটি কথা বলবার আছে, ঘরের হাওয়া যদি স্থির, শুষ্ক হয়, তবে ক্ষমতায় কুলোলে এবং সুযোগ থাকলে ঘরে বিদ্যুৎচালিত পাখার সাহায্যে ঘরের বাতাসকে বেশ ইতস্তত সঞ্চালিত করবার ব্যবস্থা করতে পারলে সেটার ক্রিয়া আরও অনেক ভাল হবে।

প্রত্যেকটি কাজে নিয়মানুবর্ত্তিতা অভ্যাস করা টি-বি রোগীর একান্ত প্রয়োজন। পথ্যগ্রহণ, বিশ্রাম, ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজ প্রতিদিন একেবারে ঘড়ির কাঁটায় চালাতে হবে। নিয়মিতভাবে এক সপ্তাহ বা দুসপ্তাহ অন্তর ওজন নিতে হবে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—ঘণ্টা চারেক অন্তর প্রতিদিন নিয়মিত টেম্পারেচার নিতে হবে এবং তা খাতায় লিখে রাখতে হবে। দিনে সকালে এবং বিকেলে অন্ততঃ দুইবার নাড়ির বেগ মিনিটে কত করে হয় দেখে খাতায় লিখে রাখতে হবে। রোগীর উন্নতি

ট. বি. রোগীর কটেজ (ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়াম)।

অবনতি, রোগের প্রকৃতি এবং গতি ইত্যাদি স্থির করতে পালস্ এবং টেম্পারেচারের প্রতি ক্রমাগত অত্যন্ত লক্ষ্য রেখে চলবার প্রয়োজন হয়। কাজেই যে খাতায় এগুলি নোট করা থাকবে সে খাতাখানা খুব যত্নে রাখতে হবে।

টেম্পারেচার নেওয়া, পালস্ দেখা, ওজন নেওয়া—এগুলির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আছে। রোগী যেমন সব সময় মনে রাখেন যে, সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় তাঁর যে টেম্পারেচার ওঠে সেটাই দরকার। খানিকক্ষণ গল্প করে অথবা বই পড়ে অথবা অন্য কোন ভাবে কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে তখন জ্বর দেখবার বিধি নয়। প্রত্যেকবার টেম্পারেচার নেওয়ার আগে অন্ততঃ আধ ঘণ্টাখানেক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। এই আধ ঘণ্টার ভিতরে ঠাণ্ডা হোক গরম হোক কোনো কিছু খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই সব নিয়মগুলির অবহেলা করলে টেম্পারেচার ঠিকমত থার্মোমিটারে উঠবে না; হয় উঠবে কম, না হয় বেশী। বগলে যেন কেউ জ্বর না দেখেন, ওতে জ্বর ঠিক ওঠে না। ঘড়ির কাঁটা দেখে পুরো পাঁচটি মিনিট জিভের নীচে থার্মোমিটার রেখে টেম্পারেচার নিতে হবে। আধমিনিটের মার্কামারা থার্মোমিটারও পুরো পাঁচ মিনিট রাখতে হবে, আধ মিনিটে কদাচিৎ সঠিক টেম্পারেচার ওঠে। মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে টেম্পারেচার দেখে আলকোহল জাতীয় কোন ওষুধে একটু তুলো ভিজিয়ে থার্মোমিটারটা বেশ করে মুছে ঝেড়ে ৯৫ ডিগ্রীর ওদিকে নামিয়ে খাপে বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। একটা শিশিতে লোশানের ভিতরও থার্মোমিটার ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাতে থার্মোমিটারের দাগগুলি কয়েকদিন পরে উঠে যায় এবং টেম্পারেচার দেখবার অসুবিধা হয়। রোগীর নিজের থার্মোমিটার ঝাড়বার চেষ্টা করা সব সময়ে উচিত নয়, অপরের সাহায্য নেওয়াই ভাল। আর সকালের টেম্পারেচারটা নেবার নিয়ম হচ্ছে একেবারে ভোরে ঘুম ভাঙবার সাথে সাথেই। সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতে হবে তারপরে। প্রথমবারের পালসও ঠিক এই সময়েই নিতে হবে। তারপর আর একবার পালসটা নিতে হবে বিকেলের দিকে। দিনের ভিতরে কোন সময়ে সব চেয়ে জ্বর এবং নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পায় সেটা নোট করতে হবে। পালস দেখতে অন্যথা করা কিছুতেই উচিত নয়—কারণ টেম্পারেচারের চাইতে পালসের গুরুত্ব বেশী। একটি রোগীর জ্বর ৯৯° এবং পালস ৭০—৭২ যদি হয়, এবং আর একটি রোগীর জ্বর ৯৮'৪° এবং পালস ৯০—৯২ হয়—তবে আগের রোগীটিরই prognosis ভাল। আর অনেক সময়েই অতি সামান্য কারণে যক্ষ্মা রোগীর পালস অত্যন্ত বেড়ে যায়। কারুর উপরে একটু রাগ করলে, সামান্য একটুক্ষণ কথা বললে, একখানি চিঠি লিখলে, হঠাৎ কোন প্রীতি-পাত্রকে দেখতে পেলে, ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকলে—অতি সামান্য রকম কোন উত্তেজনা হলেই পালস ভীষণ বেড়ে যায়—বিশেষ করে যে রোগী একটু ভাবপ্রবণ তার তো কথাই নেই। এই সব উত্তেজনার মুখে পালস নিতে নেই, শরীর-মনের বেশ শান্ত এবং বিশ্রামের অবস্থায় নাড়ির বেগ যা হয় সেইটেই ডাক্তারকে দেখাবার জন্যে খাতায় টুকে রাখতে হবে। আর ওজন ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ অন্তর নিয়মিত নিতে হবে বলেছি। ওজন নেবারও একটু নিয়ম আছে। দিনের যে সময়টাতে যে পোষাকে প্রথম দিন ওজন নেওয়া হবে, পরেও দিনের সেই সময়ে এবং ঠিক সেই পোষাকে ওজন নিয়ে চলতে হবে। তা' না হ'লে ওজনটা সঠিক হবে না।

রোগীকে একটা যা-তা ঘর দিলে চলবে না—তাকে দিতে হবে বাড়ীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরখানি। সে রকম ঘর না থাকলে তার জন্যে আলাদা একখানা ঘর তৈরী করতে হবে—চারিদিকে একেবারে খোলা দরজা-জানালা প্রচুর পরিমাণে দিয়ে। দালান হলে পরে একেবারে ছাতের উপরে খাতা, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে রোগীর জন্যে চমৎকার ঘর তৈরী করা যেতে পারে। ঘরে যেন বেশ রোদ আসে—কিন্তু রোগীর গায়ে যেন কোন মতেই রোদ না লাগে। ঘরের ভিতরে অনাবশ্যক জিনিষপত্র কিছু থাকবে না এবং ঘরটিকে রাখতে হবে সর্ব্বদা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করে। রোগীর বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রোদ দিতে হবে—এবং সেগুলি কখন কোন ভাবে নোংরা না থাকে। রোগীকে নিয়মিত স্পঞ্জ করানো, মাথা ধুইয়ে দেওয়া ইত্যাদির অন্যথা কখনও না ঘটে।

মরুভূমির দেশ আরবে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইবেলের সময় হইতে হাদ্রামাউৎ প্রদেশ সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। হাদ্রামাউৎ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ দিকে, এডেন বন্দরের কিছু পূর্ব্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৫০ মাইল, প্রস্থে ১৫০ মাইলেরও বেশী। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত রুব'আলখালি মরুভূমি, পশ্চিমে ইমেন প্রদেশ।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে থিওডোর বেণ্ট ও লিও হিরশ্ এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াইয়া অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহারা একটা ম্যাপও খাড়া করেন বটে, কিন্তু সে ম্যাপ খুব ভাল নয়। ১৯৩২ সালে নেদারল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের কনসাল ভ্যান ডার মিউলেন হাদ্রামাউৎ ও রুব'আলখালি মরুভূমি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"আরব দেশের মরুভূমি ও পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে আবিষ্কারের অভিযানটা সহজ নয় মোটেই, যদি মরুভূমির অধিবাসী বেদুইনদের সাহায্য না পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বিধর্ম্মীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। দেশের মধ্যে যথেচ্ছা ভ্রমণ করার অনুমতি তাদের কাছ থেকে পাওয়া সহজ নয়। কখন কি অবস্থায় তারা রেগে উঠবে, তা কিছু বলা যায় না। তাদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে অনেক ভ্রমণকারী ইতিপূর্ব্বে প্রাণ হারিয়েছে। হাদ্রামাউৎ প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই এ জন্য আজও অনাবিষ্কৃত, এই বিস্তীর্ণ রহস্যময় অঞ্চলে কোথায় যে কি আছে, পৃথিবীর লোকের কাছে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার দরুণ ডাচ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হাদ্রামাউৎ প্রদেশটা ভাল করে পরিভ্রমণ করবার ও তার একটা ম্যাপ তৈরী করবার ভার পড়ল আমার উপর। ঘটনাটা এই। অনেক দিন পূর্ব্বে একজন 'হাদ্রামি' জাভায় গিয়েছিল অর্থোপার্জ্জন করবার জন্য।

সাইয়ুন ও তেরিমের মধ্যবস্থিত মরিয়ামার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (হিরশের পুস্তকে উল্লিখিত): খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্ব্বের হিমিয়ারাইটিক সভ্যতার আবাসস্থান। এই সভ্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ যে প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি লাইন বাম হইতে এবং একটি দক্ষিণ হইতে লিখিত।

জাভাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লোকটা দু' পয়সা উপার্জ্জন করলে। পরে সে ডাচ নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হল। কিন্তু সেখানে কিছুকাল আরামে যাপন করবার পরে তার মনে হ'ল, দেশে ফিরে সে বড় একটা কিছু হবে। জাভাতে বড়-মানুষি করে লাভ কি? টাকার সার্থকতা কি যদি তার স্বদেশের লোকের চোখে সে বড় না হতে পারলে?

সে দেশে ফিরে সৈন্যদল যোগাড় করলে, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র কিনলে, তারপর দিগ্বিজয়ে বার হ'ল। প্রথম সে যে স্থানের

অধিবাসীদের উপর উপদ্রব সুরু করলে, সে জায়গাটা মুকাল্লার সুলতানের অধিকারভুক্ত। অধিবাসীরা সুলতানকে জানালে। সুলতানের আদেশে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য ও একটা ছোট কামান দিগ্বিজয়ীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ল—ফলে দিগ্বিজয়ীর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যে দিকে চোখ যায় সরে পড়ল। দিগ্বিজয়ী নিজে হ'ল বন্দী এবং সুলতান তার মুক্তিপণ স্বরূপ আশী হাজার ফ্লোরিন চাইলেন।

দিগ্বিজয়ী তখন নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করলে যে, সে একজন ডাচ প্রজা—সুলতান তাকে বন্দী করে প্রকৃত পক্ষে ডাচ গবর্ণমেণ্টেরই অপমান করেছেন, অতএব যত সত্বর হয়, মুকাল্লায় একখানা যুদ্ধের জাহাজ পাঠিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া হ'ক। ডাচ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধের জাহাজ পাঠান নি, কিন্তু অন্য ভাবে এই অদ্ভুত প্রকৃতির হাদ্রা-হামির মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই হাদ্রামাউতের অজ্ঞাত স্থান সকল পরিভ্রমণ করবার অনুমতি পাওয়া যায় মুকাল্লার সুলতানের নিকট থেকে।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ও ডাঃ বিসমান্ এডেন বন্দরে জাহাজ থেকে নামি এবং হাদ্রামাউৎ প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করবার উদ্যোগ করি।

এডেন থেকে ছোট ষ্টীমারে মুকাল্লা আসি। মুকাল্লা আরব সমুদ্রের একটি বন্দর। এখানে বাহিরের সমুদ্রের ঢেউকে বাধা দেওয়ার জন্যে আধুনিক ধরণের বাঁধ নেই। বড় বড় ঢেউ সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ বিধৌত করে দিচ্ছে। গরম খুব কম। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তখন সমুদ্রের ঢেউএর গর্জ্জনধ্বনি স্থানীয় বাজারের কোলাহলকে ডুবিয়ে দেয়।

মুকাল্লা সুরক্ষিত সহর। মরুভূমিবাসী বেদুইন দল সহরের মধ্যে প্রবেশের সময় পুলিশের কাছে তাদের রাইফেল ও টোটা জিম্মা দিতে বাধ্য—হাট-বাজার সেরে বাড়ী ফিরে যাবার সময় আবার ফেরৎ পাবে। বেদুইনরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, দস্যুবৃত্তিই অনেকের প্রধান উপজীবিকা—এ ধরণের ব্যবস্থা তাই অতি প্রয়োজনীয়।

"জোল": মরুভূমির পথে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল উত্তীর্ণ হইবার কষ্টই সমধিক।

মুকাল্লা বাজারে তারা মাসে একবার খাবার জিনিস সংগ্রহ করবার জন্য আসে। সাধারণতঃ তারা কেনে ময়দা, চাল, শুকনো খেজুর ও শুঁটকি মাছ—প্রধানতঃ সামুদ্রিক হাঙ্গরের বাচ্চা। বেদুইনদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চুল-গুলোকে একটা চামড়ার পেটি দিয়ে বেঁধে রাখে। রৌদ্র ও গরম হাওয়ার হলকা থেকে দেহকে রক্ষা করবার জন্য সাধারণতঃ নীল রং গায়ে মাখে। রাত্রে আবার তার উপর চর্ব্বি মাখায়।

মুকাল্লার সুলতান বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় থাকেন ভারতবর্ষের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ। সুলতানের প্রধান উজির আমাদের ভ্রমণের বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে একদল পথিক উটের পিঠে হাদ্রামাউতের টেরিম সহরের দিকে রওনা হ'ল—আমরাও তাদের সঙ্গ নিলাম। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দলবদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক। পথ হারাবার ভয় তো আছেই—তা ছাড়া আছে রাইফেলধারী দুর্দ্দান্ত বেদুইন দস্যুর দল। অনেক সময় এদের হাতে পড়ে গোটা পথিক দলই মারা পড়ে।

মুকাল্লা ছেড়ে পাষাণময় নদীখাতের পথ দিয়ে আমরা উত্তরমুখে চলি। বাতাসের আর্দ্রতা ক্রমে ক্রমে আসছে,

দিনের উত্তাপ অসহ্য বটে, কিন্তু রাত্রিতে শীত পড়ে। আরব দেশের এই অঞ্চল পৃথিবীর উষ্ণতম প্রদেশগুলির অন্যতম—শুধু উত্তপ্ত বলেও নয়, এত বন্ধুর পথও খুব কম

হাদ্রামাউৎ : প্রাচী পারস্যের ও রোমের ইতিহাসে সুলতান, বাদশা, সীজার ইত্যাদির গৌরব-কাহিনীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধি বৃক্ষ (frankinscence)।

দেশেই থাকে। রাস্তা বলে কোন জিনিস নেই, শুধু আছে ধূ ধূ মরুভূমি আর কেবল পাথর আর পাহাড়-পর্ব্বত। পথ একবার উঠছে, একবার নামছে, এক একস্থানে পাহাড়ের খাড়াই এত বেশী যে, সেখান দিয়ে উটের দল নামাতে ভরসা হয় না—একবার পা পিছলে পড়ে গেলে দু' হাজার ফিট গভীর খড়ের মধ্যে সবাইকে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে।

এই ধরণের নদীখাতের পথ পার হয়ে আমরা এলাম "জোল" বা পর্ব্বতময় মালভূমির মধ্যে। চারিধারে শুধু অন্তহীন উপলাকীর্ণ মরু দূর চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাথরের সঙ্গে সম্ভবতঃ ধাতু মিশ্রিত আছে, কারণ রৌদ্রে তা চক্ চক্ করছে। এই "জোল" অঞ্চলের কোথাও জল নেই, গাছপালা নেই। লোকজনও নেই।

মাঝে মাঝে জমির মধ্যে বড় বড় গর্ত্ত, ছোট বড় পাথরে ভর্ত্তি। দু' একটা এরকম গর্ত্তের ধারে-ধারে সুগন্ধি আরবী গঁদের গাছ। এই জায়গায় একটা পাহাড়ের গুহায় আমরা একদল বেদুইনের দেখা পেলাম। আরবদেশের অন্যস্থানের মত এরা উটের লোমের তাঁবুতে বাস করে না।

বেদুইনরা আমাদের দেখে এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল। মেয়েরাও এল। আমার সোনায় বাঁধানো দাঁত দেখে তারা এ ওকে আঙুল দিয়ে দেখায়—সবাই অবাক হয়ে গেল। আমাদের গায়ের রং দেখে তারা তো বিশ্বাস করতেই চায় না যে, আমরা গায়ে কোনো প্রকার সাদা রং মাখিনি। আমাদের প্রতি নানারূপ প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। আমরা যখন জন্মেছি, তখন থেকেই কি আমাদের রং সাদা, না, অনবরত সাবান মেখে এরকম হয়েছে? আমরা কি খাই? দুধ আমরা পান করি কি না? আমরা কি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বেড়াই, না, সব সময়েই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি?

সবাই আমাদের রাত্রে থাকতে অনুরোধ করলে। তারা বললে, রাত্রে তারা নাচবে এখন। আমরা অবস্থান করা সম্বন্ধে আমাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম, কারণ আমাদের

অতিথিপরায়ণ প্রৌঢ় হাম্রাহামি।

হাতে সময় অল্প এবং বহুদূর পথে পাড়ি দিতে হবে। ওরা বললে, রাত্রে থাক, তোমাদের প্রত্যেককে একটি স্ত্রী দেব। আমাদের চারি পাশ ঘিরে যে সব কুশ্রী স্ত্রীলোক

উপস্থিত ছিল, তাদের দিকে চেয়ে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হলাম না। ওরা তখনি আমাদের মনের ভাব বুঝে বললে—না, এরা নয়। অল্প-বয়সের মেয়েরা পশুদল চরাতে গিয়েছে, সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে ফিরবে।

এখান থেকে রওনা হয়ে আমরা ওয়াদি হাদ্রামাউতের উপনদী ওয়াদি ডুয়ানের দিকে অগ্রসর হই। এখানে আমাদের সৌর তাপক্লিষ্ট চক্ষু সত্যই যেন জুড়িয়ে গেল, ওয়াদি ডুয়ানের তীরস্থ শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও বৃক্ষরাজির দিকে চেয়ে।

এখানে গভীর পাষাণতীরের মাঝখান কেটে নদী বয়ে যাচ্ছে চকচকে বালুরাশির উপর দিয়ে। নদীস্রোত থেকে

যুক্ত কাস্ত্রী ক্রীতদাস।

কিছু উর্দ্ধে নদীতটের ঢালুতে সবুজ তালীবন। এই মরুদ্বীপকে কেন্দ্র করে এদেশে ছোট বড় জনপদ গড়ে উঠেছে, কারণ মরুভূমির মধ্যস্থ অন্য সব স্থান মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

এই স্থানের বাড়ীগুলি কাঁচা ইটের তৈরী এবং প্রায়ই চার পাঁচতলা উঁচু। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে এই সহর প্রায় অদৃশ্য থাকে, কারণ ওয়াদি তটের ধূসর ও গৈরিক বর্ণের মাটী পাথর থেকে সহরের বাড়ীগুলোকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। উত্তাপের দরুণই বাইরে জনমানবের দেখা নেই, সবাই গৃহমধ্যে বিশ্রামরত।

নিম্নের উপত্যকাভূমিতে এবার নামতে হবে। ছোট সরু পথ এঁকে বেঁকে নেমে গিয়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সে পাহাড় এত দুরারোহ যে, সেই সংকীর্ণ পথে ভারসমেত উটের দলের নামবার কথা ভাবতেই আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল।

বেদুইন পথপ্রদর্শকেরা উপর থেকে নিম্নভূমি পর্য্যন্ত সারাপথটা নিজেদের ছড়িয়ে রাখলে। দুটি করে উটের ভার নিয়েছে একজন বেদুইন। মনে হল যে, উটেরাও যেন বুঝতে পেরেছে, তাদের সম্মুখে জীবন-মরণ সমস্যা। একবার যদি কোনো কারণে পা পিছলে যায়, তবে নিম্নের পাষাণময় নদীখাতে পড়ে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে। কিন্তু বেদুইন উষ্ট্রচালকের কৌশল ও কুদর্শন অথচ গুণবান এবং বুদ্ধিমান উষ্ট্রদলের বুদ্ধির দরুণ সকল বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া গেল এবং আমরা উৎরাইয়ের পথে নামবার পরিশ্রমের পরে নিম্নের উপত্যকায় তাঁবু খাটিয়ে সে বেলার মত অবস্থান করার উদ্যোগ করলাম।

ওয়াদি ডুয়ানের বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা বেশ ভাল লোক। সম্প্রতি তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর পাচতলা কাঁচা ইটের গাঁথুনির বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন ও নানা গল্পগুজব করলেন। লোকটি বড় আমুদে। চারতলার উঁচু ছাদ থেকে আমরা নীচের গ্রামের দিয়ে চেয়ে চেয়ে তাঁর মুখে আমাদের পূর্ব্বে যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদ্বয় এসেছিলেন, তাঁদের গল্প শুনছিলাম।

যদিও সে অনেক দিনের কথা, তবুও বৃদ্ধ বা-সুরা সে ঘটনা স্মরণ করে রেখেছেন। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, এই সব স্থানে নতুন কিছু বড় একটা ঘটে না। জীবন এখানে পাষাণময়, ওয়াদি প্রাচীরের মতই অটল ও বৈচিত্র্য-হীন। এই একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ যদি কিছু নতুন দেখা যায়, তা হলে লোকে তা মনে রেখে দেয় চিরকাল।

বা-সুরার আবাসস্থান ঠিক যেন মধ্যযুগের একটি দুর্গ। সেই রকম প্রাচীর, তোরণ, বুরুজ, গম্বুজবিশিষ্ট। আমরা একটা বড় লোহার ফটক পার হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করি। তারপর বড় একটা হল, তার চারিধারে সশস্ত্র রক্ষী সৈন্য-দল। মাঝখানে পুত্রপৌত্রগণ পরিবৃত অন্ধ বা-সুরা। শাসনকর্ত্তার অতিথিস্বরূপ আমাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হয়েছিল, সাধারণ লোকের ভাগ্যে তা জুটে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকদিন মাত্র এখানে যাপন করবার পরে পুনরায় মরুপথে আমাদের যাত্রা সুরু হল, কারণ সময়ের অভাববশতঃ কোথাও দীর্ঘকাল কাটান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আবার নির্জ্জন মরুভূমি ও নির্জ্জনতর ভাষায় এর নাম ওয়াদি। ওয়াদি এখানে বৃক্ষলতাবিহীন। দুপুরে অত্যন্ত গরম গরম চড়ল ১১৮° ডিগ্রীতে। কম্পমা· দিয়ে অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে হাজারাইন দেখা গেল।

এই পথের পাশে পুরাকালের কয়েকটি ধ্বংশেষ আছে, তার পরে হাজারাইন গ্রাম। দস্যুর বড়ই উৎপাত ছিল, বর্ত্তমানে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের বিক্রমে স্থানটি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। এইস্থানের অধিবাসীরা পূর্ব্বে কখনো কোন ইউরোপীয়ানকে নগরের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। আমাদের আগমন উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে দেখা গেল। রাস্তার দুধারে রঙীন কাগজের লণ্ঠন। গ্রামের মোড়ল এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চললেন। আগে আগে চললেন বিখ্যাত এল্‌-আত্তাস্‌ বংশের জনৈক ভদ্রলোক। কিন্তু গ্রামের ভীষণ জলকষ্ট ও অধিবাসীদের দারিদ্র্য দেখে আমাদের মন যেন নিরানন্দ হয়ে পড়ল।

হাদ্রামাউৎ: শস্যক্ষেত্রে কৃষাণীরা আগাছা পরিষ্কার করিতেছে।

এখানে আমরা কয়েক দিন থাকবার পরে খবর পেলাম, ডাচ গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্যে মোটরগাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। একদিন সকালে নগরের অধিবাসিগণ এই নতুন দানবের আবির্ভাবে চমকে উঠল—বিকট শব্দ করতে করতে মরুভূমির জিনের মতই সে শান্ত, স্তব্ধ নগরের রাজপথে দেখা দিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে এটার দিকে ভয়ে ও সম্ভ্রমে চেয়ে রইল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি ছাদের উপর উঠে মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে। আল্লার তৈরী বাইরের জগৎটাতে না জানি কত আশ্চর্য্য জিনিসই আছে! এটা আবার কি এল দেখ!

এই মরুভূমির পথে মোটরগাড়ী পাঠাবার খরচ অনেক। নগর ত্যাগ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে এত লোক ও মাল বোঝাই করা হয়েছিল যে, তাতে আর তিল মাত্র স্থান ছিল না। নগরের বাইরে ঘোর মরুভূমি, আগুনের মত হল্‌কা সামনের দিক থেকে এসে আমাদের হাত মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তর-ইউরোপের শীতের তুষার-শীতল হাওয়ার মতই তা অসহ্য। মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ুস্তর উত্তাপে ভেঙে চুরে বেঁকে বিকৃত হয়ে দূরে দূরে নানারূপ অবাস্তব দৃশ্যের সৃষ্টি করছে।

ক্রমে ওয়াদি বিস্তৃততর হয়ে পড়ছে। ওয়াদি আমদ্‌ যেখানে ওয়াদি কাস্‌রে গিয়ে মিশে গেল, সেখানে নদীর উচ্চ পাষাণময় তট এত পিছনে সরে গিয়েছে, আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন বিস্তীর্ণ বালুর মহাসমুদ্রের মাঝে জাহাজে চড়ে আমরা চলেছি।

নালেন, সিবাম সহরে সুলতান আমাদের কফি-পানের পর আমরা বিলম্ব করতে পারলাম না—সেই অপরাহ্নেই সিবাম অভিমুখে রওনা হই।

হাদ্রামাউৎ প্রদেশের প্রাচীনতম নগরী এই সিবাম। এর স্থাপত্যে সৌন্দর্য্য নেই, আছে দৃঢ়তা ও শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকার মত আট দশ বারো তলা বাড়ী এখানে অনেক। আরবের মরুভূমিতে 'স্কাই-স্ক্রেপার' এত বেশী যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, অথচ এই সব 'স্কাই-স্ক্রেপার' আগাগোড়াই কাঁচা ইট ও বাজে কাঠে তৈরী।

...হার নির্ম্মানশিল্পে অনেক...

মরুভূমির বালুরাশির প্রান্তে সিবাম সহরের সাদা মিনার দেখে আমাদের প্রথমে মরীচিকা বলে ভুল হয়েছিল। লোহার ফটকের মধ্যে দিয়ে আমরা সহরে প্রবেশ করলাম। সিবামের সুলতান আমাদের যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সুলতানের বৃহৎ প্রাসাদটিও কাঁচা ইটের তৈরী। এদেশে কি রাজপ্রাসাদ, কি মসজিদ, কি

...দের যখন ...তে মুখ গুঁজে ...রণের বালুস্তম্ভের সামনে পড়ে মোটরের এঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। কিছুতেই ষ্টার্ট নিতে চায় না। ঠেলে ঠেলে অতি কষ্টে আবার চালান গেল।

হঠাৎ বালুরাশির মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বামদিকে দূরে দিজার্ আল্-বুকরীর ধূসর বর্ণের উচ্চ দুর্গত্রয় দেখা দিল। বালুর ঝড়ে তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছি, গরম গরম কফি পান করার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়েছে, একথা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই। আমাদের মোটর-গাড়ীর হর্ণ শুনে একদল সশস্ত্র রক্ষী-সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের উপর আবির্ভূত হল। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, নিশ্চয়ই মোটরগাড়ীর প্রথম দর্শনে! আমরা চেঁচিয়ে বললাম—তোমাদের সেনাপতিকে ডেকে দাও।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে আমরা অনুমতি পেলাম।
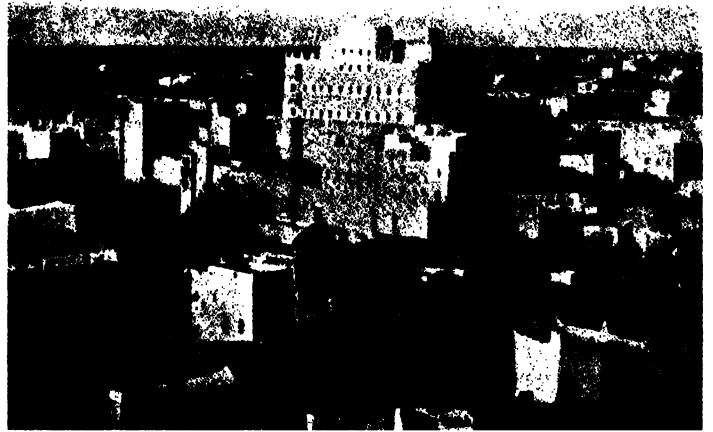
সিবাম-সুলতানের প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্ব। ভারতবর্ষ ও ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্টের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এই সুলতান বহু ধনদৌলতের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দুর্গ—সবই এই উপাদানে নির্ম্মিত। অং
হাদ্রামাউতের স্থপতিদের প্রশংসা না ক

স্বাস্থ্যের দিকে অধিবাসীদের দৃষ্টি
বড় বড় বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীর রাস্তাগ
থেকে তালের গুঁড়ির খোল বার করা আ
বাড়ীর ব্যবহৃত যত নোংরা জল তালের
উপরই পড়ে। রাস্তার মাঝখান বেয়ে আব
ড্রেন, ময়লা ও আবর্জ্জনায় তা কানায় কানায় ভ
চলাও এক বিপদ, সব সময় উপরের দিকে
হবে, কোনো বাড়ীর নোংরা জল মস্তকে বর্ষিত না হ

আমরা যখন সিবামে ছিলাম, বৎসরের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা গরম। দিনমানে একটু রোদ চড়লেই

মৃত্যুহীনতা

জীবনের যাত্রাপথে দূরপানে চাহি ভেবেছ কি কোন দিন
এ অনন্ত লোকে,
আনন্দ-কল্লোলধ্বনি থেমে যাবে সব মহানিদ্রা বিমলিন
মূর্ত্ত হবে চোখে!
নিবিড় কাজল-মেঘে ঘনীভূত রবে ভ্রূকুটি-ভীষণরাতি
আকাশ ভরিয়া,
দুরন্ত আবেগভরা বাজাইয়া বাঁশী উঠিবে ঝটিকাক্ষুব্ধ
আলোক হরিয়া।
মানবের পুঞ্জীভূত বেদনার গান শুনিবে দিগন্তমাঝে
সকরুণ শোকে!

তামসী শর্ব্বরী আর পোহাবে না পুনঃ—ধরিত্রীর বক্ষে রবে
কঙ্কালের স্তূপে,
নিঃশব্দ চরণ ফেলি তুমি যাবে কোথা? আসিবে দেবতা যবে
রুদ্র ভীমরূপে,
মহাকাল সিন্ধু হতে উদগ্র সঙ্গীত ধ্বনিবে তরঙ্গ তুলি
ব্যোমপৃথ্বী নিয়া,
দূর গিরিশৃঙ্গপরে অগণ্য আঘাতে যোগমগ্ন তপস্বীর
চমকিবে হিয়া,
বন হ'তে বনান্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধ্বংস হবে বনস্পতি
মহাকালযূপে!

জলদের সিংহনাদে
ঝরিবে না আর,
সংক্ষুব্ধ দিগন্তযাত্রী হবে দিশাহারা অন্ধকারে মগ্ন হয়ে
লয়ে যাবে মিশে।
মর্ম্মপটে লীলায়িত রক্তিমরেখারে হারাইবে নিরুদ্দেশে
বসন্তের পাখী,
ধরণীর শ্যামস্নেহ না পেয়ে লতিকা চিরতরে মুদিবে যে
আপনার আঁখি
কলাপীর আর্ত্তনাদে নামিবে বরষা মেদিনী কাঁপিবে সদা
বাসুকীর বিষে।

তবে কেন বিলাসের বন্দনায় রত ঐশ্বর্য্যের ললাটিকা
পরি রাজবেশে,
থেমে যাবে স্বার্থতার বিপুল নর্ত্তন তোমারি আয়ুর শিখা
নিভে যাবে শেষে।
আগুন লেগেছে যেথা অশনিপরশে ফিরাও তোমারি রথ
সেই দিকে আজি,
আপনারে রিক্ত করি নিভাও তাহারে উঠুক তোমারি পথে
জয়শঙ্খ বাজি,
তোমার জীবন হ'তে বাঁচে যদি জীব, মৃত্যুহীন হবে তুমি
ক'র তাই হেসে।

—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

নাটকে লিখিয়াছেন (৯।৪৬)। কর্ণপূর
...ন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি" বলিয়া উল্লেখ
) ও লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য অবধূতাকৃতি
...খিয়াই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নাটকে
...হ যে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে
রূপের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন; তৎপ...
...ত আসেন ও সনাতনের সহিত মিলিত হন। কিন্তু
...ার ঘটনা বলিবার সময় বার্ত্তাহারী প্রতাপরুদ্রকে
...লতেছে—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ৯।৪৮

...াদশ
...নের প্রথম
...ন হয় যে, সনাতন
শ্রীচৈ... ...পূর্ব্বেই সাধনরাজ্যের উচ্চস্তরে
অধি... ...য়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে শ্রীচৈতন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের পরিকর। আমি তোমার সহিত মথুরা যাইতে ইচ্ছা করি। তুমি বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ প্রকট করিবে" (৩।১৮।৪-৬)। সনাতন তাঁহাকে বলিলেন, "নির্জ্জন বৃন্দাবনে জনসংঘের সহিত যাইয়া কি হইবে?" তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপারূপ শাস্ত্রের দ্বারা নিজের সংসার-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "কৃষ্ণ তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন" (৩।১৮।১১)। সনাতনের কথা শুনিয়াই শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশ ভ্রমণান্তে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন।

কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন বর্ণনা করেন নাই। কাশীতে সনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যের

অর্থাৎ, কালক্রমে বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বিলুপ্ত হইলে শ্রীচৈতন্য পুনরায় তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে রূপ ও সনাতনকে তথায় কৃপামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। শ্লোকটীর চতুর্থ চরণের "স্তত্রৈব" শব্দে কোন্ স্থান বুঝাইতেছে? নাটকের বর্ণনার ক্রম দেখিয়া মনে হয় বারাণসী বুঝাইতেছে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে সংস্করণ বাহির করেন, তাহার সংস্কৃত টীকায় "'তত্রৈব' —শ্রীবৃন্দাবন এব" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ "তত্রৈব প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে" বলিয়া পাঠককে বড়ই মুস্কিলে ফেলিয়াছেন (নাথ—চৈঃ চঃ ২।১৯।১০৯ পর)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে, প্রয়াগে শ্রীরূপের ও অনুপমের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপকে উপদেশ দিবার পর শ্রীচৈতন্য যখন কাশীতে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, তখন শ্রীরূপ তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। শ্রীচৈতন্য কিন্তু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন (২।১৯।১৯৫-২০১)। কাশীতে যখন সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন শ্রীরূপ সেখানে

ছিলেন না। সুতরাং একস্থানে দুই ভাইকে কৃপা করা সম্ভব হয় না। রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কোন ঘটনা-বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত কর্ণপূরের বিরোধ থাকিলে, কবিরাজ গোস্বামীর কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিতে হইবে। কেন না কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। কর্ণপূরের সঙ্গে শ্রীরূপের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায় না। সুতরাং নাটকে "তত্রৈব" শব্দে একসঙ্গে শ্রীচৈতন্য রূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়াছিলেন বলা ভুল।

কর্ণপূর রূপ-সনাতন সম্বন্ধে আর একটি ভুল সংবাদ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, সনাতন, অনুপম ও রূপ, এই তিন ভাই একত্রে শ্রীচৈতন্যকে নীলাচলে দর্শন করিয়াছিলেন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন (মহাকাব্য ১৭। ৯-২৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিতেছিলেন।

এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥ ৩।১।৩২।

শ্রীরূপ একা নীলাচলে গিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন।

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥ ৩।১।৪৫-৪৭।

শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দশ মাস (৩।৪।২৫) পুরীতে থাকিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন (৩।১।১৬০)।

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা। (৩।৪।২)
প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিলা দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা দিনদশ॥ ৩।৪।২৫

এস্থানেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণ কর্ণপূর-বর্ণিত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। এই দুই ঘটনা সম্বন্ধেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবিরাজ গোস্বামী কর্ণপূরের নাটকের ৯।৪৫, ৯।৪৬, ৯।৪৮ শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসঙ্গ রাখিয়াছে লিখিয়া॥ ২।২০।২০৯

পুনরায় ৯।৪৮ শ্লোক ২।১৯।১০৯এর পর উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

কর্ণপূর নাটকে মাত্র দুইটি শ্লোকে সনাতনের প্রতি কৃপা ও একটি শ্লোকে রূপের প্রতি কৃপা বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটি বা একটি শ্লোককে "বিস্তার করিয়া" ও "লিখিয়াছেন প্রচুর" বলা কতদূর সঙ্গত সুধীগণ বিবেচনা করিবেন; কবিরাজ গোস্বামী কর্ণপূর-বর্ণিত ঘটনা স্বীকার করেন নাই, অথচ নিজের বর্ণিত বিবরণের বিপরীত ঘটনামূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। হয়তো পূর্ব্বাচার্য্যকে প্রতিবাদ না করাই বৈষ্ণবীয় রীতি, অথবা ঘটনাকে বৈষ্ণব লেখকগণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাই সে সম্বন্ধে কবিরাজ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ও একাদশ অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে "জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রূপ-সনাতন সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা কর্ণপূরের প্রদত্ত তথ্যের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তিনি অন্ত্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, নীলাচলে রূপ-সনাতন একই সময়ে অবস্থান করিতেছিলেন (৪৯৩ পৃঃ)। অদ্বৈতের নিকট ইঁহাদের পরিচয় দিবার সময় শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুইরে (৫০৮ পৃঃ)।

পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখাইয়াছি যে, রূপ নীলাচল হইতে চলিয়া যাইবার দশদিন পরে সনাতন তথায় আগমন করেন এবং নীলাচলে আসার পূর্ব্বে দুই ভাইয়ের মথুরায় সাক্ষাৎ হয় নাই। যথা—

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥ ৩।১।৪৫

জয়ানন্দ রূপ-সনাতনের কথা অতি অল্পই জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে।
দবিরখাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে॥
দবিরখাসে ঘুচাইলা সংসার বন্ধন।
দুই ভাইর নাম হইল রূপ সনাতন॥ ১৪৯ পৃ:।

বৃন্দাবনদাসের মতে রূপের উপাধি বা পদ ছিল দবিরখাস অর্থাৎ খাস মুন্সী (private secretary)। জয়ানন্দ ফার্সী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, তাই দবিরখাস উপাধিকে দবির ও খাস এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া তাহা রূপ ও সনাতনের নাম ভাবিয়াছেন।

লোচন "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে"র প্রারম্ভে রূপ-সনাতনকে বন্দনা করিয়াছেন (পৃঃ ৩); কিন্তু গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁহাদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। "শেষখণ্ডে" শ্রীচৈতন্যের গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে অদর্শন হওয়া বর্ণনা করার পর তিনি লিখিয়াছেন—

কাশী মিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সঙ্গে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ (পৃঃ ১১৭)

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় সনাতন নীলাচলে ছিলেন বা ব্রহ্ম হরিদাস জীবিত ছিলেন, এ কথা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লোচন এক্ষেত্রে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডলে রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনীসমূহে রূপ-সনাতনের কথা বিশেষ কিছু নাই; অথচ সকল গ্রন্থেই তাঁহাদিগের নাম সসম্মানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬-৩৬, ৫৩-৭৫, ১৬৫-২১০, ২২৭-২৩১ ও ঊনবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রধানতঃ এই বিবরণ অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিচারের প্রথম পথ-প্রদর্শক রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Chaitanya and His Companions গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ের একটি উক্তি সংশোধন করিয়া পাঠ করা প্রয়োজন। ডক্টর সেন লিখিয়াছেন যে, "Rupa met Chaitanya at Benares where the latter took pains to instruct him in the cardinal points of the Vaisnava religion (১৮ পৃঃ)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যথা—

এই মত দশদিন প্রয়াগ রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

ডক্টর সুশীলকুমার দে "পদ্যাবলী"র যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক সংস্করণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় (xlvii পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, কাশীতে রূপ, অনুপম ও শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎ হয়। এ উক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত ঘটনার বিরুদ্ধ। বোধ হয় ডক্টর দে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পূর্ব্বোল্লিখিত "তত্রৈব" শব্দ অনুসরণ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত রূপ-সনাতন শিক্ষার ঐতিহাসিকতা তিনি স্বীকার করেন না। "But to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana, Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious but entirely unhistorical imagination." (xxxv-vii).

রূপ-সনাতনের জাতি বিচার

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ-সনাতনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ। ২।১।১৭৯
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ ২।১।১৮৬
সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত—আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশ মঙ্গল আমার॥ ৩।৪।২৭-২৮

এই সব উক্তি দেখিয়া, বিশেষতঃ "নীচজাতি" ও "নীচ বংশ" শব্দ দেখিয়া কোন কোন গবেষক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রূপ-সনাতন অথবা তাঁহাদের পিতা কুমারদেব মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন— "রূপ-সনাতনের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে পিরালি খাঁ নামক একজন মুসলমান পীরধর্ম্ম প্রচারার্থ যশোহর জেলায় আসেন। রূপ-সনাতনের পিতা ঐ সময় যশোহর জেলায় বাস করিতেন।

সম্ভবতঃ তিনি পিরালি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩৪১, পৃঃ ১৭৭-৭৮)।

রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্যান্য উক্তি দেখিলে কিন্তু এই অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন যে, রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করার পর—

দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাত পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ ২।১৯।৩-৪

সনাতন রাজসভায় উপস্থিত না হইয়া—

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ ২।১৯।১৬

যদি রূপ-সনাতন বা তাঁহাদের পিতা সত্যই মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে পুরশ্চরণের জন্য ও ভাগবতবিচারের জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুশাসন তখন খুব প্রবল ছিল। রূপ-সনাতন মুসলমান হইলে সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখক একযোগে চাপিয়া যাইবেন ইহাও সম্ভব মনে হয় না।

ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূলসূত্র হইতেছে এই যে, যাঁহার সম্বন্ধে কথা তাঁহার নিজের উক্তি পাওয়া গেলে তাহাই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য সেই ব্যক্তির যদি সত্যগোপন করা অভ্যাস থাকে বা স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল প্রমাণিত হয়, তবে তাহার কথা বিশ্বাস করা যায় না। রূপ-সনাতনের ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশের কথাই উঠিতে পারে না। তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় পিতার বা নিজেদের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-বৃত্তান্ত গোপন করিয়া যাইবেন একথাও বিশ্বাস্য মনে হয় না। তাঁহারা রাজমন্ত্রী হিসাবে যথেষ্ট মানসম্ভ্রম পাইয়াছিলেন—লোকনিন্দার ভয়ে আত্মপরিচয় গোপন করিবার লোক তাঁহারা নহেন। মহত্তর জীবনের আহ্বানে রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যগোপন বা মিথ্যাভাষণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকের স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন—"পক্ষে চ তত্তৎ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাট-দেশবিখ্যাত-বিপ্রকুলাচার্য্য শ্রীজগদ্‌গুরুবংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশী যঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেত্যর্থঃ।" এখানে সনাতন রূপকে বিপ্রবংশজাত বলিতেছেন। রূপ সনাতনাষ্টকে লিখিয়াছেন—

সুদাক্ষিণাত্য-ভূমিদেববৃন্দবংশভূষণং
মুকুন্দদেব পৌত্রকং কুমারদেব-নন্দনম্।
স্বজীবতাতবল্লভাগ্রজন্মরূপকাগ্রজং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্॥

এস্থলেও রূপ সনাতনকে ব্রাহ্মণবংশভূষণ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতের লঘুতোষণীর অন্তে রূপ-সনাতনের বংশপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেও জানা যায় যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত "ভক্তিরত্নাকরে" লিখিত আছে—

সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গাসন্নিধানে॥ (পৃঃ ১৩)

ইহাতেও সনাতনের ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়।

তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান সরকারে চাকুরী করার জন্য রূপ-সনাতনের পাতিত্যাদি দোষ ঘটিয়াছিল। সনাতন গোস্বামী ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বৃহদ্ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন—"যাঁহারা স্বধর্ম্মাদির অপেক্ষা না রাখিয়া পুরাতনী বা আধুনিকী প্রতিমা ভজনা করেন, তাঁহাদের পাতিত্যাদি দোষ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা মহান্ গুণ সঞ্চয়ই করিয়া থাকেন।" ২।৪।২০৮-৯।

শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে সনাতন

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা যদি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শাস্ত্রচর্চ্চা না করিতেন, তাহা হইলে এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে লিখিয়াছেন—

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভাগবতঃ প্রেমামৃতমহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখো হয়ং শ্রীসনাতনোদিনাং॥

ভক্তি-রত্নাকরে ঐ শ্লোকের ভাবানুবাদ—

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষ চিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল॥ (পৃঃ ৩৮)

নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তি-রত্নাকরে আরও সংবাদ দিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পূর্ব্বে রূপ-সনাতন সর্ব্বদা "সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চা" করিতেন। কেহ ন্যায়সূত্রের নূতন ব্যাখ্যা করিলে তাঁহাদিগকে শুনাইতে আসিতেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে নিজের শিক্ষাগুরুদের বন্দনা নিম্নলিখিত ভাবে করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥

উদ্ধৃত শ্লোকে যখন 'গুরূন্' শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজনকে সনাতনের দীক্ষা-গুরু মনে করিবার কারণ নাই। ইঁহারা সকলেই সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন মনে হয়। ভক্তি-রত্নাকর লিখিয়াছেন—

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যা বাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥

এই স্থানে নরহরি চক্রবর্ত্তী গুরু অর্থে দীক্ষাগুরু বুঝাইয়াছেন কি? সনাতন গোস্বামী নিজে বলিতেছেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীচৈতন্য। তিনি বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥
ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণামহং সারস্য সংগ্রহঃ
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ॥ ১০-১১।

তিনি স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীগুরুবরং প্রণমতি। চৈতন্যদেবে চিন্তামণিভূতশ্রীবাসুদেবে। যদ্বা চৈতন্যদেবেতি খ্যাতে শ্রীশচীনন্দনে। ততশ্চ তস্য যৎ প্রিয়ং রূপং যতিবেশঃ প্রকাণ্ডগৌরশ্রীমূর্ত্তিস্তস্মাত্তদনুভাববিশেষেণেত্যর্থঃ। পক্ষে তস্য প্রিয়ো রূপোনাম মহাশয়স্তস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ।"

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ—যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন অহেতুক করুণাকারী সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুবরকে নমস্কার। চৈতন্যদেবের প্রিয়রূপ হইতে তাঁহাতে অনুভূত যে ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রসমূহের সার, ইহা তাহারই সংগ্রহ। একাদশ শ্লোকের টীকায় "প্রিয়রূপতঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সনাতন গোস্বামীর মতে শ্রীচৈতন্যের প্রিয়রূপ হইতেছে যতিবেশ। গৌড়মণ্ডলে শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, বাসুঘোষপ্রভৃতি গৌর-গোপাল অর্থাৎ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিকেই শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠরূপ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন বলা হয় বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরার পূর্ণতর ও দ্বারকায় ও কুরুক্ষেত্রের পূর্ণ, তেমনি গৌরপারম্যবাদিগণ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়া হইতে প্রত্যাগত ভাবোন্মত্ত বিশ্বম্ভরকে পূর্ণতর ও যতিবেশধারী শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণ মনে করিতেন এবং এখনও করেন। ব্রজমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থাদি রচিত হয়, তাহাতে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মূলতঃ উপায়, উপেয় নহেন। সেই জন্যই ব্রজমণ্ডলের সাধকদের নিকট শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ, যে বেশে তিনি শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রিয়রূপ।

উক্ত টীকায় লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে এই যে, সনাতন নিজের অনুজ শ্রীরূপকে কিরূপ সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেছেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে আরও জোর দিয়া শ্রীরূপের কথা বলিয়াছেন। যথা—

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ তুষ্যতোঽখিলম্।
কুর্য্যাদিদং যদাদেশবলেনৈব বিলিখ্যতে॥

শ্রীরূপের আদেশবলেই সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিতেছেন, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীরূপ সনাতনকে গুরু বলিয়া সর্ব্বত্র প্রণাম করিয়াছেন। গুরু হইয়াও সনাতন শিষ্যের আদেশে বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী রচনা করিলেন বলিতেছেন; ইহাতে একদিকে যেমন সনাতনের চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি ব্রজমণ্ডলে

শ্রীরূপের অসাধারণ মর্য্যাদা দেখা যাইতেছে। ব্রজমণ্ডলের ভজন-প্রণালীর প্রবর্ত্তক শ্রীরূপ—সনাতন নহেন। রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থাদিপাঠেও এই ধারণা জন্মে। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্কারকামী গৌড়ীয় মঠও "রূপানুগত ভজন-প্রণালী"র পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইবার সনাতন গোস্বামীর গুরু কে সেই বিচারে ফিরিয়া আসা যাউক। বৃহদ্ভাগবতামৃতের দশম ও একাদশ শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যকেই তিনি গুরুবর বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানি Pilgrims Progressএর ন্যায় সনাতন গোস্বামীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রূপক। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নায়ক সত্যানুসন্ধিৎসু গোপকুমার স্বয়ং সনাতন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে যে, কামাখ্যা দেবী স্বপ্নে উক্ত গোপকুমারকে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র উপদেশ করেন। এই দশাক্ষর গোপালমন্ত্র মাধবেন্দ্রপুরীর, ঈশ্বরপুরীর ও শ্রীচৈতন্যের উপাসিত মন্ত্র। ভগবৎপার্ষদগণ গোপকুমারকে বলিলেন—

গৌড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুরব্রাহ্মণোত্তমঃ
জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্ গুরুঃ ॥ ২।৩।১২২

অর্থাৎ, "গৌড়দেশে জয়ন্ত নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি কৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু।" গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অন্য কোনও কৃষ্ণের অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সেই জন্য উক্ত জয়ন্ত শ্রীচৈতন্যেরই রূপকাকারে গৃহীত নাম বলিয়া মনে হয়।

এই সকল প্রমাণবলে আমি অনুমান করিতেছি যে, শ্রীচৈতন্যই সনাতনের গুরু। অবশ্য এই অনুমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরোধী। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমষ্টিগুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। যোগ্য ভক্ত দ্বারা দীক্ষাদান করাইয়া থাকেন।"

আলোচ্য মঙ্গলাচরণে সনাতন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও বাণীবিলাসকে বন্দনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন ছাড়া অপর চারিজনের নাম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। কোন বৈষ্ণব-বন্দনায় শেষোক্ত চারিজনের নামের উল্লেখ নাই। সুতরাং অনুমান হয় যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ঐ ছয়জন পণ্ডিতের নিকট সনাতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই অনুমানের সমর্থন হিসাবে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিব। প্রথম, সনাতন নীলাচলে বাসকালে সার্ব্বভৌমের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সেই জন্য মনে হয় সার্ব্বভৌম যখন গৌড় দেশে থাকিয়া ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই সময়ে সনাতন তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। দুই, ভক্তি-রত্নাকর মতে—

ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতনরূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥ (৪২ পৃঃ)

সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।৪।৩) ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্য রূপ-সনাতনকে বলিতেছেন—

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥ ২।১।১৯৩

ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তমবিলাসে লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখনই রূপ-সনাতন তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি রূপ-সনাতনের গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ে আরও কয়েকটি মূল্যবান সংবাদ দিয়াছেন। যথা—

গৌড়ে রামকেলি গ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি॥
মহারাজ মন্ত্রী সর্ব্বশাস্ত্র বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্রচর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।
উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ॥
কাশী কাশ্মীরাদি স্থিত মহাবিদ্যাবান্।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান॥
পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল॥

সনাতনরূপ গৌড়রাজ প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি ॥
(নরোত্তম বিলাস,—পৃঃ ৬)

এগ্‌লিং (Eggling) সাহেব বলেন যে, সনাতন গোস্বামী-কৃত তাৎপর্য্য-দীপিকা নামে মেঘদূতের এক টীকা India Office Libraryতে আছে (India Office Catalogue, Vol. II (pp. 1422-23) এ টীকা যদি সত্যই শ্রীচৈতন্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্য সনাতন গোস্বামীর রচনা হয়, তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্তের কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে সনাতন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তের কৃপাপ্রাপ্তির পরে সনাতন গোস্বামী নিশ্চয়ই মেঘদূতের টীকা লিখিতে বসেন নাই।

সনাতন কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ?

শ্রীজীবগোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে সনাতনের রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

অথাগ্রজকৃতেষগ্রং শ্রীলভাগবতামৃতং
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী ॥
লীলা স্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।

অর্থাৎ, (১) দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ভাগবতামৃত (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাহার টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী (৩) লীলাস্তব (৪) বৈষ্ণবতোষণী। ইহার মধ্যে প্রথম ও চতুর্থখানি সম্বন্ধে কোন গণ্ডগোল নাই। হরিভক্তিবিলাস নাম দিয়া যে গ্রন্থ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ছাপিয়াছেন, তাহার প্রকৃত নাম ভগবদ্ভক্তিবিলাস ও উহা গোপালভট্টকৃত। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"গোপালভট্টের ভগবদ্ভক্তিবিলাসকে প্রায়শই লোকে "হরিভক্তিবিলাস" বলিয়া থাকে সুতরাং এই গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস নামেই অভিহিত হইল।" তিনি ঐ গ্রন্থের যে টীকা ছাপিয়াছেন, তাহা সনাতন গোস্বামীর লেখা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গোপালভট্ট মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, তিনি রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষবিধানার্থ গ্রন্থ লিখিতেছেন। টীকায় রঘুনাথ দাসের পরিচয়দানপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন নিজসঙ্গিনং সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ।" এ স্থলে রঘুনাথাদি সঙ্গী বলিয়া রূপ-সনাতনের কথা টীকায় অনুল্লিখিত রহিয়া গেল। ঐ টীকা যে সনাতন গোস্বামীরই লেখা, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। অপর প্রমাণ হইতেছে, শ্রীজীব লিখিয়াছেন যে, সনাতন "হরিভক্তি বিলাসে"র "দিক্‌-প্রদর্শিনী" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য মুদ্রিত টীকায় আছে—

লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্য যথামতি।
টীকা দিগ্দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥"

"দিক্ প্রদর্শিনী" ও "দিগ্দর্শিনী"র মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সনাতন কি স্বকৃত হরিভক্তি-বিলাসের একবার টীকা করিয়াছিলেন, আবার গোপালভট্টের ভগবদ্ভক্তি-বিলাসের টীকা করিয়াছিলেন ? অথবা গোপালভট্টের বইয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন, নিজের বইয়ের টীকা লিখেন নাই ? সনাতনকৃত হরিভক্তি-বিলাসের কোন পুঁথি আমি দেখি নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে, বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটিতে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সনাতনের হরিভক্তি-বিলাসের পুথি নাই। ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কিন্তু লিখিয়াছেন—"কোন কোন স্থানে কেবল সনাতনরচিত মূল সংক্ষিপ্ত হরিভক্তি-বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়।" এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সনাতনকৃত হরিভক্তি-বিলাসের দুই তিনখানি পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি হরিভক্তি-বিলাস লিখিয়াছিলেন কি না জানা যাইবে না।

সনাতন গোস্বামীর লীলাস্তব নামক গ্রন্থ স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ভক্তি-রত্নাকর মতে লীলাস্তবের অপর নাম দশমচরিত। যথা—

লীলাস্তব দশমচরিত যারে কয়।
সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয় ॥ পৃঃ ৫৭।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন। ২।১।৩০-৩১।

দশমচরিত বা লীলাস্তব নামে কোন গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই। ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শ্রীরূপগোস্বামীর "স্তবমালা"র "নন্দোৎসব-চরিতং" হইতে আরম্ভ করিয়া "রঙ্গস্থলক্রীড়া" নামক তেইশটি লীলাবর্ণনামূলক কবিতা ছাপিয়াছেন।

"নন্দোৎসবাদি চরিতং"-এর টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন যে, ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা। যথা "ভগবল্লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরূপো ভগবন্নামোৎকর্ষং মঙ্গলমাচরিত জীয়াদিতি"। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ গীতাবলী ও দশমচরিতকে শ্রীপাদরূপবিরচিত বলিয়াই তদীয় টীকাপ্রারম্ভে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চিরদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, এই কাব্যও শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। শ্রীপাদ কবিরাজ যে, শ্রীপাদসনাতন লিখিত দশমচরিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, উহা এই স্তবমালাভুক্ত দশমচরিত ভিন্ন অন্য কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা (শ্রীমৎ রূপ-সনাতন শিক্ষামৃত, পৃঃ ৪৯৪)। বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। রূপ-সনাতনের গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নহে, কিন্তু আমাদের সমসাময়িক কোন ব্যক্তির শুনা কথা অপেক্ষা তাঁহার শুনা কথা কম প্রামাণ্য নহে। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীতে শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের মধ্যে "ছন্দোঽষ্টাদশকং" নামে এক গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। "স্তবমালার" "অথ নন্দোৎসবাদিচরিতং" পদ্যের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈরষ্টাদশভিরভির্ব্বিপাস্তে॥

এই শ্লোক হইতে অনুমান হয় যে, শ্রীজীব কথিত ছন্দোঽষ্টাদশকং গ্রন্থই স্তবমালার আলোচ্য পদ্যগুলি। তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর লীলাস্তব বা দশমচরিত কোথায় গেল? এসম্বন্ধেও আরও অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীজীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্ত্তী বা বলদেব বিদ্যাভূষণ সনাতনের রচিত বলিয়া "গীতাবলী" নামক কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ "স্তবমালা"র অন্তর্ভুক্ত গীতাবলী নামক একচল্লিশটি গীতের প্রত্যেকটিতেই সনাতন নাম কোন না কোন প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাবলীর টীকার শেষে একচল্লিশটি গীতেরই কথা বলিয়াছেন, যথা—"গাপাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যো ব্যাচষ্ট শ্রীরূপাদিষ্টাং প্রযত্নাৎ।" ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বাইশ সংখ্যক গীতের পর ভুল করিয়া সংখ্যা দিয়া গীতসংখ্যা বিয়াল্লিশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ইহা লক্ষ্য না করিয়া লিখিয়াছেন—"ইহাতে বিয়াল্লিশটি গীত আছে" (রূপ-সনাতন শিক্ষামৃত, পৃঃ ৪৮৮)। এরূপ ভণিতা দেখিয়া মনে হয়, এ গুলি সনাতন গোস্বামীরই রচনা। কীর্ত্তনানন্দে ধৃত দুইটি পদের মধ্যে যথাক্রমে আছে—

"শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ ভাব তরঙ্গী।"
(গোপীকান্তদাস, কীর্ত্তনানন্দ, ২৮ পৃঃ)

"গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলি
শুনইতে উনমিত চিত"
(গৌরসুন্দর দাস, ঐ)

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গীতাবলী সনাতনের রচিত (রূপসনাতন শিক্ষামৃত, ৪৮৮ পৃং)। অথচ শ্রীজীবাদি পূর্ব্বোল্লিখিত চারিজন লেখক সনাতনের গ্রন্থতালিকায় "গীতাবলী"র নাম করেন নাই। পদকল্পতরুতে "গীতাবলীর" অনেকগুলি গীত ধৃত হইয়াছে, এবং ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সেগুলি শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীরূপ "বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন।" গীতাবলীর ৩৭ সংখ্যক গীতি "সুহৃৎসনাতন" ১৩ সংখ্যক "সনকসনাতনবর্ণিতচরিতে", ২০ সংখ্যক "গিরিশ সনাতন সনক সনন্দন" প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া মনে হয়, ইহা শ্রীরূপের লেখা। কেন না শ্রীরূপ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে সনাতনকে "সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা" বলিয়াছেন। সনাতন নিজে গীতাবলী লিখিলে সনকাদির সহিত নিজের নাম ভণিতাচ্ছলে উল্লেখ করিতেন না। আমার মনে হয়, শ্রীরূপ গীতাবলীতে তাঁহার গুরু সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদভাবে দর্শন করিয়া "মুঞ্চ সনাতন সঙ্গতিকামং" (১৯) প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে সনাতনের উক্তি

শ্রীপাদ সনাতন শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণের প্রথম ও তৃতীয় শ্লোকে তিনি শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদতত্ত্ব রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"যদ্যপি শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবদবতার এব, তথাপি প্রেমভক্তি-বিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাত্তেন তদর্থং স্বয়ং গোপী-ভাবোঽপি ব্যঞ্জতে।" তৃতীয় শ্লোকটী এই—

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

'স্বদয়িতনিজভাবং' পদের টীকায় সনাতন লিখিয়াছেন—"স্বস্য হরের্ভাবঃ নিজভক্তজনেষু যঃ প্রেমা, তস্মাৎ সকাশাৎ স্বদয়িতানাং ভক্তানাং ভাবং" শ্লোকটির বাঙ্গালা অর্থ "নিজভাব হইতে স্বীয় ভক্তবর্গের নিজের প্রতি ভাব আলোচনা করিয়া সেই ভাবের প্রতি লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি যতিবেশধারী শ্রীশচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীহরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।"

শ্লোকের টীকায় "উক্তং সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যপাদৈঃ" বলিয়া

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এস্থানে শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আস্বাদনের বাঞ্ছায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের যে অপূর্ব্ব প্রেম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (বৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৩৩।২৩৪ শ্লোক)। বৃহদ্ভাগবতামৃতে নারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন "সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না, যদি বা কোনক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার প্রতীতিবিষয়ও হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। গোপীগণ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরম প্রেমভগবতী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এখানে যদি বা কাহারও প্রেমতত্ত্বশ্রবণে শক্তি হয়, তথাপি সে ব্যক্ত করিতে পারে না। কারণ উপর্য্যুপরি প্রেমাবির্ভাবে সর্ব্বদা সকলে মহোন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অপর, শ্রোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেও তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাক্ষাৎদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তাদৃশ নিজপ্রেমবিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে।"

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ॥

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে পুনঃ পুনঃ ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকার শেষে ভগবান শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ততশ্চ ভগবানিতি—

আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব ভূতানামাগতাগতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

অভিপ্রায়েণেতিদিক।"

এই হিসাবে তো যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকেই ভগবান্ বলা যায়। আমি কাঞ্চীর বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার সম্প্রদায়ে "ভগবান শঙ্করাচার্য্য" বাক্যে ভগবান্ শব্দে কি বুঝায়? তিনি ঠিক ঐ শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে "ভগবান্" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আর কোথাও দেওয়া হয় নাই। সনাতন গোস্বামী কি ভাব লইয়া শ্রীচৈতন্যকে ঐরূপ লক্ষণান্বিত ভগবান বলিয়াছেন তাহার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন।

ভূমিকা

—সমুদ্র গুপ্ত

বিয়েবাড়ীর গোলমাল থামিয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে কৌতুকমত্তা নবীনাদের তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনি শোনা যায়।

ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী রাত্রি। সারাটি দিন ভরিয়া ক্লান্তিহীন বৃষ্টির ধারা নিরুদ্বেগে বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই সিক্ত স্পর্শে আসন্ন শরতের স্নিগ্ধমধুর শ্যামলিমা অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। আকাশ সজল ছায়ায় আচ্ছন্ন। মফঃস্বল সহরের রক্তিম পথগুলি কাদায় ভরা। বাহিরের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া সকলেই ঘরে আশ্রয় লইতে ব্যস্ত।

কিন্তু তথাপি মনে হয়, যেন এই ক্ষুদ্র দিনটির অন্তরালে একটি অকথিত রূপকথার ব্যগ্র কৌতূহল লুকাইয়া আছে—যেন যাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নয় এবং যাহা সত্য তাহা কিছুতেই নিজেকে ধরা দিতে চাহিতেছে না—যেন শ্রাবণের অশ্রুধারার সাথে আশ্বিনের প্রভাতী শিউলীগন্ধ মিলিয়া এক বিচিত্র আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়াছে।

গল্পের ভূমিকায় কাব্যরসের অবতারণা করা অলিখিত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ বটে, কিন্তু কাব্য ও জীবন যে এক নয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন। আমাদের নায়ক অনুপমও তাহা অনেক বার শুনিয়াছিল। কিন্তু যে সনাতন দেশে পূর্ব্বরাগের সাথে কলঙ্কের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সে দেশের নবীন যুবক বিয়ের রাত্রিতে যদি সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশটি ভুলিয়া যায় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

কৃতী ছাত্র অনুপম বিবাহ করিতে আসিয়াছে। পাত্রীর পিতার অর্থ আছে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাও কম নয়। পাত্রীর নাম অমলা, বয়স যাহা হওয়া উচিত তাহাই এবং সে ইংরেজী শিশুপাঠ পড়িতে শিখিয়াছে।

যে নিজের দেহের ও মনের অর্দ্ধবিকশিত মাধুর্য্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারই মত অর্দ্ধ-সচেতন অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং লোভাতুর একটি পুরুষের পাশে।

—অমলা!

উত্তর নাই।

কয়েক মিনিট থামিয়া অনুপম আবার ডাকিল—অমলা!

উত্তর নাই।

অনুপম বেশ জানিত যে, অমলা জাগিয়াই আছে। মুখর দেহটিকে সহসা নিস্পন্দ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হওয়াতে সে নিজের অঙ্গসঞ্চালন নিয়মিত করিবার জন্য সন্তর্পণে চেষ্টা করিতেছে। মুখটি অপর পাশে ফিরাইয়া সে শুইয়া আছে, কাজেই তাহার নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুপম অনুভব করিতে পারিতেছে না। অবাধ্য অলঙ্কারগুলিকে কিছুতেই মৌনব্রতে দীক্ষিত করা যায় না, তাই মাঝে মাঝে মৃদু শব্দ শোনা যায়। এমনই একটি সুযোগের সাহায্য লইয়া অনুপম কহিল, তুমি ঘুমিয়েছ?

—না।

কয়েকটা প্রশ্নের পরে যে, একটা উত্তর দিতে হইবে, তাহা ঠাকুরমা বলিয়া দিয়াছিলেন। সমবয়সী বিবাহিতা সখীরা আরো অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু ততখানি দুষ্টামি নাকি আবার কোন মেয়ে করিতে পারে!

—এখন তোমার জ্বর আছে?

—না। অমলার মনে হইল, যেন প্রশ্নগুলি বড় তাড়াতাড়ি নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

—আজ কি খেয়েছ?

—চা, দুধ এই সব।

সম্প্রদানের সময় অনুপম যখন নিজের হাতে অমলার ফুটন্ত দেহের প্রথম স্পর্শ অনুভব করিল, তখনই তাহার মনে হইয়াছিল যে, অমলার বোধ হয় জ্বর, হাতখানা বড় গরম। কালিদাস বিবাহধূমারুণলোচনা সীতার বর্ণনা করিয়াছেন—পুরোহিতের বিচিত্র মন্ত্রধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে সেই শ্লোকটি অনুপমের অন্তরে উঁকি দিতেছিল।

কবিতা ভুলিয়া গিয়া অনুপম ভাবিল—আহা বেচারী! সারাদিনের অনাহার, উত্তেজনা! বিয়ের সাঁঝে লজ্জানতমুখী কিশোরীর মনের গোপন কথা কে জানে?

যে কথা কেহ জানে না, অপরিচিত অতিথি অনুপম তাহাই জানিতে চাহিল। জানিল কি না বলা কঠিন; কিন্তু জানিবার প্রয়াসের মধ্য দিয়া যে পরিচয় সুরু হইল তাহার রেশ যুগযুগান্ত অতিক্রম করিয়া কোথায় শেষ হইবে কি না তাহা অনুপম জানে না।

তন্দ্রা ভাঙ্গিলে অনুপম চাহিয়া দেখিল, সূর্য্যের আলো ঘর প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং অমলার একখানা হাত তাহার বুকের উপর হেলিয়া রহিয়াছে। হাতে অনন্ত, চুড়ি, ছোট আঙুলটি ঘিরিয়া ছোট ছোট আংটি। সাঁঝের রক্তিম লাবণ্যে আলোকিতা ক্ষীণা তটিনী যেমন করিয়া তরুছায়া-সমাচ্ছন্ন রহস্যময় গ্রামটিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই ভাবে সরু অথচ দীপ্ত হারছড়াটি অমলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দুলিতেছে। সারা গায়ে বিয়ের লাল শাড়ী জড়ানো।

অমলা ঘুমাইতেছে।

অনুপম আবার চোখ বুজিল।

সূর্য্যের আলো যেন অমলার দেহের জ্যোতির সাথে লুকোচুরি খেলিতেছে।

* * *

অমলা রাগ করিয়া কহিল, যাও, ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে ত আমার ঘুম হচ্ছে না।

অনুপম হাসিল। বেশ। লোকে সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার মুখ দেখবে না। চমৎকার হবে।

—না দেখুক গে।

অনুপম কথা বলিল না।

অমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি হ'ল?

—কি আর হবে?

—কথা বলছ না যে?

—বাঃ, সারারাত তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না কি?

—যা ভেবেছি। এতেই রাগ হ'ল?

—রাগ আবার হ'ল কোথায়?

—আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি সব বুঝি। তোমায় চিনতে আমার কি আর বাকী আছে? ঐ যে আমি বলেছি ছেলে চাই না, অমনি রাগ।

—যদি তাই হয়?

উভয়ের যখন মিটমাট হইল, তখন নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে আলোকরেখার সূচনা হইতেছে, বহু দূরে সমুদ্রের নীল জল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

* * *

জাহাজ ছাড়িল।

চৈত্রের সন্ধ্যা। বসন্তঋতুর স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের পরিবর্ত্তে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত স্পর্শ বলাই ভাল, তরুণ-তরুণীর কথা অবশ্য ভিন্ন।

অনুপম অমলাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতেছে; সম্পূর্ণ একটা দিন এবং একটা রাত্রি জাহাজে থাকিতে হইবে। পরিচিত আর কেহ সঙ্গে নাই।

ভালই। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্নভাবে এমন একান্তে অমলাকে কাছে পাইবার সুযোগ আর হয় নাই। বাঙ্গালীর সংসারের সহস্র বন্ধন, সহস্র বৎসরের সংখ্যাতীত অন্ধ সংস্কার—ইহার মধ্যে মিলনপ্রয়াসীর স্বাধীনতা কোথায়!

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। জাহাজ নদীর সীমারেখা পার হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অদূরবর্ত্তী আলোকস্তম্ভের জ্যোতি মজ্জমান শৈলরাজির শিখরদেশ অকস্মাৎ আলোকিত করিয়া তুলিতেছে।

ধীরে ধীরে সকলেই ডেক ছাড়িয়া কেবিনে আশ্রয় লইতে লাগিল। আলোকস্তম্ভটি ক্রমে সরিতে সরিতে দিগন্তে মিশিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার এবং সমুদ্রের গাঢ় নীল জলরাশি মিলিয়া যেন সমগ্র সচেতন পৃথিবীটি একটা ঘনকৃষ্ণ যবনিকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নিতান্ত একঘেয়ে কল্লোল ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বিরাট জাহাজটা মাঝে মাঝে কাঁপিয়া বা দুলিয়া উঠে।

নির্জ্জন ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অমলার বামহাতের আঙুল কয়টি নিজের ডানহাতের মুষ্টির মধ্যে জড়াইয়া লইয়া অনুপম বলিল, আচ্ছা দেখ দেখি, আমরা তো জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি। এখন যে কোন সময় জাহাজটা ডুবে যেতে পারে, জাহাজে আগুন ধরতে পারে, আরো কত কি বিপদ হ'তে পারে। যদি তাই হয় তবে আমরা কি করি? এই বিশাল অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে কি ভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখি বল তো?

অনুপম নিজের ঘরটিতে একা। বাহিরের বন্ধনহীন কল্লোলের মধ্যে আজ তাহার স্থান নাই। নিজের উপর, অমলার উপর, সমস্ত পৃথিবীর উপর দারুণ রাগে তাহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছিল। কেন অমলাকে ব্যথা দিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি আজ তাহার মাথায় আসিল? কেন অমলা বুঝিল না যে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা তাহার সত্যকারের মনের কথা নয়? কেন এই উৎসববিহ্বল নরনারীর দল আজ তাহার ও অমলার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া দুইজনের মনে দীর্ঘ ব্যবধানের প্রাচীর তুলিতেছে?

অনুপম কয়েকবার অমলাকে ডাকিয়া পাঠাইল, কিন্তু যে ছোট শ্যালিকাটির উপর এই গুরুতর দৌত্যকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল, সে প্রত্যেকবারই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দিদি এখন আসিতে পারিবে না। অনুপম একবার ভাবিল যে, অমলা হয় তো জনসঙ্ঘের দৃষ্টি এড়াইয়া আসিবার সুযোগ পাইতেছে না; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, এই অজুহাত সত্য নয়, অমলার আসিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই সে দূরে দূরে ফিরিতেছে। অনুপম ইহার প্রতিশোধ লইবে।

প্রতিশোধ লওয়া হইল সারাদিন পরে সন্ধ্যার সময়। বাড়ীতে ভোজন-যজ্ঞের সমাধা হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিতের দল চলিয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকটি বিশেষ পরিচিত বান্ধবী তখনও গৃহকর্ত্রীর চারিপাশে আসর জমাইতেছেন। অনুপম বৈকালের দিকে একবার বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিল, তখন সবেমাত্র বাড়ীতে ফিরিয়া নিজের ঘরটিতে প্রবেশ করিয়াছে। হঠাৎ অমলা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

রাত্রিতে অনুপম কহিল, আজ আমাদের নতুন করে ফুলশয্যা হ'বে, কি বল?

অমলা হাসিয়া জবাব দিল, তোমার যেমন কথা! এত যদি বারবার ফুলশয্যা ক'রবার সখ থাকে তবে আর কয়েকটা বিয়ে কর না কেন?

অন্য সময় হয় ত অনুপম এ কথায় রাগ করিত, কিন্তু আজ সারাদিনব্যাপী মেঘান্ধকারের পর এই চকিত রৌদ্রটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই সে গম্ভীর ভাবে কহিল, প্রথম গিন্নী তো ফুলশয্যার রাত্রে জ্বরে অচেতন ছিল, তাই সেই অসম্পূর্ণ মুহূর্ত্তটি আজ সম্পূর্ণ করতে চাই।

ফুলশয্যার কথা কোন মেয়েই ভুলিতে পারে না, অমলাও পারে নাই। কিশোরীর ফুটন্ত মনের উপর সেদিনকার উতলা হাওয়া যে আন্দোলনের সূচনা করে, কোন্ কবি তাহা ধ্বনিতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন?

সেই ভয়াতুর, মিলনলোভী রাত্রিটির কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় অমলার মনে যে একটু লোভ না জাগিল এমন কথা বলা যায় না।

গভীর রাত্রি। ঘরে ঘরে কর্ম্মক্লান্ত নরনারী নিদ্রামগ্ন। অনুপম ও অমলা গল্প করিতেছে। সে যেন বন্যার স্রোত, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই—তাহা মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু কোন্ পথে তাহার গতি তাহা কেহ জানে না।

অমলার শরীর বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মন যেন চৈত্র-সন্ধ্যার দুর্দ্দম হাওয়ায় হেলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। অমলা স্বপ্ন দেখিতেছে। কালস্রোত যেন বহিতে বহিতে অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অমলা মায়ের ঘরে গেল।

অনুপমের যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস হইতেছিল না। যে পরম মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষা সে এতদিন ধরিয়া করিতেছিল, তাহা-কি এত শীঘ্রই আসিয়া পৌছিল? যদি আসিয়াই থাকে, তবে এতদিনের সন্ত্রস্ত ব্যাকুলতা এখন সে সামলাইবে কি ভাবে?

অনুপম কি করিবে?

সময় কাটিয়া যায়। সন্দেহ আর নাই। অনুপমের তেইশ বৎসরের জীবনে সে বাস্তবতার এমনি রূপ আর কখনও অনুভব করে নাই।

পাশের ঘরে অমলা। তাহার কম্পমান দেহের প্রতিটি স্নায়ু যেন একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির আকস্মিক প্লাবনে পুড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। গভীর নিশীথে প্রলয়ের ভূমিকম্প যেন সুপ্ত নরনারীর অচেতন দেহগুলিকে ঝঞ্ঝাহত তরুলতার মত ওলট-পালট করিতেছে। অমলার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন দীপ্ত বিদ্যুৎশিখা তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে।

নিজের ঘরটিতে অনুপম একা! কিছুক্ষণ আগে অমলা যেখানে শুইয়া ছিল, বিছানার সেই অংশটি এখন শূন্য। নরম বালিশ ও তোষকের উপর অমলার দেহের ভারে দাগ পড়িয়া গিয়াছে। অমলার চুলের গন্ধ খাটের আশে-পাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ভোরের আলোকে অনুপম স্পষ্ট দেখিতে পাইল, অমলার চুড়ির আঘাতে কিছুক্ষণ আগে চাদরের যে কোণটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ঠিক তেমনই আছে।

অনুপম বসিয়া ছিল, একবার শুইল। হঠাৎ চোখ দুইটি মুদ্রিত করিয়া অনুপম ভাবিল, অমলা তাহার পাশেই আছে। ফুলশয্যার রাতে ভীতা হরিণীর মত অমলা! আজ তাহাদের ফুলশয্যার নূতন সংস্করণ।

কতক্ষণ যে সে শুইয়া ছিল তাহা অনুপম জানে না। পাশের ঘরে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। প্রভাতী আলোর সুপ্তপ্রায় দীপ্তিকে প্রখর করিবার জন্য বাতি জ্বলিতেছে। পাখীর কলরবের সঙ্গে লোকজনের আনাগোনার সতর্ক শব্দ মিলিয়া যাইতেছে।

তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া অনুপম পাশের ঘরের দরজায় উঁকি দিল, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইল না। তার পর কোনরকমে একটি শ্যালকের সন্ধান পাইয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন? একটু থামিয়া আবার কহিল, অবশ্য যদি হেঁটে আসতে পারে।

শ্যালকপ্রবর একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অনুপম নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দৃঢ়ভাবে খাটের একটা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের মধ্যে টাইটানিক জাহাজের মত দুলিতেছে। বরফের পাহাড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, অনুপম ও অমলা বৃথাই 'লাইফ-বেল্ট' খুঁজিতেছে।

কয়েক মিনিট পরে ঘরের দরজায় অমলাকে দেখা গেল। ম্লান আলোকে তাহার মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু বামদিক হইতে দেখিলে মনে পড়ে, পদ্মার শ্বেতাভ নির্জ্জীব বালুচরের দৃশ্য। অমলার পা কাঁপিতেছে, তাই দরজার কাছে আসিয়া সে একখানা কবাট ধরিয়া একটু দাঁড়াইল। অনুপম তাহার কাছে গিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরমুহূর্ত্তে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আনিয়া খাটের একপাশে বসাইয়া দিল।

অনুপম কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু পরে অমলা স্থির হইয়া বসিয়া একবার হাসিল এবং নিজের কম্পমান বামহাতখানি অনুপমের কোলে রাখিয়া নিজের দেহটি তাহার বুকের উপর এলাইয়া দিল। অনুপম মুগ্ধ হইল। অমলাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে কহিল, ভয় পাচ্ছ?

অমলা জবাব দিল না, কেবল অনুপমের হাতে একটু চাপ দিল। হঠাৎ পাগলের মত অনুপম তাহার মুখ, চুল ও হাত দুইটি চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কয়েকমিনিট যেন স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, ভয়ের কিছু তো নেই। এরকম তো সবারই হয়। মা আছেন, এখনি ডাক্তারবাবু আসবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ডাক্তার? অত্যন্ত শ্রান্তভাবে শব্দটি উচ্চারণ করিয়া অমলা একবার জানালার দিকে তাকাইল।

মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে অনুপমের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, তবু নিজেকে কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া একটুখানি হাসির ভাণ করিয়া কহিল, এ সময় ডাক্তার আনাই তো ভাল। তোমার যাতে বেশী কষ্ট না হয় সে জন্যই তো ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া। সাহস থাকে যেন, লক্ষ্মীটি।

—আমি ত ভয় পাই নি—বলিতে বলিতে হঠাৎ অমলা চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল। অনুপম একটি মুহূর্ত্ত বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল, তারপর তাড়াতাড়ি অমলাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া নিজে বাহির হইয়া গেল। একটু পরে সেই শ্যালককে নিয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অমলা আবার উঠিয়া বসিয়াছে।

মায়ের ঘরে যাইবার সময় অমলা পিছনে ফিরিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু বলা হইল না।

অনুপমের চোখের উপর আজ সৃষ্টি ও প্রলয় একসঙ্গে কোলাকুলি করিতেছে।

কয়েকটা ঘণ্টা কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা অনুপম মনে করিতে পারে না। পৃথিবীর গতি যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জীবনের প্রবাহ যেন চলিতে চলিতে হঠাৎ রুদ্ধ

হইয়া গিয়াছে। নিরন্তর ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্ক কি বজ্রপাতের আশঙ্কায় বিপদের পূর্ব্বেই স্থবির হইয়া গেল ?

একবার অনুপমের মনে হইল, পৃথিবী বড় সুন্দর। যুগযুগান্ত ধরিয়া সুখ দুঃখের নিয়ত প্লাবন এই পৃথিবীর বুকে বহিয়া চলিয়াছে। নারী ও পুরুষ এখানে বাঁচিয়া থাকে, সৃষ্টি করে। এই পৃথিবীর আলো অমলার দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এখানকার তরু-লতা অমলার স্পর্শে সজীব। এই পৃথিবীর তুলনা নাই।

চা-এর সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া শ্যালকপ্রবর অনুপমের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তারপর তাহার দিকে একবার তাকাইয়া ব্যস্তভাবে চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, নাও। যে দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

—না, ভাল লাগছে না। এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলিয়াই অনুপম ঘরের এক কোণে যাইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

শ্যালক কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইবার পাত্র নন, বিশেষতঃ অনুপমের এই আকস্মিক বৈরাগ্যের অর্থ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মুখখানি একটু অর্থপূর্ণভাবে বাঁকাইয়া বলিলেন, চা খাবে না কেন ?

অনুপম শুধু একবার মাথা নাড়িল। শ্যালক চলিয়া গেলেন।

জানালার পাশে চেয়ারটায় বসিলে বাহিরের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। বাড়ীর সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঝে মাঝে আমগাছের সারি। তাহার ওপারে মফঃস্বল সহরের অপ্রশস্ত রাস্তা এবং রাস্তার ওপারে দরিদ্র পল্লীর কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর। অগ্রহায়ণের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত কুয়াসায় ঈষৎ ম্লান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না।

অনুপম বাহিরের দিকে চাহিল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল সুরু হইয়াছে। বহির্জ্জগতের অগ্রগতির সাথে নিজের দেহ ও মনের স্তব্ধতার তুলনা করিয়া অনুপমের মাথা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

পাশের ঘরে চাপা গলায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে অমলার আর্ত্তস্বর শোনা যাইতেছে।

হঠাৎ অনুপমের চোখে কুয়াসার ছায়া নামিয়া আসিল এবং ক্রমে ক্রমে বাষ্পজলে পরিণত হইল।

অনুপম কাঁদিতেছে। অমলার চীৎকার যতই তাহার কানে আঘাত করে, ততই বন্ধনহীন অশ্রুধারা-প্রবলবেগে গড়াইয়া পড়িতে থাকে। সেই স্বর অনুপম সহিতে পারে না। অমলা যদি সারাক্ষণ অবিরত আর্ত্তনাদ করিত, তবে হয় তো তাহা এত নিদারুণ মনে হইত না। কিন্তু এই যে কয়েকমিনিট পর পর বিশ্বব্যাপী নিস্তব্ধতা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে—

অনুপম নীরবে নীচে নামিয়া গেল। মজ্জমান জাহাজের যাত্রীরা মধ্যরাত্রে জীবন-তরীর সন্ধানে ফিরিতেছে—তাহারা কি ভাবে কে বলিবে ? অনুপম পাশের ঘরের কান্না আর শুনিতে পারে না। যেখানে তাহা আর শোনা যাইবে না অনুপম সেখানে যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে সে জায়গা ?

কাঠের বড় বাংলো। উপরে থাকিবার ঘর, নীচটা ফাঁকা। অমলা যে ঘরে ছিল অনুপম ঠিক তাহার নীচে যাইয়া দাঁড়াইল। অমলার আর্ত্তনাদ দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছে।

ডাক্তার যখন ছেলের গায়ে ছুরি চালাইতে ব্যস্ত তখন মা ঘরে থাকিতে পারেন না, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দরজার দিকে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

আবার সেই শব্দ! অনুপম তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। চোখের জল বাধা মানে না, কিন্তু ঘরের বাহিরে তাহাকে বাধা দিবার প্রয়োজন হয়। চাকরটা যে নীচে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অনুপম লক্ষ্য করিয়াছে।

সৃষ্টির ব্যথা কি শুধু মানুষের জন্য ? বিধাতার কি তাহাতে কোনই অংশ নাই ?

লোকচক্ষু কোন রকমে এড়াইয়া অনুপম দূর হইতে চুপি চুপি অমলার দিকে চাহিল।

অমলা শুইয়া আছে। তাহার সারাগায়ে কালো রঙের একটা কম্বল জড়ানো। চুলগুলি আলুথালু। হাত দু'খানি বুকের উপর এলাইয়া রহিয়াছে, চুড়িগুলির একটা অংশমাত্র দেখা যায়।

পাশে নূতন অতিথি।

অমলা যে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে ইহা অনুপম মনে করে নাই। কিন্তু অমলা নিজের মাথাটি বালিশ হইতে সামান্য একটু উঠাইয়া একটু হাসিল এবং পরক্ষণেই মাথাটি আবার নামাইয়া মেয়ের দিকে একবার চাহিল।

অনুপম মেয়েকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু মেয়ের মা যে তাহার দিকে চাহিয়া শীর্ণ আঙ্গুল কয়টি দোলাইতে চাহিতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

একছুটে হরিহর-ছত্র

—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুত্বের অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। মৌলভী সাহেব খোস-মেজাজে বহাল-তবিয়তে কলিকাতা আসিয়া বেগার ধরিলেন, নূতন মোটর খরিদ করিব, পছন্দ করিয়া দাও। তথাস্তু। চার পাঁচ দিন নানাবিধ গাড়ী দেখা এবং salesmanদের বুকনির দাপটে যখন প্রায় রাঁচিপ্রদেশস্থিত কাঁকে-র মস্তিষ্ক-চিকিৎসাগারের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িবার উপক্রম, তখন তাড়াতাড়ি এক আট-সিলিণ্ডার "পন্‌টিয়াক্" খরিদ করিয়া ফেলা গেল। বন্ধু সেই রাত্রেই "যঃ পলায়তি স জীবতি" করিলেন। আমার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে, তাঁহার নূতন গাড়ী স্বহস্তে পৌছাইয়া দিয়া তাঁহার পুরাতন গাড়ী লইয়া আসিব। একা এতদূর পাড়ি জমান বড় বেজুৎ, তাই জ্ঞানবাবু ও মিতাকে আরোহিরূপে সংগ্রহ করিলাম। তাঁহারাও "সস্তার কিস্তিতে অশ্বত্থামা যাত্রার লোভ" সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন সন্ধ্যায় তিন মূর্ত্তি যাত্রা করিলাম। তখন কিন্তু জানা ছিল না যে, এই যাত্রা ভবিষ্যতে "এক ছুটে হরিহর-ছত্রের" মাল-মশলা সরবরাহ করিবে।

ডোবার ঘাট। ডোবার ঘাটের অপর দৃশ্য। শোনপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গা।

রাত্রি বারটার সময় বর্দ্ধমান পৌছান গেল। আরোহি-দ্বয়ের ইতিমধ্যে জঠরে এরূপ দাহ ও অনলের সৃষ্টি হইয়াছে যে, আর বিলম্ব হইলে তাঁহারা হয়ত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন। পৌছিবামাত্র তাঁহারা ছুটিলেন সীতা-ভোগ ও মিহিদানা সংগ্রহে এবং আমি পাশেই এক পাঞ্জাবী হোটেলে চাপাটি ও অত্যুৎকৃষ্ট মাংসসহযোগে অনল-নির্ব্বাপণে ব্যস্ত হইলাম। Hunger is the best sauce. ক্ষুধার ঝোঁকে খাইয়া গেলাম, কিন্তু তার ফলে যে অশ্রুর অবিরল ধারা এবং লালার অবাধ প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহা রোধের ক্ষমতা নাই; সে কি দারুণ ঝাল! খাস পূর্ব্ববঙ্গে ধামাপূর্ণ কাঁচালঙ্কার ঝোলও খাইয়াছি, কিন্তু এ পাকের বাহাদুরী তাহাকেও হার মানাইয়াছে। রান্নার তারিফ করিতেই হইবে। সয়তান ঘাড়ে চাপিয়া পরামর্শ দিল, এ হেন রসাস্বাদ একা ভোগ অতীব স্বার্থপরতার পরিচায়ক হইবে, অতএব চুপচাপ থাকিয়া ভবিষ্যৎ ফলাফল পর্য্যবেক্ষণই বিধেয়। হইলও তাই; বন্ধুদ্বয় লোভ সংবরণ করিতে অপারগ হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মাংস-চাপাটি খাইলেন; খাইয়া উভয়েই আমার উপর মারমুখী, সাবধান করি নাই কেন! আমি নজীর পেশ করিলাম :—

এক হোটেলে বহুদিন পরে দুই বন্ধু খানায় বসিয়াছেন। খানা ও নানা সুখ দুঃখের গল্প অবাধে চলিয়াছে। এক বন্ধু বোতল হইতে চাটনী লইয়া ভক্ষণে রত হইলেন। অল্প পরে

অপর বন্ধু লক্ষ্য করিলেন, বন্ধুর চক্ষে দরবিগলিত ধারা, What makes you cry? (কাঁদ কেন?) সয়তান সেক্ষেত্রেও স্কন্ধে সওয়ার হইয়াছেন, উত্তর মিলিল, Fifteen years ago they hanged my poor innocent father here (এইখানে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমার বেচারী নিরপরাধ পিতাকে তাহারা ফাঁসী দিয়াছিল)। সহানুভূতি, বিচার-বিভ্রাট ইত্যাদি সাময়িক সমবেদনা করিতে করিতে অপর বন্ধুও চাটনী-ভক্ষণে রত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুসাগরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রথম বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, What makes you cry my friend? (তুমি কাঁদ কেন বন্ধু?) বন্ধু তখন ভুক্তভোগী, উত্তর মিলিল, That they did not hang you along with your father. (যেহেতু তোমাকে তোমার বাপের সঙ্গে তাহারা ফাঁসিতে লটকায় নাই)। বলা বাহুল্য, চাটনীটি ভীষণ ঝাল।

আসানসোলে পেট্রোল আদি সংগ্রহের পর পুনরায় রওনা হইয়া অতি প্রত্যূষে গিরিডি পৌছিলাম এবং তথায় কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও আহারাদি সমাপন করিয়া ডেবোর ঘাট হইয়া বিহার-সরিফ পৌছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়। সেখান হইতে খোঁজ-খবর করিয়া যাইতে হইবে "অশথাওঁয়া"—বন্ধু মৌলভী সাহেবের বাড়ী। সেখানে গিয়া জানিলাম, বন্ধু পাটনায় গিয়াছেন, তবে তাঁহার শ্বশুর, মাননীয় সচিব মহাশয় উপস্থিত আছেন এবং আমাদের দর্শনাভিলাষী। সাক্ষাতে আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট হইল; রাত্রে থাকিবার জন্য জিদ করিলেন, কিন্তু আমরা তখনই পাটনা যাইতে বদ্ধপরিকর জানিয়া তাঁহার বাসায় উঠিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া এবং সেই মর্ম্মে পত্রাদি লিখিয়া দিয়া বিদায় দিলেন। আমরা পাটনা অভিমুখে ছুটিলাম।

কি জানি কেন, রাত্রি বারটা এ যাত্রায় আমাদের ভয়ের কারণে পরিণত হইতেছিল। আবার বারটায় পেট্রোল অভাবে মধ্যপথে গাড়ী দেহ রক্ষা করিল; নূতন গাড়ী, পেট্রোলের ক্ষুধা সঠিক অজ্ঞাত, কাজেই এই বিভ্রাট। অগত্যা রাস্তায় গাড়ী ফেলিয়া টর্চ্চ হাতে সেই ঘোর নৈশ অন্ধকারে অগ্রসর হইলাম, সাহায্যের—এবং দুগ্ধাভাবে দধি, অর্থাৎ পেট্রোল অভাবে কেরোসিন তৈলের সন্ধানে।

রাস্তার দক্ষিণে গঙ্গার উন্নত তটভূমি, জলের মৃদু কল্লোল কানে আসিতেছিল, আর আসিতেছিল শীতের শিশিরসিক্ত নৈশ সমীরণ, যাহা আবরণের যথেষ্ট বাহুল্য সত্ত্বেও হাড়ে কাঁপুনি তুলিয়া দাঁতে দাঁতে কলিসান্ লাগাইতেছিল। কিছুদূর এই ভাবে চলিয়া রাস্তার ধারে এক "ঝুপড়ী" দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটি টর্চ্চের আলো গিয়া পড়িল সেই কুঁড়ের উপর। তার সামনে দিয়াই এক নাতিপ্রশস্ত অত্যন্ত ঢালু "পাকডাণ্ডি" গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে এবং আশাতীত সাফল্য,—দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি, কুঁড়ের স্বল্পপরিসর দাওয়ায় আপাদমস্তক "দোহর" মুড়ি দিয়া, দুই খাটিয়ায় নিদ্রাসুখে মগ্ন। যাক্,

ষ্টীমারে হরিহর-ছত্র যাত্রা। (৬৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মানুষ যখন মিলিয়াছে, তখন আর বিশেষ ভাবনা নাই; সকলে চীৎকার আরম্ভ করা গেল—তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে। কিন্তু চেষ্টা বৃথায় গেল, কুম্ভকর্ণের কলিযুগের সেই যমজ সংস্করণ আসলকেও অনায়াসে হার মানাইতে পারে, জাগা দূরের কথা—তাহারা একটু নড়িলও না, ভাঙ্গিল শুধু আমাদের গলা। তখন দলবলসহ দাওয়ায় চড়াও করিয়া বস্ত্রাবৃত এক মূর্ত্তিকে সজোরে ধাক্কা দিলাম; মাত্র কোঁক্ করিয়া একটি আওয়াজ ছাড়া কোনও ফল হইল না। তখন জোর করিয়া "দোহর" মুখ হইতে অপসারিত করিয়া টর্চ্চের আলো দিবা মাত্র,—প্রকাণ্ড এক লম্ফ। বন্ধুবর বোধ হয় পথ রোধ করিয়া ছিলেন, এক ঝটকায় তিন হাত তফাতে পড়িলেন, হাতের
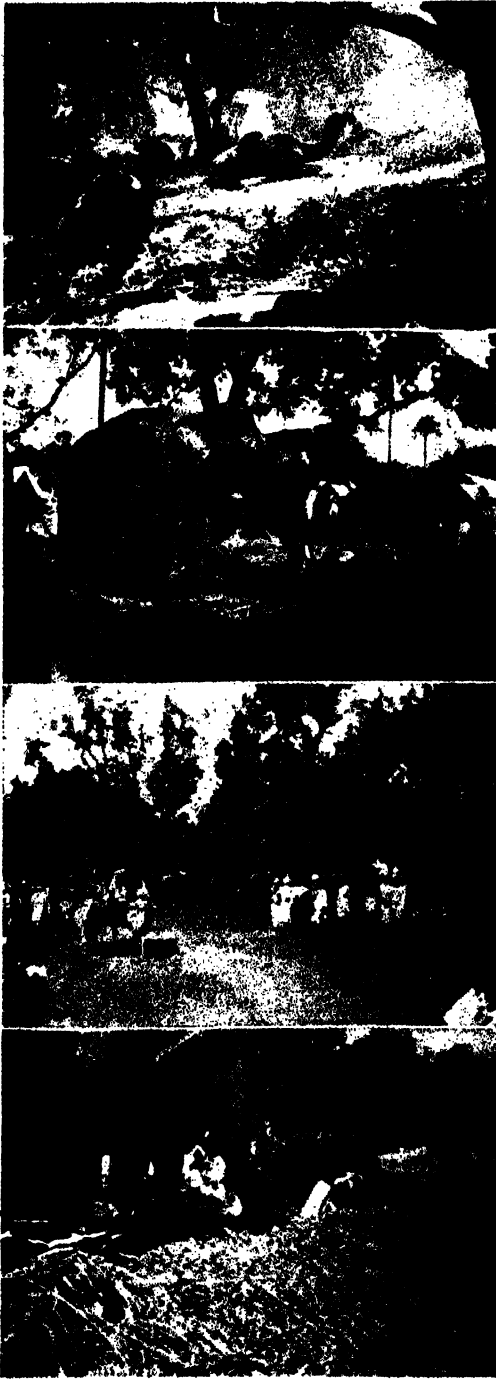
হরিহর-ছত্র : উষ্ট্রের বিপণি। হস্তিযূথ ক্রেতার অপেক্ষায়। অপর দৃশ্য। হস্তীশাবক। (৬৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

টর্চ্চ ছিটকাইয়া গেল এবং প্রায় নগ্ন এক মূর্ত্তি "বাপ্পা হো বাপ্পা" চীৎকারে নিশীথিনীর স্তব্ধ নীরবতা দীর্ণ করিয়া ছুট মারিল, যেন এই দৌড়টির উপরই তাহার এই জীবনের বাঁচন মরণ নির্ভর করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্ত্তিও লাফ মারিল বটে, কিন্তু "দোহর" তার কাল হইল, জড়াইয়া পড়িল মাটিতে এবং তথা হইতে পড়িল গিয়া বন্ধুবরের ঘাড়ে, যিনি প্রথম ধাক্কায় প্রায় ঢালু পথে পড়িয়াছেন। টাল সাম-লাইতে সে ধরিল বন্ধুর চরণ, ফলে তিনি পড়িলেন তার ঘাড়ে, তারপর দুই প্রাণী গভীর আর্ত্তনাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া, সরসর করিয়া সেই ঢালু পথে নামিয়া গেল এবং পরক্ষণেই গঙ্গাগর্ভ হইতে শব্দ উঠিল···ঝপ্, ঝপ্, ঝপাং।

চক্ষের নিমেষে এই যে নানা ঘটনার সমাবেশ, বোধ হয় আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও দৃশ্যপটের সাহায্যে এরূপভাবে প্রকট করা সম্ভব নহে। ছুটিয়া গিয়া বন্ধু ও অজানিতকে উপরে আনা হইল, তাঁহারা তখন বেতসপত্রের মত থরহরি কম্পমান। ভাগ্যে তীরে জল গভীর ছিল না, নতুবা সেই রাত্রের দুর্ঘটনার কথা আজ আর লিখিবার শক্তি থাকিত না। ভোগের শেষ তখনও হয় নাই, মহা-বাজখেয়ে গলায় রাস্তা হইতে হুঙ্কার উঠিল, "কোউন্ হই রে-এ-এ-এ-এ" এবং হাজির হইল এক পাকা চারিহস্ত পরিমিত তৈলপক্ক বংশদণ্ড, যার আগাগোড়া এবং মধ্য অর্থাৎ প্রতি গাঁইট ভারী পিতল দিয়া মোড়া। বাপ! সে কি লাঠি! লাঠি দেখিয়াই এমন তাক লাগিয়া গেল যে, দৃষ্টি ফিরাইয়া এ হেন কোঁৎকার মালিককে দেখিব বা কিছু বলিব, সে শক্তি রহিল না। আবার সেই গলায় প্রশ্ন হইল, "বুতরু কাহে রোতা?" সঙ্গে সঙ্গে যষ্ঠি-আস্ফালন। বোধ হয় এত আগ্রহে "ত্রাহি দুর্গা" ডাক খুব কমই উঠে। বেশ বুঝা গেল, ব্যক্তিটি তার খেঁটের মতই একেবারে নিরেট, বুদ্ধির আতিশয্য হেতু যদি হলধরের মত একবার চালনা আরম্ভ করিয়া দেয়, তবে হলায়ুধের অপেক্ষা কম কার্য্যকরী হইবে না। বলিতে ইচ্ছা হইল, "ও রে নির্ম্মম! স্বজাতি বলিয়া গুম্ফশোভিত 'সপ্ত শার্দ্দুলের খোরাক' জোয়ানের বুতরু (শিশু) পদবাচ্য হইতে বাধা হইল না, অথচ তিনটি নিরীহ বঙ্গ-সন্তানের তোমার বিশাল কোঁৎকার আস্ফালনে অন্তরাত্মা পিঞ্জরমুক্ত হইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই?" কিন্তু যদি বসাইয়া দেয়, এই ভয়ে সবাই নীরব। তারপর আরম্ভ হইল গ্রাম্য হিন্দীর অবাধ আদান-প্রদান, বেশীর ভাগই

দুর্বোধ্য, মাঝে মাঝে আরও দুর্বোধ্য হইতেছিল জ্ঞানবাবুর সাফাই গাওয়ায়, যথা—"রাস্তা খুঁজকে না পেতে স্থাক্তা, তো ঘুম ভাঙ্গায় গা না তো কি?" কতক আন্দাজে, কতক বুঝিয়া এবং বাকি fill up the blanks (পাদপূরণ) করিয়া বুঝা গেল, আমরা পৌছিয়াছি একেবারে শ্মশানে (বলিহারি গাড়ী! যথাস্থানেই দেহরক্ষা করিয়াছে)। ওইটি মুর্দ্দফরাসের কুটীর; ব্যবসা সেদিন খুব জোর চলিয়াছিল; তিনটি শব দাহ হইয়াছে; কাজেই পিতা নিদ্রিত পুত্রদ্বয়কে পাহারায় রাখিয়া (বোধ হয় poachingএর ভয়ে) গ্রামে গিয়াছে কিছু তরল পদার্থ উদরে দিয়া শ্রম অপনোদন করিবার জন্য; আর ফেরে নাই। এমন সময় এই উৎপাত। এই হল্লায় সদ্য দেহচ্যুৎ আত্মার "পিরেত"রূপে শুভাগমন পূর্ব্বক তাহাদের নধর কাঁচা মস্তক দুইটি চর্ব্বণের ইচ্ছার ফল বলিয়া মনে করা কি তাহার পক্ষে অন্যায়? লোকটি এমন ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে এখনও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না। কিছু পরে আগন্তুক বিকট কণ্ঠে বলিল, "আরে নেহি, ই সব বঙ্গালী বাবু"; যেন বুঝাইতে চাহে, "বঙ্গালী বাবু" ও "পিরেতে" অতি নিকট সম্বন্ধ, অতএব "বুতরু"র এই ভ্রম খুবই স্বাভাবিক। তারপর হুকুম জারি হইল "যো বাচ্চা ঘরে যা"—বাচ্চাও বিনা বাক্যব্যয়ে চোঁচা দৌড় দিল।

বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম; শুধু একটি আশার ক্ষীণ আলোক মনে উঁকি দিতেছিল। প্রথম পলাতক "বুতরু"র যদি মা থাকে, তবে নিশ্চিন্ত থাকিবে না, দ্বিতীয় পুত্রের উদ্ধারে এখনই ছুটিয়া আসিবে। বাপ-ব্যাটা তাড়ি খাইয়া আরামে রত, গ্রাহ্যও করিবে না।

আমার এই মনস্তত্ত্বের গবেষণায় ভুল হইল না; অল্পক্ষণের মধ্যেই নানা অস্ত্রধারী দল গ্রাম হইতে হাজির হইল, সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিতেছে শাবলধারিণী মুর্দ্দফরাসনী—প্রায় জ্ঞানশূন্যা, তাহার হারান ধন যে মজা দেখিবার জন্য নিঃশব্দে দলের সঙ্গ লইয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নাই। হায় মা! তোমার স্নেহের ধারার উচ্চ, নীচ, মানুষ, পশু কোথাও তারতম্য হয় না, সর্ব্বত্রই সমান অবাধ প্রবাহ, আর মনে হয়, এই স্বর্গীয় স্নেহের লীলাই এত অনাচার সত্ত্বেও পৃথিবীর রসাতল গমনের বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

মোটর "বিগড় গিয়া" শুনিয়া ধরিয়া লইল "ভারি আদমি", সাহেব হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। প্রায় সকলেই সেলাম দিল, কিন্তু মুর্দ্দফরাসনী কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মোর বেটওয়া?" যখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তার হারানিধি দেখাইয়া দিলাম, সে তার কি আনন্দ! যেন মেঘের উপর এক ঝলক রৌদ্রকিরণ পড়িল। এক হস্তে তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়া অপর হস্তে আমার পদধারণ করিয়া হাসিকান্না মিশান সুরে নিবেদন করিল, "সাহেবের দয়াতেই আজ পিরেতের হাত হইতে পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে।" অন্যরূপ বিশ্বাস করান অসম্ভব হইল। বুঝিলাম, এখানে ভূতের ভয় বড়ই প্রবল। তারপর দলবল আমাদের মোটরে বসাইয়া গাড়ীশুদ্ধ ঠেলিয়া গ্রামে হাজির করিল, কোনও মানা শুনিল না এবং আমাদের জয়যাত্রা থামিল গিয়া শেঠির
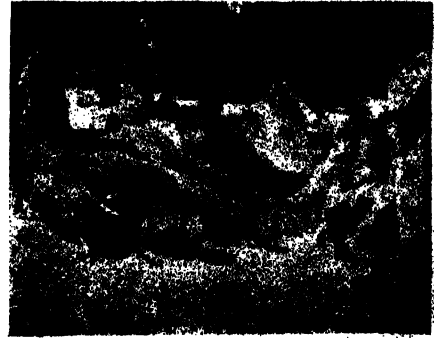
হস্তিপদে অস্ত্রোপচার। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তেলের কলে, যেখানে ইঞ্জিন চলে এবং নিশ্চয়ই মোটরের তেল মিলিবে। হইলও তাই। ইঞ্জিন ষ্টার্ট করার জন্য পেট্রোল ছিল। পাঁচ ছয় বোতল সংগ্রহ হইল। তারপর একছুটে পৌছিলাম ফতোয়ার ডাকবাঙ্গলায়, বাকী রাত্রিটুকু বিশ্রামের পর প্রাতে পাটনা পৌছান গেল। শুনিলাম, মৌলবী সাহেব শোনপুরে হরিহর-ছত্রের মেলা দেখিতে গিয়াছেন, পরদিন প্রাতে আমরাও শোনপুর ধাওয়া করিলাম।

পাটনায় গাড়ী রাখিয়া, দিঘাঘাটে ষ্টীমারে চড়িয়া পরপারে শোনপুর পৌছান গেল। প্রায় গঙ্গার তীরেই মেলা বসে। বি. এণ্ড এন. ডব্লিউ রেলের ষ্টেসন আছে। দেখিলাম truck-এ বোঝাই হইয়া ক্রীত কয়েকটি হস্তী স্থানান্তরে যাইতেছে। হরিহর-ছত্রের মত এত বড় পশু-মেলা ভারতে আর নাই। এমন কি শুনিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যে

এইরূপ মেলার মধ্যে ইহাকেই বৃহত্তম বলিয়া গণ্য করা হয়। এত পশুপক্ষী যে এদেশে আছে জানা ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বে এখানে
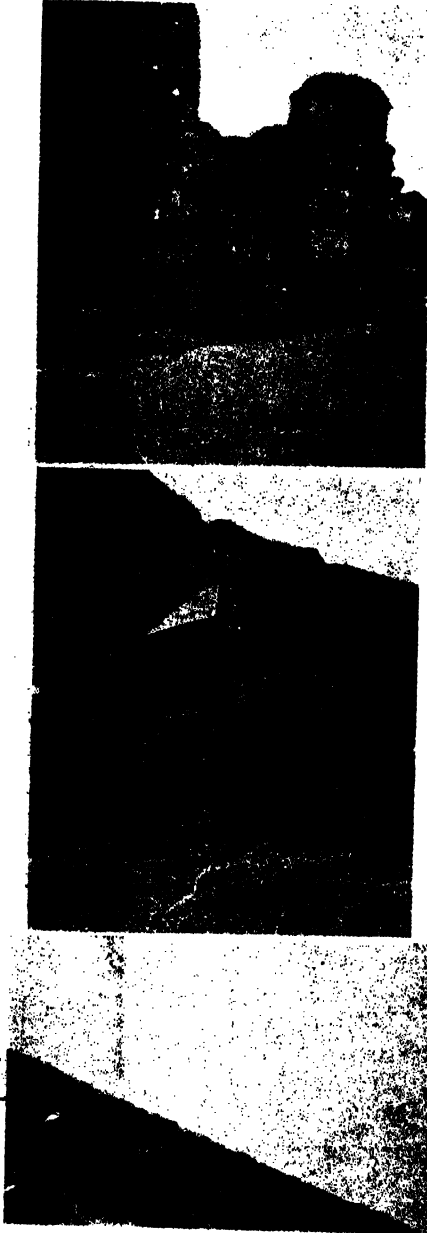
নালন্দা: প্রবেশ-তোরণ। অধ্যক্ষের গৃহ। কিরূপ ঢালুর উপর নালন্দা অবস্থিত, নীচের ছবিতে তাহাই লক্ষ্যের বিষয়।

অশ্বের কেনা-বেচা বিস্তর হইত। এখন আর তত হয় না। এই মোটরের যুগে ঘোড়ার আদর কমিয়া গিয়াছে। প্রচুর হস্তীও আসিয়াছে দেখিলাম। বাজার কিন্তু বড়ই মন্দা। ১৫০০৲—২০০০৲ টাকায় জোয়ান হাতী বিক্রয় হইতেছে, তবুও খরিদ্দারের অভাব। একটি বাচ্চা-হাতীর মজার রকম-সকম (antics) দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। জ্ঞান বাবু দর-দস্তুর আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৫০০৲ হইতে ৩০০৲ পর্য্যন্ত নামিল, হয়ত ২০০৲ টাকাতে চুক্তি হইতে পারিত, কিন্তু খোরাকের বহর শুনিয়া বন্ধু পিছাইয়া গেলেন। একটি প্রকাণ্ড হাতীর পায়ে কাঁটা ফুটিয়া পাকিয়াছে ; যন্ত্রণায় দারুণ চীৎকার করিতেছে। তাহার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা দেখিতে দাড়ান গেল। সামান্য কায়দায় অত বড় জন্তুকে একেবারে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করান হইল। তারপর এক অতিবৃদ্ধ মাহুৎ নরুণের মত একটি ধারাল যন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্র করিয়া পুঁজ ও কাঁটা বাহির করিয়া দিল। হাতী যথেষ্ট চেঁচাইল বটে, কিন্তু যেন বুঝিতে পারিতেছিল, তাহারই যন্ত্রণালাঘবের চেষ্টা করা হইতেছে এবং সেই জন্যই শুধু চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল, অন্য কোনওরূপ বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করিল না।

গৃহপালিত সকল রকম পশুরই সমাবেশ দেখিলাম। অশ্ব, অশ্বতর (mule), গাধা, মহিষ, গরু, বলদ, ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদির পালে পালে কেনা-বেচা হইতেছে। হাতী, উট, নানাবিধ পক্ষী, হরিণ ইত্যাদিও বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে। নাচ, গান, থিয়েটার, বায়স্কোপের খুব মরসুম চলিয়াছে ; দোকান-পশারও যথেষ্ট, মানুষের ভিড় ততোধিক। থানা বসিয়াছে : বড় বড় অফিসারদের তাঁবু পড়িয়াছে, সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে মৌলভী সাহেবকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মেলা দেখিয়া সন্ধ্যায় আমরা পাটনা ফিরিয়া আসিলাম। মৌলভী সাহেব তাহার দুই দিন পরে ফিরিয়া অনুযোগ করিলেন, ছত্রে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে কোনও কষ্ট হইত না। মার খাইবার ভয় থাকা সত্ত্বেও আমিও বলিয়া বসিলাম, "সেই বলদ-সমুদ্রের মধ্য হইতে মহাশয়কে বাহির করা was more difficult than finding a needle from a haystack (খড়ের গাদা হইতে ছুঁচ বাহির করা অপেক্ষাও কঠিন)। বন্ধু হাসিয়া অস্থির, "বড়া জবর জবাব মিলা।"

সদল বলে, মায় মৌলভী সাহেব, অশর্থাওয়া খাওয়া গেল এবং তথায় তাঁহার আতিথ্যের মর্য্যাদারক্ষার পর এবং গাড়ী

অদল-বদল করিয়া বিদায় লইয়া পুনরায় কলিকাতা মুখে রওনা হইলাম।

বিহারে পৌছিয়াই কিন্তু বন্ধুরা ধরিয়া বসিলেন, নালন্দা, রাজগীর ও গয়া দেখিয়া কলিকাতা ফেরা হইবে। তথাস্তু, নালন্দাতেই হাজির করিলাম।

বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেলপথ; বক্তিয়ারপুর (ই. আই. আর-এর একটি ষ্টেসন, পাটনার নিকট) হইতে বিহার-সরিফ হইয়া রাজগীর কুণ্ড ষ্টেসনে শেষ হইয়াছে। নালন্দা এই রেলপথে একটি ষ্টেসন; ষ্টেসন হইতে নালন্দার বিহার আধ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটরে যাইবার পথ আছে। বিহার হইতে নালন্দা প্রায় দশ মাইল এবং তথা হইতে রাজগীর আট মাইল হইবে, ঠিক রাস্তার ধারে ধারে লাইট রেলওয়ে গিয়াছে।

নালন্দার বিহার অশোকের কীর্ত্তি। কালে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, চিহ্ন মাত্র ছিল না, কিন্তু ঐ নালন্দার বিহার হইতেই বিহার-সরিফ এবং পরে বিহার প্রভিন্সের নামকরণ। শোনা যায়, এক রাস্তা সার্ভে করার সময় বৃহৎ ইমারতের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে এবং বিহার গভর্ণমেণ্ট খনন করাইয়া দেখেন যে, সেখানে এক অতি বিশাল পুরা-কীর্ত্তি মাটির নীচে রহিয়াছে; এখন পর্য্যন্ত কিয়দংশমাত্র খনন করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে; অর্থাভাবে কার্য্য অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতেই নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে হয়। কি বিরাট পরিকল্পনা এবং কি সুন্দরভাবে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করা হইয়াছিল! **Excavations**-এর নিকটেই একটি **museum** তৈয়ারী হইয়াছে। অনেক তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের পাঠ-উদ্ধার হইতে জানা যায় যে, ন্যূনপক্ষে দশ সহস্র ছাত্র সর্ব্বদা সেখানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে এই ভারতে ১০,০০০ ছাত্রের বাস-উপযোগী **Residential University**র কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল—যে সময় আধুনিক সভ্যতাভিমানীরা অনেকেই অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পশুবৎ জীবন যাপন করিয়াছে। নালন্দা দেখিলেই বুঝা যায়, এই স্থান অন্ততঃ দুইবার পরিত্যক্ত এবং পরে তাহার উপর আবার ইমারত তৈয়ার হয়। প্রথম স্তরে ভীষণ অগ্নিদাহের চিহ্ন পরিষ্কার বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় স্তরে পরিত্যক্ত হইবার কারণ এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর বালুকা দ্বারা ভরাট করিয়া তাহার উপর নূতন ইমারত নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। লম্বা ভাবে প্রথম হইতে আরম্ভ করিলে প্রবেশ-তোরণ, তৎপর দক্ষিণে পূজার স্থান, পাকশালা, ভাণ্ডার, পরিচারকের গৃহ ইত্যাদি এবং বামে বক্তৃতা-মণ্ডপ, ছাত্রদের বাসগৃহ এবং পরিশেষে এক অতি উচ্চ গম্বুজের উপর আচা-র্য্যের ঘর। এই গৃহের এমনই অবস্থান, যাহাতে সেখান হইতে কোথায় কি হইতেছে, অনায়াসে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। ছাত্রাবাস এক একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ঘর, মাঝে বাঁধান উঠান ও একটি করিয়া কূপ। প্রত্যেক ঘরে একজন করিয়া ছাত্র থাকিত। তাহার মধ্যে পুস্তকাধার,
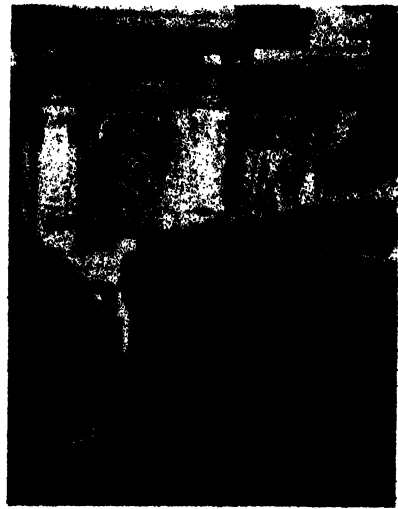
নালন্দা: কারুকার্য্য।

পড়িবার বাঁধান বেদী, শুইবার বেদী সব বন্দোবস্ত বিদ্যমান। প্রতি চতুষ্কে একজন করিয়া তত্ত্বাবধায়কের ঘর আছে। ইতি-বৃত্ত দেখিয়া বেশ অনুমান হয় যে, ঐরূপ সাতটি মহল পাশা-পাশি ছিল। এখনও না কি এক-চতুর্থাংশ উদ্ধার হয় নাই। সকলের পশ্চাতে প্রাচীরের বাহিরে কতকগুলি করিয়া বাঁধান সমাধি রহিয়াছে। যে সকল আচার্য্য এবং অধ্যক্ষ ঐ স্থলে দেহত্যাগ করিতেন, তাঁহাদের সেই স্থানেই সমাহিত করা হইত।

কি ভাবে নালন্দা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনুমানে মনে হয়, কোনও সময়ে অতি ভীষণ ভূমিকম্পের ফলেই বিরাট নালন্দা তাহার সমস্ত বিরাটত্ব

লইয়া ভূতলে সমাধিস্থ হইয়াছিল। এবারের বিহারের ভূমিকম্পে অনেক অট্টালিকা পাতালে প্রবেশ করিয়াছে শোনা যায়; সেখানে যে বাড়ীঘর ছিল তার চিহ্নমাত্র নাই। সেগুলিও উত্তর কালে পুরাকীর্ত্তিরূপে আবিষ্কৃত হইবে কি না কে জানে!

নালন্দা ছাত্রাবাস। ভগ্ন-মস্‌জিদ। রাজগীরের পথে
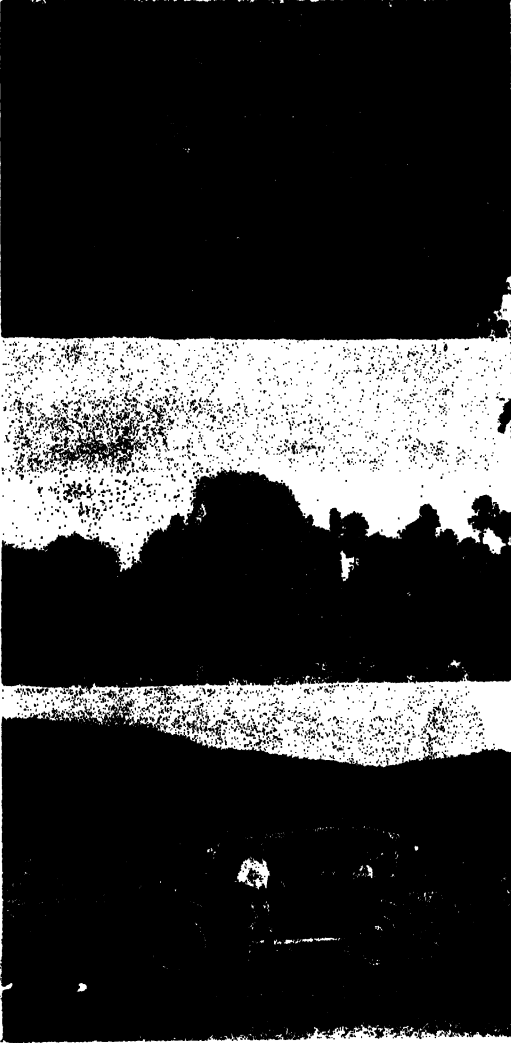
ঐরূপ ভূমিকম্পের আভাস পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ এবং বুদ্ধগয়ার মন্দির হইতেও মিলে। সম্প্রতি খনন করিয়া পাটনার নিকট ঐ প্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার মন্দিরও বহুদূর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। মাত্র চূড়ার দিকটা জাগিয়া ছিল। লাট কুর্জ্জন বহু ব্যয়ে পুনরায় উদ্ধার করান। মন্দিরের প্রবেশ-পথ সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া "পাতালে" প্রবেশের পর পাওয়া যায়। গয়ার "বিষ্ণুপাদ" মন্দির একেবারে আধুনিক। রাণী অহল্যাবাইয়ের কীর্ত্তি। পুরাতন মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। পুরাকীর্ত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ বিষয়ে, ভারত, লাট কুর্জ্জনের নিকট অশেষ রূপে ঋণী। খনন করিয়া অনেক স্থলে নালন্দার বুনিয়াদ পরীক্ষা করা হইয়াছে। ছবির উভয় চতুষ্কে ঐরূপ পরীক্ষার খাদ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। Museum দেখিয়া রাজগীর অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

মহাভারত-প্রসিদ্ধ জরাসন্ধের রাজধানী ও বিখ্যাত কারাগার রাজগীরে ছিল বলিয়া কথিত হয়। বৃত্তাকার পাহাড় মধ্যের সমতল ভূমিকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে, শুধু রাজগীরের সম্মুখে কিছু স্থান খোলা এবং ঐ স্থান হইতেই কেবল ভিতরে প্রবেশ সম্ভব। আর কোনও স্থান হইতে উচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘন ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের উপর সৈন্যাবাসের ধ্বংস এখনও বিদ্যমান। প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে সামান্য এক উচ্চ টিলার (hillock) উপর বিখ্যাত রাজগীর কুণ্ড। পাহাড়ের ভিতর হইতে পাথরের বাঁধান পয়োপ্রণালী দিয়া উষ্ণজল অবিরত পড়িতেছে। কয়েকটি মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারই নীচে কুণ্ড—গরম জলে পূর্ণ, বেশ স্নান করা চলে। এই জলে স্নান করিলে শরীরের নাকি খুব উপকার হয়।

আমরা যে সময় গিয়াছিলাম, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্নানার্থে গিয়াছেন দেখিলাম। শুনিলাম তিনি প্রায়ই গিয়া থাকেন এবং ঐ স্থান বড় পছন্দ করেন। পরপৃষ্ঠার ছবিতে কুণ্ডের অবস্থান এবং স্নানরত ব্যক্তিদের দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের উপর যেখানে সাদা ঘর দেখা যায়, ঐখানে কুণ্ড অবস্থিত। জরাসন্ধ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কারাগারের উপযুক্ত স্থান বাহির করিয়াছিল বটে—"পাণ্ডববর্জ্জিত" স্থান! যে সব রাজাদের ধরিয়া আনিয়া একবার সেই স্বাভাবিক কারাগারে ভরা হইত, তাঁহাদের আর উদ্ধারের কোনই উপায় ছিল না।

রাজগীর হইতে একটা রাস্তা পাটনা নাওদা রাস্তায় আসিয়া মিলিয়াছে, মধ্যে একটি প্রশস্ত নদী পার হইতে হয়। নদী পার হইতে বেশ কিছু দুর্ভোগ বরদাস্ত করিতে হইল। নদীর ধারে আসিয়া দেখা গেল, জলধারা বেশ প্রশস্ত

এবং বালুময় তটভূমি ততোধিক প্রশস্ত। জলের গভীরতা জানা দরকার। দেখা গেল, গো-শকট অনেক যাতায়াত করিয়াছে এবং পরিষ্কার "নিক" পড়িয়াছে—"নিক" ধরিয়া যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া অযাচিত উপদেশ দিল, ওদিকে জল বেশী, দশ হাত ডাহিনে চাপিয়া গেলে জল কম পাওয়া যাইবে। যথা আজ্ঞা দশ হাত ডাহিনে চাপিয়া যাইতে গিয়া দুস্তর পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া গেল; জল বেশ গভীর, অর্দ্ধেক গাড়ী প্রায় জলমগ্ন হইয়াছে, এঞ্জিন অচল। তীর হইতে চীৎকার মারফৎ প্রস্তাব আসিল, দশ রুপেয়া পাইলে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিস্তর লোক জমিল, যেন সকলে ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, গাড়ী আটকাইলে কিছু কামাই করিয়া লইবে। জ্ঞান বাবু দর কসাকসি আরম্ভ করিলেন, আমি কিন্তু উৎসুক নয়নে পার-রত একটি গো-শকটের প্রতি চাহিয়া ছিলাম। নিক ধরিয়া নির্ব্বিবাদে শকট পার হইয়া গেল; কোথাও জল দেড় ফুটের বেশী হইল না। ব্যাপার বুঝিলাম; কে বলে Indians lack in initiative! ইচ্ছা করিয়া আমাদের বেশী জল ও কর্দ্দমে ফেলিয়া কিছু অনায়াস-লভ্য টাকা চাঁদা মারিয়া আদায় করিতে চায়। জ্ঞান বাবুকে চুপ করিতে বলিয়া তাহাদের কথাতেই সম্মত হওয়া গেল। ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া ছিলাম। দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া গাড়ী ঠেলিয়া পরপারে আনিয়া দিল। পারে আসিয়াই start চালু করাইয়া লইলাম, তারপর জ্ঞানবাবুকে বলিলাম, jump in, চট্, ওঠ এবং gear দিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। কিছুদূর পিছনে দৌড়াইয়া দল পিছাইয়া পড়িল। যেমন কুকুর, তেমনি লগুড়াঘাত খাইয়া সব জব্দ হইল। গিরিয়াকে নওয়াদা রোড ধরিয়া গয়ায় আসা গেল এবং বিষ্ণুপাদ ও বুদ্ধগয়া দেখিয়া বরাবর গিয়া হাজারিবাগে রাত্রের মত ডেরা লইলাম।

হাজারিবাগে লোকের কিছুদিন বাঘ পুষিবার সখের বড় বাহুল্য হইয়াছিল। লাল-মোটরের মণি বাবু (আমাদের মেজ দাদা) প্রথমে এই ধারা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি এক জোড়া চিতার বাচ্চা পোষেন। বহু যত্ন সত্ত্বেও একটি মারা যায়, অপরটি বেশ বড় হইয়াছিল। শেষে কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেন। তাহার পরই চাতরা সাবডিভিসনের অন্তর্গত সীমেরিয়ায় এক সঙ্গে পাঁচটি বড় বাঘের বাচ্চা কাঠুরিয়ার দল ধরিয়া লইয়া আসে। দুইটি হস্তগত করেন চাতরার সবডিভিসনাল অফিসার মিষ্টার প্রাইস্, একটি পান শাদা-মোটরের তখনকার ম্যানেজার মিষ্টার মোদী, একটা যায় আমাদের বিজয় দা'র হাতে, আর বাকীটির চিত্র

রাজগীর: কুণ্ড। পথে নদী পার। পথে গাড়ী অচল।

পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। প্রথম দুইটির একটি মারা যায় এবং অপরটি সেই বিখ্যাত ডায়না, যাহার বিবরণ বহুবার প্রকাশিত এবং যাহার বহু চিত্র প্রচারিত হইয়াছে। ডায়না কলিকাতা 'জু' এবং তথা হইতে লণ্ডন 'জু'তে গিয়াছে। মিষ্টার প্রাইস ডায়নাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার

রাসেল যখন ডায়নাকে মানুষের মধ্যে অবাধে রাখা বিপজ্জনক বিধায় তাহাকে 'জু'তে প্রেরণের আদেশ দেন, তখন প্রাইস সাহেব প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উপায় ছিল না; ডায়নাকে বাধ্য হইয়া বিসর্জ্জন দিতে হইল।

কার্য্যব্যপদেশে আমাকে প্রায়ই চাতরা যাইতে হইত। যখনই যাইতাম, ডায়নাকে দেখিয়া আসিতাম। ডায়নার প্রশংসায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক শতমুখ হইয়া উঠিতেন। আমি নিজে দেখিয়াছি, তাহাকে জঙ্গলে লইয়া গিয়া সাহেব ছাড়িয়া দিয়াছেন, ডায়না ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে, দশ পনেরো মিনিট কোনও সাড়া নাই, কিন্তু যেই তিনি ডায়না বলিয়া ডাক দিলেন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার কাছে লুটাইয়া পড়িল।

হাজারীবাগ: খোকা বাবু ও বাঘের বাচ্ছা।

ডায়না ঠিক পোষা কুকুরের মত আচরণ করিত। তাহার দেহে তখন যৌবনের জলতরঙ্গ। সাহেবের নিজমুখে ডায়না সম্বন্ধে এই গল্পটি শুনিয়াছি। প্রাইসের বাঙ্গলো সহরের এক প্রান্তে এবং তাহার পরই গভীর জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। চাতরা শিকারবহুল স্থান; রাত্রে প্রায়ই হরিণ আসিয়া তাঁহার বাঙ্গলোর হাতায় ডাকিত; সময় সময় চিতাবাঘের গর্জ্জনও শুনা যাইত। একদিন রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় সাহেব বাগানে বসিয়া পুস্তকপাঠে রত, মেমসাহেবও পাশে বসিয়া সূচীকর্ম্ম করিতেছিলেন, ডায়না চেয়ারের পায়াতে চেন দিয়া বাঁধা আছে। সাহেবের আয়া সহরে যাইবার জন্য জঙ্গলের পাশ দিয়া short-cut পাকডাণ্ডি ধরিল, হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। ঠিক হাতা ছাড়াইয়াছে, দেখে, ঝোপের ধারে ডায়না বসিয়া আছে। ডায়নাকে কাহারও ভয় ছিল না। আয়া ভাবিল ডায়না ছাড়িয়া গিয়াছে; "ডায়না" "ডায়না" বলিয়া আদর করিতে গেল। ডায়না কিন্তু দাঁত খিঁচাইয়া থাবা তুলিল। আয়া ভুল বুঝিতে পারিল, বুঝিল ডায়না নয়, সম্মুখে যম। চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া বাঙ্গলোর বারান্দায় আছাড় খাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ব্যাঘ্র-গর্জ্জন। মহা সোরগোল, চতুর্দ্দিকে ছুড়াছুড়ি; সাহেব, মেমসাহেব বাঙ্গলোয় পলাইলেন, তাড়াতাড়িতে ডায়না বাহিরেই রহিয়া গেল। সাহেবের দুই পুত্র শিকারে গিয়াছে, বন্দুকাদি যাহা ছিল সব তাহাদের সঙ্গে। বাঙ্গলো বন্ধ করিয়া সাহেব ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বাঘ ডায়নার কাছে প্রেম-অর্ঘ্য ডালি দিতে আসিয়াছে। ডায়না প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হইল, তারপর বোধ হয় তাহার মনে হইল, এই অপদার্থটার জন্যই তাহার প্রভুর বিশ্রামসুখে বাধা পড়িয়াছে। ভীষণ হুঙ্কারে চেয়ারসমেত ডায়না পড়িল আগন্তুক প্রেমাকাঙ্ক্ষীর স্কন্ধে এবং এক চপেটাঘাতে তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার পিঠের মাংসে নখর বসাইয়া একটানে লম্বা ফালা করিয়া দিল। প্রেমিকবর প্রেমের এ দুর্দ্দান্ত দাপট সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, চীৎকারে সহর, বন কাঁপাইয়া পলায়নই বীরত্বের লক্ষণ নীতির চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিলেন। সাহেব বলিলেন, তখনও বাহিরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দেখা গেল, ডায়নার থাবার ঘায়ে পলায়নকালে বুনো বাঘটার আহত স্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। পরদিন সেই রক্তরেখা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বহুদূর গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্তের দাগ লোপ পায়। তারপর ডায়না যে, চেয়ার টানিতে টানিতে বারান্দায় উঠিল এবং তাহার আদুরে purring (ঘড় ঘড় শব্দ) ও দরজা আঁচড়াইয়া মনিবকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, আপদটাকে তাড়াইয়া দিয়াছি, আপনি আসিয়া বিশ্রাম করুন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী আসিয়া পুনরায় বাহিরে বসিলেন, ডায়না কিছুতেই ছাড়িল না। ডায়না যুবতী বাঘিনী; চাতরা সহরের মধ্যেও তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষীর শুভাগমন আরম্ভ হওয়াই তাহাকে 'জু'তে পাঠানর অন্যতম কারণ।

ডায়নাকে যখন প্রথম জু-তে আনা হয়, সে মানুষ দেখিলে ক্ষেপিয়া যাইত। ক্রমে শান্ত হয়। কে জানে মানুষের পরিত্যাগ রূপ শেল তাহার বুকে কুলিশ অপেক্ষা কঠোর বাজিয়াছিল কি না। যাহার স্নেহের আকর্ষণে স্বধর্ম্ম, স্বজাতি-ত্যাগ তাহার পক্ষে কঠিন মনে হয় নাই, সেই কি না শেষে তাহাকে ত্যাগ করিল? বাজিবার কথাই বটে। ডায়না জু-তে থাকাকালীন মিঃ প্রাইস তাহাকে একবার দেখিতে আসেন। সেদিন জু-র অপর দর্শকগণ যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, জীবনে তাহারা ভুলিবে না। লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ ভীষণ ব্যাঘ্রী এক সাহেবের আওয়াজ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া গরাদের উপর পড়িল; এ কি! সাহেব কি পাগল? অনায়াসে খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বাঘিনীকে আদর করিতে লাগিলেন এবং বাঘিনীও সোহাগে গলিয়া ঢলিয়া পড়িল, সাহেবের হাত দেহ চাটিতে লাগিল, কত কাল পরে দেখা! তাহার আনন্দ জানাইতে সে যে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। তারপর যখন সাহেব বাধ্য হইয়া চলিয়া গেলেন, খাঁচার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে তার কি বুক ফাটা কান্না! বলা বাহুল্য, প্রাইসের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। ডায়নাকে শান্ত করিতে চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষকে সেদিন বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহারাই অনুরোধ করেন, ভবিষ্যতে মিঃ প্রাইসের জু-তে না আসাই উভয়ের পক্ষে অল্প কষ্টদায়ক হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডায়না এখন লণ্ডন জু-তে। আশা করি সে ভাল আছে, সুখে আছে। মিষ্টার মোদীর পালিত বাচ্ছাটিও বেশ বড় হইয়াছিল। মাঠের মধ্যে শিকলে বাঁধা থাকিত। বোতলে দুধ বা জল ভরিয়া দিলে সামনের দুই থাবার মধ্যে বোতল ধরিয়া তাহা পান করার যে কৌশল সে শিখিয়াছিল, দেখিতে অত্যন্ত চমৎকার। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে বড় নির্ম্মমভাবে বেচারীর ব্যাঘ্র-লীলার অবসান হয়। এক "সামরিক" গাভী একদিন তাহাকে ঢুঁ মারিয়া পিঠ জখম করিয়া দিল। বনের বাঘ হইলে ঢুঁ মারা দূরের কথা, নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহার সব লীলা সাঙ্গ হইত। কিন্তু সেই নিরামিষ সত্যকার গো-বেচারী, ব্যাঘ্র-নামের অপভ্রংশ গরুর কাছে মার খাইয়া যে ঘা করিল তাহাতেই মারা যায়। যে বাচ্ছাটির ছবি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল, সেটিও মারা গিয়াছে।

পথে মোটর-দুর্ঘটনা। তোপচাচী : বাঁধ। লোকের দৃশ্য, সম্মুখভাগ। অপর দৃশ্য।

হাজারিবাগ হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যকুণ্ড দেখা হইল। বরহি এবং বাগোদরের ঠিক মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের

ধারে সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত। রাস্তা হইতে কুণ্ডের ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পাহাড়ের কোলে মাঠের মধ্যে বিশাল জঙ্গলের ধারে কুণ্ড অবস্থিত। পাথরের ফাটল হইতে অবিরত উষ্ণ জলধারা বাহির হইয়া বাঁধান নালী বহিয়া ছোট নদীতে পরিণত হইয়াছে। জল এত গরম যে, হাত দেওয়া যায় না। জলে অত্যন্ত গন্ধকের গন্ধ। জলের টেম্পারেচার ২১২° এফ। অনেকে বিনা খরচে ভাত রাঁধিয়া খায়। আমরাও বহুবার জ্বালানী সাশ্রয় করিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছি। একখণ্ড বস্ত্রে চাউল, দাল, আলু ইত্যাদি বাঁধিয়া কুণ্ডের জলে ডুবাইয়া দিলে ঠিক উনিশ মিনিটে চমৎকার ভাতে-ভাত প্রস্তুত হয়। আমি এত উষ্ণ কুণ্ড আর কোথাও দেখি নাই বা ভারতে আছে বলিয়া শুনি নাই। এই কুণ্ডের জলে শুনিয়াছি অত্যন্ত healing power, রোগনাশক শক্তি আছে। একবার সূর্য্যকুণ্ডে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে তাঁহার স্ত্রী ও গুটি দুই শিশু লইয়া সেই শ্বাপদ-সমাকুল মাঠের মধ্যে কুঁড়ে বাঁধিয়া থাকিতে দেখি। ভদ্রলোক কলিকাতার একজন এটর্ণী; সে সময় তাঁর নাম-ধাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন ভুলিয়া গিয়াছি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে তিনি জল-চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি, একটি ইজি-চেয়ারে শুইয়া থাকিতেন, নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। কিছুদিন পরে যষ্ঠি ভর করিয়া বেড়াইতে দেখিলাম; তাহার পর গিয়া শুনিলাম, সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অন্য দেশে হইলে সূর্য্যকুণ্ড দেশবিখ্যাত হইত এবং জল-চিকিৎসার জন্য রোগীর বসবাসার্থে কত হোটেল আদি নির্ম্মিত হইত। হাজারিবাগে আরও অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার মধ্যে বল্‌-বল্‌ নদীর ভিতর হইতে যে উষ্ণ জল উঠিতেছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। নদীর ঠাণ্ডা জল বহিয়া যাইতেছে, সেই স্রোতের মধ্যে মাঝে মাঝে ফোয়ারার মত উষ্ণ জল উঠিতেছে এবং তাহার আশে পাশের জলকে গরম করিয়া দিয়াছে। সে অতি আশ্চর্য্য, তবে বড় দুর্গম রাস্তায় যাইতে হয়। সূর্য্যকুণ্ডের নিকট গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে সের শার নির্ম্মিত রাস্তার পুলে একটি অদ্ভুত শীতল প্রস্রবণ আছে। একটি চৌবাচ্চা বাঁধান আছে, মাটি হইতে উত্থিত জলধারা সেই চৌবাচ্চায় জমা হয় এবং পুলের একটি থাম্বার মাঝামাঝি বাঁধান একটি ছিদ্রপথ আছে, তাহা হইতে বৃষ্টিধারার মত অবিরত অতি সুপেয় শীতল জল পড়িতেছে। ইহা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ২৪৮ নম্বর মাইল পোষ্টের নিকট।

তোপচাঁচীর জলের কল (water works) দেখা হইল। কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির কোনও বালাই নাই। পরেশ নাথ পাহাড়ের দুইটি সমান্তরাল শাখাভুজের মধ্যে একটি ক্ষীণা পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত ছিল। এক বিশাল বাঁধ বাঁধিয়া সেই দুই পাহাড়ের মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ লেকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নীচে শোধন সায়র (filter beds) মাধ্যাকর্ষণে জল লেক হইতে সেই সায়রে আসে এবং তথা হইতে মাধ্যাকর্ষণের বলেই ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি কয়লা-খাদের কেন্দ্রে প্রেরিত ও পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জলকল তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে ঐ সব অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি বড়ই প্রবল ছিল, এখন আর নাই। তোপচাঁচীর লেকের দুই অংশের দুইটি চিত্র দেওয়া হইল। স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়।

এইবার সোজা কলিকাতা।

শিক্ষা-পদ্ধতি

বর্ত্তমানে যখন কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের মধ্যে আহার্য্যের, ব্যবহার্য্যের ও বাসস্থানের সর্ব্বব্যাপী একটা অনটন উদ্ভূত হইয়াছেএবং প্রায় সকলেই অল্প বয়স হইতে একটা না একটা অসুস্থতায় ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলি যে দোষযুক্ত, তাহা সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। কি কি উপায়ে জনসাধারণের আহার্য্য, ব্যবহার্য্য ও বাসস্থানের সংস্থান অথবা দেশের জলহাওয়ার স্বাস্থ্যসাধন ব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত না করিয়া—তাহার উপার্জ্জন করিবার কোন শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকৃত হইতে পারে কি?

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৮]

শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী

গত দশ বৎসরের মধ্যে মূক-বধিরদিগের শিক্ষা-প্রণালী আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ণরোগ-বিশারদ ডাক্তারগণ (otologists) ও জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বধির ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেরই কমবেশী ভাবে আংশিক শ্রবণশক্তি আছে। কোন কোন শিশুর আংশিক শ্রবণশক্তি (residual hearing) এত বেশী যে, আমরা তাহা সহজেই ধরিতে পারি, কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এতদিন ইহার সঠিক পরিমাপ করিতে পারিতাম না। এইরূপ শিশুর সংখ্যা বড় কম নয়। আবার এইরূপ অনেক বধির শিশু আছে, যাহাদিগের আংশিক শ্রবণশক্তি এত কম যে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু শ্রবণশক্তি-পরিমাপক যন্ত্রের (audiometers) সাহায্যে আজকাল অতি সামান্য আংশিক শ্রবণশক্তিও সঠিক বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণভাবে বধির অর্থাৎ যাহাদের কোন প্রকার শব্দের অনুভূতি নাই, এইরূপ শিশুর সংখ্যা খুব কম।

বধির শিশুর পক্ষে অতি সামান্য শ্রবণশক্তিরও দাম অত্যন্ত বেশী। যে সব শিশু শতকরা ৫০ ভাগের বেশী শুনিতে পায়, তাহারা উপযুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী (aural training) পাইলে, শ্রবণশক্তি-বিশিষ্ট সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাহাদের ভাষা সাধারণ শিশুর মত সহজ (natural) হয়, কোনরূপ মূক-বধিরত্বের ছাপ থাকে না। তাহাদের কথাও সাধারণ কথার মত সুর ও তালবিশিষ্ট হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, এইরূপ ছেলেমেয়েদের পরে বধির বা মূক বলিয়া মোটেই বুঝিতে পারা যায় না। অপরের কথা শুনিবার সময়, তাহারা বেশীর ভাগ কানের উপরে নির্ভর করে, কাজেই ওষ্ঠপাঠের প্রয়োজন তাহাদের বেশী হয় না। আমি এমন অনেক ছেলেমেয়ে দেখিয়াছি, যাহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনীর ফলে অপরের কথা শুনিয়াই সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে, ওষ্ঠপাঠের উপর মোটেই নির্ভর করে না।

যে সব ছেলেমেয়েরা শতকরা ২০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত শুনিতে পায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী পাইলে, তাহাদেরও বিশেষ উপকার হয়। তাহাদের কথাও কিয়দ্‌পরিমাণে সুর ও তালবিশিষ্ট হয়, তাহাদের ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ (natural) হয়। ওষ্ঠপাঠ করিবার সময় তাহারা কানের উপরেও নির্ভর করে বলিয়া, অপরের কথা বুঝিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যাহারা ২০ ভাগের কম শুনিতে পায়, তাহাদেরও কিছু উপকার হয়। তাহাদের কথাতেও আ-বিশুর স্বাভাবিক গতি আসে।

শ্রবণশক্তি-পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্কারের সহিত শিক্ষকদিগের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। আমেরিকায় ডাক্তার গোল্ডষ্টাইন ও ডাক্তার রাইট, ইংলণ্ডে ডাক্তার ইয়ুইং (Ewing), অষ্ট্রিয়ায় আর্‌বান্‌টিশ প্রভৃতি মনীষিগণ কি করিয়া বধির শিশুর এই আংশিক শ্রবণশক্তি কার্য্যকরী করা যায়, চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বড় বড় শব্দ-পরীক্ষাগারে (sound laboratory) শব্দের নানা প্রকার বিবর্দ্ধক যন্ত্র (amplifier) নির্ম্মিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রথমে ফল মোটেই আশাপ্রদ হয় নাই। সকল বধিরত্বের প্রকৃতি এক রকম নয়। কাহারও বধিরত্ব তাহার মধ্য-কর্ণরোগ-জনিত, অন্তর্কর্ণে স্নায়ু-মণ্ডলী সুস্থ। কাহারও অন্তর্কর্ণের রোগ জনিত। কেহ বা, যত জোরেই কথা বলা যাউক না কেন, কোন বিশেষ গ্রামে (pitch) কথা না বলিলে, কিছুই শুনিতে পায় না। কাজেই একই রকম বিবর্দ্ধক যন্ত্রের (amplifier) সাহায্যে সকল বধির শিশুর উপকার হইতে পারে না। গত বিশ বৎসর ব্যাপী অনুসন্ধানের পর আজ বিবর্দ্ধক যন্ত্র (amplifier) বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছেন। প্রত্যেকটি বিবর্দ্ধক যন্ত্রকে (amplifier) শিশুর প্রয়োজনানুসারে যে কোন গ্রাম (pitch) ও সুরে (intensity) বাঁধিয়া দেওয়া যায়। অবশ্য এখনও এই বিষয়ে অনেক তথ্য জানিবার আছে এবং অবিরাম অনুসন্ধান চলিতেছে।

আজকাল আমেরিকায়, য়ুরোপে সমস্ত বিদ্যালয়ে মূক-বধির শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী দিবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষয়িত্রীর টেবিলে মাইক্রোফোন (microphone) থাকে এবং উহা হইতে প্রয়োজনমত নল (tube) বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক শিশুর কানে নলের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার প্রয়োজনানুযায়ী গ্রাম (pitch) ও সুরে (intensity) বাঁধা 'ইয়ারফোন'(ear-phone) থাকে। শিক্ষয়িত্রী ঠিক সাধারণ স্কুলের ন্যায় শিক্ষা দেন।

সম্প্রতি শিকাগো নগরে অল্প শ্রবণ শক্তি-বিশিষ্ট (hard-of-hearing) লোকদিগের জন্য একটি থিয়েটার খোলা হইয়াছে। এই থিয়েটারটি নিউ ইয়র্ক সহরের সোনোটোন কর্পোরেসন (Sonotone Corporation নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনশত লোকের বসিবার স্থান আছে। ষ্টেজের উপরে একটি মাইক্রোফোন. এবং প্রত্যেকটি চেয়ারে air conduction ও bone conduction ear-piece আছে। যাঁহার যেরূপ যন্ত্র দরকার তাহা নিজের প্রয়োজন মত intensity ও pitch-এ বাঁধিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। প্রত্যহই তালিকানুযায়ী বক্তৃতা, অভিনয় বা সবাক্ চলচ্চিত্রের অভিনয় হয়। প্রত্যেক শনিবার স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রদ সবাক চলচ্চিত্রের অভিনয় হয়। থিয়েটারটি

মাত্র গত মার্চ্চমাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা লোকে এত সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শীঘ্রই আমেরিকার সর্ব্বত্র এইরূপ বহু থিয়েটার স্থাপিত হইবে, আশা করা যায়।

সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে কেবল সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও কি করিয়া আরও উন্নত ও অধিকতর কার্য্যকরী প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এই বিষয়ে গভীর প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। ইহার জন্য আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে অনেকে দায়ী করেন, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের প্রকৃতিগত দোষও যথেষ্ট আছে। আমরা গতানুগতিকভাবে গড্ডালিকা স্রোতের সহিত চলিতে ভালবাসি, নূতন কিছু করিবার ও ভাবিবার স্পৃহা ও সাহস আমাদের নাই। যদি কিছু করি সমস্তই পাশ্চাত্যের অনুকরণে, কিংবা নিয়তির দোহাই দিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে চাই।

আমেরিকা ও য়ুরোপের কর্ণরোগবিশারদ বহু ডাক্তার মূক-বধিরদিগকে লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে এই গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তারগণ কোথায়? তাঁহাদের কেহই কি মাসিক চার পাঁচ হাজার টাকার ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকার জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নহেন? এইরূপ গবেষণা করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও জুটে না। আমাদের দেশে ধনী অনেক আছেন, কার্ণেগী বা রক্‌ফেলারের ন্যায় দাতা না হইলেও বদান্যতার অভাবও একেবারে নাই। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাই, সে বদান্যতা অপাত্রে কিংবা অ-বিষয়ে ন্যস্ত। ইহার কারণ কি? গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী দিবার উপযুক্ত একটি শ্রেণী খুলিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুই হইতেছে না, কবে হইবে তাহাও জানি না। এইরূপ একটি শ্রেণীর ব্যবস্থা করিতে প্রায় চার হাজার টাকার দরকার। কলিকাতায় কি এমন কোন ধনী নাই, যাঁহাদের মধ্যে কেহ এই টাকা দিতে পারেন?

(ক্রমশঃ)

কাব্যহীন

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সবি আছে, শুধু নাই একটি হৃদয় আজ
যে থাকিলে সবই ভাল লাগে,
সহস্র নয়নমাঝে যার আঁখি দুটি
একান্তই মোর লাগি জাগে;
সে দৃষ্টি-জোৎস্না বিনা ভুবন আঁধার মোর,
জীবনে জাগে না আর আলো,
দুঃখ আর দহনের মায়া-মরুভূমি-বুকে
ছায়া আনে সে আঁখির কালো।
গান আছে, নাই আর সে সুর-লহরী তার,
ছন্দোহীন আজ সে গীতালি,
ভাষা আছে, ভাব নাই, দেহের কঙ্কাল শুধু;
প্রাণহীন জড়ত্বের ডালি।

ফুল আছে ফুটে, তার গন্ধ হারায়ে গেছে
বাঁশী আছে, স্বর নাই আজ,
উৎসবের স্বপ্ন আছে উৎস শুখায়ে গেছে
মমতাজ-হীন যেন "তাজ"।
কণ্ঠ আছে, ভাষা নাই বুক আছে, আশা নাই
আছে বীণ, নাহিক ঝঙ্কার,
হৃদয়ের অতি কাছে ছিন্ন ডোর পড়ে আছে
মালা নাই, মালা নাই আর।
বেশ আছে, সজ্জা নাই, দীপ আছে, দীপ্তি নাই,
ধূপ আছে নাহিক সুরভি,
অনুভূতি আছে শুধু, ভাবের প্রতিমা নাই,
কাব্য নাই, শুধু আছে কবি।

বধূ

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হিমাংশুর বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। কলিকাতায় সে প্রথম আসে ম্যাট্রিক পাস করিয়া কুড়ি টাকা জলপানি লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে। পরের এগজামিনগুলাও জলপানি লইয়া পাস করে; অবশেষে ল' পাস করিয়া গায়ে গাউন চড়াইয়া সহরে বসিয়াছে ব্যবসা করিতে।

পাঁচ বৎসরে পশার বেশ জমিয়াছে। সহরে যত বড় বড় চুরি, জাল-জালিয়াতী, ফন্দীবাজী ও খুনখারাবি হয়, সেগুলায় শেষ যবনিকা পড়ে হিমাংশুর হাতে। অর্থাৎ বড় বড় ফৌজদারী মকর্দ্দমায় হিমাংশু এখন সহরের যত আসামীর বল-বুদ্ধি-ভরসা। মা-লক্ষ্মী আদালতের দ্বারে বসিয়া হিমাংশুর দুই পকেটে তাঁর ভাণ্ডার একেবারে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিতেছেন।

সহরে হিমাংশুর নাম-ডাকের অন্ত নাই। সহরের বুকে যত কিছু আরাম শান্তি খ্যাতি মান সঞ্চিত আছে, হিমাংশুকে তাহার সবটুকু দিতে সহর বাকী রাখে নাই। বাড়ী, গাড়ী, পয়সা-কড়ি, বিজলী বাতি-পাখা; অবশেষে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে শ্রীমতী কণিকা দেবীকে পর্য্যন্ত তাহার পাশে জীবন-সঙ্গিনী রূপে ধরিয়া দিয়াছে।

কণিকার যেমন রূপ তেমনি গুণ। ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়াছে। বাপের আছে ইংরেজ-পাড়ায় সাত-আট-খানা বাড়ী; তা ছাড়া কণ্ট্রাক্‌টরী কারবারে পয়সা আসিতেছে অজস্র। এক কথায় ক'বৎসর ভাগ্যলক্ষ্মী দুনিয়ার সকলকে ছাড়িয়া হিমাংশুর উপরেই তাঁর মনোযোগটুকু ষোল-আনা সমর্পণ করিয়াছেন।

গ্রামের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, ভাই-বোন, খুড়া-খুড়ী, পিসিমা। তাঁহাদের বুক হইতে হিমাংশুকে সমূলে উপড়াইয়া আনিয়া কলিকাতা সহর তাহাকে আজ নিজের বুকে রাখিয়া যেন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বনের কোণে যে চারা মাথা তুলিয়াছিল, সে চারা সজ্জিত ড্রয়িং-রুমের দামী টবে বসিয়া নূতন আব-হাওয়ায় রূপে ও সমৃদ্ধিতে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহে মা, খুড়া-খুড়ী, ভাই-বোনেরা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দেশের বাড়ীতে বিবাহ করিবে, হিমাংশুর অবসর ছিল না। মামলা-মকর্দ্দমায় দু'হাত নিত্য ভরিয়া আছে। বিপন্ন মক্কেলদের নিরুপায় দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলিয়া দুদিনের জন্য হিমাংশুর বাহিরে যাইবার উপায় নাই! কাজেই...

ওদিকে দেশের বাড়ীতে খুঁটিনাটি লক্ষ কাজ। সেকেলে পরিবার—সহরে আসিয়া দুদিন বিশ্রাম করিবে, অবসর নাই। বিবাহের উৎসব চুকাইয়া মা-বোনের দল দেশে ফিরিয়া গেলেন। কণিকাকে লইয়া হিমাংশুর নূতন সংসার নূতন সাজে সাজিয়া উঠিল।

কোর্টের ছুটিছাটা হয়। সে ছুটিতে স্বামী-স্ত্রী কখনো যায় দার্জ্জিলিং-দেরাদুন, কখনো বা দিল্লী-আগ্রা। সে ছুটিতে দেশে যাওয়া ঘটে না। ওদিকটায় যে কেহ আছে, কাজের ভিড়ে উপলব্ধি হয় না। মার নামে মাসে মাসে হিমাংশু দুশো আড়াইশো টাকা পাঠায়; টাকা পাঠাইয়া ভাবে, ওদিককার কাজ চুকিল। মনের দিক দিয়া ওদিকে কেহ তার কাছে আরো কিছু প্রত্যাশা করে, কয় বৎসরের দুশ্চর অর্থ-সাধনায় সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। এ সাধনার মধ্যে বুঝিয়াছে, জীবনের দিন পরিমিত; সে পরিমিত সময়টুকুর মধ্যে কর কাজ! কাজে পয়সা আসিবে। পয়সা আসিলে কোনদিকে কোন অভাব থাকিবে না; কোন অনুযোগ উঠিবে না; মনের কোথাও এতটুকু চাড় লাগিবে না।

এবং এইভাবেই তার দিন কাটিতেছে।

দেশ হইতে চিঠিপত্র আসে। কখনো তার জবাব দেয়; কখনো বা কাজের ভিড়ে জবাব দেওয়া হয় না। সেজন্য মন কোন দিন টন্‌টনিয়া উঠে না।

এখানে সন্ধ্যায় কণিকা মাঝে মাঝে ছোটখাট পার্টির ব্যবস্থা করে। সে পার্টিতে গান হয়; গল্প হয়। হিমাংশু সব পার্টিগুলায় পুরাপুরি হাজিরা দিতে পারে না; মক্কেল আসিয়া

বসিয়া আছে—এক গাদা কাগজপত্র দেখিয়া জেরার পয়েন্ট নোট করিতে হইবে।

যদি কখনো অবসর মেলে, কণিকা তাহাকে ধরিয়া গঙ্গার ধারে, নয় তো লেকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তাও কি দুদণ্ড বসিয়া প্রেমের স্বপ্ন রচনা করা চলে! হয়তো গাড়ী হইতে নামিয়া দুজনে একটা বেঞ্চে বসিয়াছে, কণিকা গা ঘেঁষিয়া হিমাংশুর একখানা হাত হাতের মধ্যে চাপিয়া কোনমতে রুদ্ধশ্বাসে বলিল,—আজকের এ হাওয়াটা কি চমৎকার লাগছে। না?

হিমাংশু সবিস্ময়ে জবাব দিল,—কেন মাঠে তো চিরদিন এমনি হাওয়া। চারিদিক খোলা কি না।

কণিকা মুখে কোন কথা বলিল না; শুধু একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলিল।

একদিন কি কারণে সকাল সকাল আদালতের ছুটি হইয়া গেল। হিমাংশু গৃহে ফিরিল বেলা দুটায়। কণিকা কহিল,—এমন অসময়ে ফিরেছ! এখন তো মক্কেলের কাজ নেই—চল, একটু বেড়াতে যাই। শিবপুরে কিম্বা বারাকপুর পার্কে। রঘুবীরকে বলে পাঠাই যেন গেরাজে গাড়ী না তোলে।

হিমাংশু কহিল,—কিন্তু

কণিকা কহিল—কিন্তু নয়। যেতেই হবে। আমি ছাড়ছি না।

হিমাংশু কহিল,—শোন, আমি ভাবছিলুম, কাল একটা মস্ত conspiracy কেসের আর্গুমেন্ট আছে, প্রায় পঁচিশজন সাক্ষীর এজাহার পড়ে আমায় তৈরী হতে হবে···

বাধা দিয়া কণিকা কহিল,—কোর্ট যদি এখন বন্ধ না হত, কি করতে?

হিমাংশু কহিল,—যখন বন্ধ হ'ল···

উদ্গত নিশ্বাস কোনমতে চাপিয়া কণিকা কহিল,—সারা জীবনটাকেই মক্কেলের হাতে সঁপে দেবে? আমার জন্যে···

অভিমানে কণিকার চোখের কোণে জল ঠেলিয়া আসিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। হিমাংশু দেখিল, দেখিয়া মৃদু হাসিল।

একটা ঢোঁক গিলিয়া কণিকা কহিল,—আমায় কি দিলে বল তো? আমি···

হিমাংশু হাসিল; হাসিয়া কহিল,—বেশ গো, চল বেড়াতে।

দুজনে গাড়ী করিয়া আসিল বারাকপুর পার্কে। ওদিকে গঙ্গার বুকে রূপালি ঢেউ···এদিকে সবুজ তৃণশষ্পে মণ্ডিত মাঠ···মাঝখানে পথরেখা।

হিমাংশুর হাত ধরিয়া টানিয়া কণিকা আসিল খোলা মাঠে। এদিকটায় এখন তেমন ভিড় নাই। একটা বড় গাছের নীচে ছায়া। সেই ছায়ায় দুজনে বসিল। কণিকা হিমাংশুর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল; তার মুখের পানে চাহিয়া কণিকা কহিল,—একটু আদর কর···সত্যি···

হিমাংশু কহিল,—এই মাঠে?

কণিকা কহিল,—এখানে কেউ নেই। বেশ, আদর না কর, গল্প কর।

হিমাংশু কহিল,—কি গল্প বলব? বল।

কণিকা কহিল,—যা খুশি।

হিমাংশু কহিল,—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনবে? ছেলেবেলায় শুনেছি ঠাকমার কাছে। জানি না, তার সবটুকু মনে আছে কি না! সে গল্প শুনবে?

কণিকা কহিল,—তাই শুনব। তুমি যা বলবে, শুনব—তাই আমার ভাল লাগবে। খুব ভাল লাগবে।

কণিকার মন যেন স্নেহাতুর কুকুরের মত অধীর লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। অধীর নয়নে সে চাহিয়া রহিল হিমাংশুর মুখের পানে।

হিমাংশু চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার দৃষ্টি কণিকার মুখের দিকে নয়, অন্য দিকে।

কণিকা দেখিল, দেখিয়া কহিল,—তোমার ইচ্ছে করে না আমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কও—আমাকে একটু আদর কর?

হিমাংশু সস্নেহ দৃষ্টিতে কণিকার পানে চাহিল। চাহিয়াই রহিল—কোন কথা কহিল না।

কণিকা কহিল,—দুনিয়ায় শুধু মক্কেলকেই চিনেছ! স্ত্রী একটা অনাবশ্যক বোঝা?

হিমাংশু হাসিল; হাসিয়া বলিল,—কার জন্যে মক্কেলকে আশ্রয় করেছি? তার পরিচর্য্যা করি, সে কি নিজের জন্যে?

কণিকা কহিল,—তবে কি আমার জন্যে? আমি তোমায় বলেছি···

হিমাংশু কহিল,—তা কেন বলবে! তোমায় বিয়ে করে তোমার সুখ-দুঃখের ভার নিয়েছি, তাই সে ভার পালন করতে মক্কেলদের সেবা করি। পয়সা চাই। পয়সার আড়ালে দুনিয়ার সব দুঃখ সব অভাব চাপা পড়বে।

কণিকা কহিল,—আমি তো পয়সার জন্যে বিয়ে করিনি। মেয়েমানুষ তা করে না। তা যদি করত তো ট্যাঁকশালকে কিম্বা ব্যাঙ্ককে বিয়ে করত! তোমার কাছে আমি চেয়েছি পয়সা?

হিমাংশু কহিল,—তুমি চাইবে, তবে আমি দেব!

হিমাংশু চুপ করিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—পয়সার দুঃখ কি, তুমি জান না। আমি জানি। একদিন…

হিমাংশুর কণ্ঠ স্মৃতির বেদনায় আর্দ্র হইল। কণিকা কহিল,—থাক, সে কথা আমি শুনতে চাই না। যদি কোন ভাল কথা জান, তাই বল। তোমার মুখে আজ শুধু ভাল কথা শুনতে ইচ্ছা করছে।

—ভাল কথা? বেশ, ভাবি…

হিমাংশু ভাবিতে লাগিল। কণিকা তার কোল হইতে মাথা তুলিয়া চারিদিকে চোখের দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিতে লাগিল। আকাশের নীচে এতখানি খোলা মাঠ। ঐ সবুজ গাছপালা…ঐ গঙ্গা…গঙ্গার ওপারে তরুশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে একরাশ চিমনী…চিমনীগুলা হইতে কালো ধোঁয়া উঠিতেছে কুণ্ডলী পাকাইয়া…নদীর বুকে নৌকা ষ্টীমার…তীরে জেটি। যেন সমস্ত পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। যাহা কিছু লইয়া দুনিয়ার কারবার, সব এখানে আছে। নাই শুধু…

দূরে ঝোপের গায়ে বেগুনি রঙের একরাশ ছোট ছোট ফুল। কণিকা নিজেকে সম্বৃত রাখিতে পারিল না, ছুটিল ঝোপের দিকে।

হাতে কাঁটা বিধিল। তবু সে একরাশ ফুল ছিঁড়িল। ফুল হাতে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল যেখানে হিমাংশু বসিয়া আছে সেইখানে।

হিমাংশু তখনো নিবিষ্ট মনে কি ভাবিতেছে। ফুলগুলা হিমাংশুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কণিকা কহিল,—কি ভাবছ? ভাববার মত কোন কথা পেলে?

হিমাংশু কণিকার পানে চাহিল। কণিকা হাঁটু গাড়িয়া তার সামনে বসিয়া পড়িল, কহিল,—সত্যি, কি ভাবছিলে?

হিমাংশু কহিল,—সত্যি বলব? রাগ করবে না?

—না।

হিমাংশু কহিল,—কালকের conspiracy কেসে ও পক্ষে দাঁড়াবে পাবলিক প্রসিকিউটার। আমাকে কেরামতি দেখাতে হবে। তাই…

কণিকার মুখ বিবর্ণ হইল। সে কাঠ হইয়া রহিল। পাথরের কাছে জল চাহিয়া কার কবে আশা মিটিয়াছে? ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কণিকা কহিল,—সত্যি, ধরে বেঁধে আমোদ হয় না। তোমার মন পড়ে রয়েছে মক্কেলের কাজে!…চল, বাড়ী চল। আমার অন্যায় হয়েছে তোমাকে এখানে এনে।

তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল!…এ বয়সে যাচিয়া সোহাগ চাহিয়া কোন্ স্ত্রী…

হিমাংশু কহিল—রাগ করলে?

গাঢ়স্বরে কণিকা কহিল,—না।

কণিকার জীবনটা যেন শূন্য হইয়া গেছে। স্বামীকে সে কতটুকু পায়! কবিতা পড়ে, গল্প পড়ে; সে-সবে দেখে…

তপশ্চারিণী উমার কথা মনে পড়িল।…ভোলা-মহেশ্বর—তবু উমা তাঁকে পাইয়াছিলেন।

সখী-সহচরীরা আসে। গান গায়, বাজনা হয়। যেন গ্রামোফোন চলিতেছে। সে গান-বাজনার মধ্যে মানুষের প্রাণের দেখা পাওয়া যায় না।

বান্ধবীরা ধরিয়া লইয়া যায় সিনেমায়…'না' বলিবে, এমন শিক্ষা কণিকা কোন দিন পায় নাই। তার উপর মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে, সখীরা ভাবিবে, মনের মধ্যে মস্ত একটা ট্রাজেডির অভিনয় চলিয়াছে..

না, না! প্রাণ থাকিতে এ দুর্ভাগ্যের কথা আর কাহাকেও জানিতে দেওয়া নয়। যাতনার ভারে পিষিয়া মরিয়া যায়, সেও সহ্য হইবে। তবু…না!

হিমাংশুর অবসর দিনে দিনে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। কাজ বাড়িতেছে। বাড়ীর দ্বারে দু'বেলা গাড়ীর ভিড় জমে। বাহিরের ঘরেও সারাক্ষণ ভিড়।

কণিকার বাপ আসিয়া একদিন বলিলেন,—একটু বেড়ানো-চেড়ানো দরকার। না হলে এত মেহনৎ সইবে কেন?

হাসিয়া হিমাংশু কহিল,—এবার পূজার ছুটী হলে ভাবছি কাশ্মীরে যাব।

কণিকার বাবা বলিলেন—যাওয়া চাই।··বেশী খাটালে কলকব্জা বেজুৎ হয়ে যায়—এ তো মানুষের দেহ।···

ভাদ্রমাসের শেষাশেষি। কণিকা বসিয়া পর্দ্দার ঝালর তৈরী করিতেছিল—হিমাংশু একখানা বই হাতে কাছারি হইতে ফিরিল। কণিকার হাতে বইখানা দিয়া বলিল—এই নাও কাশ্মীর-গাইড-বুক। এবারে তোমার দুঃখ আর রাখব না। মহালয়ার পরের দিনেই বেরিয়ে পড়ব তোমায় নিয়ে কাশ্মীর···

কণিকা কহিল,—মক্কেলরা ছাড়বে?

হিমাংশু কহিল,—সকলকে নোটিস দিয়েছি···মহালয়ার আগের দিন পর্য্যন্ত যা কিছু কাজ করাতে চাও, করব। মহালয়ার দিন থেকে মহাত্মার বিশ্রাম। একটি মাস—সত্যি কণি, কাছারিতে কোন মকর্দ্দমার তারিখ ফেলতে দিচ্ছি না। মহালয়া থেকে এক মাস বিশ্রাম···তুমি উদ্যোগ-পর্ব্বে নাম।

কণিকা কহিল—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

হিমাংশু কহিল—বেশ তো, কটাই বা দিন! আঁচাতে দেখলে বিশ্বাস হবে?

কণিকা কহিল—হ্যাঁ। তার আগে নয়। মহালয়ার আগে আমি কিছু করব না। যা কিছু আয়োজন করতে হয়, করব মহালয়ার দিন।

তবু ভিতরে ভিতরে কণিকা আয়োজন করিতে লাগিল।

হিমাংশুর বাহিরে ঘরে মক্কেলের ভিড়, আইন-নজীরের তুর্কী-নাচনে চলে। হিমাংশুকে দেখিয়া কণিকা মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠে,—ঐ ভিড়ে কাশ্মীরের কথা মনে থাকিবে ত? তবু মুখ ফুটিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথা তোলে না।

এমনি ভাবে ভাদ্র মাসকে সরাইয়া একদিন আশ্বিন আসিয়া দেখা দিল। এবং মহালয়ারও অবশেষে বাকী রহিল তিনটি দিন।

দুপুর বেলায় বাহিরের ঘরে কণিকা গিয়াছিল বাপের বাড়ীতে টেলিফোন করিতে। কি একটা জিনিষের প্রয়োজন। টেবলের উপরে পড়িয়া আছে একখানা চিঠি...খামের চিঠি। হিমাংশুর নামে আসিয়াছে। শিরোনামায় লেখা—

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ হিমাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিক বাবাজীবনেষু

কৌতূহল হইল। খাম খুলিয়া কণিকা চিঠি বাহির করিল। হিমাংশুর মা চিঠি লিখিয়াছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠি।

প্রাণাধিকেষু

কতকাল তোমাদের দেখি নাই বলিতে পারি না। জানি, কাজের ভিড়ে এখানে আসিবার অবসর পাও না। এখানে সকলে ভাল আছে। আমার বাত—নড়িতে পারি না। নহিলে ভাবিয়াছিলাম, এবার পূজার সময় কলিকাতায় গিয়া তোমাদের দেখিয়া আসিব।

যথার্থ বাবা, আমাদের একেবারে ভুলিয়া গেলি? একটি দিনের জন্য দেখা দিতে আয়। আর ক'দিন বা বাঁচিব! শ্রীমতী বধূমাতাকে সেই বিবাহের সময় দেখিয়াছি। তাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিতেছে।

দেশে নানা অসুখ-বিসুখ, নানা অসুবিধা জানি। তবু এক বেলার জন্য যদি আসিস।

এ সম্বন্ধে যা ভালো হয়, করিস। চিঠি লিখিস বাবা। হোক বাত—একবার গিয়া তোদের দেখিয়া আসিতে চাই। আর সহ্য হইতেছে না।

আমার আশীর্ব্বাদ দু'জনে জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

মা

চিঠিখানি সে দু'বার তিনবার পড়িল। শাশুড়ীর কথা, শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়-কুটুম্বের কথা মনে পড়িল। সেই বিবাহের সময় দেখা···তারপর আর দেখা নাই।

হিমাংশু তো কখনো বাড়ী যায় না! অন্ততঃ যে কয় বৎসর সে এ গৃহে গৃহিণী হইয়া বসিয়াছে, তত দিনের মধ্যে যাইতে দেখে নাই।

কথায় কথায় শাশুড়ীর কথা কত দিন উঠিয়াছে। হিমাংশু বলিয়াছে, মা এখানে আসিতে চান না। বলেন, যে-ঘরে বাবা মারা গেছেন, সে ঘর ছাড়িয়া তাঁহার কাশী-হরিদ্বার যাইবার সাধ নাই, তা কলিকাতা! ছোট ভাইবোনেরা? তাদের ছাড়িয়া মা থাকিতে পারিবেন না। তারা এখন সেখানে

পড়াশুনা করিতেছে। মেজ ভাই শুভ্রাংশু এবারে ম্যাট্রিক দিবে। পাস করিলে এখানে আসিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেখানকার কথা চকিতে উঠিয়া আর পাঁচটা কথায় চাপা পড়িয়া যায়।

নিজের মাকে কণিকা হারাইয়াছে—তখন তার বয়স সাত বৎসর। মায়ের অভাব সহিয়া মানুষ হইয়াছে। বুঝি, সেই জন্যই শাশুড়ীর অভাব ততখানি তার চোখে পড়ে না। তার উপর সে ছিল নিজের লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত…

আজ এ চিঠি পড়িয়া বার বার মনে হইতেছিল—শাশুড়ী! শাশুড়ী! না জানি, তিনি থাকিলে এ সংসারের মূর্তি কি রকম হইত! কি স্নেহ মিলিত! হয়তো এমন করিয়া এই বয়সে গৃহিণী সাজিয়া পাকিয়া উঠিতে হইত না! হয়তো…

হয়তো অনেক কিছু ঘটিত,—হয়তো অনেক কিছু ঘটিত না…

কিন্তু হিমাংশু! সত্য,—সে স্ত্রী। দুদিন মাত্র পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাকে ঠেলিয়া কাজ লইয়া থাকিতে ভালবাসে। সে আসিয়া কাজের মধ্যেই দেখা দিয়াছে! কিন্তু শাশুড়ী—হিমাংশুর মা…কাজের ভিড়ে মাকে হিমাংশু ভুলিয়া থাকে কি বলিয়া!

মন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। হয়তো মা সেখানে ভাবিতেছেন, বধূর প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। সে প্রতিপত্তি ঠেলিয়া হিমাংশু মায়ের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। এমন তো কত গল্পে পড়িতেছে…

মহালয়ার দু'দিন আগে দুপুর বেলায় মুহুরি শিবনাথ এক গাদা গরম কাপড়চোপড় আনিয়া উপস্থিত হইল। মুহুরি জানাইল, বাবু বলিয়া দিয়াছেন শ'তিনেক টাকা বাহির করিয়া দিতে; বার্থ রিজার্ভ করিয়া বাবু গৃহে ফিরিবেন। কণিকা চাকরের মারফৎ বলিয়া পাঠাইল, বার্থ রিজার্ভ করিবার প্রয়োজন নাই। কাশ্মীরে যাওয়া হয়তো ঘটিবে না। বাবু ফিরিলে সে সম্বন্ধে বাবুর সহিত কথা হইবে। অতএব ইত্যাদি

সন্ধ্যার পর হিমাংশু ফিরিলে কণিকা কহিল,—কাশ্মীর যাওয়া থাক। আমার ইচ্ছা করছে শালতুলীতে যেতে। চাই চল…সত্যি, বেশ হবে।

শালতুলী হিমাংশুর দেশ।

কণিকার কথা শুনিয়া হিমাংশুর দুই চোখ কপালে উঠিল। হিমাংশু কহিল—শালতুলী!

—হ্যাঁ। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

হিমাংশু কহিল,—জান, ট্রেণ থেকে নেমে পাঁচ ঘণ্টা যেতে হবে নৌকোয়—খালের মধ্য দিয়ে? তারপরে নৌকো ছেড়ে গরুর গাড়ী করে চার ক্রোশ মেঠো পথ!

কণিকা কহিল,—ও পথে মানুষ যায় না?

হিমাংশু কহিল,—যাবে না কেন! আমিই তো গেছি এককালে। তুমি পারবে না। চিরকাল সহরে আছ। সে ভয়ঙ্কর কষ্ট…

—তা হোক। আমি শালতুলী যাব। কাশ্মীর যেতে হয়, তুমি যাও, বেড়িয়ে এস। আমার শালতুলী যাবার ব্যবস্থা করে দাও। যেতে আমার খুব সাধ হচ্ছে। শাশুড়ী রয়েছেন। ক'জনের ভাগ্যে শাশুড়ী মেলে? মা কবে মারা গেছেন! কি বল, যাবে তুমি আমার সঙ্গে শালতুলীতে?

হিমাংশু ক্ষণকাল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কণিকার পানে; তারপর কহিল—সত্যি যাবে?

—সত্যি।

হিমাংশু কহিল,—তাহলে চল, আমিও যাব। কি করি, মা যে এখানে কিছুতে আসবেন না। বিয়ের সময় যে কষ্টে আনা হয়েছিল!…মা খুব খুশী হবেন। তুমি নিজে থেকে যেতে চাইছ, এতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু গিয়ে আরাম পাবে না। কষ্টের একশেষ। সন্ধ্যার পর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—ঝিঁঝিঁ ডাকছে—তার উপর পাড়াগাঁয়ের লোকজন লেখাপড়া জানে না—আদব-কায়দা জানে না।

কণিকা কহিল,—আমি তো সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী হয়ে সেখানে মিটিং preside করতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি সেখানকার বৌ।

হিমাংশু কহিল,—সেখানকার বৌ হয়ে যেতে হলে পায়ে জুতো-মোজা আঁটা চলবে না—মাথায় ঘোমটা দিতে হবে।

কণিকা কহিল—তা কি পারি না? এ সব যে করি—তোমরা চাও, তাই। তোমরা যদি বল, জুতা-মোজা খুলে তসরের শাড়ী পরে ঠাকুর-ঘরে ঢোক, তাহলে তাই করব! তোমাদের কথায় পিয়ানো বাজাতে বসি—আবার

তোমাদের কথাতেই শীল-নোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসব! সে কি শক্ত কাজ? আমার মা-দিদিমারা যে সে সব করেছেন। আমি কেন পারব না শুনি? আমি বিলেত থেকেও আসিনি, আমেরিকা থেকেও আসিনি।

খুশী মনে হিমাংশু বলিল,—বেশ, তাই হোক। কিন্তু মনে রেখ, কাশ্মীর হল ভূস্বর্গ! আর শালতুলী··

বাধা দিয়া কণিকা কহিল,—সে তোমার জন্মভূমি—তার অপযশ গেয়ো না। জান তো সেই কবিতা—

কেঁচো কয় নীচ মাটী কালো তার রূপ।
কবি তারে ডেকে বলে, চুপ, চুপ, চুপ!
তুমি যে মাটীর কেঁচো খাও তারি রস—
তাহার নিন্দায় তব বাড়িবে কি যশ!

হিমাংশু কহিল,—কিন্তু হঠাৎ কাশ্মীর থেকে শালতুলী! তুমি বুঝি ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকছিলে?

কণিকা কহিল,—তা নয়। মার চিঠি পড়ে ছিল বাইরের ঘরের টেবিলে।—তোমায় লিখেছেন। আমি পড়ছিলুম।

কণিকা স্বামীর পানে চাহিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল,—মার চিঠি আমায় কখনো দেখাওনি কেন?

হিমাংশু কহিল,—মার লেখাপড়া সেকেলে। চিঠিতে বানান ভুল হয়···

—ও! কণিকা আর কিছু বলিল না।

কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুর সঙ্গে সঙ্গে চোখে যে দৃষ্টি ফুটিল, তাহা হিমাংশুর গায়ে বিঁধিল—কাঁটার মত। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

শালতুলী! শালতুলী! এ যেন আর একটা পৃথিবী।

ছোট নদী। নৌকা হইতে ঘাটে নামিয়া কণিকা দেখে, তিন-চারিখানা গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে; গরু জোড়া নাই। কালোকোলো কতকগুলা ছেলেমেয়ে···বসনের ধার ধারে না—কোমরে ঘুনসী বাঁধা···কণিকাকে দেখিয়া কাহারো চোখ আর ফিরিতে চায় না। এ-জায়গায় এমন মানুষ যেন তারা কোন দিন প্রত্যাশা করে নাই।

দুখানা গরুর গাড়ী মিলিল। একখানায় মালপত্রসমেত উঠিল ভৃত্য দাশু ও দাসী বিন্দু। অপরটিতে উঠিল কণিকা আর হিমাংশু। কণিকা নৌকা হইতে নামিবার সময় পায়ের জুতা খুলিয়া বিন্দুর পুঁটলিতে ঠাসিয়াছে, মাথার পিন খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে।

গাড়ী চলিল। সামনে যতদূর দেখা যায়, সবুজ মাঠ আর নীল নির্ম্মল আকাশে কোলাকুলি করিতেছে। দুধারে ধানের ক্ষেত, জলা—মাঝে মাঝে খোড়ো ঘর। ঘাসের বুকে ঐ ফিঙে পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতেছে।

পিপাসু নয়নের দৃষ্টি দিয়া কণিকা এ মাধুরী উপভোগ করিতেছিল।

পুকুর, ভাঙ্গা শিব-মন্দির, কালিকাসুন্দার ঝোপ, খাগড়া-বন, সাদা কাশের ঝাড়, মজা বিল, বারোয়ারি-তলা পার হইয়া গাড়ী আসিল গাঁয়ের কাছে। পথে লোক চলিয়াছে। মুখ তুলিয়া কেহ চাহিয়া দেখিতেছে—কেহ বা না দেখিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেছে।

এক জায়গায় একজন ডাকিয়া কথা কহিল; বলিল,—হিমু না কি? ভাল আছ? ক যুগ পরে দেশে এলে··· ওঃ! সঙ্গে বৌমা বুঝি? বেশ, বেশ! দুদিন থাকা হবে তো?

এমনি অভ্যর্থনা সারা গাঁ জুড়িয়া। এক জায়গায় এক বর্ষীয়সী নারী গাড়ী থামাইয়া বলিল,—দেখি মা, মুখখানি। আহা···খাসা বৌ!

কেহ বলিল,—হিমু! বাঃ! আজ সকালে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলুম—কৈ তুমি আসবে, এমন কথা তো শুনিনি।

হিমাংশু কহিল,—না, বাড়ীতে কেউ জানেন না। আমি খবর দিইনি।

যখন গাড়ী আসিয়া গৃহে পৌছিল, তখন সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় তাল গাছগুলার পাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যের লাল আলো আসিয়া গ্রামের বুকে পড়িয়াছে! সূর্য্য যেন একটু থাকিয়া দেখিয়া যাইতে চায়, বাড়ীর সকলে হিমাংশুকে সহসা গৃহে আসিতে দেখিয়া কতখানি আনন্দ প্রকাশ করে।

গৃহে যে আনন্দ দেখা দিল, তাহা দেখিয়া দিনের সূর্য্য খুশী-মনে অন্তগৃহে গেল।

কণিকা অবাক হইয়া গেল। কাহাকেও জানে না, চেনে না। তবু যেন কত চেনা—কতকালের কতখানি জানা। প্রাণগুলা যেন তাহারি উপর পড়িয়া ছিল। এত যত্ন, এমন আদর।

সারা আকাশ আদরের রঙে রাঙা হইয়া উঠিল। মিষ্ট কথায় দিকে দিকে যেন আলোর লহর। তার মনে হইতেছিল, এতদিন কিসের লোভে এ সব ছাড়িয়া দূরে বসিয়া ছিল! এত ঐশ্বর্য্য এখানে সঞ্চিত আছে!

হিমাংশু গায়ের জামা খুলিয়া মার কাছে আসিয়া বলিল,—একখানা গামছা দাও তো মা।

মা বলিলেন,—গামছা কেন রে?

হিমাংশু কহিল,—নদো আর জুনো এসেছে। ওদের সঙ্গে পুকুরে একটু সাঁতার কাটব।

মা বলিলেন,—রাত হয়ে গেছে যে ..কত কাল অভ্যাস নেই। শেষে দুদিনের জন্যে এসে অসুখ করবি।

হিমাংশু কহিল,—কিসের অসুখ! কোন অসুখ করবে না।

মা বলিলেন,—দাও তো বৌমা, কোথায় ওর গামছা আছে, বার করে।

হিমাংশু কহিল—ট্রাঙ্ক খোলার তর সইবে না, মা। তোমার গামছা নেই?

মা বলিলেন,—ওরে টেঁপি,—আমার গামছাটা এনে দে রে তোর বড়দাকে।

টেঁপি ননদের মেয়ে। গামছা আনিয়া বলিল,—এই নাও বড়দা গামছা।

হিমাংশু কহিল,—একটু সর্ষের তেল দে, মাথায় মাখব।

শুভ্রাংশু কহিল,—সাবান দেবে বড়দা?

—ধেৎ! সাবান কি হবে?

টেঁপি তেল আনিয়া দিলে সেই তেল মাথায় গায়ে মাখিয়া হিমাংশু বাহির হইয়া গেল।

কণিকা কাছেই বসিয়া ছিল। বাড়ীর যত লোক, তাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। হিমাংশুর রকম দেখিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেখানে উঠিতে বসিতে যে লোক দাস-দাসীর উপর নির্ভর করিত, এখানে সে···

তার বড় ভাল লাগিল।

পিস্‌শাশুড়ী আসিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ মা, তোমার জন্যে ট্যাপা একটু চা তৈরী করে দিক!

কণিকা কহিল,—না পিসিমা, আমি চা খাই না।

পিসিমা কহিল,—সে কি মা! কলকাতার মেয়ে, পাস করেছ—চা খাও না!

কণিকা কহিল,—না পিসিমা। আমার বাবা চায়ের উপর বড় চটা। তাই ও অভ্যাস কখনো হয়নি।

পিসিমা বলিলেন,—বা! বেয়াইকে খুব ভাল বলতে হবে তো।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। আহারাদি চুকিয়া গিয়াছে। বুড়ার দল হইতে ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাহারো চোখে ঘুম নাই। ছোটগুলা কণিকাকে পাইয়া বসিয়াছে। সবাইয়ের মুখে শুধু এক কথা,—বৌদি···বৌদি! বড়রা কথায় কথায় ডাকিতেছে,—বৌমা!

তাকে পাইয়া সকলে যেন পাগল—দুনিয়ার আর সব ভুলিয়া গিয়াছে। তার মনে হইতেছে, এ মিষ্ট মধুর আহ্বানে বুঝি সে গলিয়া যাইবে।

··বৌমা! বৌদি···

বৌদি গল্প বলিতেছে।

খুড়-শাশুড়ী বলিলেন,—ওরে, তোরা করিস কি? সারা পথ বৌমার কত কষ্ট হয়েছে। ওঁকে ছাড়্—ঘুমোতে দে। বৌদি তো পালাচ্ছে না—শুনিস্ গল্প। তুমি ওঠ বৌমা—শুয়ে পড়গে। রেলে, নৌকোয়, গরুর গাড়ীতে কষ্টের কি সীমা-পরিসীমা ছিল! ছেলে মানুষ···কখনো অভ্যাস নেই

মৃদু হাসিয়া মিষ্ট কথায় কণিকা কহিল,—আমার ঘুম পায় নি পিসিমা।

যেন দোল! না, দুর্গোৎসব।

রাত্রি প্রায় বারোটা। পুনি, টুনি, ভুলু বৌদির কাছে গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বড়রা ঢুলিতে ঢুলিতে চোখগুলাকে প্রাণপণে মেলিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন,—না বৌমা, আর গল্প থাক্। অনেক রাত হয়েছে। যাও, শুয়ে পড়গে।

অসুখ হলে আমার ভাবনার সীমা থাকবে না। ওঠ মা। বাইরের ঘরে হিমুকে নিয়ে ওর ছেলেবেলার যত সঙ্গীরা যেন মেতে রয়েছে। তাকে ডাকতে পাঠাই। তুমি ওঠ মা··· তারপর এগুলোকে তুলে বিছানায় শোয়াই।

কণিকা কহিল,—আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি মা—কোলে করে।

—না মা, পারবে না। চেন না তো! শুয়ে আছে সব নিরীহ হয়ে, তুলতে যাও এখনি রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। কম পাজী সব।

—আমি পারব মা। লক্ষীটি!

কণিকা দু'একটি ছোটকে তুলিতে গেল। তারা চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া যে কাণ্ড করিল। বেচারী আনাড়ি! একটা লাথি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী তাড়াতাড়ি তাকে ধরিয়া বুকে লইলেন। বলিলেন, লেগেছে খুব?

কণিকা কহিল,—না।

হাসিয়া মা কহিলেন,—দেখ একবার কাণ্ড! শুধু শুধু নাথিটা খেলে।···ওরে এই ভুলো···ভূত কোথাকারের, নাথি মারলি বৌদিকে!

ঝাঁকানির চোটে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভুলু উঠিয়া বসিল—ড্যাবডেবে দুই চোখ মেলিয়া। শাশুড়ী বলিলেন,—যা, ঘরে গিয়ে শো। শোন্—আমার ঘরে শুবি। তারপর কণিকার মুখে চুমা দিয়া বলিলেন—এস মা তোমার ঘরে—

কণিকাকে আনিয়া তিনি ঘরে দিলেন। সাদাসিধে ঘর। ঘরের এক ধারে তার বড় ট্রাঙ্ক রহিয়াছে, সুটকেস রহিয়াছে—পালঙ্কে বিছানা। ঘরের কোণে ঝক্‌ঝকে পিতলের পিলসুজ—পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে।

মা বলিলেন,—শুয়ে পড়। আমি হিমুকে ডেকে পাঠাই। সবাই যেন মেতে উঠেছে। ভালবাসা এমন জিনিষ! আহার-নিদ্রা ভুলিয়ে দেয়।

মা চলিয়া গেলেন। জানালা খোলা ছিল। কণিকা আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। জানালার ওধারে মিশ্‌কালো অন্ধকার। মাঝে মাঝে জোনাকি জ্বলিতেছে। যেন কালো মখমলে সোনালি চুমকির বাহার। আর বন জুড়িয়া ঝিল্লীর অবিরাম গুঞ্জন।

কলিকাতার কথা মনে পড়িল। আলোয় আলো-করা পথ···কলরবের অন্ত নাই কখনো। ট্যাক্সি চলিয়াছে, ছ্যাকড়ার দৌড়, রিক্‌শার টিং-টিং শব্দ···হার্মোনিয়ম বাজিতেছে—আখ্‌ড়ায় রিহার্শালের গান চলিয়াছে—দারুণ হট্টগোল। মনটাকে এক দণ্ড কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। সেই বিচিত্র কলরবে সারাক্ষণ সকলে মাতিয়া মশগুল হইয়া আছে। সে আলোর চেয়ে এ অন্ধকার অনেক ভাল।

তারপর এই স্নেহ, এই ভালবাসা। কাল কোথায় কে ছিল—দেখা নাই, শুনা নাই। আর আজ! এতখানি প্রাণের হিল্লোল বহিয়া চলিয়াছে এই জীর্ণ মলিন গৃহে, বনের কোণে—আদব-কায়দায় অনভিজ্ঞ এখানকার এই নর-নারীর বুকে!

সহসা পিছন হইতে হিমাংশু আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল।

ফিরিয়া কণিকা চাহিয়া রহিল স্বামীর মুখের পানে।

হিমাংশু কহিল,—মন কেমন করছে কলকাতার জন্যে? এখানে এই অন্ধকার! বলেছিলুম তো।

কণিকা নিশ্বাস ফেলিল,—জবাব দিল না।

হিমাংশু কহিল—কি ভাবছিলে?

—বলব?

—বল।

কণিকা কহিল,—তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন মনে খুব গর্ব্ব হয়েছিল—এই ভেবে যে, আমার স্বামী খুব মস্ত বিদ্বান।

হিমাংশু কহিল,—বেশ! তারপর?

কণিকা কহিল,—আজ এখানে এসে সে গর্ব্ব অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। আমার স্বামী শুধু মস্ত বিদ্বান নয়—তার চেয়েও বড়—অনেক বেশী বড়।

হিমাংশু কহিল,—তার মানে?

কণিকা কহিল,—সে মানে নাই শুনলে।···রাগ হচ্ছিল তোমার উপর।

—রাগ?

—হ্যাঁ। শাশুড়ীর এই ভালবাসা—দেওর, ননদ, এমন সংসার—এ-সব থেকে আমার বঞ্চিত রেখেছিলে—এই তোমার ভালবাসা!

হিমাংশু কহিল,—শোন আমার কথা। কিছু গোপন করবো না।

বাধা দিয়া কণিকা কহিল,—ভেবেছিলে, আমি পাশ করেছি বলে শুধু স্বামীর স্ত্রী হতেই চাই—ঘরের বৌ হতে আমার অসাধ? ছি!

হিমাংশু কহিল,—আমায় ক্ষমা কর।

কোলাহল-কলরবের অন্ত নাই।

ছোট দেওর আসিয়া চুপি চুপি ডাকিল,—বৌদি…

কণিকা কহিল,—কি ভাই?

—শসা খাবে? গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছি। কেমন কচি! খুব ভাল।

ভুলু শসা দিল।

ও-পাড়ার ঠানদি আসিয়া বলিল,—ও নাতবৌ, পঞ্চমুখী খোঁপা বাঁধিস না কেন ভাই! মাথায় অত চুল! আয়—সে খোঁপার জালে হিমু একেবারে চিরদিনের মত আটকে থাকবে।

ঠানদি তার মাথা লইয়া পড়িল; তেলে জবজবে করিয়া চুলগুলা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কহিল,—আমার মাথা দেখেছিস্ নাতবৌ? তোর বুড়োদাদা আমার মাথার চুলের কি সুখ্যাতিই করত!

পিস-শাশুড়ী আসিয়া কহিলেন,—ও ছোট মামী, ও কি করলে! বৌমার চুলে ঐ দুর্গন্ধি নারকেল তেল জবজবে করে মাখালে! কাপড় বালিশ—সব যাবে যে! বৌমার কাছে ভাল দামী গন্ধ-তেল রয়েছে যে!

ঠানদি কহিল,—তুই থাম্ দয়া। এই নারকেল তেল ছেড়ে সহরে গন্ধ-তেল মেখে মেখে একালের বৌ-ঝিয়েরা কাঁচা বয়সে মাথার চুল যেমন শাদা করছে, তেমনি চুল হচ্ছে খাটো। এমন খাটো যে খোঁপা বাঁধতে পরচুল কিনে আনে! সেব'রে গিয়াছিলুম না সেই কালীঘাটে আমার বোনঝীয়ের বিয়েতে…দেখে এলুম! হ্যাঁ নাতবৌ, নারকেল তেলে তোর বিম্নি হচ্ছে না কি ভাই?

কণিকা কহিল,—না ঠানদি…পিস-শাশুড়ীর পানে চাহিয়া বলিল,—মাখি নারকেল তেল পিসিমা। আমার তো দুর্গন্ধি লাগছে না।

এমনি করিয়া আটদশ দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল—যেন স্বপ্ন! ওদিকে মুহুরি শিবনাথ চিঠি লিখিল,—

এখন আসিলে ভালো হয়। আসা চাই। নারাকুলার রাজার মস্ত নালিশ রুজু করিতে হইবে। জুনিয়ার উকিল শঙ্করবাবু বড্ড পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ইত্যাদি।

হিমাংশু আসিল মায়ের কাছে। মাকে ডাকিল। মা শুইয়া ছিলেন। বাতের ব্যথা খুব বাড়িয়াছে। কয়লার তোলা উনুন জ্বালিয়া কণিকা ফ্লানেলের সেঁক দিতেছে। সামনে লক্ষ্মীপূজা। খাটুনি আছে। মা নিজের হাতে সব করেন। কণিকা বলিতেছিল—আমায় সব শিখিয়ে দেবেন মা, নাহলে শিখব কি করে!

ছেলের আহ্বানে মা চাহিলেন ছেলের পানে।

ছেলে শিবুর চিঠির কথা বলিল। মা বলিলেন,—ওমা, লক্ষ্মী পূজোটা থেকে যাবি না কি রে? না, না, তা হয় না।

ছেলে বলিল—উপায় নেই মা। মস্ত বড় মকর্দ্দমা। শিবু চিঠি লিখেচে। না হলে অনেক টাকা লোকসান হবে।

মা চাহিলেন কণিকার দিকে। ছেলে বুঝাইল, মা-লক্ষ্মীর পূজা—তাঁর আহ্বান আসিয়াছে—শুনিব না?

•

তারপর ঘরের মধ্যে হিমাংশুর সঙ্গে কণিকার দেখা।

হিমাংশু কহিল,—সব গুছিয়ে নাও গো।

কণিকা কহিল,—মার বাতের এই ব্যথা…তার উপর বাড়ীতে লক্ষ্মী পূজো। যেতে হয়, তুমি যাও কলকাতায়। মা না সারা পর্য্যন্ত আমি কলকাতায় যাব না। বুঝলে?

হিমাংশুর দুই চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

কণিকা কহিল,—এমনিতেই আমার সে মরুভূমিতে যাবার ইচ্ছা বড় হচ্ছে না—তার উপর মার অসুখ। আমি যদি সেবা না করব তো ঘরের বৌ হয়েছি কি জন্যে…

কণিকার দুই চোখে…

হিমাংশু যে-দীপ্তি দেখিল, এমন দীপ্তি পূর্ব্বে সে কোথাও দেখে নাই। না কলিকাতায়, না দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে, না আগ্রায়। এ-দীপ্তি তার বড় ভাল লাগিল। তার সারা বুক যেন আলোয় আলো হইয়া উঠিল।

নামকরণ

—স্বামী ভূমানন্দ

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের ন্যায় অনেক নিরর্থক ও বিপরীতার্থক নাম আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে। শুধু এ দেশে কেন, অনেক দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ নামকরণ চলিয়া আসিতেছে। নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, নাম ও নামী "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" আদৌ নয়। নামকরণের এবংবিধ ব্যভিচার দেখিয়া একজন তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন ঠনঠন্ দাস। এইপ্রকার অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত নাম রাখার হেতু কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন—

অমর জো ওহ্ মর্ গয়া
ধনপৎ কাটতা ঘাস্
লছমন ঔর মছলী বেচে
ভলাহী ঠনঠন্ দাস॥

অর্থাৎ, যাহার নাম ছিল অমর সে মরিয়া গিয়াছে, ধনপতি ঘাস কাটিতেছে, লক্ষ্মণ মৎস্য বিক্রয় করিতেছে: এই সব দেখিয়া আমার মনে হয় ঠনঠন্ দাস নামই ভাল। বাস্তবিক একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, আমাদিগের মধ্যে যে সমস্ত নাম প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই নামীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তাই বলিয়া যে, সমস্ত নামই অর্থহীন তাহাও নহে, কতকগুলি অর্থযুক্ত বা অর্থসংশ্লিষ্ট নামও আছে। অত্যন্ত বর্ষার মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাম বাদল, কৃষ্ণকায় সন্তানের নাম কৃষ্ণ বা কালী রাখা নিরর্থক নয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারেও স্থানের নামকরণ-প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর, হরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হরধাম ও শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবনিবাস অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠাতার সাক্ষ্য দিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালেও মুরশিদাবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, মুরাদাবাদপ্রভৃতি এবং সম্প্রতিও প্রদ্যোৎনগর, সুরেন্দ্রগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নামকরণও এই ভাবেই হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

পুরাণাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, পৌরাণিক যুগেও অনেক সার্থক নাম ছিল, কিন্তু এখন আমরা অনেকেই সেই সমস্ত নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানি না। "জরয়া চাভিসন্ধিতে. জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ" অর্থাৎ, জরানাম্নী রাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত হইয়াছিল বলিয়া দ্বিধাবিভক্ত বালকের নাম জরাসন্ধ হইয়াছিল, ইহা অনেকের জানা আছে। "সগরাৎ সাগরঃ কীর্ত্তি" অর্থাৎ সাগররাজার পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রের নাম সাগর হইয়াছিল, ইহা আমরা অনেকেই জানি; কিন্তু সগর রাজার নাম সগর হইয়াছিল কেন তাহা হয়ত অনেকের জানা নাই। বর্ত্তমান কালেও অনেক স্থান পৌরাণিক নামে পরিচিত, অথচ সেই সেই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। এবংবিধ কয়েকটী সার্থক নামের ব্যুৎপত্তি নিম্নে দেওয়া হইল; ইহাদিগের কয়েকটীর আনুষঙ্গিক বর্ণনায় রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবদাদি বিভিন্ন গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

মান্ধাতা—রাজা যুবনাশ্বের একশত ভার্য্যা ছিল, কিন্তু তিনি অনপত্য ছিলেন। তন্নিবন্ধন যুবনাশ্ব শতভার্য্যাসহ বনগমন করেন। তত্রত্য ঋষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সন্তানার্থ ইন্দ্রদৈবত্য যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করেন। যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন হইলে একদিন যুবনাশ্ব নিশাভাগে তৃষিত হইয়া জলপানার্থ যজ্ঞসদনে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার পত্নীকে দিবার জন্য যে অভিমন্ত্রিত জল ছিল, তাহাই পান করেন। পুরোহিতগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন, কলসে জল নাই এবং অনুসন্ধানে জানিলেন, রাজা স্বয়ংই ঐ জল পান করিয়াছেন। পুত্রোৎপাদক জলপানের ফলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিপ্রগণ দুঃখিত হইয়া যখন বলিতে লাগিলেন, "আহা, এই কুমার স্তন্যপানার্থ রোদন করিতেছে, এখন সে কাহার স্তন্য পান করিবে?" তখন দেবরাজ ইন্দ্র "মাংধাতা" অর্থাৎ আমাকেই পান করিবে, এই কথা বলিয়া ঐ বালকের মুখে স্বকীয় তর্জ্জনী প্রদান করিলেন। এই কারণে ঐ বালকের নাম হইল মান্ধাতা—

ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্।
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্ত্তী জজান হ ॥
কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং স্তন্যে রোরূয়তে ভৃশম্ ॥
মান্ধাতা বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ৬ অধ্যায় ; মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২৬ অধ্যায়)

সগর—রাজা বাহুক শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপহৃতরাজ্য হইয়া ভার্য্যার সহিত বনগমন করেন এবং তথায় তাঁহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইবার উদ্যোগ করিলে, মহর্ষি ঔর্ব তাঁহাকে অন্তর্ব্বত্নী জানিয়া সে উদ্যম হইতে নিবারণ করেন। রাজমহিষীর সপত্নীগণ তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ঐ গর্ভ বিনাশ করিবার জন্য তাঁহাকে অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র জীবিতাবস্থায় স-গর (অর্থাৎ বিষের সহিত) জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য ঐ পুত্রের নাম হইয়াছিল সগর—

আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ
সহ তেনৈব সংজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ৮ অধ্যায় ; রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৯ অধ্যায়)

অগস্ত্য—সূর্য্যদেব প্রত্যহ অদ্রিরাজ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেন। তদ্দর্শনে বিন্ধ্যাগিরি ঈর্ষাপরবশ হইয়া একদিন সূর্য্যকে বলিলেন, "ভাস্কর, তুমি প্রতিদিন যেমন মেরুকে প্রদক্ষিণ কর সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিবে।" তদুত্তরে সূর্য্য বলিলেন, "আমি স্বকীয় ইচ্ছানুক্রমে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না ; বিশ্বস্রষ্টার আদিষ্টপথে পরিভ্রমণ করিতেছি মাত্র।" সূর্য্যের উক্তিতে বিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত সহসা অত্যুন্নত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া বিন্ধ্যকে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিন্ধ্য তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল-সন্নিধানে আগমন করতঃ কহিলেন, "হে ভূধর, আমি কোনও বিশেষ কার্য্যবশতঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিব, অতএব তুমি আমাকে পথ প্রদান কর এবং যতদিন আমি প্রত্যাগমন না করি তুমি আমার অপেক্ষা করিবে, বর্দ্ধমান হইবে না।" গুরুবাক্য স্বীকার করিয়া বিন্ধ্য মহর্ষিকে পথ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি আর প্রত্যাগমন করিলেন না, কাজেই বিন্ধ্য আর বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অগং (পর্ব্বতং বিন্ধ্যং) স্তম্ভয়তি ইতি অগস্ত্য—অর্থাৎ অগকে স্তম্ভন করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষির নাম হইয়াছিল অগস্ত্য—

ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সুমহান্ ভাস্করস্য নগোত্তমঃ।
আদেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্দ্ধতে ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব, ১০৩ অধ্যায় ; রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড, ১১ অধ্যায়)

কৃপ, কৃপী—গোতম ও অহল্যা হইতে শতানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। শতানন্দের পুত্র ধনুর্ব্বেদবিশারদ সত্যধৃতি, সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। অপ্সরা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া শরদ্বানের স্খলিত শুক্র শরস্তম্বে পতিত হয় ও তাহা হইতে নরমিথুন জন্মগ্রহণ করে। রাজা শান্তনু মৃগয়া করিতে গিয়া দৈবাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পান ও কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া প্রতিপালন করেন। রাজা শান্তনুর কৃপায় ঐ নরমিথুনের জীবন রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া বালকের নাম হইল কৃপ ও বালিকার নাম হইল কৃপী। কৃপ কালে কৌরবদিগের আচার্য্য ও কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন—

তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াঽগৃহ্নাৎ শান্তনুর্মৃগয়াঞ্চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২১ অধ্যায় ; মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৩০ অধ্যায়)

শান্তনু—শান্তনু রাজা করদ্বারা যে কোনও জীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন, সেই ব্যক্তিই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিত, এই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল শান্তনু—

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ।
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২২ অধ্যায় ; মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায়)

শকুন্তলা—এক সময়ে মহাতপা বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র, পাছে বিশ্বামিত্র তপস্যাপ্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রত্ব-পদ অধিকার করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যাভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। মেনকা কৌশলক্রমে বিশ্বামিত্রের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন এবং বিশ্বামিত্র মেনকাকে লাভ করিয়া

তপস্যা পরিত্যাগ করতঃ তাহার সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মেনকা গর্ভবতী হইলেন এবং যথাকালে একটী কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে দেবরাজ-সভায় চলিয়া গেলেন। তত্রত্য পক্ষিগণ হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ নির্জ্জন বনে সদ্যোজাত অসহায় কন্যাকে পতিত দেখিয়া সদয় হৃদয়ে তাহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। মহর্ষি কণ্ব কন্যাটীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করেন ও শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া কন্যার নাম রাখেন শকুন্তলা—

নির্জ্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া ॥
(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭২ অধ্যায়)

আনক দুন্দুভি—বসুদেবের অপর নাম আনকদুন্দুভি। তাঁহার জন্মকালে স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভি ও ঢক্কা বাদ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল আনকদুন্দুভি—

দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২৪ অধ্যায়)

ভরদ্বাজ—উতথ্য-বনিতা মমতার গর্ভাবস্থায় একদিন বৃহস্পতি গোপনে ঐ ভ্রাতৃভার্য্যায় মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হইলে গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে নিষেধ করেন; কিন্তু বৃহস্পতি তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক বীর্য্যসেক করেন। গর্ভস্থ বালক এক গর্ভে দুইজনের অবস্থান অসম্ভব বিবেচনা করিয়া পার্ষ্ণি প্রহার দ্বারা সেই বীর্য্য মাতৃযোনির বহির্দ্দেশে নিঃসারিত করিয়া দেন। ভূপতিত সেই শুক্র হইতে তৎক্ষণাৎ এক কুমার উৎপন্ন হয়। স্বামীভয়ে ভীত হইয়া মমতা ঐ বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বৃহস্পতি মমতাকে বলিয়াছিলেন "মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং" অর্থাৎ "হে মূঢ়ে তুমি একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্য্যে (দুইজন হইতে) উৎপন্ন (দ্বাভ্যাং জাতং দ্বাজং) এই বালককে ত্যাগ করিও না, ইহার ভরণপোষণ কর।" মমতাও বৃহস্পতিকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, এই হেতু ঐ বালকের নাম হইয়াছিল ভরদ্বাজ—

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়)

মরুৎ (মারুত)—দেবগণ কর্ত্তৃক দিতির পুত্রগণ নিহত হইলে, দিতি ভর্ত্তা কশ্যপের নিকট ইন্দ্রবিনাশে সক্ষম একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ দিতির এই প্রার্থনায় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি যদি সহস্র বৎসর বিশুদ্ধাচারে ব্রতপরায়ণ হইয়া থাকিতে পার তাহা হইলে ঈপ্সিত পুত্র প্রসব করিবে।" মহর্ষি দিতিকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন ও নিজে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। দিতিও ভর্ত্তৃনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করতঃ শুদ্ধাচারে ব্রতপরায়ণ হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র বিমাতার এই সঙ্কল্প অবগত হইয়া দিতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নে তাঁহার সেবাপরায়ণ থাকিয়া ব্রতভঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিবেন। একদিন দ্বিপ্রহরে দিতি চরণ-স্থাপন-স্থানে মস্তক ও মস্তক-স্থাপন-স্থানে চরণ স্থাপন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ অশুচিভাবাপন্ন দেখিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন ও বজ্র দ্বারা সেই গর্ভস্থ শিশুকে উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। উদরগহ্বরে খণ্ডীকৃত গর্ভ উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, ইন্দ্র তাহাদিগকে বলিলেন, "মা রুদ" অর্থাৎ রোদন করিও না। এই হেতু খণ্ডীকৃত ঐ গর্ভের নাম হইল মরুৎ—

যস্মান্মা রুদ ইত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসম্ভবাঃ।
মরুতো নাম তে নাম্না ভবন্তু সুখদায়িনঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

বৃত্র—ত্বষ্টৃনন্দন বিশ্বরূপ কোনও সময়ে দেবতাদিগের পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যজ্ঞকালে প্রকাশ্যে দেবতাদিগের উদ্দেশে ও গোপনে মাতৃকুলজ অসুরদিগের উদ্দেশে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন। ইন্দ্র বিশ্বরূপের এই ব্যবহার জানিতে পারিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। ইহাতে ত্বষ্টা ইন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের বিনাশকামনায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে কয়েকটী আহুতি প্রক্ষেপের পরই যজ্ঞাগ্নি হইতে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ইন্দ্রশত্রু এক রাক্ষস উৎপন্ন হয় ও তাহার স্বকীয় তমঃ প্রভাবে সর্ব্বলোক আবৃত করিয়া ফেলে, এই জন্য ঐ রাক্ষসের নাম হইল বৃত্র—

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তমসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ৯ অধ্যায়)

অনঙ্গ—কঠোর তপস্যায় রত উমাপতির চিত্তবিকৃতি জন্মাইবার জন্য কামদেব তাঁহার সমীপবর্ত্তী হন। মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধাগ্নিতে তাঁহার শরীর বিশীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে অঙ্গবিহীন করেন। এই জন্য কামদেবের অপর নাম অনঙ্গ ও যে স্থানে কামদেবের অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানও অনঙ্গ দেশ বলিয়া বিখ্যাত—

অস্থাঙ্গাঙ্গপতম্ রাম সঙ্গঃ সর্ব্বাণাশেষতঃ।
অশরীরঃ কৃতঃ কাম এবং কোপান্মহাত্মনা॥
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তুহ; প্রভৃতি রাঘব।
অনঙ্গ ইতি দেশোহয়ং খ্যাতঃ কামাঙ্গনাশনাৎ॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২৬ অধ্যায়)

কার্ত্তিকেয়—ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ বহ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেনাপতিলাভের অভিপ্রায়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন "হুতাশন গঙ্গার গর্ভে আত্মবীর্য্যে যে অপত্য উৎপাদন করিবেন, সেই কুমারই দেবসেনাপতি হইবেন।" ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি গঙ্গাগর্ভে বীর্য্যপাত করেন, কিন্তু গঙ্গা সেই উগ্র বীর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহা কৈলাস-শিখরে শরবন প্রদেশে পরিত্যাগ করেন ও তাহা হইতে বালসূর্য্যসমপ্রভ একটী কুমার উৎপন্ন হয়। তদনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, সেই কুমারকে স্তন্য-প্রদান করিবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিযুক্ত করেন। কৃত্তিকাগণ, ঐ পুত্র তাঁহাদিগের নামানুসারে বিখ্যাত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে ইন্দ্রাদিকে বদ্ধ করিয়া কুমারকে স্তন্য-দানে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু দেবগণ ঐ কুমারের নামকরণ করিলেন কার্ত্তিকেয়—

তং কুমারং ততো জাতং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রা মরুদ্গণাঃ।
তদা ক্ষীরপ্রদানার্থং কৃত্তিকাঃ সংন্যযোজয়ন্॥
তাঃ ক্ষীরং তস্য দেবস্য সময়েন দদুস্তদা।
অস্মাকময়ং পুত্রঃ খ্যাতো নাম্নেতি রাঘব॥
ততস্তা দেবতা উচুঃ কার্ত্তিকেয় ইতি প্রভুঃ।
পুত্রোহয়ং জগতি খ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়: রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩৯ অধ্যায়)

অপ্সরা—দেব ও দৈত্যগণ অজর ও অমর হইবার বাসনায় ক্ষীরোদ-সাগরে নানাবিধ ওষধি নিক্ষেপ করতঃ মন্দরগিরিকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। জল আলোড়িত হইলে সেই ওষধিরস হইতে বরাঙ্গনাগণ উত্থিত হইলেন। জল (অপ) হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নাম হইল অপ্সরা—

অপ্সু নির্ম্মথ্যমানাসু রসাত্তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুরস্মসো যস্মাত্তস্মাদপ্সরসোহভবন॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৬ অধ্যায়)

সুর, অসুর—সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে বরুণের কন্যা বারুণী (অপর নাম সুরা) পরিগ্রহীতা (অর্থাৎ কে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে তাহা) অন্বেষণ করিতে করিতে উত্থিত হইলেন। সুরাকে অর্থাৎ বারুণীকে দেবগণ গ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহারা সুর নামে ও দৈত্যগণ সুরাকে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া অসুর নামে অভিহিত হইলেন—

সুরাপ্রতিগ্রহাদ্দেবাঃ সুরা ইত্যভিবিশ্রুতাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাত্তস্যা দৈতেয়াশ্চাসুরাঃ স্মৃতাঃ॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৬ অধ্যায়)

তিলোত্তমা—দানবেন্দ্র সুন্দ ও উপসুন্দের উপদ্রবে অস্থির হইয়া দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, তাহারা অপরের অবধ্য হইবে, কেবল তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে পারিবে। ব্রহ্মা ঋষিদিগের কাতরোক্তিতে বিচলিত হইলেন ও নিজদত্ত পূর্ব্ব বর স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ বিশ্বকর্ম্মাকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা জগতের যাবতীয় উত্তম বস্তু হইতে তিল তিল অংশ গ্রহণ করিয়া এক লোকললামভূতা ললনা নির্ম্মাণ করিলেন। এই জন্য ব্রহ্মা তাঁহার নামকরণ করিলেন তিলোত্তমা—

তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্ বিনির্ম্মিতা।
তিলোত্তমেতি তৎ তস্যা নাম চক্রে পিতামহঃ॥

(মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ২১১ অধ্যায়)

অষ্টাবক্র—সুজাতার গর্ভস্থিত বালক, অধ্যয়নশীল পিতাকে মাতৃগর্ভ হইতে কহিলেন, "হে তাত, আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভাবস্থায়ই সাঙ্গবেদ ও সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার

ঠিক হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালক কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া রোষভরে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন—"তুমি গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, অতএব তোমার কলেবর অষ্টস্থলে বক্র হইবে।" কহোড়-নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তিনি অষ্টবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন—

যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি, তস্মাদ্বক্রে ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ।
স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো মহর্ষিঃ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৩২ অধ্যায়)

জরৎকারু—যাযাবরবংশে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহর্ষির শরীর অত্যন্ত কারু অর্থাৎ দারুণ ছিল এবং তিনি কঠোর তপস্যাদ্বারা সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ (জীর্ণ) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল জরৎকারু। বাসুকির ভগিনীর নামও জরৎকারু—

জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতম্।
শরীরং কারু তস্যাসীৎ তৎ স ধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ॥
ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারু ইতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা॥

(মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ৪০ অধ্যায়)

আস্তীক—মহর্ষি জরৎকারু নাগরাজ বাসুকির অনুরোধে তাঁহার ভগিনী জরৎকারুকে এই অঙ্গীকারে বিবাহ করেন যে, তাঁহার ভগিনী কোনও অপ্রিয়াচরণ করিলে মহর্ষি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন। একদিন মহর্ষি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পত্নীর অঙ্কে শিরোনিবেশপূর্ব্বক শায়িত ও নিদ্রিত হইলেন, ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল; নাগকন্যা স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় তাঁহাকে জাগরিত করিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন, সূর্য্যাস্তের সময় হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। মহর্ষি তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমার দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে আমি নিদ্রিত থাকিলে সূর্য্যের যথাকালে অস্তগমন করিবার সাধ্য নাই; তুমি আমার অবমাননা করিলে অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থান করিব না।" নাগকন্যা মর্ম্মাহত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু মহর্ষি স্বকীয় সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হইলেন না। মহর্ষি গমনে উদ্যত হইলে, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন "হে ধর্ম্মজ্ঞ আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপগ্রস্ত; আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপবিমোচন হইবে; কিন্তু তাহার ত কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না, অর্থাৎ আমার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।' তদুত্তরে মহর্ষি "অস্তি" (অর্থাৎ গর্ভে পুত্র আছে) বলিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই নিমিত্ত ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন—

অস্তীত্যুক্ত্বা গতো যস্মাৎ পিতা গর্ভস্থমেব তম্।
বনং তস্মাদিদং তস্য নামাস্তীকেতি বিশ্রুতম্॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৮ অধ্যায়)

চ্যবন—একদিন মহাত্মা ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয় ও ভৃগুপত্নীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন করতঃ কামাতুর হইয়া তাঁহাকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করে। ভৃগুপত্নীর গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এই গর্হিত আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত (চ্যুত—চুচ্যাবেতি) হন ও রাক্ষসকে ভস্মীভূত করেন। এই হেতু ঐ বালকের নাম হয় চ্যবন—

ততঃ স গর্ভো নিবসন্ কুক্ষৌ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
রোষান্মাতুশ্চ্যুতঃ কুক্ষেশ্চ্যবনস্তেন সোঽভবৎ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬ অধ্যায়)

ঔর্ব্ব—রাজা কৃতবীর্য্য ভার্গবদিগের যজমান ছিলেন। তিনি যজ্ঞান্তে প্রভূত ধনধান্যাদিদ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেন। রাজা লোকান্তরে প্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিগণের কোনও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অর্থের আবশ্যকতা হয়। ভার্গবদিগের অর্থাতিশয্য জানিয়া নৃপতিগণ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রার্থনা করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে তাঁহাদিগের বিত্ত ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, ও কেহ কেহ ব্রাহ্মণসাৎ করেন। এই অবসরে কোনও ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিতে করিতে ভৃগুর গৃহে প্রভূত বিত্ত দেখিতে পান। তাহাতে ভার্গবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের যথেচ্ছ অবমাননা করেন। ক্ষত্রিয়েরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীদিগের গর্ভস্থ অর্ভকের প্রাণসংহারে

প্রবৃত্ত হইলে, চ্যবন-ভার্য্যা আরুষী সভয়ে তাঁহার উরুদেশে এক গর্ভ ধারণ করেন। ক্ষত্রিয়েরা তাহা জানিতে পারিয়া ঐ গর্ভবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদীর্ণ করতঃ নির্গত হইয়া স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের দৃষ্টিশক্তি সংহার করেন। উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ বালকের নাম হইয়াছিল ঔর্ব্ব—

অনেনৈব চ বিখ্যাতো নাম্না লোকেষু সত্তমঃ।
স ঔর্ব্ব ইতি বিপ্রর্ষিরূরুং ভিত্ত্বা ব্যজায়ত॥

(মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১৭৯ অধ্যায়)

ঘটোৎকচ—রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঔরসে মহাবল, পরাক্রান্ত, কেশশূন্য, হস্তীর মস্তকের ন্যায় মস্তক-বিশিষ্ট এক অমানুষ পুত্র জন্মে। ঘট শব্দের অর্থ করি মস্তক, ও উৎকচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য। এই জন্য ঐ পুত্রের নাম রাখা হইল ঘটোৎকচ—

ঘটো হাস্যোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত।
অব্রবীৎ তেন নামাস্য ঘটোৎকচ ইতি স্ম হ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৫৫ অধ্যায়)

পরীক্ষিৎ—কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জাতকের নাম হইয়াছিল পরীক্ষিৎ—

পরিক্ষীণেষু কুরুষু সোত্তরায়ামজীজনৎ।
পরীক্ষিদভবৎ তেন সৌভদ্রস্তাত্মজো বলী॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২২ অধ্যায়, ১ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়)

মতান্তরে—অশ্বত্থামানিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ অস্ত্রতেজ নিবারণ করিয়া অর্ভককে রক্ষা করিয়াছিলেন, গর্ভস্থ শিশু ঐ চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি কে; কিন্তু ভগবান্ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ বালক যে সমস্ত মনুষ্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গর্ভাবস্থায় দৃষ্ট আকারবিশিষ্ট কেহ আছেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এই জন্য নাম হইয়াছিল পরীক্ষিৎ—

স এষ লোকবিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভদৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৯ অধ্যায়; সৌপ্তিকপর্ব্ব, ১৬ অধ্যায়)

কান্যকুব্জ (কনৌজ)—রাজর্ষি কুশনাভ অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ একশত কন্যা উৎপাদন করেন। একদিন কুমারীগণ গন্ধদ্রব্যে ও মাল্যে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যান-ভূমিতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময় সর্ব্বগ বায়ু তথায় আগমন করিয়া ঐ বালিকাদিগকে তাঁহার ভার্য্যা হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কন্যাগণ বলেন, "আমরা রাজা কুশনাভের কন্যা; পিতা আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের স্বামী হইবেন।" এই উত্তরে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাগণের মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাঁহাদিগের কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে কুব্জ করিয়া দেন। কন্যা-গণ কুব্জত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম হইল কান্যকুব্জ বা কন্যকুব্জ—

(ক) যস্মাদ্বায়ুনা চ তাঃ কন্যাস্তত্র কুব্জীকৃতাঃ পুরা।
কন্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎ পুরম্॥

(খ) কুব্জত্বাৎ কন্যকানাং তৎ কান্যকুব্জমভূৎ পুরম্।

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩৫ অধ্যায়)

হস্তিনাপুর—রাজা বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী। তিনি যে পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল—

বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়; মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায়)

চম্পাপুরী—রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চম্প। চম্প যে পুরী নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম চম্পাপুরী—

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্বিনির্ম্মিতা।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ৮ অধ্যায়)

মিথিলা—ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি যজ্ঞ করিবার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিকরূপে বরণ করেন; কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, "ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছেন, অতএব যে পর্য্যন্ত তাঁহার যজ্ঞ সমাধা না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর।" নিমি বিবেচনা করিলেন, ইন্দ্রসত্র সমাপ্ত না হইতেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার যজ্ঞ করা হইল না। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিমি অন্য ঋত্বিকদ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপনান্তর নিমির ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া শিষ্যের অন্যায়দর্শনে রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান-

করিলেন এবং তাহার ফলে নিমির দেহপাত হইল। উপস্থিত মহর্ষিরা বিবেচনা করিলেন, অরাজক রাজ্যে প্রজাদিগের সর্ব্বদাই ভয়ের সম্ভাবনা ; অতএব সকলে রাজপুত্র কামনা করিয়া নিমির মৃতদেহ মন্থন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে ঐ মৃতদেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ঐ বালকের নাম হইল মিথিল ; তাঁহার অপর দুইটী নাম জনক ও বিদেহ। মিথিলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরীর নাম মিথিলা—

মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়)

বৈশালী—তৃণবিন্দুর পুত্রগণের মধ্যে বিশালই বংশরক্ষাকারী রাজা ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরীর নাম বৈশালী—

বিশালো বংশকৃদ্রাজা বৈশালীং নির্ম্মমে পুরীম্।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২ অধ্যায় ; রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৮ অধ্যায়)

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—উশীনর-ভ্রাতা তিতিক্ষুর বংশে বলি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গপ্রভৃতি বহু নরপতি উৎপন্ন হন। স্ব স্ব নামানুসারে তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশগুলির নামকরণ করেন—

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্ম-পুণ্ড্রান্ধ্র সংজ্ঞিতাঃ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ॥
চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধ, ২৩ অধ্যায়)

প্রভাস—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল। তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, ধর্ম্মকে দশটী ও চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই সমান রূপলাবণ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এইজন্য অপর পত্নীগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রজাপতি দক্ষ তাহাতে রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইবেন।" দক্ষশাপ-প্রভাবে চন্দ্র রোগগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। ঋষিগণ চন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে পশ্চিম সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হিরণ্য-সরোবর তীর্থে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্র ঐ তীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম প্রভাস—

তত্র চাবভাসিতস্তীর্থে যদা সোমস্তদাপ্রভৃতি চ।
তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্নাখ্যাতং বভূব॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২ অধ্যায়)

বিপাশা (নদী)—বশিষ্ঠপুত্র শক্তির অভিশাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসদেহবিশিষ্ট হইয়া শক্তি ও তাঁহার অনুজদিগকে ভক্ষণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অধীর হইয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হন ও সম্মুখবর্ত্তী নদীতে প্রাণত্যাগ করিবার বাসনায়, আপনাকে পাশদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হন ; কিন্তু নদী মহর্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে তীরে উত্থাপিত করে। বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি ঐ নদীর নাম রাখিয়াছিলেন বিপাশা—

উত্ততার ততঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ।
বিপাশেতি চ নামাস্যা নদ্যাশ্চক্রে মহানৃষিঃ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৭৭ অধ্যায়)

শতদ্রু (নদী)—মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপাশা নদী হইতে উত্থিত হইয়া কাতরতাপ্রযুক্ত একস্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবর পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দর্শন করিয়া জীবনত্যাগ করিবার ইচ্ছায় নদী-প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন ; কিন্তু সরিদ্বরা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুত হইল। এই কারণে ঐ নদীর নাম হইল শতদ্রু—

সা তমগ্নিসমং বিপ্রমনুচিন্ত্য সরিদ্বরা।
শতধা বিদ্রুতা যস্মাৎ শতদ্রুরিতি বিশ্রুতা॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৭৭ অধ্যায়)

ত্রিকূট (পর্ব্বত)—এই পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ তিনটী—একটী স্বর্ণময়, একটী রৌপ্যময় ও একটী লৌহময়। তিনটী প্রধান শৃঙ্গদ্বারা শোভমান বলিয়া পর্ব্বতটীর নাম ত্রিকূট—

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্য্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্।
দিশশ্চ রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৮ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়)

মানস (সরোবর)—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মানস (মনের) সঙ্কল্পদ্বারা একটী সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মানস-সৃষ্ট বলিয়া ঐ সরোবরের নাম হইয়াছিল মানস—

কৈলাসশিখরে রাম মনসা নির্ম্মিতং সরঃ।
ব্রহ্মণা প্রাগিদং যস্মাৎ তদভূন্মানসং সরঃ॥
(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২৭ অধ্যায়)

সিদ্ধাশ্রম—ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া সুমহৎ তপশ্চারণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশ্রম সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল—

এষ পূর্ব্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ।
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো যত্র মহাযশাঃ॥
(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩২ অধ্যায়)

দণ্ডকারণ্য—ইক্ষ্বাকুতনয় দণ্ডের গর্হিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে দণ্ড সামাত্যবলবাহন বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার রাজ্য ভস্মীভূত হইবে। ব্রহ্মশাপপ্রভাবে সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের দেহপাত হয় ও তাঁহার রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া কালে অরণ্যে পরিণত হয়। এই হেতু ঐ স্থানের নাম দণ্ডকারণ্য—

সপ্তাহাদ্ভস্মসাদ্ ভূতঃ স চাপি ব্রহ্মতেজসা।
তস্য দণ্ডস্য বিষয়ো বিন্ধ্যশৈলস্য সানুষু॥
তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
তপস্বিনঃ স্থিতা যত্র জনস্থানমুচ্যতে॥
(রামায়ণ)

নৈমিষারণ্য—রাজা দুর্জ্জয় সসৈন্যে বনভ্রমণ করিতে করিতে একদিন গৌরমুখ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। গৌরমুখ রাজাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সামাত্যবলবাহন নিমন্ত্রণ করেন। আশ্রমে অতিথিসৎকারোপযোগী দ্রব্যাদি না থাকায় মহর্ষি চিন্তিত হইয়া ধ্যানযোগে ভগবান নারায়ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান মহর্ষির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "চিন্তাসিদ্ধি" মণি প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মণিপ্রভাবে আশ্রমে দাসদাসী-পরিবৃত বহু সুরম্য হর্ম্ম্যাদি ও উত্তম ভোজ্যপেয়াদি সমাহৃত হইল এবং রাজার সমক্ষেই মণি হইতে বরাঙ্গনাগণ আবির্ভূত হইয়া রাজার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজা মুনির আতিথ্য-সৎকারে পরম আপ্যায়িত হইয়া, সে রাত্রি আশ্রমে যাপন করিলেন এবং প্রভাতে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া কি উপায়ে ঐ মণি হস্তগত করিতে পারেন তাহা চিন্তা করিতে করিতে নিজ সৈন্যমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ঐ মণি আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী মহর্ষির নিকট রাজার জন্য মণি প্রার্থনা করায়, তিনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। দুর্জ্জয় তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, বলপূর্ব্বক ঐ মণি আনয়ন করিবার নিমিত্ত, এক সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক মণি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে মণি হইতে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্রধারী পরাক্রান্ত সৈন্য বিনির্গত হইয়া সেনাপতিকে নিহত করিল। তখন দুর্জ্জয় স্বয়ং সৈন্যপরিবৃত হইয়া আশ্রম আক্রমণ করিলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, মহর্ষি চিন্তিত হইয়া ভগবান হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় চক্রদ্বারা নিমেষমধ্যে দুর্জ্জয়ের সৈন্যদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন ও গৌরমুখকে বলিলেন, নিমেষমধ্যে সমুদয় শত্রুসৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া এই অরণ্যের নাম নৈমিষারণ্য হইবে—

তেন চক্রেণ তৎ সৈন্যমাসুরং দৌর্জ্জয়ং বলাৎ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ সমগ্রং ভস্মসাৎ কৃতম্॥
এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমেষেণেদং নিহতং দানবং বলম্॥
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেবং নৈমিষারণ্যসংজ্ঞকম্।
ভবিষ্যতি যথার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষকম্॥
(বরাহপুরাণ, ১০—১২ অধ্যায়।)

বিজ্ঞান জগৎ

সূর্য্যের তাপ

§ বৃহস্পতির প্রভাব

-শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

বিজ্ঞানের বর্ত্তমান জ্ঞানানুযায়ী নয়টি গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের পৃথিবী এই নয়টি গ্রহের অন্যতম।
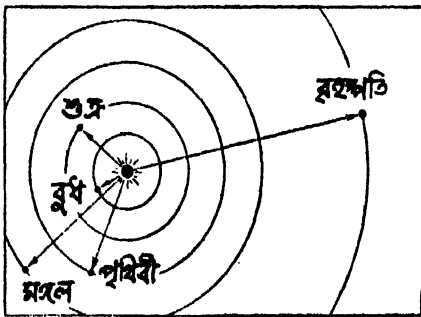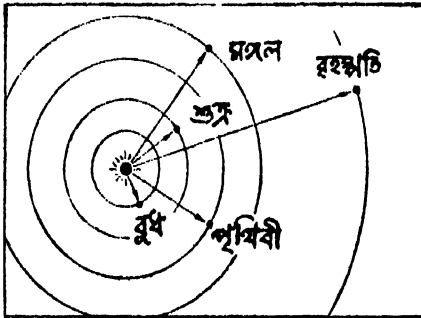
ছবি দুটির উপরটিতে বৃহস্পতি ও অন্য গ্রহগুলি একদিকে থাকায় সূর্য্যতাপ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা: নীচের ছবিতে বৃহস্পতির ক্রিয়া অন্য গ্রহের প্রভাবে মন্দীভূত।

প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্য হইতে তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর অক্ষ তাহার ভ্রমণকক্ষের সহিত তির্য্যক্‌ভাবে স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন ঋতুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু একই ঋতুতে তাপের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, কোনবার অত্যন্ত বেশী গরম পড়ে, কোনওবার বা অপেক্ষাকৃত কম গরম পড়ে।

সূর্য্য হইতে কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যাইতেছে তাহা ডক্টর অ্যাবট (Dr. Abbot) আবিষ্কৃত রৌদ্রমান (pyrheliometer) যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাণ করা যায়। এই যন্ত্রের অনুলেখ (record) হইতে দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে সূর্য্যের তেজোবিকিরণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুত তাহা ঠিক নহে। গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপবৃদ্ধি প্রায় ১০।১১ বৎসর অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সূর্য্যের বৃহত্তম তাপবৃদ্ধির কালের সহিত সৌরকলঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাদুর্ভাবের কাল প্রায় মিলিয়া যায়। সুতরাং সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি ও তাপবৃদ্ধির মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

সূর্য্যের উত্তাপ এত অধিক যে, তাহার দেহের উপর কোন বস্তুই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না। সূর্য্যের উপরিতন স্তর প্রচণ্ড উত্তাপবিশিষ্ট বাষ্পের সমবায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই বাষ্প কোন সময়েই স্থির নাই। সূর্য্যের দেহের উপর সকল সময়ই প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে। এই ঝড়ের প্রভাবে যখন কোন বিশেষ স্থানের উপরিস্থিত বাষ্প সরিয়া গিয়া ভিতরের অংশ দেখা যায়, তখন আমরা তাহাকে সৌরকলঙ্ক বলি। যদি কোন কারণে সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ আলোড়ন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সৌরকলঙ্কের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, সৌরকলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধি সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ তাপ—তথা তেজোবিকিরণের পরিমাপস্বরূপ।

সংপ্রতি জনৈক মার্কিন পূর্ত্তশিল্পী ও জ্যোতির্ব্বেত্তা, এডওয়ার্ড গডফ্রে (Edward Godfrey) সূর্য্যতাপের এইরূপ নিয়মানুগ পুনরাবৃত্তির কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাময়িক সৌরতাপ বৃদ্ধির জন্য সৌর-জগতের সর্ব্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি দায়ী।

কোনও গ্রহের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নহে—দীর্ঘবৃত্তাকার (elliptical), সুতরাং সূর্য্য হইতে কোন গ্রহের দূরত্ব সকল সময়ে এক

থাকিতে পারে না। বৃহস্পতি যখন সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয় তখন উহাদের ব্যবধান ৪৬,০২,৮০,০০০ মাইল; সূর্য্য ও বৃহস্পতির বৃহত্তম ব্যবধান ৫০,৬৩,১০,০০০ মাইল এবং উহাদের গড়-ব্যবধান ৪৮,৩৩,০০,০০০ মাইল।

সূর্য্য ও বৃহস্পতি এত ব্যবধানে থাকিলেও উহাদের মধ্যে মহাকর্ষণজনিত (gravitational) যে বল সৃষ্ট হয়, তাহা অল্প নহে। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই আকর্ষণ বহন করিতে যদি কোন রজ্জুর প্রয়োজন হইত তাহা হইলে ৪০,০০০ মাইল—অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচগুণ—ব্যাসযুক্ত ইস্পাতের রজ্জু প্রয়োজন হইত। এই প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে সূর্য্যের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে গোলাকার থাকিতে পারে না; সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীতে যেরূপ জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়, বৃহস্পতির প্রভাবেও সেইরূপ সূর্য্যের দেহে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, সূর্য্যের দেহের স্ফীতি সেইরূপ বৃহস্পতির সম্মুখে ঘুরিতে থাকে, ফলে সূর্য্যের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন, তথা তাপের সৃষ্টি হয়। সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির ব্যবধান যদি সকল সময়ে একই থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্যতাপের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইত না; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যবধান মোটামুটি ৪৬ কোটি হইতে ৫০॥ কোটি মাইল। নিউটনের নিয়ম অনুসারে মহাকর্ষণের বল ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। দুইটি বস্তু যত নিকটবর্ত্তী হইবে, উহাদের আকর্ষণও তত বেশী হইবে; ব্যবধানের বর্গফলের উপর আকর্ষণ নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যবধান অর্দ্ধেক হইলে আকর্ষণ চার গুণ বৃদ্ধি পাইবে, ব্যবধান তৃতীয়াংশ হইলে আকর্ষণ নয় গুণ বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি।

সুতরাং বৃহস্পতি ও সূর্য্য যখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়, তখন আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সূর্য্যের আলোড়ন কলঙ্ক ও তেজোবিকিরণ বাড়িয়া যায়। প্রায় ১১ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয় সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর গ্রীষ্ম আমরা ১০।১১ বৎসর অন্তর পাইয়া থাকি।

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, সূর্য্যের তাপনিয়ন্ত্রণে বৃহস্পতি প্রধান হইলেও অন্যান্য গ্রহও অল্পবিস্তর সাহায্য করিয়া থাকে। সূর্য্য ও সকল গ্রহের মধ্যেই পারস্পরিক আকর্ষণ আছে, বৃহস্পতির আকর্ষণের ন্যায় তাহা প্রচণ্ড না হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে, বিশেষত যে সমস্ত গ্রহ বৃহস্পতির অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে আছে। যখন এই গ্রহগুলির অবস্থান এরূপ যে, তাহাদের ক্রিয়া ও বৃহস্পতির ক্রিয়া পরস্পরবিরোধী, তখন বৃহস্পতি সূর্য্যের নিকটে থাকিলেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। আবার যদি গ্রহগণের অবস্থান এরূপ হয় যে, তাহারা বৃহস্পতির সহায়তা করে, তখন তাপসৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

বক্ররেখাটি গত ৫০ বৎসরের সূর্য্যতাপের হ্রাসবৃদ্ধি নির্দ্দেশ করিতেছে (ক) বৃহস্পতি সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে (খ) বৃহস্পতি সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা দূরে।

ডিজেলের যুগ

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর তাহা নানা ভাবে মানুষের কাজে লাগান হইয়াছে। যে কোনরূপ যন্ত্র চালাইবার জন্য বাষ্পের আধিপত্য পূর্ব্বে এক প্রকার অক্ষুণ্ণ ছিল। কিছুদিন হইতে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় "টারবাইন" (turbine) ব্যবহার করা হইতেছে এবং তাহা অপেক্ষা আরও অধিকসংখ্যক যন্ত্র পেট্রল দ্বারা চালান হইতেছে। এমন কি আধুনিক কালে পেট্রলের ব্যবহার এত প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহাকে পেট্রল-যুগ বলা কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না।
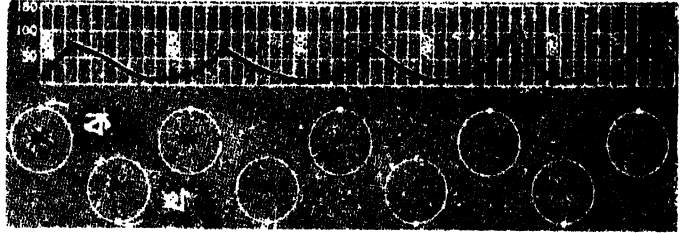
সংপ্রতি আবার পেট্রলের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পেট্রল ও অনেক ক্ষেত্রে বাষ্পেরও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে তৈলচালিত ডিজেল (Diesel) ইঞ্জিন।

ডিজেল ইঞ্জিনের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহাতে পেট্রল-ইঞ্জিনের মত কোন "কার্বুরেটর" (carburetor) প্রয়োজন হয় না এবং পেট্রল বাষ্প জ্বালাইবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা (ignition system) করিতে হয়, তাহার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া ডিজেল-ইঞ্জিনে যে তৈল জ্বালান হয়, তাহা পেট্রলের মত সহজদাহ্য নহে সুতরাং অধিকতর নিরাপদ। ডিজেল-তৈল দামে শস্তা এবং প্রয়োজনও হয় কম, সুতরাং অধিকতর লাভজনক।

এই মোটর গাড়িটি সাধারণ কিন্তু ইহাতে ডিজেল তৈল জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে নলের সাহায্যে তৈল জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে আবিষ্কারক তাহা দেখাইতেছেন। (৭১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইহা ছাড়া ডিজেলের 'দক্ষতাঙ্ক' (efficiency) পেট্রল বা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা অধিক।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ডিজেল ইঞ্জিন এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া সত্বেও তাহার বহুল প্রচার এতদিন হয় নাই কেন? ডিজেল ইঞ্জিনের মূলতত্ব জানিলে তাহার কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

ডিজেলের মূলতত্ব মোটামুটি এই:—সিলিণ্ডারের (cylinder) ভিতর পিস্টন (piston) চলিলে সিলিণ্ডারের মধ্যস্থিত বাতাস সংকুচিত হয়। তাহার ফলে ভিতরের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। (প্রতি বর্গ ইঞ্চি ৫০০—১২০০ পাউণ্ড; সাধারণ বাতাসের চাপ প্রায় ১৫ পাউণ্ড মাত্র)। চাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারের মধ্যস্থিত বাতাসের উত্তাপ প্রায় ১০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠে; তখন সিলিণ্ডারের মধ্যে তৈলের বাষ্প নিষেক করিলে তাহা জ্বলিয়া যায়। তৈল জ্বলিলে নানাপ্রকার গ্যাসের উৎপত্তি হয় এবং তাহার চাপে পিস্টনটি চলে।
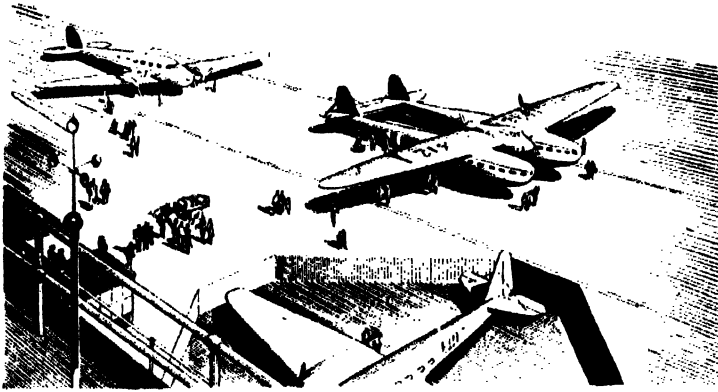
সামুদ্রিক বিমানঘাঁটির কাল্পনিক দৃশ্য: ব্লেরিয়োর পরিকল্পিত নূতন বিমান সম্মুখে দেখা যাইতেছে।

পেট্রল-ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে যে চাপ সৃষ্ট হয়, ডিজেল-ইঞ্জিনে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক চাপ সৃষ্ট হয়, সুতরাং ডিজেল-ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার বহুগুণ মজবুত করা প্রয়োজন। অতএব একই অশ্বক্ষমতার (horse power) পেট্রল ও ডিজেল-ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিতে পেট্রল-ইঞ্জিনের ভার অনেক কম হইবে। ডিজেলের অধিকতর ভার বড় অসুবিধাজনক এবং বিমানচালনায়, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বিমানচালনায় ডিজেল-ইঞ্জিনের বহুল ব্যবহার হইবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এয়ারশিপ-চালনায় (বঙ্গশ্রী শ্রাবণ ১৩৪২ দ্রষ্টব্য) ও সুবৃহৎ এরোপ্লেন-চালনায় ইহা ব্যবহার করা হইতেছে।

ডিজেল-ইঞ্জিনের আরও একটি অসুবিধা এই যে, পেট্রল-ইঞ্জিন অপেক্ষা ডিজেল ইঞ্জিন 'ষ্টার্ট' (start) করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর।

বর্ত্তমান ডিজেল-ইঞ্জিনের পূর্ব্বগামী হিসাবে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি দুইজন আমেরিকান দুইটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। ইহার মধ্যে একটি কিছু দিন চলিবার পর ফাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কারকও প্রাণ হারান। এই যন্ত্রে কয়লার গুঁড়া জ্বালান হইত।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডক্টর রুডলফ ডিজেল (Dr. Rudolf Diesel) নামক জনৈক জার্ম্মাণ তাঁহার ইঞ্জিন নির্ম্মান ও প্রদর্শন করেন। দুঃখের বিষয় এই ইঞ্জিনটিও ফাটিয়া যায়, কিন্তু ডিজেল প্রাণে বাঁচিয়া যান। এই যন্ত্রটিতেও কয়লার গুঁড়া জ্বালান হইত।

এই ডিজেলের নামানুসারেই ডিজেল-ইঞ্জিনের নামকরণ করা হইয়াছে। ডিজেল জাতিতে জার্ম্মান হইলেও ফরাসী দেশে প্যারীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি প্যারীতে এক বরফের কলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া তিনি তাঁহার ইঞ্জিনের সফলতার সম্ভাবনা প্রদর্শন করেন।

দুর্ঘটনার পর হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া ডিজেল কয়লার গুঁড়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার ইঞ্জিনে তৈল জ্বালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া যান। তাঁহার নূতন ইঞ্জিন সম্পূর্ণ হইলে জার্ম্মাণীতে আউগসবুর্গ (Augsburg) নামক স্থানে অবস্থানকালে অ্যাডল্‌ফাস্ বুশ (Adolphus Busch) নামক আমেরিকানের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। বুশ ডিজেল-ইঞ্জিনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশান্বিত হন এবং ডিজেলের 'পেটেণ্টের' (patent) আমেরিকান স্বত্ব ক্রয় করেন।

বুশ ডিজেল-ইঞ্জিন আমেরিকায় প্রচলন করিবার চেষ্টা করিলে ইঞ্জিনিয়ারগণ যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন, কিন্তু কারখানা নির্ম্মাণ করিবার টাকা দিতে পারেন এরূপ ধনী লোকেরা পেটেণ্টের 'রয়ালটি' (royalty) ফাঁকি দিবার মতলবে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন—যতদিন না পেটেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হয়।

ডিজেলের পেটেণ্টের সময় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হয় এবং ডিজেল তাহাতে এতদূর দমিয়া যান যে, পরের বৎসর ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার সময় চলন্ত জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের আরম্ভের সময় হইতেই ডিজেল-ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা বিশেষভাবে হইতে থাকে এবং বহু ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে ডিজেল-ইঞ্জিন তাহার বর্ত্তমান রূপ ও কার্য্যক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে রেলগাড়ী, নানা আকারের ছোট ও বড় জাহাজ, এয়ারশিপ, এরোপ্লেন, পাম্প এবং সর্ব্বপ্রকার কুলিযন্ত্র প্রভৃতি চালাইতে ডিজেল-ইঞ্জিনের ব্যবহার হইতেছে। অদূরভবিষ্যতে ডিজেল-ইঞ্জিনের ব্যবহার আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া ইঞ্জিনিয়াররা মত প্রকাশ করেন এবং আমাদের জীবৎকালেই হয়ত পেট্রল-ইঞ্জিন দেখিতে হইলে যাদুঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

সামুদ্রিক বিমানঘাঁটির পরিকল্পনা

লুই ব্লেরিয়ো (Louis Bleriot) জনৈক বিখ্যাত ফরাসী বৈমানিক। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল এরোপ্লেন সাহায্যে পার হন।

তিনি এখন একজন বিখ্যাত বিমান-নির্ম্মাতা এবং বিমানসাহায্যে সাগর পারাপারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। তাঁহার নির্ম্মিত "ফ্লাইং বোট" (flying boat) সাঁতো-দুমাঁ (Santos-Dumont)
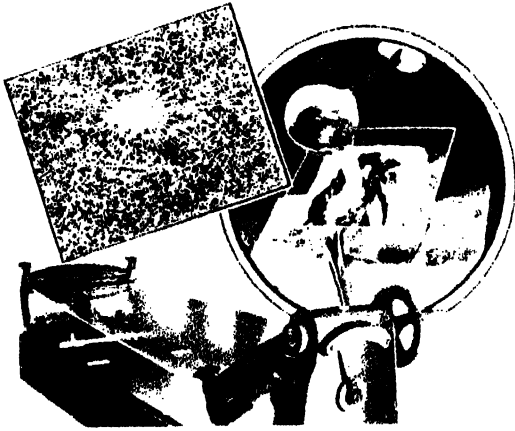
উপরে বামে—দৃঢ় কাঁচ এই ভাবে ভাঙ্গিয়া যায়; উপরে দক্ষিণে—বরফের উপর একখণ্ড কাঁচ রাখিয়া তাহার উপর গলিত সীসা ঢালা হইতেছে, নীচে—একখণ্ড দৃঢ় কাঁচ ২০ ডিগ্রি বাকান হইয়াছে।

১৫বার দক্ষিণ আটলাণ্টিক পারাপারে রেকর্ড স্থান পাইয়াছে। ব্লেরিয়োর কারখানায় সাধারণ ও সামরিক দুই প্রকারেরই এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতেছে।

ফরাসী সরকারের সহযোগিতায় ব্লেরিয়ো সংপ্রতি একপ্রকার নূতন বিমানের পরিকল্পনা শেষ করিয়াছেন। ইহাকে "ফ্লাইং বোট" বা "সি প্লেন" (বঙ্গশ্রী, আষাঢ় ১৩৪২ দ্রষ্টব্য) কোনটিই বলা চলে না; ব্লেরিয়ো ইহার নাম রাখিয়াছেন "avion marin" (marine aeroplane) বা সামুদ্রিক এরোপ্লেন। ইহাতে প্রায় ১০০ ফুট লম্বা ডানা থাকিবে এবং তাহা হইতে দুইটি তিমির আকারের যাত্রী ও মাল বহন করিবার কক্ষ থাকিবে। এরোপ্লেনের পাখা ও ইঞ্জিন পিছনে বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার এই নূতন বিমান মুখ্যতঃ আকাশে চলিবার জন্য নির্ম্মিত হইলেও নির্ব্বিঘ্নে জলের উপর নামিতে পারিবে।

ব্লেরিয়োর মতে বিমানে সাগর-পারাপারের প্রধান অসুবিধা দুইটি। প্রথম প্রায় তিন হাজার মাইল বিমান চালাইবার জন্য যে পরিমাণ জ্বালানী তৈল বহন করিতে হয়, তাহাতে মাল ও যাত্রী বহন করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যায়। দ্বিতীয়, তিন হাজার মাইলের মধ্যে কোন অবতরণক্ষেত্র না থাকায় যাত্রীদের মনে স্বভাবতঃই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে এবং ফলে অধিক যাত্রী পাওয়া সম্ভব হইবে না।

ব্লেরিয়োর মতে এই দুইটি অন্তরায় দূর করিতে হইলে মার্কিন আবিষ্কারক আর্মষ্ট্রং (Armstrong) পরিকল্পিত সামুদ্রিক বিমানঘাঁটি (seadrome) স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ব্লেরিয়ো ও আর্মষ্ট্রং দুই জনের সহযোগিতার ফলে সামুদ্রিক বিমানঘাঁটির পরিকল্পনা এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে, অদূরভবিষ্যতে ইহার স্থাপনার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যাঁহারা বায়োস্কোপে এফ. পি. ওয়ান (F. P. 1,—floating platform 1) দেখিয়াছেন, তাঁহারা ব্লেরিয়োর পরিকল্পনা বুঝিতে পারিবেন।

নূতন কাচ

সাধারণ কাচ অপেক্ষা ছয় গুণ দৃঢ়তর এক প্রকার নূতন কাচ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ কাচ অত্যন্ত ধীরে ধীরে শীতল করা হয়, কিন্তু এই নূতন কাচ প্রস্তুত করিতে ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়াছে। একটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লীতে কাচের উপকরণগুলি গলান হয় এবং সেগুলি নমনীয় হইলে হঠাৎ বাতাসপ্রয়োগে কাচ শীতল করা হয়। ফলে এই কাচের উপরিভাগ সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং ভিতরে যথেষ্ট চাপ ফলিত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ কাচ সাধারণ কাচ অপেক্ষা অনেক অধিক ঘাতসহ। একখণ্ড কাচ বরফের উপর স্থাপিত করিয়া উপরে গলিত সীসা ঢালিলে ইহা ভাঙ্গিয়া যায় না, কিন্তু কোন সাধারণ কাচ এইরূপ উত্তাপ-বৈষম্য সহ্য করিতে পারে না। এই কাচের উপর চাপ দিলে ইহা বাঁকিয়া যায় কিন্তু ভাঙ্গে না। একটি পরীক্ষায় একখণ্ড কাচকে ২০ ডিগ্রি (degree) পাকান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। আর একটি পরীক্ষায় ৩ ফুট উঁচু হইতে একটি একসের ওজনের ইস্পাতের গোলা ও প্রায় পাঁচ সের ছররা সিকি ইঞ্চি পুরু কাচের উপর ফেলা সত্ত্বেও তাহা অক্ষত ছিল।

এই কাচের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহা কাটা চলে না, কাটিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এই নূতন কাচ ভাঙ্গিবার সময় সাধারণ কাচের ন্যায় তীক্ষ্ণ খণ্ডে ভাঙ্গে না, সমস্তটি একসঙ্গে টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং এই

পারীর শহরতলীতে ব্যবহৃত দুই তলা রেলগাড়ী।

খণ্ডগুলি প্রায় মসৃণ থাকে। এই প্রকার কাচ অনেক নূতন কাজে ব্যবহার করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দুই তলা রেলগাড়ী

পারী শহরের শহরতলীর যাত্রী বহন করিবার জন্য একপ্রকার দুই তলা

রেলগাড়ীর প্রচলন হইয়াছে। সাধারণ রেলগাড়ীর মত উঁচু এই গাড়ীগুলি আগাগোড়া ধাতুনির্ম্মিত। গাড়ীর প্রথম তলাটি প্ল্যাটফরমের কিছু নীচে—দরজা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে হয়; উপরে উঠিবার জন্য আর একটি সিঁড়ি আছে। সাধারণ দৈর্ঘ্যের লোক অনায়াসে হাঁটিতে পারে, প্রত্যেক তলার উচ্চতা এরূপ করা হইয়াছে। এই গাড়ীর প্রচলন হওয়াতে একই গাড়ীতে পুর্ব্বের দুই গুণ যাত্রী বহন করা সম্ভব হইয়াছে।

চালকহীন এরোপ্লেন

"কুইন বি" (Queen Bee) নামক বৃটিশ এরোপ্লেনের চালকহীন পরিচালনার সাফল্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে।

এই চালকহীন এরোপ্লেন "কুইন বি" দেখিতে সাধারণ এরোপ্লেনের মত।

এরোপ্লেনটিতে কোন চালকের প্রয়োজন নাই, যদিও পরীক্ষার সময়ে ইহাতে একজন চালক ছিল, কোন আকস্মিক বিপদ হইতে ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। মাটি হইতে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে ইহা দশ হাজার ফুট উপরে উঠিতে পারে; ইহাকে ২০ মাইল ব্যাসের মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুরান ফিরান যাইতে পারে।

এরোপ্লেনটির আকৃতি সাধারণ এরোপ্লেন হইতে কোন অংশেই ভিন্ন নহে। ভবিষ্যতে যুদ্ধকার্য্যে এইরূপ বিমান বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

শব্দ ও দুগ্ধ পরিপাক করিবার ক্ষমতা

শব্দের সহিত দুগ্ধ পরিপাক করিবার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সংপ্রতি জনৈক মার্কিন চিকিৎসক শব্দতরঙ্গের সাহায্যে দুগ্ধকে অধিকতর সহজপাচ্য করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

শরীরের অভ্যন্তরে যাইয়া দুগ্ধ ছানায় রূপান্তরিত হয়; এই ছানার দানাগুলি কঠিন হইলে পরিপাক করিতে অধিক সময় লাগে, কিন্তু ছানার দানাগুলি নরম হইলে সহজেই হজম করা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও গরুর দুধ হইতে নরম এবং কোনও গরুর দুধ হইতে কঠিন ছানা পাওয়া যায়, সুতরাং বাজারের মিশ্রিত দুগ্ধ পরিপাক করা শিশুদের ও রুগ্ন লোকের পক্ষে অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

বৈদ্যুতিক প্রভাবে একটি ইস্পাতের পাত প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬০ হইতে ৩০০০ বার আন্দোলিত করিয়া তাহার উপর দিয়া দুগ্ধের ধারা নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে দুগ্ধের প্রকৃতি কিছু পরিবর্ত্তিত হয় এবং ইহা হইতে জাত ছানা নরম হয়; কাজেই ইহা পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

শত্রুনির্ণয়ে নূতন রশ্মিপ্রয়োগ

বিপক্ষ জাহাজের গতিবিধি ও অবস্থান নিরূপণ করিবার জন্য আমেরিকায় এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং গোপনে বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ২০ মাইল দূর হইতে অন্ধকার রাত্রে জাহাজের নির্ভুল অবস্থান নিরূপণ করিতে ২০ বারের মধ্যে ২০ বারই ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছে। পরীক্ষার সময়ে অবশ্য জাহাজের উপর আলোক ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অন্ধকারে অনালোকিত জাহাজের উপর এইরূপে গোলাবর্ষণ করা সম্ভব হইবে। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল অবশ্য গোপন রাখা হইয়াছে, কিন্তু বোধহয় জার্ম্মানীতে তৈয়ারী এরোপ্লেনের অবস্থান নিরূপণ করিবার যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

জার্ম্মান যন্ত্র অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এরোপ্লেনের অভিমুখে এক গুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি প্রয়োগ করিলে এরোপ্লেনে প্রতিহত হইয়া রশ্মিগুচ্ছ আলোকের ন্যায় প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মি কোন্ স্থানে পড়িতেছে, তাহা হইতে এরোপ্লেনের অবস্থান সঠিক ভাবে জানা যায়।

বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র

সংপ্রতি রাশিয়ার ক্রিমিয়া অঞ্চলে বাতাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের চেষ্টা সফল হইয়াছে। ৮০ ফুট উঁচু একটি ইস্পাতের স্তম্ভের (tower) উপর একটি বৃহৎ "উইণ্ডমিল" (windmill) স্থাপন করা হইয়াছে। উইণ্ডমিলের পাখাগুলির প্রত্যেকটি ১০০ ফুট করিয়া দীর্ঘ।

স্তম্ভের উপর একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেখানে ১০০ "কিলোওয়াট" (kilowatt) পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে এরূপ একটি যন্ত্র বসান হইয়াছে। উইণ্ডমিলের পাখাগুলি নির্দ্দিষ্ট বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে যন্ত্রটি আপনিই চলিতে আরম্ভ করে এবং বাতাসের বেগ মন্দীভূত হওয়ার ফলে উইণ্ডমিলের বেগ কমিয়া গেলে যন্ত্রটি আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। রাশিয়ান সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহার দশগুণ অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে এরূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। শীঘ্রই সমস্ত ক্রিমিয়া প্রদেশে এরূপ বহুসংখ্যক যন্ত্র স্থাপন করা হইবে এবং অদূরভবিষ্যতে ২,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বাতাস হইতে উৎপাদন করা হইবে।

একচাকাযুক্ত মোটর সাইকেল

ক্যালিফোর্নিয়ায় (California) সংপ্রতি এক প্রকার এক চাকাযুক্ত মোটর সাইকেল নির্ম্মিত হইয়াছে। মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনটি মাত্র এক সিলিণ্ডার (cylinder) যুক্ত। ইহাতে একটি চাকার মধ্যে আর একটি চাকা আছে এবং ইঞ্জিনের সাহায্যে মাত্র বাহিরের চাকাটি ঘুরে। ইহার

মোড় ফিরাইবার কৌশল গোপন রাখা হইয়াছে, কিন্তু গাড়ীটি মোড় ঘুরিবার সময় আরোহী একদিকে কাত্ হইয়া না গিয়া সোজা বসিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ পেট্রল ও তৈলচালিত মোটরগাড়ীতে খরচ অনেক কম পড়ে কারণ পেট্রল অপেক্ষা জ্বালানী তৈল অনেক শস্তা।

তৈলসাহায্যে মোটরগাড়ী চালাইবার নূতন ব্যবস্থা

মোটরগাড়ীতে সাধারণতঃ পেট্রল জ্বালান হইয়া থাকে, কিন্তু মোটরগাড়ীতে ডিজেল-ইঞ্জিনে (Diesel engine) ব্যবহৃত জ্বালানী তৈল ব্যবহার করিতে পারিলে মোটরগাড়ী চালান'র ব্যয় অনেক সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। সাধারণ মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন তৈল জ্বালাইবার উপযোগী নহে—ডিজেল-ইঞ্জিন ও মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের নির্ম্মাণ-কৌশল বিভিন্ন।

মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন না বদলাইয়া যাহাতে ডিজেল তৈল ব্যবহার করা চলে, তাহার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে তৈলের জন্য একটি স্বতন্ত্র আধার স্থাপন করা হইয়াছে, তথা হইতে 'কার্বুরেটরে' (carburetor) যাইবার পথে তৈলবাহী নলটি নির্গম-নলের (exhaust pipe) উপর জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে কার্বুরেটরে যাইবার সময় তৈল উত্তপ্ত হইয়া যায় এবং কার্বুরেটরের মধ্যে 'র‍্যাডিয়েটর' (radiator) হইতে নির্গত জলীয় বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

প্রথমে চালাইবার সময় পেট্রল-ইঞ্জিনই চালান হয়, তাহার পর ইঞ্জিন গরম হইলে পেট্রল বন্ধ করিয়া তৈল ব্যবহার করা হয়। গাড়ী থামাইবার পূর্ব্বে তৈল বন্ধ করিয়া পুনরায় পেট্রল ব্যবহার করা হয়, কারণ তাহাতে কার্বুরেটর পরিষ্কার থাকে।

এক চাকাযুক্ত মোটর সাইকেল।

প্রেমের জয়

—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

ফুলকলি হিয়া সবলে দলিয়া চলিয়া গিয়াছে গরবমত্ত,
বায়ু বলবান; মিছে অভিমান মিছে বল তার মিছে বীরত্ব!
ফুলমধু আর সৌরভে তার
কই, কিছুই তো নাহি অধিকার
ভালবাসা দিয়া হৃদয় কিনিয়া অলি বুঝিয়াছে ফুলের তত্ব।

মানব-শোণিতে রাঙায়ে ধরণী অসি দিয়ে যারা জিনিল রাজ্য
তারা কেহ নয় রাজ্যের প্রভু তাহাদেরে কেহ করে না গ্রাহ্য।
জুলিয়া সীজার মিশেছে ধূলায়,
সেকেন্দরের তক্ত কোথায়?
অযুত হৃদয় ভরিয়া বিরাজে বুদ্ধ-গোরার প্রেম-রাজত্ব।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[১৯]

গ্রীষ্মের খররৌদ্র তাপ কমিয়া আকাশে পূর্ব্বমেঘের সঞ্চার হইয়াছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে আষাঢ়ের দিনগুলি নৃত্যছন্দে কাটিয়া চলিয়াছে, দিন রাত কেবল রিম ঝিম রিম ঝিম।

পানুর গৃহে তাহার ক্ষুদ্র শয্যাটিতে এলোমেলো অসংখ্য বহির মাঝখানে কোন মতে একটুখানি স্থান করিয়া, সন্ধ্যার পরই পানু আসিয়া শুইয়া পড়িল; কিছুক্ষণ পরে নিতান্তই অবহেলার সহিত দুই একখানা বহির পাতা খুলিয়া দেখিয়া, একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে বহিগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মুদিত নেত্রে চুপ করিয়া পানু শুইয়া রহিল এবং বাহিরের ঐ রিম ঝিম তালের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

টেবিলটি প্রায় খালি করিয়া ক্রমে ক্রমে কখন যে বহিগুলি সব শয্যার উপর গিয়া উঠিতেছে, সে দিকে পানুর খেয়ালই নাই, এই স্তূপীকৃত বহির ভিতর হইতে, প্রয়োজনীয় খানা সকল সময়ে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বিরক্ত চিত্তে পানু সেই বেলাটা পড়া বন্ধ করিয়া শুইয়াই কাটাইয়া দেয়, আর তাহার পর একটির বদলে আর একটি আসিয়া, খাটের জঞ্জাল না কমিয়া কেবল বাড়িতেই থাকে।

কলেজে ক্লাসের পড়া অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, নানা ত্রুটিতে পানুর কেবলই বিলম্ব হইয়া যায় এবং পরে সেই পুরানো পাতাগুলি খুলিয়া দেখিতে পানুর আর ইচ্ছা হয় না, ক্লাসে আসিয়া বসে, ও কেমন একটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে প্রোফেসারের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে,—এই ছেলেটি যে কিছুই বুঝিতেছে না বা যা কিছু পড়া হইতেছে, ইহার কানে সে সব কিছুই ঢুকিতেছে না, প্রোফেসার তাহা বুঝিতে পারেন। এই আপনভোলা অতি সুন্দর ছেলেটিকে অনেক প্রোফেসারই সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখেন এবং কেন যে সে বুঝিতেছে না, অন্য কোন প্রকারে তাহার পড়ার সাহায্য করা সম্ভব কি না, সে সম্বন্ধে মনে মনে ভাবিয়াও থাকেন, কিন্তু পানুর দিক হইতে কোন আগ্রহই প্রকাশ পায় না। পানু কলেজে যায়, বাড়ী ফিরে এবং স্তূপাকার বহি ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নূতন গৃহে পানুর জীবন এই ভাবেই কাটিতে লাগিল।

মাঝরাত্রিতে পানুর ঘুম ভাঙিয়া গেল, বাহিরের ঐ রিম ঝিম তান তখনও চলিতেছে, শয্যায় শুইয়া শুইয়াই পানুর মনে পড়িল, রাত্রিতে ত খাওয়া হয় নাই তাহার, ঐ ত ছোট টেবিলটার উপর খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তা থাকুক, এত রাত্রিতে কে আর এখন ঐগুলি চিবাইতে বসিবে! প্রথম প্রথম যত রাত্রিই হউক, অধরবাবু হইতে ঠাকুর চাকর সকলেই তাহার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও বোধ করিয়া করিয়া এখন এ বিষয়ে পানুর কড়া নিষেধই ছিল,—অবশ্য তেমন ব্যাকুল কোমল আগ্রহ কাহারই বা আর আছে, তেমন দায়ই বা আর কাহার!

শয্যা ত্যাগ করিয়া পানু জানালার পাশে আসিয়া বসিল, ঝর ঝর বৃষ্টির ধারা অবিশ্রান্ত ভাবে কেবলই ঝরিতেছে!—বাগানের গাছগুলি, গাছের ফুলগুলি, লতাপাতা ও নূতন ছোট ছোট চারাগাছগুলি বৃষ্টির তীক্ষ্ণ আঘাতে নুইয়া পড়িয়াছে, সদ্য ঘুমভাঙ্গা পানু তাহার শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল—এমন কত রাত্রিতেই পানুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, জানালায় আসিয়া বসিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া দেখে, অন্ধকার আকাশে প্রলয়ের ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, বাড়ীঘর কাঁপাইয়া গাছপালা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া হা হা রবে একটা ঝড়ো-হাওয়া পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, পানু ধীরে ধীরে টেবিলের উপর হইতে তাহার বাঁশীটি তুলিয়া লয় এবং বাহিরের এই ঝড়ো-হওয়ার ভিতর দিয়া একটি কোমল সুর কত দূর দূরান্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে ঝড় কখনও থামিয়া গেলে পূব-আকাশের শুক-তারাটি অত্যন্ত মলিন নিষ্প্রভ জ্যোতিতে পানুর চোখের সম্মুখে

ফুটিয়া উঠে, ক্লান্ত পানু বাঁশীটি তখন নামাইয়া রাখিয়া টেবিলের উপরেই মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অহিংস অসহযোগের যুগ,—পুরুষ ত দূরের কথা, পথে পথে ঘুরিয়া মেয়েরা পর্য্যন্ত সেদিন যে কাণ্ড করিলেন, তাহাতে কলেজের কোন ছাত্রেরই মাথা সহজে ঠিক থাকিতে পারে না। কিন্তু এমন অবস্থায়ও পিতামাতার ভয়ে যে সব ছেলেরা সহজে কলেজ ছাড়িয়া অসহযোগীর দলে ভর্ত্তি হইতে পারিল না, তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেক সহরে, নিজের নিজের পাড়ায় এবং সহর হইতে দূরে নিজেদের পল্লীগ্রাম-গুলিতে নানা রকম সৎশিক্ষা বিস্তার করিবার পণ গ্রহণ করিল; পানুও ইহাদেরই দলে যোগদান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের মনটিকে সচেতন করিয়া তুলিল এবং ক্রমে ক্রমে বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদরটি হইতে আরম্ভ করিয়া পান্নালালের পরে ধুতি-পাঞ্জাবী পর্য্যন্ত সমস্তই খদ্দরের মোটা আকার ধারণ করিল।

ছেলেবেলা হইতেই পান্নালালের ঠিক কর্ত্তব্যকর্ম্মটিতে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখা না গেলেও অ-কর্ত্তব্যটিতে নিষ্ঠা ছিল অতি প্রগাঢ়, ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে তাহার বহির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়া গেল। বাড়ী হইতে যথানিয়মে টাকাকড়ি আসিতে এবং কলেজে মাহিনা দিতেও তাহার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ঐ টুকুই শুধু তাহার কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক রহিল এবং এমনি করিয়া, যেখানে পানু মাত্র ক্ষুদ্র একটি সভ্য হইয়া ঢুকিয়াছিল, বছরখানেকের মধ্যেই সে তাহারই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল।

দেশে থাকিয়া পিতা এ সকলের কিছুই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু বিনয়বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী সকল কিছুই শুনিতে পাইলেন এবং একদিন তাহাকে বাড়ীতে ডাকাইয়া একটু বুঝাইবার প্রয়াসও পাইলেন। পানু নত মস্তকে তাহা শুনিল মাত্র। কিন্তু তাহাতে তাহার এই নূতন স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

সম্প্রতি বড় রকমের একটি খেতাব পাইয়া বিনয়বাবু উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন, নিজের জীবনটাকে কোন রকমে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানলাভে কাটাইয়া যাওয়াটাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন,—যে দুঃখী, দুঃখ তাহার প্রাপ্য বলিয়াই যে সে দুঃখী, মানুষ যে কেন এই সাধারণ কথাটি বুঝিতে পারে না, ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন। অনাথ কাঙ্গাল আতুর যাহারা, ভগবানের শাস্তিই তাহারা বহন করিতেছে, তাহাদের অভাব দূর করিতে পারে, মানুষের এমন কি ক্ষমতা আছে। তবু কেন এই অসন্তোষের কোলাহল—ভাবিয়া তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন হইত। পানু ছেলেটা এই বয়সে এই সব বাজে কাজে যোগ দিয়াই যে নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। তাঁহার এই বিরক্তি পানুর অজানা ছিল না, তাই মীরার মা নিতান্তই জোর করিয়া বলিয়া না পাঠাইলে, এ বাড়ীতে সে আর আসিতই না।

মাঝে মাঝে মীরার মা মৃদু অনুযোগ করিয়া কহিতেন, পানু, কি করে' এমন পর হয়ে গেলি, আমি ত ভাবতেই পারি না।

পানু হাসিয়া কহিত, মা তোমার বাগানে একটা আগাছার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে গেছে, এখন কেমন সুন্দর সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দেখতে', এর আবার ভাববার কি আছে মা?

মার বুকে আঘাত লাগিত, পাষাণের এই নিষ্ঠুর বাক্যের উত্তর আর কিছু মনে আসিত না।

মা মাঝে মাঝে কহিতেন, পানু, কত সময় যে ভাবি তোর কথা, লোকের কাছেও কত কথাই শুনি, কি কাজ তোর ঐ মেথর-পল্লী, মুচী-পল্লী ঘুরে ঘুরে নাইট-স্কুল করবার? দেশে এত শিক্ষিত লোক হয়েছে, কোন্ দুঃখটা তাদের দূর হয়ে গেছে শুনি, এদের লেখাপড়া শিখিয়েই বা কোন্ দুঃখটা তোরা দূর করতে পারবি? একখানা বই পড়তে শিখলেই কি এরা জ্ঞানী হয়ে উঠবে? এর চেয়ে বেশী করবার ক্ষমতাই বা কোথায় তোদের? তোদেরই বা কতটা জ্ঞান হয়েছে বল ত আমায়? মাঝে থেকে নিজেদেরও সময় নষ্ট, আর এদেরও সর্ব্বনাশ।

বিস্মিত পানু কহিত, সর্ব্বনাশ!

—সর্ব্বনাশ নয়ত কি? একখানা দুখানা বই পড়ে এদের তখন বিদ্বান বলে অহঙ্কার হয়ে পড়ে, সেই অহঙ্কারে বাপ-ঠাকুর্দ্দাকে করে ঘেন্না, নিজের ব্যবসার উপর আসে ঘেন্না, এ আমি কত দেখছি, তুই আমায় কি বুঝাবি পানু? তোর

চেয়ে বয়সে যে আমি বড়, অনেক দেখেছি চারধারের সব, সেটা ত অস্বীকার করতে পারবি না ?

পান্নু উত্তর দিত না, চুপ করিয়া ভাবিতে থাকিত—

মা কহিতেন, তারপর শুনলাম সেদিন কার কাছে, কোথায় কোন্ অনাথাশ্রম হবে না কি হবে, তার জন্য রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে তুই চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছিস। কি কাজ তোর এ সবে পান্নু, যাদের যেমন কর্ম্মফল তেমন ভাবেই তাদের জীবন যাবে, মাঝে থেকে পরিশ্রম করে ঘুরে মরাই তোদের কেবল সার, ঈশ্বরের বিধান কি মানুষে উল্‌টিয়ে দিতে পারে ? এ সহজ কথাটা কেন বুঝিস না বাবা ?

পান্নু হাসিয়া কহিত, কি করে বুঝব মা, ছেলেবেলা থেকে তুমিই ত শিখিয়েছিলে গরীব-দুঃখীর উপকার করতে হয়, কত ভিক্ষুককে ডেকে কতদিন তুমি ভাত দিয়েছ, পয়সা দিয়েছ, যার কাপড় নেই, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে কাপড় দিয়েছ, একদিন তুমি যাকে কাপড় দিয়েছ, আজ বড় হয়ে তার জন্যে আমি যদি ঘরের সন্ধান করতে বেরুই, তা হলে ঈশ্বরের বিধান তখনও যদি উল্‌টিয়ে যায় নি, এখনই বা যাবে কেন ?

অপ্রস্তুত হইয়া মা চুপ করিয়া থাকিতেন, একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, পরের দুঃখ দূর হোক এ কামনা তাঁরও আছে, কিন্তু সে জন্য যদি নিজের ছেলেটিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে আর তিনি তাহা চাহেন না।

বিনয় বাবু গৃহে না থাকিলে পান্নুর এই ভাবে মায়ের সঙ্গে কথোপকথন আরও খানিকক্ষণ চলিত। এটা সেটা বলিয়া মা আবার পূর্ব্ব কথার খেই ধরিয়া কহিতেন, পান্নু, দূরে চলে গেছিস বলেই কি আর আমার কথা শুনতে নেই ? একটু লেখাপড়া কর বাবা, মানুষের মত মানুষ হ, আমরা সবাই ত তাই চাই। আজ যদি তোর মা থাকতেন, এমনি করে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলতে কি আর দিতেন তিনি ?

পান্নু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল করিয়া কহিত, আমার মা যদি আজ থাকতেন মা, তা হলে জোর করে তাঁকে আমার মতেই আমি টেনে আনতুম, আমার মা যদি সত্যিই থাকতেন, সংসারে আমার আরও কত কাজ হত মা,—

নিষ্ঠুর পাষাণ অকৃতজ্ঞের কথা শুনিয়া মার ব্যথিত মাতৃস্নেহে গভীর আঘাত লাগিত, নীরবে তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতেন। পান্নু উঠিয়া মীরার সন্ধানে যাইত, মীরা সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত, কখনও ছোকরা চাকরটাকে লইয়া পিতার বাহির হইতে ফিরিয়া পরিবার কাপড়-চোপড়-গুলি গুছাইয়া রাখিতেছে, কখন ঝাড়ন হাতে টেবিল চেয়ারগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া চক্‌চকে করিতেছে, কখনও বা নীচে ঠাকুরকে কোন একটি তরকারী রান্না দেখাইয়া উপরে উঠিতেছে, তেমনই চঞ্চল পরিহাসমুখরা হাসিখুসী ভাব।

পড়িবার ঘরে মীরা তাহার ড্রয়ার খুলিয়া গুছাইতে বসিয়াছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল—এস পান্নু দা।

একটি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পান্নু কহিল, খুব ব্যস্ত দেখছি যে !

হাঁ, নিজের কাজেই ব্যস্ত আছি, তোমার মত পরের উপকার করতে এখনো শিখিনি।

পান্নু হাসিল, মীরা কহিল, শুনছি খুব দেশের উপকার করে বেড়াচ্ছ, নিজের উপকারও যদি কিছু কিছু করতে, তাহলে খুসী হতাম পান্নু দা।

মীরার কাছে আসিলে পান্নুর বক্তৃতা করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া আসে, সুতরাং চুপ করিয়াই থাকে। সময় যায়—দুই জনেই চুপ করিয়া থাকে, একজন ড্রয়ার ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে থাকে, আর একজন চুপ করিয়া তাহাই দেখিতে থাকে। ড্রয়ার মোছা শেষ করিয়া মীরা টেবিল সাজাইতে আরম্ভ করিল, পান্নু আরও খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, চললাম।

—বস, বস, এত তাড়া কিসের, দেশের উপকার করবার সময় তোমার নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, লেখাপড়া নেই, বলবার কেউ নেই, আজকাল ত অগাধ অফুরন্ত অঢেল সময় তোমার।

—কে বললে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, যে মুহূর্ত্তটি যায় সে আর ফিরে আসে না, তা জান ?

—তা জানি, আর জানি বলেই একটা কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছে, রাখবে কথাটি দয়া করে ?

—বল শুনি, তারপর দেখা যাবে।

একটু আহত হইয়া মীরা কহিল, পান্নু দা, ছেড়ে দাও এ সব, আবার পড়া আরম্ভ করে দাও, পরীক্ষা দাও, পাশ কর।

—সে শক্তি আর নেই।

—কে বললে নেই? সব রকম গোলমাল ছেড়ে দিয়ে আবার এ বাড়ীতে এস, আবার তোমার সব হবে।

খানিকক্ষণ অভিভূতের মত তাকাইয়া থাকিয়া পানু কহিল, সে আর হয় না মীরা।

—হবে, পানু দা এস,—

—না, না, অসম্ভব; আর তা হবে না।

সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিতে নামিতে পানু নীচে একেবারে মায়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, মা কহিলেন, যাস নি পানু, খেয়ে যা।

—না মা, ঠাকুর-চাকররা বসে থাকবে সব।

পানু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

[২০]

যে ঠাকুর-চাকরের কথা বলিয়া পানু বাহির হইয়া আসিল, রাস্তায় আসিয়া তাহাদের কথা তাহার আর মনেও রহিল না। এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ছোট একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল, দ্বার খোলাই ছিল, ভিতরে ছোট একটি টেবিলের পাশে দুইটি চেয়ারে বসিয়া দুইটি ছেলেমেয়ে পড়িতেছিল, পানু আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

—কি করছ সুশীল? এগজামিনের পড়া?

—হাঁ ভাই। সময় আর কই, দিন ত ক্রমে এগিয়ে আসছে, বস, কোন্ দিক জয় করে এলে আজ, ভীষণ এক্সাইটেড দেখা যাচ্ছে যে।

মেয়েটি তাহার বই গুছাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে পরদা সরাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ঘরের একপাশে একখানা তক্তপোষে সতরঞ্চি পাতা ছিল। পানু সেটায় গিয়া শুইয়া পড়িয়া ভূমিকা মাত্র না করিয়া কহিল, সুশীল আমায় তুমি পড়িয়ে দাও, তোমার কাছে আমি পড়ব, এগজামিন দেব।

সুশীল একটু অবাক হইয়া পান্নালালের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, হঠাৎ এ দুর্ম্মতি কেন?

পানু উত্তর দিল না, হাত দুখানি মাথার দুপাশে ছড়াইয়া দিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিল। সুশীল কহিল, বেশ, পড়বে যদি সত্যি, দুজনে একসঙ্গেই পড়ব, সে ত বেশ ভালই, কিন্তু এখন ত আর পড়ার সময় নেই, ওঠ এখন স্নান-টান করে খেয়ে নেওয়া যাক।

চক্ষু বুজিয়াই পানু কহিল, কটা বাজল এখন ভাই?

—এগারোটা বেজে গেছে, একটু বিশ্রাম কর তুমি, আমি মাকে গিয়ে বলি।

আহার ও খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর সুশীল বলিল, এস পড়তে বসি এইবারে।

—তুমি পড়, আমি শুনি,—

সুশীল পড়িতে পড়িতে কখন এক সময় মাথা তুলিয়া দেখিল, পানু গভীর নিদ্রামগ্ন। সুশীল হাসিয়া সেই বহিখানি রাখিয়া অন্য বহি হাতে তুলিয়া লইল।

সেদিন সারাক্ষণ আর সুশীল পানুকে ছাড়িল না, পানুরও অমত কিছুই প্রকাশ পাইল না, একটা আশ্রয়ের তাহার নিতান্তই যেন প্রয়োজন ছিল, বন্ধুর সস্নেহ ব্যবহারের আবরণে নিজেকে সে ঢাকা দিয়া ক্ষণকালের জন্য বাঁচিয়া গেল।

আরও মাস দুয়েক কাটিল, ইতিমধ্যে মীরার মায়ের দুই তিন দিনের আহ্বানেও পানু এ বাড়ীতে আসে নাই, কিন্তু কিসের একটা ছোটখাটো উৎসব উপলক্ষে পানু সেদিন আর কিছুতেই না আসিয়া পারিল না। মা মৃদু অনুযোগ করিলেন, দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পানু 'সময় হয় না' বলিয়া মায়ের সকল প্রশ্নের একটি উত্তর দিয়াই চুপ হইয়া গেল—মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্য অনেক দিনের মত আজিও ভাবিলেন, পর কখনও আপন হয় না।

মীরার কলেজের কয়টি বন্ধুও আসিয়াছিল, সহসা একজন পানুকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, ও মা, উনিই নাকি তোর পানু দা' মীরু?

মীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে 'ওমা'-টা কিসের?

অপ্রস্তুতের ভাবটা গোপন করিয়া চারু কহিল, তুই পানু দা পানু দা সর্ব্বদা করতিস্, কিন্তু ইনিই যে তিনি, তা ত' জানতুম না, তাই জিজ্ঞেস করলুম, এই পান্নালাল বাবু ত আমাদের ওখানে রোজই যাচ্ছেন,—

—তাই নাকি? তোদের সঙ্গে আলাপ আছে না কি?

চারুলতা কহিল, না আলাপ ঠিক নেই, তবে দাদার সঙ্গে ওর বড্ডো ভাব, একই সঙ্গে পড়াশুনা করেন, দাদার কাছে রোজই ত যাচ্ছেন, ওরা ক'জনে মিলে নাইট-স্কুল করেছেন কতকগুলো, আরও কি কি করছেন,—

—আর কি কি হয় ওদের জানিস?

—ঠিক জানি না, তবে চাঁদা-টাদা তোলেন দেখেছি। বিবেকানন্দের ছবিতে রোজই মাথা নুইয়ে নমস্কার করেন সবাই, তাও দেখেছি।

কথাটি বলিয়া চারুলতা একটু সলজ্জ ভাবে হাসিল, মীরার দৃষ্টি ক্রমে তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল, কহিল, তুই লুকিয়ে লুকিয়ে খুব দেখিস বুঝি?

চারুলতা নিজেও এইবারে একটু কঠিন সুরে কহিল, লুকিয়ে দেখব কেন, অনেক দূরের ঘর ত আর নয়, আমাদের ঘরের ভিতর থেকেই সব দেখা যায়।

সেদিন পানু ফিরিবার সময় মীরা কহিল, পানু দা', কই, একদিনও ত বল নি?

—কি বলি নি?

—চারুদের সঙ্গে তোমার এত ভাব, এত যাও সেখানে, বলনি ত তা কোন দিন?

—চারু কে?

—ওই তোমার সুশীলবাবুর বোন।

—না, আমি চারু-টারু কাউকে চিনিনে।

—সে কিন্তু তোমায় চেনে।

—হতে পারে।

মীরা কহিল, তা হ'ক গে, কিন্তু পানু দা, খালি কি ওই সব করেই ঘুরে বেড়াও? পড়াশুনো কি করছ না কিছুই? পরীক্ষার আর বাকী ত মাস দুই।

—কই তেমন করছি। ইচ্ছে হলে বসি সময় সময় বই নিয়ে—

—ছিঃ পানু দা, আমার লজ্জা হয় শুনতে, হেলা করে করেই তুমি দিনগুলো কাটালে, নইলে আমাদের চেয়ে তোমার বুঝবার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। আবার বাহাদুরী করে জোর করে বল কি করে, আমি তাই ভাবি।

—পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে বিশেষ নাই।

—সত্যি না কি? তবে কেন আর কলকাতায় বসে বসে টাকা খরচ করছ? বাড়ী যাও।

—তাও বিশেষ আগ্রহ নেই।

—তবে কি করবে?

—যা করছি, তাই।

—ভাল, কিন্তু জ্যাঠামশাই যদি টাকা না পাঠান আর?

—ক্ষতি কি? চাকরী কিছু জুটবে না কি?

—জুটতে পারে, শিয়ালদহতে মুটেগিরি। ম্যাট্রিক পাস কেন, এম-এ-পাসরাও রাস্তায় ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

—তবে তাই আশীর্ব্বাদ কর মীরু, মুটেগিরিই যেন আমাকে করতে হয়, তবু তোমাদের ঐ এ্যারিষ্টোক্রেট হবার আকাঙ্ক্ষা যেন আমার না হয় কোন দিন জীবনে।

পানু ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেলে, মীরার সর্ব্ব-বিজিত অন্তর সহসা যেন অপমানে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পড়াশুনার আগ্রহ, ভাল করিয়া পাস করিবার অদম্য উৎসাহ কোথায় আজ মিলাইয়া গেল।—ঘরে ঢুকিয়া আলো নিবাইয়া মীরা শুইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ

উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধি

···এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথানুসারে ডিগ্রীলাভ করিতে পারিলেই মানুষ শিক্ষিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন এবং প্রায় সমস্ত রকম পরিচালনার কার্য্যের উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হন্। অথচ বুদ্ধি কাহাকে বলে, শরীরের মধ্যে তাহার স্থান কোথায়, কোন কার্য্যে বুদ্ধির হ্রস্বতা হয় এবং কোন্ কার্য্যে তাহার উৎকর্ষ হয়, তদ্বিষয়ক কোন শিক্ষা পাইবার সুযোগ ছাত্রগণকে দেওয়া হয় না।···

কতকগুলি প্রসিদ্ধ সিংহাসনের কথা

—শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য

অতি প্রাচীনকালের যে সব রাজার উল্লেখ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, তাঁদের সিংহাসনের বিষয় জানতে মানুষের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। এই সব সিংহাসনের মধ্যে যেন সেই প্রাচীন রাজাদের স্মৃতি জড়িত আছে বলে মনে হয়। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কিন্তু তবুও কাল এই স্মৃতির উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অধিকন্তু কালের গতির সঙ্গে এই স্মৃতি যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

"চেয়ার" ছিল সুদূর অতীতে প্রভুত্ব ও ক্ষমতার চিহ্ন; বেঞ্চ, টুল গৃহস্থালীতেই ব্যবহার হ'ত। প্রত্যেক বড় লোকেরই থাকত একটা করে নিজস্ব "চেয়ার।" সে চেয়ার তাঁদের ক্ষমতার পরিচয় দিত। ১৩০০ সালের শেষে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের (Edward I) জন্য যে "চেয়ার" তৈরী হয়েছিল, সেটি সকলের চেয়ে পুরান ও বিখ্যাত। এরই উপর ব'সে পর পর রাজত্ব করেছেন ইংলণ্ডের সকল রাজা—আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটও করছেন।

রোমের সেণ্ট পিটার (St. Peter's) গির্জ্জার মধ্যে যে চেয়ারটি রক্ষিত আছে তা'র খ্যাতিও কম নয়। এটিকে দেখবার সৌভাগ্য সাধারণের ঘটে উঠে না, কারণ এর দর্শন পাওয়া যেতে পারে একশ' বছরে মাত্র একটিবার। আরও একটা অতি পুরান ও বিখ্যাত চেয়ার আছে রেভেনের (Ravena) গির্জ্জায়। সে চেয়ার মারবেল পাথরের তৈরী। তা'র নাম "দি চেয়ার অফ ম্যাক্সিম্" (The Chair of Maxim); তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে বাইবেলের দৃশ্য ও সাধুদের মূর্ত্তি।

কালের গতির সঙ্গে শক্তির নিদর্শন এই "চেয়ার"ই শেষে সিংহাসনে রূপান্তরিত হ'ল। এর কারণ রাজাদের আত্মাভিমান আর বিলাসপ্রিয়তা। সভ্যতার বিস্তার ও তার সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যার উন্নতিও কারুকার্য্যময় বিচিত্র সিংহাসনকে জন্ম দিতে কম সহায়তা করেনি। প্রাচ্য সিংহাসনের কারুকার্য্য ও রূপের বাহুল্য পাশ্চাত্য সিংহাসনের গায়ে দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সিংহাসনের উপর প্রাচ্য সিংহাসনের প্রভাব অবশ্য আমরা দেখতে পাই, বিজান-টিয়ামের (Byzantium) মধ্যযুগের রাজাদের সিংহাসনে। তাঁ'রা যে বিখ্যাত সিংহাসন তৈরী করিয়েছিলেন তা'র ভাব
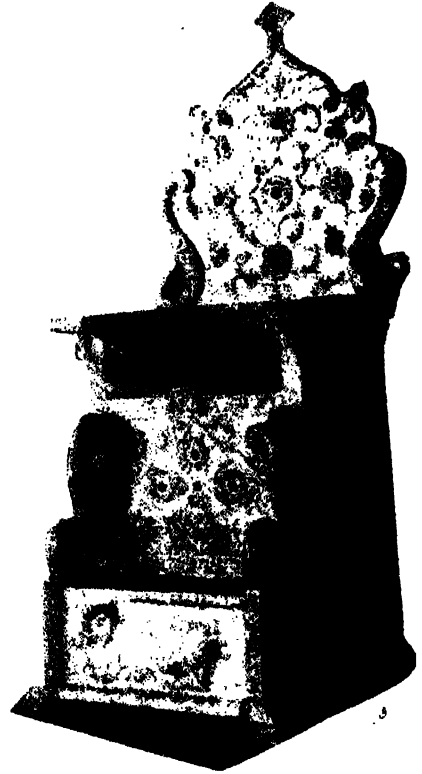
ময়ূর-সিংহাসন (ব্রহ্মদেশ)।

ও কারুকার্য্যের আদর্শ তাঁরা পেয়েছিলেন সম্রাট সলোমনের (Solomon) সিংহাসন থেকে; এমন কি সলোমনের সিংহাসনের নামটি পর্য্যন্ত তাঁ'রা বাদ দেননি। সোনার সিংহ এই সিংহাসনকে ঘিরে পাহারা দিত; যখন কোন ষড়যন্ত্র চলত একে চুরি করবার, তখনি তারা দাঁড়িয়ে উঠে গর্জ্জন করত।

সিংহাসন তৈরী করা ছিল পারস্য-সম্রাট আব্বাসের একটা নেশার মত। এক ডজনেরও বেশী তাঁর সিংহাসন ছিল—সবগুলিই উল্লেখযোগ্য। যখন তিনি তাঁর শ্বেত-

সিংহলের প্রাচীন সিংহাসন: বহুদিন উইণ্ডসর কাসলে ছিল।

মন্মরে তৈরী মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্র সিংহাসনে বসতেন তখন নিজেকে সকলের চেয়ে আনন্দিত ও সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তাঁর সিংহাসনগুলির মধ্যে এই খানিই ছিল শ্রেষ্ঠ। বহুমূল্য পোষাক পরে এরই উপর বসে প্রজাদের সামনে সভায় বসতে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করতেন। মহাবীর নেপোলিয়নের সিংহাসনে বৈচিত্র্য এমন কিছুই ছিল না। তাঁর সিংহাসন ছিল সোনার তৈরী, তাতে মিশরের কারু-কার্য্য, সিংহের মুণ্ড ও রাজ-চিহ্ন স্বরূপ ঈগল (Imperial Eagle) খোদাই করা ছিল।

কিন্তু সিংহাসন তৈরী করার জন্য সর্ব্বাধিক খ্যাতি পেয়েছিল প্রাচ্য কারিগরেরা এবং কারুকার্য্য ও জাঁকজমকের দিক থেকে প্রাচ্য সিংহাসনই স্থান পেয়েছিল সকলের উপরে। ভারতের ইতিহাসে মোগল রাজত্ব বিখ্যাত মোগলদের এক সম্রাটের তৈরী এক অপূর্ব্ব সিংহাসনের খ্যাতি পৃথিবীর সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সিংহাসনই সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসন—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক সম্রাট সাজাহানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি ছিলেন খুব বিলাসী এবং তাঁর বাসভবন ছিল যেন এক ভাবরাজ্য। তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যে সব ভাব আত্মপ্রকাশ করত, তাদের রূপ দিতে কোন চেষ্টারই তিনি ত্রুটী করেন নি।

তাঁর পূর্ব্বের সম্রাটদের চেয়ে সাজাহানের অনুচর ছিল বেশী, তাঁর সভার জাঁকজমক ও খরচ ছিল অজস্র এবং তাঁর মহানুভবতা ছিল অসীম। তাঁর অমিতব্যয়িতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, ময়ূরসিংহাসন।

তাভারনিয়ার (Teavernier) ছিলেন একজন বিখ্যাত জহুরী। ১৬৬৫ সালে দিল্লী দেখতে গিয়ে ময়ূর-সিংহাসন দেখে তিনি চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:—ময়ূর-সিংহাসনের বসবার জায়গাটি একটি বিছানার মত—৬ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া। ২০।২৫ ইঞ্চি উঁচু চারিটি পায়া তাকে উঁচুতে ধরে রেখেছে। বারটি থামের উপরে চাঁদোয়া টাঙ্গান। পায়া ও থাম সবগুলিই মণিমাণিক্যে সুশোভিত। মণিমাণিক্যের মধ্যে হীরা-মুক্তারও অভাব ছিল না। তিনটি সিঁড়ি দিয়ে সিংহাসনে উঠতে হয়। সিংহাসনের উপর তিনটি সোনালী গদি। এই গদির চারিদিক ঘিরে গদা, বর্ম্ম, ধনুক ও তীর রাখবার তূণ। সবশুদ্ধ সিংহাসনের গায়ে ছিল ১০৮টি চুণি, ১১৬টি পান্না। যে বারটি থামের উপর চাঁদোয়া টাঙ্গান ছিল, তাদের গায়ে সারি সারি মূল্যবান মুক্তা বসান ছিল। সিংহাসনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ এই থামগুলি।

চাঁদোয়ার ভিতর সবটাই হীরা ও মুক্তা বসান ছিল এবং বাইরেও ছিল একসার মুক্তা। চতুষ্কোণ গম্বুজের উপর ছিল একটি ময়ূরের মূর্ত্তি। ময়ূরের গায়ে ছিল

সোনার ফুলের কাজ। আবার ফুলের মধ্যে বসান ছিল মূল্যবান পাথর। ময়ূরের পুচ্ছটি ছিল নীলা পাথর ও আরও অন্য রঙীন পাথরে তৈরী। ময়ূরের বুকে ছিল একটা বড় চুণী, তা' থেকে একটা বড় ফলের আকারের মুক্তা ঝুলত। মুক্তার ওজন ছিল ৫৬ রতি। চাঁদোয়ার সামনেটাকে উজ্জ্বল করে তুলত একটা বড় হীরা, যার ওজন ছিল ৯০ রতি। সিংহাসনের দুদিকে ছিল দুটো মখমলের ছাতা। মখমলে সোনার জরির কাজ করা ছিল এবং তাতে মুক্তা বসান ছিল। এই ছাতার ৭।৮ ফুট উঁচু বাঁটে বসান ছিল চুণী, হীরা, মুক্তা।

মোগলদের মধ্যে মহম্মদ শাহই শেষ এই সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরই রাজত্বের সময় পারস্য-সম্রাট নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন এবং মোগলদের পরাজিত করে এই সিংহাসন নিয়ে যান নিজের দেশে, তাঁর ভাণ্ডারের শোভা বাড়াবার জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পারস্যের রাজ-দরবারে ময়ূর-সিংহাসনের অস্তিত্ব আছে বলেই শুনা যেত, কিন্তু স্বর্গীয় লর্ড কর্জ্জন আমাদের সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন। পারস্য-ভ্রমণের সময় পারস্যের সিংহাসনগুলি দেখবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটেছিল। পারস্য সম্বন্ধে যে বই তিনি লিখে গেছেন তাতে আমরা দেখতে পাই যে, সেই বিখ্যাত সিংহাসনের কতক কতক অংশ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই সকল অংশ পারস্যের বর্ত্তমান সিংহাসনে দেখতে পাওয়া যায়। ময়ূর-সিংহাসন তৈরী করতে সবশুদ্ধ খরচ হয়েছিল সাড়ে চার মিলিয়ন ষ্টারলিং।

সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসন সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা অনেক নতুন কথা শুনতে পাচ্ছি। লণ্ডনের তিনজন সাংবাদিক সম্প্রতি এর সম্বন্ধে কতকগুলি খবর দিয়েছেন। সিংহাসন সম্বন্ধে তাঁরা তিনজনেই একমত। তাঁরা বলেন, এই সিংহাসন এখন আছে পারস্যের রাজধানী তেহেরানে, পারস্য-সম্রাটের মিউজিয়ামে। পারস্য-ভ্রমণে যাঁরা যাবেন এই রহস্যময় সিংহাসন তাঁদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু উক্ত লেখকদের ধারণা সত্যই ভুল। কর্ণেল গর্ডন হিয়ারন্ নামে একজন লেখক এ বিষয়ে লর্ড কর্জ্জনের সঙ্গে একমত। তিনি প্রমাণও করেছেন যে, এই সিংহাসন সত্যই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

ভেবে দেখলে বলতে হয়, ময়ূর-সিংহাসনের অস্তিত্ব না থাকাই সম্ভব এবং এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। গত দু'শ বছরের মধ্যে পারস্যের আর্থিক অবস্থার এত অবনতি হয়েছে এবং অর্থের প্রয়োজন এত বেশী হয়েছে যে, রাজ-সভায় ময়ূর-সিংহাসনের মত মূল্যবান সিংহাসন শুধু শুধু পড়ে থাকতে দিতে পারস্যবাসীরা পারে না।

ময়ূর-সিংহাসন সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করবার চেষ্টা আমরা যতই করি, এর পুরাণো ইতিহাস যতই পড়ি, আমরা
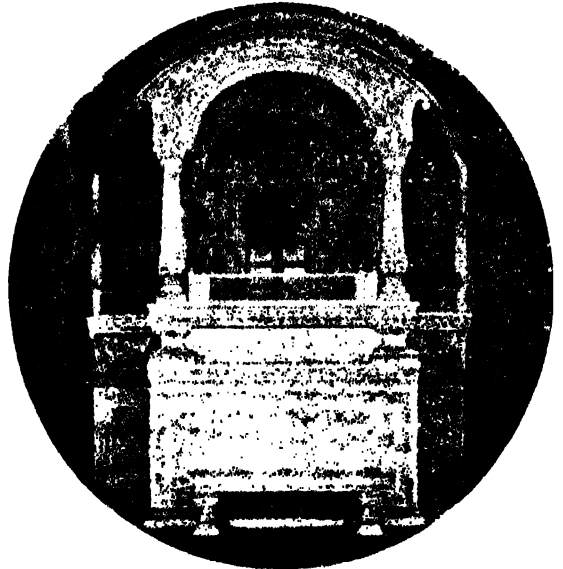
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন।

ততই বেশী আশ্চর্য্য হই; একে তত বেশী রহস্যময় বলে মনে হয়, এর রহস্য দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়। অনেকের মত, দিল্লীতে একই সময় সাজাহানের দরবারে দুটো একই রকম ময়ূর-সিংহাসন ছিল। দুটোর মধ্যে যেটা বেশী আড়ম্বরপূর্ণ, সেটা ব্যবহৃত হত কচিৎ কোন উৎসব উপলক্ষে।

কেউ কেউ বলেন যে, ময়ূর-সিংহাসনের অপহরণকারী নাদির শাহ ময়ূর-সিংহাসন দেখে ঠিক সেই রকম আর একটি ময়ূর-সিংহাসন করিয়েছিলেন। খুর্দ্দ (khurd) নামে এক জাতের লোকেরা নাদির শাহকে হত্যা করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল এই দুটি সিংহাসনের মধ্যে একটিকে। নাদির-শার পৌত্রের রাজত্বের সময় এই সিংহাসনকে ভাঙ্গা অবস্থায়

পাওয়া গিয়েছিল—এমনভাবে সিংহাসনটি ভেঙ্গে গিয়েছিল যে সারাবার আর কোন উপায় ছিল না। সাজাহানের সিংহাসনের অংশগুলি থেকে আগা মহম্মদ খাঁ তৈরী করেছিলেন আর একটি সিংহাসন। তার নাম তিনি দিয়েছিলেন "তখত-ই-নাদিরি"। এই সিংহাসনটিই এখন পারস্য দরবারে বর্ত্তমান।

সম্রাট সাজাহান ও তাঁর ময়ূর-সিংহাসন সত্যই রহস্যময়। বার্ণিয়ার (Bernier) নামে এক পরিব্রাজক এই সময় মোগল বাদসাহের দরবার দেখতে আসেন। তিনি সাজাহানের দরবারের সুন্দর বর্ণনা লিখেছিলেন, "দরবারের জন্য প্রকাণ্ড ঘর, তারই এক কোণে অত্যুজ্জ্বল পোষাক পরে সম্রাট বসে আছেন। সাদা সাটিনে তাঁর ভিতরের জামা তৈরী। সোনালী কাপড়ের পাগড়ী, তাতে মূল্যবান বড় বড় হীরা বসান। পাগড়ীর মাঝখানে একটি পোখরাজ ঠিক সূর্য্যের মত জ্বল জ্বল করছিল। সে সময় এটির মত পোখরাজ আর ছিল না। তাঁর গলায় শোভা দান করছিল একটি দীর্ঘ মুক্তার মালা।"

ব্রহ্মদেশের ময়ূর-সিংহাসনের সঙ্গেও অনেক রহস্যময় গল্প জড়িত আছে। মান্দালয়ের রাজা মিনডন (Mindon) এক প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। এই প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করত নয়টি সিংহাসন—ময়ূর-সিংহাসন তাদেরই মধ্যে একটি।

প্রত্যেক সিংহাসনই ছিল সেগুনকাঠের তৈরী, কাঠের উপরটা সোনার পাতে মোড়া ছিল; আর তার উপর আবার মণিমাণিক্যের কাজ। এই নয়টি সিংহাসনের মধ্যে প্রধান ছিল "সিংহ-সিংহাসন (lion throne)"; তাকে রাখা হয়েছিল রাজসভার ঠিক মাঝখানে এবং তারই উপর উঠেছিল রাজ-প্রাসাদের চূড়া। ব্রহ্মবাসীরা তাদের রাজপ্রাসাদকে বলত "ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল"।

বিশেষ কোন উৎসব ছাড়া সিংহ-সিংহাসন ব্যবহৃত হত না। কিন্তু বাকী আটটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসন ভিন্ন ভিন্ন কাজের সময় ব্যবহৃত হ'ত।

প্রাসাদের ভিতরের একটি ঘরে সিংহ-সিংহাসনের পিছনে ছিল "হংস- সিংহাসন"। সভায় বিদেশী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে সম্ভাষণ করবার সময় এই সিংহাসন ব্যবহৃত হত। এরই পিছনে রাজার ঘরের আরও কাছে ছিল একটি সিংহাসন, যার ব্যবহার হত জলক্রীড়ার সময়। নূতন বছরের আগমনে রাজা এর উপর বসে এটিকে সম্মানিত করতেন।

তারপর "হস্তী সিংহাসন"। এতে বসে রাজা দেখতেন তাঁর শ্বেতহস্তীদের খেলা। "শম্বুক-সিংহাসনে"র (snail throne) স্থান ছিল হংস-সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে। এই সিংহাসনের ব্যবহার হয়েছিল মাত্র একবার, যখন রাজা তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করে তাঁকে যুবরাজের ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

উৎসবের সময় রাজহস্তী দেখবার জন্য ছিল তাঁর "মৃগ-সিংহাসন"। প্রাসাদের ঠিক দক্ষিণ দিক অধিকার করে ছিল ব্রহ্মদেশের "ময়ূর-সিংহাসন"। রাজার স্পর্শ পাবার সৌভাগ্য এই সিংহাসনের তখনই হ'ত, যখন রাজ-অশ্বরা তাদের খেলা দেখাত রাজার সামনে।

ব্রহ্মদেশের সিংহাসনগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও চমকপ্রদ ছিল "পুষ্প-সিংহাসন"। পৃথিবীর সব জায়গাতে সকলে সৌন্দর্য্যের আদর চিরকাল সমভাবে করে এসেছে। সৌন্দর্য্যের আধার নারীকে সম্মানিত করতে ব্রহ্মদেশের রাজাও বোধ হয় জানতেন। সেই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মদেশের রাজা তাঁর সবচেয়ে সুন্দর সিংহাসনে বসে সুন্দরী রমণীদের অভ্যর্থনা করতেন। "পুষ্প-সিংহাসন" প্রাসাদের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

নবম সিংহাসনের ব্যবহার হত বিচার করবার সময় মাত্র। এর স্থান হয়েছিল রাজার বিচারালয়ের ঠিক মাঝখানের ঘরে। বিচার আরম্ভ হবার সময় মহা আড়ম্বরে রাজা বসতেন এই সিংহাসনের উপর।

প্রত্যেক সিংহাসনই মাটী থেকে ৪।৫ ফুট উঁচু ছিল। সুতরাং রাজা সিংহাসনে বসলে, মাটীতে যারা বসে থাকত, তাদের সকলকেই ভাল করে দেখতে পেতেন।

রাজা থিবো (Thebaw) ব্রহ্মদেশের রাজা হয়ে প্রত্যেক সিংহাসনকে প্রায়ই ব্যবহার করতেন। রাজা মিনডনের মত থিবো এদের মূল্যমান অলঙ্কারের সামিল মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন না। থিবো ছিলেন দাম্ভিক, যথেচ্ছাচারী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিনি তাঁর কুচক্রী রাণীর বশীভূত ছিলেন। রাজ্যশাসনে রাণীর কথার উপর কথা বলার সাহস

তাঁর হত না। যে কেউ রাণী সুপায়লৎকে (Supayalat) অসন্তুষ্ট করত বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলত, তার শাস্তি ছিল অনিবার্য্য।

সিংহ-সিংহাসন ছিল রাণীর প্রিয় সিংহাসন। এর পিছনে তিনি তৈরী করিয়েছিলেন এক উঁচু ঘর—যেখানে বসে তিনি সব দেখতে পেতেন। কত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় এখানে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন কুচক্রের পরিকল্পনা করে। আবার থিবোর পতনের পর, এরই উপর বসে ভগ্ন হৃদয়ে রাণী দেখেছিলেন বিজয়ী ইংরাজ সৈন্যদের পুরী প্রবেশ করতে—পশ্চিম দ্বার দিয়ে।

সম্প্রতি সিংহলের রাজ-দরবার থেকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে সিংহলের রাজাদের ব্যবহৃত পুরানো মুকুট ও সিংহাসন তাদের ফিরিয়ে দিতে। এই মুকুট ও সিংহাসন এখন আছে উইণ্ডসার ক্যাসেলে। এই সিংহাসন অবশ্য এর সমসাময়িক মোগল সিংহাসনের মত মূল্যবান নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক রহস্য ও কারুকার্য্যের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় যে, এই সিংহাসনই সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই সিংহাসনের স্থান ছিল সিংহলের রাজাদের "ময়ূর-প্রাসাদে"। এখানেও আমরা দেখতে পাই ময়ূরের প্রভাব, শুধু সিংহাসন-নির্ম্মাতার উপর নয়, প্রাসাদ-নির্ম্মাতার উপরও। এই প্রাসাদকে ময়ূর-প্রাসাদ বলা হত দুটি কারণে। তার বাইরে ছিল অপূর্ব্ব রঙের খেলা, আর চারদিকে ছিল মূল্যবান পাথরের প্রাচুর্য্য এবং সোনা ও রূপার কারুকার্য্যের শোভা।

ইতিহাসে কথনো দেখা যায়নি কোন রাজা বা রাজপুত্র ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন তাঁর জিনিষপত্রের সঙ্গে সোনার সিংহাসন নিয়ে। কিন্তু আমরা দেখেছি এক রাজপুত্রকে তাই করতে হয়েছে। তিনি আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের তৃতীয় পুত্র ডিউক অফ গ্লষ্টার (Duke of Gloucester)। কান্দির সিংহাসনকে সিংহলে পৌঁছে দেবার ভার তাঁর উপর সম্রাট দিয়েছিলেন। কাজেই তিনি অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে এই সিংহাসনকে তার স্বদেশে নামিয়ে দিয়ে গেছেন।

চেহারায় বৈচিত্র্য এর বিশেষ নেই। অতি পুরানো একটি "চেয়ার", যার পিছনটা উঁচু হবে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট। চন্দনকাঠে তৈরী তার দেহের উপর জড়ান আছে পাতলা সোনার পাত, তাতে দামী পাথর বসান। সিংহাসনের হাতল দুটো সোনার সিংহ—এই দুটোই আকর্ষণ করে লোকের দৃষ্টি সকলের চেয়ে বেশী। চমৎকার কারুকার্য্য তাদের গায়ে, আর চোখে বসান বড় বড় দুটো নীল পাথর। সিংহাসনে হেলান দেবার জায়গার ঠিক মাঝখানে আছে একটা বড় সোনার সূর্য্যের মূর্ত্তি—কান্দির রাজারা সূর্য্যবংশীয় তাই জানাতে। সূর্য্যের দুধারে বসে আছে দুই দেবী মূর্ত্তি।
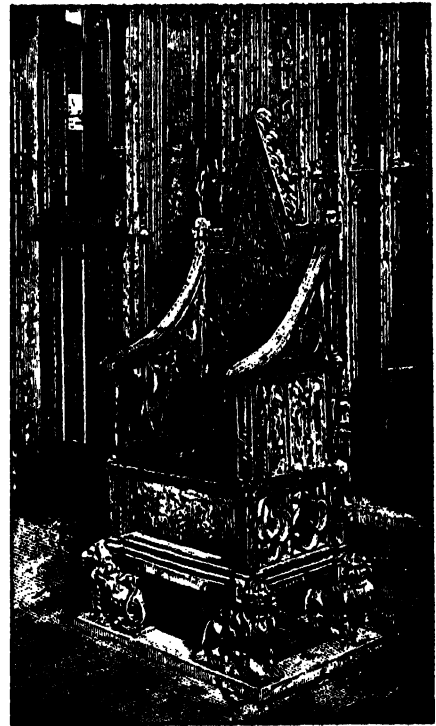
ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবে: করোনেশন-সিংহাসন।

বসবার জায়গাটি লাল মখমলে মোড়া। এই ত গেল সিংহাসনের কথা। আবার তার সঙ্গে আছে একটি ছোট টুল, লাল রেশমে মোড়া। তার উপর রাজারা পা রেখে বসতেন।

নিজের দেশ ছেড়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে এই সিংহাসন শ্বেতাঙ্গদের দেশে গিয়ে কি করে পৌঁছল, তার ইতিহাসের সঙ্গে সিংহল-বিজয়ের কাহিনী জড়িয়ে আছে। রামায়ণের যুগ থেকে আমরা দেখে আসছি, ভারতে কথনো বিভীষণের অভাব হয়নি। বিষ্ণুর অবতার হলেও রাবণ ও

ইন্দ্রজিতের মত বীরদের বধ করে সিংহল জয় করা রামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হত না, বিভীষণের সাহায্য না পেলে। এখনও আমরা বলতে পারি সিংহলবাসীর সাহায্য না পেলে পাহাড় পর্ব্বতে ঘেরা, স্বভাব সুরক্ষিত সিংহল জয় করা ইংরাজ বাহাদুরের পক্ষে সুকঠিন হত। সেই বিখ্যাত ১৮১৫ সাল—যে বৎসর নেপোলিয়নের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ভেঙে-চুরে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে, ওয়েলিংটনের অসাধারণ যুদ্ধকৌশলের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে ছিল—সেই বছরই কান্দি জয় করেছিলেন ইংরাজ বাহাদুর। রাজা শ্রীবিক্রম রাজসিংহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে এহেলোপোলা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত সিংহলী ইংরাজের দলে যোগ দিলেন: ইংরাজও তাদেরই সাহায্যে সিংহল জয় করলেন। এক রাজার হাত থেকে দেশ অন্য রাজার হাতে গিয়ে পড়লে প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা যায়। এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে ইংরাজের দেরী হল না। সিংহলীদের বিশ্বাস কান্দি থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাস্তা যাঁরা তৈরী করতে পারবেন, সিংহল জয় করতে পারবেন একমাত্র তাঁরাই। ইংরাজেরা এই রাস্তা তৈরী করে সিংহলীদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরাই সিংহলের ভাবী অধীশ্বর। কান্দির রাজা হলেন নির্ব্বাসিত; কিন্তু পড়ে রইল রাজার সব চিহ্ন আর তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ সকল পোষাক ও আসবাব কান্দির রাজপ্রাসাদে, প্রজাদের চোখের সামনে তাদের রাজাদের পূর্ব্ব গৌরব উদ্ভাসিত করে তাদের উত্তেজিত করবার জন্য। রাজার মত সিংহাসনকেও এঁরা নির্ব্বাসিত করলেন। তখন ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জ। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ইংলণ্ডের রাজসভায় এই সিংহাসন স্থান পেলে।

প্রতিগ্রাহী

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি যা দিলে দান
গোপন মনে মনে
ভরিল দেহ-প্রাণ
পুলক শিহরণে।
হাতের দান, সে ত
দু'হাতে নিতে পারি
বুকের দান এত
বুকে সে লাগে ভারি;
কোথায় রাখি তারে
ভাবিয়া নাহি পাই,
তোমারে বারে বারে
ফিরে তা দিতে চাই।
হৃদয় খালি করে
নিবাস রচি তার,
তবু সে ঝরে পড়ে
উপচি চারিধার॥

ভাবিয়াছিনু মনে
চাহিয়া লব কিছু
বিনয় সুবচনে
নয়ন করি নীচু—
চুলের দুটি ফুল
হাতে রাঙারাখী
হাসিটি অনুকূল
অথবা স্মিত আঁখি।
তুমি তা মাগিবার
দিলে না অবসর
স্নেহের বারিধার
ঢালিলে শিরপর।
ফিরিতেছিনু ম্লান
কি লব তাই খুঁজে,
অতুল দিলে দান
আমার মন বুঝে॥

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বরাবর মোটরের পথ আছে বটে, কিন্তু বড় দুর্গম পথ। কলিকাতা হইতে কিছুদূর পীচ-ঢালা রাস্তার পরই মেঠো-রাস্তা সুরু হইল। কোথাও চষা-ক্ষেতের উপরে গরুর গাড়ীর 'লিক্' ধরিয়া, কোথাও শুষ্ক নদীর বুকের বালুস্তরের উপর দিয়া, কোথাও গৃহস্থের আঙ্গিনা ভেদ করিয়া রাস্তা গিয়াছে। মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, মোটরের ছাদ তাতিয়া আরোহী দু'টিকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ছায়ার প্রভাতকুসুমের মত স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি আতপতাপদগ্ধ কমলিনীর মত শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠ তালু বিশুষ্ক, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে, তবুও বিশ্রাম লইবার প্রস্তাবে ছায়া সম্মত হয় নাই। কোন গ্রামাভ্যন্তরে গাড়ী থামাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবার পরামর্শ বিমল দিয়াছিল, ছায়া বলে, না দাদা, একেবারে বাড়ী গিয়ে জল খাব। বিমল পুরুষ, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে রত থাকিয়া কঠোর হইয়াছে, এই সকল তুচ্ছ ও দৈহিক কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মনে করে না। কিন্তু যত্নে লালিত পালিত, বিলাস-বাসনে চিরাভ্যস্ত স্বভাবদুর্ব্বলা কোমলা বঙ্গবালা এত কষ্ট সহিতে পারিবে কেন? গাড়ী যখন রামনগর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বেলা দুইটা। গ্রামসীমান্তে অবস্থিত বিরাট দুই বৃদ্ধবটের প্রশস্ত শিকড়ের উপর কতকগুলি রাখাল-বালক শুইয়া দিবানিদ্রা যাই-তেছিল, মোটরের শব্দে উঠিয়া পড়িয়া প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক্ হইল, পরে কোলাহল করিয়া অনুপস্থিত বন্ধু ও আত্মীয়গণের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল। মোটর থামাই-বার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাড়ী কেহই জানে না, রাখাল-বালকদের প্রশ্ন করা হইলে, তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল; তারপর একজন বলিল, বেনাদের ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছে, তেনাদের বাড়ী যাবেক ত? সে ঐ হোথা!

'হোথা' বলিলে বুঝিতে পারিবে এমন বিদ্যা ইহাদের ছিল না। সপ্রতিভ বালক বলিল, সোজা গিয়ে জোড়া-শিবের মন্দির দেখবেক ত, তারই বাঁয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় তেনাদের বাড়ী।
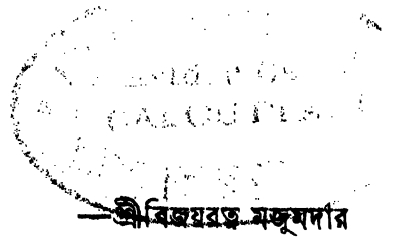
পাঁচনবাড়ী হস্তে একটি নগ্ন শিশু কহিল, মোকে হাওয়া গাড়ীতে তুলে নাও, মুই বাড়ী দেখিয়ে দিবক।

বিমল ছায়ার পানে চাহিল, ছায়া নীরবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। ধূলিধূসরিত দিগম্বর বালক ও তাহার সঙ্গীদের দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার সহরে মনটা আবার পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, চলুন-না, জোড়া-শিবের মন্দির দেখতে পাবই এখন।

কৌতূহলী বালকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বোসেদের কে গা?

ছায়া বলিল, গাড়ী চলে না কেন দাদা?

গাড়ী চলিল। রাখাল-বালকগণ কিছুদূর পর্য্যন্ত মোটরের পিছনে ছুটিয়া নিরস্ত হইল।

জোড়া-মন্দির। মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গা, ভিতরে ঘন অন্ধ-কার, শিবলিঙ্গ আছে কিম্বা নাই, মন্দিরের চাতালে নানাবিধ বৃক্ষ-লতা গজাইয়াছে, দেখিয়া মনে হয় না যে, কোনদিন কোন ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া এই মন্দিরে দেবাদিদেবের নিকট ডালি দিতে আসে। বাম দিকে একটি গরুর গাড়ীর রাস্তা দুই পার্শ্বের বনানীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হই-য়াছে। এই বনমধ্যে মানুষের বাস থাকিতে পারে ইহা মনে করাও কঠিন। ট্যাক্সি-চালক মোড়ে গাড়ী রাখিয়া কিয়দ্দূর দেখিয়া আসিয়া গাড়ী চালিত করিল।

একটি কামারশালা। এক বৃদ্ধ কামার উত্তপ্ত লৌহের উপর হাতুড়ী পিটিতেছিল, একটি নগ্ন বালক বসিয়া হাপরের দড়ি টানিতেছিল, মোটরের শব্দে উভয়েই পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বিমল প্রশ্ন করিয়া জানিল, এই রাস্তার শেষে যে বাড়ী, সেই বাড়ীর ছেলে বিলাতে গিয়া মেম বিয়ে করিয়াছে। গাড়ী আবার চলিল।

ডানদিকে একখানি মাটির ঘরসংলগ্ন ঢেঁকিশালে দুইটি নারী ধান ভানিতেছিল, গাড়ীর শব্দ তাহাদিগকেও বিস্রস্ত

বসনে পথের ধারে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

একটি পানা-ঢাকা ডোবা। তাহারই ভাঙ্গা সানে বসিয়া দুইটি প্রাচীন ছিপে মৎস্য শীকার করিতেছিলেন, তাঁহারাও ছিপ ফেলিয়া, চার, টোপ, ফাতনা, খালুই ভুলিয়া পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গাড়ী থামাইয়া অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার আশায় উৎসুক হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের অধীরতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল।

কয়েক ঘর সাঁওতালের বাস। এক খণ্ড জমির উপর ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়ে, অঙ্গনে খাটিয়ায় বসিয়া নধর-কৃষ্ণদেহ সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা, কেহ তামাক খাইতেছে, কোন রমণী কাণে কলিকা ফুল গুঁজিয়া কৃষ্ণাধরে শুভ্রদন্তে হাসির লহর তুলিয়া গল্প করিতেছে, নগ্নকায় বালক-বালিকারা একপাল ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, মুরগীর সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতেছে। গাড়ীর শব্দ তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল, তাহারাও সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার করিয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী দেখিয়া বাঙ্গালী নর-নারী বিমুগ্ধ হন, স্ব স্ব অদৃষ্টের নিন্দাবাদ করেন, হিংসাও করেন, বঙ্গপ্রবাসী সাঁওতালদের দেখিয়া তাহা করিতে হয় না। পাহাড় দেখিয়া বিস্ময় জাগে, টিলা বা উইঢিবি কাহারও বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে না। মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম তাহার পরিপূর্ণ অস্বাস্থ্য, দূষিত জলহাওয়া, অন্নাভাবের প্রভাব বিস্তার করিয়া এই প্রকৃতির দুলালদেরও সমতলবাসীদের সঙ্গে সমভূমিতে আনিয়া দাঁড় করাইতে বিলম্ব করে নাই।

আরও দুই একটা হাজামজা পুকুর, বাঁশঝাড়, কলা গাছের সারি, কুটীর ও অট্টালিকার কঙ্কাল অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণ পথটি যেখানে শেষ হইল, ঠিক তাহার সম্মুখে বাঁশের বেড়া দেওয়া একখানি জীর্ণ কোঠাবাড়ী, যেন কুব্জপৃষ্ঠ, ম্লানদেহ মরণোন্মুখের মত পরকালের পানে জ্যোতিহীন চক্ষু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ট্যাক্সির চালক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হিঁয়া?

প্রশ্নটি ছায়ার মনটিকে যেন করাত দিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি বিমলকে বলিল, দাদা, নেমে দেখুন না, যদি কাউকে দেখতে পান!

বিমলকে নামাইয়া সন্ধান করিতে পাঠাইল বটে, কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, এই গৃহই বটে! তাহার বেশ মনে আছে, দেশের বাড়ীর কথা উঠিলে অশোক বিরক্ত হইত। অশোক মাতুল-গৃহে মানুষ,—মাতুল সহরবাসী, পল্লীগ্রামের বন-বাদাড়, ভাঙ্গাবাড়ী অশোকের মনকে পীড়া দিত, তাই জন্মভূমির নামমাত্রে সে সঙ্কুচিত হইত।

বিমল বেড়াটার ধারে ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কাউকেই দেখতে পেলুম না ছায়া।

—আমি দেখছি, বলিয়া কম্পিত পদে ছায়া গাড়ী হইতে নামিল। পা দু'টা কাঁপিল কি? বুকের ভিতরকার স্পন্দন বন্ধ হইল কি? না, না—মনের ভুল! কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে কেন?

বেড়ার একস্থানে প্রবেশের পথে দুইটি বংশখণ্ড আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা ছিল। প্রবেশার্থীরা অনায়াসেই তাহা সরাইয়া ফেলিতে পারে, অথচ গরু-বাছুর ঢুকিয়া বাড়ীর অঙ্গনে উৎপাত করিতে পারে না। ছায়া ভিতরে ঢুকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরের রোয়াকে উঠিয়া দেখিল, প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথার উপরে শতছিন্ন একখানি কাঁথা চাপা দিয়া একটি ছেলে শুইয়া যেন ধুঁকিতেছে। ছেলেটি দ্বারের পানে চাহিয়া শুইয়া ছিল, দ্বারসম্মুখে অপরিচিতা ও অপরূপ রূপলাবণ্যশালিনী এক নারীকে দেখিয়া ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা পিঞ্জরমুক্ত হইবার উপক্রম করিল। ভয় পাইয়া দুনিয়ার ছেলেরা যাহা করে, এই ছেলেটিও তাহাই করিল; তারস্বরে চীৎকার করিল, মা! অ মা! মা!

ছেলেটি বোধ হয় ভাবিল, জ্বরের ঘোর বড়িয়াছে। ঘোরের মধ্যে যেমন নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখে, এ রূপলাবণ্যময়ীও তদ্রূপ। এই গ্রামে, এই তল্লাটে এমন জগদ্ধাত্রীর মত রমণীমূর্ত্তি কে দেখিয়াছে! নিশ্চয়ই জ্বর-বিকারে সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাই প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে লাগিল, মা! অ মা! মা গো!

ছেলেটির মা অনতিদূরেই ছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন, কি বাবা, কি হয়েছে!

ছেলে আঙ্গুল দিয়া দ্বার দেখাইয়া দিল। প্রবল জ্বরের সময় ছেলে যা তা বলে, যা তা করে। মা দ্বারের পানে

পরেশ কোন্ সামগ্রী অধিক ভালবাসে, কোন্‌টি এখনই পরীক্ষা করিবে, ইহার বিচার-বিবেচনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও বৌদিদির কার্য্যে সহায়তা করিতে একটুও ভুলে নাই। ছায়া ভাতের হাঁড়ীতে জল ঢালিয়াছে মাত্র, পরেশ পুকুর হইতে ধুচনী করিয়া চাল ধুইয়া আনিয়া হাজির। কয়দিন তাহার জর হয় নাই, পেঁটরার অন্ধকারা হইতে তাহার ফার্ষ্ট বুক অফ রীডিং খানি বাহির হইয়াছে। শুধুই বাহির হয় নাই; বৌদিদি তাহার অঙ্গে একটি জ্যাকেট পরাইয়া দিয়াছে, আর ভিতরে প্রত্যেক শব্দের পাশে অর্থ লিখিয়া দিয়া কঠিন পাঠ সহজ করিয়া দিয়াছে। হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া বৌদিদি ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্পটা আজ বলিবে কথা আছে, বৌদিদি পুকুরে চাল ধুইতে গেলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পরেশ বৌদিদির মানাসত্ত্বেও জল ঘাঁটিয়াছে। যদি সময় থাকে, ক্যাসাবিয়াঙ্কার পরে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্পটিও আজই শুনা হইয়া যাইবে।

রঘু ছায়ার শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া যখন তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল, তখন ছায়া আঁচল খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল। রঘু বলিল, দেবে দিদি-মণি, দাও, সাহেব কিন্তু পাঁচটাকা বখশিশ আগেই দিয়েছেন। এই দেখ।—রঘু ট্যাঁক হইতে একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া দেখাইল। অপর ট্যাঁক হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, সাহেব বলেছেন, তোমার গয়নাগুলো বিমলবাবুকে দিয়ে ছাড়িয়ে এনে রেখেছেন। আর এই টাকায় তুমি হাত-খরচ কর।

আবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি হাত পাতিয়া নোটের তাড়া লইয়া ছায়া চলিয়া গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওমা, অত টাকা কি ঘরে রাখতে আছে! যে দিন কাল পড়েছে মা, চোর-ডাকাতে লুটেপুটে নেবে, চাই কি প্রাণেও মারতে পারে।

ছায়া বলিল, মা, আমি ঠাকুরপোর জন্যে জমি কিনব। ঠাকুরপো চাষবাস করবে।

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, কায়েত বামুনের ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে—

ছায়া বলিল, লেখাপড়া ক'রে ত সব হয়! ঐ যে বিমল দাদা এসেছিলেন, ছ'টা পাস করেছেন, খুব বিদ্বান, একটা ত্রিশটাকা মাইনের চাকরীও হচ্ছে না। কি হবে মা, লেখা-পড়া করে? ঠাকুরপো চাষবাস করে রাজার হালে থাকবে।

পরেশ এই সময়ে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ছায়া হাসিয়া বলিল, আর ঠাকুরপো'র যে রকম বুদ্ধি, তাতে ওর লেখাপড়া হবেই না, তা আর কথা! জানেন মা, ভায়ের আমার এমন বুদ্ধি, বলে বি ইউ টি যদি বাট্ হয়, পি ইউ টি পাট হবে না কেন? এই বুদ্ধি নিয়ে ও আবার লেখাপড়া করবে! না মা, আপনি চাটুয্যে মশাইকে দিয়ে জমির সন্ধান করুন, পাঁচশো টাকায় অনেক জমি হবে।

—দেখি বাছা!—বৃদ্ধা কোলের ছেলেটির বিদ্যাহীনতার সংবাদে খুশী হইতে পারেন নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল।

আরও তিনদিন কাটিল। প্রত্যুষে দুর্গানাম স্মরণ করিয়াই বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর ক'দিন দেরী বৌমা?

—আর দশদিন বাকী মা!

—বৌমা, তুমি কি আমায় মিথ্যে কথা বলছ বাছা?

—মিথ্যে বলব কেন মা?

—তুমি বলছ আর দশদিন বাদেই আমার নরু বাড়ী আসবে। তাই যদি হয়, সে কি একটা চিঠিও লিখত না?

এ কথার কি কোন উত্তর আছে? এই প্রশ্ন কি তাহাকেও পীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল না? যে দিন 'কেল্লে' টাকা পাঠাইয়াছে, সেই দিন হইতে একটি তারের খবরের প্রত্যাশা অহরহ কি তাহার মনও করে নাই? কিন্তু আশা ত পূর্ণ হয় নাই। শ্বশ্রূর প্রশ্নের জবাব তখনই না দিলে নয়; বলিল, বাড়ী ত আসছেনই, বোধ হয় সেই জন্যেই আর চিঠি লেখেন নি।

শ্বশ্রূ চুপ করিয়া রহিলেন; কথাগুলা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, যুক্তিটায় ছায়ার মনও সাড়া দেয় নাই। তাই সে আবার বলিল, আর মা জাহাজ থেকে চিঠি ত ডাকে পাঠান যায় না।

শাশুড়ী তবুও কথা কহিলেন না।

দিন তিনেক পরে একদিন বিকাল বেলা সুদৃশ্য মোটরে চড়িয়া প্রণয়কুমারের শুভাগমন হইল। তাঁহার সাজে পোষাক, মাথায় হ্যাট, চোখে মোটর-চশমা দেখিয়া ছায়ার শাশুড়ী সসম্ভ্রমে সরিয়া গেলেন; পরেশ আড়াল হইতে উঁ

মারিয়া সাহেবকে দেখিতে লাগিল, সামনে আসিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

তাহাকে দেখিয়া যে জীবনকে ছায়া বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, এক মুহূর্ত্তে তাহাই প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মন চাবুক খাইয়া শুইয়া পড়িল। তবুও, সংসারের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে, হাসিমুখেই আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হয়।

ছায়া প্রণয় মামাকে চা করিয়া দিল; বলিল, প্রণয় মামা ত এখুনি যাচ্ছ না, রাত্রে খাবার ক'রে দেব, খেয়ে যাবে। কেমন?

প্রণয় বলিলেন, সে হবে—হবে! তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বলছি কি সীতার বনবাস শেষ হবে কবে?

ছায়া হাসিয়া বলিল, রামচন্দ্র ফিরলেই।

প্রণয় হতাশাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, সে আর ফিরেছে!

ছায়ার মুখখানি শুকাইয়া গেল। বলিল, না ফেরেন, বনবাসেই জীবন কাটবে।

প্রণয় বলিলেন, যা-যা, জ্যেঠামো করতে হবে না। এখানে কখন ভদ্দরলোক থাকতে পারে?

ছায়া হাসিয়া বলিল, ভদ্রলোক পারে না, আমরা পারি, প্রণয় মামা। দিন পনের ত হয়ে গেছে, কেন, বেশ ত আছি। কিছু মন্দ দেখছ? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে যদি, শ্বশুর-ঘর কি জিনিষ, জানতে পারতে!

প্রণয় দেখিলেন, কথাগুলা দূরের পথ ধরিতেছে; তিনি মোড় ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, চল্ ছায়া, একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় গো?

—এই কাছাকাছি কোথাও। গাইড-বুকে দেখছিলুম, কাছেই সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম জানিস্ ত? সাতগাঁ রে! বাঙ্গলা দেশের প্রধান বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম! রাজবাড়ী, দুর্গ —এ সবের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চল্ দেখে আসি।

ছায়া দু'টি হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথায় ঠেকাইয়া দিল, রক্ষে কর প্রণয় মামা, এ তোমার কলকত্তা সহর নয় মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে মোটরে বেড়াতে যাবে! এখানে রাতদুপুরের আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দেখা হওয়ার নিয়ম নেই।

প্রণয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, সে নিয়ম পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের জন্য।

ছায়া বলিল, আমিও সেই ভূতেদেরই একজন হয়ে গেছি যে প্রণয় মামা!

—তবে চল্, কলকাতা ঘুরে আসি। কতক্ষণই বা লাগবে? চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। বল্ এদের, বাবা-মা নিতে পাঠিয়েছেন।

—তাঁরা ত এখানে নেই, প্রণয় মামা।

—নাই বা থাকল, ঐ ছলে দুজনে খানিক ড্রাইভ করে আসি। কতদিন এক সঙ্গে বেড়ান হয়নি বল্।

ছায়া করুণকণ্ঠে কহিল, দোহাই প্রণয় মামা, আর আমায় ওসব কথা ব'ল না, তোমার পায়ে পড়ি।

প্রণয় বলিলেন, লক্ষ্মীটি, চল।

—সাত দোহাই তোমার! আমায় মাপ কর। অতি কষ্টে কলকাতাকে ভুলেছি; আর আমায় কলকাতার কথা মনে করিয়ে দিও না। আমি বেশ আছি প্রণয় মামা।

—বেশ আছ কেমন তা আর দেখছি নে! কাপড়ে এক গাদা হলুদের দাগ, পায়ের নীচে একরাশ ঝুল কালি, হাতে ওসব দাগ কিসের? রাঁধতে হয় বুঝি?

—শুধু রাঁধতে? প্রণয় মামা, আমার একটি গরু আছে, যে ঘরে গরু থাকে, তাকে গোয়াল-ঘর বলে জান ত? সেই গোয়াল-ঘর আমি নিজের হাতে সাফ করি; পুকুরধারে বসে বাসন মাজি। আমার শাশুড়ী একা, বুড়ো মানুষ, সব কাজই আমি করি। বলিয়া ছায়া হাসিল।

প্রণয়কুমার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তবু বলছিস বেশ আছি?

—সত্যি প্রণয় মামা, সত্যি বেশ আছি! কলকাতার ছায়া কি আর আছে? সে মরে গেছে, এখন যে আছে সে এই ভূতের দেশের ছায়া।

—ও সব কোন কথা আমি শুনব না। যেতেই হবে, চল। বলিয়া খপ করিয়া ছায়ার একটা হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

ছায়া কিছু মাত্র বলপ্রয়োগ না করিয়াও হাতটি ছাড়াইয়া লইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, প্রণয় মামা, তুমি যাও।

তাঁহার আরক্ত মুখ, ঘূর্ণিত নয়ন, তীক্ষ্ণ তীব্র নিঃশ্বাস, স্ফীত স্কন্ধ, তাঁহার দ্রুত বক্ষস্পন্দন দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ছায়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লইল।

ছায়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পরেশকে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, মাকে বল, প্রণয় মামা যাচ্ছেন, তাঁকে নমস্কার করবেন। দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে বল।

পরেশ এক মিনিট পরে বলিল, বৌদিদি, মা এসেছেন।

প্রণয় না দাঁড়াইলেও, ছায়া বলিল, মা, প্রণয় মামা প্রণাম করছেন।

পরেশ বলিল, মা আশীর্ব্বাদ করছেন, বৌদিদি।

প্রণয় তখনও নীরবে বসিয়া ছিলেন; ছায়া নিম্নস্বরে বলিল, আর দেরী ক'র না প্রণয় মামা!

প্রণয় রাগে ফুলিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় দংশন করাই স্বাভাবিক। বলিলেন, তুমি কি কোন দিন একলা একলা আমার সঙ্গে রাত্রে গড়ের মাঠে মোটরে বেড়াওনি ছায়া? আজ হঠাৎ স্থাকামী করছ যে বড়!

ছায়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, স্থাকামী নয় গো মশাই, নয়। এটা যেমন কলকাতা নয়, এ ছায়াও তেমনই সে ছায়া নয়। হাকিম লোক, এটা বোঝ না কেন?

প্রণয় জলন্ত স্ফুলিঙ্গবৎ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ছায়া সমস্ত উত্তাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, আমায় ক্ষমা কর প্রণয় মামা।

প্রণয় ফিরিয়া চাহিলনে; আশার ভরসায় তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। ছায়া বলিল, বড়া কথা বলে ফেলেছি, তার জন্যে মাপ চাইছি। প্রণয় মুখ ফিরাইয়া মোটরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন।

মোটর ঘিরিয়া এক রাশ ছেলে কলরব করিতেছিল, প্রণয় ইংরাজী গালাগালসহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিলেন।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রণয় মামা, ইন্দুদের খবর জান?

প্রণয় কি ভাবিলেন কে জানে। বলিলেন, জানবার দরকার দেখি নে।

—বিমল দার?

—কে বিমল-দা? ওঃ, সেই মেয়েটার লাভার! 'রোগ্‌স' (সব বদমাস্)!

গাড়ী চলিয়া গেল।

পরেশ প্রকাশ হইয়া বলিল, বড্ড রাগী লোক উনি, না বৌদিদি?

ছায়া হাসিয়া বলিল, সাহেবী পোষাক পরলেই লোকের রাগ বাড়ে ভাই।

পরেশ চিন্তা করিয়া বলিল, দাদা যদি বিলেত থেকে সাহেবী পোষাক পরে আসেন?

—আমি আগে ধুতি পরাব, তবে অন্য কথা!—বলিয়া হাসিয়া, পরম স্নেহে দেবরটির গলা জড়াইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জজসাহেবের চিঠি পড়িয়া ডানকান্ সাহেব মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বিমলকে কহিলেন, তুমি এম-এ বি-এল পাশ করিয়া কৃষিকার্য্যে অনুরাগী হইয়াছ ইহা অতী সুখের বিষয়। তুমি যে-ভদ্রলোকের পত্র আনিয়াছ, তিনি আমার বিশেষ উপকারী সুহৃদ। তাঁহার অনুরোধ রাখিতে পারিলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিব। তুমি আমার কাছে অকপটে বল, কৃষিকার্য্যে যেরূপ কায়িক শ্রম করিতে হয়, তাহা কি তুমি পারিবে? আরও এক কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ কায়িক শ্রমকে [illegible] করেন ও কায়িক শ্রমজীবীদের নিম্নস্তরের লোক [illegible] অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন, তুমি কি সেই অভিমান ও [illegible] দূর করিতে পারিয়াছ? শুনিয়া সুখী হইলাম, [illegible] শিক্ষাভিমান নাই এবং তোমার মনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন [illegible] কিন্তু আরও কথা আছে। তুমি হয়ত জান না, তোমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের এমনই দুরবস্থা যে, জাত-কৃষক, কৃষিকার্য্যে তাহাদেরই উদরের অন্নের [illegible] হইতেছে না। তাহাদের অভাব সামান্য, আশা [illegible] প্রয়োজনও যৎসামান্য, তবুও তাহারা তাহাদের

আকাঙ্ক্ষা ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। কৃষির এই দুরবস্থায় ভদ্র-সন্তানেরা তাহাদের অভাব-মোচনের উপায় কৃষিকার্য্য হইতে করিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

“যদি বল, আমি এ কায কেন করিতেছি। আমি তাহারও উত্তর দিতেছি। তুমি বোধ হয় জান না, আমি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতাম, মাহিনা মোটা ছিল, এখন যাহা পেন্সন পাই, তাহাতে আমার একার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। স্ত্রী স্বর্গে গিয়াছেন, একটিমাত্র পুত্র জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে; দুইটি কন্যা ছিল, তাহারা তাহাদের স্বামী-পুত্র লইয়া উদরান্নের চেষ্টায় কখনও ভারতে, কখনও চায়নায়, কখনও আষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশে আমার ঘর-বাড়ী নাই, আত্মীয়-স্বজনও নাই; বুড়া হইয়াছি, আঠার বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম, আটষট্টি বৎসর বয়স হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর ভারতবর্ষে—বাঙ্গলাদেশে কাটাইয়াছি, এই দেশকেই ভাল বাসিয়াছি, এ দেশও আমায় ভাল বাসিয়াছে; এর জল-হাওয়া বুড়া হাড়ে বেশ সহ্য হইয়াছে, এ দেশেই থাকিয়া গিয়াছি। পেন্সন লইয়া যদি চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতাম, বাতে ধরিত, অসুখে পড়িতাম, হয় ত বা অসময়ে মারা যাইতাম। সমস্ত জীবনটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়াছি, এখন একেবারে নিষ্কর্ম্মা থাকিতেও পারিব না ভাবিয়া সামান্য যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তাহা দিয়া সুন্দরবনে জমি কিনিয়া চাষ করিতে লাগিয়া গেলাম। দশ বৎসর এই কাজ করিতেছি, লাভ যে কিছু না হইতেছে তা'ও নয়; তার পর পেন্সন আছে, একলা লোক, বেশ চলিয়া যায়। বৎসরের শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা আমার লাভ হয়, অর্থাৎ যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা এখানকার গরীব চাষাভূষাদের বীজ-ধানে, বস্ত্রে খরচ করি। এদেশের গরীব শ্রমজীবীরা বড় ভাল, বড় সরল। আমি তাহাদের কতটুকু উপকারই বা করিতে পারি, তাহারা আমাকে পিতৃ সম্বোধন করে। দেখ, আমি যদি পাদ্রী হইতাম, এই পাঁচ সাত শত বাঙ্গালী-হিন্দু-কৃষক-পরিবারকে একদিনে যীশুখৃষ্টের উপাসক করিয়া ফেলিতে পারিতাম। দুঃখের বিষয় আমি পাদ্রী নই। সেই জন্যই হিন্দুধর্ম্মটা এ-যাত্রা এখানে বাঁচিয়া রহিল।” বলিয়া সাহেব হাসিলেন।

“তুমি ভাবিও না আমি তোমাকে একেবারেই হতাশ করিয়া দিতেছি। আদৌ তাহা নহে। তবে সকল বিষয়ের সহিত আমি তোমায় পরিচিত করাইতে চাই। সব শুনিয়া কৃষিকার্য্যে অবহিত হইলে, আমি সানন্দে তোমাকে আমার সঙ্গী ও সহকর্ম্মী করিয়া লইব। আগেও অনেক বাঙ্গালী যুবক আমার কাছে আসিয়াছে, তাহাদেরও সব দেখাইয়াছি, বুঝাইয়াছি, শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের বিরস আনন, পাণ্ডুবর্ণ দেহ দেখিয়া আমার কত কষ্ট হইয়াছে তাহা বলিবার নয়; কিন্তু কি করিব বল? মোটা মাহিনা দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার সামর্থ্য আমার কৈ? আমি আশা করি, তুমি পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে মহাজন ভাবিবে না এবং তাহাদের অনুসৃত পথকেই একমাত্র পন্থা বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধকে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া যাইবে না।

“কাজে নামিয়া দেখিলাম, দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে দেশের অবস্থা উন্নত হইবে না। তোমাদের মধ্যে অনেকে আইন শিখিয়াছ, বিজ্ঞান শিখিয়াছ, সাহিত্য শিখিয়াছ, কিন্তু চাকরী না পাইলে তোমাদের সমস্ত বিদ্যা নিষ্ফল। গবর্ণমেণ্ট তাহা দেখিতেছেন, তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও তাহা দেখিতেছেন; তবু যে তাঁহারা শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইতেছেন না কেন, তাহা আমি জানি না। আমাকে যদি এক দিনের জন্য শিক্ষাবিভাগের হিটলার কি মুসোলিনী করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি কি করিব জান? আমি প্রথমেই তোমাদের আইন-বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান-বিদ্যালয়গুলির দ্বারে 'টু লেট' (To Let) বাড়ী-ভাড়ার লেবেল আঁটিয়া দিব। তুমি হাসিও না, আমি বলিতেছি, ভারতের মুক্তি কৃষিতে; কৃষি ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। তবে কৃষি এখন যে ভাবে চলিতেছে, সে ভাবে নয়।

“আমি আগেই বলিয়াছি, আমাকে তোমরা হের হিটলার বা সিনর মুসোলিনী করিয়া দাও, আমি আদেশ দিব সরকার ও দেশের লোক মিলিয়া দেশের যত নদ-নদী আছে, সব কাট, সব নদ-নদীতে সারা বৎসর যাহাতে জল থাকে, তাহা কর। নদীর জলের রস না পাইলে জমির উর্ব্বরা-শক্তি কখনও বাড়িতে পারে না। আজ সমগ্র দেশের চাষীর এই যে দারুণ দুর্দ্দশা, জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়াছে

বলিয়াই না তাহা হইয়াছে? আমার তৃতীয় 'ফায়াট'—জমি হইতে খনিজ পদার্থ সমূহ তোলা বন্ধ করিতে হইবে। কয়লায় আমাদের কাজ কি! দেশে বন-জঙ্গলের অভাব নাই, জ্বালানী কাঠের অভাব হইবে না। কি কাজ গাদা গাদা লোহার? লোহার কড়ি-বরগা দিয়া বাড়ী তৈয়ার না করিলেও চলিবে। সকলকে আমার মত ফাঁকা কুঁড়ে-ঘরে বাস করিতে হইবে; তাহা হইলে অসুখ-বিসুখ কম হইবে। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, দশ বছর এই কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া আমি যেরূপ অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছি, জীবনে আর কোন দিন তাহা করি নাই। খনি হইতে কেরোসিন, পেট্রোল তুলিবারই বা কি প্রয়োজন! রেড়ীর তৈলে কি ঘরের অন্ধকার ঘুচে না! রায়, তুমি কি আমায় উন্মাদ ভাবিতেছ? না! ধন্যবাদ। অবশ্য উন্মাদ বলিলেও আমি রাগ করিব না। সত্যই, এদেশের অসামান্য possibilities আর লোকের ঔদাসীন্য ভাবিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠে, আমি উন্মাদ হইয়া যাই। এদেশের মত possibilities আর কোনও দেশে ছিল না, আজও নাই। এস, আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই।

"এই ম্যাপ—ভারতের মানচিত্র। এই তোমার বাঙ্গালা দেশ। কত নদী দেখিতেছ? নদীগুলির উৎপত্তি-স্থল, হিমালয়। হিমালয়-সঞ্চিত বৃষ্টির জলধারা বুকে লইয়া নদীগুলি বাঙ্গালা দেশকে চিরশস্যশালিনী করিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা-দেশ ভারতের, আর ভারত সারা জগতের নিকট অন্নপূর্ণা হইয়াছিল। কালে নদীগুলি শুষ্ক, হাজিয়া-মজিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, কৃষির সঙ্গে দেশও 'কুকুরে গিয়াছে' (gone to dogs)।"

একটি হৃষ্টপুষ্টকায় দেশী কুকুর সাহেবের চেয়ারের পাশে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, dog শব্দটি কানে যাইবামাত্র তাহার কান দুইটা খাড়া হইয়া উঠিল, সে-ও দাঁড়াইয়া উঠিল। সাহেব কুকুরটিকে জানুর কাছে টানিয়া লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

"তোমরা আমাকে ডিক্টেটার করিতে রাজী আছ? যদি রাজী থাক, বল, আমিও অঙ্গীকার করিতেছি, বিশ বৎসরের মধ্যে দেশের অন্য রূপ করিয়া দিব। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখি, সকলকে কৃষক হইতে হইবে। তোমাদের দেশে কৃষক হওয়া আগে ত নিন্দার ছিল না। আমার এক বাঙ্গালী বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি, অযোধ্যার রাণী, সীতার বাবা রাজা জনকও নিজে হল কর্ষণ করিতেন। ইহা কি সত্য নয়? বোধ হয় আমরা আমাদের দেশ হইতে যে শিক্ষা ও সভ্যতা আনিলাম, তাহারই সঙ্গে তোমাদের বিকৃত অভিমান জাগিল।

"থাক্, বাজে কথা অনেক হইল। এবার কাজের কথা হউক। তুমি এখানে থাকিবে?"

দেশব্যাপী, দিগন্তবিস্তৃত তমসাবৃত আকাশের একপ্রান্তে রক্তিম অরুণাভা পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, বিমল যেন তাহারই পানে চাহিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সাহেবের প্রশ্নে সচকিত হইয়া বলিল,—থাকিব।

—বেশ। তোমায় আমি চাকরী দিব না, দিতে পারিব না, কাজেই মাহিনার কথা উঠিবে না। তবে তোমার যখন যা দরকার, তাহা তুমি পাইবে। রায়, তুমি বিবাহিত?

—আজও নয়।

—বিবাহ করিবে না?

—করিব।

—নাই বা করিলে?

—আমাদের ধর্ম্মে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, আমার মা আছেন, তাঁহার মতেই আমার মত। তিনি চান, আমি এখনই বিবাহ করি।

—খাওয়াইবে কি?

—নিজে যাহা পাইব।

—ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার মিলিবে না। যথেষ্ট বিত্তশালী না হইয়া বিবাহ করা আমরা ঘোরতর অন্যায় মনে করি।

বিমলকে নীরব দেখিয়া, সাহেব বলিলেন, নিজে দুঃখ-কষ্ট করিতে পারি, কায়ক্লেশে জীবন কাটাইতেও পারি, কিন্তু যে সরলা সুশীলা নারীটি আমার জীবনের সঙ্গিনী হইয়া আসিবে, তাহাকে কষ্ট দিবার, দুঃখ দিবার কি অধিকার আমার আছে বল ত? ইহা বোধ হয় তুমিও স্বীকার করিবে, নারীদের সখ অধিক, আকাঙ্ক্ষাও অধিক, তোমার অর্থাভাবজন্য তুমি যদি তাহার কোনটিই পূরণ না করিতে পার, সে কি সুখী হইবে?

বিমল সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিল না দেখিয়া হাসিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমি বুঝিতেছি, বিবাহ করিবার জন্য তুমি লালায়িত। তোমাদের সমাজে ত পূর্ব্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি নাই শুনিয়াছি। তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে জানিবার দেখিবার সুযোগ তোমার নিশ্চয়ই হয় নাই!

বিমল হাসিল।

—হাসিলে যে?

—আমার বেলা ঘটনা অন্যরূপ।

—অর্থাৎ, তোমার সঙ্গে তোমার ভাবী-বধূর ভাব আছে? তোমাদের সমাজও উন্নত হইতেছে দেখিতেছি।

—বিমল বলিল, উন্নতি-অবনতি বুঝি না, তবে আমাদের সমাজেও ছেলেরা এখন বিত্তশালী না হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। আগে আমাদের সমাজে এরূপ ছিল না। কৈশোর বা যৌবনের প্রারম্ভে পঠদ্দশাতেই পিতামাতার আদেশে ছেলেরা বিবাহ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না।

সাহেব বলিলেন, তাহার কারণ ছিল। তোমাদের দেশে খাদ্যের অভাব কোনদিন ছিল না। তাই শুনিয়াছি, এক-একজন পুরুষ দশ বিশটা বিবাহ করিতেও ডরাইত না। তোমার দেশের আর্থিক দুরবস্থা মোচন কর, দেখিবে বিবাহ সম্বন্ধে আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে। 'পলিগেমী'র প্লাবনে তোমরা সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে।

সাহেব এক মিনিট থামিয়া পুনরায় বলিলেন, দেখ রায়, তোমাদের এই দেশকে আমি নিজের করিয়া লইয়াছি আমার মনে হয়,এই দেশও আমাকে আপন করিয়া লইয়াছে। এখন এই দেশ ও আমার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে—দেশের উন্নতিতে আমার উন্নতি, দেশের অবনতিতে আমার অবনতি। আমি সেই ভাব লইয়াই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে চাই। আমার সে কাজে তোমার মত তরুণ কর্ম্মীকে সহযোগীরূপে পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি আমাকে কথা দিয়াছ, আমার সঙ্গে কাজ করিবে। কবে হইতে যোগদান করিবে বল?

বিমল বলিল, আমি দুই তিনদিনের মধ্যেই আসিব। কলিকাতায় আমার একটু বিশেষ দরকার আছে—

সাহেব বলিলেন, প্রণয়িনীর নিকট বিদায় লইতে হইবে ত?

বিমল হাসিল, বলিল, কতকটা তাই। আমার মাকেও বলিয়া আসিতে হইবে। আমরা মায়ের অনুমতি না লইয়া কোন কাজ করি না।

– তোমার মাতৃভক্তি দেখিয়া সুখী হইলাম। বালক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

সাহেব হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিলেন।

জীবন—যে জীবন এতদিন অনির্দ্দিষ্ট অজানা আঁকা-বাঁকা পথে চলিতেছিল, যাহার কোন একটা স্থির লক্ষ্য ছিল না, সেই জীবন একটা গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভ করিতে চলিল জানিয়া অন্তরে বিমল সুখানুভব করিতেছিল। বৃদ্ধ সাহেবটির প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশী মানুষটি এই দেশের মঙ্গলচিন্তা যতখানি করিয়াছেন, দেশের কয়জন লোক তাহা করিয়াছে? দেশের কথা অল্প-বুদ্ধর সবাই ভাবে সত্য, দেশের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে মানুষমাত্রেরই হৃদয়ের দুই একটি তার যোগসূত্রে বাঁধা থাকে সত্য, চিন্তাশীল সাধক না হইলে মানুষের চিন্তাধারাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে কেহ পারে না, বাঁধা তারেও ঝঙ্কার না। বিদেশী সাধক তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা লোককে পথ দেখাইতে পারেন, তারে ঝঙ্কার দিতে পারেন।

কলিকাতায় আসিয়াই বিমল ইন্দুর পত্র পাইল। পত্র ক্ষুদ্র, এইরূপ :—

আমরা শুক্রবার সকালে সেই একজিবিসন দেখিতে যাইব। ইন্দু।

একজিবিসন-প্রাঙ্গনে সাক্ষাৎ হইল। ক্ষণা নাগরদোলায় দুলিতে গেল। বলিয়া গেল, পুরা একটি ঘণ্টা দুলিবে। ইন্দু বলিল, এইবার বল।

—কি বলব?

—কবে আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাবে?

বিমল নীরব।

ইন্দু বলিল, মা যে কি কাণ্ড করছেন কি বলব! রোজ পাঁচ সাত দল লোক আমায় দেখতে আসছে, ঘটক-ঘটকীর ভিড়ে বাড়ীতে তেষ্ঠান দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আর আমার সহ্য হয় না। কাল একদল যারা দেখে গেছে, তাদের সামনে বার হতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গেছল, তারা এই অঘ্রাণেই দিন ঠিক করতে চায়। তার আগে—

—কিন্তু ইন্দু—

—তোমার পায়ে পড়ি, আর তুমি কিন্তু ক'র না।

—কিন্তু একটা—

—তুমি যদি বল, আমি প্রণয় বাবুকে ধরে এখনই তোমার একটা কাজের জোগাড় করি।

—না।

—কি দোষ?

—তাঁর মত লোকের কাছ থেকে উপকার নিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।

—কিন্তু যদি এই অঘ্রাণে তারা—

—দিন ঠিক করে? বেশ ত!

ইন্দুর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; বিমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—না; বিমলের সুন্দর মুখখানি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া ভরসা পাইল, আর্ত্তকরুণকণ্ঠে বলিল, কি করবে বল?

—শোন ইন্দু, তোমায় বলি। আমি সুন্দরবনে চাষের কাজ করতে যাচ্ছি; এক কথায় যাকে বলে চাষা হতে যাচ্ছি। চাষার কুঁড়ে ঘরে তোমার মত ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ চায় না!

—ও কি? মা যে! উঃ, মা একেবারে গোয়েন্দাগিরি করেছেন।···না না, তুমি যেও না। যা হয় আজই একটা হয়ে যাক, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।

তাহার আর্ত্ত আকুল কণ্ঠস্বর লোক-কোলাহলে বিলীন হইয়া গেল। ফিরিয়া চাহিতে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, নিকটে অথবা দূরে বিমল কোথাও নাই। [ক্রমশঃ

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(৯) মেডিক্যাল-কলেজে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদ করেন কে?

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, স্বর্গত মধুসূদন গুপ্ত বৈদ্যরত্ন মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজে শবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বর্গত রাজকৃষ্ণ দে (১) মহাশয়ই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে টি-ই-ডি বিটন (T E D Bethune) সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে, মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে শবচ্ছেদ করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বেল্‌নস নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলাদ্বারা মধুসূদনের একখানি সুন্দর তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া মেডিক্যাল-কলেজের থিয়েটার-গৃহে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও ইহা সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিটন্-সাহেব (বেথুন সাহেব) বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই:—"মধুসূদনের শবচ্ছেদের সময় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, তাহার কথা আমি শুনিয়াছি। মধুসূদন প্রথমতঃ শবচ্ছেদ করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পরে তিনি স্থিরসংকল্প হন। শবচ্ছেদের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। একটী গুদাম-ঘরে একটী মনুষ্যের মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল। গুডিভ্-সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। মধুসূদন তাঁহার পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্যান্য ছাত্রগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া দরজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহসী না হওয়ায় তাহারা ঝিলমিলির ভিতর দিয়া কৌতূহল সহকারে দেখিতে লাগিল। যখন মধুসূদন একখানি সুশাণিত ছুরী লইয়া মৃতদেহের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিল, তখন তাহারা এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।"

বিটন্-সাহেব স্বচক্ষে উক্ত শবচ্ছেদ-ঘটনা দেখেন নাই। এচ্-এচ্ গুডিভ-সাহেবের মুখে তিনি ইহা শুনিয়াছিলেন মাত্র। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গুডিভ-সাহেব মেডিক্যাল কলেজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি উক্ত ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, শবচ্ছেদ-ঘটনার ১২ বৎসর পরে গুডিভ-সাহেব এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। গুডিভ-সাহেব মধুসূদনকে প্রথম শবচ্ছেদ-কর্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন। শবচ্ছেদ-ঘটনার ১২ বৎসর পরে যখন গুডিভ-সাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার স্মরণ ছিল না, ইহা বিলক্ষণ বোধ হয়।

---

(১) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারিকানাথ গুপ্ত (D. Gupta) রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র, এই ৪ জনই মেডিক্যাল কলেজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ছাত্র। রাজকৃষ্ণ দে সর্ব্ব প্রথমে শবচ্ছেদ করেন। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ-মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল-কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হন। মাসিক এক শত টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের চাকরী লইয়া তিনি দিল্লী গমন করেন। এক বৎসর মাত্র তিনি চাকরী করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ১১ বৎসর-বয়স্কা স্ত্রীকে রাখিয়া দিল্লীতেই দেহত্যাগ করেন। মহাত্মা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (Lord Auckland) এই দুঃসংবাদ পাইবামাত্র রাজকৃষ্ণের বিধবা বালিকা স্ত্রীকে ৩০০৲ (তিন শত) টাকা পাঠাইয়া দেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি তাৎকালিক হিন্দু-কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডি. এল্. রিচার্ডসন্‌কে রাজকৃষ্ণের জীবন-চরিত লিখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু রিচার্ডসন্-সাহেব কিছুদিন পরে বিলাত যাত্রা করায় জীবনচরিত লেখা হয় নাই। মহাত্মা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাস্তবিকই গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। উমাচরণ শেঠ মহাশয় মেডিক্যাল-কলেজের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে ৩০০৲ (তিন শত) টাকা মূল্যের একটি উৎকৃষ্ট সোণার ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন। উমাচরণ বাবুর পৌত্র হাইকোর্টের উকিল, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস শেঠ মহাশয় এই ঘড়ীটী যত্নসহকারে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ঘড়ীতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের নাম ক্ষোদিত আছে। লেখক এই ঘড়ীটী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলী (Mountford Joseph Bramley) মেডিক্যাল-কলেজের সর্ব্ব-প্রথম প্রিন্সিপ্যাল (First Principal) ও গুডিভ-সাহেব তাঁহার সহকারী অধ্যাপক (Assistant Professor) ছিলেন। ব্রামলী-সাহেব শবচ্ছেদের সময় স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার ৩ মাস পরে তিনি শবচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)।

"১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৮ অক্টোবর [১২৪৩ বঙ্গাব্দে, ১১ কার্ত্তিক, শুক্রবার] দিন উপস্থিত হইল। ইহা কলিকাতা-মেডিক্যাল-কলেজের ইতিহাসে অতি সুপ্রসিদ্ধ। চারিজন বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত ছাত্র শবচ্ছেদ করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্য চারিজন সহাধ্যায়ী ও কলেজের প্রোফেসর-গণের সম্মুখে তাঁহারা শবচ্ছেদ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। চারিজন সহাধ্যায়ী তাঁহাদিগকে তৎকালে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শবচ্ছেদকারিগণ যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে শবচ্ছেদ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত হয়।"

ডাক্তার ব্রামলী-সাহেব কেন যে এই চারিজন ছাত্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই, তাহারও কারণ আছে। তৎকালে হিন্দু-সমাজের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। কেহ কোন প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই তাঁহার লাঞ্ছনা ও অপমানের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া কেহ আহার করিত না। তাঁহার ধোপা ও নাপিত বন্ধ করা হইল। তাঁহার বাটীতে কেহই আদান-প্রদান করিত না। অগত্যা তাঁহাকে 'একঘরে' থাকিতে হইত। পাছে শবচ্ছেদ-কারী ছাত্রগণকে সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, এই হেতুই ব্রামলী-সাহেব তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। ব্রামলী-সাহেব ঘুণাক্ষরেও মধুসূদন গুপ্তের নামোল্লেখ করিয়া যান নাই। মধুসূদন সর্ব্বপ্রথমে শবচ্ছেদ করিলে ব্রামলী-সাহেব নিশ্চিতই তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া যাইতেন।

উক্ত যে চারিজন ছাত্র প্রথমে শবচ্ছেদ করেন, তাঁহাদের নাম উমাচরণ শেঠ, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। স্বর্গীত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কাহারও কোন কথায় সহসা বিশ্বাস করিতেন না। তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় Calcutta Journal of Medicine নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "মেডিক্যাল-কলেজে কোন্ জন সর্ব্ব-প্রথমে শবচ্ছেদ করেন, ইহা জানিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া আমার কৌতূহল ছিল। একদিন উমাচরণ শেঠ ও দ্বারিকানাথ গুপ্ত মহাশয়কে এক স্থানে একত্র দেখিতে পাইয়া প্রথম শবচ্ছেদকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উভয়েই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমরা চারিজনে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদ করি। তবে আমাদের চারিজনের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে সর্ব্ব-প্রথমে শবচ্ছেদ করেন।" (১)

---

(১) "On that day that is the 28th October, 1836 which may be regarded as an eventful era in the annals of the Calcutta Medical College, four of the intelligent and respectable pupils *at their own solicitation* undertook the dissection of the human subject, and in the presence of all the Professors of the College, and of four of their brother-pupils demonstrated with accuracy and nicety, several of the most interesting parts of the body; and thus was accomplished, through the admirable example of these four native youths, the greatest step in the progress towards true civilization which education has yet effected. At this first attempt, all their companions present assisted, and it was delightful to witness the emulation amongst them in displaying their willingness to recognise the importance of, and adapt, a mode of study hitherto contemplated with such horror by their fellow-countrymen."—*Dr. Bramley's First Report of the Calcutta Medical College.*

(১) Dr. Mahendralal Sarkar, M. D. writes :—"Babu Umacharan set has just retired from an honourable service of 34 years. Babu Dwarkanath Gupta has been practising as a private practitioner ever since he graduated. Babu Rajkrishna Dey was the individual who was the first to plunge the scalpel into the dead human body, and to whom therefore the meed of being the pioneer of dissection in Bengal is due."

Babu N. M. Koar writes :—"Of these 4 passed students the first named (Babu Umacharan) entered Government service and was placed in charge of Agra Dispensary, the second (Babu Rajkrishna) died prematurely, the third (Babu Dwarkanath) amasseh a large fortune in private practice, and the fourth

যখন শেঠ মহাশয় ও গুপ্ত মহাশয় মহেন্দ্রলাল সরকারকে স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর কি সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে ?

তৎকালের ছাত্রগণ কিরূপ শিক্ষা-লাভ করিয়া কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখুন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২১ নভেম্বর তারিখে S. Nicholson (Surgeon General Hospital), J .Grant (Surgeon Apothecary to the H. E. I. & Co), R. Martin (Presidency Surgeon, and Surgeon, Native Hospital), D. Stewart (Asst Surgeon. Supdt. Gen. of Vaccination), এই চারিজন সাহেব, H. T. Prinsep (Secretary to the Government of India) মহাশয়কে উক্ত প্রথম-পরীক্ষিত ৪ জন ছাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

1. Umacharan Sett—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.
2. Rajkrishna Dey—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.
3. Dwarkanath Gupta—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.

Nobinchunder Mitter—He was examined for two hours very searchingly, and exhibited excellent knowledge of his subject ; but somewhat obscured by a diffidence of manner already alluded to. He has been employed for some time as apothecary to the little···(?) attached to the College and has given great satisfaction.

(Babu Nabin Chandra) acquired a very high reputation, for high profession skill, integrity, strong sense of duty and an abiding desire to serve the poor."

ডেভিড হেয়ার সাহেব লিখিতেছেন :—

"During the Examinations (৭ নভেম্বর ১৮৩৮) of Nabin Chunder Mitter, two of the Examiners and some of the officers of the College proceeded to the dead-room to see operations performed on the dead body by Umachurn Sett and Rajkristo Dey who performed the operations of amputation in a very neat and satisfactory manners."

বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তার বাবুরা বলিয়া থাকেন যে, মেডিক্যাল-কলেজের প্রথমাবস্থায় যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যে সকল অধ্যাপকের নিকট তাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন না। তাঁহারা ফাঁকতাল্লায় কাজ সারিয়া দিতেন। বর্ত্তমান কালের ডাক্তার বাবুদের এই কথা সম্পূর্ণ অলীক। তাঁহারাই বরং ফাঁকতাল্লায় কাজ সারিয়া ও কিছু-মাত্র না শিখিয়া সেনেট হাউস (Senate House) হইতে সার্টিফিকেট আদায় করিয়া বাহির হন। তখনকার অধিকাংশ ডাক্তারই রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে ও যথাসাধ্য ঔষধ দিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিতেন। এখনকার ডাক্তার-গণ রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে জানেন না এবং তাহাকে সুস্থ করিতেও পারেন না। তখনকার প্রাচীন ডাক্তার দুইটী টাকা দর্শনী পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেন। এখনকার ডাক্তার বত্রিশ মুদ্রা না পাইলে রোগীর গৃহে পদার্পণ করেন না। কোন এক বিলাত-প্রত্যাগত বিখ্যাত ডাক্তার রোগীকে দেখিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, "ছেলেটি বেশ ভালই আছে আর কোন ভয় নাই।" এই মধুময় বাক্য-বিন্যাস করিয়া ও বত্রিশটী মুদ্রা পকেটস্থ করিয়া তিনি তাঁহার গাড়ীতে উঠিবামাত্র ছেলেটী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিন মিনিটের মধ্যে এই ঘটনা! এই অদ্ভুত ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল। হায় রে বৈলাতিক ডাক্তার সাহেব!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কাঁদি তাই নিরালায়

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

তোমার কথাটি মনে পড়ে শুধু
আর কা'রো কথা নয়,
বুঝি তুমি নাই ব'লে—
তোমার স্মৃতির মাধুরী পড়িছে
আমার নয়নে গ'লে!

দেরাজে বন্দী কাঁকন তোমার
কহিছে, "দুয়ার খোল
দেখি তা'রে একবার,
যে-জন আমারে বেঁধে রেখে গেছে
পীরিতি-নিগড়ে তা'র।
বেশী দিন নয়,—পরিচয় শুধু
এক বছরের হ'বে,
মধু-মিলনের রাতে—
আমারে তুলিয়া নিয়াছিল তা'র
মৃণাল-বিজয়ী-হাতে।
তা'র সিঁদুরের রঙ্ লেগে মোর
বর্ণ হ'য়েছে রাঙা
সরমে লুকাতে গিয়া,
প্রথম-পরশ-রক্তিম-মুখ
বাহুর আড়াল দিয়া।
তা'র দয়িতের প্রেম-চুম্বন
ভুল ক'রে মোর গালে
লাগিয়া সেদিন রাতে,
চঞ্চলি বুক তুলেছিল মোর
তাদের অসাক্ষাতে।
তা'র হাসি দেখে কত দিন মোর
খুশীতে ভ'রেছে হিয়া,
ব্যথায় কেঁদেছে প্রাণ,
ছোট-বড় তা'র কত স্মৃতি আজো
এ-চোখে জ্যোতিষ্মান্।

মনে পড়ে শেষ-বিদায়ের দিন
থেকে থেকে কাঁদে মেঘ,
শ্রাবণের চোখে জল,
পূবালী পবন চলে উন্মনা
পাখী শাখে চঞ্চল।
মেলিল না আঁখি সারা দিনমান
দেখালে না ম্লান মুখ
তপন অসহ শোকে;
দয়িতের কোলে আমার সখীর
শেষ ঘুম এল চোখে,
খোল খোল দ্বার, দেখি একবার
এখনও কি শুয়ে আছে
দেবী সেই অমরার!"

তোমার কাঁকনে বুঝাব কেমনে
নাই তুমি ওগো আর,
সাধ ক'রে কেনা হাতীর দাঁতের
কৌটায় ভরা তব
সিঁদুর কাঁদিছে ওই।
তোমার সিঁথিতে শেষ চুমা তা'র
ভস্মে মিশেছে, সই,
তোমার সাধের ময়না-টিয়া
কয় না আমার সাথে
অভিমানে কোনো কথা।
তুলসী-তলের ঘন আঁধারের
বুঝি না মর্ম্মব্যথা,
আঁধারের পর আঁধার আসিয়া
ভিড় ক'রে দিনশেষে
মন্ত্রণা কত করে,
সন্ধ্যা হইতে সারাটি রজনী
আমার শূন্য ঘরে।
হারানো দিনের কত কথা মোর
স্মরণের দ্বারে এসে
আগল খুলিতে চায়,
আমার এ ব্যথা বুঝিবে না কেহ
কাঁদি তাই নিরালায়।

গুরুবাদ

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না, আমি তা জানি। আমি যে কথা আজ বলিতে আসিয়াছি, সে কথা বলিবার অধিকার হয় ত বা আমার নাই, তা'ও আমি জানি। তবুও বলিতেছি, কেন না আমার মনে হইয়াছে, যে-ব্যাপার আমি বলিব, অন্তঃপুরকে তা অনেকখানি প্রভাবিত করে। তাই অন্তঃপুরের পাঠিকাদের কাছে কথাগুলি বলিতে আসিলাম। আমি কোনরূপ মন্তব্য করিব না। শুধু যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব।

গুরুবাদ আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই আছে। আমার বিদ্যার দৌড় অনেকদূর পর্যান্ত নয়, "চৈতন্যমঙ্গল" পর্য্যন্ত। সেই চৈতন্যমঙ্গলেও দেখি, গুরুবাদ বিদ্যমান। লোকের মুখেও শুনি, গুরুবাদ আমাদের দেশের অনেক কালের সম্পত্তি। আমরা ছেলেবেলায় বাড়ীতে দেখিতাম, বৎসরে একবার আমাদের পৈতৃক গুরুদেব আসিতেন। দেখিলেই বুঝা যাইত, খুব গরীব লোক। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, নতুনের সময় সাদা রঙের ছিল। এখন ছাই রঙের হইয়া গিয়াছে, পায়ে ছেঁড়া দু'পাটি চটি, গলায় এক-গোছা শুভ্র পৈতা, আর গায়ে একখানি উত্তরীয়। ঠাকুরমা, বাবা-মা সকলেই তটস্থ হইয়া পড়িতেন ঠাকুর মহাশয় আসিলে। সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইতেন, ঠাকুর মহাশয়ের ধুলি-ধুসরিত চরণের ধূলি তুলিয়া ঠোঁটে ঠেকাইতেন, মাথায় দিতেন আর বুকেও মাখিতেন। মা নতুন গাড়ুতে জল আনিয়া পা ধৌত করিয়া দিতেন, নতুন গামছায় পা মুছাইয়া দিতেন। যে স্থানে পা ধোয়া হইত, সে স্থানটি গোময় দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলা হইত। পাছে কেহ সেই পবিত্র স্থানে পদক্ষেপ করিয়া পবিত্রতার অসম্মান করে, তাই সেই সাবধানতা। গুরুদেবের ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে বাহির হইত, একটি ছোট হুঁকা আর একটি কলিকা। আমার পিত্রালয়ে চাকর-বাকরের অভাব ছিল না, তাহারা ছুটিয়া তামাক সাজিয়া আনিত, পুকুর-ঘাটে গিয়া হুঁকায় জল ভরিয়া আনিত। গুরুদেব বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেন, আর গল্প করিতেন। মা উনান জ্বালাইয়া, সিদা সাজাইয়া দিতেন, ঠাকুর মহাশয় নিজে পাক করিতেন। সিদা জিনিষটা কি তাহা হয়ত অনেক মেয়ে জানেন না, তাই জিনিষটা কি সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করিতেছি। একটা থালায় চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, তরী-তরকারী, মসলা সাজাইয়া দেওয়া হইত—ইহাকেই সিদা বলে। ঠাকুর মহাশয় যে ঘরে পাক করিতেন, সে ঘরে আমাদের কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। রন্ধনশেষে, আহারাদি শেষ করিয়া তিনি বাহিরে বসিতেন। তখন মাঠের ফসলের কথা, পুকুরের মাছের কথা, কলম-বাগানের আম-কাঁঠালের কথা, নানা বিষয়ের গল্প হইত।

ঠাকুর মহাশয় দুই একটি দিন থাকিতেন। বাহিরের ঘরে শুইতেন। বিদায়কালে বার্ষিক প্রাপ্য, ধুতি, চাদর ও দুই চারিটি টাকা দক্ষিণা লইয়া সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ, ছাতা ও লাঠি হাতে চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় বাড়ীসুদ্ধ সকলে গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া যেন ধন্য হইত। তিনিও যে যেখানে আছে, বাড়ীর চাকর-বাকর পর্য্যন্ত, সকলের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে যাইতেন।

আমার ঠাকুরমার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবার পর ঠাকুর মহাশয় আর পূর্ব্বের মত প্রতি বৎসর আসিতেন না। এক বৎসর অন্তর আসিতেন। মা তাঁহার জন্য প্রতি বৎসর পূজার সময় ধুতি-চাদর আনাইয়া তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। যখন আসিতেন, তখন পূর্ব্বের মত টাকা ও কাপড়-জামা যাহা জমিয়া থাকিত, দিয়া দিতেন। শুনিয়াছি এখনও আসেন, তবে দুই বৎসর পর পর আসেন। মা বলেন শুনিতে পাই,

আমার দাদাদের সংসার হইলে ঠাকুর মহাশয় আসিবেন না। দাদারা দিন দিন যে রকম সাহেব হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহারা দেবদ্বিজে ভক্তি করিবে এরূপ ভরসা তাঁহার একটুকুন্‌ও নাই। আমার মায়ের মতটা কিছু অদ্ভুত রকমের। মা বলেন, ইংরিজি লেখাপড়া বেশী শিখিলে লোকে ম্লেচ্ছ-ভাবের হইয়া পড়ে। ঠাকুর-দেবতা মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি করে না, বাপ-মাকেও তেমন কেয়ার করে না।

মায়ের মত অদ্ভুত বলিতেছি, সেই সঙ্গে স্বীকারও করিতেছি, এইরূপই দেখা যায় বটে।

বেশী ভক্তি, বেশী মান্য কেহ যেন কাহাকেও করিতে চায় না। গুরুদেব আসিয়াছেন, আসিয়াছেনই! পূজা পূজাই! এই রকমের ভাব। বাড়ীতে একটা টে'স্‌-সাহেব আসিলে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, গুরুদেব আসিলে বাবুদের সাড়া পাওয়া যায় না। কেহ সাহেব-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলে বাবুরা যে রকম প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন, পাড়ার দুর্গাপূজাতেও সে রকম হন না। আমরা ইহাই ত দেখিতে পাই।

কলিকাতা সহরে হঠাৎ একদিন অন্য রকম দেখিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। সেই কথাটিই বলিতে আসিয়াছি। আমার জা' কোথা হইতে খবর লইয়া আসিলেন, ভবানীপুরে এক সাধুবাবা আসিয়াছেন, তিনি নরদেহে দেবতা। হাজার হাজার রোগীর রোগ শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়াই সারাইয়া দিয়াছেন; মর-মর যক্ষ্মারোগীর উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন, আর তাহারা সারিয়া গিয়াছে; কত লোক মামলায় জয়লাভ করিয়াছে, যাহাদের সন্তান-সম্ভাবনা ছিল না, তাহারা বুড়া বয়সে কোলে ছেলে পাইয়াছে; যে 'মড়ুঞ্চে'-পোয়াতীর ছেলে হইয়া বাঁচে না, সাধু-বাবার দেওয়া বিল্বপত্র খাইয়া তাহার ছেলে মস্ত বড় হইয়াছে, এমনি আরও কত কথা। দিদি ঠিক করিলেন, সাধু-বাবা দেখিতে যাইবেন। বেশ ত, দিদি যান না। ওমা! দিদি একলা যাইবেন না। আমাকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার কোন দরকার নাই। আমার জন্যই তাঁহার যাওয়া! আমি তাঁহাকে কত বুঝাইলাম, কত সাধিলাম, দিদি বুঝিলেন না।

অবুঝে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে!

শেষ পর্য্যন্ত দিদির গোড়ে গোড় দিতে হইল। দুপুর বেলা বাবুরা বাড়ী নাই, সেকেণ্ড ক্লাস ঠিকা-গাড়ী আনাইয়া আমরা চলিলাম, সাধুবাবা দর্শনে। পাড়ার এক বিধবা ঘোষ-মাসী আমাদের সঙ্গ লইলেন। পরে জানিয়াছি, ইনিই দিদির সংবাদদাত্রী। তিনি বাড়ী জানিতেন, বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হইল না। গাড়ীটা আমরা ছাড়িলাম না, গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আমরা ভিতরে ঢুকিলাম।

কি ভিড়! ঘরের ত কথাই নাই, সিঁড়িতে, উঠানে পর্য্যন্ত লোক ধরে না—আমাদের জাতই সব। পুরুষ দুই একজন ছিলেন, তাঁহারা বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া। বাড়ীটা খুব বড়, চক্‌মিলানো, সাজান-গোজান। দেখিলেই মনে হয় বড়লোকের বাড়ী। ঘোষ-মাসী এই বাড়ীর লোকদের জানেন, কর্ত্তা যিনি, তিনি মাস তিন চার আগে মারা গিয়াছেন, হাইকোর্টের বড় কাউন্সেল ছিলেন। সাধুবাবা তাঁহার গুরুদেব। ঘোষ মাসী কেবল ঐ টুকুই জানিতেন। যে রোয়াকটিতে বসিয়া আমরা সাধু-দর্শনের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতেছিলাম, সেখান আরও অনেকে ছিলেন। তাঁহারা যে সকল গল্প বলিলেন তাহা খুব আশ্চর্য্যজনক।

বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তাঁহার বড় ছেলেটির বয়স যখন এক বৎসর, তাঁহারা কুমায়ুন পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেইখানে ছেলেটির নিউমোনিয়া হয়। ডাক্তারেরা যখন আশা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, সেই সময় এই সাধুবাবা কোথা হইতে আসিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, তোমার ছেলে আন দেখি। ব্যারিষ্টার সাহেব গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ভিতর হইতে খবর পাইয়া ছেলে কোলে লইয়া আসিলেন। সাধুবাবার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—বাবা রক্ষে কর।

সাধুবাবা ছেলেটির পানে একবারটি চাহিয়াই চক্ষু বুঁজিয়া ফেলিয়া হিন্দীতে বলিলেন, তুহারা বেটা আচ্ছা হো গিয়া।

যেমন না,এই কথা বলা, ছেলে চক্ষু খুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, একটু পরে 'আম্মা-আম্মা' করিতে করিতে হাত-পা নাড়িতে লাগিল। খানিক বাদে সেই ছেলে ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কিছুই অসুখ যেন তাহার হয় নাই।

পাশে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান।

আর একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ও বলিলেন—তাতে কি আর কথা আছে দিদি।

যিনি গল্প বলিতেছিলেন, তিনি আগের মতই বলিয়া চলিলেন ছেলের বাপের ততক্ষণে হুঁস হল, সাধুবাবার পা জড়িয়ে ধরলেন। সাধুবাবা বললেন, দীক্ষা নাও। কর্ত্তা-গিন্নী ভাল দিন দেখে দীক্ষা নিলেন। সেই লোক সাধুবাবা—এঁদের গুরু। এঁদের বাড়ীতে কখনও কোন বিপদ-আপদ হয় না।

যে আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি থাকিয়া থাকিয়া জোরে জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, তিনি খুব জোরে আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন--সাক্ষাৎ ভগবান, দিদি, সাক্ষাৎ ভগবান।

আর একজন অমনি বলিয়া উঠিলেন—তা নইলে কি এমনটি হয়!

যিনি গল্প বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—এইবার যখন কর্ত্তা গেলেন, সাধুবাবা হিমালয়ে ছিলেন, তখন এঁরা তাঁকে খবর দেন নি। সাধুবাবা এসে শুনলেন শিষ্য মারা গেছে।

শুনেই তিনি এঁদের বকতে লাগলেন, এঁরা তাঁকে খবর দেন নি কেন? গিন্নী কি বকাটাই না বকলেন। সাধুবাবা বললেন, তিনি এসে পড়লে শিষ্য কখনও ফাঁকি দিয়ে যেতে পারতেন না।

এই সময় সিঁড়ির উপরে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। নানান্ গোলমালের মধ্য হইতে শুনিতে পাওয়া গেল যে, সাধুবাবা মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম করিতেছেন, আজ আর দর্শন হইবে না।

প্রায় দেড়শো জন স্ত্রীলোক ছিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা আমি আপনাদিগকে অনুমান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মিনিট কয় খুব গোলমাল চলিল, কেহই নড়িতে চায় না, সাধু দর্শন না করিয়া যাইবে না। খুব গোলমাল।

একজন গিন্নী-বান্নি লোক সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া খুব মিনতিভরা সুরে বলিলেন, ঠাকুর খেয়ে শুয়ে পড়লেন, শরীর ভাল বোধ করছেন না। আপনাদের অনেক কষ্ট হল, কিন্তু কি করি বলুন। কোন দোষ নেবেন না, আর একদিন আসবেন।

গিন্নীর চেহারাটি ভাল, মুখখানিতে মাতৃভাব চল চল করিতেছে, আর কথাগুলিও মধুমাখা। গোলমাল তখুনি থামিয়া গেল। সকলেই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় একজন বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ গা মা, সেই ধাপাধাড়া গোবিন্দপুর বেলেঘাটা থেকে এই রোদ্দুরে আসছি, রোগা মেয়েটিকে পর্যান্ত টানতে টানতে এনেছিলুম মা, বাবার শরীর যখন ভাল নেই তখন কি আর বলব, আমাদেরই অদৃষ্ট, তবে মা, কথাবার্ত্তা আর একদিন হবে, আজ যদি একটি বার চোখের দেখাটা দেখে যেতে পারি মা, মন খানিকটা 'প্রবুদ্ধি' মানে।

গৃহিণী সত্যই সজ্জন লোক। বলিলেন—তা বেশ ত। সাধুবাবার ঘরের জানালা খোলাই থাকে, শুধু দেখতে চান আসুন।

যেই বলা আর সবাই ফিরিয়া দাঁড়াইল, না দেখিয়া যাইবে না। ঘোষ-মাসীকে লইয়া আমরা সদর দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ফুটপাথটি পার হইলেই গাড়ীতে উঠা হয়। কিন্তু ঘোষ-গিন্নী ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, মাসী ফের কেন?

মাসী বলিলেন—ওমা? তাও না কি আবার হয়! মন্দিরে এসে ঠাকুর না দেখে বুঝি যাওয়া যায়? চল বৌমারা চল

আমি বলিলাম—আরও একদিন যখন আসতেই হবে, তখন আজ আবার কেন?

ঘোষ-মাসী ধমক দিবার আগেই দিদি চোখ টিপিয়া বলিলেন—চল না দেখেই আসি।

দুই ঘণ্টা ঠায় বসিয়া বসিয়া আমার কিছু যেন ভাল লাগিতেছিল না, আমিও চোখ টিপিয়া দিদিকে জানাইলাম, থাক্ না!

কিন্তু দিদি শুনিলেন না সে কথা, কিম্বা বুঝিতে পারিলেন না, অথবা ঘোষ-মাসীর ভয়ে আমার কথার সায় দিতে পারিলেন না, আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, কতক্ষণ আর লাগবে!

বারান্দার দিকে একটি জানালার সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর গৃহিণী সকলকেই তুষ্ট করিতে চান, কেবল ভিড় সরাইয়া সরাইয়া দিতেছেন। যখন আমরা সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পিছনে আর কেহ বাকী নাই। ভিড় সরাইয়া গিন্নী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ঐ দেখ মা ঠাকুর শুয়েছেন। যেটি পায়ে হাত বুলোচ্ছে উটি আমার বড় বেটার বৌ; আর একটি আমার মেয়ে। হাইকোর্টের জজের মেজ-ছেলের সঙ্গে এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে। জজেরা এসব পছন্দ করেন না, আনি-কে আসতে দিতে চান না, অনেক কথা বলে আনিয়েছি। আনি না এলে ঠাকুরের কিছু ভাল লাগে না।

বাড়ীর গিন্নী আমাদের সাথে কথা বলিতেছেন দেখিয়া যে ভিড় আগাইয়া সিঁড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেই ভিড় মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া আমি দিদিকে ধাক্কা দিয়া বলিলাম—চলুন না দিদি।

ঘোষ-মাসী ঠক্ ঠক্ করিয়া জানালার কাঠে মাথা ঠুকিয়া বিড় বিড় করিয়া কত সব কথা বলিতে লাগিলেন। আর একবার ঘরের ভিতরটি দেখিয়া লইয়া আমি দিদিকে আর একটি ধাক্কা দিলাম।

ঘরের ভিতরে সাধুবাবা পান চিবাইতে চিবাইতে সেবা-কারিণীদের সঙ্গে হাসি-গল্প করিতেছেন। কেন জানি না ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি যেন চলিয়া যাইতে

পারিলে বাঁচি। ঘোষ-মাসীর প্রণাম করা আর শেষ হয় না। দিদি কোন কথা বলেন না দেখিয়া আমিই ঠোঁটকাটার মত বলিয়া ফেলিলাম, মাসি চলুন, বেলা যে পড়ে এল।

দিদি উঠানের দিকে চাহিয়া ভয় পাইলেন। বেলা শেষ হইয়া আসিল বলিয়া। বাবুরা যদি আমাদের আগে বাড়ী আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে কি যে হইবে, কে তাহা বলিতে পারে। দিদি মাসীকে তাড়া দিতে মাসী আবার কতকগুলি ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া চলিতে লাগিলেন। গৃহিণী মাসীর ভক্তি দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—কবে আপনারা আসছেন আবার?

দিদি বলিলেন—কাল আসব মা।

—একটু সকাল-সকাল আসবেন। সবায়ের আগে বাবার সাথে দেখা করিয়ে দোব। কারুর অসুখ-বিসুখ আছে বুঝি?

এই প্রশ্নের যে জবাব দিদি দিবেন তা আমি জানি, তাই আমি একটু আগে সরিয়া গেলাম।

বাড়ীতে আসিয়া বলিলাম—আমি যাব না আর।

আমার মরণদশা, আমি মরিলে তিনি বাঁচেন (যদিও আমি সতীন নই, জা) আমার জন্য তাঁহার কোন *সুখ* নাই, এই সব গালি শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, গায়ে লাগে না। তাই আবার বলিতে পারিলাম, আমি যাব না।

কিন্তু দিদিকে পারিবার জো নাই। পরের দিন হেঁচড়াইয়া টানিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিলেন। তিনি ও ঘোষ-মাসী দুই জনে আজ মনের সাধ মিটাইয়া আমার পিণ্ড চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে চলিলেন। আমি থাকিলাম চুপ করিয়া।

বোবার শত্রু নাই।

সেদিন আরও ঘটা। লোক অনেক বেশী। পুরুষও অনেক।

মা গো! অত পুরুষ মানুষের ভিড়ের ভিতর দিয়া যাই কি করিয়া? ঘোষ-মাসী ডিঙ্গী মারিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া চলিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার পিছনে চলিতেছি।

সাধুবাবার ঘরে যে কত লোকে বসিয়া আছে গুণিয়া বলা যায় না। অনেক ভারী-ভারী চেহারার পুরুষ মানুষও রহিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা সকলেই বড়মানুষ।

পাগলা ঘোড়ার মত আমিও অনেকবার বাঁকিয়া দাঁড়াইলাম, যদি পাশ কাটাইতে পারি। দিদি কঠিন করিয়া আমার হাত ধরিয়া রহিলেন।

সাধুবাবার চেহারা দেখিলে ভক্তি হয়। মোটা-সোটা গোল-গাল ফর্সা চেহারা। পরিয়াছেন শাদা সিল্কের কাপড়, গায়ে গেরুয়া সিল্কের আংরাখা (কতকটা ফিতাবাঁধা ফতুয়ার মত)। মাথায় ঘন চুল না থাকিলেও চেরা সিঁথি কাটা, দাড়ী কাঁচা-পাকা মেশা, কুঞ্চিত। সাধুবাবা সৌখীন লোক তা বেশ বোঝা যায়।

আমরা যখন ঘরে ঢুকিলাম, তখন সাধুবাবা বলিতে-ছিলেন—হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের জজসাহেব রোজ চিঠি লিখছেন যাবার জন্যে, আজ আবার টেলি পাঠিয়েছেন। আর এদিকে ত দেখছই, ..ক্ষিতির পা দুটোর উপর শুয়ে পড়ল, তার বাড়ীতে তিন রাত্রি বাস না করে গেলে সে আত্মহত্যা করবে। কি করি তা তোমরাই বল?

কেহই কোন কথা বলিল না।

সাধুবাবাই বলিতে লাগিলেন—আমি বলি কি গুরুদেবকে কেটে তোমরা সবাই ভাগ করে নাও। আমিও নিশ্চিন্ত হই, তোমরাও বাঁচ।

গুরুদেব নিজেই খুব উচ্চ শব্দ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর সকলে চুপ করিয়া রহিল।

—আবার ওদিকে কি মজা হয়েছে জান? মাইশোরের যুবরাজ ষ্টেটসেলুন পাঠাবেন বলে চিঠি লিখেছেন, যুবরাণী পুত্রেষ্টি যাগ করবেন, গুরুদেবকে না হলে হবে না।

কতক্ষণ বলিতে পারি না, তবে অনেকক্ষণই বটে, এই রকম কথা তিনি একলাই বলিতে লাগিলেন; আর সকলে কেবল শুনিতে লাগিল।

গুরুদেবের জন্য খাদ্যদ্রব্য আসিল। একজন মানুষের জন্য যে এইরূপ বিরাট আয়োজন করার দরকার হয় ইহা মনে করাও দুঃসাধ্য।

গুরুদেব খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিলেন। ঘোষ-মাসী কতবার গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া দিদির মনোদুঃখের কারণটি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই পারিলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত বেলা পড়িয়া আসিল দেখিয়া আগের দিনের মত অনেকেই চলিয়া যাইতে লাগিল। গুরুদেব তখনও হায়দ্রাবাদের, মাইশোরের গল্প করিতে লাগিলেন।

আমরাও চলিয়া আসিলাম। দিদিও আর যাইবেন না বলিয়া আমাকে বাঁচাইলেন। তবে তাঁহার সে দুঃখ ঘুচিল না তাহা বেশ বুঝিলাম।

সেকালের গুরুদেবও দেখিয়াছি, একালের গুরুদেব দেখিলাম। জানি না কে বড় আর কে ছোট।

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত

আমাদের কথা

আমাদের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই কোন না কোন বিষয়ের কোন না কোন পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে হইতেছে। তাহাতে হয়ত কেহ কেহ মনে করিবেন যে, বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমাদের পত্রিকার পরিচালক যে কয়েকজন বণিক তাহা খুব সম্ভব আমাদের পাঠকগণ বিদিত আছেন। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—ইহা অন্ততঃপক্ষে আমাদের পরিচালকগণের অভিমত।

আমাদের চোখের সম্মুখে আছেন বেকার ও দুরবস্থাপন্ন শিক্ষিত যুবকগণ। আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং পরিশ্রমী। প্রকৃতি যতগুলি গুণ বাঙ্গালী যুবকগণকে দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী যুবকগণের প্রায়শঃ কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া এবং প্রয়োজনানুরূপ উপার্জ্জন হওয়া উচিত ছিল—ইহা আমাদের অভিমত। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকেই বেকার হইয়া পড়িতেছেন এবং যাঁহারা কোন না কোন কর্ম্ম-নিয়োগ পাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেরই প্রয়োজনানুযায়ী উপার্জ্জন পর্য্যন্ত হইতেছে না। এতাদৃশ বিষম অবস্থার কি কারণ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে বসিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, শিক্ষা দুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমাদের নিরপরাধ উজ্জ্বল-রত্নগুলি জীবনক্ষেত্রে হাবুডাবু খাইতেছেন।

যুবকগণের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও পরিশ্রমানুরাগ যাহা দেখা যায়, তাহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যথা সময়ে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে তাঁহারা প্রায়শঃ চাকুরী না করিয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে চাকুরী না পাইলে প্রায়ই কেহ স্বীয় জীবিকার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না এবং চাকুরী পাইলেও কি করিলে নিয়োগকর্ত্তাকে লাভবান করিতে পারা যায়, তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

যুবকগণের এই অবস্থার মূল কারণ শিক্ষকগণের দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব এবং পাঠ্য পুস্তকের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি—ইহা আমাদের বিশ্বাস। কাযেই বাধ্য হইয়া প্রখ্যাতনামা অধ্যাপকগণের ত্রুটী কোথায় তাহা আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে।

কোন অধ্যাপকের প্রতি ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ আমাদের নাই। আমরা যে সমস্ত অধ্যাপকের ত্রুটী দেখাইয়াছি, তাঁহারা কেবল ত্রুটীপূর্ণ ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু তাঁহাদের স্বপক্ষেও বহু কথা বলিবার আছে।

আমরা এতাবৎ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ডাঃ শিশির-কুমার মিত্র ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছি।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তের পুস্তকগুলিতে চিন্তাশীলতার কোন পরিচয় প্রায়শঃ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সেগুলিতে পরিশ্রমশীলতা ও অধ্যয়নশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের একটী বক্তৃতার বিরুদ্ধে আমরা

সমালোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু এতাবৎ আমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে যোগ্যতর বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পাওয়া সম্ভব নহে। মানুষ ভুলভ্রান্তিহীন হইতে পারে না, কিন্তু যে-মানুষ স্বীয় ভুলভ্রান্তি আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন, অথবা অপর কেহ তাহা দেখাইয়া দিলে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ছাত্র এবং তাঁহারই পক্ষে প্রকৃত অধ্যাপক হওয়া সম্ভব।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের অবোধ্য। তিনি যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে তিনি যে স্বভাবতঃ চতুর তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কোন পুস্তকেই তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা করিয়াছেন, অথবা ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহা যে তাঁহার সম্পূর্ণ জানা আছে ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রয়োজন হইলে তাঁহার এক একখানি পুস্তক অবলম্বনে তিনি কোন্ শ্রেণীর পণ্ডিত এবং তাঁহার লেখা যে কত অসার, তাহা আমরা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। আমাদের মনে হয়, ডাঃ চট্টোপাধ্যায় শ্রেণীর অধ্যাপক আমাদের যুবকগণের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টজনক আদর্শ।

অত্যন্ত তিক্ত বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত এবং তজ্জন্য আমরা ভগবানের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর ও কৃষির অবস্থা

কৃষির কথা ভাবিতে বসিলে কৃষকের কথা ও জমীদারের কথা মনে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বাঙ্গালার কৃষিদ্বারা তিন শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং বাকী লোক পরোক্ষভাবে চিরদিন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। যে তিন শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষভাবে চিরদিন কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের নাম—(১) কৃষক, (২) পাট্টাদার, (৩) জমীদার।

কৃষি-সম্বন্ধে এই তিন শ্রেণীর লোকের কাহার কি দায়িত্ব ছিল তাহা বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, কৃষকের কার্য্য সাধক অথবা যোগীর মত পরিশ্রম করিয়া যাওয়া। সে বৃষ্টিতে ক্লেশ অনুভব করিতে পারিবে না, রৌদ্র-তাপের প্রাখর্য্য তাহাকে বসন্তের স্নিগ্ধতা বলিয়া মনে করিতে হইবে; জমীর উর্ব্বরতা, উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মবশ্যতা অবলম্বনে তাহাকে জমী হইতে শস্য উৎপাদন করিতে হইবে; যাহার যাহা পাওনা-গণ্ডা তাহা তাহাকে সদ্ভাবে চুকাইতে হইবে এবং তাহার নিজের অথবা পরিবারের অন্নবস্ত্রের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিল কি না তদ্বিষয়ে সে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। সে পেট ভরিয়া খাইতে পাক আর না পাক, অর্দ্ধাশন অথবা অনশনের জন্য সে দুর্ব্বল অথবা সবল হউক, সুস্থ অথবা অসুস্থ হউক, জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি থাক আর নাই থাক, পাওনাদারের পাওনা-গণ্ডা যদি কৃষক যথাসময়ে চুকাইতে না পারে, তাহা হইলে কৃষককে ‘অলস’ এবং ‘অসৎ’-বিশেষণে অভিহিত করিতে হইবে।

পাট্টাদারের কার্য্য এক সময়ে ছিল গ্রামে থাকা, জমীদারের নায়েবগণের সহিত সদ্ভাব রাখা, তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং কৃষকগণের নিকট হইতে যাহাতে অতিরিক্ত কিছু আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা। কৃষকগণের মধ্যে একতা থাকিলে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদায় করা ক্লেশকর হইত। কাযেই তাহাদের একতা যাহাতে না থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ যাহাতে বাড়িয়া যায়, তদ্বিষয়ে পাট্টাদারগণকে যত্নশীল হইতে হইত। আজকাল পাট্টাদারগণের আর সে বালাই নাই। পেটের জন্য তাঁহাদের অধিকাংশেরই গ্রাম ছাড়িয়া সহরবাসী হইতে হইয়াছে।

জমীদারদিগের কার্য্য একসময় ছিল গ্রামে থাকা, প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু-না-কিছু জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহারা যে জমীদার তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া, আমোদ-প্রমোদ করা এবং পরস্পরের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহা লইয়া ঝগড়া, মারামারি এবং দলাদলি করা। জমীদারদিগেরও এখন আর প্রায়শঃ গ্রামে থাকার বালাই নাই। কড়া শাসনে যাহাতে প্রজাগণের নিকট হইতে পাওনা-

গণ্ডা ষোল আনার স্থলে আঠার আনা আদায় হয়, নায়েবগণের সহিত তদ্বিষয়ক চুক্তির ব্যবস্থা করিয়া সহরে বাস করা, দেনা করিয়া ধনিকগণকে আদর-আপ্যায়ন করা এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করা, চাকর-বাকরের (house servants) সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তিন টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় কেনা, অস্বাভাবিক সময়ে নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত থাকা—এখনকার জমীদারদিগের কার্য্য।

কৃষি সম্বন্ধীয় এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের অবস্থা দেখিয়া বলিতে হয় যে, কাহারও জমীর উর্ব্বরতার দিকে লক্ষ্য করার দায়িত্ব ছিল না, অথবা কেহই ঐ দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেন না। অথচ ভারতীয় ঋষিগণের জমী-বিষয়ক কথাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমী সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর লোকেরই যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং ঐ দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালিত হইলে, ভারতবর্ষে কাহারও অন্নাভাব অথবা অস্বাস্থ্য আসিতে পারিত না।

প্রধান ভূম্যধিকারীর অথবা জমীদারের যে যে দায়িত্ব ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) কোন্ ঋতুতে কোন্ জমী কোন্ কোন্ শস্য উৎপাদনক্ষম তাহা লক্ষ্য করা ;

(২) বিভিন্ন বৎসরের একই ঋতুতে একই জমীর উৎপাদনক্ষমতার তারতম্য কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করা ;

(৩) বিভিন্ন কৃষিপদ্ধতিতে একই জমীর উৎপাদন-ক্ষমতার তারতম্য কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করা ;

(৪) কোন জমীর উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যধিক মাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;

কোন্ জমীতে কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বপন করা যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা ;

স্ব স্ব এলাকার (territory) প্রয়োজনীয় কোন্ কোন্ কৃষিজাত দ্রব্য অন্য কোন্ এলাকা হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা ;

(৭) কৃষকগণকে কৃষিকার্য্য হইতে অবসর-সময়ে কোন্ কোন্ শিল্পকার্য্যের দায়িত্ব দিতে হইবে তাহা স্থির করা ;

(৮) স্ব স্ব এলাকায় কোন্ কোন্ ব্যবস্থার প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করা ;

(৯) মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের কি কি কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য কি কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা স্থির করা এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(১০) কৃষকদিগের কি কি কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য কি কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা স্থির করা এবং তদ্বিষয়ে মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের অথবা পাট্টাদারগণের যে যে দায়িত্ব ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) প্রধান ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা ;

(২) প্রধান ভূম্যধিকারিগণের পরামর্শানুযায়ী কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিতেছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা।

মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা, তদনুরূপ কার্য্য করা, স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া জমী হইতে উৎপাদন করা ছিল কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের প্রধান কার্য্য।

ব্রাহ্মণ, প্রধান ভূম্যধিকারী, মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী এবং কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধীয় ঋষিদিগের কথা অতীব বিস্তৃত এবং এইখানে তাহার সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই চারি শ্রেণীর লোকের স্কন্ধে অতীব গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ঐ চারি-শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, প্রধানতঃ তাহারই ফলে ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ অনন্যসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

বহুদিন হইতে আমরা আমাদের গৌরবের যাহা কিছু ছিল তাহা হারাইয়াছি ইহা খুব সত্য, কিন্তু কিছু দিন আগেও আমাদের গৌরবময় সংগঠনের কাঠামোটী বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের অন্নাভাব ছিল না।

যে-দেশে অন্নাভাব কাহাকে বলে তাহা মানুষ জানিত না, যে-দেশে অন্নের জন্য মানুষের কখনও বিব্রত হইতে হইত না, সেই দেশে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে এখন প্রায় প্রত্যেকের অন্নের জন্য প্রতিনিয়ত বিব্রত থাকিতে হইতেছে। এইরূপভাবে আর কিছু দিন চলিলে আমাদের গৌরবময় সংগঠনের কাঠামোটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন আগে কৃষি-ঋণ লাঘব বিল আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পাঠকগণ অবগত আছেন।

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, উত্তর-বঙ্গের জমীদারদিগের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব-সচিব স্যর বি. এল. মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া জমীদারদিগের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন:—ঋণপরিশোধার্থ সরকার হইতে তাঁহাদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং যতদিন পর্য্যন্ত জমীদারদিগের ঋণ শোধ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সরকার তাঁহাদের জমীদারী পরিচালন-ভার গ্রহণ করুন—ইহাই হইল জমীদারদিগের প্রতিনিধি-বর্গের কথা। রাজস্ব-সচিব এই কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জমীদারদিগের প্রার্থনা আংশিক পরিমাণে পূর্ণ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

কৃষি-ঋণ লাঘব বিল ও জমীদারদিগের উপরোক্ত দুঃখের কাহিনী বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার পরিচায়ক।

কৃষি লাভজনক থাকিলে কৃষকের দেনা করিবার প্রয়োজন হইত না এবং পঞ্চাশ বৎসর আগেও বাঙ্গালার কৃষকের এতাদৃশ দেনার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যে দিন হইতে কৃষিকার্য্যের লভ্যাংশ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষকেরও দেনা আরম্ভ হইয়াছে।

জমীদারদিগের অবস্থার জটিলতা ও ঋণ আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতে, যেদিন তাঁহারা জমী ও গ্রাম-সম্বন্ধীয় স্ব স্ব কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। যদি তাঁহারা জমী ও গ্রাম-সম্বন্ধীয় স্ব স্ব কর্ত্তব্যে মনোযোগী থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আয় অপেক্ষা অধিকতর ব্যয়সঙ্কুল প্রতিষ্ঠালাভের কথা মনে স্থান দিবার অবসর হইত না এবং তাঁহারা অথবা কৃষকগণ দায়গ্রস্ত হইতেন না।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এই দুইটী কার্য্য কৃষক ও জমীদার-দিগের দুরবস্থার প্রতি সমবেদনার পরিচায়ক এবং ঐ সমবেদনার জন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র বটে, কিন্তু বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ যাহা করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের কোন উপকার হওয়া ত' দূরের কথা, অপকার হইবারই আশঙ্কা আছে।

যে কারণে কৃষি লোকসান-জনক এবং কৃষক ঋণভারগ্রস্ত হইতেছে, তাহা অপসারিত না করিয়া কৃষকের ঋণভার আপাতত লঘু করিয়া দিলে পুনরায় কৃষকের ঋণগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। পরন্তু মহাজনের ন্যায্য প্রাপ্য টাকা যথা সময়ে পরিশোধ না করিবার সুযোগ কৃষককে দেওয়া হইলে কৃষক ও মহাজনদিগের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। আজ মহাজনদিগের অনিষ্ট সাধন করিয়া কৃষককে ঋণভার হইতে মুক্ত করিলে, কৃষকের যে অন্যায্য দাবীর সহায়তা করা হইবে, তাহাতে কি কৃষকের অধিকতর অন্যায্য দাবী করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত করা হইবে না? এই অন্যায্য প্রবৃত্তির ফলে কৃষক যে একদিন ঐ জাতীয় অন্যায্য দাবী গভর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করিবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? অধিকন্তু মহাজনগণও দেশীয় লোক ও গভর্ণমেণ্টের প্রজা। যে কার্য্যে কোন প্রজার প্রতি কিছুমাত্র অবিচার হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা করা কি কোন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? তাহাতে কি জনসাধারণের মধ্যে অসন্তুষ্টি উৎপাদন করা হইবে না? ঋণের কারণ অপসারিত না করিয়া এইরূপ ভাবে ঋণভার লঘু করিয়া দিলে কৃষকগণেরও অনিষ্ট হইবে। কারণ, আবার যখন তাহাদের ঋণ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন ঋণ পাওয়া ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইবে।

জমীদারদিগের কাছে জিজ্ঞাস্য যে, জমীদারী হইতে উপার্জ্জন যাহাতে বাড়িয়া যায় এবং স্ব স্ব বৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কোন কি উপায়ে ঋণ-

গ্রহণের সুবিধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিলে অথবা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে জমীদারীর পরিচালনা-ভার ছাড়িয়া দিলে কোন ফলোদয় হইবে কি? এতাবৎ যে কয়টী জমীদারী ঋণভারাক্রান্ত হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়টী ঋণমুক্ত হইয়া আবার জমীদারদিগের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

বাঙ্গালার গবর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সনের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, তিনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তদ্দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাময়িক বাহবা অর্জ্জন করিতে পারিবেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অথবা ভারতীয় প্রজার কোন স্থায়ী উপকার সাধন করা হইবে কি?

পল্লী-উন্নয়ন এবং গভর্ণমেণ্ট

ভারতীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের কথা লইয়া যে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। গ্রামের উন্নতি কাহাকে বলে এবং তাহা সাধন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি ব্যবহার প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কি ধারণা, তাহা আমরা এখনও কোন বিবৃতি হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি নাই।

সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট পল্লী-উন্নয়ন বিধি (The Manual of Rural Development) নামক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন।

"যাহাতে পল্লীবাসীর অপচয় হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, উপার্জ্জন সম্ভাবনা (resources) ও ধন-সঞ্চয় বাড়িয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য" —ইহা ঐ পুস্তকের কথা। ইংরাজী ভাষায় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ শ্রুতিমধুর হইলেও তাহার বাস্তব অর্থ কি তাহা প্রায়শঃ স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। ইহার জন্য দায়ী আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, না ইংরাজী ভাষা, না সরকারী কর্ম্মচারিগণের স্বভাব—তাহা বলা শক্ত।

প্রত্যেক মানুষ কি চাহে এবং মানুষের কি পাওয়া উচিত তাহা স্থিরীকৃত না হইলে, মানুষের অপচয় কোথায়, মানুষ কুশিক্ষার জন্য নিজেকে অসুখী মনে করিতেছে অথবা বাস্তবিকই সে অসুখী ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করা যায় না।

প্রত্যেক মানুষ চাহে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, কিছু কিছু আসবাব, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, সততা, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন। ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক মানুষের তাহা চল্লিশ বৎসর আগে বহুলাংশে বর্ত্তমান ছিল। আজ তাহা নাই কেন এবং আগে তাহা ছিল কি উপায়ে, তাহা প্রথমতঃ স্থির করিয়া না লইলে কোন প্রকৃত পল্লী-উন্নয়ন সম্ভব হইবে কি?

গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে পল্লী-অভিমুখী হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। আমাদের মতে ইহা খুব ভাল কথা। ভারতবাসী যে চিরদিনই প্রায়শঃ পল্লীবাসী ছিল, তাহার প্রমাণ ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের সহরের সংখ্যা। এখন যেরূপ জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় সহর গড়িয়া উঠিতেছে—ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এত সহর ছিল না। বড় বড় জমীদার-মহাজন-দিগের কথা বাদ দিলে, অন্নাভাবের তাড়নায় ছাড়া কোন ভারতবাসী আরাম-উপভোগের জন্য স্বেচ্ছায় সহরাভিমুখী হয় নাই। ভারতবাসীর কেন অন্নাভাবের তাড়না উপস্থিত হইল, কেন সে সহরাভিমুখী হইতে বাধ্য হইল, তাহা আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

চল্লিশ বৎসর আগে দেশের যে অবস্থা ছিল এখন আর তাহা নাই। অন্নাভাব না থাকিলে দেশে ও সমাজে গল্প-গুজব ও ফাঁকা-কথা চালাইলেও চালান যাইতে পারে। কিন্তু এখন আর ফাঁকা-কথায় চিঁড়া ভিজাইতে চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইবে কি?

বঙ্গীয় সরকার এবং অন্তরীণদিগের কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার পরিকল্পনা

অন্তরীণগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়, তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গালার গভর্ণর স্যর জন এণ্ডার্সন একটী বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, দুইশতাধিক অন্তরীণ শিক্ষালাভেচ্ছু হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

অন্তরীণগণকে জেলে পচাইয়া মারা অপেক্ষা তাঁহারা যাহাতে বিভিন্ন মনোবৃত্তি লাভ করিয়া সংসারী হন এবং স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাহার ব্যবস্থা করা দেশের ও দশের মঙ্গলজনক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্যর জন এণ্ডার্স ন এই ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন। কিন্তু যে ব্যবস্থাদ্বারা অথবা শিক্ষাদ্বারা এতাবৎ কাহারও চাকুরী না পাইলে স্থায়ীভাবে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় নাই, সেই শিক্ষায় অন্তরীণগণ স্ব স্ব অন্নোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবেন কি?

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প-বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র এতাবৎ পাঠ সমাপ্ত করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিতেছেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি? বর্ত্তমান সময়ে দেশে কৃষি ও শিল্পের যে অবস্থা, তাহাতে ঐ ঐ ব্যবসা দ্বারা যদি জীবিকার্জ্জন করা সুসাধ্য হয়, তাহা হইলে কৃষক ও শিল্পিগণের পক্ষে লাভবান হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন? যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ঐ ঐ ব্যবসা অবলম্বনে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেই বাঁচিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তরীণগণকে কৃষি ও শিল্পশিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জ্জনক্ষম করিবার চেষ্টা করাকে কি "বাজে কথা" বলিয়া আখ্যাত করা যায় না?

শিক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কোন্ বস্তু অথবা কোন্ ব্যবস্থা মানুষের ইষ্টপ্রদ অথবা অনিষ্টপ্রদ তাহা জানা। শিক্ষা যথাযথ হইলে কোন্ কোন্ বস্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং তাহা কি উপায়ে উপার্জ্জন করিতে হয়, অন্যদিকে কোন্ কোন্ বস্তু মানুষের বর্জ্জনীয় এবং তাহা কি করিয়া বর্জ্জন করিতে হয়—তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। আমাদের মতে আমাদের শিক্ষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজ্য-পরিচালনার ভার বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। যেদিন আমাদের শিক্ষা যথাযথ হইবে, সেই দিনই আমাদের রাজ্য-পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য থাকিবে না।

বর্ত্তমান রাজ্য-পরিচালনার সংগঠন (Constitution) অনুসারে বহু কার্য্য আমাদের দেশীয় মন্ত্রিদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষা যদি যথোপযুক্ত হইত, তাহা হইলে কি করিয়া স্ব স্ব সেক্রেটারি-গণের অথবা গভর্ণরের মুখাপেক্ষী না হইয়া, জনসাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন এবং জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে অসন্তুষ্টি অনুভব না করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিত। দেশময় যে চাঞ্চল্য জাগ্রত হইয়াছে, তাহার যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে প্রধান—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও শিক্ষা-বিভাগের অদূর-দর্শিতা এবং অনাচার।

শিক্ষা এত বিকৃত হইয়াছে যে, এখন আর মানুষ কি হইলে তাহার নিজের ভাল হয়, তাহা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে জানে না। ঝগড়াঝাঁটিতে মানুষের কখনও ভাল হয় না, ইহা প্রাথমিক সত্য, অথচ এখন আর মানুষ ঝগড়া-ঝাঁটির কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিতে জানে না।

সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সভার কতিপয় প্রতিনিধি কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধিগণের মতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সংসাধিত হইলে কৃষকগণের মঙ্গল সাধিত হইবে:—

(১) ঊর্দ্ধতন পরিষদবিহীন আইন-সভার এবং কৃষক ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী জমিদারপ্রমুখ সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী রহিত করণ।

(২) যে পর্য্যন্ত জমীদারগণ সংরক্ষিত আসন চাহিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে যেন সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে সদস্য পদপ্রার্থী হইতে না দেওয়া হয়।

(৩) জমীদারী বা তালুকদারীতে এবং অন্যান্য অঞ্চলের কৃষক-সঙ্ঘ সমূহ আইন অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট, জমীদার প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে।

(৪) লোকাল বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্ব্বাচনে প্রচারকার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কৃষক ও কৃষি-শ্রমজীবীদের একটি রাজনৈতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৫) সমস্ত জমীর উপর ন্যূনতম ও একহারে কর ধার্য্য করিতে হইবে। জল-করের হারও বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অনেক কম করিতে হইবে।

(৬) ১৯২৯ সাল হইতে পুনরায় সেটেলমেণ্টের ফলে বর্দ্ধিত ভূমি-রাজস্ব নাকচ করা এবং মাদ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বত্র পুনরায় সেটেলমেণ্ট বন্ধ করা।

(৭) প্রত্যেক প্রদেশে সেচ ও শিল্পোন্নতির জন্য স্বতন্ত্র বাজেট প্রস্তুত করিতে হইবে। সেচের বাঁধ, খাল প্রভৃতি হইতে যে লাভ হইবে, উহার সমস্তই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও অন্যান্য অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থার উন্নতি এবং হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীমের প্রসারের জন্য ব্যয়িত হইবে।

(৮) অবিলম্বে তুঙ্গভদ্রা-কৃষ্ণা রিজার্ভার প্রজেক্ট, ভবানী প্রজেক্ট এবং অন্যান্য ছোট ছোট বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(৯) যাহাতে টেরিফ-বোর্ড আইন-সভার প্রকৃত প্রতিনিধি-স্থানীয় এবং কোন শিল্পকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কি না তাহা স্থির করিবার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়, তজ্জন্য উহা পুনর্গঠন করা।

(১০) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক করভার এরূপ ভাবে বণ্টন করা, যেন উহার অন্ততঃ শতকরা ৭৫ ভাগ জমীদার ও মহাজন প্রমুখ ধনী শ্রেণীর এবং যাহাদের বার্ষিক আয় প্রতি পরিবারে ১০ হাজার টাকার অধিক তাহাদের উপর পতিত হয়।

(১১) জমীদার ও অপর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক জমী হইতে লব্ধ ন্যূনতম ২ হাজার টাকা আয়ের উপর অবিলম্বে আয়কর ধার্য্য হউক।

(১২) দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিজ পণ্যপ্রেরণের ভাড়া হ্রাস করিতে হইবে।

(১৩) শিক্ষার নিমিত্ত যে টাকা বরাদ্দ করা হইবে, তাহার শতকরা ৭৫ টাকা কৃষক ও শ্রমিকদের এবং তাহাদের ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

(১৪) কৃষক ও গবর্ণমেণ্টের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং জমীদারী এলাকায় সেচের খালের উপর জমীদারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া নূতন সেচ-আইন পাশ করিতে হইবে।

(১৫) ইনাম-জমীতে ইনামদারী প্রজাদিগকে চিরস্থায়ী স্বত্ব দিতে হইবে।

১৯৩৪ সালের পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড যে মৌলিক অধিকারের তালিকা প্রচার করিয়াছেন, উহার যে যে অংশ উপরোক্ত দাবীর তালিকার বিরোধী নহে—ঐ সকল অংশ কৃষকদের ও কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবীর অতিরিক্ত অংশ ও উহার অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, গভর্ণমেণ্ট যদি পুরাপুরী ঐ ব্যবস্থাগুলি করিয়া দেন, তাহা হইলে কি কৃষিকার্য্যের লাভজনক হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে কি ইহাই প্রতিপন্ন হইবে না, আমরা এমন শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে তাহা পর্য্যন্ত আমরা জানি না এবং তদনুরূপ দাবী উপস্থিত করিতেও পারি না?

বৈজ্ঞানিক সভা ও বিজ্ঞানের নমুনা

গত ১৯শে অক্টোবর বাঙ্গালোর রোটারি-ক্লাবে স্যর সি. ভি. রমণ জীবজন্তুর বর্ণ-বিভিন্নতা বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় উল্লেখযোগ্য অপর বক্তার নাম ডাঃ গিলবার্ট ফাউলার।

স্যর রমণ ও ডাঃ গিলবার্ট ফাউলার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত বিজ্ঞানের বাণী অবিচারিত চিত্তে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আমরা এই পদ্ধতি বজায় রাখিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত কথা আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন, তাহার যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা স্যর রমণের ও ডাঃ ফাউলারের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিতেছি।

স্যর রমণের প্রথম কথা—বর্ণ মনুষ্য-জীবনে অতি প্রয়োজনীয় এবং শক্তিশালী অংশ অভিনয় করিয়া থাকে ('colours played a very important and influential part in human life.')।

'বর্ণ' যে প্রত্যেক মানুষের চক্ষুর উপর অথবা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের প্রত্যেকটীই যে ব্যক্তিগত ও সমবেত-কারণে অশিক্ষিত মানুষের সমগ্র জীবনের উপর অনেক খেলা খেলিয়া থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি বটে; কিন্তু একমাত্র 'বর্ণ'ই যে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সমগ্র জীবনে কি করিয়া অতি প্রয়োজনীয় এবং শক্তিশালী অংশ অভিনয় করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বাস্তব ক্ষেত্রে, প্রথমতঃ চক্ষুর উপরই যে বর্ণের খেলা হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। চক্ষুর উপরিস্থিত ঐ বর্ণের খেলাই যে সমগ্র জীবনীশক্তিতে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহা রমণ সাহেব প্রকৃত শরীরবিধান বিদ্যার (Physiology) সহায়তায় প্রতিপন্ন করিতে পারেন কি? স্বীয় শরীরের ভিতর প্রতিনিয়ত যে খেলা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুভূতি থাকিলে রমণ সাহেব জানিতে পারিবেন যে, সমস্ত জীবের চক্ষু বর্ণ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু মানুষ

আপনার জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্র জাগ্রত থাকিলে এই বর্ণের কার্য্য চক্ষুতে আরম্ভ এবং চক্ষুতেই শেষ হইয়া থাকে এবং শরীরের অন্য কোন অংশে তাহার অভিনয় হইতে পারে না।

রমণ সাহেবের দ্বিতীয় কথা—ঘোলাটে রঙের উপর আলোকের ইতস্ততঃ নিক্ষেপ হইতে নীলবর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে ('the blue was caused by the scattering of light in a turbid medium'.)।

এই তথ্যটী যথাযথ হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যুগান্তর হইবার কথা, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। রমণ সাহেবের মতে ঘোলাটে বস্তু মাত্রের উপরই আলোকের ইতস্ততঃ নিক্ষেপ হইতে যখন নীলবর্ণের উদ্ভব হয়, তখন তিনি নিশ্চয়ই ঘোলাটে, সাদা অথবা লাল কাঁচের উপর উত্তাপহীন (?) আলোক দ্বারা নীলবর্ণের উদ্ভব সম্ভব করিতে পারিবেন। রমণ সাহেবের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাকে উত্তাপহীন আলোক ব্যবহার করিতে হইবে। ঘোলাটে, সাদা অথবা লাল কাঁচের উপর উত্তাপহীন আলোক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ দ্বারা নীলবর্ণের সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি ?

আমাদের মত সাধারণ লোকের মনে হয় যে, রমণ সাহেব সম্পূর্ণ ভাবে উত্তাপহীন আলোক পাইবেন না এবং সাদা ও লাল কাঁচ হইতে নীলবর্ণের উদ্ভব হইবে না।

রমণ সাহেবের তৃতীয় কথা—জন্তুর বর্ণগ্রহণ (অথবা বর্ণসাধন) অসংখ্য রকমের ('animal colouration was of numerous kinds'.)।

রমণ সাহেবের মতে জন্তুর বর্ণগ্রহণ (colouration) যখন অসংখ্য রকমের, তখন নিশ্চয়ই কত রকমে যে বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, রমণ সাহেব তাহার সংখ্যা করিতে পারিবেন না। কাযেই যে যে রকমের বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রমণ সাহেব বলিতে পারিবেন না, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন—ইহা বুঝিতে হইবে। যে যে রকমে বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, তাহা যখন সম্পূর্ণভাবে রমণ সাহেবের এখনও জানা হয় নাই এবং তাঁহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি নিজেই যখন পরিজ্ঞাত, তখন তিনি বর্ণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রলাপ-বাক্যও হইতে পারে, এই কথা জগতের সমক্ষে কেন স্বীকার করিবেন না ?

আমরা তাঁহাকে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া ঋক্, সাম, যজু, এই তিনটী বেদ এবং বৈশেষিক দর্শন অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বর্ণসাধনের কারণ অসংখ্য নহে, মাত্র পাঁচটী, মূলতঃ একটী। বস্তুর মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে উত্তাপের সাহায্যে, যে-কোন দুইটী প্রাকৃতিক বস্তুর মিশ্রণে কোন্ বর্ণবিশেষের উদ্ভব হইবে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

রমণ সাহেবের চতুর্থ কথা—প্রকৃতি দেবী বর্ণ-ব্যবহারে অপব্যয়ী এবং তাঁহার পরিণতি অর্জ্জন করিবার জন্য অনন্ত রকমের বিভবের উপর নায়কত্ব করিয়া থাকেন ('Nature was lavish in her use of colours and commanded an infinite variety of resources to achieve her effects'.)।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত জানিতাম যে, প্রকৃতি দেবী কতকগুলি নিয়মের বশীভূতা এবং তাঁহার নিজের কোন নায়কত্ব করিবার সামর্থ্য নাই। রমণ সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে, তিনি এমন একটি প্রকৃতি দেবীর সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় বিভবের উপর নায়কত্ব করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। আমরা বহুদিন হইতে অনুসন্ধান করিয়াও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কোন গ্রন্থে কোন প্রকৃতি দেবীর সম্পূর্ণ ও সমঞ্জস কোন বর্ণনা খুঁজিয়া পাই নাই। রমণ সাহেব তাঁহার অভিনব কর্ত্তৃত্বশালিনী প্রকৃতি দেবীর সম্পূর্ণ ও সমঞ্জস বর্ণনা জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করিবেন কি ?

রমণ সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি দেবী "অনন্ত রকমের" (infinite variety) বিভবের উপর নায়কত্ব করিয়া থাকেন। আমরা "অসংখ্য রকমের" (innumerable vareities) বিভব বলিতে কি বুঝায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিন্তু "অনন্ত রকমের" (infinite variety) বিভব বলিতে কি বুঝায়, তাহার ধারণা (practical conception) করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, infinite variety জাতীয় শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের শব্দশাস্ত্রের জ্ঞান বালকোচিত। তত্ত্বজ্ঞানালোচনা-

ক্ষেত্রে বালকোচিত শব্দ-ব্যবহার অত্যন্ত অশোভনীয় নহে কি ?

রমণ সাহেবের পঞ্চম কথা—পক্ষীর বর্ণ-সাধন তিনটী সীমাবদ্ধ নমুনায় বিভক্ত করা যাইতে পারে,—যথা, বর্ণের 'non-iridescent type', 'iridescent type' এবং বর্ণের তৃতীয় নমুনাটী হইবে সেইটী, যেটী পর্য্যবেক্ষণকৌশল (অথবা দৃষ্টির ঘূর্ণন) প্রসূত নহে ('The colouration of birds could be divided into three definite types, namely, the noniridescent type of colour, the iridescent type in which the colour changed according to the angle from which one looked at it and that type of colour which was not a function of the angle of inspection.') ।

রমণ সাহেবের পক্ষীর বর্ণবিভাগের এই বৈজ্ঞানিকতা আমাদের অবোধ্য ।

আলোক অথবা বায়ুর বিশেষ বিশেষ কার্য্য ব্যতীত কেবলমাত্র চক্ষুঘূর্ণনের তারতম্যের জন্য যে, কোন বস্তুর বর্ণের তারতম্য সংঘটিত হইতে পারে, তাহাও আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে ।

রমণ সাহেবের বক্তৃতার বাকী কথাগুলি বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং তৎসম্বন্ধে কোন কথা আমাদের মুখ হইতে পাঠকগণের না শোনাই ভাল। আমাদের বোধ হয়, রমণ সাহেবের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বাণী বুঝিতে হইলে যে বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। কাযেই রমণ সাহেবের প্রস্তাবিত তথ্যগুলি সত্য অথবা কল্পনা-প্রসূত, তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা শুধু এই শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকগণকে জিজ্ঞাসা করি যে, যে কথাগুলি তথ্যানুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের পক্ষে বুঝা অথবা ধারণা করা সম্ভব নহে এবং বাস্তব প্রয়োগে যে সমস্ত কথার কোন সার্থকতা নাই, সেই সমস্ত কথা সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিবার কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে ?

পাঠকগণকে কোন কথা বলিবার আগে জানাইয়া রাখিতেছি যে, রমণ সাহেবের উপর ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন রূপ অশ্রদ্ধা নাই। পরন্তু রমণ সাহেব একজন স্বভাবতঃ প্রতিভাশালী লোক বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের যত কিছু বিরোধ, তাহা এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার সহিত। আমাদের ধারণা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতা মানুষকে অবোধ্য করিয়া তোলে এবং তাহা মানুষ মারিবার কৌশল শিখাইয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ কি করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানের উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হয় না।

ডাঃ ফাউলারের বক্তৃতা হইতে আমরা নূতন শুনিলাম যে, সম্পূর্ণ উত্তাপহীন আলোকের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার নমুনা—খদ্যোৎ। আপাতদৃষ্টিতে খদ্যোতের দাহিকা শক্তি নাই এবং তাহার আলোক আছে অথচ উত্তাপ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে খদ্যোতের দাহিকা শক্তি আছে কি না তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। একটী জীবন্ত খদ্যোৎকে প্রজ্বলিত দীপশিখা দ্বারা দগ্ধ করিয়া খদ্যোতের দাহিকা শক্তি আছে কি না, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। খদ্যোতের মধ্যে দাহিকা-শক্তি না থাকিলে দগ্ধ খদ্যোৎ হইতে নাসিকা-দগ্ধকর তীব্র গন্ধ পাওয়া সম্ভব হয় কি ?

ডাঃ ফাউলারের মতে রাজনৈতিকগণের উত্তাপ আছে অথচ আলোক নাই। আমাদের বোধ হয় এই মন্তব্যটীও যথাযথ নহে। যদি উত্তপ্ত রাজনৈতিকগণের আলোকই না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধ্রুবতারার মত চক্ষের সম্মুখে রাখিবার জন্য টিক্‌টিকি-পুলিশের এত প্রয়াস কেন ?

পশু-বলি ও আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ-পরিষদ

পশু-বলিদান কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা-কল্পে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার ভবনে আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ-পরিষদের একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে অনেক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকের কথা হইতে যদি আমরা বুঝিতে চাই যে, পশু-বলিদান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহা বুঝা যাইতে পারে; আবার যদি বুঝিতে চাই যে, পশু-বলিদান ভীষণ পাপের কার্য্য এবং তাহা অকর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহাও বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাই প্রকৃত আধুনিক পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। একদিন ছিল, যখন কোন মানুষ অর্থহীন অথবা লিঙ্কাহীন কথা

কহিলে 'পাগল' বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু অধুনা অনর্গল কথা কহিতে হইবে অথবা বক্তৃতা দিতে হইবে, অথচ কেহ যেন বুঝিতে না পারে বক্তব্য অথবা সিদ্ধান্ত কি,—অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়া না দেওয়ার (non-committal) নৈপুণ্য না থাকিলে আর মানুষ পণ্ডিত অথবা চতুর বলিয়া পরিগণিত হয় না।

আধুনিক নৃতত্ত্বের মত একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞানের বিজ্ঞান ত্ব এবং তাহার বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিক-ত্ব আমাদের মত অল্প-বুদ্ধি জনসাধারণের অবোধ্য এবং বাস্তব ধারণাতীত। কাযেই পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বের পণ্ডিতগণের মুখ হইতে যে সমস্ত কথা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা যে-দেশের শতকরা ৯৭ জন লোক আমাদের শ্রেণীর অল্পবুদ্ধি, সেই দেশের লোকের না শুনিলেও চলিতে পারে। অতএব আমরা তাহার আলোচনা করিব না।

আমাদের আলোচ্য হইবে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর বক্তৃতা, কারণ তিনি "শাস্ত্রী"। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কথা, অহিংসা শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু প্রথার বিরোধী নহে ("Ahimnisa" is not alien to orthodox Hindu tradition.)।

তাঁহার এই কথায় কি বুঝিতে হইবে যে, হিংসা কোন কোন সময়ে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু-প্রথাসম্মত এবং পশু-বলিদান এবং পশু-হিংসা একই অর্থবোধক? পশু-বলিদান ঋষির শাস্ত্রসম্মত তাহা খুব সত্য, কিন্তু পশু-হিংসা ভারতীয় ঋষির কোন্ গ্রন্থে অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় জগৎকে দেখাইয়া দিবেন কি?

শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়া রাখুন, "বলি" শব্দের অর্থ—"অন্ন হইতে জীবের অস্তিত্বের কারণ কিরূপে উদ্ভূত হয়, তাহা বুঝিবার কার্য্য; আর "হিংসা" শব্দের অর্থ "জীবের মূল উপাদানের কার্য্য বিস্মৃত হইবার ফলে যে তমোগুণের কার্য্য আরম্ভ হয় সেই কার্য্য"। ভারতীয় ঋষিগণের কথানুসারে জীবের অভ্যন্তরে হিংসার উদ্ভব হইলে দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য (গীতা ২য় অঃ, ৬৪ শ্লোক; ৭ম অঃ, ২৭, ২৮ শ্লোক); আর বলি ব্যতীত জীবের জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই।

জীবের প্রধান কর্ত্তব্য, স্রষ্টার সৃষ্টি যাহাতে বজায় থাকে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। অথচ স্রষ্টার নিয়মানুসারে কোন জীব অপর জীবের ধ্বংস-সাধন অথবা অপর জীবকে রূপান্তরিত না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। ভারতীয় ঋষির কথানুসারে যাহা কিছু প্রকৃতি-জাত, তাহাই জীব এবং জীব দুই প্রকার, যথা, চর এবং অচর। চর অথবা অচর জীব খাদ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া কোন জীবের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নহে। প্রাকৃতিক নিয়মের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কোন বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া খাদ্যরূপে গৃহীত হইলে, আপাতদৃষ্টিতে ঐ বস্তুর ধ্বংসসাধন করা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ শ্রেণীর বস্তুর ধ্বংস-সাধন করা ত দূরের কথা, ঐ শ্রেণীর বস্তুর উন্নতিসাধন করা হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, আমরা খাদ্যরূপে ফল-মূল, শস্য ও মাংস প্রভৃতি যে-সব জীব ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার ভস্মাবশেষ মলরূপে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে যে-পরিমাণ জীবের আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার জন্য ধ্বংস-সাধন করিয়াছি, তদপেক্ষা বহু গুণ পরিমাণে জীবের সৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। অন্য দিকে বৃথা কোন জীবের বিনাশ সাধন করিলে তাহার ধ্বংসাবশেষ প্রায়শঃ অন্য কোন জীবের সৃষ্টির সহায়ক হয় না এবং তাহাতে স্রষ্টার সৃষ্টিধ্বংসের সহায়তা করা হয়।

জীবের বৃথা ধ্বংস-সাধনের নাম "হিংসাপ্রসূত ধ্বংস" এবং খাদ্যের জন্য জীবের ধ্বংস-সাধনের নাম "বলিপ্রসূত ধ্বংস"। হিংসাপ্রসূত-ধ্বংস সৃষ্টির ক্ষয়কারী এবং বলি-প্রসূত ধ্বংস সৃষ্টির রক্ষা ও বৃদ্ধিকারী। দুইটাই ধ্বংস, অথচ একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরটী নিতান্ত গর্হিত। মানুষ যাহাতে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' না চাপায়, তজ্জন্য ভারতীয় ঋষি তাঁহাদের প্রত্যেক পূজায় এই ধ্বংসতত্ত্ব যাহাতে মানুষের স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। "পূজা" বলিতে কি বুঝায়, "ছাগবলি" বলিতে কি বুঝায় এবং যে "মন্ত্র"গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ কি, তাহা যথাযথ জানা থাকিলে এবং চিন্তা করিলে আমরা "বলি" ও "হিংসা" সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সত্যতা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়প্রমুখ পণ্ডিতগণকে ভারতীয় ঋষির কথা লইয়া খেলা করিতে নিষেধ করি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বৎ ঐ কথাগুলি লইয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া খেলা করিবার ফলে সোণার ভারতে প্রায় প্রত্যেকের অন্নাভাব

উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি সারা জগতে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা নগণ্য বলিয়া আমাদের কথা উপেক্ষাযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যে অবস্থা ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে অচিরে আমাদের এই কথা বাধ্য হইয়া সকলের শুনিতে হইবে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার দ্বিতীয় কথানুসারে—দৈনিক জীবনে স্বাধীন ও উদার হওয়া হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত।

তাঁহার এই স্বাধীনতা ও উদারতার অর্থ কি, তাহা আমরা জানি না। কাযেই ইহার সমালোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিলাম। আমরা যাহা জানি, তদনুসারে জীবপ্রকৃতি সর্ব্বদা বিশেষ বিশেষ নিয়মে পরিচালিত, ইহা ভারতীয় ঋষির দর্শন এবং সর্ব্বদা মানুষের বিধিবদ্ধ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য, ইহাই ভারতীয় ঋষির উপদেশ।

সংবাদ ও মন্তব্য

শিক্ষা

পাব্লিক স্কুল

গত ২৮শে অক্টোবর দেরাদুনে ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতের প্রথম পাব্লিক স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহার উদ্বোধন-বক্তৃতায় বড়লাট বলিয়াছেন :—এদেশে ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে সুফল ফলে নাই এবং অনেকেরই মতে সে পদ্ধতিতে কেবল পুস্তক মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী লাভ ছাড়া চরিত্রগঠনের দিক হইতে কোন উপকার হয় না। এই পাব্লিক স্কুল এই সকল সমালোচনার উত্তরদানে সক্ষম হইবে, আশা করা যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনকেও এই বিদ্যালয় নিবিড়তর করিতে পারিবে। কিন্তু মানুষ বিদ্যালয়ে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষাই পাক না কেন, জীবনে যে উন্নতি করে, তাহার শিক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি সে নিজেই গ্রহণ করে। এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এমন ইচ্ছা নয় যে, দেশে কেবল কতকগুলি ভুঁইফোড়, হঠাৎ-বড়লোকের সৃষ্টি করে, দেশের মাটিতে সহজে স্বীয় মর্য্যাদার আসন অধিকার করিবার শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের ইচ্ছা।

বড়লাট সাহেবের বক্তৃতায় এমন একটি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত তাঁহাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে-দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। আমরা অবশ্য অস্বীকার করি না যে, এই শিক্ষার কতকগুলি দোষ পরমুখাপেক্ষী, চাকুরীজীবী আমাদের মধ্যেই অধিকতর পরিস্ফুট; কিন্তু শিক্ষার মূল সূত্র বিষয়ে যে আলোচনা আমরা 'বঙ্গশ্রী'তে এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা যাঁহারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে জগদ্ব্যাপী যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা শিক্ষার অভিনয় মাত্র। কলিকাতা কিংবা বোম্বায়ের কোন স্কুলের শিক্ষার সহিত, ইটন, হ্যারো, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, বার্লিন, প্যারিস ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানের স্কুলের শিক্ষার যে পার্থক্য, তাহা কেবল বহিরাবরণের পার্থক্য—মূল দোষ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; সে দোষ হইতেছে এই যে, জাগতিক ব্যাপারের অতি-সাধারণ যে জ্ঞান, যেমন মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে হয় এবং সে-ব্যবস্থা করিয়া সুস্থ, সুখী ও দীর্ঘ আয়ু কি করিয়া লাভ করিতে হয়—তাহার জ্ঞান এই শিক্ষায় হয় না। সুতরাং বড়লাট মহোদয় আশা দিলেও এই পাব্লিক স্কুল প্রবর্ত্তনার সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আশান্বিত হইবার কিছুই নাই। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—মানুষ বিদ্যালয়ে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষাই পাক না কেন, জীবনে যে উন্নতি করে, তাহার নিজের শিক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি সে নিজেই গ্রহণ করে। তলাইয়া দেখিলে, এ কথার কি এই মানে হয় না যে, মানুষ হইবার মত শিক্ষাব্যবস্থা বর্ত্তমান জগতে নাই? থাকিলে, নিজের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইতে হইবে কেন?

সমাজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়

গত ৩১শে অক্টোবর আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যর মির্জ্জা ইস্মাইল বলিয়াছেন :—সামাজিক সংগঠনে (social economy) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনটি কর্ত্তব্য। এক, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা; দুই, উপার্জ্জন-ক্ষেত্রেও যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়-শিক্ষিত যুবক স্থান পায়, সে দিকে দৃষ্টি; তিন, উৎকৃষ্ট নাগরিক তৈয়ারী।

প্রতিবাদ না করিয়া যদি এই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সামাজিক সংগঠনে বিচ্ছিন্ন ভাবে কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়-

হইতে এই তিনটি উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু, সামাজিক সংগঠনের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে এই উদ্দেশ্য-সাধক শিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিলেও তদ্দ্বারা কোন সুফল ফলিবার আশা নাই। বর্ত্তমান সামাজিক সংগঠনই যে 'তাসের ঘর' তাহা মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানের জানিবার সুবিধা না হইতে পারে, মহীশূরবাসী জন-সাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

পরীক্ষা ও শিক্ষা

বরোদায় এক শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় বোম্বায়ের উইলসন কলেজের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড মাকেঞ্জি বলিয়াছেন:—ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় বড় পরীক্ষার কড়াকড়ি, পরীক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে কিংবা গ্রীসে ছিল না, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড হইতে আমদানি। ইহার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার।

বাঙ্গালোরে 'শিক্ষা-সপ্তাহ' সংশ্লিষ্ট এক সভায় মহীশূরের যুবরাজ বলিয়াছেন:—শিক্ষা-ব্যবস্থার এই পরীক্ষা-পদ্ধতি চীনের মারাত্মক ক্ষতি করিয়াছে, ইংলণ্ডেও ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে বাধা সৃষ্টি করে বলিয়া শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে নিন্দিত হইয়াছে। পরীক্ষার এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তে যাহাতে সত্যকার কার্য্যকারিতার বিচার হয়, ইহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

আমরাও স্বীকার করি যে, প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে অর্থহীন। কিন্তু যে-শিক্ষার গোড়ার কথা হইতেছে, বই মুখস্থ করা, তাহার পরীক্ষা-পদ্ধতি ভিন্ন ভাবে করা কিরূপে চলিবে তাহা বুঝিতে পারি না। আসলে ইহা বস্তুবিশেষের এপিঠ এবং ওপিঠ। সমগ্রভাবে সমস্যাকে না দেখিয়া, অঙ্গবিশেষ দেখিয়া সমাধানের চিন্তার সময় আর নাই। দেশময় রব উঠিয়াছে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অকেজো, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি লালসার ভাব পাশ্চাত্যের শিক্ষা এবং অপরাপর বিষয় সম্পর্কে জাগিয়াছে, যাহাতে একেবারে হতাশ হইতে হয়। চোখ মেলিয়া আমরা চাহিয়া দেখিতেছি না যে, পাশ্চাত্যেও আমাদেরই ন্যায় নহে, আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক হাহাকার উঠিয়াছে। নিতান্ত অন্ধ না হইলে একথা অস্বীকার করা চলে না। অথচ, আজও আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে উহাদের অনুকরণ-প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে কেহ হার না মানাইতে পারে। তাহা না হইলে, এই যে 'শিক্ষা-সপ্তাহ' এবং এই 'শিক্ষক-মণ্ডলী'—ইহাদের এমন প্রাদুর্ভাব হইত না। দেশে যে শিক্ষা-সংস্কারের 'ধুয়া' উঠিয়াছে, তাহা যে একেবারেই 'ভুয়া'—এ কথা আমরা কবে বুঝিব?

স্বদেশ ও সম্প্রদায়

কুম্ভকোনামে এক শিক্ষক-সভায় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন:—যাহার মন সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ, তাহার পক্ষে স্বাদেশিকতার জন্য চীৎকার অশোভন। জাতিগঠনের পথে মনের এই অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

গণ্ডীমাত্রই খারাপ—সে সম্প্রদায়েরই হউক, কিংবা অপর কিছুরই হউক। কিন্তু গণ্ডীতে অভ্যস্ত না হইলে গণ্ডী উত্তীর্ণ হইবার শক্তি অর্জ্জন করা যায় না, ইহা ভুলিলে চলে কি?

"চতুর টিয়াপাখী"

ত্রিচিনপল্লীর শ্রীযুক্ত এম্‌. কে. দেবশিগামনি দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভারতীয় আদর্শের পক্ষে অসামঞ্জস্য আখ্যাত করিয়া ইহার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা ভাষা ব্যতীত আর কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে 'চতুর টিয়াপাখী'র মত বুলি আওড়ান ছাড়া আর কোন শিক্ষা হয় না। তৃতীয়তঃ ইহা পারিবারিক পারিপার্শ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষার্থীকে কুপথে লইয়া যায়।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীযুক্ত দেবশিগামনিকে সমর্থন করি। কিন্তু কোন প্রতীকার-নির্দ্দেশ তিনি দিতে পারিবেন কি?

শিক্ষা ও বেকার

চীনের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা দেখা গিয়াছে। পিকিং-এর এক সংবাদ: মাসিক প্রায় পোনেরো টাকা বেতনের এক চাকুরীর জন্য তিনশত আবেদন পড়ে; তাহার মধ্যে ১৫ জন গ্রাজুয়েট, ২৬ জন ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, ১১ জন চাকুরীহীন রাজকর্ম্মচারী এবং ১৫ জন চাকুরীহীন সৈন্যবিভাগের লোক।

আশ্চর্য্যজনক সংবাদ নহে। জগতে শিক্ষা এবং বেকার সমস্যার মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

কথার অপব্যবহার

অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক ছাত্র-সভায় স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—অর্থ না বুঝিয়া সোসালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌, কাপিটালিজম্‌ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করা অনুচিত।

ছাত্রদের দোষেই কথার এই অপব্যবহার, না শিক্ষকের দোষে, কে বলিবে! আমরা আশা করি, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ের কোন ছাত্রকেই এই দোষে অভিযুক্ত করা যাইবে

না এবং তাঁহার স্বলিখিত সমস্ত পুস্তকই সুসংবদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ!

স্ত্রীশিক্ষা

পাঞ্জাব ইনফরমেশন-বুরোর ডিরেক্টরের মারফৎ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, গ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করা দরকার।

গ্রামবাসী পুরুষকে শিক্ষার 'হেভি ডোজ' খাওয়াইয়া তাহাদের সকল রোগের উপশম হইয়াছে, এবার গ্রামবাসী স্ত্রীলোকদের পালা। সহরবাসী স্ত্রীলোকের শিক্ষায় নিশ্চয়ই সহরবাসী পুরুষের সংসারের চেহারা ফিরিয়াছে!

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

হলাণ্ড প্রদেশের আইণ্ডহোডেনস্থ ফিলিপ্‌স্ লাবোরেটরিতে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে; ইহার সাহায্যে যে-কোন দ্রব্যের বর্ণ-গুণ অতি অল্প সময়ে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত রৌদ্র কিরণ ব্যতীত এই পরীক্ষা সম্ভব হয় নাই।

হের প্রিবিল নামীয় জনৈক হাঙ্গেরীয় আবিষ্কারক একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্র হইতে প্রতিফলিত রশ্মি যে বস্তুর উপর নিক্ষিপ্ত হইবে, উহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

এই বৈজ্ঞানিকগণের যাবতীয় বৈজ্ঞানিকত্ব বিচার করিবার জন্য একটি যন্ত্রের আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। প্রশ্ন এই যে, এমন যন্ত্র যিনি আবিষ্কার করিবেন, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক আখ্যায় অভিহিত করা চলিবে কি না।

বৈজ্ঞানিক তথ্য

প্রায় আড়াইমাস কাল তিব্বতের বহু দুরধিগম্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি আমেরিকার একদল বৈজ্ঞানিক বিবিধ উদ্ভিদ ও নৃতত্ত্ব-পরীক্ষার বস্তু লইয়া কলিকাতা ফিরিয়াছেন। লণ্ডনের কিউ গার্ডেন্‌সে ও নিউ ইয়র্কের বোটানিকাল গার্ডেন্‌সে উদ্ভিদগুলি সযত্নে রক্ষিত হইবে।

আমরা জানি যে, বিবিধ অভিযানে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করেন। ইহার জন্য যে পরিশ্রম হয় এবং ইহার পশ্চাতে যে অনুসন্ধিৎসা আছে, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সেই পুরাতন গল্পটি মনে পড়িল—সারারাত্র ধরিয়া নৌকার বৈঠা চালাইয়া ভোর বেলায়—যে-ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়াছিল, সেই ঘাটেই নৌকা বাঁধা রহিয়াছে—এই তথ্য আবিষ্কারের গল্পটি। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বৈঠা ঠিকই চালাইতেছেন, কিন্তু নৌকা যে গাঁয়ের ঘাটেই বাঁধা আছে, এ তথ্য আবিষ্কারের সময় কি তাঁহাদের এতদিনেও হয় নাই?

মনুষ্যদেহ

লক্ষ্ণৌয়ের ইসাবেলা থোবার্ন কলেজে ডাঃ নীলরতন ধর সম্প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার সতীর্থগণের বিশ বৎসর ব্যাপী গবেষণার ফল—জীবদেহে এবং বৃক্ষাভ্যন্তরে কি করিয়া খাদ্যদ্রব্য বাতাসের অক্সিজেনের সহিত অনায়াসে মিশ্রিত হয়, অথচ বহিপ্রকৃতিতে কেন হয় না, সে বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এই রাসায়নিক মিশ্রণের ফলেই মনুষ্য জীবনধারণে সমর্থ হয়—ইহাই তাঁহার মত।

ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ডাঃ ধর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, 'মনুষ্যদেহ' বলিতে কি বুঝায়। দোহাই তাঁহার, ইংরাজীতে লেখা ফিজিওলজির পুস্তকের বুলি শুনিতে চাহি না, সেগুলি আমরাও পাঠ করিয়াছি। কিন্তু পাঠ করিয়াও দৈনন্দিন জীবনের কোনও কার্য্যকরী জ্ঞানের অধিকারী হই নাই। সুতরাং তাঁহাকে সবিনয় অনুরোধ যে, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বুলি না আওড়াইয়া মোটা কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—'মনুষ্যদেহ' এই বস্তুটি কীদৃশ।

কৃষি

কৃষি-বিষয়ক সংবাদের মূল্য

৬ই নভেম্বরের সরকারের সাপ্তাহিক ইস্তাহারে প্রকাশ—

বঙ্গদেশ: রবিশস্যের অবস্থা আশাপ্রদ।

আসাম: ফলিত শস্য ও শস্যের সম্ভাবনা মাঝামাঝি।

বিহার-উড়িষ্যা: সিওয়ান ও গোপালগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত সর্ব্বত্রই শস্য ও আখের অবস্থা মাঝামাঝি। ঐ দুই মহকুমায় শস্যের অবস্থা খারাপ। স্থানে স্থানে বৃষ্টির অভাববশতঃ হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাই: মোটের উপর শস্যের অবস্থা ভালই। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি স্থানে অতিবৃষ্টির ফলে তুলার ক্ষতি হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ: যে-সকল স্থানে সেচের ব্যবস্থা নাই, সেখানে বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ ধানের অবস্থা ভাল নহে; অন্যত্র 'খারিফ' শস্যের অবস্থা ভালই।

মাদ্রাজ: শস্যের অবস্থা মোটের উপর ভালই।

পাঞ্জাব: যে সকল স্থানে সেচ-ব্যবস্থা আছে তথাকার শস্যের অবস্থা মাঝামাঝি; যেখানে সেচের ব্যবস্থা নাই, তথায় শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

উপরোক্ত সরকারী মন্তব্যগুলির মূল্য যে কতখানি তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতে প্রতি বিঘা জমি হইতে গড়ে কিঞ্চিদধিক সাত মণ ফসল পাওয়া যাইত এবং কৃষকগণ সাধারণতঃ সানন্দচিত্তে কৃষিকার্য্য করিত। আর এখন প্রায়শঃ বিঘাপ্রতি চারি মণ ফসলও পাওয়া যায় না এবং কৃষকগণ কৃষি ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়াছে। অথচ সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, শস্যের অবস্থা "আশাপ্রদ", "মাঝামাঝি" ইত্যাদি। এবংবিধ মন্তব্য যখন সরকারী কর্ম্মচারিগণের লেখনী হইতে প্রসব লাভ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রণিধান-যোগ্য!

কিন্তু নীচে বেসরকারী সংবাদ দ্রষ্টব্য।

১৪ই অক্টোবরের ফেণীর সংবাদে জানা যায়, সেখানকার আমন শস্যের অবস্থা খারাপ।

১৩ই অক্টোবরের কাঁদির সংবাদে প্রকাশ, বৃষ্টির অভাবে ধান শুকাইয়া যাইতেছে।

২১শে অক্টোবরের বগুড়ার খবর—এ পর্য্যন্ত এক বিন্দু বারিপাতও হয় নাই; ইহার ফলে আমন ধান শুকাইয়া যাইতেছে।

১লা নভেম্বরের মুর্শিদাবাদের সংবাদে জানা যায় যে, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের মতই, মুর্শিদাবাদেও অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মাহেতু আর্থিক দুর্দ্দশার আশঙ্কা হইয়াছে।

সরকারী বিবরণীতে দেখান হইয়াছে, প্রায়শঃ শস্যের অবস্থা ভাল; আর বেসরকারী বিবরণীতে দেখিতেছি অনেক স্থানে বিপরীতাবস্থা। এই অনৈক্যের কারণ কি রহস্যজনক নহে?

কৃষি-গবেষণা

ধান্য এবং গমের সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্রের দুইটি স্থায়ী শাখা গঠন করিতেছেন। প্রধানতঃ এই দুইটি কমিটির কার্য্য পরামর্শমূলক হইবে।

সরকারের চেষ্টার ত্রুটী নাই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, তবুও যে কাজের কাজ হইতেছে না তাহাও অস্বীকার করা যায় না। রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে রোগ উপশম হইতে পারে না। সেই কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টা হওয়াই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষকের অবস্থা

ব্রহ্মদেশের কৃষি-বিভাগের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, অনেক কাল পরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেকে মনে করেন, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে কৃষকের অবস্থা ভাল হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ লাভ করে, শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে তাহার ব্যয়ও ততোধিক হইয়া পড়ে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কৃষকের অবস্থা ভাল হয়, যুক্তিযুক্ত ভাবে ইহা কখনোই বলা যায় না।

কৃষির উন্নতি

বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক সাবুর, বাঁকা ও জামুইয়ের সরকারী কৃষি-গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সকল গবেষণাগারের প্রচেষ্টায় বিহারে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে।

কৃষির যথেষ্ট উন্নতি যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিহার হইতে অন্নাভাব, বেকার সমস্যা প্রভৃতির অবসান হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

'ডিম্ব-সচেতন'

মাদ্রাজের সহকারী মার্কেটিং-অফিসারের বক্তব্যানুযায়ী ভারতবাসীকে "ডিম্ব-সচেতন" (egg conscious) হইতে হইবে, কোন্ ডিম্ব ভাল, কোন্ ডিম্ব মন্দ ইহা নির্ণয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করা উচিত।

আমরা না হয় ডিম্ব-সচেতন হইলাম, বিশেষজ্ঞগণ অশ্ব-ডিম্ব-সচেতন হইবেন কবে? যদি কোন বিশেষজ্ঞ আমাদিগকে প্রশ্ন করেন, কোন্ ডিম্ব ভাল আর কোন্ ডিম্ব মন্দ, তাহা হইলে আমাদের আদি ও অকৃত্রিম উত্তর—অশ্ব-ডিম্বই উৎকৃষ্ট! কিন্তু যে-দেশে অন্নেরই অভাব, সে-দেশে ডিম্ব দেখিবার সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

সেচ-বিভাগ

নয়া-দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেচ-বিভাগের ষষ্ঠ বার্ষিক সভাধিবেশনে স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস বলিয়াছেন যে ভারত সরকারের সেচ-বিষয়ক পরামর্শদাতার পদটি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, ভারত সরকার বর্ত্তমানে সেচ-বিষয়ক বহু কার্য্য হাতে লইয়াছেন।

যে ভাগ্যবান এই পদটি লাভ করিবেন, তাঁহার অবস্থা ফিরিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু প্রচলিত সেচের দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী উপকার হইবে, সে বিষয়ে দৃঢ়মূল সন্দেহের নিরসন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে সকল স্থানে বর্ত্তমান জলসিঞ্চন-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে প্রথম কয়েক বৎসর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু উর্ব্বরাশক্তির উন্নতি যে কোথাও সংঘটিত হয় নাই, এই সত্য অস্বীকার করা যায় কি?

ধান্য-গবেষণা

ইম্পীরিয়্যাল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ-এর নির্দ্দেশ মত বঙ্গীয় সরকার চুঁচুড়া ও সিউড়ীর সরকারী কৃষি-কেন্দ্রগুলিতে ধান্য সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন।

গবেষণার অবসান হইলে সরকারী দপ্তরখানা যে বেকার হইয়া পড়িবে!

তূলার চাষ

বঙ্গীয় সরকারের কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী পাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে ১২,৭৯৩ একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসরে ১২,৯০৩ একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছিল।

উপরোক্ত হিসাবে এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ১১০ একর কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। এই হ্রাসের কারণ কি? অবশ্য এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে কৃষকের লাভ-ক্ষতি কতটুকু তাহা ‘গবেষণা’সাপেক্ষ।

পল্লী-উন্নয়ন

লাহোরের ২৮শে অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পল্লীউন্নয়ন জন্য ভারত সরকারের বরাদ্দ আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার এক-চতুর্থাংশ পাঞ্জাবের পল্লীগ্রামে জল-সরবরাহের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এই মর্ম্মে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় পাঞ্জাব সরকার এক বিবৃতি দিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে জল-সরবরাহের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। উপায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

কৃষি-ঋণ

মাদ্রাজের চিংলিপুট ও রাজামুন্দ্রীতে যাহারা চাষযোগ্য জমির অধিকারী, তাহাদিগকে পরীক্ষাধীনভাবে কৃষি-ঋণ মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত মাদ্রাজ সরকার করিয়াছেন।

কৃষি-ঋণ দ্বারা কৃষকের অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। বরং ঋণের পর ঋণ বৃদ্ধিই পাইবে। যাহাতে ঋণ না করিতে হয়, সেই চেষ্টা করাই যে সঙ্গত, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভেজাল নিবারণ

তুলার ভেজাল নিবারণ জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক একটি আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা সহরে ভেজাল ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, খাদ্যদ্রব্য নিবারণের জন্য কড়া আইন আছে। তাহাতে ফল কি হইয়াছে, সহরবাসীর তাহা অজ্ঞাত নাই।

আসামের ভূমি-রাজস্ব

১৯৩২-৩৩ সাল হইতে আসামে বাৎসরিক প্রায় পনের লক্ষ টাকা পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব ছাড়স্বরূপ দেওয়া হইতেছে; ১৯৩৬-৩৭ সালেও তাহা প্রচলিত থাকিবে কি না, আসাম সরকার তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।

বিবেচনা তাঁহারা করুন। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন ভূমি-রাজস্ব ছাড়স্বরূপ দিতে হইতেছে, আসল ব্যাধি কোন্ অঙ্গে, তাহা নিরূপণ করিতেও চেষ্টিত হউন।

আখের চাষ

বাঙ্গালা দেশে ১৯৩৫-৩৬ সালে আখের চাষ সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতিতে পূর্ব্বাভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ শত একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত একর জমি চাষ হইয়াছিল।

আখের চাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুগার-মিল প্রভৃতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে গুড় ও চিনি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। এক্ষণে দেশ মিষ্টতায় ভরিয়া উঠিলেই ভাল!

বিহারে দুর্ভিক্ষ

বিহারের প্রাদেশিক কিষাণ-সভার সম্পাদক মিঃ এ. পি. সিংহ গত বৎসরের বন্যার ফলে, উত্তর বিহারে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিহার সরকারকে কিষাণদের দেয় খাজনা আদায় মুলতুবী রাখিতে বলিয়াছেন।

খাজনা আদায় মুলতুবী থাকিলে কৃষক সাময়িক ভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারে। কিন্তু সরকার চিরকাল খাজনা মুলতুবী রাখিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে পারেন না, সুতরাং যখনই খাজনা আদায় করিতে উদ্যত হইবেন, তখন প্রজা বিপদাপন্ন হইবেই। তাহার উপায় কি?

কৃষকের দুর্দ্দশা

১৯শে অক্টোবর তারিখে মজঃফরপুরের এক কিষাণ-সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সরকার যদি দীর্ঘ মেয়াদে কৃষি-ঋণ মঞ্জুর না করেন ও অন্ততঃ ছয় মাস খাজনা আদায় বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে কৃষকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনাও আছে।

সেই এক কথা! এরূপ ফাঁকা কথার মালা গাঁথিয়া কৃষকের কোনই উপকার হইবে না, তথাকথিত কৃষক-বন্ধুরা এ কথা কবে বুঝিবেন ও উপদেশদানে বিরত হইবেন?

কাশ্মীরের ভূমি-রাজস্ব

কাশ্মীরের ব্যবস্থা-পরিষদে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ এম. এ. বেগ নামক সদস্য কাশ্মীরের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দাবী করেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা দরিদ্রদিগকে নিষ্পেষিত করিতেছে।

ভূমি যখন শস্য উৎপাদনে অক্ষম হয়, তখনই ভূমি-রাজস্ব দরিদ্রদিগকে নিষ্পেষিত করে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষিত হইলে দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটে।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, ১৩৪২ সালের ত্রয়োদশ অধিবেশন বড়দিনের ছুটীর সময় কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কয়েকটী অপ্রত্যাশিত কারণ বশতঃ এ বৎসরের অধিবেশন সেখানে হওয়া সম্ভবপর হইল না।

এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে উক্ত অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটীর সময় নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

মাছোড়বান্দা

বিজ্ঞানের যুগের আমরা লোক। আমরা চাই তথ্য। আমরা চাই শুদ্ধ হিসাব। পরিচিত সত্যেরও অনেক সময় আমরা প্রমাণ দাবী করি। অবশ্য অত্যন্ত কষ্টার্জ্জিত হলেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে সব সময়েই মূল্যবান; সে অন্ধবিশ্বাস যত গভীরই হোক, রূঢ় বাস্তব সত্যকে জানবার এই আগ্রহ আমাদের যুগের মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য।

চা-পান সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তার গুণগান করবার জন্যে দীর্ঘ কোন প্রবন্ধের প্রয়োজন হয় না। নিজগুণেই সে সমাদৃত। এ বিষয়ে চা-রসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তা না হ'লে এ দেশে বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার নতুন লোক চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'ত না।

চা সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশে যারা নিন্দা করে তাদের কথা শুনে সাধারণ দেশবাসী একটু বিস্মিতই হয়। সন্দেহ হয় যে এই সমস্ত সমালোচক বোধ হয় কোনো দিন একটু কষ্ট করে ভালো দেশীয় চায়ের স্বাদ জানবার চেষ্টা করে নি। সুখের কথা এই যে এ-সমস্ত নিন্দুকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং তাদের বাতিকগ্রস্ত বলেই ধরা হয়। শুধু একবার যদি তারা সুস্বাদু ভারতীয় চা পান করে বুঝত, বিশুদ্ধ ও মধুর পানীয় হিসাবে চা আমাদের জীবনে কি সৌভাগ্য এনে দিয়েছে!

মনে একবার স্থান পেলে কোন ধারণাকে দূর করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু চা-পানের অভ্যাস ভারতবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা এ প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন চায়ের উপকারিতার যথেষ্ট সুবিদিত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, সে বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এখনো নির্ম্মূল হয়নি দেখে বিস্মিত হতে হয়। পানীয় হিসাবে ভারতীয় চায়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা কি সম্ভব? যে ফুটান জলে চা তৈরী হয় সে জল ত ফোটাবার দরুণই সমস্ত রোগ-বীজাণু থেকে মুক্ত হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে শরীরযন্ত্রের জন্য বিশুদ্ধতম জল গ্রহণের সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল দিনে-রাতে নিয়মিতভাবে কয়েকবার চা পান করা। কৃষিজাত আর কোন জিনিষকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করার জন্যে এত সূক্ষ্মভাবে যত্ন যে নেওয়া হয় না, এ কথা ত সবাই জানে।

কুসংস্কারের বশে চায়ের যারা অখ্যাতি করে, সহজে তাদের বিলোপ না হলেও, যুক্তি বা সত্য কিছুই তাদের পক্ষে নেই। চা-পান সম্বন্ধে যে উৎসাহের বন্যা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ছে তার বিরুদ্ধে বৃথাই তারা দুর্ব্বলভাবে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানের আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হবেই। সত্যকে কেউ প্রতিষ্ঠা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অপরিহার্য্য

চায়ের অতীত ইতিহাস যদিও রহস্যমধুর, যদিও তাকে কেন্দ্র করে অনেক মনোহর গল্পের জাল বোনা হয়েছে, তবু কল্পনা-বিলাস এখন থাক। এখন নেমে আসা যাক বাস্তবতায়।

পানীয় হিসাবে চা সম্বন্ধে স্থূল সত্য কি? সে সত্য এই যে চা আমাদের জীবনের একটি সাধারণ প্রয়োজন। কেমন করে জল বাতাস বা নূনের মত চা আমাদের জীবনের অপরিহার্য্য প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে, তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্য যে নিত্যকার পানীয় হিসাবে চা আমাদের প্রগতিশীল যুগের অপরিহার্য্য অংশ আজ। কে এ কথা অস্বীকার করিবে।

যে কোনো ঋতুতে, যে কোনো সময়ে, যেখানেই আমরা থাকি না কেন, বন্ধুর সঙ্গের মত আমরা এই পরম তৃপ্তিকর পানীয় কামনা করি। চা দুর্লভ ও নয় মহার্ঘ ও না; চা সম্বন্ধে ধ্রুব সত্য এই যে চা না হ'লে আমাদের চলে না।

বিখ্যাত কোনো ইংরাজী লেখক ঠিকই বলেছেন যে চায়ের সঙ্গে সত্যের প্রগতির তুলনা হয়। প্রথমে সইতে হয়েছে সন্দেহ, তারপর পরিচিত হবার চেষ্টায় দিয়েছে বাধা; খ্যাতি-প্রচারের সঙ্গে রটিয়েছে কুৎসা। কিন্তু তবু শেষে কালের অপ্রতিহত প্রভাবে নিজস্ব মাহাত্ম্যেই তার হয়েছে জয়।

সুপটু হাতে তৈরী চায়ের প্রথম স্বাদ কখনও ভোলবার নয়। মনে হয় এত সুন্দর যার স্বাদ তা আগে কেন জানতে পারি নি! অবাক হতে হয় এই ভেবে, এমন পানীয়ের সঙ্গে এতদিন পরিচিত হই নি!

সবিস্ময়ে ভাববার কথাই বটে। আমাদের দেশের মৃত্তিকাতেই চায়ের জন্ম। আমাদের দেশের লোকেরাই তা চাষ করে। ব্যবহারের যোগ্য করে তোলেও তারাই। ভারতে উৎপন্ন চা পৃথিবীর সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক সমাদরে পান করে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশকে সত্যই আমরা এই অপূর্ব্ব জিনিষ উপহার দিয়েছি।

সাধারণ সহজ একটি পানীয় হিসাবেই চা সকলে গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। চা শ্রান্তিহর ও তেজস্কর সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে শুধু সেই কারণেই চা পান করে না। লোকে পরম তৃপ্তিকর বলেই চায়ের প্রতি এত অনুরক্ত। সকল ঋতুতে সকল সময়ে ব্যবহার করা যায় বলে, অব্যর্থভাবে মেজাজ ভালো করে তোলে বলেই চায়ের এত আদর। চা আমাদের জীবনের একটা প্রয়োজন বটে, কিন্তু ওটা মধুর প্রয়োজন।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গশ্রীর বর্ষান্তিক অভিবাদন

এই সংখ্যার সঙ্গে আমাদের তৃতীয় বর্ষের সমাপ্তি হইবে। বঙ্গশ্রীর গ্রাহকসংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বাঙ্গালী পাঠকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে বাধ্য, কারণ যে-সময়ের মধ্যে যে-সংখ্যক গ্রাহক বঙ্গশ্রী কার্য্যতঃ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমরা আমাদের কার্য্যপ্রারম্ভে আশা করিতে পারি নাই। অবশ্য গ্রাহকের সংখ্যা যাহা হইলে বঙ্গশ্রীর স্থায়িত্ব অটুট হয়, তাহা আমরা এখনও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমরা দুঃখানুভব করি না। তাহার কারণ প্রত্যেক কার্য্যের সিদ্ধি—সময় ও সাধনাসাপেক্ষ। আমাদের আশা আছে যে, বঙ্গশ্রীর পরিচালক ও সম্পাদকবর্গ যথাবিধি সাধনা করিলে অচিরে বঙ্গশ্রীর স্থায়িত্ব অটুট হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গশ্রীর সম্পাদক ও পরিচালকবর্গ যথাবিহিত কার্য্যতালিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না এবং অসাফল্যের দায়িত্ব তাঁহাদের; কাযেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি এবং সর্ব্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গশ্রীর উদ্দেশ্য

মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইতেছে, কেন মানুষের অবস্থার বিকৃতি হইতেছে, কি করিলে তাহা দূরীভূত হইতে পারে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেশের মধ্যে মানুষ গুলির পুরা মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহার আলোচনা করাই বঙ্গশ্রীর মূল উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি, অথচ দুইটী মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে এবং প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সামর্থ্য এবং কতকগুলি অসামর্থ্য থাকে। যে-জ্ঞান ও কার্য্য-শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে মানুষ তাহার অস্তিত্ব অটুট রাখিতে পারে, সেই জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির নাম মানুষের সামর্থ্য। যে জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির ফলে মানুষ অসুস্থতার এবং অশান্তির আবাস-স্থল হয় এবং তিল তিল করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, তাহা প্রচলিত ভাষায় জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে কুজ্ঞান ও কুকার্য্যশক্তি। ঐ কুজ্ঞান ও কুকার্য্যশক্তির নাম মানুষের অসামর্থ্য।

মানুষের সামর্থ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, মানুষের দুরবস্থার পরিমাণ তত কমিয়া যাইবে এবং মানুষের অসামর্থ্যের পরিমাণ যত বাড়িয়া যাইবে, ততই তাহার দুরবস্থার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বাস্তব সত্য। কাযেই মানুষের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে কি হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে, দেশের অসামর্থ্যের অথবা কুজ্ঞানের এবং কুকার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা কমিয়া যাইতেছে, তাহার বিচার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে সাধারণের বিশ্বাস যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। অথচ একটু

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক সমাজে সাধারণতঃ চারিশ্রেণীর লোক থাকে। দার্শনিক ভাষায় ঐ চারিশ্রেণীকে ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক মানুষ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের অর্থনীতির ভাষানুসারে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষকে বলিতে হয় শ্রমজীবী, মনঃপ্রবণ মানুষকে বলিতে হয় বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিপ্রবণ মানুষকে বলিতে হয় ব্রাহ্মণ এবং আধ্যাত্মিক মানুষকে বলিতে হয় ঋষি। আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের বেদে, শ্রৌতসূত্রে, আরণ্যকে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, মীমাংসায়, দর্শনে, পুরাণে ও সংহিতায় যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, যখন মনুষ্য-সমাজে প্রকৃত ঋষি ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকেন, তখন প্রকৃত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্রমজীবীর উদ্ভব হয় এবং মনুষ্য-সমাজে দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যখন প্রত্যেক দেশে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যার প্রাদুর্ভাব এত বেশী এবং ক্রমশঃই তাহা আরও বাড়িয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, এখন আর প্রকৃত ঋষি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য অথবা প্রকৃত শ্রমজীবী মনুষ্য-সমাজে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছে। বস্তুতঃ এখন কাহারও শ্রমজীবী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমানকর বিবেচিত হয় এবং যাঁহারা নিজদিগকে ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া প্রচারিত করেন, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ নামের অভিনেতা বলা যাইতে পারে। অপ্রিয় হইলেও তাহা বাস্তব সত্য। যে দেশে অগণিত শ্রমজীবী প্রত্যেকে অল্পাধিক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, মধ্যবিত্ত যুবকগুলি জীবিকার্জ্জন-ক্ষেত্রের সন্ধান পায় না, অথবা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সুখে, শান্তিতে দিনাতিপাত করিতে পায় না, প্রত্যেক লোক অসন্তুষ্ট, অসুস্থ এবং অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয়, সেই দেশে যদি কোন মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান, পণ্ডিত অথবা কার্য্যকুশল বলিয়া মনে করেন অথবা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি বুদ্ধিমত্তার, পাণ্ডিত্যের অথবা কার্য্যকুশলতার অভিনয়কারী ভণ্ড বলা যায় না?

আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, এখন আর ভারতবর্ষে প্রকৃত বুদ্ধিমান, প্রকৃত পণ্ডিত, অথবা প্রকৃত কার্য্যকুশল লোক আছেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তাই বঙ্গশ্রীর পরিচালকগণ নিজদিগকে অশিক্ষিত ও মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ভণ্ড, তাঁহাদের স্বরূপ যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা বঙ্গশ্রীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বঙ্গশ্রীর বৈশিষ্ট্য

একদিন ছিল, যখন ভারতবাসী তাহার জননী, পত্নী অথবা দুহিতাকে অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়া মনে করিত। যদি কেহ তাহার মাতাকে, পত্নীকে অথবা দুহিতাকে জনসভায় আনিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে অপমানিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন পুরুষ, যাহা করিলে মানুষের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসার সংঘটিত হয়, তদনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া তাহার জন্য জনসমাজের

মধ্যে অক্লান্তভাবে কর্ম্মনিরত থাকিতেন, আর রমণী জনসমাজের অন্তরালে থাকিয়া মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রসারের প্রয়োজন তাহার স্থির করিতেন এবং যাহাতে স্ব স্ব সংসার বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অপর কেহ মাতা-পত্নী ও দুহিতাস্বরূপিণী রমণীকে নগ্নচিত্রে চিত্রিত করিলে অপমান বোধ করা ত দূরের কথা, আমরা নিজেরাই তাঁহাদিগকে উপন্যাসে, গল্পে এবং ছবিতে অল্পাধিক নগ্নভাবে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কালের এমনই পরিহাস যে, এখন মাতৃস্বরূপিণী রমণীর নগ্নচিত্র আমাদের পণ্যদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এমন পাঠকও আছেন, যাঁহারা ঐ নগ্নচিত্রকেই উপাদেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। একদিন সমাজের এমন অবস্থা ছিল যে, কেহ প্রবৃত্তির বশে হঠাৎ আমাদের কোন রমণীকে আংশিক ভাবেও নগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে শাস্তিপ্রাপ্ত হইত, আর আজ রমণীকে লইয়া প্রকাশ্য ভাবে নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিতে পারিলে প্রগতি সাধিত হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্নাভাবে, অস্বাস্থ্যে মানুষের বুদ্ধি যে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়। কাহারও কাহারও মতে মাসিক-পত্রে এই শ্রেণীর প্রগতিসম্পন্ন চিত্র না থাকিলে তাহার সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত।

উপন্যাস এবং গল্প-লেখকগণ প্রায়শঃ এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের পক্ষে নগ্নতা বাদ দিয়া কোন চিত্র অঙ্কিত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বঙ্গশ্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ নগ্নতাহীন গল্প ও উপন্যাস সংগ্রহ করা আপাততঃ কষ্টকর বটে, কিন্তু নগ্নচিত্র যথাসাধ্য বাদ দিয়া মাসিক-পত্রের সাফল্য লাভ করিবার চেষ্টা করা বঙ্গশ্রীর বৈশিষ্ট্য।

যাঁহারা মাতৃস্বরূপিণী রমণীর নগ্নচিত্র পাইলে পরিতৃপ্ত হন, বঙ্গশ্রী তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ।

যে-জাতীয় প্রবন্ধে বর্ত্তমানে মানুষের অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কেন সোনার ভারতে ঐ রূপ অবস্থা হইল এবং কি করিলে আবার ভারত স্বর্ণপ্রসবিনী হয়, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝা যাইতে পারে, সেই জাতীয় প্রবন্ধ বঙ্গশ্রীর অঙ্গ যাহাতে পরিশোভিত করে, তাহার চেষ্টা করা বঙ্গশ্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাস বঙ্গশ্রীর কলেবর সম্বর্দ্ধিত করিবে, তাহা যাহাতে উহার মূল উদ্দেশ্যের সমঞ্জসীভূত হয়, তাহার চেষ্টা করা বঙ্গশ্রীর আর একটি বৈশিষ্ট্য।

এক কথায় প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রে সাধারণতঃ যাহা যাহা থাকে, তাহার সমস্তই বঙ্গশ্রীতে পাওয়া যাইবে। কেবল পাওয়া যাইবে না "নগ্নচিত্র" এবং তাহার স্থানে দেশের সর্ব্বব্যাপী ব্যাধির প্রকৃত অবস্থা, তাহার কারণ এবং ঔষধ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা সুপরিলক্ষিত হইবে।

বঙ্গশ্রীর কার্য্যে তিক্ততা আছে ও থাকিবে তাহা সত্য, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিতে হইলে প্রায়শঃ তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই বিবেচনায় পাঠকগণ ঐ তিক্ততা উপেক্ষার চক্ষে দেখিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাবৃত্তি

এই প্রবন্ধে এতাবৎ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

(১) যাবতীয় সমস্যাপূরণের উপায় কি ? (How to solve a problem.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(২) কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি ? (How to solve a nation's problem.) (১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৩) "জাতি" বলিতে কি বুঝায় এবং কি হইলে জাতি উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ লাভ করে। (How to define "nation" and what are the main causes of a nation's rise and fall.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৪) "দেশ" বলিতে কি বুঝায় এবং কি হইলে দেশ উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ লাভ করে। (How to define a country and what are meant by rise and fall of a country.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৫) জমি ও জলহাওয়া বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎকর্ষ কি ? (How to define land and atmosphere ; and what is meant by improvement of land and atmosphere.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৬) মানুষ বলিতে কি বুঝায় ? (How to define man physiologically and psychologically.) (১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৭) মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ। (What are the causes of physiological and psychological differences among men and how do they appear.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৮) মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। (Primary responsibilities of man.)

(১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৯) মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা। (What are the real necessities of life and what do men crave for.)

(১৩৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১০) মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ। (How to classify physiological and psychological actions of men and how to classify men according to their physiological and psychological actions.)

(১৩৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১১) চালচলন অনুসারে মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায়। (How to know a man from his actions.)

(১৩৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১২) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম। (Different ends of different classes of men according to their different actions.)

(১৩৪১ সালের মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এবং ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা)

(১৩) বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের স্বরূপ ও তাহার পরিণাম। (How does the same work become different in the hands of different men and how are the different results achieved.)

(১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন সংখ্যা)

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাহিত্যরচনা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দেশ-হিতৈষণা ও গবেষণা প্রভৃতি দেশ ও জাতির হিতকর কার্য্য কিরূপ ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে বিভিন্ন রকমে সম্পন্ন হয় ও বিভিন্ন শ্রেণীর ফল-প্রসব করে, তাহা দেখান এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। মানুষ সাধারণতঃ মনে করে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যের সংগঠন করিতে পারিলেই দেশের অথবা দেশবাসীর হিত সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা যথার্থ নহে। মানুষের হিত সাধন করিতে হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যের সুসংগঠন যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু একমাত্র ঐ সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যের সুসংগঠন হইলেই যে দেশের অথবা জাতির হিত সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না। দেশের অথবা জাতির মঙ্গল সাধন করিতে হইলে, যাহাতে দেশবাসীর বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়, ইহা দেখাইবার জন্য এই অধ্যায় লিখিত হইতেছিল।

ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষ কিরূপ ভাবে একই অধ্যয়ন, একই অধ্যাপনা ও একই সাহিত্য-রচনাকে বিভিন্ন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রধান, মনঃপ্রধান, বুদ্ধিপ্রধান ও আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা দেখান হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দেশ-হিতৈষণা ও গবেষণা এই কয়টী কার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে কিরূপ বিভিন্ন হয়, তাহা এখনও দেখান হয় নাই। ইত্যবসরে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কি তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহার পর আলোচিত হইতেছে—

(১৪) ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যার সংক্ষেপবর্ণনা। (Summary description of the present-day problem of India.)
(১৩৪২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা)

(১৫) ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ। (Causes of the present-day troubles of India.)
(১৩৪২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা)

(১৬) ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার উপায়। (Means of removing the present-day troubles of India.)
(১৩৪২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার উপায় কি—এই প্রসঙ্গে উহার মূল সূত্র (fundamental principles of removing the distress), পদ্ধতি (method of removing the causes of distress), পদ্ধতি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা (how to make practical application of the method for removing the causes of distress.) কি তাহা দেখান হইয়াছে।

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে যে যে কথা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ এখনই বলা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার আলোচনা শেষ হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দেশ-হিতৈষণা ও গবেষণা প্রভৃতি কার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে কিরূপ বিভিন্ন হয়, তাহা দেখান হইবে।

ভারতবাসীর তথা জগতের বর্ত্তমান সমস্যা যদিও সাধারণতঃ তিনটী এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি গত সংখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে এই সমস্যাগুলি চারি শ্রেণীর, ইহা বলা যাইতে পারে। সমস্যাগুলির নাম—

(১) কৃষক, তাঁতী, যুগী, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব;

(২) শিক্ষিত যুবকদিগের ও শ্রমজীবিগণের বেকারাবস্থা এবং অসন্তুষ্টি;

(৩) উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইন-ব্যবসায়িগণের, চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণের এবং বণিক্‌গণের পর-মুখাপেক্ষিতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং অসন্তুষ্টি;

(৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসন্তুষ্টি এবং পরমুখাপেক্ষিতা।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির কারণ তেরটী। তাহাদের নাম—

(১) জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস;

(২) পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity);

(৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতি-পালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

(৪) উপরোক্ত চারিটী পন্থাতেই যাহাতে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

(৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা যাহাতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and sub-ordinate officers) পদগৌরবের তারতম্য স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের চারিটী পন্থাতেই যাহাতে সর্ব্বোচ্চ (maximum) উপার্জ্জন একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অভাব ;

(৮) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরগঠন বিদ্যার (Anatomy) অভাব ;

(৯) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল শরীরবিধান বিদ্যার (Physiology) অভাব ;

(১০) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল পদার্থবিদ্যার (Physics) অভাব ;

(১১) সম্পূর্ণ ও নির্ভুল রসায়নের (Chemistry) অভাব ;

(১২) জল ও বায়ু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থার অভাব ;

(১৩) শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ হইলে ছাত্রগণ স্ব স্ব বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অভাব।

সমস্যার কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই তাহার পূরণ সম্ভব হয়। তদনুসারে যদ্দারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থার তেরটী কারণ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাকে সমস্যাপূরণের মূল সূত্র বলা যাইতে পারে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা গত সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

সমস্যার ঐ তেরটী কারণ যে কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-বিভাগ সম্বন্ধীয়, তাহাও গত সংখ্যায় দেখান হইয়াছে। কাযেই গভর্ণমেন্টের ঐ চারিটী বিভাগের সংস্কার করাকে বর্ত্তমান সমস্যাপূরণের পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

দেশীয় লোকের একতা সাধিত না হইলে, গভর্ণমেন্টের ঐ চারিটী বিভাগের কোনটীরই যথাযথ সংস্কার সাধন সম্ভব হইবে না। যাহাতে সাধারণের দুরবস্থার ঐ তেরটী কারণ অপসারিত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি কংগ্রেস হইতে কোন জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশীয় লোকের একতা সাধিত হইতে পারে। স্বাধীনতা, অসহযোগ, অথবা আইন অমান্য আন্দোলনে দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত অপরাপর লোকের বিবাদ অপরিহার্য্য, শ্রমিক অথবা সমাজ-সাম্যবাদ আন্দোলনে (Socialism) ধনিকগণের সহিত বিবাদ অপরিহার্য্য, কিন্তু দেশের সকলের দুরবস্থা অথবা অসন্তুষ্টি দূর করিবার জন্য যে আন্দোলন, তাহাতে ব্যাপক ভাবে কোন বিবাদ অথবা মনোমালিন্য সম্ভব হইতে পারে না। জাতীয় একতাসাধক কংগ্রেসের ঐ আন্দোলনকে ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার পদ্ধতি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবার পন্থা বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাপূরণকল্পে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য

যে যে কারণে ভারত বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ গভর্ণমেন্টের নিকট কংগ্রেসের কতকগুলি দাবী উপস্থিত করিতে হইবে এবং দেশীয় জনসাধারণকে জানাইতে হইবে যে, ঐ দাবীগুলি গভর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। কংগ্রেস যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করিবেন, তাহাদের প্রত্যেকটী যাহাতে জনসাধারণের, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি জাতিনির্ব্বিশেষে অথবা বাঙ্গালা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের দুরবস্থার অপনয়নকর হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। জনসাধারণের দুরবস্থার অপনয়নকর ঐ দাবীগুলি উপস্থিত করিবার সময় গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যদি যে যে কারণে ভারতবাসী বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে, সেই সকল কারণ দূরীকরণে সমর্থ না হন, এবং তাঁহাদের অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের সহিত প্রকৃত (sincere) সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, যাহাতে ভারতের ও ইংলণ্ডের দুরবস্থা

দূরীভূত হইতে পারে, তদনুরূপ পন্থা গভর্ণমেন্টের সহযোগে কংগ্রেস অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন।

গভর্ণমেন্টের নিকট কংগ্রেস যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করিবেন, তাহা সাধারণতঃ কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-বিভাগ সম্বন্ধীয় হওয়া কর্তব্য।

যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, প্রত্যেক আট বিঘা জমীর উৎপন্ন শস্যের দ্বারা অথবা তাহার মূল্যের দ্বারা কৃষির খরচ এবং জমীদারের খাজনা ও সেস্ প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইয়া একজন কৃষক, একজন কৃষক-পত্নী এবং দুইটী কৃষক-সন্তান, তাঁহাদের আহার্য্য, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্জ্জন করিতে পারেন, —তদনুরূপ ব্যবস্থা হইবে কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধীয় দাবী।

বাণিজ্য-বিভাগীয় যে যে ব্যবস্থার দাবী করিতে হইবে, সেগুলির নাম—

(১) পণ্যদ্রব্যের মূল্যে যাহাতে সাদৃশ্য থাকে তদনুরূপ ব্যবস্থা।

একজন কৃষক যে কয় বিঘা জমী সারা বৎসরে চাষ করিতে পারে, ঐ জমীতে ধান চাষ করিলে যদি কৃষির খরচ, খাজনা, সেস্ প্রভৃতি বাদে গড়ে ৫০ মণ ধান উদ্বৃত্ত হয়, অথবা তুলা চাষ করিলে খরচাদি বাদে যদি গড়ে ৫ মণ তুলা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে ৫০ মণ ধানের মূল্য যাহাতে ৫ মণ তুলার মূল্যের সমান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করার নাম পণ্যদ্রব্যের মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখা। ঐ রূপ খরচাদি বাদে তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি সারা বৎসরে যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে, তাহার পরস্পরের মূল্য যাহাতে সমান হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থাও মূল্যের সাদৃশ্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থার অন্তর্গত।

(২) দেশের জনসাধারণের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহাতে স্ব স্ব মজুরী দ্বারা ন্যূনকল্পে গরীবানা ভাবে একটী স্ত্রীলোক ও দুইটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা বালিকা প্রতিপালন করিতে পারে, তদনুরূপ মজুরীর ব্যবস্থা।

(৩) পরিশ্রমজাত দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৪) মস্তিষ্কের পরিশ্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

(৫) মূলধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা।

শিক্ষা-বিভাগীয় যে যে ব্যবস্থার দাবী করিতে হইবে, সেগুলির নাম—

(১) যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাযথ ভাবে সক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(২) কোন্ কোন্ খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান স্বাস্থ্যের উন্নতিকর এবং কোন্গুলি অবনতিকর, তাহা যাহাতে দেশের প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৩) স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের পার্থক্য কোথায়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৪) জীবিকার্জ্জনের জন্য দেশের মধ্যে কোথায় কত লোকের উপযোগী কি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ঐ ব্যবস্থানুসারে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বালক জানিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৫) যাহা যাহা শিক্ষা করিলে জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা।

(৬) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উচ্চশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে কি না এবং মন ও বুদ্ধি ভবিষ্যতে তদনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না,

তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যাহাতে অনুত্তীর্ণ বালকগণ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৭) কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয় এবং নিজেকেই বা কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যাহাতে উচ্চশিক্ষার্থী যুবকগণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৮) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, অথবা নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কিরূপ ভাবে গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া যাহাতে কেহ উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত না হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা।

(৯) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া যাহাতে কেহ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে, অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও শাসন-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা।

যাহাতে দেশের জল ও বায়ু কলুষিত হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে, তাহা যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় এবং যাহা করিলে দেশের জল ও বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাই হইবে শাসন-বিভাগ সম্বন্ধীয় দাবী।

কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসন-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত ষোলটী দাবীর প্রত্যেকটী জনসাধারণের প্রত্যেকের হিতকর। তৎসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ অথবা দলাদলি হইতে পারে না। ঐ ষোলটী দাবী কংগ্রেসের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইলে দেশীয় জনসাধারণের ঐক্যস্থাপন অনিবার্য্য হইবে এবং দেশের প্রত্যেকের পক্ষে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সম্ভবপর হইবে।

গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ ষোলটী দাবী উপস্থিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের একটী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিভাগ (Central Construction Committee) গঠন করিবার প্রয়োজন হইবে। কি কি পন্থা অবলম্বন করিলে উপরোক্ত ষোলটী ব্যবস্থা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা স্থির করাই হইবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের এই ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিভাগে প্রকৃত চরিত্রবান্, দেশপ্রেমিক, কার্য্য-কুশল, অধ্যয়ন-নিরত, সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন মাত্র দুই তিন জন ভারতবাসীর মিলন সম্ভব হইলে, প্রয়োজনীয় পন্থা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইবে না। কোন্ কোন্ পন্থায় ঐ ব্যবস্থাগুলি সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা ঋষিদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বাস্তব সংগঠনে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবাসিগণ সামান্য পরিশ্রম করিয়া চেষ্টা করিলেই তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবেন।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণ যে সময়ের লোক, সেই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের অথবা সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। ইতিহাসের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে বলিতে হইবে যে, সেই সময় জগতের প্রত্যেক মানুষ হয় ঋষি, নতুবা ঋষির সন্তান অথবা শিষ্য হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ঋষিগণের সন্তান ও শিষ্যগণই উত্তর-কালে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। কাযেই ঋষিগণের প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সমান অধিকার এবং ঐ গ্রন্থগুলিতে যদি গৌরবের কিছু আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই গৌরবের বস্তু। এক কথায় ঋষিগণের গ্রন্থগুলিকে মানবধর্ম্মের গ্রন্থ অথবা জীব-প্রকৃতির বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। যদি কেহ মনে করেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের বস্তু, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত মনে করিতে হইবে।

মানুষ যখন আবার প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিতে পারিবে, তখন আমাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। তৎকালে জগতের সর্ব্বত্র সমাজ কিরূপভাবে সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থগুলি সম্যক্ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য সমস্ত দেশের সেই সংগঠন বহুদিন পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও সেই সংগঠনের ধ্বংসাবশেষ কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাযেই যদি কোন ভারতবাসী প্রাচীন সংগঠনের ঐ বাস্তব ধ্বংসাবশেষের সহিত মিলাইয়া ঋষিগণের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন

করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা বুঝা সম্ভব হইতে পারে। অন্য কোন জাতির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অন্য কোন জাতির পক্ষে যে ঐ গ্রন্থগুলি যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব নহে, তাহার পরিচয় জার্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারগণ। অ্যাভিলন (Avelon), বাক্রে (Bakre), ব্লুমফিল্ড্ (Bloomfield), বোট্‌লিঙ্ক (Bohtlingk), ক্যালণ্ড (Caland), ফ্রাঙ্ক (Franke), গ্যাষ্ট্রা (Gaastra), গার্বে (Garbe), গিগার (Geiger), গেল্ড্‌নার (Geldner), কিথ (Keith), কিলহর্ণ (Keilhorn), লেভি (Levi), ম্যাক্‌ডোনেল (Macdonell) মোক্ষমুলার (Maxmuller), ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg), পার্জ্জিটার (Pargiter), থিবো (Thibaut), শ্রোডার (Shroder), হুইট্‌নী (Whitney) প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-উদ্ধারকল্পে যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্য-সাধারণ। কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে কি? যদি হইত, তাহা হইলে ভারতীয় ঋষির কথা প্রয়োগযোগ্য অর্থনীতি-শাস্ত্রে অথবা রাষ্ট্রনীতি-শাস্ত্রে অথবা শিক্ষানীতি-শাস্ত্রে স্থান পাইত না কি? যখন দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অর্থনীতি-শাস্ত্রে অথবা রাষ্ট্রনীতি-শাস্ত্রে অথবা শিক্ষানীতি-শাস্ত্রে ভারতীয় ঋষির কথা স্থান পায় নাই, তখন কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে কোন প্রয়োগযোগ্য কাযের কথা নাই?

বস্তুতঃ ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে যে প্রয়োগযোগ্য কথা আছে, তদনুসারে মানব-সমাজ সংগঠিত হইলে, মানুষের দুঃখ আবার দূরীভূত হইবে এবং জগৎ আবার সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও কার্য্যকুশল কোন ভারতীয় বহুদিন হইতে তাহার অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়াই ঐ প্রয়োগযোগ্য কথাগুলি বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে কোন দেশপ্রেমিক কিঞ্চিৎ কার্য্যকুশলতার সহিত প্রবৃত্ত হইলেই আবার অনন্যসাধারণ ঐ কথাগুলির অনুসন্ধান পাইবেন এবং ভারতবর্ষ ও জগৎকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জগতের এই আসন্ন বিপদের কারণ কি, তাহা পাশ্চাত্ত্য ও মার্কিণ দেশের কেহই এতাবৎ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। টলষ্টয়, লেনিন, কার্ল মার্কস্, হেনরি জর্জ্জ, হিটলার যে অসাধারণ লোক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সার্ব্বজনীন দুরবস্থাবশতঃ তাঁহারা যে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বহুবিধ লোকহিতকর পন্থার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু কাহারও নির্ব্বাচিত পন্থা যে সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। যদি তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পন্থা অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশে বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা এবং কৃষক-সমস্যা থাকিতে পারিত না। কি করিলে জগতের আসন্ন বিপদের ঐ কারণসমূহ দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাও যে পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে কেহ অদূরভবিষ্যতে স্থির করিতে পারিবেন, ইহা মনে করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহাদের যে-জাতীয় শিক্ষা ও সাধনা, তাহাতে তাঁহারা যে সহজে তাঁহাদের অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিবেন, তাহাও মনে করা যায় না।

কংগ্রেসের দ্বারা দাবীগুলি উপস্থাপিত হইলে, খুব সম্ভব গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বহু অর্থহীন কথার উদ্ভব হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট যে জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার প্রকৃত চেষ্টা ও পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইবে। গভর্ণমেণ্টের ঐ কথাগুলি যে ভিত্তি ও অর্থহীন, তাহা জনসাধারণ যাহাতে বুঝিতে পারেন, তাহার চেষ্টা ও ব্যবস্থা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিভাগের করিতে হইবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে, ভারতবাসীর দুরবস্থার পরিমাণ যে-দ্রুত-গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে কংগ্রেস সজাগ থাকিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আর বেশী দিন জনসাধারণকে অর্থহীন কথার দ্বারা সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং কংগ্রেসের সহযোগিতা যাচ্ঞা করিতে হইবে। তখন যদি কংগ্রেস তাহার সুচিন্তিত ব্যবস্থাগুলি গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট পথে দেশের শাসন পরিচালনা করিতে বাধ্য হইবেন এবং তখন কার্য্যতঃ দেশীয় কার্য্য পরিচালনা-ভার সর্ব্বতোভাবে

কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা পূরণ করা সম্ভব হইবে।

কংগ্রেসের দ্বারা উপরোক্ত ষোলটী দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইলে এবং কংগ্রেস যে, দেশের সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা দূর করিবার মানসে গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইলে, প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহ ও ভারতীয় আসেম্ব্লি কংগ্রেসের মনোনীত সভ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। দেশের সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা দূরীকরণমানসে কংগ্রেস ব্রতী হইলে, কংগ্রেস যাহাকে সভ্য হইবার জন্য নির্ব্বাচিত করিবেন, তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কাহারও নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি? কাউন্সিল ও আসেম্ব্লির সভ্যগণ কংগ্রেস-মনোনীত হইলে, সমস্ত মন্ত্রীও কংগ্রেসের মনোনীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক কাউন্সিলে ও আসেম্ব্লিতে সমস্ত মন্ত্রী যদি কংগ্রেস-মনোনীত হন, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে দেশের পরিচালনার ভার দেশবাসীর হস্তে আসিয়া পড়ে না কি?

যে দিক্ দিয়া দেখা যা'ক না কেন, উপরোক্ত ষোলটী দাবী কংগ্রেসের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইলে এবং কি উপায়ে জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে, তাহা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইলে, ভারতের তথা সমগ্র জগতের বর্ত্তমান সমস্যাপূরণের সম্ভাবনা ঘটিবে।

কাযেই যাহাতে ঐ দাবীগুলি কংগ্রেসের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক কংগ্রেস সভ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। দেশের সর্ব্বসাধারণকে মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেস কাহারও নিজস্ব নহে, উহা সমস্ত ভারতবাসীর মিলন-ক্ষেত্র। যদি দেশের কোন শ্রেণীর লোকের কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কংগ্রেসে অনাচার এবং দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই অনাচার এবং দুর্নীতির প্রতিবিধান করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দেশবাসী প্রত্যেকের আছে। মিলন-ক্ষেত্র যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কংগ্রেস আমাদের সেই মিলন-ক্ষেত্র। তাহাতে অনাচার অথবা দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহার উপর রাগ করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবার প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। সর্ব্বসাধারণের দুরবস্থা যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থার দাবী কংগ্রেস হইতে উত্থাপিত হইলে, তাহার অনাচার এবং দুর্নীতি আপনা হইতেই অপসারিত হইবে। কাযেই এই দাবীগুলি যাহাতে কংগ্রেস হইতে উত্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা দেশবাসী প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। [ক্রমশঃ

ছিন্নমস্তা

—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ

'সভ্যতা'-র ঘূর্ণীপাকে স্বপনের মোহ-জাল আসি
স্বভাব-সুন্দর মুখে আনিয়াছে দীপ্ত ক্রূর হাসি,
সমাজ-নিয়ম লঙ্ঘ্য চটুল, চঞ্চল সে-মতি
স্বর্ণমৃগ লভিবার আশে চলে মত্ত, দ্রুত তার গতি।
স্বরূপ-বিস্মৃতা নারী।
দেবীর আসন ত্যজি' কোথা ধাও বুঝিতে না পারি।

স্ব-রাজ্যের রাজরাণী, যাত্রা তব অন্ধকার পথে,
সুখ-শান্তি সশঙ্কিত অশান্তির দুর্নিবার স্রোতে,
স্বাধীনতা নামে স্বেচ্ছা-চারিতার দুষ্ট দম্ভভরে,
কপট হাস্যেতে ন্যায়-বিচারেতে পদাঘাত করে।
বিপথগামিনী নারী!
তব প্রগতির পথে দুর্গতি ফিরিছে সারি সারি।

কোন্ স্থানে যাও ফেলি অন্তঃপুর-ছায়া সুশীতল?
পতি নহে প্রণম্য তোমার, সংসারের সহায় কেবল:
স্নেহহারা শিশু কাঁদে অবিরল গৃহের মাঝার,
মাতৃত্ব ত্যজিয়া হায় নারী-দর্পে তুমি নির্ব্বিকার!
কল্যাণদায়িনী নারী!
স্তম্ভিত করিলে ধরা পয়োমুখে অনল উগারি।

পুরুষের সাথে কেন নিত্য-কর্ম্মে তব অভিযান—
তৃষ্ণা নিবারিতে কেন নিজ হস্তে কর বিষপান?
আঁখিত্ব'টি উন্মীলিত করি, হের ওগো মদ-উন্মাদিনী,
মৃত্যুর নিশান করে মাতিয়াছ বিশ্ববিমোহিনী!
ওগো কক্ষভ্রষ্টা নারী!
স্বস্থানে ফিরিয়া এস ছিন্নমস্তা অবিদ্যা সংহারি।

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(১০) মেডিক্যাল-কলেজে সর্ব্ব-প্রথম হাসপাতাল স্থাপন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল খোলা হইল। ইহাই মেডিক্যাল-কলেজের সর্ব্ব-প্রথম হাসপাতাল। এই হাসপাতালে ৩৬টী রোগী আসিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিল। এই সঙ্গে, বাহিরের রোগিগণের নিমিত্ত একটী ডিস্‌পেন্‌সারীও খোলা হইল। যে কয়েকটী রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়া স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গেল। মেডিক্যাল-কলেজের অধ্যক্ষ এক বৎসর পরেই হাসপাতাল সম্বন্ধে কৃতকার্য্যতার কথা গভর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে এক শত রোগী থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

(১১) মেডিক্যাল-কলেজে তাৎকালিক ছাত্র-সংখ্যা।

সর্ব্ব-প্রথমে ৫০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। তাহারা ৭৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি পাইত। গুণানুসারেই তাহারা বৃত্তিপ্রাপ্ত হইত। পুরাতন হিন্দু কলেজ (Old Hindu College) ও জেনরেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন (General Assembly's Institution) হইতেই অধিকাংশ ছাত্র আসিয়াছিল। উক্ত ৫০ জন ছাত্র ভিন্ন আরও অনেকগুলি ছাত্র আসিল। ইহারা এই দেশের লোক বটে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্‌স্ (East Indians) ও লঙ্কাদ্বীপবাসী (Ceylonese)। উক্ত ৫০ জন ছাত্র কোন্ কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

ব্রাহ্মণ	...	৫ জন
কায়স্থ	...	১৫ „
বৈদ্য	...	৩ „
স্বর্ণকার	...	২ „
গন্ধ-বণিক	...	১ „
তন্তুবায়	...	৬ „
সুবর্ণ-বণিক	...	৮ „
অন্যান্য জাতি	...	১০ „
		৫০ জন

(১২) প্রথম তিন বৎসর পাঠ করিবার ফল।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা-দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া "জেনারল-কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌সনের" (General Committee of Public Instruction) তাৎকালিক সেক্রেটারী জে-সি-সি সাদার্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে পত্র লেখেন। তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে লিখিলেন, "আমরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিব। আপনাদের মেডিক্যাল-কলেজের যে সকল ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়াছে এবং যাহারা এই সকল ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়া রোগীদিগকে চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের নাম লিখিয়া সত্বর পাঠাইবেন।" তৎকালে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব মেডিক্যাল-কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, ১২ই এপ্রিল তারিখে, মেডিক্যাল-কলেজ-কাউন্সিলের আদেশানুসারে গভর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য সাদার্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জে-সি-সি সাদার্‌ল্যাণ্ড,

সম্পাদক, জেনারল-কমিটী অফ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকসন

কলিকাতা

মহাশয়,

কলেজ-কাউন্সিলের আদেশানুসারে আপনাকে জানাইতেছি

যে, ৩১ মার্চ্চ তারিখে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) লিখিত আপনার পত্র (৩২৪নং) পাইয়াছি। ইহাতে আপনি লিখিয়াছিলেন, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা ও চট্টগ্রামের ডিস্‌পেন্‌সারীর নিমিত্ত ৪টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

ইহার উত্তরে আমি কলেজ-কাউন্সিলের অনুমতি লইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, এখনও এমন কোন ছাত্র এরূপ কৃতবিদ্য হয় নাই যে, সে ডিস্‌পেন্‌সারীতে থাকিয়া রোগিগণের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২৮ জানুয়ারি তারিখে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় এই মর্ম্মে আদেশ করিয়াছিলেন যে, মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণ ৪ বৎসরের কম ও ৬ বৎসরের বেশী কাল কলেজে পড়িতে পারিবে না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১ জুন [১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার] তারিখে কলেজ খোলা হইয়াছে। সুতরাং এখন ২ বৎসর ১০ মাস মাত্র অতীত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইউরোপে যত মেডিক্যাল-কলেজ আছে, তাহাতে ছাত্রগণ অন্ততঃ ৪ বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ৬ বৎসর পড়িলে তবে ছাত্রগণ কৃতবিদ্য হইতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজে এখনও নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। শবচ্ছেদ করিবার প্রথা এদেশে নাই। যদি করিতে হয়, তবে অতি সাবধানে ইহা করিতে হইবে। শবচ্ছেদের উপযুক্ত যন্ত্রাদি নাই। রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার যথোপযুক্ত পুস্তক ও অন্যান্য উপায় নাই। নামে মাত্র কলেজ চলিতেছে। যন্ত্রাদি অনেক বস্তু ইংলণ্ড হইতে আনিতে হইবে।

আজ ১২ দিন হইল, একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পুস্তক ও অন্যান্য সুবিধা নাই। আরও ৬ মাস অতীত হইলে তবে ছাত্রগণ কতকটা উপযুক্ত হইতে পারিবে। ছাত্রগণ রোগনির্ণয় বিলক্ষণ শিখিয়াছে, কিন্তু উপযোগী যন্ত্রাদি না থাকায় তাহাদের নানা অসুবিধা হইতেছে।

কলেজ-কাউন্সিল বলিতেছেন যে, পূর্ণ ৪ বৎসর না পড়িলে বিশ্বাস করিয়া ছাত্রগণের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে উচ্চ শ্রেণীর কয়েকজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে কৃতবিদ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। তজ্জন্য তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিবেন।

কলেজ-কাউন্সিল ইচ্ছা করেন যে, আগামী অক্টোবর মাসে ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কলেজের কোন শিক্ষক পরীক্ষক থাকিবেন না। বাহিরের পরীক্ষকগণই পরীক্ষা করিবেন। যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারিবে, তাহাদিগকেই গভর্ণমেণ্ট ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা ও চট্টগ্রাম ডিস্‌পেন্‌সারীতে পাঠাইবেন। ছাত্রগণকে এক একখানি করিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র (diploma) দিতে হইবে। তাহাতে লিখিত থাকিবে যে, এই সকল ছাত্র ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে শিক্ষা চিকিৎসা করিতে পারিবে। প্রত্যেক উত্তীর্ণ ছাত্র "College of Native Surgeons of British India" নামক সভার সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যাহাতে আমরা এই কার্য্যে অগ্রসর হই, তদ্বিষয়ে আপনারা সত্বর অনুমতি দিবেন।

মেডিক্যাল-কলেজ ১২ এপ্রিল, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ	আপনাদের বশংবদ ভৃত্য ডেভিড হেয়ার সেক্রেটারী, মেডিক্যাল-কলেজ

(১৩)মেডিক্যাল-কলেজে ছাত্রগণের সর্ব্ব-প্রথম পরীক্ষা।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের তাৎকালিক সেক্রেটারী এচ্-টি প্রিন্‌সেপ (H. T. Prinsep) সাহেবকে পরীক্ষকগণ যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে লিখিত হইল :—

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, ৩০ অক্টোবর [১২৪৫ বঙ্গাব্দে, ১৫ কার্ত্তিক] তারিখে ছাত্রগণকে পরীক্ষা করা হয়। ইহাই মেডিক্যাল-কলেজে ছাত্রগণের সর্ব্ব-প্রথম পরীক্ষা। ১১ জন কৃতবিদ্য ছাত্র পরীক্ষা দিতে আসিল। তাহাদের জাতি ও নাম-ধাম এই :—

ছাত্রের নাম	জাতি	বাসস্থান
১। উমাচরণ শেঠ (১)	কায়স্থ	কলিকাতা
২। দ্বারিকানাথ গুপ্ত (D. Gupta)	বৈদ্য	"

১। স্বর্গত উমাচরণ শেঠ মহাশয় জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। ভ্রম-বশতঃ কায়স্থ লেখা হইয়াছে।

৩। রাজকৃষ্ণ দে	কায়স্থ	"
৪। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	বৈদ্য	"
৫। কালাচাঁদ দে	কায়স্থ	"
৬। গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত (১)	বৈদ্য	"
৭। চুমনলাল	কায়স্থ	দিল্লী
৮। নবীনচন্দ্র মিত্র	কায়স্থ	কলিকাতা
৯। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ব্রাহ্মণ	"
১০। বদনচন্দ্র চৌধুরী	ব্রাহ্মণ	"
১১। জেম্‌স্ পোট্	ক্রিশ্চান্	"

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণ পূর্ণ ৬ বৎসর পড়িয়া তবে পরীক্ষা দিয়া থাকে; কিন্তু উল্লিখিত ১১ জন ছাত্র ৩ বৎসর ৫ মাস পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিল। ৭ দিন পরীক্ষা করা হয়। কোন্ দিন, কোন্ ছাত্র, কোন্ বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

(প্রথম দিন)

(৩০ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৮৩৮)

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Stewart, Green and Mactutosh.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাচরণ শেঠ	অত্যন্ত সন্তোষ-জনক
২। রাজকৃষ্ণ দে	"
৩। দ্বারিকানাথ গুপ্ত	"
৪। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	মন্দ নহে, তবে চঞ্চল-দোষ

(দ্বিতীয় দিন)

(৩১ অক্টোবর, বুধবার, ১৮৩৮)

এনাটমী ও ফিজিওলজি।

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Stewart, Goodeve, and O'Shaughnessy.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
৫। কালাচাঁদ দে	কতকগুলি উত্তর অতি সুন্দর। এক জন ভাল এনাটমিষ্ট।
৬। গোপালকৃষ্ণ	কিছু মান্দ্যভাব; চিন্তাশীলতার অভাব; মোটর উপর উত্তরগুলি ভাল।
৭। চুমনলাল	স্থিরচিত্ত। উত্তরগুলি বিশুদ্ধ। ভাল এনাটমিষ্ট।
৮। নবীনচন্দ্র মিত্র	বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। উত্তরগুলি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। আত্ম-বিশ্বাস কিছু অল্প।
৯। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	উত্তর সাধারণতঃ সন্তোষদায়ক।
১০। বদনচন্দ্র চৌধুরী	ঐ ঐ ঐ
১১। জেম্‌স্ পোট	প্রায় উপরি-উক্ত দুই জনের মত।

(তৃতীয় দিন)

(১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৩৮)

কেমিষ্ট্রী ও ফার্ম্মেসী। (২)

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Goodeve, O'Shaughnessy,

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাচরণ শেঠ	সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়, চিন্তাশীল, অত্যন্ত সন্তোষদায়ক।
২। দ্বারিকানাথ গুপ্ত	প্রশংসনীয়, চিন্তাশীল, সন্তোষ-জনক।
৩। রাজকৃষ্ণ দে	ঐ ঐ একাগ্র-চিত্ত।
৪। গোবিন্দচন্দ্র	কতকগুলি উত্তর সুন্দর, কিন্তু অন্যগুলি ভাল নহে। আরও ৬মাস পড়ুক।

(চতুর্থ দিন)

(২ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৮৩৮)

কেমিষ্ট্রী ও মেটিরিয়া-মেডিকা।

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Stewart and T. Halliday (Secretary ~~to the~~ Government of Bengal)

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। কালাচাঁদ দে	উত্তর অতীব সন্তোষ-জনক, তবে ছাত্রটী অস্থির

১। স্বর্গত গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত মধুসূদন গুপ্ত বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের পুত্র।

২। Dr. Martin writes, "This day, we all the examiners examined the boys in dissection. We proceeded to the Operating room, when Umacharan Sett, Dwarkanath Gupta, Rajkrishna Dey and Nobin Chandra Mitra performed various operations on the dead human body in a very good style."

২। গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত	কতকগুলি উত্তর উত্তম, তবে এক এক সময় লিখিতে গোলমাল করে। আরও ৬ মাস পড়ুক।
৩। চুমনলাল	স্থিরচিত্ত; উত্তরগুলি অতি সুন্দর। একজন ভাল রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ।
৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	একভাবে সুন্দর উত্তর দিয়াছে।
৫। নবীনচন্দ্র মিত্র	অতি মনোহর। দস্তুর-মত বুঝিয়াছে।

চতুর্থ দিবসে ১১জন ছাত্র পরীক্ষা দিল। কিন্তু প্রশ্নের কাঠিন্য দেখিয়া ৭জন ছাত্র অন্তর্দ্ধান করিল। অবশিষ্ট ৪জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে লাগিল। ইহাদের নাম, উমাচরণ শেঠ, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। উক্ত ৭জন ছাত্র ৬মাস পরে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিয়াছিল।

(পঞ্চম দিন)

(৭ নভেম্বর, বুধবার, ১৮৩৮)

মেটিরিয়া-মেডিকা ও ফিজিক্স।

Present—Messrs Nicolson, Grant, Martin and Stewart.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাচরণ শেঠ	প্রত্যেক বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ সন্তোষ-দায়ক। সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানী
২। রাজকৃষ্ণ দে	ঐ
৩। দ্বারিকানাথ গুপ্ত	ঐ

(ষষ্ঠ দিন)

(৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৩৮)

ফিজিক্স ও মেটিরিয়া-মেডিকা

Present—Messrs. Nicolson, Carbyn, Grant, Martin and Stewart.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। নবীনচন্দ্র মিত্র	অত্যন্ত সন্তোষ জনক

(সপ্তম দিন)

(৯ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৮৩৮)

সার্জ্জারী ও অস্ত্রোপচার।

Present—Messrs. Nicolson, Corbyn, Grant, Martin, Stewart, Goodeve and O'Shaughnessy,

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য	
১। উমাচরণ শেঠ	সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও মনোহর	
২। রাজকৃষ্ণ দে	ঐ	ঐ
৩। দ্বারিকানাথ গুপ্ত	ঐ	ঐ
৪। নবীনচন্দ্র মিত্র	ঐ	ঐ

১১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে উক্ত ৪ জনই বিশেষ-রূপ কৃতবিদ্য। বিশেষতঃ উমাচরণ শেঠ মহাশয়ই বরাবর সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত।

পরীক্ষক-গণ উক্ত ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"The Supreme Government will see from the above results that the ordeal through which these young men have passed, is one of no common kind, and affords a very gratifying measure of capacity and acquirements. The result is such as to satisfy us that their average knowledge is of a solid and well-grounded character"

পরীক্ষক-গণ গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, "উমাচরণ শেঠ, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র এই চারিজন ছাত্র আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহাদের জ্ঞান বিশেষ-রূপ জন্মিয়াছে। তাহারা রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে দক্ষ। বিশেষতঃ, রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তাহারা ঔষধপ্রয়োগে সবিশেষ নিপুণ। অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তাহারা বিলক্ষণ পারদর্শী। এই ছাত্রগুলির স্বভাব-চরিত্রও অতি সুন্দর।"

পরীক্ষকগণ গভর্ণমেণ্টকে আরও লিখিলেন, "উক্ত চারি জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে মাসিক ১০০৲ (এক শত) টাকা হিসাবে বেতন দেওয়া হউক। ছাত্রগুলি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা সচ্চরিত্র। তাহারা দেশীয় কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া শবচ্ছেদ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা আরও বলি যে, উক্ত চারি জন ছাত্রকে যে কোন গভর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সারীতে পাঠাইতে পারেন। তাহারা মাসিক বেতন ব্যতীত বাহিরে লোকের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবে।"

পরীক্ষকগণ মেডিক্যাল-কলেজের মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন, "উক্ত ছাত্রগণ চিকিৎসা ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। ৫ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহারা যখন কলিকাতায় আসিবে, তখন তাহাদের যাতায়াতের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্টকেই বহন করিতে হইবে। কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময় তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি প্রতিষ্ঠা-পত্র (diploma) দেওয়া উচিত। চাকরী লইয়া যাইবার সময় গভর্ণমেণ্ট যেন তাহাদের প্রত্যেককে নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রদান করেন। এই পুস্তকগুলি সঙ্গে থাকিলে তাহারা সর্ব্বদাই ইহা পড়িতে পারিবে। পুস্তকগুলির নাম এই :—

1. Phillips' Translation of the London Pharmacopia,
2. Thomson's Elements of Materia Medica Theraputic,
3. Dr. O'Shaughnessy's Manual of Chemistry,
4. Cloquet's Anatomy by Know,
5. Sir C. Bell's Institutes of Surgery (Just Published),
6. Dr. Geo. Gregory's Elements of Medicine,
7, Twining on the Diseases of Bengal,
8. Cooper on Dislocations and Fractures,
9. Clarke's Commentaries on the Diseases of Children.

We have etc.
S. Nicolson
Surgeon, Gen. Hospital.
J. Grant
Surgeon, Apothy, to the H. E. I. Co.
J. R. Martin
Presdy. Surgeon, Surgeon Native Hospital
D. Stewart
Asstt. Surgeon, Supt.Gen. of Vaccination,

Calcutta
21st Nov—1838

(১৪) চারিজন ছাত্রের পুরস্কার-লাভ ও চাকরী-প্রাপ্তি।

সর্ব্বোত্তম ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত মেডিক্যাল-কলেজে মহা-সমারোহে একটী সভা স্থাপিত হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, ১৫ মার্চ্চ, শুক্রবার দিবসে এই পুরস্কার-সভা বসিয়াছিল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর তখন এদেশের গভর্ণর জেনারল। বড় বড় বাঙ্গালী ও সাহেব সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর স্বহস্তে পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদান করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সমবেত ছাত্রগণকে প্রোৎসাহিত করাই তাঁহার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। উমাচরণ শেঠ মহাশয় বরাবর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এই হেতু অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর তাঁহাকে ৩০০৲ টাকা মূল্যের একটী উৎকৃষ্ট সোণার ঘড়ী উপহার ও প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদান করেন। অন্যান্য ৩টী ছাত্র পুস্তক পুরস্কার এবং প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। (১)

উক্ত চারি জন ছাত্রের প্রত্যেকে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইলেন। উমাচরণ শেঠ আগ্‌রা ডিস্‌পেন্‌সারীতে, রাজকৃষ্ণ দে দিল্লী ডিস্‌পেন্‌সারীতে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র লক্ষ্ণৌ ডিস্‌পেন্‌সারীতে ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। দ্বারিকানাথ গুপ্ত কলিকাতা ত্যাগ করিলেন না। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে যাইতে না দিয়া তাঁহার জন্য ধর্ম্মতলায় একটী ডিস্‌পেন্‌সারী করিয়া দেন। ইহার নাম Metropolitan Dispensary. ইহাই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম ডিস্‌পেনসারী। রাজকৃষ্ণ দে চাকরী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি সেস্থানে দেহত্যাগ করেন। তিনি ১১ বৎসর বয়সের একটী বালিকাকে বিবাহ করিয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। মহাত্মা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাঁহার বালিকা স্ত্রীর সাহায্যের নিমিত্ত ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

(১৫) সর্ব্বোত্তম ছাত্রগণের চাকরী-প্রাপ্তি।

মেডিক্যাল-কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যে কয়েক জন কৃতবিদ্য ছাত্র প্রথমে গভর্ণমেণ্টের চাকরী পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) Friend of India, 1839 (vol. V)

১।	উমাচরণ শেঠ (১)	১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৯
২।	শ্যামাচরণ দত্ত (২)	১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৯
৩।	রাজকৃষ্ণ দে (৩)	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৯
৪।	নবীনচন্দ্র মিত্র (৪)	৮ অক্টোবর, ১৮৩৯
৫।	ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলী	১ জানুয়ারি, ১৮৪০
৬।	রামনারায়ণ দাস (৫)	১ জানুয়ারি, ১৮৪০
৭।	যাদবচন্দ্র শেঠ	১ জানুয়ারি, ১৮৪০
৮।	নবীনচন্দ্র পাল (৬)	১ জানুয়ারি, ১৮৪০
৯।	কালাচাঁদ দে	১৪ জানুয়ারি, ১৮৪১
১০।	চুমনলাল	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪১
১১।	বদনচন্দ্র চৌধুরী (৭)	১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪২
১২।	গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত (৮)	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪২

(১) উমাচরণ শেঠ মহাশয়, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে কলিকাতা যোড়াসাঁকোর অন্তর্গত ৬৯নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুরাতন হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল-কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিই মেডিক্যাল-কলেজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ছাত্র। তিনি প্রথমতঃ আগ্রা, তৎপরে বর্দ্ধমান, কাণপুর, গাজীপুর, মির্জ্জাপুর, নয়নিতল ও ফতেপুর প্রভৃতি নানা ডিস্পেন্সারীতে ৩৪ বৎসর চাকরী করিয়া ও পেনসন্ লইয়া যোড়াসাঁকোর বাটীতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, জুন মাসে দেহত্যাগ করেন। তৎকালে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের উপাধি ছিল G. M. C. B. (Graduate Medical College Bengal) তৎপরে সংক্ষিপ্ত উপাধি হইয়াছিল G. M. C.

(২) শ্যামাচরণ দত্ত মহাশয় পাটনায় অপিয়াম ডিপার্টমেন্টে চাকরী করিতে করিতে মেডিক্যাল-কলেজে আসিয়া অধ্যয়ন করেন। তৎপরে উত্তীর্ণ হইয়া পাটনায় চাকরী করিতে যান।

(৩) রাজকৃষ্ণ দে মহাশয়, দিল্লীতে এক বৎসর মাত্র চাকরী করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড ইঁহার বিধবা স্ত্রীকে ৩০০ টাকা প্রদান করেন।

(৪) নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় লক্ষ্ণৌ নগরে চাকরী করিতে যান। সেখান হইতে আসিয়া কালনা প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা করেন।

(৫) রামনারায়ণ দাস মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যে সকল বড় বড় পাথুরী (stone) কাটিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি মেডিক্যাল-কলেজের মিউজিয়মে রহিয়াছে।

(১৬) মেডিক্যাল-কলেজ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা।

হিন্দু-স্কুলের উত্তর দিকে ও শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর পশ্চিম দিকে রামকমল সেন মহাশয়ের বাড়ী। এই বাড়ীখানি অতি বিখ্যাত। এই বাড়ীখানিতে সর্ব্ব-প্রথমে The School for Native Doctors, তৎপরে The Native Medical Institution, তৎ-পশ্চাৎ Medical College বসিয়াছিল। Lord Macaulay এই বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। Captain D. L. Richardson ও Mr. Kerr এই বাড়ীতে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। সকলের শেষে সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই বাড়ীতেই "এলবার্ট কলেজের" সৃষ্টি হইয়াছিল। ধনবল্লভ শেঠ মহাশয় এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় এই কলেজে Chemistry পড়াইতেন। তিনি চীনদেশে যাত্রা করিলে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ মহাশয় অনেক দিন ধরিয়া Chemistry পড়াইয়াছিলেন। বারিদবরণবাবু সুপণ্ডিত। তাঁহার বিশাল লাইব্রেরী অতি মূল্যবান্। তিনি মেডিক্যাল-কলেজ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। যখন যাহা কিছু বুঝিতে পারি নাই, তখনই তিনি তাহা আহ্লাদ সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে মেডিক্যাল-সম্বন্ধে এত কথা লিখিতে পারিতাম না।

"বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ৫ বৎসরের (১৮৩৫-১৮৩৯) ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ৮ মাস অতীত হইয়া গেল। সময়াভাবে আর অধিক লেখা হইল না। অনেক কথা লিখিতে বাকী রহিল।

---

(৬) নবীনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নিবাস পটোলডাঙ্গা। তিনি মুষ্টিযোগের সাহায্যে অনেক উৎকট ব্যাধি সারিয়া দিতেন। তাঁহার যাবতীয় certificate আমার নিকটে রহিয়াছে।

(৭) বদনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় হুগলীতে ছিলেন। তিনি চিকিৎসা করিয়া ক্রোরপতি হইয়াছিলেন।

(৮) গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। ইনিও পিতার ন্যায় সুচিকিৎসক ছিলেন।

স্বর্গীয় বিশপ লিডবিটার

সম্মুখ-দৃশ্য]

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্তৃক ফটো অবলম্বনে গঠিত প্রতিমূর্তি

কারিকুলাম

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আদেশ হইয়াছে। আদেশ শিরোধার্য্য; তবে অপাত্রে আদেশ ন্যস্ত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয়কে প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া দিতে আমার একটুও সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না। যে গুরুতর বিষয় লইয়া মনীষিগণ মাথা ঘামাইতেছেন, সেই বিষয়ে কথা বলা আমার পক্ষে ছোটমুখে বড়কথা হইয়া পড়িবে না কি?

শিক্ষার বিষয়, ইংরেজিতে যাহাকে 'কারিকুলাম' বলা হয়, কি হওয়া উচিত, তাহা লইয়া কথা বলা আমার মত "অ-শিক্ষিত" বা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত গৃহস্থনারীর পক্ষে অসহনীয় ধৃষ্টতা বলিয়া যদি বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেজন্য দায়ী হইবেন কে, সেই কথাটীর মীমাংসা আগে-ভাগেই হওয়া সঙ্গত। সেই মীমাংসার ভার আমার পাঠিকাদের উপরে রহিল।

এখন চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্, কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া এই বিষয় সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি কি না। কোনও রূপ মন্তব্য করিব না। করা সাজে না, শোভা পায় না বলিয়াই করিব না। কেন সাজে না বা কেন শোভা পায় না, তাহা যাঁহারা কষ্ট করিয়া আমার অকিঞ্চিৎকর লেখাটী পড়িবেন, তাঁহারা অনায়াসে অনুমান করিয়া লইবেন, এ আশা আমি খুবই করি।

আমার জানাশোনা বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর নারী দেখিয়া থাকি। এক শ্রেণীর নারী আছেন, যাঁহারা আমাদের মত একটু আধটু লেখাপড়া জানেন—ইংরাজিতে লেখা চিঠি, টেলিগ্রাম, বিল প্রভৃতি পড়িতে ও বুঝিতে পারেন, যৎসামান্য লিখিতেও পারেন। আর এক শ্রেণীর নারী দেখি, যাঁহারা কলেজে পড়িয়াছেন, কেহ দুইটা, কেহ বা তিনটা পাশও করিয়াছেন। একেবারে অক্ষর-পরিচয় নাই, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের এমন স্ত্রীলোক এখনকার দিনে বড় দেখি না; যদি বা দেখি, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।

আমি নারীদের যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে অনেক পাঠিকারই পরিচয় আছে। কেন না, আমি মনে করি, প্রত্যেক সংসারেই আজকাল ঐ প্রথম শ্রেণীর নারীই আছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীর সংখ্যা সাধারণ গৃহস্থের সংসারে কিছু কিছু বাড়িতেছে সত্য, তবে সংখ্যায় খুব বেশী নয়। আমাদের বিশেষ জানা একটী সংসারের ঘরের খবর আমার জানা আছে, আমার আজিকার প্রবন্ধের উদাহরণ স্বরূপ সেই ঘরের খবরগুলি লিখিলেই, সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালিত হইবে ও সাধারণ পাঠিকারাও ঐ বিষয়ে স্ব স্ব মতামত গড়িয়া লইতে পারিবেন। আমার কোনরূপ মন্তব্য করার প্রয়োজনও হইবে না।

এই সংসারটীতে চারিটী নর, পাঁচটী নারী। অতিরিক্ত নারীটি গৃহের প্রধানা গৃহিণী, বাবুদের জননী; বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য, অন্য চারিটী নারী বাবুদের "সহধর্ম্মিণী", স্ত্রী বা ওয়াইফ। গৃহিণীর দুইটী কন্যা, তাহারা শ্বশুরালয়ে থাকে, ক্বচিৎ কদাচিৎ মাতৃালয়ে আসিয়া থাকে। বাড়ীর বড়বাবু সম্প্রতি দিল্লীতে বদলি হইয়া গিয়াছেন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। বিদেশে একাকী থাকিতে ছেলের কষ্ট হইবে বুঝিয়া গৃহের প্রধানা গৃহিণীই উদ্যোগ আয়োজন করিয়া বধূকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বড়বধূ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বাড়ীতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। বাড়ীর যিনি গৃহিণী, তাঁহাকে প্রায়ই অসন্তুষ্ট দেখা যায়। এতদিন তিনি যেন 'রিটায়ার' করিয়াছিলেন; সব ঝক্কি হইতে অব্যাহতি

মিলিয়াছিল, বড়বধূ চলিয়া যাওয়ায় আবার সমস্ত উলোট-পালোট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনে শান্তি নাই, এক দিনও বিশ্রাম নাই, এমন অবস্থাই হইয়াছে।

ব্যাপার কি হইয়াছে, সেই কথা বলিব। বড়বধূ সেকেলে মানুষ, গিন্নীপনায় তাঁহার তুলনা নাই। সংসারের সমস্ত ভারি কাজের ভার তিনি নিজের ঘাড়ে লইয়াছিলেন, কাহাকেও কিছু দেখিতে বা করিতে হইত না—লোকজনদের দিয়া হউক, নিজের গতর দিয়া হউক, তিনি সবই করিয়া দিতেন। ভোরবেলায় উঠিয়াই তিনি বাড়ীর বাবু, ছেলেমেয়ে, বউ—সকলের জন্ম জলখাবার করিয়া ফেলিতেন; অন্য বউ-য়েরা চা তৈরী করিবার আগে বড়-বৌ কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন লুচি-আলুভাজা, কোনদিন বা কড়াইশুঁটী ভাজা, কোনদিন পাঁপরভাজা, আবার কোনদিন চালভাজা, ছোলা-ভাজা প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। বামুনঠাকুর হয়ত তখনও কাপড় কাচিয়া রান্নাঘরে ঢুকেই নাই। চায়ের আসর চলিতেছে, ইহারই মধ্যে সেইখানে বসিয়া বড়বধূ দিনের রান্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে চাল দিলেন, ডাল দিলেন, তরকারী বুঝাইয়া দিলেন, মসলাপাতি দেখাইয়া দিলেন। বড় বৌ ঠাকুরাণীর এই সময়কার মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। কস্তা লালপাড় গরদের একখানা শাড়ী পরণে—কি শীত কি গ্রীষ্ম, এ সময়টা তিনি কোন দিন সায়া, সেমিজ পরিতেন না। তাঁহার অন্য জায়েরা ঠাট্টা করিত, কত সব কি বলিত, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। বড়বধূ সকলের সঙ্গে চা খাইতেন না। চায়ের আসরের কাছে বসিয়া তিনি রান্নার যোগাড় করিতেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি চা না খাইলেও, যাহারা খাইত, তাহারা নানা বিষয়ের গল্প-গাছা করিত, তাহা শুনিতে ও সে-সকলে যোগ দিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। পূজা অর্চ্চনা সারিয়া সেই 'তিন পোর' বেলায়—বেলা প্রায় ন'টায়, তিনি আলাদা বাসনে প্রস্তুত করিয়া এক বাটী চা খাইতেন।

বেলা নটা হইতে গৃহস্থের বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে। ছেলেরা কে স্নান করিয়া ভাতের জন্ম খাবার-ঘরে ঢুকিল, কে কল-ঘরে ঢুকিয়া বালতি বালতি জল ঢালিল, কে ইস্কুলের সময় ভুলিয়া গুলি খেলিতেছে, বড়বধূর নজর সব দিকে। ইহাকে ধমকাইতেছেন, উহাকে বাপু বাছা বলিয়া আদর করিতেছেন, চাকরকে তাহার মত, ঠাকুরকে ঠাকুরের মত, আবার বাবুদের বাবুদের মত হইয়া চলিতেছেন। এই ছবি দেখিবার মত।

কাজের ভিড় বা ঝক্কি বাড়িয়াই চলিল। বাবুরা স্নান সারিয়া আহার করিতে আসিলেন, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলের জন্ম তৈরী হইয়া খাইতে বসিল। একটি ঠাকুর, সব দিকে ছুটো-ছুটি করিতে সে পারিবে কেন? তাই বড়বধূ ছেলেদের ঘরের সম্পূর্ণ ভার লইলেন। ঠাকুরের নিকট হইতে স্বতন্ত্র পাত্রে সর্ব্ববিধ আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া তিনিই ছেলেদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্বামী ও দেবরদের খাওয়া দেখিয়া আসিয়া পাচককে যথাবিহিত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বাবুরা আফিসে গেলেন, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে গেল, ছোট ছোট যাহারা রহিল, তাহারা পরে খাইবে। এই সময় বড়-বধূর অবসর মিলিল। স্নান করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি নিরামিষ রান্নাঘরে শাশুড়ীর জন্ম রান্না করিতে গেলেন। শাশুড়ী পূর্ব্বে স্বপাক আহার করিতেন, বৃদ্ধ বয়সে আগুন-তাতে তাঁহার বেশ কষ্ট হইত। মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতেন না সত্য, আর তাঁহার বাছবিচারও বড্ড বেশী, অন্যের ছোঁয়া লেপা খাইতে তাঁহার অসম্মতি থাকিতেও পারে, তাই স্বপাক-ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছিল। বড়বৌ অকস্মাৎ একদিন তাঁহাকে হাঁড়ী ছুঁইতে না দিয়া, নিজেই তাঁহার জন্ম শুচিভাবে রান্না করিতে বসিলেন। শাশুড়ী বলিলেন, তুমি একলা মানুষ, কত দিক সামলাবে বৌমা, ভারি ত ঐ রান্না, আমি ও দুটো ফুটিয়ে নোব।

বড়বধূ সে নিষেধ মানেন নাই।

মধ্যাহ্নটী বড়বধূর সত্য সত্যই বিশ্রাম। মধ্যাহ্নের যে সমস্ত কাজ, সেগুলি তাঁহার জায়েরা নিপুণ ভাবে সমাধা করিয়া থাকেন। ছেলেমেয়েদের জামা-ইজের সেলাই, বালিশের ওড় তৈরী, কোন কিছুতে রিপুকর্ম্ম করা, এই সব কাজগুলিতে তাঁহার জায়েদের অপার পারদর্শিতা। কি করিতে হইবে, শুধু সেইটী বলিয়া ও বুঝাইয়া দিলেই হইল, আর দেখিতে হইত না। বড়বধূঠাকুরাণী এই সময়ে খুব খানিকটা দিবানিদ্রা দেন। শীতকালে দিবানিদ্রার ফলে তাঁহার শরীর প্রায়ই খারাপ হয়। অম্ল, অজীর্ণ, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা, গা হাত পা

ম্যাজ ম্যাজ করা—এই সমস্ত তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক অভিযোগ। তবুও এই কু-অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু ঐ কু-অভ্যাস সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাও সহ্য করিতে পারেন না। শরীর তাঁহার যেমনই হোক্, কোন্ কাজটা তিনি না করেন।

বিকালে আবার কাজের তাড়াহুড়া। একদিক হইতে ছেলেরা, অন্য দিক হইতে মেয়েরা ইস্কুল হইতে আসিয়া পড়ে। তাহাদের জলখাবার দেওয়া এক বিষম ব্যাপার। কেহ লুচি খায় ত মিষ্টি খায় না, আর দুধের বাটী ফেলিয়া পালাইবারই চেষ্টা সকলের। রাম-রাবণের যুদ্ধ করিয়া তবে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। তাহাদের জল খাওয়া হইলে তাহারা যতক্ষণ না খেলিতে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম নাই। জায়েরা ছেলেমেয়েদের গা মুছাইয়া জামা-কাপড় বা ইজের বদলাইয়া, মাথায় চিরুণী দিয়া দেন, তাহারা খেলিতে বা বেড়াইতে যায়।

সন্ধ্যার সময় বাবুরা একে একে আসিতে থাকেন। বড়বাবুর মিশ্রীর সরবতে গোঁড়ালেবুর রস চাই, তৎসহ দু'টি ঘরে-তৈরী সন্দেশ। মেজবাবু ও সেজবাবু চা, কচুরি, সিঙ্গাড়া খাইয়া নন্দীদের বৈঠকখানায় ব্রিজ খেলিতে যান। ছোটবাবু কোকো খাইয়া ঘরে বসিয়া কাব্য পাঠ করেন। ছোটবাবু সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন।

এই সময়ে ঠাকুরকে আবার রান্না বুঝাইতে হয়। এক প্রস্থ লুচি, এক প্রস্থ রুটি, এক প্রস্থ ভাত—আর সর্ব্বজনীন দাল-তরকারী, ব্যবস্থা ও তদারক করিতে ঘণ্টাখানেক লাগিয়া যায়। আটটা না বাজিতে আবার হৈ চৈ! অমুক ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে তুলিয়া আনিতে হইবে, অমুকের গা অল্প অল্প গরম হইয়াছে, কোনও ফাঁকে সে যেন ভাত খাইয়া না ফেলে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে, খুকীর সর্দ্দিকাশি, তাহাকে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে হইবে, এই বিষয়ের তদারক শেষ করিতে করিতে ছেলেমেয়েদের মাষ্টার মহাশয়রা চলিয়া যান, আর তাহারা খাবার-ঘরে আসিয়া খণ্ড প্রলয় বাধাইয়া দেয়। বড়বধূ আসিয়া তাহাদের খাইতে দেন।

বাবু, বধূগণ খাইয়া গেলে চাকর, ঝি, ঠাকুরের পালা। শাশুড়ীর সামনে বসিয়া তাঁহাকে 'জল' খাওয়াইয়া বড়বধূ যখন খাইতে বসেন, তখন অনেক রাত্রি হইয়া যায়। তখনও সব ঘরে ঘরে একবার করিয়া সকলের খোঁজ-খবর লইয়া তাঁহার ছুটি হয়।

বাড়ীর সেই বড়বৌ হঠাৎ অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় বাড়ীতে যে খানিকটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়াই স্বাভাবিক, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু এই বাড়ীতে এতগুলি বধূ থাকিতেও এতখানি বিশৃঙ্খলা হইতেছে কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, নারী হইয়া নারীনিন্দা করিতে হয়। পর-নিন্দা পাপ, অনেকে বলেন, স্বজাতি-নিন্দা মহাপাপ। আমাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইতেছে।

মেজবধূ বি-এ পাশ। দেখিতেও সুন্দরী, স্বভাবটিও বড় মিষ্ট। ধনীর গৃহের মেয়ে, কিন্তু দেমাক কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। আট নয় বৎসর এ বাড়ীতে আসিয়াছেন, একটি কড়া কথা কেহ তাঁহার মুখ হইতে কোনদিন শুনে নাই; জোরে কথাও তাঁহার মুখে নাই। শরীরটা শক্ত নয়, বরং বড় বেশী হালকা। তিন চারটি ছেলেমেয়ে হইয়া তিনি যেন আরও অকেজো হইয়া গিয়াছেন। সকল কাজেই খুব উৎসাহ, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল বলিয়া কোন কাজই সুচারুভাবে করিতে পারেন না; দৌড়ঝাঁপ করাও সহ্য হয় না। ছেলেরা তাঁহাকে মানে না, তিনিও তাহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ আধপেটা খাইয়া, কেহ ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একেবারেই না খাইয়া ইস্কুলে যায়। তাঁহার কোলের মেয়েটা যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাঁহার জানু ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এক মিনিট কাছছাড়া হয় না, তাই শাশুড়ী অশুচি-ভয়ে তাঁহার হাতের রান্না খান না, তিনি আবার নিজেই রান্না করিতেছেন।

সেজ বৌ বি-এ পড়িতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বিয়ে। তাঁহার দাদার সহপাঠী বন্ধু তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে না হইলেও ঘরের কাজ-কর্ম্ম শিখিতে পারেন নাই, কেবল কলেজের পড়াই করিতেন। পরীক্ষায় তিনি বেশী নম্বর পাইতেন, ভাল মেয়ে বলিয়া কলেজে খুব নাম ছিল। সংসারের কাজে সেজবৌ অচল, তবে মানুষটি খুব ভাল।

ছোটবধূটি ছেলেমানুষ। সেও ম্যাট্রিক পাশ। বাপ-মার বড় আদরের মেয়ে। বাপের বাড়ীতে তাহাকে কোন কাজ করিতেই হইত না, এখন পর্য্যন্ত এখানেও কিছুই করিতে হয়

নাই। কাজেকর্ম্মে তাহাকে কেহই ডাকে না। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা তাহার ছুটী নাই, ছোটবাবু যতক্ষণ বাড়ী থাকেন, ছোট বধূকে তিনি চোখের আড়াল করিতে চাহেন না। অন্য জায়েরা তাই তাঁহার কোন কসুরও ধরেন না। এবাড়ীর জায়ে জায়ে খুব সম্প্রীতি। আজকালকার সময়ে এমন সম্প্রীতি খুব কম বাড়ীতে দেখা যায়। আমাদের মেয়েলি একটি দুর্নাম আছে। ভাই ভাই বেশ থাকে, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া যত জঞ্জাল ঘটায়। দুর্নামটি সত্য অথবা পুরুষদের রচনা, তাহা আমি বলতে পারি না।

সে কথা যা'ক, এই সংসারের বৌয়েদের মধ্যে যে সদ্ভাব দেখা যায়, তাহা উচ্চ প্রশংসার বিষয়।

কিন্তু বিপদ হইল, সংসার লইয়া। বড়বধূর চলিয়া যাওয়ার পরদিনই সকালে বিষম কাণ্ড। ছেলেমেয়েরা চায়ের ঘরে আসিয়া দুধ পাইল ত খাবার পাইল না, খাবার না পাইয়া তাহারা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিল। মেজবধূ সামলাইতে না পারিয়া মেজবাবুকে খবর দিলেন। শুনিতে পাওয়া গেল যে, খাবার প্রস্তুত করা হয় নাই। ঠাকুরের উপরে ভার ছিল, সে পারিয়া উঠে নাই। মেজবাবু হেদুয়ার মোড়ের মণিহারী দোকান হইতে একটিন বিস্কুট আনিয়া তখনকার মত গোল মিটাইলেন। একটিন বিস্কুট একটি সকালেই নিঃশেষিত হইল।

ইস্কুলের ভাতের সময় আরও বিভ্রাট। ঠাকুর একা বাবুদের ঘর, ছেলেদের ঘর সামলাইতে পারে না। এতদিন ছেলেদের ঘরের ভার বড়বধূর উপরে ছিল, মেজবধূ সে ভার অবশ্যই লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার কোলের মেয়েটা তাঁহাকে সর্ব্বদাই ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া পারিলেন না। মেজবধূ কোমরে আঁচল জড়াইয়া ভাতের মস্ত বড় থালা লইয়া পরিবেশনে নামিলেন। অনভ্যাসের ফোঁটা, ছেলেরা এমন গণ্ডগোল তুলিতে লাগিল যে, তিনি 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' করিয়া পালাইলেন।

ওদিকে ছেলেরা তাণ্ডব নাচ নাচিতেছে। তাহাদেরই মধ্যে কে একজন উচ্ছিষ্ট ডালের বাটী ঠাকুরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া, তাহার জাতজন্ম গিয়াছে বলিয়া মাথামুড় খুঁড়িবার উপক্রম করিতেছে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। মালা জপ ফেলিয়া, কেটের কাপড় পরিয়া হেঁসেলে ঢুকিয়া পড়িলেন। ছেলেদের ও বাবুদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে স্নান করিয়া বেলা একটার সময় নিজের জন্য একমুষ্টি চাউল সিদ্ধ করিবেন।

সেদিন বিকালেও বিষম কাণ্ড। ঠাকুর সেই যে সকালে কান্নাকাটি করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়াছে, আর সে ঘরে ঢুকে নাই। ছেলেমেয়েদের বিকালের জলখাবার হইয়া উঠে নাই, দোকানের খাবার দেখিয়া তাহারা তিড়িংমিড়িং লাফাইতেছে। বড়বধূ কোন দিনই দোকানের খাবার এ বাড়ীতে ঢুকিতে দিতেন না।

রাত্রের কথা সবিস্তারে না বলিলেও চলিবে। তবে এইটুকু বলা দরকার যে, দিনের বেলার চেয়ে অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—বরং খারাপ।

এইরূপ ভাবেই চলিতেছে। ঠাকুরটির জাতজন্ম ফিরিয়া আসিতে কয়েকদিন সময় লাগিল। সেই সময়ে একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। মেজ ও সেজ-বৌ দুইজনে রন্ধনশালার ভার লইয়াছিলেন। মস্ত বড় হাঁড়িতে ভাত হইয়াছে, একজনে হাঁড়ী নামাইতে না পারিয়া, দুইজনে দুইদিক ধরিয়া হাঁড়ী নামাইতেছিলেন, হাঁড়ীর কানা খসিয়া গিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, আর সেই তপ্ত ভাত ও ফেন পড়িয়া মেজবধূর দুইখানি পা পুড়িয়া-ঝুড়িয়া একাকার। মেজ-বৌয়ের পায়েও লাগিয়াছিল, তবে বেশী নয়—দুই একটী ফোস্কার উপর দিয়াই গিয়াছে।

সেদিন মাঘী-পূর্ণিমা তিথি, শাশুড়ী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, বাবুরা কি করিবেন, কি দিবেন কিছুই জানেন না। ছুটিলেন ডাক্তার আনিতে। বাড়ীর কাছে যে ডাক্তারখানা, তাহার ডাক্তার 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন; কাছে আর ডাক্তার নাই। অনেক দূর হইতে ট্যাক্সি করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। ততক্ষণে সেজ-বৌ যন্ত্রণায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সকল হাঙ্গামার মধ্যে ঠাকুরটি কি ভাবিয়া মান ত্যাগ করিল কে জানে। ডাক্তার, ঔষধ প্রভৃতি—হাঙ্গামা কাটিয়া সব থিতু হইলে দেখা গেল, ঠাকুর নূতন হাঁড়ীতে ভাত চড়াইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া সব শুনিয়া রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজ অদৃষ্টের ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পোড়ারমুখ দিল্লীর আফিসকে যত বা ধিক্কার দেন, অদৃষ্টেরও তত লাঞ্ছনা করেন। বড়ছেলের আফিস যদি দিল্লী না যাইত,

তাঁহার লক্ষ্মীপ্রতিম বড়-বৌকেও এখানকার সোনার সংসার ছাড়িয়া ও সকলকে 'অাতান্তরে' ফেলিয়া যাইতে হইত না। সে না যাইলে তাঁহার সংসারেরও এমন হাল হইত না। দিল্লীর আফিস ও অদৃষ্ট ছাড়া আর কাহারও তিনি দোষ দিলেন না, অথবা অন্য কাহারও নিন্দা করিলেন না। আর তিনি সেরূপ করিবেনই বা কেন? তাঁহার বধূরা যদি ইচ্ছা করিয়া কাজে হাত না দিত, কিম্বা কাজ জানা সত্ত্বেও যদি না করিত, তাহা হইলে কথা হইতে পারিত। তাঁহার বধূরা ইচ্ছা করিয়া ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গে নাই, ইচ্ছা করিয়া তাহারা তাহাদের পা পোড়াইয়া শয্যা লয় নাই, ইহা কি আর তিনি বুঝিতেছেন না?

সাংসারিক এই সকল বিভ্রাটকে আমরা প্রবন্ধ লিখিবার ও পড়িবার সময়ে যত সহজ করিয়া দেখিতেছি, সংসারে বাস্তবিক পক্ষে এইগুলি তুচ্ছ ত নয়ই, বরং বিশেষ গুরুতর। সংসারে যদি গোলমালই থাকিয়া গেল, যদি সেখানে অব্যবস্থাই বাসা বাঁধিল, অশান্তি ও কোলাহল স্থায়ী হইল, তাহা হইলে সংসার-চিত্র সুখকর হইল কি? সংসারকে আশ্রম বলা হয়; অন্য যে কয়টি আশ্রম আছে, সংসার-আশ্রম তাহাদের কাহারো চেয়ে ছোট বা হীন নহে। আশ্রম বলিতেই সকলের মনে একটি শান্তিপূর্ণ, একটি আনন্দময়, রোগশোকদুঃখশূন্য আলয়ের দৃশ্যই জাগে। কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলার কণ্বের আশ্রমের বর্ণনা অনেক পাঠিকাই পড়িয়াছেন; বনমধ্যে অবস্থিত থাকিলেও ঋষি কণ্বের আশ্রমকে সংসার-আশ্রমই বলা যায়। সংসার-আশ্রমের তাহাই যদি আদর্শ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে একটি সংসারও আজ সংসার বলিয়া গণ্য হয় কি?

আমি ভুল করিয়া আবার বড় বড় কথা বলিয়া ফেলিতেছি। আমার বক্তব্যের গণ্ডীর মধ্যেই আমার থাকা উচিত।

বেদের ভাষা আজ আমরা জানি বুঝি না, এই ...কার সম্ভ্রান্ত লেখকের মতে, বেদের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা এদেশের লোকের এখন নাই বলিয়াই যত দুঃখের উদ্ভব হইতেছে। বেদের ভাষায় (আমি গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি মাত্র) স্ত্রীলোকের সাধারণ নাম নারী। নারী শব্দের অর্থ নেত্রী। নারী রাজনৈতিক নেত্রী নয়, নারী সংসারের নেত্রী। নারীকে নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য কোন অকৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। নারী জন্ম নেত্রী। শিশু যে দিন হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে শিক্ষা করে, সেইদিন হইতে জননীকে সে নেত্রীরূপেই দেখিতে পায়। তাহাকে লালন-পালন-তাড়ন সবই করেন জননী। নারীর প্রাধান্য বা নেতৃত্ব সেই শৈশবকাল হইতেই তাহার মনে আঁকিয়া বসে। কোন সময়ে কোন অবস্থায় এই মনোভাবের বিচ্যুতি ঘটিলে সেও আহত হয়, নারীর আদর্শও খাটো হইয়া যায়।

কোন্ ছেলের মা কিরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহা লইয়া কোন ছেলে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাহার মা তাহাকে কত ভালবাসেন, কত যত্ন করেন, কত আদর করিয়া খাইতে দেন, অসুখের সময় কত সেবা করেন, তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া কত বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন, তাহা মনে করিয়া আনন্দ পায় না, এমন ছেলে সংসারে কয়টি আছে?

যে বাড়ীটির কথা আমি এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতে ছোটখাট বিভ্রাট কত যে ঘটতেছে, তাহার সংখ্যাই নাই। সেজবধূর যে দিন পা পুড়ে, তার পরদিন তাঁহার ছেলেটি পাশের একটা নতুন বাড়ীর ভারা-বাঁধা বাঁশের উপর হইতে পড়িয়া বাম পা ভাঙ্গিয়া আসে। বাড়ীতে বাবুরা তখন কেহ নাই, শাশুড়ী অন্য পাড়ায় রামায়ণ শুনিতে গিয়াছেন। সেদিন তাহাদের বাড়ীতে যে কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। বড়বধূ লেখা পড়া বিশেষ জানিতেন না, কিন্তু সংসার করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে সাধারণ শিক্ষা ও কর্ম্মপটুতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, যাহা না থাকিলে সংসার অসার হইয়া পড়ে, তাহা বড়বধূর ছিল বলিয়াই কোনরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে নাই। বি-এ, আই-এ পাশ যদি সংসারের কাজে লাগিত, তাহা হইলে বড়বধূর অভাবে এই সংসারখানিতে এত কোলাহল উত্থিত হইত কি?

আমি মন্তব্য করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি, আমার অজ্ঞাতে আমার কলম হইতে হাকিমের রায়ের মত কথাগুলি একটি একটি করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সেজন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

আমি যে চিত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম, তাহা লেখা হইয়াছে, এইখানে আমি শেষ করিব। তাহা করিবার পূর্ব্বে মনস্বী স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতার একাংশ উদ্ধার করিব। সর্ব্বমুখী প্রতিভার অধীশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সর্ব্ব বিষয়ের বিচার করিয়াছিলেন। দেশের পুরুষ ও নারী-সমস্যার প্রতিও তাঁহার প্রতিভার তীক্ষ্ণ আলোকসম্পাত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন —মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, গৃহশিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দাও, সেবা, রন্ধন, সূচিকার্য্য, শরীর পালন স্বাস্থ্যগঠন, সন্তানপালন প্রভৃতি বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম শিক্ষা দাও। ছাত্রীদের সামনে সর্ব্বদা আদর্শ নারীচরিত্র ধর। নারীর উচ্চ আদর্শ, নারীর কর্ত্তব্যানুরাগ, নারীর ত্যাগব্রতে তাদের অনুরাগিণী কর।

মেয়েদের কারিকুলাম কি হওয়া উচিত, স্বামী বিবেকানন্দই তা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা, যাঁহারা বিবেকানন্দের লেখা পড়ি নাই বা পড়েন নাই, তাঁহারা যেন তা পড়িও পড়েন।

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দুর সমস্ত মন বিষিয়া উঠিল। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, অভিমানে মন যেমন বিরক্ত, দেহও তেমনই তিক্ত হইয়া গেল। ইহারা পুরুষ? ইহারাই পৌরুষ দেখাইয়া নারীর হৃদয় জয় করিতে চায়, নারীলাভের আশা পোষণ করে? ছিঃ ছিঃ! ইহারা যদি পুরুষ, তবে কাপুরুষ কে? তাহার এই আঠারো উনিশ বছরের জীবনভোর পুরুষ ভাবিয়া সে কি কাপুরুষকেই কামনা করিয়াছে? ঐ কাপুরুষের জন্যই সে সকলের বিরক্তির কারণ হইয়াছে, ঘরে পরে লাঞ্ছনা সহিয়াছে? এমনই কাপুরুষ সে, মা'র রোষানলে অবহেলে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া পুরুষ পলায়ন করিতে পারিল? পুরুষের আকর্ষণ কি এতই দুর্নিবার যে, বাঙলা দেশের মেয়েরা এই সব পুরুষবেশী কাপুরুষকে পূজা করে, ভালবাসে? এই কাপুরুষদিগকে জীবনের সঙ্গীরূপে না পাইলে তাহাদের জীবন পঙ্গু ও অচল হইয়া পড়ে?

ইন্দুর পা দু'টি কাঁপিতেছিল। তাহার ভয় হইতেছিল, বুঝি বা পড়িয়া যাইবে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া মাটীর উপরে পা দুটিকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহার দুচোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু চোখের জলের এ সময় নয়। আর, কাহার জন্য চোখের জল? সেই কাপুরুষের জন্য চোখের জল কি অপব্যয় নয়?

ইন্দু একটি বার মাত্র মাকে আসতে দেখিয়া আর সে দিকে মুখ ফিরায় নাই; ফিরাইলে দেখিত, মা একা নহেন, তাঁহার সঙ্গে সুকেশ, সুবেশ, সুন্দর একটি যুবাপুরুষও আসিতেছিলেন।

কাছে আসিয়া মা স্নেহসিক্তস্বরে কহিলেন, এখানে একা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কেন ইন্দু? মাথায় যে রোদ লাগছে মা! ক্ষণা কোথায়?

—ক্ষণা নাগরদোলায় দুলছে—বলিতে বলিতে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠ অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া গেল।

বুঝি কয়েক বিন্দু বারি চোখের কোণেও আসিয়া পড়িয়াছিল, মা'র চোখে তাহা গোপন রহিল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছায়ায় আয় ইন্দু, রোদে মুখচোখ তোর ঝলসে যাচ্ছে যে। বলিয়া কন্যার বাহু ধরিয়া তাহাকে একটি দোকানের ছায়ায় আনিয়া দাঁড় করাইলেন। নিজের কটীদেশ হইতে শুভ্র রেশমী রুমালখানি টানিয়া, কন্যার মুখটি তুলিয়া ধরিয়া মুছাইয়া দিলেন। ইন্দু চক্ষু মুদিয়াই ছিল, বোধ হয় চক্ষু মুদিয়া থাকিলে অশ্রুর উৎস কতকটা বাধা মানে।

মুখ মুছাইয়া, বায়ুবিক্ষিপ্ত কুন্তলচূর্ণগুলি যথাবিন্যস্ত করিয়া মা যখন আদরভরে মুখখানি হইতে হাত সরাইয়া লইলেন, ইন্দু চক্ষু খুলিতেই দেখিল, দুই নেত্রে প্রশংসার প্রবাহ লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রণয়কুমার! হৃদয় কল্পনাতেও সে প্রণয়কুমারকে এ সময়ে এখানে আশা করে নাই। তবে আশা সে করে নাই, করিতেও পারে না, সে কথাও মনে রহিল না। তাই মনে বিরুদ্ধ ভাবেরও উদয় হইল না। একটি বার মাত্র দেখিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল। সেই এক দৃষ্টিতেই দেখিল, প্রণয়কুমারকে আজ বড় ম্লান, বড় বিমর্ষ দেখাইতেছে। অঙ্গের সে লাবণ্য নাই, চক্ষুর সেই দীপ্তি নাই, আননের উজ্জ্বল্য নাই, নিশান্তের পাণ্ডুর চন্দ্রের মত মলিন, পাংশু।

অভ্যাসমত যুক্ত কর মস্তক স্পর্শ করিল। প্রণয়কুমার ম্লান হাস্যে প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মা বলিলেন, প্রণয় মফঃস্বলে বদলী হয়ে যাচ্ছেন, তাই তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ইন্দুর ক্লান্ত চক্ষু দুটি আপনা হইতেই প্রণয়কুমারের পানে ফিরিল। প্রণয় নীরবে অর্থহীন দৃষ্টি দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন মাত্র।

না জিজ্ঞাসা করা ভাল দেখায় না বলিয়া ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় বদলী হলেন?

প্রণয়কুমার বলিলেন, অনেক দূর, কুমিল্লা।

ইন্দু আবার জিজ্ঞাসা করিল, কবে যেতে হবে?

—কালই যাব।

মা এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, দিদ্ধী মেয়েটা গেল কোন্ দিকে বল্ ত?—এই অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া, মা যেদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল, সেইদিকে চলিলেন। কয়েক পা গিয়া, এদিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোরা এইখানেই থাকিস্, আমি আসছি ক্ষণাকে নিয়ে।

পায়ের কাছে ঘাস নাই, তাই শ্যামলতাও নাই। চাঁচা-ছোলা, শ্রীহীন ভূখণ্ডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণয়কুমারও সহসা কোন কথা বলিলেন না। ইন্দুর মা যখন সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, প্রণয়কুমার গাঢ় স্বরে ডাকিলেন, ইন্দু।

মুখ তুলিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইলেও ইন্দু তাহা পারিল না, সাড়া দিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কণ্ঠে শব্দ ফুটিল না।

প্রণয়কুমার পুনশ্চ ডাকিলেন, ইন্দু।

ইন্দু পূর্ব্ববৎ নিশ্চল, নিস্পন্দপ্রায়।

প্রণয়কুমার বলিলেন, তোমার কাছে আমি আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি ইন্দু।—কণ্ঠস্বর গাঢ়, অকৃত্রিম অনুতাপে ভরা।

ইন্দুর মনটি নড়িয়া উঠিল।

প্রণয় বলিতে লাগিলেন, অনেক অপরাধ করেছি ইন্দু, তুমি আমায় ক্ষমা কর। কতদূরে চলে যাচ্ছি, কলকাতায় আর ফিরব না, যাবার সময় তোমার ক্ষমা পেলে আমি হাল্কা মনে যেতে পারি।

ইন্দু বলিল—কলকাতায় ফিরবেন না কেন?

প্রণয় বলিলেন, যে জন্যে চলে যাচ্ছি, সেই জন্যেই ফিরব না। সে অনেক কথা, যাক্। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে বল?

—আমার কাছে ক্ষমাই বা চাইতে হবে কেন?

—তুমি যদি বল কোন অপরাধ হয় নি, তা হলে ক্ষমা চাইব না।

—অপরাধ আবার কি!

প্রণয়ের কণ্ঠস্বর প্রফুল্ল হইল। ইন্দু যদি দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, এই মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখখানিতেও প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ ইন্দু! এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় কহিলেন, অনেক চেষ্টা করে আমি বদলী হতে পেরেছি। পরশু বদলীর অর্ডার হয়েছে, সেই থেকে কেবলই ভাবছি, তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। জানি যেতে পারব না, তবু দু'দিন কেবলই ভেবেছি তোমার কাছে আসব কি আসব না। যদি তুমি বিরক্ত হও, যদি তোমার ভাল না লাগে, খারাপ লাগে, এই ভেবেই দু'দিন কেটে গেছে। আজ সকালে আর থাকতে পারলুম না। ভাবলুম, আর ত কখনই দেখা হবে না, শেষবারের মত দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাই। এসে শুনলুম, তোমরা স্বদেশী একজিবিসনে এসেছ। তোমার মাকে বদলীর কথা বলেই চলে যেতে পারলুম না। ওঁকে বললুম, চলুন না, একজিবিসনে ইন্দুর সঙ্গে দেখাটা করে আসি। এসে তোমায় বিরক্ত করলুম না ত? যদিই বিরক্ত হয়ে থাক, জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে না, কখন বিরক্ত করতে আসব না, এই ভেবে আমার এ অপরাধও আজ ভুলে যাও, ইন্দু।

নারীর চোখ, সহজেই তাহাতে জল আসিয়া পড়ে। কেন, কে জানে! অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ইন্দু অশ্রু গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

কতকগুলি অতিমাত্রায় কৌতূহলী লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে বুঝিয়া প্রণয় বলিলেন, ঐ ছায়ায় বেঞ্চিটায় বসবে?

ইন্দু নিস্পৃহের মত বলিল, চলুন।

অফুরন্ত কৌতূহলের অধিকারিদিগের কৌতূহলের অবসান তথাপি হইল না। অনেকে চলিয়া গেল, অনেকে যাইতে যাইতেও দেখিতে লাগিল, অনেকে যেমন ছিল, তেমনই রহিল, অনেকে গোপনে আলোচনাও করিতে লাগিল। তবে ইহারা আর তাহাদের দেখিতে পাইল না।

প্রণয় বলিলেন, আর একটি অনুরোধ করব, রাখবে? অবশ্য ক্ষমা পেয়েছি বলেই কথাটা বলতে পারছি।

ইন্দু মুখখানি অল্প একটু তুলিয়া চাহিল।

প্রণয় বলিলেন, আমাদের কোর্ট থেকে আজ আমাকে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিচ্ছে। যাবে দেখতে?

ইন্দু বলিল, আমি! কেন?

প্রণয়কুমার ঈষৎ আবেগের সহিত বলিলেন, কেন-র উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে তুমি গেলে আমার খুব ভাল লাগবে।

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার কিয়ৎপরে কহিলেন, যাবে ?

ইন্দু তথাপি নীরব।

প্রণয়কুমার বলিলেন, তোমার ইচ্ছে নেই ; তবে থাক্। তাঁহার কণ্ঠস্বরে দুঃখ ও হতাশা ধ্বনিত হইল।

—আর কে যাবে ?

-আমাদের বাড়ীর মেয়েরা হয় ত যাবেন, আরও অনেকে যাবেন।

—মাকে বলেছেন ?

—না। তোমার মত জেনে তবে তাঁকে বলব।

—বলবেন।

প্রণয়কুমার প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, পাঁচটায় পার্টি। বল ত আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাব।

মা ক্ষণাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দুকে বলিলেন, একজিবিসন দেখবি না কি রে ?

—না, বড্ড রোদ।

—তবে চল্ বাড়ী যাই।

প্রণয় বলিলেন, আজ বিকেল পাঁচটায় আমাদের কোর্ট থেকে আমাকে ফেয়ারওয়েল পার্টি দিচ্ছে, আমি মনে করছি ইন্দুদের নিয়ে যাব।

মা ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া, বিদ্রোহের ভাব না দেখিয়া প্রসন্ন মনে কহিলেন, তা বেশ ত !

গেটের বাহিরে গাড়ী ছিল। প্রণয়কুমার বলিলেন, আমি সাড়ে চারটেয় আসব, ইন্দু। তোমরা তৈরী থেক।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া মা সর্ব্বাগ্রে নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণার পরে, ইন্দু গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইলে, ড্রাইভার নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া ভাঁজকরা একটি কাগজ তাহার হাতে দিল।

ভাঁজ খুলিতে যে হাতের লেখা দেখা গেল, তাহাতে ইন্দুর মন আবার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল তথাপি পড়িতে হইল। লেখা ছিল :—

যাহার দাবীর অধিকার নাই, সে চোরের অধম। আমি চলিলাম।

চিঠিখানা শতছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেই যদি সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত, তাহা হইলে ইন্দুর কোন দুঃখই ছিল না। কিন্তু তা হয় কই ? সারাদিন সেই অক্ষর কয়টা সরীসৃপের মত তাহার মনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নানে ইচ্ছা ছিল না, শরীর খারাপ বলিয়া কাটাইয়া দিল ; আহারে প্রবৃত্তি হইল না, ক্ষুধা নাই বলিয়া এড়াইয়া গেল। সে সময়ে শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জার খুব উপদ্রব চলিতেছিল, সাবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া মা'ও খাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না, জোর করিয়া শুধু এক বাটী গরম দুধ খাওয়াইয়া দিলেন।

ঘড়িতে তিনটা বাজিতেই মা মেয়েদের শোবার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ক্ষণা ছবির বহি দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পাতা-খোলা বহিগুলি শয্যার উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; ইন্দু মোটা একখানা চাদর গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া মাকে দেখিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। মা আসিয়া তাহার কাছে বসিলেন। চাদরখানি সরাইয়া মেয়ের কপালে, বুকে, বগলের নীচে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এখন শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে রে ?

—ভালই।

—কিছু খাবি ?

—এখন আবার কি খাব ?

মা হাসিয়া বলিলেন, কি-খাব কেন ? সারাদিন ত কিছু খেলি নে। ঠাকুর দিক না খাবার-টাবার কিছু করে। খান-কতক 'টোষ্ট' করে দিতে বলব, খাবি।

ইন্দু বলিল, না।

সে ঘরে ঘড়ি ছিল না। মা ভাবিতেছিলেন, হয়ত সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। প্রণয় হয়ত এখনি আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই কথাটা মেয়েকে বলিতে যতটুকু সাহসের দরকার, সেটুকুও তাঁহার ছিল না। থাকিবেই বা কিরূপে ? প্রণয়ের উপর মেয়েদের মনের ভাব জানিতে ত আর তাঁহার বাকী নাই। অথচ বেলা যে অবসানপ্রায়, সেটিও জানাইয়া দেওয়া দরকার। তাই নিদ্রিত ক্ষণার পানে চাহিয়া বলিলেন, ক্ষণাটা কত ঘুমুচ্ছে ! চারটে বাজে, এখনও ওঠবার নাম নেই।—বলিয়া তিনি ক্ষণাকে ডাকিতে লাগিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কত বাজল মা ?

—দেখি। সাড়ে তিনটে হ'ল বোধ হচ্ছে।

পাশের ঘরে গিয়া ঘড়ি দেখিয়া মা বলিলেন, তিনটে বেয়াল্লিশ।

—তা হলে দেরী আছে, নিজের মনেই কথা কয়টি বলিয়া ইন্দু আবার চাদর মুড়ি দিল।

মা পাশের ঘরে কাণ পাতিয়া রহিলেন। ইন্দু উঠিল না, তাহা বুঝিলেন; কিন্তু কোন কথাও বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিল। মা বলিয়া উঠিলেন, ক্ষণা উঠল রে?

—ওঠে নি না। দাঁড়াও আমি তুলে দিচ্ছি।

ইন্দু নিজের খাট হইতে নামিয়া, ক্ষণার খাটে গিয়া ধাকাধাকি করিয়া ক্ষণাকে তুলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্নান-কক্ষের দ্বার খোলা ও বন্ধের শব্দ শুনিয়া মা কতকটা আশান্বিত হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণা মার কাছে গিয়া বসিলে, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুইও যাচ্ছিস নাকি দিদির সঙ্গে?

—কৈ, দিদি ত কিছু বলে নি!

মা হাসিয়া বলিলেন, প্রণয় ত তোকেও যেতে বলেছে।

ক্ষণা মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল, আমার নাম ধরে অবিশ্যি বলে নি, তবে 'ইন্দুদের' 'তোমরা' এই সব 'প্লুরাল নাম্বার' দিয়ে কথা বলেছে। ওরকম বলায় আমি যাই না।

মা হাসিলেন, বলিলেন, তুই না গেলে তার ত দুঃখের সীমা থাকবে না।

ক্ষণা রাগিয়া বলিল, আমারই যেন দুঃখ থাকবে বড়।

—না থাকে না থাকবে, যা দুধ খেয়ে আয়।

ক্ষণা নিঃশব্দে নীচে চলিয়া গেল।

ইন্দু ঘরে ফিরিয়াছে বুঝিয়া মা বলিলেন, ক্ষণা যাবে না কি রে?

ইন্দু কাপড় বদলাইতেছিল, বলিল, চলুক না।

মা নিশ্চিন্ত মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ও বলছে প্রণয় ওর নাম ধরে ভাল ক'রে বলে নি, ও যাবে না।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তাই না কি?

মা বলিলেন, ঐ ত পোড়ারমুখী নিজে এসেছে, জিজ্ঞেস কর না।

ইন্দু ডাকিল, ক্ষণু দিদি, একবারটি শোন ত লক্ষ্মী দিদি-মণি আমার।

—আদর যে আর ধরে না—বলিয়া ইন্দুর ঘরে আসিয়া ক্ষণা ক্ষণেকের তরে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল; তার পর বলিল, ওমা! আপনার যে সাজগোজ হয়ে গেছে দেখছি।

ইন্দু লজ্জা দমন করিয়া বলিল, তুই যাবি নে?

—তুমি বলেছ আমায়?

—যাঁর পার্টি, তিনি ত বলেছেন।

—আজ্ঞে না, যাকে তাঁর বলবার, তাকে তিনি ঠিক বলেছেন। গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করেছেন মাত্র।—শেষের কথাগুলা সে নিম্ন কণ্ঠেই কহিল।

ইন্দু বলিল, তাঁর ত কন্যেদায় নয় যে গলায় চাদর দিয়ে জোড় হাত ক'রে সবাইকে নাম ধরে-ধরে বলবেন! নে, কাপড় প'রে নে, চল।

ক্ষণা বলিল, উঁহুঁ। তুমি কিন্তু আজ যা সেজেছ, একেবারে 'কিলিং'।

এই সময়ে নীচে, বাগানে মোটরগাড়ীর সুগম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল। ক্ষণা খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, এসেছেন, হাকিম সাহেব এসেছেন।

—তুই যাবি না ত?

—না, না, না। 'বাট্ আই উইশ্ ইউ সাকসেস।'

—তা হ'লে আমি যাব না, যা!

—যাব না বললেই হ'ল আর কি! ঐ দেখ—

চেষ্টা করিয়া মনকে যতখানি শান্ত, সংযত ও শুদ্ধ রাখিতে পারা যায়, ইন্দু তাহাই পারিয়াছিল। তাহা না পারিলে, আবার সেই মোটরে, সেই লোকের পার্শ্বে বসিয়া কখনই সে যাইতে পারিত না। গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পুরাতন কথাগুলা যে মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল না তাহা নহে; চেষ্টা করিয়াই সে ভাবগুলিকে দূর করিতে হইতেছিল।

প্রণয়ও আজ বিশেষরূপ শান্ত। পথে কথাবার্ত্তা হইল না বলিলেও হয়। প্রণয় এক মনে গাড়ী চালাইতেছে, আর পার্শ্বোপবিষ্টা নারী নিজের মনকে কেবলই বাঁধিতেছে।

বিরাট সামিয়ানার তলে বিরাট সভা। প্রথমে বিদায়-সঙ্গীত গীত হইল। তারপর দুটি সুন্দর মেয়ে দুই গাছি পুষ্পমাল্য আনিয়া প্রণয়ের গলায় দুলাইয়া দিল। আবার একটি সঙ্গীত, তারপর সভাপতির বক্তৃতা ও অভিনন্দন পাঠ।

একটি সুদৃশ্য, স্বর্ণচিত্রিত রৌপ্যাধারে রক্ষিত অভিনন্দন-পত্রখানি সভাপতি প্রণয়কুমারের হাতে দিলেন; প্রণয় সেখানিকে মাথায় স্পর্শ করাইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

এইবার তাঁহাকে জবাব দিতে হইবে। বলিতে বলিতে প্রণয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; এক সময়ে মনে হইল তাঁহার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িতেছে; পা দুটি কাঁপিতেছে;—হঠাৎ একসময় "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন" করুণকণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। বিপুল করধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

বক্তার পর বক্তা উঠিয়া, প্রণয়ের সদাশয়তার, আশ্রিত-বাৎসল্যের, সচ্চরিত্রতার, মহানুভবতার কথা বিঘোষিত করিয়া তাঁহার বদলীতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বৃদ্ধ - উকীল অথবা মোক্তার, মাথায় সেকেলে সামলা, গলায় পাকান চাদর—বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রণয়কুমার বয়সে তরুণ হইলেও তিনি যে কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীবৃন্দের পিতা-মাতা স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি চলিয়া গেলে তাহারা যে একান্ত অনাথ হইবে, অতিশয় ভাবাবেগের সহিত কথাগুলা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তিটি স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সভান্তে চা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরিত হইল। ইন্দু মেয়েদের সারিতে এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, প্রণয়কুমার তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, কিছু খাবে ইন্দু?

ইন্দু তন্ময় হইয়া ছিল। যে লোকটির উচ্চ গুণগ্রামের প্রশংসা করিয়া বক্তার পর বক্তা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিল, সেই লোককে একেবারে তাহারই সম্মুখে দেখিয়া সে মহা গৌরব-বোধে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল।

প্রণয়কুমার প্রীতিভরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কিছু খাবে ত?

ইন্দু না বলিতে পারিল না; হাঁ বলিতেও পারিল না। ভিতরটা তাহার ভরিয়া গিয়াছিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহাকে তাহার সম্মতি মনে করিয়া প্রণয় বলিলেন, এস আমার সঙ্গে। আমরা ঐ টেবিলটায় বসি।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

প্রণয় বলিলেন, কিছু খেতে হবে যে!

চারিদিকে অগণিত পুরুষ, আর দশদিকে প্রসারিত অগণিত তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহারই মাঝে বসিয়া খাইতে হইবে শুনিয়া ইন্দু পিছাইয়া গেল; বলিল, না, না, আমি কিছু খাব না।

—একটু চা?

—এখানে না।

প্রণয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল, আমরা অন্য কোথাও বসে চা খেয়ে নেব। এস তুমি।

প্রণয় সভাপতি ও অন্য দুই চারিজন গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট বিদায় লইয়া বাহিরের দিকে চলিলেন, ইন্দু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

গাড়ীর ভিতরটা অভিনন্দন-পত্রাধারে, পুষ্পমাল্যে, পুষ্প-স্তবকে ভরিয়া গিয়াছিল। তাহারই মধ্য হইতে গুটি কতক স্তবক লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া, প্রণয় ইন্দুকে গাড়ীতে উঠাইয়া, নিজে উঠিয়া বসিলেন। তখনও স্তবগানের ও গুঞ্জনের অবসান হয় নাই। বারবার নমস্কার করিয়া কোনমতে এড়াইয়া, গাড়ী চালাইয়া দেওয়া হইল। গাড়ীতে আবার চুপচাপ।

গঙ্গার তীরে, নদীর জলে ভাসমান একটা জেটির উপরকার ক্ষুদ্র হোটেলের বারান্দায় বসিয়া উভয়ে চা পান করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পরপারের কলগুলিতে লক্ষ দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, গঙ্গার বুকে আলোকিত ষ্টীমারগুলা ছুটাছুটি করিতেছে, নদীর জলেও মাঝে মাঝে রঙীন আলো ভাসিয়া উঠিতেছে,—জ্বলিতেছে, নিবিতেছে। দৃশ্য মনোরম। ইন্দু একাগ্রদৃষ্টিতে নদীর তরঙ্গায়িত কাল জলের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

প্রণয় সসঙ্কোচে কহিলেন, তোমার খারাপ লাগে নি ত ইন্দু?

—কি?

—আজকের সভা—

ইন্দু উচ্ছ্বাসভরে বলিল, না, না, আমার খুব ভাল লেগেছে।

সত্য সত্যই তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। অভিনন্দন-সভাদিতে অতিশয়োক্তির যে প্রবল বন্যা বহিয়া যায়, ইহা ত সে জানে না। অভিনন্দন ও শোকসভাগুলিতে নীর ত্যজিয়া যে ক্ষীরেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হয়, ইহা সে কিরূপে

জানিবে? তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, প্রণয়বাবুর মত উচ্চহৃদয়, মহৎ লোকের সম্বন্ধে কি ভ্রান্ত ধারণাই না সে এতকাল ধরিয়া পোষণ করিয়াছে?

প্রণয়কুমার উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন, তোমার ভাল লেগেছে শুনে আমার যে কত আনন্দ হ'ল তোমাকে তা আমি বুঝাতে পারব না।—পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।

পথে আবার সেই নীরবতা। এবার নীরবতা ইন্দুর ভাল লাগিতেছিল না। সে প্রণয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রণয় কোনও প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলে ইন্দু সানন্দে তাহাতে যোগ দিত।

কিন্তু প্রণয় কোন প্রসঙ্গই তুলিলেন না। গঙ্গার ধারের ষ্ট্র্যাণ্ড শেষ হইল, গড়ের মাঠের আলো-আঁধারের পথ ধরিয়া গাড়ী অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিল, কত গাড়ীর ভিতরে কত আলো, কত হাস্যফুল্ল মধুর মুখ, কত আনন্দস্ফীত বক্ষ অতিক্রম করিয়া তাহাদের গাড়ী চলিল, কিন্তু সে কি নিদারুণ কঠোর ব্রতনিষ্ঠা,—নিরবচ্ছিন্ন মৌনতার অবসান হইল না। প্রণয়ের কথা আমরা বলিতে পারিব না, কিন্তু বক্ষ-মথিত-করা কত নিঃশ্বাস ইন্দু যে সযত্নে দমন করিয়াছে, তাহা সে-ই জানে!

বাড়ীর বাহিরে গাড়ী থামাইয়া প্রণয় বলিলেন, তুমি ক্ষমা করেছ জেনেও একটা কথা না ব'লে পারছি না ইন্দু। তোমায় কখন কখন বিরক্ত না করেছি তা নয়; কিন্তু কেন বিরক্ত করেছি, তা যদি জানতে!—কথাটা তিনি শেষ করিলেন না। বাম হস্তে গাড়ীর দ্বার খুলিতে খুলিতে বলিলেন, একটি অনুরোধ করব? রাখবে?

'না' বলিবার সাধ্য ছিল না; ইন্দু বলিল, বলুন।

—আমার শত দোষ ত্রুটী আছে আমি জানি; তবু যখন ক্ষমা করেছ বলেছ, যখন আমি এদেশে থাকব না, আসব না, তখনও মনের একটি কোণে একটু স্থান দেবে কি?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ইন্দু বলিল, আমি এখানেই নামব না কি? আপনি ভিতরে আসবেন না?

—আজ আর নয়। বাইরে একটা ডিনার আছে, ৮টা

—কাল একবার আসবেন?

—আসব?

ইন্দু হাসিয়া বলিল, বা রে! যাবার আগে একবার আসবেন না?

প্রণয় উল্লসিত হইয়া কহিলেন, বেশ, আসব।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া হেরম্বনাথ নিদ্রার উপক্রম করিতেছিলেন, গৃহিণী আসিয়া আলো জ্বালিলেন; মশারির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, মশারির ভিতর মশা ঢুকেছে না কি গো? কাল কাল ওগুলো কি বল ত?

হেরম্বনাথ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না; মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, মশাই হবে বোধ হয়। দেখ না!

গৃহিণী খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া হেরম্বনাথকে একটি ধাক্কা দিয়া বলিলেন, চোখ চেয়ে দেখ-ই না গো। বোধহয়-এ দরকার কি!

হেরম্বনাথ চক্ষু মেলিলেন, চোখে চোখ মিলিল, উভয়ের মুখেই হাসি দেখা দিল। হাসির কোন অর্থ ছিল কি ছিল না তাহা কে বলিতে পারে? বুড়া-বুড়ীরা এমন অনর্থক হাসে কি?—কে জানে হাসে কি না! আমি বুড়া নহি, বুড়া-বুড়ীর মনের কথা কিরূপে জানিব? হেরম্বনাথ হাস্যমুখে কহিলেন, শয়নে পদ্মনাভটা কি তবে এখানেই হবে?

—আহা! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে!—বলিয়া গৃহিণী ছোট-খাট আর একটি ধাক্কা দিলেন। তারপর কর্ত্তাকে খানিকটা সরাইয়া দিয়া পাশটিতে শয়ন করিলেন।

হেরম্বনাথ বলিলেন, তা বেশ। এখন দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দিলে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি। মহেন্দ্রটা আজ যা হারান্ হেরেছে, তিনদিন তার গায়ের ব্যথা মরবে না। চার বাজী খেলেছে, চার বারই মাৎ।

গৃহিণী বলিলেন, বলি, মাৎটা করলে কে?

হেরম্বনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, কেন,আমি!

—তুমি খুব বীর!—বলিয়া হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, শোন, ঘুম পরে হলেও হবে, এখন বিশেষ কথা আছে।

—এই রাত্রে! দোহাই প্রি—

গৃহিণী তাড়াতাড়ি কর্ত্তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, খুব আদর হয়েছে।

হেরম্বনাথ গৃহিণীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিলেন, কেন লাবু, তোমায় আমি আদর করি নে? শুনবে তবে, প্রিয়ে, প্রিয়তমা, প্রাণেশ্বরী—বলিতে বলিতে হেরম্বনাথ সত্যই একটু হায়-রে-সেকালে-আচরিত আদর করিলেন। বয়স যতই কেন হোক্ না, লাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে ভুল হইবে। কক্ষে আলোক থাকিলে একটুখানি লজ্জা হয়ত অনুভব করিতেন।

—শোন, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

একটু আদর করিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ভাবিয়া কর্ত্তা নিদ্রাদেবীর তপস্যায় মন দিতেছিলেন, বলিলেন, ভগবান মঙ্গলময়, চিরদিনই মুখ তুলে চেয়ে আছেন।

—না গো না, তা বলি নি।

নয়!—হেরম্বনাথ পাশ ফিরি উপক্রম করিতেছিলেন, গৃহিণী বাধা দিয়া খুব চুপে-চুপে, বিশেষ গোপনীয় কথার ভঙ্গীতে বলিলেন, এখন প্রণয়কে ইন্দুর ভাল লেগেছে।

হেরম্বনাথ শঙ্কিত, নীরব।

—প্রণয় আজ ওকে পাটিতে নিয়ে গেছল। এসে পর্য্যন্ত ইন্দুর মুখে প্রণয়ের প্রশংসা ছাড়া অন্য কথাই নেই।

মহেন্দ্রকে মাৎ করিবার যে আনন্দে হেরম্বনাথ মশগুল ছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল।

গৃহিণী বলিলেন, ইন্দু কাল দুপুরে প্রণয়কে খেতে বলেছে। ওকি তুমি ঘুমুচ্ছ নাকি?—বেশ লোক ত তুমি!

ঘুম! হায় রে, ত্রিসীমানা ছাড়িয়া ঘুম কোথায় পলায়ন করিয়াছে তার ঠিকানাই নাই। কিন্তু সে কথা বলিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

—জান ত! আগে আগে প্রণয়ের নামে ও জ্বলে উঠত, দু'চক্ষু পেতে তাকে দেখতে পারত না। আজ হঠাৎ তাকেই খাওয়াবার কথা মনে হ'ল, বলি, বুঝছ?

হেরম্বনাথ কবুল করিয়া বলিলেন, না।

গৃহিণী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, দিলেন আলো জ্বালিয়া। তারপর বলিলেন, কি বুঝছ না, তাই বল।

হেরম্বনাথ তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াই বলিলেন, কাল বলব।

—কাল কেন, এখনই বল।

হেরম্বনাথ মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। এমন জানিলে 'বুঝিনা' না-বলিয়া 'বুঝি' বলিলেই ভাল হইত ভাবিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। ঘুমের প্রথমাবস্থায় বাধা পাইলে ঘুম চটিয়া যায়, ঘুম না হইলে তাঁহার শরীর খারাপ, মেজাজ খারাপ হয়। কিন্তু যে লোক সুগভীর রাতে সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া যুদ্ধং দেহি রবে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে নিরস্ত করাও সহজ নয় ভাবিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

গৃহিণী বলিলেন, কি চুপ ক'রে রইলে যে!

ভাবছি।

—কি ভাবছ?

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; হেরম্বনাথ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা বাজছে?

গৃহিণী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, বারটা।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হেরম্বনাথ বলিলেন, বাস্ রে! বারটা বেজে গেল! কাল আবার ভোরেই বেরুতে হবে যে। বলিয়া চক্ষু মুদিলেন।

গৃহিণী রাগতভাবে কহিলেন, ভোরেই বেরোও আর এখনি বেরোও, কাল দুপুরে তোমায় বাড়ী থাকতে হবে।

—দুপুরে, তা নিশ্চয় থাকব।

—তোমার নিশ্চয় ত!

—দেখ, ঠিক থাকব।

দেখা গেল হেরম্বনাথ যথাসময়ে গৃহে অনুপস্থিত রহিলেন। প্রণয়কে আহারে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মা'র অনুরোধে, ইন্দুই তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল এবং সাধারণ ভদ্রলোকের গৃহে যেমন হইয়া থাকে, সেদিন সে নিজে অনেকগুলি সৌখীন রান্না রাঁধিয়া ফেলিল। ঘর-সংসার, রান্নাবান্নার কাজে ইন্দুর চিরদিন প্রবল আগ্রহ। এ সকল কাজ পাইলে আর কিছুই সে চায় না। আজ সকাল হইতে সে একা একশত হইয়া খাটিতেছে। তাহাকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য মা বার বার রান্নাঘরে আসিতেছেন, মশলাদি পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন, ইন্দুও মা'র কাছে নানা পরামর্শ জানিয়া লইতেছে।

ইন্দুর এই অপরিসীম যত্ন, শ্রমশীলতা দেখিয়া মা'র মনে আজ আনন্দের অবধি নাই। এই সুমতিটুকু যাহাতে বজায়

থাকে, তাহার জন্য তিনি সাতকোটী দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

প্রণয় আসিলে, ইন্দু তাহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বলিল, আপনাকে কি টেবিলে দেব?

প্রণয় হাসিয়া কহিলেন,—As you like it! (যথা অভিরুচি)।

টেবিলে খাবার সাজাইয়া, ইন্দু তাঁহাকে খাবার-ঘরে ডাকিয়া আনিল। প্রণয় বলিলেন, তুমি খাবে না?

—আপনার হোক্।

—একা একা খেতে আমার ভাল লাগবে না।

—একা কেন, আমি ত এখানেই আছি। আপনি বসুন।

—তুমি বসলে কিন্তু বেশ হ'ত। দু'জনে গল্প করতে করতে—

—গল্প এমনই করতে পারবেন, আমি ত এখানেই আছি। যার রান্না, সম্মানিত অতিথিকে না খাইয়ে সে খেতে পারে কি?

প্রণয় সজ্জিত আহার্য্যের পানে চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, তুমি এত সব রেঁধেছ ইন্দু!

লজ্জারুণ আনত মুখে ইন্দু কহিল, আপনি বসুন তো। খেতে পারেন, তবে না?

ইন্দু টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া বসিল।

প্রণয় সামান্য কিছু খাইয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন।

ইন্দু বলিল, আপনি খেলেন কৈ যে, এত সুখ্যাতি করছেন?

প্রণয় আবার আহারে মন দিলেন। যে বাটী হইতে যে খাদ্য মুখে তুলেন, তাঁহার নিকট তাহাই অমৃততুল্য বোধ হয়।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, আমি রেঁধেছি আর আপনার সামনে বসে আছি, প্রশংসা না করে উপায় কি!

—বেশ, তা হলে একটু নিন্দাই করি, কেমন! এই দেখ, নূনের ভেতর একটা আস্ত ডেলা।

ইন্দু হাসিল। প্রণয় বলিলেন, কেমন, নিন্দে করতেও পারি। দেখলে?

লজ্জার কথা কি-না জানি না, প্রণয় ভোক্তা ভাল, আধুনিক যুবকদিগের মত নস্য-পরিমাণ ভোজন করিয়াই হাঁস-ফাঁস করেন না। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, বলিলেন, জীবনে এমন তৃপ্তির সঙ্গে আর কোন দিন খাই নি ইন্দু।

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল। তবে কথাটা যে তাহাকে অতীব প্রীত করিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল।

প্রণয় বলিলেন, ইন্দু, আজ তুমি আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তার বিনিময়ে তোমাকে আনন্দ দেওয়াই উচিত; কিন্তু তার বদলে আমি তোমায় দুঃখই দেব।

ইন্দু মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে কাণ পাতিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রণয় বলিলেন, সব কথা হয়ত গুছিয়ে আমি বলতে পারব না, তবু আমার বিশ্বাস, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে।

ইন্দুর পা দু'টা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

—তুমি জান বোধ হয় আমি বিপত্নীক। বৌদি সে কথা তোমাদের বলেছিলেন বলেই শুনেছি। বিপত্নীক হবার কিছুদিন পরেই বৌদি আমাকে তোমাদের কাছে আনেন। যে উদ্দেশ্যে আনেন, তা বোধ হয় তুমিও জান। প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু—

ইন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, প্রণয় বলিলেন, আমার কথা অনেক নয়, এক মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি সেই একটি মিনিট ব'স।

ইন্দু বসিল; কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ ছুটিতেছিল।

প্রণয় বলিলেন, তোমাকে পাবার আশাই আমি করেছিলুম, কিন্তু তুমি ছিলে একান্ত বিরূপ। তুমি যত দূরে চলে যেতে চেয়েছ, আমাকে তত পাগল করেছ। আমার সে অবস্থায় আমি যেখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। মনে করেছি তোমার চেয়ে ভাল কাউকে খুঁজে নিতে পারব, সেই আশাতেই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত—তোমাকে ত নয়ই, তোমার মতও কাউকে পাই নি। তবুও ছুটোছুটির অন্ত নেই, কলকাতায় থাকলে তার আর শেষ হবেও না। তাই আমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। আজ যাবার দিনে তোমার স্নেহ-যত্ন পেয়েছি বলেই একটা কথা বলে যাই, ইন্দু, আমি লম্পট নই, অসচ্চরিত্রও নই, যত খারাপ ব'লে তুমি

আমাকে ভাব, ততটা খারাপও আমি নই। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে, জীবনকে আমি ধন্য বলে মেনে নিতে পারতুম।

কথা শেষ হইতেই ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার মুখ পাংশু, চক্ষু নিষ্প্রভ, দেহখানি যেন বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে।

প্রণয় ভীত কণ্ঠে কহিলেন, অপরাধ নিও না, ইন্দু। জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যটা আজ স্পষ্ট করে বলে ফেললুম।

—আপনার পান আনি, বলিয়া ইন্দু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অসহযোগের সঙ্গে আইন অমান্যের প্রবল আন্দোলন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। জেদাজেদির পীঠস্থান আদালত জনশূন্য, স্কুল-কলেজে ছেলে নাই, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থিতি নাই, লোকের আস্থাও নাই, কোম্পানীর কাগজের দাম রোজই নামিয়া যাইতেছে, কংগ্রেসের লোক রাজার আইন অমান্য করিতেছে, দেশময় বিশৃঙ্খলা। ছেলেমেয়েরা বাপ-মার কথা অমান্য করিতেছে, সমাজের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে। অদৃশ্য স্থানে বসিয়া বাসুকী যেন মাথা নাড়া দিতেছেন। ধনীর মনে সুখ নাই, গৃহস্থের ঘরে শান্তি নাই, সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে কোন রকমে দিন যাপন করিতেছে। সর্ব্বত্র অশান্তি। এত মধ্যে শান্তি, এমন বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিবে কেমন করিয়া কে জানে!

জেলে যাওয়ার বড় ধুম পড়িয়াছে। নেতারা আগেই গিয়াছেন, স্বেচ্ছাসেবকেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, এখন স্কুল-কলেজের ছেলেদের পালা। তাহারা স্কুল বা কলেজের ফটকে পিকেটিং করিয়া জেলে যাইতেছে। যে বেকারের দল জীবিকার আশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, তাহারা দিন কতকের জন্য বিশ্রামাশায় পুকুরপাড়ে বা নদীর ধারে উনুন জ্বালিয়া ভাঁড় চড়াইয়া নুন তৈরী করিতে লাগিয়া গিয়াছে। খবর পাইয়া পুলিশ আসিতেছে শুনিলেই তাহার দ্বিগুণ উৎসাহে উনুনে জ্বালানি কাঠ ঠেলিয়া দিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে আগুন, কাজেই মুটে-মজুররা বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাও ঝাঁকা ফেলিয়া "বন্দে মাতরম্" হাঁকিয়া পুলিশের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া রাজ-আতিথ্য বরণ করিতে চলিয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা শহরের রাজপথে এই দৃশ্যই শুধু দেখা যায়। মাথায় ময়লা খদ্দরের টুপি, অঙ্গে মোটা মলিন খদ্দর বসন, কাহারও বা খদ্দরের চাদরে আবৃত দেহ, কাহারও দেহের উপরার্দ্ধ নগ্ন, পায়ে জুতা আছে কিম্বা নাই—দলে দলে লোককে একটিমাত্র পুলিশ-প্রহরী স্বচ্ছন্দে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে চলিয়াছে। পলায়নের চেষ্টা নাই, দণ্ডের ভয় নাই; মধ্যে মধ্যে কেবল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে শহর সচকিত হইয়া উঠিতেছে।

সরকারের জেলখানায় স্থানের অত্যন্তাভাব। দরমার বেড়া দিয়া মাঠ ঘিরিয়া নূতন নূতন জেলখানা গঠিত হইতেছে। শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে খোলা মাঠ আর নাই বলিলেও চলে।

স্কুল-কলেজের ছেলে যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মেয়েদের পালা। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই বাড়ীতে, স্কুলে-কলেজে, গুরুজনদের কথা অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন দৈনিক সংবাদপত্রে জেলযাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিল, তখন তাহারাও জোট বাঁধিয়া দেশের লবণাভাব দূর করিতে অগ্রসর হইল। নারীদের জন্য স্বতন্ত্র জেলখানা না গড়িয়া সরকারের উপায় রহিল না।

লবণের অভাব দেশের লোকের বড় অভাব নহে, লবণ প্রস্তুত করিয়া সে অভাব মোচন করাও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করাই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা যে কতকাংশে সফলও হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যে আন্দোলনে লোকের অন্তরের স্পর্শ ছিল না, সে আন্দোলন খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

তা না হউক, অগ্নিশিখা বহু দূর উচ্চে উঠিল এবং বহু দূরে ছড়াইয়া পড়িল। সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রাম, সেখান হইতে গণ্ডগ্রামগুলিতেও পরিব্যাপ্ত হইল।

ছায়ার শ্বশুরবাড়ীর দেশ রামপুর গ্রামেও বন্যার ঢেউ লাগিল। ছায়ার দেবর স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে কোন্ নদীর ধারে নুন প্রস্তুত করিতে গিয়া, থানার হাজতে দুই দিন দুই রাত্রি বন্ধ থাকিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, ক্ষমা চাহিয়া, নাকে খৎ দিয়া তৃতীয় দিবসে শুকাইয়া আধখানা হইয়া বাড়ী ফিরিল।

ছায়ার শাশুড়ী তৎপূর্ব্বেই শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোক আসে নাই, একটি একটি করিয়া দিন কাটিয়া গিয়াছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়াছে, অশোক আসে নাই, কোন খবরও দেয় নাই।

ছায়ার মুখে আর কথা নাই। শাশুড়ীর সামনে আসিতে তাহার মাথা কাটা যায়। তাঁহার ব্যাকুল ছল ছল আঁখি দুইটি অহরহ ছায়ার মুখের উপরে চাহিয়া যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছে, সে প্রশ্নের শেষ উত্তরটিও যে ছায়ার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! বলিবার, সান্ত্বনা দিবার কোন কথাই কি আর তাহার আছে? সে যে প্রাণ ঢালিয়া, নিঃশব্দে রুগ্না শাশুড়ীর সেবা করিলেও, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কথা বলিতে গেলে চোখে জল আসিয়া পড়ে, ছায়ার

শাশুড়ী যে তাহা না বুঝিতে পারেন, তাহা নহে; তাই ত তিনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাহাকে কাছে ডাকেন। কোন কথা বলিবার না থাকিলেও যা-তা একটা কথা বলিয়া, তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদছলে অশ্রু বর্ষণ করেন, তাহা দেখিয়া ছায়া যে কিছুতেই আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে না। তাঁহার সম্মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া কোন গোপন স্থানে গিয়া কাঁদিয়াই তবে সে একটু সান্ত্বনা পায়! অশোক তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ হয় না তাহা নহে; কিন্তু সে এই পুত্রগতপ্রাণা মাতাকে যে নিষ্ঠুর প্রতারণা করিয়াছে, সে দুঃখের সীমা কোথায়? একটি করিয়া দিন কাটিয়াছে আর আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের দ্বন্দ্বে বৃদ্ধার ভঙ্গুর হৃদয়ে যে ঝড় বহিয়াছে, তাহা চোখে যে না দেখিয়াছে, তাহার পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। এক একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক একখানি পাঁজরা খসিয়া গিয়াছে। ছায়া মিনিটের পর মিনিট ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সে দৃশ্য দেখিয়াছে। দেখিয়াছে, আর তাহার নিজের বিড়ম্বিত, অভিশপ্ত জীবনের দুঃখও ম্লান হইয়া গিয়াছে। ছায়ার কল্পিত দিনের পর আরও কয়েক দিন যখন কাটিয়া গেল, তখনই বৃদ্ধা শয্যা লইলেন। পাছে পরে জ্ঞান না থাকে, বলিতে না পারেন, তাই আগেই ছায়াকে বলিয়া রাখিলেন, বউ মা, ছোঁড়াটাকে দেখো। না খেতে পেয়ে যেন মরে না।

ছায়া বলিল, আমি বেঁচে থাকতে ঠাকুরপোকে কোন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না মা!

বৃদ্ধা কতকটা শান্ত হইলেন। না হইয়া কি করিবেন? ছায়া অনাথা নিঃসহায়া স্ত্রীলোক, তাহার অভয়দানের মূল্য কি? মুখের সান্ত্বনা ছাড়া ইহা যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। কঠোর সংসারে তাই বা কে দেয়? তাই বা কোথায় পাওয়া যায়?

এমনই এক দুর্দিনে দুঃসংবাদ আসিল, পরেশকে থানার লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

পল্লীগ্রামের লোক সরল, পরোপকারী, কিন্তু তাহাদের পায়ে মাথা খুঁড়িলেও থানার চৌকাঠ তাহারা মাড়াইবে না। দুই দিন এই দুই নারীর কি ভাবে কাটিল, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিলেন।

কয়েক দিন পরে বৃদ্ধার অবস্থা যখন খুবই শঙ্কাজনক, সেই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নে প্রণয়কুমারের সুন্দর গাড়ীখানি আসিয়া সেই কঞ্চির বেড়ার ধারে দাঁড়াইল। ছায়া গাড়ীর শব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দুকে আসিতে দেখিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসিল।

তাহারা কাছে আসিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিমল-দা?

ইন্দু মুখ নীচু করিল। প্রণয় বলিলেন, নিষিদ্ধ বই পড়ায়, ছ' মাস জেল হয়েছে।

দুইটি নারী একই সঙ্গে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল—ছ' মাস জেল—বিমল-দা'র?

প্রণয় ধীরকণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছেই বিচার হয়েছিল। অনেকের এক বৎসর পর্যন্ত জেল হয়েছে। বিমল বাবুকে ছেড়ে দিতেও পারতুম, তাঁকে সে সুযোগও দিয়েছিলুম, তিনি জেলই বেছে নিলেন।

—আমায় বল নি ত?

ইন্দু আকাশে মুখ তুলিয়া প্রণয়ের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রণয় তাহাকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া ফেলিলেন।

ছায়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বিমল-দা'র বুড়ী মা?

প্রণয় বলিলেন, তাঁকে কাশী পাঠান হয়েছে। যেদিন বিমল বাবুর জেল হয়, সেই দিনই আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সঙ্গে লোক দিয়ে মা'কে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইন্দু সজল দু'টি চক্ষু তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র।

ছায়া নিজের মনেই বলিল, ছেলেরা বড় হ'লে মা'রা আর বেঁচে থাকে কেন, তাই ভাবি! এখানেও এক বৃদ্ধা মা'কে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলছে; প্রাণ যায়-যায়, তবু যায় না!

ইন্দু দাওয়ার উপরে উঠিতে ছায়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এক মুহূর্তে, কি-যেন-কি মনে হইল, কি-যেন-কি ভাবিল, তারপরে তাহাকে সমদুঃখী ভাবিয়া বুকের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ভিতরে এস ভাই।

ইন্দু ভিতরে প্রবেশ করিলে, ছায়া প্রণয়কে বলিল, প্রণয় মামা, পৃথিবীতে চিরদিন কি এমন বিপরীত ঘটনাই ঘটে?

—কি বিপরীত ঘটনা ছায়া?

কোন্‌টা নয়? কিন্তু, এই যে, ছেলের জন্যে মা'র প্রাণ যায়, ছেলে মা'র খোঁজও নেয় না—

কথাটা শেষ হইল না। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে বন্যা বহিল,—তাহার শেষ কোথায়, কে জানে! নদী, নদী হইতে সমুদ্র, সমুদ্র হইতে মহাসমুদ্র, তারপরে—কে জানে বন্যার শেষ কোথায়? [ক্রমশঃ

ভাষার অন্তর

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পুরুষ যেদিন পেল প্রকৃতির প্রেম অনাবিল,
প্রথম উঠিল কাঁপি এ বিশ্ব-নিখিল,
আঁখির ভ্রূভঙ্গী-তলে,
ধরা দিল পলে পলে,
পরস্পরে অতি সন্নিকটে,
আঁখি হ'তে স্মরণের পটে ;
—সেই দিন বিকশিল জীবনের প্রথম অঙ্কুর
আদিতম মানব-শিশুর ॥
জন্মের আনন্দ-জালে
জড়াইয়া অন্তরের অতি অন্তরালে
মেঘের ভেলায়,
মৃত্তিকার রস-ঘন আনন্দ-মেলায়,
এল তারা বেলা-অবেলায় ।
অনন্তের অন্ত হ'তে অমৃতের প্রসাদ-পাত্র খানি
প্রকৃতি তাহারে দিল আনি' ;
বায়ুতে আনিল দোল, আকাশের যত ছন্দতাল
প্রভাত আনিল ফুল,
তপস্বিনী সাজিল বৈকাল ;—
গাছে গাছে লতায় পাতায়
শ্যামল বনানী
শয্যাখানি পেতে দিল আনি'—
দিল তারে ডাক
রসঘন পরম-নির্ব্বাক ।
সমুদ্র আনিল তার লাগি'
সারা রাত্র জাগি'
নিখিলের সঙ্গীত-পিপাসা
সর্ব্ব সনে মিলিবার আশা,
যে আছে যেথায় ;
অনন্ত নিখিল হ'তে অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বালুকায়,
কোন্ মন্ত্র, কোন্ গান—
করে কানাকানি,
কোন্ সে রহস্যখানি
অরণ্যের মনে
ক্ষণে ক্ষণে বাহিরায় অনবগুণ্ঠনে !

কৌতূহল-জিজ্ঞাসার সেই পথখানি
বসন্তের গানে গানে ভরে দিল "বাণী"—
বাণী এল অরূপা অ-রূপা—
প্রথম বন্দনা তার নব মধু-ক্ষরা
প্রকাশের ব্যাকুলতা ভরা ।

অরূপ লভিল রূপ
অতি অপরূপ ;
ভাঙ্গিয়া জড়ের বাসা,
সীমায় পাইল মূর্ত্তি অসীমের আশা ।
প্রথমা যে অনাদি প্রকৃতি, স্নেহার্ত্ত চুম্বনে
মানবের শাবকেরে আনিয়াছে প্রথম ভুবনে,
তারি ছন্দে হৃদে বাজে অরূপ অক্ষর
শিরার ঝঙ্কারে ওঠে স্বর
প্রকৃতির অতি কণ্ঠলীনা
একান্তই তার অনুগামী ;
শব্দের প্রথম রস রসনার তলে তলে আনি'
সেই ত ছানিল তারে
অমৃতের সরোবর-পারে !
বিকশিত শ্বেত-পদ্ম প্রায়
অতি মনোলোভা,
তার সে মর্ম্মের প্রেম,—বেদনা নিষ্কাম,
স্নেহ অবিরাম
অন্তর-উজল-করা সে বাণীর সোনা
নিল স্থান হংস-মণ্ডল মাঝে,
শুভ্ররূপা, নাভি-পদ্মমূলে,
নিঃশ্বাসে নিশ্বাসে ওঠে বাণী
আলসে ধ্বনিয়া চলে প্রকৃতির বীজ-মন্ত্রখানি
প্রাণ আর মৃত্তিকার গুপ্ত কানাকানি ॥

মানুষের মজ্জায় মজ্জায়
মিশিয়াছে প্রকৃতির যেই আশীর্ব্বাদ,
তাহারি গীতালি
ভাষায় পাইল খুঁজি' মনের মিতালি ।

ভাষা আর প্রকৃতির সঙ্গম-প্রয়াগে
নিষ্কলুষ বাণী-মূর্ত্তি জাগে
নব রাগে রাগে ॥
নিখিল নয়ন-তলে শান্ত মৃদু হাসি
অবিনাশী শব্দ-যন্ত্র করে
প্রোজ্জ্বল কিরীট 'পরে
নব-জাত বালার্কের শিখা ;
প্রস্ফুটিত শ্বেত-পদ্মাসনা,
লীলাকণ্ঠী-মরাল-গমনা,
এলায়িত আকুল অলকে
পলকে পলকে,
নব নব মূর্চ্ছনায় দেহ-তন্ত্রী-তারে
মিলাইল বারে বারে
ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ব লোকে, লোকে,
দেশের প্রকৃতি পেল ভাষার আলোকে
আপনার বিকাশের পথ,
তাহার অস্তিত্ব সাথে যুক্ত হ'ল প্রকৃতির আশা।
বাণীরে সাজায়ে ফুলে
নেমে এল ভাষা
প্রকৃতির শান্ত ভালবাসা, পেল সেই ভাষার প্রণাম।
ভাষায় রহিল বাঁচি প্রকৃতির যত কিছু গান ;
শুদ্ধ দেশ-প্রাণে
সে ভাষা অমর হ'ল মানুষের গানে ॥
যুগে যুগে প্রকাশের এই আয়োজন
নিত্য প্রয়োজন,
মিটিতেছে স্বদেশের মৃত্তিকার কাছে ;
মৃত্তিকার যেই রসে সে দেশের ভাষাটুকু বাঁচে,
প্রভাত-শিশির ভেজা
যার ঘাসে ঘাসে
অন্তরের বাণী তার নাচে,
সেই মাটি মর্ম্মে তার সত্তা হ'য়ে আছে ;
—রবে চিরকাল।

অমর অশেষ তাহা, মৃত্যুহীন, প্রাণের পাথেয়,
নহে অপাংক্তেয়।
(লয় তার নাই ;—কেবল প্রলয় আছে
ব্যভিচারী মানুষের হাতে)।
দেশ-প্রকৃতির সাথে
ছিন্ন হ'ল মানুষের সর্ব্ব যোগাযোগ
সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ,
মাটির এই অনাবিল শান্ত রসধারা
যেখানে হইল হারা
মানুষের অন্তরের মরু-বালুকাতে,
—আছে সেই ক্রূর পরিণাম,
ভাষায় পেল না আর মানুষের প্রাণের প্রণাম ॥
স্বদেশের মৃত্তিকার মর্ম্ম হ'তে ছিঁড়ি'
তাহারে রাখিলে ঘিরি'
প্রস্তরের কঠিন প্রাচীরে,
লুপ্ত করি' জন্মান্তের মায়া-স্পর্শটিরে
লুকায়ে রাখিলে তারে, বন্দীবেশে, মানবের দল
—নিষ্করুণ সংস্কার-উচ্ছল,
চিত্ত-তল হ'তে তার অকস্মাৎ খ'সে যাবে
সত্যকার বাণীর প্রতিমা
প্রাণহীন দেহ রবে ল'য়ে তার ক্ষুদ্রতার সীমা,
প্রাণস্পর্শহীন সেই সীমা-তলে
পলে পলে
দেশ যাবে ম'রে,
শুধু তার শব-দেহ পরে
পুঞ্জীভূত হবে আসি' ভ্রষ্টরূপা জড় অলঙ্কার,
মানুষের লুব্ধ অহঙ্কার।
শ্মশান-ভূমির সেই প্রান্তদেশে আসি'
হয় ত উঠিবে হাসি'
অপরূপা যোগভ্রষ্টা বাণী
নবরূপা, নহে নিত্যরূপা
নহে সে কল্যাণী ;
মানুষ পাবে না আর তাহার অন্তরে—
স্বদেশ-বাণীর সেই
সহজাত প্রেম-স্পর্শখানি।

ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী

—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন,
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্দ্ধন।
যাহা নদী হয় তাহা মানসে কালিন্দী,
মহা প্রেমবশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি।
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত।

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির একটি বিরাট তফাৎ দেখিতে পাই যে, প্রাচীন ভারতের মানবজীবন, একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, এই বিরাট প্রকৃতির অন্তান্ত অপরূপ রসভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। তাঁহাদের সমগ্র জীবনের যে কোন বিভাগে যখনই আত্মার কোন একটা ভাব ছন্দোবদ্ধ হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে নির্ম্মল ও অতীন্দ্রিয় রসের সন্ধান পাইয়াছে, তখনই উহা তাঁহাদের নিকট রসকলায় জীবন্ত হইয়া পরিস্ফুরণ লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মন্ত্রই ছিল, "ভোগঃ যোগায়তে মোক্ষায়তে চ সংসারঃ।" অর্থাৎ, সংসারের রূপ-রস-গন্ধের বহুমুখী ছন্দের ভিতর মানুষের অফুরন্ত প্রাণ অসীম সৌন্দর্য্যে ধ্বনিত হইবে।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার এই অন্তর্গূঢ় অখণ্ডতা, আধুনিক কৃত্রিমতাময় সভ্যতার চাপে মানুষের জীবনে নানা বিভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে রস-কলা, 'রহস্তময়', 'রূপাভিনয়' হইয়া সাধারণ মানুষের জীবন হইতে আজ বিশ্লিষ্ট এবং মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বোধগম্য অথবা চর্চ্চার বস্তু হইয়া গণ্ডীভূত হইয়াছে। সেই জন্ত সাধারণের পক্ষে এইরূপ চিত্র-প্রদর্শনী আশার সংবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার উজ্জীবন ও উত্থানের পরিব্যাপ্তি মনে হয় আবার বিকারগ্রস্ত বাঙ্গালী সমাজের ভাববিলাস, কদর্য্যতার আস্ফালন ও সর্ব্বপ্রকার পীড়াদায়ক অসমতা হইতে রূপবেদীর পাদমূলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উত্তরাধিকারিত্বে সেই সহজ অনুভূতির পুলকে অনুপ্রাণিত হইয়া উপলব্ধি করিবে,

মহাপ্রস্থান। [শ্রীকিরণময় ধর

অবশ্য আজ নব্যযুগের প্রকৃষ্ট রীতির ভিতর দিয়াই এই রূপ-সংগ্রহ যাহাতে বিশ্ববাসীর উপভোগ্য হয়, সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। কেন না সুদূর যুগের যান-বাহন এ যুগের পথে পর্য্যাপ্ত নয়—সে যুগের বার্ত্তাবাহক পথগুলি এখন বিপর্য্যস্ত ও কণ্টকিত হইয়া গিয়াছে।

এই হিসাবে লক্ষ্ণৌ-শিল্পের এই ক্ষুদ্র অথচ বিচিত্র অলিন্দে স্তরে স্তরে সজ্জিত চিত্র-প্রদর্শনীটি অতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীতে অধ্যক্ষ অসিতকুমারের চৌত্রিশ খানি, প্রধান শিল্প-শিক্ষক বীরেশ্বর বাবুর সাত খানি এবং প্রাক্তন ছাত্র কিরণময় ধরের চল্লিশ খানি ও অন্তান্ত ছাত্রের অঙ্কিত কিছু চিত্র সমগ্র প্রদর্শনী-কক্ষটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইটালি যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিরণময় বাবুর অক্লান্ত চেষ্টা ও

শকুন্তলা। [শ্রীকিরণ্ময় ধর

পাহাড়ী মেয়ে। [শ্রীকিরণ্ময় ধর

যম। [আর. চ্যাটার্জ্জী

সতীহারা শিব। [শ্রীকিরণ্ময় ধর

কল্কি। [আর. চ্যাটাজ্জী

মন্দির-প্রাঙ্গনে। [শ্রীকিরণময় ধর

উদ্বেগ। [শ্রীশরদিন্দু সেন রায়

বৌদ্ধ-ভিক্ষু। [শ্রীভবানীচরণ গুঁই

উদ্যম এবং তাঁহার ও লক্ষ্ণৌ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের চিত্রের এই রকম একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহের রসগ্রহণে বাঙ্গালী জনসাধারণকে সুযোগ দিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের নানাবিধ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের মধ্যে "ছেলেদের জন্য অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র" দেখিলেই মনে হয় যে, ইহারা যে শক্তি লইয়া দেখা দিয়াছে, উহার রূপ, রস, চিত্র। তন্মধ্যে "পথের পাশের বীণাবাদক" (৫১ নং), "রুদ্র প্রয়াগের দড়ির পুল" (৫৮ নং), "পাহাড়ী মেয়ে" (৬০ নং)। এই তিনটী ছবি রেখার সাবলীলতায় ও বস্তু-সমাবেশের গুণে সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই সঙ্গে তাঁর অল্প রংয়ের উপর "সূক্ষ্ম তুলির স্পর্শে" অঙ্কিত ছবিগুলি ধরা যায়। যেমন "নৃত্য-রতা" (৪৯ নং), "পাহাড়ী মেয়ে" (রঙ্গীন) ইত্যাদি।

সাকী। [শ্রীকিরণময় ধর

সৃষ্টির গভীরতায় আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায় এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে। ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে বীরেশ্বর সেনের নিপুণ-তুলিকাস্পর্শ। তাঁহার চিত্রাঙ্কনে কোথাও দুর্ব্বল অথবা অত্যুগ্র বর্ণবিন্যাসের স্থান নাই। চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দিয়া থাকে। তাহার পরই প্রদর্শনী-কক্ষটি প্রদক্ষিণ করিলে যে সমস্ত চিত্রাবলী নয়নপথে গোচরী-ভূত হয়, তাহার অধিকাংশই শ্রীযুক্ত কিরণময় ধরের অঙ্কিত।

এই চিত্রগুলিকে শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার যেরূপভাবে পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রথম—রেখা-

তাঁর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চিত্র মানুষ বা দেবতার জীবনের কোন বিশেষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি, যেমন "সতীহারা মহাদেব" (৩৪ নং)। মহাদেবের এই মহাশোকের চিত্র-খানি অঙ্কিত করিয়া চিত্রকর তাঁর কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। তাঁর আরও দু'খানা ঐ ধরণের ছবির মধ্যে একখানা "যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ," অন্যখানা "সাকী"। কিরণবাবুর তৃতীয় পর্য্যায়ের ছবি, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত colour sketch "বদ্রিনাথের মন্দির" (১১ নং), "একখানা প্রতিকৃতি" (৯১ নং), এই দুই-খানা ছবি দেখিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতিতেও তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে প্রণব রায়ের "প্রসাধন" চিত্রখানি নিখুঁত রেখাপাত ও সহজ রং-বিন্যাসের সরলতায় অতীব মনোরম হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে স্তরে স্তরে বিচিত্র সম্ভারে লক্ষ্ণৌ-শিল্পশিক্ষা-লয়ের চিত্রকলা-প্রদর্শনীর এই ত্রিবেণীসঙ্গম সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রদর্শনীর ভিতর দিয়াই দেশ-বিদেশের শিল্প-ধারার আদান-প্রদানে জনসাধারণ উপকৃত হইবেন আশা করি।

নীরব উৎসর্গ

-শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী

বছর-বছর বর্ষার শেষাশেষি একটি প্রকাণ্ড মাছ-ধরার উৎসব হয়ে থাকে রায়-বাহাদুরের পল্লী-আবাসে। ভদ্রলোকের সহরের পাঁচ ছয়টি আত্মীয়-কুটুম্ব পরিবার থেকে পনের ষোলজন যুবক, আধা-বয়সী, তর-বেতর হুইল-লাগান লম্বা লম্বা ছিপ, চার-কাঠি, টিনের কৌটা, ভাজা মসলা-গুঁড়া, পনীর, পাউরুটি প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম নিয়ে ট্রেণে চেপে হাজির হন রায়-বাহাদুরের বাড়ীতে। জমীদার মহাশয়ের তিন চারটি প্রকাণ্ড পুকুর, নদীর মত একটি লম্বা ঝিল,—সব মাছে ঠাসা। কাণায় কাণায় বর্ষার জলে ভরা সেই সব দীঘি আর ঝিলে মাচাং বেঁধে সাতদিন (অহোরাত্র বললেই হয়) ফাতনার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাছ ধরার সে যে কি বিপুল আনন্দ, তা আর বলা যায় না। সহরের একঘেয়ে, ক্লান্ত জীবনকে একটু বিরাম দেবার জন্যই হোক, অথবা বর্ষার পল্লীশ্রী দেখবার লোভেই হোক, ম্যালেরিয়ার ভয় তুচ্ছ করে, তিন চারজন স্ত্রীলোকও তাঁদের সঙ্গে আসেন।

এবারকার মীনোৎসবের মাছ-ধরা পর্ব্বাধ্যায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ পল্লীবাসের শেষ-রজনী। রায়-বাহাদুরের ডে-লাইটে আলোকিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় প্রশস্ত টেবিলের চার পাশ ঘিরে চেয়ারে বসে আছেন এগার জন মৎস্য-শিকারী, আট জন মহিলা, রায়-বাহাদুর নিজে ও তাঁর গৃহিণী এবং স্থানীয় ডাক্তার রমেশবাবু। টেবিলটি নানা রকম ফুল ও পাতায় সাজান। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।

কথা হচ্ছিল ভালবাসা নিয়ে,—শুধু কথা নয়, রীতিমত তর্কই চলছিল,—সেই সনাতন মামুলি তর্ক,—'মানুষ জীবনে একবারের বেশী ভালবাসায় পড়তে পারে কি না।' তর্কে যেমন হয়ে থাকে,—পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, দু'টি দলের অভাব ঘটেনি। এক পক্ষ জানা-অজানা অনেক লোকের জীবনী থেকে দেখাচ্ছিলেন যে, তাঁরা জীবনে একবার মাত্র প্রেমে পড়েছেন। অপর পক্ষও এক বারের বেশী প্রেমে-পড়া লোকের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে কসুর করছিলেন না। অনেকের মত এই যে, ভালবাসা একটা ব্যাধি এবং ব্যাধির মতই অনেকবার একই লোককে আক্রমণ করতে পারে এবং যদি কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এর অবাধ গতিকে প্রতিহত করে, তা হ'লে সেই প্রেমগ্রস্তকে মরণের পথেও নিয়ে যেতে পারে। এ যুক্তি একেবারে অকাট্য বটে, কিন্তু মেয়েরা (যাদের মতামত বাস্তব ঘটনাবলীর চেয়ে কবি-কল্পনার ভিত্তির উপরই বেশী প্রতিষ্ঠিত) তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন যে, ভালবাসা—হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম মানুষের জীবনে একবার মাত্র আসতে পারে। প্রেম পদার্থটা সৌদামিনী-সংস্পর্শের মত, একবার যে হৃদয়কে ছোঁয়, তাকে এমনি করে শূন্য, ধ্বংস ও দগ্ধ করে ছেড়ে দেয়, এমন অনুর্ব্বর করে তোলে যে, তাতে আর কোন কমনীয় কোমল ভাবের সঞ্চার হতেই পারে না, এমন কি নিদ্রাবস্থায়, স্বপ্নেও নয়।

রায়-বাহাদুর নিজের জীবনে একাধিক বার ভালবাসায় পড়েছেন; তিনি খুব জোর করেই এই মতের প্রতিবাদ করলেন। "আমি বলছি, মানুষে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনেকে বারই ভালবাসতে পারে। দ্বিতীয়বার যে ভালবাসা যায় না, এইটি প্রমাণ করবার জন্য আপনারা এমন সব লোকের জীবন-কাহিনী বিবৃত করছেন, যারা প্রেমে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। উত্তরে আমি এই কথা বলতে চাই যে, যদি সেই আহম্মুখেরা নিজের জীবনকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে হনন না করত, তা হ'লে তারা কালক্রমে এই শুষ্কপ্রাণতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে এই জীবনেই আবার সুখী হতে পারত; জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি বলপূর্ব্বক রোধ করে দেওয়াতেই তো হতভাগোরা দ্বিতীয় প্রেমাস্পদ থেকে বঞ্চিত হ'ল। প্রেমের নেশা আর মদের নেশা দুই-ই সমান। একবার যে মদ খেয়েছে, সে আবার খাবে; একবার যে ভালবেসেছে, সে আবার ভালবাসবে। এটা মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দুই পক্ষই তখন ডাক্তার রমেশ বাবুকে মধ্যস্থ মানলেন। রমেশ বাবু আধা-বয়সী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। আগে

সহরেই থাকতেন, কিছুকাল পল্লীতে এসে বাস করছেন, ডাক্তার বাবুর মত ব্যক্ত করবার জন্য সবাই তাঁকে চেপে ধরল।

দেখা গেল ডাক্তারবাবুর নিজের মতামত বিশেষ কিছুই নেই।

"রায়-বাহাদুর যা বললেন, এটা সম্পূর্ণ ই মানুষের প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে। সে যা হোক, আমার নিজের জ্ঞানে আমি এমন একটি ভালবাসার ব্যাপার জানি, যেটি পঞ্চাশ বৎসর ধরে সমান ভাবে, অবিচ্ছেদে অবিরামেই বিদ্যমান ছিল ; মরণ হ'ল, তবে গেল।"

রায়-বাহাদুর-গৃহিণী উৎসাহে করতালি দিয়ে উঠলেন।—"খাসা, খাসা, কি চমৎকার! কি সুখ এ রকম ভালবাসা পাওয়ায়! দীর্ঘ পঞ্চাশটি বৎসর ধরে এক প্রগাঢ় তীব্র প্রেমাবরণে আবৃত হয়ে থাকা! যে ভালবেসেছে তারই বা কত সুখ!"

ডাক্তার বাবু একটু হাসলেন।

"আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে ভালবাসার পাত্র একটি পুরুষ। আপনারা সকলেই তাকে চেনেন ;—নরহরি গুপ্ত ম'শায়, যার মস্ত ওষুধের দোকান আছে। আর স্ত্রীলোকটি? সেও আপনাদের পরিচিত,—সেই যে ডোমের মেয়ে, বছর বছর এ অঞ্চলে এসে ধামা-চেয়ার মেরামত করবার জন্য ফেরি করে বেড়াত...ব্যাপারটা আপনাদের খুলে বলি।"

ডাক্তারের আগেকার কথায় মেয়েদের মনে যে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা গিয়েছিল, শেষের কথায় তা একেবারে মুসড়ে গেল। রীতিমত বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁদের মুখে, যেন ভালবাসা জিনিষটা তাদের মত অভিজাত ধনী ও শিক্ষিতদেরই একচেটিয়া,—ছোটলোক-মহলের প্রেম কাহিনী শোনবারই যোগ্য নয়।

ডাক্তার কিন্তু বলতে লাগলেন।

"মাস তিনেক আগে 'কল' পেয়ে আমাকে এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যুশয্যার পাশে যেতে হয়েছিল। মাত্র তার আগের দিন রাত্রে সে এ গ্রামে এসে পৌঁছেছিল, দুটো বলদ টানা ভাঙা ঝরঝরে চৌকোণা ছই দেওয়া সেই গাড়ীখানা করে, আর দুটো প্রকাণ্ড কাল কুকুর সঙ্গে নিয়ে। গাড়ীখানা আপনারা সকলেই দেখেছেন। ঐ গাড়ীই ছিল তার বাড়ী, ঐ তার ঘর, ঐ তার সব। আর ঐ কুকুর দুটোই তার রক্ষক, তার সখী, তার বন্ধু। গিয়ে দেখলাম আখড়ার বৈরাগী ঠাকুর আগে থাকতে এসে হাজির হয়েছেন। স্ত্রীলোকটি একখানা উইল করছে, আর আমাদের সেই উইলের একজিকিউটর করল। এ ভাবে তার টাকাকড়ির বিলি-ব্যবস্থা করছে কেন, সেই উদ্দেশ্যটা আমাদের বোঝাবার জন্য সে তার জীবনের সমুদয় ইতিহাসটা খুলে বলল। আমি জীবনে এর চেয়ে কৌতুকাবহ অথচ মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী আর কখনও শুনি নি।

"তার বাপ-মা ছিল বাবাজে ধামা-চেয়ার-সারা। পৃথিবীর মাটীর উপর তৈরীকরা ঘর-বাড়ীতে সে জীবনে কখনও বাস করে নি।

"যখন নেহাৎ ছোট, সে উকুন পোকায় ভরা ময়লা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার বাপ-মা গ্রামের প্রান্তসীমায় কোন খানার কাছে তাদের ডেরা ফেলত ; বলদ দুটো জোয়াল থেকে খালাস পেয়ে রাস্তার ধারে ঘাস খেত ; কুকুর দুটো সামনের পায়ের দুই থাবার মধ্যে নাকটি রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিত ; ছোট মেয়েটা ঘাসের উপর বেড়াত, গড়াত ; আর বাপ-মা অশথ গাছের তলায় বসে, গ্রামের যত ভাঙা ধামা-চেয়ার-মোড়া—সব নিবিষ্ট চিত্তে মেরামত করতে লেগে যেত। এই যাযাবর পরিবারের ভিতর কথাবার্ত্তা খুব অল্পই ছিল। সেই চিরাভ্যস্ত সর্ব্বজনবিদিত "ধামা সারাবে গো" "চেয়ার সারাবে গো" "মোড়া সারাবে গো" বুলি আওড়াতে আওড়াতে আজ কে পাড়ায় বেরুবে, দু এক কথায় এইটুকু ধার্য্য হয়ে গেলে, তারা কখনও বা সামনা-সামনি, কখনও বা পাশাপাশি বসে কাজে লেগে যেত :—কথা নেই, শব্দ নেই, শুধু বেতের পাটি মোচড়ান দোমড়ান। মেয়েটা খেলতে খেলতে যখন একটু বেশী দূরে গিয়ে পড়ত কি পাড়ার কোন বজ্জাত ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার উপক্রম করত, বাপের ক্রুদ্ধ স্বর নিস্তব্ধ গ্রামপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠত—'ফিরে আয় বলছি হারামজাদী।' এর চেয়ে কোমল আদরের সম্ভাষণ জীবনে সে কখনও পায় নি।

"আর একটু বড় হলে, বাপ-মা তাকে ভাঙা ধামা-মোড়া-চেয়ার সংগ্রহের জন্য পাড়ায় পাঠাত। তাতে করে অনেক পথের ছেলের সঙ্গে তার জানাশুনা হত ; কিন্তু তার নূতন

বন্ধুদের বাপ-মা অতি কর্কশ স্বরেই হেঁকে তাড়িয়ে দিত—চলে আয় বলছি, পাজী। ফের যদি ন্যাকড়াপরা হা-ঘরে ছোটলোকের সঙ্গে কথা কবি, তবে দেখতে পাবি মজা।

"পাড়ায় বেরুলে দুষ্ট ছেলেরা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে মারত।

"কোন দয়াবতী এক সময়ে আট দশটি পয়সা তাকে দিয়েছিল। সে অতি যত্নে সেগুলি জমিয়ে রেখেছিল।

"একবার যখন তারা এ গ্রামে আসে, তখন একদিন (সে সময় তার বয়স বছর আষ্টেক হবে) ঠাকুরবাড়ীর পাঁচীলের ধারে জমীদার গুপ্ত-বাবুদের ছোট ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা। একজন খেলুড়ে তার কাছ থেকে জোর করে দুটো পয়সা কেড়ে নিয়েছে, ছেলেটি হাপুস নয়নে কাঁদছে। বড়ঘরের বড়-মানুষদের সৌভাগ্যের যে কল্পিত ছবি এতদিন সে তার ছোটলোকের ছোট্ট মাথায় এঁকে রেখেছিল, ছেলেটির কান্না দেখে তা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। সে এগিয়ে গেল তার কাছে এবং তার কান্নার কারণ শুনে তার বহুদিনের সযত্ন-সঞ্চিত দশটি পয়সা একেবারে তুলে দিল তার হাতে। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে পয়সা ক'টি নিল ; তার কান্নাও থেমে গেল। আনন্দে মেয়েটির দেহ থর থর করে কাঁপছিল, সাহসে ভর করে ধরল সে তার গলাটি জড়িয়ে। পয়সা পাওয়ার আনন্দে ছেলেটি তখন ভরপুর, সে কোন আপত্তিই করল না। মেয়েটি যখন দেখল যে, বাবুদের ছেলে তাকে মারলও না, ধমকালও না, সে তাকে কাছে টেনে নিয়ে জোর করে চেপে ধরল তার বুকে এবং তার হাত দুটির উপর যত পারল অজস্র চুমা বর্ষণ করতে লাগল। তারপর ছুটে পালাল।

"বেচারা মেয়েটির হল কি ? তার আজীবন-সঞ্চিত যথা-সর্ব্বস্ব সে ত সঁপে দিল ছেলেটির হাতে, তার প্রথম আদরের চুমা অজস্র বর্ষণ করল তার করপল্লবে। এ কি অনুরাগের অঙ্কুর ? কে জানে! ভালবাসা চিরদিনই রহস্যময়, কৈশোরেই হোক আর যৌবনেই হোক।

"তারপর কতদিন ধরে সেই ঠাকুরবাড়ীর পাঁচীলের ধারটি আর সেই ছেলেটির সুন্দর মুখখানি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তার চোখের সামনে নাচতে লাগল। তাকে আর একবার দেখতে পাবার আশায় সে, ধামা সারার পয়সা থেকেই হোক, আর বাজার করবার পয়সা থেকেই হোক, পয়সা সরিয়ে জমাতে লাগল।

"আবার যখন সে-পাড়ায় গেল, তখন তার হাতে দেড়টি টাকা জমেছে। সে ছোট-গুপ্তর দেখা পেল, কিন্তু তার পৈতৃক দাওয়াইখানার ভিতর। একটি বড় কাচের জারে হাত দুই লম্বা একটি কৃমি আরকে রক্ষিত হয়েছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোটবাবু। মুখখানি তার দেখাচ্ছিল বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই চক্চকে ; সেই ঝক্ঝকে কাচের রঙিন তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে বোধ হচ্ছিল বড়ই মধুর। মেয়েটির প্রাণে জেগে উঠল এক অপূর্ব্ব শিহরণ !

"স্মৃতি হতে এ দৃশ্য আর মুছল না। তার পরের বছর স্কুলের পিছনের মাঠে তার সঙ্গে আবার দেখা ; ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলছে। যেমনি দেখা, অমনি ছুটে গিয়ে একেবারে তার গলাটা জড়িয়ে ধরা আর প্রবল আবেগে তার হাতের উপর অজস্র চুম্বন। ছোকরাটি তো ভয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল। তখন তাকে শান্ত করবার জন্য তার হাতে গুঁজে দিল তার সঞ্চিত যা কিছু ছিল,—তিন টাকা পাঁচ আনা। ছেলেটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শুধু চেয়ে রইল

"ছেলেটি টাকা-পয়সা গুলি নিল আর তার ইচ্ছামত তাকে আদর করতে কোন বাধা দিল না।

"চার বৎসর ধরে মেয়েটি তার সঞ্চিত যাবতীয় সবই তুলে দিতে লাগল ছেলেটির হাতে। ছোট-গুপ্ত মহাশয় সেগুলি নিতে লাগলেন বিনা ওজর-আপত্তিতে, আর তার বিনিময়ে দিতে লাগলেন মেয়েটিকে ইচ্ছামত তাকে আদর চুম্বন করতে। প্রথম বার চৌদ্দ আনা ; দ্বিতীয় বৎসর এক টাকা দশ আনা ; তার পরের বছর মাত্র বার আনা (সেবার কিন্তু পয়সা কটি দিতে গিয়ে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছিল, আর অনেক মিনতি করে জানিয়েছিল যে বৎসরটা বড়ই দুর্ব্বৎসর যাচ্ছে) ; শেষবার একেবারে চার টাকা! তাতে গুপ্ত-বাবু খুব খুসী হয়ে হেসেছিলেন।

"গুপ্তবাবু ছাড়া মেয়েটির আর কোন চিন্তার বিষয়ই ছিল না। গুপ্তও অধৈর্য্য হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষা করত, আর তাকে দেখতে পেলেই তার দিকে ছুটে যেত। তাতে মেয়েটির প্রাণ যেন আনন্দে নেচে উঠত।

"তারপর গুপ্ত একেবারে গুপ্ত হয়ে পড়ল। সে এখন শহরের স্কুলে পড়ে। অনেক চেষ্টা ও সন্ধান করে মেয়েটি এই তথ্য সংগ্রহ করল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ছুটীর সময় বাড়ীতে আসে। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে তাদের আগমন সম্ভব করতে

মেয়েটিকে তার বাপ-মার কাছে নানা ফন্দী, নানা ফিকির খাটাতে হ'ল। বৎসরব্যাপী বহু চেষ্টার পর তবে সে বাপ-মাকে রাজী করাল। দু বৎসর সে ছেলেটিকে দেখে নি—তাকে আর চেনাই যায় না, চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে,—বেশ বড় হয়ে উঠেছে, সারবন্দী চকচকে সোণার বোতাম দেওয়া স্কুলের পোষাকে সুন্দর চেহারাটি তার খাসা মানিয়েছে। ছেলেটি কিন্তু দেখেও তার দিকে চাইলে না,—গট গট করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

"দু'টি দিন ধরে সে শুধুই কাঁদল,—কাঁদল। তারপর থেকে তার দুঃখ-কষ্টের আর বিরাম নেই।

"প্রতি বৎসর সে এ অঞ্চলে আসত, তার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করত, ভরসা করে কথা কইতে কি একটা গড় করতেও পারে নি; সেও তার দিকে একবার ফিরেও চায় নি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মেয়েটি তাকে ভালবেসেছিল।

"ডোম স্ত্রীলোকটি আমায় বলল—'ডাক্তার বাবু, এই পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র লোককে আমি জীবনে চোখ দিয়ে দেখেছি। ওরকমটি দ্বিতীয় আর কেউ আছে কি না জানি না।'

"তার বাপ-মা মারা গেল। সে তখন একাই ব্যবসা চালাতে লাগল। তবে একটা কুকুরের জায়গায় দুটো বাঘের মত প্রকাণ্ড কুকুর পুষল,—কেউ যাতে তার উপর কোন অত্যাচার করতে না পারে।

"তার মনটা ত পড়ে থাকত এই গ্রামেই। এক বছর এখানে এসে দেখল ছোট-গুপ্ত বাবু হাসতে হাসতে হাত ধরে একটি যুবতীকে ল্যাণ্ডোতে তুলে দিয়ে তার পাশে গিয়ে ঘেঁসে বসল। এ তবে তার স্ত্রী! তার তবে বে হয়ে গিয়েছে!

"সেই রাত্রে টাউন-হলের কাছে একটা যে মস্ত ঘোড়া নাওয়াবার পুকুর আছে তাতেই মেয়েটি ডুবল। দু একজন পথ-চলতি লোক দেখতে পেয়ে মাছ-খোঁজা করে তাকে জল থেকে তুলল আর ধরাধরি করে এনে ফেলল গুপ্ত-বাবুদের দাওয়াইখানায়। নরহরি বাবু নেমে এলেন, ডাক্তারি পোষাক পরে চেতনাসঞ্চার করলেন তার এবং তাকে চেনেন এরকম কোন ভাব না দেখিয়ে কর্কশ স্বরে বললেন—"তুই মাগী পাগল না কি? খবরদার, আর কখনো যেন এ রকম পাগলামি করতে যাস নি।'

"তাতেই তার মনের ব্যাধি সেরে গেল। ছোটবাবু তার সঙ্গে কথা কয়েছে! কিছুকাল ধরে রইল সে এই আনন্দেই মস্‌গুল হয়ে।

"বিশেষ জিদ ও পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গুপ্ত মহাশয় পারিশ্রমিক হিসাবে তার কাছ থেকে কিছু নিতে রাজী হলেন না।

"এই ভাবে মেয়েটির জীবন কাটতে লাগল, ধামা-চেয়ার মেরামত করে আর ছোট-গুপ্তর কথা ভেবে। বছর বছর আসে এই গ্রামে, দাওয়াইখানার শার্সি-দেওয়া জানালার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে তার পানে। মাঝে মাঝে ভিতরে ঢুকে এটা-ওটা ওষুধ কিনতে যায় তার কাছে;—উদ্দেশ্য তাকে ভাল করে দেখা, তার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া, নিজের উপার্জ্জিত টাকা তাকে দেওয়া।

"আগেই বলেছি, গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সে মারা গিয়েছে। তার এই করুণ জীবন-কাহিনী বিবৃত করবার পর সে আমায় বিশেষ জিদ করে ধরল যে, যাকে সে সারা জীবনটা ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে, তার সেই একমাত্র ভালবাসার পাত্রকে তার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জনের পয়সা-গুলি দিয়ে আসতে হবে। সে যে সমস্ত জীবন খেটেছে, তা শুধু ঐ ভালবাসার পাত্রটির জন্য। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ থেকেও আপনাকে বঞ্চিত করে সে জমিয়ে রেখেছে এই টাকা ক'টি! এই টাকা ক'টি হাতে পড়লে স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর পর অন্ততঃ একবারও যদি তাঁর এই ডোমের মেয়েটির কথা মনে পড়ে!

"এই বলে স্ত্রীলোকটি একহাজার সাতানব্বই টাকা এগার আনা আমার হাতে দিল। আমি সাতানব্বই টাকা এগার আনা দিলাম আখড়ার বৈরাগী ঠাকুরকে, স্ত্রীলোকটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, সমাধি প্রভৃতি অন্তিম কাজের জন্য; তার মৃত্যুর পর বাকী টাকা নিজেই নিয়ে গেলাম।

"তার পরদিনই গেলাম গুপ্তদের ছোটবাবুর কাছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তাঁরা স্ত্রীপুরুষে বসে আছেন চেয়ারের উপর সামনা-সামনি হয়ে। দুজনেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, নাদুস্-নুদুস্, নিরন্তর দাওয়াইখানার নানারূপ ওষুধের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিগতব্যাধি, আপনাদের গরবেই আপনারা গরীয়ান্, বেশ ফুর্ত্তিযুক্ত।

"আমাকে একখানা চেয়ারে বসালেন। এক কাপ চা'র হুকুম হল। চা-পানান্তে আমি জড়িত কম্পিত কণ্ঠে আমার

গল্প সুরু করলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কাহিনীটা শুনে তাঁদের চোখে জল আসবে।

"যেমনি শুনলেন যে, সেই হা-ঘরে ধাগা-সারা ছোটলোক ডোমের মেয়েটা তার প্রেমাসক্ত হয়েছিল, ছোটগুপ্ত একেবারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে,—রাগে তাঁর চোখ মুখ লাল, যেন সেই হতভাগিনী তাঁকে নীরবে মনে মনে ভালবেসে তাঁর মান, সম্ভ্রম, ইজ্জৎ সব হরণ করে নিয়েছে।

"তাঁর স্ত্রীও দেখলাম খুব চটেছেন। রাগে বলবার কোন কথা খুঁজে না পেয়ে ঘৃণা ভরে বার কতক শুধু বলতে লাগল—'আ ম'লো! সেই হা-ঘরে ভিখিরিটা! সেই হা-ঘরে ভিখিরিটা!'

"নরহরি বাবু তো লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে সুরু করলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলতে লাগলেন,—'ডাক্তার বাবু, ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারেন? এ যে ভয়ানক কথা! মাগী বেঁচে থাকতে যদি এটা জানতে পারতুম, তাকে নাস্তানাবুদ করতুম, পুলিসে ধরিয়ে দিয়ে জেল খাটাতুম, জেল থেকে যাতে বেরুতে না হয় এমন করতুম।'

"আমার উদার দৌত্যের পরিণামটা দেখে আমি তো হকচকিয়ে গেলাম। কি বলব, কি করব বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমার দৌত্য-কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত তো এগুতে হবে। আমি বললাম,—'মৃত্যুকালে স্ত্রীলোকটি তার সারা জীবনের উপার্জ্জন এক হাজার টাকা আপনাকে দিতে বলে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা যখন আপনার এত অপ্রীতিকর হচ্ছে, তখন সে ক্ষেত্রে টাকাটা নিয়ে না হয় কোন জনহিতকর সৎকার্য্যে ব্যয় করবেন।

"এই অভাবনীয় সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে তাঁরা দুজনেই—স্ত্রী ও পুরুষ, চেয়ে রইলেন আমার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে।

"আমি পকেট থেকে বের করলাম টাকার থলিটা—সেই অবজ্ঞাত ঘৃণিত টাকা,—নানান দেশের নানান রকম মুদ্রা,—সোণা, রূপো, তামা। জিজ্ঞাসা করলাম,—'এখন কি করবেন?'

"গিন্নীই আগে কথা কইলেন। বললেন,—'হঁ্যা, যখন স্ত্রীলোকটির মৃত্যুকালীন শেষ ইচ্ছাটা এই রকম, তখন এ টাকা তো কোন রকমে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।'

"স্বামী মহাশয় একেবারে ভাব্যাচাকা খেয়ে গিছলেন। বলে উঠলেন,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। ও টাকাতে না হয় ছেলেমেয়েদের কোন আমোদ-প্রমোদের জিনিষ কিনে দেওয়া যাবে।'

"আমি নিতান্ত নীরস ভাবেই বললাম—'তা যা' আপনাদের অভিরুচি।'

"ছোটবাবু বললেন,—'স্ত্রীলোকটি যখন টাকাটা আমায় দেবার জন্য আপনাকে ভার দিয়ে গেছে, টাকাটা দিয়েই যান। কোন সৎকার্য্যে ওটা ব্যয় করলেই হবে।'

"আমি টাকাটা গুণে দিয়ে নমস্কার করে বিদায় হলাম।

"তার পর দিন সকালেই ছোট গুপ্ত মহাশয় আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। হন্ত-দন্ত হয়ে বললেন,—'হ্যাঁ, ভাল কথা, তার একখানা মালবোঝাই গাড়ী ছিল না, সেই···সেই মেয়ে মানুষটার?' সে পুরাণো গাড়ীখানা নিয়ে আপনি কি করবেন?

"কিছুই নয়; দরকার হয় নিয়ে যেতে পারেন।

"বেশ! বেশ! ঠিক ঐ রকম একখানাই আমি খুঁজছিলাম। আমার ফুলবাগানের মালীর যন্ত্রপাতি রাখবার একটা শেড্ মত করব।

"বলেই হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম। 'তার দুটো বুড়ো বলদ আর দুটো কুকুর আছে। সেগুলোও কি আপনি রাখবেন?'

"নরহরি বাবু থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন। খানিক পরে বললেন—'অ্যাঁ—না, না। কি সর্ব্বনাশ! ওগুলো আমার কি হবে? ও আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন।' হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"আমিও দিলাম এক ঝাঁকানি। কি বলেন? আমি ডাক্তার, আর উনি হচ্ছেন দাওয়াইকার; এক জায়গায় থাকি, অসদ্ভাবটা ভাল নয়।

"কুকুর দুটো নিজেই রাখলাম। আখড়ার বোষ্টম ঠাকুরের খানিকটা ধান-জমি আছে। তিনি বলদ দুটোর ভার নিলেন। গাড়ীখানা ছোট গুপ্ত মহাশয়ের বাগানের যন্ত্রপাতি রাখবার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর টাকাটা দিয়ে তিনি পাঁচখানা রেলওয়ে শেয়ার কিনে ফেলেছেন।

"প্রগাঢ় অনুরাগের, সত্যিকার প্রেমের—নিঠুর সেই

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে—

এই ধরণের ভালবাসার নীরব উৎসর্গের, কোন কিছু প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে নীরবে নিজের সমস্তটাকে দয়িতের চরণে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার,—এই একটি মাত্র ঘটনা আমার জানা আছে।"

ডাক্তার বাবু চুপ করলেন। দেখা গেল রায়-বাহাদুরের গৃহিণীর চোখ দুটো জলে টস্ টস্ করছে। তিনি কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন—'সত্যি, সত্যি, মেয়েমানুষেই শুধু আসল ভালবাসতে জানে। *

---

* মোপাসাঁ অবলম্বনে।

বাগ্মীশ্রেষ্ঠ লালমোহন

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

উপক্রমণিকা

প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে, 'সভায় বাক্‌পটুতা' মহাত্মা-গণের একটি লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বাস্তবিক যাঁহারা প্রকৃত বাগ্মী,

রামগোপাল ঘোষ।

যাঁহাদের অগ্নিময়ী বাণী একটি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে বা একটি সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিতে পারে, যাঁহাদের উদাত্ত স্বরে একটি সুপ্ত জাতি উত্থিত, জাগরিত ও উদ্দীপিত হইতে পারে, যাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত দৈববাণী নিরাশ হৃদয়কে আশার জ্যোতিঃতে প্রদীপ্ত করিতে পারে, পাপপঙ্কিল ধরণী হইতে মানবকে উর্দ্ধে উন্নীত করিতে পারে, সেই সকল বাগ্‌দেবীর বরপুত্রগণ যথার্থই মহাত্মা-পদবাচ্য। ইঁহাদের নির্ভীক ও ওজস্বিনী বাণী অমিতপ্রতাপশালী অত্যাচারীর হৃদয়েও লজ্জা ও ভীতি উৎপাদন করে, অত্যাচারিতের হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ দেয়, মর্ত্ত্যকে স্বর্গের নিকটে লইয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে, যে সকল মনীষী বাগ্মিতার জন্য খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে "ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস" রামগোপাল ঘোষের নাম আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইঁহার সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন —

> "প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর
> স্বদেশ-রক্ষার ভীম সদা উচ্চ-শির,
> অসম সাহস ভরা অন্যায়ের অরি,
> সভ্যতার সেনাপতি কল্যাণ-কেশরী।"

রামগোপালের সামসময়িক অন্যান্য বাগ্মী,— কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সেই মুগ্ধকরী বক্তৃতাশক্তির কথা বিস্মৃত হইবার নহে। সেই—

> "তীব্রমূর্ত্তি ব্রাহ্ম বীর কেশব কিশোর
> বহিছে প্রচণ্ড বেগে করে দিগ্বা দেশ
> ব্রহ্ম মহিমার বাণী ধর্ম্ম উপদেশ"

সে মূর্ত্তি কি ভুলিবার? ধর্ম্মোপদেশকরূপেই কেশবচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, রাজনীতিক নেতারূপে নহেন। তাহার পর রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই সময় তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইল,— সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও লালমোহন ঘোষ। ইঁহাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লালমোহন স্বদেশে ও বিদেশে বাগ্মীরূপে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, আর কেহ সেরূপ খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী জন ব্রাইট প্রমুখ মনীষিগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডের তিনটি প্রদেশ তাহাদের প্রতিনিধিরূপে পালিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে ইংলণ্ডের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম একজন ভারতবাসী—লালমোহনকে—অনুরোধ করিয়াছিল এবং আইরিশ নেতা পার্ণেলের সহিত কোন বিষয় লইয়া শেষ মুহূর্ত্তে উদারনীতিক দলের বিরোধ

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

না ঘটিলে হয়ত তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পালিয়ামেণ্টের সদস্যের গৌরব লাভ করিতেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা সংক্ষেপে "বাঙ্গালার

জন ব্রাইট" বাগ্মীপ্রবর লালমোহনের জীবনকথা আলোচনা করিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

লালমোহন ঘোষ।

জন্ম ও বংশবিবরণ

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর দিবসে লালমোহন ঘোষ নদীয়া কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে বাস করিতেন। কথিত আছে বিক্রমপুরে সামকোটের নিকটবর্ত্তী ভল্লদিয়া গ্রামের ইঁহারা প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। কীর্ত্তিনাশা বা পদ্মার কৃপায় সামকোট ও ভল্লদিয়া গ্রাম বহুদিন নামশেষ হইয়াছে। রামভদ্র ঘোষ নামক জনৈক পূর্ব্বপুরুষ দুইটি শিশু পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। এই সময়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গোপালকৃষ্ণ কোনও কায়স্থ-রমণীর গর্ভজাত এক কন্যার সহিত উক্ত শিশুদ্বয়ের মধ্যে একজনের বিবাহ দিতে মনঃস্থ করেন। তিনি শিশুদ্বয়কে আনিতে পাঠাইলে তাহারা স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পরগণা ইদিলপুরের প্রতাপশালী জমিদার কমল রায় চৌধুরীর শরণাপন্ন হয়। রাজা গোপালকৃষ্ণের অনুরোধানুসারে তাঁহার হস্তে শিশু দুইটিকে সমর্পণ না করায় রাজা তাঁহার লাঠিয়াল প্রেরণ করেন, কিন্তু ইদিলপুরের জমিদারের লাঠিয়ালদের নিকট তাহারা পরাজিত হয়। অতঃপর রাজা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঘোষ মহাশয়দিগের ভিটা ধ্বংস ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর ইঁহারা ঢাকার ১৫ মাইল দূরে বিক্রমপুরের অন্য এক অংশে ধলেশ্বরী নদীর তীরে বৈরাগদি গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এই বৃত্তান্তটি লালমোহনের পিতা রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে ৺রামগোপাল সান্যাল মহাশয় তৎপ্রণীত কোনও গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

লালমোহনের পিতা রামলোচন ঘোষ মহাশয় সামসময়িক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ইংরাজী-শিক্ষা-বিস্তারে তিনি অন্যতম উদ্যোগী এবং ঢাকা কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি উক্ত কলেজে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেন্ট তাঁহার স্মরণার্থে তাঁহার নামে একটি ছাত্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রামলোচন লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক সদর আমীনের পদে (সবজজ) নিযুক্ত হন। এই পদ সেকালে এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী সম্মানের ছিল। রামলোচন তিন পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মনোমোহন পৈত্রিক আবাসস্থান বৈরাগদিতে জন্মগ্রহণ করেন, মধ্যম লালমোহন পিতার তৎকালীন কর্ম্মস্থল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ মুরলীমোহনও এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

শৈশবেই লালমোহনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ না করিলে হিন্দু-সন্তানের 'হাতে খড়ি' হয় না, কিন্তু 'হাতে খড়ি' হইবার পূর্ব্বেই লালমোহন তাঁহার অগ্রজের পড়া শুনিয়া ও তাঁহার লেখার উপর লিখিয়া পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন অনুজের এই পাঠানুরাগের কথা পিতৃদেবের গোচরে

মনোমোহন ঘোষ।

আনিলে তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরেই লালমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়

বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান ও ইংরাজীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকৃত করিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লালমোহনও ব্যারিষ্টার হইবার সঙ্কল্প করেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সেই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে প্রথম বার

ইংলণ্ডে গমন করিয়া লালমোহন ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য 'মিড্‌ল টেম্পল'এ প্রবেশ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে মিষ্টার কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় (পরে ছো আদালতের বিচারপতি), স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
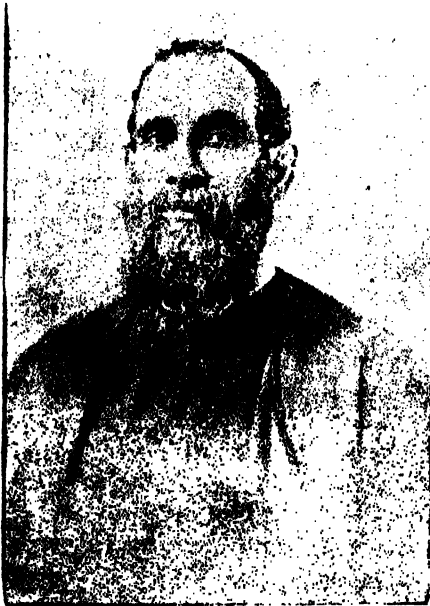
পাধ্যায়, স্যর তারকনাথ পালিত, রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় ছাত্র ছিলেন, ইঁহাদের সহিত লালমোহনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি লণ্ডন নগরে ল্যাকোনিক্‌স নামক আলোচনা-সমিতিতে বাগ্মিতাশক্তি অর্জ্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত বাগ্মী জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে আহূত কোন সভায় লালমোহন একবার এরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন যে, ব্রডহার্ষ্ট নামক একজন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য সভাগৃহের বাহির হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া বলেন যে, তাঁহার মনে হইতেছিল, পার্লিয়ামেণ্টের কোন বিখ্যাত বাগ্মী বক্তৃতা করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ এবং সভাপতি স্বয়ং উচ্চ করতালি দিয়া বক্তাকে অভিনন্দিত করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লালমোহন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

ইংলণ্ডে দ্বিতীয়বার

লালমোহন শীঘ্রই ব্যারিষ্টারিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, কিন্তু অখণ্ড মনোযোগের সহিত তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার জন্য আহ্বান আসিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ জনসাধারণের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, কারণ দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজনৈতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তখন ধনী জমিদারগণের সভায় পরিণত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় লর্ড সল্‌স্‌বেরি 'ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস' সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন, এবং সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর সর্ব্বোচ্চ বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে উক্ত পরীক্ষা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে যে, এত অল্প বয়সে বালকগণকে অভিভাবকগণ ইংলণ্ডের ন্যায় স্থানে নানা প্রলোভনের মধ্যে এদেশ হইতে প্রেরণ করিতে স্বভাবতঃই ভীত হইবেন এবং বালকগণও অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া ইংলণ্ডের ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে পারিবে না। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মনোমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যদুনাথ ঘোষ প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী যাহাতে পরিবর্ত্তিত এবং ভারতেও যাহাতে পরীক্ষা গৃহীত করা হয় তজ্জন্য আন্দোলন করা স্থির হয়। এই আন্দোলন অধিকতর বিস্তৃত করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বক্তৃতা করেন। ইতঃপূর্ব্বে এ সকল ব্যাপারে ভারতবাসী আবেদন-পত্র পাঠাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু এবারে ভারতবর্ষ হইতে একজন প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া সেখানে আন্দোলন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশপত্র লইয়া সুরেন্দ্রনাথ কাশিমবাজারের পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আশানুরূপ অর্থসাহায্য পাইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সিবিল সার্ভিস হইতে সম্প্রতি অপসারিত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব অন্য কাহারও উপর অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উদীয়মান বাগ্মী লালমোহনের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"The choice of the Indian Association fell upon

Mr. Lalmohan Ghose, and Mr. Lalmohan Ghose's phenomenal success in his mission fully justified the selection. His marvellous gifts of oratory were unknown to us, for he had never before taken to public life as a serious occupation; and when they were displayed in a manner that extorted the admiration of his audience, among whom was the greatest of living orators, John Bright, the revelation was a bewildering and an agreeable surprise. Carnot took credit for discovering Napoleon while the latter was yet an unknown young subaltern. The leaders of the Indian Association warmly congratulated themselves on having discovered one who was the first Indian to stand for Parliamentary honours, and who was destined to occupy a leading place in the ranks of our public life."

"ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লালমোহন ঘোষকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলেন এবং লালমোহন প্রচারকার্য্যে যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, যোগ্যপাত্রই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানিতাম না, ইতঃপূর্ব্বে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে সেরূপ উৎসাহ সহকারে অবতীর্ণ হন নাই, এবং যখন তিনি বক্তৃতাশক্তি এরূপভাবে প্রদর্শিত করিলেন যে, তৎকালীন জীবিত বাগ্মীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী জন ব্রাইটের ন্যায় শ্রোতাদিগের শ্রদ্ধা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল তখন তাঁহার বাগ্মীরূপে আবির্ভাব আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করিল। নেপোলিয়ন যখন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন তখনই কার্ণো তাঁহার রণপ্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন। যিনি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যের গৌরবময় আসন অধিকারের জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভাগ্যদেবতা যাঁহাকে আমাদের দেশসেবকগণের মধ্যে ভবিষ্যতে উচ্চ আসন অধিকৃত করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।"

ইংলণ্ডে গমন করিয়া লালমোহন প্রসিদ্ধ বাগ্মী জন ব্রাইটের স্নেহ ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই তিনি লণ্ডনে Willis's Rooms-এ একটি প্রকাশ্য সভায় লর্ড লিটনের রাজস্ব ও শাসন-বিষয়ক নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। জন ব্রাইট প্রমুখ অন্যূন ৩০ জন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য এবং অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। জন ব্রাইট, হেনরি ফসেট ও ডেভিড ওয়েডারবার্ণ বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগদান করেন। জন ব্রাইটের ন্যায় বাগ্মী তখন ইংলণ্ডে ছিল কি না সন্দেহ। তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেন যে, লালমোহনের ওজস্বিনী ও সদ্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার পরে আর কিছু বলিয়া বক্তৃতার মধুর ঝঙ্কার নষ্ট না করাই শ্রেয়ঃ। এই বক্তৃতার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টে সিবিল সার্ভিস সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিশোধিত আকারে উপস্থিত করা হয় এবং উহার ফলে এদেশে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়।

এই যাত্রায় লালমোহন আরও যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি ল্যাম্বেথে অল্ডারম্যান স্যর জে. সি. লরেন্সের সভাপতিত্বে প্রদত্ত হয়, বিষয় ছিল ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যায় ভারতবাসীর মত। আর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল, রাজস্ব, বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি। এই বক্তৃতাটি বার্মিংহামে তত্রত্য চেম্বার অব কমার্সের গৃহে আহূত এক সভায় চেম্বারের সহকারী সভাপতি মিষ্টার এস. বুণের সভাপতিত্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। দুইটি বক্তৃতাই লালমোহনের অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সুখ্যাতি বিস্তৃত করিয়াছিল।

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লালমোহন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার যোগ্য সমাদর করিয়াছিল। উক্ত বৎসর ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা টাউন-হলে সহস্রাধিক সমাজনেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। প্রবীণ আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনন্দন-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রাজা শ্যামশঙ্কর রায়, যদুলাল মল্লিক ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। লালমোহন প্রত্যুত্তরে একটি সুললিত বক্তৃতায় দেশের রাজনীতিক অবস্থার সুন্দর সমালোচনা করেন।

ইংলণ্ডে তৃতীয় বার

কয়েক মাসের মধ্যেই লালমোহন তৃতীয় বার ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মে তারিখে লণ্ডনে Aborigines Protection

Societyর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি স্যর বার্টল ফ্রেয়ারের জুলুনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই বক্তৃতার এক স্থানে তিনি বলেন যে, যেখানে নিজের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নাই, সেখানে ইংরাজেরা বিচার ও সালিসী ব্যাপারে সংকার্য্য করেন, কিন্তু যেখানে স্বার্থের সহিত সংঘাত বাধে, সেখানে তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়, এই জন্যই ইংরাজী আইনের একটি মূল সূত্র এই যে, নিজের মোকদ্দমা কেহ নিজে বিচার করিতে পারিবেন না। এই বৎসর
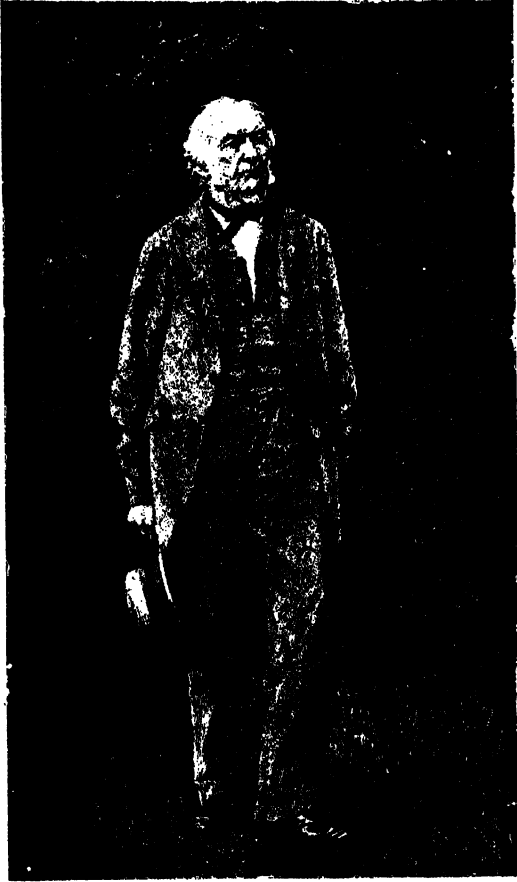
উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্লাড্‌ষ্টোন।

২৬শে মে তারিখে লণ্ডন শান্তি-প্রচারিণী সভাতে (London Peace Society) লালমোহন আর একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দেন।

এই বৎসর জুলাই মাসে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট মার্কুইস অব হার্টিংটনের হস্তে ভারতবর্ষের শাসননীতি, সংবাদপত্র সংক্রান্ত বিধি, দেশীয়গণকে উচ্চরাজকার্য্যে নিয়োগ ও শাসন বিষয়ে তাহাদিগকে অধিকতর ক্ষমতাদান প্রভৃতি বিষয়ের সংস্কার ও নিয়মাবলী পরিশোধনের জন্য একটি আবেদন-পত্র অর্পণ করিবার জন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। লালমোহন দেশীয়গণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আবেদন-পত্র প্রদানের পর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে লালমোহন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। উক্ত বৎসর ৩০শে নভেম্বর বোম্বাইনগরে পদার্পণ করিবা মাত্র তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিকের সভাপতিত্বে একটি বিপুল সম্বর্দ্ধনা-সভায় লালমোহনকে সম্বর্দ্ধিত করেন। লালমোহন প্রতিভাষণে একটি কথা বলিয়াছিলেন, যাহা দেশবাসীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের জাতীয় জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে আমাদিগকে কেবল ঐক্য অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই নহে, আমাদিগের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজগণকে জানাইতে হইবে যে আমরা এক জাতি।

এই সময় হইতে রাজনৈতিক সকল আন্দোলনেই লালমোহনের পরামর্শ বা বাগ্মিতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ শিবপুর ইংরাজী স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন হইতে লালমোহন গবর্ণমেন্টের শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী বৎসরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা টাউন-হলে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য উদার-হৃদয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণকে ধন্যবাদ প্রদান করা। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লালমোহন এই সভায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

এই সময়ে ইলবার্ট বিলের সেই লজ্জাকর আন্দোলন উত্থিত হয়। প্রবন্ধান্তরে উহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থেও এই আন্দোলনের ইতিহাস অমর হইয়া আছে। ব্রান্সন নামক এক ব্যারিষ্টার অকথ্য ভাষায় দেশীয় নরনারীগণের নিন্দা করিয়া আপনার অনুদার ও কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। ঢাকায় ২৯শে মার্চ্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একটি বিরাট জনসভায় লালমোহন ওজস্বিনী ভাষায় উহার উত্তর দিয়াছিলেন। ফলে ব্রান্সনকে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই বক্তৃতাটি বোধ হয় লালমোহনের শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতা।

ইংলণ্ডে চতুর্থ বার

ঢাকায় বক্তৃতা দিবার পর কয়েক মাসের মধ্যে লালমোহন পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে ১৮৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে নানা স্থানে ছয় সাতটি ওজস্বিনী বক্তৃতায় ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন, রিপণের উদার শাসননীতি, ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি ইংলণ্ডীয় শ্রোতৃবর্গকে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অত্যুদার মত এবং গভীর রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া এরূপ মুগ্ধ করেন যে গ্রীনউইচ, ডেপ্টফোর্ড ও উলউইচ এই তিনটি প্রদেশ তাঁহাকে তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হইতে অনুরোধ করেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীর এরূপ সম্মান লাভ ঘটে নাই। লালমোহন

ডেপ্টফার্ডের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি দুইবার পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হন। কারণ তখন হোমরুল লইয়া ইংলণ্ডে উদারনীতিকদিগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে আইরিশ নেতা পার্ণেলের নির্দ্দেশানুসারে আইরিশ ভোটগুলি তাঁহার 'রক্ষণশীল' প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়ায় একবার কৃতকার্য্য হইবার প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি অকৃতকার্য্য হন। তিনি ৫৫৬০ ইংরাজের ভোট পাইয়াছিলেন। ডেপ্টফোর্ডের গুণানুরাগিগণের উৎসাহের সীমা ছিল না। তাঁহার ইংরাজ সমর্থনকারীরা তাঁহাকে আপনার জন মনে করিয়াছিল। যখন রক্ষণশীল দল রাজপথে চীৎকার করিত "হিন্দুকে ভোট দিও না, ইংরাজকে দাও", তখন উদারনীতিক দল প্রত্যুত্তরে চীৎকার করিয়া বলিত, "আমরা কৃষ্ণাঙ্গ ইংরাজকে ভোট দিব।" দুইজন অশীতিপর বৃদ্ধ ভোট দিতে আসিলে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তাহারা লালমোহনকে ভোট দিতে চায়, তখন তাহারা উত্তর দিয়াছিল, "কারণ উহারা উঁহাকে কৃষ্ণকায় বলিতেছে।" একজন এত বৃদ্ধ ও সামর্থ্যহীন ছিল যে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শত শত ইংরাজ ঘোড়া খুলিয়া আপনারা লালমোহনের গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেন। প্রধান মন্ত্রী এবং উদারনীতিক দলের নেতা পুণ্যস্মৃতি উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন বিশেষ আগ্রহের সহিত লালমোহনের পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশের এই প্রচেষ্টা সন্দর্শন করিতেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিজের গাড়ী পাঠাইতেন। লালমোহন রক্ষণশীল দলের তৎকালীন প্রভাবের জন্য পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তিনি দেখাইয়াছিলেন, ভারতবাসীর পক্ষে পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে এবং কয়েক বৎসর পরে দাদাভাই নৌরোজীর পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশের পথ সহজ ও সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। লালমোহনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এভেলিন সাহেব জয়ী হইলেও লালমোহনের জয়বার্ত্তা ঘোষিত করিয়া পার্লিয়ামেন্ট ত্যাগ করেন। পার্লামেণ্ট প্রবেশের কিছুদিন পরে তিনি বলেন—গত নির্ব্বাচনে একজন আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী পুরুষ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ ছিলেন। তিনি বলিতেন আয়র্লাণ্ডে স্বায়ত্বশাসন প্রদান বা প্রজাপীড়ন করা এই দুয়ের মধ্যে মধ্যপথ কিছুই নাই। আমি কিন্তু আমার প্রদেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলাম যে এরূপ মধ্যপথ যথার্থই আছে। এক্ষণে রাজমন্ত্রীগণের ব্যবহারের দ্বারা আমি বুঝিয়েছি যে আমার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাই সত্য—আমার কথাই মিথ্যা। এরূপ স্থলে আমি আর বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে অক্ষম।"

ফিরোজ শা মেটা।

স্বদেশে পুনরাগমন ও ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ

অতঃপর ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া লালমোহন নিয়মিত ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। একজন বিচারপতি বলিয়াছিলেন, "পার্লিয়ামেণ্ট যাহা হারাইল বিচারালয় তাহা লাভ করিল।" বাস্তবিক সংক্ষেপে সমস্ত কথা মনোগ্রাহী করিয়া বলিবার ক্ষমতা, বাজে বাক্য ব্যয় না করিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা নিজমত সমর্থন করিবার শক্তি, সাক্ষীকে জেরা করিবার অসামান্য দক্ষতা তাঁহাকে ব্যবসাক্ষেত্রে উচ্চ আসন দিয়াছিল। তিনি তাঁহার অগ্রজ মনোমোহনের ন্যায় পরোপকারী, দয়ালু ও দরিদ্রবৎসল ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

গভীর দেশানুরাগ লালমোহনকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দেয় নাই। তিনি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানাদির সহিত আন্তরিক যোগ রাখিয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। এই সময়ে তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস এলিয়ট জুরীদিগের বিচারসংক্রান্ত একটি আদেশ প্রচার করেন, উহাতে দেশবাসীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। দেশে উহা লইয়া মহা আন্দোলন হয়, লালমোহনও ব্যবস্থাপক-সভায় উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশেষে উক্ত আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভায় নেতৃত্ব

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়, উহাতে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ লালমোহন ঘোষ সভানেতৃত্ব করিবার জন্য

মাইকেল মধুসূদন।

আমন্ত্রিত হন। স্যর ফিরোজ শা মেটা সভাপতি বরণ করেন। লালমোহন ইদানীং কোন বিশেষ কারণে "বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া রাজনীতি-প্রবাহ দেখা করিতেছিলেন।" তিনি কোন বিশেষ দলভুক্ত ছিলেন না বলিয়া সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত তাঁহার যুক্তিতর্কসমন্বিতা ওজস্বিনী বক্তৃতাটি সাম্প্রদায়িক ভাববর্জ্জিতা, নির্ভীক আত্মবিশিষ্টা এবং সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই অভিভাষণটির বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান নাই।

বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনি লর্ড কার্জ্জনের অবলম্বিত নীতির যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহারও সবিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যানুরাগ

লালমোহন আজীবন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, তিনি কোনও গ্রন্থাদি রচনা করত প্রকাশিত করিয়া যান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এক স্মৃতিসভায় লালমোহনকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হয়, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি আসিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, তাঁহাকে যেমন করিয়াই হউক আনিতে হইবে এবং সুরেশবাবুকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। সুরেশ সমাজপতি বলেন যে, তিনি লালমোহনকে যেরূপ অবস্থাতে দেখিলেন, তাহাতে তিনি বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল। লালমোহন প্রথমে অস্বীকার করিলেও পরে সমাজপতি মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার সহিত সভাস্থলে আগমন করেন। পূর্ব্বে বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত না থাকিলেও পরে যথাসময়ে তিনি যে অপূর্ব্ব হৃদয়গ্রাহিণী ও ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে শ্রোতৃগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। এমন কি, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা অপেক্ষা তাঁহার বক্তৃতা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছিল বলিয়া অনেক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এখন উদ্ধার করা সম্ভব কি না জানি না। একবার তিনি বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইংরাজীতে "নেপোলিয়ন ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, কিন্তু গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আর একবার তিনি মিল্টনের ন্যায় ঝঙ্কারপূর্ণ ছন্দে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন এবং রচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু তাঁহার এক ভৃত্য তাহা হারাইয়া ফেলে। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু উহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রোগশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। লালমোহন মাইকেলের ও মিল্টনের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

জন ব্রাইট (মর্ম্মর মূর্ত্তি হইতে)।

মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাঁহার কন্যাগণকে মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' পড়িয়া শুনাইতেন। সুতরাং তৎকৃত মেঘনাদ বধের ইংরাজী অনুবাদ যে

একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, লালমোহনের ইংরাজী বক্তৃতাগুলি ভিন্ন তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও মানসিক শক্তির, তাঁহার প্রতিভার ও মনস্বিতার আর কোনও পরিচয় ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য রক্ষিত রহিল না।

স্বর্গারোহণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর লালমোহন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কোনও পুত্রসন্তান ছিল না, দুইটি মাত্র কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা ছিলেন এবং কনিষ্ঠা সুকুমারীর সহিত ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের বিবাহ হইয়াছিল।

লালমোহনের ন্যায় নির্ভীক দেশপক্ষসমর্থক বাগ্মী ও তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিকের তিরোধানে দেশবাসী নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসভায় পরবর্ত্তী অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লালমোহনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"In the death of Mr. Lal Mohan Ghosh we mourn the loss of one of the greatest orators that India has produced. Of his matchless eloquence it is not necessary for me to speak He combined with it a wonderful grasp of great political questions, and long before the Congress was born, he employed his great gifts in pleading the cause of his country before the tribunal of English public opinion. The effect which his eloquent advocacy produced on the minds of our fellow subjects in England was testified to by no less eminent a man than John Bright, the great tribune of the English people. To Mr. Lal Mohan Ghosh will always belong the credit of having been the first Indian who made a strenuous endeavour to get admission into the great Parliament of England. It is sad to think that his voice will not be heard any more either in asserting the rights of his countrymen to equality of treatment with their European fellow subjects or in chastening those who insult them, after the manner of his memorable Dacca speech."

ইহার মর্ম্ম এই—

"লালমোহন ঘোষের মৃত্যুতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের অন্যতম ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। জটিল রাজনীতিক সমস্যা সমাধানে তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা এই অনন্যসাধারণ বাকপটুতার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল এবং জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহার এই অলৌকিকী প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন ইংলণ্ডীয় জনমতের ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার স্বদেশের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের মনের উপর তাঁহার ওজস্বিনী বাণী কিরূপ প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা ইংরাজদিগের প্রধান নেতা জন ব্রাইটের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। য়ুরোপীয় প্রজাগণের সহিত দেশীয়গণের সমান অধিকার ঘোষণা করিবার জন্য কিম্বা ঢাকার বক্তৃতায় যেমন বলিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশবাসীর অপমানকারীদিগকে দণ্ডদানের জন্য আর তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইবে না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।"

কত রাত্রি ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এখনো কি রাত নিকষের মত কালো,
দেশের পাখীরা ক্ষুৎপিপাসায় কাঁদে ?
এখনো কি পথে পড়েনি উষার আলো—
যুগের উদয় লক্ষীর করাঘাতে !
জীবনের নদী ছুটিতেছে কোন্ পানে
পায় কি হেরিতে ও দু'টী অন্ধ আঁখি ?
কল্লোল-গীতি উঠিতেছে কোন্ খানে
পাও কি শুনিতে হৃদয় বন্ধ রাখি ?

কেন যে অশ্রু শিশিরের মত ঝরে
তুষারশীতল কুসুমের বাগিচায়,
স্নেহের মুকুল মরিছে বিশ্ব 'পরে
নীরব নিশীথে নির্ম্মম শীত-বায়, ..
কভু কি প্রশ্ন করেছ কাহারো কাছে ?
স্বপনের ছবি আঁকিতেছ ঘুমে আজ,
শিখিয়াছ যাহা, আসিল না কোনো কাজে ;
শিখিয়াছ কি বা ? কহিতে পাই যে লাজ

অন্ধ পথিক বেদনার গান গেয়ে,
মেঠোপথে চলে বাউলের বেশ পরি'
ভারতের শুভ আদি-বয়সের মেয়ে
বঙ্গ-জননী চলে তার 'হাত ধরি'।
মায়ের পরানে অতীতের স্মৃতি জ্বলে,
পরণের শাড়ী ছিঁড়ে গেছে বহুদিন।
নয়নের জ্যোতি নিভিয়াছে পলে পলে,
বারে বারে মা'র বাজে তবু ভাঙাবীণ !

কতটা রাত্রি ?—হ'তে পারে শেষ রাত !
ঘুম ভেঙে ফেল, থেক না ঘরেতে শুয়ে'
ক'র গো বারেক করুণ নয়নপাত,
ব্যথার পরাগ পড়ে আছে বন-ভুঁয়ে।
সবারে বাঁচাতে বাহিরিয়া এস ভাই,
যে পথে পাখীরা কাঁদিতেছে অবিরত,
যে পথে বন্ধু আলোকের রথ নাই
জীবনের গতি হইতেছে প্রতিহত।

প্রাচীন ভারতের লেখ্য-পরীক্ষা

—শ্রীমতিলাল দাশ

ব্যবহার-নির্ণয়ে লেখ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। সাক্ষ্যের চেয়ে লেখ্য প্রমাণ হিসাবে বলবত্তর। দিব্য প্রমাণ কিংবা মৌখিক সাক্ষ্য কখনই লেখ্যের তুল্য হইতে পারে না। "শতং বদ মা লিখ" এই প্রবচন লেখ্যের গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। শতসংখ্যক সাক্ষীও সচরাচর লেখ্যকে হঠাইতে পারে না।

অতএব বিচার বিষয়ে লেখ্য-পরীক্ষার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি থাকা উচিত। প্রাচীন হিন্দু-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেকালের স্মৃতিকারেরা অনুপম বুদ্ধিচাতুর্য্যে লেখ্যপরীক্ষার সুনিপুণ পদ্ধতি ও সুন্দর নিয়মাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নের বিধি :—

রাজা ক্রিয়াং সমাহূয় যথান্যায়ং বিচারয়েৎ।
লেখ্যাচারেণ লিখিতং সাক্ষ্যাচারেণ সাক্ষিণঃ॥

রাজা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া যথান্যায় বিচার করিবেন। লেখ্যাচারে লেখ্যের এবং সাক্ষ্যাচারে সাক্ষ্য নির্ণয় করিবেন।

লেখ্যাচার কি সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন : —

বর্ণ-বাক্য-ক্রিয়া-যুক্তমসন্দিগ্ধং স্ফুটাক্ষরম্।
অহীনক্রমচিহ্নং চ লেখ্যং তৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

যে দলিলে বর্ণ ও বাক্যবিন্যাস সাক্ষ্যক্রিয়াকে বিশদ ভাষায় সংশয়হীন অর্থে ফুটাইয়া তোলে, যাহাতে কোনও কিছু অক্ষর বা পদ পড়িয়া যায় নাই, যাহাতে ক্রম কিংবা চিহ্ন দিতে ভুল হয় নাই, সেই দলিলই বিচারে জয় লাভ করে।

তখনও দলিল রাজাধিকরণে অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক করচিহ্নিত হইয়া বলবান বিবেচিত হইত। এই registered documentগুলিকে রাজকীয় লেখ্য বলা হইত।

নারদে পাই :—

রাজা স্বহস্তসংযুক্তং স্বমুদ্রাচিহ্নিতং বা।
রাজকীয়ং স্মৃতং লেখ্যং সর্ব্বেষর্থেষু সাক্ষিমৎ॥

রাজার সহি ও রাজকীয় মুদ্রাযুক্ত লেখ্য সকল বিবাদেই দৃঢ় প্রমাণ বলিয়া স্থির হইত।

নারদ জানপদ-লেখ্যের দুই ভাগ করিয়াছেন, এক অসাক্ষিমৎ স্বহস্তলিখিত, অপর অন্যকৃত কিন্তু সাক্ষিযুক্ত। বলপূর্ব্বক বা জুয়াচুরি সাহায্যে না করাইলে স্বহস্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইত। যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান হইতে বুঝা যায়, স্বহস্তলিখিত লেখ্যেও সময় সময় সাক্ষী থাকিত।

অন্যকৃত লেখ্য হইলে সাক্ষী আনিতে হইত। পিতামহের লেখ্যের সংজ্ঞা হইতে তাহার নির্দ্দেশ পাই।

বাদিভ্যামভ্যনুজ্ঞাতং লেখকেন সসাক্ষিকম্।
লিখিতং সর্ব্বকার্য্যেষু তৎ প্রমাণং স্মৃতং বুধৈঃ॥

বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া লেখক সসাক্ষিক যে লেখ্য রচনা করে তাহা সর্ব্ব কার্য্যেই প্রমাণ।

নারদ ও কাত্যায়ন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, লেখ্য-রচনায় বিশেষ দেশের বিশিষ্ট রীতি ছিল, সেই জন্যই লেখ্য দেশাচারবিরুদ্ধ না হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইতে বলিয়াছেন। দেশস্থিতি অনুসারেই লেখ্যের যোগ্যতা নির্ভর করিত।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন :—

স্থানভ্রষ্টাস্বপংক্তিস্থাঃ সন্দিগ্ধা লক্ষণচ্যুতাঃ।
যদা তু সংস্থিতাঃ বর্ণাঃ কূটলেখ্যং তদা ভবেৎ।
দেশাচারবিরুদ্ধং যৎ সন্দিগ্ধং ক্রমবর্জ্জিতম্
কৃতং চ স্বামিনা যচ্চ সাক্ষ্যহীনং চ দুষ্যতি॥

যে দলিলে লেখার স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, পংক্তি ঠিক নাই, যাহা সংশয়জনক ও স্মৃতিনিরূপিত লক্ষণহীন, যাহাতে নূতন বর্ণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে জাল দলিল সাব্যস্ত করিতে হইবে। যে লেখ্য দেশাচার লঙ্ঘন করে, যাহা সংশয়িত, ক্রমহীন, লেখ্যস্বামী যেখানে নিজেই লিখিয়া লইয়াছে এবং যাহা সাক্ষ্যবস্তুহীন তাহা ফলবান হইবে না।

বৃহস্পতিও জাল দলিল নির্ণয়ের সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

যদুজ্জ্বলং চিরকৃতং মলিনং স্বল্পকালিকম্।
ভগ্নোন্মৃষ্টাক্ষরযুতং লেখ্যং কূটত্বমাপ্নুয়াৎ ॥

যদি পুরাতন দলিলে উজ্জ্বল কালির আভাস পাওয়া যায়, কিংবা নূতন দলিলে পুরাতন কালির লেখা দেখা যায়, এবং যদি তাহার অক্ষর ভাঙা বা মোছা হয়, তবে তাহাকে কূট দলিল বলা হইবে।

হারীতে পাওয়া যায় :—

যচ্চ কাকপদাকীর্ণং তল্লেখ্যং কূটতামিয়াৎ।
বিন্দুমাত্রবিহীনং যৎ সংহিতং চিরিতং চ যৎ ॥

যে লেখা কাকের পায়ের মত অবিন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহাকে জাল বলিয়া ধরিবে। বিন্দুমাত্র বিহীন হইলেও দলিল অগ্রাহ্য, যাহাতে কিছু নূতন সন্নিবেশ হইয়াছে কিংবা যাহা ছিন্ন তাহাও ফলদায়ক নহে।

লেখ্য-কারকের অযোগ্যতা অনুসারেও অনেক লেখ্য নিষ্ফল হইত।

বৃহস্পতি বলেন—

মুমূর্ষু-শিশু-ভীতার্থস্ত্রীমত্ত ব্যসনাতুরৈঃ।
নিশোপধিবলাৎকারকৃতং লেখ্যং ন সিধ্যতি ॥

মুমূর্ষু যদি দলিল করে, সে দলিল ফলহীন; শিশু, ভীত ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, উন্মত্ত, ব্যসনী ও রোগী যদি দলিল করে তাহাও অগ্রাহ্য; নিশাকালে, ফাঁকি দিয়া কিংবা বলপ্রয়োগে কৃত লেখ্যও সিদ্ধ হয় না।

নারদের বচন :—

মত্তাভিযুক্তস্ত্রীবালবলাৎকারকৃতং তু যৎ।
তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপাধিকৃতং তথা ॥

কাত্যায়নের বচন :—

মত্তেনোপাধিভীতেন তথোন্মত্তেন পীড়িতৈঃ।
স্ত্রীভির্বালাস্বতন্ত্রৈশ্চ কৃতং লেখ্যং ন সিধ্যতি ॥

মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত কিংবা উন্মত্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা ভীত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত লেখ্য অপ্রামাণ্য। জুয়াচুরি সাহায্য করিলেও তাহা অসিদ্ধ, অস্বতন্ত্র ব্যক্তি বা পীড়িত ব্যক্তি করিলেও তাহা অগ্রাহ্য। এই গুলি অসিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে অযাথার্থ্য ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

লেখক কিংবা সাক্ষী যদি দূষিত ব্যক্তি হয়, তাহা হইলেও দলিল অসিদ্ধ হইবে।

ব্যাস বলিয়াছেন :—

দূষিতঃ কর্মদুষ্টো বা সাক্ষ্য যত্র নিবেশিতঃ।
কূটলেখ্যং তু তৎ প্রাহুঃ লেখকো বাঽপি তদ্বিধঃ ॥

কাত্যায়ন বলেন :—

সাক্ষিদোষাদ্ভবেদ্দুষ্টং পত্রং বৈ লেখকস্য বা।
ধনিকস্যাপি বা দোষাত্তথা ধারণকস্য বা ॥

সাক্ষী, লেখক, ধনিক বা ধারণক ইহাদের মধ্যে কেহ যদি নিন্দনীয় চরিত্রের হন, তাহা হইলে লেখ্য দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

লেখ্য-দোষের মধ্যে যে গুলি অপ্রকট এবং গূঢ় সে গুলি বিবাদীকে বাহির করিতে হইত, অন্যগুলি বিচারক বা সভ্যগণ বাহির করিয়া লইতেন। কিন্তু প্রমাণ শেষ হইলে আর পক্ষগণ নূতন দোষ বাহির করিয়া দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে বাধা উৎপন্ন করিতে পারিতেন না।

দলিলে যার নাম আছে সে দলিল লেখে নাই, আরূঢ় সাক্ষী সাক্ষ্য দিল না, বিবাদী যখন এই কথা বলে, তখন লেখ্যকে জাল বলিয়া মনে করিয়া বিচার করিবে। যদি বাদী বিবাদীর কথিত দোষ নিরাকরণ করিতে না পারিত, তবে বাদী মোকদ্দমাও হারিত, উপরন্তু মিথ্যাভিযোগের জন্য দণ্ডিত হইত। ধনী যদি স্বহস্তে সাক্ষীবর্জ্জিত লেখ্য লিখিতেন, এবং সেই উপগত লেখ্য দায়ী যদি স্বীকার না করিতেন, তবে তাহা কূট বলিয়া বিবেচিত হইত।

কাত্যায়নের বচন পাই :—

ধনিকেন স্বহস্তেন লিখিতং সাক্ষিবর্জ্জিতম্।
ভবেৎ কূটং ন চেৎ কর্ত্তা কৃতং হীতি বিভাবয়েৎ ॥

যদি ঋণী নিজে লিখিয়া লেখে নাই বলিত, তখন পত্রস্থ সাক্ষিগণের দ্বারা তুষ্ট কি অতুষ্ট তাহা বিবেচিত হইত। দলিল দিয়াছে কি দেয় নাই, সে বিষয়ে সাক্ষ্যই প্রামাণ্য।

কাত্যায়ন বলেন :—

কৃতাকৃতবিবাদেষু সাক্ষিভিঃ পত্রনির্ণয়ঃ।

দূষিত লেখ্যনির্ণয়ের জন্য নারদ বিধান দিয়াছেন :—

যস্মিংস্তু সংশয়ো লেখ্যে ভূতাভূতকৃতঃ ক্বচিৎ।
তৎস্বহস্তক্রিয়াচিহ্নযুক্তিপ্রাপ্তিভিরুদ্ধরেৎ ॥

যখন কোনও পত্রসম্বন্ধে সংশয় হয়, তখন তাহার সত্যতা প্রমাণের জন্য পত্রস্থ ব্যক্তিগণের হস্তলিপি পরীক্ষা করিবে, লেখ্যের ক্রিয়া ক্রম, বিশেষ চিহ্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও যুক্তি

এবং ঘটনার সম্ভাব্য কিংবা অসম্ভাব্য বিবেচনা করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

সন্দিগ্ধলেখ্য শুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ।
যুক্তি-প্রাপ্তি-ক্রিয়া-চিহ্ন-সম্বন্ধাগম-হেতুভিঃ॥

সংশয়িত দলিলের সত্যতা-নির্ণয় জন্য স্বীকৃত হস্তলিপির সহিত অভিযুক্ত লেখ্যের লেখার তুলনা করিবে। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা বিশেষ চিহ্ন, পক্ষগণের সম্বন্ধ, আগমহেতু এবং লেখ্য হইবার কারণ, পক্ষগণের দলিল করিবার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া শুদ্ধি নির্দ্দেশ করিবে।

যখন লেখ্যদাতা জীবিত না থাকিত, তখন তাহার স্বহস্ত-কৃত অন্য লেখ্যের সহিত তুলনা করিয়া লেখ্য নির্ণয় করা হইত। লিখিত বিষয় লিখিত বিষয়ের দ্বারা নির্ণয় হইত। কাজেই যখন লেখ্যসম্বন্ধে সংশয় হইত তখন অন্য লেখ্য দিয়া তাহার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নির্ণয় করা হইত। মৌখিক সাক্ষ্যে কখনও লেখ্য দুষ্ট বা অদুষ্ট বিবেচনা করা হইত না।

কাত্যায়নের বচন পাই :—

প্রত্যক্ষমনুমানেন ন কদাচিৎ প্রবাধ্যতে।
তস্মাল্লেখ্যস্য দুষ্টস্য বচোভিঃ সাক্ষিণাং ভবেৎ।

প্রত্যক্ষকে কখনও অনুমান দিয়া বিপ্রতিপন্ন করিবে না, সাক্ষিগণের বাক্যেই কখনও লেখ্যকে দুষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

দলিলে যখন সাক্ষী থাকিত, তখন তাহারা দলিলের সত্যতা বা অসত্যতা বিষয়ে বলিতে পারিত, কিন্তু যে দলিলে কোনও সাক্ষী থাকিত না, সে দলিল লেখক ও পক্ষগণের হস্তলিপি তুলনা ব্যতীত প্রমাণিত হইত না।

বিষ্ণুসংহিতায় বিষ্ণু বলিয়াছেন, যেখানে ঋণী, ধনী, সাক্ষী বা লেখক মৃত, সেখানে তাহার স্বহস্ত প্রমাণ দ্বারা লেখ্য সিদ্ধ করিয়া লইবে।

পশ্চাৎকার বলিয়া যে সব জয়পত্র দেওয়া হইত, রাজা সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যুক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে প্রমাণ গণ্য করিতেন। কিন্তু অযুক্ত হইলে পুনরায় নির্ণয় করিতেন। অতথ্যকে তথ্য ভাবে স্থাপন করিলে বস্তুনিবদ্ধ পশ্চাৎকারও অগ্রাহ্য করিবে। চাতুরী না থাকিলে বর্ত্তমানে সমবিষয়ক ব্যাপারে পূর্ব্বপ্রদত্ত ডিক্রি বিচারস্থিতির জন্য আর পুনর্ব্বিচার হয় না। সেকালের Res Judicate পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র ছিল দেখা যাইতেছে—সেখানে অতথ্য যদি তথ্য বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বের জয়পত্র অপ্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হইত।

শাসনবিষয়ে সংশয় হইলে রাজার স্বাক্ষর, মুদ্রা প্রভৃতি দেখিয়া সত্যনির্ণয় হইত।

কাত্যায়ন বলেন :—

মুদ্রাশুদ্ধং ক্রিয়াশুদ্ধং ভুক্তিশুদ্ধং সচিহ্নকম্।
রাজ্ঞা স্বহস্তসংশুদ্ধং শুদ্ধিমায়াতি শাসনম্॥

যে শাসনে ঠিক মুদ্রা আছে, যাহার অন্বয় শুদ্ধ, যাহাতে রাজকৃত চিহ্নাদি আছে এবং রাজার স্বহস্ত আছে এবং যে শাসন বিষয় ভুক্ত হইয়াছে তাহাকে শুদ্ধ গণ্য করিবে।

ভোগের দ্বারা জানপদ-লেখ্যও শুদ্ধ হইত।

শক্তস্য সন্নিধাবর্থো যেন লেখ্যেন ভুজ্যতে।
বর্ষাণি বিংশতিং যাবত্তৎ স্থিরং দোষবর্জ্জিতম্॥

লেখ্যবলে যখন শক্ত ব্যক্তির সন্নিধানে বিশ বছর ভোগ হইয়াছে, তখন সে লেখ্য সর্ব্বদোষবর্জ্জিত বলিয়া স্থির করিবে।

দলিল মূলে যদি কিছু লাভ হইয়া থাকে, কিংবা দলিলের যদি প্রজ্ঞপ্তি হইয়া থাকে, তবে সাক্ষিগণ মরিয়া গেলেও লেখ্য সিদ্ধ হইবে। প্রজ্ঞপ্তি পারিভাষিক শব্দ।

নারদে তাহার অর্থ পাই—

দর্শিতং প্রতিকালং যচ্ছ্রাবিতং স্মারিতং তথা।
লেখ্যং সিধ্যতি সর্ব্বত্র মৃতেষ্বপি হি সাক্ষিষু॥

যে লেখ্য যথাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রায়শঃ যাহার জন্য তাগাদা করা হইয়াছে এবং লোকসমক্ষে প্রচার করা হইয়াছে তাহার 'প্রজ্ঞপ্তি' হইয়াছে—এইরূপ লেখ্য সাক্ষিগণের মৃত্যুর পরেও বলবান থাকে।

তখনকার দিনেও বেনামি দলিলের খুব প্রচলন ছিল। বেনামি দলিল সম্বন্ধে বাদ হইলে যাহার হাতে দলিল থাকিত, সাধারণতঃ তাহারই ভোগ নির্দ্দেশ হইত।

প্রজাপতি বলেন :—

হেত্বন্তরকৃতে পত্রে আরূঢ়ো যত্র নিহ্নুতে।
লেখ্যং যস্য ভবেৎ হস্তে তস্য ভোগং বিনির্দ্দিশেৎ॥

দায়াদগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত দলিল যাহার হস্তে থাকিবে তাহারই ভোগ নির্দ্দেশ করিবে।

নারদ বলেন :—

লেখ্যং যচ্চান্যনামাঙ্কং হেত্বন্তরকৃতং ভবেৎ।
বিপ্রত্যয়ে পরীক্ষ্যং তৎ সম্বন্ধাগমহেতুভিঃ॥

যখন কাহাকেও ফাঁকী দিবার জন্য অন্য নামে দলিল করা যায়, সেই, বেনামি দলিল সম্বন্ধে বিসংবাদ হইলে, সেই দলিল সম্বন্ধে ধনদান-প্রতিদান হইয়াছে কি না, তাহার উৎপত্তির কারণ ও হেতু, স্থির করিয়া বিচার করিবে।

বৃহস্পতি বলেন, লিপিজ্ঞানহীন স্ত্রী, বালক ও আর্ত্তকে বঞ্চনা করিবার জন্য তাহাদের আত্মীয়গণ লেখ্য করে যুক্তি ও আগম দেখিয়া তাহার নির্ণয় করিবে।

মানুষ মানুষই, অতীতেও জাল জুয়াচুরি চলিত।

বৃহস্পতিতে পাই—

জ্ঞাত্বা কার্য্যং দেশকালকুশলাঃ কূটকারকাঃ।
কুর্ব্বন্তি সদৃশং লেখ্যং তদ্ যত্নেন বিচারয়েৎ॥

জালিয়াতেরা দেশকালকুশল, কার্য্য জানিয়া জাল দলিল তৈয়ার করে, তাহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক দলিল পরীক্ষা করিবে।

কাত্যায়ন বলেন, দর্পণে যেমন প্রতিফলিত বিম্ব অসৎ হইলেও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমনই কুশলী লোকে জাল দলিল করে। নারদও কূটলেখ্যকারক দুরাত্মাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন নাম গোত্র তুল্যরূপ হইত এবং ঋণীর স্বহস্তের ন্যায় হইত, তখন যদি ঋণী ধন লই নাই বলিত, তখন উপায়ান্তর না থাকায় দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত।

প্রজাপতি তাহার বিধান দিয়াছেন :—

যন্নামগোত্রৈস্তুল্যরূপং লেখ্যং ক্বচিৎ ভবেৎ।
অগৃহীতে ধনে তত্র কার্য্যো দিব্যেন নির্ণয়ঃ॥

যদি অধমর্ণ দলিল দেখিয়াও বিশ বছরের মধ্যেও কোনও প্রতিবাদ না করিত, তবে সে দলিলকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করা হইত।

স্থাবরের কবালা বা রেহেনি খত কেহ জাল করিলে তাহার বিশেষ দণ্ড হইত, তাহার জিহ্বা, পাণি ও পাদ কর্ত্তন করা হইত।

যে সমস্ত লেখ্যের বিষয় বলা হইল, তন্মধ্যে উপগত লেখ্যের চেয়ে অসাক্ষিক স্বহস্তলিখিত লেখ্য বলবান, অসাক্ষিক স্বহস্তের চেয়ে সসাক্ষিক স্বহস্ত, সসাক্ষিক স্বহস্তের চেয়ে অন্যহস্তকৃত, অন্যহস্তকৃতের চেয়ে রাজকীয়, রাজকীয়ের চেয়ে শাসন বলবান। পরস্পর বিরোধ হইলে শেষেরটি পূর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। লেখ্যমাত্রেই মৌখিক সাক্ষ্য হইতে বলবান বলিয়া বিবেচিত হইত। এবং লেখ্যের বিরুদ্ধ মৌখিক সাক্ষ্য প্রতিগৃহীত হইত না।

বৃহস্পতির বচন :—

বাচকৈর্যত্র সামর্থ্যমক্ষরাণাং বিহন্যতে।
ক্রিয়াণাং সর্ব্বনাশঃস্যাদনবস্থা চ জায়তে॥

যদি বাক্য অক্ষরকে হীন করে, তবে ক্রিয়ার সর্ব্বনাশ হয় এবং বৈষয়িক ব্যাপারের অনবস্থা হয়। এই বচনের সহিত বর্ত্তমানের সাক্ষ্যবিধির ৯০ ধারা মিলাইয়া দেখিলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব।

লেখ্য কখনও সাক্ষী বা শপথের দ্বারা হীন হয় না। লেখ্যের দ্বারাই লেখ্য নিয়মিত হয়। অতএব সাক্ষি প্রমাণ বা দিব্য প্রমাণ দ্বারা কখনও লেখ্যকে অগ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু লেখ্য যদি প্রদর্শিত না হয়, যদি পড়িয়া শোনান না হয়, কিংবা উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে লেখ্যের হানি হয়। ত্রিশ বৎসর যদি কোনও দলিল দর্শিত বা শ্রুত না হয়, তবে তাহা সাক্ষী বাঁচিয়া থাকিলেও অকর্ম্মণ্য হয়। লিখিবার পর কিংবা সুদ পাওয়ার কাল শেষ হইয়া গেলেও যে দলিল দেখানো হয় না, কিংবা ঋণীর নিকট যাচ্ঞা করা হয় না, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

উপরে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে আমরা সেকালের পণ্ডিতগণের অসামান্য ধী, লোকচরিত্রে জ্ঞান, বিশ্লেষণ-শক্তি এবং কূট নৈয়ায়িক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হই। এই সমস্ত বিষয় হইতে আমরা হিন্দুগণের ব্যাবহারিক জ্ঞানেরও যথেষ্ট পরিচয় পাই। ব্যবহার-নির্ণয়কেও স্মৃতিকার ও নিবন্ধকারগণ অতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত অনুশীলন করিয়াছিলেন—নবজ্ঞানদৃপ্ত নব্যগণ তাঁহাদের সেই পরিশীলন হইতে নবযুগের জন্য নূতন বার্ত্তা ও নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

-শ্রীসুকুমার সেন

[১০৫]

মনসামঙ্গল বা 'পদ্মাপুরাণ'-রচয়িতা নারায়ণদেবের কাল জানিবার কোন উপাদান বর্ত্তমানে নাই। যুক্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নারায়ণদেবকে কেহ কেহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বলেন, ইনি চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। যেহেতু কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ স্বীয় মনসামঙ্গল কাব্যে নারায়ণদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হেতু অনুমান হয় যে, ইনি অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নারায়ণদেবের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই সংস্করণটির মূল এক গায়কের একটি সংক্ষিপ্ত পালার পুঁথি; সুতরাং ইহাতে অবান্তর বন্দনাদি অংশ না থাকারই কথা।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের খণ্ডিত পুঁথি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ পুঁথি দুর্ল্লভ। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ হইতে কাব্যটি ছাপা হইয়াছিল। প্রথমে বটতলা হইতে নারায়ণদেবের কাব্য প্রকাশিত হয়, তাহার পর এই পুস্তক দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণদেবের কাব্যের একটি প্রামাণিক সংস্করণ খুবই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

রচনার কাল দেওয়া না থাকিলেও নারায়ণদেবের কাব্যে তাঁহার পরিচয় কিছু কিছু দেওয়া আছে। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, ইঁহার নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। পিতার নাম নরসিংহ, মাতার নাম রুক্মিণী, পিতামহের নাম নরহরি।[1]

নারায়ণদেবে কয় নরসিংহসুতে। পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

অপর এক মনসামঙ্গলের কবি রসিকানন্দের মত নারায়ণদেবেরও উপাধি ছিল "সুকবিবল্লভ"।

নারায়ণদেবে কহে সুকবিবল্লভ হএ
গোদের বাকে দিল দরশন॥

নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কবির পূরা নাম "রামনারায়ণ দেব"।

সুকবিবল্লভ রাম দেব নারায়ণ। একটি লাচাড়ি কহি শুন দিয়া মন॥[2]

[১০৬]

নারায়ণদেবের কাব্যের উপাখ্যান অংশ বংশীদাসের কাব্যের অনুরূপ। নারায়ণদেবের রচনার নিদর্শন হিসাবে অল্প কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জলন্ত আনলে জেন ঢালিলেক[3] তেল। এহি রূপে চন্দ্রধর কোপে জলি গেল॥
দম্ভ কড়মড়ি চান্দো মচড়য়ে দাড়ি। বাম কান্ধে[5] তুলি লইল হেমতাল[4] বাড়ি॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া জেন গরুড়ের বিক্রম। সেহি মত চন্দ্রধর গছিল সংগ্রাম॥
হেমতাল কান্ধে[5] লৈয়া দিলেক পাকান। দেখিয়া নাগ সবের উড়িল পরান॥
চান্দোক দেখিয়া নাগ ত্রাস পাইল বড়। ত্রাসে ভঙ্গ দিল নাগ না পিন্ধে[6] কাপড়॥
কবজি[7] মৎস্য হাটে[8] জেন পাইয়া বরিষণ। এহি মতে চন্দ্রধর গছিলেক রণ॥
কোন নাগেরে মারে হেমতাল বাড়ী। ভূমিত পড়িয়া নাগ যাহে গড়াগড়ী॥
বড় বড় জত সব আছিলেক সর্প। চান্দোক দেখিয়া সব পাসরিল দর্প[9]॥
গরুড় দেখিয়া জেন নাগ পলায় ডরে। এহিরূপে নাগ চান্দো খেদাইয়া মারে॥[10]

[১০৭]

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ্যধারাগুলির আলোচনা করা হইল। এইবার শতাব্দীর একান্ত শেষের রচিত কয়খানি বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আনিয়া উপসংহার করিব। পরবর্ত্তী ইতিহাস ধারাবাহিক অপর প্রবন্ধসাপেক্ষ।

১। বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ কলিকাতা সংস্করণ, প্রস্তাবনা, পৃঃ ।/০।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ১১১। ৩। 'ঢালিলেক' পুঁথি। ৪। হিন্তাল। ৫। 'কান্দে'। ৬। 'পীন্দে'। ৭। 'কবয়ি'? ৮। 'হাটে'। ৯। 'দর্প'। ১০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি ১৭৬। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৩২-৩৩।

[১০৮]

কবিবল্লভের রসকদম্ব[1] হইতেছে কাব্যাকারে গ্রথিত একখানি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। রচয়িতার নাম কবিবল্লভ। তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ এবং মাতার নাম বৈষ্ণবী (?)। বাসস্থান ছিল করতোয়া তীরে মহাস্থানের নিকটে আরোড়া গ্রামে।

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর২ মাতা। জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের কথা॥

... ...

করতোয়াতীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

কবির গুরু উদ্ধবদাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাস হইবেন। কারণ কবি যেরূপ ভাবে গদাধরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে গদাধর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়। নিত্যানন্দে৩ আনন্দ করুক অতিশয়॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেম সঙ্গ। গদাধরে ধরে৪ যেন রসের তরঙ্গ॥
চৈতন্যের প্রিয়৫ যত বৈষ্ণব সুজনে। তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে॥
শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচক্ষু দাতা। সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥৬
ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তি রসধাম। ভব দুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম৭॥
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়। জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয়॥
নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম। তাহার প্রসাদে হৈল সংসার সুজান॥৮

১৫২০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৃহস্পতিবার রসকদম্ব রচনা সমাপ্ত হয়।

ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক॥৯

কবির এক বন্ধু ছিলেন মুকুট রায়। মুকুট রায় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। এই মুকুট রায়ের আগ্রহে কবিবল্লভ রসকদম্ব রচনা করেন।

কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে। সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজ কুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়। অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়॥
তাহার উত্তোগে কিছু লেখিল কারণ। যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ॥১০

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী বনমালিদাসের নিকট যে সকল সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা কবি বনমালিদাসের নিকট শ্রুত হন। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে এবং শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য পুরাণাদি অবলম্বনে কবি রসকদম্ব রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নামে এখন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়। বনমালিদাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্য লীলার আরম্ভ। পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান। পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী। প্রাকৃতে লেখিল রস সর্ব্ব জীব লাগি॥১১
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা দেখি করিল আরম্ভ। পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব॥১২

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা সম্বন্ধে কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয়, ইহা কোন গ্রন্থবিশেষ নহে, পরন্তু বৈষ্ণবীয় সাধনাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তবিশেষ।

এসব প্রসঙ্গ পূর্ব্বে দারুকে শুনিল। পরিণাম কালে গর্গ মুনিকে কহিল॥
গর্গ স্থানে শুনি সুত আদি মুনিগণে। লেখিল প্রবন্ধ করি ভজন কারণে॥
ক্রমে ক্রমে প্রচারিল বিদর্ভনগরে। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা হেন জানিল সকলে॥১৩

[১০৯]

রসকদম্ব দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে প্রায় দুই হাজার পয়ার শ্লোকে গ্রথিত। ইহার মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব ত্রিপদী ছন্দের শ্লোক কিছু কিছু আছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ। ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যম নিবন্ধ১৪॥১৫
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর। দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥১৬

গ্রন্থটিতে দুই শত ছয় অযুত অক্ষর আছে কি না গণনা করিয়া দেখি নাই। তবে চতুষ্পদী পয়ার ছন্দে সহস্র শ্লোক আছে বটে।

গ্রন্থটিতে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের এক একটি অধ্যায়ে এক একটি "রস" বর্ণিত হইয়াছে। এই "রস" দ্বারা অবশ্য অলঙ্কার শাস্ত্রে অথবা বৈষ্ণবশাস্ত্রে উল্লিখিত রস ছাড়াও আরও অনেক কিছু বুঝাইতেছে। কবি কথিত বাইশটি রস এই—আদি রস (বন্দনা), সূত্র রস (কৃষ্ণলীলাসূত্র বর্ণনা), ভৈরব রস (দ্বারকার ঐশ্বর্য্যবর্ণনা), হাস্যরস (রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণের

১। রসকদম্ব, কবিবল্লভ বিরচিত, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৩২। ভূমিকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এইরূপ সুসম্পাদিত গ্রন্থ অতি অল্পই এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। ২। 'হেন' পাঠান্তর। ৩। 'নিত্যানন্দ'। ৪। 'গদাধর ধারা'। ৫। 'ভক্ত' পাঠান্তর। ৬। পৃঃ ৩। ৮। পৃঃ ৮৩। ৯। পৃঃ ৯৮। ১০। পৃঃ ৮৩।

১১। পৃঃ ৮৩। ১২। পৃঃ ৩। ১৩। পৃঃ ৮২। ১৪। 'মধ্যমে নির্ব্বন্ধ'। ১৫। পৃঃ ৩। ১৬। পৃঃ ৮৪।

পরিহাস), প্রেম রস (১) (কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রেমভাব বর্ণনা) অদ্ভুত রস (সৃষ্টি ও ভৌগোলিক সংস্থান বর্ণনা), শিক্ষা রস (কর্ম্মফল বিচার), স্তুতিরস (কৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব বর্ণনা), ভেদ রস (জীবের উত্তমাধম অবস্থার হেতু বিচার), শৃঙ্গার রস (নিত্য বৃন্দাবনের বর্ণনা,), প্রেম রস (২) (বৃন্দাবন লীলা ও গোপীপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনা), শান্তি রস (সাধকের পন্থা বর্ণনা), ভাব রস (ভক্তি বিচার), ভজন রস (অবতারতত্ত্ব ও প্রতিমাপূজা তত্ত্ব বিচার), বীভৎস রস (সাংসারিক ক্লেশাদি বিচার), আস্থা রস (শ্রুতিগণের গোপীরূপে ভজনা), ভক্তিরস (কৃষ্ণের রৈবতক উপস্থিতিতে নারদের ভক্তি বর্ণনা), ভীত রস (পাপের ফল ও নরক বর্ণনা), বিস্ময় রস (কৃষ্ণের দ্বারকায় অবর্ত্তমানে তত্রত্য কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ভার্য্যার কৃষ্ণপ্রীতি সন্দর্শনে নারদের বিস্ময়), করুণ রস (নারদ সত্যভামাকে কৃষ্ণের ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাঁহার দুঃখ জন্মাইলেন), বীররস (পারিজাত তরুর নিমিত্ত কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ), দীক্ষারস (কৃষ্ণের রুক্মিণী ও সত্যভামাকে কিশোর রসের মন্ত্র দীক্ষা দিলেন)।

এক একটি দলের প্রারম্ভে এক একটি বিশেষ রাগ বা রাগিণীর উল্লেখ আছে। মুদ্রিত পুস্তকে (এবং তদবলম্বিত পুঁথিগুলিতেও বোধ হয় ভ্রমক্রমে) পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের শীর্ষে কোন রাগ বা রাগিণীর উল্লেখ নাই। রসকদম্বে যথাক্রমে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—আহির, ললিত, পঠমঞ্জরী, রামকেলি, সুহট, মল্লার, বরাড়ী, আশোয়ারী, পাহাড়িয়া, সারঙ্গ, বিনোয়া, নট, গান্ধার, ভাটিয়াল, তুড়ি, কানাড়া, গৌরী, কেদার।

রসকদম্বের মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ সূত্রাকার আখ্যায়িকা আছে তাহার কাঠামো এইরূপ। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করাতে রুক্মিণী ব্যথা পাইলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বিমানে চড়িয়া দুইজনে রৈবতকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে কৃষ্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় সকল বলিয়া যাইতেছেন। এই হইতেছে চতুর্থ হইতে ষোড়শ অধ্যায়ের কথা। তাহার পর রৈবতকে পৌঁছিলে নারদ কৃষ্ণকে একটি পারিজাত পুষ্প উপহার দিলেন, কৃষ্ণ সেটি রুক্মিণীকে দিলেন। ইহার পর পারিজাত হরণের ব্যাপার। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ই কৃষ্ণের উক্তি।

[১১০]

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শুদ্ধ তত্ত্বকথাসম্বলিত অল্প যে কয়খানি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, রসকদম্ব তাহার মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা ছাড়িয়া দিলে এ বিষয়ে রসকদম্ব দ্বিতীয়-রহিত। কবি যে শুধু পণ্ডিত ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন তাহা নহে, ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কোথাও কবিত্বের আড়ম্বর না করিয়া যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে অথচ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম সহজভাবে বুঝাইয়াছেন। তত্ত্বকথার মধ্যে প্রাকৃতজনোচিত ঘটনা, গল্প বা উক্তি প্রভৃতি থাকিলে লোকে পাছে অগ্রাহ্য করে, সেই জন্য কবি পাঠককে সাবধান করিয়াছেন।

প্রাকৃত কারণে লোক অনুভব কহে। বিচারিলে মহাতত্ত্ব গ্রাম্যকথা নহে॥

গ্রন্থের নাম কেন "রসকদম্ব" হইল তাহার উত্তরে কবি বলিতেছেন—

শৃঙ্গার বিগ্রহ সর্ব্ব রস বিস্তারিল। তে কারণে নাম রসকদম্ব রাখিল॥

কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও গায়কের প্রতি কবির উক্তি হইতে বোঝা যায়।

লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে। ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি। অন্তরে প্রবেশ তবে না হয়ে মাধুরী॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান। পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান॥
তে কারণে দড়াঞা কহিল নিজ মনে। পূর্ব্ব পক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে॥১

উপমাদির প্রয়োগে কবি যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মে সমদৃষ্টি এবং আত্মদৈন্য কবির উচ্চহৃদয়তা জ্ঞাপন করে।

উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত শকতি। মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি॥
উত্তমে না লয় দোষ গুণ মাত্র ভোগে। শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্মযোগে॥
দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে। সর্ব্ব দ্রব্য মূল্যে২ যেন বণিকের ঘরে॥
দোষে সুখ গুণে দুখ৩ ক্ষণেক প্রকাশে। পল্লব ছাড়িঞা উট কণ্টক বিলসে॥
অতএব ভাবরস সুদৃঢ় জানিব। ভাব হৈতে প্রেমযোগে সুকর্ম্ম সাধিব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্ন স্বভাব। অন্যোন্যে সকলে করে সর্ব্ব দেহে ভাব॥
ইহাতে পৃথক বুদ্ধি যেহি জন করে।৪ মস্তক ভুমিঞা জেন শরীর প্রহারে॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহাধনী। পসার সাজিঞা তারা লয় ভক্তি মণি॥

১। পৃঃ ৩। ২। 'তুল্য' হইবে। ৩। 'দোষে দুঃখ, গুণে সুখ'। ৪। 'ভাব হৈতে পৃথক বুদ্ধি যেবা জনে করে।'

প্রণাম করিয়া কহি পণ্ডিত চরণে। কৃষ্ণের প্রসাদ গুণ স্থাপিব যতনে॥
হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র। কবিদোষে দুষী নহে কৃষ্ণের চরিত্র॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী। ভক্তি মূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি॥
দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে। আর্ত্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রতি ঘরে।
দরিদ্র অবল খঞ্জ অন্ধহীন জনে। শ্রদ্ধাপণে সেই ভক্তি কিনে বিনি ধনে॥

তিক্ত মিষ্ট কটু কথা ক্ষার অম্ল নহে।
নিত্য নিত্য নব স্বাদ জন্মে নিজ১ দেহে॥
রাজারে নিবারে নারে না পোড়ে আনলে।
জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে না দেখে তস্করে॥
নাড়িতে বহিতে কিছু নহে পরিশ্রম।
বিলাইতে অক্ষয় ভোগিতে অনুপম॥
অনায়াসে হেন দ্রব্য পাঞা সর্ব্বজনে।
অচেতন্য হারায় আলিস্য অভিমানে॥২

পতিবিষয়ে নববধূর মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় কবি অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস।
ক্ষণ মাত্রে কোনযোগে নহে পতিবশ॥
সর্ব্ব সঙ্গে হাসে খেলে থাকে নানা সুখে।
পতিকে দেখিলে মাত্র রহে অধোমুখে॥
কন্দল পিরীতি কথা সর্ব্ব সঙ্গে কহে।
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন হৈয়া রহে॥
সহজে পুরুষ নব নারীর কারণে।
দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে ক্ষণে ক্ষণে৩॥
গৃহ মধ্যে থাকে পত্নী ধৈর্য্য কথা কহে।
কোন ছলে তার পতি আঙ্গিনাতে রহে॥
দেখিতে না পায় কভু চাহে চারিদিগে।
না শুনে বচন কভু কর্ণ পাতি থাকে॥
ব্যাজ লক্ষ কার সঙ্গে দীর্ঘ কথা কহে।
কারণে রহিত তভু নানা ছলে রহে॥
বৃদ্ধা দাসী শিশু দাস পত্নী সঙ্গে থাকে।
যত্ন করি তাঁর কথা পুছে তা সভাকে॥
যথা তথা ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে।
আপনে না ভোগে দেয় তার সখীর হাতে॥
সখী যদি পতিদ্রব্য হেন তাকে কহে।
হস্তে হৌ না ছোয় তাহা নয়ানে না চাহে॥
মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত মানে৪ কণ্টক কুসুমে।
অঙ্গ জ্বলে চলে সখী বচন না মানে৫॥

সুখে স্বামী নানা বেশ রচিয়া আপনে।
যেখানে দেখিতে পায় রহে সেই থানে।
দৈব যোগে পতি যদি দেখে সেই নারী। বিষময় করি ঢাকে নয়ান পুতুলি॥
এই মত দিবস পর্য্যন্ত দুঃখে ফিরে। রজনী হইতে বাঞ্ছা নিরবধি করে॥
সন্ধ্যাযোগ বুঝিঞা সত্বরে কিছু ভুঞ্জে। নিদ্রাছল কারণে আপনে শয্যা রচে॥
তার নারী প্রবোধিঞা আনে দাসীগণ। শয্যাতে বসিয়া করে বিমুখে শয়ন॥
নিজ ভুজে শির তার হৃদয় বিলাস। জাগিতে হৌ নিদ্রাছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
পতি যদি পত্নী অঙ্গে নিজ কর ঢালে। তার করি ধরি তবে তৃণবৎ পেলে॥
নিজ ভুজ ফিরাইতে যদি ইচ্ছা৬ করে।
পাষাণ অধিক তবে নাড়িতে না পারে॥
বসনে শরীর ঢাকে না পরে চন্দন। মুখ মেলি নাহি করে তাম্বুল ভক্ষণ॥
অশ্রু বিনে কান্দে যদি অতিশয় পুছে। অজস্র জল্পায় যাহা আপনে না বুঝে॥
মুখ নিরখিতে পুন চাপে দুই আঁখি। পরিহাস কথা শুনি হয় বক্রমুখী॥
ভাব বুঝি পতি যদি দূর হঞা রয়। উঠিয়া পলাবে হেন মনে করে ভয়॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শয়ন। অল্প মাত্র নিদ্রা সর্ব্বরাত্রি জাগরণ॥৭

বৃদ্ধের লাঞ্ছনা—

বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন। নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জ্জন॥
ধান্যের বায়স রাখে৮ গাভীর সেবা করে।
শিশু পৌত্র৯ দৌহিত্র পালিঞা থাকে ঘরে॥
পত্নীপুত্রে বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ। সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ॥
অসুস্থ অবল দেখি সবে মন্দ বলে। না মরে কারণ সভে নিত্য তিরস্করে।
সুরীতে না হয় ভক্ষণ শয়ন। মরণ অধিক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন॥
বৃদ্ধ মৈলে তার নারী বোলে পুত্র স্থানে। অল্প ব্যয়ে তার কর্ম্ম কর সমাধানে॥
সে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস। ক্রন্দন অসুখ না করহ ধননাশ॥
পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে। তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে॥১০

গোলোকের রীতিবর্ণনায় কবি ব্রহ্মসংহিতা হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, তথাপি ইহা কবির নিজস্ব বর্ণনা বটে।

সর্ব্ব বৃক্ষ কল্পদ্রুম নানা গুণ ধরে। ফল ফুল মকরন্দ গন্ধ শোভা করে॥
অযাচক যাচক কাহাকে নাহি জানে। বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে॥
নব নব সুখ সব শরীরে উদয়। মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন। বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥
প্রেমরস সুখরস মূর্ত্তিমন্ত দেখি। অখণ্ড আনন্দ সর্ব্বজীব মহাসুখী।
কার্য্য বিনে করণ সর্ব্বত্র উপাদান। স্বাদুগন্ধ রূপবতী সর্ব্বমূর্ত্তিমান॥
গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি১১॥
না ভোগিলে সর্ব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন।
না দেখিঞা সর্ব্ব রূপ করে নিরীক্ষণ॥

১। 'দম্ভ'। ২। পৃঃ ২-৩। ৩। 'রাত্রি দিনে'। ৪। 'বাসে'। ৫। 'শুনে'।

৬। 'ইৎসা' মূল। ৭। পৃঃ ১২-১৩। ৮। 'খেদে'। ৯। 'পুত্র' মূল। ১০। পৃঃ ১৩। ১১। 'উৎপত্তি' মূল।

না বোলিলে সর্ব্ব কথা বুঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে১ সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রমিঞা রমে।
মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনি শ্রমে॥২

দ্বারকায় এত সুন্দরী সুশিক্ষিতা মহিষী থাকিতে কেন যে কৃষ্ণের চিত্ত গোপীদিগের মত অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর প্রতি অনুক্ষণ ধাবিত হইতে পারে, তাহা রুক্মিণী ভাবিয়া না পাইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সম্প্রতি দ্বারকাপুরী ষোলয় সহস্র নারী
রাজকন্যা পরম পণ্ডিতা।
কুল শীল রূপ গুণে অনুপামা সর্ব্বজনে
সরস রভসে সুচরিতা॥
নয়ান কমল পথে রাখিলে আপন চিত্তে
মতি গতি সর্ব্ব কর্ম্ম করে।
তিলেক না দেখে যদি না শুনে বচন নিধি
অনুরাগে প্রাণ দাহে মরে॥
হেন অনুরাগে ছাড়ি কপট দেবার্চ্চা করি
ধ্যানযোগে থাক তুমি বনে।
সহজে সে ভিন্ন নারী সেহো বন অনুচরী
যতনে ভজহ কি কারণে॥
প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে।
বৃক্ষ মূলে ঘর বার বন পুষ্প অলঙ্কার
সে জন কেমনে তোমা মোহে॥
কেলি যার কুঞ্জতল বনের কুসুম দল
পরিহাস কন্দল সমান।
রচিতে না জানে রতি গুরু কুলে ঘন মতি
তাতে কেনে এমন সন্ধান॥
নিত্য স্থান কেলী বার্ণা শুনিতে অপূর্ব্ব মানি
তার তুল্য বাসহ গোকুলে।
এ মোর বিস্ময় বড় অনন্তে জানিলে দঢ়
বুঝিয়া কহিবে নিরাকুলে॥

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ গোপীপ্রেম বর্ণনা করিতেছেন—

জগতে সম্বন্ধ যত বেদে কহে নানা মত
সে সব জানিব মনে দঢ়।
তাহাতে জানিব লাভ পুরুষ প্রকৃতি ভাব
ইহাধিক নাহি আর বড়॥
তার মধ্যে গোপ্ত রস কেবল প্রেমের বশ
সর্ব্বলোকে করে সঙ্গোপন।
ছাড়িয়া মন্দির পুরী গুরু কুলে করে চুরি
বিরলে বাঢ়ায় প্রেমধন॥
সহজে সে গ্রাম্য জাতি সহজ চরিত্র আতি
চাতুরী আহার্য্য নাহি জানে।
তাহাতে কুলজা ধর্ম্ম বিরলে বিলসে কর্ম্ম
পতি অহঙ্কার নাহি মানে॥
তাতে রহে অনুরাগ মনে সহে দুঃখ ভাগ
প্রেমশয্যা তরুতলে সীমা।
রূপে করে অহঙ্কার যৌবনে কি রূপ তার
প্রেম নহে যৌবন গরিমা॥
গৃহ কর্ম্মে বাহ্য দেহা মনে ভোগে নব লেহা
কন্দলের ছলে সুখ কহে।
সহজে প্রকট রসে রসিকের নহে তোষে
গোপ্ত প্রেমে প্রাণ মন মোহে॥
নিকুঞ্জ মন্দির পাঞা তাহাতে বিরল ছায়া
কুসুম সৌরভে বায়ু দোলে।
কোকিলে পঞ্চম গায় মাতল ভ্রমরে ধায়
সচকিতে প্রীত লাগি বুলে॥
এ সব সুখের ওর কহিতে শুনিতে মোর
তনুমন প্রাণে দুঃখ ভাব।
এ সব অপূর্ব্ব ভাষা শুনিতে পরম আশা
শুনিলে বাঢ়য়ে বড় লাভ॥
আত্মারাম রূপ ধরি নানারূপ কেলি করি
খণ্ডনে স্থাপনে কর্ত্তা আমি।
শিবে কি বিষের তেজে আনলে সকল ভুঞ্জে
তেজবান কিছু না রাখিণু॥
উত্তম মধ্যম যত যে জন যে কার্য্যে রত
তাহা কেহ ছাড়িতে না পারে।
হেন ও আনন্দধাম কেলি বৃন্দাবন নাম
তার ভাবে পূরিল অন্তরে॥
গোপীগণ প্রেমখানি স্মরিতে নারিল মানি
প্রেমপুঞ্জ বাঢ়ে আর্ত্তি যোগে।
মনে কর অনুমান যে করে অমৃত পান
অন্য মধু তারা নাহি ভোগে॥
পিরীতি আরতি রতি সম্ভোগ বিয়োগ গতি
তোমাকে কহিল আদিরসে।
কৃষ্ণের প্রবোধ বোলে রুক্মিণী পড়িলা ভোলে
শ্রীকবিবল্লভ কিছু ভাষে॥৩

১। 'বুঝে'। ২। পৃ ২৬।

৩। পৃঃ ৩৪-৩৬।

[১১১]

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বৈষ্ণব রসশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নন্দকিশোর দাসের রসকলি[১] প্রাচীনতম। এই গ্রন্থটীর একটী সম্পূর্ণ প্রতিলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।[২] তাহা অবলম্বনে এই আলোচনা করা যাইতেছে।

রসকলিকা ষোড়শ 'দল' বা অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। প্রথম দলে নায়কগুণবর্ণনা, দ্বিতীয়ে নায়িকা নিরূপণ, তৃতীয়ে নায়িকা স্বভাবভেদ বিচার, চতুর্থে দৌত্যপ্রকরণ, পঞ্চমে উদ্দীপন বিভাববর্ণন, ষষ্ঠে অনুভাববিবরণ, সপ্তমে সাত্ত্বিক বিবরণ, অষ্টমে ব্যভিচারী ভাব বর্ণন, নবমে অষ্টবিধ রতি বিবরণ, দশমে মোহনদশা বর্ণন, একাদশে স্থায়ী ভাববিবরণ, দ্বাদশে বিপ্রলম্ভ বিবরণ, ত্রয়োদশে সম্ভোগচতুষ্টয় বর্ণন, চতুর্দ্দশে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচৌর্য্য লীলাবিবরণ, পঞ্চদশে দানলীলা বর্ণন এবং ষোড়শে সম্ভোগলীলাবর্ণন।

রসকলিকার অন্যতম বিশেষত্ব হইতেছে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী হইতে রসশাস্ত্রের বিচারে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত।

রসকলিকার ভণিতা এইরূপ —

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ। নায়কবর্ণনা কহে নন্দকিশোর দাস॥

নন্দকিশোর ষোড়শ শতকে শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই অনুমানের হেতু ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর অভিরাম দাসের শিষ্য ছিলেন। অন্ততঃ অভিরামদাস রচিত শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয় হইতে তাহাই অনুমান হয়।

চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর।

১০৯১ সালে অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত একটী পুঁথিতে নন্দকিশোর ভণিতা একটী নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা পদ পাওয়া গিয়াছে।[৩] পদটী রসকলিকাকার নন্দকিশোরের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

পাঁচটি বন্দনাশ্লোকের পর এইরূপ গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥
ব্রজেশতনয়ঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধাপ্রেমকামুকঃ।
নবদ্বীপেঽবতীর্ণোঽভূৎ কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥ ২॥

ইত্যাদি।

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
অতিশয় দীনজনবন্ধু।
অজ্ঞান তিমির নাশে দিব্য নেত্র পরকাশে
সেই প্রভু করুণার সিন্ধু॥
মো অতি অধম ছার মোরে কৈলে অঙ্গীকার
সেহো তাঁর করুণা প্রবল।
কৃপা করি সব মত জানাইলা রসতত্ত্ব
রাধাকৃষ্ণলীলাদি সকল॥
মুঞি অতিশয় দীন সারাসারজ্ঞানহীন
হৃদয় মলিন অতিশয়।
গুরুকৃপা পরবন্ত[৪] সব মলা করি খণ্ড
স্নিগ্ধাকার করিল হৃদয়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি রাধাভাব অঙ্গীকার
নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রেমধন করি দান
আস্বাদিল নিজ ভাব পূর্ণ॥
নিত্যানন্দচাঁদ বন্দি গৌরপ্রেমরসানন্দী
বলদেব রোহিণীতনয়।
অবতীর্ণ মহীতলে প্রেম প্রচারিয়া বুলে
কীর্ত্তন আনন্দ রসময়॥
তবে বন্দো মহাশয় সদাশিব কৃপাময়
ভক্তরূপে অদ্বৈত-আচার্য্য।
যেহোঁ নিজ ভক্তি বলে কৃষ্ণ আনি ক্ষিতিতলে
সাধিল আপন যত কার্য্য॥
বন্দো প্রভুর ভক্তগণ শ্রীবাসাদি যত জন
গদাধর আদি ভাগবত।
বন্দো স্বরূপ রামানন্দ কেবল প্রেমের কন্দ
চৈতন্যপার্ষদ আর যত॥
দুই প্রভু অবতরি নিজগণ সঙ্গে করি
বিলস এ নদিয়া নগরে।
প্রেমরস পরকাশে আনন্দ সায়রে ভাসে
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি॥
শুন প্রাণ নিত্যানন্দ তুমি সে আনন্দকন্দ
শুন মোর এক নিবেদন।
গৌড়দেশে প্রেমধন দান কর অনুক্ষণ
প্রকাশ করহ সঙ্কীর্ত্তন॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দে সমর্পিয়া নিজানন্দে
বৃন্দাবনে রূপ সনাতনে।
আপনে উৎকল দেশে করে প্রেম পরকাশে
রহে স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
অথাৎ সনাতনরূপ প্রভু আজ্ঞা পাঞা[৫] ভূপ
লুপ্ততীর্থ প্রকাশ করিলা।
ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিলা নানামত
লক্ষগ্রন্থনিরূপণ কৈলা॥
বিদগ্ধমাধব আর উজ্জ্বলনীলমণি সার
এই দুই রসের সাগর।

১। নামান্তর "রসপুষ্প কলিকা" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৮৭)।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

৩। A History of Brajabuli Literature, Sukumar Sen, Calcutta University Press, 1935, পৃঃ ৩০৭-৮।

৪। 'প্রচণ্ড' পুঁথি।

৫। —ঙা।

নামামৃত আছে ইথে শুনি সাধুমুখাদিতে
আস্বাদিতে লোভ বাঢে মোর ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন বন্দো দোঁহার চরণ
দোঁহে মোরে হও কৃপাবান।
নাহি কিছু অধ্যয়নে দুষ্টদীর্ঘজ্ঞানহীনে
তভু চেষ্টা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥
খর্ব হঞা চাঁদ যেন ধরিবারে করে মন
তেন বাঞ্ছা হএত আমার।
যদি দয়া করি সভে পড়িয়াছি অতি লোভে
নিবেদন করোঁ বারবার ॥
কহিতে শৃঙ্গার রসে মনে হয় অভিলাষে
শুভদৃষ্টে দয়া কর মোরে।
নায়ক নায়িকাগুণ আর ভাবনিরূপণ
রস প্রেমদশাদি-বিস্তারে ॥
উজ্জ্বলগ্রন্থ অনুসারে বিদগ্ধমাধব আর
সাধু পন্থ ভক্তি যে প্রকার।
এ রস কলিকা নাম ঐ গ্রন্থের আখ্যান
দৈন্যরূপ করিব প্রচার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সেই মোর সুসম্পদ
তাহা বিনু অন্যে নাহি আশ।
যে চরণ বল হৈতে মঙ্গলাচরণ রীতে
কহে দীন নন্দকিশোর দাস ॥

প্রত্যেক "দল" বা অধ্যায়ের শীর্ষে এই পয়ার শ্লোকটি আছে—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

এই পয়ারটী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য স্থলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

রসকলিকায় কয়েকটি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ সম্পূর্ণ ও আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটী নন্দকিশোর ভণিতায়। এই দুইটী গ্রন্থকারের রচিত বলিয়াই মনে হয়। শ্রীরাম ভণিতায় একটী পদ আছে। কবিরঞ্জনের একটী এবং গোবিন্দদাসের সাতটী সম্পূর্ণ এবং তিন চারিটী অসম্পূর্ণ পদ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত এই পদাংশটীও আছে—

সেই পরাণনাথ পাইলুঁ। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ ধ্রু ॥

রসকলিকায় শেষভাগে যে বংশীচৌর্য্যাদিলীলা বর্ণিত আছে তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থাদি অবলম্বনে বিরচিত।

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ।

রসশিরোমণি রাধা কৃষ্ণ দুই জন। দোঁহার বিলাস কিছু করিল বর্ণন ॥
আমি অজ্ঞ দুরাচার বড়ই অধম। অসৎ ধারণে সদা মনের গমন ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে অনেক শুনিল। সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল ॥
অভিলাষ ক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন। দোষ না লইবে কেহো মুঞি অজ্ঞ জন ॥
যদি কোন রস ক্রমবিপর্য্যয় হয়। সে রস বৈষ্ণব সব করিবে নির্ণয় ॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতি বড় হীন। রস কিছু নাহি বুঝি অতি অপ্রবীণ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ। এ রসকলিকা নন্দকিশোর প্রকাশ ॥

[১১২]

লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুবাদ করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে অকিঞ্চন দাস নাটকটীর আর একটি অনুবাদ রচনা করেন। অকিঞ্চন দাসের গ্রন্থের একখানি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-শালায় আছে।[১] তাহা অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা যাইতেছে।

লোচন টানা অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার লক্ষ্য বেশি ছিল শ্লোকগুলির উপর। অকিঞ্চন দাস অঙ্ক ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, সুতরাং এই হিসাবে এবং নাটকের ধারাবাহিকতা হিসাবে অকিঞ্চনের অনুবাদ অধিকতর মূলানুযায়ী। কিন্তু লোচনের কবিত্ব শক্তি অকিঞ্চন দাসের ছিল না। সেই জন্য কাব্যাংশে অকিঞ্চনের গ্রন্থ মূল্যবান নহে।

প্রত্যেক অঙ্কের শেষে অকিঞ্চন এই ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

প্রথমে বেণুরধ্বনি করিল প্রকাশ। নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চন দাস ॥

কাব্যের বন্দনা অংশ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান। তাঁর পাদপদ্মে মোর অনন্ত প্রণাম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপ প্রকাশ। কৃপা করি মো অধমে কর নিজ দাস ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তশিরোমণি। যাহার প্রসাদে ধন্য হইল ধরণী ॥
শিরের উপর বন্দো তাঁহার চরণ। কৃপা কর মো অধমে লইনু শরণ ॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি সর্ব্বজনে গাই ॥
চৈতন্যের ভক্ত যত পরিষদগণ। অগণ্য অনন্ত যত কে করু গণণ ॥
তা সভার পদ বন্দো দন্তে তৃণ ধরি। নিজগুণে কৃপা কর দাসে অঙ্গীকরি ॥
জয় সনাতনরূপ ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
ইহাঁ সভার পদধূলি বন্দো শিরোপরি। চরণমাধুরি তাহা কি বলিতে পারি ॥
এ সভার পদধূলি যে লয় শরণ। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ ॥
একত্রে করিনু সেই ছয়ের বন্দন। আমার প্রভুর প্রভু হয় এক জন ॥
পূর্ব্বে তিন মধ্যে তাঁর করিনু বন্দন। পুনরপি বন্দো তাঁর যুগল চরণ ॥

ইহা হইতে জানিতে পারি যে কবি ছয় গোস্বামীর মধ্যে অন্যতমের প্রশিষ্য। অকিঞ্চন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন কি ?

১। পুঁথি সংখ্যা ১৫১২।

সন্ধ্যালাপ

-শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

মধ্যযুগের অবসানকালে ইউরোপের দুঃসাহসিক নাবিকগণ "সোনার দেশের" কাহিনী শুনিয়া অকূল অজানা সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিল একটি স্বপন-ঘেরা দেশ আবিষ্কারের আশায়। "সোনার দেশ" তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই—স্বপন তাহাদের সার্থক হয় নাই। কিন্তু যাহা তাহারা আবিষ্কার করিল তাহা তাহাদের আশারও অতীত।

জীবনসমুদ্রে বিভাসও দুঃসাহসিক নাবিক। কিশোর বয়স হইতে সে বাহির হইয়াছে সেই অখণ্ড সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে, যাহার খণ্ড খণ্ড টুকরা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে বিশ্বের সুন্দরীদের রূপের ছায়ায়। সে উপলব্ধি করিতে চায় সেই গভীর প্রশান্তি, যাহা মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। সে অনুভব করিতে চায় সেই বিপুল পুলক, যাহা যুগে যুগে মানুষের আশা ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, কিন্তু কখনও ধরা দেয় নাই। সে পাইতে চায় সেই আদর্শ পরিপূর্ণতা, যাহার অস্তিত্ব বিশ্ব-সংসারে নাই। যাহা পাইবার নয় তাহাই পাইবার জন্য এমন একটা আকুতি সকলেরই জীবনে জাগে—কিন্তু যৌবনে পা দিতে না দিতে কৈশোরের স্বপ্ন মায়া-মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া যায়। বাস্তব জীবনের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও যে দুই চারি জন লোকের মন হইতে সেই স্বপ্নের ঘোর কাটে না, বিভাস তাহাদেরই একজন।

ব্যারিষ্টারীকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশ-বিদেশে তাহার হারানো আদর্শকে খুঁজিয়া বেড়ানই তাহার ব্যবসা। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ব্যারিষ্টারী সুরু করিয়া ছয় বৎসরের মধ্যে সে তিন বার জায়গা বদলাইয়াছে। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে কলিকাতায় তিন বৎসর হাইকোর্টে যাতায়াত করিবার পর সে পাড়ি দিল একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, বোম্বে। দুই বৎসর সেখানে প্র্যাক্‌টিস্ করিবার পর যখন সে বেশ গুছাইয়া লইয়াছে, তখন চলিয়া আসিল লক্ষ্ণৌয়ে। আসিবার উপলক্ষ্য হইল অযোধ্যা প্রদেশের এক ধনী তালুকদার বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। কয়েক লাখ টাকা আয়ের বিহারের এক বহু-বিস্তৃত জমীদারীর তিনি দাবীদার। অনেক দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি বিভাসকে লক্ষ্ণৌয়ে আনাইয়াছেন। তাঁহারই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য বিভাস পাটনায় আসিয়াছে।

বিভাসের মত লোকের পক্ষে নথীপত্র ও মক্কেল লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে বসিয়া থাকা অসম্ভব। সন্ধ্যার রহস্যময় আবছায়া অন্ধকার তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া বাহিরে ডাকে। সে ডাককে উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। লোকালয়ের কোলাহলকে দূরে পরিহার করিয়া বিভাস তখন নদীতীরে বা কোন বিস্তীর্ণ ময়দানে যাইয়া বসে। মনের সাথে বোঝাপড়া করিবার এই তাহার সময়। বিভাসের সৌন্দর্য্যবোধকে তৃপ্ত করিতে পারে এমন জায়গা পাটনায় খুব কম। সরকারী আফিস আর কর্ম্মচারী মিলিয়া গঙ্গা-তীরকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। সেই একচেটিয়া অধিকারের ক্ষীণ প্রতিবাদ স্বরূপ আধ মাইলটাক একটা সরু পথ মেডিকেল কলেজ হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহারই শেষ প্রান্তে বিভাস বসিয়া ছিল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলেজের ছেলেরা মেসে হষ্টেলে ফিরিয়াছে। পথ নির্জ্জন। ভাদ্রের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ বিভাসের মুখের উপর পাণ্ডুর আভা ফেলিয়াছে। সে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া নিজের মনের অজানিতে কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় অধ্যাপক অবনী তাহার এক বন্ধুকে লইয়া উপস্থিত হইল। অবনী আর বিভাস এক সঙ্গে এম-এ পড়িত। অবনী বিভাসের কাছে আসিয়া বলিল—দেখতো বিভাস কাকে এনেছি।

বিভাস উঠিয়া দাঁড়াইল। অবনীর বন্ধুর মুখের উপর টর্চ্চলাইটের ধরণে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বন্ধুটি চোখ তুলিয়া চাহিলেন। চোখাচোখি হইতেই দুজনের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল।

বিভাস কহিল—চোখে দেখে মনে হচ্ছে হারানো বন্ধু, কিন্তু নাম-ধাম কিছু মনে করতে পারছিনে।

বন্ধুটি কহিলেন—মনে পড়বার কথাও নয়। পনর বছর আগে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কৃষ্ণনগরে।

একটু ভাবিয়া লইয়া বিভাস বলিল—পনর বছর আগে কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাড়ীতে কি? আপনি কি শ্রীরূপ?

—ঠিক ধরেছেন। আপনার কোন লেখা যখনই পড়ি, তখনি আপনার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু লেখার সঙ্গে আপনার সে সময়কার চেহারাটার কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারি নি কখনো।

—কি করে পারবেন? তখন ছিলাম বৈরাগী—মনের তার ত্যাগের সুরে বাঁধা।

—শুধু মনের সুর নয় হে অবনী! ওঁর চেহারাটাও একটা দেখার মতন জিনিষ ছিল। পূজার ছুটীতে মামাবাড়ী গিয়েছি বেড়াতে। আমার সমবয়সী এক মামাতো বোন বললে, দাদা দেখে এস লাইব্রেরী-হলে এক অদ্ভুত জীবের আবির্ভাব হয়েছে। দাদামশায়ের লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি মাথা মুড়ান, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা পরা একটি ছেলে খালি গায়ে মেঝেয় বসে একখানি পুঁথি নকল করছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইলেন। আমাকে ডেকে বললেন—দেখুন আপনার ঘণ্টাখানেক সময় আছে হাতে? আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—কেন বলুন তো? উনি বললেন—কুমারসম্ভবের একটা নূতন টীকা পেয়েছি, একটু যদি ডিক্টেট করেন, ঘণ্টা খানেকেই আমার দরকারী অংশটুকু লিখে নিতে পারি। ওঁর কথা শুনে লজ্জায় তো আমার মাথা কাটা গেল। আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম—আমি সায়েন্স পড়ি, সংস্কৃত অক্ষর তো চিনি না। উনি হেসে বললেন, সায়েন্স পড়েন—তা হলে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন—ফাঁকী দিয়ে পাশ করেছিলেন বুঝি? এমন সময় আমার সেই মামাতো বোন সুধা পর্দ্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বলল—আপনি আমার দাদাকে অপমান করেছেন কেন? দিন আমি ডিক্টেট করছি। উনি মাথা নীচু করে বললেন—আজ্ঞে না, আমি মেয়েদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিই না।

কথার মাঝখানে বিভাস বাধা দিয়া বলিল—সেদিন আপনারা ভাইবোনে আমার উপর খুবই রাগ করেছিলেন, না? কি করব, তখন যে আমার মনে সব সময়ে জাগত ছোট হরিদাসের কথা, যিনি এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছে ভিক্ষা নিয়েছিলেন বলে মহাপ্রভু তাঁর মুখ দেখা বন্ধ করেছিলেন। জানেন শ্রীরূপ বাবু, আপনাদের সাথে সেদিন যে রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম, তা ভেবে এখন আমি লজ্জা পাই। সুধাদেবীর সেই দৃপ্ত মূর্ত্তি, আমার পানে উপেক্ষা ও করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যাওয়া আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই জন্যই ত কৃষ্ণনগরের কথা বলতেই আপনার নাম মনে পড়ল।

অবনী এতক্ষণ ইহাদের দুই জনের অতীত স্মৃতির রোমন্থন-ধ্বনি চুপ করিয়া শুনিতেছিল। আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কহিল—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে হে বিভাস! কৃষ্ণনগরে যখন পড়তে তখন কি প্রায়ই তোমার সঙ্গে সুধাদেবীর দেখাশুনো হত না কি?

বিভাস জবাব দেবার আগেই শ্রীরূপ কহিল—আমার সঙ্গে যেমন সেই প্রথম দেখা, সুধার সঙ্গেও তাই। ঘটনাটার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও রোমান্স কিছু ছিল না।

বিভাস বলিল—রোমান্স যে একেবারে ছিল না তাই বা বলি কেমন করে? কৃষ্ণদয়াল বাবুর লাইব্রেরীটা ছিল কৃষ্ণনগরে আমার সবচেয়ে বেশী আকর্ষণের বস্তু। একটু সময় পেলেই লাইব্রেরীতে গিয়ে হাতে লেখা পুঁথির স্তূপ খুলে বসতাম। যখন খুব মন দিয়ে পড়ছি বা লিখছি, তখন হয়ত পর্দ্দার আড়াল থেকে চুড়ির রুমুঝুমু ধ্বনি এসে কানে পৌছাত। মনে হত, যুগে যুগে যারা মুনি ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করেছে, তাদেরই একজন এসে আমাকে প্রলুব্ধ করছে। পড়া থেকে মনটা যত আলগা হয়ে যেত, তত বেশী রাগ হত অন্তরাল-বর্ত্তিনীর উপর। তাই সেদিন যখন সুধাদেবী বাইরে এসে আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন, তখন এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগের ঝালটা গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। রাগ আর অনুরাগ যখন আকর্ষণের এপিঠ আর ওপিঠ, তখন সুধাদেবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটাকে রোমান্স বলতে আর দোষ কি?

রোমান্সের গন্ধ পাইয়া সাহিত্যের অধ্যাপক অবনী একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল—তখন তুমি কোন্ ইয়ারে পড় বিভাস?

বিভাস চুপ করিয়া রহিল। শ্রীরূপ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—ওঁর বোধ হয় তখন ফার্ষ্ট ইয়ার, আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।

অবনী বলিল—ওঃ ফার্ষ্ট ইয়ার! ছেলেদের অবস্থাটা তখন হয় ঠিক যেন সদ্য ডিমের খোলস ছাড়া পাখীর ছানার মত। মুক্ত বায়ু, প্রচুর আলো, প্রাণে স্বাধীনভাবে উড়বার অদম্য ইচ্ছা, অথচ তখনও ডানার জড়তা কাটে নি—তাই পদে পদে বাধা। তা ও-বয়সের রোমান্সটা চুড়ির আওয়াজকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে বটে।

বিভাসের বোধ হয় এ সব কথার দিকে মন ছিল না। সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়া বলিল—থাকুক পুরাতন কথা। অতীতকে নিয়ে টানাটানি না করে বর্ত্তমানে ফিরে আসা যাক্। নিতান্ত ঘরোয়া কথা দিয়েই আলাপ সুরু করি, কি বলেন শ্রীরূপবাবু! আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি বলুন।

শ্রীরূপ একটু হাসিয়া বলিল—মাত্র একটি মেয়ে।

বিভাস যেন তাহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—মাত্র একটি মেয়ে—বলেন কি? কতদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে আপনার? মেয়েটি কত বড়?

—মেয়েটি এই বছর চারেকের হবে। বিয়ে আট বছর হ'ল হয়েছে। আপনার ঘরের খবর কি?

—আমি অক্ষরে অক্ষরে মনুর আদেশ পালন করেছি—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"; আমিও আট বছর আগে বিয়ে করেছিলাম—দুটি ছেলে একটি মেয়ে দেশকে উপহার

—উপহার দিয়েছেন, ঠিক জানেন? যদি কিছু মনে না করেন ত বলি নিরন্ন পঙ্গু দেশের গলায় আরও তিনটি জীবের ভার ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এরা অন্ন উৎপাদন করবে না, বরং যারা উৎপন্ন করে তাদের শোষণ করবে। এ দেশের আর্থিক জীবনে ভদ্দরলোকের সন্তানেরা এই করতেই জন্মগ্রহণ করে।

—শোষণ নয়, পোষণ করতে এরা জন্মায়। ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তানকে যদি আজ মেরে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে চাষী-মজুরদের অন্নকষ্ট দূর হবে না; বরং তাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের যে একটু আশা দেখা যাচ্ছে তাই দূর হবে। ভদ্রলোকের নেতৃত্ব ছাড়া চাষী-মজুরদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে, এমন কোন দেশের নাম আপনি করতে পারেন? ফরাসী বিপ্লব, চীনের জাগরণ, কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা সব কিছু করেছে যে, ছাত্র, উকীল, ডাক্তার অধ্যাপকের দল।

—যুগ যুগ ধরে শত সহস্র ভদ্দরলোক গরীবদের যে শোষণ করে এসেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি দু'চার জন মিরাবোঁ, দাঁতে, মারা, সান্‌ইয়াৎসেন্, লেনিনের জীবন দিয়েই শেষ হয়ে যাবে? পরশুরামের একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার মত করে তিন সাত্তে একুশবার ভদ্রলোকদের কচুকাটা করতে পারলে তবে চাষী-মজুরেরা নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার করতে পারবে।

—শ্রীরূপ বাবু! উত্তেজনাবশে ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার পরশুরামের উদাহরণটা দুদিক ধারালো তরোয়াল। পরশুরামকে যে একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করতে হয়েছিল তা থেকেই প্রমাণ হয় যে ক্ষত্রিয় না থাকলে ধরার চলে না। তেমনি শুধু চাষী-মজুর নিয়ে সমাজ বেঁচে থাকতে পারে না। রাশিয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রায় উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও রাষ্ট্র এক নূতন ভদ্রশ্রেণীকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। এরা কবি, শিল্পী, অভিনেতা, বৈজ্ঞানিক, ঔপন্যাসিক। যখন চাষী-মজুরেরা দিনান্ত পরিশ্রম করেও পেট ভরে খেতে পায় না, শীত নিবারণের বস্ত্র পায় না, তখনও সমবায় ভাণ্ডার থেকে তাদের মাখন-রুটি দেওয়া হয়।

—সমাজ-জীবনে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনকে অস্বীকার করি না, কিন্তু ভদ্দরলোকের ঘরেই যে তাঁদের জন্ম হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। আর যদিই বা তা থাকে, তবু কবে কোথায়, এঁরা জন্মাবেন বলে একটা বিরাট শোষক সম্প্রদায়কে চাষী-মজুরদের বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে।

—ভদ্রসন্তানদের একটা দিকই একান্ত করে আপনার চোখের সামনে ভাসছে। আপনার মত লোকও যে ভদ্রসন্তান এবং দেশ যে আপনাদের জাতকে কিছুতেই ধ্বংস হতে দিতে পারে না সেটা ভাবছেন না কেন?

—খুব বেশী করে ভেবেছি বলেই আমাদের ভদ্দরলোকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে উঠেছি মিঃ চৌধুরী! অনেক দিন ধরে পরাধীন থাকার ফলে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে, চাকুরী ছাড়া আমাদের গতি নাই, কেন না

চাকুরী ছাড়া এমন নিশ্চিত আরামটুকু আর কিছুতে পাওয়া যায় না বলে আমাদের ধারণা জন্মেছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যে যে সাহস, যে বীর্য্যের প্রয়োজন তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মত দুর্ব্বল মানুষ লোকের আর সমাজে প্রয়োজন নেই বলেই আমি কতকগুলি অপোগণ্ডের সৃষ্টি করিনি।

—কথাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিযোগের মতন শোনাচ্ছে যেন শ্রীরূপবাবু! আপনার সাথে আর একটু ভাল করে না মিশলে, আপনার অভিযোগের মূল কোথায় ধরতে পারছি নে। কি হে অবনী, একেবারে যে চুপচাপ! ঘুমিয়ে পড়লে না কি?

অবনী হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিল। তাহার হইয়া শ্রীরূপই উত্তর দিল—ঘুমোয় নি, কিন্তু চাকুরী বজায় রাখতে হলে এ রকম কথাবার্ত্তায় ওদের ঘুমের ভাণ করে থাকতে হয়।

অবনী এইবার মাথা তুলিয়া বলিল—বল বাবা, যত খুশী বল, ভগবান তোমাদের স্বাধীন ব্যবসা করতে সুযোগ দিয়েছেন—প্রাণ খুলে আলাপ কর। কিন্তু তোমাদের আলাপের আরম্ভটা যেমন মনোরম হয়েছিল, তাতে ভেবেছিলাম আজ সন্ধ্যাটা বেশ জমাট রকমের মধুর হয়ে উঠবে। আচ্ছা বিভাস! একবার ত জিজ্ঞাসাও করলে না সুধাদেবী এখন কেমন আছেন, কোথায় আছেন?

বিভাস একটু উদাস স্বরে বলিল—ইচ্ছা করে না জিজ্ঞাসা করতে। বাঙ্গালীর মেয়ে—কেমন আবার থাকবে? বেশ জানি হয় ত ভাল ঘরে, ভাল বরে বিয়ে হয়েছে, দু'একটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, বসে বসে খেয়ে তাঁর মেদবৃদ্ধি হচ্ছে; সে ঠাকুর-চাকরকে ধমকায়, স্বামীর উপর শাসন চালায়, গহনা গড়ায়, আর মেয়েদের মজলিসে বসে পরের কুৎসা করে। আর নয় ত গরীবের সংসারে এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে রোগে শোকে জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছে—দৈন্য আর অভাবের মধ্যে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে বাইরের দিকে তাকাবারও অবসর নাই। সে এখন যেমনটি থাক, যার চোখে সেদিন আমি উপেক্ষা আর করুণার অপরূপ মিলন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে আর আজ বেঁচে নাই। কোন এক সময়ে যাদের ভাল লেগেছিল, কিছুদিন পরে তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখি, যাকে ভাল লেগেছিল সে মারা গিয়েছে, তার কাঠামটা নিয়ে কে একজন অপরিচিত লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

খুব একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা নেড়ে বিভাস যেন তার মনের আসন্ন বিষাদের ছায়াটাকে হটিয়ে দিয়ে বলিল—যাক গে সব বাজে কথা। আপনাকে বড় ভাল লেগেছে শ্রীরূপ বাবু। আপনি এখানে কি করেন? অবনীটা তো আপনার সাথে পরিচয়ও করিয়ে দিলে না!

অবনী বলিল—বিনা পরিচয়েই এমন জমিয়ে তুলেছ যে তোমাদের দু'জনার মাঝে নিজেকে যেন intruder বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি আমার ভুল শোধরাতে যাই তবে কি রকম দেখাবে জান? যেন ফুলশয্যার রাতে বরের সঙ্গে বধূর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মত।

অবনীর কথায় শ্রীরূপ ও বিভাস উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। এই সরল হাসির মধ্য দিয়া যেন তাহাদের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল। রাত্রি অনেকখানি হইয়াছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গার অপর পারে যে দুই একটি আলো মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল তাহাও নিভিয়া গেল। বন্ধুরা বৈঠকী সন্ধ্যালাপ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

নারীর আদর্শ

...প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের নারীজাতিকে আধুনিক করিয়া তুলিবার উদ্যম, যদি সে-উদ্যম নারীকে সীতার আদর্শ হইতে দূরে লইতে চাহে, একেবারেই ব্যর্থ!...

—বিবেকানন্দ

মাইক্রোনেসিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চলে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জকে মাইক্রোনেসিয়া নামে অভিহিত করা হয়। মাইক্রোনেসিয়ায় এমন অনেক দ্বীপ আছে, যাহাতে ইহার পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয়ান পদার্পণ করেন নাই। লিগ অব নেশনস্ হইতে অনেকগুলি দ্বীপের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য জাপানকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং অনেকের মতে জাপান এই অঞ্চলে রণতরী-বহরের একটা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছে। মেজর বড্লের বিবরণ হইতে মাইক্রোনেসিয়া-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ভ্রমণ-কাহিনী উদ্ধৃত করা গেল।

"ভ্রমণের সুবিধা আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এই শতাব্দীর প্রথমে যে সকল স্থান প্রায় অজ্ঞাত ছিল, বর্ত্তমানে সে সকল স্থানে বড় বড় 'লাইনার' যাতায়াত সুরু করিয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানের লোকের চোখে শ্বেতকায় মানুষেরা এতই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক স্থানেই তাহাদের আগমন নূতন ঘটনা বলিয়া আর গণ্য হয় না।

"আমি চার বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছি এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। ইউরোপীয়ানেরা যায় নাই এরূপ জায়গা তো বড় একটা দেখি না। মুক্তার ব্যবসায়ী, নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের রপ্তানী-কারক, কফি-চাষী, সিনেমার দল প্রায় সর্ব্বত্রই গিয়াছে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই দুনিয়ায়। কাজেই চার বৎসর পরে যখন সত্যই এমন দেশের সন্ধান পাইলাম, যাহার কথা টমাস কুকের ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে উল্লিখিত নাই, তখন মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, সে অঞ্চলে একবার যাইতেই হইবে।

"কেন এই অঞ্চলে লোক যায় নাই তাহার কারণ আছে। বড় বড় জাহাজের লাইন হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরে অবস্থিত, নিকটতম বন্দর ইয়োকোহামা দু'হাজার মাইল দূরে।

ইয়াপ (সাউথ সি): আদিম অধিবাসীদের মিউনিসিপালিটি-গৃহ
(All Men House)

তা ছাড়া এই দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলি বহুবিস্তৃত মহাসমুদ্রের মধ্যে এরূপ ভাবে দূরে দূরে অবস্থিত যে, ইহার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার চারশো মাইল।

"জাপানী ছোট ছোট মালবাহী জাহাজ ব্যতীত এই অঞ্চলে যইবার অন্য কোনো উপায় নাই। তাও তার কখন যাইবে না যাইবে, কেহ বলিতে পারে না, কারণ তারা

যাইবে তাদের সুবিধামত, ভ্রমণ-কারীর সুবিধামত নয়। মালবাহী জাপানী জাহাজে আরোহী হওয়া যে কত সুখ, যিনি একবার ইহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াছেন, তিনি কিছু বুঝিবেন না। এসব ছাড়া আছে সর্ব্বজন-ভীতিপ্রদ টাইফুন—প্রশান্ত মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাত্যা।

"আমার বন্ধু ওয়ালটার হ্যারিস্ আমাকে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পরামর্শ দেন। জাপানী অধিকারভুক্ত হওয়ার পরে তিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি এখানে আসিয়াছিলেন এবং বোধহয় আমিই প্রথম ইউরোপীয়ান, যে এই ১৪০০ মাইল ব্যাপী দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকটী দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছে।

ইয়াপ (সাউথ-সি): এই সকল প্রস্তরচক্র ইয়াপবাসী কর্তৃক মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। পালাও ইয়াপ হইতে ২৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আর একটী দ্বীপ। কোন আদিম কালে পালাও হইতেই যে এই সকল প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ইয়াপেই এখনও পর্যন্ত কোনও মিশনারীর পদার্পণ হয় নাই।

ইউরোপ বা সিনেমাতে যাহা সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ডাচ-ইণ্ডিজ দ্বীপগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কল্যাণে এসব দিকে এখন বড় বড় লাইনের জাহাজ অনবরত যাতায়াত করে এবং দেশীয় শিল্পদ্রব্য বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়—তাহার অধিকাংশই ভ্রমণকারীদের মধ্যেই বেচিবার উদ্দেশ্যে জাপানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। 'কিউরিও'-বেচাকেনা এখন একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"যখন আমাদের ছোট জাপানী জাহাজ ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে নোঙর করিল এবং ষ্টীমার হইতে নামিয়া লঞ্চে করিয়া আমরা তীরের অভিমুখে রওনা হইলাম, তখনই দেখি জেটিতে দস্তরমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বেই জাপানী কোয়ারাণ্টাইন-অফিসারের নিকট শুনিয়াছে যে, এই জাহাজে একজন শ্বেতকায় লোক আছে এবং সে তীরে নামিতেছে। অনেকে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভেলা বা দেশী নৌকায় চাপিয়া আমাদের জাহাজের কাছে আসিয়া কৌতূহলদৃষ্টিতে জাহাজের ডেক নিরীক্ষণ করিতেছে, শ্বেতকায় লোকটা যদি চোখে পড়ে!

"প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দেশী শিল্পদ্রব্য বা 'কিউরিও' এখানে পাওয়া যায় না। ও সব জিনিষের ব্যবসায় যে চলিতে পারে, তা এই সকল কৃষ্ণকায় লোকগুলির নিকট অজ্ঞাত। সভ্যতার হাওয়া এখনও ইহাদিগকে নষ্ট করে নাই। ক্যারোলিন দ্বীপে কোন জিনিসের কোন ধরাবাধা দাম আছে বলিয়া মনে হইল না, কারণ এখানে মুদ্রার প্রচলন নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত এই সব সরল মানুষ মুদ্রার মূল্য আদৌ বুঝে না। তুমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল কিনিতে চাও—ছাগলের মালিককে একবাক্স সিগারেট দিয়া ছাগলটী লও, অভাবে একখানা সাবান, কিংবা একখানা ছুরি।

"তীরের নিকটেই একটা জাপানী দোকান। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দোকানে মজা দেখিলাম। চামোরো জাতির মেয়ে-পুরুষ জিনিষ কিনিতে আসিয়াছে—সঙ্গে কেহ আনিয়াছে কলার পাতে মোড়া কয়েকটী ডিম, কেহ এক ঝুড়ি পাকা পেঁপে, কেহ বা নাকে দড়ি বাঁধিয়া আনিয়াছে একটী শূকরের বাচ্চা। এগুলির পরিবর্ত্তে তাহারা দোকান হইতে লইয়া যাইতেছে তামাক, রঙীন কাপড়ের ছিট কিংবা চকোলেট বা লজেঞ্চুস।

"ইয়োকোহামা ছাড়াইয়া এ পথে আসিতে প্রথম বন্দর পড়ে সাইপান, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। জাপানের খুবই নিকটবর্ত্তী বলিয়া এস্থানের লোকে অপেক্ষাকৃত সভ্য ও চতুর হইয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সেদিক হইতে সাইপানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। এখানকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলি সমুদ্রবক্ষ হইতেই চোখে পড়ে। জাপানীরা খুব আখের চাষ সুরু করিয়াছে এখানে, এমন কি আখের গুড়

হইতে হুইস্কি চোলাই করিবার একটী কারখানাও খুলিয়াছে।

"আখের গুড় হইতে হুইস্কি, কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? কিন্তু জাপানীরা হটিবার পাত্র নয়। হুইস্কির বোতলগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের হুইস্কির বোতলেরই মত—তার গায়ে লেবেল আঁটা আছে—"খাটী পুরাতন স্কচ হুইস্কি, সাইপানে প্রস্তুত"—এবং সত্তর হাজার কোয়ার্ট এই হুইস্কি প্রতি বৎসর এখান হইতে টকিওতে রপ্তানী করা হয়। কারখানার ম্যানেজার আমাকে কারখানার সর্ব্বত্র দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন এবং একটু গর্ব্বের সুরে বলিলেন যে, আগামী বৎসরে তিনি ঐ ঝোলাগুড় হইতে 'পোর্ট ওয়াইন' চোলাই করিবার মতলব করিতেছেন এবং আশা করেন, ইহাতে কৃতকার্য্যও হইবেন।

"সাইপান ছাড়িয়া আমরা খাড়া পূর্ব্বমুখে চলিলাম, তিন দিনের মধ্যে ডাঙা চোখে পড়িল না, শুধু জল আর জল। বাণিজ্যবায়ু প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া প্রতিপদে আমাদিগকে বাধা-প্রদান করিতেছিল। অবশেষে একদিন আমরা একটি অপরিসর খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া প্রবাল-বাঁধের মধ্যবর্ত্তী স্থির সমুদ্রে নোঙর করিলাম। এই বন্দরের নাম ট্রাক।

"সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জের অন্য সব গুলির মত ট্রাকেরও এমন একটা অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে, যা ঠিকমত বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অথচ যা প্রকাশ না করিতে পারিলে মনকে পীড়া দেয়। জাপানের শাসনাধীনে আসার দরুন এখানে একটা বড় উপকার হইয়াছে এই যে, কোন প্রকারের ট্রপিকাল রোগ এখানে নাই। এমন কি ট্রপিক্সের অতি-সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়াও না। ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশা এখানে নাই।

"কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হাওয়াই ও টাইটি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের যে দুর্দ্দশা সুরু হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়াই ও টাইটি দ্বীপের অধিবাসীদের মত ইহারা মরিয়া উজাড় হইয়া এখনও যায় নাই বটে, কিন্তু চামোরো ও কানাকা জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী দেখা যাইতেছে।

"ট্রাকের একটী গৌরব করিবার বিষয় এই যে, দ্বীপটী টাইফুনের জন্মস্থান। টাইফুন বা ঘূর্ণীঝড় অনেক সময় পাঁচশ মাইল ব্যাস লইয়া বহিতে থাকে এবং বৎসরে কোন কোন ঋতুতে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে প্রলয় বাধাইয়া তোলে। কিন্তু ট্রাক টাইফুনের জন্মস্থান হইলেও বায়ুমণ্ডল এখানে সব সময়ই প্রশান্ত। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া দূরের তালীবনের সহস্র শাখার মধ্যে বাতাসের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতেছে বটে, এখনও কাঁচ শিশুর মতই প্রবাল-সরোবরে ভেলাদের দোল দিতেছে, তাল-নারিকেলের পত্রপুঞ্জ নাড়িয়া খেলা করিতেছে...

"...কিন্তু এখান হইতে একশো মাইল পশ্চিমে যখন গিয়া পড়িবে, তখন ইহার এই শৈশব চলিয়া যাইবে, তখন ইহার

পোনাপি (সাউথ-সি): রহস্যময় অরণ্যাবৃত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই দুর্গ কবে কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা যে এই দ্বীপের বর্ত্তমান অধিবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্মুখস্থ জেলে-ডিঙিগুলি ব্যস্তসমস্ত ভাবে আশ্রয় অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিবে। আরও একশো মাইল দূরে গেলে, তখন বেতার-ষ্টেশন হইতে সকল জাহাজকে ঝড়ের গতি সম্বন্ধে সতর্ক করিতে থাকিবে, বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের নারিকেল পাতার কুটীরে মাথা গুঁজিয়া ভয়ে কাঁপিবে এবং বড় বড় যাত্রীজাহাজ পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে।

"টাইফুন কখনো একদিকে ছুটে না। ট্রাক হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো ফিলিপাইনে শুধু খুব ঝড়-বৃষ্টির উপর দিয়াই গেল, হংকংএ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য জাহাজ-চলাচল বন্ধ থাকিল, কিন্তু হংকংএর নিকটস্থ বন্দর এময়ের (Amoy) সর্বনাশ ঘটিল, অথচ ফরমোসা দ্বীপে শুধু বেতারের মারফৎ ঝড়ের খবর পৌছিল মাত্র।

পোনাপি (সাউথ দি): ভূপ্রদক্ষিণকারী ম্যাগেলানের সমসাময়িক (ষোড়শ শতক) স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকারের প্রবেশ-তোরণ।

"টাইফুনের খামখেয়ালী গতির বিষয় কেহ কিছু বলিতে পারে না ঠিক বটে, কিন্তু টাইফুনের নির্দ্দয় কবলে পড়িলে জাহাজ, গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। আমি দুইবার প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, পুনরায় টাইফুনের সম্মুখীন হইবার ইচ্ছা আমার নাই।

"ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোনাপি নামে একটী দ্বীপ আছে। তাহাতে দুটী আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায়। প্রথম, প্রায় দুহাজার ফুট উচ্চ একটী পর্ব্বত, এ অঞ্চলের প্রায় কোন দ্বীপেই এত উচ্চ পর্ব্বত নাই, আর দ্বিতীয়টী হইতেছে একটী বহু প্রাচীন যুগের দুর্গ। এই দুর্গ কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। কিন্তু একথা ঠিক যে, তাহা এই দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত নয়।

"এই প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কৌতূহলপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন অতি-বৃদ্ধ লোক না কি ইহার গোপনতত্ত্ব অবগত আছে, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস বিদেশীর কাছে তাহা প্রকাশ করিতে নাই। একজন জাপানী স্কুলমাষ্টারের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, একজন বৃদ্ধ লোক তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভুলিয়া গুপ্তকথাটী তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যায়। সেই হইতে এই সংস্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

"এই দুর্গের ধ্বংসস্তূপ প্রায় পাঁচবর্গ মাইল জমি জুড়িয়া অবস্থিত। বড় বড় চৌরস করিয়া কর্ত্তিত প্রস্তরখণ্ডে ইহা নির্ম্মিত। ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে যে এই সকল প্রস্তর আনীত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, দুর্গটী যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। আসলে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রকায় দ্বীপের উপর বাড়ীগুলি নির্ম্মিত। বড় বড় খাল দ্বারা সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত। দুর্গের মধ্যস্থলে একটা বড় প্রাসাদ পূর্ব্বে ঘোর জঙ্গলে আবৃত ছিল, এখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। এক সময়ে এই প্রাসাদে বড় বড় কক্ষ ছিল এবং জল হইতে প্রাসাদে উঠিবার সুবৃহৎ সোপানাবলীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। দুর্গের প্রাচীর তিন চার ফুট পুরু এবং ক্রমশঃ পিছনদিকে ঢালু। পিকিং সহরে এই ধরণের গাঁথুনি দেখা যায়।

"সমুদ্রের ধারে একটী প্রাচীনকালের পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। এক সময় পোতাশ্রয়টী খুব গভীর ছিল বলিয়া বোধ হয়, বড় বড় জাহাজ আশ্রয় গ্রহণ করিত। দুর্গের বাকী অংশ ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গাঁথুনি এত মজবুত যে, ম্যানগ্রোভের জঙ্গলও তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই।

"সাউথ-সিদ্বী পপুঞ্জের সহিত যাহারা পরিচিত, ক্যারোলিন দ্বীপে এরূপ একটী প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্বের বিবরণ তাহাদের নিকট অবান্তর বলিয়া মনে হইবে। আমিও যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন বিশ্বাস করি নাই—দিনের আলোয় না দেখা পর্য্যন্ত।

"এসিয়া মহাদেশের কোন স্থানে প্রাচীন নগর অবস্থিত হইলে তাহা বিস্ময়ের কারণ হয় না, কারণ অনেক সময়েই তাহার একটা ইতিহাসও বাহির হইয়া পড়ে। জাভার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি বুরোবদর দীর্ঘ নয় শতাব্দী কাল অরণ্যাবৃত ছিল, কিন্তু যখন তাহা আবিষ্কৃত হইল, তখন সেটাকে ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ বলে নাই। বুরোবদরের উৎপত্তি ও তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

"কিন্তু সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জে, যেখানকার অধিবাসীরা আবহমান কাল ধরিয়া নারিকেল পাতায় ছাওয়া কুটীরে বাস করিয়া আসিতেছে, এত বড় প্রাসাদ-দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়া সত্যই বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। এই দুর্গ ও পোতাশ্রয় নির্ম্মাণে যে উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্যবিজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্দ্ধনগ্ন স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহার ধারণাও অসম্ভব।

"ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় নাবিকেরা তাহাদের ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে এই রহস্যাবৃত প্রাসাদ-দুর্গের উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে যে, স্থানীয় অধিবাসীরা নিতান্ত বর্ব্বর, তাহাদের মধ্যে অনেকে নরমাংসভোজী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাহাদের অবস্থা এখন অপেক্ষা ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ কিছু উন্নত ছিল না। এই দুর্গের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে আমাদের আরও হয়তো অনেক শত বৎসর পিছাইয়া যাইতে হইবে, হয়তো হাজার বৎসর পিছাইতে হইবে। এসিয়া হইতে আগত কোন সভ্যজাতির কথা ভাবিতে হইবে, যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ছিল, যাহারা বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে ও মহাসমুদ্রের পথে চালনা করিতে জানিত।

"গভীর রহস্যের অনুভূতি লইয়া এই অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ পরিত্যাগ করিলাম। কেহ কোনদিন এ রহস্যের সমাধান করিতে পারিবে কি না কে জানে!

"মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জালুইট নামে একটা ছোট দ্বীপে আমাদের জাহাজ লাগিল। ষ্টিভেন্‌সনের উপন্যাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে ধরণের প্রবাল-দ্বীপের বর্ণনা আছে, জালুইট সেই শ্রেণীর দ্বীপ। প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিধি ব্যাপিয়া প্রবালের একটী বাঁধ, জল হইতে তাহার উচ্চতা তিন ফুটের বেশী নয়। নারিকেল গাছ ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষলতা সেখানে জন্মে না, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়ে নাই। সমুদ্রের জল

সাউথ-সি: মার্শাল দ্বীপবাসী যোদ্ধা।

এত স্বচ্ছ যে, গভীর জলের তলায় সন্তরণশীল রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণের মাছের ঝাঁক স্পষ্ট দেখা যায়।

"এখানে বড় বড় সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলা দেখিলাম। বড়গুলিতে ছোট ছোট ছেলের স্নানের টব হইতে পারে। সমুদ্রের তীরে জোয়ার নামিয়া গেলে এই সব ঝিনুক ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট ঝিনুকও অনেক, কত বিচিত্র তাদের রং, চুণীর মত, ইন্দ্রনীল মণির মত, আর

সব সময়ই প্রবালের বাঁধে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জন ও তীরস্থ নারিকেল শাখার মধ্যে বাণিজ্য-বায়ুর যাওয়া-আসা—সবশুদ্ধ মিলিয়া জালুইটের সমুদ্রোপকূল যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হয়। আমাদের জাহাজ ডাঙার কাছেই নোঙর ফেলিয়াছিল। চাঁদের আলো পড়িয়াছিল প্রবাল সাগরের জলে, আমরা ডেকে বসিয়া নাচগান করিতেছিলাম, জাহাজের কাপ্তেন মাজং খেলায় মত্ত, যেন জীবনে কাহারও কোন দায়িত্ব নাই, বন্ধন নাই।

জালুইট (সাউথ-সি): প্রবাল দ্বীপ। প্রবালপুঞ্জের উপরে ম্যানগ্রোভ জন্মিয়াছে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ কালে এই সকলই দ্বীপে পরিণত হইবে।

মিশনরীরা এ দেশকে সভ্য করিতে ও পশ্চিমের রীতি-নীতির অনুকরণ করাইতে বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিশনারীদের পরস্পর মনের মিল না থাকাতে সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের মধ্যে এত বিবাদ যে, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। অথচ শত শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে দশ বারটির বেশী পাদরী নাই। আমার মনে হয়, ভাল না করিতে পারিলেও ইহারা অনিষ্ট যথেষ্ট করিতেছে। ইতিমধ্যে অনেক স্থানে মেয়েদের সুন্দর ঘাসের পোষাক পরার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, পুরুষেরাও দেহে চিত্র-বিচিত্র উল্কি কাটে না। সৌভাগ্যের বিষয়, পশ্চিম ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে মিশনরীদের এখনও শুভাগমন হয় নাই। প্রস্তর যুগের রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ এখনও তথায় দিব্য চলিতেছে।

"যদি কেহ সাউথ-সি অঞ্চলের এই সব মায়াপুরীতে বেড়াইতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিয়া রাখি যে, ইয়োকোহামা বন্দর হইতে বাহির হইয়া দশ হাজার মাইল ভ্রমণের ব্যাপারে আমার ব্যয় হইয়াছিল মাত্র পচিশ পাউণ্ড। জাহাজ-ভাড়া ও খাই-খরচ এতই সস্তা।"

বাঙ্গালার কৃষক

···ঋণভারের জন্য মুখ্যতঃ কৃষকেরা দায়ী নহে। অবিবেচক ও অমিতব্যয়ী ব'লে বাংলার কৃষকদের গালি দিলে সত্যের অপলাপ করা হয় কারণ তারা সত্যি সত্যি অবিবেচক ও অমিতব্যয়ী নয়। কৃষিঋণের সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যতঃ অন্য কারণে—জমির উর্ব্বরতা হ্রাসের জন্য, জমি বহুধা বিভক্ত হওয়ার জন্য এবং অজন্মা, অতিবর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের জন্য। ব্যয় অনুপাতে আয় না হওয়াতেই বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে যেতে হয়েছে গ্রামের মহাজনদের কাছে···

—শ্রীনবগোপাল দাস (বিষাণ)

অনুস্মৃতি

—শ্রীঊষা বিশ্বাস

সেবারে বড়দিনের ছুটীর আগে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার রণজিৎ মুখার্জ্জী এসে ধরল, ছুটীর ক'দিন তার সঙ্গে তাদের দেশে গিয়ে থাকতে হবে—ছুটীটা তা হ'লে বেশ দু'জনে মিলে শিকার ক'রে ও মাছ ধ'রে কাটান যাবে। আমি তখন মাত্র কয়েক মাস হ'ল বিষ্ণুপুরে বদলী হয়ে এসেছি। এই অল্প দিনের মধ্যেই আমার ও রণজিতের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জ'মে উঠেছিল। প্রথম দিন দেকেই আমার বড় ভাল লেগে গেল এই সরল প্রিয়দর্শন অমায়িক যুবকটিকে। ওর স্বভাবের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, যাতে করে ও মানুষকে দু' মিনিটে আপনার ক'রে নেয়।

এ বছর দিল্লীতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল; নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছি, যাবার খবরও দিয়ে ফেলেছি। এমন সময়ে রণজিতের এই অনুরোধ। অনুরোধ ঠিক নয়, যেন মিনতি। অনুরোধ যদি বা এড়ান যায়, মিনতি এড়ানো কঠিন।

ছুটী হ'তেই দুই বন্ধুতে রওনা হওয়া গেল সকালের একটা ট্রেনে। রণজিৎদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে। গ্রামটি রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে তিন চার মাইল দূরে। ষ্টেশনে গাড়ী থামবার আগেই দেখলাম একটি শুভ্রকেশ, কৃশাঙ্গ, আধবয়সী ভদ্রলোক—"এই যে এই গাড়ীতে রে! তোরা সব তাড়াতাড়ি আয়—চটপট জিনিষ পত্র নামিয়ে ফেল"—ব'লে প্ল্যাটফরমের উপর ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। রণজিৎ পরিচয় দিল—"ইনি আমাদের নায়েব—কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।" ট্রেন থামতেই আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। কমলেশ বাবু আমাকে ও রণজিৎকে সহাস্য বদনে অভিবাদন ক'রে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে আমাদের জিনিষপত্রগুলো লোকজন দিয়ে গাড়ী থেকে নামাতে লাগলেন। আমি ততক্ষণে একবার ষ্টেশনটির চারিদিক দেখে নিলাম। লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফরমটির উপর কয়েকটা লাইট-পোষ্ট, এখানে সেখানে দু' একখানা বেঞ্চিও এবং সামনে ছোট্ট একটি লাল বাড়ী। তারই পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে—অনতিপ্রশস্ত একটি রাস্তা। অদূরে দুই একটি ঘোড়ার গাড়ী যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

জিনিষপত্র নামান হয়ে গেলে কমলেশবাবু এসে বললেন—"আজ্ঞে, আপনাদের গাড়ী ঠিকই আছে। দয়া করে উঠুন এসে।"

আমি বললাম—"বাড়ী কত দূরে? হেঁটে যাওয়া যায় না? এখনও ত রোদের তেজ তেমন হয় নি। দুই তিন মাইল ত আমরা হেঁটেও যেতে পারি। কি বল রণজিৎ? আমাদের আজকের মর্নিং-ওয়াকটাও হ'য়ে যাবে তা হ'লে।"

কমলেশবাবু তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠলেন—"আজ্ঞে না, না, সে আবার একটা কথা হল! আপনারা এই রোদ্দুরের মধ্যে এতটা পথ হেঁটে যাবেন! না, না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না। রোদ্দুর না থাকলে তবু কথা ছিল। তা ছাড়া, গাড়ী যখন রয়েইছে তখন আর মিছিমিছি কষ্টই বা করতে যাবেন কেন?

রণজিৎ স্মিতহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"গাড়ীতেই চল। নইলে কমলেশদার মনে আর স্বস্তি থাকবে না।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে চললাম গাড়ীতে উঠব বলে। আমরা গাড়ীতে উঠলে পরে কমলেশবাবুও সামনের 'সীটে' এসে বসলেন।

পল্লীগ্রামের সেই উঁচুনীচু রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলল ঝাঁকানি দিতে দিতে। গাড়ীতে উঠেই রণজিৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল—মনে হ'ল যেন তার বহু পুরাণো স্মৃতি আজ আলোড়িত হ'য়ে উঠছে—অনেক দিনের অনেক ভুলে যাওয়া কথা যেন আবার জেগে উঠছে তার মনে। গাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকাল দূরের দিকে—যত দূরে চোখ যায়। সেই জনবিরল ছায়াবহুল পল্লীপথ, মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ, শীতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণ, মাথার উপরকার ঘননীল চন্দ্রাতপ, পথের দুই পাশের আবাল্যপরিচিত গাছ-পালাগুলি, উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর,

শস্যক্ষেত্রের শ্যামল শ্রী সব মিলে যেন তার মনের উপর এক অপরূপ মায়াজাল বিস্তার করছে। সতৃষ্ণনয়নে দেখেও সে যেন শেষ করতে পারছে না। গাড়ীতে কমলেশবাবুও বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা বললেন না। সেই মৌনতা ভঙ্গ ক'রতে আমারও ইচ্ছা হ'ল না। আমিও তাই নীরবেই দুই পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। রণজিৎদের বাগানের কাছাকাছি গাড়ীটা যখন এসে পড়ল, কমলেশবাবু তখন সেই দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"আমরা ত বাড়ী এসে পড়লাম ব'লে। ঐ যে আমাদের বাগান দেখা যাচ্ছে।" স্বপ্নোত্থিতের মত রণজিৎ ব'লে উঠল—"বাঃ! এরই মধ্যে বাড়ী এসে পড়ল।"

খানিক পরে গাড়ী এসে থামল মস্ত বড় এক গেটের সামনে। সামনেই সোজা এক রাস্তা চ'লে গিয়েছে। তারই শেষে প্রকাণ্ড বড় একটি বাড়ী। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় জরাজীর্ণ তার অবস্থা। মাঝে মাঝে দেওয়ালের চুণবালি খসে গিয়ে ইষ্টকের শ্রীহীন নগ্ন মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েছে। দুই একটা ফাটলের মধ্যে থেকে ছোট ছোট বট, অশ্বত্থ গাছও গজিয়ে উঠেছে। গাড়ী আসতেই ১৬।১৭ বছরের একটি বালক ভৃত্য ছুটতে ছুটতে এসে গেট খুলে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের দু'জনকে নমস্কার ক'রল। আমরা গাড়ী থেকে নামতেই ক্ষিপ্রহস্তে সহিসের সঙ্গে আমাদের জিনিষ-পত্র নামাতে লাগল।

রণজিৎ বলল চল, আমরা ভিতরে যাই। গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে প'ড়ল—রাস্তার দুধারে অযত্ন-বর্দ্ধিত গাছ-পালাগুলি। এদিকটায় বোধ হয় কোনও এক কালে একটু ফুল-বাগান করতে চেষ্টা করা হ'য়েছিল। সে বাগান আজ হতশ্রী। কয়েকটি জবা, করবী, বেল, যুঁই ইত্যাদি ফুলের গাছ অযত্নেও বোধ হয় মরে নি। তারাই আজ বিগত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গৃহস্বামীর আগমন-সংবাদ পেয়ে বোধ হয় ঘাস ও আগাছা তুলে এদিককার এই বাগানটি একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। আমরা বাড়ীতে ঢুকলে কমলেশবাবু বললেন—"রণজিৎ তোমাদের জন্যে আমি উপরে দক্ষিণদিককার দুটো ঘর পরিষ্কার ক'রিয়ে রেখেছি—তোমার ঘরটা ও তার পাশের ঘরটা। তোমরা যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর গে। তোমাদের জিনিষপত্রগুলো আমি এখনি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জন্যে জলখাবারও ঠিক রেখেছি। একটু চা'ও ক'রে দিতে বলি গে, কেমন!···ওরে, ও গোবিন্দ, এতক্ষণ কি করছিস রে? নিয়ে আয় না বাবুদের জিনিষ পত্রগুলো শীগগির ক'রে?" ব'লে তিনি এক হুঙ্কার ছাড়লেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরে বেশ কয়েক ঘণ্টা দিবানিদ্রা দেওয়া গেল। রণজিৎ এসে যখন আমাকে বিকালে চা খাবার জন্যে ডাকল, বেলা শেষ হ'তে তখন আর বাকী নেই। চায়ের টেবিলে ব'সে ব'সে খানিকটা গল্প-সল্প হ'ল। আমরা যখন চা খেয়ে উঠলাম, তখন একেবারে সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। রণজিৎ বলল—"চল একটা টর্চ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশী দূরে যাব না—বাড়ীর কাছাকাছিই একটু ঘুরে আসব।" বলতে বলতেই চাকর এসে খবর দিল কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। "আমি এখনি আসছি"—বলে রণজিৎ চলে গেল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তার দেখাই নেই; খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে শেষে আমি একাই একটা টর্চ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ী ফিরে এসে দেখি রণজিৎ বৈঠকখানা ঘরে বসে কমলেশবাবুর সঙ্গে গল্প করছে। আমায় দেখেই সে বলে উঠল—"এই যে তুমি এসে পড়েছ! তোমায় খুঁজতে আমি এখনি লোক পাঠাব মনে করছিলাম।" "আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি ভেবেছিলে না কি? বাড়ীর সামনের এই সোজা রাস্তা ধরে একটু ঘুরে এলাম। সারাদিন আজ ত ঘরেই বসে আছি।" বলে আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। আমার ঢুকতে দেখেই কমলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার কথা শেষ হ'তেই আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বললেন—"এখানে এসে আপনার শরীর ভাল আছে ত? আমি ত আর ওবেলা তারপর কোনও খবর নিতে পারি নি। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত এখানে? আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে আপনাকে কি দিয়েই বা আদর-আপ্যায়িত করব?"

"না, না, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আপনাদের আতিথ্যে আমি খুব আরামেই আছি। আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি ত আর আপনাদের পর নই।"

"যাই দেখি রান্নার কতদূর হ'ল। একটু না দেখলে হয় ত ওরা সব ঢের রাত ক'রে ব'সে থাকবে।" বলে কমলেশ বাবু চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই রণজিৎ একটু হেসে বলল—"কমলেশদা একটুতে বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। ওর চিরকালই ঐ স্বভাব।.........বাইরের লোকেরা সব একটু পরে চলে যেতেই আমি তোমার খোঁজে ভিতরে এসে দেখি তুমিও বেরিয়ে গিয়েছ। একা একা বাড়ী বসে কি করি ভাবছিলাম। এমন সময়ে কমলেশদা এল। আমি এতক্ষণ ওর কাছ থেকেই গ্রামের সব খবরাখবর নিচ্ছিলাম। অনেক দিন পরে পরে বাড়ী আসি। বড্ড জানতে ইচ্ছে করে সব খবর।"

এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিল—"রান্না হয়ে গিয়েছে।"

রণজিৎ বলিল—"রান্না হ'য়ে গিয়ে থাকলে আমাদের খাবার দিতে বল গে। মিছিমিছি রাত করে লাভ কি? কি বল, রাজীবদা? খেয়ে দেয়ে না হয় গল্প করা যাবে।"

"বেশ, কোনও আপত্তি নেই।"

যথা সময়ে আমরা খেতে বসলাম। আহারের সময় কমলেশবাবু নিজে বসে থেকে 'এটা খান' 'ওটা খান' করে খুব যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। আমার বড্ড ভাল লাগল এই স্নেহপ্রবণ মানুষটির অনাড়ম্বর আন্তরিকতাটি। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হ'ল রাত তখন সাড়ে আটটা আন্দাজ হবে। কিন্তু সেই অন্ধনিবিড় পল্লীসন্ধ্যা সুগভীর রাতের মত নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ ক'রছে—মনে হ'ল রাত যেন তখন অনেক গভীর হ'য়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে বৃক্ষপল্লবের মর্ম্মরধ্বনি ও বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। মাঝে মাঝে দু' একটা নিশাচর পাখী একগাছ থেকে আর একগাছে উড়ে যাচ্ছে—মধ্যে মধ্যে তাদের ডানা-ঝাপটার শব্দ ও ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ রব সেই বিরাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। দূরে মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই কমলেশবাবু ব'ললেন—"আমি তাহ'লে আজকের রাতের মত আসি, ভায়া। তোমরাও আজ আর বেশী রাত জেগো না। আজ সব ক্লান্ত আছ—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।"

তিনি চলে যেতেই আমি রণজিৎকে বললাম—"বড় স্নেহশীল অন্তর কিন্তু তোমার এই কমলেশদাটির। তোমায় একবারে নিজের ছোট ভাইএর মতই স্নেহ করেন ব'লে মনে হয়। মানুষটি বড়ই অমায়িক।" একটু চুপ ক'রে থেকে রণজিৎ বলল—"শুধু তাই নয়। ও তার চেয়েও ঢের বড়—মহৎ। ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মর্ম্মন্তুদ বেদনার একটি সকরুণ ইতিহাস, যার জন্যে আমি নিজেকেও আংশিকভাবে দায়ী মনে করি। ওর জীবনের ইতিহাসটা আজ আমি তাহ'লে তোমায় বলি?

"সে অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন বছর দশেকের বেশী হবে না। কমলেশদা বাবার কাছে কাজের প্রার্থী হ'য়ে আসে। তোমায় ব'লেছি বোধ হয় আমার বাবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কমলেশদাকে দেখেই বাবার কেমন যেন ভাল লেগে গেল। বিশেষ ক'রে যখন ওর সব কথা শুনলেন বাবার তখন বড় মায়া হ'ল ওর ওপরে। ব্রাহ্মণের ছেলে—ছোটবেলায় মা বাপ ম'রে যায়। পৈতৃক জমিজমা যা কিছু ছিল জ্ঞাতিরা সব ঠকিয়ে নেয়। পড়াশুনা বেশীদূর কর'তে পারে নি—স্কুলে অতি কষ্টে সেকেণ্ড ক্লাস অবধি প'ড়েই পড়া ছেড়ে দিতে হয়।......বাবার হৃদয়টি ছিল ভারী কোমল ও উদার। যদি ভবিষ্যতে কোনও কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারেন এই ভেবে তিনি ওকে কিছুদিন বাড়ীতেই রাখলেন। বাবা মা ওকে ঠিক বাড়ীর ছেলের মতই দেখতেন, আর আমিও জানতাম ও আমার বড় ভাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমাদের বাড়ীতে নিজের স্থান ক'রে নিতে পেরেছিল। মা, বাবা কিংবা আমার—আমাদের—কারুরই ওকে নইলে যেন চ'লতই না। এমন সময়ে আমাদের পুরাণো নায়েব হঠাৎ মারা গেল। মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বাবা ঠিক কর'লেন কমলেশদাকেই আমাদের নায়েবের কাজটা দেওয়া হবে। ওর বয়স তখন কুড়ি একুশের বেশী হ'বে না। কিন্তু বয়স কম হ'লে হবে কি! বাবা দেখলেন একদিকে ও যেমন চালাক চতুর আর একদিকে ও তেমনি সৎ ও ধর্ম্মভীরু। এই ক'মাসের মধ্যেই বাবা ওর বুদ্ধির ও সততার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। সুতরাং আর কোনও দ্বিধা না করে বাবা কমলেশদাকেই নায়েব করে আমাদের জমীদারীতে পাঠালেন। সেই অবধি ও এখানেই আছে। তার বছর

দশেক পরে বাবা কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমাদের এই পৈতৃক বাড়ীতে বাস করতে এলেন। আমি তখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি—সেবার বি-এস্-সি পরীক্ষা দেব। এই সময়ে আমাদের সঙ্গে এল একটি মেয়ে। নাম ছিল তার 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যারও একটু ইতিহাস ছিল।" বলে রণজিত একটু থামিল। তারপর সে আবার বলতে লাগল।

"সন্ধ্যা যখন প্রথম আমাদের বাড়ীতে আসে তখন সে সাত বছরের মেয়ে। ও প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে আসে সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। আমি তখন এগারো বারো বছরের ছিলাম। বাবা তখন মেদিনীপুর জেলায় তমলুকে ছিলেন। সেবার তমলুকে খুব কলেরা হয়েছিল। সন্ধ্যার মা বাবা দু'জনেই একদিনে কলেরা হয়ে মারা যায়। মা শুনতে পেয়ে এই অনাথা মাতৃপিতৃহীন মেয়েটিকে প্রতিপালন করবার জন্যে নেন। ব্রাহ্মণেরই মেয়ে—আমাদের স্বজাতি, মা ওকে নিজের মেয়ের মত করেই মানুষ করছিলেন। আমার দিদিরা সকলেই আমার চেয়ে ঢের বড়—বহুকাল আগেই তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে একটিও মেয়ে নেই বলে মা প্রায়ই দুঃখ করতেন। এমন সময়ে ভগবান তাঁকে জুটিয়ে দিলেন সন্ধ্যাকে। বাড়ীর মধ্যে ছিলাম আমিই সব চেয়ে ছোট এবং একমাত্র পুত্র। কাজেই এতদিন বাড়ীতে আমারই একাধিপত্য ছিল। হঠাৎ কোথাকার কে একটি মেয়ে এসে আমার মার আদরের উপর ভাগ বসাল দেখে প্রথমটা আমার শিশু-মনে যে একটু রাগ বা হিংসে হয় নি তা নয়। তারপর ক্রমে সন্ধ্যার উপরে আমার কেমন যেন একটা মমতা জন্মে গেল। ঝগড়া যে মাঝে মাঝে হত না তা নয়। কিন্তু সন্ধ্যাকে বকলে কিংবা মারলে মা আমায় বোঝাতেন, বলতেন, "ছি! ওকে বকা করতে নেই। ওর মনে কষ্ট হবে। তোমার মা বাবা সবই আছে। কিন্তু আমরা ছাড়া ও বেচারার পৃথিবীতে কেউ নেই, একটু ভালবাসবার, আদর করবার। যা হোক পরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সন্ধ্যার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। সন্ধ্যাও আমার খুব অনুগত হয়ে পড়ল।

"আমি ওকে পড়াতাম, নিজের হাতখরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে এটা ওটা কিনে দিতাম। যত বড় হতে লাগল সন্ধ্যার রূপও ততই যেন ফেটে পড়তে লাগল। যেমনি রং তেমনি নাক-মুখের চেহারা, তেমনি গড়ন! তার পর আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে গেলাম। অনেকদিন পরে যখন ছুটীতে বাড়ীতে এলাম, সন্ধ্যা আর তেমন করে আমার কাছে এল না। এতদিন পরে আমায় দেখে ওর বোধ হয় একটু লজ্জা ও সঙ্কোচ হয়ে থাকবে। আমি কোন কথা জিজ্ঞেস করলে কোন রকমে তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিয়েই চলে যেত। কিন্তু আমি যখন ঘরে থাকতাম না, তখন ও লুকিয়ে লুকিয়ে আমার পড়ার টেবিল গুছিয়ে দিত—আমার জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে রাখত। আমিও ওকে কখনও কখনও বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, ব্রোচ, ক্লিপ ইত্যাদি উপহার দিতাম। একটু মিষ্টি করে আদর করে কথা বলতাম। সন্ধ্যার উপরে আমার তখনকার মনের ভাবটিকে ঠিক প্রেম বলা চলে না—এ যেন আমার সেই নবজাগরণ-চঞ্চল কিশোর হৃদয়ের স্বপ্নমোহমদির প্রেমতৃষার প্রথম উন্মেষ—বিকচোন্মুখ যৌবনের নবারুণরাগের প্রথম আভাস। তারপর বাবা যখন কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেশের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন, সন্ধ্যা তখন পনেরো ষোল বছরের মেয়ে। মা বাবা ওর বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জানই ত, আমাদের বাংলাদেশে ওরকম অনাথ মাতৃপিতৃহীন মেয়ের বিয়ে দেওয়া এক কঠিন ব্যাপার। অথচ অত বড় মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখাও চলে না—বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে। ওর একটা ভাল মত বিয়ে দিতে না পারলে মা বাবা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। মা একদিন কমলেশদাকে ডেকে বললেন "কমলেশ, বাবা, সন্ধ্যার জন্যে একটা ভাল পাত্তর-টাত্তর দেখো। ও ত দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। এখন ত আর ওর বিয়ে না দিলে চলছে না! ওর একটা ভাল মত বিয়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। আমরা আর কিছুই চাই না। ছেলেটি যেন বেশ সচ্চরিত্র হয়—সন্ধ্যার খাওয়া-পরার যেন কোনও কষ্ট না হয়। দেখ ত' একটু সন্ধান করে—তোমার জানাশোনা যদি কেউ ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়। মেয়েটি বড়ই লক্ষ্মী! পড়াশুনাও মোটামুটি একরকম শিখেছে। ঘরকন্নার কাজ ত' বেশ ভালই জানে। তা ছাড়া সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমাদেরই স্বঘর।"

কমলেশ মাথা নীচু করে বলল—"আজ্ঞে আপনারা যদি আমাকে খুব অযোগ্য না মনে করেন ত আমিই সন্ধ্যাকে বিয়ে-

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বলে উঠলেন, "তুমি সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চাও? এ ত খুব ভাল কথা! সন্ধ্যার জন্যে তোমার চেয়ে ভাল পাত্তরই বা আমরা পাব কোথায়? ওর তা হলে কপাল ভালই বলতে হবে।"

সেদিন দুপুরে বাবা ভাত খেতে বসেছেন। মা সামনে বসে একখানা হাতপাখা নাড়ছেন ও খাওয়া দেখছেন, মা বললেন—"ওগো শুনেছ, কমলেশ সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চায়।"

বাবা শুনে বললেন—"তাই ত! কমলেশের কথা এতদিন আমাদের মনেই হয় নি! ওকে ত আজ এত বছর ধরে দেখে আসছি। ভারী চমৎকার ওর স্বভাবটি কিন্তু। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সন্ধ্যা সুখেই থাকবে।"

মা বললেন, "তা সন্ধ্যাকেও একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।"

"ওকি স্বয়ংবরা হবে না কি? ওকে আবার কি জিজ্ঞেস করবে?"

"না না, ও বড় হয়েছে। ওর মতটাও জানা দরকার বই কি। তবে একটা কথা, বয়সে ওদের দুজনের খুব তফাৎ হবে কিন্তু; কমলেশ সন্ধ্যার চেয়ে অন্ততঃ ১৫।১৬ বছরের বড় হবে।"

—"তা ওরকম ত হয়েই থাকে।"

"মা একদিন সন্ধ্যাকে কাছে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লেন। শুনে সন্ধ্যা প্রথমটা কোন কথা বলল না, তার চোখ দিয়ে খালি টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মা তাকে অনেক আদর করে শান্ত করলেন। তারপর সে বলল, "মা, আমি বিয়ে করব না।"

"বিয়ে করবে না, সে আবার একটা কথা হল! আমরা ত আর মা, চিরকাল বাঁচব না, বুড়ো হয়েছি, তোমার একটা ভালমত বিয়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। আর কমলেশ ছেলেটিও বড্ড ভাল। ও তোমায় খুব যত্নে রাখবে।"

"আমি কমলেশদাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।"

"তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা সূচিত হল। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?" কোনও কথা না বলে সন্ধ্যা নীরবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বললেন "আচ্ছা কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখো। ওর চেয়ে ভাল ছেলেই বা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে! যার তার হাতে ত আর তোমায় দেওয়া যায় না। অথচ বিয়ে দিতেই হবে।" শেষের কথা কয়টি মা যেন কতকটা নিজের মনেই বললেন।

"তারপর মাস দুই কেটে গেল। মা বাবা সন্ধ্যাকে খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন কমলেশদাকে বিয়ে করবার জন্যে। কমলেশদাকে তার বিয়ে না করতে চাওয়ার কোন সঙ্গত কারণও তাঁরা খুঁজে পেলেন না। তাঁরা মনে করলেন বালিকাসুলভ লজ্জাবশতঃই বোধ হয় সন্ধ্যা বিয়ে করতে আপত্তি জানাচ্ছে। তার পর মা তাকে অনেক বোঝাতে লাগলেন, অনেক ভয়ও দেখালেন। শেষে কি জানি কি ভেবে সে—কমলেশদাকে বিয়ে করতে রাজী হল। মা বাবাও নিশ্চিন্ত হলেন। যাতে ওদের অবস্থা আর একটু স্বচ্ছল হয় সেজন্যে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ বাবা সন্ধ্যার নামে কিছু জমিও লেখাপড়া করে দিলেন। মাও বিয়ের সময় সন্ধ্যাকে গা সাজিয়ে গয়না দিলেন, নিজের দু' একটি অলঙ্কারও উপহার দিয়েছিলেন। যা হ'ক কমলেশদার সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল। আমি তখন বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতেই ছিলাম, বিলেত যাবার উদ্যোগ করছিলাম। সন্ধ্যার বিয়ের কথা শুনে আমার মনটা কেমন করে উঠল। "—কি জানি কেন, এ'তে আমার অন্তর যেন তেমন সায় দিল না! হয় ত' বা নিজের অজ্ঞাতে দুই একটি দীর্ঘ শ্বাসও পড়ে থাকবে—কোন্ এক অজানা ব্যথায়। যা হ'ক সন্ধ্যার বিয়েতে ক'দিন ধরে কোমর বেঁধে আমি খুব খাটলাম। মনে পড়ে বিয়ের পরে সন্ধ্যা যেদিন আমাদের বাড়ী থেকে চলে যায়, মা সেদিন তার সব জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ করে দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তার খোঁজ পড়েনি। তারপর যখন যাবার সময় হল, তখন তাকে আর সারা বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় না! শেষে দেখি সে ঠাকুরঘরে গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে ঠাকুর প্রণাম করছে—আর তার দুই গণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝ'রছে। জানি না সেদিন

ঠাকুরের পায়ে সে কি নিবেদন করছিল! এ দৃশ্য দেখে আমি প্রথমে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—ভেবে পেলাম না কি করব। পরে ধীরে ধীরে ডাকলাম—"সন্ধ্যা", "সন্ধ্যা"। আমার ডাকে সন্ধ্যা চমকে উঠে ত্রস্তে উঠে বসল—তাড়াতাড়ি চোখ মুছে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করল। তারপর সেখান থেকে উঠে এসে আমাকে প্রণাম করবার জন্যে আমার পাদস্পর্শ করল—দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল আমার পায়ের উপরে। প্রণাম করেই সে এক রকম ছুটে সেখান থেকে চলে গেল।

"তারপর, কিছুদিন পরে আমি বিলেত চলে যাই। বিলেত যাবার আগে সন্ধ্যা একদিন তার বাড়ীতে আমায় নেমন্তন্ন করে নিজের হাতে রেঁধে খুব যত্ন করে খাইয়েছিল—আমি যা' যা' খেতে ভালবাসি। বিদায়-কালে প্রণাম করে আমার কাছে চেয়েছিল আমার একখানি ফোটো। তার সেদিনকার বিদায়ব্যথাভরা অশ্রুসজল চাহনিটি আজও যেন আমার চোখে ভাসছে!

"তিন বছর পরে—আমি তখনও বিলেতে—হঠাৎ এক মেলে খবর পেলাম সন্ধ্যা মারা গিয়েছে—থাইসিসে। তার অসুখের খবর এর আগেই মা'র চিঠিতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সে যে এত শীগ্‌গির চলে যাবে তা' কখনও ভাবতেও পারিনি। সেদিন সেই সুদূর প্রবাসে তার মৃত্যুসংবাদটা যখন পেলাম, আমার অজ্ঞাতেই বেরিয়ে এল মর্ম্মমথিত করা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস—মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। মনে জেগে উঠল পুরান দিনের অনেক মুছে যাওয়া স্মৃতি—অনেক ছোটখাট কথা, যা এতদিন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে ছিল।

"পরের বছর আমি মা বাবাকেও হারালাম। শেষ সময়ে তাঁদের কারও সঙ্গেই যে আমার দেখা হ'ল না এ দুঃখ আর আমার ভুলবার নয়। আমি তখন পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছি, কিন্তু ট্রেনিংএ ছিলাম।···প্রথমে গেলেন বাবা। তাঁর ব্লাড-প্রেসার অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই তাঁর জন্যে মা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতেন—কখন কি হয় ভেবে। বাবা মারা যাবার কয়েকমাস পরে মাও চলে গেলেন। আগে থেকেই তাঁর হার্ট খারাপ ছিল—তাই অত বড় শোকটা সামলাতে পারলেন না।

"বিলেত থেকেই আমি চাকরী নিয়ে আসি। ফিরে এসে বছর দুই প্রায় আমাকে দূরে দূরেই কাটাতে হয়েছে। এর মধ্যে কমলেশদা' অনেকবার আমাকে লিখেছে দেশের বাড়ীতে একবার এসে ক'দিন থেকে যেতে। একে ত আমার প্রায় ছুটীই নেই, তাছাড়া এ শূন্যপুরীতে ঢুকতে আমার কিছুতেই মন সরছিল না। তারপর কি একটা কাজে একবার আমায় ক'দিনের জন্যে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। তখন হঠাৎ কি জানি কি মনে হ'ল—ইচ্ছে হ'ল একবার আমাদের এ বাড়ীটা দেখে যাই। একদিন কাউকে কোনও খবর না দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে যখন এসে পৌছালাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আমার আসার খবর পেয়েই কমলেশদা ছুটে এল আমায় দেখতে—আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে তার সেদিন কি কান্না! মনে হল তার এতদিনকার সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা ঝ'রে পড়ছে আজ অশ্রুর আকারে—তরল হয়ে।

"আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম – কমলেশদা'র সব চুল এর মধ্যে একবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। তার বয়স তখন চল্লিশও হয় নি।···তারপর চোখ মুছে শান্ত হয়ে কমলেশদা' আমায় বলল—"কাপড় চোপড় ছেড়ে কিছু খাও। গোবিন্দকে বলি হাতমুখ ধোবার জল টল দিতে।" সেদিন ও নিজে সামনে বসে থেকে আমায় এই রকম যত্ন করেই খাওয়াল। সেদিনও আমি এই টেবিলে বসেই খাচ্ছিলাম—কমলেশদা' বসেছিল ঐ চেয়ারটাতে। উঠানের এক কোণে একটা চালাঘরে একটা কুকুর অশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ শব্দ করছিল। মাঝে মাঝে সেটা একটু থামলে শোনা যাচ্ছিল বাইরে গাছের পাতার উপর বৃষ্টির জলের টুপুর টাপুর শব্দ। খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে বসে আছি। চাকর টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। কমলেশদা' যেন তার যাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিল—সে চলে যেতেই আমায় আবেগরুদ্ধ স্বরে ডাকল—"রণজিৎ।"

"আমি একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম—"কি?"

"তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

"বল, কমলেশদা।"

"আমার স্ত্রী সন্ধ্যাকে তোমার মনে পড়ে?"

"নিশ্চয়ই।"

"সে তোমায় একটা কথা বলতে বলে গিয়েছে।"

"কি কথা?"

"মরণকালে আমার কাছে সে স্বীকার করে গিয়েছে তার মনের কোনও গোপন ব্যথার কথা।"

"আমি চুপ করে রইলাম"—এ কথার পরে কি যে বলা উচিত ভেবে পেলাম না।

"কমলেশদা আবার বলতে লাগল—কথাটা তোমায় বলতে আমার কেমন যেন বাধছে!···না না, তোমায় আমি কিছুতেই বলতে পারব না। না, আমায় বলতেই হবে। না বলে উপায় নেই। তুমি বোধ হয় শুনেছ সন্ধ্যার যক্ষ্মা হয়েছিল। তা মোটেই নয়। সে মারা গিয়েছে আসলে মনের দুঃখেই। বিয়ের পরে যখন সে প্রথম এল আমার বাড়ীতে, তখন থেকেই দেখলাম সে যেন সর্ব্বদাই খুব বিমর্ষ হয়ে থাকে—মনে তার কোনও আনন্দ নেই, স্ফূর্ত্তি নেই। দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। ছ' মাসের মধ্যে তার এমন চেহারা হয়ে গেল যে, তাকে দেখে চেনাই যেত না যে, সে সেই সন্ধ্যা। তাকে এবিষয়ে কোনও প্রশ্ন করলে সে কিছুই বলত না—শুধু একটু ম্লান হাসি হাসত। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ, ব্যথাময়। তার আপত্তি সত্ত্বেও আমি একদিন ডাক্তার ডেকে আনলাম। গ্রামের গোকুল ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলল—ও কিছু নয়। লিভারের একটু দোষ হয়েছে, সেরে যাবে শীগ্‌গির। বলে কি একটা মস্ত বড় রোগের নাম করল। আমার ভাই ওসব বড় বড় নাম মনেও থাকে না। আমি সন্ধ্যার জন্যে শিশি শিশি ওষুধ কিনে আনতে লাগলাম। ডাক্তারের ফি'তে ও ওষুধপত্রে আমার অনেক টাকা খরচ হতে লাগল। কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই ওষুধ খেতে চাইত না। ওষুধ দিতে গেলেই সে একটু হেসে বলত—ও খেয়ে আর কি হবে? ওষুধে আমার অসুখ সারবার নয়।

"আমি ক্রমে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওর কোনও গোপন ব্যথা আছে—যা ও আমায় বলতে পারছে না। একা থাকলে অনেক সময় দেখতাম ও শুয়ে শুয়ে কাঁদছে—চোখের জলে ওর বালিশ ভিজে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারতাম না আমার কি করা উচিত। তাকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে আমি তাকে কত নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর শাড়ী, গয়না এসেন্স, সাবান ইত্যাদি সৌখীন জিনিষ কিনে এনে দিতাম। কিন্তু কিছুতেই তার মুখে এতটুকু হাসি ফুটাতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম মৃত্যু তার নিশ্চিত। তখন ফাল্গুনের শেষ। অল্প অল্প গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। একদিন রাত্রে আমি বিছানায় শুয়ে আছি—তখনও ঘুমোই নি। সন্ধ্যা আস্তে আস্তে ক্ষীণস্বরে আমায় ডাকল—"ওগো শুনছ।" আমি তাড়াতাড়ি উঠে তার বিছানার কাছে গেলাম। মশারি তুলে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আমায় ডাকছ সন্ধ্যা?"

"হ্যাঁ। তোমায় আমি একটা কথা বলে যেতে চাই। আমি ত আর বাঁচবই না।" বলে সে একটু থামল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—"ছি! ওকথা বলতে নেই, সন্ধ্যা। তুমি সেরে উঠবে।" সে একটু অধীর হয়ে বলল—"না, না, আমার মরণের দিন ঘনিয়ে আসছে আমি বেশ বুঝতে পারছি। এর পরে হয় ত আর সময় পাব না। যাবার আগে আমার সব অপরাধ স্বীকার করে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে যাব। বল, আমায় ক্ষমা করবে আর আমার একটি অনুরোধ রাখবে?" বলে সে আমার একটা হাত চেপে ধরল।

"আমি বললাম—"নিশ্চয়ই রাখব। তুমি বল, তুমি কি বলতে চাও।" একটু চুপ করে থেকে সন্ধ্যা আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগল—"বিয়ের পর থেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তোমায় সুখী করতে, কিন্তু আমার ভাগ্য-দোষেই বোধ হয় তা পারিনি। আমি নিজেও সুখী হতে পারলাম না, আর তোমার জীবনটাও ব্যর্থ করে দিলাম। সেজন্যে আমার অপরাধ নিও না—আমায় তুমি ক্ষমা কর। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার কাছে খাঁটী থাকতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বিয়ের আগে কিংবা পরে অন্যায় কিছুই করিনি—এটা অন্ততঃ আমি জোর গলায় বলতে পারি। আমি আজ মরতে বসেছি। কিন্তু এর কারণ কি জান?" বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

"তার মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছিল তার রোগপাণ্ডুর মুখখানির উপরে। আমি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলাম—"বল কি কারণ? এখনও যদি তোমায় বাঁচাতে পারি কোনও রকমে!" ক্ষীণ হাসি হেসে সন্ধ্যা বলল—"না, আমায় বাঁচাতে তুমি পারবে না।

আর আমার বেঁচেও কোন সুখ নেই। নিজেও কষ্ট পাব—তোমাকেও কষ্ট দেব। আমি বড় ভালবাসতাম একজনকে। সে আমার ছোট বেলাকার খেলার সাথী, কৈশোরের সখা, যৌবনের প্রিয় রণজিৎদা।"

"কিছুক্ষণ আমরা কেউই কোনও কথা বলতে পারলাম না—দুজনেই চুপ করে রইলাম। একথার উত্তরে আমি তাকে কি যে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেলাম না। তারপর সন্ধ্যাই সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে আবার বলতে লাগল—"আজ তুমি বল, আমার এই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ভালবাসাতে কোন দোষ, কোন পাপ আছে কি না! ভালবাসাই হল আমার কাল। এই আগুন বুকে চেপে আমি তিলে তিলে জলে মরেছি। এক এক সময় আমার ভয় হত আমি বুঝি বা পাগলই হয়ে যাব। বড় সাধ ছিল মরবার আগে রণজিৎদাকে একবার দেখব। তা আমার মনের এ বাসনা পূর্ণ হল না। তিনি কিন্তু কিছুই জানেন না এ সব কথা। তাঁকে কোনও দিন জানতে দিই নি আমার মনের কথা। মনের ব্যথা এতকাল আমি মনেই চেপে রেখেছিলাম। আজ এই তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকেই বলি নি আমার এই গোপন ব্যথার কথা। আমি যখন আর এ জগতে থাকব না তুমি রণজিৎদাকে ব'ল আমার কথা। ব'ল কত ভালবাসতাম আমি তাঁকে। তুমি বল, তুমি বলবে তাঁকে আমার এই কথাটি? আমার এই মরণ-সময়ে আমায় কথা দাও। আমি বেঁচে থাকতে যে কথা তাঁকে বলতে পারিনি, আমি মরে গেলে আমার সেই কথা তুমি ব'ল তাঁকে। কোনও একদিন যে তিনি জানবেন, কত ভালবাসতাম আমি তাঁকে, সেই কথা মনে করেই আমি মরণ-সময়ে একটু সান্ত্বনা পাব।"

"আমি তাকে কথা দিলাম। রণজিৎ, ভাই, আজ কথাটা তোমায় বলে আমার মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আমি তার শেষ অনুরোধ রাখতে পেরেছি—নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করেছি।" ব'লে কমলেশদা চুপ করল। দেখলাম তার দুই চোখে অশ্রু টল্ টল্ করছে।"

"খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রণজিৎ আবার বলতে লাগল—"সন্ধ্যার মৃত্যুর এই করুণ কাহিনীটি শুনে সেদিন আমার মনের ভিতর যা হ'তে লাগল তার খবর শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন। তোমায় আর কি ব'লব রাজীবদা। আমার কেবলি মনে হতে লাগল—আমিই এই পরম স্নেহশীল সোদরোপম লোকটির স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। আমার জন্যেই এ সন্ধ্যাকে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধতে পারে নি। যাক্। তোমায় আমি যে কথা বলছিলাম সেটাই শেষ করি। সেদিন কমলেশদার কথা শেষ হ'লে আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথাই খুঁজে পেলাম না। শুধু তার একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে চেপে ধীরে ধীরে অপরাধীর মত বললাম, "কমলেশদা আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

"কমলেশদা' অমনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—"ছি! ও কথা ব'লছ কেন ভাই? তোমার ত এতে কোনও দোষ নেই। তুমি চিরদিনই আমার সেই স্নেহের ছোট ভাইটিই থাকবে। তোমার উপরে তোমার কমলেশদার স্নেহের এক কণাও কোনও দিন কোন কারণেই কমবে না। সবই নিয়তি। তাকে আমরা কেউই খণ্ডাতে পারি না।" ব'লে সে নিজের কপালে হাত ঠেকাল।

"আমি আর কোনও কথা বলতে পারলাম না—নিঃশব্দে তার একটা হাত চেপে ধ'রে ব'সে রইলাম। অনেক দিনের জমাট অশ্রু,...অনেক কালের সঞ্চিত ব্যথা আকুল হ'য়ে উঠল আজ বেরিয়ে আসবার জন্যে আমার দু' চোখ ছাপিয়ে—সে দিন,অনেক দিন পরে কাঁদলাম, শৈশবের অনেক স্মৃতি মনে ক'রে। মা-বাবাকে হারানোর দুঃখ, সন্ধ্যাকে হারনোর ব্যথা আমার মনে নতুন ক'রে জেগে উঠল—আর এই হতভাগ্য মানুষটির নিষ্ফল প্রেমের বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের কথা মনে ক'রেও বুঝি বা আমার সেদিন কয়েক ফোঁটা চোখের জল প'ড়ে থাকবে।...তারপর খানিকক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পরে কমলেশদা' বলল—"যাবে দেখতে সন্ধ্যার সমাধি? সে যে ঘরটিতে শুত তারই কাছে তার সাধের ফুলবাগানের মধ্যে রেখেছি তার চিতাভস্ম—তার দেহাবশেষ।" আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তখনও বৃষ্টি থামেনি—অল্প অল্প ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। বহিঃপ্রকৃতিতেও যেন দুটি ব্যথাতুর মানব-হৃদয়ের দুঃখে সমবেদনার অশ্রু ঝরছিল—টপ টপ। আমরা চললাম সেই বৃষ্টির মধ্যে

দিয়েই। বৃষ্টির জলের ফোঁটা টুপ টুপ করে পড়ছিল আমাদের মাথার উপরে—সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। কমলেশদা' এসে দাঁড়াল তার বাগানের মধ্যে একটা উঁচু রেলিংঘেরা জায়গার সামনে—পকেট থেকে চাবি বার করে খুলল একটি ছোট্ট গেট। ছোট্ট একটি সমাধি—মার্বেল পাথরে বাঁধান। কমলেশদা' টর্চের আলো তার উপরে ফেলল, দেখলাম লেখা আছে—শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী। তার নীচে কয়েকটি লাইন—

"বল শান্তি, বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।"

"কমলেশদা বলল—"এই লাইন ক'টি সে তার সমাধির উপরে লিখে রাখতে বলেছিল আমায়।

"আমরা দু'জনে নীরবে সেই ভিজে ঘাসের উপর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সন্ধ্যার সমাধিবেদীর সামনে—দু'জনে পাশাপাশি—একজন যে সন্ধ্যাকে ভালবেসেছিল, আর একজন সন্ধ্যা যা'কে ভালোবেসেছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই মৃতা নারী যেন একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র বেঁধে দিল। দেখলাম গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির জলের ফোঁটা টপ্ টপ ক'রে পড়ছে সেই শ্বেতপাথরের সমাধির উপরে। মনে হ'ল সেই পাষাণবেদীর নীচে সন্ধ্যা যেন ঘুমিয়ে আছে। তার নিষ্কলুষ ভালবাসায় ভরা হৃদয়টির কথা মনে প'ড়ে গেল—বোধ হ'ল যেন সেই হৃদয়ের স্পন্দনও স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

"তার পর থেকে প্রতি বছর আমি একবার ক'রে এখানে আসি—জানি না কিসের টানে। একবার দেখে যাই সন্ধ্যার সমাধিটা। কমলেশদাকে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় তার জীবনের যে মহা ক্ষতিটা আমি ক'রেছি—ওর কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ব'লে মনে হয়। কিন্তু ও যেন ওর সহিষ্ণু হৃদয়ের অশেষ ক্ষমা দিয়ে আমায় সর্ব্বদাই ঢেকে রাখতে চায় অসীম স্নেহের পক্ষপুটে।"

কথা শেষ ক'রে রণজিৎ—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ ক'রে রইল। আমারও নিজের অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর রণজিৎ ঘরের ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব'লে উঠল—"অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছে। এস, আমরা শুয়ে পড়ি।"

ধন্য

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

তোমারি দেওয়া দুখ সহিতে শকতি
তুমিই দেবে ভাবি' তোমারে ডেকেছি।
তোমারি পায়ে, প্রভু, উজাড়ি' ভকতি
ব্রজের পথ-ধূলি অঙ্গে মেখেছি॥
কপোলে নেমেছিল যতেক আঁখি-জল
আমার কর-পুটে ধরিয়া সে সকল
অর্ঘ্য দেছি তোমা মৌন-নিশীথে
মনের মন্দিরে মূরতি গড়িয়া।
ভেবেছি পূজা মোর লয়েছ দেবতা,
খুশীতে মন তাই উঠেছে ভরিয়া॥

তুমি যে আসিবে না মন তা বলেনি,
কাঁদাতে ভালবাস আসেনি স্মরণে।
ভাবিনি তারও লাগি ও-মন গলেনি
ডেকেছে যে তোমায় জীবনে মরণে॥

কেঁদেছে যশোমতী, "গোপাল কোথা" ব'লে,
রাধার আঁখি-জলে পাষাণ গেছে গ'লে,
কংস-কারাগারে কেঁদেছে দেবকী
নন্দ পিতা কেঁদে অন্ধ হয়েছে।
ভক্ত শব্দকে তুমিই বধেছ
তারেই কাঁদালে যে স্মরণ লয়েছে॥

অবুঝ মন মোর বুঝালে বুঝে না
তোমারে ডাকে তবু দয়াল ভাবিয়া।
তুমি কি দয়াময়, যুক্তি খুঁজে না,
তুমিই জাগ্রত সবারে ছাপিয়া॥
নীরব নিশীথিনী, আজিও তোমা লাগি'
দুয়ার খুলে, প্রভু, রয়েছি একা জাগি'
অশ্রু-যমুনায় উজান বহিবে
এস হে, গিরিধারী, এ প্রেম-কুঞ্জে।
এ দেহ-শ্রীরাধিকা ধন্য হইবে
তোমার সুনিবিড় পরশ ভুঞ্জে॥

বুকের একটি ব্যাধি

—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

গত প্রবন্ধে টি. বি. রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ু ইত্যাদির আলোচনা করেছি। লিখেছি যে, রোগী যে ঘরে শোবে সে ঘরে যেন বেশ রোদ আসে, কিন্তু গায়ে কখন রোদ না লাগে। এই রোদ লাগা সম্বন্ধে আর দু' একটি কথা লেখা দরকার মনে করি। সাধারণ লোকের মনে একটা ধারণা আছে যে রোদ এই রোগের পক্ষে মহা উপকারী বস্তু। এবং অনেকেই এই রোগীকে অনেকক্ষণ করে রোদে গিয়ে রোজ বসে থাকতে উপদেশ দেন এবং অনেক সময় পীড়াপীড়িও করে থাকেন। কিন্তু টি. বি. রোগীরা যেন মনে রাখেন যে, বুকে রোদ লাগানো কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। অজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে খালি গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকে কড়া রোদ লাগিয়ে অনেক রোগীই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। দুপুরের রোদ ত খুবই খারাপ

আমেরিকার সর্বপ্রথম যক্ষ্মা-নিবাস (এডওয়ার্ড লিভিংস্টোন ট্রুডো স্থাপিত)।

ভোরবেলাকার রোদ—যা নাকি "আলট্রা ভায়োলেট" রশ্মি দ্বারা সমৃদ্ধ—তা'ও বিচক্ষণ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গায়ে লাগাতে বেশী চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। শরীরের কোন্ কোন্ অংশে কখন, কি ভাবে, কতদিন যাবৎ, কতটুকু রোদ লাগাতে হবে, রোদ লাগানোর মত বুকের অবস্থা কি না—এসব সম্বন্ধে কেবল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। সুইটজারল্যাণ্ডে লেজাঁ স্যানাটোরিয়ামে Dr. Rollier সূর্য্যালোক দ্বারা অস্থির ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। এই চিকিৎসা-প্রণালীকে বলা হয়ে থাকে Helio-therapy.

যতদিন ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, প্রায় প্রত্যেক রোগীকেই এটা-সেটা উপসর্গ দ্বারা কম বেশী বিব্রত হয়ে থাকতে হয়। এই উপসর্গগুলির ভিতরে কাসি এবং রক্তবমন-সংক্রান্ত দুটি একটি বিষয় রোগীর জানা দরকার।

প্রথমে বলছি কাসি সম্বন্ধে। বহু রোগীকেই কাসি দ্বারা উপদ্রুত হতে হয়। কিন্তু এই কাসিটা বড় ক্ষতিকর। কাসির সাথে সাথে ফুসফুসের সুস্থ অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পায়, কাসতে কাসতে রোগী নিজেকে ভীষণভাবে পরিশ্রান্ত করে তোলে, জ্বর বাড়ে, অনেক সময়ে কাসতে কাসতে শেষে সুরু হয় রক্তবমি। কাসিকে কম রাখবার জন্যে যত রকম উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করা উচিত। একটু মিছরীর টুকরো, পেপস্ অথবা ইউকেলিপটাস-মেন্থলের বড়ি, কোন ঝাঁঝওয়ালা লজেন্স, বচ, বা ঐ রকম অন্য কোন ঝাল-দ্রব্য মুখে রাখা চলতে পারে। গলার এবং টনসিলের দোষ থাকলে তা ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। মুখে একটা কিছু চুষে অথবা সাধারণ কোন ওষুধে কাসির উপশম হওয়া বড় শক্ত। আসল কথা, ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানগুলির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হতে চায় না। তবুও ফুসফুস যাতে আরও জখম না হয়, সেজন্যে কাসিকে কম রাখবার চেষ্টা যথাসাধ্য করতে হবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে রোগী অভ্যাসবশে কাসে। গলার কাছে একটুখানি সুড় সুড় করে উঠলেই অমনি খকর খকর করে কখনো কাসতে সুরু করে দেওয়া উচিত নয়। ১০০ টার ভিতরে ৬০টা কাসিই রোগী একটু চেষ্টা এবং অভ্যাসের ফলে চাপতে সক্ষম হতে পারে। কেসে গয়ের তুলতে চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অধিকাংশ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গয়ের উপরে উঠে এসে আপনা থেকেই গলার কাছে জমে, তখন গলাটা একটু টেনে অথবা অল্প একটু কেসে সেই গয়েরটা তুলে ফেলতে হবে—কিন্তু "শুকনো কাসি"কে প্রশ্রয় দেওয়া অসঙ্গত।

রোগীর আর একটি উপসর্গ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা। রক্ত বন্ধ করবার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম। রক্ত ওঠা সুরু হলে একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেওয়া অথবা রোগীকে কোন রকম টানা-হ্যাঁচড়া করা নিতান্ত অসঙ্গত। রোগীর যত উত্তেজনা বাড়বে, যত নড়াচড়া হবে রক্ত উঠতে থাকবে তত বেশী করে। যে মুহূর্তে কাসির সাথে রক্ত উঠে আসতে আরম্ভ করবে, রোগী বসে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন—আর কথাটি না বলে বিছানায় এসে সটান লম্বা হয়ে পড়বেন—আর নিজের মনকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করবেন। সম্পূর্ণ বিশ্রামের কিছুমাত্র ত্রুটি না করলে রক্ত দুই একদিন অথবা তিন চার দিনের ভিতরে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে; তার পরে পাঁচ সাত দিন হয়তো থুতুর সাথে সামান্য সামান্য থেকে অবশেষে মিলিয়ে যাবে। রক্ত যদি বেশী ওঠে তবে সেই কয়েক দিন শক্ত অথবা গরম কোন জিনিস খাওয়া বাদ দিতে হবে—বরফ দিয়ে একটু একটু দুধ খালি খেতে হবে। থুতুর সঙ্গে রক্তের খালি সামান্য ছিট থাকলে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। রক্ত ওঠা বন্ধ হবার পরেও দু'তিন সপ্তাহ অবধি ওঠা-বসা কিছুমাত্র নিরাপদ নয়—এই সময়টা বেডপ্যান ব্যবহার করতে হবে। রক্ত বন্ধ করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বুকে Artificial Pneumothorax নামক ইঞ্জেক্শান; কিন্তু এই ইঞ্জেক্শান যেখানে সেখানে নেবার সুবিধাও নেই এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

ছাড়া যে সে ডাক্তারের হাতে নেওয়া কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয় (অবিশ্যি বহু ডাক্তার দিতে জানেনও না)। অনেক সময়ে "মরফিয়া", "কুডেন", "কঙ্গো-রেড" ইত্যাদি ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়ে থাকে। গলার সুড়সুড়ি কমাবার জন্যে মুখে এক আধ টুকরো বরফ চোষা চলতে পারে। সকলেই জানেন "ক্যাল্সিয়াম" ইঞ্জেকশনের কথা, কিন্তু সদ্য রক্ত বন্ধ করবার ক্ষমতা "ক্যালসিয়ামের" কিছুমাত্র নেই। এই প্রক্রিয়াটা অবলম্বন করা যেতে পারে : প্রথমে দুই পায়ে উরুর উপরে খুব শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে ; ঘণ্টাখানেক বা দেড়েক পরে উরুর বাঁধন খুলে হাতে দুই বাহুর উপরে খুব শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। হাতের বাঁধন বেশীক্ষণ রাখা যায় না—আধ ঘণ্টা খানেক পরে হাত খুলে আবার পা বাঁধতে হবে—এই ভাবে রক্ত না বন্ধ হওয়া অবধি চলবে। মাথার নীচেকার বালিশটা সরিয়ে দেওয়া ভাল। এগুলি রক্ত বন্ধ করতে কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা সাহায্য করে। বুকের চামড়ার নীচে Oxygen ইঞ্জেকশান করবারও ব্যবস্থা আছে।

যক্ষ্মা-রোগীর কতকগুলি জিনিষ সর্বদা মেনে চলা উচিত। কোন ভারি জিনিষ তুলতে যাওয়া তার কখনো ঠিক নয়। কোন কিছুর উপরে অনেকক্ষণ কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকা অন্যায়। কাউকে চীৎকার করে ডাকবার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। বিছানার পাশে রোগী একটি Calling Bell রাখতে পারেন, কাউকে ডাকবার জন্যে সেইটে টিপলেই চলবে। অতিরিক্ত অট্টহাস্য খুবই খারাপ। কারুর সাথে জোরে জোরে কথা বলা অথবা বহুক্ষণ ধরে অবিরাম কথা বলা, গুণগুণের চেয়ে পর্দা আর একটু চড়িয়ে মনের আনন্দে অথবা দুঃখে গান ধরে দেওয়া ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। হঠাৎ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে ওঠা, অথবা ধাঁ করে চোখের নিমেষে ঘর থেকে হয়তো বারান্দায় এসে দাঁড়ানো, শরীরকে একটা ঝাঁকানি মেরে কোনো কিছুর উপরে উঠে বসা—অথবা যে কোনো রকম sudden violent movement of the body গুরুতর রকম হানি করতে পারে। অনেক রোগীর বদ্ অভ্যাস আছে—থুতু গিলে ফেলা। এটা যে শুধু একটা নোংরামি তাই নয়, এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। যাদের থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু বর্তমান আছে (এবং ব্যাধির কোনো না কোন সময়ে অধিকাংশেরই প্রায় থেকে থাকে), তারা যদি থুতু গিলে খাওয়া রূপ কদভ্যাস অচিরাৎ ত্যাগ না করতে পারে, তবে তাদের পেট যক্ষ্মাক্রান্ত হতে একটুও বিলম্ব ঘটে না। এবং মনে রাখতে হবে Intestinal Tuberculosis সারানোও অতিরিক্ত শক্ত ব্যাপার। যক্ষ্মারোগী যথাসম্ভব চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অভ্যাস করতে পারেন, অথবা বুকের যদি একটা দিকে অসুখ থাকে, তবে পাশ ফিরে শুতে হলে যে দিকে অসুখ সেই দিকেই পাশ ফিরে শোয়া উচিত। এতে সেই দিকটা একটু বিশ্রামও পায়, আর সেই দিককার গয়ের বিপরীত দিককার সুস্থ ফুসফুসটিতে ঢুকে সেটিকেও খারাপ করবার সুযোগ পায় না। খুব এঁটেসেঁটে কাপড় পরা যক্ষ্মা-রোগীর উচিত নয়। কাপড় পরতে হবে খুব ঢিলে করে এবং গায়ে রাখতে হবে ঢিলে জামা, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো অসুবিধা না হয়, অথবা শুয়ে থাকবার সময়ে কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না হয়।

থুতু সম্বন্ধে যক্ষ্মারোগীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে থুতু ফেলে পরিবারের সুস্থ লোকেদের আক্রান্ত করা তার পক্ষে মহাপাপ হবে। অবশ্য রোগী কখনই চান না, তাঁর দ্বারা অপরের কোনো ক্ষতি হয় ; কিন্তু শুধু চাওয়া নয়, কিসে অপরের ক্ষতি হবে না হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর ভাল রকম জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে।

ধরমপুর স্যানাটোরিয়াম : রোগীদের রিক্রিয়েশান হল।

আমি পূর্বেই বলেছি—গয়েরটাই হল আসল বিপদ। গয়ের ফেলবার জন্যে রোগীর কাছে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পাত্র থাকবে এবং পাত্রটি ঢাকনাযুক্ত হওয়া দরকার। টি. বি. রোগীর থুতু ফেলবার উপযোগী কাপ কিনতেও পাওয়া যায়। এই পাত্রে ৫% কার্বলিক লোশান অথবা ২% লাইসল্ লোশান কিছু দিয়ে তার ভিতরে থুতু ফেলতে হবে। প্রতিদিন এই থুতুর পাত্র পরিষ্কার করতে হবে এবং বাসগৃহ থেকে দূরে কোনো জায়গায়, যেখানে অত্যন্ত কড়া রোদ লাগে, সেখানে থুতু টেনে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। সূর্যের আলো যক্ষ্মাজীবাণুর মহাশত্রু। অল্প সময়ের ভিতরেই প্রখর সূর্যালোকে যক্ষ্মাজীবাণু নিধন প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার, স্যাঁৎ-সেঁতে জায়গায় এরা বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল। থুতু সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা যেতে পারে, অথবা শক্ত কাগজের ঠোঙায় বা একটি পাত্রে কাঠের গুঁড়ো রেখে তার ভিতরে থুতু ফেলে শেষে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। হাতে-টাতে কখনো থুতু জড়িয়ে গেলে সে-হাত তৎক্ষণাৎ কোনো লোশানে অথবা কার্বলিক সাবান দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। টি. বি. রোগী যখন কাসবেন, মুখের সামনে একখানা ন্যাকড়া নিয়ে কাসবেন, পরে সেই ন্যাকড়া

পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যক্ষ্মারোগীর দাড়ি গোঁফ রাখা কখনো ঠিক নয়। কাসবার সময়ে দাড়ি গোঁফে থুতুর কণা আটকে থাকে, কখনো বা গয়ের ফেলবার সময়ে দাড়িতে খানিক জড়িয়ে যায়। এসব শুধু অপরিচ্ছন্নতা নয়, দস্তুরমত বিপজ্জনক। যক্ষ্মারোগীর সমস্ত শরীর, বিছানাপত্র, ঘরদোর সর্ব্বদা বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। ঘরের মেঝে, দেওয়ালের নীচের অংশটা প্রত্যেক দিন ফিনাইল দিয়ে বেশ করে পুঁছতে হবে। যক্ষ্মারোগীর খাওয়ার বাসনপত্র সম্পূর্ণ একটি সেট একেবারে আলাদা থাকবে—সেগুলি ব্যবহার করবার অধিকার অপর কারুরই থাকবে না। রোগী যেন লক্ষ্য রাখেন, তাঁর ঘরে ছোট ছেলেপিলে না ঢোকে; পূর্ব্বেই বলেছি এই রোগের জীবাণু দ্বারা শিশুরা আক্রান্ত হয় অতি সহজে। যক্ষ্মারোগীকে যাঁরা দেখাশোনা করবেন, যাঁদের উপরে রোগীর সর্ব্ববিধ শুশ্রূষার ভার থাকবে, মনে রাখা দরকার যে, রোগীর নিজের চাইতে তাঁদের দায়িত্ব অনেক সময়ে অনেক বেশী। রোগীর নিজের তো শুয়েই থাকতে হয়, কাজ করবার ভার

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি-বিকিরণ যন্ত্র।

বেশীর ভাগই অপরের উপরে। কাজেই তাঁরা যদি তাঁদের কর্ত্তব্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে না পারেন অথবা কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তার পরিণাম সকলের দিক দিয়েই শোচনীয় হতে পারে।

গত প্রবন্ধটিতে বিশ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলে রোগীর ধীরে ধীরে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার কথা উল্লেখ করেছিলাম। রোগীর যতদিন পর্য্যন্ত সব রকম উপসর্গ প্রবল থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন রকম পরিশ্রমের কথা একেবারে আসেই না। উপসর্গগুলি একেবারে কমে গিয়ে শরীর যখন বেশ ভাল হয়ে উঠবে, বুকের অবস্থার যখন যথেষ্ট উন্নতি হবে, তখন ধীরে ধীরে একটু একটু করে পরিশ্রমের কাজ করতে চেষ্টা করতে হবে। সাধারণতঃ অন্যান্য উপসর্গগুলি অপেক্ষাকৃত শীগ্‌গিরই কমে আসে, কিন্তু নাড়ীর একটু দ্রুততা এবং বিকেলের দিকে অল্প একটু জ্বর, এইটে কিছুতেই যেতে চায় না। এই অবস্থায় একটু ধৈর্য্য ধরে বিশ্রামই চালিয়ে যেতে হবে। তারপরে যখন নাড়ীর এবং টেম্পারেচারের অবস্থা বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে, তখন প্রথমে সুরু করতে হবে বসা থেকে। সকাল বেলায় প্রথমে আধ ঘণ্টা খানেক বসে থাকতে হবে। পাঁচ সাত দিন বসবার পরে যদি পাল্‌স্‌ এবং টেম্পারেচার না বাড়ে, তা হলে আধ ঘণ্টার জায়গায় বসতে হবে এক ঘণ্টা করে। এতে যদি কোনো ক্ষতি না হয়, তবে বসতে হবে দু ঘণ্টা করে—সকালে এক ঘণ্টা, বিকেলে এক ঘণ্টা। তার পরে ধীরে ধীরে করতে হবে হাঁটবার চেষ্টা। প্রথমে এক ফার্লং (৮ ফার্লং-এ ১ মাইল হয়), তারপরে দুই ফার্লং, তারপরে তিন ফার্লং—১০।১২ দিন থেকে পনের কুড়ি দিন বা একমাস অন্তর অন্তর এই ভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে রোজ দু'তিন মাইলও হাঁটা চলবে। যক্ষ্মারোগীর কখনো জোরে জোরে হাঁটা উচিত নয়—ঘণ্টায় দুই মাইল হাঁটাই নিরাপদ। দৌড়ানো তো ভুলেও চলবে না। পড়াশোনা, গল্প-গুজব ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে এবং নিজের ব্যাধি সম্বন্ধে সর্ব্বদা থাকতে হবে সচেতন।

প্রকৃত পক্ষে কার যে কতদিন অবধি বিশ্রাম নিতে হবে এবং কে যে কতখানি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে—তা বুকের অবস্থাই নির্দ্দেশ করে দেবে। ব্যাধি যদি বেশী দূর এগিয়ে না থাকে এবং উপসর্গগুলি যদি চট করে কমে আসে, তবে পরিশ্রম সেই অনুপাতেই শীগ্‌গির সুরু করা যায়। হয়তো চিকিৎসা সুরু হবার পরে দু'মাস বা তিন মাসের ভিতরেই এটা সম্ভব হবে। কিন্তু বুকের অবস্থা যদি অন্য রকম হয়, তবে ছ'মাস, আট মাস, এক বছর, দু'বছর অবধি বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে; পরিশ্রমের কাজও বিশেষ কিছুই করা চলবে না—জীবনটাকে কোনো মতে টিপে টিপে কাটিয়ে দিতে হবে আর কি।

পরিশ্রমের অবস্থা এলেও রোগী যেন ভুলেও না মনে করেন যে, তিনি সারাদিনই যা খুশী তাই করতে পারেন, বিছানার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে। বিছানার সাথেই যক্ষ্মারোগীর সবচেয়ে বড় নিকট এবং আজীবনের সম্পর্ক। রোগী হাঁটা চলাফেরা করতে পারলেও দিনের ভিতরে খানিক সময়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই হবে। এক হচ্ছে, হেঁটে টেঁক ফিরে আসবার পরেই আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। এই সময়টা যেন রোগী খবরের কাগজ, বই পড়া অথবা কারুর সাথে হাসি গল্প করা রূপ 'বিশ্রাম" না নেন। বিশ্রাম মানে শরীর মন সব ঢিলে করে চোখ মুদে পড়ে থাকা। তারপরে আর একটি সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় হচ্ছে খাওয়ার আগে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। অনেক সময়ে খাওয়ার পরে অনেকের টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায়, পাল্‌স্‌ বেড়ে যায়, মুখ চোখ কান গরম হয়ে ওঠে। খাওয়ার আগে বিশ্রাম নিলে এসব দ্বারা উপদ্রুত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। আর একটি কথা, বেড়িয়ে এসেই অথবা অন্ত

মত ঝকঝকে তকতকে থাকে এবং সিগারেটের ছাই বা শেষটুকু কেহ কখনও অ্যাশট্রে ছাড়া অন্যত্র ফেলে না ; গাওয়ার ষ্ট্রীটে দেখিলাম, পায়খানাগুলির পাশে উপরে বাহিরে প্রায়ই দেশের মত অবস্থা হইয়া উঠে এবং লাউঞ্জে অ্যাশট্রের ব্যবহার নাইই। গাওয়ার ষ্ট্রীটে আজকাল পশ্চিমা ও দক্ষিণি ছাত্রদের আধিক্য, বাহিরের বাঙ্গালী ছাত্রেরা ইহার "চিড়িয়াখানা" প্রভৃতি অনেক নাম দিয়াছে। অবাঙ্গালী ভারতীয় ছাত্রদের ধরণধারণ, কথাবার্ত্তা রকমসকম সম্বন্ধে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অনেক রকম মজাব মজার গল্প, পরিহাস প্রভৃতির ভাণ্ডার জমাইয়াছে, সেগুলি নেহাৎ মিথ্যাও নয়। ক্লাসে গিয়া চুপ করিয়া লেকচার শুনা, বাড়ী আসিয়া নিজেদের মধ্যে ছোট বড় দলে আড্ডা জমান বা গল্প করা ; নয়ত নিজেরা কয়েকজন একত্র হই া সিনেমা বা "করণার-হাউসে" বা হোটেলে যাওয়া, ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বান্ধবীদের লইয়া চিত্তবিনোদন করা—এই করিয়া অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রদের দিন, মাস ও বৎসর কাটে ; ইংরেজদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধুত্ব দূরে থাকুক, দেখাসাক্ষাৎই হয় না। দেশে ফিরিয়া সবাই মস্ত সাহেব হন বটে, কিন্তু বড় জোর ডিগ্রিটি ছাড়া অন্য বেশী কিছু ভাল জিনিষ এদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য অধিকাংশেরই ঘটে না। কন্টিনেণ্টের ছাত্রেরা এবং কন্টিনেণ্টে পড়িতে আসে, এমন ইংরেজ ছাত্রেরা কাপড়চোপড় সম্বন্ধে খুব সাদাসিধা, লণ্ডনের ইংরেজ ছাত্রদেরও সেই রকম দেখিলাম। সেকালে অক্সফোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে কাপড়চোপড়ের খুব বাঁধাবাঁধি ছিল, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বুড়া বয়সে অক্সফোর্ডের ছেলেদের বস্ত্রশৈথিল্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় অক্‌স্‌ফোর্ডে প্রত্যেককে অন্ততঃ এমন একসুট পোষাক রাখিতে হয়, যাহা পরিয়া সে কখনও খাড়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া বসিত না, পাছে ভাঁজ একটু নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল তো "অক্সফোর্ড ব্যাগ" সস্তা ঢিলা পোষাকের আদর্শ। লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকে যেরূপ বস্ত্রবাহুল্য করেন, তাহা ব্যাঙ্কের বড় কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য ইংরেজরা সহজে পারিয়া উঠেন না। লণ্ডনে এত ভারতীয় ছাত্র আছেন, তাঁহারা যদি পরিচ্ছদ, বান্ধবী, পানভোজন, আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য কমাইয়া নিজেরা সমবেত চেষ্টায় হষ্টেল চালাইয়া থাকেন, তবে খুব কম খরচে লণ্ডনে বাস করিতে পারেন ; ইহাতে দেশের অনেকগুলি টাকা লোকসান বন্ধ হয়, এবং অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রও বিলাতি এডুকেশনের সুযোগ পায়।

লণ্ডনের ভারতীয়দের খুব ন্যাশানালিষ্ট ভাব দেখিলাম। কন্টিনেণ্টের ভারতীয়দের মধ্যেও এভাব বেশ দেখা যায়। এদেশে বৎসরখানেক বাস করিবার পর অধিকাংশের মোহ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায়। ইহার কারণ যে নিকট সংস্পর্শে আসিয়া বিলাতি সভ্যতার অন্য কতকগুলি দিক চোখে পড়ে, যা দূর হইতে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে, এদেশের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের কালচার ও মনোবৃত্তির ক[illegible] তফাৎ ; একটু চিন্তাশীল প্রকৃতির যারা, তাদের উপর এই কারণটির ক্রিয়া বড়ই গভীর দাগ দিয়া যায়। তৃতীয়তঃ দেশে থাকিতে যাহারা ফেরঙ্গ-মার্গের সাধনা করেন অর্থাৎ বিলাতি আহার, বসন প্রভৃতির নিকৃষ্ট অনুকরণ, সন্ধ্যার সময় নিউ-মার্কেট অঞ্চলে ঘুরিয়া ইন্‌স্‌পিরেশন সংগ্রহ ও মনের গূঢ় প্রদেশে একদিন কমোডে বসিবার লোভ পোষণ করেন, তাঁহারা এদেশে আসিয়া দু'দিনেই দেখেন যে, এত সাধনা এত অনুরাগাসক্তি সব বিফলে গিয়াছে, যতই দামী বিলাতি কাপড় পরুন, যতই দামী হোটেলে যান, কিছুতেই সাহেবদের মত হইতে পারিতেছেন না, কুলি-মজুর পর্য্যন্ত তাঁহাদের 'নিগার'ই মনে করে, তখন তাঁহাদের "ভালাই মেরা ঠনাঠন দাস" রকমের স্বজাতিগর্ব্ব প্রবল হইয়া ওঠে। অল্পদিন এদেশে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাহারা সাহেব হয়, তাহারা নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়াই এরূপ হয়, তাহাদের সম্বন্ধে এদেশের ভারতীয়রা ঠিকই বলেন, "বেশী দিন তো থাকেন নাই, তাই একটু দেখিয়া তাক্ লাগিয়া গিয়াছে।" যাহারা বেশী দিন অর্থাৎ দুই তিন বা ততোধিক বৎসর এদেশে কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া কেন যে সাহেব হন এখনও বুঝিতে পারিলাম না, হয়ত দুষ্টামি করিয়া লোককে ঠকাইবার জন্য, নয়ত দেশের লোকের দুষ্টামিবশতঃ, কারণ ভুক্তভোগী অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে, সিধা চা'লে চলিলে লোকে প্রাপ্য মর্য্যাদাটুকুও দেয় না, বাঁকা চা'লে চলিলে খুব ভয়খাতির করে। একাদিক্রমে বা পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে এদেশে পাঁচ দশ কুড়ি পঁচিশ বৎসর থাকিয়াছেন, এমন অনেক ভারতীয়দের কন্টিনেণ্ট ও লণ্ডনে দেখিয়াছি, সকলেই দেশী ভাবের

দম্পতী, ভারতীয়ত্ব বা বাঙ্গালীত্ব সপ্রমাণে উৎসুক, নিজেদের সাহেব বলিতে বা সাহেবি চা'ল দিতে ঘৃণা বোধ করেন। এখানে আমরা একটু দেশী ডাল ভাত, একটু দেশী তরকারির খবর পাইলে সেই লোভে বড় হোটেলের দামী ডিনার ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত, স্বদেশীদের বাড়ীতে দেশীয় ভাবে খাওয়ার নিমন্ত্রণ পরম আপ্যায়ন ও আত্মীয়তার চিহ্ন মনে করি। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাস কয়েকের জন্য এদেশে আসিয়া কন্টিনেন্টে এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাদরের সহিত দেশীয় ভোজ্য খাইয়াছিলেন, শুনিলাম তিনি দেশে ফিরিয়া নিন্দা করিয়াছেন, 'আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডালভাত খাওয়াইয়াছিল! এমন আর কি লোক!' আমরা শুনিয়া বলিলাম, "সেজন্য দুঃখ কি? তিনি দেশে ফিরিয়া যেন সারাজীবন পাড়ার রাস্তার মোড়ের 'কেবিন'টিতে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চার পয়সার চপ কাট্‌লেট্ খা'ন।"

এদেশে থাকিবার ফলে জাতীয়ত্বের আত্মসম্মান জাগ্রত হওয়া খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু এই জাগরণটি সুবুদ্ধিপূর্ব্বক হওয়া উচিত। এদেশের একটু দেখিয়া দেশে ফিরিয়া দেশীভাব বিসর্জ্জন দিয়া সাহেব হইবার চেষ্টা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা ও বিফল, তেমনি এদেশের খারাপটা বা আমাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া এটা মনে করাও ভুল যে আমাদের সব ভাল, এদের সব মন্দ। বিচারবুদ্ধিতে ইউরোপের ভালটুকু যদি সরলভাবে দেশের উপযোগী করিয়া আমরা গ্রহণ করি ও তদনুসারে আমাদের সেই সেই বিষয়ে যে দুর্ব্বলতা তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করি, তবেই দেশ যথার্থ লাভবান হইবে। বাহ্যিক আচার, ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতির কথা তুলিতেছি না, কিন্তু এদেশে আসিয়া আমরা সকলেই যে জিনিষটা বুঝিতে পারি সেটা এদেশের কর্ম্মযোগ। এখানে সকলে কেমন করিয়া কাজটা ভাল করিয়া করে, সব কাজ এখানে কি গুণে যেন নিজে নিজেই সুসম্পন্ন হয়, কেনই বা আমাদের দেশে কিছুই কাজ হইয়া উঠে না, সব সাধনাই শূন্যে বিলীন হয়—এই রহস্য যিনি ভেদ করিতে পারিবেন, এই তত্ত্ব যিনি নিজে বুঝিয়া দশ জনকে শিখাইতে পারিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত উপকার করিবেন।

একদিন লণ্ডনের ঈষ্ট-এণ্ডের দরিদ্র পল্লী দেখিতে গেলাম। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেখানে আসিয়া নামিলাম, সে জায়গাটাকে লণ্ডনের অন্য ভদ্রপাড়ার তুলনায় দরিদ্র মনে হইলেও আশানুযায়ী কুৎসিত মনে হইল না। এর চেয়েও বেশী নিশ্চয় দেখিবার আছে মনে করিয়া পুলিশম্যানের শরণ লইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ঈষ্ট এণ্ডের গরীব পাড়া কোথায় দেখা যায়? পুলিশম্যান বলিল, "এই তো, চারিপাশেই।" আমি বলিলাম, "না, এর চেয়েও খুব গরীবরা যেখানে থাকে সেটা দেখিতে চাই", পুলিশটি বলিল, "খুব নোংরা লোক যেখানে থাকে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, খুব নোংরা গরীব লোকদের যেখানে অতি হতভাগ্য অবস্থায় দেখা যায়।" বর্ণবান বিদেশী লণ্ডনের উল্টাপিঠও খুঁটাইয়া দেখিতে চাহিতেছে বুঝিয়া পুলিশম্যানের ব্রিটিশ আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, একটু খোঁচা দিয়া সে এই অপমানের শোধ লইল, শান্তস্বরে পথের খবর দিয়া এটুকুও জুড়িয়া দিল, "ওসব জায়গায় অনেক কালা আদমিও বাস করে দেখিতে পাইবে।" অনেক গলি, ঘুঁজি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ওয়েষ্ট এণ্ডের তুলনায় ঈষ্ট-এণ্ড চমকপ্রদ বটে, কিন্তু তার দারিদ্র্য বা নোংরামি আমাদের কাছে এমন নূতন কিছু জিনিষ মোটেই নয়, অমন দারিদ্র্যের প্রকাশ তো আমাদের দেশে যত্রতত্র দেখা যায়। রাস্তাঘাট ও বাড়ীর বাহিরটা অপরিচ্ছন্ন হইলেও ঘরের মধ্যে যেটুকু দৃষ্টিতে পড়িল তাহার সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রের সৌষ্ঠব আমাদের দেশের অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের চেয়ে শ্রেষ্ঠই মনে হইল। লস্কর-শ্রেণীর অনেক কালা আদমিও দেখিলাম, ইহাদের অনেকে আবার টুপি তুলিয়া সেলামও করিল। একটি ছোট দোকানে কালা দোকানদার দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, লোকটি দিল্লী অঞ্চলের, একটি জার্ম্মান মেয়েকে বিবাহ করিয়া এখানে ঘর-সংসার ও কারবার পাতিয়াছে, খুব কমিউনিষ্ট, গান্ধী মহারাজকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

দিন কয়েক হাইড-পার্কে বক্তৃতা শুনিলাম। পুলিশের লাইসেন্স লইয়া বিভিন্ন দল বা সমিতির লোক রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে। সব বক্তারই শ্রোতা জোটে, অনেক সময় দুই বিরোধী দল পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পরের মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতেছে, যদিও তাহাতে সৌজন্যের কোন অভাব লক্ষিত হয় না; প্রত্যেকেই পরস্পরের কথা বলিতে হইলে

my friends over there বলিতেছে। বক্তারা সৌজন্য রক্ষা করিলেও শ্রোতারা কিন্তু সব সময়ে ঠাণ্ডা থাকে না। সেদিন ব্রিটিশ ফ্যাসিষ্টরা হাইড পার্কে সভা করিবেন শুনিয়া কমিউনিষ্টরাও সভা করিল। পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এজন্য পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, মোটর ও এরোপ্লেনচারী প্রায় সমগ্র লণ্ডন পুলিশফৌজ জমায়েত হইয়াছিল, "মার্ব্বল-আর্চ্চ" তোরণের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চপদস্থ পুলিশ-অফিসাররা অনবরত বেতারে পুলিশ-কমিশনারের কাছে মিটিংএর খবরাখবর পাঠাইতেছিলেন।

গাওয়ার ষ্ট্রীট ছাড়া লণ্ডনে "শাফি", "কোহিনুর", "ইণ্ডো-বার্ম্মা", "দিল্লী" প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় রেস্তরাঁ আছে। আছে। "শাফি" পাঞ্জাবীর দ্বারা এবং "কোহিনুর" ও "দিল্লী" দিল্লী-অঞ্চলের লোকদ্বারা পরিচালিত, "ইণ্ডো-বার্ম্মা" বাঙ্গালীর হাতে আছে। সবের মধ্যে গাওয়ার ষ্ট্রীটই সস্তা, বিশেষতঃ "শিলিং স্পেশাল" নামে এখানে যে মেনুর ব্যবস্থা আছে তাহাতে বেশ পেট ভরে। "শাফি"র দাম বেশ চড়া, জায়গাটা একটু অ্যারিষ্টোক্রাটিক, রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ডেলিগেটরা এখানে মজলিশ করিতেন। "কোহিনুর" মধ্যম রকমের দামের জায়গা, লোকও অনেক হয়। "ইণ্ডো-বার্ম্মা" ও "দিল্লী" নূতন জায়গা, দাম মাঝারি রকমের। গাওয়ার ষ্ট্রীটের বামুন ঠাকুর জাতে গোয়ানীজ এবং খদ্দেরদের মধ্যে দক্ষিণিদের প্রাধান্য হওয়ায় এখানকার রান্না ও মেনু দক্ষিণি-ভাবের, গোয়ানীজ রাঁধুনির হাতে উত্তর-ভারতীয় ডিশগুলি ভাল জমে না। "শাফি" ও "দিল্লী"তে পাঞ্জাবী রান্না, ঘি (অর্থাৎ ফ্যাট) মশলা প্রচুর, কিন্তু ঝালের অভাব, এটি গাওয়ার ষ্ট্রীটের দক্ষিণি রান্নায় বেশ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী-চালিত "ইণ্ডো-বার্ম্মা"তেও কিন্তু বাংলা রান্নার সুতার পাওয়া যায় না। গাওয়ার ষ্ট্রীট ছাড়া অন্যগুলিতে ওয়েটাররা দেশী লোক, বাঙ্গালী বা মেড়ো পুরাতন কাপড়ের দোকান হইতে জীর্ণ ফ্রক কোট প্রভৃতি কিনিয়া অপরূপ সাহেব-ওয়েটার সাজিয়াছেন। দেশময়ই তো সাহেব-ওয়েটার, এই মাত্র গোটা তিনচার জায়গাতে দেশীয় লোকদের মধ্যে বসিয়া দেশীয় খাওয়া খাইতে আসি, এখানেও যদি সাহেবি-বাঁদরামি দেখিতে হয়, তবে তো আর প্রাণ বাঁচে না! ব্যাপারটার মধ্যে একটা আর্ট-বোধের কুশ্রী অভাবের পরিচয় আছে। সাহেবাজ্ঞ্য লণ্ডনের মাঝখানে এই জায়গা কয়টির ওয়েটারগুলিকে যদি ভারতীয় খানসামার সুদৃশ্য পোষাকে সাজান হইত এবং আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার মধ্যে একটু ভারতীয় ভাবের আমদানি করা হইত, তবে ব্যাপারটা দেখিতে অনেক বেশী সুন্দর হইত, এবং অভিনবত্ব ও "ওরিয়েণ্টাল টাচ্" থাকার দরুণ অনেক ইংরেজ ও লণ্ডনভ্রামী কন্টিনেণ্টাল ও আমেরিকান খদ্দেরদেরও আকর্ষণ করিয়া ব্যবসায় বৃদ্ধি করিত। দক্ষিণি ও পশ্চিমা অনেক তরকারি প্রভৃতির মেনুতে লিখিত দেশী-নাম গাওয়ার ষ্ট্রীটের মেম-ঝিদের মুখে উচ্চারিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে। (এই প্রসঙ্গে ব্র্যাকেটের ভিতর লিখিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে "ছোঁড়া"-দের উপদ্রবে গাওয়ার ষ্ট্রীটের কর্তৃপক্ষ তরুণী বা যুবতী ঝি রাখিতে ভরসা পান না; বুড়ী বা রূপহীনা যে কয়টিকে রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বকের মত নাকমুখধারিণী একটি ঝির বয়সটা খুব বেশী না হওয়ায় এবং গালে ঠোঁটে রং মাখাটা বেশ বেশী হওয়ার "ছোঁড়া"রা অনেকে তাহার এমনই খাতির করেন যে, নিজেকে মহাসুন্দরী মনে করিয়া সে এখন তার বক-নাসিকাটা আরও শূন্যে তুলিয়া বেড়ায়। শুনিলাম কিছু দিন আগে একটি মিস্ত্রিমজুর শ্রেণীর ইংরেজ গলায় এই প্লাকার্ডটি ঝুলাইয়া গাওয়ার ষ্ট্রীট হষ্টেলের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিত "একজন ইণ্ডিয়ান আমার বৌকে ভাগাইয়া লইয়া গিয়াছে।" বন্ধু-সমাজে গল্প-বাহাদুরির সময় কিন্তু শোনা যায়, সকলেরই বান্ধবীরা "ইউনিভার্সিটি গার্ল", জার্ম্মানিতে হইলে ধনী ব্যারণের উত্তরাধিকারিণী!)

গাওয়ার ষ্ট্রীটে একদিন একটি সান্ধ্য-সমিতি ছিল। অনেকদিন পরে কয়েকটি বাংলা ও হিন্দী গান শুনিতে মধুর বোধ হইল। গাওয়ার ষ্ট্রীটের সিংহলী চাকরবাকরদের মধ্যে একজন লোক কয়েকটি সিংহলী "ফোক্ ডান্স" নাচিল, তাহার মধ্যে "ব্যাঘ্র-নৃত্য" নামক একটি নাচের সবীর্য্য কিন্তু সহজ বিক্রমভঙ্গিমার উদ্দাম লালিত্য এমন "একসপ্রেসিভ" হইয়াছিল যে, আর্ট-রসিক সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সার আবদুল কাদের সভাপতি ছিলেন, তাঁহার পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার পর আহূত না হইলেও ইংলণ্ডে নবাগত, দীর্ঘশ্মশ্রুধারী, মধ্যবয়সী একজন শিখ ফিলজফির প্রফেসার বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ

জগদীশচন্দ্রের পর আমাদের দেশের অনেক কেষ্টবিষ্টুরই ইউরোপে খাতির পাইবার একটা গুপ্ত 'কম্‌প্লেক্‌স' থাকে। শিখ অধ্যাপক বোধ হয় এদেশে আসা অবধি মুখ খুলিতে না পাইয়া বড়ই মনঃকষ্টে ছিলেন, এখন সুবিধা পাইয়া এমন দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন যে, ছেলেরা বাধ্য হইয়া ঘন ঘন হাততালি পাতালি দিয়া তাঁহাকে বসাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উল্টা সমঝিলেন শিখরাম, এইবার ইউরোপে নাম জাহির ও দেশের কাগজে রিপোর্ট হইবে ভাবিয়া ভদ্র-লোকের উৎসাহ এমনই বাড়িয়া গেল যে, শেষটা একটা কেলেঙ্কারির জোগাড় হয় আর কি!

লণ্ডন হইতে আবার সোভিয়েট জাহাজে হাম্বুর্গ ফিরিলাম, এবারও নর্থ-সী বেশ ঠাণ্ডাই ছিল। তিনজন ভারতীয় ছাত্র জাহাজে ছিলেন, একজন মহারাষ্ট্রী, ব্রিষ্টলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়েন, কিছুদিন জামশেদপুরে কাজ করিয়াছিলেন তাই বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন। দ্বিতীয়টি কচ্ছি, তৃতীয়টি সিংহলী তামিল—ইঁহারা দুজন কেম্ব্রিজে গণিত পড়িয়াছেন ও আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়া দেশের পথে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমেরিকা ও লণ্ডন-প্রবাসী কয়েকটি রাশিয়ান পরিবার দেশে ফিরিতেছেন—তাঁহাদের ইস্কুল বয়সের ছেলে-মেয়েরাও সঙ্গে আছে। অতি-তরুণরা সোভিয়েট-শিক্ষা কেমন হজম করিয়াছে দেখিবার লোভ হইল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সোভিয়েট তত্ত্ব আলোচনা করিলাম, সে সন্ধ্যাটা লাউঞ্জ-ঘর বেশ জমিয়া উঠিল, তরুণদের মা-বাপরাও আসিয়া সাগ্রহে আলোচনায় যোগ দিলেন। তরুণরা দেখিলাম খুব সতেজ ও উৎসাহী কমিউনিষ্ট, বেশ পরিষ্কার ভাবে ও কৈশোর সরলতার সঙ্গে কমিউনিজমের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিবার ও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, একটু ঘুরাইয়া বা তলাইয়া প্রশ্ন করিলে ছেলেদের যেখানে উত্তর দিতে আটকাইয়া গেল, সেখানে মেয়েরা ছেলেদের থামাইয়া দিয়া সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইল। ছেলেরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আলোচনা করিল, জটিল প্রশ্ন তুলিলে সমাধানের অন্য পথ না পাইলে পুরুষোচিত বলপ্রয়োগের দ্বারা সব বাধাবিপত্তি খণ্ডনের ব্যবস্থা করিল; কিন্তু মেয়েরা নিজের বুদ্ধি খাটাইবার চেষ্টা না করিয়া সোভিয়েট-ইস্কুলের শিক্ষকের নির্দ্দিষ্ট পথেই উত্তরের ধারা চালাইল, কাজেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উত্তর সঠিক ও যথাযথ হইল; শিক্ষকের যে ব্যবস্থা মনে গাঁথিয়া গিয়াছে তাহাতে আপত্তি তুলিলে মেয়েরা কষিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল, এবং আরও বেশী বিরক্তিকর প্রশ্ন তুলিলে উল্‌টিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বল এটার কি ব্যবস্থা করা উচিত!" মা-বাপরা দেখিলাম তরুণ উৎসাহে মহা উৎসাহী ও আলোচনায় যোগদানে সমুৎসুক; তরুণরা কিন্তু আবার মা-বাপকে থামাইয়া দিয়া নিজেরাই সমস্ত আলোচনাটা চালাইতে চায়।

হাম্বুর্গ হইতে একটি বন্ধুর মোটর-বাইকের পিছনে চড়িয়া একদিন বাল্‌টিক সাগরে স্নান করিতে গেলাম। পথে ল্যুবেক Lubeck সহর পড়িল, এখানে মধ্যযুগের অনেক বাড়ীঘর আছে। সাগরতীরের জায়গাটির নাম ট্রাভেমুণ্ডে Travemunde, ছোট সহর, আর সাগরতীর ব্যাপিয়া হোটেল ও কাফে। প্রায় দুই মাইল বেলাভূমি স্নান-বিলাসীতে ভরিয়া গিয়াছে। সারাদিন সাগরতীরে কাটাইয়া দিলাম, যাহারা হোটেলে না ওঠে তাহারা সবাই সঙ্গে লাঞ্চ লইয়া আসে, বালিতে বসিয়াই লাঞ্চ সারিয়া লয়। তীরময় অনেক লাউড-স্পীকার খাড়া করা আছে, বালিতে শুইয়া শুইয়া অনেক গানবাজনা শোনা যায়। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট কাফেতে আহার করিলাম। একটি বুড়া লোক এখানে বসিয়া সারা-সন্ধ্যা বিয়ার টানিতেছিল, লোকটা লড়াইয়ে ছিল এবং আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িল, বিয়ারের ঝোঁকে বারে বারে উত্তেজিত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিল, "তোমারই দেশের সেপাইরা দাঁতে কুকরি লইয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রে বেরালের মত চুপে চুপে আমাদের ট্রেঞ্চে পড়িয়া আমাদের গলা কাটিত!" আমার সঙ্গীরা মজা দেখিবার জন্য লোকটিকে খুব উস্‌কাইয়া দিতে লাগিলেন, আমিও বাচনিক ছাড়িয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার শারীরিক আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া হাসিতে লাগিলাম, অবশেষে কাফের মালিক আসিয়া লোকটিকে নিরস্ত করিয়া সরাইয়া দিলেন।

যে কোনো ভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে অমনি খেতে বসার চেষ্টা রোগী যেন কখনো ভুলেও না করেন। ভাত, তরকারী ঠাণ্ডা হয়ে যাক—তবুও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিটাকে দূর না করে যেন টি. বি. রোগী কখনই খেতে চেষ্টা না করেন। তারপরে আর একটি "সম্পূর্ণ বিশ্রামে"র সময় হচ্ছে খাওয়ার ঠিক পরেই। দুপুর বেলাকার খাওয়া শেষ করে দুই বা তিন ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবার পরেও এই বিশ্রামটির অবহেলা রোগী দীর্ঘকাল অবধি করতে পাবেন না। তারপরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরেও আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অবধি সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

এবারে টি. বি. রোগের "স্যানাটোরিয়াম"-চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করব।

ডাক্তার যখন রোগ নির্ণয় করে বলে দেন যে "টি. বি." হয়েছে, তখন রোগীর নিজের মনে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, স্যানাটোরিয়ামে যাওয়া উচিত হবে কি না। প্রকৃতপক্ষে স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে (এমন কি ডাক্তারের মনেও) এত অসংখ্য ভুল ধারণা আছে। খুব কম লোকেই স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখেন। প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা স্যানাটোরিয়ামে হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ, স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসা-প্রণালী। এর আগে যে সব কথা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে পাঠক বেশ বুঝে নিতে পারবেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম এবং মুক্ত বায়ু এই রোগের চিকিৎসা। পুষ্টিকর খাদ্য এবং মুক্ত বায়ুর কথা আপাততঃ ছেড়ে দিলাম, ফুসফুসকে বিশ্রাম দেবার জন্যে স্যানাটোরিয়ামে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, সে সব ব্যবস্থা বাইরের রোগীর পক্ষে করা অনেক সময়েই প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অনেক সময়ে নিরাপদও নয়। খালি শুয়ে থাকলেই বুকের সম্পূর্ণ বিশ্রাম মোটেই হয় না, ওঠা-বসা করলে ত কথাই নেই। শুয়ে থাকার ফলে আংশিক বিশ্রাম যা হয় তাতে রোগের উপশম হতে অত্যন্ত দীর্ঘকাল সময় নেয়, কখনো কখনো বিশেষ কিছুই কাজ হয় না। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামে এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে, যার সুফল অত্যন্ত শীগ্‌গিরই প্রকাশ পায়। কোন একটা উপসর্গ প্রবল হয়ে উঠলে তাকে যথাসম্ভব সত্বর প্রশমিত করবার আয়োজন স্যানাটোরিয়ামে সর্ব্বদাই থাকে এবং হাতের কাছে বিচক্ষণ চিকিৎসককে সর্ব্বদা পাবার দরুণ রোগীর মনে যথেষ্ট সাহস থাকে। এই ব্যাধির আধুনিক উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতির সর্ব্ববিধ সুবিধা পাওয়া একজন রোগীর পক্ষে একমাত্র স্যানাটোরিয়ামেই সম্ভব। ইঞ্জেক্‌শানে এবং অপারেশানে এই চিকিৎসাগুলির ব্যবস্থা অধিকাংশই এমন, যে গুলি চলবার সময়ে সর্ব্বদা ডাক্তারের চোখে চোখে থাকবার দরকার হয় এবং অনেক সময় এমন সব উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়, যার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া দরকার। বাইরে থেকে এ সব কদাচিৎ সম্ভব হয় এবং রোগী নিজের অবস্থা বিপজ্জনক করে তোলে। তারপরে রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতিমাসে এত অসংখ্য বার এত অসংখ্য উপায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তার চিকিৎসা এবং আরোগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—যে সবের ব্যবস্থা রোগীর পক্ষে বাড়ীতে থেকে করা অসম্ভব। রোগীর বিশ্রামের অবস্থা থেকে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে। আমি যা কিছু বলেছি-- একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যেই। কিন্তু বিশ্রামের অবস্থা থেকে পরিশ্রম সুরু করবার সময়ে রোগীর দায়িত্ব যে কতখানি, কত সতর্কতার সাথে তাকে যে অগ্রসর হতে হবে, তা বুঝিয়ে বলবার নয়। বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে এবং রোগী নিজে কিছুই জানতে পারে না যে, তার বুকের অবস্থা কি রকম—এমন কি বাইরের সমস্ত লক্ষণ যথেষ্ট ভাল থাকলেও হঠাৎ একদিন গিয়ে একজন ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করিয়ে এলেও কিছুমাত্র সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। স্যানাটোরিয়ামে

যাদবপুর হাসপাতাল: একদল ওয়ার্কিং পেশেণ্ট। চিহ্নিত রোগী প্রবন্ধের লেখক। (যাদবপুর হাসপাতালের অন্যতম ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ভাবে ফটোটি তোলা হইয়াছে)।

চিকিৎসক দীর্ঘ দিন রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে যে ব্যবস্থা দিতে সক্ষম হন, সেটাই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর পরিচর্য্যা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা এত বেশী যে, তা বলবার নয় এবং এই অজ্ঞতার ফলে রোগীর উপযুক্ত পরিচর্য্যা বাড়ীতে হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। যাদের হাতে এই রোগীর সেবার ভার থাকে, তাঁদের দুইটি কর্ত্তব্য---একটি রোগীকে সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা এবং আর একটি, পরিবারের অপর সবাইকে নিরাপদ রাখবার চেষ্টা। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছে যে, এই দুটোর কোনটাই বাড়ীতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। নানা মুনি আসেন নানা মত দিতে, রোগীকে নিয়ে চলে ছেলেখেলা। রোগের গুরুত্ব পারেন না কেউ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে, রোগীর প্রতি চলে বহু অবিচার এবং এক ভাবে নয়, নানাভাবে রোগীর উন্নতির মূলে করা হয় কুঠারাঘাত—শুধু এই বহুবিধ অজ্ঞতার ফলে।

তৃতীয়তঃ, একটি স্যানাটোরিয়ামে রোগীর অনেক কিছু শিখবার, জানবার, বুঝবার আছে। এই রোগটা একটি দিন, দুটি দিন, দুটি মাস অথবা ছ'টি মাসের ব্যাপার নয়। অনেক সময়ে একটি লোকের সমস্ত জীবনটাই ওলট-পালট হয়ে যায় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে। এই রোগের এমনই মজা যে, নিজেকে সুস্থ করা বহু কষ্টে যদি বা সম্ভব হয়, তার চেয়ে আরও কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় নিজেকে সুস্থ রাখা। একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত হবার পরে জীবনের ভবিষ্যতের অনেকখানি অংশকে, এমন কি কোন কোন সময়ে সমস্ত ভবিষ্যৎকেই নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন হয়। জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার সম্পূর্ণ শিক্ষা স্যানাটোরিয়ামে বাসের অভিজ্ঞতা থেকেই ভাল ভাবে হতে পারে—বাইরে থেকে এক আধজনের মুখে একটু শুনে অথবা কেতাব পড়ে এটি হয় না।

যাদবপুর হাসপাতাল (অপারেশন থিয়েটার): রোগীর বুকে এ. পি. করা হইতেছে। (এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের তোলা ফটো)।

চতুর্থতঃ, স্যানাটোরিয়ামে একজন টি. বি. রোগী এমন বহু রোগীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়, যারা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা নিয়ে এসে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এদের দেখে রোগী নিজে উৎসাহ পায়। আর স্যানাটোরিয়ামে তার মত বহু লোকেই যে কড়াকড়ির ভিতরে থাকে, সেই কড়াকড়ি মেনে চলা রোগীর মনের উপরে খুব বিরুদ্ধ ক্রিয়া করে না এবং রোগী নিজের খেয়াল মত যা খুশী তাই করবার সুযোগ না পেয়ে ধীরে ধীরে এবং অবাধে আরোগ্যের পথে চলতে থাকে। তার কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলতাই এখানে প্রশ্রয় পাবে না- সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার একটা ভীষণ প্রতিযোগিতার মাঝখানে।

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার দোষত্রুটি যে কিছুই নেই, একথা নিশ্চয়ই সত্য নয়; কিন্তু দোষের চেয়ে গুণের ভাগ এত বেশী যে সেগুলির আলোচনা করতে আমি অনিচ্ছুক।

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হবার আগে টি. বি. রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল। রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা অতি সচরাচর করা হ'ত; ব্যবস্থা করা হ'ত হরেক রকম বাজে ওষুধের, অনেকগুলি রোগীকে একত্র করে রেখে দেওয়া হ'ত গরম ঘরের ভিতরে, ইত্যাদি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে George Boddington টি. বি'র চিকিৎসায় বিশ্রাম এবং মুক্ত বায়ুর বিষয় সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় যে, তিনি অতিমাত্রায় নিরুৎসাহ হয়ে ইংলণ্ডে তাঁর স্থাপিত হাসপাতাল নিজেই তুলে দেন। পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান চিকিৎসক Hermann Brehmer জার্ম্মেনীর দক্ষিণাংশে একটি স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত করে বিশ্রাম, মুক্ত বায়ু এবং ক্রম-ব্যায়াম দ্বারা টি.বি. রোগীর চিকিৎসা করতে লাগলেন। এইটিই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম যক্ষ্মানিবাস এবং স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার গোড়াপত্তনের সাথে ব্রেমারের নামই সর্ব্বপ্রধান ভাবে জড়িত। আমেরিকায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য চিকিৎসক Edward Livingstone Trudaw সর্ব্বপ্রথম Saranac Lake-এ পাহাড়ের উপরে একটি কটেজ স্থাপিত করে—তাঁর প্রথম দুটি রোগীর জন্যে—যুনাইটেড ষ্টেটস-এ স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার সূত্রপাত করলেন। আস্তে আস্তে এই রকম করে সুরু হয়ে এখন ত স্যানাটোরিয়ামে দেশ ছেয়ে গিয়েছে।

যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ে, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় এবং যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যপ্রচারে কত জনের যে ছোট বড় কত কৃতিত্ব আছে, তার অন্ত নেই এবং কোনটিরই মূল্য কম নয়। যক্ষ্মাজীবাণুর আবিষ্কর্ত্তা রবার্ট কথের কথা প্রথম প্রবন্ধে বলেছি। তাঁর বহুকাল পূর্ব্বে Rene-Theophile Hyacinth Laennec (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন) নামে একজন প্রতিভাশালী তরুণ ফরাসী চিকিৎসক আবিষ্কার করেন ষ্টেথোস্কোপ এবং এই ব্যাধিসংক্রান্ত নানা বিষয়ে অনেক আলোকপাত করেন। Wilhelm Konrad Roentgen ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে X-ray উদ্ভাবন করেন। তখন অবিশ্যি শরীরের কোন হাড় মটকে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকের শরীরের কোথাও গুলি বিঁধলে এই সব ধরণের জিনিষ দেখবার জন্যেই চিকিৎসাক্ষেত্রে X-rayর বেশী চলতি ছিল। ক্রমেই X-rayর প্রয়োজনীয়তা বহুভাবে বেড়ে উঠবার সাথে সাথে টি. বি'র চিকিৎসায় ত বর্ত্তমানে X-ray একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Carlo Forlanini আবিষ্কার করেন—অধুনাসুপরিচিত Artificial Pneumothorax,—সংক্ষেপে A. P.। অবশ্য আরও অনেকের কল্পনায় এটি ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্যতার সাথে Forlaniniই এটির ব্যবহার সবচেয়ে প্রথমে করেন। A. P. সম্বন্ধে পরে বুঝিয়ে বলব, তাতে ব্যাপারটা কি সাধারণ লোকে বুঝতে পারবেন। তার পরে Dr. A. Rollier, একজন সুইস সার্জেন সূর্য্যালোক দ্বারা অস্থির যক্ষ্মা-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আল্পস্ পর্ব্বতে Leysin-এ তিনি একটি Clinic স্থাপিত করেন, এখন সেটা বিখ্যাত

স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হয়েছে। যাই হোক, এই রকমভাবে বহুজনে এই ব্যাধিসংক্রান্ত বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন এবং আজও করছেন।

তবে ১৮৮০ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ অবধি স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার প্রণালী দোলত নানা ভাবে। কখনো খালি উচিত হাওয়া খাওয়ানোরই ধুয়ো, শীতে এবং গ্রীষ্মে রোগীকে একেবারে জমিয়ে অথবা একেবারে পুড়িয়ে, কখনো অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে উপেক্ষা করে রোগীদের একেবারে ঠেসে দুধ-ডিম খাইয়ে, দিনের ভিতরে আটবার দশবার ষোড়শোপচারে ব্যবস্থা করে উচিত খালি ওজন বাড়ানোর ধুয়ো, কখন বা উচিত অতিরিক্ত পরিশ্রম করানোর ধুয়ো। Journal of Outdoor Life-এ California র একজন বৃদ্ধ লোক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন: তিনি যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে রক্তবমির অবস্থায় Saranac Lake-এ Dr. Trudaw র স্যানাটোরিয়ামে যখন চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি প্রথমেই ব্যবস্থা হয়েছিল প্রত্যেকদিন তিন মাইল করে বেড়াবার—আবহাওয়ার অবস্থা যাই থাক না কেন! ভাগ্য বলতে হবে যে, বুড়া এই রকম অসঙ্গত চিকিৎসায়ও বেঁচে উঠেছিল।

আজকাল নানারকম অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ফলে মাত্রা ছাড়িয়ে সব কিছু করবার ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে এবং চারিদিকে একটা সাম্য এবং সামঞ্জস্যের মাঝখানে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা বেশ সন্তোষজনক পথে চলেছে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার জন্যে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলেন, তবে তাঁকে এই ভাবে অগ্রসর হতে হবে। রোগী যে, স্যানাটোরিয়ামে যেতে চান, প্রথমে সেখানে চিঠি লিখে ভর্ত্তির এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ফরম আনাতে হবে। যথাযথভাবে এগুলি পূরণ করে আবার তা ওই স্যানাটোরিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা মেডিক্যাল অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। চিঠির উত্তর এবং অনুমতি হয়তো শীগগিরই আসবে, কিন্তু তখুনি রওনা হওয়া হয়তো নাও চলতে পারে। স্যানাটোরিয়ামে সিট খালি হওয়া ভয়ানক মুস্কিল, এক মাস থেকে হয়ত চার পাঁচ মাসও দেরি হয়ে যেতে পারে। একটু খোঁচাখুঁচি করে অথবা দরকার হলে ধরাধরি করে যত শীগগির সম্ভব স্যানাটোরিয়ামে বেড পেতে চেষ্টা করা উচিত—বাড়ীতে পড়ে থাকা কোন ভাবেই নিরাপদ নয়। রোগীর ভাগ্য নিতান্ত ভাল হলে দরখাস্ত করার সাথে সাথেও হয়ত রওনা হবার আদেশ চলে আসতে পারে। অধিকাংশ সময়েই যখন কমবেশী বিলম্ব করতে হয়, তখন যতদিন পর্য্যন্ত স্যানাটোরিয়ামে রওনা হবার আদেশ না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত রোগীর খুব সাবধানে থাকা উচিত এবং কোনরকম অনিয়ম অত্যাচারে রোগ যাতে বেশী দূর অগ্রসর হবার সুযোগ না পায়, আন্তরিকতার সাথে সে চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বায়ুতে অবস্থান—এই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রতীক্ষাকালে রোগীর সমস্ত তোড়জোড় সেরে ফেলে দিতে হবে। সম্পূর্ণ এক প্রস্থ বিছানা, মশারি, তা ছাড়া জামাকাপড় চোপড়—সমস্ত কিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, সার্ট, তোয়ালে, কাপড়, রুমাল—ইত্যাদি সবই দু' চারটা ক'রে অতিরিক্ত থাকা দরকার, নৈলে স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে কেনা-কাটি অথবা তৈরী করা রোগীর পক্ষে বিস্তর হাঙ্গামা হবে। থার্ম্মোমিটার, পকেট-স্পিটুন, মাউথ গ্লাস, খাবার বাসনপত্র এসবও রোগীর নিজের থাকবে। কোন পাহাড়ে স্যানাটোরিয়ামে যদি রোগীর যাওয়া ঠিক হয়, তবে জুতো, মোজা, মাফলার, সোয়েটার, কোট, ওভারকোট, দুটো একটা আণ্ডার-অয়্যার, প'জামা এসব যেন রোগীর থাকে। সেভ করবার সমস্ত সরঞ্জামও পুরুষ-রোগীর রাখা দরকার। মেয়ে-রোগীরা যেন বিশেষ কোন গয়নাপত্র অলঙ্কার নিয়ে স্যানাটোরিয়ামে না যান; কারণ ওগুলি হারিয়ে গেলে অথবা চুরি গেলে স্যানাটোরিয়াম দায়ী থাকে না। রোগীর আত্মীয় স্বজন যেন স্মরণ রাখেন, রওনা হবার সময়ে গাড়ীতে রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে এবং যথেষ্ট সাবধানে এবং যথেষ্ট আরামের ভিতরে রাখতে চেষ্টা করতে হবে—যদি রোগীর শরীরে বিশেষ কোন গ্লানি থাকে, তবে তো কথাই নেই। কিছু পয়সা বাঁচাতে চেষ্টা ক'রে রোগীর প্রাণ পথেই যেন বার করে না দেওয়া হয়। বুকের অবস্থা এবং উন্নতি অবনতি অনুযায়ী স্যানাটোরিয়ামে ছয় মাস থেকে এক বছর, দেড় বছর অথবা তার চেয়েও বেশীদিন থাকতে হতে পারে। এর জন্যে রোগীকে সব দিকে তৈরী হ'য়ে যেতে হবে।

স্যানাটোরিয়াম-জীবন দুইভাগে বিভক্ত—বিশ্রামের অবস্থা এবং ব্যায়ামের অবস্থা। প্রথম, স্যানাটোরিয়ামে যাবার পরেই রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত রোগীকে এই ভাবে থাকতে হয় ততদিন তাকে বলা হয়, bed patient. তারপরে দিন যেতে যেতে যখন বুকের বেশ উন্নতি হতে থাকে, সব উপসর্গ কমে যায়, তখন ধীরে ধীরে রোগীকে হাঁটতে সুরু করতে হয়। এই সময় তারা walking patient নামে অভিহিত করা হয়। রোগী স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরেই তার বুকের X-ray ফটো-তোলা হয়, রক্ত, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়, তার পরে অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বহু রকমের ইঞ্জেক্‌শান ও অপারেশন স্যানাটোরিয়ামে করা হয়। তার ভিতরে প্রধান দু'চারটির নাম করছি। ইঞ্জেক্‌শানের ভিতরে Calcium, Gold, Tuberculin ইত্যাদি এবং অপারেশানের ভিতরে Artificial Pneumothorax, Thoracoplasty, Phrenic evulsion, Apicolysis, ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও নানা রকম আছে—তবে Calcium, Gold এবং Artificial Pneumothorax-এর চলতিই অত্যন্ত বেশী। Artificial Pneumothorax (সংক্ষেপে—A. P.) আজকাল বহু খারাপ রোগীরও প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে এবং এর ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বগলের নীচে বুক ফুঁড়ে Pleural Space-এর ভিতরে হাওয়া দিয়ে ফুসফুসের অসুস্থ অংশকে চেপে রাখা এই ইঞ্জেকশান দ্বারা সাধিত হয়। দুঃখের বিষয় এমন কতকগুলি কারণ আছে, যার জন্যে অনেক রোগীর A. P. চিকিৎসা চলে না। ভাল ভাবে চললে পরে এই ইঞ্জেকশানটা

বেশ ফলপ্রদ। এই ইঞ্জেকশানে হাওয়ার বদলে আজকাল কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন তরল তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তা'কে বলা হয়,—Oleothorax. তবে Oleothorax-এর চলতি এখনও তেমন নয়। A.P. কেমন করে দেওয়া হয়, A. P-র পরে বুকের কোথায় কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে, A. P-র ফলে কেমন ক'রে বুকের উন্নতি হয়, A. P. চিকিৎসার ক্রমোন্নতি কেমন ক'রে হল, এবং অন্যান্য ইঞ্জেকশান এবং অপারেশানগুলি সম্বন্ধেও বিশদভাবে জানবার হয়তো অনেকের কৌতূহল থাকতে পারে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত হ'লাম। স্যানাটোরিয়ামে ultra-violet-এর ব্যবহারও হয়ে থাকে এবং রোগীর যদি টি, বি, ছাড়াও অন্য কোন ব্যাধির কোন উপসর্গ থাকে, তবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও কম-বেশী যথাসম্ভব করা হয়ে থাকে।

যক্ষ্মা: স্যানাটোরিয়াম।

স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের সারাটা দিন নিম্নলিখিত ভাবে কাটাতে হয়। Bed patient দের নিয়ম হচ্ছে :—

সকাল ৬টা—টেম্পারেচার গ্রহণ (তবে আর আগে জাগলে পরে ঠিক জাগবার সময়ে নিতে হবে)।

৬.১৫—মুখধোয়া ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য।

৭—সকাল বেলাকার খাবার।

ভিতরে পায়চারি করতে দেওয়া হয়েছে তারা তাই করবে।

৯—টেম্পারেচার গ্রহণ।

১১—"ব্রেকফাস্ট"—মধ্যাহ্ন ভোজন।

১১.৩০—১২—যাদের পায়চারী করতে দেওয়া হয়েছে তারা তাই করবে।

১২—টেম্পারেচার গ্রহণ।

১—৩—সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

৩—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৪—"ডিনার"—অপরাহ্ন ভোজন।

৫—৬.২৫—যাদের পায়চারী করতে দেওয়া হয়েছে তারা তাই করবে।

৬.২৫—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৬.৩০—৭.৩০—সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

৭.৩০—"সাপার"—নৈশভোজন।

৮.৪৫—টেম্পারেচার-গ্রহণ ডাক্তার বললে পরে।

রাত্রি ৯—শয়ন।

আর "ওয়াকিং" পেশেণ্টদের নিয়ম হচ্ছে :—

সকাল ৬টা—টেম্পারেচার-গ্রহণ (আর আগে জাগলে পরে জাগবার সময়ে)।

৬.১৫—মুখ হাত ধোয়া—ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য।

৭—সকাল বেলাকার খাবার।

৮—১০—বেড়াতে বেড়ানো—যার যে রকম ব্যবস্থা থাকবে। বেড়িয়ে এসে টেম্পারেচার নিতে হবে।

৯—১১—বিশ্রাম। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী যে যখন বেড়িয়ে ফিরবে তারপর থেকে।

১১—"ব্রেক ফাস্ট"।

১১.৩০—১—একটু আমোদ প্রমোদ—অথচ পরিশ্রম না হয়।

১—৩—সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

৩—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৩.১৫—৪—একটু আমোদ প্রমোদ—শ্রম-হীন।

৪—"ডিনার"।

৪.৪৫—৬.২৫—বেড়াতে বেরুনো—যখন যার যতটুকু করে ব্যবস্থা থাকবে।

৬.২৫—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৬.৩০—৭.৩০—বিশ্রাম।

৭.৩০—"সাপার"।

৮—৮.৪৫—শ্রমবিহীন আমোদ প্রমোদ।

৮.৪৫—টেম্পারেচার গ্রহণ,—ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকলে।

৯—শয়ন।

আমি যে টাইম-টেবলটা দিলাম এটি দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী নয়। বহু অদল-বদল থাকে—তবে গোড়াকার ব্যাপারগুলি এবং চিকিৎসার আদত প্রণালীগুলি সর্ব্বত্রই প্রায় এক। কিন্তু তাই বলে একটি জিনিস জেনে রাখা ভাল যে, সব স্যানাটোরিয়ামই সমান উন্নত নয় এবং সব স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তারও সমান নয় অথবা এক মতাবলম্বী নয়। আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালীর যেখানে সর্ব্ববিধ সুবন্দোবস্ত আছে, সেখানেই রোগী যেতে চেষ্টা করবেন—আগে থেকে বেশ করে খোঁজখবর নিয়ে। অবশ্য আন্দাজে পণ্ডিতী করবার স্বভাব যাদের, তাদের কাছ থেকে কোন খোঁজ-খবর না নেওয়াই ভাল। সোজা স্যানাটোরিয়ামেই লেখা উচিত।

অধিকাংশ স্যানাটোরিয়ামেই সম্পূর্ণ বিনা খরচায় কিছু কিছু রোগী রাখবার বন্দোবস্ত আছে। যে সব রোগী অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁরা এই সব "ফ্রী বেড"-এর জন্যে চেষ্টা করতে পারেন।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত আরোগ্যলাভ। এবং এই আরোগ্যলাভের জন্য তার অভ্যাস ক'রতে হবে অসীম সংযম আর নিষ্ঠা। অভ্যাস ক'রতে হবে তার বিপুল ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা। রোগীকে হতে হবে সাহসী এবং নির্ভীক। কত রোগীর কত যন্ত্রণার কথা, কত রোগীর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ কানে আসবে চোখেও দেখতে হ'তে পারে। নিজের শরীরেও যথেষ্ট গ্লানি থাকা সম্ভব। কিন্তু তার ভিতরেও নিজেকে রাখতে হবে শান্ত, সমাহিত। আমি তো নিজে রোগী—সে কথা আমার প্রথম প্রবন্ধেই বলেছি। আমিও এই প্রবন্ধ লিখছি একটি হাসপাতালেরই একটি কক্ষে শুয়ে। আমার ঘরের তিন চারটি ঘর পরেই একটি ঘরে রয়েছে ১৬।১৭ বছরের একটি ছেলে—অসুখ খুব বেশী। জ্বর হয় ১০৩', ১০৪' ডিগ্রী করে, ওজনে ভয়ানক কমে গেছে, গায়ের বর্ণে নেই একটুকু উজ্জ্বল্য, দুটি চোখ পর্য্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে চুপচাপ পড়ে থাকে, কারুর সাথে কথা-টথা বলে না। সেদিন দেখি বিছানার ওপরে উঠে বসে আছে। আর একজন সুস্থ রোগী সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন—"উঠে বসেছ যে? শুয়ে পড়—শুয়ে পড়!" ছেলেটির পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ ঠোঁট দুটিতে ফুটে উঠল একটি ম্লান, পলাতক হাসির রেখা। ক্লান্ত স্বরে বলল—"শুয়েই তো থাকি সুধাংশু দা, আর পারি না!" দেখি, আর একদিন অসীম দুঃসাহস করে বিছানা থেকে উঠে এসে ছেলেটি আমার ঘরের সামনে দিয়ে টলতে টলতে যাচ্ছে। আমার ঘরে ঐ সুধাংশু বাবু বসে একটানা তাঁর এক প্রেমের গল্প আমার কাছে করছিলেন, বছর তিনেক আগে তাঁর বিলাতে অবস্থানকালীন এক আইরিশ মেয়ের। সহসা ছেলেটিকে দেখে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন—"আরে আরে করেছ কি! কোথায় যাচ্ছ? কি সর্ব্বনাশ!" ছেলেটির ঠোঁটে চকিতের জন্য ভেসে এল সেই একটু প্রান্ত হাসি। বলল, "প্রভাত দাকে একটু দেখে আসি; আর পারি না সুধাংশুদা শুয়ে থাকতে...।"

ছেলেটির এই যে 'আর পারি না' উক্তি—এর পিছনে যে তার কতখানি মর্ম্মবেদনা লুকানো তা' আমি বুঝতে পারি। ছেলেটির মুখের দিকে তাকাতে পর্য্যন্ত আমার কষ্ট হয়। ওর বুকের অবস্থা এত খারাপ যে ভাল হওয়া ওর পক্ষে শুধু শক্ত নয়—বোধহয় অসম্ভব। কিন্তু নিজের অথবা চারিপাশের এত বেদনার মাঝখানেও নিজেকে শক্ত রাখতেই হবে, নইলে চলবে না। হতাশ হ'য়ে পড়বার চেয়ে টি. বি. রোগীর বড় বিপদ আর নেই। সেরে উঠবই—এই দৃঢ়তা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। Tennyson-এর এই ক টি সুন্দর লাইন রোগী মনে রাখবেন।

> Oh! Well for him, whose will is strong!
> He suffers, but he cannot suffer long,
> He suffers, but he cannot suffer wrong.

অনেক সময়েই অধিকাংশ রোগীর ভিতরে দেখতে পাওয়া যায়—পরস্পর পরস্পরের কাছে গিয়ে সুরু করেছেন নিজেদের অনন্ত দুঃখের কাহিনী গাইতে। একজনের শুনতে হয়তো ভাল লাগছে না—তবুও বলা চাই। আমার মনে হয় স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের এসব ত্যাগ করাই ভাল। প্রকৃত পক্ষে এ সবের ভিতরে কোনই বৈচিত্র্য নেই—প্রত্যেক রোগীরই ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দ্দশা কম বেশী একই ধরণের। সব সময়ে ঐ ব্যাধির কথা আর ব্যাধির বিস্তারিত ইতিহাস ব'লে ব'লে আর শুনে শুনে মুখ ভোঁতা করা আর কাণ ঝালাপালা ক'রবার কোন মানে হয় না। অনেক সময়ে নিজের দুঃখ বেদনার কথা অপরকে বললে মন অনেক হালকা হয়, অনেক সময়ে নিজেরও ইচ্ছা যে না হয়, অপরের দুঃখ-বেদনার কথা শুনতে তা নয়। কিন্তু বেশী বেশী চটকালে তেতো হয়ে যায়—দিনের পর দিন ব্যাধির একঘেয়ে কথা, মনের ঘটায় বড় অধঃপতন।

> Talk health! The dreary, never-changing tale
> Of mortal maladies is worn and stale.
> You cannot charm or interest or please
> By harping on that minor chord, disease.
> Say you are well, or all is well with you,
> And God shall hear your words,
> and make them true.

লাএনেক (Laennace) ষ্টেথেস্কোপের আবিষ্কর্ত্তা।

বড় বড় স্যানাটোরিয়ামগুলিতে রোগীদের সময় কাটাবার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে। ক্যারম, গ্রামোফোন, রেডিয়ো অথবা দু' চার রকম খেলা-ধুলার ব্যবস্থা—যাতে নাকি কোন পরিশ্রম না হয়, ইত্যাদি আছে। লাইব্রেরীও থাকে—রোগীরা ইচ্ছামত বই-পত্রিকা আনিয়ে পড়তে পারেন। যতদিন অবধি b d patient হয়ে থাকতে হয়, ততদিন সত্যই খানিকটা কষ্টে এবং অসুবিধায় থাকতে হয় বৈকি; কিন্তু ভাল হয়ে উঠবার সাথে সাথে যখন বাইরে বসবার, বেড়াবার বা আমোদ-প্রমোদে একটু-আধটু যোগদান করবার অনুমতি পাওয়া যায়, তখন স্যানাটোরিয়াম-জীবন আর দুঃসহ ঠিক তেমনটি থাকে না। Walking patientরা অনেক সময়েই বেশ দল বেঁধে আড্ডা দেবার সুযোগ পায়—নানা বিষয় আলোচনা ক'রে তাদের সময় কাটে। আর অধিকাংশ রোগীই শিক্ষিত এবং যুবক বলে হাসপাতালের আবহাওয়া কতকটা বোর্ডিং বা হোষ্টেলের আবহাওয়ারই মত। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ক্রমাগত লঙ্ঘন করবার মনোবৃত্তি যাদের থাকবে, তাদের এসব জায়গায় না যাওয়াই উচিত। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলতার ভাব, পরস্পরের ভিতর একতার ভাব, চিকিৎসকের সাথে চিকিৎসা-ব্যাপারে অহিংস-সহযোগের প্রচেষ্টা ইত্যাদি রোগীদের নিজেদের অন্তরে সযত্নে জাগিয়ে তুলতে হবে।

সংস্কার

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

স্কুলের ছেলেরা নিতান্ত ছেলেমানুষ। মাথা হইয়া দাঁড়াইয়া কোন কাজ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। গ্রীষ্মের ছুটির সময় কলেজের ছেলেরা ফিরিয়া আসিয়া হৈ চৈ বাধাইল।

এত বড় একটা গ্রাম, প্রায় আট হাজার লোকের বাস। সে গ্রামে এই একটি মাত্র পানীয় জলের পুকুর। বর্ত্তমান জমীদার বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর এই দীর্ঘ দেড় শত বৎসরের মধ্যে আর তাহার সংস্কার হয় নাই। বাঁধা-ঘাটের কাছে হাত পাঁচেক পাঁক জমিয়াছে। মাঝ দিয়া সরু এক ফালি রাস্তা হইয়াছে। এক জন করিয়া লোক কোন রকমে গিয়া মাথা ডুবাইয়া আসে, আবার এক জন যায়। একটু পাশ কাটাইতে গেলেই ভর ভর করিয়া পাঁক উঠিয়া সমস্ত স্থান পঙ্কিল হইয়া উঠে।

কলেজের ছেলেরা একখানা খাতা বগলে চাঁদাসংগ্রহে বাহির হইল। চন্দ্রকান্ত এম-এ পড়ে, সে-ই সকল কাজের পাণ্ডা। মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া আগে আগে চলে সে, পিছনে কলেজের অন্যান্য ছেলেরা এবং তাহাদের পিছনে স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলের দল।

গ্রীষ্মকালের বেলা। একটুতেই রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। জমিদার ত্রৈলোক্যবাবু ভিতরে স্নান করিতে যাওয়ার জন্য উঠিতেছিলেন। এমন সময় চন্দ্রকান্ত সদলবলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। ত্রৈলোক্যবাবুর ভিতরে যাওয়া হইল না। নিজের পৃথক্ আসনে বসিয়া তিনি সকলকে বসিতে বলিলেন।

চন্দ্রকান্ত অনতিদূরে একখানা আসনে বসিল। ত্রৈলোক্যবাবুর সম্মুখে ছেলেরা কোন দিনই বড় একটা ভিড়িত না। তাহারা কেহ থামের আড়ালে, কেহ সিঁড়ির পৈঠায় পিছন ফিরিয়া নিরাসক্ত ভাবে বসিল, কেহ বা সম্মুখের কলমের আমগাছটার চারিধারে ঘুরিয়া অর্দ্ধপক্ক আম্রগুলির প্রতি লোলুপ নেত্রে চাহিতে লাগিল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে কেবলই খাতা উল্টাইতেছে দেখিয়া ত্রৈলোক্যবাবু নিজে হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব্যাপার? চাঁদা?

—আজ্ঞে, দীঘির পঙ্কোদ্ধার না করলে তো আর চলছে না। ঘাটের গোড়াতেই এক হাঁটু পাঁক। জলও হয়েছে তেমনি, কাদাগোলা, অথচ গ্রামের আর কোন পুকুরে একটি ফোঁটাও জল নেই, লোকে স্নানই বা করে কোথায়? খাবার জলই বা আনে কোথা থেকে? সেজন্যে ভাবছি……

মধ্যপথে বাধা দিয়া ত্রৈলোক্য বাবু বলিলেন,—তা তোমরা তো এসেছ হপ্তা খানেক হ'ল। এর আগে লোকে স্নান করত কোথায়?

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ঐ খানেই। আমরা যদি চাঁদা তুলে পঙ্কোদ্ধার না করি, তা হলে গ্রীষ্মভোর ওই জলই খাবে। যখন তাও মিলবে না, তখন গাড়ীতে ক'রে পাশের গ্রাম থেকে জল আনবে। তবু নিজেরা উৎসাহ ক'রে কোন কাজ করবে না। এত বড় গ্রাম, বাড়ীপিছু এক জন করে লোক যদি কোদাল ধরে, পঙ্কোদ্ধার হ'তে কতক্ষণ? একটি পয়সাও খরচ হয় না। কিন্তু তা তো হবে না। সব ফাঁকির উপর চলতে চায়।

চন্দ্রকান্ত হয় ত আরও অনেক কথা কহিত। কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর মত গম্ভীর লোকের মুখে কৌতুকের ক্ষীণ রেখা ফুটিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

ত্রৈলোক্যবাবু হাস্য দমন করিয়া কহিলেন, এখন আমাকে কি করতে হবে?

চন্দ্রকান্ত কিছুই না বলিয়া শুধু চাঁদার খাতাটা উল্টাইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্য বাবু কহিলেন,—কিন্তু আমি তো দীঘিতে স্নান করি না। আমিও না, আমার বাড়ীর কেউও নয়। আমার বাড়ীতে ইন্দারা রয়েছে। খাওয়ায়, স্নানে আমরা সবাই সেই জল ব্যবহার করি।

আমগাছের আশে পাশে যাহারা ঘুরিতেছিল, একথা শুনিয়া

তাহারা সরিয়া পড়িল এবং গ্রামের অন্তরালের ছেলেগুলি সিঁড়ির ছেলেগুলির পাশে সরিয়া আসিল।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত তথাপি হাল ছাড়িল না। কহিল,—তা হলেও সাধারণের উপকারের জন্যে···

বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন,—ঠিক। কিন্তু চন্দ্রকান্ত, তোমরা আজকাল ইংরিজি লেখাপড়া শিখছ, তোমাদের মুখে নিত্য নতুন কথা শুনতে পাই। তোমরা দেব-দ্বিজ মান না, জমিদারের অধিকার স্বীকার কর না, তোমাদের কাছে প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান। দীঘির পঙ্কোদ্ধারে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমাকে যদি চাঁদা দিতে হয় তো প্রজাদের স্বার্থের জন্যে। কিন্তু জমিদারে প্রজায় যে সম্পর্ক তা ত তোমরা রাখতে চাও না।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিল। চাঁদা আদায় করিয়া করিয়া তাহার বুদ্ধি পাকিয়া গিয়াছে। সাধারণের কাজে নামিতে গেলে পাঁচজনের পাঁচ কথা শুনিতে হয়। যে ইহা না পারে সাধারণের কাজে তাহার নামাই ভুল।

ত্রৈলোক্যবাবু আবার বলিলেন,—যে দীঘির আজ তোমরা পঙ্কোদ্ধারের আয়োজন করছ, সেই দীঘি আমারই পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি। তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে অত বড় ব্যয় বহন করেছিলেন, আর আমি তার পঙ্কোদ্ধারও করতে চাচ্ছি নে। কেন জান? তোমাদের ওই বড় বড় বক্তৃতার জন্যে শুধু ওই দীঘি নয়, এই গ্রামে এবং মাঠে যত পুষ্করিণী আছে তার শতকরা নব্বুইটা জমিদারের দান। তাঁরা প্রজা ঠেঙ্গিয়ে খাজনা আদায় করতেন, কোথাও কোথাও অত্যাচার যে না করতেন তাও নয়, কিন্তু তার পরে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রেখে নিশ্চিন্তে সুদ উপভোগ করতেন না। তার অধিকাংশই দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট মেরামতে ব্যয় করতেন। তোমরা আজকে সে বিধান উল্টে দিতে চাও। প্রজায় রাজায় আজকে শুধু খাজনার সম্পর্ক। পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ আজ আর তাই জমিদারের নয়। তার জন্যে চাঁদা তোলার প্রয়োজন। কিন্তু কত চাঁদা ওঠে শুনি? তোমার খাতাটা দেখতে পারি?

প্রায় পঞ্চাশজন চাঁদা সহি করিয়াছে। মোট পনেরো টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। খাতাখানা ত্রৈলোক্যবাবু ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। একটু শ্লেষের সঙ্গে হাসিয়া কহিলেন,—এ গ্রামে প্রায় হাজার ঘর লোক হবে। তার মধ্যে দুশো ঘর হাড়ি, বাগ্দী, মুচি ইত্যাদি। তারা দিন আনে দিন খায়। জনহিতে একটা দিন স্বেচ্ছায় বেগার দিতেও রাজী হবে না। আরও দুশো ঘর নিঃস্ব। তাদেরও বাদ দাও। বাকী ছ'শো ঘরের মধ্যেও অনেকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ধরে নিলাম তারা দেবে। তা হ'লেও যে পড়তায় চাঁদা উঠছে, তাতে দুশো টাকার বেশী উঠবে না। ওতে তোমার কাজ হবে?

চন্দ্রকান্ত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হাজারের কমে হবে না।

—বাকি আটশো?

চন্দ্রকান্ত ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্যবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—দুটো টাকা আমার নামে ফেল। কাল যে কোনো সময় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে যেও।

বলিয়া খড়মের শব্দ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বহুক্ষণ অস্বস্তিভোগের পর ছেলেগুলি যেন বাঁচিয়া গেল। কেবল চন্দ্রকান্ত কি যেন চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

এত বড় একটা ব্যাপারের ভার লইয়া চন্দ্রকান্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

গ্রামের যে সমস্ত প্রবীণ ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়া তাহাকে এ কাজে নামাইয়াছেন, এখন আর তাঁহাদের দেখাও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের অনেকে এখনও চাঁদার খাতায় সই পর্য্যন্ত করেন নাই। যাঁহারা একদমে চারি আনা সই করিয়া গিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছে নগদ কি যে আদায় হইবে ভগবান জানেন। গ্রামের অন্যান্য লোকও যে খারাপ তাহা নয়, কিন্তু ইদানি চন্দ্রকান্ত অথবা তাহার দলবলকে দেখিলে সকলেই গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া চন্দ্রকান্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার দলের সকলেই ছোট। তাহাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু শুধু উৎসাহে তো পুষ্করিণীর পাঁক উঠিবে না। সকল দায়িত্ব তাহারই। আর সে দায়িত্ব কম নয়। উপযুক্ত পরিমাণ চাঁদার অভাবে যদি পঙ্কোদ্ধার না হয়, যাহারা চাঁদা দেয় নাই, তাহারাও সেদিন

নিন্দা করিতে ত্রুটি করিবে না। যেন একটা সাধু সঙ্কল্প করিয়া চন্দ্রকান্তই চোর হইয়াছে।

সেদিন সকালে চন্দ্রকান্ত কুম্ভকার-পাড়ায় গিয়াছিল। সঙ্গে ত্রৈলোক্যবাবুর ছেলে হৃষিকেশ ছিল বলিয়াই রক্ষা। নহিলে হয় তো কেহ দেখাই করিত না। তাহারা জমিদার-নন্দনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, চাঁদা দিবার শক্তি তাহাদের নাই।

হৃষিকেশ বলিল,—সে বললে তো হবে না। পাঁচজনের কাজ, তোমাদেরই স্নান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাঁদা না দিলে চলবে কি করে?

হৃষিকেশ জানে, তাহার পিতামহের শ্রাদ্ধের সময় শুধু এই একটা পাড়া হইতেই একশত টাকা উঠিয়াছিল। তাহার চেয়ে এ কাজ কত জরুরী। কিন্তু সে জানে না, ইহারা জমিদারের হুকুমে প্রয়োজন হইলে একশত টাকা কেন, দুইশত টাকা উঠাইয়া দিতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী কাজেও স্বেচ্ছায় এক টাকাও দিতে পারে না। চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে যে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, সে সংবাদ ইহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। তাই হৃষিকেশের কথায় ইহারা আর একবার হাত জোড় করিল।

এ কাকুতিতে চন্দ্রকান্ত এবং হৃষিকেশ উভয়েরই মন গলিল। বেচারীরা সত্যই যে বড় গরীব, সে বিষয়ে তো আর সন্দেহ নাই।

চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ দম ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল,—আচ্ছা চাঁদা তোমাদের দিতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ী থেকে সপ্তাহে একজন করে বেগার দিতে হবে। তাতে তো আর পয়সা খরচ নেই।

কুম্ভকারেরা তথাপি হাত জোড় করিয়াই রহিল। কহিল,—আজ্ঞে বাবু, তা হ'লে গলায় পা দেওয়া হবে।

ব্যাপারটা সমাধা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত উঠিতেছিল। বিস্মিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—কেন?

—আজ্ঞে ম্যালোয়ারীর অত্যাচারে পাড়ায় একটা মুনিষ তাজা নেই। একদিন ভাল থাকে ত সাত দিন আর উঠতে পারে না।

—তবে, তোমাদের জমি চাষ ক'রে দেয় কে?

—আজ্ঞে, যা নিতান্ত না করলে নয়, তা না ক'রে উপায় কি?

হৃষিকেশ রাগিয়া বলিল,—ও! ভেবেছ শুধু আহারের ব্যবস্থা করলেই হ'ল? পানীয় জলের ব্যবস্থা করা বুঝি কিছুই নয়? পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই বলেই তো এত ম্যালেরিয়া। দীঘি সংস্কার না করলে বারমাস এমনি ভুগতে হবে।

চন্দ্রকান্তের দলের অপর একজন তর্জ্জনী আন্দোলিত করিয়া কহিল,—আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে চাঁদা চাইতে আসিনি বুঝেছ পালজি?

পালজি জিভ কাটিয়া বলিল,—আজ্ঞে বাবু মশাই, ও কথা যদি মনেও এনে থাকি আমার জিভ যেন খসে যায়।

চন্দ্রকান্ত তাহাকে নরম দেখিয়া আশ্বস্ত ভাবে কহিল, তা হ'লে ওই মুনিষের কথাই ঠিক রইল তো?

পালজি আবার হাত জোড় করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ঘর-পিছু সপ্তাহে একটা করে মুনিষ পারব না।

চন্দ্রকান্ত ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কহিল,—তা হলে কি পারবে তাই শুনি?

পালজি বার কয়েক হাত কচলাইয়া, কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—আজ্ঞে আমি একা আর কি ক'রে বলি? পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয়, আপনাদের দু' তিন দিনের মধ্যে জানাব।

বলিয়াই চট করিয়া একটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তাও বলে রাখি, বড় পালজির কথা আমি বলতে পারব না। আমি এই আমাদের সাত ঘরের কথা বলতে পারি।

—সে আবার কি কথা! তোমার সহোদর ভাই—

ছোট পালজি মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ওদের সঙ্গে বাক্যালাপ নেই।

ইহার দিন কয়েক পরে একদিন ছেলেরা আসিয়া শ্রান্ত দেহে চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় বসিল। বেলা তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রে সকলের মুখ ঝলসিয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কল কল ধারে ঘাম ঝরিতেছে। কয়দিন মাত্র ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছে,—এই কয় দিনেই দেহের

ত্বক কর্কশ ও বর্ণ তাম্রাভ হইয়াছে। ছেলেরা যে যেখানে পারিল, বসিয়া আঁচল ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

সম্মুখের ঘরটি চন্দ্রকান্তের পড়িবার ঘর। চারিদিকে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া বড় বড় আলমারী,—বইতে ঠাসা। মধ্যে একটি টেবিল, এখানে বসিয়া সে পড়ে। ওদিকে একটি সোফা, মাথার দিকে একটি টিপয়। একদিকের দেওয়ালে একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র। ঘরের দেওয়ালে যে কয়খানি বাছাই করা ছবি টাঙানো আছে, তাহাতেও তাহার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ঘরে চন্দ্রকান্তের ছোট বোন মঞ্জরী দাদার দেওয়া টাস্ক তৈরী করিতেছিল। এতগুলি লোকের পদশব্দে বাহিরে আসিয়া তাহাদের রৌদ্রদগ্ধ মুখের অবস্থা দেখিয়া গালে হাত দিল।

—এই ডাকাতের দল নিয়ে সমস্ত রোদ্দুরটা কোথায় কোথায় ঘুরলে দাদা? মুখ যে ক'দিনেই কালী বর্ণ হল!

মঞ্জরী দাদার মত অতখানি ফর্সা নয়। কিন্তু মুখের গড়ন দাদার চেয়ে ঢের ভাল। ছোট্ট মসৃণ ললাট, ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ, ভ্রূ দুইটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। ছেলেরা সবাই একবার বাতাস খাওয়া ভুলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল,—ডাকাতের দলই বটে! তুই চট্ করে ভেতর থেকে একটা বড় ঘটিতে করে এক ঘটি জল, আর একটা গ্লাস নিয়ে আয় তো। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

মঞ্জরী ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া একটা বাটিতে করিয়া এক বাটি গুড়, এক ঘটি জল ও একটা গ্লাস আনিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গেল। তবু তৃষ্ণা মিটিল না। মঞ্জরী আর এক ঘটি জল আনিয়া দিল।

এই তৃষ্ণার্ত্ত ছেলের দল যেন মরুভূমির মত সমস্ত জল শুষিয়া লইল দেখিতে মঞ্জরীর বড় কৌতুক বোধ হইতেছিল।

হাসিয়া কহিল,—আজকে কত চাঁদা উঠল দাদা? একশো? দুশো?

চন্দ্রকান্ত ম্লান হাসিয়া কহিল,—ও সব হবে না রে। কদিন মিথ্যে রোদে ঘুরলাম। এদের পানীয় জলের দরকার আছে, কিন্তু কেউ নিজে এক পয়সা দিতে রাজি নয় অন্যে করে দেয় তো বেশ হয়।

মঞ্জরী হৃষিকেশের দিকে অপাঙ্গে একটা খোঁচা দিয়া কহিল,—তা বাপু এই কটা টাকা তোমরাই দিয়ে দাও না। তুমি রয়েছ, ঋষি দাদা রয়েছে, তোমরা দিয়ে দিতে পার না?

—তুই কি বলিস মঞ্জরী! আমাদের যা দেবার আছে তা আমরা দোব, যত খাটতে হয় তত খাটব, কিন্তু সবটা দোব কেন? পাবই বা কোথায়? আর পেলেই বা দোব কেন?

মঞ্জরী আবার হাসিয়া কহিল,—দেবেই না বা কেন? রোদ্দুরে লোকের দোরে দোরে ঘুরে জ্বর করবে তো? তাতেই ও টাকাটা বেরিয়ে যাবে।

এ উত্তরে সকলেই হাসিয়া উঠিল। হৃষিকেশ যে বড়-লোকের ছেলে, তার পিতা যে জোর করিয়া প্রজার কাছ হইতে খাজানা আদায় করেন, এই লজ্জায় পাঁচজনের মধ্যে সে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সে বুঝিয়াছিল, টাকাটা বিশেষ করিয়া তাহাকেই দিবার জন্য মঞ্জরী ইঙ্গিত করিয়াছিল। তাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিয়া ছিল। এখন মুখ তুলিয়া কহিল,—মঞ্জরী, চন্দ্রদা টাকা পাবেন কোথায়? আমিই বা কোথায় পাব? টাকা যদি থাকে, সে বাবার, আমার নয়। কিন্তু সে কথাও নয়। শুধু দীঘি-সংস্কারই ত আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আসল কথা, মানুষের মনে civic sense জাগাতে হবে। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ হাওয়া, পর্য্যাপ্ত আলো, ভাল রাস্তাঘাট, আহার এবং বস্ত্রের মতই এগুলোও মানুষের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। সেই কথাই যে তারা বুঝতে চাচ্ছে না।

মঞ্জরী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বুঝতে চাচ্ছে না টাকা নেই বলে।

—টাকা নেই? নকড়ি ঘোষ ন'বছরে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জই করে ফেললে। সে টাকার দায়ে হয়তো বেচারা সর্ব্বস্বান্ত হবে। কিন্তু তবু বিয়ে দেওয়াই চাই। কারণ পরলোকের সম্বন্ধে তার sense জেগেছে। তার মনে বিশ্বাস জেগেছে নবম বৎসরে গৌরীদান না করলে স্বর্গের একটা বিশেষ কোন জায়গা সে পাবে না। কাজেই beg, borrow or steal—যে কোন প্রকারে মেয়ের বিয়ে তাকে ন'বৎসরে দিতেই হবে। মুক্ত আলো বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় সম্বন্ধে সে বুদ্ধি যদি তার জাগত, আমাদের কিছুতে ফেরাতে পারত না।

একটু থামিয়া হৃষিকেশ তেমনি উজ্জ্বল চোখে আবার বলিল,—টাকা নেই ? কিন্তু আমরা সকলের কাছে টাকা ত চাইনি। যার টাকা আছে তারই কাছে চেয়েছি টাকা, যার নেই তার কাছে চেয়েছি দেহের পরিশ্রম। কিন্তু এরা তাও দেবে না, একেবারে ফাঁকির ওপর সব কিছু চায়।

কিন্তু তথাপি মঞ্জরী যে ইহাদের দুঃখ উপলব্ধি করিল তাহা মনে হইল না। সে তেমনি পরিহাস-চটুল চোখে চাহিয়া কহিল, তা হলে যতদিন না civic sense জাগে, ততদিন কি করবে ঠিক করেছ ? অপেক্ষা করবে ?

হৃষিকেশ এই পরিহাসের উত্তর দিল না, শুধু ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল

জবাব দিল চন্দ্রকান্ত। কহিল, অপেক্ষাই করতে হবে দিদি। গায়ের জোরে ত শুভবুদ্ধি জাগান যাবে না। তবে অপেক্ষাও আর বেশী দিন করতে হবে না। এ বছরটাও পাঁকে-জলে যাবে, আসছে বছরে তাও যখন পাবে না, তখন দেখিস ওরাই আবার আমাদের কাছে আসবে নিজে থেকে।

ওপাড়ার কথা মনে পড়ায় চন্দ্রকান্ত আপনার মনেই হাসিয়া ফেলিল।

—দীঘির জলের ওপর গোটা গাঁয়ের জীবন নির্ভর করছে, শুধু এ পাড়ার নয়। গেল বছরে আমরাই লেখালেখি করে জেলাবোর্ড থেকে ওপাড়ায় একটা ইন্দারা করিয়ে দিয়েছিলাম। এবারে শুনলাম, কে একটা ছেলে তার মধ্যে একটা মরা কুকুরছানা ফেলেছিল। দুর্গন্ধে চারিপাশের লোকের টেঁকা দায় হয়েছিল। তবু সবাই এমনি ব্যস্ত যে, সেটাকে কেউ বার করেও ফেলে দেয়নি। দেখে এলাম সেখানে চমৎকার ব্যাঙের চাষ হচ্ছে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জরী কহিল, তাই বলে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবে ? কাল যে কলেরা আরম্ভ হবে। তখন ?

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল, তখন আমরা রোজ রাত্তিরে জাঁকালো করে হরিনাম সংকীর্ত্তন বার করব। তিনিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন। কিন্তু সেও ত কালকে। আজ ত স্নান করে খেয়ে নেওয়া যাক। কি বল ?

বলিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। তাহারাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বেলা অনেক হইয়াছে।

সেই দিন অপরাহ্নে—রৌদ্রের তখনও বেশ তেজ আছে, হৃষিকেশ ধীরে ধীরে চন্দ্রকান্তের বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কেউ এখনও আসেনি ?

বই হইতে মুখ তুলিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, এই তো মোটে চারটে বাজল আসবে সব একে একে পাঁচটার মধ্যে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হৃষিকেশ বলিল, চন্দ্রদা আমি শ পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা

একটি দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ' পাঁচেক টাকা! চন্দ্রকান্ত বিস্ময়দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ?

হৃষিকেশ ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া কহিল, টাকাটা মা দিচ্ছেন। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি একবার চাইতেই রাজি হয়ে গেলেন।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিল। পাঁচজনের জন্য চিন্তা করা এবং পাঁচজনের কাজে পরিশ্রম করা তাহার একটা রোগ। চেয়ারে বসিয়া এ বই সে বই-এর পাতাগুলি কিছুক্ষণ ধরিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া অবশেষে কহিল, আমি ভেবে দেখলাম ও টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না। তুমি জান, ধনীর দান আমি গ্রহণ করি না, বহু লোকের বহু ছোটখাটো দান নিয়ে আমি বড় জিনিষ গড়তে চাই, সাধারণের ব্যাপারে এক জনের মাৎসর্য্যকে প্রশ্রয় দিতে চাই না।

হৃষিকেশ চুপ করিয়া রহিল, টাকাটা লইবার জন্য জেদ করিল না। চন্দ্রকান্ত বলিতে লাগিল, একজন পুকুর দান করে গেছেন, সেই দানের মর্য্যাদা রক্ষা করার শক্তি এদের নেই, দুঃখ না পেলে মানুষ শক্তি অর্জ্জন করতে পারে না। দুঃখ এদের অনেক, কিন্তু দুঃখবোধ নেই, যেটুকু আছে দাতার এককালীন দানে তাও যাবে মরে। তার চেয়ে এরা দুঃখই পাক,—যতক্ষণ না সে দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠছে।

হৃষিকেশ তথাপি কোন কথা কহিল না।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিল, আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি তোমার বাবার কাছে যাব, এবং······

হৃষিকেশ সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিল,—এবং তিনি যদি দয়া করে ভার নিতে রাজি হন, তাঁরই ওপর ভার দেব। ওদের দুঃখ দিতে তাঁর মত কেউ পারবে না।

হৃষিকেশ সভয়ে বলিল, কিন্তু বাবা যে—

চন্দ্রকান্ত হাত নাড়িয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিয়া বলিল, না, না, যে রোগের যে ওষুধ। উনি ছাড়া ওদের রোগ সারাতে আর কেউ পারবে না যে! আছেন তিনি বাড়ীতে? তা হলে তাঁর কাছেই যাওয়া যাক। ওঠ।

হৃষিকেশ উঠিল, কিন্তু হাত জোড় করিয়া বলিল, আপনিই যান চন্দ্রদা, আমাকে আর টানবেন না।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল, কেন? ভয় করে? আমার বাবা তো আমার সঙ্গে দাবা খেলতেন। আচ্ছা তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি গেলেই হবে। ছেলেরা যদি আসে, তাদের এইখানে অপেক্ষা করতে ব'লো। আমার বেশী দেরী হবে না।

তাহার ফিরিতে দেরী হইল না। পিতার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইলেই আশঙ্কায় হৃষিকেশের বুক দুরু দুরু করে। এই দলটি জমিদার প্রথার ঘোরতর বিরোধী। হৃষিকেশ নিজেও তাহাদেরই পন্থী। তথাপি পরের মুখে পিতার সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা তাহার পক্ষে প্রীতিকর হয় না।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল? হ'ল না?

কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রকান্ত কম্বলের একপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

—কি বললেন?

একটু ম্লান হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, তিনি বললেন, সকল মানুষের একই সময়ে একই সাধু ইচ্ছা হয় না। সে জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হয়। যা'রা কাজ করতে চায়, তাদের ঘাড়ে ধ'রে কাজ করাবার শক্তি থাকা চাই। নইলে কাজ হবে না। আমি ঘাড়ে ধ'রে কথাটায় আপত্তি করতেই তিনি সহাস্যে বললেন, আচ্ছা গায়ে হাত বুলিয়েই না হয় হ'ল। কিন্তু গায়ে সে-ই হাত বুলোলে কাজ হয়, যে ইচ্ছা করলে ঘাড়েও ধরতে পারে।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিল।

—তা হলে উনি রাজি হ'লেন না?

চন্দ্রকান্ত কহিল,—রাজি হওয়ার তো কথা নয়। উনি জানতেন, আমরা পারব না। সেই ভেবে উনি নিজেই এ কাজটা হাতে নেওয়ার সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। এ তো আর আমাদের একচেটিয়া অধিকার নয় যে, আমরা ছেড়ে না দিলে তিনি নিতে পারবেন না! আজ তাঁর পাইক বার হ'ল, বললেন, কাল সকালে সবাই তাঁর কাছারীতে হাজির হবে।

একজন উত্তেজিত ভাবে বলিল,—আমাদের কি এই জবরদস্তিতে বাধা দেওয়া উচিত নয়?

চিন্তিত ভাবে চন্দ্রকান্ত কহিল,—কি জানি! কিন্তু তা হ'লে বোধ হয় দীঘি-সংস্কারের দায়িত্বও নিতে হয়।

ছেলেরা চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিল।

অতঃপর যে কাণ্ড ঘটিল তাহাকে ভোজবাজি বলা চলে।

পরের দিন সকালে গ্রামের প্রত্যেকটি প্রজা সকল কাজ ফেলিয়া কাছারীতে উপস্থিত হইল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে আটশত টাকা এই দরিদ্র গ্রাম হইতে উঠিবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। বড় পালজিকে ছেলেরা এক সপ্তাহ খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারে নাই। জমিদারের কাছারীতে সে-ই সর্বাগ্রে উঠিয়া পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল এবং পরমুহূর্তেই ছোট পালজি উঠিয়া সাত টাকা চাঁদা হাঁকিয়া সগর্বে বড় পালজি যে দিকে বসিয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল।

—পাঁচজনের কাজ, কি বল পিসে!

—বটেই তো বাবাজি। বিশেষ বাবু যখন নিজে দাঁড়িয়েছেন, তখন আর কথা আছে? সাতটা টাকা আবার টাকা!

পিসে বাবাজির উপর টেক্কা দিয়া দশ টাকার প্রতিশ্রুতি দিল।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ত্রৈলোক্য বাবুর স্তুতি-গুঞ্জনে কাছারী মুখর হইয়া উঠিল। এত বড় কাজ আর যে কেহ করিতে পারিত না, সে তো জানা কথা। বাবু যে

স্বয়ং এ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতেই গরীব প্রজারা কৃতার্থ হইয়াছে।

ছোট পালজি করযোড়ে নিবেদন করিল,—ছোটবাবু যখনই গেলেন, তখনই বললাম, বাবু এতো ভাল কাজ। আমার যা সাধ্যি হয় তাই করতে প্রস্তুত। কথায় বলে, জল-দান। ওর চেয়ে আর পুণ্যি আছে না কি? কি বল পিসে?

—বটেই তো। এক ফোঁটা পাকজল তাই মানুষে কেতাত্ব হয়ে থাচ্ছে। এবার পাচ্ছে, আসছে বার তাও পাবে না। আমাদের বাবুর দয়ার শরীর, তাই···

সরকার হিসাব করিয়া জানাইল, আটশো পঁয়ত্রিশ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন,—ওহে বড় মোড়ল, তুমি তো এসব কাজ ভাল বোঝ শুনতে পাই। দীঘি সংস্কারে কি রকম খরচ হবে একটা আন্দাজ দাও দেখি?

বড় মোড়ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ারও নয়, ওভারশিয়ারও নয়,—তাহার গুণের মধ্যে ভাল মাটির দেওয়াল দেয়। এতাবৎ এ সম্বন্ধে যে সব কথা হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—আজ্ঞে হাজার দেড় হাজার হবে।

ত্রৈলোক্যবাবু মনে মনে হাসিলেন। হাজার ও দেড় হাজারের মধ্যে পাঁচশো টাকার ব্যবধান।

কহিলেন,—আচ্ছা, বাকী যা খরচ হবে সেটা আমিই দোব।

নিতান্ত ত্রৈলোক্যবাবুর মত জবরদস্ত, গম্ভীর প্রকৃতির লোক না হইলে লোকে আনন্দের আতিশয্যে 'হরিবোল' দিত। ততখানি পারিল না বটে, কিন্তু মুখ দেখিয়া বোঝা গেল আনন্দে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

হরিশ তন্তুবায় গাঁজা খায় এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান। আনন্দের আতিশয্যে সে সেইখানেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—সাক্ষাৎ দেবতা! আবার দেবতা কাকে বলে! আমার ভাগনেটাকে তাই তো বলি, বাপু, কেন ওখানে দু' কাঠা জমির জন্যে লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছিস,—সব বিক্রি-সিক্রি ক'রে এইখানে চ'লে আয়, রাম-রাজত্বি কাকে বলে দেখে যা।

উপস্থিত সকলে মাথাগুলা নাড়িয়া ভক্তিভরে তন্তুবায়ের কথায় সায় দিল।

ইহার পরের দিন ওই হরিশকেই দেখা গেল আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলা লুকাইয়া লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ী প্রবেশ করিতেছে।

—মা ঠাকরুণ কই গো?

মাতা ঠাকুরাণী রান্নাঘর হইতে ডাক শুনিয়াই ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিলেন। হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মাথার কাপড় টানিয়া হাত দুইটা আলগোছে রাখিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আঁচলে লুকানো বস্তুগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—এস, বাবা।

চারিদিকে চাহিয়া হরিশ কহিল,—দাদাঠাকুরকে তো দেখছি না, মা ঠাকরুণ? পাড়ায় বেরিয়েছেন বুঝি?

মাতা ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,—কোথায় বেরিয়েছেন তিনিই জানেন। আমাকে কি একটা কথা জানায়? শুনছি, বাগ্দীপাড়ায় কার নাকি কলেরা হয়েছে। হয়তো সেই-খানেই গেছে।

ভাল করিয়া সিঁড়ির পৈঠায় বসিয়া হরিশ কহিল,—অসম্ভব নয় মাঠাকরুণ, ওঁর তো আত্মপর-ভেদজ্ঞান নেই,—ছোট বড়ও বাছেন না। মন তো নয়, যেন গঙ্গাজল। সামনে দিয়ে হেঁটে চলেন মাঠাকরুণ, মনে হয় দেবতা চলেছেন।

—দেবতার মুখে আগুন বাবা! ওকে নিয়ে আমি দিন রাত্তির সশঙ্কিত থাকি, কখন কি রোগ টেনে আনে। তার চেয়ে ও বাইরে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

হরিশ হো হো করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল,—উনি যে ভোলা মহেশ্বর মাঠাকরুণ। আমাদের হিসেবে তো চলবেন না। আপনার দুঃখ তো হবেই মা, নন্দরাণীর কথাটা ভাবুন। দেবতা পেটে ধরার যে অনেক ঝঙ্কাট!

হরিশ নিজের রসিকতায় নিজেই আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল,—এ গাঁয়ে ভাল মন্দ সব রকম লোকই তো আছে, কিন্তু গরীব দুঃখীর ওপর অমন দয়া কখনও দেখেছেন? এই যে অত বড় বাবুরা রয়েছেন—

হরিশ আরও একটু সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল—টাকায় তো তাঁদের অভাব নেই। তবু নিজেদের পুকুর সারাবার জন্যে প্রজার ওপর কি রকম চাঁদাটা চাপালেন, শুনেছেন তো সব ও টাকাটা কি আর উনিই ফেলে দিতে পারতেন না?

-তা তোমরা দিলে কেন বাছা? বললেই তো পারতে, দোব না?

হরিশ ম্লানভাবে একটু হাসিয়া কহিল,—এ কি আমাদের পাগলা দাদাঠাকুর মাঠাকরুণ যে, দোব না বললেই রেহাই পাব? এ জমিদার। না দিলে কাল আর আমাকে এ গাঁয়ে বাস করতে হবে না। জানেনই তো!

চন্দ্রকান্তের জননী নীরবে হরিশের আসল কথাটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রদত্ত কিছু টাকা তাঁহার নিজের কাছে আছে। সুদে খাটাইয়া এই কয় বৎসরে তাহা বেশ মোটা টাকায় পরিণত হইয়াছে। তবু এই ব্যবসা তাঁহাকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে চালাইতে হয়। একবার চন্দ্রকান্তের কানে যাইতে সে সমস্ত বন্ধকী গহনা ফেরৎ দিয়া আসিয়াছিল।

সে বলে,—ধার দেওয়া ভাল। সময়ে অসময়ে মানুষের অনেক উপকার হয়। কিন্তু এই ব্যবসা যে করে তার আর কিছু থাকে না।

যাহারা ধার লইতে আসে, তাহারা ত সে কথা জানে। তাই চন্দ্রকান্ত বাড়ীতে আছে কি নাই সে সংবাদ সর্বাগ্রে লয়।

হরিশ তন্তুবায় আর একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া আঁচলের খুঁট হইতে কয়েক খানা গহনা বাহির করিল—এক জোড়া রূপার বালাকাটা, তাহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে অল্প দিন পূর্বে এক জোড়া তোড়া তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল, সেই জোড়াটি, আর তাহার বড় নাতনীটি কয়দিন হইল শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাহার কানের এক জোড়া মাকড়ি।

সেগুলি চন্দ্রকান্তের জননীর পদপ্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া হরিশ সকাতরে বলিল,—পাঁচটি টাকা আমার না হলেই নয়, মাঠাকরুণ। দশটি টাকা চাঁদা। তার অর্দ্ধেকটা কাল দিতেই হবে।

চন্দ্রকান্তের জননী সেগুলি তুলিয়া লইলেন না। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—এই সেদিন টাকা নিয়ে গেলে, তার একটা পয়সা সুদ পেলাম না এখনো। আর বাছা আমার কাছে সুবিধা হবে না। টাকাও নেই।

হরিশ মুখখানি একটি চমৎকার বিনীত ভঙ্গিতে বাঁকাইয়া কহিল,—দোব বইকি, মাঠাকরুণ। আর দশটি দিন সবুর করুন। চৈতিলীটা উঠুক। শুধু সুদ কেন, আসলও কিছু দিয়ে যাব।

বলিয়া হরিশ ধূর্ত্তের মত হি হি করিয়া আর একবার হাসিল। কিন্তু তথাপি চন্দ্রকান্তের জননী দ্বিধা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—তুমি বরং আর কারও কাছেই দেখগে বাছা, আমার টাকাই কম আছে।

এবারে হরিশ আর এক রকমের হাসি হাসিল,—অনেকটা উচ্চাঙ্গের ভক্তিমার্গের হাসি। বলিল,—ওসব কথা আপনি অন্য লোকের কাছে বলবেন মা, কিন্তু হরিশ তন্তুবায় যে জিনিস আপনার পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে তা আর তুলে নিচ্ছে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় হরিশ তন্তুবায়কে 'তন্তুবায়' বলে।

চন্দ্রকান্তের জননী আপনার মনেই কি যেন ভাবিলেন। বলিলেন,—তা হলে তিনটি টাকা নিয়ে যাও বাছা। পাঁচ টাকা আমার কাছে নেই। আমি কি মিছে কথা বলছি?

হরিশ সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল,—আজ্ঞে তা কি আমি বলছি? কিন্তু পাঁচটা টাকার কম কিছুতেই হবে না যে! ওই যে বললাম—

চন্দ্রকান্তের জননী প্রমাদ গণিলেন। এদিকে চন্দ্রকান্তের ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। বেশী দরদস্তুর করিবার অবকাশ নাই। হরিশ যে ব্যক্তি, টাকা না লইয়া সে কিছুতেই উঠিবে না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উঠিতে হইল। জিনিসগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া ভিতরে গেলেন। বলিয়া গেলেন—দেখি যদি থাকে তো বাছা পাবে, নইলে ফিরতে হবে বলে দিচ্ছি।

হরিশ কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া হাতে হাত ঘসিতে লাগিল। চন্দ্রকান্তের জননীর ফিরিতে দেরী হইল না। একটু পরেই পাঁচটি টাকা হরিশের কাছে নামাইয়া দিলেন।

—দেখো বাছা, চৈতালী উঠলে যেন সুদের টাকা ক'টা পাই।

হরিশ তৎক্ষণে টাকা কয়টি ট্যাঁকে গুঁজিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিয়া গেল, আজ্ঞে সে আর বলতে হবে না।

তার পরে আরম্ভ হইল সংস্কার পর্ব্ব।

দীঘির জলাটা পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বড়ই ছিল। এখন মজিতে মজিতেও যাহা আছে তাহার পরিমাণ একশ বিঘার কম হইবে না। কিন্তু তাহাতে জল কম, পঙ্কই বেশী। আর আছে ছুর্ভেদ্য দাম ও কাঁটাশেওলা। টিয়া-সবুজ রঙের দলাশের শাওলা সর উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় শালুক ফুলের বড় বড় পাতা এমন ভাবে উপরটা ঢাকিয়া আছে যে, জল দেখা যায় না।

উত্তর দিকে মেয়ে-ঘাট ত একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল প্রথম সিঁড়িটিই এখানে যে ঘাট ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তার পরেই পর্ব্বতপ্রমাণ পঙ্ক। জলের চিহ্নমাত্রও নাই। মেয়েরা সে ঘাট বর্জ্জন করিয়া পশ্চিমদিকে পুরুষ ঘাটে হানা দিয়াছে। সেটিরও অবস্থা শোচনীয়। দুই পাশে উঁচু উঁচু পাঁকের পাহাড়ের মাঝখান দিয়া একটি মানুষের চলিবার মত সঙ্কীর্ণ এক ফালি পথে বালি জমিয়াছে। তাও বেশীদূর পর্য্যন্ত নয়। হাঁটু-জলেই স্নান সারিতে হয়।

তিন দিকের তিনটি ঘাটে দশ বারখানা করিয়া ডুনি পড়িয়া গেল। জল বড় বেশী ছিল না। সে জন্য জল মারিতে দেরীও বেশী হইল না, ব্যয়ও বেশী হইল না এবং আরও একটি বিষয়ে আশাতীতরূপে ব্যয় সংক্ষেপ হইল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কেবলই টাকার হিসাব করিয়াছে। দীঘির পাঁক যে জমির সার হিসাবে কত মূল্যবান তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে নাই। জল মরিয়া যাইতেই লোকের সে খেয়ালটা হইল। তখন আর পাঁক তুলিবার জন্য খরচ করিতে হইল না। লোকে গাড়ী লইয়া আসে, নিজের খরচে পাঁক তোলে, আর জমীতে দেয়। ত্রৈলোক্য বাবু দুই তিন সপ্তাহ জনমজুর রাখিলেন। সে কয়দিন রাত্রি তিনটা হইতে সকাল আটটা এবং বিকাল চারটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে গরুতে মানুষে এবং রাত্রিবেলায় হারিকেনের আলোয় মরা-দীঘিতে যে উৎসব ও সমারোহ পড়িয়া গেল, জীবিত দীঘির অদৃষ্টেও বোধ করি সেই প্রথম একবার মাত্র তত সমারোহ হইয়াছে। গানে গল্পে হাসিতে বহুমানুষের কলরবে মরা-দীঘি যেন রূপকথার রাজপুরীর মত এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল।

সকালে সন্ধ্যায় লোকে ভিড় করিয়া এই উৎসব দেখিতে আসে। বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে, ঘোষেদের দাওয়ায় এবং স্যাকরার দোকানে যে তাস-পাশা দাবার আড্ডা বসিত, সে-গুলি দীঘির বটচ্ছায়ায় উঠিয়া আসিয়াছে। একটা দিকের চটানে ছেলেগুলা সকালে খেলে গুলি-ডাণ্ডা, বিকালে হা-ডু-ডু। পূর্ব্বদিকের বটগাছটা ছেলেদের ঝালঝুল খেলার উৎপাতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কতকগুলি ছেলে তালপাতার ভেঁপু তৈরী করিয়া অশ্রান্তভাবে বাজাইতেছে, কোথাও কয়েকটি নগ্নদেহ বালক তালপাতার ঘুরণি তৈরী করিয়া এদিক হইতে ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। আর বুড়ারা কর্ম্মকর্ত্তার মত হুঁকা হাতে চারিধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

—ওহে ও কর্ম্মকার, এক ধার থেকে পাঁক তোলো। এখানে এক খাবল ওখানে এক খাবল করে নিলে তো হবে না। ওই তোমার বাঁ দিকে সাজি কি রকম করে পাঁক তুলছে দেখ। ওই রকম করে—হ্যাঁ।

—আরে এই ছেলেগুলো কাদের হে? অ-শাপা ছেলে! ভেঁপু বাজিয়ে বাজিয়ে কান ফাটিয়ে তুললে!

ছেলেগুলির মজা বাড়িয়া যায়। তাহারা বুড়াদের কাছে কাছে ঘোরে আর যত পারে ভেঁপু বাজায়।

—লে বাবা। ঘাড়ের ওপর পড়বি না কি? দেখে চলতে জান না? একটা ছেলে তালপাতার ঘুরণি লইয়া ছুটাছুটী করিতেছিল। তাহারই সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

মেলা বলিলেই হয়। কেবল কয়েকখানি দোকানের অভাব।

পূর্ব্বদিকটাই নিরিবিলি। সেদিকের একটা গাছের ছায়ায় চন্দ্রকান্তদের আড্ডা বসিত। এই দলটির সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য সকলের আচার-ব্যবহারে সকল দিকেই একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে ইহারা যখন ঘোরা ফেরা করে, মনে হয় ইহারা যেন এখানকার মাটির নয়। অন্যান্য ছেলেরাও বড় একটা ইহাদের সঙ্গে ঘেঁষে না।

গাড়ীতে গাড়ীতে রাশি রাশি পাঁক উঠিতেছিল। মাখনের মত কোমল পাঁক। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। হৃষিকেশ আপন মনেই আঙুল বাড়াইয়া এক একবার তাহার স্পর্শ লইতে-ছিল। স্নিগ্ধ স্পর্শ।

—ও কি করছ? চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

হৃষিকেশ অপ্রস্তুতের মত হাসিয়া কহিল, বেশ লাগছে। কোমল এবং স্নিগ্ধ। আমার ভারি লোভ হচ্ছে ওদের মত পাঁক ঘাটি।

হৃষিকেশ আর একবার হাসিল।

কীটরাজ্যের তন্তুবায়

§ মাকড়শার রহস্য-বিবরণ

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কাপড় দরকার বলে তাঁতীকে খবর দিলাম। তাঁতী শুধু হাতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বললে,—"বলুন কোন্ ঘরে বুনব।" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "শুধু ঘর নিয়ে কি হবে। কই তোমার সুতো, কই তোমার তাঁত?" তাঁতী বললে,—"দেখতে পাচ্ছেন না আমি নিজেই এসেছি।"...এই পর্যন্ত পড়ে কেউ যদি মনে করে, কোন পাগলা তাঁতীর আজগুবি গল্প ফাঁদা হয়েছে, তা হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই আজগুবি নয়, মানুষ-তাঁতীর পক্ষে অসম্ভব হলেও কীট-জগতের তাঁতীর পক্ষে কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে সত্য। কীট জগতের তাঁতী নিজে হাজির হলেই যথেষ্ট, যন্ত্রপাতি, তুলো, সুতো সবই তার নিজের মধ্যে আছে।

কীট-জগতের তাঁতী যে মাকড়শা তা অবশ্য বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। ঘরে বাহিরে নানা জায়গায় তার অদ্ভুত বয়ন-কৌশল সকলেরই চোখে নিশ্চয় পড়েছে। বছর বছর ঘরের যে নোংরা ঝুল আমাদের পরিষ্কার করতে হয়, সেগুলি এদেরই অপকীর্তি। তারা অবশ্য সত্যি পরবার কাপড় বুনে না, তারা বুনে শীকার ধরবার জাল। তাঁতীর চেয়ে তাদের, পোকামাকড়দের রাজ্যের ব্যাধ বলাই বোধ হয় বেশী সঙ্গত। মানুষের পর সমস্ত ইতর প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র তারাই খাদ্যসংগ্রহের এই অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

অবশ্য মাকড়শামাত্রেই যে জাল বুনে তা নয়। বাঘ সিংহের মত পোকামাকড় শীকার করে ফেরে এমন অনেক মাকড়শাও আছে। ছোট ছোট এক জাতের মাকড়শা বাঙ্গালাদেশের ঘরবাড়ির আনাচে-কাণাচে দেখা যায়, তারা জাল বুনতে জানে না, হিংস্র শ্বাপদের মত পোকামাকড়ের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে।

জাল যারা বুনে, তাদের মধ্যেও অনেক শ্রেণীভেদ আছে। ঢাকাই মসলীন্ ত আর সব তাঁতীর হাত দিয়ে বেরোয় না, গামছা বুনবার জোলাও আছে। মাকড়শাদের মধ্যে সবচেয়ে গুণী কারিগরেরা যে জাল বুনে তার সুতো যেমন রেশমের মত সূক্ষ্ম, তেমনি নিখুঁত গোলাকার তার
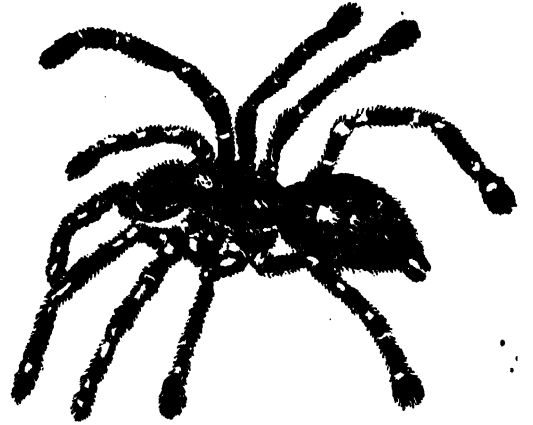
টারান্টুলা মাকড়শা।

গড়ন। কে বলবে যে জ্যামিতি খুলে রীতিমত সূক্ষ্ম মাপজোখ করে সে জাল গড়া হয় নি!

গোল জাল যারা গড়ে তাদের অধিকাংশকেই বৈজ্ঞানিকেরা 'এপিরোপিডি' বলে এক বড় গোষ্ঠির মধ্যে ফেলেছেন। এর ভিতর সব চেয়ে বড় 'জেনাস' বা 'গণ' হল "অ্যারেনিয়াস"। সাধারণতঃ এ জাতের মাকড়শা নিশাচর।

এই গুণী মাকড়শা কেমন করে তাদের অপরূপ জাল বুনে এবার দেখা যাক। তাদের যন্ত্রপাতি মালমশলা সবই যে তাদের নিজের মধ্যে আছে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। গুণী মাকড়শার একটিকে চিৎ করে ফেললে দেখা যাবে,

তাদের পেটের তলায় ক্ষুদে ক্ষুদে আঙ্গুলের মত কয়েকটি জিনিষ আছে। এগুলির নাম "স্পিনারেট"—এইগুলিই তাদের জাল বুনবার মাকু। একটা বড় কাঁচের পাত্রের মধ্যে একটি মাকড়শাকে ছেড়ে দিলে এই "স্পিনারেট"গুলির পরিচালনা-কৌশল দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কখনও খুলে, কখনও বন্ধ হয়ে, আমাদের আঙ্গুলের মত কখনও পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে, কখনও ফাঁক হয়ে এই মাকুগুলি নিজেদের ভিতর থেকে মিহি সুতো বার করে, খানিকক্ষণের মধ্যেই কাঁচের পাত্রের ভিতরটা জালে ঢেকে ফেলবে।

নানা জাতের মাকড়শার পেটে ছটি থেকে আটটি পর্য্যন্ত "স্পিনারেট" দেখা যায়। বেশীর ভাগ মাকড়শার থাকে ছটি। যে গুণী মাকড়শার কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের পেটে আগুপিছু করে তিন জোড়া ছটি মাকুই আছে। খালি চোখে এ মাকুগুলি দেখা গেলেও তাদের অপরূপ রহস্য জানতে হলে অনুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হয়। অনুবীক্ষণের তলায় দেখা যায়, প্রত্যেক "স্পিনারেটে"র ভিতর অসংখ্য সূক্ষ্ম নল রয়েছে। নলগুলি বেশীর ভাগ গোলাকার, সেগুলিকে 'স্পুল' বা কাঠিম বলে। মাঝেমাঝে মোটা থেকে ছুঁচল লাট্টুর তলার দিকটার মত এক রকম নল দেখা যায়।

এই মোটা থেকে সরু ছুঁচল নলগুলিকে বলে 'স্পিগট' বা গুঁজি। এই কাঠিম ও ছুঁচল ছিপিগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে সূক্ষ্মতম নল দিয়ে মাকড়শার পেটের একটি করে গ্রন্থির যোগ আছে। সেই গ্রন্থিগুলি থেকেই মাকড়শার জালের রেশমী সুতো বেরোয়। গ্রন্থির ভিতর অবশ্য সুতো জমা হয়ে নেই। সেগুলির বিশেষ রসই 'স্পুল' বা 'স্পিগটের' ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে হাওয়ার স্পর্শে শুকিয়ে সুতো হয়ে যায়। মাকড়শা চলাফেরার সঙ্গেসঙ্গে টেনে সে সুতোকে দীর্ঘ করে।

যে মাকড়শার কথা বর্ণনা করছি, তার তলপেটে 'স্পুল' ও 'স্পিগটে'র সঙ্গে যুক্ত এমন ৬০০টি গ্রন্থি আছে। কিন্তু স্পুল ও স্পিগটগুলি তাই বলে সেই সমস্ত গ্রন্থির সুতো এক সঙ্গে জড়িয়ে সুতো পাকায় না। তার কারণ এই যে, সব গ্রন্থি থেকে একরকম সুতো বার হয় না। পাঁচ ধরণের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে আলাদা আলাদা পাঁচ রকম সুতো উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ধরণের সুতো বিভিন্ন কাজে লাগে। যখন যে রকম সুতো দরকার, মাকড়শা উপযুক্ত গ্রন্থিগুলিকে তলব করে তা বার করে নেয়। অন্য গ্রন্থিগুলির তখন ছুটি।

প্রত্যেক 'স্পিনারেটে' অনেকগুলি করে স্পুল ও কয়েকটি স্পিগট আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। স্পুলের সংখ্যা প্রায় ১০০। মাকড়শা স্পুলগুলি শুধু জালের সুতো কোথাও আটকাবার দরকার হলে বা কোন শীকার জালে পড়লে তাকে বেঁধে ফেলবার জন্যে ব্যবহার করে। স্পুলগুলি থেকে এক রকম আটাল চটচটে ছোট সুতোই বেরোয়। অসংখ্য সেই রকম আটাল সুতোর জালে আবদ্ধ শীকার একেবারে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা হয়ে যায়। 'স্পিগটে'র কাজ বুঝতে হলে প্রথম তারা স্পিনারেটে কি ভাবে সাজান থাকে জানা দরকার। সামনের স্পিনারেট দুটিতে দুটি স্পিগট থাকে। মাঝের জোড়ায় থাকে প্রত্যেকটিতে তিনটি করে ও পিছনের জোড়ায় থাকে পাঁচটি করে। সামনের স্পিগট দুটিই সব চেয়ে বেশী কাজে লাগে। মাকড়শার জালের সমস্ত সুতো এই দুটি স্পিগটই জোগায়। মাঝখানের স্পিনারেট দুটিতে মোট ছটি স্পিগট আছে। প্রত্যেক স্পিনারেটে দুটি থাকে আগার দিকে ও একটি পিছনে। মাঝের স্পিনারেটের পিছনের স্পিগটদুটির ডাক পড়ে জালের সুতো শক্ত করবার দরকার হলে। তখন সামনের দুটি স্পিগটের দু'ফেরতা সুতোর সঙ্গে এই দুটি স্পিগটের দু'ফেরতা সুতো যোগ হয়ে মোট চার ফেরতা সুতো একত্র করা হয়। মাঝের স্পিনারেটের উপরকার চারটি স্পিগট জাল বুনবার জন্যে নয়, তাদের প্রয়োজন কি তা পরে বলা হচ্ছে।

পিছনের স্পিনারেট দুটির প্রত্যেকটিতে যে পাঁচটি করে স্পিগট আছে তা আগেপিছে তিনটি ও দুটি করে সাজান। সামনের তিনটি করে ছটি স্পিগটই জাল বুনার কাজে লাগে। তাদের কাজ কি তা জানবার আগে মাকড়শার জাল পাতবার রীতিটি বোঝা যাক। মাকড়শা প্রথমে বেশ একটি সুবিধে মত জায়গায় চারফেরতা সুতোয় মজবুত করে জালের তেকোণা বা পাঁচকোণা ফ্রেমটি খাটিয়ে নেয়। এই ফ্রেমের সমস্ত লাইনগুলি থেকে মধ্য-বিন্দুতে চাকার 'স্পোক' বা দণ্ডের মত অনেকগুলি সুতো তারপর মাকড়শা পেতে ফেলে। সেই কাঠামের ওপর গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাকড়শা এবার সুতোর প্যাঁচ জড়ায়। মাকড়শার পাতা এই জাল ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বাইরের ফ্রেম ও চাকার স্পোকের মত কেন্দ্রাভিমুখী সুতোগুলির সঙ্গে বৃত্তাকারে জড়ান সুতোর তফাৎ আছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ান সুতোগুলি

আটার মত চট্চটে। তাতে যা লাগে তাই জড়িয়ে যায়। পেঁচিয়ে জড়ান সুতোগুলি সামনের সাধারণ স্পিগট থেকে উৎপন্ন হলেও এ রকম চটচটে হয় শুধু পিছনের স্পিনারেট জোড়ার সামনের তিনটি করে স্পিগটের গুণে। এই স্পিগট গুলি থেকেই আটার মত এক রকম রস বার করে মাকড়শা সুতোয় লাগিয়ে দেয়। অন্যান্য গ্রন্থির রসের মত মাকড়শার এই গ্রন্থিগুলির রস হাওয়ার সংস্পর্শে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় না।

মাকড়শার সমস্ত স্পিগটের মধ্যে এখন শুধু মাঝের চারটি ও পিছনের চারটির কাজ কি তা জানা যায় নি। এগুলি জালের কোন কাজে লাগে না। এগুলি থেকে যে সুতো বেরোয় সেগুলি সহজে ছেঁড়া যায় না, সেগুলি টানলেও বাড়ে। এই সুতোয় মাকড়শা তার ডিম রাখবার থলে তৈরী করে।

মাকড়শার জাল-বয়ন ব্যাপার যে কি জটীল, তা বোধ হয় এতক্ষণে ভাল করেই বুঝা গেছে। এক একটি মাকড়শা নিজের দেহে যেন গোটা একটা কাপড়ের কল বয়ে নিয়ে বেড়ায়। অবশ্য কীট-জগতের বিশেষত্বই তাই। মানুষের মত তারা বাইরের উপকরণ কাজে লাগাতে পারে না, কিন্তু নিজেদের দেহকেই এমন সব যন্ত্রে পরিণত করতে পারে, মানুষের বুদ্ধি যার কাছে অনেক সময়ে হার মানে।

জাল যারা বুনে সেই মাকড়শাদের দুটি বড় বড় গোষ্টিতে ভাগ করা হয়।

এক দলের তলপেটে স্পিনারেটগুলির উপর একটি শক্ত ঢাকনি থাকে। স্পিনারেটের সুতো সেই ঢাকনির নানা সূক্ষ্ম ফুটোর ভিতর দিয়ে বাইরে বেরোয়। আমরা এতক্ষণ যে মাকড়শার কথা আলোচনা করলাম, মাকড়শাদের সেই গুণী তাঁতীদের এই ঢাকনি নেই। পেটে ঢাকনি দেওয়া মাকড়শারা সাধারণতঃ নীরেস জাল বুনে, তবে তাদের ভিতর একটি জাত গোলাকার জাল পাতার বিদ্যা প্রায় আরানিড জাতীয় মাকড়শার মতই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অন্যান্য পেটে ঢাকনি দেওয়া মাকড়শাদের জাল দুপুরু হয়। নীচে উপরে দুটি জাল পাতা থাকে। তার উপরেরটি সমতল ও তার বুনোন ঘন, নীচেরটি ফাঁক ফাঁক।

ছোটবড় গাছপালার ঝোপে জটীল ঘন অগোছালো এক রকম জাল অনেকেরই চোখে নিশ্চয় পড়েছে। লতায় পাতায় ডালে যেন যেমন-তেমন ভাবে এই জাল জড়ান বলে মনে হয়। জালের চারিধারে চটচটে অনেকগুলি সুতো ঝুরির মত ঝুলতেও দেখা যায়। এই জালগুলি পেটে ঢাকনি দেওয়া এক জাতের মাকড়শার বাসা। এই জাতের মাকড়শা একলা নয়, দল বেঁধেই উপনিবেশ পেতেই বাস করে। শীকার পড়বা মাত্র তারা বেরিয়ে এসে শীকারকে জালের ভিতর টেনে নিয়ে আহার করে।
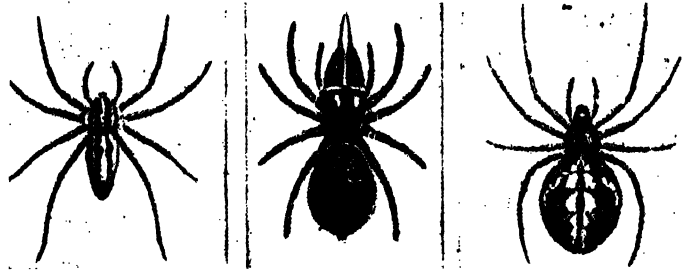
তিন জাতির অদ্ভুতদর্শন মাকড়শা।

ঢাকনাহীন বয়ন-নিপুণ মাকড়শাদের একটি জাতকে আমাদের মাঠে ঘাটে বাগানে আমরা সবাই দেখেছি। গোলাকার জালগুলি দেখলেই তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। এদের আর একটি জাতি বাঙ্গলা দেশে বড় বড় গাছে বিশাল সব ফাঁদ পেতে রাখে। বর্ষার শেষে এদের হলুদ-রঙের সুতোর প্রায় তিনহাত লম্বা জালগুলি জঙ্গলের নানা যায়গায় দেখা যায়। এই মাকড়শাগুলি পাগুলি সমেত লম্বায় চওড়ায় এক একটি প্রায় আধ ফুট। এদের গায়ে সবুজ ও হলদে রঙের ছিট থাকে।

জাল পেতে যে মাকড়শারা এমনি করে শীকার ধরে, তারা সবাই কিন্তু মাকড়শা-বাড়ির গিন্নী। মাকড়শাদের কর্ত্তারা নিতান্ত নিরীহ। ক্ষুদে অকর্ম্মণ্য প্রাণী। আকারে তারা অনেক ছোট হয়। বাড়ির মালিক গিন্নীর দয়ার উপর নির্ভর করে, তাঁর প্রসাদ খেয়ে, জালের এক প্রান্তে কোন রকমে কর্ত্তার দিন কাটে দজ্জাল গিন্নীর ভয়ে তিনি সারাক্ষণই শশব্যস্ত।

অবশ্য সব জাতের মাকড়শাদের ভিতর কর্ত্তা-গিন্নীর এরকম সম্বন্ধ নয়।

নেকড়ে-মাকড়শা যাদের বলা হয়, তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতর খুব বনিবনাও। নেকড়ে-মাকড়শাদের ভিজে স্যাঁৎ-সেতে জায়গায় খুব বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ এ জাতের কেউ জাল বুনে না। শ্বাপদের মত শীকার করে আহার সংগ্রহ করে। এদের নাম নেকড়ে দেওয়া হলেও নেকড়ে বাঘের মত এরা কিন্তু দল বেঁধে থাকে না। একা একাই ফেরে। এদের ভিতর একটি জাত ঝোপের উপর বা ঘাসের ভিতর সুড়ঙ্গের মত এক রকম ফাঁদ পাতে। কর্ত্তা থাকেন সুড়ঙ্গের মুখে আর গিন্নী ভিতরে বিশ্রাম করেন। সুড়ঙ্গের মুখে শীকার এসে পড়লে কর্ত্তাই তাকে মেরে ভিতরে নিয়ে যান।

নেকড়ে-মাকড়শার মত আর এক জাতের মাকড়শা জাল না বুনে ধাওয়া করে শীকার ধরে। এদের নাম 'অ্যাটিডি' বা লাফানো মাকড়শা। এদের গতিবিধি ভারী অদ্ভুত, ছোট ছোট কয়েকটা লাফ দিয়ে এরা খানিকক্ষণ একেবারে স্থির হয়ে থাকে, তার পর আবার কয়েকটা লাফ দেয়। শীকার ধরার এই হ'ল এদের কায়দা। এই লাফানো মাকড়শাদের অনেকে পিঁপড়েদের চাল-চলন, এমন কি চেহারা পর্য্যন্ত অদ্ভুত ভাবে এক এক সময়ে নকল করে। এদের একটি জাতের চেহারা এমন যে, মাঠের কালো পিঁপড়েদের থেকে তাদের তফাৎ চট করে বুঝাই দায়।

পোকা হিসাবে মাকড়শাকে আমরা খুব ভাল চোখে দেখিনে। বেশ একটু ঘৃণা এমন কি একটু ভয়ও করি। কিন্তু সত্যি অধিকাংশ মাকড়শাই নিতান্ত নিরীহ। আমাদের ঘরবাড়িতে যে সমস্ত মাকড়শার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, দু একটি ছাড়া তাদের অধিকাংশ জাত আমাদের উপকারই করে। মশা, মাছি, আরশুলা প্রভৃতি ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের তারা শত্রু। লাফান মাকড়শাদের একটি জাত ত মশার যম। তাদের ল্যাটিন নাম প্লেক্সিপ্পাস কালসিভোরাস-(plexippus culcivorus)-এর অর্থ হ'ল 'মশাখেকো'। আমাদের বাড়িঘর থেকে তাড়াতে যদি কাউকে হয়, তা হলে আর্টিমা আটলান্টা নামে এক জাতের মাকড়শ'কে। এদের চেনা মোটেই কঠিন নয়। সুতোর মত মিহি পা ও ক্ষুদে দেহ এদের বিশেষত্ব। মুখে ডিম নিয়ে জালের মাঝখানে পেট উপর দিকে করে এরা বসে থাকে। যেখানে সেখানে জাল পেতে এরা আমাদের বাড়িঘর ঝুলে নোংরা করবার ব্যবস্থা করে।

সাধারণ মাকড়শাকে ভয় করবারও কিছু নেই। মাকড়শা মাত্রেরই মুখে দাঁতের গোড়ায় দুটি করে বিষের থলি আছে বটে, কিন্তু খুব কম মাকড়শাই মানুষের শরীরে বিষ প্রয়োগ করবার ক্ষমতা রাখে। অনেকে মনে করেন, সাপের চেয়ে মাকড়শার নিজের বিষের কলের উপর দখল বেশী আছে। বিষাক্ত সাপ যেমন কামড়ালেই বিষ, ঘায়ের ভিতর গড়িয়ে আসে, মাকড়শার তা হয় না। মাকড়শা ইচ্ছামত বিষ প্রয়োগ করতে পারে।

যে সব মাকড়শা বিষ প্রয়োগ করে মানুষের ক্ষতি করে, তাদের আসল মাকড়শা থেকে আর এক ভিন্ন গোষ্ঠিতে ফেলা হয়। বিষ-দাঁতের গড়নের পার্থক্য থেকেই এই প্রভেদ করা হয়েছে। ট্যারান্টুলা নামে বড় বড় লোমশ বিষাক্ত মাকড়শা এই পৃথক গোষ্ঠিভুক্ত। বয়ন-নিপুণ যে সব মাকড়শার কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বলা হয় আসল মাকড়শা। অতিকায় সমস্ত মাকড়শা ট্যারান্টুলার জাত-গোষ্ঠির মধ্যেই পাওয়া যায়। এদের অনেকে এত বড় ও এমন শক্তিমান হয় যে, পাখী ও ছোটখাট জানোয়ার অনায়াসে শীকার করে। এদের একটি জাতের শীকার ধরবার কৌশল অপূর্ব্ব। মাটির ভিতর গর্ত্ত করে এরা বাস করে। গর্ত্তের মুখে একটি কব্জা-দেওয়া ঢাকনি থাকে। সে ঢাকনিটির উপরে এমন ভাবে মাটি লাগান থাকে যে, তাকে অন্য পাশের জমি থেকে আলাদা করে চেনাই যায় না। মাকড়শা গর্ত্তের ভিতর দরজার নীচে ওৎ পেতে থাকে। কোন পোকামাকড় বা মাছি সেই কব্জা-দেওয়া ঢাকনির উপর বসবা মাত্র সে বিদ্যুদ্‌বেগে ঢাকনি টেনে ভিতরের গর্ত্তে শীকারটিকে ফেলে ধরে নেয়।

মাকড়শাদের মাত্র কয়েকটি জাতের মোটামুটি পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। তারা পৃথিবীর অত্যন্ত প্রাচীন জাত। আদিম সমুদ্রে যে বিরাট সাগরবিচ্ছুরা একদিন রাজত্ব করে, তাদেরই ধারা থেকে মাকড়শাদের উৎপত্তি হয়েছে। কাঁকড়া-বিছে ও মাকড়শারা এক হিসেবে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। অন্যান্য পোকামাকড়ের থেকে এদের ধারা পৃথক। বহু যুগের বিবর্ত্তনের ফলে মাকড়শারা নানা বিভিন্ন পথে বিচিত্র রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশে অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকেরা এখনো তাদের সকলের খোঁজ নিতে পারেন নি। এখনো অনেক নতুন নতুন জাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

মীরা

-শ্রীসুরুচিবালা রায়

[২১]

দ্বিতীয়ার এক ফোঁটা চাঁদ কখন আকাশে উঠিয়া কখন অস্তে নামিয়া গিয়াছে। আকাশ প্রায় অন্ধকার, আকাশের নীচে সহর-কর্ত্তাদের কৃপাবঞ্চিত অপরিসর ছোট ছোট গলিগুলিও তেমনই অন্ধকার। বহু দূরে দূরে এক একটী লাইটপোষ্টের কাছে কাছে একটুখানি করিয়া জায়গা আলোকিত হইয়া আছে। তাহারই কাছে কাছে বাড়ীগুলির সম্মুখের রকে বসিয়া দুই চারিজন ভদ্রলোক বিশ্রাম-সুখের সঙ্গে সহরের নানা আলোচনায় মগ্ন।

আলোকোজ্জ্বল বড়রাস্তা ছাড়িয়া একটীর পর একটী এই রকম গলি অতিক্রম করিয়া একাকী পানু অন্ধকারে পথ চলিয়াছে। পানুর মাঝে মাঝে এইভাবে গলিতে গলিতে হাঁটিবার কি রকম একটা অদ্ভুত খেয়াল হয়।—বড় রাস্তার উপরের সুশোভিত, আলোকোজ্জ্বল বাড়ীগুলির একটা গর্ব্ব আছে, দীপ্তি আছে এবং দাহও আছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র গলিগুলির দারিদ্র্য ও অন্ধকারের ভিতর একটা যে কোমল প্রশান্তি আছে, এক একদিন মনটাকে যেন তাহা কেবলই টানিতে থাকে।

গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া পানু অনির্দ্দিষ্ট পথে কেবলই চলিতেছে। উপরের ঐ আকাশের মত, সম্মুখের, পশ্চাতের ঐ লক্ষ্যহীন আঁধার সমুদ্রের মত তাহারও বুকে আজ আলোর রেখা মাত্র নাই। মনটা যেদিন এমন চঞ্চল হয়, সেদিন আর পানু ঘরে বসিয়া স্থির হইয়া ভাবিতে পারে না। আদিহীন, অন্তহীন পথে লক্ষ্যহারার মত ছুটিয়া ছুটিয়াই পানু আপনাকে শান্ত করিয়া রাখে।

আজ যে কঠিন কথাগুলি মীরাকে পানু বলিয়া আসিল, তাহার মন জানে, এইগুলি সত্য নয়। ব্যর্থতার যে দারুণ বেদনা অহর্নিশ তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, এইগুলি তাহারই বিষাক্ত বাষ্পমাত্র।

ঘণ্টা দুই পরে পানু যখন গৃহে পৌছিল, সেখানে নীচের হলঘরে, তখন তাহার কলেজের জনকয়েক বন্ধুর মস্ত এক সভা বসিয়া গিয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্য করিয়া পানুর মনটা খুসী হইয়া উঠিল যে, অধরবাবু তাঁহার আতিথ্যের কিছু মাত্র ত্রুটি রাখেন নাই, টেবিলটীর উপর নিম্‌কী, সন্দেশের প্লেট এবং ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা সারি সারি শোভা পাইতেছে। পানু আসিয়া গৃহে দাঁড়াইতেই ছেলেরা কলরব করিয়া উঠিল।

কাছে অগ্রসর হইয়া টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া পানু কহিল, —'ব্যাপার কি? হঠাৎ সব? কিসের সভা?'

—'কোথায় ছিলে তুমি এত রাত অবধি? কলেজে গিয়েও তক্ষুনি চলে এলে, প্রেসিডেন্ট তোমায় খুঁজছিলেন।'

—'মি. মার্টিন?'

—'হ্যাঁ। জানিস ভাই, আমাদের প্রোগ্রাম প্রেসিডেন্ট আগাগোড়া বদলে দিলেন সব। বললেন, একজামিন এসে পড়ল প্রায়, এখন বাইরের কাজ কমিয়ে আনতে হবে। তার চেয়ে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে নিজের নিজের গ্রামে গিয়ে, পড়ার সময়টা বাদ দিয়ে অন্য যে কোন গ্রাম-হিতকর কাজ, যেমন নিরক্ষরকে পড়ান বা আর কিছু তাই করতে হবে সবাইকে। আর কে কি করতে চায়, তাই ঠিক করে নিতে হবে আজই, কাল প্রেসিডেন্টের বাড়ীর মিটিংএ তাঁকে গিয়ে সব জানাতে হবে।'

পানু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল, তাহার পর টেবিলের কাছেই একটা খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল।

—'কি রে শুয়ে পড়লি যে? কি হয়েছে তোর বল ত, কি রকম দেখাচ্ছে যেন!'

হাই তুলিয়া, গোটা দুই পাশ ফিরিয়া পানু কহিল, 'হয়নি কিছুই, কিন্তু তোরা খাচ্ছিস না কেন? চা জুড়িয়ে যাচ্ছে না?'

—'খাচ্ছি, মিসেস মার্টিন একটা লোভের কথা বলেছেন, শুনেছিস?'

—'না, কি কথা?'

—'এ বারের এই ছুটিতে গ্রামের কাজ এবং পড়ার কাজ দুটোই যার ভাল হবে সব চেয়ে, ছুটির পরের মিটিংএ তাঁকে

তিনি এফিসিয়েন্সি গোল্ড-মেডেল দেবেন। ফাঁকি দেওয়া চলবে না কিন্তু।'

পানু মাথাটা তুলিয়া নিতান্ত উদাসীন ভাবে একটা হুঁ বলিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

—'এত ক্লান্ত হয়ে পড়লি কেন? কোথায় গেছলি? এই শোন, মিঃ এবং মিসেস মার্টিন দুইজনেই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বলছিলেন, সেক্রেটারীর কি হ'ল? তোর কি হ'ল বল ত? এরই মধ্যে উৎসাহ সব নিভে গেল না কি?'

ছেলেরা চলিয়া গেলেও পানু সেখানেই শুইয়া রহিল। কাজ! কাজ! কাজ! চারিদিক হইতে কেবলই কাজের আহ্বান। তাহার কাছ হইতেই সকলে দাবী করে, কিন্তু তাহার কি দাবী কাহারও উপর নাই? স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, সংসারে কোন কিছু তাহার জন্য নাই, কেবল ভিক্ষা করিয়া করিয়া কতদিন চলে? যার কিছু নাই, চারিদিকে যার গভীর শূন্যতা, কাজ করিবার শক্তি সে কোথা হইতে পাইবে?—হায় মা, কেন তুমি জন্ম দিয়া অনাথ করিয়া সংসারে ছেলেটীকে ফেলিয়া গেলে? যার মা নাই, মাতৃ-স্নেহ যে পায় নাই, তাহার কাঙ্গাল বৃত্তি কি পৃথিবীতে কোন দিন ঘুচে?

অত কঠিন করিয়া কথাগুলি বলা, আজ মীরাকে হয়ত উচিত হয় নাই। অক্ষমতার বেদনা ঢাকিতে গিয়া যে মিথ্যা তেজের আশ্রয় সে গ্রহণ করিয়াছিল, উহা কি তাহাকে চির-দিন বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে? সে নিজে জানে, কত তুচ্ছ, কত হেয় সে। অত তুচ্ছ বলিয়াই ত মীরার কাছে তাহার পরাজয়ের বেদনা। তাহার চিরদিনের সাথী মীরা, আজ কত উচ্চে উঠিয়া তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দূরে দূরে কত মধুলোভী ভ্রমর যে ঐ একটী ফুলেরই পানে দৃষ্টি রাখিয়া গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, অস্পষ্ট হইলেও পানুর তাহা অজ্ঞাত নাই।—পানুর আজ আর মীরার সমকক্ষ হইবার কোন ক্ষমতা নাই, তাই দারুণ একটী অভিমানে পানু দিনে দিনে রুক্ষ, কঠোর হইয়া উঠিতেছে। নিজেকে বেদনা দিয়া এবং অন্যকেও আঘাত করিয়া করিয়া যে মর্ম্মভেদী আরাম সে পায়, তাহা যে তাহার অন্তরকে দিনে দিনে এক বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে, কতদিন আর তাহার দাহ সে সহ্য করিবে!

পরদিন প্রভাতে স্নান এবং চা-পান সমাপন করিয়া পানু নিতান্তই অবসন্ন মনে দৈনিক খবরের কাগজখানি খুলিয়া বসিতেই প্রথমেই তাহাকে উপরের বড় বড় অক্ষরগুলি সচকিত করিয়া তুলিল। বিপুল নাদে ধর্ম্মের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছে, ধর্ম্মের আসনে বসিয়া ধর্ম্মের পূজারী পূজার মন্দিরে অধর্ম্মের যে বীভৎস গোপন লীলার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের আহ্বান,—পানুর রক্ত গরম হইয়া উঠিল, খবরের কাগজ টেবিলে ফেলিয়া রাখিয়া সে চঞ্চল পদে গৃহে পায়চারী করিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরে কলেজে গিয়া প্রথমেই সে সুনীলকে বলিল, 'তারকেশ্বরের ব্যাপার দেখেছিস? আমাদের কি কোন কাজ নেই এতে?'

শান্তভাবে সুনীল কহিল, 'তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে? কাজ হয়ত আছে, কিন্তু—'

অধীর হইয়া পানু কহিল, 'কিন্তু কি? কাজের দরকার পড়েছে, কাজ করতে হবে, আমি এই বুঝি, এর ভিতর আবার কিন্তু কি? আরাম করতে চাইলে ঘরে বসে অনেক আরাম করা যায়, তোরা তবে তাই কর বসে, এবারে আমার ডাক পড়েছে সত্যাগ্রহে,—আমারই এবার পালা, আমি চললুম।'

সুনীল কহিল, 'ভাই ব্যস্ত হবার কথা নয়, এখন আমাদের সময় হয়নি, শক্তির সঞ্চার না হতেই যদি এমনি করে মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজেদের নষ্ট করে দিই, তবে বৃথাই কেন এতদিন শক্তির সাধনা করলাম? তার চেয়ে শক্তির পূর্ণ সঞ্চার করে নিয়ে, শক্তিমান হয়ে, সে মরণ-আগুন নিঃশেষে যদি নিভিয়ে দিতে পারি, সেইটেই কি বড় আদর্শ নয়?'

পানু কহিল, 'আমি ও সব বুঝি না, আমি বুঝি সুযোগ সচরাচর আসে না। সুযোগ ছাড়তে নেই।'

সুনীল কহিল, 'তবে তুমি সুযোগ গ্রহণ করগে' যাও, কিন্তু এর পরে যখন ফিরে আসবে, তখন হয়ত সমস্ত শক্তি হারিয়ে আসবে। আর তা ছাড়া কে জানে, সত্যিকারের আদর্শের পথ থেকে তোমায় তখন হয়ত অনেক দূরেই গিয়ে পড়তে

'হবে। কেন না, একবার কোনও রকমে জেল-টেল খেটে এলে, তাকে দিয়ে সংসারের অনেক কাজই হয় না।'

—'না হোক্! আমি একবার নিজের শক্তির পরীক্ষা করতে চাই, প্রাণটা কত সহজেই বিলিয়ে দিতে পারি, সে শক্তির পরীক্ষা হোক।'

—'শক্তির সঞ্চার হল কবে যে এখনি তার পরীক্ষা ভাই? বরং এখন, এই দিকে, এই সব ছোট ছোট কাজগুলোতে আমাদের দরকার বেশি; তুমি বা আমি একলা প্রাণ দিলেই ত হল না, যাদের আমরা তৈরী করছি, এমনি ধর্ম্মের আহ্বানে প্রাণ দেবার মত মন তাদেরও গড়ে তোলবার দরকার ভাই। একজন বা দুইজনে প্রাণ দিলে যা হবে, হাজার জনে প্রাণ দিলে, তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না? সেই প্রাণগুলোকে গড়ে তোলবার জন্যই এখন আমাদের থাকবার দরকার বেশি।'

—'ভাই, আমার মন এখন ভয়ঙ্কর চঞ্চল, ও সব কথা এখন আমি আর ঠিক বুঝছি না, আমাকে ভাবতে হবে।'

কিন্তু ভাবিয়া বিশেষ কিছু হইল না; তারকেশ্বরের মোহান্ত-বিনাশী আগুনের যে শিখাতে সমস্ত ভারতবর্ষ ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছিল, পানুর স্বভাবচঞ্চল একগুঁয়ে মন অবিলম্বে তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িল।

[২২]

—'কে? সুনীল না?'

—'পান্নালাল, এস ভাই এস, রমেশের কাছে খবর পেয়ে, আজ তিনদিন রোজ আমি এখানে আসছি, রোজই ফিরে যাচ্ছি। ঠিক দিন ত জানবার যো নেই।' বলিয়া সুনীল পানুর পানে চাহিল; পান্নালালের অধরে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

দ্রুত অগ্রসর হইয়া সুনীল দুটি ব্যগ্র হাতে বন্ধুকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া ফেলিল। মৃদু, কোমল কণ্ঠে পান্নালাল কহিল, 'হ্যাঁ, ছাড়া পাওয়ার সৌভাগ্য আজই হল, এই দু'দিন ত ছাড়ার কথা ছিল না, তুমি মিছে এসে ঘুরে গেছ; তা আজই বা কেন এলে? হাওড়া থেকে বাড়ীটুকু চিনে যাবার পথ আমি ভুলে গেছি, এই তোমার ধারণা হল না কি?' মৃদু হাসিয়া সুনীল কহিল, 'হ্যাঁ, তা' একটু হল বৈকি! ভাবলাম এসে পৌছুতে পৌছুতেই ফিরে গাড়ীতে ফের না রওনা হয়ে যাও। তোমার বুদ্ধির কলগুলো কখন কোন্ দিকে ঘুরতে থাকবে, তা বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও জানেন না। কিন্তু আমার ভুলই হচ্ছিল ভাই, যা করে কাপড় চাদর মুড়ি দিয়ে নেমেছ, আমি ত চিনতেই পারিনি।'

সম্মুখে একটী লাইটপোষ্টের কাছে আসিয়া সুনীল কহিল, 'দাঁড়াও, এই দুই মাসে চেহারাটা কেমন তৈরী করে নিয়ে এলে একটু দেখি, ফটো তোলবার মত ত?'

চাদর সরাইয়া মুখখানি তুলিয়া পান্নালাল বন্ধুর পানে চাহিয়া হাসিল। শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে; কালীমাটির ফাঁকে ফাঁকে সেই উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ দেহখানি নিতান্ত ফ্যাকাশে ও মলিন দেখাইতেছে, দেহখানি শীর্ণ, পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন, কিন্তু চক্ষু দুটী অত্যন্ত উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীব্র, প্রখর।

পান্নালাল হাসিয়া কহিল, 'বিয়ের বর দেখছ না কি হে?'

—'তা দেখছি বই কি! এমন বরটী পেলে, যার নিতান্তই দুর্ভাগ্য সেই কেবল ছাড়বে।'

—'কনের বাপের সামনে দাঁড়িয়ে ও সার্টিফিকেটটী দিও, যদিই বা তারা এমন মূল্যবান কথাটী ভুলে যায়!'

—'মাস দুই আতিথ্যের পরমান্নভোজ খেয়েও রসিকতাটুকু তোমার চাপা পড়ে যায় নি দেখছি।'

পান্নালাল হাসিয়া কহিল, 'না ভাই, রস বরং বেড়েছে আরো।'

পর পর দুই খানি ট্রাম আসিয়া হাজির হইল, লাফাইয়া একটীর পা-দানীতে উঠিয়া সুনীল বন্ধুর হাত ধরিয়া টানিল, পান্নালাল কহিল, 'তুই যা ভাই, আমি একবার শিয়ালদ' যাব, একবারটী ওপানে দেখা করে, তার পর বাড়ী ফিরব।'

সুনীল নামিয়া পড়িয়া কহিল, 'কিন্তু আমার ওখানে মা যে আজ তোর জন্যে রেঁধে বসে আছেন, তিনি আশা করেছেন, তুই আমাদের ওখানেই উঠবি।'

গাঢ়স্বরে পান্নালাল কহিল, 'উঠব বই কি, নিশ্চয়ই উঠব, মার রান্না খাব না? তুই উঠে পড় না; আমি ঘণ্টাখানেকের ভিতরই ফিরছি।'

দুই বন্ধু দুই ট্রামে উঠিয়া বিভিন্ন পথে যাত্রা করিল।

বহুদিন পর আবার সেই গৃহ! সেই চিরপুরাতন, চির-পরিচিত, চির প্রিয়। গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পানু সস্নেহ, সজল নেত্র দিয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে যেন অভিষিক্ত করিয়া দিল।

দ্বিতলে বারাণ্ডার সামনের বড় হলখানিতে বন্ধুবান্ধবসহ সস্ত্রীক বিনয়বাবু বসিয়া ছিলেন। পানু নীচ হইতে উচ্চ হাসির ধ্বনি ও কথোপকথন শুনিতে পাইল, এক মুহূর্ত্তকালের জন্য পানু একটু দ্বিধা করিল, তাহার পর ধীর পদক্ষেপে উঠিয়া গিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সেই উচ্চ হাসি, সেই কথোপকথন নিমিষে থামিয়া গেল, বিস্ময়চকিত দৃষ্টি মেলিয়া সকলে পানুর পানে চাহিয়া রহিলেন। দ্বারের পাশের চেয়ারটীতেই মা বসিয়া ছিলেন, অতি মধুর স্বরে 'পানু' বলিয়া ডাকিয়াই তাহার দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। পানু নীরবে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইয়া অগ্রে বিনয় বাবুকে প্রণাম করিয়া মায়ের পায়ে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া দিয়া তাঁহারই পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িল। মা কোমল দুটি হাতের স্পর্শে পানুকে আরও কাছে টানিয়া নিলেন।

প্রথম বিস্ময়ের নীরবতাটুকু কাটিয়া গিয়া, গৃহে তখন একটা অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিনয় বাবু তাঁহার আসনে সোজা হইয়া বসিয়া একটু ব্যাকুল ভাবে অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, মুস্কিল! পানু কি হাওড়া থেকে আসছ নাকি এক্ষুনি?

'—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই ছাড়লে—'

'—আজই ছাড়লে! তা তা—তবে—'

বিনয় বাবু চেয়ারটা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া, অত্যন্ত অস্থির ভাবে গৃহে পদচারণা সুরু করিয়া দিলেন। পরমুহূর্ত্তেই আবার পানুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'আজই ছাড়লে, তা হলে এই ভাবেই তোমার কি কোথাও যাওয়া··· ···তোমার আগে বাড়ী গিয়ে পরিস্কার হওয়া দরকার ছিল। এভাবে এইখানে তোমার আসাটা···হয়ত তোমার পেছনে এখনও লোক লেগে রয়েছে, না এলেই পারতে আজ, পরে অন্য এক সময়...'

বিনয় বাবুর গলার স্বর ও চেহারায় একটা উদ্বেগ ও ভীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অন্যান্য সকলেই কেমন যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই আলোকোজ্জ্বল প্রকাণ্ড গৃহখানিতে মুহূর্ত্তে ভীতির একটা কালোছায়া পড়িয়া তাহাকে যেন ক্রমে ভূতগ্রস্ত এবং মলিন করিয়া তুলিল। বিনয় বাবু অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ধপ করিয়া নিজের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, 'তোমরা ছেলেগুলো সব আজকাল বাপ মায়ের কথা শুনবে না, যত সব বাজে কাজে গিয়ে জড়িয়ে পড়বে, তার পর নিজেরও বিপদ, অন্যেরও বিপদ ..' মুহূর্ত্তে পানু দাড়াইয়া উঠিল এবং মোটা চাদরখানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মার উদ্দেশে পরিস্কার কণ্ঠে কহিল, 'মা, আমার বড্ড ভুল হয়েছে, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

নীরবে পানু তেমনি শান্ত পদবিক্ষেপে সকলের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মা পিছন পিছনে বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিয়া, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'খাবার তৈরী আছে পানু, একটু কিছু মুখে দিয়ে যা বাবা।'

সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিতে নামিতে পানু কহিল, 'আজ নয় মা,—আজ নয়—আর একদিন।'

দ্রুত পদে সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেই সহসা কিসের শব্দ শুনিয়া পানু পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইল। এক রাস্তায় নামাইয়া দুই হাতে দরজার কপাট ধরিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মীরা ডাকিতেছে—'পানু দা, পানু দা।'

পরস্পরবিরোধী দুইটি প্রবল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ঝোঁকের মাথায় পানু প্রায় ছুটিয়াই বহু দূরে আসিয়া পড়িল। দূরে একটী ট্রাম আগুনের গোলা বুকে লইয়া সম্মুখে ছুটিয়া আসিতেছিল, উর্দ্ধশ্বাসে তাহারই পানে অগ্রসর হইতে হইতে সভয়ে পানু একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল—মীরার সেই আহ্বান তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে এত দূরে কি করিয়া আসিয়া পড়িল!—যেন সেই আর্ত্ত আকুল কণ্ঠস্বর তাহাকে তখনও আহ্বান দিতেছে, পানু দা! পানু দা!

সকাল বেলা শয্যা হইতে ডাকিয়া তুলিয়া, সুশীল যখন পাশে আসিয়া বসিল, তখন জ্বরের ঘোরে পানুর চক্ষু দুটিতে রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মুহূর্ত্তকাল বসিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৃহখানির চারিপার্শ্বে তাকাইয়া দেখিয়া, যেন রাত্রির স্বপ্নঘোরের মোহটুকু দূর করিয়া দিয়া, পানু আবার শুইয়া পড়িল।

ভীত ব্যস্ত হইয়া সুশীল কহিল, 'ইস্ বড্ড জ্বর যে, কখন হ'ল পান্নালাল?'

—'রাত্তিরেই।'

—'রাত্তিরেই! কই, তখন ত ছিল না! তাই কি আমাদের ওখানে যাও নি? তাঁদের ওখানেই খেয়ে এসেছিলে বুঝি? রাত বারটা সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত আমরা ঠায় বসে। তারপর চারু বললে, মীরার মা এতদিন পর কি আর না খাইয়ে ছাড়বেন। তখন আমরা খেয়ে তবে শুতে গেলুম। মা তাই আজ ভোরেই পাঠালেন, তোমায় নিয়ে যেতে।—তা এত জ্বর কখন হল, পান্নালাল?'

পান্নালাল রক্তিম চক্ষু দুটি মেলিয়া সুশীলের পানে তাকাইল। সুশীল কহিল, 'মহামুস্কিলে ফেললে যে! নিয়েই বা তোমায় যাই কি করে? কিন্তু এই রকম জ্বর, এখানেই বা থাকবে কি করে? একটা গাড়ী ডাকাই, কেমন?'

মাথা নাড়িয়া পান্নালাল নীরবে জানাইল, 'না।'

—'না কি? হেঁটে যাবে?'

—'যাব না।'

—'যাবে না! তা কখন হয়? কে তোমাকে দেখবে এখানে বল, ওইত কেবল একটি দ্বারোয়ান রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, শুনলাম তোমার বাবা তোমার উপর রেগে চাকর ঠাকুর সব ছাড়িয়ে দিয়েছেন, অধর বাবু কোন্ মেসে আছেন, সেইখানেই থাকেন, খান, এখানে তুমি কোথায় থাকবে? তা ভাল শরীরে যাহোক করে চলে যেত, এই জ্বরের উপর তোমায় আমি এখানে একলা ফেলে যেতে পারি নে।'

পান্নালাল ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ় ভাবেই জানাইল,—না সে কিছুতেই যাইবে না।

পান্নালালের এই দৃঢ়তাটুকু সুশীল ভাল করিয়াই চিনিত, সে হতাশ হইয়া বলিল, 'তবে শেয়ালদ যাবে? চল সেখানেই তাহলে পৌঁছে দিই গে—'

—'না।'

বিরক্ত হইয়া সুশীল বলিল—'না? তবে থাক, থাক তুমি একলাটী পড়ে। আমার কর্ত্তব্য ছিল তোমায় বলা, বললুম। তবে তোমার বাবাকে টেলীগ্রাফ করা আর একটা কর্ত্তব্য আমার বাকী রয়েছে, সেইটেই এখন করে দিগে, যাই, তারপর তোমার যা খুসী হোক—'

সুশীল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

—'সুশীল—'

বারাণ্ডায় গিয়া সুশীল দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া ঘরে আসিয়া সাগ্রহে কহিল, 'ডাকলে?'

—'টেলিগ্রাফ ক'রো না—'

—'কেন? তারপর এসবের দায়িত্ব নেবে কে?'

রক্তবর্ণ চক্ষুদুটীতে দারুণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পান্নালাল কঠিন তিক্তস্বরে কহিল, 'ক'রো না টেলিগ্রাফ,—ব্যস্,—যাও।'

সুশীল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে দ্বারে একটা গাড়ী আসিয়া থামিল। জ্বরের ঘোরে পান্নালাল তখন স্বপ্ন দেখিতেছে। সেই তারকেশ্বরের মন্দির, সেই গোলমাল, মাথায় একটা ভীষণ আঘাত, তারপর দিন দুই পরে সেই হাজতে কয়েদী। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা তখনও সারে নাই, সেই অবস্থাতেই আহারের অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থার ফলে প্রায়োপবেশন, দুর্ব্বল দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল, কঠিন মন তবু কিছুতে ভাঙ্গে না,—দারুণ পিপাসা,এক ফোঁটা জল তবু পানু মুখে তুলিল না। অবশ দেহ ক্রমে ভূমির সঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় চারিদিক গাড়ীর শব্দে কাঁপাইয়া, মীরার মা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন, হাসিয়া কহিলেন, 'পানু উঠে আয়, তোকে নিতে এসেছি'। মীরা আসিয়া চুপিচুপি কহিল, 'আঙটীটা নেবে পানু দা? নতুন গড়িয়েছি, দেখ, এই নাও, পর।' হাসিয়া পানু হাত বাড়াইয়া দিল। অন্য আঙ্গুলে মীরার সেই জন্মদিনের দেওয়া আঙটীটী তখনও ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মা আবার ডাকিলেন 'ওঠ পানু, ওঠ, যাবি না? ঈস্, একি রে! মাথায় এত রক্ত কিসের?' আঁচল টানিয়া মা দুই হাতে পানুর মাথা চাপিয়া ধরিলেন।

সহসা হস্তস্পর্শে পানুর স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিতভাবে চাহিয়া ডাকিল,—'মা?'

'আমি বাবা, এত জ্বর হ'ল কেন পান্নালাল?'

গলার স্বর চিনিতে না পারিয়া মুখ তুলিয়া পানু সম্মুখে চাহিল,—কে? মা? মা কই? মা কোথায়? এ কে?

—'চিনতে পারলে না বাবা? আমি যে সুশীলের মা।'

পানুর অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল, সুশীলের মা? সুশীলের মা কেন? তাহার মা কই?

সম্মুখোপবিষ্টা অতি মধুর স্বরে কহিলেন, 'ওঠ ত বাবা, চল, আমি তোমায় নিতে এসেছি।'

—'না মা।'

—'কেন বাবা? আমি তোমায় নিয়ে যাব বলেই এসেছি যে।'

আর্ত্তনাদের মত গলা হইতে স্বর বাহির করিয়া পানু কহিল, 'আমি কোথাও যাব না মা।'

—'যাবে না কি বাবা? মা হয়ে আমি কি তোমায় এমনি করে ফেলে যেতে পারি? ওঠ।'

স্নেহের স্বরে পান্নালালের চোখের কোণে জল ছুটিয়া আসিল, শান্তস্বরে কহিল, 'আমি জেলের কয়েদী মা, আমায় ঘরে নিলে আপনার অমঙ্গল হবে না?'

—'পাগল! মঙ্গল অমঙ্গল কিসে হয় না হয় আমি কি জানিনে, বাবা? আর হয়ই যদি, মা হয়ে আমি কি তোমায় এমনি করে ফেলে যেতে পারি?'

বোকার মত খানিকক্ষণ অতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে পানু সুশীলের মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল।

মা কহিলেন, 'আমি কাউকে ডরাই নে বাবা, ওঠ।'

পানু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

[২৩]

বছর দেড়েক কাটিয়া গিয়াছে। বি-এ পরীক্ষার ফল এবং মীরার বৃত্তি পাইয়া সসম্মানে পাশের খবরও যথাসময়েই পাওয়া গিয়াছে। পিতামাতা এইবারে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মনের ইচ্ছা একবার বাহিরে প্রকাশ হওয়া মাত্রই চারিদিক হইতে কত রকমের সম্বন্ধের খবর আসিতে লাগিল, পিতামাতা কোনটা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কোনটা হাতে রাখিয়া আরও ভালর আশায় রহিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা মীরার মা অতি কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, অত্যন্ত বাড়াবাড়ির অবস্থায় পানুকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই দীর্ঘ দেড় বৎসরে পানুর সঙ্গে তাঁহাদের সকল সম্পর্ক দূর হইয়াই চলিতেছিল; ক্বচিৎ কখনও কাহারও কাছে পানু ভাল আছে, এই খবর পাইয়াই মা সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহার বেশি আশা আর তিনি করিতেন না, সেই একদিনের কথা মনে পড়িলে এখনও চক্ষে তাঁহার জল আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই শক্ত অসুখের সময় তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গেল, পানুকে দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সামান্য ছুটি চটিজুতা পায়ে, একটা অতি সস্তাদরের গেঞ্জির উপর খদ্দরের চাদরে দেহ ঢাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পানু ধীরে ধীরে রোগিণীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মীরা মায়ের জন্য বেদানার রস প্রস্তুত করিতেছিল, শয্যা-পার্শ্বে দুইজন নার্স আইসব্যাগ ও পাখা ধরিয়া বসিয়া ছিল; এক পাশে একটা টেবিলের উপর পা ছটি তুলিয়া দিয়া, অর্দ্ধ-মুদিত নেত্রে বিনয়বাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, পানু নীরবে আসিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াই, হঠাৎ মীরার হাত ছটি মুহূর্ত্তের জন্য একবার যেন অবশ হইয়া আসিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে ডাকিল, 'এস,—'

পানু জুতাজোড়া বারাণ্ডায় খুলিয়া রাখিয়া, পা টিপিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু খুলিয়া, পা নামাইয়া বিনয়বাবু সোজা হইয়া চেয়ারে বসিলেন; বাতির মৃদু আলোকে, চক্ষুর সম্মুখে পানুকে দেখিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন।—সেই শৈশবের সদাচঞ্চল, তাঁহাদের আশ্রিত দুরন্ত পানু আর নাই। আকৃতির দৈর্ঘ্যে, বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে, চক্ষুদুটির গভীরতায়, তরুণ পান্নালাল অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন সুন্দর যুবক হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বকালের সেই চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ-তনয়ের ন্যায়, শুভ্র সুন্দর, অতি সাধারণ বেশ, বিনয়বাবুর চোখে পানুকে যেন, এই দারুণ দুঃসময়ে সহসা দেবদূত বলিয়াই বোধ হইল। মৃদুস্বরে তিনি কহিলেন 'উনি তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছেন পানু, আজ তিন চার দিন তোমার বাড়ীতে সমানে লোক পাঠাচ্ছি।'

—'আমি এখানে ছিলুম না কাকাবাবু, আজই খানিক আগে এসে পৌঁছেছি।'

খানিকক্ষণ নীরবে শুশ্রূষাকার্য্য দেখিয়া, একজন নার্সকে সরিতে বলিয়া, পানু নিজে আইসব্যাগ ধরিয়া বসিল। রোগিণী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, এই ভাবেই প্রায় সারাদিন থাকেন, ক্বচিৎ কখনও দুই একটা কথা বলেন।—নীরব ঘরে

ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দে প্রহরের পর প্রহর অতীত হইয়া চলিয়াছিল, সহসা মীরা মৃদু স্বরে কহিল—

—'পানু দা তোমার ত রাত হয়ে যাচ্ছে,—'

শান্ত কণ্ঠে পানু কহিল, 'হোক, আজ আর যাব না—'

গভীর ভরসায় বিনয়বাবু পানুর পানে ফিরিয়া চাহিলেন, মীরা কহিল 'চল বাবা, তোমাকে তবে খেতে দেই গে, পানু দা বসুক মার কাছে।—'

—'পানু খাবে না ?—'

—'আমি খেয়েই এসেছি।'

নীরবে পিতাপুত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই মীরা ঘরে ঢুকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মাকে ত' রস দেবার সময় হ'ল পানু দা, আমি দিয়ে যাই রসটা তৈরি করে কেমন ? তুমি খাওয়াতে পারবে ত ?'

একটু হাসিয়া পানু কহিল, 'যাও তুমি, সে সব হবে'খন, তোমার ত' শুধু মায়ের জন্যই এই প্রথম করা, আর আমার ও করে করে হাত পেকে গেছে।'

হঠাৎ আর একদিনের কথা মীরার মনে পড়িল, শিয়ালদহে মুটেগিরি নেওয়ার পরমার্শ দেওয়াতে গর্ব্বিত মাথা তুলিয়া পানু কহিয়াছিল,—সাহেব সাজার চেয়ে সে অনেক ভাল,—মনে মনে এই দ্বিতীয়বার মীরার বিদ্যা-বিজয়গর্ব্বিত মস্তক পানুর নিকট অবনত হইল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া মীরা কহিল—'তা' ভাল, তা আজকাল এই নার্সগিরিই ধরেছ বুঝি, মুটেগিরিতে সুবিধে হ'ল না তেমন ?'

—'না সে সবও চলছে, নার্সগিরি মুটেগিরি খানসামাগিরি সবই চলছে ; মার জন্য তোমার ভাবনা নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে খাও গে যাও,—হাঁা, কখন দেব রস মাকে সেইটে শুধু বলে যাও, এক্ষুনি কি ?'

ঘড়ি দেখিয়া মীরা কহিল, 'না, আর দশ মিনিট পরে দিও।'—মীরা চলিয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিনয়বাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, 'পানু একটু চা খাওগে যাও, মীরা তৈরী করছে। রইলে যখন, সারারাত হয়ত জেগে কাটাতে হবে, দাও না আইসব্যাগটা, ওঁর হাতে দাও'।

নিজে খাইয়া, ঠাকুর, চাকর, ঝি, সকলের আহারের তত্ত্বাবধান করিয়া মীরা রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া পানুর জন্য চা তৈরী করিতেছিল, পানু আসিয়া একটা মোড়ায় বসিয়া বলিল, 'দরকার ছিল না কিছু, কেন আবার মিছে কষ্ট করতে গেলে ?'

সহাস্য নেত্রে মীরা প্রশ্ন করিল, 'কেন, ছেড়ে দিয়েছ না কি ?'

—'ছাড়াছাড়ি আর কি! পেলে খাই, না পেলেও অভাব কিছু বোধ করি না।'

চা দিয়া সকৌতুকে মীরা হাসিয়া কহিল, 'পানুদার আজও কি সেই রোগ আছে নাকি ?

—'কি রোগ ?'

—'সেই দেশ উদ্ধার করা রোগ ? দেশের কোন্ দিকটা উদ্ধার হ'ল ?'

—'সর্ব্বনাশ, ওই দুঃসাহস বা স্পর্দ্ধা আমার কোন দিন হয় নি। আমার এই এতটুকু একটা প্রাণ, তা ঢেলে দিলেও ত' এতবড় দেশটা উদ্ধার হবে না, যে দেব। তবে বড়-লোকের পদদলিত দু'চারটে লোকের গায়ে হাতে হাত বুলোতে যাই, এই মাত্র।'

মীরা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না। গরম চা খাইতে পানুর দেরী হইতেছিল, ভাঁড়ার-ঘরে তালা দিতে দিতে মীরা কহিল, 'দু'বছর প্রায় আস নি, মা প্রায়ই বলতেন তোমার কথা।'

এ কথার পানু আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, কেন না, তাহার না আসিবার কারণ কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, পানু তাহা জানিত।

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া পানু কহিল, 'অনেক দিন পরে দেশে গিয়ে, ঠাকুরমার বাক্স ঘেঁটে, আমার মায়ের একটা মাদুলী পেলাম। বিয়ের পর এ বাড়ী এসে মা বড্ড ভুগতেন বলে, ঠাকুরমা ঐ মাদুলীটা করিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকখানি সোনা ছিল ওটায়, আমি এবারে ওটা নিয়ে এসে একটা আঙটী গড়িয়েছি, মায়ের ঐ একটুখানি জিনিষই আমি পেলাম। কিন্তু পথে পথেই ঘুরে বেড়াই, স্বভাব ত জানই, কোথায় ফেলি কি করি কিছুরই ঠিকানা নেই, তুমি সেটা রাখবে মীরা ?'

হাত পাতিয়া মীরা কহিল, 'দাও আমায়, আমি নেব।' পানুর আঙ্গুলে দুইটা আঙটী ছিল, একটা পরিয়া, আর একটীর পানে চাহিয়া মীরা কহিল,—'ওটা?'

শান্তভাবে চক্ষুদুটী মীরার পানে তুলিয়া, গভীরস্বরে পানু কহিল, 'না, ওটা আমার থাকবে,—'

ইহার পর আর কথা কিছুই হইল না, ঐ আঙটীটার স্মৃতি উভয়েরই মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উভয়ে নীরবে আসিয়া মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দিনের বেলাটা বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়াতে এক রকম চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে রোগিণীর নীরব শয়ন-কক্ষে পিতা ও কন্যার কেমন একটা ভয়েভয়ে সময় কাটিত। সদাসর্ব্বদা খোঁজ খবর লইতে যাঁহারা আসিতেন, রাতের বেলা সহায়তা পাইবার মত কোন ভরসা পিতা বা কন্যা তাঁহাদের উপরও করিতেন না এবং সেজন্যই ইহাঁদিগকে লইয়া পাছে মিছামিছি বিব্রত হইতে হয়, এই ভয়ে ইহাঁদিগকে থাকিতেও কখনও ইহাঁরা বলিতেন না।

আজ পানু আসিয়া আপনি রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করাতে, মনে মনে উভয়েই সবিশেষ আশ্বস্ত হইলেন। এবং এই সূত্রে দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের ভিতর যে একটা কাল মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, আপনিই কখন তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহু অর্থব্যয় এবং বহু শুশ্রূষার পর দীর্ঘ দেড় মাসে মীরার মা রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। এই দেড় মাসে পানু কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় নাই। তাঁহার প্রবৃত্তি অনুসারে, নানা ভাবে নানা রকমে তাঁহার যত্ন করিয়া, সেবা করিয়া, তাঁহার রোগযন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়া, তাঁহাকে আরাম দিতে চেষ্টা করিয়াছে। পুত্রের যেমন করিয়া মাতাকে সেবা করা উচিত বা করিতে পারে, পানু কোন দিক দিয়া তাহারক এতটুকুও ত্রুটি রাখিল না। তাহার পর, পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিবা মাত্রই, পানু তাহার নিজের বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।—মাতা দুঃখ করিলেন, অভিমান করিলেন, রাগ করিলেন, কিন্তু তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না।

করুণ কাতর কণ্ঠে মাতা কহিলেন, 'তবে রোজ একবারটী করে মাকে দেখতে আসবি, এই কথাটি বলে যা—।'

হাসিয়া পানু কহিল, 'মা, মায়ের চেয়ে বড় সংসারে আমার কিছু নেই, কিন্তু কাজে আটকে পড়ে' যদি রোজ না আসতে পারি, তা হলে দুঃখ ক'রো না।'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'তবে, আর একটী কথা বল্।'

'কি মা?'

—'প্রাণের যাতে হানি হয়, এমন কাজ কিছু করিস্ না, বাবা।'

—'কাজ না করেও যদি, এই মুহূর্তে আমার হার্টফেল হয়ে যায়, তা হলে, তুমি বা আমি কেউই কি সেটাকে বারণ করতে পারব মা?'

ষাট্ ষাট্ করিয়া মা জিভ কাটিলেন। পানু হাসিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল এবং গেটের বাহিরে গিয়া চক্ষু দুটীর প্রান্ত ভাগে গায়ের চাদরখানি তুলিয়া, ভাল করিয়া মুছিয়া লইল। [ক্রমশঃ

ভারতবর্ষের জমী

ভারতবর্ষে ৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর ভূমি আছে, ইহার মধ্যে ১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্য্যন্ত কোন্ শ্রেণীর ভূমির পরিমাণ কত ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	লক্ষ একর ১৯২২-২৩	লক্ষ একর ১৯৩২-৩৩
মোট ভূমির পরিমাণ	৬৬৭০	৬৬৭০
কৃষিকার্য্যের জন্য অপ্রাপ্য	১৫২০	১৫২০
বন-জঙ্গল	৮৫৫	৮৮৪
পতিত জমি	৪৭০	৫০৪
আবাদযোগ্য পতিত ভূমি	১৫২০	১৫৫০
যে জমিতে বীজ উপ্ত হয়	২২৪৯	২২৮০
যে জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে	৪৭৮	৪৯৬

—বণিক

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩১ সালের Census Reportএ ২,৩০,৮৯৫ জন মূক-বধিরের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূক-বধির, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতিদের যে সংখ্যা Census Report হইতে আমরা পাই, নানা কারণবশতঃ উহা আমরা সঠিক গণনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের মতে ইহাদের সঠিক সংখ্যা আরও অনেক বেশী। কোনও একটি সহরে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আন্দাজ করা যাইতে পারে, Census Report-এর সংখ্যায় কতটা ভুল আছে। Dr. Muir কুষ্ঠরোগীদের লইয়া এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করেন যে, তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা Census Report-এর যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অন্ততঃ দশগুণ বেশী। অবশ্য মূক-বধিরদের সংখ্যায় এতটা পার্থক্য হইবে না, কারণ পরিবারের মধ্যে কুষ্ঠরোগ লোকে যতটা লুকাইয়া রাখিতে চায়, মূক-বধিরত্ব ততটা লুকাইয়া রাখিতে চায় না।

আমার এই প্রবন্ধের জন্য Census Report-এ দেওয়া সংখ্যাই গ্রহণ করিব। আড়াই লক্ষ মূক-বধিরের মধ্যে অর্দ্ধেক স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক বলিয়া ধরিতে পারি। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৮৩৪ জন বিদ্যালয়ে যায়। দুই বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য সমস্ত স্কুলে চিঠি লিখিয়া এই সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসরে ইহাদের সংখ্যা হয়তো কিছু বাড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মোট ৯০০ জনের উপরে যায় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই সহরে মূক-বধিরদের জন্য ভারতবর্ষে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিতেছি যে, সওয়া লক্ষ মূক-বধির বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র ৯০০ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। আমেরিকায় মূক-বধিরদিগের শিক্ষা আরম্ভ হয় ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু আজ সেখানে একজনও অশিক্ষিত বধির নাই। য়ুরোপে প্রায় সব দেশেই অশিক্ষিত বধির নাই বলিলেই চলে। জাপানে মূক-বধিরদের শিক্ষা আমাদের দেশ হইতে অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আজ সেখানে তাহাদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক।

বাংলা প্রদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা ৩৫,৪৩৭। ইহাদের শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায়, ঢাকায়, বরিশালে, রাজসাহীতে, বহরমপুরে, মৈমনসিংহে ও চট্টগ্রামে—এই ৭টি বিদ্যালয় আছে। একটি প্রদেশে ৭টি স্কুল, শুনিতে ভাল; কিন্তু কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ছাড়া অন্য স্কুলগুলি নামেই স্কুল। স্কুলপিছু ছাত্রসংখ্যা ১০।১২ জনের বেশী নয়। ঢাকায় ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩৯ জন হইবে, কিন্তু তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষিত (trained) শিক্ষক মাত্র একজন। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৩০ জন। সব দিক হইতে এই বিদ্যালয়টি ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত শিক্ষকই বিশেষ ভাবে শিক্ষিত।

আসামে মূক-বধিরের সংখ্যা ৬,৭৬০। কোন স্কুল নাই।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা ২৪,০০৩। একটিও স্কুল নাই।

যুক্তপ্রদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা ২৫,৩১৫। এলাহাবাদে নামে মাত্র একটি স্কুল আছে।

পাঞ্জাব প্রদেশে ১৬,১৬১ জন মূক-বধির আছে, কিন্তু তাহাদের জন্য একটিও স্কুল নাই।

বোম্বাই প্রদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা ১৭,৩৭৬। ইহাদের জন্য তিনটি স্কুল আছে, কিন্তু কোনটাই উপযুক্তভাবে প্রসার লাভ করিতেছে না।

মধ্য-প্রদেশে ১২,৭০৩ জন মূক-বধির আছে। নাগপুরে নামে মাত্র একটি স্কুল আছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে ৩৩,৩০৮ জন মূক-বধির আছে। ইহাদের জন্য মায়লাপুর ও পালামকোটায় জেনানা-মিশনের অধীনে দুইটি বিদ্যালয় আছে। উভয় বিদ্যালয়েই শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ও আধুনিক, ছাত্রছাত্রীসংখ্যা মোট প্রায় ২৫০, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রিগণ প্রায় সকলেই বিশেষভাবে শিক্ষিত।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বরোদায় দুইটি ও মহীশূরে একটি বিদ্যালয় আছে। উভয় রাজ্যেই মূক-বধিরদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীরে মূক-বধিরের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পরেও আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষে মূক-বধিরদের শিক্ষার প্রসার আদৌ হয় নাই। ইহার কারণ কি? যাঁহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে বক্তৃতা দিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য দায়ী। গভর্ণমেণ্ট যে মোটেই দায়ী নন, তাহা আমরা বলি না। গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে সাহায্য করেন, তাহা অতি সামান্য। কিন্তু তাঁহাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিলে, ঠিক উচিত কথা বলা হইবে না। কারণ, আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, আমাদের দেশের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা মূক বধির, অন্ধ, দুর্ব্বলমস্তিষ্কদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কিছু সময় দিতে ও টাকার থলির ফাঁস একটু আল্‌গা করিতে মোটেই প্রস্তুত নন। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের পক্ষেও, যদি আজ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, তবে দেশবাসীর কাছে কেবল আবেদন জানাইলেই একটি পয়সাও আসিবে না; ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় কোন শিক্ষায়তনের সহজ-প্রসার হয় না।

ইহা ব্যতীত মূক-বধিরদের শিক্ষার প্রসারের আরও দুইটি প্রধান অন্তরায়,—লোকের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য। শিক্ষা দিলে মূক বধিররা কথা বলিতে পারে এবং স্বাবলম্বী হইতে পারে, ইহা বেশীর ভাগ লোকই জানেন না, বলিলেও বিশ্বাস করিতে চাহেন না। যাঁহারা তাঁহাদের মূক-বধির ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াইতে চান, তাঁহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ লোকই মাসে ১০৲ ১২৲ টাকা খরচ করিতে অক্ষম। জিলা-বোর্ডগুলি

দুই একটি বৃত্তি দেন, কিন্তু তাহাতে জিলার সমস্ত মূক-বধির শিশুর কোন কল্যাণ হয় না। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিও কয়েকটি বৃত্তি দেন। এই রকম 'ছিটে-ফোঁটা' সাহায্য আর ভিক্ষার দান একই জিনিষ; ইহাতে সমাজের ও জাতির কোন সার্ব্বজনীন উপকার হয় না।

সম্প্রতি নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক সম্মেলনী নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহা কেবল শিক্ষকদিগের সমিতি নয়; যাঁহারা মূক-বধিরদিগকে সাহায্য করিতে চান, তাঁহারাও এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য,—(১) জন সাধারণের মধ্যে মূক-বধিরদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রচার, (২) যে বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমানে আছে, সেইগুলি যাহাতে আরও বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা, (৩) যে প্রদেশে কোন স্কুল নাই, সেখানে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা, (৪) ছয় হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত মূক-বধির বালক-বালিকার শিক্ষা যাহাতে বাধ্যতামূলক হইতে পারে, সেই চেষ্টা করা, (৫) বধির যুবকদিগকে কার্য্যের সন্ধান করিয়া দেওয়া, (৬) তাহাদিগের সম্বন্ধে আইনগত যে সব অসুবিধা ও অনধিকার আছে, তাহা রহিত করা, এবং (৭) উন্নততর শিক্ষা-প্রণালী বাহির করিবার জন্য একটি গবেষণাগার স্থাপন।

যাঁহারা সমিতিতে সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে লিখিলে সবিস্তারে জানিতে পারিবেন।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের জাতি

অগ্রহায়ণের বঙ্গশ্রীতে "সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় রূপ-সনাতনের জাতিবিচার করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রূপ-সনাতন নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, মুসলমানের চাকুরি করিতেন বলিয়া বিনয় করিয়া নিজদিগকে নীচ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কেহ নীচ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া নিজ জাতি বা বংশকে নীচ বলিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। যদিও স্বীকার করা যায় যে, সনাতন দৈন্যবশতঃ নিজের জাতিকে নীচ জাতি বলিয়াছেন, তথাপি এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাদিগকে নীচ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সত্য সত্যই ইঁহাদের জাতিতে কোনও দোষ না থাকিলে শ্রীচৈতন্যদেব কখনও ইঁহাদিগকে নীচ জাতি বলিতে পারিতেন না।

১৩৪১ এর শ্রাবণ-সংখ্যার ভারতবর্ষে আমি এই সকল কথা আলোচনা করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের পিতা বা পিতামহ হয় পীরালি ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নচেৎ অন্য কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিমানবাবু বলিয়াছেন যে, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের পিতা বা পিতামহ যে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে পারে না। কারণ (১) তাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পূর্বে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চারণ করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনা করিতেন। তাঁহারা মুসলমান হইলে এই সকল কার্য্যের জন্য কোনও ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত না; এবং শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি তাঁহাদের যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে একথা বলেন নাই যে, তাঁহাদের কোনও পূর্বপুরুষ মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলিতে চাহি যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান না হইলেও কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি জাতিচ্যুত হইলেও পুরশ্চরণের জন্য এবং ভাগবত আলোচনার জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। পীরালি ব্রাহ্মণের বংশধর যদি হিন্দু হইতে চাহেন, তাহা হইলেও পৌরোহিত্য প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। যবন হরিদাসও হিন্দু-সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বপুরুষের ত্রুটি উল্লেখ করিতে সকলেই সঙ্কোচ অনুভব করেন। তথাপি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থে যে, তাঁহাদের বংশের দোষের কথা একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই তাহা বলা যায় না। শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতের লঘুতোষণী টীকায় যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীকুমারাভিধঃ

কস্মিৎদ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।

তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাস্ত্রয়োজজ্ঞিরে

যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্॥

শ্রীরূপের পূর্বপুরুষ কর্ণাট হইতে আসিয়া নৈহাটিতে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে মুকুন্দের পুত্র শ্রীকুমার নামক দ্বিজবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সৎকুলজাত হইলেও কোনও দ্রোহ অর্থাৎ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া "বঙ্গদেশে" (যশোহর জেলায়) গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মহৎ বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম তিনজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীঅনুপম)। যাঁহারা "পুনঃ" (পুনরায়) নিজবংশ পরলোকে এবং ইহলোকে পূজনীয় করিয়াছিলেন।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীকুমার কোনও "দ্রোহ"প্রাপ্ত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, ইহা কি কোনও জাতিভ্রংশকর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? পরবর্ত্তী "পুনঃ" শব্দ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবসর রাখিতেছে না। যে বংশ পূর্বে পূজনীয় হইয়াছিল, কোনও কারণবশতঃ—"দ্রোহ"প্রাপ্তিহেতু—আর পূজনীয় ছিল না, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপমের পুণ্যচরিত্রে সে বংশ পুনরায় পূজনীয় হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী কেন বারবার শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে নীচ জাতি এবং নীচবংশ বলিয়াছেন, লঘুতোষণীর এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান জগৎ

প্রাচীন লেখ

§ সংরক্ষণ-পদ্ধতি

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

অতি পুরাকালে মানুষ যখন গুহায় বাস করিত, তখন হইতেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখা যায়। গুহাবাসী মানুষের আঁকা নানা প্রকার জীবজন্তুর প্রতিলিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে সেই সময়কার জীবজন্তু এবং জীবনযাত্রার প্রণালীর আভাসও পাওয়া যায়। আদিম মেক্সিকোর মায়া-সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের মন্দিরের গাত্রে এবং স্তম্ভে উৎকীর্ণ সাঙ্কেতিক লিপি আজও বর্ত্তমান। মায়া-সভ্যতা বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়, যদিও তাহার সঠিক কাল সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদিগের আর সকল বিষয়ের মতই মতভেদ আছে। কাহারও মতে মায়া-সভ্যতার বয়স আড়াই হাজার বৎসর মাত্র। অনেকের মতে মায়া-সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর প্রাচীন। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওদের রাজত্বকালে বহু পীরামিড নির্ম্মিত হয়। পীরামিডগুলি প্রধানতঃ শব রক্ষা করিবার গৃহহিসাবে ব্যবহৃত হইলেও, এগুলিকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহাফেজখানা বলা চলে, কারণ পীরামিড হইতে বহু কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরডোটাসের মতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পীরামিড —চেওপ্‌সের পীরামিড: ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১ লক্ষ লোকের ৩০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই পীরামিড ৫ হাজার বৎসরেরও অধিক প্রাচীন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করেন। প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতে মাটির ফলকের উপর বানমুখো (cuneiform) লেখা উৎকীর্ণ করা হইত। পরে ফলকগুলি পুড়াইয়া চিরস্থায়ী লেখ প্রস্তুত করা হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় ১ হাজার এই প্রকার ফলক পাওয়া গিয়াছে। পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি ব্যাবিলনীয় মন্দিরের হিসাব নিকাশের বহি। আধুনিক কালে আমরা যেরূপ ব্যাঙ্কের 'চেক' (cheque) ব্যবহার করি, সেই প্রাচীনকালেও যে তাহার ব্যবহার ছিল, তাহার নিদর্শন এই লেখগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও নানা প্রকার উৎকীর্ণ লিপি, উৎকীর্ণ স্তম্ভ, তাম্রশাসন প্রভৃতির অভাব নাই।

সংপ্রতি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল হইতে ২ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইস্‌টার আইল্যাণ্ড নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রায় ৫৫ বর্গ মাইল স্থানে চক্রাকারে সজ্জিত অবস্থায় ৬০০ বিরাট আকারের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি ৩০ হইতে ৭০ ফুট উঁচু মানুষের মুখের প্রতিলিপি। এই গুলির সহিত যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, কেহই তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই; তবে একটি বিশেষ ভারতীয় লিপির সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

গুরুতর বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য গ্রীক ও রোমকেরা পাথর বা ব্রঞ্জের ফলক ব্যবহার করিত। সাধারণ কাজের জন্য মোম দিয়া ঢাকা কাঠের ফলক, প্যাপিরস্‌ ও পার্চমেণ্ট ব্যবহার করা হইত। প্যাপিরস্‌ প্রথমে ব্যবহৃত হয় মিশরে এবং ইহাকে কাগজের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। শুনা যায়, দুই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে চীনদেশে কাগজ আবিষ্কৃত হয়।

য়ুরোপে মধ্যযুগে পুস্তক লিখিতে সূক্ষ্ম পার্চমেণ্ট বা ভেলামের ব্যবহার হইত। তখনকার অলঙ্কৃত পুথি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হয়। তাহার পূর্ব্বে কাগজের ব্যবহার থাকিলেও লিখিত বিষয়ের প্রচার সহজসাধ্য ছিল না; কারণ হাতে লেখা ছাড়া প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার অন্য কোন উপায় তখন বর্ত্তমান ছিল না। আধুনিক কালে মুদ্রাযন্ত্রের বহু উন্নতি হইয়াছে এবং কোন বিষয়ের প্রতিলিপি প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং বহুগুণ দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালে যেরূপ কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না; কাঠের মণ্ড হইতে প্রস্তুত খবরের কাগজ ৫০ বৎসর অবিকৃত থাকে না। অথচ চীনদেশে নির্ম্মিত ৬০০ বৎসরের পুরাণো কাগজ এখনও অবিকৃত এবং নূতনের মত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

প্রাচীন কালের যে সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শই প্রস্তর অথবা ধাতু নির্ম্মিত এবং কথনও বা প্যাপিরস প্রভৃতি জাতীয়; কিন্তু আধুনিক সমসাময়িক ইতিহাস খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নিহিত। আজ

যদি কোন কারণে পৃথিবী হইতে মানুষের চিহ্ন মুছিয়া যায়, তাহা হইলে মাত্র সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী উত্তর কালের জন্য আধুনিক ইতিহাসের কোন বিবরণ পাওয়া যাইবে না; খবরের কাগজ কয়েক বৎসর এবং পুস্তক সকল কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই লোপ পাইবে। ৫০০০ বৎসরের মধ্যে ইস্পাত ও কংক্রিটনির্ম্মিত বাড়ী ধূলায় পরিণত হইবে. গ্রন্থাগারগুলির চিহ্ন থাকিবে না, যান্ত্রিক সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সমস্ত কলকারখানা মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের একমাত্র সম্বল হইবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুদ্রা, খোদাই-করা পাথরের মূর্ত্তি এবং সেগুলির নাম-ফলক। আমেরিকায় গ্রানাইট্‌ পাথরের পাহাড় কাটিয়া ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিঙ্কন ও থিয়োডোর রুজভেল্টের যে বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা অন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ বৎসর স্থায়ী হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন।

ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ তামার পাত্রে, বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাস সম্বলিত ১০০০ পুস্তক রাখিয়া কক্ষটি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখিবার প্রস্তাব জনৈক মার্কিনবাসী করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকগুলি বহু সহস্র বৎসর থাকিবে বলিয়া মনে হয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এই প্রস্তাব অনুযায়ী জনৈক বিশিষ্ট মার্কিন তাঁহার গৃহের নিকটে একটি পীরামিড্‌ নির্ম্মাণ করিতেছেন।

ভবিষ্যৎ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আধুনিক সভ্যতার কি কি নিদর্শন পাইবেন, অথবা কিছুই পাইবেন কি না বলা সুকঠিন। সে সম্বন্ধে জল্পনা করিবার জন্য 'বিজ্ঞান-জগৎ' শীর্ষে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করি নাই। বিজ্ঞান-জগতের সংবাদ—বর্ত্তমান কালের পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র কিরূপে অধিকদিন স্থায়ী করা যাইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান ব্যবহারিক প্রয়োগশিল্পীদের গবেষণার বিষয় হইয়াছে।

পুরাতন চামড়ার বাঁধাই অনেকদিন টিঁকিত, কিন্তু আজকালকার চামড়ার বাঁধাই মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় ৫ বৎসরের চেষ্টায় জানা গিয়াছে যে, চামড়া পাকাইবার (tanning) জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য আজকাল ব্যবহার করা হয়, সেইগুলিই ইহার জন্য দায়ী। পূর্ব্বে চামড়া পাকাইবার জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হইত, তাহাতে চামড়া উৎকৃষ্টতর হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সে পদ্ধতিতে চামড়া পাকাইবার প্রচলন নাই। এই কারণে নিউ ইয়র্কের গ্রন্থাগারের (New York City Library) শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পুস্তক কাপড় দিয়া বাঁধান হইয়াছে।

এই গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন পুথিপত্র এবং প্রায় ৫০ লক্ষ পুস্তক আছে এবং এখানে পুস্তক ও কাগজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ন্যাকড়া হইতে তৈয়ারী কাগজ (rag paper), লিনেনের সূতা, এক জাতীয় 'বোর্ড' (semi-tar board) এবং নরম চামড়ার (buckram) বাঁধাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী।

এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৩০।৫০ বৎসর আগেকার খবরের কাগজ এতদূর জীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর বাঁধান যায় না; অথচ ১২৫ বৎসরেরও অধিক পুরাতন কাগজ বেশ ভাল অবস্থায় আছে। ইহার কারণ এই যে, ৩০।৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কাঠের মণ্ড (mechanical wood pulp) হইতে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে খবরের কাগজ অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। সুতরাং খবরের কাগজ সংরক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

প্রথমে কাগজের ফাটা জায়গাগুলি স্বচ্ছ কাগজের ফিতা দিয়া আটকান হইত। তারপরে চেষ্টা হইল, কাগজের উপর এমন কোন জিনিষের প্রলেপ লাগান, যাহাতে কাগজ শক্ত হইয়া যায় এবং বাতাসের সংস্পর্শে না আসে। গালা, তরল সেলুলয়েড, টারপিন ও মোমের মিশ্রণ, নাইট্রো-সেলুলোজ (nitro-cellulose), রজন ও তিসির তেলের মিশ্রণ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য চেষ্টা করিয়া দেখা হয়, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক হয় নাই। তাহার পর পাতলা রেশমের কাপড় কাগজের উপর আঠা দিয়া আটকাইয়া দেখা যায় যে, তাহাতে কাগজের দৃঢ়তা একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু কাগজের উপর বাতাসের ক্রিয়া সমানই চলিতে থাকে। কিছুদিন হইতে রেশমের বদলে পাতলা মলমল জাতীয় জাপানী কাপড় (Japanese tissue) ব্যবহার করা হইতেছে, কারণ ইহা বহুগুণে সস্তা অথচ দৃঢ়তর। পূর্ব্বে হাতে করিয়া লাগাইতে বহু সময় লাগিত, কিন্তু আজকাল জাপানী 'টিসু' লাগাইবার জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

সংপ্রতি জনৈক মার্কিন ডাক্তার এক প্রকার রাসায়নিক বাহির করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ; ইহাতে কাগজ ডুবাইলে কাগজের দৃঢ়তা ২০ গুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং লেখাগুলি আরও স্পষ্ট হইবে বলিয়া তিনি প্রচার করিতেছেন।

প্রায় ১।। ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ফুট লম্বা ফটো তুলিবার ফিল্মের উপর সাধারণ আকারের দৈনিক কাগজের ৮ পৃষ্ঠার ফটো তুলিবার, ফটোগুলি দেখিবার অথবা পর্দ্দার উপর ফেলিবার এক যন্ত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে ১ মাসের খবরের কাগজ ৪ ইঞ্চি চওড়া রীলের (reel) মধ্যেই থাকিতে পারিবে। এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন হইলে গ্রন্থাগারগুলিতে বহু স্থান সঙ্কুলান হইবে।

জনৈক বৃটিশ আবিষ্কারক পাতলা সোনার পাতের উপর প্লাটিনামের অক্ষরে লিখিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। সোনা এবং প্লাটিনাম বহুকাল বাতাসে থাকিলেও উহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না,—সম্পূর্ণরূপেই অবিকৃত থাকে; সুতরাং কোন দলিলপত্র চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। যদিও মূল্যাধিক্যের জন্য সাধারণ ভাবে এই ব্যবস্থা কাজে লাগিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিকগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য পরিষদ (Oriental Institute) দশ বৎসর পরিশ্রমের ফলে একটি মিশরীয় মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি উদ্ধার করিয়াছেন। যে দেওয়ালে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাইল। মন্দিরটি খৃষ্টপূর্ব্ব ১২শ শতাব্দীতে তৃতীয় রামেসেস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হয়। মিশরীয় ইতিহাসে তৃতীয় রামেসেসের কাল অত্যন্ত

গৌরবোজ্জ্বল, সুতরাং এই লিপির উদ্ধার সাধন হইলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন।

লিপিগুলি কালের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেই জন্য ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার জন্য মন্দিরের দেওয়ালটি অনেকগুলি চতুষ্কোণ খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং ক্যামেরা-সাহায্যে প্রত্যেক খণ্ডটির ফটো তোলা হয়। এই ফটোগুলি পরে সলিলত্র (waterproof) কাগজের উপর বড় করিয়া তোলা হয়। প্রত্যেক খণ্ডের ছবি দেওয়ালের সহিত মিলাইয়া দেখা হয় এবং ছবিগুলির রেখা চীনা কালি দিয়া অঙ্কন করা হয় এবং পরে রাসায়নিক দ্রবণে ডুবাইয়া ফটোগুলি তুলিয়া ফেলা হয়। দ্রবণে ডুবাইলে চীনা কালির রেখাগুলি অবিকৃত থাকে। মিশরীয় চিত্রলিপি-বিশারদ দ্বারা প্রত্যেক রেখাচিত্রটি পুনরায় মূল লিপির সহিত

খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মিশরীয় চিত্রলিপি ক্যামেরাসাহায্যে উদ্ধার করা হইয়াছে।

মিলাইয়া দেখা হয় এবং কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে তাহা অঙ্কিত করা হয়। প্রত্যেক খণ্ডটির জন্য এইরূপ পরিশ্রম করিয়া সমস্ত লিপি উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তৃতীয় রামেসেসের চারিটি বিজয় কাহিনীর বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্রলিপি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃত্রিম রবার

আজকাল কৃত্রিম জিনিষের ধুয়া পড়িয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহুপ্রকার নূতন জিনিষ প্রস্তুত করা এবং বহু প্রকার পুরানো জিনিষ কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করার জন্য বর্তমান রাসায়নিকগণ বহু চেষ্টা করিতেছেন। বহু প্রকারের ঔষধ ও রঞ্জক পদার্থ, রেশম, 'প্লাষ্টিক' (plastic—'বেকেলাইট' জাতীয় পদার্থ) প্রভৃতি সহস্র সহস্র দ্রব্য আজকাল কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। কোন কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত জিনিষ বাজারে চালাইতে হইলে, হয় তাহা স্বাভাবিক জিনিষ অপেক্ষা সস্তা হওয়া প্রয়োজন, কিংবা তাহার এরূপ কোন বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক যে, স্বাভাবিক দ্রব্যের অপেক্ষা অধিক দাম দিয়া লোকে তাহা কিনিবে। প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিম 'নীল' এবং কৃত্রিম রেশমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ স্বরূপ কৃত্রিম রবার বা 'ডুপ্রিন্'-এর (Duprene) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত রবার-জাতীয় জিনিষের অস্তিত্ব প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে রাসায়নিকদের জানা আছে। কিন্তু এগুলির কোন ব্যাবহারিক নিয়োগ অনেক দিন পর্য্যন্ত হয় নাই, কারণ স্বাভাবিক রবার অপেক্ষা নিকৃষ্ট এই দ্রব্যগুলির দাম খুব বেশী।

গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী বাহির হইতে রবার সংগ্রহ করিতে না পারায়, কৃত্রিম রবারের কারখানা স্থাপন করে। একটি কারখানায় মাসিক ১৫০ টন করিয়া কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইত এবং এই রবার সলিড টায়ার (solid tyre), ব্যাটারীর আধার প্রভৃতি নির্ম্মাণের কাজে লাগিত। যুদ্ধের পর বিদেশ হইতে রবার পাওয়া সম্ভব হইলে, জার্ম্মানীর এই কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়।

জার্ম্মান এবং বর্ত্তমান আমেরিকান রবার 'ডুপ্রিন' দুইই 'অ্যাসেটিলিন' (acetylene) নামক গ্যাস হইতে প্রস্তুত। 'অ্যাসেটিলিন' আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গ্যাস; কোন কর্ম্মবাড়ীতে আলো দিবার জন্য যে তথাকথিত 'গ্যাস' ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাতে এই 'অ্যাসেটিলিন' জ্বালান হয়। 'ক্যালসিয়াম্ কারবাইড' (calcium carbide) বা সংক্ষেপে 'কারবাইড' অর্থাৎ 'গ্যাসের মশলা'র সহিত জলের রাসায়নিক ক্রিয়া হইলে 'অ্যাসেটিলিন' পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে চুণাপাথর ও কোক উত্তপ্ত করিলে 'কারবাইড' পাওয়া যায়। নীচে কৃত্রিম রবার-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া দেওয়া হইল।

জার্ম্মাণ কারখানায় নিম্নলিখিত ভাবে রবার প্রস্তুত করা হইত। অ্যাসেটিলিন ও জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পাওয়া যায় 'অ্যাসেট্যাল্-ডিহাইড' (acetaldehyde) এবং তাহা হইতে বাতাসের অক্সিজেনের ক্রিয়ায় 'অ্যাসেটিক' অম্ল (acetic acid) বা সির্কা। 'অ্যাসেটিক' অম্ল হইতে 'অ্যাসেটোন' (acetone) এবং তাহা হইতে 'পিনাকল' (pinacol); 'পিনাকল' হইতে জলের রাসায়নিক অংশ বাদ দিলে পাওয়া যায় 'ডাই-মেথিল বুট্যাডিন' (dimethylbutadiene) বা 'মেথিল-আইসোপ্রিন' (methyl-isoprene)। এই দ্রব্যটি একটি তরল পদার্থ—ইহার সহিত ইহার নিজেরই রাসায়নিক সংযোগের ফলে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করা হইত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখা যায় যে, তামা প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর 'ক্লোরাইড' (chloride) লবণের দ্রবণে অ্যাসেটিলিন গ্যাস চালিত করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, যাহাতে বুঝা যায় যে, কোন নূতন জিনিষের সৃষ্টি হইতেছে। কোন কঠিন বা তরল দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহা দ্রবণে পাওয়া যাইত, সুতরাং নূতন দ্রব্যটি কোন গ্যাস বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ১৯২০ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও এই গ্যাস ধরিতে পারা যায় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'কুপ্রস্ ক্লোরাইড' ও 'অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে'র (cuprous chloride and ammonium chloride) মিশ্রণে অ্যাসেটিলিন চালিত করি

দেখা গেল যে, সেই গ্যাসের গন্ধ ব্যতীত দ্রবণে একটি তৈলবৎ তরল পদার্থও পাওয়া যায়।

১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কাঠামোর উপর বহুসংখ্যক কাচের কলম সাজাইয়া এই লেন্সটি নির্ম্মিত। লেন্সটির সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সৌরতাপ কাজে লাগান হয়। লোকটি লেন্স সাফ করিতেছে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, 'ডাইভিনিল্যাসেটিলিন' (Divinylacetylene) নামক এই দ্রব্যটির একটি অণু তিনটি 'অ্যাসেটিলিন' অণুর সংযোগে গঠিত। সুতরাং মূলতঃ ইহা অ্যাসেটিলিন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সালফার ডাইক্লোরাইডের (sulphur dichloride) সহিত ক্রিয়ার ফলে এই তৈল হইতে রবার-জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব, কিন্তু এই রবার বিশেষ উপযোগী নহে।

পূর্ব্বে যে গ্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাও সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহার একটি অণু অ্যাসেটিলিনের দুইটি অণু দিয়া গঠিত। এই দ্রব্যটির নাম 'মনোভিনিল্যাসেটিলিন' (monovinylacetylene); ইহার উপর 'হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে'র (hydrogen chloride) ক্রিয়ার ফলে 'ক্লোরোবুটাডিন' (chlorobutadiene) বা 'ক্লোরোপ্রিন' (chloroprene) নামক এক প্রকার তরল পদার্থ পাওয়া যায়। কয়েক দিন রাখিয়া দিলে ঘনীভূত (polymerisation) হইয়া ডুপ্রিন নামক কৃত্রিম রবারে পরিণত হয়।

সাধারণ রবারের ন্যায় পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদি অ্যাসিড (acid), বাতাস এবং ওজোনের (ozone) ক্রিয়া ইহার উপর কিছুই নাই। সুতরাং যে সকল স্থানে সাধারণ রবার ব্যবহার করা চলে না, সেখানে এই রবার ব্যবহার করা চলিবে।

নূতন চিকিৎসা বিধান

সংপ্রতি রাশিয়ার লেনিনগ্রাড শহরে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক শরীরতত্ত্ব সম্মেলনে (Fifteenth International Physiolgical Congress) হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে জনস্ হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের (Johns Hopkins University Hospital) ডাক্তার নাক্‌লাস (Dr. J. W. Nachlas) ডাঃ শেলিঙের (Dr. D. Shelling) সহযোগিতায় অস্থি-র ব্যাধির এক প্রকার নূতন চিকিৎসা-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ খাদ্য এবং ঔষধপ্রয়োগে রোগীর হাড়গুলি রবারের মত নরম ও নমনীয় করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর অঙ্গ-সংবাহনের (massage) সাহায্যে হাড়গুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া বাড় (splint) বা প্ল্যাস্টারের (plaster) সাহায্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং খাদ্য ও ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া হাড়গুলি শক্ত হইতে দেওয়া হয়। হাড়গুলি সম্পূর্ণরূপে শক্ত হইয়া গেলে বাড় বা প্ল্যাস্টার খুলিয়া দেওয়া হয়। যে সকল ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব বা অযৌক্তিক, সেই সকল ক্ষেত্রে এই নূতন চিকিৎসা-প্রণালী কাজে লাগিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অবশ্য শেষ অবধি এই চিকিৎসার ফল কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা জানা যায় নাই।

সূর্য্যালোকের ব্যবহার

সূর্য্য হইতে আমরা যে পরিমাণ তাপশক্তি পাইয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যবহার করিতে পারিলে, কয়লা, তৈল প্রভৃতির খরচ বহু গুণ কমিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ বিষয়ে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা হইয়াছে সন্দেহ নাই,

কেন্দ্রীভূত সৌরতাপের নীচের চুল্লী।

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ফলপ্রদও হইয়াছে। কিন্তু বিস্তৃতভাবে সূর্য্যতাপ কাজে লাগাইবার কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই।

সূর্য্যতাপ কাজে লাগাইয়া ডক্টর অ্যাবট (Dr. C. G. Abbot রাঁধিবার ষ্টোভ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অপর একজন বৈজ্ঞানিক

অটো. এচ. মার (Otto. H. Mahr) সৌরতাপের সাহায্যে বরফ করিতেছেন।

ইঞ্জিন চালাইবার বদলায় সূর্য্যের তাপে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি সূর্য্যতাপ ব্যবহারের আরও দুইটি উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

স্পেন দেশীয় মাদ্রিদ শহরে জনৈক আবিষ্কারক একটি বিরাট লেন্স (lens) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি ১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট কাঠামোর উপর বহুসংখ্যক কাচের কলম (prism) সাজাইয়া এই লেন্সটি নির্ম্মিত হইয়াছে। লেন্সটির সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সৌরতাপ যে স্থানে গিয়া পড়ে, সেখানে একটি চুল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চুল্লীর উপর মূচিতে (crucible) করিয়া কোন দ্রব্য রাখিলে তাহা তাপ পায়। এইখানে একটি কাঠের টুকরা ফেলিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া যায়। কাচ এবং নানাবিধ ধাতু অতি সহজেই এই চুল্লীতে গলান যাইতে পারে। ইহা অপেক্ষা বহু গুণ বড় ২০টি লেন্স নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সাহায্যে কারখানা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

অপর উপায়টির উদ্ভাবক জনৈক মার্কিনবাসী ; নাম অটো. এইচ. মার। তিনি সৌরতাপের সাহায্যে বরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সাধারণ বরফের কলে একটি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে অ্যামোনিয়া দ্রবণ (liquor ammonia) হইতে তাপসাহায্যে অ্যামোনিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই অ্যামোনিয়া বাষ্পাকারে একটি নলের মধ্যে বা একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। চাপবৃদ্ধির ফলে অ্যামোনিয়া বাষ্প তরল আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। তরল অ্যামোনিয়া নলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং বাহির হইতে তাপ শুষিয়া লইয়া জল জমাইয়া বরফ করিয়া দেয়।

বর্ণিত যন্ত্রে সাধারণ গৃহ-ব্যবহার্য্য বরফের কলে গ্যাস বা কয়লার উনান হইতে তাপ না দিয়া বিশেষভাবে নির্ম্মিত একটি গোলাকার লেন্সসাহায্যে অ্যামোনিয়া-দ্রবণ উত্তপ্ত করা হয়। দৈনিক মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া রৌদ্র লাগাইলে সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী বরফ প্রস্তুত এবং খাদ্যদ্রব্য শীতল অবস্থায় রাখা চলিতে পারে। বৃহৎ আকারের গোলাকার লেন্স ব্যবহার করিয়া শীত ও গ্রীষ্মকালে 'এয়ার-কণ্ডিশনিং'-এর (air conditioning) ব্যবস্থাও আবিষ্কারক করিয়াছেন।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বিহারের পরিকল্পনা

সাধারণ বায়ুমণ্ডলের যে স্তর পর্য্যন্ত ঝটিকা বহিতে পারে, তাহার উপরের স্তরকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (stratosphere) বলা হয় বেলুনে চড়িয়া ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্য্যন্ত উঠিয়া ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের বহুকাল হইতে ধারণা আছে যে,

উপরে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বেলুন : মধ্যে গ্লাইডার এবং নীচে গ্লাইডারের চালককক্ষে দুই জন আবদ্ধ চালক।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়া এরোপ্লেন চালাইতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবে, কারণ ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ঝড়ের ভয় নাই এবং বাতাসের চাপ অত্যন্ত লঘু, সুতরাং

কিন্তু এই সকল ঔষধ সেবনে যে কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। রোগা হইবার জন্য প্রধানতঃ "থাইরইড" রস (thyroid extract) এবং "ডাইনাইট্রোফেনল" (dinitrophenol) নামক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির বিষয় গত ভাদ্র মাসের বঙ্গশ্রীতে আলোচিত হইয়াছে।

ডাইনাইট্রোফেনল ব্যবহারে মেদ কমে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। ইহা সেবনের ফলে বমনেচ্ছা, পেটের যন্ত্রণা, ঘর্ম্মস্রাব, জ্বর, ঘন ঘন শ্বাস ফেলা এবং পেশীসমূহের জড়তা এবং শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু ঘটিতে পারে। যকৃৎ, মূত্রাশয়, হৃদযন্ত্র এবং স্নায়ুসমূহের উপর ইহা ক্রিয়া করে। চোখে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ছানি পড়ে এবং অতি শীঘ্র তাহা অন্ধত্বে পরিণত হয়। ইহার প্রভাবে "অ্যাগ্র্যানুলোসাইটোসিস" (agranulocytosis) নামক এক প্রকার রক্তের ব্যাধি হইতে দেখা যায়।

ইহা এবং ইহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া হইল :—'নাইট্রোমট' (Nitromot), 'ডাইনাইট্রোল্যাক' (Dinitrolac), 'নাইট্রোফন' (Nitro-phon), 'ডাই-নাইট্রিসো' (Dinitriso), 'ফর্ম্মুলা ২৮১' (Formula 281), 'ডাইনাইট্রোস' (Dinitrose), 'নক্স-বেন-অল' (Nox-ben-ol), 'রি-ডিউ' (Re-du), 'অ্যাল্‌ডিনল' (Aldinol), 'ডাইনাইট্রিনাল' (Dinitrenal), ১৭নং প্রেসকৃপ্‌শন (Prescription No. 17), 'স্লিম্' (Slim), 'ডাইনাইট্রোল' (Dinitrole), 'ট্যাবেলিন' (Tabelin) এবং 'রিডিউসল্‌স' (Redusols)। এগুলির কোনটিই ব্যবহার করা উচিত নহে এবং আমাদের দেশে মেদবৃদ্ধি রোগের ঔষধরূপে যাহা যাহা বিক্রয় হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, তাহাতে 'ডাইনাইট্রোফেনল' আছে কি না—থাকিলে তাহা বিষবৎ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

কুকুরের উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, 'ডাইনাইট্রোফেনল' প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যে মাতাল কুকুরকে প্রকৃতিস্থ করা সম্ভব। সুতরাং এই জাতীয় কোন ঔষধে ইহা থাকা অসম্ভব নহে। ইহাতে নেশা ছুটিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ।

স্বাধীনতা

…আমাদের শিক্ষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজ্য-পরিচালনার ভার বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। যেদিন আমাদের শিক্ষা যথাযথ হইবে, সেইদিনই আমাদের রাজ্য-পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য থাকিবে না।…

[সম্পাদকদ্বয়ের সম্মতিক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনতা

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নামক নাটকখানির অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ঐ নাটকের "ঠাকুরদাদা" ভূমিকায় অভিনেতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং ভদ্রঘরের যুবক ও যুবতীগণ অন্যান্য অংশের অভিনয় করিয়াছেন।

আমাদের সাধারণের বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে ও তাঁহার কার্য্যে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাধারণের ঐ ধারণা যথাযথ নহে।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিক্ষা যখন জগতের বরেণ্য হইয়াছিল, তখন নাটক লিখিত হইত এবং তাহার অভিনয়ও হইত ইহা সত্য বটে; কিন্তু যে-নাটকের অভিলেখ্যে অথবা তাহার যাদৃশ অভিনয়ে কাম-ক্রোধাদির নিবৃত্তি না হইয়া তাহার উদ্রেক হইতে পারে, সেই নাটকের রচনা অথবা তাদৃশ অভিনয়ের প্রশ্রয় তখন দেওয়া হইত না। ছন্দ ও শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিদিগের যে সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার মূলাংশগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কালিদাস প্রভৃতি যে সমস্ত কবি বিরুদ্ধ রসাত্মক নাটকের রচয়িতা, তাঁহারা ভারতের ঋষিদিগের সমসাময়িক নহেন।

রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নাটক লিখিয়াছেন, অথবা তাঁহার অধিনায়কত্বে যে ভাব-ভঙ্গীতে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, তাহাতে দর্শকগণের মনে কাম-ক্রোধাদির উদ্রেক হয় না— এই কথা খুব সম্ভব তাঁহার একনিষ্ঠ শিষ্যগণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিবেন না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের বক্তৃতায় যতই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উপাসক হউন না কেন, তিনি কার্য্যতঃ যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে ভারতীয় নিজস্ব প্রকৃত সভ্যতা ও শিক্ষার পরিপন্থী অনেক কিছুর বিস্তৃতি সাধিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা অথবা আত্ম-সম্মান সম্বন্ধে সজাগতার কথা আমাদের অজ্ঞাত নহে। আজকাল কোন কোন বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে "করেছ", "খেয়েছ" প্রভৃতি শব্দসম্বলিত ব্যাকরণ-হীন যে ভাষা চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এতাদৃশ ভাষার সৃষ্টি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর হিত অথবা অহিত সাধন করিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। ভাষার উদ্দেশ্য কি এবং তাহার রূপ কি রকম হইলে ভাষা উদ্দেশ্যের সমঞ্জসীভূত হয়, ইহা বিচার করিতে বসিলে হয়ত প্রতিপন্ন হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণহীন ভাষা বাঙ্গালীর উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধন করিয়াছে। কিন্তু তথাপি যিনি একটা নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি যে অসামান্য প্রতিভার আধার, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে-উপাধির জন্য সাধারণতঃ মানুষ লালায়িত হয়, সেই উপাধির মধ্যে যেটী সর্ব্বজনাদৃত, তাহাতে ভূষিত হইয়াও যিনি দেশবাসীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ অবলীলাক্রমে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তিনি যে অসাধারণ পরিমাণে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন, ইহা অতি সাধারণ বুদ্ধির লোকও অস্বীকার করিতে পারে না।

কাযেই আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ভ্রান্তিহীন না হইলেও শ্রদ্ধেয় এবং অসাধারণ।

দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে যুবক ও যুবতীগণের চরিত্র-গঠনের সহায়তা হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও পাতিত্য সাধিত হইতে পারে, তাদৃশ কার্য্য রবীন্দ্রনাথ করিতেছেন, ইহা দেখিলে আমাদের বলিতে হয় "প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি"।

কত শিক্ষিতা যুবতী অবিবাহিতা রহিয়া যাইতেছেন, যুবক-যুবতীর পারিবারিক জীবন কিরূপ অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষার প্রকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলার

স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের পুরস্কার-বিতরণ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেকার সমস্যা ও শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। কি হইলে বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না, তাহার অনেক সংবাদ ভাইস-চ্যান্‌সেলার মহোদয়ের বক্তৃতায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কি করিলে যে বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার কোন সন্ধান ঐ বক্তৃতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কি হইলে বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না, তাহা যে-কোন বেকার যুবকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভাইস-চ্যান্‌সেলার মহোদয় কষ্ট করিয়া তৎসম্বন্ধে এত কথা কেন বলিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত।

ভাইস-চ্যান্‌সেলার মহোদয় তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, "খুব ভাল ভাল ছেলে উচ্চাঙ্গের এঞ্জিনিয়ারীং, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়াও বেকার হইয়া রহিয়াছে। কাযেই (অবশ্য তাঁহার মতে) বুঝিতে হইবে যে, ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিলেও বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না।" তাঁহার এই যুক্তি অনুধাবন করা আমাদের সাধ্যাতীত। ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় বিদ্যা যথাযথ ভাবে লাভ করিতে পারিলে যে, কাহারও বেকার থাকিতে হয় না, পরন্তু ধনবান্ হওয়া যায়, ইহা অতীতের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখনও যে-কোন ব্যবসায়ের পরিচালক অথবা স্বত্বাধিকারী খুব সম্ভব স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বাজারের অবস্থা মন্দা বটে, কিন্তু উপযুক্ত সহকারী পাইলে প্রত্যেক ব্যবসায়েই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি সাধন করা সম্ভব। কেরাণীর কোন কার্য্য খালি হইলে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অসংখ্য যুবক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবসায়-পরিচালনার কার্য্যে উপযুক্ত সহকারী পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা বাস্তব হইলে ইহা কি বুঝিতে হইবে না যে, যাহাদিগকে ভাইস-চ্যান্‌সেলার মহোদয়গণ অথবা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চাঙ্গের এঞ্জিনিয়ারীং, বিজ্ঞান এবং শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া ছাপ দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে যথার্থ উচ্চাঙ্গের কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং তাহাদের স্বকীয় কোন অপরাধ না থাকিলেও, কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যই তাহাদিগকে বেকার থাকিতে এবং নানাবিধ ক্লেশভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয়?

এই বক্তৃতায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, শিক্ষার প্রকার (type) তিনটী; যথা, সাহিত্য-বিষয়ক (literary), বিজ্ঞান-বিষয়ক (scientific) এবং শিল্প ও যন্ত্র-বিষয়ক (technical)। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মনীষিগণ সাধারণতঃ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উচ্চপদস্থ হইয়া থাকেন, তদনুসারে শিক্ষাকে ঐরূপ ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষের আরাধ্য হইয়াছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করা এবং ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ ব্যাকরণ, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা, তৃতীয়তঃ কল্প, চতুর্থতঃ নিরুক্ত, পঞ্চমতঃ জ্যোতিষ অভ্যাস করিতে হইত। তখন সাহিত্য বলিতে বুঝিতে হইত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শব্দতত্ত্ব এবং শিক্ষা বলিতে বুঝাইত, মানুষ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া যে যে অর্থে যে যে ভাবে শব্দ করে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার কার্য্য। তখন "বিদ্যা" বহু রকমের বলিয়া বিবেচিত হইত বটে এবং শিক্ষার অঙ্গও বহু বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু "শিক্ষা" ছিল একটী মাত্র কার্য্য। তখন

জ্ঞান কাহাকে বলে, বিজ্ঞান কাহাকে বলে, ব্যাকরণ কাহাকে বলে, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ কাহাকে বলে, অথবা ঐ সমস্ত পদের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তাহা মানুষের যথাযথ জানা ছিল। তখন মানুষ কোন পদের প্রকৃত সংজ্ঞা কি তাহা না জানিয়া ঐ পদ ব্যবহার করিত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন ভাষায় বহু রকম পদের ব্যবহার হইয়া থাকে, অথচ কোন্ পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা পণ্ডিতগণের(?) মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্তরের, তাঁহারা পর্য্যন্ত প্রায়শঃ জানেন না।

আমরা শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, সাহিত্যহীন বিজ্ঞানশিক্ষা অথবা বিজ্ঞানহীন সাহিত্যশিক্ষা, অথবা যন্ত্র-বিষয়ক জ্ঞানহীন বিজ্ঞানশিক্ষা কোন্ শ্রেণীর কার্য্য, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি? যদি সাহিত্য না শিখিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, অথবা ভাষার বিজ্ঞান শিক্ষা না করিয়া প্রকৃত ভাবে সাহিত্য শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, অথবা যন্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান লাভ না করিয়া কোন বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-বিষয়ক, বিজ্ঞান-বিষয়ক অথবা যন্ত্র-বিষয়ক শিক্ষা,—তিনটী যে বিভিন্ন রকমের, ইহা বলা অথবা মনে করা ভ্রমাত্মক নহে কি?

আমাদের শিক্ষার কর্ণধারগণ শিক্ষাকে এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই এখন আর ভাল ভাল ছেলে ভাল ভাল পাশ করিয়াও কোথাও চাকুরী না পাইলে পেটের অন্ন পর্য্যন্ত যুটাইতে পারেন না, ইহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু বুঝিতে পারিবেন কি?

শিক্ষা কিরূপ হইলে বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে মিলিতে পারে। আমরা তাহা শিক্ষার কর্ণধারগণকে পড়িতে অনুরোধ করি।

ক্ষুধা, মস্তিষ্কশক্তি ও পণ্ডিতগণের প্রতারণা

কি হইলে মানুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ওয়াশিংটন সহরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন মনস্তত্ত্ববিদ্ কতকগুলি গবেষণা করিয়াছেন। ঐ দুইজন মনস্তত্ত্ববিদের নাম ইলিয়ট (M. H. Elliott) এবং ট্রেট (W. C. Treat)।

বিদ্যুতের সহায়তায় ইন্দুরের মস্তিষ্কে ধাক্কা প্রদান করিলে তাহার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ বিশিষ্টরূপে প্রভাবান্বিত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে তেজ-গমনাগমনের রাস্তা প্রস্তুত করিতে পারিলে মস্তিষ্কের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে, ইন্দুরের পাকস্থলী যত খালি থাকে, তত তাহার মস্তিষ্কের প্রভাব বাড়িয়া যায়।

ঐ পরীক্ষা হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পাকস্থলী যখন খালি থাকে, তখনই মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে শিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে।

ইঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতে স্বতঃই মনে হয় যে, মস্তিষ্কই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ এবং মানুষ যত উপবাস অভ্যাস করিবে, ততই সে স্বীয় শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে।

কিন্তু বস্তুতঃ মস্তিষ্কই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ নহে এবং উপবাস অভ্যাস করিলেই শিক্ষার উৎকর্ষ লাভ হয় না।

ভারতীয় ঋষিদিগের কথানুসারে, শিক্ষা করিতে হইলে যেমন মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তেমন শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও সমান প্রয়োজন আছে। শিক্ষার প্রাথমিক অঙ্গ যে চক্ষুরাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তাদি পাঁচটী কর্ম্মযোনি, তাহা বাস্তব জীবন লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মস্তিষ্ক সুস্থ না থাকিলে চক্ষুরাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্মক্ষমতা থাকে না, আর মস্তিষ্কের নিম্নপ্রদেশস্থ অংশ সুস্থ না থাকিলে হস্তাদি পাঁচটী কর্ম্মযোনির কর্ম্মক্ষমতা থাকে না। কাজেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার জন্য যে, সমস্ত অবয়বের পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত অবয়বের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, সারা অঙ্গে যাহাতে সর্ব্বদা পূর্ণ পরিমাণের অপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃতের প্রবাহ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। নাসারন্ধ্রের এবং শ্রোত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক-গুহায় বায়ুর প্রবাহ অপ্রতিহত থাকিলে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে অপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃতের উৎপত্তি হয় এবং ঐ চারিটী পদার্থ মস্তিষ্কের সঞ্চয়-ক্ষেত্র হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত অনায়াসেই প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে অপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃতের উৎপত্তি হয়, তাহা নাভিমূলের নিম্ন ভাগে কিছুতেই প্রয়োজনানুরূপ গমনাগমন করিতে পারে না।

নাভিমূলের নিম্নে খাদ্য সঞ্চিত থাকিলে তাহা হইতে ঐ স্থানে অপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃতের উৎপত্তি হয় এবং ঐখান হইতে নাভিমূলের নিম্নভাগে ঐ চারিটী পদার্থের গমনাগমন সম্ভব হয়। কাযেই সমস্ত অবয়বের পূর্ণ স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে খাদ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা খাইলে অপ হইতে অমৃত পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, তাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করাই ঋষিগণের পরামর্শ এবং তাহারই জন্য ব্রাহ্মণগণ খাদ্য গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে 'অমৃতমুপস্তরণমসি স্বাহা' এবং খাদ্যগ্রহণ সমাপ্ত হইলে 'অমৃতমপিধানমসি স্বাহা', এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। খাদ্য গ্রহণ করিবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ খাদ্য হইতে অপ, জ্যোতি, রস এবং অমৃত সৃজন করিতেই ব্যস্ত থাকে। তখন মস্তিষ্কের কার্য্য সম্ভব হয় না। খাদ্য হইতে ঐ চারিটী উপাদানের উৎপত্তি সমাপ্ত হইলে, মানুষ ঐ চারিটী উপাদান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং এই সময়ে মানুষের স্বাস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল থাকে ও তাহার মস্তিষ্কের সর্ব্বাধিক কার্য্যক্ষমতা সম্ভব হয়। কিছুক্ষণ পরে ঐ চারিটী উপাদান আবার ফুরাইয়া যায় এবং তখন আবার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য ব্যতীত মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তির উৎকর্ষ সম্ভব হয় না; আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন এবং কিছুতেই মানুষ সর্ব্বদা মস্তিষ্কের সমান কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিতে পারে না।

এখন পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন, আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, না, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন।

আমাদের মনীষিগণ সংস্কৃত ভাষা না জানিয়া, ঐ ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত আছে, তাহা প্রায়শঃ যথাযথ না পড়িয়া, ভারতীয় ঋষিগণ কি জানিতেন অথবা কি না জানিতেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি কি ছিল, অথবা তাঁহারা কোন্ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া থাকেন। ইহাকে কি পণ্ডিতগণের প্রতারণা বলা যায় না?

ইতিহাসের উপকরণ এবং 'ষ্টেটস্‌ম্যান'

সম্প্রতি পাটনার নিকট একটী স্থানে প্রায় ২২ ফুট মাটীর নিম্নে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত মঞ্চ (platform) খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মঞ্চটী প্রায় ১০০ ফুট লম্বা, ৫২ ফুট চওড়া, ৭ ফুট খাড়াই। পাটনা ও বাঁকীপুরের প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মতে পাটলিপুত্রে যে একটী বন্দর ছিল, তাহার অন্যতম প্রমাণ ঐ মঞ্চটী। ষ্টেট্‌স্‌-ম্যানেরও বিশ্বাস, পাটলিপুত্রে একটী বড় বন্দর ছিল এবং ঐ প্রসঙ্গে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে জগতের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

যে সময়টী ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ উন্নতির সময় অর্থাৎ যখন ভারতবর্ষের প্রকৃত ঋষিদিগের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তখন ভারতবাসিগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষের কোন বন্দর ছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। কারণ, আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জানিয়া ঋষিদিগের পুস্তকগুলি যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন ভারতবাসীর উদ্ভব হইলে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস স্বতঃই উদ্ভাসিত হইবে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে ও প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়নের উপকরণ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের কথায় মনে হয় যে, বর্ত্তমান সভ্যজাতিগুলির ইতিহাস খুব পরিষ্কার ভাবে লিখিত হয়; এখন যেরূপ পরিষ্কার ভাবে ইতিহাস লিখিত হয়, প্রাচীন জাতিগুলি ঐরূপ পরিষ্কারভাবে ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না এবং যে সমস্ত জাতির লিখিত ইতিহাস নাই, তাহাদের প্রাচীন বৃত্তান্ত উদ্ধার করিবার উপায় শিলাখণ্ড, স্তম্ভ, অলঙ্কৃত পাত্র (vase) এবং খোলাকুঁচির (shard) উপর যে সমস্ত লিখন পাওয়া যায়, তাহার পর্য্যালোচনা করা।

আমাদের মতে ইতিহাস-প্রণয়ন-সম্বন্ধীয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এই মন্তব্যগুলি যুক্তিযুক্ত নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, বর্ত্তমান জাতিগুলির ইতিহাস পরিরক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহা যে ঠিক নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সময় যে যুদ্ধগুলি হইয়া গিয়াছে, তাহার বয়স এখনও ১৫০ বৎসর হয় নাই। অথচ বিভিন্ন গ্রন্থকার ঐ যুদ্ধগুলির যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন। কোন্ গ্রন্থকার বিশ্বাসযোগ্য অথবা কে বিশ্বাসের অযোগ্য,

তাহা চিন্তা করিতে বসিলে ঐ ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধ অথবা রুশ ও জাপানের যুদ্ধ, অথবা বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের অবস্থাও তদ্রূপ। দুইজন গ্রন্থকারের বর্ণনা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে এবং তাহার ফলে কাহার বর্ণনা নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বুঝিয়া উঠা ভবিষ্যৎ কালের পাঠকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দেশের সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন। বস্তুতঃ কোন একটা ঘটনা দুইজন মানুষ একরূপ ভাবে দেখে না ও শুনে না এবং তাহার ফলে একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষের বিবৃতিতে অথবা রচনায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কাযেই বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাসের নামে যাহা পরিরক্ষিত হইতেছে, তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান কালের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না এবং হইবে না। শিলাখণ্ড এবং স্তম্ভ প্রভৃতিতে যাহা লিখিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা কল্পনা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হইতে পারে না এবং হইবে না।

কোন মানুষের কি রকম উন্নতি অথবা অবনতি হইলে তাহার রচনা ও কার্য্যাবলী কিরূপ হয়, সমাজের কোন্ অবস্থায় কিরূপ গ্রন্থকারের উদ্ভব হয়, এবংবিধ তথ্যগুলি জানা থাকিলে, যে কোন সময়ে যে কোন দেশের ইতিহাস ঐ দেশের এবং ঐ সময়ের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বুঝিতে পারা সম্ভব হয়। মানুষ মিথ্যা কথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে অথবা রচনায় যে অস্বাভাবিকতার উদ্ভব হয়, তাহা প্রকৃত বুদ্ধিমানের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখা যায় না। কাযেই প্রকৃত ইতিহাসের প্রধান উপকরণ তিনটী—যথা (১) যে সময়ের ইতিহাস জানিতে হইবে সেই সময়ের বিভিন্ন রচনাবলী, (২) বুদ্ধিমান্ পাঠক, (৩) রচনাবলী হইতে গ্রন্থকারের চরিত্র এবং তাঁহার সমসাময়িক সমাজ-চিত্র প্রভৃতি কিরূপে বুঝিতে হয়, তাহার তত্ত্ব।

যে পরাধীন ভারতে আজ মনুষ্যাকারের যে জীবগুলি দম্ভভরে আপনার ও স্ত্রীপুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে প্রায়শঃ মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াও মনুষ্যত্বের অভিনয় করিতেছে, সেই ভারতের ঐ দাম্ভিক মানুষগুলির পিতৃপুরুষগণই একদিন প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ কি হইতে পারে এবং কি করিলে ইতিহাস চিরকালের জন্য পরিরক্ষিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ জাতীয় আলোচনা জগতের অন্য কোন জাতির কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ (?) ব্যাসদেবের পুরাণগুলিকে যে অংশে প্রচারিত করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐগুলিকে অবাস্তব গল্পের পুস্তক বলা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কোন দিন প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা মানুষ আবার জানিতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ পুরাণগুলির মধ্যেই ইতিহাসের উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বলিখিত আলোচনাগুলি আছে এবং তাহার মধ্যে অবাস্তব কোন গল্প নাই।

বৃটিশ শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য এবং আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গীয় পরিষদ্

আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গীয় পরিষদে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনায় ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং প্রোফেসার বিনয় কুমার সরকার মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আংশিক ভাবে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুলকাষ্টার, মিল্‌টন, লক্ এবং স্পেন্‌সার শিক্ষা সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন, তাহা ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহার কোন্ কথা কেন গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নাই। কাযেই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের জনসাধারণের কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে ডাঃ দাশগুপ্তের যে কোন চিন্তা আছে, তাহা তাঁহার বক্তৃতার প্রকাশিত অংশ হইতে বুঝা যায় না। ডাঃ দাশগুপ্ত যেরূপ ভাবে মুলকাষ্টার, মিল্‌টন লক্ এবং স্পেন্‌সারের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কথাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ স্কুলের ছেলেদের প্রয়োজনী হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, কারণ এই জাতী

বিশ্লেষণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং তাহা আজকালকার পণ্ডিতদিগের কথায় প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান ইয়োরোপে তথা ইংলণ্ডে যে যে ধারার শিক্ষা প্রচলিত, তাহাতে যদিও সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মূল-নীতি নাই, তথাপি বিভিন্ন দেশের শিক্ষার নীতিতে যে যৎসামান্য সমতা দেখা যায়, রুসোকে তাহার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে এবং ক্যাণ্ট, পেষ্টালজি (Pestalozzi), ডেকার্টে, ফ্রোবেল এবং হার্বার্টকে (১৭৭৬-১৮৪১) তাহার পরিবর্দ্ধক বলা যাইতে পারে।

ডাঃ দাশগুপ্তের আলোচনায় অন্ততঃপক্ষে রুসো, ক্যাণ্ট, পেষ্টালজি এবং ডেকার্টের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ স্থান পাইলে আমরা আরও আনন্দানুভব করিতে পারিতাম।

কি জাতীয় শিক্ষা হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ বেকার না থাকিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারে, তাহা আমাদের বিশেষ চিন্তনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ চিন্তায় ইংরাজ জাতির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনার স্থান কতটুকু, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কোন বিষয়ে অনুকরণ করা যায় কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে, যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষার নীতি কি হওয়া উচিত, কি জাতীয় শিক্ষা হইলে তদ্দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ইংরাজগণ এখনও পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের প্রচলিত শিক্ষানীতি সাফল্য লাভ করে নাই। তাঁহাদের প্রচলিত শিক্ষানীতি যে সাফল্য লাভ করে নাই, তাহার প্রমাণ ইংরাজ জাতির শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এবং ইংরাজ জাতির পরমুখাপেক্ষিতা।

ইংরাজদিগের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও যে-সংখ্যক ইংরাজ নিজের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এখন আর সেই সংখ্যক ইংরাজ নিজের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। এই সত্যটী বিভিন্ন ইংরাজ গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। কাযেই ইংরাজের বর্ত্তমান শিক্ষানীতি তাহার নিজের দেশেও সাফল্য লাভ করে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শিক্ষা (Education) শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পর্য্যন্ত ইংরাজগণ এতাবৎ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত বাট্‌লারের (N. M. Butler) "The Meaning of Education", ১৯১৩ সালে প্রকাশিত ষ্ট্যান্‌লী লেদ্‌সের (Stanley Leathes) "What is Education", ১৯১৫ সালে প্রকাশিত ওয়েলটনের (J. Welton) "What do we mean by Education" এবং ১৯১৫ সালে প্রকাশিত মূরের (E. C. Moore) "What is Education"—এই চারিখানি গ্রন্থ পড়িলে ইংরাজগণ যে এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষা শব্দের যথাযথ অর্থ কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই এবং ইংরাজ গ্রন্থকারগণ যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু, সৎ প্রকৃতির সত্যবাদী লোক আছেন। তাই তাঁহাদের অক্ষমতার কথা অকুণ্ঠিত ভাবে জগৎসমক্ষে প্রচারিত হয় এবং তাঁহাদের জাতীয় জীবনের বয়স নগণ্য হইলেও, জগতের মধ্যে তাঁহাদের জাতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ স্বভাবতঃ ভাল লোক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের যে কোন সুচিন্তিত শিক্ষা-নীতি নাই এবং যাহা শিক্ষা বলিয়া চলিতেছে, তাহা যে সুফল প্রসব করে নাই এবং কাহারও অনুকরণযোগ্য নহে, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

অথচ আমাদের পণ্ডিতগণ ইংরাজের শিক্ষা-নীতির কথা লইয়া এত মাথা ঘামাইতেছেন এবং সময়ক্ষেপ করিতেছেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি ? কাযেই আমাদের পণ্ডিতগণের ইংরাজের জ্ঞানের প্রতি প্রীতি-বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক হইতে হইবে।

ইংরাজের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা বলিয়াছেন যে, হিন্দুর শিক্ষা (culture) ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মনস্তত্ত্বে (psychology) বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। "শিক্ষার মূলনীতি" (fundamental principle) বলিয়া একটা শব্দ অথবা পদ হইতে পারে এবং আমরা তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু "শিক্ষার মনস্তত্ত্ব" বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষানুসারে

"শিক্ষার মনস্তত্ত্ব" এই শব্দটীকে "দুষ্ট শব্দ" বলিতে হয়। যাহা হউক আমরা ডাঃ লাহার "শিক্ষার মনস্তত্ত্বকে" শিক্ষার মূলনীতি, এই অর্থে গ্রহণ করিব।

ভারতবর্ষের আচার্য্য, ভট্ট, মিশ্র এবং স্বামী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ "শিক্ষা" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে যদি হিন্দুর শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্য জাতির শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুর শিক্ষার আংশিক সমতার উপলব্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু বিভিন্নতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু হিন্দুর শিক্ষা বলিতে যদি ভারতীয় ঋষিগণের প্রদর্শিত মূল শিক্ষাপদ্ধতি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা বলিতে আমরা বাধ্য। আমরা এই সংখ্যায় এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিব না। শুধু ডাঃ লাহাকে অধিকতর সতর্ক হইয়া সাধারণের কাছে বাণী প্রচার করিতে অনুরোধ করিব। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন এবং সতর্ক না হইলে এই বিপদ্ আরও ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা আছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ডাঃ লাহা জনসাধারণের কাছে অসামান্য পরিমাণে শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। তাঁহার কথা অনেকে প্রমাণযোগ্য বলিয়া মনে করে। তিনি চিন্তা না করিয়া 'আলগাভাবে' ভ্রমাত্মক কথা বলিলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইতে পারে এবং তাহাতে আমাদের প্রত্যেকের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তিনি কি আমাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?

শিক্ষার কথাপ্রসঙ্গে প্রোফেসার বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে জগৎ সর্ব্বত্র স্পেন্‌সারের আদর্শবাদানুসারে চলিতেছে। এই কথার সার্থকতা কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "যে শিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে"—এই জাতীয় কথা স্পেন্‌সার বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি? বর্ত্তমান জগতে এমন কোন্ দেশ আছে, যে-দেশে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা পাইয়া মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জীবিকার্জ্জনের সহায়তা করিতে পারিয়াছেন? পরন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, যে-সমস্ত মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হয় না যে, স্পেন্‌সারের শিক্ষানীতি জগতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই?

চিন্তা করিয়া আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে কোন পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকার স্পেন্‌সারের শিক্ষানীতিকে কার্য্যতঃ অনন্যসাধারণ স্থান দেন নাই, কারণ স্পেন্‌সার আংশিকভাবে একটা শিক্ষানীতির কথা মাত্র বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঐ নীতি কিরূপে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কোন কথা বলেন নাই। ইংলণ্ডের কোন কোন শিক্ষাসংস্কারের আধুনিক কমিটিতে যে যে মতবাদ আলোচিত হইয়াছে, সেগুলিকে আংশিকভাবে স্পেন্‌সারের মতবাদ বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাও কেবলমাত্র স্পেন্‌সারের মতবাদ নহে।

শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহাদের নাম—

1. Essays on Educational Reformers by R. H. Quick, 1868.
2. Teaching & Organisation, by P. A. Barnett, 1897.
3. Common Senses in Education by P. A. Barnett, 1899.
8. Education : Intellectual, Moral and Physical by Herbert Spencer, (reprint.) 1903.
9. The Educative Process by W. C. Bagley, 1905.
10. A Text Book in the History of Education by P. Monroe, 1905.
11. Sonnenschein's Cyclopœdia of Education, (Edited by A. E. Fletcher.) 1906.
12. The School & Society by J. Dewey, 1910.
13. Cylopœdia of Education by P. Monroe 1911-1913.
14. Educational Problems G. S. Hall, 1911.
15. A Text Book in the Principles of Education, by E. N. Henderson, 1911.
16. Principles of Education, by F. E. Bolton, 1911.

17. The Evolution of Educational Theory by John Adams, 1912.
18. What is Education by S. M. Leathes. 1913.
19. From Locke to Montessori, by William Boyd, 1914.
20. Principles of Secondary Education, by P. Monroe, 1914.
21. What do we mean by Education by J. Welton, 1915.
22. Schools of To-morrow by J. Dewey, 1915.
23. What is Education by E. C. Moore, 1915.
24. The New Teaching by John Adams, 1918.
25. Experimental Education by R. R. Rusk, 1919.
26. The Measurement of Intelligence by L. M. Terman, 1919.
27. Short History of Education by J. W. Adams, 1919.
28. Education: its Data and First Principles by T. P. Nunn, 1920.

এই সমস্ত গ্রন্থই খুব সম্ভব আমাদের কথার পোষকতা করিবে।

স্পেন্সারের "আদর্শবাদ" কি বস্তু, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম স্পেন্সার কি কি প্রয়োগযোগ্য পন্থা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশগুলি কোথায় কোথায় কার্য্যতঃ গৃহীত হইয়াছে, প্রোফেসার সরকার তাহা জনসাধারণকে দেখাইয়া দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিপন্ন করিবেন কি ?

প্রোফেসার সরকারকেও জিজ্ঞাসা করি যে, দেশের আসন্ন বিপদের সময় যাহাতে জনসাধারণ বিপথগামী না হইতে পারে, তদনুরূপ চিন্তা অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ তাঁহাদের মত লোকের কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে কি ?

প্রোফেসার সরকার উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, যত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, ততই বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। কাযেই তাঁহার মতানুসারে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যাহাতে বাড়িয়া না যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পণ্ডিতের কথা বটে! ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, যদি সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীগুলি না থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকগুলিকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেক তথাকথিত শিক্ষিত পণ্ডিতকে বেকার থাকিতে হইত এবং অন্নাভাবের যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হইত। কাযেই আমাদের মতানুসারে বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জন্যই জগদ্ব্যাপী দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার প্রতিকার শিক্ষার সঙ্কোচ-সাধন নহে, পরন্তু যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা কি তাহার অনুসন্ধান হয় এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রসার সাধিত হয়, তাহা করাই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায়।

গুড়ের সার ও অধ্যাপক নীলরতন ধর

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর কলিকাতা সায়েন্স কলেজে গুড়ের সার সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক ধরের মতে গুড় সার রূপে ব্যবহৃত হইলে শর্করা শিল্পের পরমোন্নতি হইবে এবং ভারতবর্ষের জমীর উর্ব্বরাশক্তি বাড়িয়া যাইবে।

বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় কথা আমাদের সাধারণ লোকের বুঝিয়া উঠা যে শক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয় যে, যাহা করিলে জমীর আভ্যন্তরীণ রস ও তেজ সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া জমীর উপরিভাগে সার দিয়া তাহার উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা আর মানুষের পেট কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় স্নিগ্ধকর তেল মাখাইয়া তাহা হইতে ভাল ভাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রসব করাইবার চেষ্টা করা একই কথা। এই কথাটি সামান্য বলিয়াই বোধ হয় আমাদের অসামান্য পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

জমীর উপরে উপরে সার ব্যবহার করিয়া তাহার উৎ-পাদিকা শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিলে খরচা পোষাইতে পারে কি না, তাহা অধ্যাপক ধর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ডি. এন. সেন

মিঃ ডি. এন. সেন বাঁকীপুর বি-এন্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। "শিক্ষা কেন বিফল হয়," তৎসম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি পাটনার ব্রাহ্মমন্দিরে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহাও তিনি ঐ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আজকাল অনেক বক্তৃতারই বক্তব্য বিষয় খুব ভাল হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়শঃ বক্তা তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারেন না, অথবা করেন না। আমাদের শিক্ষা কেন বিফল হয়, তাহা জানিবার জন্ত ঔৎসুক্য সকলেরই উপস্থিত হয়। একজন প্রবীণ অধ্যক্ষ তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—দৈনিক কাগজে তাহা দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত মিঃ ডি. এন. সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি। ঐ বক্তৃতায় ঋক্‌বেদের কথা, বেদান্তের কথা, বৌদ্ধ দর্শনের কথা, কিছু-কিছু স্মৃতিশাস্ত্রের কথা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এমন কি আমাদের বর্ত্তমান জীবন যে অত্যন্ত গোলমালে পরিপূর্ণ তাহাও বুঝা যায়, কিন্তু বক্তৃতার যাহা প্রতিপাদ্য "শিক্ষা কেন বিফল হয়," তাহা একেবারেই বুঝা যায় না।

মিঃ সেন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আমরা শিক্ষার আদর্শ উপলব্ধি করিতে যেরূপ গোলমাল করিয়া থাকি, ঠিক তদ্রূপ গোলমাল হইয়া থাকে আমাদের জীবনের আদর্শ বুঝিতে। অথচ জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রয়োগযোগ্য কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে, 'বৈদিক কালে ভারতীয়গণ সন্তান-সন্ততির জন্ত প্রার্থনা করিতেন, ধনের জন্ত প্রার্থনা করিতেন, শত্রু-বিজয়ের জন্ত প্রার্থনা করিতেন পরকালের সুখের জন্ত প্রার্থনা করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ভারতীয়গণের জীবনের ও শিক্ষার একটী নূতন আদর্শবাদ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাৎকালিক ছাত্রগণ বেদের মন্ত্র অভ্যাস করিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ সমস্ত অধ্যয়নে মন্ত্রবিদ্ হওয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মবিদ্ হওয়া যায় না। কাযেই তখন গুরুগণ ছাত্রদিগকে তপস্বীর আশ্রমের নিয়মানুগতা অভ্যাস করাইতেন এবং পরিশেষে আত্ম-তত্ত্ব শিখাইতেন।'

শিক্ষা ও জীবনের আদর্শবাদের সহিত মিঃ সেনের ঐ সমস্ত কথার সংলগ্নতা (relevancy) কি, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, মিঃ সেনের মতে সন্ন্যাসী হইতে পারিলেই শিক্ষার ও জীবনের আদর্শবাদ বুঝিতে পারা যায় এবং জীবন যথাযথ ভাবে অতিবাহিত করা যায়?

সন্ন্যাসী হইতে পারিলেই যদি জীবনের বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সন্ন্যাসিগণ নিশ্চয়ই নীরোগ এবং দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে অসংখ্য সন্ন্যাসীর মধ্যে কয়জন সন্ন্যাসীর নীরোগ ও দীর্ঘজীবন দেখা যায়? বাস্তব জীবনে যাহা দেখা যায়, তাহাতে বলিতে হয় যে, যাঁহারা সংসারক্ষেত্রে বর্ত্তমানে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে হাবু ডাবু খাইয়া থাকেন, তাঁহারাও যেমন সর্ব্বদা একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতে করিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও অধিকাংশেরই সেইরূপ শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতে এবং অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। কতিপয় সন্ন্যাসী ও যেরূপ নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকেন, কতিপয় সংসারীরও তাহা লাভ হইয়া থাকে। কাযেই সন্ন্যাসী ও সংসারীর জীবনে বাস্তব কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

মিঃ সেন ঋগ্বেদে অথবা বেদান্তে যে সমস্ত কথা আছে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি? তিনি খুব সম্ভব প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন না এবং বেদের মূল তাঁহার পড়া নাই। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, চারিটী বেদ পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং মন্ত্রভাগ, শ্রৌতশাস্ত্র ভাগ, আরণ্যক ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ ও উপনিষদ্ ভাগ লইয়া প্রত্যেক বেদের সম্পূর্ণতা। কোন একটী বেদের কি বক্তব্য, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইলে, চারিটী বেদের সমগ্র মন্ত্র, শ্রৌত, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগ বুঝিতে হয়। তিনি সমগ্র বেদ ঐরূপ ভাবে পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? আমাদের বিশ্বাস, তিনি ভারতীয় ঋষির শাস্ত্রে বিন্দুমাত্রও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। যদি ভারতীয় ঋষির প্রকৃত শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইত, তাহা হইলে বৈদিক কালে ভারতীয়গণ শত্রু-বিজয়ের জন্ত প্রার্থনা করিতেন, অথবা পরকালের সুখের জন্ত প্রার্থনা

করিতেন, অথবা অবিবাহিত সন্ন্যাসী হইতেন, এই কথা তিনি বলিতে পারিতেন না।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

এই বাক্যটী গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোক। মানুষ কি করিয়া সুখী হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ ঐ শ্লোকে আছে। ঐ শ্লোকানুসারে মানুষের সুখী হইতে হইলে দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হয়।

দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হইলে কাহারও সহিত যাহাতে শক্রতার উদ্ভব না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। কাযেই মানুষের সুখী হইতে হইলে শক্রয় জয় করা তো দূরের কথা, যাহাতে শক্রতার উদ্ভব না হয়, তাহার চেষ্টা করাই ভারতীয় ঋষির নির্দ্দেশ। দ্বেষের উদ্ভব না হইলে শক্রতার উদ্ভব হয় না। কাযেই 'victory' বলিতে যে "জয়" বুঝায়, তাহা লাভ করা ভারতীয় ঋষির নির্দ্দেশ হইতে পারে না। ঋষিগণ "জয়" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার উপলব্ধি বিকৃত হইয়াছে।

জীবনের কর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে ঋষিদিগের নির্দ্দেশ কি তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় অথবা প্রকাশাত্মযতীন্দ্রের শাব্দ-নির্ণয় পড়িয়া "শব্দ" কাহাকে বলে, "অক্ষর" কাহাকে বলে, "বর্ণ" কাহাকে বলে, "মান" কাহাকে বলে, "অক্ষস্" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হয়। তাহার পর পাণিনি-ব্যাকরণ পড়িয়া "প্রকৃতি-ভাব" কি, "যুষ্মদ্", "অস্মদ্" এবং "তদ্"-ভাব কি তাহা বুঝিতে হয়। প্রচলিত ভাষায় যাহাকে "আমি", "তুমি" এবং "সে" বলা হয়, তাহার আসল প্রকৃতি কি, তাহা বুঝার নামই "যুষ্মদ্" "অস্মদ্" এবং "তদ্"-ভাব বুঝা। "যুষ্মদ্", "অস্মদ্" এবং "তদ্"-ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাসদেবের গীতা অধ্যয়ন করিতে পারিলে মানুষের জীবনের কর্ম্মের প্রয়োগযোগ্য আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের জীবনের কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি এবং তাহা কি করিয়া বুঝিতে হয়, তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে ব্যাসদেবের গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে :—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥

এই শ্লোকানুসারে যাঁহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য "মা" ও তাহার "অনুস্বার"কে আশ্রয় করিয়া "যত" হইয়া থাকেন, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে "আত্মাকে" অধিকরণ করিয়া "অখিল কর্ম্ম" কি তাহা বুঝিতে পারেন এবং "ব্রহ্ম" ও "তদ্" কি তাহা পরিজ্ঞাত হন। এই শ্লোকটীর মধ্যে যে "মাং", "যত", "অধ্যাত্ম", "ব্রহ্ম" ও "তদ্" শব্দ রহিয়াছে, তাহা বাক্যপদীয়, শাব্দ-নির্ণয় ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি-ব্যাকরণ ভাল করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে বুঝা সম্ভব নহে।

বহুদিন হইতে পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত পুস্তক না পড়িয়া সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ফলে সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃই অধিকতর বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বাক্যপদীয়, শাব্দ-নির্ণয় ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি-ব্যাকরণ ভাল জানা থাকিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, "মামাশ্রিত্য" পদের অর্থ "মা এবং তাহার অনুস্বারকে আশ্রয় করিয়া"। "মা" বলিতে বুঝায় "স্পর্শের কার্য্য"। স্পর্শের কার্য্য এবং তাহার অনুস্বারকে বুঝিতে হইলে শব্দ হইতে কি করিয়া স্পর্শের উৎপত্তি হয়, স্পর্শ হইতে কি করিয়া রস ও রূপের উৎপত্তি হয় এবং রস ও রূপ হইতে কি করিয়া গন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিতে হয়। **কাযেই বলিতে হইবে যে, ব্যাসদেবের নির্দ্দেশানুসারে মানুষের জীবনের কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে মানুষকে প্রথমতঃ স্বীয় যৌবন ও দীর্ঘ-জীবন রক্ষা করিবার জন্য কার্য্য করিতে হইবে এবং কি করিয়া তাহার নিজের ভিতর শব্দের উৎপত্তি হইতেছে এবং ঐ শব্দ হইতে স্পর্শ এবং ঐ স্পর্শ হইতে রূপ ও রস, এবং ঐ রূপ ও রস হইতে গন্ধের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।**

কি করিয়া নিজের ভিতর ও অন্যান্য জীবের ভিতর শব্দাদির উৎপত্তি হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করা। ঋষিগণ তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রে তন্ন-তন্ন করিয়া অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা কি বুঝাইয়াছেন, তাহার রস বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভাষ্যকার-

গণের ও বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের (?) কথা শুনিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "হে মাতঃ বসুন্ধরে, দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করিব"—

না, আমি আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। আত্মহারা হইলে চলিবে না। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, সমস্ত মানবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়াছে। পণ্ডিতদিগের (?) কোন দোষ নাই। আমরা তাঁহাদের উপর দ্বেষ পোষণ করিতে পারি না। কালের প্রভাবে অপৌরুষেয় বেদের অবস্থা যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে। তাহার জন্য কোন পণ্ডিতের (?) দায়িত্ব নাই। আমাদের মত সাধারণ লোকের দুঃখ যে, পণ্ডিতগণ নিজেরা যে কিছুই বুঝেন নাই, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝেন না। তাঁহারা বুঝেন না যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিগণের কথা লইয়া খেলা করিলে তাহার মধ্যে পতঙ্গবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়। তাঁহারা বুঝেন না যে, ঐ আগুন লইয়া খেলা করিবার ফলে বর্ত্তমান জগৎ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঋষিদিগের এই কথাগুলিকে লইয়া খেলা করা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা মিঃ সেন বুঝিতে পারিবেন কি?

মিঃ সেন তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ইয়োরোপের ছোট ছোট প্রদেশে শিক্ষার যে সম্পূর্ণতা আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। আমাদের মতে এই কথা সত্য নহে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষা যেরূপ অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হইয়া থাকে, ইয়োরোপের শিক্ষাও ঠিক সমান ভাবে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হয়। ইয়োরোপীয়গণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ফল না হইলে তাঁহাদের দেশে বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা, ধনের অসমান বিতরণ-সমস্যা এত প্রকট হইত না। ইয়োরোপের এবং আমেরিকার সমস্যা যে ভারতবর্ষের সমস্যা হইতেও আশঙ্কাজনক, তাহা টলষ্টয়, হেনরি জর্জ্জ, লেনিন, কার্ল মার্কস, এবং স্যার জসুয়া ষ্টাম্পের গ্রন্থ পড়িলে ও হের হিটলারের বক্তৃতা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। ইয়োরোপীয়গণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল, ইহা যখন এত সহজেই বুঝা যায়, তখন ভারতীয়গণের ঐ শিক্ষার অনুকরণ করা অথবা তাহার পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি?

ইহা ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত বিজয়ের (intellectual conquest) কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

অবশ্য যদি দেখা যাইত যে, পাশ্চাত্ত্যগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অথবা শিক্ষার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে কোন আপত্তি হইতে পারিত না। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের দুঃখই দূরীভূত হইতেছে না, তখন যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। আমাদের যুবকগণ অযথা ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে উহাতে অনুরক্ত হন, তাহার জন্য দায়ী মিঃ সেনের মত শিক্ষা-বিভাগের অধ্যাপকগণ। অযথা ভাবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অথবা শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইলে পাশ্চাত্ত্যগণকে গুরুর পদে বরণ করা হয়। গুরু চিরদিন প্রভু এবং শিষ্য তাহার দাস। প্রকৃত শিক্ষায়, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পাশ্চাত্ত্যগণ প্রকৃত ভাবে "গুরু" হইলে তাঁহাদের "শিষ্য" হইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাই বলিয়াই, যে যে জাতি তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের অন্নক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহারা প্রভু, আমরা তাঁহাদের দাস, এই ভাব যত শীঘ্র বিদূরিত হইয়া প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য প্রযত্ন আরম্ভ হয়, ততই মঙ্গল।

শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান আন্দোলন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন হইতে ভারতের সমস্ত প্রখ্যাতনামা লোক যেরূপ ভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কার করিবার জন্য যে একটা চেষ্টা হইতেছে এবং সেই চেষ্টার উদ্দেশ্য যে শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার-সমস্যার সমাধান, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান

এই শিক্ষা-সংস্কারকার্য্যে ভারতীয় বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সমান ভাবে ব্রতী হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষাবিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কিছু নূতন নূতন কথা কহিতেছেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিখ্যাত পুরুষগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন টীকাটিপ্পনীতে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। কাজেই আশা করা যায় যে, যদি আমাদের শিক্ষার কোন সংস্কার হয়, তাহার মূলে থাকিবে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের কথা এবং কল্পনা। যে শিক্ষার দ্বারা দেশের সর্ব্বব্যাপী অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অসদ্বৃত্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহা ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের দেশেই ঐ জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করি সক্ষম হন নাই।

কোন্ শিক্ষায় জনসাধারণের বেকার-সমস্যা, অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অসদ্বৃত্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যদি ইংরাজদিগের জানা থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে ঐ সকল সমস্যা থাকিতে পারিত না। কিন্তু বস্তুতঃ ইংলণ্ডের ঐ সমস্ত সমস্যা ভারতবর্ষের তদ্বিষয়ক সমস্যা অপেক্ষাও গুরুতর।

কাজেই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের কল্পনা হইতে যে নূতন শিক্ষাবিধির উদ্ভব হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটা নূতন পরীক্ষার (experiment) সৃষ্টি হইবে বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইবে না এবং প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না।

এইখানে শিক্ষা-বিভাগের ও শাসন-বিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের সমস্যা যেরূপ জটিল ও গুরুতর, তাহাতে এখন আর কোন পরীক্ষার সময় নাই। ভারতবর্ষের জমী যখন রসাল ছিল এবং ভারতবাসীর শতকরা ৮৫ জন যখন কৃষিদ্বারা সুখে দুঃখে মিশ্রিত জীবন একরূপ ভাবে অতিবাহিত করিতে পারিত, তখন যে যাহা করিয়াছে, তাহাই একরূপ ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সিমলার ও দার্জ্জিলিং-এর শৈলশিখরে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অথবা পান-ভোজনের আমোদ উপভোগ করিতে করিতে তখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা সম্ভব হইত। তখনকার রাজকর্ম্মচারীদিগের দূরদর্শিতা থাকিলে হয় ত ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থায় এত জটিলতা বর্ত্তমানে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। ভারতের জমী ক্রমশঃ যেরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, প্রতিবিঘা জমীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যেরূপ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, কৃষকদিগের পক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা যেরূপ ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শতকরা ৮৫ জন কৃষক কৃষি ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হওয়ায় অন্যান্য প্রত্যেক বৃত্তি যেরূপ অতিরিক্ত জনতাযুক্ত (overcrowded) হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে যথাযথ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হইলে ভবিষ্যৎ রাজকর্ম্মচারিগণের পক্ষে রাজ্যপরিচালনা করা আরও ক্লেশকর হইবে, ইহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

শিক্ষা কিরূপ হইলে ইলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান হইতে পারে, তাহা ভারতীয় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে হয়ত অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা করিতেছেন না। যাঁহাদের প্রাণ প্রকৃতপক্ষে মূক জনসাধারণের জন্য প্রকৃতিবশে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। আর যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহারা ইংরাজের সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা করিবার জন্য যে সময়টুকু অতিবাহিত করেন, অথবা মস্তিষ্কের যে অংশটুকু কার্য্যকরী করিয়া থাকেন, তাহার অর্দ্ধেক সময় অথবা মস্তিষ্কের অর্দ্ধেক অংশ দেশের জনসাধারণের দুঃখ কি করিয়া দূরীভূত হইতে পারে, তাহার চিন্তায় ব্যয় করেন না। এই অবস্থা দেশের জনসাধারণের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় এই মনীষিগণই আবার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন এই রাজকর্ম্মচারিগণকে দায়ী করিবেন এবং তাঁহারা নিজেরা যে তাঁহাদের দায়িত্বানুসারে কার্য্য করিতেছেন না, তাহা বিস্মৃত হইবেন।

কাজেই বলিতে হইবে যে, দেশবাসীর অথবা কংগ্রেসের ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানকল্পে তৎপর হইবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের মতে বাঙ্গালীর দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর রূপ কি, পৃথিবীর কোন্ স্থানের সহিত সূর্য্যের কি সম্বন্ধ, সূর্য্য হইতে বিভিন্ন স্থানের দূরত্বের বিভিন্নতানুসারে ঐ ঐ স্থানের চর ও অ-চর জীবের বৃদ্ধিতে কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা যখন মানুষ যথাযথভাবে জানিতে পারিবে, তখন মানব-জীবনের সমস্যা-সমাধানে যে বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুব গুরুতর, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যে শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সূচিত হইয়াছিল বাঙ্গালীর দ্বারাই। তাহাতে যদি কোন সুফল ফলিয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর কৃতিত্ব এবং যদি কোন কুফল ফলিয়া থাকে, তাহাও বাঙ্গালীর দায়িত্বপ্রসূত। এখন যখন দেখা যাই-তেছে যে, ঐ শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তখন বাঙ্গালীকেই তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালী যদি তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ না করেন, তাহা হইলে একদিন আসিতে পারে, যখন ভারতীয় অন্যান্য জাতি যুক্তিযুক্ত ভাবে তাঁহাদের মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালায় শিক্ষিত লোকের অবস্থা ক্রমশঃ অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্যাবলী সুতীক্ষ্ণ নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা যে কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আনন্দবাজার প্রভৃতি কয়েকটী দৈনিক পত্রিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে মনে হয়, যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও অধ্যাপকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ নির্ব্বাহ করিতেছেন। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের চিন্তার ধারা কি, তাঁহারা দেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছেন কি না, তাহা, তাঁহাদের বক্তৃতায় যে সমস্ত কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইতে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অন্যরূপ প্রতিভাত হয়।

গত কয়েক দিনের মধ্যে এলাহাবাদে ও পাটনায় মিঃ সপ্রু, আলিগড়ে স্যর গিরিজাশঙ্কর বাজপায়ী, শিলং-এ লেডি কীন, আগ্রায় মহারাজ আনন্দস্বরূপ, লক্ষ্ণৌতে মিঃ পরাঞ্জপ্যে এবং নাগপুরে মিঃ জয়াকর শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ বাবুও স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। মিঃ সপ্রু প্রভৃতি যে যে বক্তৃতা দিয়াছেন,তাহা যে সর্ব্বতোভাবে যথাযথ অথবা সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের বক্তৃতায় বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে এবং চিন্তার খাদ্য আছে। বক্তৃতাগুলির সহিত তুলনা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা পড়িয়া হতাশ হইতে হয়। তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই এবং তাহাতে কোন চিন্তার খাদ্যও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে বলিয়া এই সংখ্যায় ঐ বক্তৃতাগুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মন্তব্য যে যথাযথ, তাহা দেখাইবার সুযোগ হইল না। প্রয়োজন হইলে আমরা তাহা ভবিষ্যতে দেখাইব।

আমাদের মনে হয়, আনন্দবাজার পত্রিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য মাত্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবুও সংবাদ-পত্রের বাহবাপ্রাপ্তির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাঙ্গালার শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব কি এবং কি করিলে ঐ দায়িত্ব নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার চিন্তায় যথাযথ ভাবে ব্যাপৃত থাকেন না। আজকাল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে দল গঠন করিবার ক্ষমতা ও কি করিয়া প্রচারশালী সংবাদপত্রগুলির সুমন্তব্য অর্জ্জন করিতে হয় তাহার নিপুণতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যথাযথ ভাবে ন্যস্ত দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, সংবাদপত্রের মন্তব্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইতে হয় না। যাঁহারা যথাযথ ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ না করিয়া, কেবল মাত্র সংবাদপত্রের মন্তব্য ও বাহবার আশা করিয়া থাকেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারকে আমরা তাঁহাদের দলভুক্ত দেখিলে ব্যথিত হইব।

স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের কার্য্যাবলী সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় কি না, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বক্তব্য নহে; কিন্তু স্যর আশুতোষের সময়ে দৈনিক কাগজপত্রে অযথাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায় নাই। জনসাধারণ যাহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারেন, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু ও আনন্দবাজার পত্রিকা যাহাতে না করেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।

আমরা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলাম বলিয়া তিনি হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা তাঁহার উপর কোন বিদ্বেষ পোষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার উপর আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। তাঁহার কোন বক্তৃতা অন্য প্রদেশের কাহারও তুলনায় নিন্দনীয় হইলে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা নিপতিত হয় বলিয়াই কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার যে পরিশ্রম-শক্তি ও ধীরতা আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি, তাহাতে অপেক্ষাকৃত একটু অধ্যয়নশীল ও চিন্তাশীল হইলেই তিনি তাঁহার দায়িত্ব সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হিন্দুধর্ম্মের শুদ্ধি ও ডাক্তার সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যে যাঁহারা ছেলেবেলায় স্কুলে ইতিহাস পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের পার্থক্য কি কি তাহা শুনিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের শুদ্ধি নাই, অর্থাৎ অন্য কোন ধর্ম্মের লোক হিন্দু হইতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেক ধর্ম্মের শুদ্ধি আছে, ইহা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন।

আসল কথাটী এই যে, জগতে একদিন ছিল, যখন সারা-জগৎ বৈদিক আচার গ্রহণ করিয়াছিল। তখন ধর্ম্ম বলিতে বুঝা যাইত মানব-ধর্ম্ম—এবং জগতে একাধিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না। তখন মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, জীবন সুখকর করিতে হইলে বিদ্বেষবিহীন হইতে হইবে। সমাজে একজন ছোট, একজন বড়, এই ধারণা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ অপরিহার্য্য হয়। অন্য পক্ষে সমাজের প্রয়োজনীয় যিনি যাহা করিতেছেন, তাহাই সমাজের পক্ষে হিতকর, যিনি মেথরের কাজ করেন, তিনিও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর যিনি শিক্ষকতার অথবা বিচার-বিভাগের কার্য্য করেন, তিনিও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়,—এই ধারণা থাকিলে সমাজে বিদ্বেষ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না এবং সমাজ সুখের আগার হইতে পারে। বেদাদি গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে যথাযথ ভাবে পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমাজ যাহাতে বিদ্বেষবিহীন হয়, তজ্জন্য ভারতীয় ঋষি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একাধিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব না থাকিলে এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন কথা আসিতে পারে না; কাজেই বৈদিক আচারের প্রভাবকালে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন প্রথা বিদ্যমান ছিল না।

কালক্রমে বৈদিক আচারের প্রভাব নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমযুক্ত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং সমাজে মানুষের ভিতর বিদ্বেষ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ক্রমে ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমযুক্ত হিন্দুধর্ম্ম মূলতঃ বৈদিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও হিন্দুগণ তাঁহাদের আচারে ও কার্য্য-কর্ম্মে প্রায়শঃ বৈদিকতা রক্ষা করিয়াছেন এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে মনুষ্য-সমাজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। হিন্দুদিগের অভ্যুদয়-কালে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন প্রথা জগতে ছিল না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তখন যে বিভিন্ন দেশের লোক নিজদিগকে বৈদিক আচার-যুক্ত অথবা হিন্দুধর্ম্মাপন্ন বলিয়া মনে করিতেন, তাহা প্রাচীন গ্রন্থগুলি একটু অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করিলেই প্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে, জগতের বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা ঐ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃত অথবা বিকৃত বৈদিক আচার রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের এই কথাগুলি বুঝিতে খুব সম্ভব পাঠকদিগের বিশেষ ক্লেশানুভব করিতে হইবে না এবং উহা হইতে হিন্দুর

যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল না এবং কেন তাহা ছিল না, ইহা বুঝা যাইবে।

অথচ ডাঃ সুনীতিকুমার হিন্দুমিশনের পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতেছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাহাতে স্কুলের বালকের মত চিন্তাহীন অধ্যয়নের এবং ইতিহাসকে বিকৃত করিবার পরিচয় আছে। এই জন্যই আমরা বলি যে বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে সকলেই স্কুলের বালক নহে এবং ডাঃ সুনীতিকুমার যত পারেন, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে আরও কিছুদিন তাঁহার বিদ্যা জাহির করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সাধারণের বিভ্রান্তিকর এবং ইতিহাসের বিকৃতিকর কোন কথা লোকসমক্ষে তাঁহার না বলাই সঙ্গত।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদিগের চাকুরীর দাবী ও আগামী নির্ব্বাচন

কর্পোরেশনের চাকুরীর এক-চতুর্থাংশ যাহাতে মুসলমানগণ পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থার জন্য একটী প্রস্তাব মুসলমান কাউন্সিলারদিগের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল। কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ফলে মুসলমান কাউন্সিলারদিগের অনেকেই কর্পোরেশন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহাদের কর্পোরেশন পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইয়াছে অথবা অসঙ্গত হইয়াছে, তাঁহাদের দাবী সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, ইহা বিচার করিতে বসিলে মতদ্বৈধের উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রত্যেক কার্য্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে।

কাযেই তাহা না করিয়া যাহাতে দলাদলির প্রখরতা কমিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই প্রথম কর্ত্তব্য

যাঁহারা দেশের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, অথবা দেশের বিবিধ দুরবস্থার জন্য বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশে একতা স্থাপিত না হইলে সর্ব্বব্যাপী বর্ত্তমান দুরবস্থার লাঘব সাধন করা সম্ভব হইবে না। কাযেই যাহাতে মতদ্বৈধ উপস্থাপিত হইতে পারে, তাহা না করিয়া, যাহাতে দলাদলির প্রখরতা কমিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই প্রথম কর্ত্তব্য।

কর্পোরেশনে দলাদলির প্রখরতা সঙ্কুচিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ চিন্তা করিতে হইবে, কর্পোরেশনের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি।

কলিকাতা সহরের জল-বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, সহরে যাতায়াত করিতে অধিবাসিবৃন্দের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জল যাহাতে প্রত্যেক অধিবাসী পাইতে পারেন, প্রধানতঃ তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই এক একটী সহরে এক একটী কর্পোরেশনের অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয়।

সহরের জল-বায়ু বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে, একজন গৃহস্বামীর জীবন-যাপন-প্রণালীতে যাহাতে অপর একজন গৃহস্বামীর অস্বাস্থ্যের উদ্ভব না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন গৃহস্বামীর বিভিন্ন গৃহ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হয়; যাহাতে প্রত্যেক গৃহের ময়লা জল সহজে নিষ্কাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়; যাহাতে প্রত্যেক গৃহের আবর্জ্জনা প্রত্যহ পরিষ্কার হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং যাহাতে বিষ্ঠাদি সঞ্চিত না হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া যাহাতে জল-বায়ুর সহিত কোন বিষা[illegible] দ্রব্য মিশ্রিত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবার প্রয়োজন হয়।

অধিবাসিবৃন্দের যাতায়াত করিতে যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে যাহাতে সুগম রাস্তা প্রস্তুত হ[illegible] এবং রাস্তাগুলির সুগমতা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিবা[illegible] প্রয়োজন হয়; রাস্তাগুলি যাহাতে আলোকিত হয়, তাহা ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সহরের মধ্যে যাহাতে দ্রুত যানে বন্দোবস্ত থাকে, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক গৃহস্বামী যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জ[illegible] পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক রা[illegible] যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রশস্ত হয়, প্রত্যেক বাসগৃ[illegible] যাহাতে যথেষ্ট বায়ু-চলাচলের বন্দোবস্ত থাকে, পাকগৃহ হইতে ধূম নির্গত হইয়া যাহাতে বাসগৃহের বায়ু বিষাক্ত করিতে পারে, মলমূত্র-পরিত্যাগের জন্য যাহাতে বায়ু বি[illegible] না হইতে পারে, যে সমস্ত দাহ্যমান পদার্থ প্রজ্বলিত ক[illegible] বায়ু বিষাক্ত হয়, তাহা যাহাতে প্রজ্বলিত না হয়, সমস্ত দ্রব্য পরিরক্ষিত হইলে বায়ু বিকৃত হইতে পারে —

যাহাতে সহরের মধ্যে পরিষ্কৃত না হয়, এবংবিধ ব্যবস্থা করিতে হয় এবং যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ জল-বায়ু সরবরাহ হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি করিবার জন্যই কর্পোরেশনের অস্তিত্বের প্রয়োজন।

কোন ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহার জন্য খরচ আছে। কর্পোরেশনের যত কিছু ব্যবস্থা, তাহা সমস্তই গৃহস্বামিগণের সুবিধার জন্য। কাজেই কর্পোরেশন-পরিচালনকার্য্যে গৃহস্বামিগণের নিকট হইতে চাঁদা লইবার প্রয়োজন হয়। গৃহস্বামিগণের নিকট হইতে তাঁহাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উপরোক্ত সুবিধাসমূহের জন্য যে চাঁদা লওয়া হয়, তাহাকে কর্পোরেশনের ট্যাক্স্ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতিবশতঃ মানুষ সর্ব্বদাই কম খরচে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুবিধাগুলি যাজ্ঞা করিয়া থাকে। অতএব যে যে পন্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কম ট্যাক্স গ্রহণে সহরের জল-বায়ুর বিশুদ্ধি, যাতায়াতের রাস্তার সুগমতা, যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু ও জলের সরবরাহ পরিরক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্পোরেশনের পরিচালকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।

উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি সম্পাদনার্থ কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে যে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহারা যথাবিধি যোগ্য হইলে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন, তাহার জন্য যদি তাঁহাদের প্রত্যেককে দায়ী করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে করদাতাগণের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম ট্যাক্স আদায় করিয়া কর্পোরেশনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার দায়ী করিতে হইলে, তাঁহাদের সহকারীর সংখ্যা যাহাতে তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এবং সহকারীর যে সংখ্যা তাঁহারা নির্দ্ধারিত করেন, তাহার প্রত্যেকে যাহাতে তাঁহাদের দ্বারা মনোনীত হন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কাজেই কর্পোরেশনের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সুদক্ষ ব্যক্তিগণ যাহাতে ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন তাহার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খরচার মধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন তাহার ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বিভাগের সহকারীর সংখ্যা ও তাঁহাদের নির্ব্বাচন ও নিয়োগ যাহাতে ঐ ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের নির্দ্দেশানুসারে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

উপরোক্তভাবে কর্পোরেশনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বন্দোবস্ত হইলে, হিন্দু সহকারী নিযুক্ত হইল, অথবা মুসলমান সহকারী নিযুক্ত হইল, তাহা লইয়া কোন দ্বন্দ্ব-কলহ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান কলিকাতা সহর যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন আর এই সহরে জল-বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না; এবং যাহাও বা যায়, তাহাও বিশুদ্ধ নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। লোকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে সতর্ক না হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই সহর বাসের অযোগ্য হইবার আশঙ্কা আছে। বিশেষজ্ঞগণ হয়ত আমাদের কথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বেরিবেরী, ক্ষয় ও রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক খুব সম্ভব আমাদের কথা অস্বীকার করিবেন না।

বর্ত্তমান কর্পোরেশনের ট্যাক্সের হারও অত্যন্ত অধিক। এই ট্যাক্সের হার আরও বৃদ্ধি করা হইবে এইরূপ কাণা-ঘুষা শুনা যাইতেছে। অথচ কর্পোরেশনের বাজেট, কলিকাতার আয়তন, রাস্তার পরিমাণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কলিকাতা সহরের অধিবাসিবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি যে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খরচে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা আমরা ভবিষ্যতে প্রতিপন্ন করিব।

এত অধিক খরচ সত্ত্বেও যে কলিকাতা সহর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ কর্পোরেশনের পরিচালকগণের অনুপযুক্ততা।

কাজেই অপেক্ষাকৃত কম খরচে যাঁহারা সহরবাসীর প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে স্বীকার করিবেন এবং তাহা করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে,